মনোবিদ্যা ও সমাজদর্শন

(PSYCHOLOGY AND SOCIAL PHILOSOPHY)

(Two-Year Degree Pass Course)

(দ্বি-বার্ষিক শ্রেণীর পাঠ্য)

শ্রীপ্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত, এম. এ. (দর্শন ও বাংলা)
দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক, কৃষ্ণচন্দ্র কলেজ,
হেতমপুর, বীরভূম।

ব্যানার্জী পাবলিশার্স
৫/১এ কলেজ রো
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রকাশক:
শ্রীসূর্যকুমার [redacted]
ব্যানার্জী পাবলিশার্স
৫/১এ কলেজ রো
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ : জুন, ১৯৫৯

মুদ্রাকর :
শ্রীদুকড়ি দাস
গোপীনাথ আর্ট-প্রেস
১৪ পি. সি. বড়াল স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০১২

SYLLABUS

CALCUTTA UNIVERSITY

Two-Year Degree (Pass Course)

Group A : Psychology

Full Marks—50

1. Sensation, Perception.
2. Memory, Learning.
3. Emotion.
4. Unconscious, Subconscious.

Group B : Social Philosophy

Full Marks—50

1. Nature of Social Philosophy.
2. Social Groups, Social Institutions, Associations.
3. Theories of the Nature of State.
4. Social Role of Religion.
5. Ideals of Education.
6. Culture and civilisation.

ভূমিকা

স্নাতক শ্রেণীর জন্য দ্বি-বার্ষিক পাঠক্রম শিক্ষার ক্ষেত্রে নতুন পরিবর্তনের সূচনা করেছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দ্বি-বার্ষিক পাঠক্রম-এর জন্য দর্শনের (পাশ কোর্স) নতুন পাঠ্যসূচী নির্দিষ্ট করেছে। সেই পাঠ্যসূচী অনুযায়ী 'মনোবিদ্যা ও সমাজদর্শন' গ্রন্থটি রচনা করা হল। মনোবিদ্যা ও সমাজদর্শনের আলোচ্য বিষয় দর্শনের পাঠ্যসূচীর তৃতীয় পত্রের অন্তর্ভুক্ত। বর্তমান গ্রন্থে মনোবিদ্যা ও সমাজদর্শনের নতুন পাঠ্যসূচীর নির্দিষ্ট অংশগুলির আলোচনা একত্রে প্রকাশ করা হল। আলোচনার ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য পাঠ্যসূচীতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি এরূপ দু-একটি বিষয়ের আলোচনা ছাড়া অন্য কোন অতিরিক্ত বিষয়ের আলোচনা গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করা হয়নি। আলোচনা যাতে সরল ও সহজবোধ্য হয় সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়েছে। বাংলা পরিভাষার পাশে প্রয়োজনমত ইংরাজী শব্দটি বসান হয়েছে।

ত্রি-বার্ষিক পাঠক্রম অনুসারে আমার লিখিত 'মনোবিদ্যা' ও 'সমাজদর্শন' গ্রন্থ দু'খানির মতন এই গ্রন্থটিও অধ্যাপক, অধ্যাপিকা ও ছাত্র-ছাত্রীদের সমাদর লাভ করবে, আশা করি।

পরিশেষে জানাই যে, গ্রন্থটির উন্নতিকল্পে যে-কোন অভিমত সাদরে গৃহীত হবে। ব্যানার্জী পাবলিশার্স-এর স্বত্বাধিকারী শ্রীসূর্যকুমার ব্যানার্জী গ্রন্থটির প্রকাশনের দায়িত্ব গ্রহণ করে আমায় কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন।

ইতি—

হেতমপুর
২০শে জুন, ১৯৭৯

প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

অষ্টম অধ্যায়

নবম অধ্যায়

দশম অধ্যায়

সমাজদর্শন

প্রথম অধ্যায়

বিষয় | পৃষ্ঠা

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

তৃতীয় পত্র

'ক'—বিভাগ

মনোবিদ্যা

(PSYCHOLOGY)

প্রথম অধ্যায়

মনোবিদ্যার বিষয়বস্তু

(The Subject-matter of Psychology)

১। মনোবিদ্যা বলতে কি বুঝ? (What is psychology ?) ঃ

মনোবিদ্যা বলতে কি বোঝায়? এই প্রশ্নের উত্তরে সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে, মনোবিদ্যা হল এমন একটি জ্ঞানের শাখা যা মন নিয়ে আলোচনা করে। মনের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনাই মনোবিদ্যা। মনোবিদ্ স্টাউট (*Stout*) মনোবিদ্যার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন যে, মনোবিজ্ঞান হল এমন বিজ্ঞান যা মন নিয়ে বা যে সব ঘটনা মনে ঘটে তাই নিয়ে আলোচনা করে।[1]

মনের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনাই মনোবিদ্যা

কিন্তু মন কি? চট্ করে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া খুবই কঠিন। মন কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু নয়। বহিঃপ্রত্যক্ষণের সাহায্যে আমরা যেভাবে বাইরের জগতের বিভিন্ন বস্তুকে প্রত্যক্ষ করি, পঞ্চেন্দ্রিয়ের মধ্যে কোনটির সাহায্যেই মনকে আমরা সেভাবে জানতে পারি না। তাহলে মনকে আমরা জানি কিভাবে? মনকে আমরা জানি তার ক্রিয়ার বা বৃত্তির মাধ্যমে। মনের যে তিনটি ক্রিয়ার সঙ্গে আমরা পরিচিত সেগুলি হল চিন্তন (thinking), অনুভূতি (feeling) এবং ইচ্ছা (willing)। মনের যে কোন ক্রিয়াই উপরিউক্ত তিন শ্রেণীর কোন-না-কোনটির অন্তর্ভুক্ত। যেমন—সংবেদন (sensation), প্রত্যক্ষ (perception), স্মৃতি (memory), কল্পনা (imagination), অবধারণ (judgment) প্রভৃতি চিন্তন-প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত, প্রতিবর্ত (reflex), ভাবজ (ideomotor), স্বতঃস্ফূর্ত (spontaneous) প্রভৃতি অনৈচ্ছিক ক্রিয়া এবং কামনা, ইচ্ছা, অভিপ্রায়, সংকল্প, মনোযোগ প্রভৃতি ঐচ্ছিক ক্রিয়া, ইচ্ছার অন্তর্ভুক্ত। সুখ-দুঃখ, ভয়, বেদনা, ক্রোধ, ভালবাসা, আনন্দ, বিষাদ প্রভৃতি মানসিক ক্রিয়াগুলি অনুভূতির অন্তর্ভুক্ত। অন্তঃপ্রত্যক্ষের সাহায্যে আমরা কেবলমাত্র নিজের মানসিক প্রক্রিয়াগুলিকে সোজাসুজি জানতে পারি। অপরের মানসিক প্রক্রিয়াগুলিকে আমাদের পরোক্ষভাবে জানতে হয়। অর্থাৎ, অপরের মানসিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত

চিন্তন, অনুভূতি ও ইচ্ছার মাধ্যমে মনকে জানা যায়

1. The science of psychology is then defined as the science concerned with minds or events which take place in minds."

—*G.F. Stout ; A Manual of Psychology*, Fifth Edition, Page 2.

দেহগত প্রক্রিয়া ও অপরের বাহ্য ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের মানসিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে পরিচিত হতে হয়।

অনেকে মনে করেন যে, চিন্তা, অনুভূতি ও ইচ্ছা প্রভৃতি মানসিক প্রক্রিয়াগুলি মনের প্রতীয়মান রূপ, এছাড়াও মনের একটা আসল রূপ বা স্বরূপ আছে। অর্থাৎ, মানসিক প্রক্রিয়ার অতিরিক্ত মনের একটা পৃথক সত্তা আছে। মনের আসল স্বরূপের প্রশ্ন বা মানস প্রক্রিয়ার অতিরিক্ত মানস সত্তার অস্তিত্বের প্রশ্ন দর্শন-অন্তর্ভুক্ত তত্ত্ববিদ্যার প্রশ্ন, এ প্রশ্নের আলোচনা মনোবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত নয়। মনোবিদ্যার কাছে এ প্রশ্নের আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক।

মানসিক প্রক্রিয়ার অতিরিক্ত মানস সত্তার অস্তিত্বের প্রশ্ন মনোবিদ্যার পক্ষে অবান্তর প্রশ্ন

মন কি? এ প্রশ্নের উত্তরে আপাততঃ আমরা এই কথাই বলতে পারি যে, মন হল যা চিন্তা করে, যার অনুভূতি আছে, যা ইচ্ছা করে। মন আছে কি নেই এও একটি বিতর্কমূলক প্রশ্ন। মনের অস্তিত্ব প্রমাণ করার দায়িত্ব দার্শনিকদের, মনোবিদ্‌দের নয়, মনোবিদ্‌দের কাজ মনের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়ে মনের বিভিন্ন অবস্থা ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান দান করা। মনোবিদ্যার কাজ মনের বিভিন্ন ক্রিয়া ও বৃত্তির আলোচনা করা। মনোবিদ্যা মন, মানসিক ঘটনা ও মনের বাহ্যপ্রকাশ নিয়ে আলোচনা করে এবং মানসিক ঘটনাগুলি সম্পর্কে কতকগুলি সাধারণ সূত্র বা সার্বিক নিয়ম আবিষ্কার করে তাদের ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে।

মন হল তাই, যা চিন্তা করে, যার অনুভূতি আছে, যা ইচ্ছা করে

মনোবিদ্যা মানসিক ঘটনা সম্পর্কে কতকগুলি সাধারণ সূত্র আবিষ্কার করে ও ব্যাখ্যা করে

২। মনোবিদ্যার বিষয়বস্তু (The Subject-matter of Psychology)

প্রথমতঃ, মনোবিদ্যার বিষয়বস্তু হল মানুষের মন। মানসিক অবস্থা ও ক্রিয়ার অনুসন্ধান এবং ব্যাখ্যাই মনোবিজ্ঞানের মূল উদ্দেশ্য। মনোবিদ্যা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচনা করে:

মনোবিদ্যার আলোচ্য বিষয়বস্তু

(১) তিনটি প্রধান ক্রিয়ার মাধ্যমে মানুষের মনের প্রকাশ ঘটে। যথা—চিন্তন (thinking), অনুভূতি (feeling), এবং ইচ্ছা (willing)। সংবেদন (sensation), প্রত্যক্ষ (preception), স্মৃতি (memory), কল্পনা (imagination), সামান্য ধারণা (conception) এবং যুক্তি (reasoning)—এগুলি চিন্তন-ক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত। সে কারণে এগুলি মনোবিদ্যার আলোচনার অন্তর্ভুক্ত।

সংবেদন, প্রত্যক্ষ, স্মৃতি, কল্পনা, সামান্য ধারণা, যুক্তি

দ্বিতীয়তঃ, অনুভূতিকে দু' ভাগে ভাগ করা হয়—সরল ও জটিল। আবেগ বা প্রক্ষোভ (emotion) এক ধরনের জটিল অনুভূতি। উভয় প্রকার অনুভূতিই মনোবিদ্যার আলোচ্য বিষয়বস্তু।

ঐচ্ছিক ক্রিয়া, অনৈচ্ছিক ক্রিয়া, ও অভ্যাস

ঐচ্ছিক ক্রিয়া (voluntary action) ও অনৈচ্ছিক ক্রিয়া (non-voluntary action) এবং তার বিভিন্ন রূপ, যেমন স্বতঃসঞ্জাত ক্রিয়া (spontaneous action), প্রতিবর্ত ক্রিয়া (reflex action), সাহজিক ক্রিয়া (instinctive action), ভাবজ ক্রিয়া (ideomotor actions প্রভৃতি মনোবিদ্যার আলোচ্য বিষয়। ঐচ্ছিক ক্রিয়া বার বার সম্পাদনের ফলে অভ্যাসের (habit) উদ্ভব ঘটে। সুতরাং অভ্যাসের বৈশিষ্ট্য, অভ্যাসের সঙ্গে সাহজিক ক্রিয়ার পার্থক্য প্রভৃতি বিষয়ও মনোবিদ্যার আলোচ্য বিষয়বস্তুর অন্তর্গত।

ব্যক্তিত্ব

(২) মনোবিদ্যা মানুষের ব্যক্তিত্ব নিয়ে আলোচনা করে। 'ব্যক্তিত্ব' (personality) বলতে আমরা মানুষের চিন্তা, অনুভূতি, কর্মশক্তি, ভাব, ধারণা সব কিছু মিলিয়ে সমগ্র মানুষটিকেই বুঝে থাকি। ব্যক্তিত্বের স্বরূপ, ব্যক্তিত্বের উপাদান, ব্যক্তিত্বের শ্রেণী-বিভাগ, ব্যক্তিত্বের বিকাশ, লক্ষণ ও মাত্রা মনোবিদ্যার আলোচ্য বিষয়বস্তুর অন্তর্গত।

সব মানুষের ব্যক্তিত্ব সমান হয় না। ব্যক্তিগত বৈষম্য বা ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রভেদের স্বরূপ (individual difference), ব্যক্তিগত পার্থক্যের পরীক্ষা ও পরিমাপ মনোবিদ্যার আলোচ্য বিষয়বস্তুর অন্তর্গত।

বুদ্ধি

(৩) বুদ্ধি কাকে বলে, কি কি নিয়মে বুদ্ধির ক্রমবিকাশ হয়, বুদ্ধি সম্পর্কীয় বিভিন্ন তত্ত্ব, বুদ্ধির পরিমাপ কিভাবে করতে হয়, বুদ্ধি-অভীক্ষা বা পরীক্ষাগুলি (Intelligence Tests)-র সুবিধা-অসুবিধা, বুদ্ধির প্রকারভেদ কি কি এবং তার উন্নতি সম্ভব কিনা, বুদ্ধির সঙ্গে আচরণ ও বৃত্তির সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয়গুলি মনোবিদ্যার আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত।

(৪) মনোবিদ্যার পদ্ধতি কি, অন্তর্দর্শন না পর্যবেক্ষণ, না উভয়ের সমন্বয় বা পরিমাণগত পদ্ধতিগুলি মনোবিদ্যায় প্রযোজ্য কিনা এই সকল বিষয়ের আলোচনা মনোবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত।

(৫) দেহ ও মনের নিবিড় সংযোগ বা সম্বন্ধের বিষয়টিও মনোবিদ্যার আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। দেহ ও মনের মধ্যে নিগূঢ় সংযোগ বর্তমান। দেহ যদি সুস্থ থাকে মনও সুস্থ থাকে। মন যদি সুস্থ থাকে দেহও সুস্থ থাকে।

(৬) মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত দেহগত প্রক্রিয়া মনোবিদ্যার আলোচ্য বিষয়। দেহ ও মনের মধ্যে নিবিড় সংযোগ বর্তমান। তাছাড়া, 'দেখা' ও অন্যান্য মানসিক ক্রিয়া সম্ভব হয়, যেহেতু কতকগুলি দেহগত প্রক্রিয়া এই ক্রিয়ার সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত। আমাদের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা এবং ত্বক—এই পঞ্চেন্দ্রিয়, স্নায়ুর সাহায্যে কেন্দ্রীয় স্নায়ুমণ্ডলের সঙ্গে যুক্ত। এই কারণে মনোবিদ্যা মানুষের স্নায়ুতন্ত্র (human nervous system) সম্পর্কে আলোচনা করে। মনের সঙ্গে দেহের কোন্ অংশের সম্পর্ক অধিক তা নির্ণয় করার জন্য স্নায়ু, মস্তিষ্ক, মেরু, মজ্জা, এগুলির সংগঠন ও ক্রিয়া, বিভিন্ন গ্রন্থিগুলির ক্রিয়াও মনোবিদ্যার আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত।

দেহগত প্রক্রিয়া

(৭) শিক্ষণ কাকে বলে, শিক্ষণ সম্পর্কীয় বিভিন্ন মতবাদ, শিক্ষণের সূত্র, কি নিয়ম বা পদ্ধতিতে অভ্যাস করলে শিক্ষণ সহজ এবং সফল হয়—এসব বিষয় মনোবিদ্যার আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত

শিক্ষণ

(৮) মানসিক অবস্থার আলোচনা প্রসঙ্গে এর বিভিন্ন স্তরের বিশদ বিশ্লেষণ মনোবিদ্যার আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। মনের এই তিনটি স্তর হল—চেতন (conscious), অবচেতন (sub-conscious) এবং নির্জ্ঞান (unconscious)। এই স্তরগুলির প্রত্যেকটির স্বরূপ, তাদের আন্তর সম্পর্ক ও পারস্পরিক প্রভাব মনোবিদ্যায় আলোচিত হয়।

মনের তিনটি স্তর—চেতন, অবচেতন ও নির্জ্ঞান

(৯) মনের অভিব্যক্তি দু-প্রকারের—(ক) স্বাভাবিক (normal) এবং (খ) অস্বাভাবিক (abnormal)। স্বাভাবিক মন ও অস্বাভাবিক মনের স্বরূপ এবং সমাজের ওপর এদের প্রভাব মনোবিদ্যায় আলোচিত হয়। এ ছাড়াও মানুষের মনের বিভিন্ন অবস্থা অর্থাৎ শিশু-মন, তরুণ-মন, প্রাপ্তবয়স্কদের মন, বৃদ্ধের মন—সব রকম মন নিয়েই মনোবিদ্যা আলোচনা করে।

স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক মন

মনোবিদ্যা ব্যক্তি-মন (individual mind) ও সমষ্টিগত-মন (collective mind) নিয়ে আলোচনা করে। সমাজ-মনোবিদ্যা সমষ্টিগত মনের বহুবিধ দিক; যথা—গোষ্ঠীমন (group mind), জনতার মনস্তত্ত্ব (crowd psychology) প্রভৃতি নিয়েও মনোবিদ্যা আলোচনা করে।

(১০) মনোবিদ্যা যখন মানুষের 'মন' নিয়ে আলোচনা করে তখন তার আলোচনা সামাজিক বা প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে যুক্ত করেই করে থাকে।

সামাজিক বা প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে ব্যক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মারফৎ তার মনের বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়। সে কারণে সামাজিক বা প্রাকৃতিক পরিবেশও মনোবিদ্যার আলোচ্য বিষয়বস্তুর অন্তর্গত।

মনের সঙ্গে যুক্ত সব বিষয়ই মনোবিদ্যার আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত

মনোবিদ্যার পরিধি দিন দিন এতই বিস্তৃত হচ্ছে যে, মনোবিদ্যা বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হচ্ছে, যথা—প্রাণি-মনোবিদ্যা, শিশু-মনোবিদ্যা, সমাজ-মনোবিদ্যা, শিক্ষা-মনোবিদ্যা, শিল্পীয় মনোবিদ্যা, শারীরবৃত্তিয় মনোবিদ্যা ইত্যাদি। মনোবিদ্যা মানুষের চেতনার বিষয়বস্তু হিসেবে বহির্বিশ্বের বিভিন্ন বস্তু আলোচনা করে। কাজেই এক হিসেবে মনের সঙ্গে যুক্ত সব বিষয়ই মনোবিদ্যার আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। সেই কারণে ডক্টর ওয়ার্ড (*Dr. Ward*)-এর মতে ব্যক্তির চেতনার বিষয়বস্তু হিসেবে স্বর্গের সমগ্র গায়কদল এবং মর্তের সব সজ্জা' মনোবিদ্যার" অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

Question

Q 1, What is the subject-matter of Psychology? Bring out in this connection the implication of the following :

'The standpoint of psychology is scientific'

Q. 2. Explain the subject-matter of psychology.

---

1. **"In this sense the whole choir of heaven and furniture of earth may belong to Psychology."—*Dr. Ward.***

দ্বিতীয় অধ্যায়

মনোবিদ্যার পদ্ধতি

(Methods of Psychology)

১। মনোবিদ্যার পদ্ধতি (Methods of Psychology) :

প্রতিটি বিজ্ঞানকেই তার বিষয়বস্তু আলোচনা করার জন্য কোন সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়। মনোবিদ্যার পদ্ধতি কি, এই বিষয়ে মনোবিদ্‌গণের মধ্যে গুরুতর মতভেদ আছে। মনোবিদ্‌গণ মনোবিদ্যার যেসব পদ্ধতির উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে প্রধান তিনটি পদ্ধতি হল যথাক্রমে—(ক) অন্তর্দর্শন (Introspection), বা ব্যক্তিনিষ্ঠ পদ্ধতি, (খ) পর্যবেক্ষণ (Observation) বা বস্তুনিষ্ঠ পদ্ধতি এবং (গ) পরীক্ষণ পদ্ধতি (Experiment)।

মনোবিদ্যার তিনটি পদ্ধতি—অন্তর্দর্শন, বাহ্যদর্শন ও পরীক্ষণ

(ক) অন্তর্দর্শন বা ব্যক্তিনিষ্ঠ পদ্ধতি (Introspection or Subjective Method) : মানসিক প্রক্রিয়ার জ্ঞান লাভের জন্য ব্যক্তি যখন নিজের মানসিক অবস্থার ও প্রক্রিয়ার স্বরূপ, তার গতি-প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করে তখন তাকে বলা হয় অন্তর্দর্শন। অন্তর্দর্শনের সহায়তায় প্রত্যেক মানুষ নিজের মনে কি ঘটছে তা সোজাসুজি জানতে পারে। অন্তর্দর্শন হল অন্তঃপ্রত্যক্ষকরণ। কিন্তু যে কোন অন্তঃপ্রত্যক্ষণই অন্তর্দর্শন নয়। কোন ব্যক্তি যখন নিজের জীবনের সুখ-দুঃখের কথা চিন্তা করে, তখন তা অন্তঃপ্রত্যক্ষণ হলেও অন্তর্দর্শন নয়। আবার যখন কোন লোক সকালবেলায় জলখাবারে কি কি খাবার খেয়েছিল, তা স্মরণ করতে গিয়ে সেই খাদ্যের একটা প্রতিরূপ বা মানস প্রতিচ্ছবি (image) মনের সামনে তুলে ধরবার চেষ্টা করে, তখনও মন অন্তর্মুখী, কিন্তু তা অন্তর্দর্শন নয়। মানসিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে জ্ঞান লাভের জন্য যখন ব্যক্তি নিজের মনের সাহায্যে নিজের মনকে জানে তখনই তাকে অন্তর্দর্শন বলে। মনোবিদ্ স্টাউটের ভাষায় অন্তর্দর্শন হল নিজের অভিজ্ঞতার প্রতি মনোযোগী হওয়া (to introspect is to attend to

ব্যক্তির নিজের মানসিক অবস্থার পর্যবেক্ষণকে অন্তর্দর্শন বলে

ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-দুঃখের চিন্তা অন্তর্দর্শন নয়

অন্তর্দর্শন হল নিজের অভিজ্ঞতার প্রতি মনোযোগী হওয়া

one's own experience) ।[1] পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে যেমন আমরা বাইরের বস্তুকে প্রত্যক্ষ করি, ঠিক তেমনিভাবে অন্তর্দর্শনের ক্ষেত্রে মন অন্তরীন্দ্রিয়ের রূপ ধারণ করে নিজের কার্যকলাপ নিজেই প্রত্যক্ষ করে। কোন কারণে হয়ত আমি ক্রুদ্ধ হয়েছি,

অন্তর্দর্শনের ক্ষেত্রে মন নিজের কার্যকলাপ নিজেই প্রত্যক্ষ করে

আমি নিজে অন্তর্দর্শনের সহায়তায় আমার ক্রোধের কারণ কি, কিভাবে ক্রোধ শুরু হল, কিভাবে ধীরে ধীরে তা প্রবলতর হতে লাগল এবং তারপর কিভাবে স্তিমিত হয়ে এল, এই সবকিছুই পর্যবেক্ষণ করতে লাগলাম। স্টাউটের ভাষায়, অন্তর্দর্শন হল সুস্পষ্ট আত্ম-চেতনার একটি বিশেষ অবস্থা।

অন্তর্দর্শন পদ্ধতি ব্যক্তিনিষ্ঠ (subjective) পদ্ধতি, বস্তুনিষ্ঠ (objective) পদ্ধতি নয়। বাইরের জগতের বস্তুর সঙ্গে অন্তর্দর্শনের সম্পর্ক প্রত্যক্ষ নয়, পরোক্ষ। অন্তর্দর্শনের সহায়তায় ব্যক্তি কেবলমাত্র নিজের মানসিক প্রক্রিয়াই প্রত্যক্ষ করতে পারে। সে কারণেও অন্তর্দর্শনকে ব্যক্তিনিষ্ঠ (subjective) ক্রিয়া-পদ্ধতি বলা হয়। অন্তর্দর্শনে ব্যক্তি বাইরের জগৎ থেকে মনকে সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন করে একাগ্র চিত্তে মনোযোগের সঙ্গে নিজের মনের কার্যকলাপ লক্ষ্য করে। অন্তর্দর্শনকে সাক্ষাৎ পদ্ধতিও (direct method) বলা হয়, যেহেতু অন্তর্দর্শনের সাহায্যে ব্যক্তি তার নিজের মন সম্পর্কে সাক্ষাৎ জ্ঞান লাভ করতে পারে।

অন্তর্দর্শনের গুণ (Merits or Advantages of Introspection) : (ক) অন্তর্দর্শন মনোবিদ্যার নিজস্ব পদ্ধতি। যদিও মনোবিদ্যাকে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের ওপর নির্ভর করতে হয়, তবুও মনের বিভিন্ন প্রক্রিয়াকে প্রত্যক্ষভাবে

অন্তর্দর্শন মনোবিদ্যার নিজস্ব পদ্ধতি

জানার এবং তাদের স্বরূপ ও গতি-প্রকৃতি নির্ধারণ করার একমাত্র উপায় হল অন্তর্দর্শন। বাহ্য-পর্যবেক্ষণের সাহায্যে মানসিক ক্রিয়ার বহিঃপ্রকাশকে জানা যায়, কিন্তু কোন্ নির্দিষ্ট বহিঃপ্রকাশ যে কোন্ নির্দিষ্ট মানসিক ক্রিয়ার বহিঃপ্রকাশ তা জানার একমাত্র উপায় হল অন্তর্দর্শন।

(খ) অন্তর্দর্শনের সহায়তায় মানসিক প্রক্রিয়াগুলি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ, সুনিশ্চিত, যথাযথ জ্ঞান পাওয়া সম্ভব। ব্যক্তি তার নিজের মানসিক অবস্থা ও ক্রিয়াকলাপকে প্রত্যক্ষভাবে এবং যতখানি সঠিকভাবে জানতে পারে, বাহ্য-পর্যবেক্ষণের আশ্রয় গ্রহণ

---

1. 'In Introspection we attend to the contents of experience as such and as forming part of the life history of an individual mind We are concerned with nature of experience itself and with the law of mental process."

Stout ; A manual of Psychology ; Page 38.

করে অন্য ব্যক্তির পক্ষে তাকে ততখানি সঠিকভাবে জানা সম্ভব নাও হতে পারে এবং জানলেও তা জানতে হয় পরোক্ষভাবে।

অন্তর্দর্শনে মানসিক প্রক্রিয়াগুলিকে নিজের ইচ্ছানুযায়ী পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব

(গ) যে-কোন ব্যক্তি নিজের ইচ্ছানুযায়ী যে-কোন সময়ে ও যে-কোন স্থানে তার মানসিক প্রক্রিয়াগুলিকে অন্তর্দর্শনের সহায়তায় পর্যবেক্ষণ করতে পারে। অন্তর্দর্শনের জন্য দেশ, কাল ও বাহ্য-অবস্থার ওপর নির্ভর করতে হয় না। তাছাড়া, অন্তর্দর্শনে কোন যন্ত্রপাতি, পরীক্ষণাগার বা অর্থব্যয়ের প্রয়োজন হয় না।

অন্তর্দর্শনে প্রাপ্ত মানসিক তথ্য বৈজ্ঞানিক গবেষণার উপাদান হতে পারে

(ঘ) যদি এমনও মনে করা যায় যে, অন্তর্দর্শনের সহায়তায় পাওয়া মানসিক তথ্য সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য নয়, তবু বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য উপাদান হিসেবে এগুলিকে গ্রহণ করা যেতে পারে। বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালাবার জন্য এগুলিকে আনুমানিক সিদ্ধান্ত বা প্রকল্প হিসেবে ব্যবহার করে মূল্যবান সিদ্ধান্ত লাভ করা যেতে পারে।

অন্তর্দর্শনের ত্রুটি এবং ঐগুলি দূর করার উপায় (Demerits or Disadvantages of Introspection and how they can be overcome.) : (ক) অন্তর্দর্শনের মাধ্যমে আমরা যে মানসিক প্রক্রিয়াগুলি পর্যবেক্ষণ করি সেগুলি অস্পষ্ট এবং অনির্দিষ্ট। বাইরের জগতের বস্তুকে যেমন সুস্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্টভাবে পর্যবেক্ষণ করা চলে, মানসিক প্রক্রিয়াকে অনুরূপভাবে পর্যবেক্ষণ করা চলে না। সব রকম অপ্রাসঙ্গিক বা অবান্তর বিষয়কে বর্জন করে যে বিশেষ মানসিক প্রক্রিয়াটিকে আমরা জানতে চাই, তার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করাও অত্যন্ত কঠিন। সে কারণে অন্তর্দর্শন পদ্ধতি হিসেবে সহজসাধ্য পদ্ধতি নয়।

অন্তর্দর্শনের সাহায্যে প্রাপ্ত তথ্য অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট

তবে উপযুক্ত অনুশীলনের সহায়তায় এই ত্রুটি দূর করা যেতে পারে। বাইরের বস্তু থেকে মনকে সরিয়ে নিয়ে অন্তর্মুখী করা কঠিন হলেও অভ্যাসের দ্বারা একে আয়ত্ত করা যেতে পারে।

অনুশীলনের সাহায্যে ত্রুটি দূর করা যেতে পারে

(খ) অনেক সময় অন্তর্দর্শন করতে গেলে অন্তর্দর্শনের বিষয় অন্তর্হিত হয়ে যায়, ফলে অন্তর্দর্শন অসম্ভব হয়ে পড়ে। কোন কোন মানসিক প্রক্রিয়া, যেমন, আবেগ (emotion) অত্যন্ত চঞ্চল ও ক্ষণস্থায়ী। এরূপ মানসিক প্রক্রিয়ার অন্তর্দর্শন করতে গেলেই সেটি বিলীন হয়ে যায়। কোন ব্যক্তি ক্রুদ্ধ হয়েছে, সে তার ক্রোধের অন্তর্দর্শন করতে চায়। কিন্তু ক্রোধের সময় ক্রোধের অন্তর্দর্শন

সম্ভব নয়; আবার শান্ত মনোভাব নিয়ে ক্রোধের অন্তর্দর্শন করতে গেলে ক্রোধ অন্তর্হিত হয়, অন্তর্দর্শন বিষয়হীন হয়ে পড়ে।

স্মৃতিশক্তির সহায়তায়, মানসিক সতর্কতা এবং একাধিক বিশেষজ্ঞ মনোবিদের সমবেত সহযোগিতার দ্বারা এই ত্রুটি অনেকাংশে দূর করা যেতে পারে। একাধিক বিশেষজ্ঞ এই চঞ্চল ও ক্ষণস্থায়ী মানসিক প্রক্রিয়াগুলি সম্পর্কে নিজেদের অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্যকে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে মিলিয়ে দেখে নিতে পারে এবং তারপরে একটা স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারে।

স্মৃতি, মানসিক সতর্কতা এবং মনোবিদদের সমবেত সহযোগিতার এই ত্রুটি দূর করা যেতে পারে

(গ) অন্তর্দর্শনের সহায়তায় একই মানসিক প্রক্রিয়াকে জানা সম্ভব নয়। যেহেতু, মানসিক প্রক্রিয়া ব্যক্তিকেন্দ্রিক, সেহেতু দুজন মনোবিদ একই মানসিক প্রক্রিয়াকে পর্যবেক্ষণ করতে কখনই সক্ষম হবেন না। ধরা যাক, দুজন মনোবিদ্ 'ভয়' এই মানসিক প্রক্রিয়াটিকে জানতে চান। কিন্তু উভয়ের ক্ষেত্রে এই মানসিক আবেগ ভিন্ন এবং একই আবেগকে জানা তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়।

দুজন মনোবিদের পক্ষে একই মানসিক প্রক্রিয়াকে জানা সম্ভব নয়

এটি অন্তর্দর্শনের স্বভাবগত ত্রুটি, সম্পূর্ণভাবে এর থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। অবশ্য একাধিক বিশেষজ্ঞ মনোবিদের সমবেত সহযোগিতায় এই ত্রুটি অনেকাংশে দূর করা যেতে পারে।

মনোবিদের সমবেত সহযোগিতায় এই ত্রুটি দূর করা যেতে পারে

(ঘ) কোঁৎ (*Comte*)-এর মতে অন্তর্দর্শনে মন দ্বিধাবিভক্ত হয়, সুতরাং অন্তর্দর্শন সম্ভব নয়। মনোবিদ কোঁৎ বলেন, 'অন্তর্দর্শন একেবারেই সম্ভব নয়; কারণ, অন্তর্দর্শনের ক্ষেত্রে একই মন একাধারে দ্রষ্টা এবং দ্রষ্টব্য'।[1] কিন্তু একই মনের পক্ষে নিজেকে দুভাগে বিভক্ত করা কিভাবে সম্ভব?

কোঁৎ-এর মতে মন একাধারে দ্রষ্টা এবং দ্রষ্টব্য হতে পারে না

কিন্তু কোঁৎ-এর অভিযোগ যে টেঁকে না, আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই তার প্রমাণ। আমাদের আত্মচেতনাকে বিশ্লেষণ করেই আমরা জানতে পারি যে, আমাদের নিজেদের পক্ষে নিজেদের মানসিক প্রক্রিয়ার স্বরূপ জানা সম্ভব।

আত্মচেতনার বিশ্লেষণ পূর্বোক্ত অভিমতকে ভুল প্রমাণ করে

(ঙ) অনেকের মতে অন্তর্দর্শনলব্ধ তথ্য মোটেও নির্ভরযোগ্য নয়, কেননা, **আসলে অন্তর্দর্শন সম্ভব নয় এবং যাকে আমরা অন্তর্দর্শন বলি তা হল অতীত স্মৃতির**

1. "The thinking individual cannot divide himself into two, of which the one reflects, while the other sees it reflects" — *Comte.*

রোমন্থন মাত্র। এই কারণে বলা হয়, 'অন্তর্দর্শন হল আসলে গত বিষয়ের দর্শন বা অতীতদর্শন (so-called introspection is only retrospection)।'

অনেকের মতে অন্তর্দর্শন হল অতীতদর্শন

অন্তর্দর্শন হল মৃত মানস প্রক্রিয়ার শবব্যবচ্ছেদ। এদের মতানুযায়ী মানসিক প্রক্রিয়ার কাজ যখন চলতে থাকে তখন তাকে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব নয়। আসলে যাকে আমরা অন্তর্দর্শন বলি তা ঘটে মানসিক প্রক্রিয়াটি ঘটে যাওয়ার পর। যতক্ষণ পর্যন্ত আমার ক্রোধ প্রশমিত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত ক্রোধের স্বরূপ জানা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ক্রোধ প্রশমিত হলেই তাকে জানতে পারি এবং তাকে জানতে হয় কল্পনা ও অনুমানের সহায়তায়। এতে অতিরঞ্জনের সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে এবং অন্তর্দর্শনলব্ধ তথ্য যথাযথ নাও হতে পারে। তাছাড়া, অন্তর্দর্শন এত অধিক পরিমাণে ব্যক্তিনির্ভর যে, ব্যক্তির নিজস্ব স্বভাব এই অন্তর্দর্শনকে বিকৃত করে তুলতে পারে।

এই অভিযোগের উত্তরে বলা যেতে পারে যে, 'অতীতদর্শনই (retrospection) প্রমাণ করে যে অন্তর্দর্শন সম্ভব।

অতীতদর্শনই প্রমাণ করে যে অন্তর্দর্শন সম্ভব

কোন অতীত মানসিক প্রক্রিয়াকে স্মরণ করা তখনই সম্ভব হয়, যদি মানসিক প্রক্রিয়াটি চলাকালীন অন্তর্দর্শন হয়। পূর্বে প্রত্যক্ষ না করলে, বর্তমানে তাকে স্মৃতিতে জাগিয়ে তোলা সম্ভব নয়। কাজেই অতীতদর্শন অন্তর্দর্শনেরই একটি বিকল্প অবস্থা। অন্তর্দর্শন হলেই তবে অতীতদর্শন সম্ভব হয়। উপযুক্ত অনুশীলন ও মানসিক সতর্কতার সাহায্যে অন্তর্দর্শনকে নির্ভরযোগ্য করে তোলা যেতে পারে।

(চ) অন্তর্দর্শন সম্ভব নয়, কারণ একই সময়ে মনকে বহির্মুখী এবং অন্তর্মুখী করা যায় না। মনোবিদ্ মডস্‌লে (*Maudsley*)[1] বলেন যে, "নিজের ক্রিয়াকে প্রত্যক্ষ করার জন্য প্রয়োজন মনের পক্ষে ক্রিয়া থেকে বিরত হওয়া, অথচ এই ক্রিয়ার

অন্তর্দর্শন সম্ভব নয়, যেহেতু নিজের ক্রিয়ার অন্তর্দর্শনের জন্য মনকে ক্রিয়া থেকে বিরত হতে হবে

ধারাবাহিকতাকে প্রত্যক্ষ করাই হল মনের কাজ।" মনের পক্ষে বহিঃইন্দ্রিয়ের সহায়তায় গোলাপ ফুলটিকে পর্যবেক্ষণ করা এবং একই সময়ে মনে জ্ঞানরূপ যে মানসিক প্রক্রিয়াটি চলছে তাকে জানা সম্ভব নয়, কারণ সে ক্ষেত্রে মনকে বাহ্যবস্তু থেকে সরিয়ে নিয়ে এসে অন্তর্মুখী করা প্রয়োজন। কিন্তু মনকে অন্তর্মুখী করতে গেলেই গোলাপ ফুল পর্যবেক্ষণ করার কাজটি বন্ধ হয়ে যাবে এবং সঙ্গে সঙ্গে

1. "In order to observe its own action it is necessary that mind should pass from activity; yet it is the train of activity that is to be observed."

—*Maudsley*: Physiology of Mind, page. 17

তার সঙ্গে যুক্ত যে মানসিক প্রক্রিয়াটি তাও বন্ধ হয়ে যাবে। অন্তর্দর্শনের জন্য কোন বিষয়বস্তু থাকবে না।

এই অভিযোগের উত্তরে একথা বলা যেতে পারে যে, একই সময়ে দুটি বিষয়ের ওপর মনোযোগ নিবদ্ধ করা সম্ভব এবং প্রয়োজনে দ্রুতগতিতে একবার বস্তু এবং একবার মানসিক প্রক্রিয়াকে পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে। মনোবিদ্ স্টাউট মনে করেন যে, এরূপ ক্ষেত্রে মানসিক প্রক্রিয়াকে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব যদি চট্‌পট্ এক নজরে পর পর তাকে দেখে নেওয়া যায় (a series of transient slide glimpses of it)। তাছাড়া স্মৃতিশক্তি, মানসিক সতর্কতা এবং একাধিক মনোবিদের সমবেত সহযোগিতায় এই ত্রুটি অনেকাংশে সংশোধন করা সম্ভব।

(ছ) অনেকে মনে করেন অন্তর্দর্শনকে মনোবিদ্যার একমাত্র পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। অন্তর্দর্শনের মাধ্যমে কেবলমাত্র ব্যক্তিগত মনের ক্রিয়া-প্রক্রিয়াগুলিকে জানা যায়, অপরের মানসিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়াগুলি জানা যায় না; যা জানার উপায় হল পর্যবেক্ষণ (observation)। কাজেই অন্তর্দর্শনের পরিপূরক হিসেবে পর্যবেক্ষণকে গ্রহণ করা একান্তই প্রয়োজন এবং অন্তর্দর্শনকে স্বতন্ত্র পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ না করে অন্যান্য পদ্ধতির পরিপূরক হিসেবে গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত।

অন্তর্দর্শনকে একমাত্র পদ্ধতিরূপে গ্রহণ করা যেতে পারে না

(জ) আচরণবাদী ওয়াটসন (*Watson*)-এর মতে অন্তর্দর্শন পদ্ধতি অবৈজ্ঞানিক ও অনির্ভরযোগ্য, কেননা ব্যক্তিনিষ্ঠ হওয়ার জন্য অন্তর্দর্শনলব্ধ তথ্য সার্বিক, বস্তুনিষ্ঠ ও সুনিশ্চিত নয়। তার মতে অন্তর্দর্শনকে বর্জন করে অন্যান্য বিজ্ঞানের মত পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণকেই মনোবিদ্যার পদ্ধতিরূপে-গ্রহণ করা উচিত।

উপরিউক্ত অভিযোগের উত্তরে বলা যেতে পারে, অন্তর্দর্শন ব্যক্তিনিষ্ঠ পদ্ধতি হলেও এই পদ্ধতির প্রয়োগে বস্তুনিষ্ঠ ও সুনিশ্চিত ফলাফল লাভ করা সম্ভব। অন্তর্দর্শনের পরিপূরক হিসেবে পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিকে মনোবিদ্যায় প্রয়োগ করা হয়। তাছাড়া একটি মাত্র ব্যক্তির অন্তর্দর্শনের ওপর নির্ভর না করে, একই মানসিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে একাধিক ব্যক্তির অন্তর্দর্শনলব্ধ তথ্যের তুলনামূলক আলোচনার দ্বারা অন্তর্দর্শনকে নির্ভরযোগ্য করে তোলা হয়।

(ঝ) অন্তর্দর্শনের ক্ষেত্র খুব সঙ্কীর্ণ, কারণ শুধুমাত্র পরিণত ও স্বাভাবিক মানুষেরই অন্তর্দর্শন সম্ভব। শিশু, মনুষ্যেতর প্রাণী, উন্মাদ ব্যক্তি এবং যে সকল ব্যক্তি মনের ভাবকে ভাষায় সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে পারে না, তাদের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা চলে না।

শিশু, মনুষ্যেতর প্রাণী এবং উন্মাদ ব্যক্তির ক্ষেত্রে অন্তর্দর্শন সম্ভব নয়

এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে, এই অভিযোগটি অন্তর্দর্শনের সীমা নির্দেশ করে মাত্র এবং অন্তর্দর্শনের সাহায্যে মানসিক প্রক্রিয়ার বিচারের পক্ষে এটি একটি সন্তোষজনক অভিযোগ নয়।

(খ) পর্যবেক্ষণ বা বস্তুনিষ্ঠ পদ্ধতি (Inspection or the Objective Method):

(i) **পর্যবেক্ষণ বা বস্তুনিষ্ঠ পদ্ধতি কাকে বলে:** অপর ব্যক্তির মনের দেহগত বা অন্য প্রকারের বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করে তার মানসিক অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করার পদ্ধতিকেই মনোবিদ্যায় পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি বলে। পর্যবেক্ষণ বলতে মানসিক প্রক্রিয়ার প্রত্যক্ষ জ্ঞান বুঝায় না, পরোক্ষ বা অনুমানিক জ্ঞান বুঝায়। আমরা প্রত্যক্ষভাবে কেবল নিজেদের মনকেই জানতে পারি। অপর ব্যক্তির মনকে জানতে হয় পরোক্ষভাবে তার আচরণ লক্ষ্য করে। কোন ব্যক্তি হয়ত ক্রুদ্ধ হয়েছে, তার ক্রোধের যে দেহগত বহিঃপ্রকাশ, যেমন ভ্রূকুটি, দাঁত কড়মড় করা, বদ্ধমুষ্টি, গর্জন প্রভৃতি থেকে অনুমান করে নিতে পারি যে লোকটি ক্রুদ্ধ। পূর্বে আমার মধ্যে যখন ক্রোধের সঞ্চার হয়েছিল তখন এই লক্ষণগুলো আমার মধ্যেও প্রকাশ পেয়েছিল। পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে অনুমান করে নিলাম যে, অপরের মধ্যে যখন এই লক্ষণগুলো দেখা গেল তখন সে ব্যক্তিও ক্রুদ্ধ। এই দিক থেকে বিচার করলে অন্তর্দর্শনের ওপরই পর্যবেক্ষণের ভিত্তি।

অপরের মনের দেহগত বা অন্য প্রকারের বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করাই পর্যবেক্ষণ

সুতরাং অপরের মানসিক প্রক্রিয়াগুলিকে জানতে হলে প্রয়োজন তার আচরণ পর্যবেক্ষণ করা বা মানসিক প্রক্রিয়ার দেহগত বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করা। সেই আচরণ বা দেহগত বহিঃপ্রকাশ থেকে মানসিক প্রক্রিয়াগুলো সচেতনভাবে বা অচেতনভাবে অনুমান করে নেওয়া হয় এবং আমাদের নিজ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অপর ব্যক্তির আচরণকে ব্যাখ্যা করা হয়।

যদিও পর্যবেক্ষণ মানসিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে আনুমানিক জ্ঞান তবু মানসিক প্রক্রিয়ার বহিঃপ্রকাশের পর্যবেক্ষণ ও মানসিক প্রক্রিয়ার জ্ঞান দুটি পৃথক বা বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়ার আকারে ঘটে না। কোন ব্যক্তি ক্রন্দন করছে, সুতরাং সে বিষণ্ণ। পর্যবেক্ষণের আনুমানিক জ্ঞান এমন স্পষ্ট অনুমানের আকারে মনের কাছে উপস্থাপিত হয় না। কোন বিষণ্ণ ব্যক্তি ক্রন্দন করছে, এইভাবেই পর্যবেক্ষণ করা হয়। সোজা কথায়, পর্যবেক্ষণে অনুমানের বিষয়টি পৃথক ভাবে মনে আসে না।

মানসিক প্রক্রিয়ার বহিঃপ্রকাশের পর্যবেক্ষণ ও মানসিক প্রক্রিয়ার জ্ঞান পৃথক আকারে ঘটে না

যেসব মনোবিদ্ অন্তর্দর্শনকে মনোবিদ্যার নিজস্ব পদ্ধতিরূপে স্বীকার করতে চান না, তাঁদের মতে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমেই মানসিক প্রক্রিয়ার প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করা যায়।

এই পদ্ধতিকে বস্তুনিষ্ঠ বা বিষয়গত পদ্ধতি (objective method) বলা হয়। এই পদ্ধতিকে পরোক্ষ পদ্ধতিও (indirect method) বলা হয়; যেহেতু এই পদ্ধতিতে অপরের মনের বাহ্যপ্রকাশ প্রত্যক্ষ করে তার মানসিক অবস্থা ও ক্রিয়া সম্পর্কে অনুমান করা হয়।

(ii) **পর্যবেক্ষণের গণ্ডী বা পরিধিঃ** পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্র খুবই ব্যাপক। ব্যষ্টিমনকে (individual mind) জানার জন্য আমরা অপর ব্যক্তির দৃষ্টি, ভাবভঙ্গি, ভাষা, তাঁর রচিত সাহিত্য, কাব্য, তাঁর আঁকা চিত্র প্রভৃতি পর্যবেক্ষণ করতে পারি। আবার সমষ্টি মনকে (collective mind) যেমন—সমাজ-মনকে জানতে হলে বিভিন্ন জাতির বা গোষ্ঠীর রীতিনীতি, আচার, বিচার, বিধি-নিষেধ, প্রচলিত প্রথা, সংস্কার, সংগীত, নৃত্য, ভাস্কর্য প্রভৃতি পর্যবেক্ষণ ও আলোচনা করা প্রয়োজন। প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি ছাড়া শিশুমন বা প্রাণিমন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে হলে তাদের বাহ্য-আচরণ বা ব্যবহারের ভিত্তিতেই তাকে জানতে হবে। অস্বভাবী ব্যক্তিদের মন (abnormal mind) সম্পর্কে এবং জড়বাদের (idiot) মন সম্পর্কে কিছু জানতে হলে তা জানতে হবে তাদের বাহ্য-আচরণ বা বিভিন্ন প্রকারের দেহগত পরিবর্তনের মাধ্যমে।

ব্যষ্টিমন ও সমষ্টি মনকে জানার উপায়

(iii) **পর্যবেক্ষণের গুণ বা সুবিধা** (Merits or Advantages of Observation or Objective Method): (ক) একমাত্র পর্যবেক্ষণের সহায়তায় আমরা অপরের মনকে জানতে পারি। অন্তর্দর্শন কেবলমাত্র আমাদের নিজের মনকে প্রত্যক্ষভাবে জানার সুযোগ দেয়। অপর ব্যক্তির মনকে সোজাসুজি প্রত্যক্ষ করবার কোন সুযোগ অন্তর্দর্শন দ্বারা সম্ভব নয়। কিন্তু অপরের মনকে না জানতে পারলে মন সম্পর্কীয় সার্বিক নিয়ম আবিষ্কার ও ব্যাখ্যা করা কিভাবে সম্ভব? এজন্য পর্যবেক্ষণ অবশ্যই প্রয়োজনীয়।

একমাত্র পর্যবেক্ষণের সহায়তায় অপরের মনকে জানা যায়

(খ) অন্তর্দর্শনের সাহায্যে নিজ মনের ক্রিয়া সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যেতে পারে কিন্তু সমষ্টি মনের—যেমন, সমাজ-মনের জ্ঞান লাভ করতে হলে সামাজিক রীতিনীতি, আচার-বিচার, বিধি-নিষেধ, গোষ্ঠী-জীবন প্রভৃতি পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন।

(গ) শিশুমন বা প্রাণিমন সম্পর্কে জ্ঞান অন্তর্দর্শনের সাহায্যে লাভ করা সম্ভব নয়, তার জন্য পর্যবেক্ষণই হল প্রয়োজনীয় পদ্ধতি।

(ঘ) জড়ধী (idiot) ও অস্বভাবী ব্যক্তির এবং অসভ্য ব্যক্তির পক্ষে অন্তর্দর্শনের সহায়তায় নিজ মনের অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয় না। তাদের মনের বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করে তাদের মানসিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে হলে পর্যবেক্ষণই প্রয়োজনীয় পদ্ধতি।

(ঙ) মনের আভ্যন্তরীণ অংশের জ্ঞান অন্তর্দর্শনের সাহায্যে লাভ করা গেলেও মনের বহিঃপ্রকাশের অর্থাৎ বাহ্য-অংশের জ্ঞান লাভ করার পক্ষে পর্যবেক্ষণই অবলম্বনীয় পদ্ধতি। কেবলমাত্র অন্তর্দর্শনের সহায়তায় পাওয়া মনের আভ্যন্তরীণ অংশের জ্ঞান মনের সম্পূর্ণ জ্ঞান নয়।

(iv) **পর্যবেক্ষণের ত্রুটি বা অসুবিধা এবং সেগুলি দূর করার উপায় (Demerits or Disadvantages of Observation and how they can be overcome)**: (ক) পর্যবেক্ষণলব্ধ মানসিক প্রক্রিয়ার জ্ঞান ভ্রান্ত হয়ে থাকে। বাহ্যিক আচরণ বা দেহগত বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করে অপর ব্যক্তির মন সম্পর্কে অনুমান করার সময় আমরা নিজেদের ভাবনা, চিন্তা এবং অনুভূতি অপরের মনে আরোপ করতে পারি। তার ফলে সেই অনুমান ভ্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাকে। মানুষের সঙ্গে মানুষের পার্থক্য, কি দেহগত বা কি মনোগত এতই বেশী যে, এই ধরনের অনুমান সব সময় যথাযথ সিদ্ধান্ত দিতে পারে না।

পর্যবেক্ষণের সময় নিজের ভাবনা-চিন্তা অপরের মনে আরোপ করার সম্ভাবনা

কোন ব্যক্তির বাহ্য-আচরণ সৎ হলেও তার মানসিক অবস্থা যে অন্যরূপ হতে পারে না তা বলা চলে না। তাছাড়া, শিশুদের মন, অস্বভাবী ব্যক্তিদের মন, পশুদের মন এবং অসভ্য ব্যক্তিদের মনকে পরিণত মানুষের মনের মাপকাঠিতে ব্যাখ্যা করা সব সময় যুক্তিযুক্ত নয়।

অবশ্য গঠনমূলক কল্পনা-শক্তি, যথাযথ অনুমান-শক্তি এবং মানসিক সতর্কতার সাহায্যে এই ত্রুটি বা অসুবিধা অনেকাংশে দূর করা যেতে পারে।

শিশু এবং পশুর মনকে যাতে পরিণত মানুষের মনের মাপকাঠিতে বিচার করা না হয় তার জন্য মনোবিদ্ লয়েড মর্গ্যান নিম্নতর মনের ব্যাখ্যায় উচ্চতর মানসিক প্রক্রিয়ার সাহায্য গ্রহণ না করার জন্য বলেছেন।

(খ) ব্যক্তিগত সংস্কার, পূর্ব ধারণা এবং পক্ষপাত প্রবণতা অপর ব্যক্তির আচরণ পর্যবেক্ষণ করে তার মানসিক অবস্থা অনুমানের ও যথাযথ ব্যাখ্যার পথে অন্তরায় হতে পারে। পক্ষপাতশূন্য হয়ে বিচার করতে না পারলে বিচার দোষদুষ্ট হয়।

সাধারণতঃ যাকে আমরা অপছন্দ করি অনেক সময় তার দোষ খুঁজে বেড়াই এবং যারা আমাদের প্রিয়পাত্র তাদের দোষ দেখেও উপেক্ষা করি। আবার কোন স্বার্থপর ব্যক্তি অপরের দয়ার কাজকেও স্বার্থ থেকে উদ্ভূত মনে করতে পারে। নিরপেক্ষভাবে ও সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে অনুমান করার অভ্যাস অনুশীলন করতে পারলে এই ত্রুটি থেকে অনেকাংশে মুক্ত হওয়া সম্ভব।

অনুশীলন ও অভ্যাসের সাহায্যে ত্রুটি দূর করা যেতে পারে

(গ) তৃতীয়তঃ, ভণ্ডের ভণ্ডামি বা কপট ব্যক্তির বাহ্য-আচরণ বা দেহগত বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করে মনের খবর সঠিক অনুমান করা খুবই কঠিন।

মানসিক সতর্কতা এবং ঘনিষ্ঠ পর্যবেক্ষণের সাহায্যে ত্রুটি দূর করা যেতে পারে

মানসিক সতর্কতা এবং ঘনিষ্ঠ পর্যবেক্ষণের সহায়তায় অনেক ক্ষেত্রে এই অন্তরায় দূর করা যেতে পারে।

(ঘ) যে আচরণ পর্যবেক্ষণের বিষয়বস্তু সে আচরণও সকল ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট ও সহজবোধ্য নয়। বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়ার বাহ্যপ্রকাশ একই প্রকার হতে পারে। কেউ আনন্দে অশ্রুপাত করে আবার দুঃখেও অশ্রুপাত করে। কোন্‌টা আনন্দের হাসি আর কোন্‌টা বিদ্রূপের হাসি বুঝে নেওয়া অনেক সময় খুবই কঠিন। কোন ব্যক্তি ভয়বশতঃ, ঘৃণাবশতঃ বা ঈর্ষাবশতঃ অপরের সংসর্গ বর্জন করতে পারে। সেক্ষেত্রে সে কি কারণে ঐ সংসর্গ বর্জন করতে চায়, বাইরের আচরণ পর্যবেক্ষণ করে তা নির্ধারণ করা খুবই কঠিন। অবশ্য সুনিপুণ পর্যবেক্ষণের সহায়তায় এই অসুবিধা দূর করা সম্ভব।

বিভিন্ন প্রকার মানসিক প্রক্রিয়ার বহিঃপ্রকাশ একই হতে পারে

(ঙ) অনেক সময় একই মানসিক প্রক্রিয়ার বাহ্যপ্রকাশ ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে যার জন্য বাহ্য-আচরণ পর্যবেক্ষণ করে তার অন্তর্নিহিত মানস প্রক্রিয়ার সঠিক জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয় না। অনেক সময় দুঃখ মানুষকে অস্থির ও চঞ্চল করে, আবার অনেক সময় স্থির ও শান্ত করে।

(চ) মনের বহিঃপ্রকাশ পর্যবেক্ষণ করে মনের গভীরতর স্তরের সঠিক জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়। মনের নির্জ্ঞান স্তরের বহিঃপ্রকাশ পর্যবেক্ষণ করে নির্জ্ঞান স্তর সম্পর্কে জ্ঞান লাভ সম্ভব নয়, কারণ নির্জ্ঞান মনের বহিঃপ্রকাশ অনেক ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক।

একই ব্যক্তিকে বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে বার বার পর্যবেক্ষণ করে বা পরীক্ষাগারের কৃত্রিম পরিবেশের মধ্যে একই ধরনের উদ্দীপক দ্বারা সৃষ্ট বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে মানসিক প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করে ও তার তুলনামূলক বিচার করে পর্যবেক্ষণের ত্রুটিগুলো অনেকাংশে দূর করা যেতে পারে।

(v) **প্রশ্ন হল, মনোবিদ্যার যথার্থ পদ্ধতি কোনটি?** : অন্তর্দর্শন (introspection) বা পর্যবেক্ষণ (observation), এই উভয় পদ্ধতির মধ্যে কোন একটিকে মনোবিদ্যার একমাত্র যথার্থ পদ্ধতিরূপে গণ্য করা সম্ভব নয়। মনোবিদ্যার উপাত্ত বা মাল-মশলা সংগ্রহ করার জন্য অন্তর্দর্শন ও পর্যবেক্ষণ এই উভয় পদ্ধতির পারস্পরিক সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। কেবলমাত্র অন্তর্দর্শনের আশ্রয় গ্রহণ করলে মনোবিদ্যার পক্ষে বিজ্ঞানের স্তরে উন্নীত হওয়া সম্ভব নয়। কেননা, অন্তর্দর্শনের মাধ্যমে কেবলমাত্র নিজের মনেরই খবর পাওয়া যায় এবং কেবলমাত্র তার ওপর নির্ভর করে মানসিক অবস্থা ও কার্যকলাপ সম্পর্কীয় সার্বিক নিয়ম প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। বিজ্ঞান যখন কোন সার্বিক নিয়ম প্রতিষ্ঠা করে, তখন তার একাধিক দৃষ্টান্তের প্রয়োজন হয়, এক্ষেত্রেও নিজের মানসিক ক্রিয়ার গতি-প্রকৃতির স্বরূপ ছাড়াও, অপরের মনের কার্যকলাপ জানা প্রয়োজন।

অন্তর্দর্শন ও পর্যবেক্ষণ কোন একটিকে মনোবিদ্যার একমাত্র যথার্থ পদ্ধতিরূপে গ্রহণ করা সম্ভব নয়

অন্তর্দর্শনের সীমা

আবার পর্যবেক্ষণকেই মনোবিদ্যার একমাত্র পদ্ধতিরূপে গ্রহণ করা যেতে পারে না। কোন ব্যক্তির আচরণ লক্ষ্য করে যখন আমরা পরোক্ষভাবে তার মনের খবর জানতে চাই, তখন আমাদের অন্তর্দর্শনের ওপর নির্ভর করতে হয়। নিজের মনকে না জেনে, অপরের মনের খবর জানা সম্ভব নয়। অন্তর দুঃখে ভারাক্রান্ত হলে মনের কি অবস্থা হয়, নিজে তা উপলব্ধি করলেই, অপরের দুঃখপীড়িত মনের অবস্থা উপলব্ধি করা যায়। মানসিক প্রক্রিয়ার যেমন একটা আভ্যন্তরীণ রূপ আছে তেমনি তার একটা বাহ্য রূপ আছে। এ দুটি রূপ মিলেই হয় মানসিক প্রক্রিয়ার পূর্ণ রূপ। অন্তর্দর্শনে মানসিক প্রক্রিয়ার আভ্যন্তরীণ রূপের সঙ্গে এবং পর্যবেক্ষণে মানসিক প্রক্রিয়ার বাহ্য রূপের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। কোন মানসিক প্রক্রিয়ার পূর্ণ রূপের জ্ঞানের জন্য এর আভ্যন্তরীণ ও বাহ্য, এই উভয় রূপের জ্ঞান প্রয়োজন। সে ক্ষেত্রে অন্তর্দর্শন বা পর্যবেক্ষণ উভয় পদ্ধতি প্রয়োগ করা দরকার।

তবে অন্তর্দর্শন ছাড়া অপরের মনকে জানা যায় না

আচরণবাদীরা মনের অস্তিত্বই স্বীকার করতে চান না। সে কারণে অন্তর্দর্শন পদ্ধতিতে তাঁদের কোন আস্থা নেই। পর্যবেক্ষণই তাঁদের মতে মনোবিদ্যার যথার্থ পদ্ধতি। কিন্তু মনকে 'বাদ' দিয়ে মনোবিদ্যা গড়ে তোলার এই প্রচেষ্টা যুক্তিযুক্ত নয়।

আচরণবাদীরা মনকে 'বাদ' দিয়ে মনোবিদ্যা গড়ে তুলতে চান

সুতরাং, বলা যেতে পারে, অন্তর্দর্শন ও পর্যবেক্ষণ এই উভয় পদ্ধতির মধ্যে কোন একটিকে মনোবিদ্যার একমাত্র পদ্ধতিরূপে গ্রহণ করে মনোবিদ্যার পক্ষে তার কাজে অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। অন্তর্দর্শন ও পর্যবেক্ষণের মিলিত পদ্ধতিই মনোবিদ্যার যথার্থ পদ্ধতি এবং প্রয়োজনমত উভয় পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করে মনের খবর সংগ্রহ করাই মনোবিদ্যার লক্ষ্য।

অন্তর্দর্শন ও পর্যবেক্ষণ উভয়ই মনোবিদ্যার পদ্ধতি

(গ) পরীক্ষণ পদ্ধতি (Experimental Method) :

(i) **পরীক্ষণ পদ্ধতি কাকে বলে ?** : কোন বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে কৃত্রিম পরিবেশ সৃষ্টি করে কোন মানসিক প্রক্রিয়াকে পর্যবেক্ষণ করার যে পদ্ধতি তাকে পরীক্ষণ পদ্ধতি বলা হয়। মনোবিদ্ স্টাউট (*Stout*) বলেন যে, "পরীক্ষণ হল সেই অবস্থার পর্যবেক্ষণ যে অবস্থা আমরা নিজেরাই পূর্ব থেকে তৈরী করেছি।"[1] অন্তর্দর্শন এবং পর্যবেক্ষণে মানসিক প্রক্রিয়াগুলি মনোবিদের ইচ্ছানুযায়ী ঘটে না, নিজেদের স্বাভাবিক নিয়মানুসারে ঘটে। কাজেই মনোবিদ্ নিজের প্রয়োজন অনুসারে সেগুলি নিয়ে গবেষণা করতে পারেন না। বৈজ্ঞানিক প্রয়োজনে মানসিক প্রক্রিয়াগুলিকে কৃত্রিমভাবে পরীক্ষণাগারে উৎপন্ন করার প্রয়োজন দেখা দেয়। পরীক্ষণাগারে নিয়ন্ত্রিত অবস্থার মধ্যে কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট মানসিক প্রক্রিয়ার অন্তর্দর্শন ও পর্যবেক্ষণ করা হয়। মনোবিদ্ পরীক্ষণাগারে নিজের সুবিধামত কৃত্রিম উপায়ে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে মানসিক ক্রিয়াকে উৎপন্ন করবেন এবং পর্যবেক্ষণ করবেন। পরীক্ষণের সময় যেহেতু অবস্থা মনোবিদের আয়ত্তে থাকে সেহেতু অপ্রাসঙ্গিক ও অবান্তর বিষয়গুলিকে বর্জন করে আলোচ্য ঘটনাকে অন্যান্য ঘটনার প্রভাব থেকে মুক্ত ও স্বতন্ত্র করে নেওয়া যেতে পারে। অথবা আলোচ্য বিষয়টিকে অবান্তর ও অপ্রাসঙ্গিক বিষয় থেকে আলাদা করার জন্য পারিপার্শ্বিকের পরিবর্তন সাধন করে নেওয়া যেতে পারে। এতে কোন একটি অবস্থাকে পরিবর্তিত করলে ঘটনাটি কিভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে তা যথাযথভাবে পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ ঘটে এবং প্রয়োজনবোধে একই পরীক্ষণ কাজ বহুবার চালিয়ে একই ঘটনা সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করা যেতে পারে।

পরীক্ষণ পদ্ধতি হল পরিবেশ সৃষ্টি করে মানসিক প্রক্রিয়ার পর্যবেক্ষণ

পরীক্ষণের সময় অপ্রাসঙ্গিক ও অবান্তর বিষয়গুলি বর্জন করে আলোচ্য ঘটনাটির ওপর মন নিবিষ্ট করা সম্ভব হয়

1. **"To experiment is to observe under conditions which we have ourselves pre-arranged."— *Stout***

(ii) মনোবিদ্যায় পরীক্ষণ পদ্ধতি কিভাবে প্রয়োগ করা হয়?ঃ মনোবিদ্যায় এই পরীক্ষণ পদ্ধতি কিভাবে প্রয়োগ করা হয় তার একটা সাধারণ নিয়ম আছে। যে অবস্থাগুলির মধ্যে কোন একটি মানসিক অবস্থাকে পরীক্ষক পর্যবেক্ষণ করেন, সেগুলি পরীক্ষকের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে। তিনি পূর্ববর্তী অবস্থাগুলির মধ্যে কেবলমাত্র একটি অবস্থার পরিবর্তন ঘটান ও অন্যান্য অবস্থাগুলিকে অপরিবর্তিত রাখেন এবং তারপর ফলাফল লক্ষ্য করেন। যে একটি মাত্র অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে ফলাফলের তারতম্য লক্ষ্য করা হয় তাকে পরীক্ষার 'নিরপেক্ষ পরিবর্তনশীল' (independent variable) বলা হয়। এই অবস্থাটির পরিবর্তনের ফলে ব্যক্তির প্রতিক্রিয়ার যে পরিবর্তন ঘটে তাকে বলা হয় 'সাপেক্ষ পরিবর্তনশীল' (dependent variable)।

মনোবিদ্যায় পরীক্ষণ পদ্ধতি প্রয়োগ করার সাধারণ নিয়ম

Independent variable'-এর পরিবর্তন করা হলে 'dependent variable'-এর পরিবর্তন ঘটবে। যেমন, স্মৃতি বা স্মরণ ক্রিয়ার বিষয়টি আবৃত্তির সংখ্যা, সময়, মনোযোগ এবং আগ্রহের ওপর নির্ভরশীল। এগুলি হল স্মৃতির পূর্ববর্তী অবস্থা। পরীক্ষক পরীক্ষণের মাধ্যমে নির্ধারণ করতে চান, স্মৃতি বা স্মরণ-ক্রিয়া আবৃত্তির ওপর কী পরিমাণে নির্ভর করে। এই নির্ভরতা নির্ধারণ করার জন্য তিনি সময়, মনোযোগ এবং আগ্রহ—এই শর্তগুলোর কোন পরিবর্তন না ঘটিয়ে আবৃত্তির সংখ্যার পরিবর্তন ঘটান। এক্ষেত্রে ব্যক্তির প্রতিক্রিয়ার যে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় তাকে বলা হয়—dependent variable' এবং আবৃত্তির সংখ্যা হল independent varial le'.

নিরপেক্ষ পরিবর্তনশীল ও সাপেক্ষ পরিবর্তনশীল

মনোবিদ্যা সম্পর্কীয় পরীক্ষণকার্যে দুজন পর্যবেক্ষকের প্রয়োজন হয়। একজন পরীক্ষক (experimenter) এবং দ্বিতীয় জন হল পরীক্ষণ-পাত্র (subject)। পরীক্ষক সুনিয়ন্ত্রিতভাবে সৃষ্ট এক কৃত্রিম অবস্থার মধ্যে পরীক্ষণ-পাত্রের ওপর একটি উদ্দীপক প্রয়োগ করেন ও তার প্রতিক্রিয়ার বাহ্যপ্রকাশ পর্যবেক্ষণ করেন এবং পরীক্ষণ-পাত্র অন্তর্দর্শনের সাহায্যে নিজের মানসিক অভিজ্ঞতার বর্ণনা দেন। পরীক্ষক পরীক্ষণ-পাত্রের অন্তর্দর্শনের এবং নিজের পর্যবেক্ষণের বিবরণের ভিত্তিতে পরীক্ষণকার্যের ফলাফল নির্ণয় করেন। সুতরাং, পরীক্ষণ পদ্ধতিতে অন্তর্দর্শন ও পর্যবেক্ষণ উভয়েরই সহায়তার প্রয়োজন হয়।

পরীক্ষণকার্যে দু'জন পর্যবেক্ষকের প্রয়োজন—পরীক্ষক ও পরীক্ষণ-পাত্র

কখনও কখনও পরীক্ষণকার্য চালাবার জন্য যাদের ওপর পরীক্ষণকার্য চালান হয়, তাদের দু'দলে ভাগ করা হয়। যেমন, কাজ করার ওপর ব্যক্তির আগ্রহের প্রভাব আছে কিনা পরীক্ষক তা নির্ধারণ করতে চান। পরীক্ষক দু' দল কর্মী নির্বাচন করলেন। উভয়

দলই শারীরিক উপযুক্ততা ও কর্মদক্ষতার দিক দিয়ে অভিন্ন। উভয়কেই একই পরিবেশ, একই পদ্ধতিতে একই কাজ করতে বলা হল। কেবলমাত্র একটি দলের মধ্যে কাজটি করার জন্য আগ্রহ সৃষ্টি করা হল, অপর দলটির ক্ষেত্রে তা করা হল না। যে দলটির মধ্যে আগ্রহের সৃষ্টি করা হল তাদের বলা হয় **পরীক্ষণমূলক দল** (Experimental Group) এবং যাদের মধ্যে সৃষ্টি করা হয়নি তাদের বলা হয় **নিয়ন্ত্রিত দল** (Control Group)। এই পরীক্ষণের ফলে যদি দেখা যায় যে, যাদের মধ্যে আগ্রহের সৃষ্টি করা হয়েছে তারা অপর দলটির তুলনায় কাজটিকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পেরেছে, তাহলে এই সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে, সুষ্ঠুভাবে কার্য সম্পাদন করার বিষয়টির ওপর আগ্রহের প্রভাব আছে।

একটি হল পরীক্ষণমূলক দল ও অপরটি নিয়ন্ত্রিত দল

(ii) **পরীক্ষণ পদ্ধতির গুণ** বা **সুবিধা** (Merits or Advantages of Experiment) : পরীক্ষণের ক্ষেত্রে ঘটনাকে আমরা নিজেরা সৃষ্টি করি এবং পরিবেশকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারি, সেহেতু পর্যবেক্ষণের তুলনায় পরীক্ষণের কতকগুলো সুবিধা আছে।

প্রথমতঃ, দৃষ্টান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি করে (multiplication of instances একই পরীক্ষণকার্য বহুবার চালান যেতে পারে। আমাদের প্রয়োজনমত কৃত্রিম অবস্থাগুলি আমরা বার বার সৃষ্টি করতে পারি এবং যে মানসিক প্রক্রিয়াটিকে আমরা জানতে চাই বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে তাকে পর্যবেক্ষণ করতে পারি। পরীক্ষণকার্য আমাদের সুযোগ, সময় এবং উদ্দেশ্য অনুযায়ী সম্পন্ন হতে পারে। মানসিক প্রক্রিয়া কখন স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে ঘটবে তার জন্য অনির্দিষ্ট প্রতীক্ষায় বসে থাকতে হয় না।

পরীক্ষণকার্য সুযোগ এবং উদ্দেশ্য অনুযায়ী সম্পন্ন হতে পারে

দ্বিতীয়তঃ, যেহেতু পরীক্ষণ হল নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থার মধ্যে পর্যবেক্ষণ সেহেতু ধীরভাবে প্রকৃতিস্থ হয়ে, সতর্কতার সঙ্গে, সুনির্দিষ্টভাবে মানসিক প্রক্রিয়াটিকে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হয়।

পরীক্ষণের ক্ষেত্রে সতর্কতার সঙ্গে ও সুনির্দিষ্টভাবে বিষয়টিকে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব

তৃতীয়তঃ, একই পরীক্ষণকার্য, বিভিন্ন ব্যক্তির দ্বারা বিভিন্ন স্থানে সম্পন্ন হতে পারে। পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও একই বিষয়ের ওপর পরীক্ষণকার্য চালিয়ে মনোবিদরা একই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন।

একই পরীক্ষণকার্য বিভিন্ন ব্যক্তির দ্বারা বিভিন্ন সময়ে সম্পন্ন হতে পারে

চতুর্থতঃ, পরীক্ষণের ক্ষেত্রে যেহেতু অবস্থা আমাদের আয়ত্তের মধ্যে, সেহেতু আলোচ্য মানসিক প্রক্রিয়াটিকে অন্যান্য অপ্রাসঙ্গিক ও অবান্তর বিষয়ের প্রভাব থেকে মুক্ত ও স্বতন্ত্র করে নিতে পারি। তাছাড়া পরীক্ষক প্রয়োজনমত কোন একটি অবস্থার পরিবর্তন করে সেই পরিবর্তনের স্বরূপ ও পরিণাম পর্যবেক্ষণ করতে পারেন।

অবান্তর ও অপ্রাসঙ্গিক বিষয় বর্জন করে আলোচ্য বিষয়ে মনকে নিবদ্ধ করা চলে

পঞ্চমতঃ, মানসিক প্রক্রিয়া ও দেহগত প্রক্রিয়ার যে পরিমাণগত সম্পর্ক (quantitative relations of mental processes to physiological processes), পরীক্ষণের মাধ্যমে তা নির্ধারণ করা যায়।

পরীক্ষণে, মানসিক এবং দেহগত প্রক্রিয়ার পরিমাণগত সম্পর্ক নির্ধারণ করা সম্ভব

ষষ্ঠতঃ, পরীক্ষণ পদ্ধতির সাহায্যে মানসিক প্রক্রিয়ার অন্তর্দর্শন ও পর্যবেক্ষণ অর্থাৎ এর অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ উভয় দিকই জানা যায়, ফলে মানসিক প্রক্রিয়ার পূর্ণ রূপের পরিচয় পাওয়া যায়।

(ii) **পরীক্ষণ পদ্ধতির ত্রুটি বা অসুবিধা এবং সেগুলি দূর করার উপায় (Defects or Disadvantages of Experimental Method and how they can be removed) :** প্রথমতঃ, মনোবিদ্ স্টাউটের মতে পরীক্ষণ পদ্ধতির প্রধান ত্রুটি হল, প্রাকৃতিক পরিবেশে বা স্বাভাবিক অবস্থায় মানসিক প্রক্রিয়াগুলি যতখানি সহজ ও সরলভাবে নিজেদের প্রকাশ করে, পরীক্ষণাগারের কৃত্রিম পরিবেশে মানসিক প্রক্রিয়াগুলি ততখানি স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেদের প্রকাশ করে না। স্বাভাবিকভাবে কোন লোক ভয় পেলে তার ভাবাবেগটিকে যেভাবে জানা যাবে, কৃত্রিম পরিবেশে, কৃত্রিমভাবে তার মনে ভীতি সঞ্চারিত করে মানসিক প্রক্রিয়াটিকে ঠিক সেভাবে জানা যাবে না।

পরীক্ষণাগারের কৃত্রিম পরিবেশে মানসিক প্রক্রিয়াগুলিকে স্বাভাবিক অবস্থায় পাওয়া যায় না

এই অভিযোগের উত্তরে বলা যেতে পারে যে, অভিজ্ঞ পরীক্ষক—পরীক্ষণাগারের (Laboratory) অবস্থাটিকে যতদূর সম্ভব স্বাভাবিক করে তুলে এই অসুবিধা আংশিকভাবে দূর করতে পারেন।

অভিজ্ঞ পরীক্ষক পরীক্ষণাগারের অবস্থাকে যতদূর সম্ভব স্বাভাবিক করে তুলতে পারেন

দ্বিতীয়তঃ, অবস্থার তারতম্য অনুসারে মানসিক প্রক্রিয়াগুলির তারতম্য সকল সময় লক্ষ্য করা যায় না। ধরা যাক, কোন লোকের মনে কৃত্রিমভাবে ভীতি সঞ্চারিত করা হল। তখন তাকে প্রয়োজন মত ক্রমান্বয়ে বাড়ান বা কমান সম্ভব নাও হতে পারে।

প্রয়োজনমত মানসিক প্রক্রিয়ার তারতম্য সব সময় হয় না

তৃতীয়তঃ, অনেক ক্ষেত্রে পরীক্ষণ পদ্ধতি প্রয়োগ করার ইচ্ছা করা হলেও, তা প্রয়োগ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। পদার্থবিদ্, রসায়নশাস্ত্রবিদ্ বা অন্যান্য প্রাকৃতিক বিজ্ঞানীকে এই অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় না, যেহেতু যেসব জড়বস্তুর ওপর পরীক্ষণকার্য চালান হয়, তারা কোন রকম বাধার সৃষ্টি করে না। কিন্তু জীবিত প্রাণী, বিশেষ করে মানুষ অত সহজবস্তু নয়, তারা সকল সময় পরীক্ষণকার্যে সহযোগিতা করতে ইচ্ছুক নয়। ধরা যাক,

মানুষ বা জীবিত প্রাণী সব সময় পরীক্ষণকার্যে সহযোগিতা করতে ইচ্ছুক নয়

পরীক্ষণের সাহায্যে নির্ধারণ করার চেষ্টা করা হল যে, মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে বুদ্ধির কি প্রকার সংযোগ আছে। কিন্তু মস্তিষ্কের কোন অংশ অপসারিত করতে দিয়ে কিছু পরিমাণে বুদ্ধি হারাতে কোন ব্যক্তিই সম্মত হবে না।

জীবিত প্রাণীর ক্ষেত্রে কেবলমাত্র একটি অবস্থার পরিবর্তন সব সময় সম্ভব না।

চতুর্থতঃ, পরীক্ষণ পদ্ধতির নিয়ম হল পূর্ববর্তী অবস্থার মধ্যে একটিমাত্র অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে, পরীক্ষণ-পাত্রের (Subject) ওপর তার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা। কিন্তু জীবিত প্রাণীর ক্ষেত্রে এই বিষয়টি সব সময় সম্ভব হয় না।

বিভিন্ন অবস্থায় একই উদ্দীপক প্রয়োগ করে এই অসুবিধা আংশিকভাবে দূর করা যেতে পারে।

পরীক্ষণকার্যই পরীক্ষণের বিষয়টির ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করতে পারে

পঞ্চমতঃ, পরীক্ষণকার্যই পরীক্ষণের বিষয়টির ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করতে পারে। ধরা যাক, দীর্ঘকালব্যাপী গোলমালের মধ্যে থাকলে, মানুষ কি রকম ক্লান্তি অনুভব করে, কোন মনোবিদ্ তা পরীক্ষণের সাহায্যে নির্ধারণ করতে চান। কিন্তু যখনই পরীক্ষণ-পাত্র পরীক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সচেতন হয় তখন সে এমনভাবে আচরণ করে যেন তার মধ্যে কোন ক্লান্তিই আসেনি। অথবা যখন কোন ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব পরিমাপ করতে যাওয়া হচ্ছে, তখন যদি পরীক্ষণ-পাত্র পূর্ব থেকে তা জানতে পারে তাহলে সে তার ব্যক্তিত্বের এমন কতকগুলি অস্বাভাবিক দিককে প্রকাশ করে, যেগুলি স্বাভাবিকভাবে তার মধ্যে দেখা যায় না।

পরীক্ষণ-পাত্রকে যথাযথভাবে শিক্ষিত করে এই ত্রুটি দূর করা যেতে পারে। পরীক্ষণ-পাত্রকে এমনভাবে শিক্ষিত করা যেতে পারে যার ফলে সে তার প্রতিক্রিয়া এবং অন্তর্দর্শন যথাযথভাবে করতে পারে।

ষষ্ঠতঃ, মানসিক প্রক্রিয়া চঞ্চল ও ক্ষণস্থায়ী, সেগুলি স্থির থাকে না। আবার স্থির না থাকলে তার পরীক্ষণ অসম্ভব। এই কারণে পরীক্ষণ পদ্ধতির প্রয়োগ সহজসাধ্য নয়। মানসিক প্রক্রিয়া চঞ্চল হলেও প্রয়োজনমত নিয়ন্ত্রণাধীন অবস্থায় এগুলিকে পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন করে এগুলির পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ সম্ভব করা যেতে পারে।

ব্যক্তিগত পার্থক্যের জন্য পরীক্ষণের ফল যথাযথ হয় না

সর্বশেষে, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রভেদ থাকার জন্য অনেক সময় ব্যক্তি বিশেষের ওপর পরীক্ষণকার্য চালিয়ে সুফল পাওয়া যায় না।

বিভিন্ন ব্যক্তির ওপর একই প্রকার পরীক্ষণকার্য চালিয়ে এই অসুবিধা দূর করা যেতে পারে।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, পরীক্ষণপদ্ধতির ক্ষেত্রে কিছুটা অসুবিধা থাকবেই, কেননা, পরীক্ষণ মাত্রই হল কৃত্রিম অবস্থায় পরীক্ষণ। কাজেই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে পরীক্ষণকার্য চালান সম্ভব নয়। তাছাড়া, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান জড় এবং অচেতন পদার্থের ওপর পরীক্ষণ পদ্ধতি প্রয়োগ করে, কিন্তু মনোবিদ্‌কে সজীব প্রাণী, বিশেষ করে মানুষের ওপর পরীক্ষণকার্য চালাতে হয়। কাজেই এক্ষেত্রে পরীক্ষকের নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ, তবু উপযুক্ত সতর্কতার সঙ্গে পরীক্ষণকার্য চালাতে পারলে অনেক ক্ষেত্রে সন্তোষজনক ফল লাভ করা যায়।

কৃত্রিম অবস্থার জন্য কিছুটা অসুবিধা পরীক্ষণের ক্ষেত্রে থাকবেই

২। উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ পদ্ধতি (Genetic Method) :

'Genesis' শব্দটির অর্থ জন্ম বা উৎপত্তি। যে পদ্ধতি অনুসরণ করে মনের জন্ম বা উৎপত্তি থেকে আরম্ভ করে তার ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করা হয় তাকেই 'উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ পদ্ধতি' বলে। এই পদ্ধতিকে **জনি পদ্ধতি** নামেও অভিহিত করা হয়। এই পদ্ধতি একটি ব্যাখ্যামূলক পদ্ধতি। দেহের মত মনেরও ক্রমবিকাশ এবং ক্রমবৃদ্ধি আছে। এই পদ্ধতির সাহায্যে ব্যক্তি-মনের বা একটি জাতি-মনের ক্রমবিকাশ তার শৈশবস্থা থেকে পূর্ণতা প্রাপ্তি পর্যন্ত লক্ষ্য করা হয়। অর্থাৎ মনের অপরিণত অবস্থা কিভাবে পরিণত অবস্থায় রূপান্তরিত হল তারই ক্রমবিকাশের আলোচনা 'উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ' পদ্ধতির উদ্দেশ্য। মনের বিকাশ বলতে পরিবেশের প্রভাবে ব্যক্তির মধ্যে সুপ্ত গুণগুলির বা ক্ষমতাগুলির বিকাশ বোঝায়। মনের বিকাশ দুটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে—বংশানুগতি (Heredity) এবং পারিপার্শ্বিক (Environment)। একদিকে বংশানুগতি বা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত গুণ ও ক্ষমতা এবং অপর দিকে পারিপার্শ্বিকের প্রভাব—এই দুইয়ের সংঘাতে ব্যক্তি-মনের ক্রমবিকাশ ঘটে। মনের ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে বংশানুগতি এবং পারিপার্শ্বিক—এই উভয়ের মধ্যে কার প্রভাব বেশী সে সম্পর্কে মতভেদ আছে। কারও মতে মানসিক বিকাশের প্রধান কারণ বংশানুগতি, আবার কারও মতে পারিপার্শ্বিক। বস্তুতঃ, মনের ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে বংশানুগতি ও পারিপার্শ্বিক উভয়ই অপরিহার্য।

উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ পদ্ধতির সাহায্যে মনের উৎপত্তি থেকে তার ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করা হয়

ব্যক্তিগত বিকাশ নির্ভর করে বংশানুগতি ও পারিপার্শ্বিকের ওপর

পূর্বোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করে ব্যক্তি-মনের ক্রমবিকাশের বিভিন্ন স্তর প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হয়। মনের ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে বংশানুগতি এবং পারিপার্শ্বিক—এই উভয়ের প্রভাব মানুষের মনের ওপর কিভাবে কাজ করছে, কি কি অবস্থায় সুস্থ মনের

বিকাশ ঘটে, কি কি অবস্থায় মনের অসুস্থতা ব্যক্তি বা জাতির ক্ষেত্রে অপরাধ প্রবণতার সৃষ্টি করে, এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য 'উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ পদ্ধতি' অনুসরণ করে সংগ্রহ করা হয়। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধি ও মানসিক ক্ষমতা কিভাবে বিকাশ লাভ করে এই পদ্ধতির সাহায্যে সে-সব জানা যায়।

প্রাণিমন, শিশুমন, প্রাপ্তবয়স্কদের মন ইত্যাদি সকলের মনের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের আলোচনায় পূর্বোক্ত পদ্ধতির প্রয়োগ করা যেতে পারে। কোন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির ক্ষেত্রে চিন্তা, অনুভূতি ও ইচ্ছা এই মানসিক প্রক্রিয়াগুলির ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করার জন্য পূর্বোক্ত পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করা হয়। তবে শিশু-মনোবিদ্যায় এই পদ্ধতির বিশেষ প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। মনের ক্রমবিকাশের আলোচনায় শিশুর অপরিণত মন নিয়েই অনুসন্ধানকার্য শুরু করা দরকার। একই শিশুকে তার শৈশবাবস্থা থেকে পূর্ণতা পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করে, সেই শিশুর বা শিশুদের মানসিক, শারীরিক এবং সামাজিক ক্রমবিকাশ সম্পর্কে অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় অবগত হওয়া যায়। কিন্তু যেহেতু এই জাতীয় পর্যবেক্ষণ দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ, সেহেতু একই শিশুকে সুদীর্ঘকাল ধরে পর্যবেক্ষণ না করে, বিভিন্ন বয়সের কয়েকটি শিশুকে নমুনা হিসেবে গ্রহণ করা হয়। এক বয়স থেকে অপর এক বয়সে শিশুর আচরণের বৈশিষ্ট্যগুলি তুলনামূলকভাবে বিচার করে শিশুমনের ক্রমবিকাশের পরিবর্তন পরিমাপ করা হয়।[1] শিশু-মনের ক্রমবিকাশের মূল সূত্রগুলি এই পদ্ধতির সাহায্যে জানা যায়। শিশুর মনে বিভিন্ন সামান্য ধারণার (general ideas) উৎপত্তি কিভাবে ঘটে, শিশুর আবেগ, অনুভূতি কিভাবে বিকাশপ্রাপ্ত হয়, শিশুর সহজাত প্রবৃত্তিগুলি শিশুর জীবনে কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে— শিশু-মন সম্পর্কীয় এই সব প্রয়োজনীয় তথ্য এই পদ্ধতির সাহায্যে জানা যায়।

প্রাণিমন, শিশুমন, প্রাপ্তবয়স্কদের মন— সকলের ক্ষেত্রে ক্রমবিকাশ পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়

শিশুমনের ক্রমবিকাশের মূল সূত্রগুলি এই পদ্ধতির সাহায্যে জানা যায়

উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ পদ্ধতির সঙ্গে বিশ্লেষণ পদ্ধতির (Analytic Method) নিবিড় সম্পর্ক বর্তমান। পরিণত মনের বিশ্লেষণ করে তার ক্রমবিকাশের ধারা বোঝার চেষ্টা করাই উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ পদ্ধতির উদ্দেশ্য। উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

1. "As such research must extend over a number of years, a compromise method, called the cross sectional, is often employed. Instead of following the same children over several years sample groups are selected which will represent the behaviour of children at each age level. Changes in development are thus measured by comparing the typical performances of children from one age level to the next." —*H. Garrett*; *Psychology*; Page 19.

পদ্ধতির সঙ্গে তুলনামূলক পদ্ধতিরও (Comparative Method) নিবিড় সম্পর্ক বর্তমান। তুলনামূলক পদ্ধতির উদ্দেশ্য, পরিণত মানুষের মনের সঙ্গে তুলনা করে শিশু-মনের এবং শিশু-মনের সঙ্গে তুলনা করে মনুষ্যেতর প্রাণিমনের জ্ঞান লাভ করা।

উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ পদ্ধতির গুণ হল, এই পদ্ধতি মনের সক্রিয়তা ও গতিশীলতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে এবং মনের যে ক্রমবিকাশ আছে এই বৈজ্ঞানিক সত্যকে স্বীকার করে নেয়। কাজেই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্য এই পদ্ধতি আধুনিক। কিন্তু এই পদ্ধতি পরিবর্তনশীল মানসিক প্রক্রিয়ার অনুশীলনে কোন স্থির মানস-সত্তার অস্তিত্বের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে না, যার ফলে, মনোবিদ্ স্টাউট মনে করেন, মানস-জীবনের ঐক্য ও ধারাবাহিকতাকে ব্যাখ্যা করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। অনেক সময় এই পদ্ধতি শিশু-মনকে পরিণত মানব-মনের মাপকাঠিতে বিচার করে ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়।

৩। চিকিৎসামূলক পদ্ধতি (The Clinical Method) ঃ

বিভিন্ন প্রকারের মানসিক ব্যাধির চিকিৎসার জন্য এই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। এই পদ্ধতির সহায়তায় ব্যক্তির মানসিক ব্যাধির স্বরূপ ও কারণ জানা যায় এবং তার প্রতিকারের ব্যবস্থা সম্ভব হয়। ব্যক্তি যদি তার পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলতে না পারে তাহলে তার বাহ্য-আচরণের ক্ষেত্রে অস্বাভাবিকতা দেখা দেয় এবং এই অস্বাভাবিক আচরণ ব্যাধিগ্রস্ত বা অস্বাভাবিক মনেরই প্রকাশ বলে মনে করা হয়। এই পদ্ধতির প্রয়োগক্ষেত্র খুবই ব্যাপক।

মানসিক ব্যাধির চিকিৎসায় চিকিৎসামূলক পদ্ধতির প্রয়োগ

বর্তমান যুগে মানসিক ব্যাধিচিকিৎসাশাস্ত্র (Psychiatry) মানসিক ব্যাধির চিকিৎসার ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য অবদান। ফ্রয়েড, ইয়ুঙ, অ্যাডলার প্রমুখ খ্যাতনামা মানসিকব্যাধি চিকিৎসকদের গবেষণামূলক তথ্যাদির আবিষ্কারের ফলে এই চিকিৎসাশাস্ত্র আজ জনহিতকর কার্যে উল্লেখযোগ্য সুফল প্রদানে সমর্থ হয়েছে।

মানসিক ব্যাধি-চিকিৎসাশাস্ত্রের উপযোগিতা

ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণ (Psycho-Analysis), ফ্রয়েডের অবাধ সংসর্গ বা মুক্ত অনুষঙ্গ প্রণালী (Free-Association) পদ্ধতি, প্রতিফলন অভীক্ষা (Projective Test), প্রশ্নতালিকা (Questionnaire), ব্যক্তিত্ব নির্ণয়ক প্রশ্নাবলী (Personality Inventory) প্রভৃতি চিকিৎসাশাস্ত্রের পদ্ধতি বর্তমানে মনোবিদ্যায় ব্যবহৃত হচ্ছে।

মনোবিদ্যায় অনুসৃত বিভিন্ন চিকিৎসা পদ্ধতি

৪। ক্রমবিকাশ-ইতিহাস-সংগ্রহণ পদ্ধতি (The Case History Method) :

'উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ পদ্ধতি' এবং 'চিকিৎসানূলক পদ্ধতি'র সহকারী পদ্ধতিরূপে এই পদ্ধতিকে প্রয়োগ করা হয়। মনের ক্রমবিকাশের পথে কোন একটি বিশেষ অবস্থাকে জানতে হলে তার পূর্ববর্তী অতীত অবস্থাগুলি থেকে বিচ্ছিন্ন করে তাকে জানা সম্ভব নয়। [1]'ক্রমবিকাশ-ইতিহাস-সংগ্রহণ পদ্ধতির' সাহায্যে অতীত অবস্থার ইতিহাস সংগ্রহ করা হয়।

মনের একটি বিশেষ অবস্থাকে জানার জন্য ক্রমবিকাশ-ইতিহাস-সংগ্রহণ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়

অস্বাভাবিক, অসুস্থ বা বিকারগ্রস্ত ব্যক্তির মনের ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করার জন্যই এই পদ্ধতি বিশেষভাবে অনুসরণ করা হয়। যেসব ব্যক্তির মন বিকারগ্রস্ত এবং যাদের বাহ্য-আচরণ অস্বাভাবিক, এরূপ ব্যক্তির মনের ক্রম-বিকাশের ইতিহাস সংগ্রহ করা হয়। এরূপ ব্যক্তির খোলাখুলি কথাবার্তা, যে পরিবেশে সে বাস করে এবং তার সামাজিক জীবন থেকে এই ইতিহাস সংগ্রহ করা হয়। বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত ঘটনাগুলি একত্র করে সুবিন্যস্ত করার পর মোটামুটি একটা ইতিহাস পাওয়া যায়। ব্যক্তির অসুস্থতার কারণ দৈহিক, মানসিক, না সামাজিক তা নির্ধারণ করার পর তার মানসিক সুস্থতা কিভাবে আসতে পারে তাও নির্ণয় করা যেতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, ব্যক্তির এই মানসিক অসুস্থতার কারণ কেবলমাত্র তার নীতিজ্ঞানহীনতা বা দুশ্চরিত্রতা নয়, পারিপার্শ্বিকের প্রভাব এর জন্য বিশেষভাবে দায়ী।

অস্বাভাবী মনের ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতির প্রয়োগ

এই পদ্ধতি অনুসরণ করে শিশুদের দুষ্কর্মের কারণ অনুসন্ধান করা হয়। হয়ত কোন ভদ্র পরিবারজাত শিশু চুরি করেছে। এক্ষেত্রে মনোবিদ্ এই ঘটনার প্রয়োজনীয় বিবরণী সংগ্রহ করার জন্য সচেষ্ট হন। মনোবিদ্‌কে শিশুর বিশ্বাস অর্জন করতে হয়, তারপর খোলাখুলি কথাবার্তার মাধ্যমে তার মাতাপিতা, শিক্ষক, বন্ধু-বান্ধব প্রভৃতির সহায়তায় তার এই দুষ্কর্মের উৎসগুলি অতীত জীবন থেকে অনুসন্ধান করে সংগ্রহ করতে হয় এবং তারপর সেগুলিকে সমাজসম্মত পথে পরিচালিত করতে হয়।

শিশুর দুষ্কর্মের কারণ অনুসন্ধান করার জন্য এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়

এ পদ্ধতি যখন মনোবিদ্ প্রয়োগ করবেন তখন তাঁকে খুব সতর্ক হতে হবে।

---

1. **"Particularly for understanding one's behaviour at a given time, an attempt is made to go through his history from the period of infancy in order to collect an almost complete biographical data."**

—***G. D. Boaz ; General Psychology* ; Page 11.**

কেননা, ঘটনার ইতিহাস যাতে সঠিক তথ্যের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয় তার দিকে নজর দিতে হবে। অতীতে যে সব ঘটনা সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়নি বা যার সঠিক ব্যাখ্যা করা হয়নি, এমন সব ঘটনার ওপরও এই পদ্ধতিকে নির্ভর করতে হয়। এ ছাড়াও সদর্থক দৃষ্টান্তের ওপর অনেক সময় এত বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয় যে, নঞর্থক দৃষ্টান্তগুলি নজর এড়িয়ে যেতে পারে। তার ফলেও ইতিহাস নির্ভুল বা যথাযথ না হবার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে।

এই পদ্ধতি প্রয়োগে সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন

৫। পরিসংখ্যানভিত্তিক পদ্ধতি (Statistical Method) :

পরিসংখ্যান বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মনোবিদ্যার ক্ষেত্রেও পরিসংখ্যান পদ্ধতিকে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে। বর্তমানে মনোবিদ্যার গবেষণার ক্ষেত্রে পরিসংখ্যানভিত্তিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে বিভিন্ন ব্যক্তির মানসিক প্রবণতা নির্ধারণ করা হয়। তাছাড়া, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যে প্রভেদ তা নির্ধারণ করার জন্য ব্যক্তির বুদ্ধি, ব্যক্তিত্ব, প্রকৃতি, যোগ্যতা, সামর্থ্য প্রভৃতি পরিমাপ করার জন্য; মানসিক শক্তির যথার্থ স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করার জন্য এবং বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়ার গতি ও তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে বিভিন্ন বিষয় নির্ধারণের জন্য এই পদ্ধতি প্রয়োগ করবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

ব্যক্তির মানসিক প্রবণতা, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রভেদ প্রভৃতি এই পদ্ধতির সাহায্যে নির্ধারণ করা হয়

৬। বিশ্লেষণ পদ্ধতি (Analytic Method) :

এই পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করে মনোবিদ্ প্রতিটি জটিল মানসিক প্রক্রিয়াকে তার অন্তর্ভুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপাদানগুলিতে বিভক্ত করেন এবং এই সকল উপাদানগুলির পারস্পরিক সম্বন্ধ সম্পর্কীয় সূত্রগুলি আরোহ অনুমানের সাহায্যে নির্ধারণ করেন।

Questions

1. Discuss the advantages and disadvantages of introspection and Inspection as methods of psychology. Can Psychology dispense with introspection ?

2. Can Introspection be regarded as a dependable method of Psychology ?

3. What is Introspection ? Explain the advantages and disadvantages of introspection as a method of psychology.

4. Discuss the defects of the Method of Introspection. Wherein lies the superiority of the Experimental method ?

5. Explain the methods of psychology and discuss how the mental processes of other persons are studied.

6. What is Introspection ? Explain the advantages and disadvantages of the Introspective process.

7. What is Introspection ? What are the disadvantages of Introspection as a method of Psychology ? How far can they be overcome ?

8. Is Introspection a scientific method ? What precautions would you recommend for its proper use ?

9. What is the true method of Psychology ?

10. "All Introspection is retrospecion-"—Do you agree ?

11. What is Objective Method (or Inspection) ? What are its merits and demerits ? Is it sufficient by itself ?

12. What is the Experimental Method in Psychology ? Discuss its advantages and disadvantages.

13. What is Experimental method ? How far can experiments be successfully applied to the investigation of mental phenomena ? Discuss the problem with concrete examples.

14. Analyse the main factors of Experimental Methods in Psychology with a concrete illustration.

15. Are the subjective and objective methods opposed to each other ? Discuss, in this context, what should be the proper method of Psychology.

16. What are the methods of psychological study ? Give an example of the ways in which the different methods can be combined.

17. Describe the methods of psychological study and explain their distinctive functions.

18. What are the methods of psychological study ? What are their merits and demerits ? Is any method sufficient by itself ?

19. Write notes on : (a) Genetic Method, (b) Clinical Method, (c) Case History Method, (d) Analytic Method.

তৃতীয় অধ্যায়

মনোবিদ্যার সংজ্ঞা ও পরিসর

(Definition of Psychology and The scope of Psychology)

১। মনোবিদ্যার সংজ্ঞা (Definition of Psychology) ঃ

বিভিন্ন মনোবিদ্ মনোবিদ্যার বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন এবং মনোবিদ্যার যথার্থ সংজ্ঞা সম্পর্কে মনোবিদ্‌দের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে। সে কারণে প্রথমে আমরা প্রচলিত কয়েকটি সংজ্ঞা বিচার করে দেখব এবং তারপর মনোবিদ্যার একটা যথার্থ সংজ্ঞা নিরূপণ করার জন্য সচেষ্ট হব।

মনোবিদ্যার কাজ আত্মার উৎপত্তি, স্বরূপ এবং পরিণতি নিয়ে আলোচনা করা

(ক) মনোবিদ্যা হল আত্মা-সম্পর্কীয় বিজ্ঞান (Psychology is the science of soul) ঃ গ্রীক দার্শনিক প্লেটো (Plato) মনোবিদ্যার এরূপ সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন। গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটলও আত্মার স্বরূপকে মনোবিদ্যার আলোচ্য বিষয় বলে মনে করেন। মনোবিদ মাহের (*Maher*)-ও মনোবিদ্যার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন যে, 'মনোবিদ্যা হল দর্শনের সেই শাখা যা মানুষের মন বা আত্মা নিয়ে আলোচনা করে'। বস্তুতঃ, তিনি তাঁর সংজ্ঞায় 'মন এবং 'আত্মা' উভয়কে অভিন্ন বলে মনে করেছেন। অন্যান্য মনোবিদ্ যাঁরা মনোবিদ্যার উপরিউক্ত সংজ্ঞা সমর্থন করেন তাঁরা মনে করেন যে, মনোবিদ্যার কাজ আত্মার উৎপত্তি এবং পরিণতি নিয়ে অলোচনা করা।

মনোবিদ্যা একটি স্বতন্ত্র জ্ঞানের শাখা, দর্শনের অংশ নয়

কিন্তু মনোবিদ্যার এই সংজ্ঞাটি সন্তোষজনক নয় এবং সে কারণে আধুনিক মনোবিদ্‌গণ মনোবিদ্যার এই সংজ্ঞা গ্রহণ করেননি। প্রথমতঃ, এই সংজ্ঞাতে মনোবিদ্যাকে দর্শনের এবং অধিবিদ্যার (Metaphysics) অংশরূপে গণ্য করা হয়েছে। কিন্তু মনোবিদ্যা হল একটি স্বতন্ত্র জ্ঞানের শাখা। সে কারণে মনোবিদ্যাকে দর্শন বা অধিবিদ্যার শাখারূপে গণ্য করা যুক্তিযুক্ত নয়। এ ছাড়া, আত্মার যথার্থ স্বরূপ সম্পর্কে দার্শনিকদের মধ্যেও মতভেদ রয়েছে। সে কারণে আত্মা মনোবিদ্যার আলোচ্য বিষয়বস্তুরূপে গণ্য হতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ, মনোবিদ্যা হল বিষয়নিষ্ঠ বিজ্ঞান এবং অভিজ্ঞতাভিত্তিক (empirical);

যেহেতু পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের উপরই মনোবিদ্যার নির্ভর। মনোবিদ্যা যদি আত্মা-সম্পর্কীয় বিজ্ঞান হয়, তাহলে মনোবিদ্যাকে অভিজ্ঞতাভিত্তিক বলা চলে না; কারণ অতীন্দ্রিয় আত্মা পর্যবেক্ষণ বা পরীক্ষণের বিষয়বস্তু নয়। তাহলে মনোবিদ্যাকে বিজ্ঞানরূপেও গণ্য করা যেতে পারে না। মনোবিদ্যা মনের বাহ্যপ্রকাশ অর্থাৎ মানুষের আচরণ, দেহগত ক্রিয়া-প্রক্রিয়া প্রভৃতি আলোচনা করে। কারণ, এগুলিই পর্যবেক্ষণের ও পরীক্ষণের দ্বারা জানা যায়।

মনোবিদ্যা অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক, সেহেতু মনোবিদ্যা আত্মা-সম্পর্কীয় বিজ্ঞান হতে পারে না।

(খ) মনোবিদ্যা মন-সম্পর্কীয় বিজ্ঞান (Psychology is the science of the mind—*Halfding*): এই সংজ্ঞাটিকেও মনোবিদ্যার যথার্থ সংজ্ঞারূপে নিরূপণ করা যেতে পারে না। নিম্নোক্ত কারণে এই সজ্ঞাটি সন্তোষজনক নয়।

প্রথমতঃ, **মন** কথাটি অত্যন্ত ব্যাপক এবং **আত্মা** শব্দটিকে কেন্দ্র করে যে মতবিরোধ দেখা যায়, 'মন' শব্দটিকে কেন্দ্র করেও সেইরূপ মতবিরোধ দেখা যায়। মন বলতে মানসিক প্রক্রিয়া, মানসিক প্রক্রিয়া অন্তরালে কোন স্থায়ী মানস সত্তার অবস্থিতি বা এই মানস সত্তা ও মানসিক প্রক্রিয়া উভয়কেই বোঝাতে পারে। কিন্তু মনকে কী অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে তা এই সংজ্ঞাটিতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি। সে কারণে, মনোবিদ্ ম্যাগডুগাল বলেন, "মন হল দ্ব্যর্থক শব্দ; এরই সংজ্ঞা দেবার প্রয়োজন আছে।"[1]

'মন' শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক

দ্বিতীয়তঃ, মনোবিদ্যা কি জাতীয় বিজ্ঞান—বিষয়নিষ্ঠ (Positive), না আদর্শ-নিষ্ঠ (Normative)—এই সংজ্ঞাটিতে তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি। মনোবিদ্যা বিষয়নিষ্ঠ বিজ্ঞান, মানসিক প্রক্রিয়াগুলি যেভাবে ঘটে, সেভাবে সেগুলি ব্যাখ্যা করাই মনোবিদ্যার কাজ। কোন আদর্শের (Norm) আলোকে মনোবিদ্যা সেগুলি ব্যাখ্যা করে না।

মনোবিদ্যা যে বিষয়নিষ্ঠ এই সজ্ঞায় উল্লেখ করা হয়নি

তৃতীয়তঃ, মনোবিদ্যাকে শুধু যদি মন-সম্পর্কীয় বিজ্ঞান বলা হয় তাহলে অন্যান্য বিজ্ঞান, যেমন—তর্কবিজ্ঞান; নীতিবিজ্ঞান; সৌন্দর্য বিজ্ঞান প্রভৃতি থেকে মনোবিদ্যার পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব হয় না; কেননা, তর্কবিদ্যা, নীতিবিদ্যা প্রভৃতিও মন নিয়ে আলোচনা করে।[2]

1. "Mind is a vague word, itself in need of definition."
—*McDougall:* Outlines of Psychology. (Eleventh Edition); Page 2

2. এই প্রসঙ্গে ম্যাকডুগাল বলেন, "Secondly, there are other sciences of mind than psychology such as logic and metaphysics and epistemology, and theology all of which claim to tell us about mind or minds,"
—*McDougall:* Outlines of Psychology; Page 3,

চতুর্থতঃ, মনোবিদ্যা যে মানুষের আচরণ ও দেহগত প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করে—এই সংজ্ঞাতে তারও কোন উল্লেখ নেই।

(গ) মনোবিদ্যা হল চেতনা সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান (Psychology is the science of consciousness—*Angell*) :

দার্শনিক দেকার্ত (*Descartes*), মনোবিদ্ এঞ্জেল (*Angell*) প্রমুখ ব্যক্তিরা মনোবিদ্যার এরূপ সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন। এই সংজ্ঞাটি পূর্ববর্তী সংজ্ঞার তুলনায় অধিকতর স্পষ্ট, কারণ, এই সংজ্ঞাতে মন বলতে কি বুঝায় তা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে এবং মনোবিদ্যাকে অন্তর্দর্শন পদ্ধতির উপযোগী করে তোলা হয়েছে। তবু এই সংজ্ঞাটি নিম্নোক্ত কারণে সন্তোষজনক নয়।

কি ধরনের বিজ্ঞান বলা হয়নি

প্রথমতঃ, এই সংজ্ঞায় মনোবিদ্যা কি ধরনের বিজ্ঞান—বিষয়নিষ্ঠ, না আদর্শনিষ্ঠ তা সুস্পষ্ট করে উল্লেখ করা হয়নি। দ্বিতীয়তঃ, এই সংজ্ঞাতে 'মন' ও 'চেতনা' এই উভয় শব্দকে অভিন্ন বলে মনে করা হয়েছে। কিন্তু মনোবিদ্যা চেতনার স্তর ছাড়াও 'চেতন স্তরের' নীচে আরও একটি মানসিক স্তর, যেমন—নির্জ্ঞান (unconscious) স্তর নিয়ে আলোচনা করে। বস্তুতঃ, মনঃসমীক্ষক (Psycho-analyst) মনে করেন যে, মনের চেতনার স্তর নির্জ্ঞান স্তরেরই বাহ্য-প্রকাশ মাত্র, আসলে নির্জ্ঞান স্তর নিয়েই মন। সেহেতু, মনোবিদ্যাকে শুধু চেতনা সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান বলে অভিহিত করা হলে সংজ্ঞাটি অব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট হয়ে পড়ে।

'মন' ও 'চেতনাকে' অভিন্ন মনে করা হয়েছে

তৃতীয়তঃ, আচরণবাদী বা চেষ্টিতবাদীরা (Behaviourists) এই সংজ্ঞার তীব্র সমালোচনা করেছেন। তাঁদের মতে মনোবিদ্যা হল বস্তুনিষ্ঠ প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এবং সেহেতু মনোবিদ্যার বিষয়বস্তু হল প্রাণীর আচরণ (behaviour)। কিন্তু মনোবিদ্যার আলোচ্য বিষয়বস্তু যদি 'চেতনা' হয় তাহলে মনোবিদ্যাকে বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞান (objective science) বলে গণ্য করা সম্ভব হয় না ; কেননা 'চেতনা' বাহ্যপ্রত্যক্ষের বিষয়বস্তু নয়। দেহাতিরিক্ত আত্মা বা মনের মতন 'চেতনা' বলে স্বতন্ত্র কোন পদার্থের অভিজ্ঞতা লাভ করা যায় না। তাছাড়া, ব্যক্তি কেবলমাত্র নিজের চেতনাকেই সোজাসুজি জানতে পারে, অপর ব্যক্তির ক্ষেত্রে তার বাহ্য-আচরণের ভিত্তিতে তার চেতনাকে অনুমান করে নিতে হয়। অথচ মনোবিদ্যা কতকগুলি সাধারণ সূত্র প্রতিষ্ঠা করতে চায় যেগুলি, সকলের মন সম্বন্ধেই প্রযোজ্য।

আচরণবাদীদের মতে প্রাণীর আচরণই মনোবিদ্যার আলোচ্য বিষয়বস্তু, চেতনা নয়

ম্যাকডুগাল প্রমুখ মনোবিদ্‌গণ, যাঁরা আচরণবাদী বা মনঃসমীক্ষক নন এই সংজ্ঞার

বিরুদ্ধে আপত্তি করছেন। তাঁদের মতে মনোবিদ্যার এই সংজ্ঞা যদি স্বীকার করে নেওয়া হয় তাহলে প্রাণি-মনোবিদ্যা, শিশু-মনোবিদ্যা এবং অস্বভাবী মনোবিদ্যাকে (Abnormal Psychology) মনোবিদ্যার শাখারূপে গণ্য করা যাবে না। কেননা প্রাণী, শিশু বা অস্বভাবী ব্যক্তির পক্ষে অন্তর্দর্শনের (introspection) সহায়তায় নিজের মনের ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার স্বরূপ ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন এদের আচরণ ও দেহগত প্রক্রিয়া লক্ষ্য করা। সে কারণে এই সংজ্ঞার সমালোচনা করে ম্যাকডুগাল বলেছেন, "মনোবিদ্যার মনে করা উচিত নয়, চেতনা প্রবাহের আত্মদর্শনমূলক ব্যাখ্যাই তার একমাত্র কাজ, এ হল কাজের প্রাথমিক অংশমাত্র। এরূপ বিশুদ্ধ মনোবিদ্যা কখনও বিজ্ঞান হতে পারে না বা ব্যাখ্যামূলক বিজ্ঞানের স্তরে উন্নীত হতে পারে না।"[1]

ম্যাকডুগাল প্রমুখ মনোবিদ্দের মতে এই সংজ্ঞা প্রাণি-মনোবিদ্যা, শিশু মনোবিদ্যা ও অস্বভাবী মনোবিদ্যাকে মনোবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত করে না

তাছাড়া মনোবিদ্যা যে প্রাণীর আচরণ এবং দেহগত প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করে—এই সংজ্ঞাতে তার কোন সুস্পষ্ট উল্লেখ নেই।

(ঘ) মনোবিদ্যা হল মানসিক প্রক্রিয়ার বিজ্ঞান (Psychology is the science of the mental processes.—Hume):

মনোবিদ্যার এই সংজ্ঞাটির গুণ এই যে, এই সংজ্ঞাতে আত্মা, মন, চেতনা প্রভৃতি বিষয়কে মনোবিদ্যার বিষয়রূপে উল্লেখ না করে মানসিক প্রক্রিয়াকে মনোবিদ্যার বিষয়রূপে নির্দেশ করা হয়েছে। কিন্তু এই সংজ্ঞাটির দোষ এই যে, মানসিক প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতা এবং ঐক্য ব্যাখ্যা করার জন্য কোন মানস সত্তার অস্তিত্ব এই সংজ্ঞা স্বীকার করে না। দ্বিতীয়তঃ, এই সংজ্ঞা মনোবিদ্যা কোন শ্রেণীর বিজ্ঞান—বিষয়নিষ্ঠ, না আদর্শনিষ্ঠ তা স্পষ্ট উল্লেখ করেনি।

(ঙ) মনোবিদ্যা মানসিক অবস্থা ও প্রক্রিয়ার বিজ্ঞান (Psychology is the science of mental states and processes—Stout):

মনোবিদ্যার এই সংজ্ঞাটির গুণ হল, এই সংজ্ঞাতে আত্মা, মন, চেতনা প্রভৃতি বিষয়কে মনোবিদ্যার বিষয়বস্তুরূপে উল্লেখ না করে, মানসিক অবস্থা এবং প্রক্রিয়াকে মনোবিদ্যার বিষয়বস্তুরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। মনোবিদ্ স্টাউট স্বীকার করেন যে, মন নিছক মানসিক প্রক্রিয়ার সমষ্টিমাত্র নয়। মন মানসিক প্রক্রিয়ার অতিরিক্ত এক

1. "Psychology must not regard the introspective description of the stream of consciousness as its whole task but only as a preliminary part of its work. Such introspective description, such 'Pure Psychology' can never constitute a science or at least can never rise to the level of an explanatory science."—*McDougall.*

সত্তা যা বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়াগুলির মধ্যে ধারাবাহিকতা আনে ও তাদের ঐক্যবদ্ধ করে। এই সংজ্ঞাটির দোষ হল, এই সংজ্ঞা মনোবিদ্যা কোন্ শ্রেণীর বিজ্ঞান—ঘটনানিষ্ঠ, না আদর্শনিষ্ঠ তা স্পষ্ট উল্লেখ করেনি।

(চ) মনোবিদ্যা হল মানুষের আচরণ সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান (Psychology is the science of human behaviour—Watson):

এই সংজ্ঞার গুণ হল, আচরণকে মনোবিদ্যার বিষয়বস্তুরূপে নির্দেশ করাতে মনোবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গিকে মনোগত না বলে বিষয়গত বলা হয়েছে এবং মনোবিদ্যাকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সমশ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে। তবু মনোবিদ্যার এই সংজ্ঞাটি সন্তোষজনক নয়। ওয়াটসন এবং তাঁর অনুরাগীবৃন্দ 'আচরণ'কে মনোবিদ্যার আলোচ্য বিষয়বস্তুরূপে গণ্য করলেও আচরণবাদীরা নিছক যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই মানুষের এই আচরণের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু মানুষ নিছক যন্ত্র নয়। ম্যাকডুগালের মতে আচরণ মানুষের উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায়েরই বাহ্যপ্রকাশ।

ওয়াটসন প্রমুখ মনোবিদ্‌গণ মানুষের আচরণের যান্ত্রিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন

ওয়াটসন মনোবিদ্যার সংজ্ঞা থেকে মন, চেতনা এবং মানসিক প্রক্রিয়াকে বর্জন করেছেন। তাঁর মতে অন্তর্দর্শন মনোবিদ্যার যথার্থ পদ্ধতি নয়। পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ যা অন্যান্য প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পদ্ধতি, তাই মনোবিদ্যারও পদ্ধতি। এই পদ্ধতির দ্বারা আচরণের প্রকৃতি ও নিয়ম নির্ণয় করা মনোবিদ্যার কাজ। আচরণ বলতে ওয়াটসন কি বোঝেন তা জানা দরকার। কোন উদ্দীপক (stimulus) মানুষের দেহযন্ত্রের ওপর ক্রিয়া করার জন্য দেহে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় তাই হল আচরণ। অর্থাৎ বাহ্যবস্তুর সঙ্গে যখন ইন্দ্রিয়ের সংযোগ ঘটে তখন স্নায়ুতন্ত্র উদ্দীপিত হওয়ার ফলে দেহে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এবং এই প্রতিক্রিয়াই হল আচরণ। ওয়াটসন প্রমুখ আচরণবাদীদের মতে মনোবিদ্যা হল উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়া (stimulus-response) সম্পর্কীয় বিজ্ঞান। মানুষের সব আচরণ, এমন কি হাঁচি, কাশি থেকে দর্শনের বই লেখা পর্যন্ত সবই উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়া—এই সাধারণ সূত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়। সংবেদন ও প্রত্যক্ষণ জীবদেহের প্রতিক্রিয়া ছাড়া কিছুই নয়। জীবদেহ এবং তার আচরণের অতিরিক্ত মন বা আত্মার কোন অস্তিত্ব নেই। চেতনার কোন অস্তিত্ব নেই। মানসিক প্রক্রিয়াই আসলে দৈহিক প্রক্রিয়া। জীবের আচরণই হল মনোবিদ্যার আলোচ্য বিষয়বস্তু, কারণ আচরণই পর্যবেক্ষণের বিষয়বস্তু।

উদ্দীপক ক্রিয়া করার জন্য জীবদেহে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, তাই হল 'আচরণ'

সংবেদন ও প্রত্যক্ষ জীবদেহের প্রতিক্রিয়া ছাড়া কিছু নয়

পূর্বোক্ত অভিমতের সমালোচনায় একথা বলা যেতে পারে যে, মনোবিদ্যা কেবলমাত্র আচরণ সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান হতে পারে না। মানুষের আচরণ তার চেতন মনেরই বাহ্যপ্রকাশ।

আচরণবাদের সমালোচনা

অন্তর্দর্শনের সাহায্যেই এই চেতন মনকে জানা যায়। অন্তর্দর্শনের সাহায্যে আমরা আমাদের মানসিক প্রক্রিয়াগুলিকে জানি এবং এই সব মানসিক প্রক্রিয়া আমাদের কোন্ কোন্ আচরণের সঙ্গে সংযুক্ত সেগুলি লক্ষ্য করি। পরে অপরের আচরণ দেখে তাদের মানসিক প্রক্রিয়ার স্বরূপগুলি অনুমান করি। সুতরাং আচরণ কখনও মানসিক প্রক্রিয়া থেকে বিযুক্ত হতে পারে না। আচরণবাদীরা চৈতন্যের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, কিন্তু দেহের ব্যবহারকে দেহ কখনও প্রত্যক্ষ করতে পারে না। চেতন মনকে বাদ দিলে উদ্দীপক ও তার প্রতিক্রিয়াকে কখনও ব্যাখ্যা করা যায় না।

মানুষের আচরণ তার চেতনারই বাহ্যপ্রকাশ 'চেতন' মনকে বাদ দিলে উদ্দীপক ও তার প্রতিক্রিয়াকে কখনও ব্যাখ্যা করা যায় না

মানুষ অচেতন জড়বস্তু নয়। তার ব্যবহার যান্ত্রিকভাবে সম্পন্ন হয় না। যখন কোন উদ্দীপক মানুষের ওপর ক্রিয়া করে তখন কিভাবে আচরণের মাধ্যমে তার প্রতিক্রিয়া ঘটবে, মানুষের মনই তা অনেক সময় নির্ধারণ করে। আচরণবাদীরা মনে করেন যে, ব্যক্তির আচরণ কেবলমাত্র পরিবেশের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু এ সত্য নয়, ব্যক্তির ওপর পরিবেশের প্রভাব থাকলেও ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছা, তার কর্ম ও পরিবেশকে নিয়ন্ত্রিত করে। উদ্দেশ্য সাধনের যে অভিপ্রায় তাকে বাদ দিয়ে মানুষের কর্মকে নিছক দেহগত প্রক্রিয়া রূপে ব্যাখ্যা করা চলে না।

উদ্দীপক জীবদেহে যে প্রতিক্রিয়া ঘটায় অনেক সময় মনই তা নির্ধারণ করে

আচরণবাদীরা 'ব্যবহার'কে যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তাতে মানুষ একটা দেহ-বিশিষ্ট যন্ত্রে পরিণত হয়েছে এবং ব্যবহারের এই জাতীয় ব্যাখ্যা গ্রহণ করলে মনোবিদ্যার সঙ্গে শারীরবিদ্যার বা শারীরবৃত্তের (psysiology) কোন পার্থক্য থাকে না। মনোবিদ্যা মনেরই ব্যাখ্যা, নিছক জীবদেহের ব্যাখ্যা নয়।

আচরণবাদীরা মানুষকে দেহবিশিষ্ট যন্ত্রে পরিণত করেছে

(ছ) মনোবিদ্যা হল জীবের আচরণ সম্বন্ধীয় বিষয়নিষ্ঠ বিজ্ঞান (Psychology is the Positive science of the behaviour of living things.—McDougall)[1]

ম্যাকডুগালের উপরিউক্ত সংজ্ঞাটির সঙ্গে ওয়াটসন প্রমুখ আচরণবাদীদের প্রদত্ত

1. *McDougall :* Psychology, Page *19*.

সংজ্ঞার ভাষাগত সাদৃশ্য থাকলেও ম্যাকডুগাল প্রদত্ত সংজ্ঞাটি অন্যান্য সংজ্ঞার তুলনায় অনেকাংশে ত্রুটিমুক্ত।

প্রথমতঃ, ম্যাকডুগাল আচরণ পদটিকে ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করেছেন। ওয়াটসন প্রমুখ মনোবিদ্‌রা জীবের আচরণকে যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁদের মতে উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়া (stimulus-response)—এই সূত্রের সাহায্যেই জীবদেহের আচরণ ব্যাখ্যা করা চলে। জীবদেহ যন্ত্র মাত্র এবং যান্ত্রিক কার্যকারণ সম্পর্কের (mechanical causation) মাধ্যমেই জীবের আচরণের ব্যাখ্যাই যুক্তিসঙ্গত। যান্ত্রিক কার্যকারণ সম্পর্ক পূর্ববর্তী ঘটনার দ্বারাই কার্যকে ব্যাখ্যা করে, কোন উদ্দেশ্যের সহায়তা গ্রহণ করে না। ম্যাকডুগালের মতে নির্জীব জড়বস্তু সম্পূর্ণভাবে যান্ত্রিক নিয়মের (mechanical laws) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু জীবের আত্মনিয়ন্ত্রণের (self-determination) ক্ষমতা আছে, জীব নিজের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যকে সচেতনভাবে অনুসরণ করে এবং নিজের সক্রিয় প্রচেষ্টার সহায়তায় সেই লক্ষ্যকে লাভ করতে চায়। সুতরাং, জীবের আচরণের ব্যাখ্যার জন্য উদ্দেশ্যমূলক কার্যকারণ সম্পর্কের (teleological causation) আশ্রয় গ্রহণ করা দরকার। ম্যাকডুগাল বলেন, 'উদ্দেশ্যের প্রকাশ বা কোন লক্ষ্য লাভ করার প্রচেষ্টাই হল আচরণের লক্ষণ এবং আচরণই জীবের বৈশিষ্ট্য।'[1]

ম্যাকডুগাল জীবের আচরণকে উদ্দেশ্য-মূলক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ব্যাখ্যা করেছেন

দ্বিতীয়তঃ, ম্যাকডুগাল জীবের আচরণকে মনের বাহ্যপ্রকাশরূপেই গ্রহণ করেছেন। জীবের আচরণের মধ্যেমে মনকে জানাই যে মনোবিদ্যার কাজ, ম্যাকডুগালের সংজ্ঞায় তার পরোক্ষ স্বীকৃতি আছে।

ম্যাকডুগালের মতে আচরণ মনেরই বাহ্যপ্রকাশ

তৃতীয়তঃ, 'আত্মা', 'মন', 'চেতনা' প্রভৃতি বিতর্কমূলক শব্দ পরিহার করার জন্য, এই সংজ্ঞা বিতর্কমূলক তাত্ত্বিক আলোচনার কোন অবকাশ রাখেনি।[2]

বিতর্কমূলক তাত্ত্বিক আলোচনা পরিহার

চতুর্থতঃ, মনোবিদ্যাকে যদি 'মন' বা 'চেতনা' সম্পর্কীয় বিজ্ঞান বলা হয় তাহলে জীবের আচরণ মনোবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত একথা সুস্পষ্ট করে বলা হয় না, বরং আচরণ মনোবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত কিনা সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়। কিন্তু মনের

1. "The manifestation of purpose or the striving to achieve an end is, then, the mark of behaviour, and behaviour is the characteristic of living things."
—*McDougall*; Psychology; page 88.

2. "The definition of psychology as the positive science of behaviour seems, then, preferable to any other...because it makes use of no ill-defined and problematical notions such as mind or soul or consciousness but only of familiar fact of observation.
—*Ibid*—Page 20.

বাহ্যপ্রকাশরূপে আচরণই মনোবিদ্যার বিষয়বস্তু, একথা বলা হলে মনকে বা চেতনাকে এই সংজ্ঞার বহির্ভূত করা হয় না।

পঞ্চমতঃ, মনোবিদ্যা যে বিষয়নিষ্ঠ বিজ্ঞান, আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান নয়, 'Positive' কথাটির ব্যবহারের ফলে তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মনের কার্যকলাপ যেভাবে ঘটে, মনোবিদ্যা তাই আলোচনা করে, কোন আদর্শের আলোকে তাকে ব্যাখ্যা করে না।

মনোবিদ্যা যে বিষয়নিষ্ঠ বিজ্ঞান তার সুস্পষ্ট উল্লেখ

ষষ্ঠতঃ, এই সংজ্ঞাটিতে মনোবিদ্যার ক্ষেত্রকে শুধু মানুষের মনেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়নি, নিম্নতর প্রাণিমনের ক্ষেত্রেও প্রসারিত করা হয়েছে।

সবশেষে, জীবের আচরণ প্রত্যক্ষগোচর, সেহেতু মনোবিদ্যার আলোচ্য বিষয়বস্তু যে অতীন্দ্রিয় কোন বিষয় নয় এবং মনোবিদ্যার পক্ষে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মতো যে সার্বিক বা সাধারণ সূত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব—এই সজ্ঞায় তাও স্বীকার করা হয়েছে।

মনোবিদ্যার বিষয়বস্তু কোন অতীন্দ্রিয় বিষয় নয়

(জ) মনোবিদ্যা হল পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তির ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কীয় বিজ্ঞান (Psychology is the science of the activities of the individual in relation to his environment--Woodworth) :

নিম্নোক্ত কারণবশতঃ এই সংজ্ঞাটি সন্তোষজনক।

প্রথমতঃ, উডওয়ার্ড (Woodworth)-এর মতে মানুষের আচরণ পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত থাকার জন্য প্রকাশ পায়, সেজন্য সেই আচরণকে বুঝতে হলে পারিপার্শ্বিককে বুঝতে হবে। তিনি মানুষের ক্রিয়াকলাপ বা আচরণের সঙ্গে পারিপার্শ্বিককে যুক্ত করে মানুষের ক্রিয়াকলাপকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যার পথ নির্দেশ করেছেন।

উডওয়ার্থ মানুষের ক্রিয়াকলাপকে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সংযুক্ত করেছেন

দ্বিতীয়তঃ, এই সংজ্ঞা স্বীকার করে নেয় যে, মনোবিদ্যা বিষয়নিষ্ঠ বিজ্ঞান, আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান নয়, কোন আদর্শে আলোকে নয়, পারিপার্শ্বিকের প্রভাবযুক্ত মানুষের ক্রিয়াকলাপের যথাযথ ব্যাখ্যা করাই মনোবিদ্যার কাজ।

মনোবিদ্যা যে বিষয়নিষ্ঠ বিজ্ঞান তা স্বীকার করা হয়েছে

তৃতীয়তঃ, উডওয়ার্থ 'ব্যবহার' বা 'মন' শব্দটি প্রয়োগ না করে 'ক্রিয়াকলাপ' (activities) কথাটি প্রয়োগ করেছেন। 'ক্রিয়াকলাপ' কথাটিকে তিনি ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করেছেন ; 'ক্রিয়াকলাপ' কথাটির মাধ্যমে মনোবিদ্যা যে সকল প্রকার ক্রিয়াকলাপ, যেমন—জ্ঞানসম্পর্কীয় ক্রিয়াকলাপ, যথা—প্রত্যক্ষ, কল্পনা, চিন্তা ; আবেগ সম্পর্কীয় ক্রিয়াকলাপ, যথা—হাসা, কাঁদা ; গতি সম্পর্কীয় ক্রিয়াকলাপ (motor

activities), যথা—হাঁটা, কথা বলা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করে—এই সংজ্ঞায় তা স্বীকার করা হয়েছে। অনুভূতিও এক প্রকার ক্রিয়াকলাপ। উডওয়ার্থের মতে জীবনের যে কোন প্রকাশই তার ক্রিয়াকলাপের অন্তর্ভুক্ত।

চতুর্থতঃ, উডওয়ার্থ 'ব্যক্তি' (individual) কথাটি ব্যবহার করেছেন। কিন্তু 'ব্যক্তি' বলতে কি কেবল 'দেহযন্ত্র'টিকেই বুঝব? তাহলে অবশ্য এই সংজ্ঞাটি দোষ-দুষ্ট হয়ে পড়ে। ব্যক্তি বলতে, আচরণবাদীদের মতন তিনি মনকে বর্জন করেননি, অথবা কেবলমাত্র দেহযন্ত্রটিকেই বোঝেননি। 'ব্যক্তি' বলতে তিনি শুধু দেহকে না বুঝে, দেহ ও মনের সমন্বয়ে যে ব্যক্তি, তাকেই বুঝেছেন। ব্যক্তির মন তার দেহের মাধ্যমেই কাজ করে। ব্যক্তির আচরণ বা ব্যবহার তার দৈহিক ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। সুতরাং, একদিকে মানসিক প্রক্রিয়া ও অপরদিকে তার দৈহিক আচরণ—এই উভয়কেই স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এই সংজ্ঞায়।

'ব্যক্তি' বলতে দেহ ও মনের সমন্বয়ে যে ব্যক্তি তাকেই বোঝান হয়েছে

সর্বশেষে, 'পারিপার্শ্বিক' (environment) কথাটি নির্দেশ করে যে মানসিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে বহির্জগতের একটা সুস্পষ্ট সম্পর্ক আছে। প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং সামাজিক পরিবেশ উভয়ের প্রভাবই ব্যক্তির মনের ওপর ক্রিয়া করে।

মনোবিদ্যার সন্তোষজনক সংজ্ঞা ঃ

প্রশ্ন হল, মনোবিদ্যার পূর্বোক্ত সংজ্ঞাগুলির মধ্যে কোন্‌টি আমরা গ্রহণ করতে পারি? পূর্বোক্ত সংজ্ঞাগুলির প্রত্যেকটির কিছু না কিছু দোষ-ত্রুটি আছে সত্য, তাহলেও কোনটিই একেবারে ভ্রমাত্মক নয়। এক একটি সংজ্ঞা এক একটি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করার জন্য প্রত্যেকটি সংজ্ঞার মধ্যেই কিছু না কিছু সত্য নিহিত আছে। কিন্তু কোন সংজ্ঞাই পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা হয়ে ওঠেনি। পূর্বোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে এবং আধুনিক মনোবিদ্‌দের অভিমতের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে আমরা এইবার মনোবিদ্যার একটি পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা দেবার চেষ্টা করতে পারি। এই সংজ্ঞাটি হল, **"মনোবিদ্যা জীবের আচরণ সম্বন্ধীয় বিষয়নিষ্ঠ বিজ্ঞান যা জীবের আচরণের ভিত্তিতে মানসিক প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণ ও শ্রেণীবিভাগ করে, তাদের গতি-প্রকৃতি, নিয়ম, কারণ ও পরিণাম নির্ণয় ও ব্যাখ্যা করে এবং মানসিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত যে দেহগত প্রক্রিয়া সেগুলি বর্ণনা করে।"**

নিম্নোক্ত কারণে এই সংজ্ঞাটিকে মনোবিদ্যার একটি সন্তোষজনক সংজ্ঞারূপে গণ্য করা যেতে পারে ঃ

প্রথমতঃ, এই সংজ্ঞাতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, মনোবিদ্যা হল বিষয়নিষ্ঠ

বিজ্ঞান (positive science), আদর্শনিষ্ঠ (normative) নয় ; কেননা, মনোবিদ্যা কোন আদর্শের আলোকে তার আলোচ্য বিষয়বস্তুকে ব্যাখ্যা করে না।

দ্বিতীয়তঃ, আধুনিক মনোবিদ্‌দের অভিমতানুযায়ী মনোবিদ্যার আলোচ্য বিষয়বস্তু প্রত্যক্ষগোচর অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তব ঘটনা হওয়া উচিত এবং তা যেন পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের বিষয়বস্তু হতে পারে। আচরণ মনের বাহ্যপ্রকাশ এবং এই আচরণ পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের বিষয়বস্তু ও সবাব কাছে সমানভাবে প্রকাশমান। এই সংজ্ঞাতে মনোবিদ্যা জীবের আচরণ নিয়ে আলোচনা করে একথাও স্বীকাব করা হয়েছে।

তৃতীয়তঃ, এই সংজ্ঞায় 'আচবণ'কে আচরণবাদীরা (Behaviourists) যে অর্থে গ্রহণ করেছেন সেই অর্থে আচরণকে গ্রহণ করা হয়নি। আচরণের মাধ্যমে জীবের 'মন'কে জানাই যে মনোবিদ্যার লক্ষ্য এবং সেহেতু মানসিক প্রক্রিয়ার স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার করা যে মনোবিদ্যার কাজ, তাও এই সংজ্ঞায় স্পষ্ট করে উল্লেখ করা হয়েছে। চতুর্থতঃ, 'জীব' কথাটি বলতে এখানে 'পবিবেশের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত' যে জীব তাকেই বুঝতে হবে এবং 'আচরণ' বলতে পরিবেশ ও জীবেব পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে জীবের মধ্যে যে আচরণের উদ্ভব ঘটে তাকে বুঝতে হবে।

পঞ্চমতঃ, জীবের 'আচবণ' যে মনেবই প্রকাশ এই সংজ্ঞায় তাবও উল্লেখ আছে।

সর্বশেষে, মনোবিদ্যা যে 'দেহগত প্রক্রিয়া' নিয়ে আলোচনা করে এই সংজ্ঞাতে তারও উল্লেখ রয়েছে।

২। বিজ্ঞান হিসেবে মনোবিদ্যার বৈশিষ্ট্য (Nature of Psychology as a Science) :

বিজ্ঞান বলতে আমরা কি বুঝি ? বিজ্ঞান বলতে বুঝি প্রকৃতির কোন একটি বিশেষ বিভাগ সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান। প্রত্যেক বিজ্ঞান প্রকৃতির এক নির্দিষ্ট বিভাগ সম্পর্কে আমাদের সুনির্দিষ্ট, সুশৃঙ্খল, সুনিশ্চিত এবং নির্ভুল জ্ঞান দান করে। পর্যবেক্ষণে, পরীক্ষণ এবং আবোহ পদ্ধতির সহায়তায় বিজ্ঞান তার আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে কতকগুলি সাধাবণ সূত্র (general laws) আবিষ্কাব কবে এবং সেই নিয়মগুলির সাহায্যে আলোচ্য বিষয়গুলিকে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করে। আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতার দ্বারা যেভাবে বিষয়কে আমরা জানি বিজ্ঞান তাই নিয়ে আলোচনা করে, বস্তুর অভিজ্ঞতার অতিরিক্ত কোন স্বরূপ নিয়ে আলোচনা করে না।

বিজ্ঞান প্রকৃতির এক নির্দিষ্ট বিভাগ সম্পর্কে নির্দিষ্ট, সুশৃঙ্খল, নিশ্চিত, নির্ভুল জ্ঞান দান করে

বিজ্ঞানের পূর্বোক্ত বৈশিষ্ট্যের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে মনোবিদ্যাকে বিজ্ঞান-

রূপে গণ্য করার সুসঙ্গত কারণ আছে। প্রথমতঃ, প্রত্যেক বিজ্ঞানের একটা নির্দিষ্ট আলোচ্য বিষয়বস্তু থাকে। মনোবিদ্যারও একটি নির্দিষ্ট আলোচ্য বিষয়বস্তু আছে, তাহল মানসিক প্রক্রিয়া এবং তার বাহ্যপ্রকাশ অর্থাৎ জীবের আচরণ। প্রত্যেক বিজ্ঞানের একটা নির্দিষ্ট অনুসন্ধান পদ্ধতি থাকে। মনোবিদ্যাও অন্তর্দর্শন এবং পর্যবেক্ষণ (observation), পরীক্ষণ (experiment) এবং আরোহ অনুমানের (induction) সহায়তা গ্রহণ করে।

মনোবিদ্যাকে বিজ্ঞান-রূপে গণ্য করার স্বপক্ষে যুক্তি

দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যেক বিজ্ঞান নিজের বিষয়বস্তু সম্পর্কে কতকগুলি সাধারণ নিয়ম আবিষ্কার করে। মনোবিদ্যাও মন সম্বন্ধীয় সাধারণ সূত্র আবিষ্কার করে এবং এই সূত্রগুলির সাহায্যে মানসিক প্রক্রিয়াগুলিকে ব্যাখ্যা করে।

যদিও মনোবিদ্যা বিজ্ঞান, তবু বিজ্ঞান হিসেবে মনোবিদ্যার এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে যা মনোবিদ্যাকে অন্যান্য বিজ্ঞান থেকে পৃথক করে। যেমন—

(ক) মনোবিদ্যা হল মানসিক বিজ্ঞান (mental science); জীববিজ্ঞান (biological science) বা জড়বিজ্ঞান (material science) নয়। বিজ্ঞানকে সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। কতকগুলি বিজ্ঞান জড় (Matter) নিয়ে আলোচনা করে, তাদের বলা হয় জড়-বিজ্ঞান; যেমন—পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র ইত্যাদি। কতকগুলি বিজ্ঞান প্রাণ (Life) নিয়ে আলোচনা করে, তাদের বলা হয় জীববিজ্ঞান, যেমন—প্রাণিবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা ইত্যাদি। কতকগুলি বিজ্ঞান 'মন' (Mind) এবং মনের প্রকাশ নিয়ে আলোচনা করে, তাদের বলা হয় মানসিক বিজ্ঞান, যেমন—মনোবিদ্যা, সমাজবিদ্যা, নীতিবিদ্যা প্রভৃতি।

মনোবিদ্যা মানসিক বিজ্ঞান

মানুষ এবং উচ্চতর প্রাণী জড়, প্রাণ ও মনের সমন্বয়ে এক অপূর্ব সংগঠন। যদিও মনোবিদ্যা প্রাণীর আচরণ ও দেহগত প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করে তবু আসলে মন এবং মনের প্রকাশই মনোবিদ্যার আলোচ্য বিষয়বস্তু, সেহেতু মনোবিদ্যা মানসিক বিজ্ঞান।

(খ) মনোবিদ্যা বিষয়নিষ্ঠ বিজ্ঞান (positive science), আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান (normative science) নয়। আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান কোন একটি আদর্শের আলোকে বিষয়বস্তুর মূল্য বিচার করে; যেমন—নীতিবিদ্যা। নীতিবিদ্যা কোন একটি নৈতিক আদর্শের মাপকাঠিতে মানুষের আচরণ ভাল কি মন্দ বিচার করে। যে বিজ্ঞানে বস্তুর উৎপত্তি, বিকাশ ও যথাযথ স্বরূপের বর্ণনা দেওয়া হয় তাকেই বিষয়নিষ্ঠ বিজ্ঞান (positive science) বলা হয়; যেমন—পদার্থবিদ্যা।

মনোবিদ্যা, চিন্তা অনুভূতি ও ইচ্ছা—এই মানসিক প্রক্রিয়াগুলি বাস্তবে যেভাবে ঘটে, তা নিয়েই আলোচনা করে, এগুলি কিরকম হওয়া উচিত তা আলোচনা করে না, অর্থাৎ কোন আদর্শের আলোকে মানসিক প্রক্রিয়াগুলির মূল্য বিচার করে না। এজন্যই মনোবিদ্যা বিষয়নিষ্ঠ বিজ্ঞান।

(গ) মনোবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্তিকেন্দ্রিক (individualistic), প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মতো নিছক বস্তুনিষ্ঠ (objective) দৃষ্টিভঙ্গি নয়। বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিজ্ঞান যখন কোন বিষয়বস্তু আলোচনা করে, তখন সে আলোচনার বিষয়টি ব্যক্তি-মনে কিভাবে অনুভূতি ও ইচ্ছার সৃষ্টি করে তার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয়। কিন্তু মনোবিদ্ যখন জীবের ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করে, তখন তাকে মনের বাহ্যপ্রকাশ বলেই মনে করে, অর্থাৎ তাঁকে মানসিক ঘটনা মনে করেই আলোচনা করে। কিন্তু মনোবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্তিকেন্দ্রিক হলেও সকল ব্যক্তি-মনের কতকগুলি সাধারণ ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য আছে; সেহেতু ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও মনোবিদ্যার পক্ষেই 'মন' সম্পর্কে সাধারণ সূত্র আবিষ্কার করা সম্ভব।

মনোবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্তিকেন্দ্রিক

(ঘ) যে পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করে মনোবিদ্যা তার বিষয়বস্তু আলোচনা করে মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে সে পদ্ধতিরও বৈশিষ্ট্য বর্তমান। অন্যান্য বিজ্ঞান, পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ অর্থাৎ বস্তুনিষ্ঠ বা বিষয়গত পদ্ধতির (objective method) অনুসরণ করে। কিন্তু মনোবিদ্যা বিষয়গত পদ্ধতি ছাড়াও অন্তর্দর্শনের বা ব্যক্তিনিষ্ঠ পদ্ধতির (subjective method) আশ্রয় গ্রহণ করে। অন্তর্দর্শন ছাড়া নিজের মানসিক প্রক্রিয়ার স্বরূপ জানা যায় না এবং নিজের মনের স্বরূপ আগে থেকে জানা না থাকলে অপরের মনের খবর জানা সম্ভব নয়।

মনোবিদ্যা পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ ছাড়াও অন্তর্দর্শনের সহায়তা গ্রহণ করে

(ঙ) মনোবিদ্যার আর একটি বৈশিষ্ট্য হল, অন্যান্য বিজ্ঞানের তুলনায় দর্শনের সঙ্গেই এর সম্পর্ক খুব গভীর। জ্ঞানের উৎপত্তি ও স্বরূপ এবং মনের স্বরূপ, দর্শনের অন্যতম প্রধান আলোচ্য বিষয় এবং এগুলি মনোবিদ্যারও আলোচ্য বিষয়। এজন্য দর্শনের অন্যান্য শাখা—নীতিবিদ্যা, সৌন্দর্যবিদ্যা, সমাজদর্শন প্রভৃতির সঙ্গেও মনোবিদ্যার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান।

দর্শনের সঙ্গে মনোবিদ্যার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক

৩। মনোবিদ্যা কি প্রাকৃতিক বিজ্ঞান? (Is Psychology a Natural Science?):

পূর্বে মনোবিদ্যাকে দর্শন বা অধিবিদ্যার শাখারূপে গণ্য করা হত এবং মনোবিদ্যার

সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হত মনোবিদ্যা 'আত্মা সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান'। কিন্তু আধুনিক অনেক মনোবিদ্ আত্মাকে মনোবিদ্যার পরিসর থেকে নির্বাসিত করে মনোবিদ্যাকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান (natural science) রূপে গণ্য করার পক্ষপাতি এবং তাঁদের মতে মনোবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র এবং জ্যোতির্বিদ্যাব সমস্থানীয় একটি প্রাকৃতিক বিজ্ঞান।

অনেকের মতে মনোবিদ্যা হল প্রাকৃতিক বিজ্ঞান

মনোবিদ্যাকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানরূপে গণ্য করা যেতে পারে কিনা, তা বিচার করতে হলে, সর্বপ্রথম প্রাকৃতিক বিজ্ঞানেব বৈশিষ্টাগুলি জানা প্রয়োজন। প্রথমতঃ, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান তাব আলোচ্য বিষয়বস্তু হিসেবে প্রকৃতির একটা বিশেষ অংশকে নির্বাচন করে নেয়। দ্বিতীয়তঃ, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সকল প্রকাব অপ্রাকৃত বিষয়বস্তু বা অলৌকিকতা বর্জন করে প্রাকৃতিক নিয়মেব সাহায্যে তাব আলোচ্য বিষয়বস্তুকে ব্যাখ্যা করে। তৃতীয়তঃ, এই উদ্দেশ্যে প্রকৃতির একরূপতা (Uniformity of Nature) এবং কার্যকারণ নিয়ম (Law of Causation)—এই দুই প্রাকৃতিক নিয়মের সাহায্যে এইসব প্রাকৃতিক ঘটনাব অন্তরালে যেসব নিয়ম বা সূত্র আছে সেগুলি আবিষ্কার করে ও ব্যাখ্যা কবে এবং এই উদ্দেশ্যে পর্যবেক্ষণ, পবীক্ষণ, সংশ্লেষণ, বিশ্লেষণ প্রভৃতি পদ্ধতিগুলি প্রয়োগ করে।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানেব বৈশিষ্ট্য

অনেক আধুনিক মনোবিদেব মতে মনোবিদ্যারও পূর্বোক্ত বৈশিষ্ট্য বর্তমান, সেহেতু মনোবিদ্যাকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানরূপে গণ্য করা যেতে পারে। মনোবিদ্যারও একটি নির্দিষ্ট আলোচ্য বিষয়বস্তু আছে, তাহল 'মন'। মনোবিদ্যাও মানসিক নিয়মের (mental laws) সাহায্যে মনের ব্যাখ্যা করে। তাছাড়া, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানগুলি যেভাবে প্রকৃতির একরূপতা এবং কার্যকারণ নিয়মেব ভিত্তিতে পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ, সংশ্লেষণ, পদ্ধতি প্রভৃতি প্রয়োগ করে নিজ নিজ ক্ষেত্রে সাধারণ নিয়মগুলি প্রতিষ্ঠা করে, মনোবিদ্যাও মানসিক ঘটনা সম্বন্ধীয় সাধারণ নিয়মগুলি অনুরূপভাবে প্রতিষ্ঠা করে। সুতবাং, মনোবিদ্যা হল প্রাকৃতিক বিজ্ঞান।

মনোবিদ্যাকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানরূপে গ্রহণ কবাব পক্ষে যুক্তি

কিন্তু মনোবিদ্যাকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানরূপে গণ্য করার বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত অভিযোগগুলি উত্থাপিত হতে পারে। যথা—

প্রথমতঃ, 'প্রাকৃতিক' কথাটিকে সাধারণতঃ আমরা 'জড়' বা 'ভৌতিক' (physical or material) অর্থে বুঝে থাকি, কিন্তু মনের ক্ষেত্রেই যদি এই 'প্রাকৃতিক' কথাটি প্রয়োগ করা হয় তাহলে 'জড' ও 'মনের' কোন পার্থক্য থাকে না। কিন্তু

কেবলমাত্র মনের ক্ষেত্রে 'প্রাকৃতিক' শব্দটি ব্যবহারের দ্বারাই জড় ও মনের যে স্বরূপগত বৈশিষ্ট্য তা দূর করা সম্ভব নয়। চেতনা, অনুভূতি প্রভৃতি মানসিক প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্যগুলি জড়ের ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। দ্বিতীয়তঃ, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান অন্তর্দর্শনের (introspection) সহায়তা গ্রহণ করে না, কিন্তু অন্তর্দর্শন হল মনোবিদ্যার নিজস্ব পদ্ধতি যার জন্য প্রাকৃতিক বিজ্ঞানগুলির সঙ্গে তার প্রভেদ। তৃতীয়তঃ, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় ব্যক্তি-মন-নিরপেক্ষ, কিন্তু মনোবিদ্যার আলোচ্য বিষয় ব্যক্তি-মনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। চতুর্থতঃ, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান যান্ত্রিক কার্যকারণ সম্পর্কের (mechanical causation) সাহায্যে ঘটনাকে ব্যাখ্যা করে। কিন্তু ম্যাকডুগাল (McDougall) প্রমুখ মনোবিদ্দের মতে মনোবিদ্যা উদ্দেশ্যমূলক বা পরিণতিমূলক কার্যকারণ (teleological causation) সম্পর্কের দ্বারা মানসিক ঘটনার ব্যাখ্যা করে।

যদিও পূর্বোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে মনোবিদ্যাকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বলা চলে না, তবুও জড়বাদী এবং আচরণবাদীদের মতে মনোবিদ্যা হল প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, কারণ, তাঁরা মনের কোন সত্তা স্বীকার করেন না;—আচরণবাদীরা যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করে দেহগত প্রক্রিয়াকেই মনোবিদ্যার আলোচ্য বিষয়বস্তু মনে করেন। কিন্তু মন বা চেতনাকে বাদ দিয়ে দেহগত প্রক্রিয়ার কোন আলোচনা চলে না।

জড়বাদী এবং আচরণবাদীদের মতে মনোবিদ্যা হল প্রাকৃতিক বিজ্ঞান

তাহলে মনোবিদ্যাকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বলা যেতে পারে না এবং একান্তই যদি প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বলতে হয় তাহলে 'প্রাকৃতিক' কথাটিকে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করে তার মধ্যে জড়, প্রাণ ও মন সব কিছুকেই অন্তর্ভুক্ত করে নিতে হয় এবং মানসিক ঘটনার ব্যাখ্যায় উদ্দেশ্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গিকে স্বীকার করে নিতে হয়।

সাধারণ অর্থে মনোবিদ্যাকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বলা চলে না

প্রশ্ন হল, মনোবিদ্যাকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বলতেই হবে এমন কি কথা আছে? প্রাকৃতিক বিজ্ঞানরূপে অভিহিত হতে না পারলে যেন মনোবিদ্যার বিজ্ঞান হিসেবে কোন মর্যাদা থাকছে না—এভাবে চিন্তা করারই বা প্রয়োজন কি? মনোবিদ্যা প্রাকৃতিক বিজ্ঞান না হলেও, বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের তিনটি প্রশস্ত শ্রেণীবিভাগ আছে—প্রাকৃতিক (natural), জীববিদ্যা সম্পর্কীয় (biological) এবং মানসিক বা মনোকেন্দ্রিক (mental)। জড় এবং মনের পার্থক্যকে জোর করে দূর করা চলে

মনোবিদ্যা প্রাকৃতিক বিজ্ঞান না হলেও, বিজ্ঞান। মনোবিদ্যা মানসিক বিজ্ঞান

না। মনোবিদ্যা মানসিক বিজ্ঞানগুলির মধ্যে একটি বিশেষ ধরনের বিজ্ঞান, একথা বলাই যুক্তিসঙ্গত।

৪। মনোবিদ্যার পরিসর (The Scope of Psychology) ঃ

মনোবিদ্যার 'পরিসর' বা পরিধি বলতে বোঝায় মনোবিদ্যার আলোচনা ক্ষেত্রের ব্যাপকতা বা বিস্তৃতি। মন সম্পর্কে সুষ্ঠু বৈজ্ঞানিক আলোচনা হল মনোবিদ্যা। কাজেই যতদূর পর্যন্ত মনের বিস্তৃতি, মনোবিদ্যার আলোচনা ক্ষেত্রের বিস্তৃতিও ততদূর।

বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়ার আলোচনা মনোবিদ্যার পরিসরভুক্ত

মানসিক অবস্থার আলোচনাই মনোবিদ্যার প্রধান কাজ। সেহেতু চিন্তন, সংবেদন, প্রত্যক্ষণ, স্মৃতি, কল্পনা, সামান্য ধারণা গঠন, অবধারণ প্রক্রিয়া, প্রতিরূপ, অনুভূতি, প্রক্ষোভ, রস, ঐচ্ছিক ক্রিয়া, অভ্যাস, অনৈচ্ছিক ক্রিয়া, যেমন স্বতঃসঞ্জাত ক্রিয়া, প্রতিবর্ত ক্রিয়া, সাহজিক ক্রিয়া, ভাবজ ক্রিয়া প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা মনোবিদ্যার পরিসরভুক্ত। ব্যক্তিত্ব, ব্যক্তিগত পার্থক্যের পরীক্ষা ও পরিমাপ, বংশানুগতি ও পরিবেশ, বুদ্ধি, শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনাও মনোবিদ্যার পরিসরভুক্ত।

অন্তর্দর্শন ও পর্যবেক্ষণ-লব্ধ সব মানসিক প্রক্রিয়ার আলোচনা মনোবিদ্যার পরিসরভুক্ত

অন্তর্দর্শনের সাহায্যে প্রত্যক্ষভাবে নিজের মনের ক্রিয়া-প্রক্রিয়া সম্পর্কে যে জ্ঞানলাভ করা যায়, সেগুলি ছাড়াও পরোক্ষভাবে দৈহিক বহিঃপ্রকাশ পর্যবেক্ষণ করে অপরের মানসিক প্রক্রিয়াগুলি সম্পর্কে যে জ্ঞান লাভ করা যায়, উভয়ই মনোবিদ্যার পরিসরভুক্ত।

মনের সর্বস্তরের আলোচনা মনোবিদ্যার পরিসরভুক্ত

পরিণত ব্যক্তির মনের আলোচনাই মনোবিদ্যার প্রধান বিষয়, কিন্তু পরিণত মনের আলোচনা করতে গেলে শিশুর অপরিণত মন ক্রমশঃ বিকাশপ্রাপ্ত হয়ে কিভাবে পরিণত মনের স্তরে উন্নীত হয়েছে তা জানা প্রয়োজন। আবার মানুষ যেহেতু দেহ-বিশিষ্ট প্রাণী, সেহেতু মনুষ্যেতর প্রাণীর সঙ্গে তার আচরণের নানা সাদৃশ্য আছে। কাজেই মানুষের মনের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে গেলে মনুষ্যেতর প্রাণীর মনের খবরও জানা প্রয়োজন। সুতরাং, শিশুমন ও মনুষ্যেতর প্রাণিমনের আলোচনাও মনোবিদ্যায় পরিসরভুক্ত। মনের সর্বস্তরের আলোচনা মনোবিদ্যার পরিসরভুক্ত। কেবলমাত্র চেতনমনের আলোচনা নয়, অবচেতন (sub-conscious) ও নির্জ্ঞান (unconscious) মনের আলোচনাও মনোবিদ্যার পরিসরের অন্তর্ভুক্ত।

আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, সমস্ত আচরণই একাধারে শারীরিক

প্রক্রিয়া। এই কারণে শরীর বিজ্ঞানের নানা বিষয় মনোবিদ্যায় আলোচিত হয়। শারীরবৃত্তীয় মনোবিদ্যা (Physiological Psychology) মনোবিদ্যার একটি বিশেষ শাখা। এই বিদ্যায় মনের সঙ্গে শরীরের সম্পর্ক আলোচিত হয়।

আবার ব্যষ্টিমন (individual mind) ছাড়াও গোষ্ঠীমন বা সমষ্টি মন (collective mind) বা সমাজ-মনের আলোচনাও মনোবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য সমাজস্থ ব্যক্তি-মনের অতিরিক্ত কোন সমাজ-মনের অস্তিত্বকে স্বীকার করা চলে না। বিভিন্ন মনের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমেই এই সমাজ মনকে জানা যায়। ভাষা, ধর্ম, আচার, ব্যবহার, রীতিনীতি, আইন-কানুন, সঙ্গীত, নৃত্য, ভাস্কর্য প্রভৃতির মাধ্যমেই এই সমাজ-মনের প্রকাশ। সমাজ-মনোবিদ্যা (Social-Psychology)—এই সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করে।

সমাজ-মনের আলোচনা মনোবিদ্যার পরিসরভুক্ত

মনোবিদ্যার অনুসন্ধানক্ষেত্র আরও অধিক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। মনোবিদ্যাকে স্বাভাবিক মনের (normal mind) বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা ছাড়াও অস্বভাবী মনের (abnormal mind) বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে হয়। এছাড়াও বিভিন্ন প্রকার মানসিক রোগ, যেমন—উন্মত্ততা, বাতিক-গ্রস্ততা (mania), বিষাদ রোগ (melancholia), চিত্তোন্মাদতা (hypochendria), বাক্‌শক্তিহীনতা (aphasia), স্মৃতিভ্রংশতা (amnesia), স্বপ্ন (dream), অধ্যাস (illusion), অমূল প্রত্যক্ষণ (hallucination) প্রভৃতি অস্বভাবী মানসিক অবস্থার আলোচনা মনোবিদ্যার পরিসরভুক্ত।

অস্বভাবী মনের আলোচনা মনোবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত

আবার ব্যক্তি-মনের ক্ষেত্রে যেমন অস্বাভাবিকতা বা বিকার দেখা যায়, সমাজ মনের ক্ষেত্রেও অনুরূপ অস্বাভাবিকতা বা বিকার দেখা যায়। ভ্রান্ত বিশ্বাস, আকস্মিক অহেতুক ভীতি, উদ্ভট খেয়াল প্রভৃতি যেগুলি সমাজ-জীবনে মাঝে মাঝে দেখা দেয় সেগুলির মাধ্যমে সমাজ-মনের এই অস্বাভাবিকতাকে পর্যবেক্ষণ করা যায়।

সমাজ-মনের অস্বাভাবিকতা মনোবিদ্যার পরিসরভুক্ত

মনোবিদ্যার পরিসর দিন দিন এতই বিস্তৃত হচ্ছে যে, মনোবিদ্যার নতুন নতুন শাখার উদ্ভব হচ্ছে,—প্রাণি-মনোবিদ্যা, সমাজ-মনোবিদ্যা, অস্বভাবী মনোবিদ্যা, শিশু-মনোবিদ্যা, শিক্ষা-মনোবিদ্যা, শিল্প-সম্বন্ধীয় মনোবিদ্যা, পেশা-মনোবিদ্যা ইত্যাদি। শিক্ষার ক্ষেত্রে মনোবিদ্যার নীতিগুলির বা সূত্রগুলির ব্যবহারিক প্রয়োগ এই মনোবিদ্যার কাজ। শিল্প-সম্বন্ধীয় মনোবিদ্যা শিল্পের ক্ষেত্রে মনোবিদ্যার সূত্রগুলিকে প্রয়োগ

করে। আবার মনোবিদ্যার এই সব বিভিন্ন শাখার উপশাখা বর্তমান; যেমন—সমাজ-মনোবিদ্যার উপশাখা হল জনতা-মনোবিদ্যা (Psychology of the crowd), জাতি-মনোবিদ্যা (Psychology of the race), রীতি-সম্বন্ধীয় মনোবিদ্যা (Psychology of the customs)। অস্বভাবী মনোবিদ্যারও একটা তাত্ত্বিক দিক এবং একটা প্রয়োগের দিক আছে। মনোরোগবিদ্যা (psychiatry) ও চিকিৎসা সম্পর্কীয় মনোবিদ্যা (medical psychology) অস্বভাবী মনোবিদ্যার দুটি উপশাখা।

মনোবিদ্যার বিভিন্ন শাখা মনোবিদ্যার পরিসরের ব্যাপকতা সূচিত করে

উপসংহারে একথা বলা যেতে পারে যে, মনোবিদ্যার পরিসর অত্যন্ত ব্যাপক। যা মনের সঙ্গে যুক্ত, যা মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করে অথবা যার ওপর মন প্রভাব বিস্তার করে তাই মনোবিদ্যার পরিসরভুক্ত। এক হিসেবে সমস্ত জগতটাই মনোবিদ্যার পরিসরের অন্তর্ভুক্ত। এই জগতের যে কোন বস্তুই যখন কোন-না-কোন মনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়ে পড়ে তখন সেটি সেই হিসেবে মনোবিদ্যার আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়।

মনোবিদ্যার পরিসর খুবই ব্যাপক

Questions

1. Examine the following difinitions of Psychology
   (a) Psychology is the science of soul.
   (b) Psychology is the sciecce of mind.
   (c) Psychology is the science of consciousness.
   (d) Psychology is the science of behaviour.

2. Critically consider McDougall's definition of Psychology as "the positive-science of the behaviour of living things."

3. Discuss the different definitions of Psychology and indicate your own preference.

4. How would you define Psychology ? State and explain the scope of Psychology

5. Explain the nature of Psychology as a science. Is Psychology a Natural Science.

6. Define the meaning and scope of Psychology.

7. State and examine the definition of Psychology which in your opinion is the most satisfactory.

8. Indicate briefly the scope of Psychology. Would you regard Psychology as a natural science ?

চতুর্থ অধ্যায়
মনোবিদ্যার শাখা
(Branches of Psychology)

১। মনোবিদ্যার শাখা (Branches of Psychology) :

হফডিং (Hoffding) বলেন, 'মনোবিদ্যা একটি মাত্র নয়, অনেক রকমের মনোবিদ্যা আছে।' প্রশ্ন হল, সত্যই কি মনোবিদ্যার সংখ্যা একাধিক? এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে, মনোবিদ্যার আলোচনার পরিধির দিক থেকে এবং মনোবিদ্যার আলোচনার পদ্ধতির দিক থেকে একাধিক মনোবিদ্যার কথা বলা হয়েছে। আমরা এই বিভিন্ন ধরনের মনোবিদ্যাকে মনোবিদ্যার বিভিন্ন শাখারূপে উল্লেখ করব।

মনোবিদ্যার বিভিন্ন শাখা

(ক) শিশু মনোবিদ্যা (Child Psychology) : মনোবিদ্যার যে শাখা শিশুমন নিয়ে আলোচনা করে তাকে শিশু-মনোবিদ্যা বলে। জন্ম থেকে কৈশোর পর্যন্ত শিশুমনের ক্রমবিকাশ, তার জন্ম, প্রবৃত্তি, তার বুদ্ধি, শিক্ষা প্রভৃতি শিশু-মনোবিদ্যা আলোচনা করে এবং শিশুর বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়ার ক্রমবিকাশ ও বুদ্ধির ব্যাপারে বংশগতি ও পারিপার্শ্বিক কিভাবে সহায়তা করে তা নিয়েও আলোচনা করে। শিশুর কল্পনা, অনুভূতি, আবেগ, বিশ্বাস প্রভৃতি প্রক্রিয়ার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে এবং পরিণত বয়স্ক মনের অনুরূপ মানসিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে তার উল্লেখযোগ্য পার্থক্য আছে; সুতরাং এগুলির বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা শিশুমনোবিদ্যার কাজ। শিশুর মনের ওপর সামাজিক ও পারিবারিক পরিবেশ কিভাবে কার্য করে, শিশুর সহজাত প্রবৃত্তি অভিজ্ঞতার দ্বারা কিভাবে পরিবর্তিত হয়, শিশুর জীবনে বুদ্ধির বিকাশ কিভাবে ঘটে, শিশু কিভাবে শিক্ষালাভ করে, প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধন দ্বারা (learning by trial and error), অনুকরণ বা অন্তর্দৃষ্টি, কিসের সাহায্যে শিক্ষালাভ করে এবং শিশুর শিক্ষা কোন্ পথে চালিত হওয়া প্রয়োজন, শিশুর আচরণের ক্রমবিকাশ ও তার বিভিন্ন পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য—এই সব বিষয় শিশু মনোবিদ্যার আলোচ্য বিষয়।

শিশু-মনই শিশু-মনোবিদ্যার আলোচ্য বিষয়

এ ছাড়াও, শিশুমনের সঙ্গে পরিণতবয়স্ক মনের পার্থক্য ও তুলনামূলক আলোচনা, শিশুর মানসিক সুস্থতা কিভাবে রক্ষা করা যায় এবং এ ব্যাপারে কি রকম পরিবেশ উপযোগী, অস্বভাবী শিশু, অপরাধপ্রবণ শিশু, অল্পবুদ্ধি বা নির্বুদ্ধি শিশু, তাদের কিভাবে স্বাভাবিক পথে আনা যায়—এ জাতীয় সমস্যাও শিশু-মনোবিদ্যার আলোচ্য বিষয়।

শিশুর মানসিক সুস্থতা রক্ষার সমস্যা

যেহেতু শিশু অন্তর্দর্শন করতে পারে না সেহেতু পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ ও খোলাখুলি কথাবার্তার মাধ্যমে প্রধানতঃ শিশুমনকে জানবার চেষ্টা করা হয়। শিশুমনকে জানবার জন্য শিশু-মনোবিদ্যায় নানা ধরনের পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। অভিক্ষেপ পদ্ধতি (projective test) প্রয়োগ করে শিশুর দক্ষতা, নৈপুণ্য, আগ্রহ প্রভৃতি সম্পর্কে অনেক বিষয় জানা যায়। ক্রমবিকাশ ইতিহাস সংগ্রহ পদ্ধতি ও চিকিৎসামূলক পদ্ধতি প্রয়োগ করেও শিশুমন সম্পর্কে অনেক মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করা হয়। মনোসমীক্ষকরা শিশুর বিশ্বাস অর্জন করার পর খোলাখুলি কথাবার্তার মাধ্যমে এবং সংবেশন বা কৃত্রিম উপায়জনিত নিদ্রাচ্ছন্ন অবস্থার (hypnosis) সাহায্যে শিশুমনের অবদমিত ইচ্ছা ও আবেগগুলির স্বরূপ উদ্ঘাটনের জন্য সচেষ্ট হন।

শিশু মনকে জানবার উপায়

শিশু-মনোবিদ্যার গুরুত্ব এই যে, পরিণত মনের জ্ঞান লাভ করতে হলে শিশুমনের জ্ঞান লাভ করা আবশ্যক, শিশুর মনই ক্রমবিকাশের ফলে পরিণত মনের পর্যায়ে উন্নীত হয়।

শিশু-মনোবিদ্যায় যেসব মনোবিজ্ঞানীদের বিশেষ অবদান আছে তাঁদের মধ্যে প্রেয়ার (W.T. Preyer), স্ট্যানলি হল্ (G. Stanley Hall), সালি (Sully), কার্ল গ্রুজ (Karl Groos), বিনে (Binnet), ওয়াটসন (Watson), জাঁ পিয়াজে (Jean Piaget), সিগমুণ্ড ফ্রয়েড (Sigmund Freud) প্রমুখ মনোবিদদের নাম উল্লেখযোগ্য। বিনে কতকগুলি বুদ্ধি-অভীক্ষার (test) উদ্ভাবন করেন যার দ্বারা শিশুর বুদ্ধির বিকাশ নিরূপণ করা যায়। ফ্রয়েড প্রমাণ করেছেন যে, শিশুর শৈশবের অভিজ্ঞতা তার ভবিষ্যৎ ব্যক্তিত্ব নিয়ন্ত্রণ করে। জাঁ পিয়াজে দেখিয়েছেন দুই থেকে চোদ্দ বৎসরের শিশুর মধ্যে পারিপার্শ্বিক জগতের ধারণা কিভাবে গড়ে ওঠে।

শিশু-মনোবিদ্যায় কয়েকজন শিশু-মনোবিজ্ঞানীর নাম

(খ) পরীক্ষণমূলক মনোবিদ্যা (Experimental Psychology) :

এ হল মনোবিদ্যার সেই শাখা যা পরীক্ষামূলক পদ্ধতির সহায়তায় প্রাণী, শিশু, তরুণ, পরিণতবয়স্ক, বৃদ্ধ ও অস্বভাবী ব্যক্তিদের মানসিক প্রক্রিয়াগুলি অনুসন্ধান করে। অবশ্য বর্তমান যুগে মনোবিদ্যার সব শাখাকেই পরীক্ষণের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। তবু পরীক্ষণমূলক মনোবিদ্যাকে মনোবিদ্যার একটি পৃথক শাখারূপে গণ্য করা হয় এই কারণে যে, এই শাখার প্রধান লক্ষ্য প্রাণি আচরণের মৌলিক প্রেরণাগুলিকে জানা ও তাদের শর্ত ও নিয়ম নির্ণয় করা। এ ছাড়াও বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা এবং সেগুলির কারণ নির্ধারণ করাও এই শাখার কাজ। পরীক্ষণমূলক মনোবিদ্যা

পরীক্ষণমূলক মনোবিদ্যার বৈশিষ্ট্য

চেতনার গুণগত বিশ্লেষণ করে, মানসিক প্রক্রিয়া ও তার আনুষঙ্গিক দেহগত প্রক্রিয়া এবং প্রাকৃতিক উদ্দীপকের মধ্যে যে পরিমাণগত সম্পর্ক তাও নির্ধারণ করে। মনো-বিজ্ঞানে পরীক্ষণমূলক পদ্ধতির প্রয়োগে যেসব বিষয় আবিষ্কৃত হয়েছে তার মধ্যে 'হ্বেবার-ফেক্‌নার সূত্র' অর্থাৎ উদ্দীপকের হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে সংবেদনের তীব্রতার হ্রাস-বৃদ্ধির সম্পর্ক-বিষয়ক সূত্র, লোটজার ত্বকজাত সংবেদন সম্পর্কে স্থানীয় বৈশিষ্ট্য সম্পর্কীয় মতবাদ, হেলম্‌হোলৎস (*Helmsholtz*)-এর শ্রবণ-সম্বন্ধীয় মতবাদ, লিওনার্দো হেরিং (*Leonardo-Hering*)-এর দৃষ্টিগত সংবেদন সম্পর্কীয় মতবাদ, ক্যাটেল-এর প্রতিক্রিয়াকাল সম্বন্ধে পরীক্ষণ, মুয়েলার-এর স্নায়ুর বিশেষ ধরনের উদ্দীপনা পরিবহণ সম্পর্কীয় মতবাদ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

মনোবিদ হ্বেবার (*Weber*), ফেক্‌নার (*Facthner*), মুয়েলার (*Muller*), হ্বুণ্ড (*Wundt*), ক্যাটেল (*Cattcl*), টিচনার (*Titchener*), কুল্পে (*Kulpe*) প্রমুখ মনোবিদ্‌দেব নাম পরীক্ষণমূলক মনোবিদ্যার সঙ্গে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট।

তবে পরীক্ষণমূলক মনোবিদ্যার বর্তমান অবস্থা ও উন্নতির মূলে রয়েছে মনো-বিজ্ঞানী হ্বুণ্ড (*Wundt*)-এর মতে সংগঠনমূলক অবদান। মনোবিজ্ঞানের পরীক্ষাব জন্য জার্মানীর লাইপজিগ বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৮৭৯ সালে তিনি সক্রিয় পরীক্ষণাগাব প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তাঁর পরীক্ষণাগারই অনেক মনোবিজ্ঞানীকে গবেষণায় উৎসাহ দান করেছে। এই প্রসঙ্গে ক্যাটেলেব প্রতিক্রিয়াকাল সম্পর্কীয় গবেষণা, টিচনার এবং কুল্পের প্রতিরূপবর্জিত চিন্তা (imageless thought) সম্পর্কীয় গবেষণার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। হ্বুণ্ড পরীক্ষণাগারটি প্রতিষ্ঠা করাব পর পরীক্ষণমূলক পদ্ধতির প্রয়োগের কাজ বিশেষভাবে চলতে থাকে। এই সব কারণেই হ্বুণ্ডকে পরীক্ষণমূলক মনোবিদ্যার প্রতিষ্ঠাতা আখ্যা দেওয়া হয়।

(গ) শারীরবৃত্তীয় মনোবিদ্যা (Physiological Psychology): শারীর-বৃত্তীয় মনোবিদ্যা মানসিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত দেহগত প্রক্রিয়া বা দেহের বিভিন্ন অংশেব গঠন ও কার্যকলাপ নিয়ে আলোচনা করে। মনের সঙ্গে শরীরেব যে অংশের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সেটি হল কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র, যার প্রধান অঙ্গ হল মস্তিষ্ক, সুষুম্নাকাণ্ড এবং স্নায়ুমণ্ডলী (nerves); সুতরাং, এই সকলের গঠন এবং ক্রিয়া নিয়ে শারীরবৃত্তীয় মনোবিদ্যা আলোচনা কবে। আমরা যাকে প্রতিক্রিয়াজনক বা প্রতিবর্ত ক্রিয়া (reflex action) বলি, সুষুম্নাকাণ্ড তার কেন্দ্রস্থল। বিভিন্নধরনেব সংবেদন ইন্দ্রিয়গুলির উদ্দীপনের

স্নায়ুতন্ত্র, বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের গঠন ও কার্য-কলাপ, পেশী, অনালী গ্রন্থি প্রভৃতি শারীব-বৃত্তীয় মনোবিদ্যার আলোচ্য বিষয়

ওপর নির্ভরশীল, সুতরাং ইন্দ্রিয়গুলির গঠন ও কার্যকলাপ শারীরবৃত্তীয় মনোবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত। মন পেশীসমূহের মাধ্যমে বাইরের জগতের বস্তুর ওপর ক্রিয়া করে, সুতরাং পেশীসমূহের শ্রেণীবিভাগ ও কার্যকলাপ শারীরবৃত্তীয় মনোবিদ্যার আলোচ্য বিষয়। পেশীগুলির কাজ বাইরের থেকে প্রত্যক্ষ করা যায়; কিন্তু দেহের অভ্যন্তরে কতকগুলি অনালী গ্রন্থি (ductless glands) আছে যেগুলির কাজ বাইরে থেকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। এগুলি রক্তস্রোতে, পাকস্থলীতে বা অন্যান্য স্থানে রসক্ষরণের দ্বারা দেহের আভ্যন্তরীণ যন্ত্রকে প্রভাবিত করে। ব্যক্তিত্বের বিকাশও এই গ্রন্থিগুলির দ্বারা সাধিত হয়ে থাকে। এইসব গ্রন্থিগুলির ক্রিয়া ও গঠন শারীরবৃত্তীয় মনোবিদ্যার আলোচ্য বিষয়। রাগ, ভয়, কাম প্রভৃতি অনুভূতির সঙ্গে স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের (automatic nurvous system) সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ এবং স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র পরিপাক-ক্রিয়া, শ্বাস-প্রশ্বাস, রক্ত চলাচল, প্রজনন প্রভৃতি জৈবক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে। সে কারণে স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের আলোচনাও শারীরবৃত্তীয় মনোবিদ্যার আলোচ্য বিষয়। সোজা কথায় বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়া যেসব শারীরিক ক্রিয়ার মাধ্যমে প্রকাশিত হয় সে বিষয়গুলির আলোচনা এই জাতীয় মনোবিদ্যার কাজ।

শারীরবৃত্তীয় মনোবিদ্যার প্রয়োজন

শারীরবিদ্যা ও শারীরবৃত্তীয় মনোবিদ্যার আলোচনার পরিসর এক নয়। শারীরবৃত্তীয় মনোবিদ্যা সেইসব দেহগত প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করে যেগুলি মানসিক ক্রিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সম্পর্কযুক্ত। মনকে জানার জন্য দেহকে জানার প্রয়োজন। কারণ, দেহের মাধ্যমেই মন কাজ করে। সেইহেতু শারীরবৃত্তীয় মনোবিদ্যার উদ্ভব।

শারীরবৃত্তীয় মনোবিদ্গণের নাম

মূলেয়ার (***Muller***), ফ্লোরেন্স (***Florence***), রোলাণ্ডো (***Rolando***), স্টানলি হল্ (***Stanley Hall***), হুণ্ড (***Wundt***), হেলম্‌হোলৎস, হেরিং হেরবার্ট, ফেকনার প্রমুখ মনোবিদ্‌দের অবদানে মনোবিদ্যার এই শাখা বিশেষভাবে পুষ্ট। তবে শারীরবৃত্তীয় মনোবিদ্যায় সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া (conditioned reflex) সম্পর্কে রাশিয়ার প্যাভলভ (Pavlov)-এর পরীক্ষণকার্য, স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের সঙ্গে আবেগের সম্বন্ধ নির্ধারণ সম্পর্কে ক্যানন (***Cannon***) ও শেরিংটন (***Sherington***)-এর পরীক্ষণকার্য এবং গুরুমস্তিষ্ক সম্পর্কে লাশলে (***Lashley***)-র পরীক্ষণকার্য সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(ঘ) অস্বভাবী মনোবিদ্যা (Abnormal Psychology) :

অস্বভাবী মনোবিদ্যা অস্বভাবী মনের কার্যকলাপ নিয়ে আলোচনা করে। অবশ্য স্বভাবী (normal) এবং অস্বভাবী (abnormal) মনের মধ্যে কোন সুস্পষ্ট

সীমারেখা টানা সম্ভব নয়। একেবারে স্বাভাবিক লোক খুঁজে মেলা ভার। যে কোন স্বাভাবিক ব্যক্তির আচরণ কোন-না-কোন ব্যাপারে অস্বাভাবিক হয়। আচরণের যে স্বাভাবিক মান আছে, সেই স্বাভাবিক মান থেকে যদি কেউ খুব বেশী দূরে সরে যায়, তবে তার আচরণ অস্বাভাবিক বলে মনে করা হয়।

সেই কারণে যে ব্যক্তি বাতুলতা রোগে ভুগছে অর্থাৎ মানসিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তি, সে যেমন অস্বভাবী; তেমনি রোগের ভয়ে যিনি ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঔষধ সেবন করেন এমন বাতিকগ্রস্ত ব্যক্তি বা কথা বলতে গেলেই মাথা চুলকোতে থাকেন এমন মুদ্রাদোষগ্রস্ত ব্যক্তিও অস্বভাবী। অস্বভাবী মনোবিদ্যা এদের সকলের মনের অবস্থা নিয়ে আলোচনা করে।

সাধারণতঃ যেসব অস্বাভাবিক মানসিক অবস্থা নিয়ে অস্বভাবী মনোবিদ্যা আলোচনা করে, সেগুলি হল—অধ্যাস (illusion), অমূল প্রত্যক্ষ (hallucination), ভ্রান্ত বিশ্বাস (delusion), সমাধি (trance), সংবেশন (hypnotism), আকস্মিক স্মৃতিলোপ (aphasia) ইত্যাদি। অস্বভাবী মনোবিদ্যা যেসব মানসিক রোগ নিয়ে আলোচনা করে সেগুলি হল—বাতুলতা (insanity), মিথ্যা ভয় (phobia), মূর্চ্ছা রোগ (hysteria), নির্বুদ্ধিতা (idiocy), বহুব্যক্তিত্ব (multiple personality), দ্বৈত ব্যক্তিত্ব (double personality), একান্তর ব্যক্তিত্ব (alternating personality) ইত্যাদি।

অস্বাভাবী মনোবিদ্যার আলোচ্য বিষয়বস্তু

যে মানসিক রোগের মাধ্যমে অস্বভাবী মনের প্রকাশ, সেই মানসিক রোগকে সাধারণতঃ তিন ভাগে ভাগ করা হয়—(১) উদ্বায়ু (Neurosis), (২) বায়ুরোগ (Psycho-neurosis) এবং (৩) বাতুলতা (Psychosis) ।[1]

এই সব মানসিক রোগ এবং রোগের উৎপত্তি, রোগ নির্ণয়, চিকিৎসা পদ্ধতি এবং আরোগ্য-সম্ভাবনা প্রভৃতি বিষয়ও এই জাতীয় মনোবিদ্যার আলোচ্য বিষয়। মনের আলোচনার ক্ষেত্রে সিগমুণ্ড ফ্রয়েড (***Sigmund Freud***)-এর নাম বিশেষ-

1. বাতুলতা রোগ হল উন্মাদ রোগ, এ হল দুরারোগ্য ও কঠিন ধরনের মনোবিকার। বাতুলতা রোগ দৈহিক কারণজনিত হতে পারে (organic), বা ক্রিয়ামূলক (functional) হতে পারে, অর্থাৎ কোন নির্দিষ্ট শারীরিক কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। এই রোগ প্রধানতঃ দু' শ্রেণীর—(১) খেদোন্মত্ত বাতুলতা (manic depressive psychosis)—এই ধরনের রোগীর ক্ষেত্রে দু'প্রকারের পরস্পরবিরোধী ব্যক্তিত্বের প্রলক্ষণের পরিচয় পাওয়া যায়। রোগী কখনও অতিরিক্ত মাত্রায় প্রফুল্ল ও উৎসাহী, আশাবাদী, নিজের সম্পর্কে খুব বড় ধারণা পোষণ করে। আবার কখনও তার মধ্যে চরম হতাশা, বিষণ্ণতা, নিরাশা, অনুতাপের ভাব দেখা যায়। (২) চিত্তভ্রংশী বাতুলতা (schizophrenia)—এই ধরনের রোগী বাস্তব পরিবেশ পরিত্যাগ করে এক কাল্পনিক পরিবেশে আশ্রয় গ্রহণ করে। তার মধ্যে অতিরিক্ত অন্তর্মুখীতা, অপরের প্রতি সমবেদনা ও সহানুভূতির অভাব দেখা যায়।

ভাবে উল্লেখযোগ্য। অস্বভাবী মনের আলোচনা প্রসঙ্গে ফ্রয়েড এবং তাঁর অনুগামীরা দেখলেন যে, সচেতন মনের গভীরে আছে নির্জ্ঞান মন এবং নির্জ্ঞান মনের স্তরে যেসব কামনা-বাসনা, ইচ্ছা অবদমিত হয়ে থাকে, রোগী যদি সেগুলিকে প্রকাশ করে তাহলে তার মানসিক ব্যাধি বা বিকারের কারণগুলি জানা যায় এবং চিকিৎসকের পক্ষে রোগীকে নিরাময় করে তোলা সম্ভব হয়। রোগীর মনের কথা বিনা বাধায় প্রকাশ করার যে পদ্ধতি তাকে 'অবাধ অনুসঙ্গ' (Free Association) পদ্ধতি নামে অভিহিত করা হয়। মানসিক রোগ নিরাময়ের পদ্ধতি হিসেবে মনঃসমীক্ষণের (Psychoanalysis) উদ্ভব ঘটলেও পরে এটি একটি মতবাদে পরিণত হয়। ফ্রয়েড, ইয়ুঙ, অ্যাডলার প্রমুখ খ্যাতনামা মনোবিদ্‌দের মানসিক ব্যাধি চিকিৎসা সম্পর্কে সুদীর্ঘকাল গবেষণার ফলে মানসিক ব্যাধি চিকিৎসাশাস্ত্রটি (Psychiatry) একটি জনকল্যাণকর বিজ্ঞানরূপে গড়ে উঠেছে।

ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণ

পূর্বোক্ত মনোবিদ্‌গণ ছাড়াও 'মেসমিরিজম'-এর সাহায্যে মানসিক ব্যাধি চিকিৎসার ব্যাপারে মেসমায়ার (*Mesmer*)-এর এবং সংবেশনের সহায়তায় রোগ নিরাময় ব্যাপারে শারকো (*Charcot*)-র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সাম্প্রতিককালে মনোবিকার তত্ত্ব (Psycho-pathology), মনঃসমীক্ষণ (Psycho-analysis) প্রভৃতির প্রসারের ফলে অস্বভাবী মনোবিদ্যার স্বতন্ত্র অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা তেমন আর নেই।

(ঙ) শিক্ষা-মনোবিদ্যা (Educational Psychology) :

প্রয়োগমূলক মনোবিদ্যার একটি প্রয়োজনীয় শাখা হল শিক্ষা-মনোবিদ্যা। শিক্ষার ক্ষেত্রে মনোবিদ্যার নীতিগুলিকে বা সূত্রগুলিকে প্রয়োগ করা এই মনোবিদ্যার কাজ। শিক্ষার্থীর মনের খবর না জেনে শিক্ষাদানকার্য কোন মতেই সুফল প্রদান করতে পারে

উন্মাদরোগে যে মনোবিকার দেখা যায় তা বাতুলতা রোগের মতো এত কঠিন ধরনের নয়। এই রোগ তিন ধরনের হতে পারে। (১) স্নায়বিক অবসাদ (neurasthenia), (২) মনোদৌর্বল্য (psychasthenia) এবং (৩) হিস্টিরিয়া (hysteria)। প্রথম ধরনের উন্মাদরোগে রোগীর মধ্যে অতিবিক্রমাত্রায় উৎকণ্ঠা-প্রবণতা, উৎসাহহীনতা, রোগ-ভয়, ক্লান্তি ভাব, দৈনন্দিন কর্মসম্পাদনে বিমুখতা দেখা যায়। এই ধরনের রোগীরা নিজেদের শরীরে নানাবিধ দুরারোগ্য রোগের কল্পনা করে এবং সর্বদা দুশ্চিন্তা করে। দ্বিতীয় ধরনের রোগীর ক্ষেত্রে অদ্ভুত অর্থহীন অবান্তর চিন্তা, যুক্তিহীন আতঙ্ক, মতিস্থিরতার অভাব, অন্যায় কাজ করার বাধ্যবাধকতা, যেমন চুরির বাতিক প্রভৃতি দেখা যায়। হিস্টিরিয়া রোগীর প্রতিবেদনের ওপর আয়ত্তের অভাব, উদ্দীপনা গ্রহণে অক্ষমতা দেখা যায়। এই ধরনের রোগী হাসতে হাসতে বা কাঁদতে কাঁদতে এমন অবস্থায় উপনীত হন যে তখন নিজেকে আর সামলাতে পারেন না। ফলে, অনেক সময় শরীরে খিঁচুনি দেখা দেয়। অনেক সময় এই জাতীয় রোগীর চোখে আলো ফেললে বা কানের কাছে শব্দ করলে সে তা টের পায় না।

না। শিক্ষা দেবার পূর্বে শিক্ষার্থীর মনের গঠন, মানসিক প্রবণতা ও ক্ষমতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। শিক্ষার পদ্ধতি ও তার সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন সমস্যা শিক্ষা-মনোবিদ্যার আলোচ্য বিষয়। অল্প সময়ের মধ্যে কোন বিষয় সম্পর্কে সুষ্ঠু অথচ দীর্ঘকালস্থায়ী শিক্ষা কিভাবে দেওয়া যেতে পারে, অর্থাৎ শিক্ষা গ্রহণের বিভিন্ন ক্ষমতা অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত করা এবং শিশু বা কিশোর-মন শিক্ষা গ্রহণকালে কিভাবে কার্য করে তা বর্ণনা করাই শিক্ষা-মনোবিদ্যার উদ্দেশ্য। পরিণত মনের তুলনায় অপরিণত শিশু বা কিশোর মনই এর প্রধান বিষয়।

শিশু-মনোবিদ্যা (Child-Psychology) শিক্ষা-মনোবিদ্যার মৌলিক ভিত্তিস্বরূপ। শিক্ষকের পক্ষে সর্বপ্রথম জানা প্রয়োজন শিশুমনকে, তারপর ধীরে ধীরে তার সুপ্ত ক্ষমতাকে উপযুক্ত শিক্ষার মাধ্যমে বিকশিত করা প্রয়োজন। পারিপার্শ্বিক অবস্থা শিশুমনকে কিভাবে প্রভাবিত করে, শিশুর ওপরে বংশ ও পরিবেশের প্রভাব, শিশুর বুদ্ধির পরিমাপ এবং বুদ্ধি অনুযায়ী কোন্ ধরনের শিক্ষা সে গ্রহণ করতে পারে তা নির্ধারণ করা শিক্ষা-মনোবিদ্যার কাজ। শিশুর মন অনুকরণপ্রিয়, অনুভূতিপ্রবণ ও কল্পনাপ্রবণ। সুতরাং শিশু ও কিশোর মনে অনুভূতি, আবেগ, কল্পনার ও ইচ্ছার স্থান নির্ধারণ করা, প্রয়োজনবোধে শিশুর কল্পনাশক্তিকে সুপথে পরিচালিত করা, খেলাধূলার মাধ্যমে শিশুকে শিক্ষাদান করা, শিশুর অনুকরণযোগ্য আদর্শ নির্ধারণ করা, শিশুদের ভবিষ্যৎ বৃত্তি নির্ধারণে সহায়তা করা, শিশুর সুস্থ ও স্বাভাবিক মনোবৃত্তি গঠন শিক্ষা-মনোবিদ্যার কাজ। এছাড়াও শিক্ষার্থীর চিন্তাশক্তি, মনোযোগ, আগ্রহ ও স্মৃতিশক্তিকে উন্নত করার উপায় নির্ধারণ করা এবং শিক্ষা গ্রহণকালে শিক্ষার্থী যে ক্লান্তি বা বিরক্তি বোধ করে তাকে কিভাবে দূর করা যায়, এই সব বিষয়ও শিক্ষা-মনোবিদ্যার আলোচ্য বিষয়। কিভাবে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বকে উন্নত করা যেতে পারে, শিক্ষা-মনোবিদ্যা এই বিষয়েও আলোচনা করে থাকে। যেসব শিশু অল্পবুদ্ধি, নির্বুদ্ধি এবং অপরাধপ্রবণ অর্থাৎ অস্বভাবী শিশুদের শিক্ষাপ্রণালী সম্পর্কেও শিক্ষা-মনোবিদ্যা আলোচনা করে। শিক্ষণের মূলনীতি ও সূত্রাবলী নির্ধারণ করা ও সেগুলির সম্যক্ প্রয়োগ করে শিক্ষা-ব্যবস্থাকে সুষ্ঠু পথে চালিত করা, শিক্ষার ফলগুলিকে পরিসংখ্যানের সাহায্যে হিসেব করে গাণিতিক সংখ্যায় প্রকাশ করা শিক্ষা-মনোবিদ্যার কাজ।[1]

শিক্ষা-মনোবিদ্যার আলোচ্য বিষয়বস্তু

রুশো (*Rousseau*), পেস্টালোৎসি (*Pestalozzi*) ও ফ্রোবেল (*Froebel*),

1. শিক্ষা-পরিসংখ্যান শিক্ষা-মনোবিদ্যায় বর্তমানে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে।

মণ্টেসরি, হারবার্ট (*Herbart*) শিক্ষাদানের নূতন পদ্ধতি সম্পর্কে এবিংহাউস (*Ebbinghaus*) স্মৃতিকে কিভাবে উন্নত করা যায় সে সম্পর্কে ; আলফ্রেড বিনে (*Alfred Binet*) বুদ্ধি পরীক্ষার জন্যবিভিন্ন পদ্ধতি নির্ধারণ সম্পর্কে যে গবেষণা কার্য করেছেন সেগুলিশিক্ষা-মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান।

(চ) শিল্প সম্বন্ধীয় মনোবিদ্যা (Industrial Psychology) :

শিল্প-সম্বন্ধীয় মনোবিদ্যা শিল্পের ক্ষেত্রে মনোবিদ্যার সূত্রগুলিকে প্রয়োগ করে শিল্প-সংক্রান্ত নানা সমস্যার ওপর নতুনভাবে আলোকপাত করতে সমর্থ হয়েছে এবং তার সমাধানের জন্য সচেষ্ট হয়েছে। শিল্প উৎপাদনের ক্ষেত্রে একদিকে যেমন আছে যন্ত্র ও উপাদান, অপরদিকে আছে যারা এই শিল্প উৎপাদনের কাযে নিযুক্ত সেই সব কর্মীদের মন। এই সব কর্মীদের মানসিক অবস্থা, আশা-আকাঙ্ক্ষা মানসিক শক্তি, যোগ্যতা প্রভৃতি নির্ধারণ করে শিল্পোৎপাদনে সহায়তা করা এই মনোবিদ্যার কাজ। কী ধরনের কাজের প্রতি কর্মীদের মানসিক প্রবণতা আছে তা নির্ধারণ করার জন্য উপযুক্ত কর্মী নির্বাচন করার জন্য, কর্মীর বুদ্ধি এবং ব্যক্তিত্ব নিরূপণের জন্য মনোবিদ্‌রা বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষার উদ্ভাবন করেছেন।

শিল্প-সম্বন্ধীয় মনোবিদ্যার পরিচয়

শ্রমিকের মানসিক অবস্থা, শ্রম বণ্টন, উৎপাদন ও বণ্টন কার্যে শ্রমিক নিয়োগ প্রভৃতি বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে মনোবিদ্যার এই শাখাটিকে নিয়োজিত করা হয়েছে। কিভাবে কম পরিশ্রমে অধিক উৎপাদন সম্ভব, কিভাবে উৎপাদন-প্রবণতা বৃদ্ধি করা সম্ভব, কর্মীর কর্মদক্ষতা কিভাবে বৃদ্ধি করা যেতে পারে, কী ধরনের পরিবেশে শ্রমিকরা সহজেই ক্লান্ত ও বিরক্ত হয়, আবার কোন্ ধরনের পরিবেশে তারা প্রফুল্ল মনে ও উৎপাদন-উদ্দীপনা নিয়ে কাজ করে, কিভাবে শ্রমিকের মন থেকে অবসাদ এবং বিরক্তির ভাব দূর করে কাজে উৎসাহ ও আগ্রহ সৃষ্টি করা যায়, এই সব সমস্যার সমাধানের জন্য মনোবিদ্‌দের সহায়তা একান্ত প্রয়োজন। এছাড়াও নতুন আবিষ্কারে শ্রমিকদের আগ্রহ কিভাবে সৃষ্টি হতে পারে, পারিপার্শ্বিক অবস্থা শ্রমিকের কর্মশক্তির ওপর প্রভাব বিস্তার করে, কিভাবে তার কর্মশক্তির উন্নতি ঘটায় বা তাকে হ্রাস করে; কিভাবে কাজে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে শ্রমিকের কাছে কাজকে আকর্ষণীয় করে তোলা যায়, কী মান বা পদ্ধতি অনুসরণ করে শিক্ষানবীশ কর্মীদের শিক্ষা দেওয়া হবে প্রভৃতি বিষয় নির্ধারণ করা শিল্প-সম্বন্ধীয় মনোবিদ্যার কাজ।

শিল্প-সম্বন্ধীয় মনোবিদ্যার আলোচ্য বিষয়

শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য শ্রমিকদের সুস্থ মানসিক অবস্থার অধিকারী হওয়ার,

শ্রমিক-মালিকের মধ্যে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির এবং শ্রমিকদের মধ্যে পারস্পরিক প্রীতি সৌহার্দ্যের একান্ত প্রয়োজন। কিভাবে শ্রমিকদের মানসিক অবস্থাকে সুস্থ রাখা যায়, শ্রমিক মালিক সম্বন্ধের উন্নতি কিভাবে করা যায় এবং শ্রমিকদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি প্রীতি ও ভালবাসা, পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব কিভাবে সৃষ্টি করা যায় তার উপায় নির্ধারণ করা শিল্প-সম্বন্ধীয় মনোবিদ্যার কাজ। কর্মীর মানসিক এবং সামাজিক প্রয়োজনগুলি সাধ্যমত মেটাতে পারলেই তাকে সুখী ও উৎসাহী কর্মী করে তোলা যেতে পারে এবং কর্মীর মনে সন্তোষ উৎপাদন করে, ধর্মঘট বা অন্যান্য অশান্তিমূলক ঘটনা যা শিল্পোন্নতিকে ব্যাহত করে তাকে দূর করা যেতে পারে। এ ব্যাপারে শিল্প-সম্বন্ধীয় মনোবিদ্যার সহায়তা একান্ত প্রয়োজন।

শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক শিল্প-সম্বন্ধীয় মনোবিদ্যা আলোচনা করে

শ্রমিক-মালিক ছাড়াও ক্রেতা ও বিক্রেতার মনোভাব নিরূপণ করা এই মনোবিদ্যার কাজ। উৎপন্ন দ্রব্য ক্রয়ের ব্যাপারে ক্রেতার মনোযোগ বা দৃষ্টি কিভাবে আকর্ষণ করা যায়, কী জাতীয় বিজ্ঞাপন বা প্রচার ব্যবস্থা ক্রেতার মনোযোগ আকর্ষণ করার ব্যাপারে বিশেষভাবে উপযোগী, এসব নির্ধারণ করাও শিল্প-সম্বন্ধীয় মনোবিদ্যার কাজ।

(ছ) প্রাণী-মনোবিদ্যা (Animal-Psychology): এ হল মনোবিদ্যার সেই শাখা যা মনুষ্যেতর প্রাণীদের মন নিয়ে আলোচনা করে। কুকুর, বাঁদর, বিড়াল প্রভৃতি জীবজন্তুদের মানসিক প্রক্রিয়া তাদের বাহ্য-আচরণের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। সেই আচরণ লক্ষ্য করে প্রাণি-মনের স্বরূপ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করাই প্রাণি-মনোবিদ্যার উদ্দেশ্য। প্রাণিমন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার জন্য এবং বিভিন্ন প্রাণিমনের তুলনামূলক আলোচনা করার জন্য যেমন প্রাণি-মনোবিদ্যা সহায়তা করে, তেমনি অপর দিকে সুস্থ, স্বাভাবিক ও পরিণত বয়স্ক মনের বিভিন্ন অবস্থা সম্পর্কেও জ্ঞান লাভ করতে প্রাণি-মনোবিদ্যা সহায়তা করে। তাছাড়া মনের ক্রমবৃদ্ধি কিভাবে ঘটেছে, সরল অবস্থা থেকে জটিল অবস্থায় মনের ক্রমবিকাশ কিভাবে হয়েছে, সে বিষয়ে জ্ঞানলাভ করতে প্রাণি-মনোবিদ্যা সহায়তা করে।

1. শিল্পের ও ব্যবসার ক্ষেত্রে মনোবিদ্যার প্রয়োগ সর্বপ্রথম শুরু হয় ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে যখন *W. D Scott* বিজ্ঞাপনের নীতি সম্পর্কে একটি পুস্তক প্রকাশ করেন। শিল্প-সম্বন্ধীয় মনোবিদ্যা বিষয়ক প্রথম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল মুনস্টারবার্গ (*Munsterberg*) রচিত গ্রন্থ 'Psychology and Industrial Efficiency', গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয় ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে। তিনি এই গ্রন্থে শিল্পসম্বন্ধীয় তিনটি সমস্যার উল্লেখ করেন, যেখানে মনোবিদ্যার প্রয়োগে সুফল পাওয়া যাবে—(১) মানসিক ক্ষমতার দিক থেকে একটি কাজের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত কর্মী নির্বাচন করা, (২) সেই পারিপার্শ্বিক অবস্থা আবিষ্কার করা, যে অবস্থায় শ্রমিকের কাছ থেকে সবচেয়ে বেশী কাজ পাওয়া যেতে পারে, (৩) ক্রেতা-বিক্রেতার সম্পর্ক কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে তা নির্ধারণ করা।

(জ) সমাজ-মনোবিদ্যা (Social Psychology) : সমাজ-মনোবিদ্যার আলোচ্য বিষয় ব্যক্তিমন নয়, সমাজের মাধ্যমে প্রকাশিত সমাজ-মন বা গোষ্ঠীমন (Group mind)। মানুষ সামাজিক জীব। সামাজিক সম্পর্কের মাধ্যমেই মানুষের ব্যক্তিত্বের প্রকাশ। সামাজিক জীব হিসেবে মানুষ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সভ্য। সামাজিক সম্পর্কের পেছনে যেসব মনস্তাত্ত্বিক উপাদান আছে, সামাজিক অনুষ্ঠানের অন্তরালে মনোবিদ্যার যেসব নীতি কার্য করে, সেগুলির আলোচনা করা সমাজ-মনোবিদ্যার কাজ। সমাজ-মনোবিদ্যা সামাজিক আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, সংস্কার, রুচি প্রভৃতির মনস্তাত্ত্বিক উপাদান সম্পর্কেও আলোচনা করে।

সমাজ-মন নিয়ে আলোচনা করে সমাজ-মনোবিদ্যা

(ঝ) লোক-মনোবিদ্যা (Folk-Psychology) : এটি সমাজ-মনোবিদ্যার অন্যতম শাখা। এই শাখা বিশেষ করে আদিম মানুষের মানসিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করে।

১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ম্যাকডুগালের 'Introduction to Social Psychology' গ্রন্থটি সামাজিক বিষয়গুলির মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তির সন্ধান দিয়েছে।

(ঞ) পরা-মনোবিদ্যা (Para-Psychology) : আধুনিক মনোবিদ্যার ইতিহাসে আর এক নতুন শাখার উদ্ভব হয়েছে যার নাম পরা-মনোবিদ্যা। এমন অনেক মানসিক ঘটনা আছে যেগুলিকে মনোবিদ্যার কোন সাধারণ সূত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায় না। এইসব ঘটনা মানসিক শক্তি সম্বন্ধীয় এবং এই ধরনের মানসিক শক্তি দেহ ব্যতিরেকেই ক্রিয়া করে। এই জাতীয় মানসিক শক্তির স্বরূপ ও ক্রিয়া-পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করে পরা-মনোবিদ্যা।

ইন্দ্রিয়ের সাহায্য গ্রহণ না করে কোন কিছু প্রত্যক্ষ করার নাম অলৌকিক প্রত্যক্ষ। অলৌকিক প্রত্যক্ষে উপরিউক্ত মানসিক শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। দূর-বেক্ষণ বা দূরদর্শন অলৌকিক প্রত্যক্ষের উদাহরণ।

ইন্দ্রিয়ের সাহায্য গ্রহণ না করে অপরের মানসিক অবস্থাকে জানা হল দূরবেক্ষণ বা Telepathy. ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ছাড়া কোন কিছুকে দর্শন করাকে দূরদর্শন বা Clairvoyance-ও বলা হয়। অনেক ব্যক্তি চোখ বন্ধ করে জনবহুল রাস্তায় সাইকেল চালাতে পারেন। আমেরিকায় মনোবিদ্যা-পরীক্ষণাগারে এই জাতীয় মানসিক ঘটনার পরীক্ষণের কাজ শুরু হয়। এ সম্পর্কে ডক্টর জে. বি. রাইনে (***Dr. J. B. Rhine***)-র গবেষণা উল্লেখযোগ্য।

পঞ্চম অধ্যায়
সংবেদন
(Sensation)

১। সংবেদন কাকে বলে? (What is sensation):

সংবেদন হল উদ্দীপনার প্রাথমিক চেতনা বা বোধ। বাইরের জগতের কোন উদ্দীপকের সঙ্গে যখন ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শ ঘটে এবং ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুক্ত অন্তর্মুখী স্নায়ুর বহিঃপ্রাপ্ত উদ্দীপিত হয় এবং সেই উদ্দীপনা ঐ স্নায়ুর মাধ্যমে যখন মস্তিষ্কে পৌছায় তখন ঐ উদ্দীপক সম্বন্ধে যে প্রাথমিক চেতনা বা বোধের সঞ্চার হয় তাকেই সংবেদন বলে। মনোবিদ্ সালি (*Sully*) সংবেদনের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন—"একটি অন্তমুখী স্নায়ুর বহিঃপ্রান্ত উদ্দীপিত হলে যখন এই উদ্দীপনা মস্তিষ্কে সঞ্চারিত হয় তখন তার দ্বারা সৃষ্ট সহজ মানসিক প্রক্রিয়া হল সংবেদন।"[1] পথ দিয়ে চলতে চলতে হঠাৎ এক ঝলক আলো চোখের ওপর এসে পড়ল। আমার চোখের ওপর আলো পড়তেই, সেই উদ্দীপনা চোখের মধ্যে অক্ষিপটের সঙ্গে যুক্ত অন্তর্মুখী স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কে গিয়ে পৌছল এবং উদ্দীপনার প্রাথমিক চেতনা বা বোধের সৃষ্টি হল। প্রথমে আলোর যে প্রাথমিক চেতনা বা বোধ তা হল সংবেদন এবং পরে এই সংবেদনকে যখন ব্যাখ্যা করলাম মোটর গাড়ীর হেড লাইটের বিচ্ছুরিত আলোক বলে, তখন তা হয়ে উঠল প্রত্যক্ষ (Perception)। দেহের অভ্যন্তরস্থ কোন পরিবর্তনও উদ্দীপকের কাজ করতে পারে।

সংবেদন হল উদ্দীপনাব প্রাথমিক চেতনা বা বোধ

সংবেদনের সংব্যাখ্যান হল প্রত্যক্ষ

সংবেদন একটি অমূর্ত মানসিক অবস্থা কাবণ, মানুষের মনে সংবেদনের কোন পৃথক ও স্বতন্ত্র সত্তা নেই; প্রত্যক্ষের সরলতম উপাদানরূপে সংবেদনকে কল্পনা করে নেওয়া হয়।

বাইরের জগতের উদ্দীপক আমাদের ইন্দ্রিয়ের ওপর ক্রিয়া করে সংবেদন উৎপন্ন করে। এই সংবেদনের ফলে আমরা বস্তুর গুণগুলিকে জানতে পারি। বাইরের জগতের কোন উদ্দীপক দেহের অর্থাৎ মস্তিষ্কেব এবং স্নায়ুমণ্ডলীর মাধ্যমে মনের ওপর ক্রিয়া করে এবং তারই ফলে সংবেদন সৃষ্ট হয়। সুতরাং সংবেদনের তিনটি উপাদান। যথা—(১) উদ্দীপক, (২) দেহ অর্থাৎ স্নায়ুতন্ত্র এবং (৩) মন।

সংবেদনেব তিনটি উপাদান—উদ্দীপক, স্নায়ুতন্ত্র এবং মন

---

1. "Sensation is a simple-psychical phenomenon resulting from the stimulation of the peripheral extremity (i. e., outer end) of an afferent nerve when this is propagated to the brain."—*Sully*.

২। উদ্দীপক কাকে বলে? (What is Stimulus?):

যা দেহে উদ্দীপনা ঘটাতে সমর্থ তাকেই উদ্দীপক বলে। উদ্দীপক সংবেদনের মূল কারণ। বহির্জগতের কোন বস্তু উদ্দীপক হতে পারে বা দেহের অভ্যন্তরস্থ কোন পরিবর্তনও উদ্দীপকের কাজ করতে পারে। বহির্জগতের কোন বস্তু ইন্দ্রিয়ের ওপর ক্রিয়া করে ইন্দ্রিয়কে উদ্দীপিত করলে এবং সেই উদ্দীপনা অন্তর্মুখী স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কে বাহিত হলে সংবেদন সৃষ্ট হয়। যেমন, বায়ু-তরঙ্গ কর্ণকে উদ্দীপিত করে শব্দ-সংবেদন উৎপন্ন করে। ক্ষুধা, তৃষ্ণা প্রভৃতি দৈহিক সংবেদনের ক্ষেত্রে উদ্দীপক থাকে দেহের ভেতরে। দেহগত পরিবর্তনের ফলেই এই জাতীয় সংবেদন উৎপন্ন হয়।

উদ্দীপক বহির্জগতের বস্তু বা দেহভ্যন্তরস্থ কোন পরিবর্তন হতে পারে

এই উদ্দীপক দুপ্রকার হতে পারে—(১) পর্যাপ্ত উদ্দীপক (Adequate stimulus) এবং (২) অ-পর্যাপ্ত উদ্দীপক (Inadequate stimulus)। যে উদ্দীপক স্বাভাবিক-ভাবেই কোন ইন্দ্রিয়কে উদ্দীপিত করে একটি বিশেষ সংবেদন উৎপন্ন করার পক্ষে যথেষ্ট তাকে ঐ ইন্দ্রিয়ের এবং সংবেদনের পর্যাপ্ত উদ্দীপক (Adequate Stimulus) বলে। যেমন, আলোকরশ্মি চক্ষুকে উদ্দীপিত করে দৃষ্টিগত সংবেদন, তরল পদার্থ জিভের ওপর ক্রিয়া করে স্বাদগত সংবেদন, গ্যাসীয় পদার্থ ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের ওপর ক্রিয়া করে ঘ্রাণ সংবেদন উৎপন্ন করার পক্ষে পর্যাপ্ত উদ্দীপক ((Adequate stimulus)। যে উদ্দীপক স্বাভাবিকভাবে কোন উদ্দীপনা উৎপন্ন করার পক্ষে যথেষ্ট নয়, অথচ তা উৎপন্ন করে (Inadequate stimulus) সেই উদ্দীপক ঐ সংবেদনের অপর্যাপ্ত উদ্দীপক (Inadequate stimulus)। যেমন, দেহের অভ্যন্তরস্থ কোন পরিবর্তন, গা বমি বমি করা—এই দৈহিক সংবেদন উৎপন্ন করে। কিন্তু অনেক সময় কোন পচা বা দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু দেখা মাত্রই গা বমি বমি করে। এক্ষেত্রে পচা বা দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু গা বমি বমি করা এই দৈহিক সংবেদনের উদ্দীপক।

পর্যাপ্ত উদ্দীপক ও অপর্যাপ্ত উদ্দীপক

৩। সংবেদনের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Sensation):

সংবেদনের এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য বা ধর্ম আছে যার মাধ্যমে তাকে আমরা অন্যান্য মানসিক প্রক্রিয়া থেকে আলাদা করে নিতে পারি। যথা—

(ক) প্রত্যক্ষ বা জ্ঞানের সরলতম উপাদান হল সংবেদন। সংবেদন জ্ঞানের উপাদান যোগায়। সংবেদনের মাধ্যমেই আমরা বাইরের জগৎ সম্বন্ধে অবহিত হই।

(খ), সংবেদনের উৎস কোন উদ্দীপক। বাইরের জগতের কোন উদ্দীপক বা দেহের অভ্যন্তরস্থ কোন পরিবর্তন দেহের ওপর ক্রিয়া করে সংবেদন উৎপন্ন করতে পারে।

(গ) সংবেদন বস্তুকেন্দ্রিক মানসিক অবস্থা (Objective mental state)। অনুভূতি মানসিক অবস্থা হলেও অনুভূতি বস্তুকেন্দ্রিক নয়, সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিকেন্দ্রিক (subjective)। আমার আনন্দ, আমার দুঃখ, আমার মনের অবস্থা, কোন বস্তুর গুণ নয়। কিন্তু সংবেদন মানসিক অবস্থা হলেও বস্তুকেন্দ্রিক। যেমন, কোন রঙের সংবেদন। এই রঙ কোন বস্তুর গুণ, আমার মনের কোন অবস্থা নয়।

সংবেদন বস্তুকেন্দ্রিক মানসিক অবস্থা

(ঘ) সংবেদন মূলতঃ নিষ্ক্রিয় অবস্থা, অর্থাৎ সংবেদনের ক্ষেত্রে মন নিষ্ক্রিয়ভাবে বাইরের জগৎ থেকে উদ্দীপনা গ্রহণ করে। ব্যক্তি কী ধরনের সংবেদন লাভ করবে, তা ব্যক্তির ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে না—তা বাইরের থেকে ব্যক্তির ওপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়। নীল রঙকে ইচ্ছা করলে সবুজ রঙ বলে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব নয়। সংবেদন সৃষ্ট হবার পর মন অবশ্য সক্রিয় হয়, কারণ মনের দ্বারা সংব্যাখ্যাত হয়ে সংবেদন প্রত্যক্ষে পরিণত হয়।

সংবেদন নিষ্ক্রিয় অবস্থা

(ঙ) সংবেদন যেন জোর করেই আমাদের চেতনার রাজ্যে উপস্থিত হয়। ইন্দ্রিয় যদি বিকল না হয় এবং এই সুস্থ ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যদি উদ্দীপকের সংযোগ ঘটে তাহলে সংবেদন সৃষ্ট হবেই। আকাশপথে যখন উড়োজাহাজ উড়ে যাচ্ছে তখন এই শব্দ আমাকে শুনতেই হয়, আমি নিজে এই অবস্থা সৃষ্টি করি না।

সংবেদন জোর করেই চেতনার রাজ্যে উপস্থিত হয়

(চ) সংবেদনের মাধ্যমে বাইরের জগৎ সম্পর্কে আমরা জ্ঞান লাভ করি। সংবেদন ছাড়া অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতের সম্পর্ক সম্ভব নয়।

৪। সংবেদনের ধর্ম বা লক্ষণ (Atiributes of Sensation):

মনোবিদ্‌দের মতে সংবেদনকে পরস্পর থেকে পৃথক করতে হলে সংবেদনের তিন ধরনের ধর্ম বা লক্ষণের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। যথা, (ক) **গুণগত ধর্ম**, (খ) **পরিমাণগত ধর্ম** এবং (গ) **স্থানীয় ধর্ম**।

(ক) **গুণগত ধর্ম** (Quality): মনোবিদ্ টিচেনার (*Titchener*)-এর মতে কোন একটি সংবেদনের গুণ হল সেই বৈশিষ্ট্য যা তাকে অপর একটি সংবেদন থেকে পৃথক করে। এই গুণের জন্যই সংবেদনটি ঠিক যা তাই, অর্থাৎ যার জন্য লাল রঙের সংবেদন সবুজ বা নীল রঙের সংবেদন নয়। তেমনি দৃষ্টিগত সংবেদন এবং শ্রবণগত সংবেদনের মধ্যে গুণগত পার্থক্য বর্তমান। এই গুণগত পার্থক্য দু-প্রকারের হতে পারে—**জাতিগত** (generic) এবং **উপজাতিগত** (specific)। যেমন, শ্রবণগত এবং দৃষ্টিগত সংবেদনের যে পার্থক্য তাহল জাতিগত পার্থক্য। আবার মিষ্ট বা

তিক্ত উভয়ই স্বাদগত সংবেদন , এদের পার্থক্য উপজাতিগত পার্থক্য। অনুরূপভাবে সবুজ রঙ ও নীল রঙের সংবেদনের পার্থক্য হল উপজাতিগত। কিন্তু লাল রঙের সংবেদনের সঙ্গে কোন বস্তুর স্পর্শগত সংবেদনের পার্থক্য হল জাতিগত।

জাতিগত পার্থক্যের কারণ হল উদ্দীপক, ইন্দ্রিয় এবং স্নায়ুগুলির বিভিন্নতা ; যেমন অক্ষিমূলক স্নায়ু (optic nerve), শ্রবণমূলক স্নায়ু (auditory nerve) ইত্যাদি। এই বিভিন্ন স্নায়ুগুলি এক, না এগুলির গঠনের মধ্যে পার্থক্য আছে, সে বিষয়ে মতভেদ আছে।

(খ) **পরিমাণগত ধর্ম** (Quantity) : একটা প্রদীপের ক্ষীণ আলোকের সংবেদন এবং একটা হাজার-শক্তির বৈদ্যুতিক বাতির আলোকের সংবেদন উভয়ই একজাতীয়, অর্থাৎ আলোক-সম্পর্কীয় সংবেদন তবু এরা ঠিক এক নয়। এক ক্ষেত্রে সংবেদন ক্ষীণ, অন্য ক্ষেত্রে তীব্র। উভয়ের মধ্যে পরিমাণগত পার্থক্য বর্তমান।

এই পরিমাণগত পার্থক্য তিন প্রকারের হতে পারে ; যথা—(i) **তীব্রতা** (Intensity), (ii) **স্থিতিকাল** (Protensity or Duration) এবং (iii) **ব্যাপ্তি** (Extensity)।

মনোবিজ্ঞানী টিচেনার (*Titchener*) সংবেদনের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে তার চারটি গুণের উল্লেখ করেছেন, যথা--গুণ, তীব্রতা. স্পষ্টতা ও স্থায়িত্ব। তাঁর মতে স্পষ্টতাও সংবেদনের একটি পরিমাণগত ধর্ম।

(i) **তীব্রতা** (Intensity) : দুটি একই জাতীয় সংবেদন কম তীব্র বা বেশী তীব্র হতে পারে। যেমন, কোন মানুষের চুপি চুপি কথা বলার শব্দ-সংবেদনের তুলনায় বাজ পড়ার শব্দ-সংবেদনের তীব্রতা অনেক বেশী ; এবং ক্ষীণ প্রদীপের আলোক, উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোক, একটি গোলাপ ফুলের গন্ধ এবং একগোছা গোলাপ ফুলের গন্ধ, উভয় দৃষ্টান্তে প্রথম সংবেদনের তুলনায় দ্বিতীয় সংবেদনের তীব্রতা অনেক বেশী। সংবেদনের শক্তি উদ্দীপকের শক্তির ওপর নির্ভরশীল।

(ii) **স্থিতিকাল** (Duration) : প্রত্যেক সংবেদন কিছু সময় ধরে স্থায়ী হয়। যতটুকু সময় ধরে সংবেদনটি স্থায়ী হল তাহল সংবেদনের স্থিতিকাল। যে গানটি শুরু হয়েই থেমে গেল তার শব্দ-সংবেদনের তুলনায় যে গানটি দশ মিনিট ধরে গাওয়া হল তার শব্দ-সংবেদনের স্থিতিকাল অনেক বেশী। একটি বাঁশী বেজেই থেমে যাওয়া, আর একটানা একটি বাঁশীর শব্দ--প্রথম সংবেদনের তুলনায় দ্বিতীয় সংবেদনের স্থিতিকাল অধিক। অবশ্য এই স্থিতিকাল উদ্দীপকের অবস্থান সময়ের ওপর অনেকাংশে নির্ভর করে। আবার কোন কোন সময় উদ্দীপক অন্তর্হিত

হবার পরও সংবেদনের রেশটুকু থেকে যায়। এই ক্ষণস্থায়ী সংবেদনকে বলা হয় উত্তর-সংবেদন বা উত্তর-প্রতিরূপ (After sensation or After image)।

(iii) **ব্যাপ্তি** (Extensity): সংবেদনেব ব্যাপ্তি মানে যতটুকু জায়গা জুড়ে সংবেদনটি অনুভূত হচ্ছে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়েব কতটুকু জায়গা জুড়ে উদ্দীপনা ঘটছে তার ওপর নির্ভর করছে সংবেদনেব এই ব্যাপ্তি। প্রথমে আঙুলের অগ্রভাগের সাহায্যে একটি উত্তপ্ত বস্তুকে স্পর্শ করলাম, তারপর সমগ্র করতল দিয়ে সেই উত্তপ্ত বস্তুটি স্পর্শ করলাম। প্রথম তাপ-সংবেদনেব তুলনায় দ্বিতীয় তাপ-সংবেদনেব ব্যাপ্তি অনেক বেশী। প্রথমে আকাশে একটি নক্ষত্রের দিকে তাকিয়ে, তারপর চাঁদের দিকে তাকালাম। উভয়ই দৃষ্টিগত সংবেদন। হাতের ওপর প্রথমে একটি মুদ্রা বাখলাম। তারপর পাশাপাশি আর একটি মুদ্রা রাখলাম। উভয়ই স্পর্শগত সংবেদন। উভয় ক্ষেত্রেই প্রথমটির তুলনায় দ্বিতীয়টির ব্যাপ্তি অনেক বেশী।

মনোবিদ্ জেমসের মতে ব্যাপ্তি হল সংবেদনের একটি সাধারণ লক্ষণ। দৃষ্টিগত এবং স্পর্শগত সংবেদন ছাড়াও শব্দ, ঘ্রাণ এবং স্বাদ সংবেদনেরও ব্যাপ্তি আছে। শব্দ কম জায়গা জুড়ে থাকতে পারে বা বেশী জায়গা জুড়ে থাকতে পারে; যেমন চড়াই পাখীর আওয়াজ বা বাঘের গর্জনের আওয়াজ। ঘ্রাণ তবং স্বাদ সংবেদনও কম-বেশী জায়গা জুড়ে থাকতে পারে। মনোবিদ্ টিচেনাবের মতে দৃষ্টিগত এবং স্পর্শগত সংবেদনেরই কেবল এই লক্ষণ আছে। শ্রবণ, স্বাদ ও গন্ধ-সংবেদনের এই লক্ষণ নেই।

(iv) **স্পষ্টতা** (Clearness): স্পষ্টতার দিক থেকে এক শ্রেণীভুক্ত বিভিন্ন সংবেদনের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়: কোন সংবেদন কম স্পষ্ট, কোন সংবেদন বেশী স্পষ্ট। যেটি চেতনার কেন্দ্রে থাকে সেটি স্পষ্ট, যেটি চেতনার প্রান্তে থাকে সেটি অস্পষ্ট।

(গ) স্থানীয় ধর্ম (Local character): আমাদের ইন্দ্রিয়ের দেহগত অবস্থানের বৈশিষ্ট্যের ফলে সংবেদনের যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, তাকেই সংবেদনের স্থানীয় ধর্ম বলা হয়। আমি চোখ বুজে রয়েছি, আমার এক বন্ধু পেন্সিল দিয়ে পর পর আমার চোখ, মুখ, কান, কপাল স্পর্শ করতে লাগল। আমি চোখ বুজে থাকলেও বলে দিতে পারব দেহের কোন্ অংশটি স্পর্শ করা হচ্ছে। কারণ দেহের বিভিন্ন অংশের স্পর্শ-সংবেদনের নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য আছে। এই বৈশিষ্ট্য হল স্থানীয় ধর্ম। দেহের বিভিন্ন স্থানেব স্পর্শকাতরতার ভিন্নতার ফলে এই তারতম্য দেখা যায়।

এছাড়াও সংবেদনের আর একটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই বৈশিষ্ট্যই হল সংবেদনের **অনুভূতি সম্পর্কীয় বৈশিষ্ট্য** (Hedonic or Affective tone)। কোন কোন মনোবিদের মতে প্রত্যেক সংবেদনের সঙ্গে একটা ভাল লাগা বা মন্দ লাগার বোধ জড়িত থাকে। যেমন, খুব তীব্র আলোকের দৃষ্টিগত সংবেদন অস্বস্তিকর মনে হয়, বিকট শব্দের সংবেদন অস্বস্তিকর মনে হয়; বিকট শব্দের সংবেদন বিরক্তি উৎপাদন করে, গোলাপ ফুলের গন্ধের সংবেদন প্রীতিপদ মনে হয়। সংবেদনের 'অনুভূতি সম্পর্কীয় বৈশিষ্ট্য' সম্পর্কে মনোবিদ্‌দের মধ্যে মতবিভেদ দেখা যায়।

সংবেদনের অনুভূতি সম্পর্কীয় বৈশিষ্ট্য

৫। ভেবার্‌-ফেকনার সূত্র বা মানস দৈহিক সূত্র (Weber-Fechner Law or Law of Psycho-Physics)ঃ

উদ্দীপকের দ্বারা সংবেদন সৃষ্ট হয়, কাজেই উদ্দীপকের তীব্রতার কমা-বাড়ার সঙ্গে সংবেদনের তীব্রতাও কমে বাড়ে। তবে বিশেষ এক শর্তে এই নীতি কার্যকর হয়।

প্রথমতঃ, উদ্দীপক উপস্থাপিত হলেই যে সংবেদন সৃষ্ট হবে এমন কোন কথা নেই। যেমন, খুব ক্ষীণ শব্দের বা ক্ষীণ গন্ধের সংবেদন উদ্রেক করার শক্তি নেই। সেজন্য উদ্দীপকের একটা ন্যূনতম শক্তি বা তীব্রতা থাকা দরকার, যা না হলে, কোন সংবেদন অনুভূত বা বোধগম্য (perceptible) হবে না। সংবেদনের নিম্নসীমা থেকে আরম্ভ করে উদ্দীপকের শক্তি বা তীব্রতাকে যদি ক্রমে ক্রমে বাড়ান যায়, সংবেদনের তীব্রতার মাত্রা ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। কিন্তু এরও একটা সীমা আছে। উদ্দীপকের তীব্রতা বা শক্তি একটা নির্দিষ্ট সীমায় পৌঁছানোর পর, তার তীব্রতা বৃদ্ধি করা হলেও সংবেদন আর বৃদ্ধি পাবে না। যে সীমায় (upper limit) পৌঁছলে উদ্দীকের শক্তি বা তীব্রতা বৃদ্ধি করা সত্ত্বেও সংবেদন আর বৃদ্ধি পায় না, সেই সীমাকে বলা হয় 'সংবেদনের উচ্চতম সীমা' (Height of Sensibility) এবং উভয় সীমার মধ্যবর্তী অবস্থাকে বলা হয় 'সংবেদনের পরিসর' (Range of Sensibility)। এই নিম্নসীমা ও উচ্চসীমার মধ্যবর্তী অবস্থার মধ্যে উদ্দীপকের তীব্রতার বৃদ্ধির বোধগম্য সংবেদন ঘটে। উদ্দীপকের যে সর্বনিম্ন বা ন্যূনতম শক্তি থাকলে সেটি ঠিক বোধগম্য (just perecptible) সংবেদন উদ্রেক করে তাকে ইংরাজীতে বলা হয় 'Liminal Intensity of Stimulus' এবং তার দ্বারা যে সংবেদনের বোধ হয় তাকে বলা হয় সংবেদনের নিম্নতম সীমা বা আরম্ভ সীমা বা 'সংবেদনের প্রবেশপথ' (Thereshold of Sensation)।

যে কোন শক্তিবিশিষ্ট উদ্দীপক সংবেদন সৃষ্টি করতে পারে না

সংবেদনের নিম্নতম সীমা, উচ্চতর সীমা ও পরিসর

দ্বিতীয়তঃ, এই সীমারেখার মধ্যে যে হারে উদ্দীপকের তীব্রতাকে বাড়ান হয় সেই হারে সংবেদন বাড়ে না। উদ্দীপকের শক্তি বা তীব্রতা বৃদ্ধি পায় দ্রুতগতিতে, আর সেই হারে সংবেদনের বৃদ্ধি অনেক কমই হয়ে থাকে।

উদ্দীপকের শক্তি বা তীব্রতা যদি খুব সামান্য বৃদ্ধি করা হয় যেমন, যেখানে এক হাজার মোমবাতি জ্বলছে সেখানে যদি আর একটি মোমবাতি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়, পাঁচ কিলো ওজনের সঙ্গে যদি আর পঞ্চাশ গ্রাম যোগ করে দেওয়া হয়, তাহলে সংবেদনের বৃদ্ধি মোটেই অনুভূত হবে না। ন্যূনতম সংবেদন বৃদ্ধি অনুভব করতে হলে উদ্দীপকের তীব্রতাকে এক বিশেষ অনুপাতে বাড়াতে হবে।

উদ্দীপক ও সংবেদনেব মধ্যে সম্বন্ধ নির্ধারণ করার জন্য জার্মান বিজ্ঞানী হ্বেবার (Weber) একটি সূত্র প্রণয়ন কবেন এবং পরবর্তীকালে ফেকনার (*Fechner*) নামে আব একজন বিজ্ঞানী হ্বেবার প্রবর্তিত সূত্রটির কিছু পরিবর্তন সাধন করেন। উভয় বিজ্ঞানীর নামানুসারে এই পরিবর্তিত সূত্রটি 'হ্বেবার-ফেকনার সূত্র' (Weber-Fechne Law) নামে খ্যাতি লাভ করেছে।

হ্বেবার এর-সূত্র (Weber's Law): উদ্দীপকের শক্তি বাডালেই যে সংবেদন বৃদ্ধি পায় তা নয়' সংবেদনেব স্বল্পতম বৃদ্ধি বা ঠিক বোধগম্য পার্থক্য (just noticeable difference বা সংক্ষেপে J. n. d,) অনুভব করতে হলে মূল উদ্দীপকের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে একটা বিশেষ অনুপাতে তার পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে। পূর্ববর্তী উদ্দীপক ও পরবর্তী উদ্দীপকের মধ্যে যে পার্থক্যের দরুণ সংবেদনেব তীব্রতায় ঠিক বোধগম্য পার্থক্য অনুভূত হয় তাকে বলা হয় 'ন্যূনতম গ্রাহ্য পার্থক্য' (Difference Limen সংক্ষেপে D. L,)। হ্বেবারের মতে এই ন্যূনতম গ্রাহ্য পার্থক্য হচ্ছে দুটি উদ্দীপকের পরিমাণগত পার্থক্যের আপেক্ষিক অনুপাত। পরীক্ষণের ফলে জানা গেছে যে, এই ন্যূনতম গ্রাহ্য পার্থক্য হচ্ছে পূর্ববর্তী উদ্দীপকের একটি অপরিবর্তিত 'ভগাংশ (constant fraction)। সুতরাং হ্বেবার তাঁর সূত্রটি প্রণয়ন করলেন এইভাবে—'প্রতিক্ষেত্রে স্বল্পতম সংবেদন বৃদ্ধি বা ঠিক বোধগম্য সংবেদন বৃদ্ধি অনুভব করতে হলে প্রদত্ত উদ্দীপকের শক্তি বা তীব্রতাকে এক থেকে বৃহত্তর একটি অপরিবর্তিত ভগ্নাংশ দ্বারা বরাবর গুণ করে যেতে হবে অথবা উদ্দীপকেব শক্তিকে গুণোত্তর প্রগতিতে বাড়িয়ে যেতে হবে।'

উদাহরণ: ভার-সংবেদনের (Pressure sensation) একটি উদাহরণ নেওয়া যাক: যদি হাতের তালুর ওপর ৩ তোলা ওজনের কোন কিছু রাখা হয়, তাহলে সংবেদনের পরবর্তী স্বল্পতম বৃদ্ধি বা ঠিক বোধগম্য বৃদ্ধি অনুভব করার জন্য (অর্থাৎ,

যেটুকু বৃদ্ধি না করলে সংবেদনের বৃদ্ধি বা পার্থক্য অনুভূত হবে না এবং একেই ইংরেজীতে বলা হয় Just noticeable difference বা সংক্ষেপে (j. n. d.) ; ৩ তোলাকে ৪/৩ ভগ্নাংশ দিয়ে গুণ করতে হবে। তাহলে ওজন বেড়ে হবে (৩ × ৪/৩)= ৪ তোলা ন্যূনতম গ্রাহ্য পার্থক্য। আবার এই প্রদত্ত সংবেদনের স্বল্পতম বৃদ্ধি বা ঠিক বোধগম্য বৃদ্ধি অনুভব করতে হলে একে আবার ৪/৩ ভগ্নাংশ দিয়ে গুণ (৪ × ৪/৩) করতে হবে এবং এইভাবে ক্রমশঃ অগ্রসর হতে হবে। অর্থাৎ, উদ্দীপকের শক্তিকে ক্রমশঃ বাড়িয়ে যেতে হবে। এইভাবে ৩ তোলা, ৩ × ৪/৩ তোলা, ৩ × ৪/৩ × ৪/৩ তোলা, ৩ × ৪/৩ × ৪/৩ × ৪/৩ তোলা ইত্যাদি। এইভাবে যদি উদ্দীপকের শক্তি ক্রমশঃ বাড়িয়ে যাওয়া যায়, তাহলে ভাব-সংবেদনের ক্ষেত্রে প্রতি স্তরে স্বল্পতম সংবেদন বৃদ্ধি বা ঠিক বোধগম্য সংবেদন বৃদ্ধি অনুভূত হবে। সুতরাং প্রতি স্তরে সংবেদনের স্বল্পতম বৃদ্ধি বা ঠিক বোধগম্য বৃদ্ধি অনুভব করতে হলে উদ্দীপকের শক্তি বা তীব্রতাকে গুণোত্তর প্রগতিতে (Geometrical progression) বৃদ্ধি করতে হবে।

উদ্দীপক গুণোত্তর প্রগতিতে বাড়লে সংবেদন সমান্তর প্রগতিতে বাড়বে

ফেকনার-এর **সূত্র** (Fechner's Law) : ফেকনার হ্বেবারের পরীক্ষণ সূত্রটিকে অনুসরণ করে সূত্রটিকে নিম্নলিখিতভাবে পরিবর্তিত করলেন। তিনি উদ্দীপকের শক্তি বৃদ্ধি করা হেতু প্রতিবারে সংবেদনের যে স্বল্পতম বৃদ্ধি বা ঠিক বোধগম্য বৃদ্ধি ঘটেছে, তাকে সমান ধরে নিলেন। তাঁর মতে উদ্দীপকের শক্তির পরিমাণ এবং সেই পরিমাণের বৃদ্ধিকে যেমন অঙ্কে প্রকাশ করা যায় তেমনি সংবেদন ও সংবেদনের বৃদ্ধির অনুভূতিকেও অঙ্কে প্রকাশ করা যায়। কাজেই গণিতের ভাষায় ফেকনারের সূত্রটিকে এভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে—"উদ্দীপক যদি গুণোত্তর প্রগতিতে বাড়ে, সংবেদন তাহলে সমান্তর প্রগতিতে বাড়বে।"

যেমন : উদ্দীপক-বৃদ্ধি	ন্যূনতম বোধগম্য সংবেদন-বৃদ্ধি
৩ তোলা	'সং' (নিম্নতম সংবেদন)
৩ × ৪/৩ তোলা	সং + ১
৩ × ৪/৩ × ৪/৩ তোলা	সং + ২
৩ × ৪/৩ × ৪/৩ × ৪/৩ তোলা	সং + ৩
ইত্যাদি	ইত্যাদি

এখানে উদ্দীপককে গুণোত্তর প্রগতিতে বাড়ান হচ্ছে এবং অপরিবর্তিত ভগ্নাংশটি হল ৪/৩। সংবেদন সমান্তর প্রগতিতে বাড়ছে, অর্থাৎ প্রতিবারেই সংবেদন এক এক করে বাড়ছে। ফেকনারের মতে সংবেদনের স্বল্পতম বৃদ্ধির 'একক' হল ১।

অবশ্য এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, বিভিন্ন সংবেদনের ক্ষেত্রে অপরিবর্তিত ভগ্নাংশটি বিভিন্ন হয়ে থাকে। যেমন, ভার সংবেদনের বেলায় ১/৩০, যার উদাহরণ ওপরে দেওয়া হয়েছে। আলোর সংবেদনের ক্ষেত্রে ১/১০০, শব্দ সংবেদনের ক্ষেত্রে ১/৩ এবং চাপ সংবেদনের ক্ষেত্রে ১/২০।

সমালোচনা: সংবেদন ও উদ্দীপনার মধ্যে যে সম্পর্ক তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেবার জন্য মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে 'হেবার-ফেকনার' সূত্রটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সূত্রটির বিশেষ মূল্য এই যে, মানসিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে তাঁরাই সর্বপ্রথম গাণিতিক পরিমাপের প্রবর্তন করলেন। হেবার-ফেকনার উদ্দীপক ও সংবেদনকে পরিমাণগত মনোবিদ্যার ভাষায় ব্যাখ্যা করার জন্য চেষ্টা করেছেন। তবে সূত্রটির নিম্নলিখিত ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়—

হেবার-ফেকনার সূত্রের মূল্য

(১) হেবারের সূত্রটি মোটামুটি ঠিক, তবে সব সংবেদনের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য নয়। শ্রবণ, দৃষ্টি, চাপ এবং পেশী সংবেদনের ক্ষেত্রে মোটামুটিভাবে এ নিয়মটিকে প্রয়োগ করা যেতে পারে, কিন্তু তাপ সংবেদনের ক্ষেত্রে সুনিশ্চিতভাবে এই নিয়মটিকে প্রযুক্ত করা যায় না এবং স্বাদ ও ঘ্রাণ সংবেদনের ক্ষেত্রে এই সূত্রটি অপরীক্ষিত।

(২) হেবারের সূত্রটি সংবেদনের উচ্চতম সীমার ঠিক নীচে এবং সংবেদনের সর্বনিম্ন সীমার ঠিক ওপরে কার্যকর হয় না ও কেবলমাত্র মাঝামাঝি তীব্রতা বা শক্তি-বিশিষ্ট উদ্দীপকের বেলায় কার্যকর হয়।

(৩) ফেকনারের সূত্রটিও হেবারের সূত্রের মতো মোটামুটিভাবে সত্য এবং এই সূত্রটিও সংবেদনের পরিসরের মধ্যবর্তী স্তরেই সঠিকভাবে প্রযোজ্য।

(৪) সংবেদনের স্বল্পতম বৃদ্ধির পরিমাণ সব স্তরেই সমান—ফেকনারের এই অভিমত উপযুক্ত প্রমাণের দ্বারা সমর্থিত হয়নি। উদ্দীপকের শক্তি একটা বিশেষ অনুপাতে বাড়ার ফলে প্রতি স্তরে সংবেদনের বৃদ্ধির পরিমাণ এক, অর্থাৎ সংবেদন বৃদ্ধির একক সমান, এ অভিমত যুক্তিযুক্ত নয়। সংবেদন বৃদ্ধির একক নিরপেক্ষ (absolute) নয়, সাপেক্ষ (relative)।

(৫) ফেকনার প্রথম উদ্দীপকের সঙ্গে দ্বিতীয় উদ্দীপকের পার্থক্যের অনুপাত (ratio) নির্ণয় করেছেন কিন্তু প্রথম ন্যূনতম বোধগম্য সংবেদনের বৃদ্ধির সঙ্গে দ্বিতীয় ন্যূনতম বোধগম্য সংবেদন বৃদ্ধির অনুপাত দেখাননি।

(৬) জেম্‌স (James) ঠিকই বলেছেন যে, কোন তীব্র সংবেদন কতকগুলি

প্রাথমিক সংবেদনের সমষ্টি বা সংমিশ্রণ নয়। সংবেদনকে কোন অংশে বিভক্ত করা যায় না। ঘন নীল রঙের সংবেদন অনেকগুলি হালকা নীল রঙের সংবেদনের ক্রমিক যোগফল, একথা বলা যুক্তিসঙ্গত নয়। প্রতি সংবেদনেরই একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে, যে কারণে অন্য কোন সংবেদনের সঙ্গে তার পরিমাণগত তুলনা চলে না। বর্ধিত সংবেদন একটি নতুন সংবেদন, এক নতুন বোধ বা অভিজ্ঞতা।

কোন তীব্র সংবেদন কতকগুলি প্রাথমিক সংবেদনের সমষ্টি বা সংমিশ্রণ নয়

(৭) ফেকনার সংবেদনের সর্বনিম্ন পরিমাণ, অর্থাৎ কোন্ অবস্থায় সংবেদনের পরিমাণ 'শূন্য' হবে তা নির্দেশ করতে পারেন নি।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, হ্বেবার (Weber)-এর সূত্রটি ফেকনার (Fechner)-এর সূত্রের তুলনায় কম ত্রুটিপূর্ণ। ফেকনার হ্বেবারের সূত্রটিকে পরিবর্তিত করে যেভাবে প্রকাশ করেছেন সেই সূত্রটিই হ্বেবারের সূত্র নামে পরিচিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই সূত্রটি ফেক্‌নারের সূত্র। মনোবিদ্ স্টাউট (Stout)-এর পথ অনুসরণ করে এই সূত্রটিকে **হ্বেবার-ফেকনার সূত্র** (Weber-Fechner Law) বলাই যুক্তিসঙ্গত। এই সূত্রটিকে দেহ-মানবসম্পর্কীয় সূত্রও (Psycho-Physical Law) বলা হয়ে থাকে, কারণ এই সূত্রে সংবেদন, যেটি একটি মানসিক অবস্থা, তার সঙ্গে উদ্দীপকের, যেটি একটি দৈহিক অবস্থার সম্পর্ক নির্ধারণ করা হচ্ছে।

এই সূত্রটিকে দেহ-মানস সম্পর্কীয় সূত্রও বলা হয়

৬। সংবেদনের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Sensations) :

সংবেদনকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। যথা—**(ক) ইন্দ্রিয় সংবেদন** বা **বিশেষ সংবেদন** (Special sensations), **(খ) দৈহিক সংবেদন** (Organic sensations) এবং **(গ) পেশীগত সংবেদন** (Muscular sensations)।

(ক) ইন্দ্রিয় সংবেদন: আমাদের পাঁচটি ইন্দ্রিয় আছে; যথা—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা এবং ত্বক। বাইরের জগৎ এই সকল ইন্দ্রিয়ের ওপর ক্রিয়া করে আমাদের মনে পাঁচ প্রকারের সংবেদন সৃষ্টি করে; যথা—দৃষ্টিগত (Visual), শ্রবণগত (Auditory), স্পর্শগত (Tactual), ঘ্রাণগত (Olfactory) এবং স্বাদগত (Gustatory)।

(খ) দৈহিক সংবেদন: দেহের অভ্যন্তরে যেসব যন্ত্রগুলি অবস্থিত যেমন, পাকস্থলী, হৃদপিণ্ড, অন্ত্র, ফুসফুস প্রভৃতির ক্রিয়াকলাপের পরিবর্তনের জন্য যেসব সংবেদনের সৃষ্টি হয় তাদের দৈহিক সংবেদন বলে। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্লান্তি প্রভৃতি দৈহিক

সংবেদনের উদাহরণ। দেহের অভ্যন্তরস্থ যন্ত্রগুলি পরিপাকক্রিয়া, রক্ত সঞ্চালন, শ্বাসক্রিয়া প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপের উৎস।

(গ) পেশীগত সংবেদন: পেশীগুলি সঞ্চালিত হবার ফলে যে সংবেদনের উদ্ভব হয় তাকে পেশীগত সংবেদন বলে। বিভিন্ন কর্মসম্পাদনের জন্য আমাদের অঙ্গকে সঞ্চালিত করার প্রয়োজন। এই অঙ্গ সঞ্চালনের জন্য দেহের পেশী, তন্তু এবং দেহের বিভিন্ন সংযোগস্থলে পরিবর্তন ঘটে ও তারই ফলে এ ধরনের সংবেদন আমরা পেয়ে থাকি।

এবার বিস্তারিতভাবে এই তিন শ্রেণীর সংবেদন আলোচনা করা যাক:

(ক) **ইন্দ্রিয় সংবেদন** বা **বিশেষ সংবেদন**[1] (Special Sensations): আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই আমরা এই সংবেদন লাভ করি। বাইরের জগৎ আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির ওপর ক্রিয়া ক'রে উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। সেই উদ্দীপনা ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুক্ত অন্তর্মুখী স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কের সংবেদন কেন্দ্রে গিয়ে পৌছায়, তারই ফলে আমাদের মনে ইন্দ্রিয় সংবেদনের সৃষ্টি হয়। চোখ দিয়ে আমি লাল গোলাপ ফুলটি দেখি, এরই ফলে আমার দৃষ্টিগত সংবেদন হয়। কান দিয়ে কোন শব্দ শুনি, এতে আমার শ্রবণগত সংবেদন হয়। এই সংবেদনগুলির নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য আছে:

(১) এ জাতীয় সংবেদন জ্ঞানের উপাদান যোগায় এবং এই সংবেদনের সাহায্যে আমরা বাহ্যজগৎ সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করি। বস্তুর গুণ সম্পর্কে যে জ্ঞান, তা এইসব সংবেদনের মারফত আমাদের কাছে এসে থাকে। রঙের সংবেদন আমাদের বস্তুর রঙ সম্পর্কে জ্ঞান দেয়।

(২) এই জাতীয় সংবেদনগুলিকে পরস্পর থেকে সুস্পষ্টভাবে পৃথক করা চলে এবং বাইরের জগতেই যে তাদের উৎস রয়েছে তাও নির্ধারণ করা চলে।

সংবেদনগুলির মধ্যে মাত্রাগত তারতম্য

(৩) এই জাতীয় সংবেদনের মধ্যে গুণগত ও পরিমাণগত উভয় প্রকার পার্থক্য থাকে; যেমন, দৃষ্টিগত সংবেদন এবং শ্রবণগত সংবেদন—দুটি ভিন্ন সংবেদন। আবার এই দৃষ্টিগত সংবেদন; যেমন, উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোকের সংবেদন এবং প্রদীপের ক্ষীণ আলোকের সংবেদন। এগুলি একই জাতীয় সংবেদন হয়েও মাত্রাগত ভাবে পৃথক।

(৪) এই জাতীয় সংবেদন ইন্দ্রিয়নির্ভর, যেহেতু ইন্দ্রিয়গুলি বাইরের জগৎ থেকে

1. পাঁচটি বাহ্যেন্দ্রিয় বা জ্ঞানেন্দ্রিয়কে ইংরেজীতে Special sense organs বলা হয় এবং এগুলির দ্বারা উদ্ভূত সংবেদনকে Special Sensations বা বিশেষ সংবেদন বলা হয়।

উদ্দীপনা গ্রহণ করে অন্তর্মুখী স্নায়ুর সাহায্যে তাকে মস্তিষ্কের সংবেদন কেন্দ্রে পৌঁছে দেয়। এই বৈশিষ্ট্যই বিশেষ ক'রে ইন্দ্রিয় সংবেদনকে দৈহিক সংবেদন থেকে পৃথক করে।

(খ) **দৈহিক সংবেদন** (Organic Sensations): দেহের মধ্যে অসংখ্য যন্ত্র আছে; যেমন—ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড, পাকস্থলী, যকৃত, নানারকমের গ্রন্থি ইত্যাদি। এই আভ্যন্তরীণ যন্ত্রগুলির মধ্যে যখন কোন পরিবর্তন দেখা দেয় এবং সেই পরিবর্তনের ফলে উদ্দীপনা যখন স্নায়ুপথ বেয়ে মস্তিষ্কে গিয়ে পৌঁছায় তখন আমরা যে সংবেদন পেয়ে থাকি তাকেই দৈহিক সংবেদন বলে। এই দৈহিক সংবেদন বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে।

প্রথমতঃ, এমন কতকগুলি দৈহিক সংবেদন আছে, যে সংবেদনের উৎসস্থল আমরা সঠিকভাবে এবং সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করতে পারি (those that are localisable)। যেমন, দেহের কোন স্থান যদি কেটে যায় বা পুড়ে যায় তাহলে দগ্ধ স্থানটি বা ক্ষতস্থানটি আমরা সুস্পষ্টরূপে নির্দেশ করতে পারি।

দ্বিতীয়তঃ, এমন কতকগুলি দৈহিক সংবেদন আছে যেগুলিকে আমরা অস্পষ্টভাবে নির্দেশ করতে পারি (vaguely localisable)। যেমন—যকৃৎ, হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, পাকস্থলীর ক্রিয়াকলাপ ইত্যাদি। এই সব যন্ত্রগুলির ক্রিয়াকলাপ যখন সুস্থ বা স্বাভাবিকভাবে হতে থাকে, তখন কোনরকম সংবেদন আমরা পাই না। কিন্তু যদি পাকস্থলীর কাজ স্বাভাবিকভাবে না ঘটে, তাহলেই আমরা সংবেদন পেয়ে থাকি এবং এই সংবেদনের স্থান অস্পষ্টভাবে নির্দেশ করতে পারি।

কতকগুলি অস্পষ্টভাবে নির্দেশ করা যায়

তৃতীয়তঃ, এমন কতকগুলি দৈহিক সংবেদন আছে, যেগুলির স্থান দেহের মধ্যে কোথাও নির্দেশ করা সম্ভব হয় না (not localisable)। যেমন, আরাম বা অস্বস্তির অনুভূতি। এই ধরনের সংবেদন হয় সমস্ত শরীরটাকে জুড়ে। এ হল ভিন্ন ভিন্ন সংবেদনের একটি মিশ্রিত রূপ। একেই স্টাউট (*Stout*) বলেছেন 'common sensibility' বা 'Conæsthesis'। শরীরে অস্বস্তি অনুভব করছি, কিন্তু এর উৎস দেহের কোথায় তা নির্দেশ করা সম্ভব হয় না। ক্লান্তি, অবসন্নতা, তন্দ্রা, সজীবতা প্রভৃতিও এই জাতীয় সংবেদনের উদাহরণ।

কতকগুলি দৈহিক সংবেদন কোথাও নির্দেশ করা যায় না

এই সব দৈহিক সংবেদনের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে:

প্রথমতঃ, এই ধরনের সংবেদনের উদ্দীপক দেহের অভ্যন্তরে অবস্থিত, দেহের

বাইরে নয়। বহিঃইন্দ্রিয়গুলি, যথা—চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা ও ত্বক-এর সঙ্গে এদের কোন সংযোগ নেই। দেহের অভ্যন্তরীণ পরিবর্তনই এগুলির কারণ।

দ্বিতীয়তঃ, বাইরের জগতের সংবাদ সরবরাহ করার ব্যাপারে এদের অবদান খুবই সামান্য। এগুলি শরীরের অভ্যন্তরীণ অবস্থার সংবাদ দিয়ে থাকে। বস্তুতঃ, এই সংবেদনগুলি দেহের সুস্থতা নির্দেশ করার যন্ত্রস্বরূপ।

তৃতীয়তঃ, এগুলি হল আদিমতম সংবেদন (Primitive type of sensation) যেগুলি সম্ভবতঃ সর্বস্তরের জীবের মধ্যে বর্তমান।

চতুর্থতঃ, ইন্দ্রিয়গত সংবেদনের তুলনায় এগুলি অস্পষ্ট এবং পরস্পর থেকে এগুলিকে পৃথক করাও কঠিন। এগুলির পরস্পরের সঙ্গে মিশে যাওয়ার প্রবণতা আছে এবং এগুলিকে সহজে ফিরে পাওয়া যায় না। ক্ষুধা এবং তৃষ্ণার সংবেদন স্মরণ করা খুবই কঠিন।

পঞ্চমতঃ, এই ধরনের সংবেদনের অনুভূতি-সম্পর্কীয় মূল্য জ্ঞান-সম্পর্কীয় মূল্যের তুলনায় অনেকখানি বেশী। কারণ আমাদের জীবনের সুখ-দুঃখের অনেকখানি শারীরিক সুস্থতা ও অসুস্থতার ওপর নির্ভরশীল। আবার এই সব সংবেদন আমাদের দেহগত কামনা-বাসনার মূলে বর্তমান যা আমাদের আচরণ নির্ধারণ করে।

(গ) **পেশীগত সংবেদন** (Motor or Muscular Sensations): দেহের কোন অংশ সঞ্চালিত করলে দেহের সেই অংশের পেশীগুলি সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হয়। পেশী (muscle), অস্থিবন্ধনী (joints) এবং অস্থির সংযোগস্থলে (tendons) যেসব অন্তর্মুখী স্নায়ুর প্রান্ত এসে মিশেছে, পেশীগুলির সঙ্কোচন ও প্রসারণের ফলে সেসব স্নায়ু উদ্দীপিত হয় এবং এই উদ্দীপনা যখন মস্তিষ্কে গিয়ে পৌঁছায়, তখনই পেশীগত সংবেদন হয়ে থাকে। চোখে না দেখেও যে আমাদের দেহের কোন্ অংশটি সঞ্চালিত করছি, তা যে জানতে পারি তার কারণ এই পেশীগত সংবেদন।

পেশীগত সংবেদনের পরিচয়

পেশীগত সংবেদন এবং ত্বকজাত সংবেদন একই প্রকার সংবেদন নয়। ত্বকজাত সংবেদন সংঘটিত হয়, যখন দেহের বহিরাবরণের সঙ্গে কোন উদ্দীপকের সংযোগ ঘটে, আর পেশীগুলিকে সঞ্চালিত করলে যে সংবেদন পেয়ে থাকি, তা হল পেশীগত বা চেষ্টীয় সংবেদন। ত্বকজাত সংবেদনের সংগ্রাহক (receptor) হল ত্বক এবং চেষ্টীয় সংবেদনের সংগ্রাহক হল পেশী। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সঞ্চালিত করার জন্য এই সংবেদন উদ্ভূত হয় বলে টিচেনার (Titchener) প্রমুখ মনোবিদ্‌গণ পেশীগত সংবেদনকে চেষ্টা-বেদন বা চেষ্টীয় সংবেদন (Motor or Kinaesthic)-এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

আমাদের দু-ধরনের পেশী আছে, কতকগুলি পেশী ইচ্ছার অধীন (voluntary); যেমন, দেহের স্কন্ধের এবং মুখের পেশীগুলি। আর কতকগুলি পেশী আছে যেগুলি আমাদের ইচ্ছার অধীন নয় (non-voluntary); যেমন, পাকস্থলী বা হৃৎপিণ্ডের বহিরাবরণের সঙ্গে যুক্ত যে পেশীগুলি।

পেশীগত সংবেদনের ক্ষেত্রে ত্বকজাত সংবেদনও বর্তমান থাকতে পারে। যখন আমাদের দেহের বহিরাবরণটি কোন কারণে সঙ্কুচিত হয় তখন পেশীগুলিকে অত্যধিক সঞ্চালিত করার জন্য রক্তচলাচল বেড়ে যায়, হৃৎপিণ্ডের গতি বেড়ে যায় এবং শ্বাস দ্রুত হয়।

আমরা পেশীগত চেতনার (muscle consciousness) কথা বলে থাকি। পেশীগত চেতনা হল দেহের কোন একটি অংশে শক্তি সঞ্চারিত করে পেশীগুলিকে সঙ্কুচিত ও প্রসারিত করার চেতনা এবং পেশীগত সংবেদন (muscular sensation) হল পেশী, অস্থিবন্ধনী ও অস্থির সংযোগস্থল থেকে উদ্ভূত যে সংবেদন। সুতরাং পেশীগত চেতনার মধ্যে দুটি দিক আছে, একটি সক্রিয়তার এবং অপরটি নিষ্ক্রিয়তার বোধ। আমি যখন জানালাটি খোলার জন্য ধাক্কা দিচ্ছি, তখন যে দেহে আমিই শক্তি সঞ্চার করছি সে বোধ হল সক্রিয়তার বোধ। আর এই শক্তি সঞ্চারিত করাব ফলে, যে পেশী সংবেদন হয়, তাহল নিষ্ক্রিয়তার বোধ।

পেশীগত চেতনা ও পেশীগত সংবেদন

পেশীগত সংবেদনকে তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যথা—(১) অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অবস্থানগত পেশীগত সংবেদন—যখন হাতটিকে না নাডিয়ে সোজা করে রাখি, তখন হাতটির বিশেষ অবস্থানই একপ্রকার পেশীগত সংবেদনের সৃষ্টি করে। (২) অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অবাধ সঞ্চালনগত পেশীগত সংবেদন —যখন সামনে এবং পেছনের দিকে হাতটি নাড়াচাড়া করি, তার ফলে যে পেশীগত সংবেদন হয়। (৩) অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বাধাপ্রাপ্ত সঞ্চালনের ফলে যে পেশীগত সংবেদন—কোন মানুষকে ধাক্কা দিতে গিয়ে বা ভার উত্তোলন করার সময় এই সংবেদন হয়ে থাকে।

পেশীগত সংবেদন তিন প্রকার

পেশীত সংবেদন গুণগত এবং পরিমাণগত, উভয় দিক দিয়েই পৃথক হতে পারে। পেশীগত সংবেদনের গুণ নির্ধারণ করা হয় তার নিষ্ক্রিয়তার উপকরণের দ্বারা (কারণ, সক্রিয়তার দিকটি সকল ক্ষেত্রেই একপ্রকার) এবং কত জোড়া পেশীকে কাজে লাগান হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ আমার ডান হাতটা ডান দিকে এবং বাম দিকে নাড়াবার সময় আমি একরকম সংবেদন অনুভব করি এবং পেছন দিকে নাড়াবার সময় ভিন্ন জাতীয়

পেশীগত সংবেদন—গুণগত এবং পরিমাণগত

পেশীগত সংবেদন অনুভব করি, কারণ এক্ষেত্রে দুই প্রস্থ পেশীকে কাজে লাগান হয়েছে।

পেশীগত সংবেদনের পরিমাণ বা তীব্রতা বলতে কতটা শক্তি পেশীগুলিকে সঞ্চালিত করার জন্য নিয়োগ করা হচ্ছে তার বোধ এবং তার সঙ্গে নিষ্ক্রিয়ভাবে পেশীগত সংবেদন কতটুকু পাওয়া গেল, উভয়কেই বুঝতে হবে।

পেশীগত সংবেদনের ব্যাপ্তি (Extensity) বলতে কতটুকু জায়গা জুড়ে সংবেদন হল তা বোঝায়। একটি আঙুল নাড়লে যে সংবেদন হয় আর হাঁটু বেঁকিয়ে বসতে গেলে যে সংবেদন হয়—উভয়ের মধ্যে ব্যাপ্তির পার্থক্য।

পেশীগত সংবেদনের জ্ঞানগত মূল্য

পেশীগত সংবেদনের জ্ঞানগত মূল্য অনেকখানি। পদার্থের মৌলিক গুণ সম্পর্কে জ্ঞান এবং পদার্থের অবস্থান, বিস্তৃতি, ওজন, দূরত্বের জ্ঞান এই পেশীগত সংবেদনের মারফত হয়ে থাকে। পেশীগত সংবেদনের অনুভূতিমূলক মূল্যও কম নয়। পেশীগত ব্যায়াম আমাদের আনন্দ দেয়। পেশী সুস্থ থাকলে মানুষ সুস্থ ও কর্মক্ষম থাকে।

৭। ইন্দ্রিয় সংবেদন (Special Sensations) :

আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি যে, ইন্দ্রিয় সংবেদন (Special Sensations) পাঁচ প্রকার ; যথা—স্বাদগত (Taste or Gustatory), ঘ্রাণগত (Smell or Olfactory), ত্বকজাত (Tactual or Cutaneous), শ্রবণগত (Auditory) এবং দৃষ্টিগত (Visual)। এইবার আমরা এই বিভিন্ন প্রকারের ইন্দ্রিয় সংবেদন একে একে আলোচনা করব :

(i) **স্বাদগত সংবেদন** (Taste or Gustatory Sensations) : স্বাদ গ্রহণ করার ইন্দ্রিয় হল জিভের উপরিভাগ। জিভের উপরিভাগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানার মতো কতকগুলি উন্নত বিন্দু আছে ; এগুলিকে বলা হয় প্যাপিলা (Papillae)। বড় বড় প্যাপিলার গর্তের মধ্যে কতকগুলি কোরক আছে, যেগুলিকে বলা হয় স্বাদকোরক (Taste buds or Taste bulbs)।

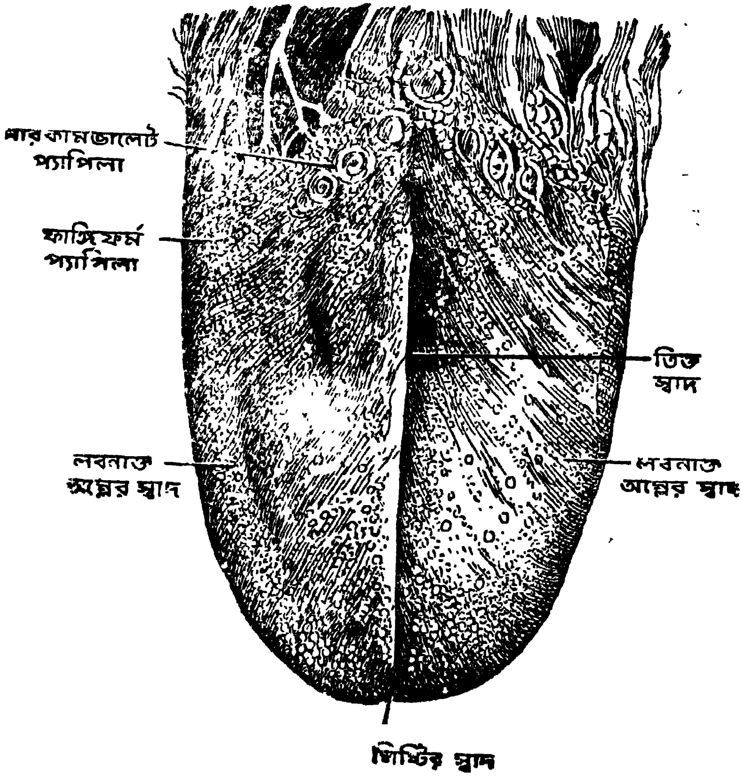
স্বাদকোরক ও স্বাদকোষ

এই স্বাদকোরকগুলিই স্বাদ গ্রহণ করার আসল ইন্দ্রিয়। এই-গুলিই স্বাদ গ্রহণের জন্য গ্রাহকযন্ত্র (receptors)। প্রত্যেকটি স্বাদকোরকের মধ্যে স্বাদ গ্রহণ করার জন্য কতকগুলি স্বাদকোষ (Taste cells) আছে। খাদ্যবস্তু জিভের লালার সংস্পর্শে এসে যখন তরল অবস্থা প্রাপ্ত হয় তখনই তার স্বাদ পাওয়া যায়। বস্তুটি তরল অবস্থায় পরিণত হয়ে প্যাপিলার ধার দিয়ে স্বাদকোরকের ছিদ্রপথ অতিক্রম করে স্বাদকোষে গিয়ে পৌঁছলে স্বাদকোষের সন্নিহিত স্বাদ-সম্পর্কীয় স্নায়ু (Taste

nerves) উদ্দীপিত হয় এবং ঐ উদ্দীপনা মস্তিষ্কে পৌছলে আমরা বস্তুর স্বাদ লাভ করি। জিভের উপরিভাগে যখন একটা চিনির ডেলা রাখা হয়, তখন সেটি জিভের সংস্পর্শে এসে তরল পদার্থে পরিণত হয় এবং তখনই আমরা চিনির স্বাদ পাই।

স্বাদগত সংবেদন সৃষ্টি করার উদ্দীপক হল তরল পদার্থ

সুতরাং স্বাদগত সংবেদন সৃষ্টি করার উদ্দীপক হল তরল অবস্থার কোন রাসায়নিক পদার্থ (chemical substance)। কোষগুলিকে উদ্দীপিত করার জন্য বস্তুটি তরল হওয়া দরকার। তাছাড়া, স্বাদ-ইন্দ্রিয় এবং উদ্দীপকের মধ্যে একটা রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটে থাকে এবং উদ্দীপনা স্বাদ-সম্পর্কীয় স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কে গিয়ে পৌছায়।



বিভিন্ন প্যাপিলাসহ জিহ্বার চিত্র

জিভের সব অংশই সবরকম স্বাদ গ্রহণ করার পক্ষে উপযোগী নয়। কতকগুলি প্যাপিলা কেবলমাত্র মিষ্ট বস্তুর, কতকগুলি তিক্ত বস্তুর এবং কতকগুলি অম্ল বস্তুর স্বাদে সাড়া দেয়। অনেকগুলি প্যাপিলা কেবলমাত্র চারটি স্বাদের মধ্যে দু-তিনটিতে,

আবার অনেকগুলি চারটি স্বাদেই সাড়া দিয়ে থাকে। কিন্তু জিভের পশ্চাদভাগের সারকামভালেট প্যাপিলা (Circumvallate papillae) অংশে তিক্ততার অনুভূতি তীব্র হয়। অম্ল বস্তুর স্বাদ গ্রহণের ক্ষমতা জিভের মধ্য অংশে সর্বাধিক এবং জিভের ধারের দিকে মধ্য অংশে অত্যন্ত তীব্র। জিভের অগ্রভাগ লবণাক্ত বস্তুর স্বাদ গ্রহণ ক্ষমতায় সবচেয়ে উপযোগী। জিভের সম্মুখস্থ অংশের উপরিভাগ, যা জিভের দুটি প্রান্ত থেকে দূর অর্থাৎ মধ্যস্থলে অবস্থিত, সেটি স্বাদ-সংবেদন বর্জিত। জিভের অগ্রভাগ মিষ্ট বস্তুর স্বাদ চট্ করে গ্রহণ করতে পারে। জিভের মধ্যভাগ এবং মূলোদেশ তিক্ত স্বাদ গ্রহণে এবং জিভের দুপাশ অম্লরসের স্বাদ গ্রহণে অতি সহজেই সক্ষম হয়। জিভের দুপাশে এবং আগায় আছে ফাঙ্গিফর্ম প্যাপিলা (Fungiform papillae)। জিভের উপরিভাগের সব অংশটুকুই লবণাক্ত বস্তুর স্বাদ গ্রহণে সক্ষম।

ফাঙ্গিফর্ম প্যাপিলা

বিশুদ্ধ স্বাদগত সংবেদন বা মৌলিক স্বাদ (simple taste) হল চার প্রকারের— মিষ্ট (sweet), অম্ল (sour), লবণাক্ত (salt) ও তিক্ত (bitter) উদাহরণ: যথাক্রমে চিনি, লেবুর রস, লবণ ও কুইনাইন। অন্যান্য স্বাদগুলি যৌগিক স্বাদ (compound taste)। যে বস্তুই আস্বাদ করি না, তার স্বাদ এই চারিটির একটি বা এদের সংমিশ্রণের কোন একটি রূপ হবে।

স্বাদগত সংবেদনগুলি অন্য সংবেদনের সঙ্গে মিশে থাকে, বিশেষ করে স্বাদগত সংবেদন ঘ্রাণজ সংবেদনের সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রে মিশে থাকে। বস্তুর গন্ধ না পেলে বিভিন্ন বস্তুর আস্বাদের তারতম্য নির্ণয় করা অনেক সময় কঠিন হয়ে পড়ে। মনোবিদ্ স্টাউট (Stout)-এর মতে যদি আমরা চোখ বুজে থাকি এবং নাক বন্ধ করে রাখি তাহলে পেঁয়াজের আস্বাদ এবং আপেল বা আলুর স্বাদের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা কঠিন হবে। কোন কোন বস্তুর স্বাদ নির্ণয় করার ব্যাপারে স্পর্শগত সংবেদনেরও একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। লঙ্কা এবং সরষের ঝাঁঝালো স্বাদ স্পর্শগত সংবেদনের সঙ্গে মিশে থাকে। অম্ল এবং লবণাক্ত আস্বাদের মূলেও স্পর্শগত সংবেদন। গরম চায়ের স্বাদ আমাদের ভাল লাগে, তার কারণ স্বাদের সঙ্গে স্পর্শগত সংবেদনের মিশ্রণ ঘটে। এ ছাড়া স্বাদগত সংবেদনের সঙ্গে দৈহিক সংবেদনও (Organic Sensation) মিশে থাকে। কোন খাবার খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গা বমি বমি করে, এক্ষেত্রে বস্তুটির আস্বাদের সঙ্গে দৈহিক সংবেদনও যুক্ত রয়েছে।

স্বাদগত-সংবেদন ঘ্রাণজ সংবেদনের সঙ্গে মিশে থাকে

স্বাদগত সংবেদনের একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল যে, এই জাতীয় সংবেদন অস্পষ্ট এবং এগুলিকে পরস্পর থেকে সুস্পষ্ট ভাবে পৃথক করা যায় না। আবার স্বাদগত সংবেদন হল আপেক্ষিক (relative)। নোন্‌তা জিনিস খাবার পর পরিশ্রুত জল পান করলে তা মিষ্টি লাগবে।

স্বাদগত সংবেদনের জ্ঞানগত মূল্য বিশেষ নেই। বাইরের জগতের বস্তুর গুণ সম্পর্কে ধারণা স্বাদের সাহায্যে খুব অল্পই লাভ করা যায়। কিন্তু এর অনুভূতি সম্পর্কীয় মূল্য খুব বেশী। এই সংবেদন মনে সুখ-দুঃখের অনুভূতি জাগায়।

(ii) **ঘ্রাণগত সংবেদন** (Smell or Olfactory Sensation) ঃ ঘ্রাণ গ্রহণ করার ইন্দ্রিয় হল নাকের মধ্যে অবস্থিত একটি জালবৎ ত্বক বা ঝিল্লী (nasal membrane) যেটি স্নায়ুকোষের দ্বারা গঠিত। এর বহিঃপ্রান্তগুলি বাতাসের সংস্পর্শে আসতে পারে। স্নায়ুকোষের ভিতরের দিক থেকে যেসব স্নায়ু নির্গত হয়েছে, সেগুলিকেই গন্ধবাহী স্নায়ু বলে। ঘ্রাণগত সংবেদনের উদ্দীপক হল বাষ্প বা গ্যাসীয় কোন পদার্থ। গন্ধময় গ্যাসীয় কণা যখন নাকে এসে প্রবেশ করে, তখন স্নায়ুকোষে এক প্রকার রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটে এবং গন্ধবাহী স্নায়ু মস্তিষ্কের ঘ্রাণ-সংবেদন কেন্দ্রে সেই উদ্দীপনা বহন করে নিয়ে যায়। তখনই ঘ্রাণের সংবেদন সৃষ্ট হয়।

কি করে ঘ্রাণ লাভ করি

অসংখ্য রকম গন্ধ আছে। সবরকমের গন্ধের নাম উল্লেখ করা বা শ্রেণীবিভাগ করা সম্ভব নয়। এছাড়াও গন্ধের নানারকম সংমিশ্রণ সম্ভব। ডাচ মনোবিদ্ হেনীং (***Henning***) ছয়টি প্রথমিক গন্ধের কথা উল্লেখ করেছেন। যথা—(১) সুগন্ধ সম্পর্কীয় (Fragrant) যেমন—গোলাপ, বেলফুল, রজনীগন্ধা, (২) ফল বা ইথর জাতীয় (Fruity or Ether), যেমন—আপেল, আঙুর, কমলালেবু, বেল ইত্যাদি ; (৩) ধুপধুনা জাতীয় (Resinous), যেমন—তার্পিন তেল, ধুনা ; (৪) মশলা জাতীয় গন্ধ (Spicy), যেমন—এলাচ, দারুচিনি, লবঙ্গ প্রভৃতি ; (৫) পোড়াজাতীয় (burned), যেমন—আলকাতরা, তামাকের ধোঁয়া এবং (৬) পচাজাতীয় (putrid), যেমন—মৃত-জন্তুর শবের গন্ধ, হাইড্রোজেন, সালফাইড ইত্যাদি।

হেনীং-এর গন্ধের শ্রেণীবিভাগ

এগুলি মৌলিক গন্ধ হলেও এদের অন্তর্বর্তী গন্ধের সংখ্যাও কম নয়। যেমন, মশলাজাতীয় এবং ইথর জাতীয় গন্ধের অন্তবর্তী গন্ধ হল পিপারমেণ্টের গন্ধ। বিশুদ্ধ গন্ধ পাওয়া খুবই কঠিন।

ঘ্রাণগত সংবেদন অন্যান্য সংবেদনের সঙ্গে মিশে থাকে। সেক্ষেত্রে সেটি বিশুদ্ধ ঘ্রাণগত সংবেদন না হয়ে মিশ্র সংবেদনের রূপ লাভ করে। ঘ্রাণগত সংবেদন স্পর্শগত সংবেদনের সঙ্গে মিশে থাকতে পারে, যেমন, নস্যির গন্ধ। নস্যি নাকে দেবার সময় নাকের সঙ্গে স্পর্শের ফলে স্পর্শগত সংবেদন হয়, যেটি ঘ্রাণগত সংবেদনের সঙ্গে মিশে থাকে। ঘ্রাণগত সংবেদন দৈহিক সংবেদনের সঙ্গে মিশে থাকতে পারে। যেমন—বদ্ধ ঘরের বোটকা গন্ধে যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। ঘ্রাণগত সংবেদন স্বাদগত সংবেদনের সঙ্গে মিশে থাকে, যেমন—সুখাদ্যের গন্ধ।

ঘ্রাণগত সংবেদন অন্যান্য সংবেদনের সঙ্গে মিশে থাকে

ঘ্রাণগত সংবেদনের জ্ঞানগত মূল্য বিশেষ নেই, তবে অনুভূতিমূলক মূল্য আছে। কোন কোন গন্ধ আমাদের মনকে সতেজ রাখে, প্রফুল্ল রাখে; আবার কোন কোন ঘ্রাণ মনকে বিমর্ষ করে তোলে।

ঘ্রাণগত সংবেদনের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল যে, বেশীক্ষণ স্থায়ী হলে এই সংবেদনে আমরা এতই অভ্যস্ত হয়ে পড়ি যে, এই সংবেদন আর পাওয়া যায় না। মাছের বাজারে ঢুকতেই মাছের গন্ধ নাকে এসে ঢোকে। কিন্তু যারা মাছ বিক্রি করছে তাদের নাকে আর গন্ধ লাগে না। তাছাড়া ঘ্রাণ গ্রহণের ক্ষমতা সব মানুষের সমান নয়। অল্পেতেই অনেকে গন্ধ পেয়ে থাকে যা অপর মানুষে পায় না। আবার দেখা যায় যদি কোন মানুষ প্রথমে দুর্গন্ধময় বস্তুর ঘ্রাণ নিয়ে পরে সুগন্ধযুক্ত বস্তুর ঘ্রাণ নেয় তাহলে শেষোক্ত গন্ধটিকে সে বেশ স্পষ্ট এবং তীব্রভাবে অনুভব করে।

ঘ্রাণগত সংবেদন : বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না

(iii) **স্পর্শগত** বা **ত্বকজাত সংবেদন** (Tactual or Cutaneous Sensation) : পঞ্চেন্দ্রিয়ের মধ্যে ত্বক একটি উল্লেখযোগ্য ইন্দ্রিয়। ত্বকের বিশেষত্ব এই যে, এই ইন্দ্রিয়টি আমাদের দেহের কোন একটি বিশেষ অংশে সীমাবদ্ধ নয়; মাথা থেকে পা পর্যন্ত সর্বত্র বিস্তৃত। স্পর্শগত বা ত্বকজাত সংবেদনের উৎস হল আমাদের দেহের ওপরের চামড়ার বহিরাবরণটি। এই চামড়ার বহিরাবরণটির সঙ্গে বাইরের জগতের কোন বস্তুর যখন সংযোগ ঘটে তখনই স্পর্শ, চাপ, উষ্ণতা ও শীত অনুভূত হয়। *চর্ম বা ত্বকের তিনটি স্তর আছে। ওর উপরের স্তরটির* নাম হল উপত্বক বা 'এপিডারমিস' (Epidermis), মধ্যবর্তী স্তরটির নাম হল ত্বক বা 'ডারমিস' (Dermis)। এই স্তরটি অতি সহজেই উদ্দীপিত হয়। তৃতীয় স্তর অর্থাৎ, যেটি একেবারে ভিতরে অবস্থিত সেটি চর্বির দ্বারা গঠিত।

চামড়ার বহিরাবরণ স্পর্শগত বা ত্বকজাত সংবেদনের উৎস

(ত্বকের দ্বিতীয় স্তরটিই স্পর্শগত সংবেদনের প্রকৃত উৎস।) এটি ঘন ও নমনীয় তন্তুর দ্বারা গঠিত। বিভিন্ন স্নায়ুর প্রান্তভাগ এই স্তরে এসে শেষ হয়েছে এবং এগুলি থেকে সূক্ষ্ম শাখা-প্রশাখা আবার চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। যখন কোন উদ্দীপক ত্বকের উপরিভাগের স্তরটি বা এপিডারমিসের ওপর চাপ দেয় বা স্তরটির সঙ্গে কোন উষ্ণ বা ঠাণ্ডা বস্তুর সংযোগ ঘটে তখন এর তলদেশে যে স্নায়ুগুলি বর্তমান সেগুলির প্রান্তদেশ উদ্দীপিত হয় এবং স্নায়ুগুলি উদ্দীপনা গ্রহণ করে স্নায়ুপথ দিয়ে তাকে মস্তিষ্কের সংবেদন কেন্দ্রে বহন করে নিয়ে যায়। তখনই আমরা স্পর্শগত সংবেদন অনুভব করি।

কিভাবে স্পর্শগত সংবেদন পাই

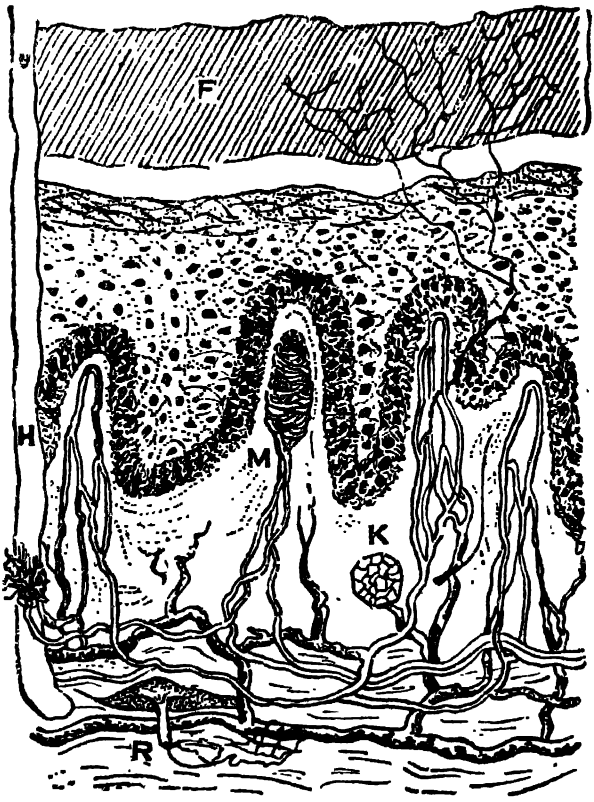
ত্বকজাত সংবেদনকে মোট চার শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। এগুলি হল— **শৈত্য সংবেদন** (Cold sensation), **উষ্ণতা সংবেদন** (Heat sensation), **বেদনা সংবেদন** (Pain sensation) এবং **চাপ সংবেদন** বা **স্পর্শজাত সংবেদন** (Pressure sensation or Touch sensation)। এই চার প্রকারের সংবেদনের গ্রহণ কেন্দ্রও ভিন্ন। উপরিউক্ত সংবেদন অনুযায়ী এই চারিটি কেন্দ্র হল **শৈত্য কেন্দ্র** (Cold spot), **উষ্ণতা কেন্দ্র** (Heat spot), **বেদনা কেন্দ্র** (Pain spot) এবং **চাপ কেন্দ্র** বা **স্পর্শ কেন্দ্র** (Pressure or Touch spot)। আমাদের চামড়ার নীচে এই কেন্দ্রগুলি অবস্থিত। এগুলি অতি সূক্ষ্ম বিন্দুর মতো। প্রতিটি কেন্দ্রের একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বা ধর্ম আছে। শৈত্য কেন্দ্র কেবলমাত্র শৈত্য সংবেদনেরই উৎস, উষ্ণতার সংবেদন সেখান থেকে পাওয়া যায় না। যদি একটা সূচ দিয়ে শরীরের কতকগুলি অংশ ধীরে ধীরে স্পর্শ করা যায় তাহলে দেখা যাবে কোন কোন অংশ থেকে শৈত্য সংবেদন পাওয়া যাচ্ছে। এগুলি হল শৈত্য কেন্দ্র। এমন কি যদি সূচের অগ্রভাগটিকে একটু উত্তপ্ত করে নেওয়া হয় তাহলেও শৈত্য কেন্দ্র থেকে কেবল শৈত্য সংবেদন পাওয়া যাবে। এই জাতীয় তাপ উদ্দীপক থেকে পাওয়া শৈত্য সংবেদনকে উডওয়ার্থ বলেছেন, 'আপাত-বিরুদ্ধ শৈত্য সংবেদন' (Paradoxical Cold Sensation)। আমাদের ত্বকের সমস্ত অংশ সমান সংবেদনশীল নয়। বিশেষ বিশেষ অংশ বিশেষ বিশেষ উদ্দীপক প্রয়োগে সাড়া দেয়।

ত্বকজাত সংবেদনের শ্রেণীবিভাগ

শৈত্য কেন্দ্র ও উষ্ণতা কেন্দ্র

এই সংবেদন কেন্দ্রগুলি যদিও দেহের বিভিন্ন অংশে ছড়ানো আছে তবু সমানভাবে ছড়ানো নেই। আঙুলের অগ্রভাগে স্পর্শ কেন্দ্রের সংখ্যা অধিক। গণ্ডদেশে উষ্ণতার কেন্দ্র বেশী। তাপ, শৈত্য এবং চাপ কেন্দ্রের তুলনায় বেদনা কেন্দ্রের

সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। ওষ্ঠ, দন্ত এবং জিভের অগ্রভাগে বেদনা কেন্দ্র আছে। চোখের কর্নিয়াতে বেদনা কেন্দ্র অধিক পরিমাণে আছে। মুখের ভেতরে উষ্ণতা কেন্দ্রের সংখ্যা কম এবং গণ্ডদেশের ভেতরের কয়েকটি অংশে একেবারেই নেই। কপালেই শৈত্য কেন্দ্রগুলির সংখ্যা বেশী। ত্বকজাত বেদনার সংবেদন ও বেদনার অনুভূতি সম্পূর্ণ পৃথক। অনেক ত্বকজাত সংবেদন হল মিশ্রিত সংবেদন। যেমন, আর্দ্রতার সংবেদন হল শৈত্য ও চাপ সংবেদনের মিশ্রণ।



ত্বকের মধ্যে সংবেদন স্নায়ুর প্রান্তভাগ

K—Krause'send bulb ; R—Ruffini's cylinder ; H—Hair follicle ; M—Mesisner's corpuscle's ; F—Free nerve endings.

ত্বকে অবস্থিত বিভিন্ন শ্রেণীর সংগ্রাহক ইন্দ্রিয়ের (receptor organ) উদ্দীপনার ফলে বিভিন্ন শ্রেণীর সংবেদন উৎপন্ন হয়। কতকগুলি মুক্ত স্নায়ুপ্রান্ত (free nerve ending) বেদনা সংবেদনের সংগ্রাহক। আমাদের দেহের উপরিভাগে যে কেশরাজি

রয়েছে সেগুলি চামড়ার নীচের মধ্যবর্তী স্তর থেকে উঠেছে। এই কেশরাশির প্রান্ত ভাগের সঙ্গে স্নায়ু আছে, সে কারণে এই কেশরাশি আকর্ষণ করলে তার সঙ্গে সংলগ্ন স্নায়ুগুলিও উদ্দীপিত হয়ে ওঠে এবং আমরা বেদনা সংবেদন (Pain sensation অনুভব করি। চাপ সম্পর্কীয় সংবেদনের (Pressure sensation) সংগ্রাহক ইন্দ্রিয় হল মাইস্নার এবং প্যাসিনি আবিষ্কৃত রক্তকণিকা। দেহের যেসব স্থানে কেশরাজি নেই, যেমন হাতের তালু বা পায়ের তলার চামড়ার নীচে, সে সব স্থানে মাইস্নার রক্ত কণিকা (Meissner's Corpuscles) নামে এক ধরনের রক্তকোষ আছে। এছাড়া চামড়ার নিম্ন স্তরে আছে আরও একপ্রকার রক্তকণিকা, যার নাম প্যাসিনিয়ান রক্তকণিকা (Paccinian Corpuscles)। মাইস্নার রক্তকণিকা ও প্যাসিনিয়ান রক্তকণিকা এবং চর্মলোমের (hair roots) মূলে অবস্থিত স্নায়ুপ্রান্তগুলি চাপ সংবেদনের উদ্দীপনা গ্রহণ করে। শৈত্য সংবেদনের সংগ্রাহক ইন্দ্রিয় ভন্ ক্রাউস আবিষ্কৃত স্নায়ুতন্তু যার নাম 'ক্রাউস-এর প্রান্ত গোলক' (Krause's end blub)। উষ্ণতা সংবেদনের (Heat sensation) সংগ্রাহক ইন্দ্রিয়, রুফিনি আবিষ্কৃত স্নায়ুতন্তু যাব নাম 'রুফিনির সিলিণ্ডাব' (Ruffini's Cylinder)।

ত্বকে অবস্থিত বিভিন্ন সংগ্রাহক ইন্দ্রিয়

(iv) **শ্রবণগত সংবেদন** (Auditory Sensation) :

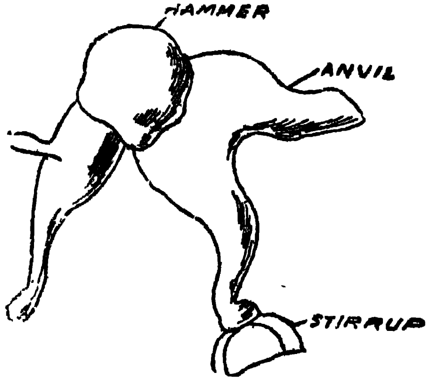
(১) **শ্রবণেন্দ্রিয়ের গঠন** (Structure of the Ear) : আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয় বা কর্ণের তিনটি অংশ আছে। যথা—(i) বহিঃকর্ণ (External Ear or Auricle), (ii) মধ্যকর্ণ (Middle Ear or Tympanum) এবং (iii) অন্তঃকর্ণ (Internal Ear or Labyrinth)।

(i) **বহিঃকর্ণ** (External Ear) : বহিঃকর্ণের দুটি অংশ—(১) কানের বাইরের যে অংশটি আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় যাকে বলা হয় কানের পাতা। (২) কানের ছিদ্র (Ear-hole), যেটি ভেতরে প্রবেশ করে গেছে এবং মধ্য কর্ণের কর্ণপটহের দ্বারা অবরুদ্ধ হয়েছে।

(ii) **মধ্যকর্ণ** (Middle Ear) : মধ্যকর্ণ হল কর্ণপটহ বা কানের পর্দা, (Ear-drum), যেটি হল একটি স্থিতিস্থাপক ঝিল্লী (Elastic membrane , তিনটি অস্থি দ্বারা সংগঠিত একটি অস্থিশৃঙ্খল এবং অন্তঃস্থিত ঝিল্লী। তিনটি অস্থির মধ্যে একটি দেখতে হাতুড়ির মতো—একে বলা হয় 'হাতুড়ি অস্থি' (Hammer bone), আব একটি দেখতে নেহাইয়ের মতো—এর নাম হল 'নেহাই অস্থি' (Anvil bone)

এবং তৃতীয়টি দেখতে জীনের রেকাব, অর্থাৎ ঘোড়ার পা-দানের মতো—এর নাম 'রেকাব অস্থি (Stirrup bone)। ষ্টেপিস

এই মধ্যকর্ণের শেষের দিকে রয়েছে একটা ঝিল্লী (membrane); এই ঝিল্লীতে দুটি ছিদ্র আছে। জীনের রেকাবের মতো যে হাড়টি, তার মাথাটি এই ছিদ্রের



কর্ণেব অস্থিশৃঙ্খলের ছবি

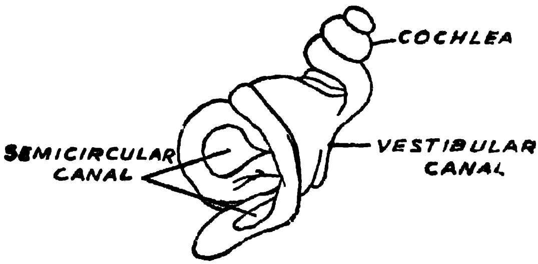
সঙ্গে সংলগ্ন থাকে, একটি ছিদ্রকে বলা হয় ডিম্বাকৃতি বিবর (Oval foramen)। এব নীচে অনুরূপ আর একটি ছিদ্র আছে যাকে বলা হয় গোলাকার বিবর (Round foramen)। একটি নল মধ্যকর্ণ, কান ও গলার সংযোগ রক্ষা করছে, এটির নাম ইউস্ট্যাশিয়ান নালী (Eustachian Tube)।

(iii) **অন্তঃকর্ণ** (Internal Ear): অন্তঃকর্ণের গঠন খুবই জটিল, এটি অস্থি দিয়ে গঠিত একটি গোলকধাঁধা (bony labyrinth)। অন্তঃকর্ণ বলতে বোঝায় কর্ণের পর্দার বা কর্ণপটহের পশ্চাতে অবস্থিত একটি বাঁকা ফাঁপা নল। এই ফাঁপা নলটি দুপ্রকার পদার্থে পূর্ণ থাকে। একটি হল তরল পদার্থ যাকে বলা হয় '*ear-lymph*' এবং অপরটি হল বালুকণার মতো কঠিন পদার্থ যাকে বলা হয় '*ear-stones*'. এই অন্তঃকর্ণের তিনটি অংশ আছে। যথা—

(ক) **ভেস্টিবুলার জলনালী** (Vestibular canal): এটি অন্তঃকর্ণের একটি খোলা অংশকে আবৃত করে রেখেছে। এই অংশটি ডিম্বাকৃতি বলে একে '*oval-window*' বলে।

(খ) **অর্ধবৃত্তাকার জলনালী** (Semi circular canal): এটি ভেস্টিবুলার জলনালীর উপরিভাগে অবস্থিত এবং তিনটি অর্ধবৃত্তাকার ফাঁকা নলের সমষ্টি।

(গ) **কর্ণশম্বুক (Cochlea) :** এটি আড়াই পাকের একটি চক্রাকৃতি কক্ষ। এটি দেখতে শম্বুক বা শামুকের মতো। এটাকে ঘোরানো সিঁড়ির মতও দেখায়। এটি



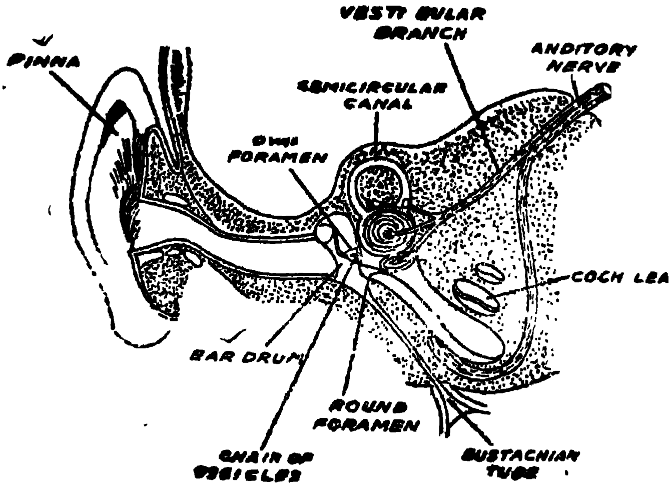
ককলিয়া, অর্ধবৃত্তকার জলনালী ও ভেস্টিবুলার জলনালী

একপ্রকার তরল পদার্থে (endolymph) পূর্ণ এবং এর ভেতরে আছে একটি সূক্ষ্ম কোমল পর্দা বা ঝিল্লী যাকে বলা হয় ব্যাসিলার মেমব্রেন (*basiliar membrane*) এর ওপরই কর্টির ইন্দ্রিয় বা '*organ of corti*' অবস্থিত। এটিই প্রকৃত শ্রবণেন্দ্রিয়। এর মধ্যে আছে অনেকগুলি সূক্ষ্ম চুলের মতো কোষ—যেগুলি সারিবদ্ধভাবে কর্ণ-শম্বুকের তরল পদার্থের মধ্যে খাড়া হয়ে থাকে। এর স্নায়ুকোষগুলি থেকে যে স্নায়ুতন্তুগুলি নির্গত হয়ে মস্তিষ্কে গিয়ে পৌঁচেছে সেগুলিকেই শ্রবণমূলক স্নায়ু (auditory nerve) বলা হয়, যেগুলি শ্রবণগত স্নায়বিক প্রবাহকে (auditory nerve impulse) মস্তিষ্কে বহন করে নিয়ে যায়।

আমরা কিভাবে শুনি :

শব্দতরঙ্গ বহিঃকর্ণের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করে কর্ণপটহের (ear-drum), অর্থাৎ মধ্যকর্ণের বাইরের ঝিল্লীতে আঘাত করতে থাকে, যার ফলে কানের পর্দাটি কম্পিত হয় এবং উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। এই কম্পন সক্রিয় করে তোলে হাতুড়ি অস্থিটিকে (hhmmer bone) এবং এই কম্পন বা উদ্দীপনা হাতুড়ি অস্থি থেকে নেহাই অস্থি (anvil bone) ও নেহাই অস্থি থেকে রেকাব অস্থিতে (Stirrup bone) বাহিত হয়। তারপর উদ্দীপনা অস্থিশৃঙ্খলের (chain of bones) মাধ্যমে মধ্যকর্ণের প্রান্তভাগে যে ঝিল্লীটি আছে তাকে কম্পিত করে। তারপর সেই উদ্দীপনা এসে পৌঁছায় অন্তঃকর্ণে বা ভেতরের কানে। এটিকে বলা হয় গোলকধাঁধাঁ (Labyrinth)। উদ্দীপনা যখন জলনালী দিয়ে ওঠানামা করে, তখন ব্যাসিলার মেমব্রেন বা ঝিল্লীটি উদ্দীপিত হয়। এই উদ্দীপনার ফলে 'কর্টির ইন্দ্রিয়ের' (organ of corti) মধ্যে

অবস্থিত যে সূক্ষ্ম চুলের মতো স্নায়ুকোষ আছে সেগুলি উদ্দীপিত হয় এবং তার সঙ্গে যুক্ত যে অন্তর্মুখী স্নায়ু, সেগুলিও উদ্দীপিত হয়। তখন সেই উদ্দীপনা অন্তর্মুখী স্নায়ু বেয়ে মস্তিষ্কে গিয়ে পৌছায় এবং আমরা শ্রবণমূলক সংবেদন পাই।



শ্রবণ-যন্ত্র কংকর্ণ

(৩) দেহের ভারসাম্যবোধের ইন্দ্রিয় (Sense of balance) :

আমরা যদিও কান দিয়ে শুনি, তবুও কানের গঠনের মধ্যে যে অর্ধবৃত্তাকার জলনালীর (Semi-circular canal) কথা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি, সেটি শ্রবণ-ব্যাপারে কোন অংশ গ্রহণ করে না। দেহের ভারসাম্যবোধ ও মস্তিষ্কের অবস্থিতিবোধ নিয়ন্ত্রিত করা এই অর্ধবৃত্তাকার জলনালীর কাজ। এটি মনুষ্যদেহের ভারসাম্য-বোধের সংবেদন আনে। আমাদের মাথা কোন্ দিকে ঝুলে আছে, আমরা সামনে, পেছনে, ওপরে, নীচে বা ডাইনে, বামে কোন্ দিকে চলেছি—এই সব কিছুর সংবেদনের উৎস ওপরের ঐ অর্ধবৃত্তাকার জলনালীটি। মস্তিষ্কের অবস্থানের পরিবর্তন ঘটলে অর্ধবৃত্তাকার জলনালীর তরল পদার্থে অনুরূপ পরিবর্তন ঘটে এবং এই পরিবর্তনের সংবেদন অন্তর্মুখী স্নায়ুপথে লঘু মস্তিষ্কে (cerebellum) পৌছলে আমরা মস্তিষ্কের অবস্থান বুঝে উঠতে পারি এবং দেহের ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করি। কেহ যদি ঘুরপাক খায় তাহলে অর্ধবৃত্তাকার জলনালীর তরল পদার্থের সাম্যাবস্থা ব্যাহত হয় যার জন্য ভারসাম্য-বোধের সাময়িক বিক্ষেপ ঘটে এবং এজন্য দেহে 'বমি বমি ভাব' দেখা দেয়। ওয়াটসন্ (Watson) অর্ধবৃত্তাকার জলনালীকে 'দেহসাম্যের ইন্দ্রিয়' (equilibration sense) বলে উল্লেখ করেছেন।

অর্ধবৃত্তাকার জলনালী দেহের ভারসাম্য বোধের উৎস

(৪) শব্দ-সংবেদনের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Sound Sensation) :

শব্দ-সংবেদনের প্রাথমিক উদ্দীপক হল শব্দতরঙ্গ। শব্দতরঙ্গ হল বাতাসের কম্পন। এই কম্পন যখন নিয়মিত, সুনির্দিষ্ট ও সুসংহত হয় তখন আমরা সুর (Tune) শুনতে পাই। আর এই কম্পন যখন অনির্দিষ্ট, এলোমেলো ও অনিয়মিতভাবে সৃষ্ট হয় তখন আমরা যা শুনি তাহল বেসুরো বা গোলমাল (noise)।

শব্দ-সংবেদনের উদ্দীপক হল শব্দতরঙ্গ

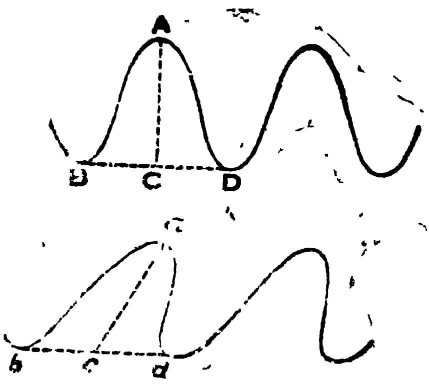
সাধারণতঃ বাতাস হল শব্দতরঙ্গের বাহক। তবে তরল পদার্থ, হাড় বা তামা প্রভৃতি ধাতব পদার্থও শব্দতরঙ্গের বাহক হতে পারে।

শব্দ-সংবেদনের পরিমাণ (quantity) এবং গুণ (quality) আছে। শব্দ-সংবেদনের পরিমাণগত বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করতে হলে শব্দ-সংবেদনের তীব্রতা (Intensity), ব্যাপ্তি (Extensity) এবং স্থিতিকাল (Duration)—এই তিনটি বিষয় বুঝে নিতে হবে।

শব্দ-সংবেদনের উদ্দীপক, পরিমাণ ও গুণ

সব রকম শব্দ-সংবেদনের তীব্রতা সমান নয়। কোন শব্দ খুব ক্ষীণ, কোন শব্দ তীব্র। চুপি চুপি কথা বলার শব্দ এবং মেঘের গুরুগম্ভীর গর্জন—এ দুটির মধ্যে তীব্রতার পার্থক্য আছে। শব্দ-সংবেদনের তীব্রতা নির্ভর করে শব্দতরঙ্গ বা বাতাসের ঢেউয়ের উচ্চতার ওপর। এই ঢেউ যত উঁচু হবে, শব্দও তত তীব্র হবে।

শব্দ-সংবেদনের তীব্রতা



শব্দতরঙ্গ

উপরে এবং তার নীচের দুটি চিত্রে যথাক্রমে AC এবং ac হল তরঙ্গের উচ্চতা, BD এবং bd হল দৈর্ঘ্য। প্রথম চিত্রটির তরঙ্গের উচ্চতা অধিকতর হওয়ায় দ্বিতীয়টির তুলনায় তীব্রতর শব্দ সৃষ্টি করে।

শব্দ-সংবেদনের ব্যাপ্তি বলতে বোঝায় শব্দ-সংবেদনটি কতখানি জায়গা জুড়ে আছে বা শব্দ-সংবেদনের উৎস কতদূর বিস্তৃত। ধরা যাক, সমুদ্রের গুরুগম্ভীর শব্দ এবং

পাখীর ডাকের ক্ষীণ শব্দ। সমুদ্রের গুরুগম্ভীর শব্দের মূলে আছে সমুদ্রের অসংখ্য ঢেউ যেগুলি অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছে। ঠিক তেমনি, একটি লোকের চীৎকার এবং জনতার কোলাহল এদের মধ্যেও ব্যাপ্তির পার্থক্য আছে। প্রথম ক্ষেত্রে শব্দ-সংবেদনের উৎস একটি মাত্র লোক এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে হল একাধিক লোক যারা অনেকখানি স্থান জুড়ে আছে।

শব্দ-সংবেদনের ব্যাপ্তি

(৫) **শব্দ-সংবেদনের স্থিতিকাল :** শব্দ-সংবেদনের স্থিতিকাল বলতে বুঝি কতটুকু সময় ধরে এই সংবেদন স্থায়ী হচ্ছে। এক মিনিট ধরে ঘণ্টা বাজতে পারে, আবার এক ঘণ্টা ধরে ঘণ্টা বাজতে পারে। দ্বিতীয় সংবেদনটির স্থিতিকাল প্রথমটির থেকে বেশী। এই সংবেদনের স্থিতিকাল নির্ভর করে উদ্দীপকের স্থিতিকালের ওপর। উদ্দীপক বায়ুতরঙ্গ সৃষ্টি করে। এই বায়ুতরঙ্গ শব্দ-সংবেদনের সৃষ্টি করে। উদ্দীপককে অপসারিত করা হলে সংবেদনও বন্ধ হয়ে যায়। তবে কখনও কখনও দেখা যায় যে, গান শেষ হয়ে গেলেও তার সুরের রেশটুকু তখনও পর্যন্ত মনে জেগে রয়েছে। অর্থাৎ, উদ্দীপকটিকে অপসারিত করা হলেও তার ক্রিয়া আরও কিছুক্ষণ ধরে চলতে থাকে—তবে এ হল সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম মাত্র।

শব্দ-সংবেদনের স্থিতিকাল

শব্দ-সংবেদনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : শব্দ-সংবেদনের গুণ বলতে আমরা বুঝি তার (১) **স্বরগ্রাম** (Pitch), (২) **উপস্বন** (Timbre) এবং (৩) **সঙ্গতি ও অসঙ্গতি** (Harmony and Discord)।

শব্দ সংবেদনের গুণগত বৈশিষ্ট্য

(i) **স্বরগ্রাম** (Pitch) **:** স্বরগ্রাম বলতে বোঝায় স্বরের উচ্চতা বা নিম্নতা। স্বরগ্রাম নির্ভর করে বায়ুতরঙ্গের দৈর্ঘ্য এবং কম্পন-হারের ওপর। এই বায়ুতরঙ্গ যত ক্ষিপ্র হয় তার দৈর্ঘ্য তত কম হয় এবং স্বর ততই উচ্চ হয়। আবার বায়ুতরঙ্গ যত ধীরগতি হয় তার দৈর্ঘ্য তত বেশী হয় এবং স্বরের উচ্চতা তত কম হয়। স্বরশক্তি (loudness) ও স্বরগ্রাম এক জিনিস নয়। স্বরশক্তি বলতে বোঝায় স্বরটির তীব্রতা। স্বরশক্তি নির্ভর করে বায়ুতরঙ্গের শক্তি বা বিস্তার (amplitude)-এর ওপর। বায়ুতরঙ্গের উচ্চতা বা অনুচ্চতার জন্য স্বরশক্তি বেশী বা কম হয়। কোন গায়ক হয়ত চাপা গলায় গান করছে, কিন্তু স্বরগ্রাম হয়ত খুব উঁচুতে অর্থাৎ চড়া স্বরে গাইছেন। মনোবিদ্ স্টাউটের (Stout) মতে শব্দ-সংবেদন পেতে হলে বাতাসের কম্পন-হার প্রতি সেকেণ্ডে ২০-এর কম এবং ২২-এর বেশী হলে চলবে না।

স্বরগ্রাম ও স্বরশক্তির পার্থক্য

(ii) **উপস্বন (Timbre):** প্রত্যেকটি স্বরের একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে যার জন্য তাকে অন্য স্বর থেকে আলাদা করা সহজেই সম্ভব হয়। এই বৈশিষ্ট্যকে বলে উপস্বন (timbre)। যদিও দুটি বাদ্যযন্ত্রের স্বরগ্রাম এবং তীব্রতা একই, তবু কোন্‌টি বেহালার আওয়াজ আর কোন্‌টি সেতারের আওয়াজ তা আমরা বুঝতে পারি। এই পার্থক্য আমরা নিরূপণ করতে পারি কারণ, মূল তরঙ্গ-কম্পনের বা মৌলিক স্বরের (Fundamental tune) সঙ্গে তরঙ্গ-কম্পনের বা খণ্ডস্বরের (Overtone) সংমিশ্রণ ঘটে।

বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের তারে আঘাত দিলে লক্ষ্য করা যায় যে, প্রতিটি তারের একটি মৌলিক স্বর এবং একটি খণ্ডস্বর আছে। সেতারের একটি তারে আঘাত করলে তার পূর্ণ কম্পনের ফলে একটি স্বর সৃষ্টি হল এবং তরঙ্গটির আংশিক কম্পন থেকে একটি খণ্ড-স্বর সৃষ্টি হল। এই উভয় কম্পন মিশ্রিত হয়ে যে জটিল স্বর সৃষ্টি করল সেটিই বাদ্যযন্ত্রটিকে অন্য যন্ত্রের স্বর থেকে পৃথক করে।

(iii) **স্বরের সঙ্গতি এবং অসঙ্গতি** (Harmony and Discord): বায়ু-তরঙ্গের এই সংমিশ্রণ যখন সুসমঞ্জস হয়ে থাকে, তখনই স্বরের মধ্যে সঙ্গতি আসে এবং এই সংমিশ্রণ যদি এলোমেলো, বিশৃঙ্খল বা অসঙ্গস হয় তাহলে স্বরের মধ্যে অসঙ্গতি দেখা দেয়। বায়ুতরঙ্গের কম্পনের মধ্যে যদি শৃঙ্খলা থাকে, তবেই সঙ্গতি, না হলে অসঙ্গতি। যখন একাধিক বাদ্যযন্ত্র একত্রে বাজতে থাকে তখন বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র যে শব্দ-তরঙ্গ সৃষ্টি করে সেগুলি পরস্পরের সঙ্গে মিশে যায়। এই সংমিশ্রণ যদি অনিয়মিত, এলোমেলো বা বিশৃঙ্খল হয় তাহলেই স্বরের অসঙ্গতি দেখা দেয় এবং তা আমাদের কাছে মনোরম মনে হয় না।

শ্রবণ-সম্বন্ধীয় বিভিন্ন মতবাদ (Different Theories of Auditory Sensation):

(i) **হেল্‌মহোলৎসের মতবাদ** বা **প্রতিধ্বনি মতবাদ** (Helmholtzs'Theory of Audition or Resonance Theory): এই মতবাদ অনুযায়ী শব্দ-সংবেদনের ব্যাপারে কানের কাজ একটি শব্দসমষ্টির বিভিন্ন অংশকে বিভিন্ন তন্তু দ্বারা গ্রহণ করা। কর্ণশম্বুক (Cochlea)-এর মধ্যে আছে একটি ঝিল্লী যেটিকে বলা হয় ব্যাসিলার মেমব্রন (Basilar membrane)। এই ব্যাসিলার মেমব্রেনের ওপর অজস্র সূক্ষ্ম চুলের মতো তন্তু (Fibre) আছে যেগুলি কর্ণশম্বুকের তরল পদার্থের মধ্যে খাড়া হয়ে থাকে; হেল্‌ম-হোলৎসের মতবাদ অনুসারে এই তন্তুগুলির প্রতিধ্বনি (resonance) করার শক্তি আছে। প্রতিটি দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট বায়ুতরঙ্গ গ্রহণ করার জন্য একটি করে তন্তু আছে এবং শব্দতরঙ্গ যখন কানে প্রবেশ করে তখন কর্ণশম্বুকের তরল পদার্থ উদ্দীপিত হয় এবং তার ফলে ব্যাসিলার মেমব্রেনের ওপরকার তন্তুগুলি প্রতিধ্বনিত, অনুরণিত বা সহানুভূতিশীলভাবে কম্পিত

হতে থাকে। ব্যাসিলার মেমব্রেনের বিভিন্ন অংশের কম্পনশীল তন্তুগুলি পিয়ানোর তারের মতো-বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের ছোট, বড় ও মাঝারি রকমের হয়। ব্যাসিলার মেমব্রেনের প্রত্যেকটি তন্তুর নিজস্ব কম্পন-হার আছে, যেটি শুধু ঐ কম্পন হারবিশিষ্ট বায়ুতরঙ্গ দ্বারা উদ্দীপিত হয়। ছোট আকারের তন্তুগুলি উচ্চ শব্দে উদ্দীপিত হয়, বড় আকারের তন্তুগুলি নিম্নশব্দে উদ্দীপিত হয় এবং মাঝারি শব্দে মাঝারি আকারের তন্তুগুলি উদ্দীপিত হয়। ব্যাসিলার মেমব্রেনের কোন অংশের তন্তুগুলি উদ্দীপিত হল, তার ওপরই নির্ভর করছে কোন্ লোক উচ্চ, নিম্ন বা মাঝারি ধরনের শব্দ শুনবে। যদি ৩০০, ৪০০, ৫০০ কম্পনবিশিষ্ট তিনটি শব্দতরঙ্গের সমষ্টি কানের মধ্যে প্রবেশ করে, তাহলে যে যে তন্তুর কম্পন-হার ৩০০,৪০০, এবং ৫৪০, সেই তিনটি তন্তুর দ্বারা শব্দতরঙ্গ স্বতন্ত্রভাবে গৃহীত হবে।

ব্যাসিলার মেমব্রেনের বিভিন্ন অংশে তন্তুগুলির উদ্দীপনার ওপরই উচ্চ, নিম্ন ও মাঝারি ধরনের শব্দসংবেদন নির্ভর করে

নানা ধরনের বধিরতা এই মতবাদের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়। কোন ব্যক্তি যদি উচ্চগ্রামের শব্দ (loud sound) শুনতে না পায় তাহলে মনে করতে হবে যে, এর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্নায়ুতন্তুগুলি নষ্ট হয়ে গেছে। এই মতবাদকে প্রতিধ্বনিবাদ (Resonance theory) বা পিয়ানোবাদ (Violin or Piano Theory) নামে অভিহিত করা হয়।

এই মতবাদের অসুবিধা হল, প্রতিটি কম্পনের জন্য পৃথক পৃথক তন্তুর ক্রিয়ার কথা কল্পনা করা কষ্টসাধ্য।

(ii) **কম্পাঙ্ক মতবাদ** (Frequency Theory): এই মতবাদটিকে কম্পাঙ্ক মতবাদ বলার কারণ, ব্যাসিলার মেমব্রেনের ওপরে 'কটির ইন্দ্রিয়ের' মধ্যে যে সূক্ষ্ম চুলের মতো কোষ (hair cell) আছে সেগুলির প্রত্যেকটিই শব্দতরঙ্গের যে কোন কম্পাঙ্ক গ্রহণ করে সেই উদ্দীপনাকে শ্রবণমূলক স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কে প্রেরণ করতে পারে।[1] শ্রবণ-সম্পর্কীয় কম্পাঙ্ক মতবাদের (Frequency theories of audition) সংখ্যা একাধিক। এই মতবাদের মধ্যে একটি হল রাদারফোর্ড (Rutherford)-এর মতবাদ। তাঁর মতে কর্ণ একটি টেলিফোনের গ্রাহকযন্ত্রের মতো ক্রিয়া করে। এই মতানুসারে বায়ুতরঙ্গ যদি প্রতি সেকেণ্ডে দশ হাজার বার কম্পিত হয়, তাহলে অন্তঃকর্ণের সঙ্গে যুক্ত স্নায়ুগুলি প্রতি সেকেণ্ডে দশ হাজার বার স্নায়বিক উদ্দীপনাকে মস্তিষ্কে প্রেরণ করতে পারে। কতবার স্নায়বিক উদ্দীপনা মস্তিষ্কে প্রেরিত হল তার ওপরই নির্ভর করছে স্বরগ্রাম (Pitch) বা স্বরের উচ্চতা বা নিম্নতা।[2]

রাদারফোর্ড-এর মতবাদ

1. Each hair cell is capable of picking up any vibration and transmitting it to the auditory nerve. Each hair cell thus reacts to all the different freqnencies of the sound waves. The name frequency theory comes from this assumption." —G. D. Boaz : General Psychology ; Page 128.

2. 'It assumes that a frequency of, say ten thousand cycles per second causes the auditory nerve to carry ten thousand impulses per second to the brain. Pitch is thus supposed to depend upon the frequency of nerve impulses reaching the brain." —Munn : Psychology ; Page 374

কতকগুলি শ্রবণ-সম্পর্কীয় স্নায়ুতন্তু (auditory fibres) উদ্দীপিত হল, তার ওপর নির্ভর করছে স্বরের উচ্চতা (loudness)।

(iii) **ভলি মতবাদ** (The Volley Theory) : কম্পাঙ্ক মতবাদের (Frequency theory) ত্রুটিগুলি দূর করার জন্যই ওয়েভার (Wever) এবং ব্রে (Bray) এই মতবাদটি প্রবর্তন করেছেন। বহিঃকর্ণে বায়ুতরঙ্গ যখন সেকেণ্ডে পাঁচ হাজার বার স্পন্দিত হয় তখন অন্তঃকর্ণের সঙ্গে যুক্ত যে স্নায়ু তার কোন তন্তু সেকেণ্ডে এক হাজার বারের অধিক স্পন্দিত হতে পারে না। সুতরাং, তাঁরা সিদ্ধান্ত করলেন যে, তন্তুগুলি পৃথক পৃথক ভাবে ক্রিয়া করে না, অনেকগুলি তন্তু দলবদ্ধ হয়ে ক্রিয়া করে। সৈন্যদের ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি ছোঁড়ার মতো তন্তুগুলি ঝাঁকে ঝাঁকে শব্দতরঙ্গের উদ্দীপনা মস্তিষ্কে প্রেরণ করে। অনেকগুলি স্নায়ুতন্তু একসঙ্গে স্নায়বিক উদ্দীপনা প্রেরণ করে বলে একে 'Volly theory' বলা হয়। কোন তন্তুই এই মতানুসারে সেকেণ্ডে এক হাজার কম্পনের বেশী প্রেরণ করে না, কিন্তু সব তন্তু মিলে সেকেণ্ডে দশ হাজার কম্পন বহন করতে পারে।

ওয়েভার এবং ব্রে-র মতবাদ

তন্তুগুলি যদি খুব ক্ষিপ্র গতিতে স্নায়বিক উদ্দীপনা মস্তিষ্কে প্রেরণ করে তাহলে উঁচু শব্দ শোনা যায়, আর যদি তন্তুগুলি খুব ধীর গতিতে স্নায়বিক উদ্দীপনা প্রেরণ করে তাহলে নিম্ন শব্দ শোনা যায়। অধিক সংখ্যক স্নায়ুতন্তু একত্র হয়ে ক্রিয়া করলে উচ্চ-গ্রামের স্বর এবং কম সংখ্যক স্নায়ুতন্তু একত্র হয়ে ক্রিয়া করলে নিম্নগ্রামের শব্দ শোনা যায়।

পূর্বোক্ত মতবাদগুলির মধ্যে ভলি মতবাদই (Volley Theory) অপেক্ষাকৃত সন্তোষজনক মতবাদ।

(iv) **দৃষ্টিগত সংবেদন** (Visual sensation) : দৃষ্টিগত সংবেদনের ইন্দ্রিয় হল চোখ। পঞ্চেন্দ্রিয়ের মধ্যে আমাদের চোখ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইন্দ্রিয় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। প্রধানতঃ দৃষ্টিগত সংবেদনের মাধ্যমেই বাইরের জগৎ সম্পর্কে আমরা জ্ঞান লাভ করি।

চোখের গঠন (Structure of the eye) : চোখের গঠন বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এটি একটি ক্যামেরার মতো। ক্যামেরার মধ্যে যেমন নানারকম কলকব্জা একটির পর একটি সুন্দরভাবে সাজান থাকে, ঠিক তেমনিভাবে চোখের মধ্যেও নানারকম কলকব্জা এমন সুন্দরভাবে সাজান আছে যাতে ক্যামেরার মতো বাইরের ছবি চট করে তুলে নেওয়া যায়।

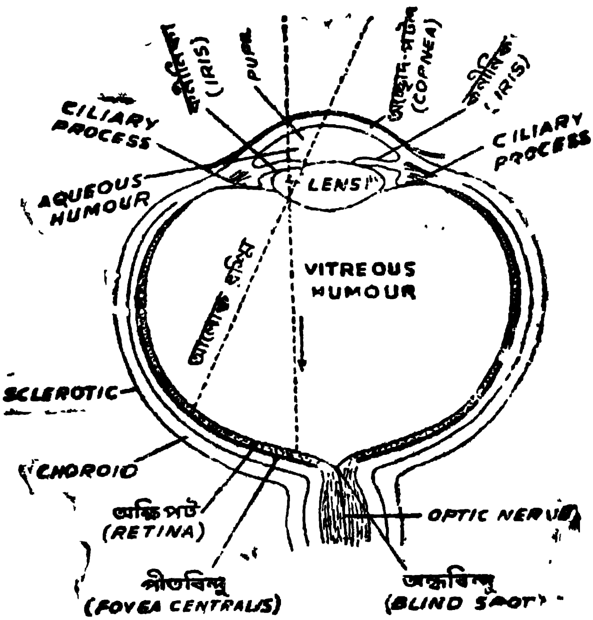
চোখের গঠন ক্যামেরার মতো

অক্ষিগহ্বরে বা চক্ষুকোটরে অবস্থিত অক্ষিগোলক দর্শন-যন্ত্রের বাহ্যরূপ। অক্ষি-

গোলককে (eye ball) আড়াআড়ি ভাবে ভাগ করলে ওর মধ্যে তিনটি স্তর বা আবরণ পাওয়া যায়, তার মধ্যে দুটি হল স্বচ্ছ এবং এরা অক্ষিগোলকের অভ্যন্তরস্থ স্নায়ুগুলিকে আঘাত থেকে রক্ষা করে : (১) একেবারে বাইরের আবরণটি হল অস্বচ্ছ, একে বলা হয় **শ্বেতমণ্ডল** (Sclerotic coat)। এর বেশীর ভাগ অংশ সাদা যার জন্য আমরা বাইরে

অক্ষিগোলকের তিনটি আবরণ

থেকে চোখের মণির চার পাশের অংশ সাদা দেখতে পাই এবং সেটি চোখের অগ্রভাগের খানিকটা জায়গাকে স্বচ্ছ ও স্ফীত করে তুলেছে। এই স্বচ্ছ ও স্ফীত অংশটিকে বলা হয় **আচ্ছোদ-পটল** বা **কর্নিয়া** (Cornea)। এই স্থান দিয়ে আলোকরশ্মি অক্ষিগোলকে প্রবেশ করে। এই



দ্বিখণ্ডিত অক্ষিগোলকের চিত্র

কর্নিয়া ক্যামেরার বাইরের **অক্ষিমুকুর** বা **লেন্সের** (Lens) কাজ করে। (২) শ্বেত-মণ্ডলের ভেতরের দিকে মাঝখানে যে অংশটি তাকে বলা হয় **কৃষ্ণমণ্ডল** (Choroid), এটি হল আলো প্রতিরোধ করার জন্য সূক্ষ্ম পর্দা। এর মধ্যে রয়েছে ছোট ছোট রক্তকণিকা। কৃষ্ণমণ্ডল বা Choroid-এর কাজ হল রক্তকণিকাগুলি বহন করে নিয়ে গিয়ে সামনের দিকে অচ্ছোদ-পটলের পশ্চাদ্‌বর্তী চক্ষু তারকা বা কনীনিকার (Iris) পেশীতন্তুর সঙ্গে মিলিত করে দেওয়া। (৩) সবচেয়ে ভেতরের আবরণটিকে বলা হয় **অক্ষিপট** বা **রেটিনা** (Retina)। এই রেটিনা হল একটা পাতলা পর্দার মতো।

চোখের মধ্যে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য অংশ হচ্ছে **অক্ষিপট** বা Retina-র ভেতরের একটি ছোট অংশ আছে যেটি চালু এবং হলদে, এটিই হচ্ছে সংবেদনক্ষম স্থান, এটিকে **পীতবিন্দু** (Yellow spot) বলা হয়। অথচ তার ঠিক নীচের অংশ যেখান দিয়ে অক্ষিমূলক স্নায়ু চক্ষুগোলকে প্রবেশ করছে সেখানে দৃষ্টির কোন সংবেদন জাগে না, এই স্থানটিকে বলা হয় **অন্ধবিন্দু** (Blind spot)। রেটিনার বা অক্ষিপটের মধ্যে দশটি স্তর আছে। তার মধ্যে নবম স্তর বা যেটি সংবেদন স্তর, সেখানে দুপ্রকারের স্নায়ুকোষ আছে, এদের বলা হয় **দণ্ড** বা **'রডস'** (Rods) এবং **শঙ্কু** বা **কোন্‌স,** (Cones)। স্নায়ুকেন্দ্রগুলির অকৃতি অনুসারে তাদের নাম দণ্ড (rods) এবং শঙ্কু (cones) হয়েছে। রডগুলির আকৃতি দণ্ডের মতো এবং কোণগুলির আকৃতি শঙ্কু বা চূড়ার মতো।

অক্ষিপট বা রেটিনা

পীতবিন্দু এবং অন্ধবিন্দু

রডগুলি সরু সরু লম্বা সুতোর মতো। কোণগুলির দৈর্ঘ্য অনেকটা কম এবং এগুলি মোটা। অক্ষিপটে এই রড এবং কোণগুলি ছড়িয়ে আছে। অক্ষিপটের দুটি কেন্দ্রে (Fovea) কোন রড্‌স নেই, অক্ষিপটের ধারে ধারে আছে। রড্‌স-এর কোন বর্ণ সংবেদন নেই, কোন্‌স অন্ধকারে কাজ করতে পারে না, দিনের আলোতে ভাল কাজ করে।

অক্ষিপটের সঙ্গে অক্ষিমূলক বা দৃষ্টিবহা স্নায়ু সংযুক্ত আছে। কর্নিয়ার পিছনে একটি ছোট ঘর আছে যাতে একপ্রকার জলীয় পদার্থ থাকে, একে বলা যেতে পারে **স্বচ্ছ জলের ভাণ্ড** (Aqueous humour)। অক্ষিমুকুর এবং অক্ষিপটের মধ্যবর্তী স্থানে ঘন বা গাঢ় তরলপদার্থ আছে, যাকে বলা হয় **অস্বচ্ছ জলের ভাণ্ড** (Vitreous humour)। অক্ষিগোলকটি একটি হাড়ের কোটরের (Socket) মধ্যে এমনভাবে সংযুক্ত থাকে যে, সেটি ছয়টি পেশীর সাহায্যে ইচ্ছামত ঘোরান যায়। এর মধ্যে চারটি পেশী হাড়ের থেকে বিস্তৃত হয়ে চোখের কোটরের মূলদেশ থেকে ওপরে, নীচে এবং দুপাশে অবস্থিত, যাতে চোখটি ওপরে ও নীচে এবং দুপাশে ঘোরান যায়। অন্য দুটি পেশী ঝিল্লীর মধ্য দিয়ে গেছে, যা চোখের ঘূর্ণমান গতিকে (Rotary motion) নিয়ন্ত্রিত করে।

'স্বচ্ছ জলের ভাণ্ড'

স্বচ্ছ জলের ভাণ্ডের (Aqueous humour) পিছন দিকে যে বাদামী, কালো বা নীল গোল পর্দা আছে তাকে বলা হয় **কনীনিকা** (Iris)। এর রঙ যেরূপ হবে চোখের রঙও সেরূপ হবে। কনীনিকার মাঝখানে একটা কালো ছিদ্র আছে, একে বলা হয় **চক্ষুতারকা** বা pupil. পর্দাটি চক্ষুতারকার আকারটিকে নিয়ন্ত্রণ করে। যদি চোখের

ওপর তীব্র আলোক এসে পড়ে তবে এই পর্দাটি প্রসারিত হয় এবং অন্ধকারে এই পর্দাটি কুঁচকে যায়। এরই ফলে চক্ষুতারকাটি কখনও স্ফীত হয় বা কখনও সঙ্কুচিত হয়।

কণিনীকা

চক্ষুতারকা

চোখের তারার পেছন দিকে অবস্থিত দু-পিঠওয়ালা ডিম্বাকৃতি লেন্স (Double convex Lense)। এই লেন্সের মধ্য দিয়ে আলোকরশ্মি কেন্দ্রীভূত হয়ে অক্ষিপটের পীতবিন্দুতে নিক্ষিপ্ত হয়। বস্তুর দূরত্ব অনুসারে লেন্সটি কখনও বিস্তৃত বা কখনও উত্তল (Convex) হয়। আলোকরশ্মিকে কেন্দ্রীভূত করার জন্য লেন্সটির প্রয়োজন। এই লেন্স যদি ত্রুটিপূর্ণ হয় তাহলে দৃষ্টিশক্তি ত্রুটিপূর্ণ হয় এবং চশমার লেন্সের সহায়তায় আমরা এই ত্রুটি দূর করার জন্য সচেষ্ট হই। লেন্সের উপরিভাগে

সিলিয়ারী প্রোসেসেস্

কতকগুলি পেশী আছে যেগুলিকে বলা হয় সিলিয়ারী প্রোসেসেস্ (Ciliary processes)। কাছাকাছি কোন বস্তু দেখতে হলে লেন্সের ওপর অত্যধিক চাপ পড়ায় লেন্সটি দুদিকে বেঁকে যায়। কিন্তু দূরের বস্তু দেখতে হলে লেন্সটি কম বেঁকে যায়। পূর্বোক্ত পেশীগুলিই লেন্সটিকে সোজা এবং বাঁকা হতে সহায়তা করে।

অক্ষিপটের বহুসংখ্যক স্তর আছে ; এই স্তরগুলির সহায়তায় বিভিন্ন রঙের, যথা—

রঙকানা বা বর্ণান্ধ

লাল, সবুজ, নীল, হলদে, সাদা, কালো প্রভৃতি রঙের সংবেদন হয়। এদের মধ্যে কোন স্তরের কোন একটি অংশ খারাপ হলে মানুষকে রঙকানা (Colour blind) বলা হয়।

দৃষ্টিগত সংবেদন কিভাবে হয়?—দৃষ্টিগত সংবেদনের ইন্দ্রিয় হল চোখ। চোখের উদ্দীপক হল আলোকরশ্মি। যে বস্তুটি আমরা দেখি, সেই বস্তুটির বিভিন্ন বিন্দু থেকে আলোকরশ্মি বিচ্ছুরিত হয়ে চোখের ওপর পড়ে। এই আলোকরশ্মি 'অচ্ছোদ-পটলের (Cornea) মধ্য দিয়ে কণীনিকার (Iris) মাঝখানে অবস্থিত চক্ষুতারকার (pupil) পথে প্রবেশ করে স্বচ্ছ জলের ভাণ্ডের (Aqueous humour) মধ্য দিয়ে লেন্সের ওপরে পড়ে এবং লেন্স থেকে অক্ষিগোলকের মধ্যস্থিত 'অস্বচ্ছ জলের ভাণ্ড' (Vitreous humour) এর মধ্য দিয়ে অক্ষিপট বা রেটিনা (Retina)-র পীতবিন্দুর (yellow spot) ওপর প্রতিফলিত হয়। এই প্রতিফলনে অক্ষিপটের কোষগুলি উদ্দীপিত হয় ও ঐ উদ্দীপনা অক্ষিমূলক বা দৃষ্টিবহা স্নায়ুপথের (Optic nerve) বহিঃপ্রান্তকে উদ্দীপিত করে এবং এই উদ্দীপনা স্নায়বিক প্রবাহের আকারে মস্তিষ্কের দর্শন-কেন্দ্রে দৃষ্টিবহা স্নায়ুর অন্তঃপ্রান্তে পৌছায়। তখনই আমাদের দৃষ্টিগত সংবেদন হয়।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে, অক্ষিপটের ওপর কোন বস্তুর যে প্রতিচ্ছবিটা পড়ে, তা বস্তুটির উল্টান ছবি (image), অর্থাৎ ওপরের অংশ নীচে এবং নীচের অংশ

ওপরে দেখায়। কিন্তু স্নায়বিক উদ্দীপনা যখন মস্তিষ্কে গিয়ে পৌঁছায় মস্তিষ্ক তখন বস্তুটিকে সোজাভাবেই প্রত্যক্ষ করে।

দৃষ্টিগত সংবেদন সম্বন্ধীয় বিভিন্ন মতবাদ (Different Theories of Vision) :

দৃষ্টিগত সংবেদন সম্পর্কে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বিভিন্ন মতবাদ প্রবর্তন করেছেন। কয়েকটি প্রধান মতবাদ এবার আলোচনা করা হচ্ছে :

(i) **ইয়ং-হেলমহোলৎস্ মতবাদ** ((Young-Helmholtz's Theory of Vision) : ইয়ং (Young) এবং হেল্‌মহোলৎস (Helmholtz), এই দুজন বৈজ্ঞানিক এই মতবাদ প্রবর্তন করেছেন। টমাস ইয়ং ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে এই মতবাদ প্রবর্তন করেন এবং ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে হেল্‌মহোলৎস এর পরিমার্জনা করেন। এঁদের মতে লাল (red), সবুজ (green), এবং নীলাভ-বেগুনী (violet)—এই তিনটি মূল রঙ।[1] অক্ষিপট বা রেটিনায় (Retina) তিন প্রকারের রাসায়নিক স্নায়বিক পদার্থ (photo chemical substance) আছে এবং এই পদার্থগুলি যখন আলোকতরঙ্গ দ্বারা উদ্দীপিত হয় তখন পূর্বোক্ত তিন প্রকার রঙের সংবেদন সৃষ্টি হয়। যদি তিনটি পদার্থ একই সময়ে সমানভাবে উদ্দীপিত হয় তাহলে সাদা রঙের সংবেদন সৃষ্টি হয়; যখন এই তিনটির মধ্যে যে কোন দুটি উদ্দীপিত হয় তখন মিশ্র রঙের সংবেদন সৃষ্টি হয় এবং যখন কোন পদার্থই উদ্দীপিত হয় না তখন কালো রঙের সংবেদন সৃষ্টি হয়। এই মতবাদ অনুসারে অক্ষিপটের ক্লান্তি বা অবসন্নতার জন্যই অসবর্ণ অনুসংবেদনের (negative after-sensation) উৎপত্তি।

এই মতবাদ অনুসরণ করে বর্ণান্ধতা (colour blindness) খুব সহজভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। কোন ব্যক্তি লাল বা সবুজ রঙ সম্পর্কে অন্ধ। সে ক্ষেত্রে বুঝতে হবে যে, লাল রঙের বা সবুজ রঙের সংবেদনের জন্য যে নির্দিষ্ট পদার্থটি উদ্দীপিত হওয়া প্রয়োজন সেটি কোন কারণে উদ্দীপিত হচ্ছে না।

সমালোচনা (Criticism) :

এই মতবাদের সুবিধা এই যে, প্রথমতঃ, এই মতবাদ বর্ণ-সংবেদনের সরল ব্যাখ্যা দিয়েছে। দ্বিতীয়তঃ, তিনটি মূল রঙের সংমিশ্রণের দ্বারা এই মতবাদের সাহায্যে বর্ণ-

---

1. এই তিনটি মূল রঙকে সুনির্দিষ্টভাবে প্রকাশ করতে গেলে বলতে হবে 'নীলাভ লাল' (Carmine red), 'ঈষৎ পীতাভ সবুজ' (Slight yellowish green) এবং 'সাগরপারের নীল' (Ultra marine blue)।

সংমিশ্রণকে (colour mixture) সন্তোষজনকভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। তৃতীয়তঃ, এই মতবাদ অনুসরণ করে বর্ণান্ধতা (colour blindness) খুব সহজভাবে ব্যাখ্যা করা যায়।

সুবিধা

এই মতবাদের অসুবিধা এই যে, প্রথমতঃ, এই মতবাদ জটিল দৃষ্টিগত বা চাক্ষুষ সংবেদনকে অতি সরলভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য চেষ্টা করেছে; যার জন্য দৃষ্টিগত সকল ঘটনাকে এই মতবাদের সাহায্যে সন্তোষজনক ভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। দ্বিতীয়তঃ, বর্ণান্ধতা সম্পর্কে এই মতবাদের প্রদত্ত ব্যাখ্যা সন্তোষজনক নয়। এই মতবাদ অনুযায়ী ধারণা করা হয় যে, সবুজ রঙ সম্পর্কে যে ব্যক্তি অন্ধ তার বর্ণান্ধতার কারণ সবুজ রঙের জন্য নির্দিষ্ট পদার্থটি ক্রিয়াশীল নয়, তাহলে ঐ ব্যক্তির পক্ষে 'সাদা' রঙের সংবেদন কিভাবে পাওয়া সম্ভব। কেননা, 'সাদা' রঙের সংবেদনের জন্য তিনটি পদার্থই সক্রিয় হওয়া প্রয়োজন। তৃতীয়তঃ, এই মতবাদ অসবর্ণ অনুসংবেদনের (negative after-sensation) যে ব্যাখ্যা দিয়েছে সেটি সন্তোষজনক নয়। কোন লাল রঙের বস্তু প্রত্যক্ষ করার পর কোন ধূসর বা সাদা রঙের বস্তু প্রত্যক্ষ করলে সেটি সবুজ মনে হয়। একে বলা হয় অসবর্ণ অনুসংবেদন (negative after-sensation or after image)। পূর্বোক্ত মতবাদ অনুযায়ী অক্ষিপটের ক্লান্তি বা অবসন্নতাই অসবর্ণ অনুসংবেদনের কারণ। কিন্তু এই অভিমত গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, কোন উদ্দীপক অল্পক্ষণ প্রত্যক্ষ করার পরই বা চক্ষুকে অল্পক্ষণ বিশ্রাম দেবার পরও অসবর্ণ অনুসংবেদন উৎপন্ন হয়। সুতরাং ক্লান্তি বা অবসন্নতা অসবর্ণ অনুসংবেদনের কারণ হতে পারে না।

অসুবিধা

(ii) **লিওনার্দো-হেরিং মতবাদ** (Leonardo-Hering Theory of Vision) : এই মতবাদ অনুসারে মূল বর্ণ হল চারটি—লাল, সবুজ, নীল ও হলুদ এবং দুটি নিরপেক্ষ বর্ণ (neutral tints)—সাদা ও কালো। অন্যান্য বর্ণ এদের সংমিশ্রণেই সৃষ্ট হয়। অক্ষিপটে তিনটি স্নায়ু পদার্থ আছে। প্রত্যেক স্নায়ু পদার্থের দুটি বিপরীত ধর্ম আছে—গড়ন (assimilation) এবং ভাঙন (dissimilation)। প্রতিটি পদার্থের উদ্দীপনায় দুটি বিপরীত বা পরস্পর পরিপূরক বর্ণ-সংবেদনের সৃষ্টি হয়। একটি পদার্থের ভাঙন ও গড়ন থেকে লাল-সবুজ, দ্বিতীয় পদার্থটির অনুরূপ ক্রিয়া থেকে নীল-হলুদ এবং তৃতীয় পদার্থের ঐরূপ ক্রিয়া থেকে সাদা-কালোর সংবেদন সৃষ্টি হয়; এই মতবাদ অনুসারে পদার্থগুলির সাম্যাবস্থা গ্রহণের প্রবণতা থেকেই অসবর্ণ অনুসংবেদনের (negative after sensation) উৎপত্তি।

সমালোচনা : এই মতবাদ ইয়ং-হেল্‌মহোলৎসের মতবাদের তুলনায় উন্নত

মতবাদ। চারটি রঙকেই মূল রঙ হিসেবে গ্রহণ করার জন্য এই মতবাদ সাধারণ ধারণার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, তাছাড়া এই মতবাদ অতি সহজেই ব্যাখ্যা করতে পারে, কি কারণে লাল বা সবুজ বর্ণান্ধ ব্যক্তি সাদা রঙ দেখতে পায়; কারণ এই মতবাদ অনুসারে সাদা রঙের সংবেদনের জন্য তৃতীয় একটি পৃথক পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়েছে। তৃতীয়তঃ, এই মতবাদ পরিপূরক বর্ণের সম্বন্ধটি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে; কারণ যখন লাল-সবুজ বা নীল-হলুদ পদার্থটির বিপরীতধর্মী ক্রিয়া একই সময়ে শুরু হয়ে যায়, তারা পরস্পরের ক্রিয়াকে নষ্ট করে দেয় এবং সাদা রঙের সংবেদন সৃষ্টি হয়। কিন্তু এই মতবাদের নিম্নোক্ত অসুবিধা লক্ষ্য করা যায়:

সুবিধা

অসুবিধা

(১) লাল রঙ সম্পর্কে অন্ধতা এবং সবুজ রঙ সম্পর্কে অন্ধতা, যদি পূর্বোক্ত মতবাদ অনুযায়ী একই পদার্থের ওপর নির্ভর করে, তাহলে কোন ব্যক্তির লাল রঙ সম্পর্কে অন্ধতা দেখা দিলে সবুজ রঙ সম্পর্কেও অন্ধতা দেখা দেওয়া উচিত। কিন্তু সবসময় এরূপ ঘটনা ঘটে না।

(২) সব রকম বর্ণান্ধতা (colour blindness) এই মতবাদের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায় না।

(৩) লাল, সবুজ, হলুদ ও নীল—এই চারটি বর্ণকেই মূলবর্ণ হিসেবে মনে করার কোন যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি এই মতবাদে ব্যাখ্যা করা হয়নি।

(৪) নীলাভ সবুজ-ই লাল রঙের পরিপূরক রঙ এবং হলুদ রঙের পরিপূরক রঙ হল indigo-blue। বিশুদ্ধ সবুজ, লাল রঙের বা বিশুদ্ধ নীল, হলুদ রঙের পরিপূরক রঙ নয়।

(iii) **ল্যাড-ফ্রাঙ্কলিন-এর মতবাদ** (Ladd-Franklin Theory of Vision): বিবর্তনবাদের (Theory of evolutior) সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষার জন্য এবং পূর্বোক্ত দুটি মতবাদের দোষ-ত্রুটিগুলি দূর করে উভয় মতবাদের মধ্যে সমন্বয়সাধন করার জন্য ল্যাড ফ্রাঙ্কলিন এর মতবাদটি মোটামুটি সন্তোষজনক মতবাদ রূপে স্বীকৃত হয়েছে।

এই মতবাদ অনুসারে মানুষের অক্ষিপটকে (Retina) বর্তমানে যে অবস্থায় দেখতে পাই সেই অবস্থায় উপনীত হবার জন্য বিবর্তনের তিনটি অবস্থা বা পর্যায় অতিক্রম করতে হয়েছে। বিবর্তনের প্রথম পর্যায়ে অক্ষিপটের আধিকাংশ কোষে ছিল দণ্ডকোষ বা রডস্ (Rods), শঙ্কুকোষ বা কোন্‌স (Cones) ছিল না, যার জন্য বর্ণবিহীন (achromatic) বা কেবলমাত্র সাদাকালো রঙের সংবেদন হত। বিবর্তনের দ্বিতীয় পর্যায়ে যখন উন্নততর প্রাণিদেহের আবির্ভাব ঘটল তখন তাদের অক্ষিপটে ঐ দণ্ডকোষগুলির (Rods) মধ্যে

একাংশ শঙ্কুকোষে (Cones) পরিবর্তিত হল। দণ্ডকোষগুলি শুধু মাত্র সাদাকালো রঙের সংবেদন উৎপন্ন করতে লাগল এবং শঙ্কুকোষগুলি (Cones) হলুদ-নীল রঙের সংবেদন উৎপন্ন করতে লাগল। বিবর্তনের সর্বশেষ পর্যায়ে হলুদ সংবেদন উৎপাদক শঙ্কুকোষগুলি (Cones) দুটি নতুন ধরনের শঙ্কুকোষে পরিণত হল। এই দুই ধরনের শঙ্কুকোষের মধ্যে একরকমের শঙ্কুকোষ লাল সংবেদন এবং অপর জাতীয় শঙ্কুকোষ সবুজ রঙের সংবেদন উৎপন্ন করার ক্ষমতা অর্জন করল। সুতরাং, এই মতানুসারে মানুষের অক্ষিপটের ওপর চার ধরনের শঙ্কুকোষ (Cones) রয়েছে এবং নীল, হলুদ, সবুজ এবং লাল রঙের সংবেদন এই চার ধরনের শঙ্কুকোষের ওপর নির্ভরশীল।

অক্ষিপটে দণ্ডকোষ ও শঙ্কুকোষ আবির্ভাবের বিভিন্ন পর্যায়

এই মতবাদ অনুসারে পূর্ণ বর্ণান্ধ এবং কোন কোন মনুষ্যেতর প্রাণীর রেটিনা এখনও বিবর্তনের প্রথম অবস্থায় রয়েছে। যেসব ব্যক্তি লাল-সবুজ রঙ সম্পর্কে অন্ধ তাদের রেটিনা এখনও ক্রমবিকাশের বা বিবর্তনের দ্বিতীয় অবস্থায় রয়েছে।

সমালোচনা (Criticism) :

এই মতবাদ পূর্ববর্তী মতবাদ অপেক্ষা সন্তোষজনক। এই মতবাদ ক্রমবিকাশ-বিজ্ঞানের (embryology) সিদ্ধান্তের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বিভিন্ন রঙের সংবেদনের জন্য রেটিনার মধ্যে বিভিন্ন স্তরের অস্তিত্ব 'পেরিমিটার' (Perimeter) নামক যন্ত্রের দ্বারা বিশেষভাবে প্রমাণিত।

এই মতবাদ ভ্রূণবিকাশের সিদ্ধান্তের সঙ্গে সামঞ্জস্য পূর্ণ

এই মতবাদের যে কিছু দোষত্রুটি নেই তা নয়, বর্ণান্ধতা এবং পরিপূরক বর্ণ সম্পর্কে কয়েকটি বিষয় এই মতবাদের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায় না। এই মতবাদ অনুযায়ী ক্রমবিকাশ বা বিবর্তনের ফলেই মানুষের মধ্যে ধীরে ধীরে বর্ণবোধ জন্মেছে, কিন্তু বানর জাতীয় জীবের মধ্যেও যখন বর্ণসংবেদন গ্রহণ করার ক্ষমতা দেখা যায় তখন মানুষের প্রথম আবির্ভাবের সময় সে বর্ণান্ধ ছিল—এ মতবাদ কিভাবে স্বীকার করা যায়?

সব বর্ণান্ধতা এবং পরিপূরক বর্ণ এই মতবাদ ব্যাখ্যা করে না

এই মতানুসারে যাদের লাল রঙের সংবেদন হয় না তাদের মধ্যে সবুজ রঙেরও সংবেদন হয় না। আর যাদের হলুদ রঙের সংবেদন হয় না তাদের নীল রঙেরও সংবেদন হয় না। কিন্তু এই বিষয়টি সর্বক্ষেত্রে সত্য নয়।

তাছাড়া, এই মতানুসারে অক্ষিপটে শঙ্কুকোষের যে পৃথক পৃথক অংশের কথা বলা হয়েছে, সেগুলিকে পাওয়া যায় না।

রঙের সংবেদন সম্পর্কীয় কয়েকটি বিষয় (Some phenomena relating to Colour Sensation) :

(i) **রঙের সংবেদন কিভাবে হয় ?** : রঙের সংবেদন কিভবে হয় এ বিষয়ে আমরা পূর্বে বলেছি যে, চোখের উদ্দীপক হল আলোকতরঙ্গ। আলোকতরঙ্গের বৈষম্যের ওপর রঙের উজ্জ্বলতার সংবেদন নির্ভর করে। এই তরঙ্গের দৈর্ঘ্য বিভিন্ন হয়; কোনটি খুব দীর্ঘ হয় আবার কোনটি খুব হ্রস্ব হয়। যদি আলোকতরঙ্গের দৈর্ঘ্য 700 M. M.-এর[1] বেশী হয় এবং 390 M.M-এর কম হয় তাহলে সেই রঙ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। উদাহরণস্বরূপ 'Infra-red' বা লাল-উজানী আলোকের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য 800 M.M-এর বেশী বলে এবং 'ultra-violet' বা 'বেগুনী পারের আলো, এবং X-Ray বা রঞ্জনরশ্মির আলোকতরঙ্গের দৈর্ঘ্য যথাক্রমে 300 M. M. এবং 100 M. M. বলে তা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। 390 M. M. এবং 700 M. M.-এর অন্তবর্তী যে আলোকতরঙ্গ সেগুলি আমাদের মধ্যে রঙের সংবেদন আনে—বেগুনী রঙের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য সবচেয়ে কম (390), লাল রঙের দৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশী (700)।

চোখের উদ্দীপক হল আলোকতরঙ্গ

আলোকতরঙ্গের বৈষম্যের ওপর রঙ ও তার উজ্জ্বলতা নির্ভর করে

390 M. M. এবং 700 M, M, -এর মধ্যবর্তী যে আলোক তরঙ্গ, সেইগুলিই রঙের সংবেদন সৃষ্টি করে

তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের ওপর আলোকের প্রকৃতি নির্ভর করে। যেমন, কোন আলো লাল হবে কি নীল হবে, সেটি নির্ভর করে সেই আলোকের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের ওপর। সে কারণে প্রতি তরঙ্গের দৈর্ঘ্য অনুযায়ী আমরা এক'একটি রঙ বা বর্ণ (Hue) পেয়ে থাকি।

এই বর্ণগুলিকে সাজিয়ে নিলে আমরা একটি বর্ণবৃত্ত বা Colour Circle পাই। তিনকোণা কাচের (Prism) ভেতর দিয়ে বা রামধনুর মধ্যেও আমরা এই রঙগুলি দেখতে পাই।

রঙের উজ্জ্বলতা নির্ভর করে আলোকতরঙ্গের বিস্তৃতির (amplitude) ওপর। তরঙ্গ যত বিস্তৃত হবে, রঙও তত উজ্জ্বল হবে। এই উজ্জ্বলতা অধিক মাত্রায় বাড়তে থাকলে রঙটি একেবারে সাদা হয়ে যেতে পারে এবং যদি অধিক মাত্রায় কমতে থাকে তবে একেবারে কালো হয়ে যেতে পারে। উজ্জলতা যে কেবলমাত্র তরঙ্গের বিস্তৃতির ওপর

আলোকতরঙ্গের বিস্তৃতির ওপর রঙের উজ্জ্বলতা নির্ভর করে

1. M M.—মিলিমাইক্রন। আলোকরশ্মির তরঙ্গের দৈর্ঘ্যকে প্রকাশ করার জন্য যে একক ব্যবহৃত হয় তাকে মিলিমাইক্রন (milimicron) বলা হয়। মিলিমাইক্রন এক মিলিমিটারের ৩০ লক্ষ ভাগের এক ভাগ।

নির্ভরশীল তা নয়, তরঙ্গের দৈর্ঘ্যের ওপরও নির্ভর করে। যেসব তরঙ্গের দৈর্ঘ্য মাঝামাঝি, যেমন—হলদে রঙ, সেগুলি আমরা সবচেয়ে ভালভাবে দেখতে পাই। সে কারণে হলুদ রঙ আমাদের কাছে লাল বা বেগুনী রঙের থেকে বেশী উজ্জ্বল মনে হয়।

রঙের উজ্জ্বলতা তরঙ্গের দৈর্ঘ্যের ওপরও নির্ভর করে

তরঙ্গের দৈর্ঘ্য অনুযায়ী এক একটি রঙ আমাদের চোখে পড়ে। কিন্তু একটিমাত্র বিশেষ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলো আমাদের চোখে খুব কমই পড়ে থাকে। আমাদের কাছে যা আসে তাহল তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের মিশ্রণ।

এই তরঙ্গগুলি পরস্পরের সঙ্গে মিশে যাওয়াতে রঙের সংবেদনও পৃথক হয়ে পড়ে। এই তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের মিশ্রণ থেকে জন্মায় বর্ণের সংপৃক্তি (saturation)। একাধিক তরঙ্গ মিশ্রিত হলে রঙটি অসংপৃক্ত (unsaturated) এবং যদি একটিমাত্র আলোক তরঙ্গের প্রতিফলন ঘটে তবে রঙটি হবে সংপৃক্ত (saturated)। সংপৃক্তি বলতে রঙের বিশুদ্ধতা বোঝায়।

তরঙ্গগুলি মিশে যাওয়াতে রঙের সংবেদন পৃথক হয়

(ii) **মৌলিক রঙের সংখ্যা** (Number of Primary or Elementary colour):

মৌলিক রঙ বা প্রাথমিক বর্ণের সংখ্যা কয়টি? সূর্যের আলো সাদা। সূর্যের আলো একটি তিনকোণা কাচের (Prism) মধ্য দিয়ে যদি বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে আমরা সেই আলোর মধ্যে সাতটি রঙের মিশ্রণ দেখতে পাই। এই সাতটি রঙ হল—বেগুনী (violet), নীল-বেগুনী (indigo), নীল (blue), সবুজ (green), হলুদ (yellow), কমলা (orange) এবং লাল (red)। নিউটনের মতে এই সাতটি রঙই হল প্রাথমিক রঙ। আবার কেউ কেউ এই সাতটি রঙের সব কয়টিকেই প্রাথমিক বা মৌলিক রঙ বলে স্বীকার করতে নারাজ। যেমন, লাল ও হলুদ রঙ মিশিয়ে কমলা রঙ পাওয়া যায়।

সাতটি প্রাথমিক রঙ

পদার্থবিদ্যার দিক থেকে কেউ কেউ মনে করেন যে, প্রাথমিক বা মৌলিক বর্ণ হল লাল, সবুজ ও নীল। কারণ, তাঁদের মতে হলুদ রঙ হল লাল ও সবুজ মিশ্রণ।

শরীরবিদ্যা এবং পদার্থবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গি মনোবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গি নয়। কারণ, রঙ প্রাথমিক বা সংমিশ্রিত, মনোবিদের কাছে তা অর্থহীন। মনোবিদ্ টিচেনারকে অনুসরণ করে বলা যেতে পারে যে, কোন রঙের সংবেদন যখন হয় তখন আমরা তাকে একটি সরল সংবেদন (simple sensation) রূপেই গ্রহণ করি, মিশ্র সংবেদনরূপে নয়। যেমন, কমলা রঙ যদিও লাল

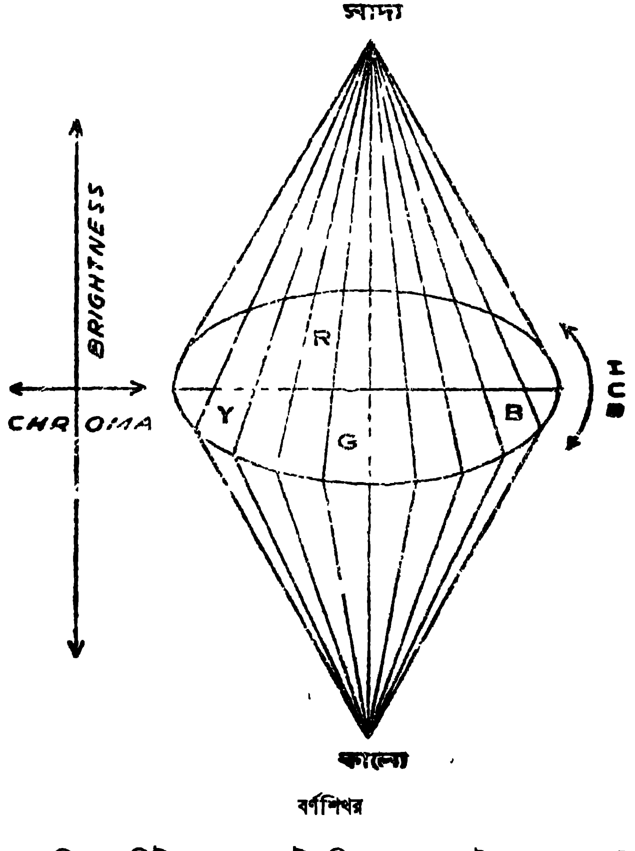
রঙ প্রাথমিক বা সংমিশ্রিত মনোবিদদের কাছে তা অর্থহীন

এবং হলুদ রঙের সংমিশ্রণ, তবুও কমলা রঙের সংবেদন হবার সময় লাল ও হলুদ রঙের পৃথক পৃথক সংবেদন হয় না।

রঙের উজ্জ্বলতার তারতম্য অনুসারে যদি বিভিন্ন রঙগুলিকে সাজাতে হয় তাহলে সরলরেখার সাহায্যে এদের স্থান নির্ণয় করা যাবে না। একটি বৃত্তের সাহায্যে

বর্ণশিখর

বর্ণবিন্যাসকে বুঝবার চেষ্টা করা হয়। নীচের বর্ণশিখরটির (colour pyramid) সাহায্যে বিষয়টি বুঝে নেওয়া যাক :

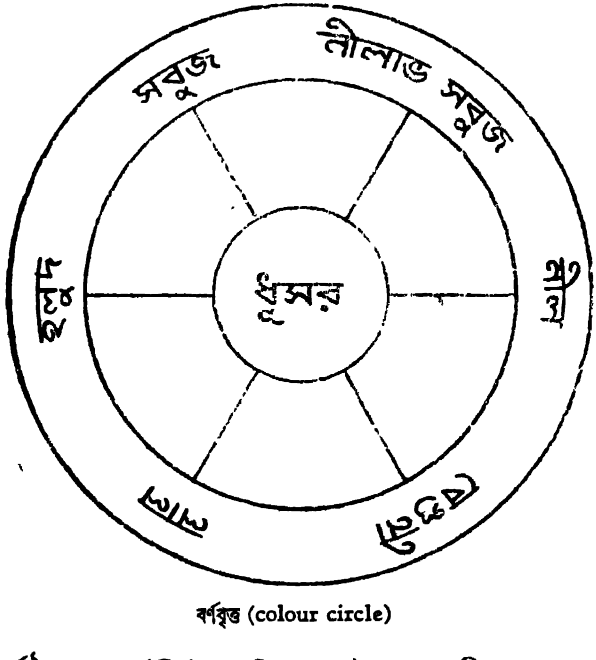


বর্ণশিখর

উপরে অঙ্কিত ছবিটির ওপরে দুটি শিখরযুক্ত একটি বৃত্ত দেখছি। বৃত্তটির বাইরে রঙগুলি সাজান আছে। ওপরের কিংবা নীচের দিকে ক্রমশঃ এই বৃত্তের পরিধি ছোট হয়ে আসছে। যত ওপরের দিকে যাওয়া যায় ততই রঙ হালকা হতে হতে আস্তে আস্তে সাদা হয়, আর নীচের দিকে আস্তে আস্তে কালো হতে থাকে।

এই বর্ণশিখরটির ঠিক মাঝখান দিয়ে ছেদ করলে দেখতে পাওয়া যায় যে, কেন্দ্র থেকে বাইরের দিকে যত যাওয়া যায় রঙের পরিমাণ (chroma) তত বাড়তে থাকে, আর যত কেন্দ্রের কাছাকাছি যাওয়া যায় তত রঙের পরিমাণ কম হতে থাকে। বর্ণশিখরের কেন্দ্রের মেরুদণ্ডে কোন রঙ নেই (achromatic); এখানে দু-শিখরে যথাক্রমে সাদা ও কালো এবং মধ্যভাগে নানান জাতীয় ধূসর রঙ আছে।

(iii) **পরিপূরক রঙ** (Complementary Colours): প্রতিটি রঙের একটি পরিপূরক রঙ আছে। যে দুটি রঙকে সমপরিমাণে মেশালে বর্ণহীন সংবেদন (achromatic colourless sensation) উৎপন্ন হয় তাদের একটিকে অপরটির পরিপূরক রঙ বলে। লাল এবং নীল-সবুজ; সবুজ এবং বেগুনী; হলদে এবং নীল ইত্যাদি পরস্পরের পরিপূরক রঙ। নীচে বর্ণবৃত্তের যে ছবিটি দেওয়া হয়েছে সেটি লক্ষ্য করলেই কোন্ রঙটি কার পরিপূরক জানা যাবে।



বর্ণবৃত্ত (colour circle)

(iv) **বর্ণ-বৈসাদৃশ্য** (Colour Contrast): কতকগুলি রঙ আছে যেগুলি একটি আর একটির বিরূপ। বিরূপ অর্থে দুটি রঙকে যদি একই সময়ে দেখা যায় বা একটি দেখার পর আর একটি দেখা যায় তাহলে প্রথম রঙটির উজ্জ্বলতা দ্বিতীয় রঙটির তুলনায়

অনেক কম বা বেশী হতে পারে। একেই বলা হয় বর্ণ-বৈসাদৃশ্য বা রঙের পারস্পরিক বিরূপতা (colour contrast)। নীল এবং হলদে; লাল এবং সবুজ রঙের মধ্যে বিরূপতা আছে। যার চুল লালচে সে যদি সবুজ পোশাক পরে তাহলে তার চুল আরও লালচে মনে হয়। হলদে এবং নীল রঙ পাশাপাশি রেখে তাকালে, রঙগুলিকে স্বতন্ত্রভাবে দেখলে যতখানি না উজ্জ্বল মনে হয়, তার থেকে অধিক উজ্জ্বল মনে হয়। একে বলা হয় সমকালীন বর্ণ-বৈসাদৃশ্য (simultaneous colour contrast)। এই বর্ণ-বৈসাদৃশ্য সমকালীন না হয়ে অনুক্রমিক (successive colour contrast) হতে পারে। খুব উজ্জ্বল বস্তুর দিকে তাকিয়ে তারপর মাঝামাঝি উজ্জ্বল বস্তুর দিকে তাকালে তা কালো বলে মনে হয়।

সমকালীন ও অনুক্রমিক বর্ণ বৈসাদৃশ্য

(v) **বর্ণান্ধতা** (Colour Blindness): বিভিন্ন বর্ণ বা রঙের মধ্যে তারতম্য নির্ধারণ করতে না পারার ক্ষমতাই বর্ণান্ধতা। বর্ণান্ধতা দু'প্রকারের—স্বভাবী (normal) এবং অস্বভাবী (abnormal)। সুস্থ স্বাভাবিক লোকও বর্ণান্ধ হয়ে থাকে। অক্ষিপটের স্বাভাবিক ধর্ম বা বৈশিষ্ট্যের জন্যই এই বর্ণান্ধতা দেখা দেয়। আমাদের অক্ষিপটের সব অংশই সমানভাবে বর্ণসংবেদনশীল নয়। অক্ষিপটের বাইরের অংশ সম্পূর্ণ বর্ণান্ধ, এতে শুধু সাদা ও কালোর সংবেদন উৎপন্ন হয়। অক্ষিপটের মধ্যবর্তী স্তরটি আংশিক বর্ণান্ধ, এই অংশ সাদা এবং কালোর সংবেদন ছাড়াও নীল এবং হলুদের সংবেদন উৎপন্ন করে। অক্ষিপটের কেন্দ্রস্থলে সব রকম বর্ণের সংবেদন উৎপন্ন হয়।

অস্বভাবী বর্ণান্ধতা রোগগ্রস্থ ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেই দেখা যায়। অস্বভাবী বর্ণান্ধতা কিংবা রঙকানা হওয়া দু'রকমের হতে পারে। যথা, সম্পূর্ণ বর্ণান্ধতা বা পুরোপুরি রঙকানা (totally colour blind) এবং আংশিক বর্ণান্ধতা বা আংশিক রঙকানা (partially colour blind)। পুরোপুরি রঙকানা লোকেরা সাদা আর কালো ছাড়া অন্য রঙ দেখতে পায় না। সম্পূর্ণ বর্ণান্ধ ব্যক্তিকে 'এক-বার্ণিক' (monochromat) বলা হয়। আমরা ইতিপূর্বে বলেছি যে, অক্ষিপটে দু'রকম স্নায়ুকোষ আছে—রড্‌স (rods) এবং কোন্‌স (cones)। যারা পুরোপুরি রঙকানা তাদের অক্ষিপটে রড্‌স আছে, কোন্‌স নেই; যারা আংশিক রঙকানা (partially colour blind) তারা লাল হলুদ এবং নীল রঙ-এর মধ্যে তারতম্য নির্ণয় করতে পারে না। দুই রঙই এদের চোখে একরকম মনে হয়। এদের দ্বি-বার্ণিক (dichromat) বলা হয়।

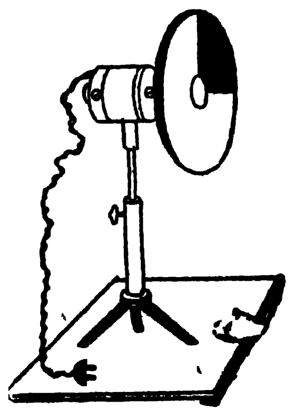
পুরোপুরি রঙকানা এবং আংশিক রঙকানা

(৫) **অনুসংবেদন** (After-Sensation) : প্রতিটি সংবেদনের একটা **স্থিতিকাল** আছে। কিন্তু কখনও কখনও উদ্দীপকটিকে অপসারিত করার পরও দেখা যায় যে, সংবেদনটি কিছুক্ষণের জন্য স্থায়ী হয়েছে। উদ্দীপকটি অপসারিত করার পরও সংবেদনের যে ক্ষীণ প্রতিক্রিয়া বা রেশটুকু চলতে থাকে তাকেই অনুসংবেদন বলে।

সবর্ণ অনুসংবেদন ও অসবর্ণ অনুসংবেদন

এই অনুসংবেদন দু'প্রকারের হতে পারে, যথা—(১) **সবর্ণ অনুসংবেদন** (Positive After-Sensation) এবং (২) **অসবর্ণ অনুসংবেদন** (Negative After-Sensation)।

যে অনুসংবেদন সংবেদনের সমজাতীয় তাকে সবর্ণ অনুসংবেদন (Positive After-sensation) বলে। সবর্ণ অনুসংবেদনের সময় মূল সংবেদনের ক্ষেত্রে যে রঙটিকে প্রত্যক্ষ করি, অনুসংবেদনের ক্ষেত্রেও সেই রঙটিই প্রত্যক্ষ করি। যেমন, কয়েক সেকেণ্ড সূর্যের দিকে তাকাবার পর যদি আমরা সূর্যের দিক থেকে চোখকে অপসারিত করে অন্যদিকে তাকাই তাহলে একটা সাদা রঙের চক্র বা ফলক (a disc of white light) দেখি। যে অনুসংবেদন সংবেদনের বিজাতীয় তাকে অসবর্ণ অনুসংবেদন (Negative After-Sensation) বলে। যেমন, সাদা দেওয়ালে আটকান এক টুকরো লাল কাগজের দিকে আধ মিনিট তাকাবার পর যদি আমরা কাগজের পাশের সাদা দেওয়ালটির দিকে তাকাই তাহলে দেখব যে, দেওয়ালটিতে নীল-সবুজের আভা দেখা যাবে। সবর্ণ ও অসবর্ণ উভয় প্রকার অনুসংবেদনই ক্ষণস্থায়ী ও চঞ্চল।



(৬) **বর্ণ-সংমিশ্রণ** (Colour Mixture) : বিভিন্ন বর্ণের মিশ্রণকে বর্ণ-সংমিশ্রণ বলে। বর্ণ-সংমিশ্রণের কথা যখন আমরা বলি তখন আমাদের একথা মনে রাখতে হবে যে, আসলে রঙগুলি পরস্পরের সঙ্গে মেশে না। কারণ রঙের যে বোধ, তাহল রঙের সংবেদন। সংবেদনের স্থান আমাদের চেতনায়। কেবলমাত্র বাইরের উদ্দীপক; যথা—আলোকতরঙ্গগুলি মিশ্রণের ফলেই বর্ণ-সংমিশ্রণের সংবেদন আমরা পেয়ে থাকি। বর্ণমিশ্রক যন্ত্রের (Colour wheel) সাহায্যে বা দুটি বিভিন্ন রঙের চাকতি পাশাপাশি রেখে দ্রুত ঘোরাতে থাকলেও এই সংবেদন পাওয়া যায়।

আলোকতরঙ্গের মিশ্রণের ফলেই বর্ণসংমিশ্রণের সংবেদন আমরা পেয়ে থাকি

কমলা রঙ হল লাল এবং হলদে রঙের সংমিশ্রণ, বেগুনী রঙ হল লাল এবং নীল রঙের সংমিশ্রণ, বাদামী রঙ হল ঘন ধূসর রঙ এবং কমলা রঙের সংমিশ্রণ।

বর্ণ-সংমিশ্রণ সম্পর্কে তিনটি নীতি আছে। (১) যদি দুটি পরিপূরক রঙকে বিশেষ অনুপাতে মেশান হয় তাহলে যে মিশ্র রঙটি পাওয়া যায় তাহল ধূসর রঙ এবং ধূসর রঙের উজ্জ্বলতা পরিপূরক রঙ দুটির উজ্জ্বলতার মাঝামাঝি হয়। (২) পরিপূরক নয় এমন দুটি রঙকে বিশেষ অনুপাতে মেশালে যে রঙ পাওয়া যাবে সে রঙটি যে দুটি রঙকে মেশানো হল তাদের রঙের মাঝামাঝি হবে। যেমন, লাল এবং নীল রঙ মিশিয়ে বেগুনী রঙ পাওয়া যায়। (৩) দুটি মিশ্র রঙকে পরস্পরের সঙ্গে মেশালে যে মিশ্র রঙটি পাওয়া যাবে তাহল ধূসর রঙ। আর এই ধূসর রঙের উজ্জ্বলতা মিশ্রিত রঙ দুটির উজ্জ্বলতার মাঝামাঝি হবে।

বর্ণ-সংমিশ্রণ সম্পর্কে তিনটি নীতি

(৭) **আলো এবং অন্ধকারে চোখ অভ্যস্ত হাওয়া** (Light and Dark Adaptation): হঠাৎ আলো থেকে যদি আমরা একটা আধো অন্ধকার ঘরের মধ্যে ঢুকি, তাহলে প্রথমে অন্ধকারে আমরা কিছুই স্পষ্টভাবে দেখতে পাই না। কিন্তু ধীরে ধীরে ঘরের জিনিসগুলি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এর কারণ হল অন্ধকারে কিছুক্ষণ থাকার জন্য আমাদের চোখ অন্ধকারে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। একেই বলা হয় অন্ধকারে অভ্যস্ত হওয়া (Dark Adaptation)। অন্ধকারে চোখ অভ্যস্ত হয়ে উঠলেও দেখা যায় আমরা কোন রঙ দেখতে পাচ্ছি না। কেবল আলো আর ছায়া দেখছি। আমাদের রেটিনাতে যে স্নায়ুকোষ, রড্স এবং কোন্স আছে, সেই স্নায়ুকোষগুলির মধ্যে কোন্সগুলি অন্ধকারে কাজ করে না, কেবলমাত্র রড্স (rods) কাজ করে। আলো থেকে অন্ধকারে চোখ অভ্যস্ত হতে প্রায় আধঘণ্টার মতো সময় লাগে। তারপর অক্ষিপটের রড্সগুলির ক্রিয়াশক্তি অনেকগুণ বৃদ্ধি পায়। অনুরূপভাবে অন্ধকার ঘর থেকে যখন আমরা আলোকে আসি তখন আমাদের চোখ যেন ধাঁধিয়ে যায়। বাইরের আলোর উজ্জ্বলতা খুব বেশী তীব্র মনে হয়। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে আমাদের চোখ আবার আলোতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। একে বলা হয় আলোতে চোখ অভ্যস্ত হওয়া (Light Adaptation)। অন্ধকার থেকে আলোতে চোখ অভ্যস্ত হতে মাত্র দু-এক মিনিট সময় লাগে।

অন্ধকারে চোখ অভ্যস্ত হওয়া

আলোতে চোখ অভ্যস্ত হওয়া

(৮) **পুরকিনজী ঘটনা** (Purkinjie phenomenon): দিনের উজ্জ্বল আলোতে বা ক্ষীণ আলোকে অভ্যস্ত ব্যক্তির কাছে রঙের উজ্জ্বলতার কি রকমের তারতম্য ঘটে তা অষ্ট্রিয়ান বৈজ্ঞানিক পুরকিনজী (Purkinjie) পরীক্ষার সাহায্যে দেখিয়েছেন বলে এই ধরনের উজ্জ্বলতার তারতম্যকে 'পুরকিনজী ঘটনা' নামে অভিহিত করা হয়।

দিনের আলোয় অভ্যস্ত যার চোখ, সেই চোখের কাছে লাল এবং হলুদ রঙই স্বাভাবিকের তুলনায় উজ্জ্বলতর মনে হয়। কিন্তু আলো ক্ষীণ হবার সঙ্গে সঙ্গেই এই দুটির উজ্জ্বলতা কমে যায়। কিন্তু ম্লান আলোক বা অন্ধকারে অভ্যস্ত ব্যক্তির কাছে সবুজ এবং নীল রঙই স্বাভাবিক অপেক্ষা বেশী উজ্জ্বল মনে হয়।

(৯) **অক্ষিপটের নিজস্ব আলো** (Retina's own light) : সম্পূর্ণ অন্ধকার ঘরে চোখ মেললে আমরা একরকম ঝাপসা ধূসর আলোর সংবেদন লাভ করি, যদিও অক্ষিপট কোন বাহ্য আলোকরশ্মি দ্বারা উদ্দীপিত হচ্ছে না। এই ধূসর অলোককেই অক্ষিপটের নিজস্ব আলো বলা হয়। এমনিতে অক্ষিপটের নিজস্ব কোন আলো নেই।

(১০) **অক্ষিপটের ঐক্য ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা** (Retinal Unity and Rivalry) : যখন দুটি সদৃশ বর্ণ বা সদৃশ বস্তু দুচোখের দুটি অক্ষিপটের অনুরূপ বিন্দুদ্বয়কে উদ্দীপিত করে তখন তাদের আমরা একটি বস্তুরূপেই দেখি। দুটি অক্ষিপট ঐক্যবদ্ধভাবে ক্রিয়া করার জন্য একে 'অক্ষিপটের ঐক্য' (Retinal Unity) বলা হয়। কিন্তু যখন দুটি ভিন্ন বর্ণ বা বিসদৃশ বস্তু দুই অক্ষিপটের দুটি ভিন্ন অংশ বা বিন্দুতে প্রতিফলিত হয় এবং দুটি যুগপৎ উভয় চোখকেই উদ্দীপিত করে তাহলে কিছুক্ষণ আমরা একটি বস্তু দেখব, কখনও অপর বস্তু দেখব। এই ঘটনাকে অক্ষিপটের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বলা হয়।

৮। অস্থিবন্ধনী সম্পর্কীয় সংবেদন (The Tendinous Sensation) :

অনেকক্ষণ ধরে কোন কঠিন পেশী-সংক্রান্ত কাজে নিযুক্ত থাকলে আমরা এমন এক ধরনের সংবেদন অনুভব করি যাকে ঠিক পেশী সংবেদনের সঙ্গে অভিন্ন করে দেখা চলে না। যেমন কুস্তি করার সময়, কোন কিছু টানাটানি করার সময় বা কোন ভার উত্তোলন করার সময় আমরা নিজেরাই সক্রিয় হই এবং আমরা যে নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে বা চেষ্টা করে কিছু করছি তা বুঝতে পারি। সে কারণে একে আমরা 'চেষ্টা' বা 'পরিশ্রম' (Effort or Exertion) আখ্যা দিয়ে থাকি। কিন্তু যখন আমরা নিষ্ক্রিয়ভাবে কোন ভারী বস্তু দেহের ওপর ধরে রাখি বা একপায়ে অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে থাকি, তখন আমরা একটা টান টান ভাব (strain) অনুভব করি। এই অভিজ্ঞতা টনটন করা, ব্যথা ইত্যাদি রূপ ধারণ করে।

অস্থিবন্ধনীই (Tendon) এই টান টান ভাব সংবেদনের উৎস। অবশ্য গলগি আবিষ্কৃত পেশীদণ্ডগুলি (Spindles of Golgi) এই ধরনের সংবেদনের

মূল উৎস।[1] মনোবিদ্ টিচেনার বলেন যে, অস্থিবন্ধনী সম্পর্কীয় সংবেদনের স্বরূপকে জানতে হলে,\ত্বকজাত, পেশীগত ও অস্থিসন্ধি (joint) সম্পর্কীয় সংবেদনকে বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে তাকে বুঝতে হবে। যা অবশিষ্ট থাকে তাহল একটা টান, টান ভাব বা সংবেদন। এই ধরনের সংবেদনের অভিজ্ঞতা খুব সুনির্দিষ্ট নয়।[2]

৯। অস্থি-সন্ধিগত সংবেদন (Articular Sensation) :

হাত, পা, আঙুল প্রভৃতি দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি বিভিন্ন অস্থির সমবায়ে গঠিত। দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালন করার সময় অস্থি-সন্ধিতে একটা ঘর্ষনের বোধ বা সংবেদন জাগে। একেই অস্থি-সন্ধিগত সংবেদন বলা হয়। চোখ বন্ধ করে হাতের আঙুলগুলি ছড়িয়ে দিয়ে হাতের কব্জিকে যদি আস্তে আস্তে সামনে পেছনে ঘোরান হয় তাহলে যে সংবেদন পাওয়া যায় তাকে অস্থি-সন্ধিগত সংবেদন (Articular sensation) বলে। হাতের পাতা শির শির করা বা ঠাণ্ডা বোধ করা, অঙ্গুলি সন্ধির একপাশ থেকে আর এক পাশ পর্যন্ত তর্জনীর সম্মুখভাগে অথবা অঙ্গুলির পার্শ্বে চাপবোধ (Pressure sensation) এই সংবেদনের লক্ষণ।

১০। সহ-সংবেদন (Synaesthesia) :

একটি ইন্দ্রিয় উদ্দীপিত হওয়ার জন্য সেই ইন্দ্রিয়ের উদ্দীপনাজনিত সংবেদন ছাড়াও যখন আরও একটি ইন্দ্রিয়ের সংবেদন পাওয়া যায় তখন তাকে বলা হয় সহ-সংবেদন (Synaesthesia)। যেমন, কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, বিশেষ ধরনের একটি শব্দ শ্রবণ করলে শব্দ সম্পর্কে জ্ঞান ত হয়ই, উপরন্তু তাদের কাছে সেটি রঙীন বলে মনে হয়। এক্ষেত্রে শব্দ সংবেদনের (Sound sensation) সঙ্গে সঙ্গে বর্ণসংবেদনের (Colour sensation) জ্ঞান হচ্ছে, যদিও ব্যক্তির শ্রবণেন্দ্রিয় কেবলমাত্র উদ্দীপিত হচ্ছে, দর্শনেন্দ্রিয় বা চক্ষু উদ্দীপিত হচ্ছে না।

---

1. "This sensation of strain appears to come from the tendons, and to have its organs in the Spindles of Golgi."

—Titchener : A Text book of Psychology ; Page 168.

2. 'In seeking to discover the nature of tendineous sensation we can only rule out the qualities that come from skin, muscle and joint, and note what is left. The remainder turns out to be the sensation of strain.'

—Titchehner : Page 163.

Questions

1. What is sensation ? Or, Define Sensation. What are the characteristics of Sensation ?

2. State and explain the attributes of Sensation distinguishing them from one another.

3. What is sensation ? What is stimulus ? Does every increase in stimulus lead to an increase in the intensity of the sensation ? Discuss the question with special reference to Weber's law.

4. Does every increase in stimulus mean increase in sensation ? Or, Explain and examine fully the Weber-Fechner Law.

5. Mention the different classification of sensation. Distin guish between Organic and Muscular sensations.

6. Explain the main feature of Gustatory and Olfactory sensations. How are they allied ?

7. Discuss the nature of Visual Sensations. How is colour perceived ? What are the complementary colours ?

8. Explain how we have Visual Sensations. Discuss in this connection the merits and defects of Young-Helmholtz's theory of Colour Vision.

9. Discuss in what respects Young-Helmholtz's theory of vision differ from Herring's theory. Wherein lies the superiority of Ladd-Franklin's theory ?

10. Elucidate the characteristic difference of sensation and feeling. What is feeling tone of sensation ?

11. Distinguish between Positive and Negative after sensations.

12. Describe by means of a suitable diagram the different parts of human eye and explain how we see by our eyes. How far does the analogy between an eye and a camera hold good.

13. Give a brief description of the structure of eye and describe the functions of different parts.

14. State the functions of the retina and discuss the primary differences of colour Zone, Does the eye as a whole act like a photographic apparatus ?

15. Give a brief description of the structure of ear and describe the functions of its different parts.

16. Explain the Theories of Hearing.

17. Explain the Theories of Vision.

18. What are the Organic Sensations ? What are their importance ?

19. How do you get tactual or cutaneous sensation ? Discuss fully.

20. Distinguish the different types of Cutaneous sensation and point out their respective sense organs.

21. What is muscular sensation ? How muscular sensations differ from cutaneous sensations ?

22. Offer briefly your own view :

(a) Can there be sensation without stimulus ?

23. Write notes on :

(i) The Tendinous sense. (ii) Articular Sense (iii) Pitch (iv) Timbre, (v) Semi-circular canal, (vi) Colour blindness (vii) After sensation, (viii) Colour-Contrast, (ix) Colour-Mixture, (x) Light and Dark Adaptation, (xi) Purkinjie phenomenon, [xii) Complementary colours. [xiii] Colour Pyramid, [xiv] Organ of Corti, [xv] Rod cells and Cone cells, [xvi] Just noticable difference, [xvii] Somesthesis, (xviii] Synæsthesia, [xix] Retina [xx] Organic Sensation (xxi)·Cutaneous Sensation [xxii] Ladd-Franklin's theory of vision [xxiii] Helmholtz's Resonance theory of Audition [xxiv] Kinaesthetic sensation, [xxv] Paradoxical cold-sensation [xxvi] Threshold of sensation.

24. What is Somesthesis ?

উত্তর-সঙ্কেত ঃ

Somesthesis শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হল—দৈহিক অনুভূতি (bodily feeling)। দৈহিক সংবেদন (Organic Sensation) এবং পেশী সঞ্চালনমূলক সংবেদন বা চেষ্টিয় সংবেদন (Kinaesthetic sensation), দেহের ভারসাম্য বোধের সংবেদন (Static Sensation) এবং ত্বকজাত সংবেদন (Cutaneous sensation)—এ সবগুলিকেই সময় সময় Somesthesis বা দৈহিক সংবেদন নামে অভিহিত করা হয়।

'Somesthetic sensation' হল দেহ সম্পর্কীয় সংবেদন, কিন্তু এ সংবেদন অস্পষ্ট ধরনের। দেহের ত্বক, পেশী এবং দেহের আভ্যন্তরীণ যন্ত্র এই ধরনের সংবেদনের উৎস। দেহ যখন বিশ্রামে রত থাকে, তখন এই ধরনের সংবেদন পাওয়া যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রত্যক্ষ

(Perception)

১। প্রত্যক্ষ বলতে কি বুঝ? (What is Perception?):

অর্থপূর্ণ সংবেদনকে প্রত্যক্ষ বলা হয়। বস্তুর নিছক চেতনা বা বোধ হল সংবেদন। **সংবেদনকে যখন ব্যাখ্যা করা হয় তখনই তা হয়ে ওঠে প্রত্যক্ষ।** সংবেদকে ব্যাখ্যা করা হলে বস্তুর নিছক চেতনা একটা বিশেষ ধরনের জ্ঞানে পরিণতি লাভ করে। এই বিশেষ ধরনের জ্ঞানই প্রত্যক্ষ। সংবেদনকে ব্যাখ্যা করার অর্থ—সংবেদনগুলির উৎস হিসেবে বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব এবং বাহ্যবস্তুর গুণ সম্পর্কে অবহিত হওয়া। প্রত্যক্ষ হল সংবেদনের অর্থবোধ। পথ চলতে চলতে হঠাৎ শুনতে পেলাম কে যেন আমায় পিছন থেকে ডাকছে। প্রথমে কানে ভেসে এল একটা কণ্ঠস্বর, কিন্তু একটু সচেতন হতেই বুঝতে পারলাম যে, এ স্বর আমার এক পরিচিত বন্ধুর। প্রথম স্তরে স্বরটি ছিল শব্দ-সংবেদন, কিন্তু বন্ধুর কণ্ঠস্বর বলে যখন তাকে বুঝতে পারলাম তখন তা সংবেদনের স্তরে সীমাবদ্ধ না থেকে প্রত্যক্ষে পরিণত হল। যা প্রথমে ছিল একটি অর্থহীন শব্দ-সংবেদন, প্রত্যক্ষ করার ফলে তা হয়ে উঠল অর্থপূর্ণ।

সংবেদনকে ব্যাখ্যা করলেই তা প্রত্যক্ষে পরিণত হয়

প্রত্যক্ষের বিভিন্ন স্তর: এই প্রত্যক্ষকে বিশ্লেষণ করলে আমরা কয়েকটি স্তর খুঁজে পাই। যথা—

(ক) **পৃথকীকরণ** (Discrimination): যখন বন্ধুর কণ্ঠস্বরটি আমার কানে এসে পৌছল তখন শ্রবণ-সম্বন্ধীয় সংবেদনটিকে দৃষ্টিগত, ঘ্রাণগত এবং স্পর্শগত সংবেদন থেকে পৃথক করলাম।

(খ) **সদৃশকরণ** (Assimilation): অতীতে এই ধরনের যেসব শব্দ-সংবেদন পেয়েছি তার সঙ্গে এই সংবেদনটির সাদৃশ্য খুঁজে পেলাম। এই স্বর যে মানুষের কণ্ঠস্বর এবং পরিচিত বন্ধুর কণ্ঠস্বর—আমি তা আবিষ্কার করলাম।

(গ) **অনুষঙ্গ ও পুনরুজ্জীবন** (Association and Reproduction): এবার স্মৃতির সাহায্যে আমি শ্রবণগত সংবেদনটির সঙ্গে অন্যান্য সংবেদনের সংযোগ সাধন করলাম। আমার বন্ধুটির সঙ্গে আমি অতীতে এক কলেজে পড়েছি, তাকে কতবার

দেখেছি, কতবার স্পর্শ করেছি, তার সঙ্গে বসে গল্প করেছি। বন্ধুর কণ্ঠস্বরটি শুনে সেই শ্রবণগত সংবেদনের সঙ্গে দৃষ্টিগত এবং স্পর্শগত সংবেদনগুলিকে আমি সংযুক্ত করলাম। বর্তমান সময়ের সংবেদনটি অতীতের অনেক সংবেদনকে মনে পুনরুজ্জীবিত করল।

(ঘ) বস্তুচেতনা এবং স্থান-নিরূপণ (Objectification and Localisation) : এর পরে সংবেদনটির উৎস যে কোন বহির্জগতের বস্তু, সেটি উপলব্ধি করি এবং সেই বস্তুটি যে বিশেষ স্থানে অবস্থিত, সেই স্থানটিও নিরূপণ করি। যেমন, আমি কণ্ঠস্বরটি শুনে বুঝি এটি কোন ব্যক্তির কণ্ঠস্বর ও এই কণ্ঠস্বর আমার বন্ধুর এবং একটি বিশেষ স্থান থেকে, অর্থাৎ পথের ওপরে একটু দূর থেকে বন্ধুটি আমায় ডাকছে।

(ঙ) বিশ্বাস (Belief) : আমার বন্ধুই যে আমায় পথের ওপর থেকে ডাকছে এবং কণ্ঠস্বরটির সংবেদন যে অলীক নয়, এই বিশ্বাস মনে জাগে বলেই ছুটে তার দিকে যাই।

প্রত্যক্ষের যে বিভিন্ন স্তরের বিশ্লেষণ আমরা করলাম, তার ওপর ভিত্তি করে আমরা প্রত্যক্ষের একটা সংজ্ঞা নির্ণয় করার চেষ্টা করব।

প্রত্যক্ষের সংজ্ঞা

প্রত্যক্ষ হচ্ছে সংবেদনের অর্থযুক্ত রূপ। **যখন কোন একটি সংবেদনকে ভিন্ন জাতীয় সংবেদন থেকে পৃথক করে সমজাতীয় সংবেদনের সঙ্গে তার সাদৃশ্য নির্দেশ করে, বর্তমানের পুনরুজ্জীবিত অতীতলব্ধ সংবেদনের সঙ্গে সংযুক্ত করে, তার উৎস ও স্থান নির্দেশ করা হয় এবং উৎসটির বাস্তব সত্তায় বিশ্বাস স্থাপন করে সংবেদনটিকে ব্যাখ্যা করা হয়, তখন এই মানসিক প্রক্রিয়াকে প্রত্যক্ষ বলে।**

২। প্রত্যক্ষের স্বরূপ (Nature of Perception) :

(ক) প্রত্যক্ষ এক ধরনের ক্রিয়া : বাহ্য-পরিবেশে কোন পরিবর্তন ঘটলে তাতে প্রতিক্রিয়া করাই হল প্রত্যক্ষ। বাহ্য-পরিবেশে যদি কোন পরিবর্তন না ঘটত, তবে প্রত্যক্ষ করার প্রশ্ন উঠত না।

(খ) প্রত্যক্ষ উপস্থাপনমূলক-পুনরুজ্জীবনমূলক প্রক্রিয়া (Presentative-Representative Process) : প্রত্যক্ষ প্রক্রিয়ার দুটি দিক আছে। একটি দিক হল উপস্থাপনমূলক—বর্তমানে যে সংবেদনটি আমার কাছে উপস্থাপিত হচ্ছে। যেমন, আমার বন্ধুর কণ্ঠস্বর। দ্বিতীয় দিকটি হল পুনরুজ্জীবনমূলক—অর্থাৎ, বর্তমানে সংবেদনটি অতীতলব্ধ অন্যান্য যেসব সংবেদনগুলিকে আমার মনে জাগিয়ে তুলছে। যেমন, আমার

প্রত্যক্ষ উপস্থাপনমূলক পুনরুজ্জীবনমূলক প্রক্রিয়া

বন্ধুর কণ্ঠস্বর, তার সঙ্গে সংযুক্ত যে দৃষ্টিগত এবং স্পর্শগত সংবেদন আছে, সেগুলিকে মনে পুনরুজ্জীবিত করছে।

(গ) প্রত্যক্ষ হল জানা ও চেনার (Cognition and Recognition) যুক্ত প্রক্রিয়া : পূর্বোক্ত উদাহরণটি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, আমি জানছি যে এটি একটি কণ্ঠস্বর। তারপর সেই কণ্ঠস্বরটিকে আমার বন্ধুর কণ্ঠস্বর বলে চিনছি। জানা ও চেনা এই উভয় প্রক্রিয়া একত্রে যুক্ত হলেই প্রত্যক্ষ সম্ভব হয়।

প্রত্যক্ষ জানা ও চেনার যুক্ত প্রক্রিয়া

(ঘ) প্রত্যক্ষ হল সংশ্লেষক (Synthetic) প্রক্রিয়া : যখন আমরা কোন একটি বস্তুকে প্রত্যক্ষ করি তখন তাকে একটি '**একক**' (unit) বা '**সমগ্র**' (whole) হিসেবে প্রত্যক্ষ করি, সেটি যে অংশবিশেষের সমন্বয় সেভাবে প্রত্যক্ষ করি না। একটি গাছকে প্রত্যক্ষ করার সময় আমরা গাছটিকে একটি বস্তু হিসেবেই প্রত্যক্ষ করি। গাছটি যে শাখা, প্রশাখা, পত্র, পুষ্প ও ফুলের সমন্বয় তা মনে করে প্রত্যক্ষ করি না।

প্রত্যক্ষ সংশ্লেষক প্রক্রিয়া

(ঙ) প্রত্যক্ষ নির্বাচনমূলক (Selective) **:** বাহ্য-জগতের অসংখ্য উদ্দীপনার মধ্যে আমরা এক বা একাধিক বস্তুকে নির্বাচন করে নিই এবং তাদের প্রত্যক্ষ করি। এই নির্বাচন নির্ভর করে বস্তুটির নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের ওপর এবং আবেগ, মনোযোগ, আগ্রহ প্রভৃতির ওপর।

(চ) প্রত্যয় হল বর্তমানের সঙ্গে অতীতের, নতুনের সঙ্গে পুরাতনের সংমিশ্রণ ঃ যে সংবেদনটি আমি বর্তমানে লাভ করছি, সেটি আমার কাছে নতুন। সেই সংবেদনটি অতীতে লব্ধ পুরাতন এবং পরিচিত সংবেদন-গুলিকে আমার মনে জাগিয়ে তুলছে এবং তার সঙ্গে সংযুক্ত হচ্ছে। সেই কারণেই মনোবিদ্ অ্যাঞ্জেল (Angell) বলেন যে, প্রত্যক্ষ হল 'সংশ্লেষাত্মক অভিজ্ঞতা এবং পুরাতনের সঙ্গে নতুনের সংযোগ সংশ্লেষণের প্রয়োজনীয় অংশ।[1]

প্রত্যক্ষ বর্তমানের সঙ্গে অতীতের,' নতুনের সঙ্গে পুরাতনের সংমিশ্রণ

(ছ) প্রত্যক্ষ একটি গঠন প্রক্রিয়া (Organizing Process) **:** প্রত্যক্ষে প্রত্যক্ষকারীর দৃষ্টিভঙ্গির বাহ্য-জগতের বস্তুগুলিকে নতুন করে বিন্যস্ত ও সুগঠিত করে। যেসব বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য আছে, যেগুলি পরস্পরের কাছাকাছি অথবা যেগুলি সুসমঞ্জস, সেগুলিকে প্রত্যক্ষকারী একত্রে প্রত্যক্ষ করে।

---

1. Angell : Psychology ; Page 153.

(জ) প্রত্যক্ষে প্রত্যক্ষকারীর অভিজ্ঞতা, শিক্ষণ, পরিবেশ, দৃষ্টিভঙ্গি, মানসিক প্রস্তুতি মনোভাব (attitude) ও সমাজের প্রভাবের ওপর নির্ভরশীল। প্রত্যক্ষকারী ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত সংবেদনের কিরূপ ব্যাখ্যা করবেন উপরিউক্ত বিষয়ের দ্বারাই সেটি নির্ধারিত হয়। প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার ভূমিকা খুবই উল্লেখযোগ্য। অতীতের অভিজ্ঞতা যতই ব্যাপক ও বৈচিত্র্যপূর্ণ হয় বর্তমানের বিষয়গুলির প্রত্যক্ষও ততই পূর্ণাঙ্গ হয়।

প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার ভূমিকা

(ঝ) **পূর্ণাঙ্গ প্রত্যক্ষ অভ্যাসসাপেক্ষ ব্যাপার :** অবশ্য অভ্যাস বলতে এখানে অবগতিরূপ মানসিক প্রক্রিয়ার অভ্যাসের কথা বলা হচ্ছে। কোকিলের ডাক শুনতে যে অভ্যস্ত, সে ব্যক্তি কেবলমাত্র স্বরটি শুনেই বুঝতে পারে কী রকমের পাখী ডাকছে।

প্রত্যক্ষের দুটি দিক আছে—একটি বইরের দিক আর একটি মনের দিক। বাইরের দিকটি হল **বস্তুগত দিক** বা **ব্যক্তিনিরপেক্ষ** (objective) দিক ; অপরটি হল **মানসিক দিক** বা **ব্যক্তিসাপেক্ষ** (subjective) **দিক**। মনোযোগ, প্রত্যাশা এবং কামনা হল প্রত্যক্ষের ব্যক্তিসাপেক্ষ দিক যা প্রত্যক্ষের ওপর অধিক মাত্রায় প্রভাব বিস্তার করে।[1] পূর্ব থেকে মনোযোগী ও প্রত্যাশী হয়ে থাকার ফলে এবং বস্তুটির জন্য কামনা থাকায় আমাদের প্রত্যক্ষ কার্যটি অনেক ক্ষেত্রেই সুস্পষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ হয়ে ওঠে।

প্রত্যক্ষের দুটি দিক— ব্যক্তি-নিরপেক্ষ ও ব্যক্তিসাপেক্ষ

প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে ব্যক্তিসাপেক্ষ উপাদানগুলি (Subjective elements) কোন মতেই উপেক্ষণীয় নয়।

৩। সংবেদন ও প্রত্যক্ষের সম্বন্ধ (Relation of Sensation to Perception) :

সংবেদনের ব্যাখ্যা করলেই তা প্রত্যক্ষে পরিণত হয়। সুতরাং, সংবেদন ও প্রত্যক্ষের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান।

সংবেদন ও প্রত্যক্ষের মধ্যে কয়েক বিষয়ে সাদৃশ্য এবং কয়েক বিষয়ে পার্থক্য বর্তমান।

সাদৃশ্য : প্রথমতঃ, সংবেদন ও প্রত্যক্ষ উভয়েই ইন্দ্রিয়নির্ভর। উদ্দীপক যদি ইন্দ্রিয়ের ওপর ক্রিয়া ক'রে তাকে উদ্দীপিত না করে তাহলে সংবেদন বা প্রত্যক্ষ কোনটিই সম্ভব হয় না।

1. "Perception may be greatly influenced by the preliminary direction of our attention by expectation or by desire."

—Rex and Knight : A Modern Introduction to Psychology, Page 108.

দ্বিতীয়তঃ, সংবেদন ও প্রত্যক্ষ উভয়ই বহির্মুখী। বাইরের জগৎ থেকে উদ্দীপনা এলেই তার সংবেদন হয়ে থাকে বা প্রত্যক্ষ সম্ভব হয়।

পার্থক্য ঃ (১) সংবেদন হল উদ্দীপনার প্রাথমিক বোধ বা অনুভূতি। প্রত্যক্ষ হল সংবেদন এবং তার ব্যাখ্যা। সংবেদনের উদ্দীপনার অর্থ জ্ঞাত হই না। প্রত্যক্ষে উদ্দীপনার অর্থ জ্ঞাত হই। অর্থযুক্ত সংবেদনই প্রত্যক্ষ।

(২) সংবেদন জ্ঞান নয়, জ্ঞানের উপাদান বা মালমশলা যোগায় মাত্র। প্রত্যক্ষ হল বস্তুর ঘটনার জ্ঞান। মনোবিদ্ ·জেমস্-এর ভাষায় সংবেদন হল কেবলমাত্র বস্তুটির সঙ্গে নিছক পরিচয় (acquaintance), প্রত্যক্ষ হল বস্তুটির সম্পর্কে সম্যক বা সুস্পষ্ট জ্ঞান (knowledge)। চোখে আলো এসে পড়তেই তাকে আলোর সংবেদন বলে জানলাম। কিন্তু যখন প্রত্যক্ষ করলাম, তখনই বুঝলাম ধাবমান গাড়ীর হেডলাইটের তীব্র আলোক আমার চোখের ওপর এসে পড়েছে।

(৩) সংবেদন হল বস্তুর গুণের চেতনা, গুণবিশিষ্ট বস্তুর চেতনা নয়। যেমন, লাল রঙের সংবেদন। প্রত্যক্ষ হল বস্তুর অস্তিত্বের চেতনা। যেমন, গোলাপ ফুল—লাল রঙটি যার মধ্যে রয়েছে। সে কারণে প্রত্যক্ষে বস্তুর অস্তিত্বকে আমরা যেমন বিশ্বাস করি, সংবেদনের ক্ষেত্রে তেমন করি না।

(৪) সংবেদনের তুলনায় প্রত্যক্ষ হল অধিকতর সক্রিয় প্রক্রিয়া। প্রত্যক্ষের তুলনায় সংবেদন অপেক্ষাকৃত নিষ্ক্রিয়। সংবেদনের ক্ষেত্রে উদ্দীপনাকে কেবলমাত্র গ্রহণ করি, প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে মনোযোগী হয়ে তার ব্যাখ্যা করি।

(৫) সংবেদন হল কেবলমাত্র উপস্থাপন মূলক (presentative); প্রত্যক্ষ হল উপস্থাপনমূলক এবং পুনরুজ্জীবনমূলক (presentative-representative process)। সংবেদনে যা বর্তমান কেবল তাকেই পাই। প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে বর্তমান অভিজ্ঞতা অতীত-লব্ধ অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যা উপস্থিত নেই তাকেও মনে জাগিয়ে তোলে।

(৬) সংবেদনের ক্ষেত্রে বস্তুর পূর্ণরূপটি পাই না, তার অংশবিশেষকে অর্থাৎ এক বা একাধিক গুণকে পেয়ে থাকি। প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে বস্তুর পূর্ণরূপটি আমাদের জ্ঞানগোচর হয়; কোন লাল ফুল প্রত্যক্ষ করার সময় ফুল এবং তার লাল বর্ণ বিচ্ছিন্নভাবে জ্ঞাত হই না, একটি সমগ্র বস্তুরূপে জ্ঞাত হই। কিন্তু সংবেদনে বস্তুর অংশ বা গুণ জ্ঞাত হই, যেমন—লাল রঙের সংবেদনের।

(৭) সংবেদন ও প্রত্যক্ষের আনুষঙ্গিক দৈহিক প্রক্রিয়ার মধ্যেও প্রভেদ আছে। সংবেদনের ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়, স্নায়ু এবং মস্তিষ্কের সংবেদনকেন্দ্র সক্রিয় হয়। প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে এগুলি ছাড়াও মস্তিষ্কের সংযোগকেন্দ্রও (Association area) সক্রিয় হয়ে ওঠে।

মনোবিদ্ উডওয়ার্থ (Woodworth)-এর মতে সংবেদন হল উদ্দীপকের প্রতি প্রথম প্রতিক্রিয়া, আর প্রত্যক্ষ হল উদ্দীপকের প্রতি দ্বিতীয় প্রতিক্রিয়া।[1]

(৮) সংবেদন জ্ঞানের উপাদান যোগায়, প্রত্যক্ষ সেগুলিকে সম্বন্ধযুক্ত করে।

৪। বিশুদ্ধ সংবেদন কি সম্ভব? (Is Pure Sensation Possible ?):

সংবেদনকে যখন ব্যাখ্যা করা হয়, তখন তা প্রত্যক্ষে পরিণত হয়। সংবেদন ছাড়া প্রত্যক্ষ সম্ভব নয়। প্রশ্ন হল বিশুদ্ধ সংবেদন, অর্থাৎ যে সংবেদন শুধুমাত্র সংবেদন এবং যা প্রত্যক্ষের স্তরে উন্নীত হয়নি, তা কি লাভ করা সম্ভব? ধরা যাক, আমি একটি ফুল দেখলাম; এক্ষেত্রে প্রথমে বস্তুটির দৃষ্টিগত সংবেদন, তার পর ফুল বলে বস্তুটিকে প্রত্যক্ষ করা বা জানা—এই দুই ভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়া ঘটল কি? কোন কোন মনোবিদ্ বলেন, বিশুদ্ধ সংবেদন বা শুধুমাত্র সংবেদন সম্ভব নয়। সংবেদন এবং প্রত্যক্ষ এত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত যে শুধুমাত্র সংবেদন লাভ করা যায় না। সংবেদন বা প্রত্যক্ষ একই মানসিক প্রক্রিয়ার দুটি ভিন্ন অবস্থা; এদের কোন স্বতন্ত্র সত্তা নেই। চিন্তা বা আলোচনা করার সময় আমরা এদের পৃথকভাবে ধরে নিতে পারি। যেমন, কোন বস্তুর উপাদান (matter) এবং তার আকারকে (form) পৃথক করা সম্ভব নয়, ঠিক তেমনিভাবে সংবেদন এবং প্রত্যক্ষকে পৃথকভাবে চিন্তা করা গেলেও বাস্তবে পৃথক করা যায় না। এই কারণে ডক্টর ওয়ার্ড (Dr. Ward)-এর মতে বিশুদ্ধ সংবেদন হল মনোবিদ্যার দিক থেকে অলীক বস্তু (A pure sensation is a psychological myth.)।

বিশুদ্ধ সংবেদন সম্ভব নয়

অবশ্য একথা বলা হয়ে থাকে যে, সদ্যোজাত শিশুর ক্ষেত্রেই এই বিশুদ্ধ সংবেদন সম্ভব। কিন্তু এও আনুমানিক ধারণা মাত্র, যেহেতু আমাদের শৈশবের বিষয় একেবারেই স্মরণ নেই। শিশু প্রথম অভিজ্ঞতার মুহূর্তে বিশুদ্ধ সংবেদন লাভ করেছিল একথা বলা যেতে পারে, কিন্তু এই রকম কোন মুহূর্তের অস্তিত্ব প্রমাণ করা কঠিন। বয়োপ্রাপ্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ সংবেদন সম্ভব নয়। কারণ তার ক্ষেত্রে সংবেদন অতীত অভিজ্ঞতার সঙ্গে এমনভাবে যুক্ত হয়ে পড়ে যে, তা প্রত্যক্ষে পরিণত হয়।

সদ্যোজাত শিশুর ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ সংবেদন সম্ভব, এ নিছক অনুমান

---

1. "Sensation is the first response aroused by a stimulus.........Perception is the second response, following the sensation and being properly a direct response to the sensation and only an indirect response to the physical stimulus."

—Woodworth : Psychology, 6th Edition ; Page 422.

কিন্তু মনোবিদ্ স্টাউট (Stout) বলেন যে, আমাদের মনে সময় সময় বিশুদ্ধ সংবেদন জাগতে পারে। বস্তু সম্পর্কে একটা অস্পষ্ট বা অনির্দিষ্ট চেতনা সময় সময় আমরা লাভ করি। যেমন, পথ দিয়ে অন্যমনস্কভাবে চলতে চলতে হয়ত কোন বন্ধুকে কেবল দেখেই চলে গেলাম, একটু পরে খেয়াল হতে তাকে চিনতে পেরে তার দিকে ফিরে গেলাম। কাজেই প্রথমের যে দৃষ্টিগত সংবেদন, তাকে বিশুদ্ধ সংবেদন বলা যেতে পারে—কেবলমাত্র দেখা, বন্ধু বলে জানা নয়। কিন্তু এক্ষেত্রেও একটা প্রশ্ন থেকে যায় যে, বন্ধুটিকে চিনতে না পারলেও তাকে মানুষ বলে ত চিনেছি। কাজেই সংবেদনের ত ব্যাখ্যা করা হয়েছে মাত্র, একেবারে বিশুদ্ধ সংবেদন কিভাবে হল?

স্টাউট-এর অভিমত

সুতরাং বলা যেতে পারে যে, বিশুদ্ধ সংবেদন বয়োপ্রাপ্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। যেহেতু বিশুদ্ধ সংবেদন বাস্তব অভিজ্ঞতায় লাভ করা যায় না, সেহেতু এর অস্তিত্ব স্বীকার করা চলে না।

৫। প্রত্যক্ষ সম্পর্কে গেস্টাল্টবাদী বা সমগ্রতাবাদীদের অভিমত (The Gestalt Theory of Perception) :

'গেস্টাল্ট' শব্দটি একটি জার্মান শব্দ। 'গেস্টাল্ট' শব্দটির অর্থ হল 'আকার' বা 'রূপ' (form), 'নকশা' (pattern) এবং 'সংগঠন' বা 'সমগ্রতা'(structure or configuration)। কোয়াহ্লার (Kohler), কফকা (Koffika), এবং বের্থাইমার (Wertheimer)—এই তিনজন এই মতবাদের প্রধান প্রবর্তক। আচরণবাদ (Behaviourism), 'অনুষঙ্গবাদ (Associationism) এবং অন্তর্দর্শনবাদ (Introspectionism)—এই তিন মতবাদের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ এই মতবাদের উৎপত্তি।

'গেস্টাল্ট' শব্দের অর্থ

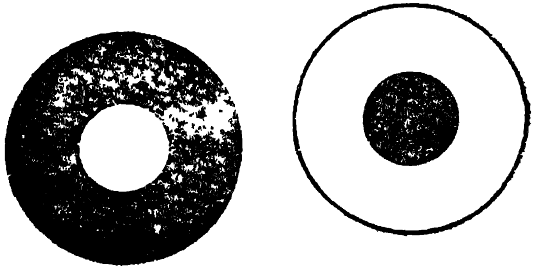
গেস্টাল্টবাদীরা মনে করেন যে, জ্ঞানের সরলতম উপাদান প্রত্যক্ষ, সংবেদন নয়। হ্বুণ্ট (Woundt), টিচেনার (Titchener) প্রমুখ মনোবিদগণ প্রত্যক্ষের সরলতম উপাদানরূপে সংবেদনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন, কিন্তু গেস্টাল্টবাদীরা মনে করেন যে, প্রত্যক্ষই জ্ঞানের একক। প্রত্যক্ষ এক সামগ্রিক অভিজ্ঞতা, বিচ্ছিন্ন সংবেদনের কোন ঐক্যবদ্ধ সংগঠন নয়। প্রত্যক্ষই সব জ্ঞানের মূল ভিত্তি।

গেস্টাল্টবাদীরা বলেন যে, যখন আমরা কোন বিষয় প্রত্যক্ষ করি তখন সেই বিষয়টি একটি সামগ্রিক রূপ নিয়ে আমাদের কাছে উদ্ভাসিত হয়—বিষয়টি খণ্ড খণ্ড ভাবে আমাদের কাছে উদ্ভাসিত হয় না। অনুষঙ্গবাদীদের মতে আমরা যখন কোন বিষয়

প্রত্যক্ষ করি তখন সেই বিষয়টি হল কতকগুলি বিচ্ছিন্ন সংবেদনের সমন্বয়। কিন্তু গেস্টাল্টবাদীরা এই অভিমতের বিরোধিতা করে বলেন যে, কি মানসিক প্রক্রিয়া, কি বাহ্যবস্তু, কোনটিই খণ্ড খণ্ড উপাদানের সমন্বয় নয়। যেহেতু সমগ্রতা বা সংগঠনই হল মানসিক প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য, সেহেতু মানসিক প্রক্রিয়াকে কতকগুলি খণ্ড খণ্ড উপাদানে বিশ্লেষণ করলে, তার যথার্থ স্বরূপটিকে কখনও জানা যায় না।

কোন কিছুকে সমগ্র একক হিসেবে প্রত্যক্ষ করাই মনের ধর্ম

যখন আমরা কোন কিছু প্রত্যক্ষ করি তখন বিচ্ছিন্ন সংবেদনগুলিকে একত্র করে আমরা প্রত্যক্ষ করি না। প্রত্যক্ষের বিষয়বস্তু সব সময়ই একটা 'সমগ্র রূপ' নিয়ে আমাদের কাছে উপস্থিত হয়। কতকগুলি অক্ষর নিয়েই একটি শব্দ গঠিত হয়। কিন্তু আমরা যখন কোন বই পড়ি, তখন কোন শব্দকে কতকগুলি বিচ্ছিন্ন অক্ষরের সমন্বয় মনে করে আমরা পড়তে থাকি না। সে কারণে কোন একটি শব্দের মধ্যে একটি অক্ষর বাদ পড়লেও আমরা পড়তে পড়তে এগিয়ে চলি, অনেক সময় ভুলটি আমাদের নজর এড়িয়ে যায়। এই কারণে সমগ্রতার দিকেই মানসিক প্রক্রিয়ার ঝোঁক, খণ্ড বিচ্ছিন্ন অংশের বা উপাদানের দিকে নয়।



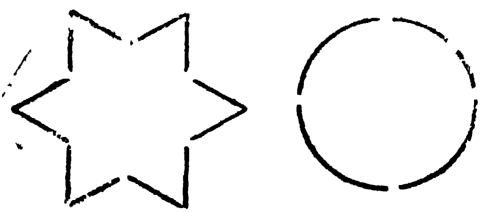
ক্ষেত্র ও মূর্তির তারতম্য অনুসারে দৃষ্ট-বস্তুর বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন

গেস্টাল্টবাদীদের মতে আমাদের সব অভিজ্ঞতাই একটি সমগ্র বস্তুর। এই সমগ্রতার কিছু অংশ মূর্তিরূপে এবং কিছু অংশ পটভূমিকারূপে ফুটে ওঠে। আমরা যখন কোন কিছু প্রত্যক্ষ করি তখন এক বিশেষ পটভূমির সঙ্গে সেই কোন কিছুকে যুক্ত করে প্রত্যক্ষ করি। অর্থাৎ, কোন 'একটি বিশেষ পটভূমিতে একটি মূর্তি' (A figure against a ground) হিসেবে তাকে প্রত্যক্ষ করি। বস্তুতঃ, এই 'বিশেষ ক্ষেত্র বা পটভূমি' এবং মূর্তিতত্ত্ব (Figure and Ground) গেস্টাল্টবাদীদের প্রত্যক্ষের ব্যাখ্যার একটি মৌলিক সূত্র।

ক্ষেত্র ও মূর্তিতত্ত্ব

বিশেষ ক্ষেত্র বা পটভূমি যদি পরিবর্তিত হয় তাহলে মূর্তিটিরও পরিবর্তন ঘটে। আবার ক্ষেত্র ও মূর্তির তারতম্য অনুযায়ী প্রত্যক্ষের বিষয়বস্তুরও পরিবর্তন ঘটে।

পূর্ব পৃষ্ঠার রেখাচিত্রে দুটি বৃত্তের আকার একই, অথচ পটভূমিকার তারতম্যের জন্য দুটি বৃত্তকে পৃথক মনে হচ্ছে। প্রথমটি কালোর পটভূমিকায় সাদা বৃত্ত। দ্বিতীয়টি সাদার পটভূমিকায় কালো বৃত্ত। এইভাবে এক বিশিষ্ট পটভূমিকায় আমরা কোন কিছু প্রত্যক্ষ করি। আকাশের পটভূমিকায় আমরা দূরের পাহাড়টিকে দেখি, সাদা দেওয়ালের পটভূমিকায় তার ওপর লাল দাগটিকে দেখি। নবজাত শিশু যখন প্রথম তার চোখ মেলে তখন তার প্রত্যক্ষকে পরিণত বয়স্কের প্রত্যক্ষের সঙ্গে তুলনা করা চলে না। কিন্তু তাহলেও তার চোখের সামনে যে বস্তুটি থাকে, ধরা যাক কোন উজ্জ্বল লাল রঙের বস্তু, সেটি তার চারপাশের পটভূমিকায় একটি বিশেষ মূর্তি নিয়ে তার কাছে উপস্থাপিত হয়। মনোবিদ্ জেমস্ (James)-এর মতে নবজাত শিশুর চেতনা হল 'জট পাকানো অস্পষ্ট অব্যক্ত চেতনা' ("a big blooming, buzzing confusion"), অর্থাৎ নবজাত শিশুর প্রত্যক্ষের পটভূমিতে চেতনা কোন সুস্পষ্ট মূর্তি ধারণ করে না। কিন্তু গেস্টাল্টবাদীরা এই মতের তীব্র বিরোধিতা করেছেন। তাঁদের মতে নবজাত শিশুর চেতনা অস্পষ্ট নয়। নবজাত শিশুও এক বিশেষ ক্ষেত্রে বা পটভূমিকায় কোন মূর্তি প্রত্যক্ষ করে।



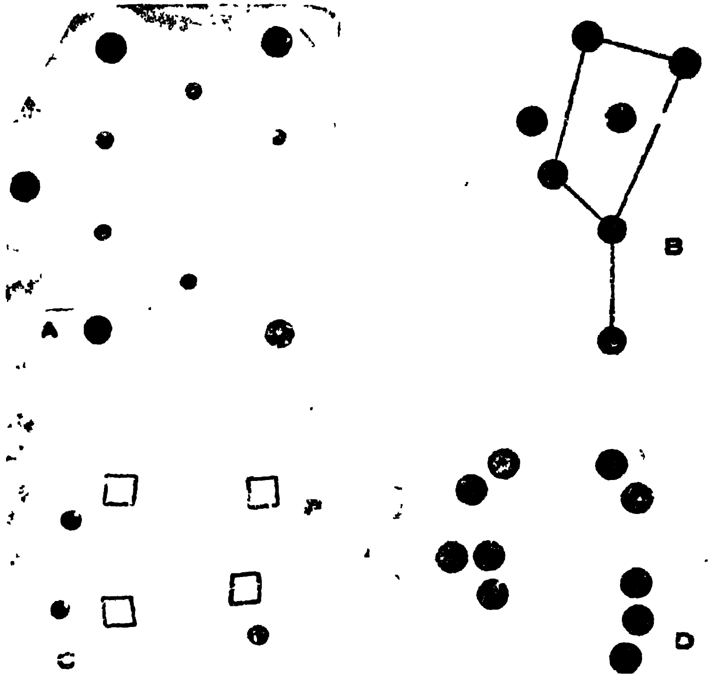
প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে ভগ্নতা পরিপূরণ। উপরের বৃত্ত এবং তারকার মধ্যে অসম্পূর্ণতা আছে, কিন্তু প্রত্যক্ষের সময় আমরা সেই অসম্পূর্ণতা অগ্রাহ্য করে মূর্তিগুলিকে সম্পূর্ণভাবে দেখি।

গেস্টাল্টবাদীরা বলেন যে, সমগ্রতা ও সংগঠনের দিকে মনের ঝোঁক থাকার জন্য প্রত্যক্ষের বিষয়বস্তুর মধ্যে যদি কোনরকম ছেদ (gap) বা অপূর্ণতা থাকে, তাহলে মনের মধ্যে একটা অস্বস্তির ভাব দেখা দেয় এবং মন কল্পনায় সেই ফাঁককে ভরাট করে, শূন্যতাকে পূরণ করে বা অসম্পূর্ণতাকে মনে মনে দূর করে দিয়ে তাকে একটি 'সমগ্র একক' (whole or unit) হিসেবে দেখতে চায়। বস্তুতঃ, যেখানেই কোন রকম

ভগ্নতা পরিপূরণ

ফাঁক বা অসম্পূর্ণতা আছে, কল্পনায় ভরাট করে নিয়ে তাকে একটা সর্বাঙ্গ সুন্দর 'একক বস্তু' হিসেবে প্রত্যক্ষ করাই মনের প্রবণতা। একেই গেস্টাল্টবাদীদের ভাষায় বলা হয় 'ভগ্নতা পরিপূরণের নিয়ম' (Principle of closure বা Pragnanz)। এই নিয়মানুসারে ব্যক্তির প্রতিটি অভিজ্ঞতা স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং যথাসম্ভব সুগঠিত ও সুসংহত হতে চায়।

প্রত্যক্ষ করার সময় বিষয়বস্তুগুলিকে সমগ্র একক হিসেবে প্রত্যক্ষ করার যে প্রবণতা আমাদের মধ্যে আছে, তার কতকগুলি কারণ গেস্টাল্টবাদীরা নির্দেশ করেছেন। যথা—



A. Inclusiveness. B. Continuity. C. Similarity. D. Proximity.

(ক) নৈকট্য (Proximity): যেসব বস্তু পরস্পরের সন্নিকটে থাকে সেগুলি মিলে একটা সমগ্রতার সৃষ্টি করে বা দল গঠন করে। যেমন, রাত্রিবেলা আকাশের দিকে তাকিয়ে যে সব তারা কাছাকাছি দেখি, সেগুলিকে আমরা দলবদ্ধ করি এবং কখনও ত্রিভুজ বা কখনও বৃত্ত প্রভৃতি বিভিন্ন আকারে তাদের প্রত্যক্ষ করি। উপরের D রেখাচিত্রটি দেখলেই বিষয়টি বোঝা যাবে।

(খ) সাদৃশ্য (Similarity): যে-সব বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য আছে, সে-সব বস্তুকে একটি সমগ্রতার মধ্যে এনে, অর্থাৎ দলবদ্ধ করে আমরা প্রত্যক্ষ করি। যেমন, যদি একটি দেওয়ালের ওপর কতকগুলি ত্রিভুজ, বৃত্ত এবং চতুষ্কোণ অঙ্কিত থাকে তাহলে ত্রিভুজগুলি, চতুষ্কোণগুলি এবং বৃত্তগুলি পরস্পর মিলিত হয়ে দল গঠন করে এবং ঐ দলগুলি আলাদা আলাদা ভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। উপরের C চিত্রটি

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, বিন্দু এবং বর্গক্ষেত্রগুলি আলাদা আলাদা ভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে।

(গ) **নিরবচ্ছিন্নতা** (Continuity) : প্রত্যক্ষের বিষয়বস্তুর মধ্যে যদি নিরবচ্ছিন্নতা থাকে তাহলে উপাদানগুলি সহজেই চেতনায় দলবদ্ধ হয়ে একটি 'সামগ্রিক রূপ' নিয়ে আমাদের কাছে উপস্থাপিত হয়। কতকগুলি বিচ্ছিন্ন বিন্দু যদি পাশাপাশি এমনভাবে সাজান থাকে যে, বিন্দুগুলিকে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত করলে একটি সরলরেখা বা একটি বৃত্ত গঠিত হয় তাহলে বিন্দুগুলিকে সেভাবেই আমরা প্রত্যক্ষ করি। পূর্বপৃষ্ঠায় B চিত্রটিতে বিন্দুগুলিকে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত করে আমরা একটা রেখাচিত্র প্রত্যক্ষ করি।

(ঘ) **অন্তর্বেষ্টন** (Inclusiveness) : কোন নকশা যদি সমস্ত অংশকে নিজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত না করে অংশবিশেষকে দলের বহির্ভূত করে রাখে, তার তুলনায় যে নকসা সমস্ত অংশকেই নিজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়, তা সহজেই আমাদের কাছে একটি সংগঠনরূপে ধরা পড়ে। কোন একটি দল বা নকশা (group or pattern) একটি সংগঠনরূপে তার অংশের তুলনায় সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পূর্ব পৃষ্ঠায় A চিত্রটি দেখলেই বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বোঝা যাবে।

(ঙ) **বিশেষ পরিচিতি** (Familiarity) : কোন একটি নকশা বা রূপ (pattern) আমাদের কাছে সুপরিচিত হওয়ার জন্য একটি সমগ্র রূপ নিয়ে আমাদের কাছে ধরা পড়ে।

৬। অধ্যাস বা ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ (Illusion) :

বিপথগামী কল্পনার প্রভাবে কোন একটি সংবেদনের অযথার্থ ব্যাখ্যার ফলে যে বিকৃত প্রত্যক্ষ ঘটে তাহল অধ্যাস। রজ্জুতে সর্পভ্রম, শুক্তিতে রজতভ্রম ইত্যাদি হল অধ্যাসের দৃষ্টান্ত।

যখন আমরা সংবেদনকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করি তখন তা হয় প্রত্যক্ষ, আর যখন আমরা সংবেদনকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করি না তখন তা হয় ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ বা অধ্যাস। অধ্যাসের ক্ষেত্রেও প্রত্যক্ষের মতনই উদ্দীপক থাকে যা সংবেদন সৃষ্টি করে। তবে সংবেদনের যথার্থ ব্যাখ্যা অধ্যাসের ক্ষেত্রে হয় না। অধ্যাসের ক্ষেত্রে উদ্দীপকের ভ্রান্ত ব্যাখ্যা দেওয়া হয় যার জন্য বস্তুর যথার্থ জ্ঞান না হয়ে অযথার্থ জ্ঞান হয়। এক্ষেত্রে কল্পনার প্রভাব বিষয়বস্তুর যথার্থ প্রত্যক্ষের পথে বাধার সৃষ্টি করে। উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টাকে বুঝে নেওয়া যাক :

অধ্যাসের স্বরূপ

পথ দিয়ে যেতে যেতে যখন দড়িটাকে দড়ি দেখছি বা ল্যাম্পপোস্টটাকে ল্যাম্পপোস্ট বলেই মনে করছি তখন তাহল প্রত্যক্ষ। কিন্তু সেই দড়িকেই যখন আবছা অন্ধকারে

সাপ বলে মনে করছি বা ল্যাম্পপোস্টটাকে মানুষ বলে ভাবছি তখন তাহল অধ্যাস (Illusion)। আসলে আমার ইন্দ্রিয়-পথে যে উদ্দীপনা সঞ্চারিত হচ্ছে তার উৎস দড়িই, সাপ নয়। অস্বভাবী কল্পনা সঠিক প্রত্যক্ষের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করছে যার জন্য সংবেদনের ব্যাখ্যা দেবার সময় তাকে সাপ বলে মনে করছি।

অধ্যাসের বাস্তব ভিত্তি

অধ্যাসের ক্ষেত্রে একটা বাস্তব ভিত্তি থাকে। অধ্যাসে যে বস্তুকে প্রত্যক্ষ করা হয় তা সম্পূর্ণভাবে মনের সৃষ্টি নয়। অধ্যাস নিছক কল্পনা নয়। যে বস্তু আসলে যা তাকে সেভাবে প্রত্যক্ষ না করে সেটি যা নয়, তা প্রত্যক্ষ করাই ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ। সুতরাং, অধ্যাস বা ভ্রান্ত প্রত্যক্ষে রয়েছে কোন বস্তুর সংবেদন এবং তার ভ্রান্ত ব্যাখ্যা।

৭। অধ্যাসের কারণ (Causes of Illusion) :

কি কি কারণে অধ্যাস ঘটে এবার সেগুলি আলোচনা করা যাক : অধ্যাসের একাধিক কারণ আছে ; যেমন—(ক) **জাগতিক কারণ**, (খ) **দৈহিক কারণ** এবং (গ) **মানসিক কারণ**।

(ক) **জাগতিক কারণ :** কোন কোন ক্ষেত্রে উদ্দীপকের গঠন এবং প্রকৃতি এমন হতে পারে যে, তার জন্য ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ বা অধ্যাসের সৃষ্টি হতে পারে।

(খ) **দৈহিক কারণ :** দেহ যদি অসুস্থ থাকে বা ইন্দ্রিয় যদি ত্রুটিপূর্ণ হয় তাহলে কখনও কখনও অধ্যাসের সৃষ্টি হয়। পাণ্ডুরোগী সাদা বস্তুকেও হলদে দেখে।

(গ) **মানসিক কারণ :** প্রথমতঃ, অভ্যাস অনেক সময় অধ্যাসের সৃষ্টি করে।

মানসিক অভ্যাস

প্রুফ-রিডারদের এই ধরনের ভুল হয়ে থাকে। 'পরিত্রণ' কথাটিকে 'পরিত্রাণ' মনে করে সংশোধন না করেই প্রুফ-রিডার এগিয়ে চলেন। অভ্যাসের জন্যই এরূপ ঘটে থাকে।

দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যাশা, প্রতীক্ষা এবং পূর্ব-ধারণা অধ্যাসের সৃষ্টি করে। রামের সঙ্গে

প্রত্যাশা, প্রতীক্ষা এবং পূর্ব ধারণা

দেখা করব এই প্রত্যাশা নিয়ে যখন দাঁড়িয়ে আছি তখন অনেক সময় অপর একজন পরিচিত ব্যক্তিকে রাম বলে ভ্রম করি। আগে থেকেই ভয়ে ভয়ে আছি যে সাপের দেখা পাব, তাই সামনের রজ্জুখণ্ডটিকে সর্প বলে ভ্রম হয়।

তৃতীয়তঃ, উদ্বেগ এবং ভীতিও অধ্যাসের সৃষ্টি করতে পারে। পাড়াতে খুব

উদ্বেগ এবং ভীতি

চুরি হচ্ছে, সে কারণে রাত্রিবেলায় ইঁদুরের শব্দ শুনেও মনে হয় বুঝি ঘরে চোর ঢুকেছে।

চতুর্থতঃ, ভ্রান্ত ধারণা, সংস্কার, পক্ষপাতিত্ব, অন্ধবিশ্বাস, সন্দেহ প্রভৃতি অধ্যাস সৃষ্টি করতে পারে। যেমন, রামকে পছন্দ করি না, তার সঙ্গে হঠাৎ আমার ধাক্কা লেগে গেলেও আমি প্রত্যক্ষ করি সে যেন আমায় ঠেলে দিল।

ভ্রান্ত ধারণা, সংস্কার, অন্ধবিশ্বাস ইত্যাদি

পঞ্চমতঃ, কোন বিশেষ সময়ে এক ধরনের চিন্তায় যদি মন ভরপুর থাকে তাহলে তার দ্বারা অধ্যাসের সৃষ্টি হতে পারে। যেমন, ভূতের গল্প শোনার পরে অন্ধকার রাত্রিতে ঘরের বাইরে গেলে সর্বত্রই যেন ভূত চোখে পড়ছে এরূপ মনে হয়।

একই সময়ে অন্যান্য ভ্রমাত্মক সংবেদন চিন্তান্বিত মনে ভ্রমাত্মক সংবেদন সৃষ্টি করে

৮। অধ্যাস সংশোধনের উপায় (Correction of Illusion) :

অধ্যাস বা ভ্রান্ত প্রত্যক্ষকে সংশোধন করা চলে। গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে, মনোযোগী হলে, সতর্ক হলে এবং আমাদের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়কে যদি যুক্তভাবে কাজ করান যায় তবে এই ভ্রম সহজেই ধরা পড়ে। চোখে যাকে মানুষ বলে মনে হচ্ছে হাত দিয়ে স্পর্শ করলেই সেটি যে গাছ তা বোঝা যাবে। অনেক সময় সত্য নির্ধারণ করার জন্য একাধিক ইন্দ্রিয়কে ব্যবহার করতে হয়। দূরে থাকার জন্য যে ভ্রমের সৃষ্টি হচ্ছে কাছে গিয়ে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে সে ভ্রম কেটে যাবে।

৯। অধ্যাস : সর্বজনীন ও ব্যক্তিবিশেষ (Illusion—Individual and Universal):

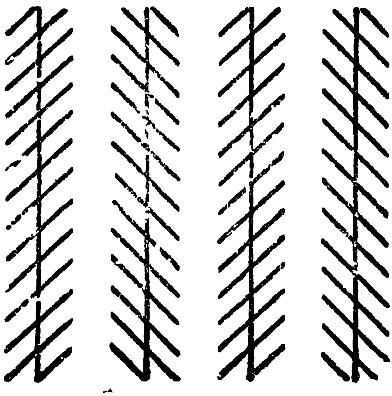
এক ধরনের অধ্যাস আছে যা সর্বজনীন, অর্থাৎ সকলেরই হয়ে থাকে। ধাবমান গাড়ীতে বসে সকলেরই মনে হয় গাছ, পাহাড়, বাড়ী সব বিপরীত দিকে ছুটে চলেছে বা আকাশে যখন মেঘ ভেসে বেড়ায় তখন মনে হয় মেঘের সঙ্গে আকাশের চাঁদও ছুটে চলেছে।

ব্যক্তি বিশেষের অধ্যাস হল দড়ি দেখে সাপ বলে ভ্রম হওয়া, সমাধির ছায়া দেখে ভূতের ভ্রম হওয়া। এ ভ্রম কারও হতে পারে, কারও না-ও হতে পারে।

১০। বিভিন্ন ধরনের অধ্যাস ও ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ (Different Kinds of Illusion) :

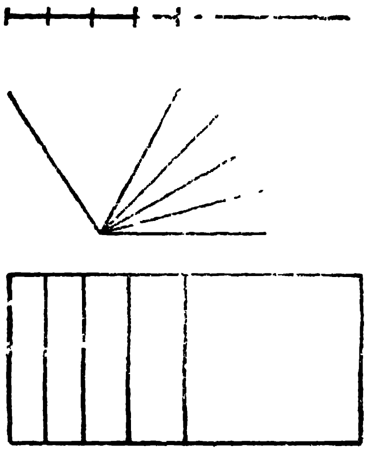
(১) জ্যামিতিক রেখাঙ্কন সম্পর্কীয় অধ্যাস ও ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ (Geometrical Optical Illusions) : জ্যামিতিক রেখাঙ্কন সম্পর্কে নানারকম চাক্ষুষ ভ্রান্তি ঘটে। জ্যামিতিক রেখা, কোণ ইত্যাদি বিষয়ের পরিমাপ সম্পর্কেও নানারকমের চাক্ষুষ ভ্রান্তি দেখা যায়। এই ধরনের ভ্রান্ত প্রত্যক্ষকেই 'জ্যামিতিক

রেখাঙ্কন সম্পর্কীয় ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ' বলা হয়। নীচে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল—



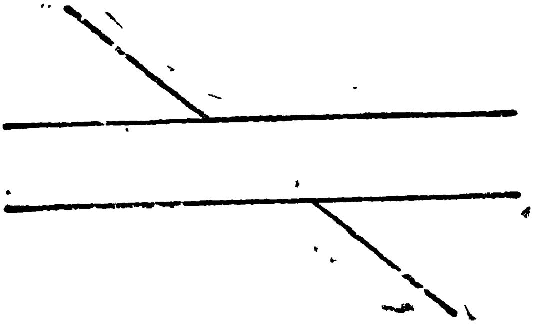
জোলনার (Zollner)-এর অধ্যাস

(ক) উপরের ছবিতে চারটি সরলরেখা সমান্তরাল, অথচ মনে হয় এরা যেন বেঁকে গেছে এবং পরস্পরের সঙ্গে মিশে যাবে।



(খ) উপরের ছবি তিনটি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, একটি সরলরেখা, একটি কোণ ও একটি আয়তক্ষেত্রকে প্রথমে সমদ্বিখণ্ডিত করা হয়েছে। কিন্তু পরে রেখা, কোণ বা আয়তক্ষেত্রের যে অংশটিকে পুনরায় বিভিন্ন অংশে খণ্ডিত করা হয়েছে

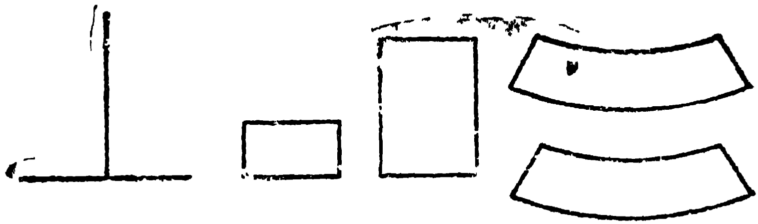
সেটিকে অপরটির তুলনায় বড় দেখাচ্ছে। অথচ রেখা, কোণ ও আয়তক্ষেত্রের দুটি অংশই সমদ্বিখণ্ডিত হওয়ার জন্য পরস্পর সমান।



পগেন্‌ডর্ফ (Poggendorf)-এর অধ্যাস

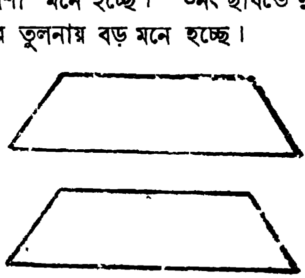
(গ) উপরের ছবিতে দুটি তির্যক রেখাই এক রেখার অংশ অথচ দেখলে মনে হয় যেন রেখা দুটি ভিন্ন।

নীচের ১নং ছবিতে দুটি রেখাই দৈর্ঘ্যে সমান, কিন্তু লম্ব রেখাটিকে (vertical line) আনুভূমিক রেখার (horizontal line) তুলনায় দীর্ঘতর মনে হচ্ছে।



১নং ২নং ৩নং

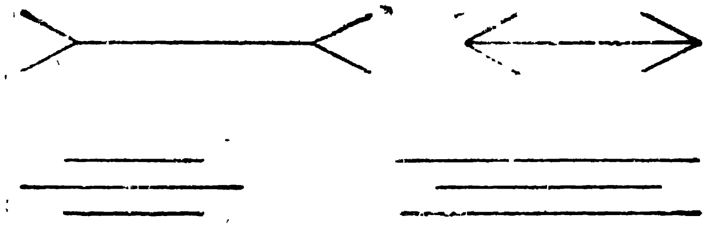
উপরের ২নং ছবিতে আয়তক্ষেত্র দুটির বিস্তার সমান। কিন্তু ডান পাশের আয়তক্ষেত্রটির বিস্তার অপরটির তুলনায় বেশী মনে হচ্ছে। ৩নং ছবিতে দুটি চিত্রেরই আকার সমান, যদিও উপরেরটিকে নীচেটির তুলনায় বড় মনে হচ্ছে।



(ঘ) উপরে ছবিতে দুটি পাত্রই সমান। অথচ উপরের পাত্রকে নীচের পাত্রটির তুলনায় বড় মনে হচ্ছে।

(২) **মুলার-লায়ারের অধ্যাস** (Muller-Lyer Illusion) :

বিশেষ বিশেষ ভঙ্গিতে আঁকা জ্যামিতিক রেখা অনেক সময় অধ্যাস বা ভ্রান্ত প্রত্যক্ষের সৃষ্টি করে। এ প্রসঙ্গে মুলার-লায়ার-এর উদাহরণ উল্লেখযোগ্য।

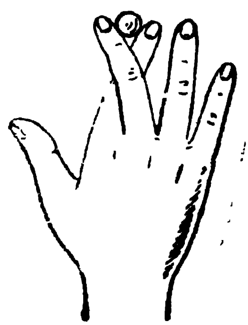


মুলার-লায়ার-এর অধ্যাস

উপরের চিত্রে যদিও উপরের সমতল রেখা দুটি সমান তবু বাঁ দিকেরটা বড় দেখাচ্ছে। নীচেই অংশে আঁকা রেখা দুটিকে অসমান মনে হচ্ছে যদিও রেখা দুটি সমান। উপরের সঙ্গে নীচের রেখা তুলনা করার জন্য এই অধ্যাস ঘটছে। এই অধ্যাসের কারণ কি? এর কারণ, যখন আমরা কোনকিছু প্রত্যক্ষ করি, তখন তাকে সমগ্রভাবেই (unified whole) প্রত্যক্ষ করি। কোন কিছুকে তার অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে প্রত্যক্ষ করি না।

(৩) **অতীত অভ্যাস ও পূর্ব অভিজ্ঞতার প্রভাবজনিত অভ্যাস** :

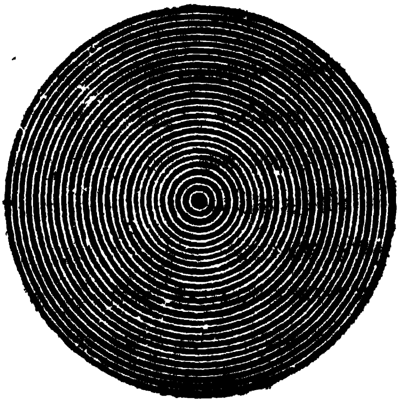
দুটি আঙ্গুলকে কোণাকুণি একটির ওপর অপর একটি রেখে আঙ্গুলের ফাঁকের মধ্যে একটি মার্বেল রাখা হয়েছে যদিও একটি মার্বেলই রয়েছে তবু দুটি মার্বেল আছে বলে ভ্রম হয়। এর কারণ আমাদের অতীত অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের জানা আছে যে, যখন দুটি বস্তুর স্পর্শ-সংবেদন লাভ করি, তখন নিশ্চয়ই দুটি বস্তু থাকবে। এখানে একটি মার্বেল থাকলেও, দুটি আঙ্গুলে দুটি স্পর্শ-সংবেদন পাচ্ছি।



অ্যারিস্টটল (Aristotle)-এর অধ্যাস

(৪) **গতি সম্পর্কে ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ** : শহরের পথে চলতে চলতে নিয়ন আলোর বিজ্ঞাপন আমাদের চোখে পড়ে। কোন হোটেলের নামের দিকে যাতে লোকের দৃষ্টি

আকর্ষিত হয় তার জন্য নামের চারপাশে কয়েকটি আলোকিত তীরকে দ্রুতগতিতে একটির পর একটি ছুটে চলতে দেখা যায়। এ হল গতির ভ্রান্ত প্রত্যক্ষের উদাহরণ। আসলে



উপরের এই চিত্রটিকে যদি ঘোরান হয় তাহলে চিত্রের ভেতরকার বৃত্তগুলি
গতিশীল হয়ে উঠবে এবং ঘূর্ণায়মান বৃত্তের ব্যাসার্ধ
(moving radii) প্রত্যক্ষ করা যাবে।

এখানে আলোকিত তীরগুলি স্থিতিশীল, কিন্তু খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে তীরগুলিকে একের পর এক আলোকিত করা হচ্ছে বলে গতির ভ্রম জন্মাছে।

১১। 'স্থান' বা বিস্তার কিভাবে প্রত্যক্ষ করি? (How can Space or Extension in general be perceived?):

আমরা যখন কোন একটি বস্তু প্রত্যক্ষ করি তখন কোন একটি স্থানে তাকে প্রত্যক্ষ করি। প্রশ্ন হল, এই স্থানকে কিভাবে প্রত্যক্ষ করা যায়? 'স্থান'-এর প্রকৃত সত্তা কি, সে সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন না তুলে কেবলমাত্র মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে স্থানের ধারণা আমরা কিভাবে গঠন করি, তাই আমাদের আলোচ্য বিষয়। স্থান দু-প্রকার—**শূন্যস্থান** (empty space) এবং **পূর্ণস্থান** (filled space)।

স্থান ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু নয়

পূর্ণস্থানটি বলতে বুঝি যখন স্থানটি বস্তুর দ্বারা পূর্ণ। এই পূর্ণস্থানই হল বিস্তার (extension)। শূন্যস্থান হল বস্তুর অস্তিত্বের অভাব। এখন এই পূর্ণস্থান বা বিস্তার আমরা কিভাবে প্রত্যক্ষ করি?

বিস্তার বলতে আমরা বুঝি (১) কতকগুলি বিন্দুর সহ-অবস্থান (Co-existence) এবং (২) সহ-অবস্থিত বিন্দুগুলির মধ্যে পারস্পরিক দূরত্ব ও দিকের সম্বন্ধের অস্তিত্ব। ব্যাপ্তি

(Extensity), স্থানীয় বৈশিষ্ট্য (Local signs) এবং গতি ও অঙ্গসঞ্চালন (Movement)-এর মাধ্যমে আমরা বিস্তারের উপরিউক্ত দুটি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে থাকি।

প্রথমতঃ, দৃষ্টিগত এবং স্পর্শগত সংবেদনের ব্যাপ্তি আমাদের কতকগুলি বিন্দুর সহ-অবস্থান (co-existence of a number of points) সম্পর্কে জ্ঞান দেয়। ধরা যাক,

ব্যাপ্তি

আমি যখন একটা লম্বা সরলরেখা প্রত্যক্ষ করছি তখন এই দৃষ্টিগত সংবেদন হল সহ-অবস্থানকারী কতকগুলি বিন্দুর সংবেদন, অর্থাৎ আমি বুঝছি, কতকগুলির বিন্দু একই সময়ে পাশাপাশি অবস্থান করছে।

দ্বিতীয়তঃ, দৃষ্টিগত এবং স্পর্শগত সংবেদনের স্থানীয় বৈশিষ্ট্য আছে সেহেতু হাত দিয়ে স্পর্শ না করেও চোখ দিয়ে দেখে আমরা বিভিন্ন বস্তুর অস্তিত্ব উপলব্ধি করি। আবার

স্থানীয় বৈশিষ্ট্য

চোখ বুজে কেবলমাত্র হাত দিয়ে স্পর্শ করেই বলে দিতে পারি বস্তুটি কি; একেই বলা হয় স্থানীয় বৈশিষ্ট্য। এই স্থানীয় বৈশিষ্ট্যই জানিয়ে দেয় যে, বিন্দুগুলি পরস্পর থেকে পৃথক।

তৃতীয়তঃ, সক্রিয় অঙ্গ সঞ্চালনের মাধমে আমরা বিভিন্ন প্রকারের পেশীসংবেদন পেয়ে থাকি। একটি বিন্দু থেকে আর একটি বিন্দুতে যেতে হলে অঙ্গ সঞ্চালন করা দরকার এবং এই সঞ্চালন করার জন্য যে পেশী সংবেদন (Muscular sensation)

অঙ্গ সঞ্চালন

হয় তার গুণগত ও পরিমাণগত তারতম্যের সহায়তায় আমরা বিন্দুগুলির পারস্পরিক দূরত্ব ও দিক সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করি।

দৃষ্টিগত ও স্পর্শগত সংবেদনের ব্যাপ্তি, স্থানীয় বৈশিষ্ট্য এবং সক্রিয় অঙ্গ সঞ্চালন একত্রে যুক্ত হলেই স্থানের প্রত্যক্ষ সম্ভব হয়।

১২। স্থানের স্পর্শগত প্রত্যক্ষ (Tactual Perception of Space):

স্পর্শের সহায়তায় কিভাবে স্থান প্রত্যক্ষ করা যায় অথবা অন্ধ ব্যক্তি কিভাবে প্রত্যক্ষ করে? (How space can be perceived by touch unaided by vision. Or, How do blind persons perceive space?)—**যে শিশু জন্মান্ধ, দৃষ্টিশক্তির অধিকারী যে নয়, কেবলমাত্র স্পর্শনের সাহায্যে সে কিভাবে স্থান প্রত্যক্ষ করবে?**

জন্মান্ধ শিশু নিষ্ক্রিয় স্পর্শন ও সক্রিয় স্পর্শনের সাহায্যে স্থান প্রত্যক্ষ করবে। স্পর্শন দু-প্রকারের—**নিষ্ক্রিয় স্পর্শন** (Passive Touch) এবং **সক্রিয় স্পর্শন** (Active Touch)। নিষ্ক্রিয় স্পর্শনের দৃষ্টান্ত হল, যখন হাতটিকে ইতস্ততঃ চালিত না করে কোন বস্তুর ওপর রাখা হয়। আর সক্রিয় স্পর্শনের ক্ষেত্রে স্পর্শনের সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গ সঞ্চালন হয়।

অন্ধ শিশুটি যখন টেবিলের ওপর হাতটি রাখবে তখন হাতটিকে রাখার সঙ্গে সঙ্গে সে একটি ব্যাপ্তির সংবেদন লাভ করবে যার দ্বারা টেবিলের বিভিন্ন অংশের স্পষ্ট সংবেদন এক সঙ্গেই পাবে। এই সামগ্রিক অনুভূতি বা এককালীন সংবেদনকেই মনোবিদ্ স্টাউট (Stout) **সংশ্লেষক স্পর্শন** (Synthetic Touch) নামে অভিহিত করেছেন। হাত দিয়ে টেবিলকে স্পর্শ করার ফলে শিশুটির করতলের বিভিন্ন স্পর্শবিন্দুগুলি (Touch Spots) টেবিলের বিভিন্ন বিন্দুর সংস্পর্শে এসে উদ্দীপিত হবে। প্রতিটি স্পর্শবিন্দুর স্থানীয় বৈশিষ্ট্যের (Local character) জন্য শিশুটি বুঝতে পারবে যে, একটি স্পর্শবিন্দু অন্যটির তুলনায় কোথায় অবস্থিত। যেহেতু টেবিলের বিন্দুগুলির সম্বন্ধ করতলের বিন্দু-গুলির সম্বন্ধের অনুরূপ এবং যেহেতু এতগুলি পৃথক পৃথক স্পর্শ সংবেদন একই সঙ্গে, একই সময় পাওয়া যাচ্ছে, অতএব শিশু বুঝতে পারবে যে টেবিলের বিন্দুগুলি, যেগুলিকে স্পর্শ করা হয়েছে, সেগুলি সহ-অবস্থানকারী (Co-existing), অর্থাৎ সমকালীন এবং পাশাপাশি অবস্থিত। কিন্তু বিভিন্ন বিন্দুগুলি পরস্পরের থেকে কত দূরে বা কোন্ দিকে, অর্থাৎ ডাইনে বা বামে অবস্থিত কিনা তা নিষ্ক্রিয় স্পর্শনের দ্বারা বুঝতে পারবে না।

নিষ্ক্রিয় স্পর্শনের সাহায্যে ব্যাপ্তি সংবেদন লাভ

স্পর্শ সংবেদনের সাহায্যে বুঝা যায় বিন্দুগুলি সহ-অবস্থানকারী

সক্রিয় স্পর্শনের ক্ষেত্রে স্পর্শনের সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গ সঞ্চালন হয়। অন্ধ শিশুটি আবার টেবিলের বিভিন্ন অংশের ওপর দিয়ে পর্যায়ক্রমে হাতটিকে সঞ্চালিত করতে শুরু করবে। তার ফলে ধরা যাক, টেবিলের ওপর যে সব কাল্পনিক বিন্দুগুলি আছে—যেমন ক, খ, গ, ঘ, ঙ; সেই বিন্দুগুলি যে কেবলমাত্র সহ-অবস্থানকারী বা সমকালীন তা নয়, সেগুলি যে ধারাবাহিক (successive), সে জ্ঞানও সে লাভ করবে। হাতটি সঞ্চালন করার সময় বিভিন্ন স্পর্শগত সংবেদনের সঙ্গে যে পেশীগত সংবেদন (Muscle sensation) সে পাবে, সেই পেশীগত সংবেদনের পরিমাণগত পার্থক্যের দরুণ সে টেবিলটির দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, দূরত্ব এবং গুণগত পার্থক্যের দরুণ টেবিলটির প্রকৃত অবস্থান সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করবে। হস্ত সঞ্চালন করার সময় যদি পেশীগত ও স্পর্শগত সংবেদন কম বেশী হয়, সেই অনুসারে

সক্রিয় স্পর্শনের সাহায্যে ধারাবাহিকতার জ্ঞান

টেবিলটির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ নিরূপণ করা হয়। পেশী সংবেদনের পরিমাণগত পার্থক্যের দরুণ অন্ধ শিশু বুঝতে পারবে যে প্রথম বিন্দু থেকে শেষ বিন্দুটির দূরত্ব দ্বিতীয় বিন্দুর দূরত্ব থেকে বেশী। যেহেতু প্রত্যেকটি সক্রিয় স্পর্শ-সংবেদন ভিন্ন, সেহেতু বিভিন্ন প্রকার সংবেদনের মাধ্যমে টেবিলের অবস্থিতি, দিক ইত্যাদি প্রত্যক্ষ করা হবে। এই সক্রিয় স্পর্শনকে স্টাউট (Stout) বলেছেন—**বিশ্লেষণিক স্পর্শন** (Analytic Touch)।

নিষ্ক্রিয় এবং সক্রিয় স্পর্শন পরস্পর যুক্ত হয়ে বিস্তারের জ্ঞান দেবে

সুতরাং, নিষ্ক্রিয় এবং সক্রিয় স্পর্শন পরস্পর সংযুক্ত হয়ে তাকে বিস্তারের জ্ঞান দেবে এবং চোখে না দেখেও অন্ধ শিশুটি কেবলমাত্র স্পর্শনের সহায়তায় স্থান বা বিস্তারের জ্ঞান লাভ করবে। নিষ্ক্রিয় স্পর্শনের মাধ্যমে সে জানবে বস্তুর বিভিন্ন অংশ বা বিন্দুগুলি সহ-অবস্থানকারী; অর্থাৎ একই স্থানে পাশাপাশি অবস্থিত। সক্রিয় স্পর্শনের মাধ্যমে সে জানবে যে, এই অংশ বা বিন্দুগুলি শুধু যে পাশাপাশি অবস্থিত তা নয় তাদের মধ্যে ধারাবাহিকতা আছে, একটি বিন্দু আর একটি বিন্দুর আগে বা পরে অবস্থিত বা একটি বিন্দু আর একটি বিন্দু থেকে দূরে অবস্থিত।

১০। স্থানের চাক্ষুষ বা দৃষ্টিগত প্রত্যক্ষ (Visual Perception of Space) :

স্পর্শনের মতই দৃষ্টির ক্ষেত্রেও নিষ্ক্রিয় দৃষ্টি, সক্রিয় দৃষ্টি, ব্যাপ্তি, স্থানীয় বৈশিষ্ট্য এবং অঙ্গ সঞ্চালনের সাহায্যে আমরা স্থানকে চক্ষুর সাহায্যে প্রত্যক্ষ করি।

নিষ্ক্রিয় দৃষ্টি, সক্রিয় দৃষ্টি, ব্যাপ্তি, স্থানীয় বৈশিষ্ট্য এবং অঙ্গ সঞ্চালনের সাহায্যে স্থানের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ

নিষ্ক্রিয় বস্তু হল যখন চোখটাকে এদিক ওদিক না ঘুরিয়ে কোন একটি বস্তুর ওপর আমাদের দৃষ্টিকে নিবদ্ধ করি। আমরা রাত্রিবেলা আকাশের তারার দিকে এভাবে আমাদের দৃষ্টিকে নিবদ্ধ করে অনেকগুলি তারা দেখতে পাই। দৃষ্টিগত সংবেদনের যে ব্যাপ্তি (Extensity), তা আমাদের এই জ্ঞান দেয় যে, তারাগুলি একই স্থানে সহ-অবস্থান করছে। তারাগুলির দিকে যখনই তাকাই তখনই বিভিন্ন তারা অক্ষিপটের বিভিন্ন অংশকে উদ্দীপিত করে। দৃষ্টিগত সংবেদনের স্থানীয় বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি যে, তারাগুলি পরস্পরের থেকে পৃথক। তারপর সক্রিয় দৃষ্টির সহায়তায় অর্থাৎ অক্ষিগোলক এদিক ওদিক ঘুরিয়ে আমরা তারাগুলির পারস্পরিক দূরত্ব, অবস্থান এবং দিক নির্ণয় করতে পারি।

সুতরাং, সক্রিয় দৃষ্টি এবং নিষ্ক্রিয় দৃষ্টি পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে আমাদের স্থানের দৃষ্টিগত প্রত্যক্ষকে সম্ভব করে তোলে।

১৪। দূরত্বের চাক্ষুষ বা দৃষ্টিগত প্রত্যক্ষ (Visual perception of Distance) :

সক্রিয় স্পর্শন ও পেশী-সংবেদনের সাহায্যে আমরা দূরত্ব সোজাসুজি প্রত্যক্ষ করতে পারি। কেবল দৃষ্টির সাহায্যে আমরা দূরত্ব সোজাসুজি প্রত্যক্ষ করতে পারি না।

স্পর্শ ও পেশী সংবেদনের সাহায্যে বস্তুর দূরত্ব প্রত্যক্ষ করা যায়

অক্ষিকোটর থেকে অক্ষিগোলক ছুটে বেরিয়ে বস্তুর কাছে পৌঁছতে পারে না, বা দূরত্বকে মেপে নিতে পারে না। বস্তুটি কত দূরে আছে জানতে হলে বস্তুর কাছে পায়ে হেঁটে পৌঁছতে হবে। ফলে যে পেশী-সংবেদন অনুভূত হবে সেই পেশী-সংবেদনের পরিমাণের দ্বারা আমরা বুঝতে পারি বস্তুটি আমাদের কতখানি দূরে আছে। আর বস্তুকে স্পর্শ করার জন্য বস্তুর যথার্থ অস্তিত্ব অর্থাৎ, বস্তু যেখানে আছে সেখানে পৌঁছেছি এই জ্ঞান আমাদের হবে।

সক্রিয় স্পর্শন, অঙ্গ সঞ্চালন এবং স্পর্শগত ও পেশীগত অভিজ্ঞতা একত্রে আমাদের দূরত্বের জ্ঞান দেয়। যখন আমরা আমাদের কাছ থেকে দূরে বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত বস্তুগুলিকে প্রত্যক্ষ করি এবং ধীরে ধীরে তাদের দিকে অগ্রসর হতে থাকি, তখন কতকগুলি দূরত্ব নির্দেশক চাক্ষুষ লক্ষণ বা সংকেত (visual signs of distance) স্পর্শন ও পেশীগত অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে। এই চাক্ষুষ লক্ষণগুলি যখন আমরা প্রত্যক্ষ করি, তখন এগুলির সহায়তায় দূরত্বটুকু কতখানি তা বুঝে নিতে পারি। এই চাক্ষুষ লক্ষণগুলির কয়েকটি দৃষ্টান্ত নীচে দেওয়া হচ্ছে :

(১) বস্তুর প্রকৃত আকার জানা থাকলে, বস্তুর আকারের আপাত পরিবর্তন (variation in apparent magnitude) থেকে আমরা দূরত্বটুকু বুঝে নিতে পারি।

বস্তুর আকারের আপাত পরিবর্তন

পাখী যতই উড়তে উড়তে ওপরে উঠতে থাকে, ততই তাকে ছোট দেখায়। কোন বস্তু যতই কাছে আসতে থাকে, ততই তাকে বড় দেখায়। কাজেই যখন কোন বস্তুকে তার স্বাভাবিক আকার থেকে ছোট দেখি তখন সেটা দূরে আছে বুঝতে পারি।

(২) যখন একটি বস্তু আর একটি বস্তুকে আড়াল করে, তখন যে বস্তুটি আড়াল করে তাকে কাছে এবং অপর বস্তুকে আমাদের দূরে মনে হয়।

উপস্থাপন (superposition)

(৩) দূরত্ব যত অধিক হয়, সমান্তরাল রেখাগুলিকে তত বেশী পরস্পরের অভিসৃত

(converged) বলে মনে হয়। দুটো রেললাইন মনে হয় যেন দূরে মিশে গেছে; যদিও আসলে তারা সমান্তরাল এবং পরস্পরের সঙ্গে মিশে যাওয়া সম্ভব নয়। সমান্তরাল রেখার আপাত অভিসৃতি (apparent convergence of parallel lines) প্রত্যক্ষ করে আমরা দূরত্ব বুঝে নিতে পারি।

সমান্তরাল রেখার আপাত মিলন

(৪) আলো-ছায়ার খেলাও (play of light and shade) আমাদের দূরত্বের জ্ঞান দেয়। ছবির যেখানে আলো পড়ে, সেটা কাছে মনে হয়, যেখানে আলো পড়ে না, অর্থাৎ ছায়া থাকে সেটাকে দূরে মনে হয়। এই আলো-ছায়ার পার্থক্যের দ্বারা চিত্রশিল্পী কাছের এবং দূরের পার্থক্যের বোধ দর্শকের মনে সৃষ্টি করেন।

আলো ছায়ার খেলা

(৫) সুস্পষ্টতার ও অস্পষ্টতার মাধ্যমেও দূরত্ব উপলব্ধি করা যায়। দৃশ্যমান অংশটি যদি সুস্পষ্ট হয় তবে মনে হয় বস্তুটি কাছে, এবং যদি অস্পষ্ট হয় তবে বস্তুটি দূরে মনে হয়।

সুস্পষ্টতা ও অস্পষ্টতা

(৬) ট্রেনে যখন চড়ি, তখন দেখি দূরের বস্তুগুলি, যেমন—পাহাড় বা গাছ আমাদের সঙ্গে ছুটে চলেছে। কিন্তু কাছের বস্তুগুলি বিপরীত দিকে সরে যাচ্ছে। একে বলা হয় parallax বা দর্শকের গতির জন্য স্থিতিশীল বস্তুর আপাত গতি, অর্থাৎ নিজেদের গতির সঙ্গে দৃশ্যমান বস্তুগুলিকেও যেন গতিসম্পন্ন বলে মনে হয়। তখন আমরা বস্তুগুলির দূরত্ব সম্পর্কে ধারণা করতে পারি।

দর্শকের গতির জন্য স্থিতিশীল বস্তুর আপাতগতি

(৭) অক্ষিপটে যাতে বস্তুর সুস্পষ্ট ছবি প্রতিফলিত হয় সেজন্য দুটি চোখেরই লেন্সের ফোকাসের (focus) সঙ্গে বস্তুর যথাযথ উপযোজনের (accomodation) প্রয়োজন হয়। এই উপযোজন প্রক্রিয়ার নিকটবর্তী বস্তু প্রত্যক্ষ করার জন্য চোখের লেন্স (lens)-কে অধিক উত্তল (convex) হতে হয় এবং দূরবর্তী বস্তু প্রত্যক্ষ করার জন্য চোখের লেন্সকে কম উত্তল হতে হয়। চোখের লেন্সের উপযোজন (accomodation of the lens) আমাদের বস্তুর দূরত্বের জ্ঞান দিয়ে থাকে।

চোখের লেন্স-এর উপযোজন

(৮) কাছের এবং দূরের জিনিস দেখার জন্য আমাদের চোখের সিলিয়ারী (Ciliary) পেশীগুলিকে সঙ্কুচিত এবং প্রসারিত করতে হয় এবং ফলে যে পেশীগত সংবেদন হয় সেগুলিও আমাদের দূরত্বের জ্ঞান দেয়।

সিলিয়ারী পেশীর সঙ্কোচন

আমাদের উভয় চোখের সাহায্যেই আমরা বস্তু প্রত্যক্ষ করি। দূরবর্তী বস্তু প্রত্যক্ষ করার সময় চোখের দৃষ্টিরেখা সমান্তরাল থাকে, তার ফলে অক্ষিগোলক সংলগ্ন পেশীগুলিতে তেমন টান পড়ে না। কিন্তু যখন নিকটবর্তী কোন বস্তু প্রত্যক্ষ করতে হয় তখন দৃষ্টিরেখাদ্বয় সমান্তরাল থাকে না; তারা অভিসৃত (converged), অর্থাৎ একই বিন্দুতে মিলিত হয়। এইজন্য চোখের পেশীগুলিকে সঙ্কুচিত করার প্রয়োজন হয়। পেশীগুলিতে টান পড়ে কি পড়ে না, তার দ্বারাই বস্তুটি দূরে না নিকটে বোঝা যায়।

দৃষ্টিরেখার সমকেন্দ্রিকতা

(৯) আমরা উভয় চোখের সাহায্যেই বস্তু প্রত্যক্ষ করি। কিন্তু আমাদের দুই চোখে বস্তুর যে প্রতিকৃতি পড়ে, তার মধ্যে সামান্য পার্থক্য আছে। অভ্যাসের জন্যই আমরা দুটি প্রতিকৃতিকে এক করে দেখি। দূরবর্তী বস্তু প্রত্যক্ষ করার সময় এই প্রতিকৃতির মধ্যে পার্থক্য কমে যায় এবং নিকটবর্তী বস্তু প্রত্যক্ষ করার সময় দুটি প্রতিকৃতির পার্থক্য বেশী হয়। পার্থক্য সত্ত্বেও দুটি প্রতিকৃতিকে এক করে দেখার জন্যে আমাদের মানসিক পরিশ্রম হয়। এই মানসিক পরিশ্রম দূরত্ববোধের জ্ঞাপক।

অক্ষিপটে প্রতিফলিত বস্তুর প্রতিকৃতির অসমতা (Retinal disparity)

১৫। দূরত্বের প্রত্যক্ষ সম্পর্কে বার্কলের মতবাদ (Berkeleyan Theory of Perception of Distance):

বার্কলের মতে চক্ষুর সাহায্যে আমরা দূরত্ব সোজাসুজি প্রত্যক্ষ করতে পারি না। দৃষ্টি আমাদের বস্তুর মধ্যে কতকগুলি চাক্ষুষ লক্ষণ বা সঙ্কেতের (Visual signs) ইঙ্গিত দেয় যেগুলিকে ব্যাখ্যা করে আমরা দূরত্ব প্রত্যক্ষ করতে পারি। এই চাক্ষুষ লক্ষণগুলি সক্রিয় স্পর্শ-সংবেদনের মধ্যস্থতায় অর্জিত হয়। সুতরাং, দূরত্ব সম্পর্কে আমাদের যে প্রত্যক্ষ হয় তাহল অর্জিত প্রত্যক্ষ (Acquired perception)। প্রত্যক্ষ সম্পর্কে বার্কলের মতবাদ 'অর্জিত চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ মতবাদ' (The Theory of Acquired Visual Perception) নামে পরিচিত।

বার্কলের মতে চাক্ষুষ লক্ষণের সাহায্যেই দূরত্ব প্রত্যক্ষ করা যায়

বার্কলের মতের স্বপক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি উপস্থাপিত করা যেতে পারে:

(১) চোখে ছানি থাকার জন্য কতকগুলি শিশু অন্ধ হয়েই জন্মগ্রহণ করে। অস্ত্রোপচারের সাহায্যে চোখের ছানি অপসারিত করা হলে তারা যখন দৃষ্টিশক্তি ফিরে পায় তখন তারা প্রথম প্রথম চোখের সাহায্যে দূরত্ব নির্ধারণ করতে পারে না, তাদের মনে হয় সব বস্তুই বুঝি তাদের কাছে আছে। একেবারে চোখের ওপর এসে পড়েছে এই মনে করে অনেক সময় দূরবর্তী বস্তু দেখেও তারা পিছু সরে আসে।

অন্ধ শিশুর ছানি অপারেশন

(২) দৃষ্টিশক্তির সঙ্গে সক্রিয় স্পর্শ যুক্ত না হওয়ার জন্য নবজাত শিশু তার জন্মের পরে প্রথম কয়েকটি মাস কোন্ বস্তুটি কাছে আর কোন্‌টি দূরে তা বুঝে উঠতে পারে না। তাই সে হাত বাড়িয়ে আকাশের চাঁদ হাতে পেতে চায়।

নবজাত শিশুর দূরের বস্তু পাওয়ার ইচ্ছা

(৩) চিত্রশিল্পী অনেক সময় সমান্তরাল রেখাকে অভিসৃত করে এবং তারপর তার বিভিন্ন অংশে আলো ও ছায়ার তারতম্য করে বিষয়বস্তুর মধ্যে ঘনত্বের বোধ এনে দেয় বা অনেক সময় দুটি সমান্তরাল রেখাকে অভিসৃত, অর্থাৎ সমকেন্দ্রাভিমুখী করে এক বিন্দুতে মিলিয়ে দিয়ে দূরত্বের বোধ সৃষ্টি করে। চিত্রে অঙ্কিত বস্তুর দূরত্ব এবং ঘনত্ব বোধ আমরা কিভাবে প্রত্যক্ষ করি? আসলে চিত্রের সব অংশই একটি কাগজের ওপর অঙ্কিত করা হয়েছে, কাজেই চিত্রে অঙ্কিত বস্তুর আসলে কোন ঘনত্ব নেই। আমরা সোজাসুজি ঘনত্ব এবং দূরত্ব এক্ষেত্রে কিছুতেই প্রত্যক্ষ করতে পারছি না, কেবলমাত্র কতকগুলি চাক্ষুষ লক্ষণ বা সঙ্কেত (Visual signs) থেকে দূরত্ব এবং ঘনত্ব অনুমান করে নিই।

সমান্তরাল রেখা অভিসৃত করে বিষয় বস্তুর মধ্যে ঘনত্বের বোধ নিয়ে আসা

(৪) আমাদের চোখের গঠন এমন যে চোখ সোজাসুজি স্থান বা দূরত্ব প্রত্যক্ষ করতে পারে না। অক্ষিকোটর থেকে অক্ষিগোলক ছুটে বেরিয়ে বস্তুর কাছে পৌঁছতে পারে না বা দূরত্বটুকু মেপে নিতে পারে না। আমাদের অক্ষিপট (Retina) হল একটি পর্দার মতো এবং বাইরে থেকে ছবিটি এই পর্দার ওপর প্রতিফলিত হয়। এই ছবি দ্বি-পরিসর বিশিষ্ট (Two dimensional)। এর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ আছে; কিন্তু সম্মুখ-পশ্চাতের পরিসর (Front-dimension) নেই।

চোখের গঠন

বার্কলের অর্জিত চাক্ষুষ মতবাদের সমালোচনা:

স্টাউট (Stout), অ্যাঞ্জেল (Angell), জেম্‌স (James) প্রমুখ মনোবিদ্‌রা বার্কলের পূর্বোক্ত মতবাদের বিরোধিতা করেন এবং তাঁদের মতে দূরত্ব সম্পর্কে আমাদের যে প্রত্যক্ষ, তা অর্জিত প্রত্যক্ষ নয়। চোখের সোজাসুজি দূরত্ব প্রত্যক্ষ করার মৌলিক ক্ষমতা আছে। উক্ত মনোবিদ্‌রা নিজেদের মতের স্বপক্ষে নিম্নোক্ত যুক্তিগুলি উপস্থাপিত করেছেন:

স্টাউট, অ্যাঞ্জেল ও জেম্‌স-এর সমালোচনা

(১) অনেক দূরে অবস্থিত যেসব বস্তু, যেমন— আকাশের তারা, মেঘ, পর্বত, সেই সব বস্তুর পারস্পরিক দূরত্ব নির্ধারণ করা চোখের সাহায্যেই সম্ভব, কেননা আমরা যাতে সক্রিয় স্পর্শের সাহায্যে দূরত্ব অবধারণ করতে পারি, তার জন্য এই বস্তুগুলি কখনও আমাদের কাছে এসে উপস্থিত হবে না।

বহুদূরে অবস্থিত বস্তুর পারস্পরিক দূরত্ববোধে চোখের অবদান

(২) দূরত্বের সূক্ষ্ম তারতম্য স্পর্শ অপেক্ষা চোখের মাধ্যমেই প্রত্যক্ষ করা যায়।

দূরত্বের সূক্ষ্ম তারতম্য

পরস্পরের খুব কাছাকাছি দুটি বিন্দুর মধ্যে যে দূরত্বের ব্যবধান তা চোখের সাহায্যেই অবধারণ করা যায়, স্পর্শের সাহায্যে নয়।

(৩) কতকগুলি চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা,বিশেষ করে এক চক্ষুর উপযোগী (Monocular)

বিশেষ বিশেষ চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা

এবং দুই চক্ষুর উপযোগী (Binocular)। প্রত্যক্ষে যে পেশী-অভিজ্ঞতা ঘটে তা চাক্ষুষ সঙ্কেতলব্ধ নয়, দূরত্বের সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ।

(৪) জেম্স (James)-এর অভিমতানুযায়ী স্থান বা বিস্তার যেহেতু তিন পরিসর-

চোখের পক্ষে কেবল দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ প্রত্যক্ষ করা সম্ভব নয়

বিশিষ্ট (Three dimensional), সেহেতু চোখের পক্ষে কেবলমাত্র দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ প্রত্যক্ষ করা সম্ভব নয়। কেননা, হয় চোখ তিন-পরিসরবিশিষ্ট স্থান, অর্থাৎ দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও ঘনত্ব তিনটিই প্রত্যক্ষ করে - নয়ত কিছুই প্রত্যক্ষ করে না।

সিদ্ধান্ত (Conclusion):

পূর্বোক্ত অভিযোগগুলি আনা হলেও বার্কলের মতবাদের মধ্যে যথেষ্ট সত্যতা আছে। স্পর্শের সাহায্য ছাড়াও শুধুমাত্র চোখের সাহায্যে দূরত্ব এবং ঘনত্ব প্রত্যক্ষ করা যেতে

বার্কলের মতবাদের সত্যতা

পারে। কিন্তু সেই দূরত্ব প্রত্যক্ষ, স্পর্শন ও দর্শনের সংযুক্ত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যে দূরত্বের জ্ঞান লাভ করা যায়, তার থেকে অনেক পৃথক। স্পর্শনের সাহায্যে যে দূরত্বের জ্ঞান লাভ করা যায় চাক্ষুষ দূরত্ব প্রত্যক্ষের তুলনায় সেই জ্ঞান অনেক বেশী নির্ভরযোগ্য। কারণ, (i) শুধুমাত্র চোখের সাহায্যে আমরা যে দূরত্ব প্রত্যক্ষ করি, ব্যক্তিসাপেক্ষ এবং ব্যক্তি-নিরপেক্ষ কারণবশতঃ তার মধ্যে তারতম্য দেখা দিতে পারে। (ii) জন্মান্ধ ব্যক্তি স্পর্শনের সাহায্যেই দূরত্বের ধারণা করে। আবার অন্ধকারেও স্পর্শনের সাহায্যে আমরা দূরত্বের ধারণা করি।

সুতরাং, সক্রিয় স্পর্শনের সাহায্যে দূরত্ব-প্রত্যক্ষ হল মুখ্য, চক্ষুর সাহায্যে দূরত্ব-প্রত্যক্ষ

স্পর্শনের সাহায্যে দূরত্ব-প্রত্যক্ষ হল মুখ্য, চক্ষুর সাহায্যে দূরত্ব প্রত্যক্ষ হল গৌণ

হল গৌণ। ব্যবহারিক দিক থেকে বিচার করতে গেলে চোখের সাহায্যে দূরত্ব-প্রত্যক্ষ হল অর্জিত প্রত্যক্ষ এবং স্পর্শনের সাহায্যে দূরত্ব-প্রত্যক্ষ হল মৌলিক প্রত্যক্ষ।

১৬। ঘনত্বের বা ঘনবস্তুর প্রত্যক্ষ (Perception of Solidity or Third Dimension of Space) :

ঘনত্ব হল বস্তুর দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ থেকে পৃথক একটি তৃতীয় গুণ। ঘনত্ব হল বস্তুর গভীরতা (Depth)। ঘনত্বকে বস্তুর তৃতীয় মাত্রা এবং ঘন বস্তুকে ত্রি-মানবিশিষ্ট (Three dimensional) বলা হয়। অর্থাৎ এর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং গভীরতা আছে। আমরা স্পর্শের দ্বারা এবং চোখের সাহায্যে—উভয় প্রকারের ঘনত্ব প্রত্যক্ষ করতে পারি।

(ক) **ঘনত্বের স্পর্শগত প্রত্যক্ষ** (Tactual Perception of Solidity) : ঘনত্ব, বস্তুর সামনের দিক থেকে পিছন দিকের ব্যবধান বা দূরত্ব, ডান থেকে বাম বা ওপর থেকে নীচের দূরত্ব নয়। সক্রিয় স্পর্শন বা অঙ্গ সঞ্চালনের মাধ্যমে আমরা বস্তুর ঘনত্ব প্রত্যক্ষ করি। হাতটিকে সামনের দিক থেকে পেছন দিকে সঞ্চালিত করে যে পেশীগত সংবেদন লাভ করি তার দ্বারা বস্তুর গভীরতা বা ঘনত্ব সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করি। কিন্তু যদি বস্তুটি বড় না হয়ে ছোট হয়, যেমন—একটা কাঠের বল, তাহলে নিষ্ক্রিয় স্পর্শনের মাধ্যমে অর্থাৎ কেবল মুঠোর ভেতর নিয়েই আমরা বস্তুটির ঘনত্ব প্রত্যক্ষ করি। বলটিকে মুঠোর ভেতর নেওয়াতে আমার আঙুলগুলি বেঁকে তাকে ধরে থাকে। এই বাঁকানো আঙুলের পেশীগত সংবেদন বলটির বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান দেয়। আমরা বুঝতে পারি যে, বিভিন্ন দিক থেকে এটি গতিকে প্রতিরোধ করছে, বলটি যে ঘনবস্তু তাও বুঝতে পারি।

সক্রিয় স্পর্শনের সাহায্যে ঘনত্ব প্রত্যক্ষ করা

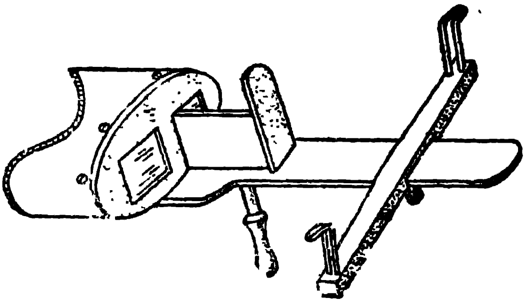
(খ) **ঘনত্বের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ** (Visual Perception of Solidity) : বস্তুর ঘনত্ব আমরা সোজাসুজি চোখের সাহায্যে প্রত্যক্ষ করতে পারি না। সক্রিয় স্পর্শনগত অভিজ্ঞতার সাহায্যেই আমরা ঘনত্বকে সোজাসুজি প্রত্যক্ষ করতে পারি। সুতরাং, চোখের সাহায্যে বস্তুর ঘনত্বের যে প্রত্যক্ষ, তাহল 'অর্জিত প্রত্যক্ষ' (Acquired perception), মৌলিক প্রত্যক্ষ নয়। কতকগুলি চাক্ষুষ লক্ষণ বা সঙ্কেতের সাহায্যে আমরা এই ঘনত্ব অনুমান করে থাকি। এই চাক্ষুষ লক্ষণগুলি স্পর্শগত অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে। অবশ্য পরে স্পর্শগত অভিজ্ঞতা ছাড়াও কেবলমাত্র ঐ চাক্ষুষ লক্ষণগুলিকে ব্যাখ্যা করে আমরা ঘনত্ব প্রত্যক্ষ করতে পারি।

চাক্ষুষ লক্ষণের সাহায্যে ঘনত্ব অনুমান করে নেওয়া যায়

নিম্নলিখিত চাক্ষুষ লক্ষণগুলি ঘনত্ব প্রত্যক্ষ করতে সহায়তা করে। যথা—

(i) কাছাকাছি যেসব বস্তুর অবস্থান সেগুলির ঘনত্ব আমরা যখন প্রত্যক্ষ করতে চাই, তখন আমাদের দুটি চোখের অক্ষিপটের ওপর যে ভিন্ন ভিন্ন ছবি পড়ে,তার বৈসাদৃশ্য সম্পর্কে অনুভূতিই আমাদের ঘনত্বের জ্ঞান দেয়। দুই চোখের অক্ষিপটের ওপর যে ছবি পড়ে, তার মধ্যে তারতম্য হবার কারণ এই যে, প্রত্যেকটি চোখে যেন বস্তুটির একটি অংশ ধরা পড়ে, যা অপর চোখটি দেখতে পায় না।

দুটি চোখের অক্ষিপটের ওপর ভিন্ন ভিন্ন ছবির বৈসাদৃশ্যের অনুভূতি



ঘনদৃক যন্ত্র (Stereoscope)

(ii) দুটি আলাদা ছবিকে মিলিয়ে একটি ছবি তৈরি করার যে মানসিক প্রচেষ্টা তাও বস্তুটির ঘনত্বের ধারণা দেয়। Wheatstone-এর ঘনদৃক যন্ত্র (Stereoscope)-এর সাহায্যে এই বিষয়টি সহজেই প্রমাণিত হয়। এই যন্ত্রের মধ্যে দুটি বিভিন্ন অবস্থান থেকে তোলা একটি ঘনবস্তুর দুটি সামান্য পৃথক ছবিকে রেখে যদি একসঙ্গে প্রত্যক্ষ করা যায় তাহলে বস্তুটির ঘনত্ব প্রত্যক্ষ করা যাবে।

ঘনদৃক যন্ত্রের সাহায্যে একই বস্তুর দুটি পৃথক ছবি তুলে বস্তুটির ঘনত্ব প্রত্যক্ষ করা যায়

(iii) ঘনত্বের প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে চোখের পেশীগত সংবেদন বিশুদ্ধ দৃষ্টিগত সংবেদনের সঙ্গে মিশে গিয়ে ঘনত্বের জ্ঞান দেয়।

(iv) দূরের বস্তুর ক্ষেত্রে ঘনত্ব কতকগুলি চাক্ষুষ লক্ষণকে ব্যাখ্যা করে প্রত্যক্ষ করা যায়। আলো-ছায়ার খেলা ঘনত্বের জ্ঞান আনতে পারে বা সমান্তরাল রেখাকে পরস্পরের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েও এই ঘনত্বের বোধ আনা যায়। চিত্রকর অনেক সময় সমান্তরাল রেখাকে সন্নিকৃষ্ট বা সমকেন্দ্রী করে এবং তারপর বিভিন্ন অংশে আলো ও ছায়ার তারতম্য করে বিষয়বস্তুর মধ্যে ঘনত্বের বোধ এনে দেয়, যদিও আসলে তা ঘন নয়।

দূরের বস্তুর ক্ষেত্রে ঘনত্ব চাক্ষুষ লক্ষণের সাহায্যে জানা যায়

১৭। ওজনের প্রত্যক্ষ (Perception of weight) :

পেশীগত সংবেদন এবং চাপ সংবেদন একত্রে যুক্ত হয়ে আমাদের ওজন প্রত্যক্ষ করতে সহায়তা করে। ওজন প্রত্যক্ষ দু-প্রকার—সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয়। সক্রিয় ওজন প্রত্যক্ষ হয় ওজন বা ভর উত্তোলনের অনুভূতিতে। কোন একটি বস্তু যখন আমরা উত্তোলন করি, তখন হাতের ওপর বস্তুটি থাকার জন্য একটা চাপ অনুভব করি এবং অপরদিকে সেটিকে উত্তোলন করার জন্য পেশীগত সংবেদন অনুভব করি। উভয় সংবেদন যুক্ত হওয়াতে ওজন প্রত্যক্ষ করতে পারি।

পেশীগত সংবেদন ও চাপ সংবেদনের সাহায্যে ওজন প্রত্যক্ষ

নিশ্চল হাতের ওপর ভারি বস্তু রাখলে যে ওজন প্রত্যক্ষ হয় তাকে নিষ্ক্রিয় ওজন প্রত্যক্ষ বলে। একটি বস্তু আমার হাতের ওপর রাখা হয়েছে এবং আমার হাতটি রয়েছে মাটির ওপর—সেক্ষেত্রে পেশীগত সংবেদন অনুভূত হবে না, কেবলমাত্র চাপ সংবেদন অনুভূত হবে। এই চাপ সংবেদনের সাহায্যেই বস্তুর ওজন প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হবে।

১৮। আয়তন এবং আকারের প্রত্যক্ষ (Perception of Magnitude and Figure) :

(ক) **আয়তন এবং আকারের স্পর্শগত প্রত্যক্ষ** (Tactual Perception of Magnitude and Figure) : একটি বস্তুর আয়তন, অর্থাৎ বস্তুটি ছোট কি বড তা আমরা স্পর্শনের সাহায্যে কিভাবে প্রত্যক্ষ করি ? বস্তুটির চতুর্দিকে হাতটিকে সঞ্চালিত করবার সময় পেশীগত শক্তি কতখানি প্রয়োগ করা হচ্ছে তার দ্বারাই আমরা বস্তুটি কতখানি বড বা ছোট বুঝতে পারি। পেশীগত শক্তির পরিমাণ (quantity) বা পেশীগুলিকে কতখানি পরিশ্রম করতে হয় তার দ্বারাই আমরা বস্তুর আয়তন সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করে থাকি। যদি কোন বস্তুর আয়তন বড় হয় তাহলে পেশীগত পরিশ্রম বেশী হবে, বস্তুর আয়তন ছোট হলে পেশীগত শক্তিব প্রয়োগ বা পরিশ্রম কম হবে। পেশীগত সংবেদনের গুণগত পার্থক্য বস্তুর আকার (Figure) সম্পর্কে জ্ঞান দেয়। বস্তুর আকার বলতে বোঝায়—গোল, লম্বা, ত্রিকোণ বা চতুষ্কোণ। কোন একটি গোলাকার বস্তুর ওপর যখন আমরা চোখ বুজে হাত সঞ্চালন করতে থাকি তখন যে স্থান থেকে হাত সঞ্চালন শুরু হয়েছিল অনবরত গতির দিক পরিবর্তন করে হাত পুনরায় হয়ত সেইখানেই ফিরে আসবে। তাছাড়া, পেশীগত সংবেদনের ধারাবাহিক এবং একই প্রকৃতিবিশিষ্ট গুণগত পরিবর্তন (gradual and uniform change of quality) আমাদের মনে

পেশীগত শক্তির পরিমাণ বস্তুর আয়তনের ধারণা দেয়

এই ধারণা আনবে যে, বস্তুটি গোলাকার। আবার চোখ বুজে যখন কোন চতুষ্কোণ টেবিলের ওপরে হাত সঞ্চালন করছি তখন পেশীগত সংবেদনের আকস্মিক পরিবর্তনের ফলে আমরা বুঝতে পারি যে টেবিলটা চৌকো। টেবিলের ওপর হাতটিকে সঞ্চালিত করতে করতে টেবিলের এক কোণে এসে গতির মোড় ঘুরে অন্যপথে চলতে লাগলো এবং আবার কিছু পরে অনুরূপভাবে অন্য পথে চলতে লাগলো। এইভাবে হাত সঞ্চালন করতে করতে পেশীগত সংবেদনের পরিমাণ ও গুণের দ্বারা আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি যে, টেবিলটা চতুষ্কোণ।

(খ) **আয়তন ও আকারের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ** (Visual Perception of Magnitude and Figure): স্পর্শনের সাহায্যেই আমরা বস্তুর প্রকৃত আয়তনকে (Real magnitude) জানতে পারি। চোখের বা দৃষ্টির সহায়তায় আমরা বস্তুর প্রকৃত আয়তন সোজাসুজি জানতে পারি না। যে আয়তনটি আমাদের কাছে প্রতীয়মান হয় সেটি প্রকৃত আয়তন নয়, আপাত আয়তন (apparent magnitude)। কোন একটি বস্তুর আয়তন চোখ দিয়ে প্রত্যক্ষ করার সময় আমরা চোখটিকে বস্তুর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে ঘোরাতে থাকি এবং প্রান্ত দুটিকে চোখের কেন্দ্রস্থলে, অর্থাৎ পীত বিন্দুতে (fovea) আনতে চেষ্টা করি। তার ফলে চোখের পেশীগত সংবেদন আমাদের বস্তুর আয়তনের সম্পর্কে জ্ঞান দেয়।

চোখের পেশীগত সংবেদন বস্তুর আয়তন প্রত্যক্ষ করতে সাহায্য করে

কিন্তু চোখের মাধ্যমে আমরা যখন বস্তুর আয়তনকে প্রত্যক্ষ করতে যাই, তখন তা সঠিক হয় না। তার কারণ দূরের বস্তুকে আমরা ছোট দেখি। বস্তুটির বিভিন্ন অংশকে দেখার জন্য সেগুলিকে দৃষ্টির কেন্দ্রস্থলে (পীত বিন্দুতে) আনার প্রয়োজন। কিন্তু বস্তুটি দূরে থাকার জন্য আমাদের চোখকে ঘোরাতে হয় এবং পেশীর সংবেদনও কম হয়। যদি কল্পনা করি বস্তুটির দুটি প্রান্ত থেকে দুটি সরলরেখা পীত বিন্দুতে এসে মিশেছে তাহলে এই দুই সরলরেখা পীত বিন্দুর সঙ্গে মিলিত হয়ে একটি কোণের সৃষ্টি করবে। এই কোণটি যত বড় হবে বস্তুর আয়তন তত বড় হবে এবং এই কোণটি যত ছোট হবে বস্তুর আয়তন তত ছোট হবে। অবশ্য যদিও দৃষ্টির সাহায্যে বস্তুর প্রকৃত আয়তনকে প্রত্যক্ষভাবে জানা যায় না, তবুও তাকে পরোক্ষভাবে জানা যায়। কারণ, যদি দূরত্বটুকু জানা থাকে তাহলে দূরের বস্তু ছোট দেখালেও তার প্রকৃত আয়তন আমরা বলে দিতে পারি। দূরে যে বাড়ীটি আছে তাকে ছোট দেখালেও বাড়ীটির দূরত্ব জানা থাকলে আমরা তার প্রকৃত আয়তনটি অনুমান করে নিতে পারি।

কিন্তু আকাশের তারা দূরে থাকার জন্য খুব ছোট দেখায়। কিন্তু দূরত্ব জানা না থাকলে তারাগুলির আয়তন সম্পর্কে কোন অনুমান করা সম্ভব হয় না।

(গ) গতির প্রত্যক্ষ (Perception of Movement): স্পর্শন এবং দৃষ্টি উভয়ের মাধ্যমেই গতি প্রত্যক্ষ করা যেতে পারে।

স্পর্শনের সাহায্যে গতি-প্রত্যক্ষ: (১) নিষ্ক্রিয় স্পর্শনের (Passive Touch) মাধ্যমে গতি-প্রত্যক্ষ করা যেতে পারে। কোন একটি অন্ধ লোক যদি গতিশীল বস্তুর ওপর হাত রেখে অচল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে তাহলে স্থানীয় বৈশিষ্ট্যের (Local characteristics) জন্য তার স্পর্শগত সংবেদনগুলি পরিবর্তিত হতে থাকবে। যখন সে বুঝতে পারবে যে, এই পরিবর্তন তার দ্বারা ঘটছে না, তখন সে গতি-প্রত্যক্ষ করবে।

নিষ্ক্রিয় স্পর্শনের মাধ্যমে গতি প্রত্যক্ষ

(২) সক্রিয় স্পর্শনের (Active Touch) সাহায্যেও গতি প্রত্যক্ষ করা যায়। ধরা যাক, অন্ধ ব্যক্তিটি একটি গতিশীল বস্তুর ওপর হাত রেখেছে। এখন এই চলমান বস্তুটির সঙ্গে সে নিজেও যদি চলতে থাকে তাহলে স্পর্শগত সংবেদনের কোন পরিবর্তন ঘটবে না। কিন্তু চলমান বস্তুর নড়াচড়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্ধ ব্যক্তিটির হাতও নড়াচড়া করতে থাকবে এবং তার ফলে সে পেশী-সংবেদন অনুভব করবে। পেশীসংবেদনের (muscle sensation) অবিরাম পরিবর্তনের ফলে সে বুঝতে পারবে যে, বস্তুটি চলমান বা গতিশীল। তখনই সে গতি-প্রত্যক্ষ করতে পারবে।

দৃষ্টির সাহায্যে গতি-প্রত্যক্ষ

চক্ষুর সাহায্যে গতি-প্রত্যক্ষ: যখন কোন চলমান বস্তুর ওপর আমাদের দৃষ্টিকে এদিক ওদিক সঞ্চালিত না করে স্থিরভাবে নিবদ্ধ রাখি তখন আমরা কতকগুলি দৃষ্টিগত সংবেদন ধারাবাহিকভাবে পাই। যেহেতু এই সংবেদনগুলি আমরা নিজেরা সৃষ্টি করি না, সেহেতু আমরা বুঝতে পারি যে, কোন একটি চলমান বস্তুর ওপর আমরা দৃষ্টি নিবদ্ধ করছি।

সক্রিয় স্পর্শনের মাধ্যমে গতি প্রত্যক্ষ

আমরা যখন একটা উড়ন্ত পাখিকে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে অনুসরণ করতে থাকি তখন চোখের পেশীগুলি নড়াচড়া করতে থাকে। কিন্তু যেহেতু পাখিটার গতির হার এবং দিকটি আমার ওপর নির্ভর নয়, তখন বুঝতে পারি যে, পাখিটা চলমান। কিন্তু পাখিটি যদি আমাদের কাছ থেকে উড়ে দূরে চলে যায় বা দূর থেকে উড়ে আমাদের কাছে আসে, কেবল একপাশ থেকে আর এক পাশে যায় না তখন পরোক্ষভাবে দূরত্বের বিভিন্ন লক্ষণ দেখে, যেমন—পাখিটির আকারের পরিবর্তন, কাছে থাকার জন্য স্পষ্টতা, দূরে থাকার

জন্য অস্পষ্টতা এবং পাখির গতিকে অনুসরণ করার জন্য চোখের পেশীগত সংবেদন প্রভৃতির দ্বারা আমরা গতি প্রত্যক্ষ করি।

কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা আপাত-গতি বা ভ্রান্ত গতি-প্রত্যক্ষ করি। এইরূপ ক্ষেত্রে আসলে বস্তুগুলি স্থির বা গতিহীন, কিন্তু আমরা দেখি বস্তুগুলি গতিশীল। নিশ্চল বস্তুতে গতি-প্রত্যক্ষ করার অবস্থাকে বলা হয় **আপাত গতি-প্রত্যক্ষ** বা 'ফাইঘটনা',(Phy-phenomenon)। চলচ্চিত্রের সাহায্যে এই 'আপাত-গতি-প্রত্যক্ষে'র বিষয়টিকে অতি সহজেই বোঝান যেতে পারে। চলচ্চিত্রে ব্যক্তি বা বস্তুর বিভিন্ন অবস্থার কতকগুলি নিশ্চল ছবি একটি যন্ত্রের সাহায্যে একটি পর্দার ওপর অতি দ্রুত পর পর ফেলা হয়, তার ফলে ব্যক্তি বা বস্তুগুলি গতিশীল বলে ধারণা হয়। এর কারণ, একটি চিত্রের যে দৃষ্টিগত সংবেদন মনের মধ্যে একটি অনুবেদন বা উত্তর-প্রতিরূপ (after-sensation of after-image) রেখে যায়, সেটি পরবর্তী চিত্রের দৃষ্টিগত সংবেদনের সঙ্গে মিলিত হয়ে নিশ্চল ছবিগুলির সাহায্যে একটি নিরবচ্ছিন্ন চলমান ছবির ধারণা নিয়ে আসে। বিজ্ঞাপনদাতারা অনেক সময় পথচারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য এরূপ ঘটনার সহায়তা গ্রহণ করেন। কয়েকটি আলোকিত তীরকে পরস্পরের থেকে একটু দূরে রেখে যদি অল্প সময়ের ব্যবধানে দ্রুত জ্বালানো ও নেভানো যায় তাহলে মনে হবে তীরগুলি বুঝি ছুটে যাচ্ছে। বাস্তবিক তীরগুলি নিশ্চল; কেবলমাত্র অল্প সময়ের ব্যবধানে তীরগুলিকে জ্বালানো ও নেভানোর জন্য আপাত-গতির প্রত্যক্ষ হবে।

ফাই-ঘটনা

চোখের সাহায্যে গতি প্রত্যক্ষ করার বিষয়টি গেস্টাল্টবাদীরা স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে গতি-প্রত্যক্ষ অনুমান নির্ভর নয়। গতি-প্রত্যক্ষ করার ক্ষমতা মনের একটা বিশিষ্ট মৌলিক ক্ষমতা। গেস্টাল্ট সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, বের্থাইমার (Bertheimer) গতি-প্রত্যক্ষ নিয়ে নানারূপ পরীক্ষণ করেছেন। যেখানে উদ্দীপকের কোন গতি নেই, সেখানে কিভাবে গতি-প্রত্যক্ষ করা যায় এই বিষয় নিয়ে তিনি পরীক্ষণ করেন। তিনি দেখিয়েছেন যে দুটি আলোক বিন্দুকে পরস্পর থেকে একটি সুনির্দিষ্ট দূরত্বে রেখে ১/১৫ সেকেণ্ডের ব্যবধানে যদি একটাকে জ্বালানো ও অপরটিকে নিভানো যায় তবে মনে হবে আলো এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করছে।

গেস্টাল্টবাদীরা গতির চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ স্বীকার করেন না

(ঘ) দিক-প্রত্যক্ষ (Perception of Direction): আমরা চোখ দিয়ে সোজাসুজি দিক প্রত্যক্ষ করতে পারিনা, সক্রিয় স্পর্শনের মাধ্যমেই আমরা দিক প্রত্যক্ষ

করি। আমরা যখন সামনের দিকে বা পেছনের দিকে, ডাইনে বা বামে ঘাড়টিকে প্রসারিত করি তখন যে বিভিন্ন ধরনের পেশী সংবেদন হয়, সেই সংবেদন আমাদের দিকের জ্ঞান দেয়। যখন আমরা আমাদের হাতটিকে সামনে, পিছনে, ডাইনে বা বামে প্রসারিত করি তখন আমরা চোখ ও হাতের এই ওঠা-নামা বা গতিকে অনুসরণ করতে থাকি। এর ফলে হাতের পেশীগত সংবেদন এবং চোখের পেশীগত সংবেদনের মধ্যে একটা যোগসূত্র স্থাপিত হয়। পরে হাতের পেশীগত সংবেদনের অভিজ্ঞতা ছাড়াও কেবলমাত্র চোখ দিয়ে আমরা কোন্‌টি দক্ষিণ দিক, কোন্‌টি বাম দিক, কোন্‌টি উপর, কোনটি নীচ প্রত্যক্ষ করতে পারি। সুতরাং, দিকের দৃষ্টিগত প্রত্যক্ষণ হল অর্জিত (Acquired), আসলে দিক্‌নির্ণয় সক্রিয় স্পর্শনির্ভর।

সক্রিয় স্পর্শনের মাধ্যমেই দিক প্রত্যক্ষ করা যায়

(ঙ) **দুর্ভেদ্যতার প্রত্যক্ষ** (Perception of Impenetrability): অধিকাংশ জড় বস্তুর একটি গুণ হল দুর্ভেদ্যতা। কোন জড়বস্তুর ওপরে চাপ দিতেই আমরা বুঝি যে আমাদের গতি বাধা পাচ্ছে বা প্রতিরুদ্ধ হচ্ছে। এই দুর্ভেদ্যতা আমরা কিভাবে প্রত্যক্ষ করি? আমরা প্রত্যক্ষ করি স্পর্শনের সহায়তায়। আমাদের গতি যখন রুদ্ধ হয়ে যায় তখনই বুঝি বস্তুটি দুর্ভেদ্য। ধরা যাক, কোন একটি টেবিলের ওপর আমি হাত দিয়ে চাপ দিচ্ছি, তখন আমি বুঝতে পারি যে আমার হাত আর অগ্রসর হচ্ছে না, আমার হাতের পেশীতেও আমি চাপ অনুভব করি। সুতরাং রুদ্ধগতিই (impeded or thwarted movement) আমাদের দুর্ভেদ্যতা প্রত্যক্ষে সহায়তা করে।

স্পর্শনের সাহায্যে দুর্ভেদ্যতা প্রত্যক্ষ

১৯। মৌলিক প্রত্যক্ষ এবং অর্জিত প্রত্যক্ষ (Original Perception and Acquired Perception):

প্রত্যক্ষ দু'প্রকারের হতে পারে, যথা—(১) **মৌলিক প্রত্যক্ষ** (Original Perception) এবং (২) **অর্জিত প্রত্যক্ষ** (Acquired Perception)।

আমরা হাত দিয়ে এক টুকরো বরফ স্পর্শ করলাম। বরফের টুকরোটি যে ঠাণ্ডা তা প্রত্যক্ষ করলাম। পরে আমরা চোখ দিয়ে বরফের টুকরোটির দিকে তাকালাম, বরফ ঠাণ্ডা দেখাচ্ছে। প্রথমটি হল 'মৌলিক প্রত্যক্ষ'; (Original perception), আর দ্বিতীয়টি হল 'অর্জিত প্রত্যক্ষ' (Acquired perception)। চোখ দিয়ে বরফের ঠাণ্ডার সংবেদন প্রত্যক্ষভাবে পাওয়া

অর্জিত প্রত্যক্ষের স্বরূপ

যায় না। অতীতে আমরা স্পর্শনের সাহায্যে জেনেছি যে বরফ ঠাণ্ডা। এখন বরফের দিকে তাকাতেই দৃষ্টিগত সংবেদন মনে স্পর্শগত সংবেদনের স্মৃতি জাগিয়ে তুলছে। বরফের দিকে তাকাতেই তার দৃষ্টিগত বা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের সঙ্গে স্পর্শগত প্রতিরূপ (Tactual image) এসে যুক্ত হচ্ছে। Stout একে বলেছেন, 'বিজড়ন' (Complication); Sully একে বলেছেন, 'অর্জিত প্রত্যক্ষ' (Acquired perception)।

প্রতিটি সংবেদনের জন্য একটি নির্দিষ্ট ইন্দ্রিয় আছে। কিন্তু যদি কোন কোন সময় কোন বিশেষ এক ধরনের সংবেদন যে নির্দিষ্ট ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে পাওয়া যায়, সেই ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে না পেয়ে অন্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে পাওয়া যায়; তাহলে যে পরোক্ষ অবধারণ বা প্রত্যক্ষ ঘটে তাকেই 'অর্জিত প্রত্যক্ষ' বলে। যেমন, আমরা বলি—আম পাকা দেখায়, গোলাপ ফুল সুগন্ধযুক্ত দেখায়। স্পর্শনের এবং আস্বাদের দ্বারা সোজাসুজি আমটা পাকা কিনা প্রত্যক্ষ করতে পারি, ঘ্রাণের সাহায্যেও প্রত্যক্ষ করতে পারি। কিন্তু যখন বলি আম পাকা দেখায় বা গোলাপ ফুল সুগন্ধযুক্ত দেখায় তখন উভয়ের ক্ষেত্রে আমরা সংবেদনটি চক্ষুর সাহায্যে পাচ্ছি। দূরত্ব, ঘনত্ব, আয়তন, গতি—এই সব বিষয়ের প্রত্যক্ষ চোখের মৌলিক প্রত্যক্ষ নয়, অর্জিত প্রত্যক্ষ।

অর্জিত প্রত্যক্ষের সংজ্ঞা

২০। কাল প্রত্যক্ষ কিভাবে হয়? (How do we perceive time):

বিভিন্ন ঘটনার পূর্বাপর সম্পর্কের ভিত্তিই হচ্ছে কাল। নিয়ত ঘটনা ঘটে চলেছে, কোনটি আগে ঘটেছে, কোনটি পরে ঘটেছে, কখনও বা দুটি ঘটনা একত্রে ঘটছে। বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে যে পরিবর্তন ও গতি তাও কালের সাহায্যেই আমরা উপলব্ধি করি।

'স্থায়িত্ব' (Duration) ও 'পারম্পর্য' (Successtion)—এই দুই বৈশিষ্ট্যের সাহায্যে আমরা কাল প্রত্যক্ষ করি। যখন বলি, এক ঘণ্টা ধরে বৃষ্টি হয়েছিল, তখন আমরা কালের এই 'স্থায়িত্ব' প্রত্যক্ষ করি। যখন আমরা বলি একটি ঘটনা আর একটি ঘটনার আগে বা পরে ঘটেছে, যেমন—আমরা বাড়ীতে আসার আগে রাম বাড়ীতে এসেছিল, তখন আমরা কালের পারম্পর্য প্রত্যক্ষ করি। সেকেণ্ড, মিনিট, ঘণ্টা, দিন, বছর—এগুলির সাহায্যে আমরা কালের স্থায়িত্ব পরিমাপ করি এবং আগে, পরে, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রভৃতি শব্দের দ্বারা কালের পারম্পর্য নির্দেশ করি। 'স্থায়িত্ব' ও 'পারম্পর্য'—সময়ের এই দুই বৈশিষ্ট্য আমরা একই সঙ্গে অনুভব করি।

স্থায়িত্ব ও পারম্পর্যের সাহায্যে কালের ধারণা

কাল এক অনাদি, অনন্ত প্রবাহ। অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ—এই অনন্ত

প্রবাহের তিনটি স্তর মাত্র। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ—এরই মাধ্যমে আমরা কাল প্রত্যক্ষ করি। আমরা কেবলমাত্র বর্তমানকেই প্রত্যক্ষ করতে পারি। সংবেদনে বর্তমান প্রত্যক্ষ হয়। অতীত এবং ভবিষ্যৎকে আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি না। স্মৃতির সাহায্যে অতীত এবং প্রত্যাশার (expectation) সাহায্যে ভবিষ্যতের প্রত্যক্ষ হয়। যথাযথ সংবেদনই 'বর্তমান'-এর জ্ঞান দেয়। একটি ক্ষুধার্ত শিশু খাদ্য খাচ্ছে, ক্ষুধার পরিতৃপ্তি ঘটছে—এই সংবেদন যখন সে লাভ করে তখনই সে বর্তমানকে প্রত্যক্ষ করে। 'আর নেই' (no more) এবং 'এখনও আসেনি' (not yet) যথাক্রমে অতীত এবং ভবিষ্যতের ধারণাকে বোঝায়। প্রত্যাশামূলক মনোযোগের মধ্যে 'এখনও আসেনি',—এই যে ভাব সেটিই ভবিষ্যতের প্রত্যক্ষের ইঙ্গিত দেয়।

অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত—কালের তিনটি স্তর

যথার্থ সংবেদন বর্তমান-এর জ্ঞান দেয়

যখন আকুল আগ্রহে খাদ্যের জন্য প্রতীক্ষা করছি, তখন আমরা এই ভবিষ্যৎকে প্রত্যক্ষ করি। আবার, 'আর নেই' এই বোধই অতীতের প্রত্যক্ষ ঘটায়। বেশ তৃপ্তি-দায়ক একটা ভোজ খাবার পর বুঝতে পারি যে ভোজ খাওয়াটি অতীত ঘটনায় পরিণত হয়েছে। যখন আমাদের ইচ্ছা বিলম্বিত হয় বা বাধাপ্রাপ্ত হয়, তখন 'এখনও আসেনি' —এই ভাবটি তীব্রভাবে অনুভূত হয়। আবার ইচ্ছা যখন আকস্মিকভাবে ব্যাহত হয় এবং তার ফলে মন নিরাশায় পূর্ণ হয়ে যায়, তখন 'আর নেই'—এই বোধটি তীব্রভাবে অনুভূত হয়। স্মৃতি এবং কল্পনার সাহায্যেই যথাক্রমে অতীত এবং ভবিষ্যতকে সুস্পষ্ট-ভাবে উপলব্ধি করা যায়।

বর্তমান হল অতীত ও ভবিষ্যতের যোগসূত্র। বর্তমানকে কেন্দ্র করেই আমরা কালের অপর দুটি স্তর—ভবিষ্যৎ ও অতীতের কথা ভাবতে পারি। কিন্তু আমরা যাকে বর্তমান বলি তা কোন সময়-বিন্দু নয়। ক্ষুরের ধারের মতো এই 'বর্তমান' কালকে দুটি নির্দিষ্ট অংশে—অর্থাৎ, অতীতে এবং ভবিষ্যতে বিভক্ত করছে না। আমরা যাকে 'বর্তমান' বলে প্রত্যক্ষ করি তার মধ্যেও অতীতের কিছু অংশ এবং ভবিষ্যতের কিছু অংশ মিশে আছে। 'বর্তমান' এই শব্দটি উচ্চারণ করার সময়, যখন 'ব' উচ্চারণ করছি, তখন অন্যান্য অক্ষরগুলি ভবিষ্যতের গর্ভে রয়েছে। আর যখন শেষ অক্ষর 'ন' উচ্চারণ করছি তখন আগের তিনটি অক্ষরই অতীতের মধ্যে মিলিয়ে গেছে; কাজেই 'বিশুদ্ধ বর্তমান' (Real Present) বলে কিছু নেই। আমরা যাকে সাধারণ কথায় 'বর্তমান' বলি, বা বর্তমান বলে প্রত্যক্ষ করি' তাহল উইলিয়ম জেমসের

বর্তমান কোন সময়-বিন্দু নয়

অলীক বর্তমান

(William James) ভাষায় অলীক বর্তমান (Specious Present)। সে কারণেই জেমস্ বলেছেন, "যাকে আমরা বর্তমান বলে প্রত্যক্ষ করি তা ক্ষুরের ধারের মতো নয়, বরং এ হল ঘোড়ার পিঠে বসা জিনের মতো, যার সামনে-পিছনে নিজের কিছু বিস্তার আছে, সেখান থেকে যথাসময়ে সামনে ও পিছনের দিকে আমরা তাকাতে পারি।"[1]

বাহ্যবস্তুর প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়নির্ভর, কিন্তু কালকে প্রত্যক্ষ করার জন্য কোন ইন্দ্রিয় নেই। কিন্তু গেস্টাল্টবাদীরা মনে করেন যে, মস্তিষ্ক সোজাসুজি 'কাল সম্বন্ধ' প্রত্যক্ষ করতে পারে এবং এ ক্ষমতা হল মস্তিষ্কের একটি মৌলিক ক্ষমতা। গেস্টাল্টবাদীদের মতে সব রকমের গতির প্রত্যক্ষই চারিমাত্রাবিশিষ্ট (four dimensional)। চতুর্থ মাত্রাটি হচ্ছে কাল যার পটভূমিতে ঘটনার প্রত্যক্ষ সম্ভব হয়।

২১। সংপ্রত্যক্ষ (Apperception) :

একটি অপরিচিত বস্তু বা ঘটনাকে যখন পরিচিত বস্তু বা ঘটনার সঙ্গে যুক্ত করে প্রত্যক্ষ করি, তখন তাকে বলা হয় সংপ্রত্যক্ষ। সংপ্রত্যক্ষ হল মনের মধ্যে সুসংবদ্ধ অতীত অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত করে বর্তমান অভিজ্ঞতাকে প্রত্যক্ষ করা। সাধারণ প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রেও অতীত অভিজ্ঞতার সঙ্গে বর্তমান অভিজ্ঞতার সংযোগ ঘটে স্বতঃস্ফূর্তভাবে, আমাদের অজ্ঞাতসারে। কিন্তু সংপ্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে অতীত অভিজ্ঞতার সঙ্গে নতুন অভিজ্ঞতার সংযোগ জ্ঞাতসারেই ঘটে থাকে। কেননা, এক্ষেত্রে জ্ঞাতসারেই নতুন কোন ঘটনাকে অভিজ্ঞতার সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হয়। একটি নতুন অপরিচিত জন্তুকে দেখে তার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হল যে, জন্তুটি বিড়াল-জাতীয়, তবে বিড়ালের থেকে আকারে বড়, বন্য, হিংস্র এবং অন্য জন্তু শিকার করে। এক্ষেত্রে মনে পূর্ব থেকে বিড়ালের যে অভিজ্ঞতা আছে, সেই অভিজ্ঞতার সাহায্যে বর্তমান অপরিচিত বস্তুটিকে ব্যাখ্যা করা হল।

সংপ্রত্যক্ষ কাকে বলে?

প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে সংবেদনই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, সংপ্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে মনের মধ্যে সঞ্চিত অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে সংবেদনকে ব্যাখ্যা করেই পরিবেশের নতুন বস্তু বা ঘটনা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায়। সংপ্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে অতীত ধারণার সাহায্যে নতুন ধারণার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়।

প্রত্যক্ষ ও সংপ্রত্যক্ষ

---

1. 'In short, the practically cognised present is no knife-edge, but a saddle-back, with a breadth of its own, and from which we look in two directions in time."

—James : Principles of Psychology, Vol 1, Page 606

জার্মান দার্শনিক হার্বার্ট (Herbert) শিক্ষার অন্যতম পদ্ধতি হিসেবে সংপ্রত্যক্ষের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। শিশুদের এমনভাবে শিক্ষা দিতে হবে যাতে তারা পুরাতন ধারণার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করে নতুন নতুন ধারণাগুলিকে বোঝার চেষ্টা করে। পাঠ্যবিষয়ের অর্থ উপলব্ধি না করে, তারা যেন কেবলমাত্র সেগুলি কণ্ঠস্থ না করে। বস্তুতঃ, জ্ঞান অর্জনের পদ্ধতিই হল অতীত অভিজ্ঞতায় পাওয়া ধারণার সঙ্গে বর্তমান ধারণাকে যুক্ত করা, জ্ঞানকে সুসংবদ্ধ করে তোলা। অতীত অভিজ্ঞতার সঙ্গে সংযুক্ত করতে না পারলে ধারণাগুলি জ্ঞানের বিচ্ছিন্ন উপাদানরূপে বিরাজ করে, যেগুলি আসলে কোন কাজে আসে না। কাজেই কোন শিক্ষকের উচিত নয় সম্পূর্ণ নতুন নতুন ধারণা দিয়ে শিশুর মনের বোঝাকে ভারি করে তোলা, কারণ সে-সব ধারণাকে শিশু অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারে না বলে শিক্ষণকার্য অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

শিক্ষার ক্ষেত্রে সংপ্রত্যক্ষের গুরুত্ব

Questions

1. What is perception ?

2. What is the relation between Sensation and Perception ?

3. Explain the nature of the perception process. Give an example. Is illusion an error of perception ?

4. 'Perception is a presentative-representative process.' Explain this statement with reference to an actual case of visual perception.

5. State clearly the distinctive chrcteristics of perception. What is an illusory perception ?

6. "A pure sensation is a psychological myth "—Discuss.

7. Can there be pure sensation in adult life ?

8. Elucidate the Gestalt theory of perception. Distinguish in this connection between Figure and Ground.

9 What is perception ? What are the contributions of Gestalt psychology in the field of perception ? How much is really objective in our perception ?

10. Compare the Associational with the Gestalt theory of perception.

11. Critically expound the Gestalt theory of perception. How does Gestalt psychology explain illusion ?—Discuss.

12. What is illusion ? What are the causes of illusion ?

13. Distinguish Perception from Illusion and Hallucination.

14. How space can be perceived by touch unaided by vision or how do blind persons perceive space ?

16. How can space in general be perceived ?

17. Explain visual perception of space.

18. Explain how we perceive distance visually.

19. Discuss the Berkeleyan theory of perception of distance. What are the monocular factors for visual distance.

20. How do you see the distance of object ? Discuss leading theories on this subject.

21. How do we perceive magnitude, figure and solidity of an object ?

22. Give an account of the perception of the third dimension of space.

23. How do you perceive the third dimension of empty space ? Discuss the question with special reference to views of Barkeley and James.

24. How do we perceive movement ? What is apparent movement ?

25. How do we parceive time ?

26 Briefly explain the threshhold of perception. What role does attention play in perception ?

27. What are the elementary qualities given to-us in perception.

28. Write notes : (a) Acquired Perception. (b) Apperception. (c) Illusion. (d) Colour blindness (e) Gestalt Psychology. (f) Geometrical optical Illusion. (g) Specious Present.

সপ্তম অধ্যায়

স্মৃতি

(Memory)

১। স্মৃতি প্রতিরূপ ও কল্পনা প্রতিরূপ (Memory Image and the Image of Imagination)[1] :

কোন একটি বস্তু প্রত্যক্ষ করার পর যখন স্মরণক্রিয়ার সাহায্যে তারই একটি প্রতিচ্ছবি আমাদের মানস-চোখের সামনে তুলে ধরি তখন তাকে বলা হয় স্মৃতি-প্রতিরূপ (Memory-Image)। অতীত অভিজ্ঞতা থেকে উপাদান সংগ্রহ করে, নতুনভাবে তাকে সাজিয়ে যখন একটি নতুন মানসিক চিত্র আমাদের মনের সামনে তুলে ধরি তখন তাকে বলা হয় কল্পনা-প্রতিরূপ (Image of Imagination)। দশ বছর আগে আমি যে বাড়ীতে ছিলাম, তার একটা প্রতিচ্ছবি যখন চোখের সামনে তুলে ধরি তখন তাহল স্মৃতি-প্রতিরূপ। পাখির ডানাকে ঘোড়ার সঙ্গে যুক্ত করে দিয়ে যখন পক্ষীরাজ ঘোড়ার একটি মানসিক চিত্র চোখের সামনে তুলে ধরি তখন তাহল কল্পনা-প্রতিরূপ।

স্মৃতি-প্রতিরূপ ও কল্পনা-প্রতিরূপের স্বরূপ

উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য : (ক) স্মৃতি-প্রতিরূপ ও কল্পনা-প্রতিরূপ উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রতিরূপগুলি অতীতের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা থেকে সংগৃহীত। (খ) উভয়ক্ষেত্রেই ইন্দ্রিয়ের সহায়তা ছাড়াই প্রতিরূপগুলিকে মনের মধ্যে তুলে ধরা যায়। (গ) স্মৃতি-প্রতিরূপ ও কল্পনা-প্রতিরূপ, উভয়ক্ষেত্রেই আমাদের চিন্তা একই পদ্ধতিতে কাজ করে। উভয় ক্ষেত্রেই আমরা বিষয়বস্তুকে স্থান ও কালের পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যক্ষ করার চেষ্টা করি। কিন্তু কয়েক বিষয়ে সাদৃশ্য থাকলেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্যও আছে।

উভয়ের মধ্যে পার্থক্য : (ক) স্মৃতি-প্রতিরূপের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষিত বস্তুর ছবিই মনে ভেসে ওঠে এবং এটি অতীত অভিজ্ঞতার পুনরুজ্জীবিত রূপ মাত্র। কল্পনা-প্রতিরূপের ক্ষেত্রে যে প্রতিচ্ছবি মনের সামনে তুলে ধরি তা অনেকটা আমাদের সৃষ্টি। বন্ধুর কথা ভাবতে গিয়ে যে প্রতিচ্ছবি মনে জাগল, তা আমার সৃষ্ট নয়। রাক্ষস বা দৈত্যের যে ছবি আমরা চোখের সামনে তুলে ধরি, তা এক হিসেবে আমার দ্বারা সৃষ্ট।

১। স্মৃতি এবং কল্পনার সম্বন্ধ 'কল্পনা' অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

(খ) স্মৃতি-প্রতিরূপ অতীতের সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু কল্পনা-প্রতিরূপ অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যৎ যে কোন কালের সঙ্গেই সম্পর্কযুক্ত হতে পারে। আমরা অতীতের স্মৃতির কথাই বলে থাকি, বর্তমান বা ভবিষ্যতের স্মৃতির কথা বলি না, বলি বর্তমানের অভিজ্ঞতা ও ভবিষ্যতের প্রত্যাশা। কিন্তু আমরা অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যতের যে কোন বিষয় নিয়ে কল্পনার প্রতিরূপ গঠন করতে পারি।

(গ) স্মৃতি-প্রতিরূপ গঠনে ব্যক্তির কোন স্বাধীনতা নেই, কল্পনা-প্রতিরূপ গঠনে ব্যক্তির স্বাধীনতা আছে। ব্যক্তি খুশিমত অতীত অভিজ্ঞতার বিভিন্ন প্রতিরূপগুলি পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত করে নিতে পারে।

(ঘ) স্মৃতি-প্রতিরূপে ঘটনার পারম্পর্য পরিবর্তিত হয় না, কল্পনা-প্রতিরূপে ঘটনার পারম্পর্যের কোন প্রশ্ন নেই। স্মৃতির ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর বা অভিজ্ঞতার যথাযথ পুনরুদ্রেক করা হয়, কোন রকম পরিবর্তন করা হয় না। কল্পনার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা রূপান্তর লাভ করে।

(ট) স্মৃতি- প্রতিরূপের ক্ষেত্রে আমরা প্রতিরূপগুলি চিনে নিতে পারি, একেই বলা হয় প্রত্যভিজ্ঞা বা পুনঃপরিজ্ঞান (Recognition)। কল্পনা-প্রতিরূপের ক্ষেত্রে পুনঃ-পরিজ্ঞানের কোন প্রশ্ন ওঠে না।

(চ) স্মৃতি-প্রতিরূপের মধ্যে একটা অহং-চেতনা থাকে। আগ্রার তাজমহলের একটি প্রতিরূপ যখন স্মৃতিতে পুনরুজ্জীবিত হয়, তখন আমার এই বোধ থাকে যে, এই স্মৃতির সঙ্গে আমার অতীত অভিজ্ঞতা যুক্ত। কিন্তু কল্পনা-প্রতিরূপের বেলায় অহং-এর চেতনা যে থাকবেই, এমন কোন কথা নেই।

(ছ) স্মৃতি-প্রতিরূপ যেহেতু অতীতে দৃষ্ট কোন বিষয়ের অবিকল অনুলিপি, সেহেতু মনে করা হয় যে স্মৃতি-প্রতিরূপ স্থির এবং যেহেতু কল্পনা-প্রতিরূপ স্বাধীন সৃষ্টি সেহেতু এটি চঞ্চল ও পরিবর্তনশীল। কিন্তু মনোবিদ্ টিচেনার (Titchener) বলেন যে, স্মৃতি-প্রতিরূপ পরিবর্তনশীল, কিন্তু কল্পনা-প্রতিরূপ হল স্থির।[1]

স্মৃতি-প্রতিরূপ এবং কল্পনা-প্রতিরূপের মধ্যে পূর্বোক্ত পার্থক্য থাকলেও, অনেক ক্ষেত্রে এই উভয় প্রকার প্রতিরূপ, পরস্পরের সঙ্গে মিশে যায়। পক্ষীরাজ ঘোড়ার প্রতিরূপে

1. "Popular Psychology regard the memory images as stable copy of past Perception and the image of imagination as subject to Keleidoscopic change. In fact, it is the memory image that varies and the image of imagination that is stable."

—Titchener : A Text Book of Psychology, Page 417

পাখির ডানা এবং ঘোড়ার প্রতিরূপ উভয়কে মনে যুক্ত করে কল্পনা-প্রতিরূপ গঠিত হয়। আবার ব্যক্তির মনোভাবও আবেগ দ্বারা রঞ্জিত হয়েই অতীত অভিজ্ঞতার পুনরুজ্জীবন ঘটে, যার ফলে স্মৃতি-প্রতিরূপ অতীত অভিজ্ঞতার অবিকল প্রতিচ্ছবি হয় না। গল্প ও উপন্যাস পড়তে গিয়ে এই উভয় প্রকার প্রতিরূপের সংমিশ্রণ আমরা লক্ষ্য করে থাকি।

স্মৃতি প্রতিরূপ এবং কল্পনা-প্রতিরূপের সংমিশ্রণ

২। স্মৃতি ও স্মরণক্রিয়া কাকে বলে? (What is Memory):

অতীত অভিজ্ঞতার যথাসম্ভব অবিকল পুনরুদ্রেক করার ক্ষমতাকে স্মৃতি (Memory) এবং এই প্রক্রিয়াকে স্মরণক্রিয়া (Recalling) বলা হয়। যেমন, কবিতা মুখস্থ করা এবং যেমন শোনা হয়েছিল তেমনভাবে মনে রাখা হল স্মৃতি এবং পরে সেটা আবৃত্তি করা হল স্মরণক্রিয়া।

স্মৃতির পরিচয়

স্মরণক্রিয়াকে সাধারণতঃ দু অর্থে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। প্রথম অর্থে স্মরণক্রিয়া হল সংরক্ষণ বা ধারণ করা (Retention) এবং দ্বিতীয় অর্থে স্মরণক্রিয়া হল পুনরুদ্রেক (Recall)। একটি ছাত্র তার পাঠ্যবিষয়টি বার বার পাঠ করে তাকে মনে ধরে রাখে এবং শিক্ষক যখন ঐ বিষয়ে প্রশ্ন করেন তখন তার উত্তর দেবার জন্য সে বিষয়টির পুনরুদ্রেক করে। প্রশ্ন হল, স্মরণক্রিয়াকে কোন্ অর্থে গ্রহণ করা হবে? উত্তরে বলা যেতে পারে, স্মরণক্রিয়াকে পুনরুদ্রেক করা অর্থে গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত। অবশ্য পুনরুদ্রেক করতে গেলেই পূর্ব অভিজ্ঞতাকে মনে ধারণ করে রাখতেই হবে। মনোবিদ্ স্টাউট (Stout) এই অভিমতের সমর্থন করে বলেছেন, "সময় সময় 'স্মৃতি' শব্দটিকে সাধারণ ভাবে 'ধৃতি' কথাটির সঙ্গে সমার্থক মনে করে ব্যবহার করা হয়। শব্দটির এই জাতীয় প্রয়োগ ব্যাপক ও অসুবিধা-জনক। যথাযথ পুনরুদ্রেক অর্থেই এর প্রয়োগ সীমাবদ্ধ রাখা ভাল[1]………।"

স্মরণক্রিয়াকে দু' অর্থে ব্যবহার

সুতরাং, স্মরণক্রিয়া হল মনে সংরক্ষিত এমন একটি পূর্ব অভিজ্ঞতার পুনরুদ্রেক করা। অতীতে অভিজ্ঞতা যেভাবে হয়েছে তাকে ঠিক সেভাবেই পুনরুদ্রেক করতে হবে। যদি

1. "Sometimes the word 'memory' is used as synonymous with retentiveness general. This application of the term is inconsistently wide. It is better to confine it to ideal revival........"

—Stout : A Manual of Psychology. Page 521

সেই অভিজ্ঞতাকে নতুনভাবে সাজিয়ে নেওয়া যায় বা তার যদি কোনরূপ রূপান্তর ঘটে তাহলে তা স্মরণক্রিয়া না হয়ে, হবে কল্পনা (imagination)। স্মৃতি হল পুনরুদ্রেকমূলক কল্পনা কারণ এই প্রকার কল্পনায় অতীতের প্রতিরূপগুলির অবিকল পুনরুদ্রেক করা হয়। গঠনমূলক কল্পনায় প্রতিরূপগুলিকে নতুনভাবে বিন্যস্ত করা হয় এবং একটি নতুন চিত্র অঙ্কিত করা হয়।

স্মৃতি ও কল্পনার পার্থক্য

৩। স্মৃতির বিভিন্ন উপাদান (Factors of Memory) :

স্মরণরূপ প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করলে নিম্নলিখিত উপাদানগুলি লক্ষ্য করা যায়—

(ক) শিক্ষণ (Learning) : কোন বিষয় যদি পূর্বে আমরা না শুনে, বা দেখে শিক্ষা করে থাকি, তাহলে তাকে প্রতিরূপের সাহায্যে স্মরণ করার কোন প্রশ্নই ওঠে না; কোন কিছু স্মরণ করতে হলে তাকে মনের খাতায় লিপিবদ্ধ করে রাখতে হবে। এর জন্য আমরা কোন একটি পাঠ বার বার শিক্ষা করি। কিন্তু অনেকে মনে করেন যে, সংবেদন, প্রত্যক্ষ, অনুভূতি প্রভৃতি ছাড়া শিক্ষণ সম্ভব নয়, সেহেতু শিক্ষণকে স্মৃতির উপাদান রূপে গণ্য করা যুক্তিযুক্ত নয়।

(খ) **সংরক্ষণ ধারণ** (Retention) : যখন আমরা মন দিয়ে কোন বিষয় বার বার শেখার চেষ্টা করি, তখন বিষয়টি আমাদের মনে ধৃত বা সংরক্ষিত হয়, অর্থাৎ আমরা বিষয়টিকে মনে ধারণ করি। বিষয়টি আমাদের চেতন-মনের স্তর থেকে অবচেতন মনের স্তরে চলে আসে। অতীত অভিজ্ঞতাগুলি মানসিক নির্দেশন রূপে বা প্রতিরূপের আকারে অবচেতন মনে রক্ষিত হয়। এই সংরক্ষিত প্রতিরূপ পুনরুদ্রিক্ত হয় বলেই স্মৃতি সম্ভব হয়।

মন যে বিষয়বস্তুকে ধারণ করতে পারে অভিজ্ঞতার পুনরুদ্রেকের দ্বারাই সে কথা প্রমাণ করা যেতে পারে। মনে যা সংরক্ষিত নেই তাকে পুনরুদ্রেক করা সম্ভব নয়।

(গ) পুনরুদ্রেক বা **পুনরুৎপাদন** (Recall or Reproduction) : মনে সংরক্ষিত প্রতিরূপগুলিকে ব্যক্ত করার মানসিক ক্রিয়াকেই পুনরুদ্রেক বা পুনরুৎপাদন বলে। পূর্ব অভিজ্ঞতাকে মনে জাগিয়ে তোলা বা মনে করাই হল পুনরুদ্রেক। অতীত বা পূর্ব অভিজ্ঞতাকে যথাযথভাবে পুনরুদ্রেক করতে হবে। যথাযথভাবে পুনরুদ্রেক করার অর্থ ঘটনার বিন্যাসটিকে অপরিবর্তিত রাখা—ঘটনার পারম্পর্য বজায় রেখে ঘটনাটি যেভাবে ঘটেছে তার প্রতিরূপগুলিকে সেভাবে পুনরুদ্রেক করা। অনুষঙ্গের (Association) জন্যই অতীত অভিজ্ঞতার পুনরুদ্রেক সম্ভব হয়।

(ঘ) প্রত্যভিজ্ঞা বা **পুনঃপরিজ্ঞান** (Recognition) : অতীত অভিজ্ঞতার প্রতিরূপগুলির পুনরুৎপাদনেই স্মরণক্রিয়া সম্পূর্ণ হয় না। যে অতীত অভিজ্ঞতার

প্রতিরূপগুলিকে পুনরুদ্রেক করা হল তাকে আমাদের পূর্ব অভিজ্ঞতার প্রতিরূপ বলে চিনে নিতে হবে। একেই বলা হচ্ছে প্রত্যভিজ্ঞা বা পুনঃপরিজ্ঞান, অর্থাৎ আমি পুনরায় পরিজ্ঞাত হলুম যে, এই অভিজ্ঞতার প্রতিরূপ যার পুনরুদ্রেক করা হয়েছে তার সঙ্গে অতীত অভিজ্ঞতার প্রতিরূপের প্রভেদ নেই। আমি হঠাৎ পথের মাঝে একটি ছেলের দেখা পেলাম এবং আমার স্মরণ হল যে কয়েক বছর আগে আমার এক আত্মীয়ের বাড়ীতে ছেলেটি আমার পাশে বসে ভোজ খেয়েছিল। এই যে ছেলেটিকে দেখে চিনতে পারলুম একেই বলা হয় প্রত্যভিজ্ঞা। প্রত্যভিজ্ঞা হল একটা পরিচিতির বোধ বা চেতনা যার অভাব ঘটলে স্মরণক্রিয়া সুনির্দিষ্ট হয় না।

(ঙ) **স্থান-কাল নির্দেশ** (Localisation): নির্ভুল স্মরণক্রিয়া তখনই হয়, যখন ঘটনাটির স্থান-কাল নির্দেশ করা যায়, অর্থাৎ স্থান-কাল জ্ঞানেরও পুনরুদ্রেক হয়। ঘটনাটি কোন্ সময়ে এবং কোথায় ঘটেছিল তা নির্ণয় করতে না পারলে স্মরণক্রিয়ার (Memory) সঙ্গে প্রত্যাশার (Expectation) প্রভেদ করা যায় না। বস্তুর পুনরুদ্রেকের সঙ্গে সঙ্গে যদি স্থান-কাল নির্দেশিত না হয় তাহলে বস্তুর পরিচিতি বোধ ঘটে না এবং এই পরিচিতি বোধই প্রত্যভিজ্ঞার প্রাণ।

(চ) **ব্যক্তিত্বের অভিন্নতা** (Personal Identity): স্মরণক্রিয়া আমাদের ব্যক্তিত্বের অভিন্নতাকে আশ্রয় করে সম্ভব হয়। বন্ধু পরিতোষের সঙ্গে দশ বছর আগে এক স্কুলে পড়েছিলাম, দশ বছর পরে আজ তার কথা স্মরণ করছি। আজকে আমি আর সেদিনের আমি যে এক, উভয়ই যে এক, উভয়ই যে একব্যক্তি, পৃথক ব্যক্তি নয়—এই বোধ না থাকলে স্মরণক্রিয়া সম্ভব নয়। অবশ্য ব্যক্তিত্বের অভিন্নতা হল মনের অভিন্নতা, দেহের নয়।

স্মৃতি বা স্মরণক্রিয়া বলতে যদি আমরা বুঝি পূর্বোক্ত উপাদানের সমষ্টি তাহলে ভুল হবে। স্মৃতি হল পূর্বোক্ত উপাদানগুলির পারস্পরিক ক্রিয়ার ফল। স্মৃতি যদিও অতীত অভিজ্ঞতার যথাযথ পুনরুদ্রেক তবু স্মৃতি-প্রতিরূপের মধ্যে কিছুটা নিজস্ব নতুনত্ব থাকে।

স্মৃতি পূর্বোক্ত উপাদানগুলির সমষ্টি নয়

৪। সংরক্ষণ বা ধৃতি (Problem of Retention):

সংরক্ষণ স্মৃতির অন্যতম উপাদান। পুরাতন অভিজ্ঞতার প্রতিরূপ যদি মনের মধ্যে সংরক্ষিত না হয় তাহলে অতীত অভিজ্ঞতার পুনরুদ্রেক সম্ভব নয়। প্রশ্ন হল, অতীত অভিজ্ঞতা মনের মধ্যে কিভাবে সংরক্ষিত হয়?

এ সম্পর্কে দুটি মতবাদ প্রচলিত আছে: যথা—(১) **শারীরবৃত্তীয় মতবাদ** (Physiological Theory), (২) **মনস্তাত্ত্বিক মতবাদ** (Psychological Theory)।

(ক) **শারীরবৃত্তীয় মতবাদ** (Physiological Theory of Retention): মিল (Mill), কারপেণ্টার (Carpenter), জেম্‌স (James) প্রমুখ মনোবিদ্‌গণ এই মতবাদের প্রবর্তক। মিল ও কারপেণ্টার মনে করেন যে, যখন আমরা কোন কিছু প্রত্যক্ষ করি তখন মস্তিষ্কের স্নায়ুগুলি উদ্দীপিত হওয়ার ফলে কম্পিত হতে থাকে।

মিল এবং কারপেণ্টার-এর অভিমত

প্রত্যক্ষ শেষ হয়ে গেলেই এই কম্পন ক্ষীণভাবে চলতে থাকে। এই প্রকার কম্পনের মধ্য দিয়েই অতীত অভিজ্ঞতা হয়। তাঁদের মতে স্থায়ীভাবে অচেতন মস্তিষ্কের ক্রিয়া চলতে থাকে। অতীত সংরক্ষিত অভিজ্ঞতার সংরক্ষণ সম্পর্কে এই মতবাদ "স্থায়ি-অচেতন মস্তিষ্ক-ক্রিয়া সম্পর্কীয় মতবাদ" (Theory of Permanent Unconscious Cerebration) নামে পরিচিত। যদি কোনভাবে এই কম্পনকে আরও দ্রুত ও তীব্রতর করে তোলা যায়, তাহলে অতীত অভিজ্ঞতার স্মৃতি সম্ভব হয়।

জেম্‌স (James) মস্তিষ্কের স্নায়ুমণ্ডলীর কোন কম্পনের কথা স্বীকার করেন না। তাঁর মতে মন এবং চেতনা সমার্থক শব্দ, যেহেতু মন এবং চেতনা সমব্যাপক। অচেতন মনের কোন অস্তিত্ব সম্ভব নয়। কাজেই যা চেতনার

জেম্‌স-এর অভিমত

বাইরে, তা মনেরও বাইরে, সুতরাং তাকে মানসিক বলা যেতে পারে না। সেহেতু অচেতন মস্তিষ্কের ক্রিয়ার কথা বলার কোন যুক্তি নেই। অভিজ্ঞতার সংরক্ষণ দৈহিক প্রক্রিয়া। প্রত্যক্ষণ-কার্য সমাপ্ত হলে মস্তিষ্কে কিছু পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তন অর্থে বোঝায় মস্তিষ্কে নতুন স্মৃতিরেখা অঙ্কিত হওয়া, অর্থাৎ মস্তিষ্কে নতুন ও সংক্ষিপ্ত স্নায়ুপথের সৃষ্টি। এরই মাধ্যমে অভিজ্ঞতার সংরক্ষণ সম্ভব হয়। জেম্‌সের এই মতবাদ 'স্থায়ি-মস্তিষ্কের পরিবর্তন সম্পর্কীয় মতবাদ' (Theory of permanent cerebral modification) নামে অভিহিত। এই পরিবর্তনের পথেই অতীত অভিজ্ঞতার পুনরুদ্রেক সম্ভব হয়।

সমালোচনা (Criticism): অতীত অভিজ্ঞতার সংরক্ষণ ও স্মরণক্রিয়ার ব্যাপারে মস্তিষ্কের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে; কিন্তু সংরক্ষণের বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে দৈহিক প্রক্রিয়া—এ বলা যুক্তিযুক্ত নয়। এ মতবাদ নিম্নলিখিত কারণে গ্রহণযোগ্য নয়।

(১) স্মৃতি বা স্মরণক্রিয়া হল একটা মানসিক প্রক্রিয়া। সুতরাং দৈহিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে মানসিক প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা কখনও সন্তোষজনক হতে পারে না। মনের সাহায্যেই মানসিক প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করা যুক্তিযুক্ত।

(২) মিল এবং কারপেণ্টার স্নায়ু-কম্পনের কথা বলেছেন, তার দ্বারা স্মৃতিকে ব্যাখ্যা করা যায় না। কোন কম্পন ধীর, কোন কম্পন দ্রুত, কখনও কম্পন ক্ষীণ, কখনও

তীব্র ; কিন্তু কম্পনের যদি কেবলমাত্র পরিমাণগত পার্থক্য থাকে, কোন গুণগত পার্থক্য না থাকে; তাহলে কম্পনগুলির পারস্পরিক পার্থক্য নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। ফলে অভিজ্ঞতার পারস্পরিক পার্থক্য ব্যাখ্যা করাও সম্ভব হয় না।

(৩) জেম্‌স-এর মতে মস্তিষ্কে স্মৃতিরেখা অঙ্কিত হয় এবং স্মৃতিরেখাগুলির প্রভাবেই পুরাতন অভিজ্ঞতার স্মৃতি সম্ভব হয়। কিন্তু মস্তিষ্কে স্মৃতিরেখা অঙ্কিত হওয়ার বিষয়টি পরীক্ষণের দ্বারা সমর্থিত নয়।

(৪) মস্তিষ্ককেই যদি অভিজ্ঞতার সংরক্ষণ-কেন্দ্র বলে মনে করা যায়, তাহলে মানুষের জীবনে যে অসংখ্য অভিজ্ঞতা ঘটে, মস্তিষ্কের ক্ষুদ্র পরিসরে এত অভিজ্ঞতা কিভাবে সংরক্ষিত হতে পারে ?

(৫) এই মতবাদ অনুযায়ী মস্তিষ্কের মধ্যে পরিবর্তনই স্মৃতিকে সম্ভব করে তোলে; কাজেই স্মরণ-প্রক্রিয়াটি দৈহিক প্রতিক্রিয়া দ্বারা উদ্দীপ্ত হয়। এই মতবাদ জড়বাদের সমর্থক, সেহেতু জড়বাদের সব দোষ এই মতবাদেও বিদ্যমান।

(৬) জেম্‌স-এর মতে অভিজ্ঞতা মনের মধ্যে সংরক্ষিত হয় না, মনের বাইরে থেকে অর্থাৎ মস্তিষ্ক থেকে সেগুলি মনে আবির্ভূত হয়। কিন্তু প্রশ্ন হল, মনের মধ্যে যা সংরক্ষিত হয় না, তা মনের মধ্যে কিভাবে উদিত হতে পারে ?

(৭) মিল ও কারপেণ্টার অচেতন মস্তিষ্ক-ক্রিয়ার কথা বলেছেন, তাহলে সিদ্ধান্ত করতে হয়, সচেতন মস্তিষ্ক-ক্রিয়ার অস্তিত্ব আছে, কিন্তু তার অস্তিত্ব কি সম্ভব ?

(খ) **মনস্তাত্ত্বিক মতবাদ** (Psychological Theory : Theory of Sub conscious Mental Modification) : এই মতবাদ অনুসারে স্মৃতি দৈহিক প্রক্রিয়া নয়, মানসিক প্রক্রিয়া। অতীত অভিজ্ঞতাগুলি প্রতিরূপের আকারে মনের অবচেতন স্তরে (Sub-conscious level) রক্ষিত হয়। এই প্রতিরূপ বলতে বোঝায় অবচেতন মনের স্থায়ী পরিবর্তন (Sub-conscious Mental Modification)। অবশ্য এর সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কের সংগঠনেরও কিছু পরিবর্তন ঘটে। পরে প্রতিরূপগুলি অবচেতন স্তর থেকে আত্মপ্রকাশ করলেই আমরা অভিজ্ঞতাকে স্মরণ করতে পারি।

স্মৃতি দৈহিক প্রক্রিয়া নয়, মানসিক প্রক্রিয়া

মন্তব্য (Conclusion) : আমাদের মতে এই মতবাদই সন্তোষজনক। মনের অবচেতন স্তরের অনুমান ছাড়া স্মৃতিকে সন্তোষজনক ব্যাখ্যা করা যায় না। আমরা আগেই দেখেছি, যা চেতনার বহির্ভূত তা মনের বহির্ভূত নয়, কোন অভিজ্ঞতা যখন কোন চেতনার ক্ষেত্র থেকে দূরে সরে যাচ্ছে তখন মনের অবচেতন স্তরে একটি ছাপ হিসেবে সেটি সংরক্ষিত থাকে এবং ভবিষ্যতে কোন উদ্দীপক উপস্থিত হলে সেটি চেতনলোকে উদ্ভাসিত হয়।

মনস্তাত্ত্বিক মতবাদ সন্তোষজনক

৫। স্মরণক্রিয়ার শর্ত (Conditions of Remembering) :

স্মরণক্রিয়ার প্রধান দুটি উপাদান—(১) **সংরক্ষণ** বা **ধারণ** (Retention) এবং (২) **পুনরুদ্রেক** বা **পুনরাবৃত্তি** (Recall or Reproduction)। সুতরাং, স্মরণক্রিয়ার শর্ত হল আসলে সংরক্ষণ বা ধারণ এবং পুনরুদ্রেকের শর্ত। সোজা কথায় বলা যায়, কোন্ কোন্ অবস্থায় আমরা অভিজ্ঞতাকে মনে ধারণ করতে পারি এবং কোন্ কোন্ অবস্থায় তার পুনরুদ্রেক করতে পারি।

(i) সংরক্ষণের শর্তাবলী (Conditions of Retention) বা কোন্ কোন্ অবস্থায় বিষয়টি মনে ধারণ করতে পারি ?

প্রথমতঃ, দেহ ও মস্তিষ্কের সুস্থ ও সতেজ অবস্থা কোন ঘটনা বা অভিজ্ঞতাকে মনে ধারণ করার পক্ষে খুবই উপযোগী। দেহ যদি সুস্থ থাকে এবং সেই অবস্থায় যদি কোন কিছু শেখা যায় তাহলে তা সহজেই মনে রাখা সম্ভব হয়।

দেহ ও মস্তিষ্কের সুস্থ ও সতেজ অবস্থা

দ্বিতীয়তঃ, উদ্দীপকের তীব্রতার (intensity) ওপরও ধারণ করার শক্তি নির্ভর করে। বেশ জোরে কেউ যদি কথা বলে, খুব তীব্র আলোক যদি চোখে এসে পড়ে তাহলে সেগুলিকে দীর্ঘ সময়ের জন্য মনে ধরে রাখা যায়। ক্ষীণ আলোক বা ক্ষীণ স্বর মনে যে ছায়াপাত করে তা অধিক কাল ধরে রাখা যায় না।

তৃতীয়তঃ, উদ্দীপক যদি সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট (vivid and precise) হয় তাহলে বিষয়টিকে সহজেই মনে ধারণ করা যায়। যে চিত্রখানি বেশ স্পষ্ট, তাকে যেমন সহজ মনে ধারণ করা যায়, অস্পষ্ট রঙের কোন সংমিশ্রণের ছাপটি মনে সেভাবে মুদ্রিত করা যায় না।

উদ্দীপকের সুস্পষ্টতা ও সুনির্দিষ্টতা

চতুর্থতঃ, উদ্দীপকের দীর্ঘস্থায়িত্ব বিষয়টিকে মনে ধারণ করার অন্যতম উল্লেখযোগ্য শর্ত। যে গানের রেশ কয়েক সেকেণ্ডে মিলিয়ে যায় তাকে মনে রাখা যায় না। কিন্তু অধিক সময় ধরে যে গানের সুরটি কানে ভাসতে থাকে তাকে মনে ধরে রাখা যায়।

উদ্দীপকের দীর্ঘস্থায়িত্ব

পঞ্চমতঃ, উদ্দীপকের পৌনঃপুনিকতা (repetition or frequency) বিষয়বস্তুকে মনে ধরে রাখার পক্ষে সহায়ক। কতবার ঘটনাটি ঘটেছে তার ওপর ধারণক্রিয়া নির্ভর করে। অনেকবার একটি কবিতা পড়ে তবে তাকে আমরা মনে রাখতে পারি। শিক্ষক মহাশয় বার বার পাঠ্যবিষয়টি পুনরাবৃত্তি করে ছাত্রদের সেটি মনে রাখতে সহায়তা করেন।

উদ্দীপকের পৌনঃপুনিকতা

ষষ্ঠতঃ, উদ্দীপকের সাম্প্রতিকতা (recency) বিষয়টিকে মনে রাখতে সহায়তা করে। কতকাল পূর্বে ঘটনাটি ঘটেছে তাও বিষয়টিকে মনে ধারণ করার অন্যতম শর্ত। যে ঘটনাটি কয়েক মাস আগে ঘটেছে তাকে যেমন সহজেই মনে ধরে রাখতে পারি, যে ঘটনা দশ বছর আগে ঘটেছে তাকে তেমন করে ধরে রাখা যায় না, কালের গতিতে মন থেকে তা মুছে যায়।

উদ্দীপকের সাম্প্রতিকতা

সপ্তমতঃ, বিষয়বস্তুর প্রতি মনোযোগ (attention) বিষটিকে মনে ধরে রাখতে সহায়তা করে। কোন একটি পাঠ শেখার সময় যদি ছাত্রের সে বিষয়ে মনোযোগ না থাকে, তাহলে সে বিষয়টিকে মনে ধারণ করা যায় না।

মনোযোগ

অষ্টমতঃ, বিষয়বস্তুর প্রতি আগ্রহ ও অনুরাগও (interest) বিষয়টিকে মনে রাখার পক্ষে উপযোগী। সাধারণতঃ দেখা যায়, এক এক মানুষের এক এক বিষয়ে অনুরাগ থাকে। যার খেলাধূলার প্রতি অনুরাগ, সে বিভিন্ন খেলোয়াড়দের নামধাম, কবে কোথায় কোন্ খেলাটি হয়েছিল ইত্যাদি যত সহজে মনে ধরে রাখতে পারে, অন্য ব্যক্তির পক্ষে, যে সে-বিষয়ে অনুরাগী নয়, সেগুলিকে মনে রাখা সহজ নয়।

অনুরাগ

নবমতঃ, সংরক্ষণের ইচ্ছাও বিষয়টিকে মনে ধরে রাখতে অনেকখানি সহায়তা করে। শিখব মনে করে যে বিষয়টি পড়া যায়, সেটাকে সহজেই মনে রাখা যায়।

সংরক্ষণের ইচ্ছা

দশমতঃ, বিষয়বস্তুর মর্মোপলব্ধি বিষয়টিকে মনে ধারণ করার পক্ষে খুবই সহায়ক। ভাল করে না বুঝে কোন পাঠ্যবিষয় বার বার পড়লেও তাকে মনে রাখা যায় না। কিন্তু বিষয়বস্তুটির অর্থ ভাল করে বুঝে নিয়ে তার বিভিন্ন অংশের পারস্পরিক সংযোগের সম্পর্ক অবহিত হয়ে যদি বিষয়টিকে মনে রাখার চেষ্টা করা হয় তাহলে বিষয়টিকে সহজে মনে রাখা যায়। পাঠ্যবিষয় অর্থবোধক (meaningful) হলে সেটিকে সহজে আয়ত্ত করা যায় ও মনেও রাখা যায়।

বিষয়বস্তুর মর্মোপলব্ধি

একাদশতঃ, সংপ্রত্যক্ষ (apperception) সংরক্ষনের পক্ষে খুবই সহায়ক। সংপ্রত্যক্ষ মানে পুরাতন অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত করে বিষয়বস্তু প্রত্যক্ষ করা।

দ্বাদশতঃ, যেসব ব্যক্তির বুদ্ধ্যঙ্ক (I.Q.) অপেক্ষাকৃত বেশী তারা খুব তাড়াতাড়ি অধিক বিষয় শিক্ষা করতে পারে এবং মনে ধরে রাখতে পারে।

ত্রয়োদশতঃ, বিষয়বস্তুর আকর্ষণীয়তাও বিষটিকে সহজে মনে ধরে রাখতে সহায়তা করে। যে বিষয় চিত্তাকর্ষক বা হৃদয়গ্রাহী হয় তাকে সহজেই মনে ধরে রাখা যায়।

চতুর্দশতঃ, যে অভিজ্ঞতা ব্যক্তির কাছে তৃপ্তিকর (pleasant) তা দীর্ঘকাল মনে ধরে রাখা যায়। যে পাঠ্যবিষয় শিক্ষার্থীকে তৃপ্তি দেয়, শিক্ষার্থী সহজে সেটি আয়ত্ত করতে পারে এবং মনে রাখতে পারে।

সর্বশেষে, ঘটনার গুরুত্ব সহজেই ঘটনাকে মনে ধরে রাখতে সহায়তা করে। মানুষের জীবনে যে অজস্র ঘটনা ঘটে বা অসংখ্য অভিজ্ঞতা হয়ে থাকে তার কয়টিই বা সে মনে রাখতে পারে? যেসব ঘটনা গুরুত্বপূর্ণ, যেসব অভিজ্ঞতা উল্লেখযোগ্য, যেগুলি আমাদের মনের ওপর গভীর ছাপ রেখে যায়, যেগুলি প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে আমাদের ব্যক্তিত্বের ওপর প্রভাব বিস্তার করে, সেগুলিকেই সহজে মনে রাখা সম্ভব হয়। যে ব্যক্তির মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সুযোগ ঘটেছে সেই অভিজ্ঞতার কথা সে সুদীর্ঘকাল মনে রাখতে পারবে।

ঘটনার গুরুত্ব

এ ছাড়াও জীবনের কোন কোন অবস্থা বিষয়বস্তুর সংরক্ষণের পক্ষে উপযোগী বা অনুপযোগী। যেমন, শৈশবে যত শীঘ্র বিষয়বস্তু মুখস্থ করা চলে, বার্ধক্যে তেমন সম্ভব হয় না।

(ii) পুনরুদ্রেকের শর্তাবলী বা কোন্ কোন্ অবস্থায় বিষয়টির পুন-রুদ্রেক করা যায়?

কোন বিষয়ের পুনরুদ্রেক বিষয়বস্তুটিকে মনে ধারণ করার ওপর নির্ভর করে। সুতরাং যেসব অবস্থা বা শর্ত বিষয়বস্তুকে মনে ধারণ করার জন্য প্রয়োজন সেগুলি পুনরুদ্রেকের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

প্রথমতঃ, অভিভাবন (Suggestion) এবং অনুষঙ্গ (Association of Ideas) বিষয়টির পুনরুদ্রেকের পক্ষে সহায়ক। বিভিন্ন বিষয় বা ঘটনার প্রতিরূপগুলি আমাদের মনের মধ্যে অনুষঙ্গবদ্ধ হয়ে আছে। সে কারণে কোন একটি ঘটনা অভিভাবনের ফলে অন্য ঘটনাটির প্রতিরূপগুলিকে মনে জাগিয়ে তোলবার জন্য স্মৃতিচিহ্নরূপে কাজ করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, শৈশবে যে বিদ্যালয়ে পড়েছি. তার সামনে পরবর্তীকালে গিয়ে দাঁড়ালেই স্কুল-জীবনের স্মৃতি মনে এসে যায়। বন্ধুর দেওয়া আংটিটি বন্ধুর স্মৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করে।

অভিভাবন এবং অনুষঙ্গ

প্রতিরূপগুলির মধ্যে যথাযথ ও সুদৃঢ় অনুষঙ্গ প্রতিষ্ঠিত না হলে, একটি ঘটনা অপর একটি ঘটনার প্রতিরূপকে অভিভাবিত করতে পারে না। সান্নিধ্য অনুষঙ্গ যথাযথ ও সুদৃঢ় হয় যদি দুটি ঘটনার মধ্যে কালগত নৈকট্য .(Proximity in time) থাকে, যদি একাধিক ঘটনার মধ্যে দুটি ঘটনার প্রতি, সে ঘটনা যতই দূরবর্তী হোক না কেন, একসঙ্গে মনযোগী হই এবং দুটি ঘটনাকে একসঙ্গে বহুবার প্রত্যক্ষ করার সুযোগ হয়।

দ্বিতীয়তঃ, যে প্রসঙ্গে (Context) ঘটনাটি ঘটেছিল সেই প্রসঙ্গটিও ঘটনাটির পুনঃ-রুদ্রেক সহজ করে তোলে। কোন একটি ঘটনা মনে করতে চাইছি কিন্তু স্মরণ করতে পারছি না। কিন্তু যখনই মনে পড়ল যে ঘটনাটি আমার কলেজ জীবনের প্রথম দিনটিতে ঘটেছে এবং কোন অধ্যাপক মহাশয় আমাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার প্রসঙ্গে ঘটেছে তখনই ঘটনাটি মনে পড়ে গেল।

যে প্রসঙ্গে ঘটনাটি ঘটেছে

তৃতীয়তঃ, মনের অনুরাগ যে বিষয়ের ওপর নিবদ্ধ থাকে তার ওপরই নির্ভর করে কোন্ বিষয়টির পুনরুদ্রেক হবে। অনেকদিন পরে বাড়ি ফিরে যখন আলমারিতে সাজান বইগুলির দিকে তাকালাম, তখন সেই মুহূর্তে আমার অনুরাগ সেদিকে ধাবিত হল এবং সেই অনুযায়ী ঘটনার পুনরুদ্রেক হল অর্থাৎ আমার বইগুলির বিষয়বস্তুর কথা মনে আসতে লাগল। বইগুলি কোন্ দোকান থেকে কিনেছি সেকথা মনে জাগল বা বইগুলির কত দাম তাও মনে পড়তে লাগল। যে বিষয়টির প্রতি আমার অনুরাগ সেটিই নির্ধারণ করে দেবে যে কোন্ ঘটনাটির পুনরুদ্রেক হবে।

অনুরাগ

৬। **পুনরুদ্রেক বা পুনরুৎপাদন (Problem of Reproduction or Recall):**

স্মৃতি সম্ভব হয় যদি আমার মনের মধ্যে সংরক্ষিত বিষয়বস্তুকে প্রয়োজনমত পুনরুদ্রেক করতে পারি। কিন্তু এই পুনরুদ্রেক কিভাবে সম্ভব হয়? এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে, অভিভাবন প্রক্রিয়া (Process of Suggestion) এবং অনুষঙ্গের নিয়ম (Laws of Association) দ্বারাই একটি বিষয় আর একটি পুরাতন বিষয়কে মনে জাগিয়ে তোলে।

অভিভাবন ও অনুষঙ্গ

অভিভাবন প্রক্রিয়া বলতে কি বুঝি? অভিভাবন প্রক্রিয়া হল সেই প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে একটি প্রতিরূপ অপর একটি প্রতিরূপকে পুনরুদ্রিক্ত ও পুনরুৎপাদিত করে। অনুষঙ্গ হল একটি প্রত্যক্ষরূপ ও তার ধারণার মধ্যে সংযোগ বা একটি ধারণার সঙ্গে আর একটি ধারণার সংযোগ। উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে বুঝে নেওয়া যাক:

অনুষঙ্গ কাকে বলে?

আগ্রার তাজমহল ও তার স্রষ্টা সম্রাট শাহাজাহান। তাজমহলের কথা ভাবলেই শাহাজাহানের কথা মনে পড়ে যায়। উভয়ের মধ্যে যে মানসিক সংযোগ তাহাল অনুষঙ্গ এবং প্রথমটির প্রতিরূপ যে দ্বিতীয়টির প্রতিরূপকে অবচেতন মনের স্তর থেকে চেতন স্তরে টেনে নিয়ে আসছে তাকেই বলা হয় অভিভাবন প্রক্রিয়া।

অভিভাবন কাকে বলে?

অনুষঙ্গ নিয়ম এবং অভিভাবন প্রক্রিয়া ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে যুক্ত। দুটি বিষয়ের মধ্যে সংযোগ বা অনুষঙ্গ না থাকলে একটির আর একটিকে পুনরুদ্রেক করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। অনুষঙ্গ নিয়মের মাধ্যমেই অভিভাবন প্রক্রিয়া ক্রিয়া করে। প্রতিরূপগুলি অনুষঙ্গ নিয়মে আবদ্ধ বলেই ওদের একটি অপরটিকে অভিভাবিত (suggest) করতে পারে। যেমন তাজমহলের প্রতিরূপ শাহাজাহানের প্রতিরূপ অভিভাবিত করে, কারণ তাজমহলের সঙ্গে শাহাজাহান অনুষঙ্গ নিয়মে আবদ্ধ। সুতরাং, আমাদের অভিজ্ঞতা কিভাবে অনুষঙ্গবদ্ধ হয় তার আলোচনা করলেই অভিজ্ঞতার পুনরুদ্রেক কিভাবে হয় তা জানা যাবে।

অভিভাবন ও অনুষঙ্গ ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত

যে নিয়ম অনুসারে পূর্ব অভিজ্ঞতালব্ধ প্রতিরূপগুলি পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হয় এবং এই সম্বন্ধের মধ্যে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয় তাকে অনুষঙ্গ নিয়ম বলে।

আধুনিক মনোবিদ্যায় তিন প্রকার অনুষঙ্গ নিয়ম স্বীকৃত হয়েছে, যথা—

(১) **সান্নিধ্য অনুষঙ্গ নিয়ম** (Law of Contiguity), (২) **সাদৃশ্য অনুষঙ্গ নিয়ম** (Law of Association by Similarity) এবং (৩) **বৈপরীত্য অনুষঙ্গ নিয়ম** (Law of Association by Contrast)—এই তিন প্রকারের অনুষঙ্গের ভিত্তিতে আমরা তিনটি নিয়ম পাই। যথা—

অনুষঙ্গের তিনটি নীতি

(১) **সান্নিধ্য অনুষঙ্গ নিয়ম** (Law of Contiguity) : অতীতে যে সব বস্তু স্থানের কালের দিক থেকে পরস্পরের কাছাকাছি রূপে জ্ঞাত হয়েছে, তাদের প্রতিরূপগুলি সান্নিধ্য অনুষঙ্গ নিয়ম অনুসারে অনুষঙ্গবদ্ধ হয় এবং একটির প্রতিরূপ মনে জাগলে অপরটির প্রতিরূপও মনে জেগে ওঠে। যেমন, কমলালেবুর প্রতিরূপ তার মিষ্টি আস্বাদ ও গন্ধের প্রতিরূপের কথা মনে জাগিয়ে তোলে। হেমলেটের প্রতিরূপ শেক্সপীয়ারের প্রতিরূপ মনে জাগিয়ে তোলে; শান্তিনিকেতনের প্রতিরূপের কথা মনে হলে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের প্রতিরূপের কথা মনে পড়ে যায়। এই সান্নিধ্য দুরকমের হতে পারে : (i) **স্থানগত সান্নিধ্য** (Spatial Contiguity) এবং (ii) **কালগত সান্নিধ্য** (Temporal Contiguity)। স্থানগত সান্নিধ্যের উদাহরণ—যেমন, হাওড়া ব্রীজ ও হাওড়া ষ্টেশন, বোলপুর ও শান্তিনিকেতন। কালগত সান্নিধ্যের উদাহরণ,—বিদ্যুতের চমক ও বজ্রধ্বনি। হাওড়া ব্রীজ এবং হাওড়া ষ্টেশন পরস্পরের কাছাকাছি। এদের একই সঙ্গে আমরা বহুবার প্রত্যক্ষ করেছি, কাজেই স্থানগত নৈকট্য বা সান্নিধ্যের

সান্নিধ্য অনুষঙ্গ নিয়ম

স্থানগত ও কালগত সান্নিধ্য

জন্য উভয়ের প্রতিরূপের মধ্যে অনুষঙ্গ স্থাপিত হয়। আবার বিদ্যুৎ চমকাবার অব্যবহিত পরেই আমরা বজ্রধ্বনি শুনতে পাই। এই অভিজ্ঞতা আমাদের বহুবার হয়েছে, কাজেই কালগত নৈকট্যের জন্য উভয় প্রতিরূপের মধ্যে অনুষঙ্গ স্থাপিত হয়েছে।

(২) **সাদৃশ্য-অনুষঙ্গ নিয়ম** (Law of Similiarity) : যদি দুই বা ততোধিক বস্তুর মধ্যে আকারগত বা প্রকৃতিগত সাদৃশ্য থাকে, একটি অপরটির সদৃশরূপে জ্ঞাত হয়, তাহলে প্রতিরূপগুলিও পরস্পরের সদৃশ হওয়ার জন্য পরস্পরের সঙ্গে অনুষঙ্গবদ্ধ হয়। একটির প্রতিরূপ অপরটির কথা মনে জাগিয়ে তোলে। রামের সঙ্গে শ্যামের আকৃতিগত সাদৃশ্য পূর্বে জ্ঞাত হয়েছি, সে কারণে রামকে দেখলেই শ্যামের কথা মনে পড়ে যায়।

(গ) **বৈপরীত্য অনুষঙ্গ নিয়ম** (Law of Contrast) : দুটি বিষয়ের মধ্যে বৈপরীত্য থাকলে একটির প্রতিরূপ অপর প্রতিরূপকে মনে জাগিয়ে তোলে। যেমন—জীবনের দুঃখের দিনগুলির কথা মনে করলে সুখের দিনগুলির কথা মনে জেগে ওঠে। অমাবস্যার অন্ধকার রাত্রি পূর্ণিমার জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রির কথা মনে করিয়ে দেয়। সুন্দর-কুৎসিতের কথা, আলো-অন্ধকারের কথা, মোটা লোক রোগা লোকের কথা মনে জাগিয়ে তোলে।

৭। অনুষঙ্গ নীতিগুলির পারস্পরিক সম্বন্ধ (Inter-relation of Laws of Association) :

কোন নীতিটি মৌলিক

পূর্বোক্ত তিনটি অনুষঙ্গ নিয়ম ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বন্ধযুক্ত। অনেকে মনে করেন এই তিনটি অনুষঙ্গ নিয়ম মৌলিক। কিন্তু এ সম্পর্কে মনোবিদ্দের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। প্রশ্ন হল, এই তিনটি অনুষঙ্গ নিয়মের মধ্যে কোন্ নিয়মটি মৌলিক ?

বৈপরীত্য-অনুষঙ্গ নিয়ম মৌলিক নিয়ম হতে পারে না :

বৈপরীত্য সম্বন্ধীয় নীতি, মৌলিক নীতি নয়

বৈপরীত্য অনুষঙ্গ নিয়ম (Law of Contrast) স্বতন্ত্র ও মৌলিক নীতি হতে পারে না। এক হিসেবে বৈপরীত্য-অনুষঙ্গ নিয়মকে সাদৃশ্য-অনুষঙ্গ নিয়মের (Law of Similarity) প্রকারভেদ বলেই মনে করা যেতে পারে। 'সাদা ও কালো' এই রঙ দুটিকে আমরা পরস্পরের বিপরীত বলে মনে করি। কিন্তু এই বৈপরীত্যের পেছনে সাদৃশ্য আছে, কেননা, সাদা ও কালো উভয়ই বর্ণ, সুতরাং উভয়ের মধ্যে জাতিগত (generic) সাদৃশ্য আছে। অনুরূপভাবে, সুখ আমাদের দুঃখের কথা মনে করিয়ে দেয়, কারণ সুখ হল দুঃখের বিপরীত। কিন্তু এখানেও সাদৃশ্য-অনুষঙ্গ নিয়মের ক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়, সুখ-দুঃখ উভয়ই অনুভূতি, এখানেও জাতিগত সাদৃশ্য আছে।

মনোবিদ্ টিচনার (Titchener)-এর মতে বৈপরীত্য-অনুষঙ্গ নিয়ম সাদৃশ্য-অনুষঙ্গ নিয়মের প্রকারভেদ—এ যুক্তি মনোবিজ্ঞানসম্মত নয়। সাদা কালোর প্রতিরূপ জাগিয়ে তোলে, যেহেতু উভয়ই বর্ণের অন্তর্ভুক্ত এবং উভয়ের মধ্যে জাতিগত সাদৃশ্য আছে, কিন্তু অন্তর্দর্শনে এই বর্ণ ধরা পড়ে না। তাছাড়া, সাদৃশ্য-অনুষঙ্গ চিন্তামূলক, বৈপরীত্য-অনুষঙ্গ অনুভূতিমূলক; কেননা বৈপরীত্য-অনুষঙ্গে বিরোধিতার বেদনা উপস্থিত থাকে। টিচনারের মতে বৈপরীত্য অনুষঙ্গ নিয়ম সান্নিধ্য-অনুষঙ্গ নিয়মের (Law of Contiguity) প্রকারভেদ; কেননা দুটি বিপরীত বিষয়ের ধারণার মধ্যে সান্নিধ্য আছে এবং ধারণা দুটি একসঙ্গে মনের মধ্যে গঠিত হয়, যেমন, অন্ধকারের ধারণা ছাড়া আলোর জ্ঞান হয় না।

এখন সাদৃশ্য-অনুষঙ্গ নিয়ম (Law of Similarity) এবং সান্নিধ্য-অনুষঙ্গ নিয়ম (Law of Contiguity)—এই দুটির মধ্যে কোন্‌টি মৌলিক, সেটিই হল প্রশ্ন—এ বিষয়ে মনোবিদ্‌দের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়।

মনোবিদ্ স্পেন্সারের (Spencer) মতে সাদৃশ্য-অনুষঙ্গ নিয়ম হল মৌলিক নিয়ম এবং সান্নিধ্য-অনুষঙ্গ নিয়মের মধ্যে মূলতঃ সাদৃশ্য-অনুষঙ্গ নিয়মই ক্রিয়া করে। স্থানগত সান্নিধ্যের মূলে আছে স্থানগত সাদৃশ্য এবং কালগত সান্নিধ্যের মূলে আছে কালগত সাদৃশ্য। আমি পূর্বে রাম ও যদুকে একসঙ্গে বহুবার প্রত্যক্ষ করেছি। স্থানগত সান্নিধ্যের জন্য রাম ও যদুর প্রতিরূপের মধ্যে অনুষঙ্গ স্থাপিত হয়েছে এবং রামকে দেখলে যদুর প্রতিরূপ মনে জেগে ওঠে। আসলে আমি যখন রামকে প্রত্যক্ষ করলাম, তখন মনের অবচেতন স্তরে রামের যে প্রতিচ্ছবিটি রয়েছে, রামের প্রত্যক্ষরূপের সঙ্গে সাদৃশ্যবশতঃ সেটি মনের মধ্যে পুনরুজ্জীবিত হল এবং রামের প্রতিরূপের সঙ্গে সান্নিধ্য সম্বন্ধে অনুসঙ্গ-বদ্ধ হয়ে আছে যদুর প্রতিরূপ, সেহেতু যদুর প্রতিরূপও মনে ভেসে উঠল।

স্পেন্সার-এর মতে সাদৃশ্য-সম্বন্ধীয় নীতিই হল মৌলিক নীতি

মনোবিদ্ জেম্‌স (James)-এর মতে সান্নিধ্য-অনুষঙ্গ নিয়ম (Law of Contiguity) হল মূল-নিয়ম এবং এই নিয়মের সাহায্যেই সাদৃশ্য-অনুসঙ্গ নিয়মকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। জেম্‌স-এর মতে সাদৃশ্য-অনুষঙ্গ নিয়মটি ক্রিয়া করতে পারে, কেননা দুটি সদৃশ বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য অধিকমাত্রায় থাকলেও আংশিক পার্থক্য থাকে। যেমন, 'হরেন' নামটি শুনলে 'হরেশ'এর কথা মনে পড়ে। উভয় নামের অক্ষরের মধ্যে সাদৃশ্য আছে 'হরে' শব্দটিকে নিয়ে। কাজেই 'হরেন' শব্দটির 'হরে' শুনলেই 'হরেশ' শব্দটির 'হরে'-র কথা মনে পড়ে যায় এবং শেষের 'হরে' শব্দটির সঙ্গে সান্নিধ্য সম্পর্কে সম্পর্কযুক্ত হয়ে রয়েছে

জেমস-এর অভিমত অনুযায়ী নৈকট্য সম্বন্ধীয় নীতিই হল মূল নীতি

'শ' অক্ষরটি, কাজেই সান্নিধ্য-অনুষঙ্গ নিয়ম অনুসারে অবশিষ্ট অক্ষর 'শ'-টি মনে পড়ল। শেষোক্ত নিয়মের জন্যই হরেন 'হরেশ'কে মনে করিয়ে দিল।

কোন্ অভিমত যুক্তিযুক্ত ?

পূর্বোক্ত অভিমত দুটির কোনটিই যুক্তিযুক্ত নয়। 'নৈকট্য-সম্বন্ধীয় নীতি' এবং 'সাদৃশ্য সম্বন্ধীয় নীতি,—এই দুটি হল ভিন্ন নীতি এবং একটিকে আর একটি থেকে অনুসৃত করা চলে না।

হ্যামিলটন-এর সামগ্রীকরণ-সম্বন্ধীয় নীতি

হ্যামিলটন (Hamilton) পূর্বোক্ত দুটি নিয়মকে একটি মূল নিয়মের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এই নিয়মটির নাম হল পুনঃসমকালন নিয়ম (Law of Redintegration)[1]। এই নিয়মের অর্থ হল—একটি সমগ্র অভিজ্ঞতার অংশ-বিশেষ যদি মনে পড়ে তাহলে সেই অংশবিশেষ সমগ্র অভিজ্ঞতাটিকেই মনের মধ্যে পুনরুজ্জীবিত করে তোলে। যেমন—বোলপুর, শান্তিনিকেতন সব মিলে আমার একটি সমগ্র অভিজ্ঞতা আছে। কাজেই বোলপুরের প্রতিরূপ মনে জাগলে শান্তিনিকেতনের প্রতিরূপ মনে জাগে। বিভিন্ন অভিজ্ঞতা একত্রে অনুভূত হলে, মনের সামগ্রিক অবস্থার (A whole mental state) অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। কাজেই মনের এই সামগ্রিক অবস্থার অংশবিশেষ মনের সামগ্রিক অবস্থাটিকে না জাগিয়ে, অন্য অংশ-বিশেষকে জাগাতে পারে না। বস্তুতঃ, আমাদের মনের ধর্ম হল বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত করে তার সুশৃঙ্খল, সুসংবদ্ধ সামগ্রিক রূপকে মনের মধ্যে ধরে রাখা।

হ্যামিলটনের মতে সন্নিধ্য-অনুষঙ্গ নিয়ম, সাদৃশ্য-অনুষঙ্গ নিয়ম এবং বৈপরীত্য-অনুষঙ্গ নিয়ম—এই তিনটি নিয়মকেই পুনঃসমগ্রীকরণ সম্বন্ধীয় নিয়মের অন্তর্ভুক্ত করা চলে।

৮। স্মৃতি-প্রখরতার লক্ষণ (Marks of good Memory):

স্মৃতি প্রখরতার লক্ষণ

স্মৃতিপ্রখরতা বলতে বোঝায় স্মরণশক্তির তীব্রতা অর্থাৎ স্বল্পায়াসে বিষয়বস্তুকে মনে সংরক্ষিত করা এবং প্রয়োজনমত তার পুনরুদ্রেক করা। স্মৃতি-প্রখরতা অর্থে কোন এক বা একাধিক বিশেষ ঘটনা স্বল্পায়াসে স্মরণ করার কথা বোঝায় না। স্মৃতি-প্রখরতার কতকগুলি লক্ষণ আছে। নিম্নে সেগুলি আলোচনা করা হচ্ছে:

(ক) **স্বল্পায়াসে এবং দ্রুত বিষয়বস্তু আয়ত্ত করা** (Ease and rapidity of learning): যে ব্যক্তির স্মৃতি খুবই প্রখর সে অল্প চেষ্টায় এবং খুব দ্রুত বিষয়বস্তু আয়ত্ত করতে পারে। অনেক সময় দেখা যায় কোন একটি ছাত্র একটি পাঠ দশবার

[1. Latin: Red=again, integrate=to make whole]

পড়েও আয়ত্ত করতে পারছে না ; সেক্ষেত্রে ছাত্রটির স্মৃতিশক্তির প্রখরতা নেই বলেই স্বীকার করতে হবে। অবশ্য এই শক্তি একান্তভাবে নির্ভর করে বিষয়বস্তুর প্রতি মনোযোগ এবং অনুরাগের ওপর। পাঠ্য বিষয়বস্তুটি যদি তৃপ্তিদায়ক হয় তাহলে তাকে অল্প প্রচেষ্টায় এবং দ্রুত আয়ত্ত করা যেতে পারে।

(খ) **দীর্ঘ সময় ধরে বিষয়বস্তুটিকে মনে সংরক্ষিত করা** (Long duration of retention) : যে ব্যক্তির স্মৃতি খুবই প্রখর সে যে কেবল স্বল্পায়াসে বিষয়বস্তুকে আয়ত্ত করতে পারে তা নয়, বিষয়বস্তুকে আয়ত্ত করার পর সুদীর্ঘ সময় ধরে তাকে মনে সংরক্ষিত করতে পারে। অবশ্য বিষয়বস্তুর সংরক্ষণের দীর্ঘস্থায়িত্ব বিষয়বস্তুর প্রতি অনুরাগ, বিষয়বস্তুর আলোচনার পৌনঃপুনিকতা ও ব্যক্তির সহজাত মানসিক প্রবণতার ওপর নির্ভর করে।

(গ) **দ্রুত এবং যথাযথভাবে পুনরুদ্রেক করা** (Rapidity and accuracy of reproduction) : যে ব্যক্তির স্মৃতি প্রখর, সে যে কেবলমাত্র স্বল্পায়াসে এবং দ্রুত বিষয়বস্তু আয়ত্ত করে মনে সংরক্ষিত করতে পারে তা নয়, প্রয়োজনমত, দ্রুত এবং যথাযথ-ভাবে বিষয়বস্তুর পুনরুদ্রেক করার শক্তিরও অধিকারী। প্রয়োজনমত বিষয়বস্তুর পুনরুদ্রেক করতে না পারলে সেটিকে আয়ত্ত করার কোন অর্থই হয় না। যে ছাত্র পরীক্ষা চলাকালীন কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে সমর্থ হয় না, অথচ পরীক্ষা-গৃহের বাইরে এসে বিষয়বস্তুটিকে স্মরণ করল; তার স্মৃতিশক্তিকে প্রখর বলা যেতে পারে না।

(ঘ) **প্রয়োজনমত দ্রুত প্রাসঙ্গিক পুনরুদ্রেক করা বা স্মরণক্রিয়ার কার্যকারিতা** (Re-serviceableness of memory) : যে ব্যক্তির স্মৃতি প্রখর সে ব্যক্তি প্রয়োজনমত প্রাসঙ্গিক বিষয়বস্তুটিকে স্মরণ করতে পারে। যে প্রসঙ্গে যে বিষয়-বস্তুটিকে স্মরণ করা দরকার তা যদি করা না যায়, তাহলে স্মৃতিশক্তিকে প্রখর বলা যেতে পারে না। যে ব্যক্তির স্মৃতিশক্তি প্রখর সে ব্যক্তি অপ্রয়োজনীয় অংশ বাদ দিয়ে প্রয়োজনীয় অংশ অনায়াসে এবং যথাযথভাবে পুনরুৎপাদন করতে পারে।

৯। স্মরণক্রিয়াকে কি অনুশীলনের সহায়তায় উন্নত করা যেতে পারে? (Can memory be improved by practice ?) :

বিষয়টিকে কেন্দ্র করে মনোবিদদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি যে শিক্ষা, সংরক্ষণ এবং পুনরুদ্রেক হল স্মরণক্রিয়ার বিভিন্ন উপাদান। মনোবিদ্ জেম্‌স (James)-এর মতে অভিজ্ঞতাকে সংরক্ষিত করার ক্ষমতা মানুষের জন্মগত

ক্ষমতা ; একে পরিবর্তন করা যায় না। তার মতে অভিজ্ঞতার সংরক্ষণের ব্যাপারটি মানসিক ঘটনা নয়, দৈহিক ঘটনা (physiological phenomena) এবং দেহযন্ত্রের মাধ্যমে এই ক্রিয়াটি সম্পন্ন হয়, সেহেতু অনুশীলনের সহায়তায় স্মরণক্রিয়াকে উন্নত করা সম্ভব নয়। শারীরিক সুস্থতার ওপর সংরক্ষণের বিষয়টি কিছু পরিমাণে নির্ভরশীল হলেও এবং শারীরিক সুস্থতা ও অসুস্থতা অনুসারে স্মৃতিশক্তির হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটলেও অনুশীলনের মাধ্যমে এর উন্নতি সম্ভব নয়। তবে জেম্স (James) স্বীকার করেন যে, আমাদের মনোযোগ ও অনুরাগ বাড়িয়ে দিয়ে বিষয়বস্তুকে আমরা তাড়াতাড়ি আয়ত্ত করতে পারি।

জেম্স-এর মতে অনুশীলনের সহায়তায় স্মরণক্রিয়াকে উন্নত করা সম্ভব নয়

মনোবিদ্ স্টাউট (Stout)-এর মতে অনুশীলনের ফলে সাধারণ স্মরণক্রিয়ার উন্নতি সম্ভব নয়, তবে অনুশীলনের সহায়তায় কোন একটি বিশেষ দিকে স্মরণক্রিয়ার উন্নতি সম্ভব। এজন্যই অভিনেতারা অভিনয়ে, পাদ্রীরা ধর্মোপদেশে এবং অধ্যাপকেরা তাঁদের বক্তৃতা বিষয়ে স্মরণশক্তির উন্নতি করতে পারেন। অবশ্য এক্ষেত্রেও মনোযোগ, অনুরাগ ও উভয়ের অনুষঙ্গই পরোক্ষভাবে স্মরণক্রিয়াকে উন্নত করে।

স্টাউট-এর মতে অনুশীলনের দ্বারা বিশেষ কোন একটি দিকে স্মরণ ক্রিয়ার উন্নতি সম্ভব

মনোবিদ্ জেমস্-এর মতে এসব ক্ষেত্রে অনুশীলনের মাধ্যমে প্রকৃত স্মরণ ক্রিয়ার কোন উন্নতি সাধিত হচ্ছে না। বিষয়বস্তুটিকে আয়ত্ত করার পদ্ধতির, যেমন মনোযোগ, অনুরাগ প্রভৃতি আনুষঙ্গিক কারণগুলির উন্নতি সাধিত হচ্ছে মাত্র।

কিন্তু মনোবিদ্ স্টাউট (Stout)-এর অভিমত সমর্থন করে আমরা একথা বলতে পারি যে, সাধারণভাবে স্মরণক্রিয়াকে উন্নত করা না গেলেও যেহেতু আনুষঙ্গিক কারণ-গুলির উন্নতির জন্য কোন বিশেষ বিষয়ে সংরক্ষণ দৃঢ়তর এবং পুনরুদ্রেক দ্রুততর হয়, কোন একটি বিশেষ দিকে অনুশীলনের মাধ্যমে স্মৃতির উন্নতি সম্ভব। তবে সে উন্নতি পরোক্ষ এবং শর্তসাপেক্ষ ; সেহেতু মনোযোগ, অনুরাগ এবং ভাবগুলির পারস্পরিক অনুষঙ্গই স্মরণক্রিয়াকে উন্নত করতে সহায়তা করে।

স্টাউটের অভিমত সমর্থনযোগ্য

১০। শিক্ষণ ও স্মরণক্রিয়া (Learning and Memory) :

স্মৃতি বা স্মরণক্রিয়াকে অনুশীলনের সহায়তায় উন্নত করা যেতে পারে কিনা, এই প্রশ্নটি বিতর্কমূলক হলেও শিক্ষা গ্রহণ করার পদ্ধতিকে নানাভাবে উন্নত করা যায়।

কিন্তু প্রশ্ন হল, শিক্ষার সঙ্গে স্মরণক্রিয়ার সম্পর্ক কি? মনোবিদ্ উডওয়ার্থ (Woodworth) স্মরণক্রিয়ার চারটি অংশের কথা উল্লেখ করেছেন—(১) শিক্ষণ, (২) সংরক্ষণ, (৩) পুনরুদ্রেক এবং (৪) প্রত্যভিজ্ঞা। সুতরাং শিক্ষণ স্মরণক্রিয়ার একটি পূর্ববর্তী শর্ত (antecedent condition)। শিক্ষণের এভাবে সংজ্ঞা দেওয়া যেতে পারে যে, শিক্ষণ হল কোন একটি ঘটনাকে এমনভাবে পর্যবেক্ষণ করা বা কোন একটি কার্য এমনভাবে সম্পাদন করা যাতে অব্যবহিত পরেই তাকে স্মরণ করা যেতে পারে। কাজেই শিক্ষণকে স্মরণক্রিয়ার অংশরূপে গণ্য না করে, স্মরণক্রিয়ার মাধ্যমেই শিক্ষণের যাচাই হয়, একথা বলাই যুক্তিযুক্ত। কিন্তু যেহেতু মানসিক প্রক্রিয়াগুলি পরস্পরের সঙ্গে মিশে যায় এবং শিক্ষণ ও সংরক্ষণ বা শিক্ষণ ও পুনরুদ্রেক, অর্থাৎ পাঠ এবং আবৃত্তি, একটির পর আর একটি ঘটতে থাকে, সেহেতু ব্যবহারিক দিক থেকে শিক্ষণকে স্মরণক্রিয়ার একটি অংশ এবং সে হিসেবে তার প্রথম স্তর বলেই গণ্য করা সুবিধাজনক।

স্মরণক্রিয়ার চারটি অংশ

শিক্ষণ অনেক ক্ষেত্রে অনৈচ্ছিক হতে পাবে—যেমন সঙ্গীতের প্রতি সহজাত অনুরাগ আছে এমন কোন বালক কোন একটি গান শোনার অব্যবহিত পরে সেটি গেয়ে লোককে চমৎকৃত করে দিতে পারে। আবার শিক্ষণ ঐচ্ছিকও হতে পারে—যেমন, সেই একই বালক কোন একটি কবিতা বার বার পড়ে স্মৃতিতে ধরে রাখার জন্য চেষ্টা করতে পারে। এই শিক্ষণ যখন ঐচ্ছিক হয়, তখনই আমরা কোন বিষয় স্মৃতিতে সংরক্ষিত করার কথা বলে থাকি (committing to memory or memorising)।

শিক্ষণ ঐচ্ছিক এবং অনৈচ্ছিক

১১। স্বল্পায়াসে শিক্ষণ ও স্মরণ রাখার পদ্ধতি (Methods of Economy in learning and memorization) :

প্রশ্ন হল, কিভাবে শিক্ষা করলে খুব অল্প আয়াসে কোন বিষয় মনে ধরে রাখা যায়? এ সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট নীতির কথা বলা যেতে পারে না, যেগুলি সকলের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য হতে পারে। তবে সাধারণভাবে কয়েকটি নীতির আলোচনা করা যেতে পারে :

(i) **যুক্তিপূর্ণ** বা **অর্থপূর্ণ শিক্ষণ পদ্ধতি** (Logical Method):

পাঠ্য বিষয়টির অর্থ ভাল করে বুঝে নিয়ে সেটি শিক্ষা করলে সেটিকে দীর্ঘকাল মনে রাখা সম্ভব। পাঠ্য বিষয়বস্তুর ভাবগুলিকে সুসংবদ্ধ করে, অন্য ভাবের সঙ্গে তার সাদৃশ্য এবং কার্যকারণ সম্পর্কটি নির্ধারণ করে বিষয়টি শিক্ষা করলে সেটি দীর্ঘদিন স্মরণে থাকে।

(ii) **আবৃত্তি পদ্ধতি** (Recitation): স্থায়িভাবে কোন বিষয়কে মনে ধরে রাখার জন্য আবৃত্তি খুবই কার্যকর। কোন একটি বিষয় পড়ার ফাঁকে ফাঁকে কয়েকবার যদি বিষয়টিকে নিজের কাছে আবৃত্তি করা যায় তাহলে কি সাময়িকভাবে বা কি দীর্ঘ-কালের জন্য পাঠ্য বিষয়টিকে মনে সংরক্ষণ করা যায়। কোন্ অংশটি অধিগত হয়নি আবৃত্তিতে তা ধরা পড়ে এবং সে অংশ যে আবার পাঠ করা প্রয়োজন তা বোঝা যায়। আবৃত্তি মূল্যবান সময়ের অপচয় বন্ধ করে এবং বিষয়টিকে মনের মধ্যে গেঁথে দেয়।

(iii) **সময়ের ব্যবধানে পুনরাবৃত্তি** (Spaced Repetition): একবারেই একটি পাঠ শিক্ষা করার চেয়ে যদি কিছু সময়ের ব্যবধান রেখে আবার সেটি পাঠ করা যায় তাহলে সহজেই বিষয়টিকে মনের মধ্যে সংরক্ষিত করা যায়। যেমন, একটি বিষয় একেবারে মুখস্থ করার চেষ্টা না করে যদি কয়দিন ধরে দিনে দু-তিনবার করে পড়া যায় তাহলে সেটিকে মনে রাখা সহজসাধ্য হয়। এর কারণ একটানা পরিশ্রমে মস্তিষ্ক ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং কিছুটা বিশ্রাম পেলে মস্তিষ্কের ক্রিয়াশক্তি বর্ধিত হয়।

(iv) **সমগ্র অবধারণ পদ্ধতি ও অংশ অবধারণ পদ্ধতি** (Whole versus Part Learning Method): কোন দীর্ঘ ও জটিল পাঠ্যবিষয় আয়ত্ত করার জন্য তাকে সমগ্র হিসেবে শিক্ষা করলে সুফল পাওয়া যায়, অথবা তাকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করে পৃথক পৃথকভাবে আয়ত্ত করলে সুফল পাওয়া যায়। এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যেতে পারে যে, উভয় পদ্ধতিই সময় অনুযায়ী সুফল দান করে। তবে সাধারণভাবে বলা যেতে পারে যে, সমগ্র অবধারণ পদ্ধতিই অধিক কার্যকর। এই পদ্ধতি অধিক কার্যকর হওয়ার কারণ, এই পদ্ধতিতে প্রত্যেকটি অংশকে অপরাপর অংশের সঙ্গে সংযুক্ত বা অনুষঙ্গরূপে শিক্ষা করা হয়। যে পাঠ্যসূচীর বিষয়গুলি পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত, সেক্ষেত্রে অংশ অবধারণ পদ্ধতি সুফল দান করে না, কারণ অংশগুলিকে পৃথকভাবে শিক্ষা করার জন্য তাদের মধ্যে অনুষঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হয় না এবং একটি অংশ অপরটির স্মারক হয় না। যে ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর মধ্যে কোন ঘনিষ্ঠ সংযোগ নেই সেক্ষেত্রে অংশ অবধারণ পদ্ধতি ভাল ফল দেয়। যেমন, নামতার ক্ষেত্রে এক এক ঘরের নামতা আলাদাভাবে শিখলে সহজেই মুখস্থ হয়।

(v) **অধিশিক্ষণ ও পর্যালোচনা** (Overlearning and Review): এবিংহস্ (Ebbinghaus)-এর অভিমতানুযায়ী নির্ভুল পুনরাবৃত্তির জন্য যতবার শিক্ষা করা দরকার তার অধিক যে-কোন শিক্ষণই হল অধিশিক্ষণ। যেমন, কোন ব্যক্তি পনেরবার পড়ার ফলে হয়ত একটি কবিতা মুখস্থ করতে এবং তা নির্ভুলভাবে আবৃত্তি করতে পারে। এখন ঐ ব্যক্তি যদি আরও দশবার ঐ কবিতাটি পাঠ করে তাহলে কবিতাটির অধিশিক্ষণ হবে।

পাঠ্যবিষয়কে অধিশিক্ষণের সহায়তায় মনে দৃঢ়ভাবে সংরক্ষিত করা যায় এবং মাঝে মাঝে পাঠ্যবিষয়ের পর্যালোচনা (review) করলে বিষয়বস্তুর পুনরুজ্জীবন ও পুনরুদ্রেক সহজতর হয়।[1]

(vi) **শ্রেণীগঠন পদ্ধতি** (Classification Method): শিক্ষণীয় বিষয়কে শ্রেণীবদ্ধ করে শিক্ষা করলে সেটি সহজে স্মরণ রাখা সম্ভব হয়। যেমন—৬৫, ৭৫, ৮৫ সংখ্যাকে যত সহজে মনে রাখা যাবে, ৬২, ৪১, ৮৭-কে তত সহজে মনে রাখা যাবে না।

(vii) **স্মৃতি সঙ্কেত:** কোন সঙ্কেত বা স্মৃতি-সহায়ক ছড়ার সহায়তা গ্রহণ করলে বিষয়বস্তু তাড়াতাড়ি স্মরণ করা যায়।

(viii) **শিক্ষা করার জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প** (The will or intention to learn): ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কিছু শিক্ষা করতে গেলে তার থেকে কখনও ভাল ফল পাওয়া যায় না। কোন কিছু শিক্ষা করার জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প থাকা চাই এবং দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে কোন কিছু আয়ত্ত করার চেষ্টা করলে তা অতি সহজেই আয়ত্ত করা যায়।

১২। বিস্মৃতি (Forgetfulness):

পূর্বে শিক্ষা করা হয়েছে এমন কোন বিষয় স্মরণ করার ক্ষমতার স্থায়ী বা সাময়িক অভাবকেই বিস্মরণ বলে।

(ক) **বিস্মৃতির উপকারিতা:** স্মৃতি এবং বিস্মৃতি উভয়ই আমাদের জীবনে খুব স্বাভাবিক ঘটনা। বিষয়বস্তুকে যদি মনে ধরে রাখতে পারি, তাহলেই তা স্মরণে আসে আর যদি তাকে ধরে রাখতে না পারি তাহলেই তা ভুলে যাই।

স্মৃতিরও যেমন প্রয়োজন আছে, বিস্মৃতিরও ঠিক তেমনি প্রয়োজন আছে। রিবট (Ribbort)-এর মতে স্মৃতির জন্য বিস্মৃতির প্রয়োজন। আমাদের মানসিক শক্তি সীমাবদ্ধ। অজস্র বিষয়বস্তুকে স্মরণ রাখা মনের পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই অনাবশ্যক ও অপ্রয়োজনীয় বিষয় যদি বিস্মৃত না হই তবে প্রয়োজনীয় এবং নতুন বিষয় মনে ধরে রাখা কিভাবে সম্ভব? কাজেই বিস্মৃতি অনাবশ্যক ও অপ্রয়োজনীয় বিষয়কে মন থেকে দূরে সরিয়ে দিয়ে নতুন বিষয় স্মরণ রাখতে সাহায্য করে। তাছাড়া, কোন ছাত্র কোন বিষয় শিখতে গিয়ে অসতর্কতাবশতঃ কতকগুলি ভুল বিষয় শিখে ফেলেছে। এখন এই ভুলগুলি

স্মৃতির মতো বিস্মৃতিরও প্রয়োজন আছে

1, বিস্তারিত আলোচনার জন্য H. E Garrett-এর Great Experiments in Psychology; Page 122 দ্রষ্টব্য।

যদি সে বিস্মৃত না হয় তবে তার পক্ষে শুদ্ধ বিষয়গুলি শিক্ষা করা কখনও সম্ভব হবে না। এ ছাড়াও আমাদের জীবনের সব অভিজ্ঞতাই তৃপ্তিদায়ক নয়; এমন অনেক অভিজ্ঞতা আছে যেগুলি খুবই 'বেদনাদায়ক—যেমন, প্রিয়জনের মৃত্যু, কর্মে ব্যর্থতা, বন্ধুর সঙ্গে মনোমালিন্য ইত্যাদি। এই জাতীয় অভিজ্ঞতাগুলি যদি আমরা বিস্মৃত না হই, তাহলে আমাদের সমস্ত জীবন দুর্বিসহ যন্ত্রণায় জ্বলে-পুড়ে মরতে হয়। কাজেই বিস্মৃতি মানসিক জীবনকে সুস্থ ও স্বাভাবিক করে তুলতে সহায়তা করে।

(খ) বিস্মৃতির অপকারিতা: প্রয়োজনীয় ও প্রাসঙ্গিক বিষয় বিস্মৃত হলে মানুষকে ক্ষতিগ্রস্থ হতে হয়।

(গ) **বিস্মরণের কারণ** (Causes of Forgetting): প্রশ্ন হল, আমরা ভুলে যাই কেন? ভুলে যাওয়ার কারণ কি? এর পশ্চাতে একাধিক কারণ বর্তমান।

যে অবস্থাগুলি স্মৃতির সহায়ক সেগুলির অভাব বিস্মৃতির কারণ

উদ্দীপক যদি তীব্র, সুস্পষ্ট, সুনির্দিষ্ট, দীর্ঘস্থায়ী ও পৌনঃপুনিক হয়; উদ্দীপক যদি আমাদের মনোযোগ ও অনুরাগ আকর্ষণ করে এবং উদ্দীপকের ক্রিয়ার সময়টি যদি সম্প্রতি ঘটে থাকে তবে বিষয়টিকে আমরা মনে ধরে রাখতে পারি। যেহেতু পূর্বোক্ত অবস্থাগুলি স্মৃতির সহায়ক সেহেতু পূর্বোক্ত অবস্থার অভাব বিস্মৃতির সূচনা করে।

উদ্দীপক সম্পর্কীয় ত্রুটি ছাড়াও বিস্মৃতির আরও কয়েকটি কারণ আছে। নিম্নে এগুলি পর পর আলোচিত হল:

(১) **পর্যালোচনার অভাব** (Lack of Review): (যে-কোন বিষয়বস্তুর আলোচনার অভাব সেটিকে বিস্মৃত হবার অন্যতম কারণ। পাঠ্যবিষয় মনে রাখার জন্য সেগুলিকে মাঝে মাঝে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। আলোচনার অভাবে কালের গতিতে বিষয়টি ধীরে ধীরে মন থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায়।)

অবশ্য মনোবিদ্‌রা আলোচনার অভাবকে বিস্মৃতির কারণ বলে মনে করেন না। কারণ, অনেক সময় আলোচনার অভাবেও বিষয়টি মনে সংরক্ষিত থাকে। এমনও দেখা যায়, যে কাহিনী মন থেকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গেছে বলে মনে করি, আকস্মিকভাবে মনে তা জেগে উঠেছে।

(২) **পশ্চাদ্‌মুখী বাধ** (Retroactive Inhibition): পরবর্তীকালে অধীত বিষয়ের পূর্বজ্ঞাত বিষয়ের স্মৃতিপথে জাগরিত হওয়ার পক্ষে বাধা সৃষ্টি করাকে বলা হয় 'পশ্চাদ্‌মুখী বাধ' (retroactive inhibition)। কোন বিষয় শিক্ষা করার সময় প্রথমটি শেখার পর কিছুটা বিরতি দিয়ে তবে দ্বিতীয়টা শিক্ষা করতে হয়। কিন্তু কোন একটি বিষয়ে শেখার পরই যদি কিছু সময়ের বিরতি না দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আর একটি বিষয়

শিখি তাহলে দেখা যাবে যে, প্রথম বিষয়টির অংশবিশেষ ভুলে গেছি। এর কারণ, দ্বিতীয় বিষয়টি প্রথম বিষয়টি মনে রাখার পক্ষে বাধার সৃষ্টি করছে এবং পিছন দিক থেকে এসে প্রথম বিষয়টিকে ভুলিয়ে দিচ্ছে। কোন ছাত্র যদি প্রথমে একটি কবিতা মুখস্থ করে এবং সময়ের কোন বিরতি না দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসের একটি অংশ মুখস্থ করে তাহলে প্রথমটি মুখস্থ আছে কিনা পরীক্ষা করে দেখতে গিয়ে দেখতে পাওয়া যাবে যে, তার অংশ-বিশেষ সে ভুলে গেছে।

(৩) **আঘাত** (Shock) : মস্তিষ্কে আঘাত লাগার জন্য বিস্মৃতি দেখা দিতে পারে। এই জাতীয় বিস্মৃতিকে বলা হয় 'অস্মার' বা 'আঘাতজনিত' স্মৃতিবিলোপ (Shock Amnesia)। দুর্ঘটনা, খেলাধূলা, যুদ্ধের সময় গোলাগুলির বিস্ফোরণ এই জাতীয় আঘাত সৃষ্টি করতে পারে। যুদ্ধের সময় দেখা গেছে বোমার বিস্ফোরণের শব্দে মস্তিষ্কে আঘাত পেয়ে অনেক সৈনিক তাদের নামধাম ভুলে গেছে।

(৪) **অবদমন** (Repression) : ফ্রয়েড এবং তাঁর অনুগামীরা মনে করেন যে, স্মরণ করার অনিচ্ছা থেকেই বিস্মৃতি আসে। কোন ব্যক্তিকে হয়ত কোন কারণে আমরা পছন্দ করি না, দেখা যায় তার কথা আমরা ধীরে ধীরে ভুলে গেছি। একে বলা হয় অবদমন। অবদমন প্রক্রিয়া মনকে বেদনাদায়ক এবং অস্বস্তিকর অভিজ্ঞতার হাত থেকে রক্ষা করে।

(৫) **যথাযথ অনুষঙ্গ এবং অভিভাবন শক্তির অভাব** (Want of proper association and suggestive forces) : আমাদের অভিজ্ঞতাগুলি অনুষঙ্গের প্রভাবে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। কাজেই বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে যদি এই অনুষঙ্গের অভাব ঘটে তাহলে একটি ঘটনা অভিভাবন প্রক্রিয়ার দ্বারা আর একটি ঘটনাকে মনে জাগিয়ে তুলতে পারে না।

আমাদের অভিজ্ঞতাগুলির ছাপ চেতন মন থেকে ধীরে ধীরে চলে যায় অবচেতন মনে। কালের গতিতে এ ছাপ ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হয়ে আসে এবং অন্যান্য ঘটনার সঙ্গে এগুলির সংযোগসূত্রও হয়ে আসে ক্ষীণ। তার ফলে বিস্মৃতি ঘটে।

(৬) **পারিপার্শ্বিকের পরিবর্তন** (Change of Environment) : এক-একটি বিশেষ পরিবেশে আমরা এক-একটি বিষয় শিক্ষা করি। অনেক সময় পরিবেশের পরিবর্তন ঘটলে বিষয়টি আমরা ভুলে যেতে পারি। ঘরে বসে যে ছাত্র একটি বিষয় শিখে নির্ভুলভাবে তার উত্তর দিতে পারে, স্কুলের ক্লাসে বা পরীক্ষার হলে সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে সে বিষয়বস্তু ভুলে যায়।

(৭) **আবেগজনিত প্রতিরোধ** (Emotional Blocking) : সময় সময় বিভিন্ন আবেগ ; যেমন—রাগ, ক্রোধ, ঘৃণা প্রভৃতি মনের মধ্যে জেগে উঠে আমাদের মনে এমন অস্বাভাবিক উত্তেজনার সৃষ্টি করে যে, ভাল করে আয়ত্ত করা হয়েছে এমন বিষয়ও আমরা স্মরণে আনতে পারি না।

(৮) **মনোযোগ এবং অনুরাগের অভাব :** যদি কোন বিষয়ের প্রতি আমাদের অনুরাগ না থাকে তাহলে সে বিষয় আমরা অতি সহজেই ভুলে যাই। তাছাড়া, মনোযোগ সহকারে যদি কোন বিষয় আয়ত্ত করার চেষ্টা না করি তাহলে বিষয়টি সহজেই বিস্মৃত হবার সম্ভাবনা থাকে।

(৯) **দেহ ও মস্তিষ্কের অসুস্থতা :** অসুস্থ দেহ নিয়ে ও ক্লান্ত মস্তিষ্কে যদি আমরা কোন কিছু স্মরণ করতে চাই তাহলে দেখা যায় আমরা কিছুতেই বিষয়টি স্মরণে আনতে পারছি না। নেশাকারক বস্তুর দীর্ঘকাল ব্যবহার মস্তিষ্ককে দুর্বল করে বিস্মৃতি ঘটাতে পারে।

(১০) **বাচনিক অনুষঙ্গের** (Verbal Association) **অভাব :** মনোবিদ্ ওয়াটসন (Watson)-এর মতে ভাষার অভাব অথবা বাচনিক অনুষঙ্গের অভাব বিস্মৃতির কারণ। শৈশবের প্রথম কয়েক বছরের অভিজ্ঞতা যে আমরা স্মরণ করতে পারি না তার কারণ ভাষার অভাবের জন্য।

পূর্বোক্ত কারণগুলি ছাড়াও বিস্মৃতির আরও অন্যান্য কারণ আছে। সকল প্রকার বিস্মৃতি একটি মাত্র কারণের দ্বারা ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। ঘটনা বিশেষে বিস্মৃতির কারণ ভিন্নরূপ হয়ে থাকে।

১৩। স্মৃতি সম্বন্ধে পরীক্ষণ (Experiments in Memory) :

মনোবিদ্ এবিংহস্ স্মৃতি এবং বিস্মৃতি সম্পর্কীয় বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে সর্বপ্রথম পরীক্ষণকার্য চালান। তাঁর পরিচালিত পরীক্ষণ কার্যগুলি থেকে অনেক মূল্যবান তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। এই সব পরীক্ষণের ক্ষেত্রে তিনিই একাধারে পরীক্ষক এবং পক্ষান্তরে পরীক্ষণ-পাত্র। পরীক্ষার উপকরণ হিসেবে তিনি কতকগুলি অর্থহীন শব্দসমষ্টি (nonesense syllables, যেমন—woke, pam, zurt bip, seg) এবং সংখ্যা (digits) গ্রহণ করেন। অর্থযুক্ত শব্দসমষ্টি নিয়ে পরীক্ষণ-কার্য চালানোর অসুবিধা হল এই যে, শব্দ যদি অর্থবোধক হয়, তাহলে অর্থের সাহায্যে শব্দটিকে সহজে মনে রাখা সম্ভব হয়, কিন্তু অর্থহীন শব্দসমষ্টির ক্ষেত্রে পূর্ব থেকে কোন

শব্দের সংখ্যা যত বেশী হবে, সেটি আয়ত্ত করার জন্য তত অধিক সময়ের প্রয়োজন

রকম অনুষঙ্গের সম্ভাবনা থাকে না। এবিংহস্ পরিচালিত পরীক্ষণের কয়েকটি উদাহরণ নীচে দেওয়া হচ্ছে :

(i) **পাঠ্যবিষয়ের দৈর্ঘ্য এবং মোট শিক্ষা করার জন্য কতখানি সময় লাগে** (The amount of material to be memorised and the time and effort required to learn it) : মনোবিদ্ এবিংহস্ পাঠ্যবিষয়ের দৈর্ঘ্য এবং তা শিক্ষা করার জন্য কতকখানি সময় লাগতে পারে সে সম্পর্কে একটি পরীক্ষণ পরিচালনা করেন। তিনি কতকগুলি অর্থহীন শব্দ নিয়ে মুখস্থ করার জন্য সচেষ্ট হলেন। তিনি তখনই বিষয়টিকে আয়ত্ত হয়েছে বুঝতে পারবেন যখন তিনি সব কয়টি শব্দ, অর্থাৎ অর্থহীন শব্দসমষ্টির তালিকাটি নির্ভুলভাবে পুনরাবৃত্তি করতে পারবেন।

এবিংহস্ তাঁর পরীক্ষণের মাধ্যমে যে ফলাফল লক্ষ্য করলেন তা হল এই যে, অর্থহীন শব্দসমষ্টির তালিকায় শব্দের সংখ্যা যত অধিক হয় সেটি মুখস্থ করতে তত বেশী সময় লাগে এবং সেটিকে অধিকবার আবৃত্তি করার প্রয়োজন হয়। আর শব্দের সংখ্যা যত কম থাকে, সেটিকে মুখস্থ করতে তত কম সময় লাগে এবং সেই অনুপাতে আবৃত্তির সংখ্যাও অনেক কম লাগে।

সাতটি অর্থহীন শব্দ নিয়ে গঠিত শব্দসমষ্টি মুখস্থ করতে এবিংহস্‌কে একবার মাত্র আবৃত্তি করতে হয় এবং সময় লেগেছিল মোট ৩ সেকেণ্ড, অর্থাৎ প্রতি শব্দ পিছু গড়ে ৪ সেকেণ্ড। বারটি শব্দ নিয়ে গঠিত শব্দসমষ্টি আয়ত্ত করতে সতের বার আবৃত্তির প্রয়োজন হয়েছিল, সময় লেগেছিল ছত্রিশ সেকেণ্ড, প্রতি শব্দ পিছু গড়ে সময় লেগেছিল ৬·৮ সেকেণ্ড। আর ৩৬টি শব্দ নিয়ে গঠিত শব্দসমষ্টি আয়ত্ত করার জন্য পঞ্চাশবার আবৃত্তি করতে হয় এবং মোট সময় লাগে ৭৯২ সেকেণ্ড, প্রতি শব্দ পিছু গড়ে সময় লাগে ২২ সেকেণ্ড।

পূর্বোক্ত পরীক্ষণ থেকে একটি বিষয় জানা গেল যে, শব্দের সংখ্যা যত বেশী হবে, আয়ত্ত করার জন্য তত অধিক সময়ের প্রয়োজন হবে। সুতরাং, পাঠ্যতালিকা যদি দীর্ঘ হয়, সেটি আয়ত্ত করতে হলে, প্রতি শব্দ পিছু অধিক সময় ব্যয় করতে হয় এবং বেশীবার পুনরাবৃত্তিরও প্রয়োজন হয়।

(ii) **সঞ্চয় প্রণালীর সাহায্যে স্মৃতি পরীক্ষণ** (Memorization by Saving Method) : পরীক্ষক একটি অর্থহীন বর্ণসমষ্টির তালিকা পরীক্ষার্থীর সামনে আবৃত্তি করে যাবেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না পরীক্ষার্থী সম্পূর্ণ তালিকাটি নির্ভুলভাবে পুনরাবৃত্তি করতে পারছে। দেখা গেল, পরীক্ষণপাত্র ১২ বারে সম্পূর্ণ তালিকাটি নির্ভুলভাবে আবৃত্তি করতে পারল। ৩৪ ঘণ্টা পরে পরীক্ষক পরীক্ষার্থীকে আগের যে শব্দ-তালিকাটি সে

আয়ত্ত করেছে তার কতটা মনে আছে পরীক্ষা করে দেখলেন। দেখা গেল, ১৩টি শব্দের মধ্যে ৩টি শব্দ তার মনে আছে। পরীক্ষক আবার আগের দিনের মতো তালিকাটি পরীক্ষার্থীর সামনে আবৃত্তি করে যাবেন যতক্ষণ পর্যন্ত না পরীক্ষণ-পাত্র সম্পূর্ণ তালিকাটি আবার আয়ত্ত করতে পারে। দেখা গেল, দ্বিতীয় দিন তালিকাটি আয়ত্ত করতে তাঁকে অনেক কম বার আবৃত্তি করতে হয়েছে এবং তার অনেক কম সময় লেগেছে। দ্বিতীয়বার পরীক্ষা করে দেখা গেল পরীক্ষণ-পাত্র ৭ বারে সম্পূর্ণ তালিকাটি নির্ভুলভাবে আবৃত্তি করতে পারল। কিন্তু প্রথমবার পরীক্ষণ-পাত্রের লেগেছিল ১২ বার। অতএব পরীক্ষণ-পাত্র বাঁচাতে পেরেছে ১২—৭ = ৫ বার এবং পরীক্ষার্থীর মোট সঞ্চয় হল ১২তে পাঁচ বা ৪১·৭%। একেই বলে সঞ্চয় পদ্ধতির সাহায্যে স্মৃতি-পরীক্ষণ।

(iii) **আমরা কি হারে ভুলে যাই?—তার পরীক্ষণ বা শিক্ষণ ও পুনরুদ্রেকের মধ্যে সময়ের ব্যবধান সংক্রান্ত পরীক্ষণ** (Time interval between Learning and Recall) **:** কোন বিষয় শিক্ষা করার অব্যবহিত পরেই বিস্মৃতি বেশী মাত্রায় এবং দ্রুত ঘটে। ক্রমশঃ তা কম মাত্রায় এবং মন্দগতিতে ঘটে থাকে। যদি একটি অর্থহীন শব্দের তালিকা—যেমন, (lut, fom, bot, muz, roz) মুখস্থ করার পরে কিছু সময়ের বিরতি দিয়ে সেটা স্মরণ করার চেষ্টা করা হয়, তাহলে দেখা যাবে যে, সম্পূর্ণ তালিকাটি আমরা স্মরণ করতে পারছি না, অংশবিশেষ ভুলে গেছি। কত সময় পরে কতটুকু স্মরণ করতে পারি, আর কতটুকু ভুলে যাই তা নিম্নে বর্ণিত মনোবিদ্ এবিংহস্-এর তালিকা থেকে জানা যাবে।

শোনা ও মনে করার মধ্যে সময়ের ব্যবধান	**মনে রাখার শতকরা হার**	**ভুলে যাওয়ার শতকরা হার**
২০ মিনিট	৫৮	৪২
১ ঘণ্টা	৪৪	৫৬
৯ ঘণ্টা	৩৬	৬৪
২৪ ঘণ্টা	৩৪	৬৬
২ দিন	২৮	৭২
৬ দিন	২৫	৭৫
৩১ দিন	২১	৭০

উপরিউক্ত তালিকা লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, প্রথম দিকে অর্থাৎ ২০ মিনিট থেকে ২ দিনের ব্যবধানে ভুলে যাওয়ার হার দ্রুত হচ্ছে ; কিন্তু তারপর অর্থাৎ ২ দিন থেকে ৩১ দিনের ব্যবধানে ভুলে যাওয়ার হার ক্রমশঃ কমে যাচ্ছে।

(iv) **স্মৃতি-প্রসর** (Memory-Span) **সম্বন্ধে পরীক্ষা :** একবারে কতটুকু মনের মধ্যে রাখা যায় ?

কতকগুলি অর্থহীন বর্ণসমষ্টি বা সংখ্যা একবার পরীক্ষণ-পাত্রের কাছে উপস্থাপিত করার পর পরীক্ষণ-পাত্র যতটুকু মনের মধ্যে ধরে রেখে তার নির্ভুল ও সুশৃঙ্খল পুনরাবৃত্তি করতে পারে তাকেই স্মৃতি-প্রসর (memory-span) বলে। এই পরীক্ষণের দ্বারা জানা যায় বিভিন্ন ব্যক্তি কত বেশী সংখ্যক সংখ্যা বা অক্ষর শুধু একবার দেখার বা শোনবার পর মনে রাখতে পারে এবং নির্ভুলভাবে পুনরাবৃত্তি করতে পারে। কোন ব্যক্তির স্মৃতির প্রসর নির্ণয় করতে হলে তাকে এমন সংখ্যার সারি বা অক্ষরের সারি দেওয়া হয় যার দৈর্ঘ্য ক্রমশঃ বাড়িয়ে যাওয়া হয় এবং পরীক্ষা করে দেখা হয় পরীক্ষণ-পাত্র কতদূর পর্যন্ত নির্ভুলভাবে আবৃত্তি করতে পারে। পরীক্ষক ৬টি বিভিন্ন তালিকা তৈরি করবেন, তন্মধ্যে প্রথমটি ৩টি অঙ্কের বা ৩টি অক্ষরের হবে এবং প্রতি লাইনে একটি করে সংখ্যা বাড়াতে বাড়াতে শেষ লাইনে অঙ্কের বা অক্ষরের সংখ্যা হবে ১২টি। তালিকাগুলি তৈরি করার সময় মনে রাখতে হবে যে, প্রথম লাইনের শেষ সংখ্যা বা বর্ণ যেন দ্বিতীয় লাইনের প্রথম অক্ষর বা সংখ্যা না হয়। পরীক্ষণ পাত্র অক্ষর বা সংখ্যাগুলি দেখার বা শোনার পর কতদূর স্মরণ করতে পারছে তা তাকে বলতে বা কাগজে লিখতে বলা হয়।

সংখ্যা-সারি	**অক্ষর-সারি**
৬ ৩ ৯	প ক ভ
৮ ২ ৫ ৪	র ধ গ ন
৬ ১ ৩ ৭ ৯	ল ব ত ম চ
৪ ২ ৬ ৮ ৩ ৫	ট প ঞ ঝ থ চ
৭ ৪ ৯ ১ ২ ৬ ৩	র দ হ ফ জ ক ঠ
৮ ২ ৫ ৪ ৩ ৭ ৯ ১	প ত ন ঞ চ ঝ ই অ
৪ ৫ ৬ ৩ ৯ ৮ ৭ ২ ১	উ ঐ ট হ থ ন ম স ধ
৫ ৬ ৮ ৯ ৪ ৩ ২ ১ ৭ ৯	প ক জ ঝ ঋ থ ক ম ঞ ভ
৮ ৭ ৬ ৩ ২ ১ ৪ ৫ ৪ ৬ ৭	জ ক ই উ ঋ ৯ গ ক ব ঞ ঝ
৯ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১ ৬ ২	থ প ল জ শ হ স র ড ণ ঝ গ

বয়স অনুযায়ী স্মৃতি-প্রসরের তারতম্য ঘটে। শ্রবণের দ্বারা স্মৃতি অনুশীলন এবং দর্শনের দ্বারা স্মৃতি অনুশীলন সংক্রান্ত পরীক্ষণকার্য চালিয়ে দেখা গেছে যে, ৪ থেকে ৬ বছরের শিশুর গড়ে স্মৃতি-প্রসর হল ৪টি সংখ্যা, ৬ থেকে ৮ বছরের শিশুর হল ৫টি সংখ্যা,

৯ থেকে ১২ বছরের ৬টি সংখ্যা এবং ১২ বছরের উর্ধ্বে ৭টি সংখ্যা।[1] মানসিক অবস্থা, মনোযোগ, অনুশীলন ও স্ত্রী-পুরুষভেদেও স্মৃতি-প্রসরের তারতম্য দেখা যায়।

(v) **আংশিকভাবে শিখলে বেশী মনে থাকে—না, সম্পূর্ণ শিখলে বেশী মনে থাকে—তার পরীক্ষণ** (To determine the capacity of memorization by part and whole method of learning) : অর্থহীন বর্ণসমষ্টির ১০টি অক্ষরবিশিষ্ট একটি তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। সেটি পরীক্ষণ-পাত্রকে দু'রকমভাবে শিখতে বলা হবে। সম্পূর্ণ তালিকাটি পরপর পড়ে একেবারে মুখস্থ করতে হবে। আবার তালিকাটি কয়েকটি অংশে ভাগ করে দিয়ে আংশিকভাবে মুখস্থ করে সম্পূর্ণ তালিকাটি মুখস্থ করতে হবে। এই পরীক্ষণকার্য কবিতার সাহায্যেও করা যেতে পারে। যেমন, প্রথমে পরীক্ষণ-পাত্রকে নির্দেশ দিতে হবে যে, পুরো কবিতাটি বার বার পড়ে মুখস্থ করার। তারপর কবিতাটি ছোট ছোট তিন চার ভাগে বিভক্ত করে নিয়ে একভাগ একভাগ করে মুখস্থ করলেই পুরো মুখস্থ হয়ে যাবে। স্টপওয়াচ (stop-watch)-এর সাহায্যে শেখার সময় লিখে রাখতে হবে। একবার পড়েই পরীক্ষণ-পাত্রকে সেটা পুনরাবৃত্তি করার চেষ্টা করতে হবে। যদি আটকে যায় তাহলে আবার প্রথম থেকে পড়তে হবে। যতবার পড়বে তার সংখ্যা লিখে রাখতে হবে আর মুখস্থ হবার পরে সময়টা দেখে নিতে হবে।

এরূপ পরীক্ষণের সাহায্যে দেখা যায়, সম্পূর্ণ শিক্ষণ পদ্ধতি (whole method)-র সাহায্যে আমরা তাড়াতাড়ি মুখস্থ করতে পারি।

(vi) পশ্চাৎমুখী বাধ সম্পর্কে পরীক্ষণ (Examination on Retroactive inhibition) : কোন বিষয় শিক্ষা করার সময় প্রথমটি শেখার পর কিছুটা বিরতি দিয়ে তবে দ্বিতীয়টি শিক্ষা করতে হয়। কিন্তু কোন একটি বিষয় শেখার পরেই যদি কিছু সময়ের বিরতি না দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আর একটি বিষয় আমরা শিখি তাহলে দেখা যায় প্রথম বিষয়টির অংশবিশেষের বিস্মরণ ঘটে। এর কারণ দ্বিতীয় বিষয়টি প্রথম বিষয়টিকে মনে রাখার পক্ষে বাধার সৃষ্টি করছে এবং পিছন দিক থেকে এসে প্রথম বিষয়টিকে ভুলিয়ে দিচ্ছে। একেই বলা হয় 'পশ্চাৎমুখী বাধ' (Retroactive inhibition)।

---

1. Memory-span differs with the type of material used, For example, the average span for auditory presentation and vocal recall of digits is four between four and five years, five between six and eight years, six between nine and twelve years and seven beyond twelve years."

—Munn : Psychology , Page 265.

এ সম্পর্কে পরীক্ষণকার্য চালাবার জন্য দুদল পরীক্ষণ-পাত্র প্রয়োজন, যারা মোটামুটি বয়স, লেখাপড়া এবং বুদ্ধির দিক থেকে সমকক্ষ। প্রথম দলটিকে একটি তালিকা মুখস্থ করতে দেওয়া হল এবং তারপর দ্বিতীয় একটি তালিকা মুখস্থ করার জন্য বলা হল। তারপর প্রথম তালিকার বিষয়বস্তু পুনরাবৃত্তি করার জন্য বলা হল। দ্বিতীয় দলটিকে প্রথম তালিকাটি মুখস্থ করার পর দ্বিতীয় তালিকাটি মুখস্থ করতে না বলে, কিছুক্ষণ বিশ্রাম করতে বলা হল। দেখা গেল যে, বিশ্রামের জন্য দ্বিতীয় দলটির ক্ষেত্রে প্রথম দলের তুলনায় বিস্মৃতির সংখ্যা খুবই কম।

Questions

1. Distinguish between Memory Image and the Image of Imagination.

2. Explain the nature of memory and distinguish it from imagination.

3. Explain and illustrate what are the factors involved in memory ?

4. Elucidate the main factors of memory. What do you mean by the serviceableness of memory ?

5. How are past experiences retained in the mind and how are they revived ? Discuss fully.

6. Explain fully the Laws of Association. Can the Laws be reduced to one single law ?

7. Explain the Laws of Association and indicate their importance in recollection.

8. Discuss the laws that determine our recall of past experiences.

9. What are the marks of good memory ? Can memory be improved by practice ?

10. What are the conditions of memory ? Is memory an exact reproduction of past experiences ? How do emotions and attitudes influence memory ?

11. Distinguish between Good memory and Bad memory.

12. What is memory ? Explain the methods of economy in memorising with the help of experimental evidences.

13. What are the principles of economy in learning and memorization ?

14. Describe the process of memorising. For economy in memorising, say a poem, what methods have been suggested through experiments ?

15. What is forgetfulness ? What are the grounds of forgetfulness ? Is forgetfulness always an evil ? Explain in this connection symptoms of some diseases of memory.

16. What are the grounds of forgetfulness ? Does the unconscious play any part in brniging about forgetfulness ?

17. What is the psychology of forgetfulness ? Explain its causes and remedies. Point out the main contributions of Ebbinghaus to the problem of forgetfulness.

18. State the findings of Ebbinghau's experiments in memory

19. Distinguish between recall and recognition.

20. Describe various methods of memorising and the points of advantage and disadvantage of each.

21. What is Memory span ? How can it be measured ?

22. Describe some experiments that have been conducted on forgetting of learned materials. What is over learning ?

23. State and explain the results of Ebbinghaus's experiments on memory.

24. Discuss how our experiences are conserved in the mind What ate the marks of good memory ?

25. What is memory ? Clearly distinguish between memory image and the imagination. Give examples.

26. What is the process of recall ? Explain after Freud, how unconscious motivation blocks recall.

27. Write notes on : (1) Law of Contiguity (2) Amnesia (3) Laws of Association, (4) Good memory, (5) The Law of Redintegration. (6) Forgetting.

অষ্টম অধ্যায়

শিক্ষণ

(Learning)

১। ভূমিকা (Introduction) :

পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করে চলতে না পারলে কোন প্রাণীর পক্ষেই এই জগতে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখা সম্ভব হয় না। প্রাণী কতকগুলি সহজাত প্রবৃত্তির অধিকারী। এগুলি প্রকৃতির দান। এই সহজাত প্রবৃত্তির বশে প্রাণী যেসব সাহজিক ক্রিয়া সম্পন্ন করে, সেগুলি প্রাণীকে তার জীবনের কতকগুলি মৌলিক প্রয়োজন চরিতার্থ করতে সহায়তা করে। আবার কতকগুলি প্রতিবর্ত ক্রিয়া প্রাণী সম্পন্ন করে, যেগুলিকে শিক্ষার দ্বারা আয়ত্ত করার প্রয়োজন হয় না। এইসব প্রতিবর্ত ক্রিয়া প্রাণীর আত্মরক্ষার সহায়ক। কিন্তু পরিবেশ সদা পরিবর্তনশীল এবং সেহেতু বিচিত্র পরিবেশের বিভিন্ন শক্তি প্রাণীর ওপর বিভিন্নভাবে ক্রিয়া করে। পরিবর্তনশীল পরিবেশের ওপর প্রতিক্রিয়া করে তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে না পারলে, প্রাণীকে জীবন সংগ্রামে পরাজয় বরণ করে নিতে হয়। এমনকি, পৃথিবীর বুকে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখাই তার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। সেই কারণেই প্রাণীকে তার পরিবেশের উপযোগী নিত্য নতুন আচরণ সম্পন্ন করতে হয়। নতুন নতুন আচরণ সম্পন্ন করা, অর্থাৎ নতুন কিছু আয়ত্ত করাই হল শিক্ষার লক্ষ্য। প্রাণীর অতীত অভিজ্ঞতাই প্রাণীকে নতুন আচরণ সম্পন্ন করার জন্য এবং নতুন বিষয় আয়ত্ত করার জন্য সহায়তা করে। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, অতীত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে নতুন বিষয় আয়ত্ত করাই হল শিক্ষণ। ইতর প্রাণীর ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা যায় যে, কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি জীবজন্তু অতীত অভিজ্ঞতার সহায়তায় নতুন পরিস্থিতিতে আচরণ সম্পন্ন করার জন্য নতুন কৌশল আয়ত্ত করতে শেখে।

নতুন বিষয় আয়ত্ত করাই হল শিক্ষণ

মনুষ্যেতর প্রাণীর মতো মানুষও প্রকৃতির দানের অধিকারী। মানুষও সাহজিক ক্রিয়া সম্পন্ন করে। মানুষের ক্ষেত্রেও প্রতিবর্ত ক্রিয়া তার আত্মরক্ষায় সহায়তা করে। কিন্তু এই জাতীয় আচরণ মানুষের জীবন ধারণের জন্য এবং জীবনকে সুন্দর করে তোলার পক্ষে মোটেই পর্যাপ্ত নয়। মানুষের এই শিক্ষণ-ক্রিয়া শুরু হয় শৈশব থেকে এবং মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত স্থায়ী হয়। মানুষের শেখার কোন শেষ নেই। কথায় বলে, 'যতদিন বাঁচি,

ততদিন শিখি'। মানুষের সমস্ত জীবন ধরে এই শেখার কাজ চলতে থাকে। শৈশবকাল অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গে আমরা অনেক নতুন কিছু শিক্ষা করি। যেমন—নানা ধরনের খেলাধুলা, সাইকেল চালান, সাঁতার কাটা ইত্যাদি। তাছাড়াও পরিবেশ সম্পর্কে আমরা নতুন নতুন ধারণা গঠন করতে শিক্ষা করি। শিক্ষার সাহায্যে আমরা বাহ্যজগৎ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানকে সুসংবদ্ধ করে তুলি।

মানুষের ক্ষেত্রে এই শিক্ষণ-প্রক্রিয়া অনেক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, শিক্ষণের সাহায্যে যদি আমরা আমাদের জ্ঞানের ভাণ্ডারকে ভরিয়ে না তুলি তাহলে আমাদের পক্ষে জীবন ধারণই অসম্ভব হয়ে পড়ে। শৈশব অবস্থাতেই আমরা আমাদের দেহের ক্ষতিসাধন করে এমন খাদ্যবস্তু বর্জন করি, শরীরের উপযোগী খাদ্যই কেবলমাত্র গ্রহণ করি। দৈনন্দিন জীবনে নানারকম বিপদ-আপদ থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য আমাদের শিক্ষালাভ করতে হয়। জীবিকা নির্বাহ করার জন্য কোন বৃত্তি শিক্ষা করতে হয়, সমাজের রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, নৈতিক আদর্শ সম্পর্কে আমাদের অনেক কিছু শিক্ষা করতে হয়। আবার ছাত্র হিসেবে কিভাবে শিক্ষা করব তাও আমাদের শিক্ষা করতে হয়। নানারকম পদ্ধতি অনুসরণ করেই আমাদের এইসব শিক্ষা করতে হয়। সে কারণে মনোবিদ্‌রা শিক্ষণ-সম্পর্কীয় নানাবিধ সূত্রগুলির সন্ধান করার চেষ্টা করেছেন। সাম্প্রতিক শিক্ষণ সম্পর্কীয় বিভিন্ন সমস্যার ওপর গবেষণা চালিয়ে মনোবিদ্‌রা সকলেই উপলব্ধি করেছেন যে, মনোবিদ্যার এই বিষয়টির আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মানুষের ক্ষেত্রে শিক্ষণ প্রক্রিয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ

২। শিক্ষণের স্বরূপ (Nature of Learning) :

অতীত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে প্রতিক্রিয়ার মধ্যে পরিবর্তন আনয়ন করাই হল শিক্ষণ।

শিক্ষণ হল সেই প্রক্রিয়া যার সহায়তায় ব্যক্তি নতুন পরিবেশে নতুন আচরণ সম্পন্ন করার দক্ষতা অর্জন করে। অবশ্য শিক্ষণ প্রক্রিয়ার ফলে ব্যক্তির আচরণের মধ্যে যে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, তা সম্পূর্ণ নতুন ধরণের হতে পারে বা তার পূর্ব আচরণের উন্নত রূপও হতে পারে। শিক্ষা যখন সম্পূর্ণ হয় তখন কোন একটি পরিস্থিতিতে যথাযথ প্রতিক্রিয়া করার কৌশল আয়ত্ত করা হয়। সুতরাং, শিক্ষণের লক্ষ্য হল ব্যক্তির আচরণের পরিবর্তন আনা এবং এই পরিবর্তনের মধ্যে যেগুলি পরিবেশের সঙ্গে যথাযথ প্রতিক্রিয়ার উপযোগী, সেগুলিকে স্থায়ী করা।

শিক্ষার লক্ষ্য ব্যক্তির আচরণে পরিবর্তন আনা

আমাদের বেশীর ভাগ শিক্ষণই হল উদ্দেশ্যমূলক। শিক্ষণ মানুষের প্রয়োজন ও

উদ্দেশ্যসাধনে সহায়তা করে। শিক্ষণ দেহ ও মনে পরিণতি আনে, মানসিক উৎকর্ষ ও শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত গুণের বিকাশ সাধন করে। যখন আমরা বলি, শিক্ষণ আচরণের মধ্যে পরিবর্তন এনে তাকে স্থায়ী করে, তার অর্থ এই নয় যে, আচরণের আর পরিবর্তন সম্ভব নয়। নতুন অভিজ্ঞতার আলোকে এই আচরণ আরও পরিবর্তিত হতে পারে। তাছাড়া, যা শিক্ষা করা হল তা স্মরণ রাখতে না পারলে শিক্ষা ফলপ্রসূ হবে না। আর শিক্ষণের ফলে ইন্দ্রিয় ও পেশীর মধ্যে নতুন সম্বন্ধ স্থাপিত হয় এবং দৈহিক অঙ্গ সঞ্চালনের ক্ষেত্রেও নতুন পরিবর্তন সাধিত হয়।

পূর্বোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে আমরা **শিক্ষণের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি** লক্ষ্য করি :

শিক্ষণের বৈশিষ্ট্য

(১) শিক্ষণ হল কোন উদ্দেশ্য লাভের জন্য আচরণকে পরিবর্তিত করা এবং কোন বিশেষ পরিবেশে, যথাযথ প্রতিক্রিয়া করার উপযোগী আচরণকে স্থায়ী করা। (২) শিক্ষণ হল উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়ার মধ্যে নতুন সম্বন্ধ স্থাপত করা। (৩) শিক্ষণ হল অতীত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে নতুন পরিস্থিতিতে যথাযথভাবে প্রতিক্রিয়া করে বাঞ্ছিত ফল লাভ করা। (৪) শিক্ষণ হল আমাদের নানাবিধ সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য নতুন কৌশল আযত্ত করা, পুরাতন পদ্ধতির উন্নতি সাধন করা। (৫) শিক্ষণ হল দ্রুতগতিতে এবং উন্নত পদ্ধতির সহায়তায় আচরণের নতুন কৌশল আয়ত্ত করা।

শিক্ষণের বিভিন্ন সংজ্ঞা

সুতরাং, শিক্ষণ আমাদের সুবিধাজনকভাবে পরিবেশের সঙ্গে প্রতিক্রিয়া করতে সহায়তা করে। শিক্ষণের উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলির ভিত্তিতে আমরা শিক্ষণের এইভাবে সংজ্ঞা নির্দেশ করতে পারি—'**শিক্ষণ হল সেই প্রক্রিয়া যার সহায়তায় আমরা আচরণের মধ্যে এমন পরিবর্তন আনতে পারি যা পরিবেশের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধের উন্নতিসাধন করে।**" শিক্ষণের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে মনোবিদ **উডওয়ার্থ** বলেছেন, "শিক্ষণ হল এমন একটি ক্রিয়া যা পরবর্তী ক্রিয়ার ওপর অপেক্ষাকৃত একটি স্থায়ী ছাপ রেখে যায়, অর্থাৎ যখনই কোন ক্রিয়ার মধ্যে পূর্ববর্তী ক্রিয়ার ছাপ লক্ষ্য করা যায় তখনই সেই ক্রিয়াকে শিক্ষণের ফল মনে করা যেতে পারে।" **ম্যাকগিয়োক** শিক্ষণের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, "শিক্ষণ হল অভ্যাসের ফলে ক্রিয়ার পরিবর্তন।" **বার্নার্ড** শিক্ষণের স্বরূপ ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছেন, "শিক্ষণ হল আচরণের পরিবর্তন।" [1]

---

1. "......learning is the modification of behaviour."
—H. W Bernard : Psychology of Learning and Teaching , Page 121.

শিক্ষণ-প্রক্রিয়ার স্বরূপ সম্পর্কে মনোবিদ্‌দের মতভেদ দেখা যায়। আচরণবাদী বা চেষ্টিতবাদীদের মতে শিক্ষণ-প্রক্রিয়া হল বিচারবুদ্ধি বিবর্জিত যান্ত্রিক প্রক্রিয়ামাত্র। মনোবিদ্‌ থর্নডাইক মনে করেন যে, শিক্ষণ-প্রক্রিয়া হল উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে যথাযথ সম্বন্ধ স্থাপন করা। ম্যাকডুগাল প্রমুখ উদ্দেশ্যসাধনবাদীদের মতে উদ্দেশ্যসাধনের উপযোগী উপায় নির্বাচন করার ক্ষমতা অর্জন করাই হল শিক্ষণ। **কোয়াহলার, কফকা** প্রমুখ গেস্টাল্টবাদীদের মতে অন্তঃদৃষ্টির সাহায্যে কোন একটি পরিস্থিতিকে খণ্ড খণ্ড বা বিচ্ছিন্ন অংশে প্রত্যক্ষ না করে, সমগ্রভাবে প্রত্যক্ষ করে প্রতিক্রিয়া করাই হল শিক্ষণ।

শিক্ষণ-প্রক্রিয়ার স্বরূপ সম্পর্কে মনোবিদ্‌দের মধ্যে মতবাদ

৩। শিক্ষণ সম্পর্কীয় মতবাদ (Different Theories of Learning):

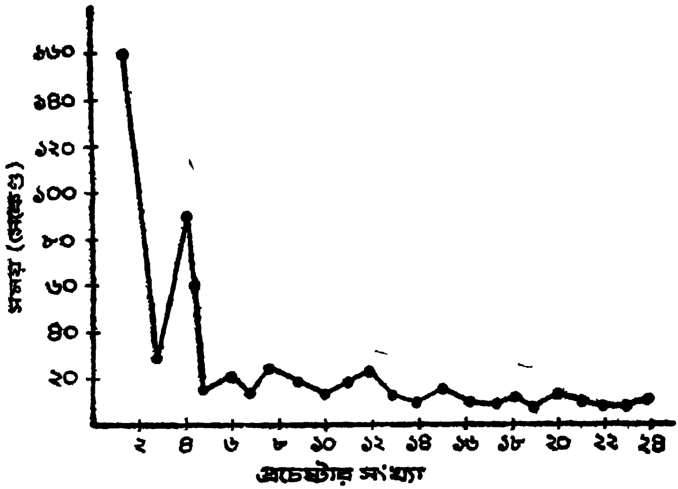
শিক্ষণ-সম্পর্কীয় একাধিক মতবাদ প্রচলিত আছে। তার মধ্যে তিনটি মতবাদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ; যথা—(ক) **প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধন মতবাদ** (Trial and Error Theory of Learning), (খ) **গেস্টাল্ট বা সমগ্রতা মতবাদ** (Gestalt Theory of Learning) এবং (গ) **সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়াবাদ** (Conditioned Reflex Theory of Learning)। এখন আমরা এই মতবাদগুলি একটির পর একটি আলোচনা করছি :

(ক) **প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধন মতবাদ** (Trial and Error Theory of Learning): ই. এল. থর্নডাইক (E. L. Thorndike) এবং সি. এল. হালিল (C. L. Halil) এই মতবাদের প্রধান প্রবর্তক। থর্নডাইকের মতে উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সংযোগ ও সম্বন্ধ স্থাপন করাই হল শিক্ষণ-প্রতিক্রিয়া। বারবার চেষ্টা ও ভুল-ত্রুটি সংশোধনের মাধ্যমেই উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে এই সংযোগ স্থাপিত হয়। এই কারণে এই মতবাদকে সংযোজনবাদ বা যোগসূত্র স্থাপন মতবাদ (Theory of Connectionism or Bond Theory of Learning) বলা হয়। শিক্ষণ-প্রক্রিয়া হল একটা যান্ত্রিক প্রক্রিয়া এবং কতকগুলি দৈহিক ক্রিয়ার অনুক্রমণ ও পারম্পর্য। আকস্মিকভাবে বিনা প্রচেষ্টায় কোন কিছু শিক্ষা করা সম্ভব নয়। শিক্ষণ একটি ধীরগতি প্রক্রিয়া, যার ফলে ব্যর্থ প্রচেষ্টাগুলি বা অসফল আচরণগুলি অবলুপ্ত হয় (stamped out) এবং সফল বা সার্থক প্রচেষ্টাটি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সংযোগ ও সম্বন্ধ স্থাপন করাই হল শিক্ষণ

মানুষের আচরণ জটিল এবং মানুষের আচরণ থেকে শিক্ষণের স্বরূপ নির্ধারণ করা

কঠিন বিবেচনা করে থর্নডাইক কুকুর, বিড়াল ও বানরের ওপর একাধিক পরীক্ষণকার্য চালান। একটি ক্ষুধার্ত বিড়ালের ওপর তিনি যে পরীক্ষণটি করেন সেই পরীক্ষণটিকেই প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধনের মাধ্যমে শিক্ষণের একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করা হয়।



একটি ক্ষুধার্ত বিড়ালের শিক্ষণের রেখাচিত্র

এই রেখাচিত্র থেকে বোঝা যাবে যে, প্রতিবারের প্রচেষ্টায় বিড়ালটির কতটা সময় লেগেছে

থর্নডাইক একটি ক্ষুধার্ত বিড়ালকে খাঁচার মধ্যে বন্ধ করে রাখলেন এবং খাঁচার বাইরে এক টুকরো মাছ রাখলেন, যাতে মাছের টুকরোটি বিড়ালটির চোখে পড়ে। বিড়ালটি খাঁচার দরজা খুলতে পারলেই মাছের টুকরোটি তার আয়ত্তে আসবে। খাঁচার দরজাটি এমনভাবে ছিটকিনি দিয়ে আটকান, যাতে সামান্য চাপ লাগলেই ছিটকিনিটি খুলে যায়। বিড়ালটি প্রথমে খাঁচার ভেতর থেকেই মাছটি পাবার চেষ্টা করল, বিফল হওয়ায় সে খাঁচার ভেতর ছুটাছুটি করতে লাগল, খাঁচাটি আঁচড়াতে লাগল, কামড়াতে লাগল। এইভাবে 'হয় সফলতা নয় ব্যর্থতা' (hit or miss) ধরনের এলোমেলো ও অন্ধ প্রচেষ্টা চালাতে চালাতে হঠাৎ ছিটকিনির ওপর চাপ পড়াতে ছিটকিনিটি খুলে গেল। তখন বিড়ালটি বেরিয়ে এসে মাছের টুকরোটি লাভ করল। দ্বিতীয় দিনে ঐ একই অবস্থার পুনরাবৃত্তি করা হল, দেখা গেল বিড়ালটি পূর্বদিনের তুলনায় কম প্রচেষ্টায় এবং অল্প সময়ে খাঁচা থেকে বেরিয়ে এল। তৃতীয় দিনেও বিড়ালটিকে এভাবে খাঁচায় আটকান হল এবং দেখা গেল যে, তৃতীয় দিনে তার ব্যর্থ

একটি পরীক্ষণকার্যের বিবরণ

প্রচেষ্টার সংখ্যা আরও কমে গেছে এবং পূর্বদিনের তুলনায় সময় আরও কম লেগেছে। এইভাবে দেখা গেল, তার ব্যর্থ প্রচেষ্টা বা ভুলের সংখ্যা ক্রমশঃ কমে আসছে। অবশেষে এমন একদিন এল যেদিন বিড়ালটি কোন ভুল বা ব্যর্থ প্রচেষ্টা না করে প্রথম বারেই অনায়াসেই খাঁচার দরজাটি খুলে বাইরে বেরিয়ে এল। সেই দিনই বিড়ালটি বার বার প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধনের সহায়তায় উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে যথাযথ সম্বন্ধ বা সংযোগ স্থাপনে সমর্থ হল এবং তার শিক্ষাও সমাপ্ত হল। বিড়ালের এই প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধনের মাধ্যমে শিক্ষা করার একটা রেখাচিত্র পূর্বপৃষ্ঠায় দেখান হল। দেখা গেল, খাঁচার দরজা খুলে খাদ্যে পৌঁছতে মোট ২৪টি ক্রমিক প্রচেষ্টার মধ্যে বিড়ালটির প্রথম প্রচেষ্টায় ১৭০ সেকেণ্ড সময় লাগলেও ক্রমশঃ সেটা কমে কমে ৭ সেকেণ্ডে এসে দাঁড়িয়েছে।

শিক্ষণ-সংক্রান্ত এই ধরনের পরীক্ষণগুলি থেকে থর্নডাইক সিদ্ধান্ত করলেন যে, শিক্ষণ-প্রক্রিয়া একটি যান্ত্রিক প্রক্রিয়া, এর মধ্যে বিচার বা মননশীলতার ও অন্তর্দৃষ্টির (insight) কোন স্থান নেই। শিক্ষণ-প্রক্রিয়ার মধ্যে উদ্দেশ্যের সঙ্গে উপায়ের সঙ্গতিবিধান সম্পর্কে প্রাণীর মধ্যে কোন রকম সচেতনতা নেই; অর্থাৎ সমস্যার সামগ্রিক রূপটিকে কল্পনায় মনের সামনে উপস্থিত করে কিভাবে সমস্যা ও সমাধানের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা যাবে তার কোন পূর্ব কল্পনা প্রাণীর মধ্যে নেই। অনুশীলনের সহায়তায় ভুল প্রক্রিয়াগুলিকে পরিহার করে যথাযথ প্রতিক্রিয়া করার সামর্থ্য অর্জন করাই হল শিক্ষা। প্রাণীর শিক্ষণ-প্রক্রিয়া কতকগুলি দৈহিক প্রতিক্রিয়ার পারম্পর্য। প্রাণী যা কিছু শিক্ষা করে তা হয় 'সফলতা নয় ব্যর্থতা' ধরনের আচরণের দ্বারাই শেখে ও ভুল-সংশোধনের মাধ্যমে শেখে। প্রাণী অনুকরণের মাধ্যমে কিছু শিক্ষা করে না।

থর্নডাইকের মতে শিক্ষণ-প্রক্রিয়া যান্ত্রিক প্রক্রিয়া

থর্নডাইকের মতে কেবলমাত্র ইতর প্রাণীই এই পদ্ধতিতে শিক্ষালাভ করে না, বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষও এই পদ্ধতিতে শিক্ষালাভ করে। কোন ছাত্রকে একটি গাণিতিক সমস্যার সমাধান করতে দেওয়া হল। ছাত্রটি সমস্যা সমাধানের জন্য পর পর বিভিন্ন ফরমূলা বা সূত্রগুলি প্রয়োগ করতে লাগল; কিন্তু যখন নির্ভুল সূত্রটি প্রয়োগ করল তখনই সমস্যার সমাধানে সমর্থ হল। অর্থাৎ, ছাত্রটি উদ্দীপক (গাণিতিক সমস্যা) এবং প্রতিক্রিয়ার (ফরমূলা বা সূত্রের প্রয়োগ) মধ্যে যথাযথ সম্বন্ধ স্থাপনে সমর্থ হল এবং সে শিখল। কাজেই থর্নডাইকের মতে সব মানুষই এইভাবে প্রচেষ্টা ও ভুল-সংশোধনের মাধ্যমে শিক্ষা লাভ করে।

মানুষও প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধন পদ্ধতিতে শিক্ষা করে

সমালোচনা (Crticism): **গুণ:** এমন কয়েকটি বিষয় আছে, যেমন অঙ্ক, নামতা, কবিতা মুখস্থ করা, ব্যাকরণের নিয়ম, যেসব ক্ষেত্রে প্রচেষ্টা ও ভুল-সংশোধন পদ্ধতিকে পরিহার করা সম্ভব হয় না। যুক্তিতর্কসংক্রান্ত বিষয়ের (reasoning subject) ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি প্রয়োগের সবচেয়ে বেশী সুবিধা রয়েছে।

দোষ: (i) যদিও শিক্ষার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতির সহায়তা গ্রহণ করা হয় তাহলেও এই পদ্ধতির বিশেষ কোন উপযোগিতা আছে বলে অনেকে মনে করেন না। এই পদ্ধতি অনুসরণ করে শিক্ষা গ্রহণ করতে গেলে অযথা অনেক সময় ও শক্তির অপচয় ঘটে।[1]

(ii) প্রচেষ্টা ও ভুল-সংশোধন পদ্ধতির ক্ষেত্রে পরীক্ষার্থী লক্ষ্যহীনভাবে বা যান্ত্রিক-ভাবে প্রতিক্রিয়া করে একথাও অনেকে স্বীকার করতে চান না। জনৈক শিক্ষা-মনোবিদের অভিমতানুযায়ী এই পদ্ধতিতে অনেক সময় সুনির্দিষ্ট এবং প্রাসঙ্গিক প্রতিক্রিয়া করা হয়। আপাতঃদৃষ্টিতে যদিও সেই ক্রিয়াগুলি লক্ষ্যহীন মনে হয়, আসলে পরিস্থিতিই শিক্ষার্থীর কাছে ক্রিয়াগুলির ইঙ্গিত দেয় এবং সেও সেইভাবে অগ্রসর হয়।[2]

(iii) প্রচেষ্টা ও ভুল-সংশোধনের মাধ্যমে ভুল ক্রমশঃ কমতে থাকে, কিন্তু আপনা-আপনি বা যান্ত্রিকভাবে ভুলগুলি কমে না, প্রাণীর দৈহিক ও মানসিক অবস্থার ওপর এই ভুল-সংশোধনের বিষয়টি অনেকাংশে নির্ভরশীল।

(iv) শিক্ষণ যান্ত্রিক প্রক্রিয়া নয়। শিক্ষণ কতকগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন ঘটনার চেতনামাত্র নয়। একটি সমগ্র অবস্থার চেতনার অনুপস্থিতিতে শিক্ষণ সম্ভব হয় না। প্রাণী যখন কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে প্রতিক্রিয়া করে তখন তার প্রতিক্রিয়াগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন অন্ধ প্রতিক্রিয়া নয়। প্রাণী পরিস্থিতির বিভিন্ন অংশের পার্থক্য ও সম্বন্ধ বুঝে প্রতিক্রিয়া করে। প্রাণী সমস্ত পরিস্থিতিকে সামগ্রিকভাবে অবধারণ করে প্রতিক্রিয়া করে।

(v) প্রাণী অন্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে শিক্ষা করে। গেস্টাল্ট মনোবিদ্ কোয়াহ্লার (Kohler) ও কফকা (Kofika) তা স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে প্রাণী অন্তর্দৃষ্টির (insight) সাহায্যে শিক্ষা করে। অন্তর্দৃষ্টি হল কোন সমস্যার বিচ্ছিন্ন অংশের সঙ্গে পূর্ণ সমস্যাটির সম্বন্ধ সমগ্ররূপে উপলব্ধি করা।

---

1. "There is much wastage of time and energy in learning by this method.'
—R. P. Bhatnagar: A Study of Educational Psychology; Page—157

2. "......in Trial and Error also, there are often systematic and relevant responses. Activities are not wholly random. All these activities though apparently random are suggested to him by the situation and the learner proceeds in accordingly."
—R. P. Bhatnagar: A Study of Educational Psychology; Page. 157

(vi) প্রাণী অনুকরণের মাধ্যমে শিক্ষা করে না, এ অভিমতও অনেকে স্বীকার করতে চান না। বানর জাতীয় জীবের অনুকরণের মাধ্যমে শিক্ষণের দক্ষতা সুবিদিত ঘটনা।

(vii) প্রাণীর শিক্ষণ প্রক্রিয়া কতকগুলি দৈহিক প্রক্রিয়ার পারম্পর্য—এই অভিমতও গ্রহণযোগ্য নয়। শিক্ষণ একটি সামগ্রিক প্রক্রিয়া (whole process) যেটি একটি সমগ্র পরিস্থিতির সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। খাঁচার মধ্যে আবদ্ধ ক্ষুধার্ত বিড়াল পরিস্থিতিকে খণ্ড খণ্ড করে প্রত্যক্ষ করে না; ক্ষুধা, খাদ্য, খাঁচা, খাঁচায় আবদ্ধ থাকা—এই সবগুলিকে সমগ্রভাবে প্রত্যক্ষ করে। তাছাড়া বিড়ালটি খাঁচার ছিটকিনি খোলা শেখার পর পরবর্তী প্রচেষ্টার সময় সোজাসুজি ছিটকিনির কাছেই চলে যায়। সুতরাং, শিক্ষণ নিছক দৈহিক প্রক্রিয়ার পারম্পর্য নয়।

(viii) পরবর্তীকালে থর্নডাইক শিক্ষণে 'belongingness' বা অন্তর্ভুক্তির ধারাকে টেনে এনে শিক্ষণের ক্ষেত্রে সমগ্র ও অংশের মধ্যে সম্বন্ধের জ্ঞানকে এবং প্রাণীর প্রয়োজন, আকাঙ্ক্ষা, আগ্রহ ও প্রেষণার গুরুত্বকে স্বীকার করে তাঁর মতবাদকে যেভাবে সংশোধন করেছেন তাতে শিক্ষণ-প্রক্রিয়া আর নিছক অন্ধ ও যান্ত্রিক প্রক্রিয়া থাকে না।

৪। থর্নডাইকের শিক্ষণের সূত্র (Thorndike's Laws of Learning) :

শিক্ষণসম্পর্কীয় বিভিন্ন ফললাভের ওপর ভিত্তি করে থর্নডাইক কতকগুলি সূত্র উদ্ভাবন করেছেন। এই সূত্র হল সংখ্যায় আটটি এবং এর মধ্যে তিনটি প্রধান সূত্র এবং পাঁচটি অপ্রধান সূত্র। তিনটি প্রধান সূত্র হল—(১) **অনুশীলনের সূত্র** (Law of Exercise); (২) **ফললাভের সূত্র** (Law of Effect); (৩) **প্রস্তুতি সম্বন্ধীয় সূত্র** (Law of Readiness)। অপ্রধান সূত্রগুলি হল—(i) **একই উদ্দীপকের প্রতি বহু প্রতিক্রিয়ার সূত্র** (Law of Multiple Response to the same external stimulus); (ii) **মনোভাব, প্রস্তুতি বা প্রবণতার সূত্র** (Law of Attitude, Set or Disposition); (iii) **আংশিক প্রতিক্রিয়ার সূত্র** (Law of Partial Activity); (iv) **উপমানের সূত্র** (Law of Assimilation), এবং (v) **অনুষঙ্গমূলক সঞ্চালনের সূত্র** (Law of Associative Shifting)।

শিক্ষণের তিনটি সূত্র

আমরা প্রথমে প্রধান সূত্রগুলি সংক্ষেপে আলোচন করব :

(১) **অনুশীলনের সূত্র** (Law of Exercise) : কোন উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে যদি বার বার সংযোগ স্থাপিত হয় এবং অন্যান্য ব্যবস্থা অপরিবর্তিত থাকে তাহলে

উদ্দীপকের সঙ্গে প্রতিক্রিয়ার সংযোগ দৃঢ়তর হয় ; অপরপক্ষে, যদি কোন উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে দীর্ঘকাল কোন সংযোগ স্থাপিত না হয় তাহলে সংযোগটি শিথিল হয়ে পড়ে। এই সূত্রটির দুটি অংশ আছে—ব্যবহারের সূত্র (Law of use) এবং অব্যবহারের সূত্র (Law of disuse)। এই দুটি অংশ পরস্পরের পরিপূরক। ব্যবহারের সূত্রে বলা হয় যে, একই উদ্দীপক বারবার প্রতিক্রিয়া করলে সংযোগ দৃঢ়তর হয় এবং অব্যবহারের সূত্রে বলা হয় যে, একই উদ্দীপকে যদি সুদীর্ঘকাল কোন প্রতিক্রিয়া করা না হয় তবে ঐ উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সংযোগ শিথিল হয়ে পড়ে। এই সূত্রটির মূল বক্তব্য হল, অনুশীলন উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়ার সংযোগকে দৃঢ়তর করে। অনুশীলনের অভাব ঘটলে সেই সংযোগ শিথিল হয়ে পড়ে। মানুষের শিক্ষণের ক্ষেত্রে এই সূত্রটির বিশেষ প্রয়োগ আমরা লক্ষ্য করি। মোটরগাড়ী চালান, টাইপরাইটার শিক্ষা, ভাষা শিক্ষা, কবিতা মুখস্থ করা প্রভৃতি শিক্ষণের বিভিন্ন ক্ষেত্রে, অনুশীলন কাজটিকে নিয়মিতভাবে ও যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে সহায়তা করে।

অনুশীলনের ফলে উদ্দীপক প্রতিক্রিয়ার সংযোগ দৃঢ় হয়

এই সূত্রটির তিনটি উপসূত্র আছে ; যথা—(i) **তীব্রতা সম্বন্ধীয় সূত্র** (Law of Vividness or Intensity) ; (ii) **সাম্প্রতিকতা সম্বন্ধীয় সূত্র** (Law of Recency) ; (iii) **পৌনঃপুনিকতা সম্বন্ধীয় সূত্র** (Law of Frequency) ; উদ্দীপকের তীব্রতা, যেমন—আলোকের উজ্জ্বলতা, শব্দের উচ্চতা প্রভৃতি এবং শিক্ষণের সাম্প্রতিকতা ও পৌনঃপুনিকতা শিক্ষণের বিষয়বস্তু আয়ত্ত করতে সহায়তা করে।

(২) **ফললাভের সূত্র** (Law of Effect) : একই অবস্থায় একটি কাজ বার বার করার ফলে উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে যে সংযোগটি স্থাপিত হয়, সেই সংযোগটি যদি শিক্ষার্থীর পক্ষে সন্তোষজনক বা তৃপ্তিদায়ক হয় তাহলে সংযোগটি দৃঢ়তর হয়, আর যদি সংযোগের ফল সন্তোষজনক না হয় তাহলে সংযোগটি শিথিল হয়ে বিলুপ্ত হয়ে যায়। ইতর প্রাণীর পক্ষে প্রতিক্রিয়ার ফল তার জৈব প্রয়োজন মেটাবার পক্ষে সহায়ক, সেই প্রতিক্রিয়ার ফলই তৃপ্তিদায়ক। যেমন—থর্নডাইকের ক্ষুধার্ত বিড়ালকে নিয়ে যে পরীক্ষাকার্য চালাবার ঘটনাটি ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, তাতে দেখা যায়, ক্ষুধার্ত বিড়ালের বার বার প্রচেষ্টা ও ভুল-সংশোধনের মাধ্যমে খাঁচার দরজাটি খুলে খাদ্য লাভ করল। এক্ষেত্রে উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার যথাযথ সংযোগের ফল প্রাণীর পক্ষে তৃপ্তিদায়ক, সেহেতু বিড়ালটি দরজা খোলার কৌশলটি শিখে রাখল। আর যেসব ভুল প্রতিক্রিয়ার জন্য সে খাদ্য লাভ করতে পারেনি সেগুলি বিস্মৃত হল।

উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার সংযোগ শিক্ষার্থীর পক্ষে তৃপ্তিদায়ক হলে সংযোগ দৃঢ়তর হয়

এই সূত্রকে পুরস্কার ও শাস্তি সম্পর্কীয় নিয়ম (Law of Reward and Punishment) বলা হয়। ক্ষুধার্ত বিড়ালটির যে প্রচেষ্টা খাদ্য লাভে সহায়তা করে সেগুলির ফলে সে পুরস্কৃত হয়। আবার যেগুলি করে না সেগুলির ফলে সে অসন্তুষ্ট হয়, অর্থাৎ তার শাস্তি ভোগ হয়।

বস্তুতঃ, এই সূত্রটি অনুশীলনের সূত্রের পূর্বে আসে, যেহেতু এই সূত্রের সাহায্যেই ব্যাখ্যা করা যায়, কিভাবে সফল প্রতিক্রিয়াটি শিক্ষার্থী নির্বাচন করে।

(৩) **প্রস্তুতির সূত্র** (Law of Readiness): উদ্দীপক ও তার উপযোগী প্রতিক্রিয়াটির মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য শিক্ষার মধ্যে একটা দৈহিক ও মানসিক প্রস্তুতির ভাব থাকা প্রয়োজন। এই প্রস্তুতি থাকলে কাজটি করা শিক্ষার্থীর পক্ষে তৃপ্তিদায়ক মনে হয়, আর এই প্রস্তুতি না থাকলে কাজটি শিক্ষার্থীর কাছে বিরক্তিজনক মনে হয়।

শিক্ষার্থীর মধ্যে দৈহিক ও মানসিক প্রস্তুতি

পূর্বোক্ত এই তিনটি সূত্র ছাড়াও থর্নডাইক আরও কয়েকটি অপ্রধান সূত্রের উল্লেখ করেছেন। (i) **একই উদ্দীপকের প্রতি বহু প্রতিক্রিয়ার সূত্র** (Law of Multiple Response to the same external stimulus): অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধির বিকাশের ফলে জীব একই উদ্দীপকের ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে প্রতিক্রিয়া করতে শেখে। প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে যত বৈচিত্র্য দেখা দেয়, শিক্ষণকার্য ততই সহজতর হয় এবং কোন বিশেষ পরিবেশে একাধিক প্রতিক্রিয়ার মধ্যে যে প্রতিক্রিয়াটি উদ্দীপকের সঙ্গে সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সবচেয়ে উপযোগী মনে হয়, শিক্ষার্থী সেটিই নির্বাচন করে নেয় এবং অনুশীলনের সহায়তায় সেই প্রতিক্রিয়াটিকেই স্থায়ী করার জন্য সচেষ্ট হয়। কোন্ প্রতিক্রিয়াটি উপযোগী সেটি নির্ধারিত হয় ফললাভের সূত্রের দ্বারা, অর্থাৎ যে প্রতিক্রিয়ার ফল সুখকর, সেটিই নির্বাচিত হয়। খাঁচায় বদ্ধ বিড়াল খাঁচার বাইরে খাদ্য দেখে নানাভাবে প্রতিক্রিয়া করে।

প্রতিক্রিয়ার বৈচিত্র্য শিক্ষণ-প্রক্রিয়াকে সহজতর করে তোলে

(ii) **মনোভাব, প্রস্তুতি ও মানসিক অবস্থার সূত্র** (Law of Attitude, Set or Disposition): কোন অবস্থায় কোন উদ্দীপকের প্রতি প্রাণীর প্রতিক্রিয়া নির্ভর করে তার মনোভাব, দৈহিক ও মানসিক অবস্থা এবং প্রস্তুতির ওপর। খাঁচার বিড়ালটির মনোভাব, প্রস্তুতি ও মানসিক অবস্থা তাকে খাদ্য সংগ্রহে সক্রিয় করে তুলেছিল যার জন্য সে বাইরে আসার চেষ্টা করছিল। খাঁচার বিড়াল ক্ষুধার্ত না হলে খাঁচার বাইরে আসার চেষ্টা করত না।

প্রাণীর প্রতিক্রিয়া তার মনোভাব, দৈহিক ও মানসিক অবস্থার ও প্রস্তুতির ওপর নির্ভর করে

(iii) আংশিক প্রতিক্রিয়ার সূত্র (Law of Partial Activity): সমগ্র অবস্থাটি উপস্থিত না থাকলেও, কোন কোন সময় কোন অবস্থার অংশবিশেষ সম্পূর্ণ প্রতিক্রিয়াটি সৃষ্টি করতে পারে। শিক্ষণের একটা নিয়ম হল সমগ্র পরিস্থিতির মধ্যে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ অংশের প্রতি সক্রিয় হওয়া। যে বিড়াল অনেকগুলি খাঁচা খুলে বাইরে এসে খাদ্য লাভ করতে শিক্ষা করেছে, তাকে একটি নতুন খাঁচায় আবদ্ধ করলে সে খাঁচাটির নানারকম বৈশিষ্ট্য সমন্বিত সামগ্রিক গঠনটির মধ্যে বিশেষ করে খাঁচার দরজা খোলা সংক্রান্ত ব্যবস্থাটুকুর প্রতি অধিকতর মনোযোগী হয়ে প্রতিক্রিয়া করে।

অবস্থার অংশবিশেষ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে

(iv) সাদৃশ্য বা উপমানের সূত্র (Law of Assimilation or Analogy): এক অবস্থায় যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় তা অনুরূপ অবস্থার দ্বারাও সৃষ্ট হতে পারে, যদিও পূর্বে সেই অবস্থা স্বভাবতঃ সেই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করত না; যেমন, সম্পূর্ণ নতুন একটি খাঁচাতে একটি বিড়ালকে আটকে রাখা হলে পুরনো খাঁচাতে থাকা অবস্থায় সে যেসব প্রতিক্রিয়া করেছিল, তার অনুরূপ প্রতিক্রিয়া করে।

(v) অনুষঙ্গমূলক সঞ্চালনের সূত্র (The law of Associative Shifting): একই অবস্থার দ্বারা যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্ট হয়, সেই অবস্থার সঙ্গে যুক্ত অন্য অবস্থার দ্বারাও সেই প্রতিক্রিয়াটি সৃষ্ট হতে পারে। যেমন, একটি নির্দিষ্ট পাত্রে কোনও কুকুরকে যদি রোজ খাদ্য দেওয়া হয়, তাহলে পরে পাত্রটি দেখামাত্রই কুকুর প্রতিক্রিয়া করবে।

একই অবস্থার সঙ্গে যুক্ত অন্য অবস্থার দ্বারাও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে

থর্নডাইকের সূত্রগুলির সমালোচনা: থর্নডাইকের সূত্রগুলির বিরুদ্ধে প্রধান সমালোচনা হল, তিনি শিক্ষণের সূত্রগুলিকে নিছক যান্ত্রিকভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

থর্নডাইকের অনুশীলনের সূত্রটির মূল্য শিশুদের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে স্বীকৃত। অনুশীলনের সহায়তায় শিক্ষণীয় বিষয়টিকে মনের মধ্যে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করা যায় এবং অনুশীলনের অভাব ঘটলে শিক্ষণীয় বিষয়টির ছাপ মনের মধ্যে থেকে ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে যেতে থাকে, এ অস্বীকার করা চলে না। তবে অনেকের মতে এই সূত্রটিতে প্রেষণা, আগ্রহ এবং বিশেষ শিক্ষা প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বিষয়গুলিকে উপেক্ষা করা হয়েছে।[1] প্রেষণা, আগ্রহ এবং অর্থ বা তাৎপর্য উপলব্ধি ছাড়া কেবলমাত্র যান্ত্রিক পৌনঃপুনিকতা কখনও শিক্ষার্থীকে কোন কিছু শিক্ষা করতে সমর্থ করে না এবং এগুলি ছাড়া যান্ত্রিক পুনরাবৃত্তি ব্যর্থ বলেই মনে করা যেতে পারে।

অনুশীলনের সূত্রটির মূল্য

1. H. E. Garrett: Great Experiments is Psychology, Page 57

বার বার পরীক্ষণকার্য চালিয়ে থর্নডাইক অনুশীলনের সূত্রটিকে সংশোধিত করেছেন। অনুশীলনের সূত্রটিকে বর্তমানে শিক্ষণের নীতিরূপে স্বীকার না করে দক্ষতা বা নিপুণতা অর্জনের নীতিরূপে স্বীকার করা হয়। শিক্ষণকার্য শিক্ষার্থীর শিক্ষণের পুনরাবৃত্তির ওপর নির্ভর করে না, শিক্ষণীয় বিষয়ের উপযোগিতা এবং মূল্যের ওপরও নির্ভর করে।

থর্নডাইকের 'ফললাভের সূত্রটি'রও শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ উপযোগিতা আছে। আনন্দ বা তৃপ্তি যতই অধিক হবে শিক্ষার্থীর শিক্ষণের প্রেষণাও ততই শক্তিশালী হবে, এ সত্য অস্বীকার করা যায় না। কোন একটি বিশেষ পরিস্থিতিকে শিক্ষণের পক্ষে বিশেষভাবে ফলপ্রসূ করে তুলতে হলে, লক্ষ্যকে তৃপ্তিদায়ক করা অবশ্যই প্রয়োজনীয়। পুরস্কার, পদক প্রভৃতি প্রদান করে শিক্ষার্থীকে উৎসাহ দেবার রীতি এই সূত্রটির ওপর ভিত্তি করেই বিদ্যালয়ে প্রবর্তিত হয়েছে।

ফললাভের সূত্রটির মূল্য

১৯৩২ খ্রীস্টাব্দে থর্নডাইক এই সূত্রটিকে সংশোধিত করেন। সূত্রটির সংশোধিত ব্যাখ্যায় দেখা যায় যে, আনন্দ বা তৃপ্তি উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সংযোগকে দৃঢ় করে। কিন্তু বিরক্তি (Annoyance) যে সংযোগকে দুর্বল করে তা নয়। বিরক্তি শিক্ষার্থীর শিক্ষণ-প্রক্রিয়ার সহায়ক, কেননা বিরক্তি শিক্ষার্থীকে নতুন প্রচেষ্টার জন্য উদ্বুদ্ধ করে।

অনেক মনোবিদ্ আবার এই সূত্রটির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেননি এবং সূত্রটির তীব্র সমালোচনা করেছেন। শেষ লক্ষ্য যে সকল ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীর পক্ষে তৃপ্তিদায়ক হবেই এমন কোন কথা নেই। আবার পুরস্কার ছাড়াও শিক্ষণ সম্ভব। অনেক শিক্ষার্থী কাজ করতে করতেই নতুন আচরণ বা প্রতিক্রিয়া আয়ত্ত করে। পুরস্কার এই আচরণের পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল করে। আবার অনেক সময় সে লক্ষ্য শিক্ষার্থীর পক্ষে তৃপ্তিদায়ক হলেও সমাজের নৈতিক আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। অনেক বিষয় শিক্ষা করার জন্য শিক্ষার্থীকে কঠিন পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করতে হয়। লক্ষ্য তৃপ্তিদায়ক হওয়া ছাড়াও দৃঢ় সংকল্প, অধ্যাবসায়, ধৈর্য, শিক্ষার্থীকে বাঞ্ছিত ফললাভে সহায়তা করে।

থর্নডাইকের 'প্রস্তুতির সূত্রটি'র মূল্যও শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে স্বীকৃত। শিক্ষা গ্রহণের জন্য শিক্ষার্থীর মধ্যে যদি কোন প্রস্তুতি না থাকে তাহলে শিক্ষা-গ্রহণ এবং শিক্ষা-প্রদান উভয় কার্য সম্পন্ন করা নিতান্তই কষ্টকর হয়ে পড়ে

প্রস্তুতির সূত্রটির মূল্য

থর্নডাইকের 'উপমানের সূত্রটি'ও শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষভাবে মূল্যবান। অতীত ও পুরাতনের মধ্যে সাদৃশ্যের ওপর এবং প্রতিদিনের শিক্ষণকার্যে জানা থেকে অজানা বিষয়ে শিক্ষার্থীকে পরিচালিত করার ওপর এই সূত্রটিতে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

উপমান সূত্রটির মূল্য

'একই উদ্দীপকের প্রতি বহু প্রতিক্রিয়ার সূত্র'—শিক্ষার্থীকে ব্যাপক অভিজ্ঞতা অর্জনের, নিজের অভিজ্ঞতা লাভ করার এবং নিজের ভুলভ্রান্তি সম্পর্কে সচেতন হবার সুযোগ দেবার যৌক্তিকতাই এই সূত্রটির তাৎপর্য।

থর্নডাইকের অনুষঙ্গমূলক সঞ্চালনের সূত্রটিরও কার্যকারিতা শিক্ষার ক্ষেত্রে স্বীকার করা হয়। বিদ্যালয়ে থাকাকালীন শিশু যেসব অভ্যাস, প্রবণতা এবং আগ্রহ মনের মধ্যে গড়ে তোলে, সেগুলিই তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের পরিণতবয়স্ক ব্যক্তি হিসাবে সমাজের বিবিধ কাজের ভিত্তিরূপে ক্রিয়া করে।

অনুষঙ্গমূলক সঞ্চালনের সূত্রটির মূল্য

থর্নডাইকের শিক্ষণের সূত্রগুলি সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে, শিক্ষণের ক্ষেত্রে এই সূত্রগুলির মূল্য যদিও অস্বীকার করা হয় না, তথাপি শিক্ষার্থীর আগ্রহ, অনুরাগ, প্রেষণা, শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতনতা, উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে উপায় নির্বাচন, শিক্ষার্থীর মনোভাব প্রভৃতি বিষয়গুলিকে শিক্ষণ-প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত না করে শিক্ষণ-প্রক্রিয়াকে নিছক যান্ত্রিকভাবে ব্যাখ্যা করা মোটেই যুক্তিযুক্ত হয়নি।

৫। গেস্টাল্ট বা সমগ্রতা মতবাদ (The Gestalt or Insight theory of Learning) :

গেস্টাল্টবাদী বা সমগ্রতাবাদীদের মতে আমরা যখন কোন বিষয় প্রত্যক্ষ করি, তখন বিষয়টিকে খণ্ড খণ্ড ভাবে বা বিচ্ছিন্নভাবে প্রত্যক্ষ না করে তাকে সমগ্রভাবে প্রত্যক্ষ করি। বিভিন্ন বস্তু যদি পরস্পরের কাছাকাছি থাকে বা তাদের মধ্যে সাদৃশ্য থাকে, তাহলে সেগুলিকে খণ্ড খণ্ড বা বিচ্ছিন্নভাবে প্রত্যক্ষ না করে একটি সমগ্র (whole) বা একক (unit) হিসেবে প্রত্যক্ষ করি। শিক্ষণ-প্রক্রিয়া সম্পর্কে গেস্টাল্টবাদী বা সমগ্রতাবাদীদের মতবাদ তাদের প্রত্যক্ষণ-সম্পর্কীয় মতবাদের অনুরূপ।

প্রত্যক্ষণের সময় কোন বিষয়কে সামগ্রিকভাবে প্রত্যক্ষ করা হয়

গেস্টাল্ট মনোবিদ্‌গণ থর্নডাইকের প্রচেষ্টা ও ভুল-সংশোধনের মতবাদের বিরূপ সমালোচনা করেন। গেস্টাল্ট মনোবিদ্ কোয়াহ্‌লার (Kohler) থর্নডাইকের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনেন যে, থর্নডাইক প্রাণীদের সামনে যে সমস্যাটি উপস্থাপিত করতেন

সেটি খুবই কঠিন — কঠিন এই অর্থে যে, সমস্যা ও তার সমাধানের সূত্রটি প্রাণীর প্রত্যক্ষের আওতার বা ক্ষেত্রের (perceptual field) মধ্যে থাকত না। কাজেই প্রাণী পরিস্থিতিকে সমগ্রভাবে অবধারণ করতে না পারার জন্য প্রচেষ্টা ও ভুল-সংশোধন পদ্ধতি প্রয়োগ করতে বাধ্য হত। তাঁর মতে সমগ্র পরিস্থিতি যদি প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রের মধ্যে না থাকে তাহলে মানুষও অনুরূপ আচরণ করতে বাধ্য হবে। যদি কোন একটি মানুষকে এমন একটি ঘরে আবদ্ধ রাখা হয়, যে ঘরে একটি বৈদ্যুতিক বোতাম লুকানো আছে যেটি টিপলে দরজা খুলে যাবে, বৈদ্যুতিক বোতাম কোথায় রয়েছে সেটি যদি লোকটির জানা না থাকে, তাহলে সেও প্রচেষ্টা ও ভুল-সংশোধন পদ্ধতিব মাধ্যমেই, ঘরের বাইরে যাবার চেষ্টা করবে।

থর্নডাইকের বিরুদ্ধে কোয়াহ্লার এর অভিযোগ

গেস্টাল্টবাদীদের মতে শিক্ষণ-প্রক্রিয়া অন্ধ যান্ত্রিক প্রক্রিয়া নয়। তাঁদের মতে থর্নডাইকের প্রচেষ্টা ও ভুল-সংশোধন পদ্ধতির সহাযতায় শিক্ষণ-প্রক্রিয়ার যথাযথ ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। প্রাণী যখন কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে কোন উদ্দীপকের ওপর প্রতিক্রিয়া করে, তখন তাব প্রতিক্রিয়াগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন অন্ধ প্রতিক্রিয়া মাত্র নয, প্রাণী সমগ্র পরিস্থিতিটিকে সামগ্রিকভাবে অবধারণ করে প্রতিক্রিয়া করে। গেস্টাল্টবাদীদের মতে শিক্ষণ-প্রক্রিয়া হল অন্তর্দৃষ্টির (Insight) সাহায্যে কোন বিশেষ সমস্যার পূর্ণ স্বরূপটি বুঝে নিয়ে কিভাবে প্রতিক্রিয়া করতে হবে সেটি জানা, অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে কোন সমস্যার বিচ্ছিন্ন অংশেব সঙ্গে পূর্ণ সমস্যাটির সম্বন্ধ সমগ্রভাবে উপলব্ধি করা। এই অন্তর্দৃষ্টি কোন রহস্যময় অতীন্দ্রিয় শক্তি নয়, কোন সহজাত ক্ষমতা নয়, এ হল অভিজ্ঞতালব্ধ ক্ষমতা। অন্তর্দৃষ্টি (Insight) হল একটি সমস্যাব বিভিন্ন অংশের সঙ্গে সমগ্রের সম্বন্ধের পরিপূর্ণ উপলব্ধি, একটি পরিস্থিতিকে অখণ্ড ও সমগ্ররূপে প্রত্যক্ষণ যার ফলে সমস্যাটির সুস্পষ্ট রূপ ও অর্থ সম্পর্কে অবগতি। অন্তর্দৃষ্টি রহস্যময় কিছু নয়,আবিষ্কারের সমগোত্রীয়। অনেকের মতে এ হল মনে উপস্থিত এক ধরণের সৃষ্টিমূলক চেতনা। কাজেই শিক্ষণ-প্রক্রিয়া কোন অন্ধ যান্ত্রিক প্রক্রিয়া নয়, এ হল সমগ্র পরিস্থিতি বা সমস্যা সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি।

শিক্ষণ প্রক্রিয়া অন্ধ যান্ত্রিক প্রক্রিয়া নয়

কোয়াহ্লার (Kohler) মুরগী, শিম্পাঞ্জি প্রভৃতির শিক্ষণ-প্রক্রিয়া নিয়ে একাধিক পরীক্ষণকার্য চালিয়ে পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হন। এ সম্পর্কে তিনি যেসব পরীক্ষণকার্য চালান তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষণের বর্ণনা নীচে দেওয়া হচ্ছে :

সুলতান নামে একটি শিম্পাঞ্জিকে একটি বড খাঁচার মধ্যে বন্ধ করে রাখা হয় এবং খাঁচার মধ্যে দুটি বাঁশের টুকরাও রাখা হয়। খাঁচার বাইরে কিছু দূরে কয়েকটি কলা

রাখা হয় এমনভাবে, যাতে শিম্পাঞ্জীটি হাত বাড়িয়ে সেই কলার নাগাল না পায় বা যে, কোন একটি বাঁশের টুকরার সাহায্যে সেই কলার নাগাল পেতে না পারে। শিম্পাঞ্জীটি প্রথমে হাত বাড়িয়ে কলার নাগাল পাবার জন্য খাঁচার মধ্যে খুব লাফালাফি করল কিন্তু সফল হতে পারল না। তখন তার চোখ পড়ল বাঁশের টুকরো দুটির ওপর। সে একটি টুকরো নিয়ে কলার নাগাল পাবার খুব চেষ্টা করল, কিন্তু কিছুতেই সফল হল না। হতাশ হয়ে কিছুক্ষণ বসে থাকার পর হঠাৎ সে একটা বাঁশের টুকরোকে আর একটি বাঁশের টুকরোর মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে একটা লম্বা বাঁশের লাঠি তৈরি করে নিল, তারপর সহজেই সেই লাঠির সাহায্যে কলাগুলিকে নিজের নাগালের মধ্যে টেনে নিল।

কোয়াহ্‌লার-এর পরীক্ষণকার্য

গেস্টাল্টবাদীদের মতে উপরিউক্ত শিম্পাঞ্জীটির শিক্ষণ প্রক্রিয়া 'প্রচেষ্টা ও ভুল-সংশোধনে'র মাধ্যমে (Trial and Error) শিক্ষণ নয়, **এ হল অন্তর্দৃষ্টির (Insight) সাহায্যে শিক্ষণ**। উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে যে সম্বন্ধ এবং তাদের যে পারস্পরিক তাৎপর্য, তার পূর্ণ দৃষ্টি যখন প্রাণীর মধ্যে জাগরিত হল তখনই অন্তর্দৃষ্টির সঞ্চার হল। বিশেষ একটি মুহূর্তে শিম্পাঞ্জীটির মধ্যে পরিস্থিতিটিকে সমগ্রভাবে অবলোকন করার এবং কিভাবে তার সঙ্গে সঙ্গতি বিধান করতে হবে, সে সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি জাগরিত হল। এই অন্তর্দৃষ্টি জাগরিত হওয়ায় প্রাণীটি আকস্মিকভাবে সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত পেল। যতক্ষণ পর্যন্ত দুটি লাঠি একটি লাঠিতে পরিণত হয় নি ততক্ষণ পর্যন্ত কোন সমগ্রতার সৃষ্টি হয়নি, কিন্তু যখনই দুটি লাঠি মিলে একটি লাঠিতে পরিণত হল, তখনই একটি নতুন সংগঠনের সৃষ্টি হল এবং ছেদ বা ফাঁক পূরণ হয়ে গেল। কোন একটা পরিস্থিতিতে অন্তর্দৃষ্টি ছাড়া অবধারণ করা হয়, যখন তার বিভিন্ন উপাদানগুলিকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন অংশরূপে প্রত্যক্ষ করা হয়। কোন সমস্যার ক্ষেত্রে অন্তর্দৃষ্টি তখনই জাগরিত হয় যখন যে অংশগুলি সুবিন্যস্ত নয়, তাদের মধ্যে একটা অখণ্ড সমতা প্রত্যক্ষ করা হয়। অন্তর্দৃষ্টি কোন ধীরগতি প্রক্রিয়া নয়, বিদ্যুৎ চমকের মতো এর আবির্ভাব। ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে এর আবির্ভাব ঘটে না। অবশ্য গেস্টাল্টবাদীরা শিক্ষণের ক্ষেত্রে প্রচেষ্টা ও ভুল-সংশোধনের বিষয়টিকে একেবারে অস্বীকার করেন না, তবে প্রকৃত শিক্ষণ প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধন পদ্ধতির মাধ্যমে সম্পন্ন হয় না। শিক্ষণ হল সমগ্র ও অংশের পারস্পরিক সংযোগ অবধারণ করা এবং তা সম্ভব হয় যখন অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে সমস্যার সমাধানের সূত্রটি পাওয়া যায়, আর তখনই ভ্রান্ত প্রচেষ্টাগুলি পরিত্যক্ত হয়।

অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে শিক্ষণ

গেস্টাল্টবাদীরা মনে করেন সব শিক্ষণই হল সমস্যার সমাধান (all learning is problem solving) সমস্যার সমাধানের অর্থ হল ব্যক্তির অতীত অভিজ্ঞতার পুনর্গঠন।

অন্তর্দৃষ্টি জাগরিত হলে সমগ্র প্রত্যক্ষণের ক্ষেত্রে (Total perceptual field) বস্তুর বিন্যাসের পরিবর্তন সূচিত হয়। প্রত্যক্ষণের ক্ষেত্রে যে বস্তুটি পটভূমিকায় (back ground) রয়েছে সেটি মূর্তিতে (figure) রূপান্তরিত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, কলার নাগাল পাবার পক্ষে অনুপযোগী বিচ্ছিন্ন বাঁশের টুকরোগুলি শিম্পাঞ্জীর কাছে অন্তর্দৃষ্টি জাগরিত হবার পূর্বে, ছিল মূর্তি এবং সেই টুকরোগুলির পারস্পরিক সম্বন্ধ ও তাদের সঙ্গে কলাটি নাগাল পাবার সম্পর্কের বিষয়টি ছিল প্রত্যক্ষণের ক্ষেত্রে পটভূমিকা-স্বরূপ। অন্তর্দৃষ্টি জাগরিত হলে যেটি পটভূমিকা ছিল সেটি মূর্তিতে এবং যেটি মূর্তি সেটি পটভূমিকায় পরিণত হল।

গেস্টাল্টবাদীদের মতে প্রত্যক্ষণের ধর্ম হল ভগ্নতা, ছেদ বা ফাঁক পূরণ করা। সে কারণে প্রত্যক্ষণের ক্ষেত্রে দেখা দেয় নতুন সংগঠন। সমগ্র এবং অংশের পারস্পরিক

ভগ্নতা পরিপূরণ

সম্বন্ধ প্রত্যক্ষণ করার জন্য প্রত্যক্ষণের বিষয়বস্তুটি নূতনভাবে সংগঠিত হয়। শিক্ষণের ক্ষেত্রেও রয়েছে এই ছেদ বা ফাঁক পূরণ (closure) এবং প্রত্যক্ষণজনিত সংগঠন। শিক্ষণের ক্ষেত্রে যখনই শিক্ষার্থীর মধ্যে অন্তর্দৃষ্টি জাগরিত হয় তখনই সে পরিস্থিতি ও পরিস্থিতির উপযোগী প্রতিক্রিয়া—এই দুইয়ের মধ্যে যে ফাঁক বা ছেদ থাকে তাকে পূরণ করে এবং পরিস্থিতিটিকে সমগ্রভাবে অবধারণ করার জন্য সমগ্র পরিস্থিতি ও অংশের পারস্পরিক সম্পর্ক উপলব্ধি করে প্রত্যক্ষ-ণের ক্ষেত্রটিকে নতুনভাবে সংগঠিত করে। গ্যারেট (Garrett)-এর ভাষায়, "কোন সমস্যার সমাধান বা উদ্দেশ্য প্রাপ্তি ছেদ পূরণ করে এবং শিক্ষার্থীর সক্রিয় অনুসন্ধানের পরিসমাপ্তি ঘটায়।"[1] এই অন্তর্দৃষ্টির উদ্ভবের ফলে প্রাণী সমস্যার সমাধানের জন্য যে যথাযথ প্রতিক্রিয়া অর্জন করে, ভবিষ্যতে অনুরূপ পরিস্থিতিতে যে সব সমস্যার উদ্ভব ঘটে সেগুলির সমাধানের জন্যও তাকে প্রয়োগ করতে সমর্থ হয়।

সমালোচনা (Criticism) : গুণ (Merit) : শিক্ষার ক্ষেত্রে এই মতবাদের মূল্য কম নয়। এই মতবাদ শিক্ষণের পরিস্থিতিকে একটি অবিচ্ছেদ্য সমগ্র পরিস্থিতিরূপে গণ্য করে এবং পরিস্থিতির বিভিন্ন অংশের পারস্পরিক সম্পর্ক অনুধাবন করে পরি-স্থিতিকে সমগ্রভাবে অনুধাবন করার কথা বলে। এই মতবাদ শিক্ষণের ক্ষেত্রে লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে এবং শিক্ষণের ক্ষেত্রে আকাঙ্ক্ষা, আগ্রহ এবং

---

1. Thus the solution of a problem or the attainment of a goal brings closure and ends the active search of the learner."
—H. E. Garrett : Great Experiments in Psychology, Page 69

মনোযোগের অবদান স্বীকার করে নেয়। বস্তুতঃ, শিক্ষণপরিস্থিতিকে যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করতে গেলে এইসব মানসিক প্রক্রিয়াকে অগ্রাহ্য করা চলে না।

শিক্ষার ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত শিক্ষণ-প্রক্রিয়া বিশেষ মূল্যবান, কারণ এ জাতীয় শিক্ষণ-পদ্ধতি মুখস্থ করার পদ্ধতিকে বাতিল করার পক্ষপাতী। এ জাতীয় শিক্ষণ-প্রক্রিয়া স্বল্প সময়সাপেক্ষ। এই প্রক্রিয়ায় পাঠ্যবিষয়ের অর্থ উপলব্ধি, সংগঠন ও সংহতির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। পাঠ্যবিষয়টি এমনভাবে রচিত হবে যাতে সেটি একটি অর্থপূর্ণ (meaningful) সমগ্রতা নিয়ে পাঠকের কাছে উপস্থিত হয়। এই শিক্ষণ-প্রক্রিয়া কল্পনা শক্তিকে, বিচারবুদ্ধিকে ও চিন্তার সামর্থ্যকে উন্নত করে। এই শিক্ষণ-প্রক্রিয়া সম্পর্কে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল শিক্ষার্থীর প্রাথমিক অন্তর্দৃষ্টি (initial insight) যা সহজাত এবং স্বতঃস্ফূর্ত সেই অন্তর্দৃষ্টিকে অভিজ্ঞতা এবং অনুকূল পরিবেশের সাহায্যে আরও গভীর করে তোলা যেতে পারে। আচরণকে সহায়তা করা, পরিচালিত করা ও উৎসাহিত করার প্রক্রিয়ার ওপর এই শিক্ষণ-প্রক্রিয়া গুরুত্ব আরোপ করে।

শিক্ষার ক্ষেত্রে গেস্টাল্ট মতবাদের মূল্য

দোষ (Defect) : শিক্ষার ক্ষেত্রে গেস্টাল্ট মতবাদের মূল্য স্বীকার করা হলেও, এই মতবাদেরও নানারকম সমালোচনা করা হয়েছে। সমালোচকদের মতে 'অন্তর্দৃষ্টি' শব্দটি বর্ণনামূলক, প্রকৃতপক্ষে এই শব্দটি কিছুই ব্যাখ্যা করে না। একটি শিশু একটি যান্ত্রিক খেলনা বেশ দ্রুত এবং নিপুণতার সঙ্গে চালনা করতে পারে এবং তার কার্যকলাপ বুঝে নিতে পারে ; সেক্ষেত্রে আমরা বলি শিশুটির অন্তর্দৃষ্টি আছে। কিন্তু যখন বলা হয় অন্তর্দৃষ্টি হল একটা নীতি বা সূত্র যার সাহায্যে প্রাণী যথাযথ প্রতিক্রিয়া করে, তখন তার অর্থ কি দাঁড়ায় ? গেস্টাল্টবাদীরা যখন অন্তর্দৃষ্টিকে প্রচেষ্টা ও ভুল-সংশোধন মতবাদ এবং সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া মতবাদের মতো এক ব্যাখ্যামূলক নীতি হিসেবে ব্যাখ্যা করতে চান তখনই সমালোচকরা আপত্তি করেন। তাছাড়া, শিক্ষার্থীর মধ্যে অন্তর্দৃষ্টি জাগরিত হওয়ার পূর্বে কতবার তাকে 'প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধন' পদ্ধতির মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হয়েছে, তা নির্ধারণ করা খুবই কঠিন। বস্তুতঃ শিক্ষণ-প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করলে এই 'প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধন' পদ্ধতিকে কোন মতেই উপেক্ষা করা যায় না। ছোটখাট কাজে প্রায়ই দেখা যায়—কি মানুষ, কি প্রাণী উভয়কেই এই পদ্ধতির মাধ্যমে অগ্রসর হতে হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না আকস্মিকভাবে কোন্ পদ্ধতিতে কাজটি সুসম্পন্ন হবে তা তার কাছে ধরা পড়ে। প্রকৃতপক্ষে এই অন্তর্দৃষ্টির উৎস যে 'প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধন' পদ্ধতি, তাই স্বাভাবিক মনে হয়।

দ্বিতীয়তঃ, কোয়াহ্লার প্রাণীদের নিয়ে যে-সব পরীক্ষণ করেছেন, সেই সব পরীক্ষণের

ক্ষেত্রে পরীক্ষকের উপস্থিতির বিষয়টিও সমালোচনার অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। খুব নির্দোষ পরীক্ষকের কাছ থেকেও প্রাণীরা সহজে সঙ্কেত বা ইঙ্গিত পেয়ে থাকে। তাছাড়া গেস্টাল্টবাদীদের অনেক পরীক্ষণের ফলাফল পরিসংখ্যানের দিক থেকে ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নি।

৬। শিক্ষণ সম্পর্কে সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়াবাদ (Conditioned Reflex of Learning Theory) :

প্যাভলভ (Pavlov) এবং ওয়াটসন (Watson) প্রমুখ আচরণবাদীদের মতে শিক্ষণ হল একটা যান্ত্রিক প্রক্রিয়া। সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়াবাদ অনুসারে সাপেক্ষ ও নিরপেক্ষ উদ্দীপক যদি বার বার একই সঙ্গে উপস্থাপিত হয় তাহলে কেবলমাত্র সাপেক্ষ উদ্দীপক বা কৃত্রিম উদ্দীপকটি উপস্থাপিত করেই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করা যেতে পারে। একটি ক্ষুধার্ত কুকুরের ওপর পরীক্ষণকার্য চালিয়ে প্যাভলভ দেখলেন যে, একটি ক্ষুধার্ত কুকুরকে খাদ্য দেওয়ার পূর্বে যদি নিয়মিতভাবে ঘণ্টা বাজান হয়, তাহলে শুধুমাত্র ঘণ্টার ধ্বনি শুনে তার লালা নিঃসরণ হয়। আবার একটি শিশুকে একটি খেলনা দেবার সময় যদি প্রতিবারই বিকট চিৎকার করা হয়, তাহলে শুধুমাত্র খেলনাটি দেখেই তার মনে ভীতির সঞ্চার হয়। উভয় দৃষ্টান্তই সাপেক্ষীকরণের দৃষ্টান্ত। প্যাভলভের মতে সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়ার সাহায্যে সব প্রকারের শিক্ষণ-পদ্ধতিকে ব্যাখ্যা করা চলে। তাঁর মতে জটিল শিক্ষণ প্রক্রিয়া একাধিক সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়ার দীর্ঘ শৃঙ্খল (a long chain of conditioned reflexes)। ওয়াটসন প্রমুখ আচরণবাদীরাও শিক্ষণ-প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্যাভলভের এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তাঁদের মতেও শিক্ষণ হল একটা যান্ত্রিক প্রক্রিয়া এবং সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়ার ওপর এর ভিত্তি। আচরণবাদীরা সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়ার সাহায্যে শিক্ষণ প্রক্রিয়ার ওপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেন, কেননা—ইচ্ছা, আশা, প্রত্যাশা, অন্তর্দৃষ্টি প্রভৃতি ধারণার সাহায্যে শিক্ষণ-প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করার তাঁরা মোটেই পক্ষপাতী নন। তাছাড়া, এজাতীয় ধারণাকে তাঁরা মনোবিদ্যা থেকে বর্জন করার পক্ষপাতী।

শিক্ষণ হল যান্ত্রিক প্রক্রিয়া

শিক্ষণ প্রক্রিয়া একাধিক সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়ার দীর্ঘ শৃঙ্খল

প্যাভলভ (Pavlov) এবং বেকটেরেভ প্রমুখ রুশদেশীয় বৈজ্ঞানিকগণ সাপেক্ষীকরণ সংক্রান্ত গবেষণা করেছিলেন উচ্চতর প্রাণীদের নিয়ে। কিন্তু ক্রাসনোগ্রস্কি (Krasnogrosky), ল্যাসলে (Lashely) প্রমুখ গবেষকবৃন্দ মানুষের ক্ষেত্রেও তাঁদের গবেষণার ক্ষেত্রকে প্রসারিত করে দেখালেন যে, মানুষের শিক্ষণও সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া-

শৃঙ্খল ছাড়া কিছুই নয়। একটি শিশু 'পাখী' কি তা জানে। যখনই সে পাখী দেখে, তখনই যদি 'পাখী' শব্দটি উচ্চারণ করা হয় তাহলে সে শব্দটি সহজেই শিক্ষা করতে পারে। পূর্বোক্ত সহজ শিক্ষণ-পদ্ধতির মতো যে-কোন জটিল শিক্ষণ-পদ্ধতিকেও সাপেক্ষীকরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে—উভয় ক্ষেত্রে শিক্ষণের পদ্ধতি একই—অর্থাৎ, জানা বিষয়ের সঙ্গে অনুষঙ্গবদ্ধ করে অজানাকে জানা।

প্যাভলভের মতে সবরকম শিক্ষণের মূলসূত্র হল সাপেক্ষীকরণ অনাপেক্ষীকরণ (Conditioning and deconditioning)। রাস্তার লাল আলোর সঙ্কেত প্রত্যক্ষ করা মাত্র গাড়ীর চালকের গাড়ী থামান সাপেক্ষীকরণের ফল। শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে প্রবেশ করামাত্র ছাত্র যে দণ্ডায়মান হয়ে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে, শিশুর এই আচরণও সাপেক্ষীকরণের ফল। আবার অনাপেক্ষীকরণের মাধ্যমে শিশুর অনেক কু-অভ্যাস, অশিষ্ট আচরণ, ভুল প্রতিক্রিয়াকে দূর করা যেতে পারে।

থর্নডাইকের সঙ্গে প্যাভলভের পার্থক্য: প্রথমতঃ, থর্নডাইক 'প্রচেষ্টা ও ভুল-সংশোধনে'র মাধ্যমে শিক্ষণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন, কিন্তু প্যাভলভ এই পদ্ধতিব ওপর কোন গুরুত্ব আরোপ করেন নি। দ্বিতীয়তঃ, থর্নডাইকের মতে প্রাণী বিশেষ দৈহিক ভঙ্গিমার পারম্পর্য কতখানি শিক্ষা করেছে, তাই হল গুরুত্বপূর্ণ। প্যাভলভের কাছে স্বাভাবিক উদ্দীপকের পরিবর্তে কৃত্রিম বা বিকল্প উদ্দীপকের ওপব প্রাণী প্রতিক্রিয়া করেছে কিনা তাই হল লক্ষ্য করাব বিষয়। থর্নডাইক একটি বিশেষ অবস্থায়, প্রাণী বার বার প্রচেষ্টা ও ভুল-সংশোধনের দ্বারা উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সংযোগ প্রতিষ্ঠা করতে পারছে কিনা তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন, কিন্তু প্যাভলভ, প্রাণীর সহজাত বৃত্তিকে তৃপ্ত করার জন্য কোন স্বাভাবিক উদ্দীপকের সঙ্গে যুক্ত কৃত্রিম উদ্দীপকের ক্ষেত্রে প্রাণী কিভাবে প্রতিক্রিয়া করে তারই ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

থর্নডাইকের সঙ্গে প্যাভলভের পার্থক্য

সমালোচনা (Criticism): দোষ (Defect): প্যাভলভ এবং ওয়াটসন্ প্রমুখ আচরণবাদীরা শিক্ষণ-প্রক্রিয়ার যে যান্ত্রিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা গ্রহণযোগ্য নয়। শিক্ষণ-প্রক্রিয়াকে সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়ার সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায় না। কেননা—ইচ্ছা, অভিপ্রায়, উদ্দেশ্য অর্থাৎ শিক্ষণপ্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে যে মানসিকতা বর্তমান, তাকে বর্জন করে শিক্ষণ-প্রক্রিয়ার কোন যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়। জটিল শিক্ষণ-প্রক্রিয়াকেও একাধিক সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়ার দীর্ঘ শৃঙ্খল মনে করা যুক্তিযুক্ত নয়। শিক্ষণ সরল বা জটিল যাই হোক না কেন, নিছক দেহ-প্রক্রিয়া নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিক্ষণের উদ্দেশ্য কোন

শিক্ষার ক্ষেত্রে সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া প্রয়োগের দোষ-ত্রুটি

লক্ষ্য সাধন করা এবং এই লক্ষ্যকে বাদ দিয়ে কেবলমাত্র দৈহিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে শিক্ষণ-প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করা যায় না। এই প্রসঙ্গে বোয়াজ (Boaz) বলেন, "সরল বা এমন কি জটিল অঙ্গসঞ্চালনমূলক ক্রিয়া ও নৈপুণ্য শিক্ষা করার জন্য, এই ব্যাখ্যা কার্যকর হতে পারে। কিন্তু আমাদের সব রকম ভাবমূলক শিক্ষা, যেমন পদার্থবিদ্যার আপেক্ষিকতাবাদকেও সাপেক্ষীকরণ প্রক্রিয়ার সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হলে, এই পদ্ধতিকে এর সীমার বাইরে প্রয়োগ করা হবে।"[1]

গুণ (Merit): তবে সাপেক্ষীকরণ পদ্ধতির কোন উপযোগিতা শিক্ষার ক্ষেত্রে নেই, একথা বলা চলে না। এই প্রক্রিয়ার সাহায্যে স্কুলের অনেক পাঠ্যবিষয়, যেমন—পড়া, লেখা, বানান অভ্যাস প্রভৃতি বেশ ভালভাবে আয়ত্ত করা যায়। অনেক বিষয় এই প্রক্রিয়ার সাহায্যে আমরা ভালভাবে আয়ত্ত করতে পারি এবং সে কারণেই কোন একটি ভাষা শিক্ষা করতে হলে, যে সমাজে সেই ভাষা ব্যবহার করা হয়, সে সমাজে থেকেই এই ভাষাকে সহজে আয়ত্ত করা যায়। সাপেক্ষীকরণ পদ্ধতির সাহায্যে নিয়মানুবর্তিতা শিক্ষা করা সহজতর হয়। সৎ মনোভাব, অভ্যাস, সৎ গুণ এবং আদর্শ যেগুলি নিয়মানুবর্তিতার উপাদান সেগুলি এই সাপেক্ষীকরণ পদ্ধতির সহায়তায় বেশ ভালভাবেই শিক্ষা করা যায়।"[2]

শিক্ষার ক্ষেত্রে সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়ার উপযোগিতা

৭। মানুষের শিক্ষণ পদ্ধতি (Human Learning):

মানুষ ও ইতর প্রাণীর শিক্ষণ পদ্ধতির মধ্যে কয়েক বিষয়ে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। ইতর প্রাণী যেমন প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধন পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষা লাভ করে।

---

1. ".........Of course, in the case of learning simple or even complex motor activities and skills this explanation may work well. But it will be stretching the point beyond its limit, if an attempt, is made to explain all our ideationa learning such as learning the theory of relativity in physics, as a process o conditioning."

—G. D. Boaz : Educational Psychology, Page 16

2- "Discipline may be caused through conditioning. Good sentiments, good habits, virtues and ideals etc. which are component of discipline are effectively learnt through the process of conditioning."

—R. P. Bhatnagar : A Study of Educational Psychology ; Page 16

মানুষও অনেক ক্ষেত্রে ঐরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে শিক্ষালাভ করে। আবার মানুষ যেমন সাধারণতঃ অন্তদৃষ্টির সাহায্যে সমগ্র পরিস্থিতির সঙ্গে অংশবিশেষের সংযোগ উপলব্ধি করে সমস্ত সমস্যাটিকে সামগ্রিকভাবে অবধারণ করার পর, কোন উদ্দীপকের ওপর প্রতিক্রিয়া করে, সেরূপ মাঝে মাঝে মনুষ্যেতর প্রাণীর মধ্যেও এইরূপ অন্তদৃষ্টির জাগরণ লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া, মানুষ ও ইতর জীব উভয়ের শিক্ষণের মূলেই আছে প্রেষণা। কোন প্রতিক্রিয়া করার জন্য যে শক্তির প্রয়োজন, প্রেষণা সেই শক্তিকে শক্তিশালী করে এবং বিশেষ একটি উদ্দেশ্যের অভিমুখে চালিত করে। ইতর প্রাণীদের নিয়ে যেসব পরীক্ষণকার্য চালান হয়েছে সেসব ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গেছে যে, ইতর প্রাণী দ্রুতগতিতে এবং নিপুণতার সঙ্গে শিক্ষা লাভ করে, যদি শিক্ষার পেছনে থাকে শক্তিশালী প্রেষণা। অবশ্য ইতর প্রাণীর ক্ষেত্রে খাদ্য, জল, শাবকরক্ষা, আত্মরক্ষা এবং সঙ্গমেচ্ছা হল সাধারণ প্রেষণা। যে প্রাণী একেবারেই ক্ষুধার্ত নয়, তাকে খাঁচায় মধ্যে রেখে যদি বাইরে খাদ্য রাখা হয়, তাহলে ঐ প্রাণীরা খাঁচা থেকে বাইরে আসার কৌশল শিক্ষা করতে দীর্ঘ সময় লাগবে। কিন্তু যদি প্রাণীটি ক্ষুধার্ত হয় তাহলে তার শিক্ষণ খুব দ্রুত হবে। মানুষের শিক্ষণ-প্রক্রিয়ার মূলে এই প্রেষণার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের ক্ষেত্রে জৈবিক তাড়নার প্রেষণা আছে বটে; কিন্তু কেবলমাত্র জৈবিক তাড়নার প্রেষণাই মানুষকে কার্য করায় না। শিশুর ক্ষেত্রে জৈবিক তাড়না প্রেষণা হিসেবে কাজ করে, কিন্তু বয়স্ক ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রেষণার রূপান্তর ঘটে। মানুষের শিক্ষণ পদ্ধতির ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত উপাদানগুলি প্রেষণার ওপর বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে।

মানুষ ও ইতর প্রাণীর শিক্ষণ পদ্ধতির মধ্যে কয়েক বিষয়ে সাদৃশ্য

মানুষের শিক্ষণের মূলে প্রেষণার গুরুত্ব। মানুষের শিক্ষণ পদ্ধতির ক্ষেত্রে কতকগুলি উপাদান প্রেষণার ওপর প্রভাব বিস্তার করে

(i) **আকাঙ্ক্ষার স্তর** (Level of Aspiration): অন্যান্য অবস্থা যদি অপরিবর্তিত থাকে, তবে শিক্ষণের ক্ষেত্রে কৃতিত্ব বিশেষভাবে নির্ভর করে ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষার ওপর। নিজের সামর্থ্যের বা দক্ষতার মূল্যায়ন এবং বিশেষ একটি মানে পৌছানোর ইচ্ছাই আকাঙ্ক্ষার স্তর নির্ধারণ করে। এই আকাঙ্ক্ষা যতই উচ্চ হয়, প্রেষণাও ততই বলবতী হয়। আবার অতীত সফলতা ও বিফলতার অভিজ্ঞতাও মানুষের শিক্ষণের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তির নিজের সামর্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা, অতীতের সাফল্য ও বিফলতা সম্পর্কীয় অভিজ্ঞতা এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা এই আকাঙ্ক্ষার স্তর নির্ধারণ করে। অবশ্য কোন ব্যক্তি যদি তার সামর্থ্যের বহু উর্ধ্বে তার আকাঙ্ক্ষাকে স্থাপন করে তাহলে সেই আকাঙ্ক্ষার স্তরে উপনীত হতে ব্যর্থতা, ব্যক্তির মধ্যে হীনমন্যতাবোধ

(Inferiority Complex) জাগাতে পারে এবং তার পরিবেশও ব্যক্তিদের প্রতি আক্রোশের সৃষ্টি করতে পারে।

(ii) **শিক্ষা গ্রহণের আগ্রহ** (The Intention to learning) : প্রেষণার শক্তি যতই তীব্র হোক না কেন শিক্ষণের আগ্রহ মানুষের শিক্ষণ-প্রক্রিয়ার ওপর বিশেষ-ভাবে প্রভাব বিস্তার করে।

(iii) **প্রায়োগিক দৃষ্টিভঙ্গি** (Pragmatic outlook) : শিক্ষাসব্ধ অভিজ্ঞতাকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার বিষয়টিও প্রেষণার ওপর প্রভাব বিস্তার করে। ব্যবহারিক জীবনে উদ্দেশ্যসাধনের পক্ষে যদি শিক্ষণীয় বিষয়টির কোন উপযোগিতা না থাকে, তাহলে ঐ বিষয় শিক্ষা করার ব্যাপারে ব্যক্তির প্রেষণা বলবতী হয় না।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, মানুষের শিক্ষণ পদ্ধতিতে প্রেষণার অবদান বিশেষ গুরুত্ব-পূর্ণ। পুরস্কার ও শাস্তি অনেক সময় প্রেষণা হিসেবে কাজ করে এবং যেহেতু পুরস্কার কোন কার্যের সফলতার সঙ্গে সংযুক্ত ; সেহেতু শাস্তির তুলনায় পুবস্কারের ভূমিকা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। পুরস্কার শিক্ষণ-প্রক্রিয়াকে অধিকতর কার্যকর করে। শাস্তি অনেক সময় শিক্ষার্থীর মনে অবাঞ্ছনীয় আবেগের সৃষ্টি করে এবং শাস্তির ভয়ে কোন কিছু শিক্ষা করলে তার ফলও সবসময় দীর্ঘস্থায়ী হয় না। অনেকের মতে প্রশংসা ও নিন্দার মূল্য শিক্ষণের ক্ষেত্রে কম নয়। কারও কারও মতে প্রেষণা হিসেবে প্রতিযোগিতাব (Competetion)-ও শিক্ষণেব ক্ষেত্রে বিশেষ মূল্য আছে, তবে কেউ কেউ প্রতি-যোগিতার ওপর তেমন গুরুত্ব আরোপ করতে নারাজ। তাঁদেব মতে প্রতিযোগিতা‍র ব্যাপারটি যদি একটি নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম কবে যায় তাহলে তা শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের ওপর অবাঞ্ছনীয় ও অসুস্থ প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে, যার ফলে শিক্ষার্থীব মধ্যে অসামাজিক মনোভাবের সৃষ্টি হতে পারে।

৮। ইতর প্রাণীর শিক্ষণ ও মানুষের শিক্ষণের তুলনামূলক আলোচনা (Animal Learning and Human Learning—A Comparison) :

ইতর প্রাণী এবং মানুষের শিক্ষণের ক্ষেত্রে একাধিক পরীক্ষণকার্য চালিয়ে উভয়ের শিক্ষণের মধ্যে কতকগুলি উল্লেখযোগ্য তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। (১) মানুষের শিক্ষণ-প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে এই তারতম্য বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হবার কারণ মানুষ বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন এবং ভাষা ব্যবহারের ক্ষমতাসম্পন্ন জীব। স্মৃতিতে অতীত বিষয়ের পুনরুজ্জীবন এবং তার পুনরুদ্রেক মানুষের প্রক্রিয়াকে সহজতর করে তোলে।

ইতর প্রাণী ও মানুষের শিক্ষণের মধ্যে তারতম্য

(২) মানুষের শিক্ষণ-প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে অধিকতর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। ইতর জীব যে পরিমাণে প্রচেষ্টা ও ভুল-সংশোধন পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষা করে, মানুষ সেই পরিমাণে এই পদ্ধতির সহায়তা গ্রহণ করে না।

মানুষের শিক্ষণ-প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে অধিকতর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয়

(৩) মানুষের স্মৃতিশক্তি উচ্চস্তরের, যেহেতু মানুষ কোন সমস্যা সমাধানের জন্য অতীত অভিজ্ঞতার যথোপযুক্ত সদ্ব্যবহার করতে সক্ষম। এর ফলে মানুষ কম শক্তি প্রয়োগ করে এবং অল্প সময়ের মধ্যে কোন পরিস্থিতিতে যথোপযুক্ত প্রতিক্রিয়া করতে সমর্থ হয়। ফলে মানুষ তার মূল্যবান সময় ও শক্তিকে অযথা অপচয়ের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে।

মানুষের উচ্চতর স্মৃতিশক্তি শিক্ষণের সহায়ক

(৪) মানুষ উচ্চতর চিন্তন-শক্তির অধিকারী। অমূর্ত বিষয়ের চিন্তন, সম্বন্ধঘটিত চিন্তন, পৃথকীকরণ, সামান্যীকরণ, অবরোহমূলক ও আরোহমূলক যুক্তিপদ্ধতি গঠন মানুষের শিক্ষণ-প্রক্রিয়াকে সহজতর করে তোলে। প্রত্যয় বা সামান্য ধারণা গঠনের ক্ষমতা, ভবিষ্যৎদৃষ্টি এবং গঠনমূলক কল্পনাশক্তির অধিকারী হওয়ার জন্য ইতর জীবের তুলনায় মানুষের শিক্ষণকার্য অনেক সহজে সম্পন্ন হয়।

উচ্চতর চিন্তন-শক্তি

(৫) ভাষা ব্যবহারের ক্ষমতা ও মানুষকে দ্রুত বিষয় আয়ত্ত করতে সহায়তা করে। মানুষ অপরের অভিজ্ঞতার বিবরণ পাঠ করেও নানা বিষয় শিক্ষা করে। নাম, সংখ্যা প্রভৃতি প্রতীকের সাহায্যে মানুষের শিক্ষণকার্য ইতর প্রাণীর শিক্ষণকার্যের তুলনায় অধিকতর সংক্ষেপে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়।

ভাষা ব্যবহারের ক্ষমতা

(৬) মানুষ ইতর জীবের তুলনায় অনুকরণের সাহায্যে অধিকতর শিক্ষালাভে সমর্থ। কোন কোন উচ্চতর ইতর জীব অনুকরণ শক্তির অধিকারী, কিন্তু মানুষের অনুকরণ শক্তির তুলনায় সে শক্তি একান্তই সীমাবদ্ধ।

অনুকরণের সাহায্যে শিক্ষা

(৭) চিন্তন, কল্পনা প্রভৃতি উচ্চতর মানসিক প্রক্রিয়ার অধিকারী হওয়াতে মানুষ অতীত ও ভবিষ্যতের বহু বিষয় শিক্ষা করতে পারে, কিন্তু ইতর প্রাণীর শিক্ষা বর্তমান বিষয়েই কেন্দ্রীভূত।

(৮) ইতর প্রাণীকে নিয়ে পরীক্ষা চালাতে গিয়ে দেখা গেছে যে, তাদের ক্ষেত্রে জৈবিক প্রেষণাকে ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে, কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে সে পরিমাণ

নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়। মানুষ ইতর প্রাণীর তুলনায় তার প্রেষণাগুলিকে আরো ভালভাবে সংগঠিত করতে পারে।

(৯) মনোবিদ্ উডওয়ার্থ ইতর প্রাণীর শিক্ষণের তুলনায় মানুষের শিক্ষণের উৎকর্ষ নির্ধারণ প্রসঙ্গে বলেছেন যে, মানুষ উচ্চতর পর্যবেক্ষণ শক্তির অধিকারী, সে কারণে মানুষ তার পরিবেশ, অন্যান্য ব্যক্তি, বিষয় ও ঘটনার এমন অনেক বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ করতে সমর্থ হয়, যা ইতর জীবের পক্ষে সম্ভব নয়।

Questions

1. What is Learning ? What are its characteristics ?

2, What is the psychological problem of learning ?

3. Explain fully, Thorndike's Theory of Learning by Trial and Error. How does Thorndike's Theory differ from Pavlov's Theory of Learning by Conditioning ?

4. Discuss the merits and demerits of the Trial and Error theory of Learning. Discuss in this connection the role of intelligense in learning.

5. Elucidate with an example the Trial and Error theory of learning and suggest the reasons for the gradual fixation of correct responce.

6. Explain Thorndike's Laws of learning, How far are they acceptable.

7. Discuss critically Pavlov's Theory of Learning by Conditioning.

8. What is Learning ? Critically examine the Gestalt Theory of Learning ?

9. How do human beings learn ? How does human learning differ from animal learning ?

10. What is learning ? What are the methods of attaining efficiency in learning ?

11. Write short notes on :

(a) Thorndike's Laws of learning ?

(b) Insight theory of learning.

(c) Thorndike's Law of Exercise.

12. State and explain any two theories of Learning. Which one of these theories is acceptable to you ? Give reason for your answer.

13. Describe, after Thorndike the Trial and Error theory of learning. How does it differ from the insight theory of learning ? What is meant by insight in this context.

14. What is learning ? Critically examine the Gestalt theory of learning.

15. Examine the laws of learning formulated by Thorndike.

16. What are the efficient methods of learning ? Refer to some studies made in this connection.

নবম অধ্যায়

আবেগ বা প্রক্ষোভ

যেহেতু আবেগ বা প্রক্ষোভ হল এক ধরনের জটিল অনুভূতি, সেহেতু আবেগের আলোচনার পূর্বে অনুভূতি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা দরকার।

১। অনুভূতির স্বরূপ (Nature of Feeling):

অনুভূতি শব্দের একাধিক অর্থ

'অনুভূতি' (feeling) শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। আমরা বলি, এই বস্তুটি শক্ত বা কোমল, গরম বা ঠাণ্ডা অনুভূত হচ্ছে। আমরা ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্লান্তি, সুস্থতা, অসুস্থতা অনুভব করার কথা বলে থাকি। আমরা স্বস্তি বা অস্বস্তি অনুভব করার কথাও বলে থাকি। আমরা আশান্বিত বোধ করি, বা বিষণ্ণ বোধ করি, আমরা বিরক্তি বোধ করি, বা অস্থিরতা বোধ করি, আমরা সুখ-দুঃখ রূপ অনুভূতির কথা বলে থাকি; আবার ক্রোধ বা ভয় অনুভব করার কথাও বলে থাকি। আবার কোন অভিযোগের অসুবিধা,কোন যুক্তির সত্যতা,কোন চরিত্রের মহত্ব বা কোন বিশ্বাসের যাথার্থ্য বোধের কথাও বলে থাকি। কাজেই আমাদের যে কোন মানসিক প্রক্রিয়া প্রসঙ্গে আমরা অনুভূতি শব্দটিকে ব্যবহার করে থাকি।

স্পেন্সার এবং মিল্ এর অভিমত

মনোবিদ্ স্পেন্সার এবং মিল সকল রকম চেতনার অবস্থা-প্রসঙ্গে অনুভূতি কথাটিকে ব্যবহার করেছেন। কখনও বা প্রত্যক্ষ চেতনা (Immediate consciousness) বোঝাতে অনুভূতি শব্দটিকে ব্যবহার করা হয়। যেমন, আমি আমার মৃত বন্ধুটির উপস্থিতি অনুভব করছি—এরূপ কথা আমরা বলে থাকি। আবার কখনও স্পর্শগত প্রত্যক্ষণকেও অনুভূতির সঙ্গে এক করে দেখা হয়—যেমন, ডাক্তার নাড়ী অনুভব করছেন (feels the pulse)।

মনোবিদ্যায় জ্ঞানমূলক এবং ইচ্ছামূলক মানসিক অবস্থা বোঝাবার জন্য কখনও অনুভূতির ব্যবহার করা হয় না। যে মানসিক অবস্থা সুখ-দুঃখ এবং কতকগুলি আবেগের অভিজ্ঞতাবোধের নির্দেশ দেয়, তাকেই অনুভূতি বলা হয়।

অনুভূতি হল মৌলিক অভিজ্ঞতা, সে কারণে অনুভূতির যুক্তিশাস্ত্রসম্মত সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয়। তবে অনুভূতির সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করে আমরা অনুভূতির স্বরূপকে বুঝে নিতে পারি এবং এই বৈশিষ্ট্যগুলির ভিত্তিতে অনুভূতির মোটামুটি একটা সংজ্ঞা দিতে পারি।

(ক) **অনুভূতি মৌলিক অভিজ্ঞতা**, সংবেদন (sensation)-এর গুণ বা বৈশিষ্ট্য নয়।

(খ) **অনুভূতি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বিষয়** (Subjective experience) : কোন ব্যক্তির অনুভূতি একান্তভাবে তার নিজের, অপর ব্যক্তির পক্ষে তার অংশ গ্রহণ করা সম্ভব নয়। প্রতিটি লোকের অনুভূতি তার নিজস্ব অনুভূতি। একই ঘটনা বা বিষয় বিভিন্ন ব্যক্তির মনে বিভিন্ন ধরনের অনুভূতি সৃষ্টি করে। যে ঘটনা কোন ব্যক্তির মনে আনন্দের অনুভূতি সৃষ্টি করে, সেই একই ঘটনা অপর ব্যক্তির মনে দুঃখের অনুভূতি সৃষ্টি করে।

তবে অনুভূতি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বিষয় হলেও বাহ্যবস্তু বা ঘটনার সঙ্গে অনুভূতির কোন রকম সম্বন্ধ নেই, এ ধারণা করলে ভুল হবে ; কারণ অনেক সময় বাহ্যবস্তু বা ঘটনার সঙ্গে সংযোগ ঘটার জন্য ব্যক্তির মনে অনুভূতির সঞ্চার হয়।

(গ) **নিষ্ক্রিয়তা** (Passivity) **অনুভূতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য** : অনুভূতি স্বতঃস্ফূর্তভাবে ব্যক্তির মনে দেখা দেয়। কারও পক্ষে জোর করে অনুভূতি সৃষ্টি করা সম্ভব নয়, সুখজনক ঘটনা ঘটলে ব্যক্তির মনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সুখের অনুভূতি জাগে। পায়ের কাছে হঠাৎ যদি কেউ সাপ দেখে তাহলে মনে ভয় জাগে, আবার কারও কটু কথায় মনে আপনা থেকেই ক্রোধের সঞ্চার হয়। এ প্রসঙ্গ মনে রাখা দরকার যে, অনুভূতি নিষ্ক্রিয় মানসিক অবস্থা হলেও যে কোন নিষ্ক্রিয় মানসিক অবস্থা অনুভূতি নয়। সংবেদনও একপ্রকার নিষ্ক্রিয় মানসিক অবস্থা, কিন্তু তাই বলে সংবেদন অনুভূতি নয়।

ম্যাকডুগাল, উডওয়ার্থ প্রমুখ মনোবিদ্‌গণ অনুভূতিকে সক্রিয় মানসিক বৃত্তি মনে করেন। তাঁদের মতে অনুভূতি সুখজনক বস্তু পাবার এবং দুঃখজনক বস্তু পরিহার করার মনোভাব ও প্রবণতা। কিন্তু মনোভাব-প্রবণতা সক্রিয় নয়, সক্রিয়তার প্রস্তুতি মাত্র ; সে কারণে উপরোক্ত মনোবিদ্‌দের অভিমত যুক্তিযুক্ত মনে হয় না।

(ঘ) **যে-কোন অনুভূতির মধ্যে একটা উত্তেজনা বা অসাড়তার ভাব থাকে**।[1] আনন্দের মধ্যে উত্তেজনা আছে। ক্রোধের মধ্যেও উত্তেজনার ভাব আছে। দুঃখের মধ্যে একটা অসাড়তার (numbness) ভাব আছে। যে কোন অনুভূতিকে উত্তেজনা-অসাড়তা পরিসরের (exciteness-numbness dimension) কোন-না-কোন স্থানে অবস্থান করতেই হবে।

(ঙ) **অনুভূতি হয় সুখের কিংবা দুঃখের হবে**। প্রত্যেক অনুভূতি হয় সুখকর

---

1. 'All the feelings also have a certain tone of excitement or numbness'.
—G. D. Boaz : General Psychology : Page 143.

কিংবা দুঃখজনক হয়। সুখ-দুঃখ এই দুই বিপরীত গুণের একটি যে-কোন অনুভূতির মধ্যে থাকবেই।

অবশ্য অনেক মনোবিদ্ পূর্বোক্ত বিষয়টি স্বীকার করতে চান না, তাঁদের মতে যে-কোন অনুভূতিকেই যে সুখের কিংবা দুঃখের হতে হবে এমন কোন কথা নেই। এমন অনুভূতিও থাকতে পারে যা সুখেরও নয়, দুঃখেরও নয়, সেগুলি সুখ-দুঃখ নিরপেক্ষ (neutral feelings), যেমন—বিস্ময়ের অনুভূতি। দ্বিতীয়তঃ, ভয়, ক্রোধ, প্রভৃতি আবেগের সঙ্গে যদিও সুখ কিংবা দুঃখ জড়িয়ে থাকে, তাহলেও সুখ-দুঃখই অনুভূতির একমাত্র গুণ নয়। ভয়, ক্রোধ প্রভৃতি আবেগের নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য আছে।

(চ) মনোবিদ্ হফডিং-এর মতে অনুভূতির ক্ষেত্রে আপেক্ষিক সূত্র (Law of Relativity) ক্রিয়া করে। অনুভূতি শারীরিক এবং মানসিক অবস্থার ওপর নির্ভর করে। একই উদ্দীপক কারও মনে সুখ কারও মনে দুঃখ উৎপন্ন করে। মানসিক অবস্থা, যেমন—আশা, নৈরাশ্য, উদ্বেগ অনুভূতির ওপর প্রভাব বিস্তার করে।

অনুভূতির সংজ্ঞা

সুতরাং, পূর্বোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে আমরা অনুভূতির মোটামুটি একটা সংজ্ঞা দেবার চেষ্টা করতে পারি। **অনুভূতি হল নিতান্ত ব্যক্তিগত নিষ্ক্রিয় মানসিক অবস্থা যা অনুভবকারীর মনে উত্তেজনা বা অসাড়তা সৃষ্টি করে এবং যা হয় সুখজনক কিংবা দুঃখজনক।**

২। অনুভূতির শর্ত বা সুখ-দুঃখ সম্বন্ধীয় নীতি (Conditions of Feeling of Laws of Pleasure and Pain):

অনুভূতি হয় সুখজনক কিংবা দুঃখজনক—এই দুটির যে কোন একটি রূপ ধারণ করে অনুভবকারীর নিকট আত্মপ্রকাশ করে। প্রতিটি অনুভূতি হয় সুখজনক কিংবা দুঃখজনক হবে। সুতরাং অনুভূতির শর্ত বা কারণ নির্ধারণ করার অর্থ সুখ-দুঃখের নিয়মগুলিকে নির্ধারণ করা। এই সম্বন্ধে তিনটি নীতি আছে—

সুখ-দুঃখের তিনটি নীতি

(ক) **উদ্দীপন সম্বন্ধীয় নীতি** (Law of Stimulation), (খ) **পরিবর্তন সম্বন্ধীয় নীতি** (Law of Change) এবং (গ) **সামঞ্জস্য ও অসামঞ্জস্য সম্বন্ধীয় নীতি** (Law of Harmony and Discord)।

(ক) **উদ্দীপন সম্বন্ধীয় নীতি** (Law of Stimulation): **উদ্দীপনার তীব্রতা যদি মাঝারি ধরনের হয় তাহলে তা সুখদায়ক, কিন্তু উদ্দীপনা যদি অতিরিক্ত তীব্র হয় বা খুব বড় বেশী ক্ষীণ বা দুর্বল হয়,তাহলে তা দুঃখজনক**

হয়। সোজা কথায়, কোন কিছুর অতিরিক্ততা হল দুঃখদায়ক—সুখ পেতে হলে চরম সীমাকে এড়িয়ে মধ্যপন্থা অবলম্বনই শ্রেয়ঃ। তীব্র আলোক, বিকট শব্দ বেদনাদায়ক অনুভূতির সৃষ্টি করে। অপরপক্ষে, খুব ক্ষীণ আলোক, খুব ক্ষীণ শব্দও পীড়াদায়ক। মাঝামাঝি আলোক বা মাঝারি তীব্রতাবিশিষ্ট শব্দ চক্ষু ও কর্ণের পক্ষে তৃপ্তিদায়ক।

কিন্তু এই নিয়মেরও ব্যতিক্রম আছে। উদ্দীপনার শুধু পরিমাণ নয়, উদ্দীপনার গুণও সুখ-দুঃখের অনুভূতি সৃষ্টি করে। যে বস্তু স্বভাবতঃই অপ্রীতিকর তা যে পরিমাণেই ব্যবহার করা হোক না কেন, অপ্রীতিকর অনুভূতির সৃষ্টি করে। যেমন, কুইনাইনের আস্বাদ তিক্ত, তা অল্প পরিমাণে বা বেশী পরিমাণে, মাঝারি পরিমাণে—যে পরিমাণেই গ্রহণ করা হোক না কেন, অপ্রীতিকর অনুভূতিই সৃষ্টি করে।

ব্যতিক্রম

(খ) **পরিবর্তন সম্বন্ধীয় নীতি** (Law of Change) : **উদ্দীপকের পরিবর্তন এবং বৈচিত্র্য সুখদায়ক। অপরপক্ষে, উদ্দীপকের বৈচিত্র্যহীনতা বা একঘেয়েমি, অর্থাৎ একই বিষয়ের নীরস পুনরাবৃত্তি বেদনাদায়ক।** এই জন্যই মানুষ জীবনে বৈচিত্র্য আকাঙ্ক্ষা করে। আমরা একই জায়গায় থাকতে ভালবাসি না, নতুন নতুন দেশ দেখতে বেরিয়ে পড়ি। যত ভাল খাবার হোক না কেন, আমরা খাদ্যে বৈচিত্র্য চাই; নিত্য নতুন সঙ্গি খুঁজি, নতুন নতুন পোষাক পরতে ভালবাসি। বৈচিত্র্যই জীবনের মশলা।

এই নিয়মেরও ব্যতিক্রম আছে। প্রথমতঃ, বড় বেশী দ্রুত পরিবর্তন সুখকর হয় না। কারণ, পরিবর্তন খুব বেশী দ্রুত সংগঠিত হলে মন পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে চলতে পারে না। খুব দ্রুত যদি একটির পর একটি গান আমাদের সামনে গাওয়া হয় তাহলে কোন গানই আমরা ভালভাবে উপভোগ করতে পারি না। দ্বিতীয়তঃ, পরিবর্তন যদি সুখজনক অবস্থা থেকে দুঃখজনক অবস্থায় নিয়ে যায়, তাহলে দুঃখজনক অবস্থা আরও বেশী দুঃখজনক বলে মনে হয়। তৃতীয়তঃ, বেদনাদায়ক ঘটনার বৈচিত্র্যহীন পুনরাবৃত্তি অনেক সময় বেদনাদায়ক ঘটনাকে অভ্যাসের বশে বেদনামুক্ত বা সুখকর করে তোলে। যাকে রোজই দীর্ঘপথ অতিক্রম করতে হয়, প্রথম প্রথম সে অভিজ্ঞতা পীড়াদায়ক হলেও, পরে তা আর বেদনাদায়ক মনে হয় না।

ব্যতিক্রম

(গ) **সামঞ্জস্য ও অসামঞ্জস্য সম্বন্ধীয় নীতি** (Law of Harmony and Discord) : **যে উদ্দীপক ছন্দযুক্ত, সুসমঞ্জস ও সুবিন্যস্ত তা তৃপ্তিদায়ক এবং যে উদ্দীপক ছন্দহীন, অসমঞ্জস ও অবিন্যস্ত তা বেদনাদায়ক।** পথের

হৈ-চৈ, গোলমাল শ্রুতির পক্ষে সুখদায়ক নয়, কেননা হৈ-চৈ বা গোলমালের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের শব্দের যে সমন্বয় ঘটে তার মধ্যে কোন ঐক্য বা সামঞ্জস্য নেই। বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের ঐকতান সঙ্গীত ছন্দযুক্ত, সুসমঞ্জস, সেহেতু শ্রুতির পক্ষে সুখদায়ক। নাচের মধ্যে তাল আছে বলেই তা দেখতে ভাল লাগে। কিন্তু নিছক লম্ফ-ঝম্ফ করলে তা অনেক সময় বিরক্তিকর মনে হয়। রেখা যদি ছন্দযুক্ত এবং সুসমঞ্জস হয় তাহলেই সে চিত্র দেখে আমরা আনন্দ পাই। কিন্তু যদি তা না হয়, তাহলে সেটি আমাদের আনন্দ দেয় না।

৩। সংবেদন এবং অনুভূতি (Sensation and Feeling):

যে সব মনোবিদ্ মানসিক প্রক্রিয়াকে চিন্তন, অনুভূতি এবং ইচ্ছা এই তিনভাগে বিভক্ত করতে চান, তাঁরা অনুভূতির কোন স্বাধীন সত্তা বা স্বতঃ-ক্রিয়তা স্বীকার করতে চান না। তাঁরা মনে করেন, অনুভূতি সংবেদন থেকে উদ্ভূত এবং সংবেদনরই একটি গুণ। অনুভূতি একজাতীয় সংবেদন ছাড়া আর কিছুই নয়।

অনেকে অনুভূতির স্বাধীন সত্তা স্বীকার করেন না

কিন্তু আধুনিক মনোবিদ্গণ এই অভিমত সমর্থন করেন না। তাঁদের মতে অনুভূতি সংবেদন নয় বা সংবেদনের কোন গুণ নয়। এই অভিমত প্রতিষ্ঠা করার জন্য তারা দেখিয়েছেন, কোন কোন বিষয়ে উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য থাকলেও অনেক বিষয়ে উভয়ের মধ্যে বৈসাদৃশ্য আছে। সুতরাং, একটিকে আর একটিতে পরিবর্তিত করা সম্ভব নয়। কুল্পে, টিচেনার প্রমুখ মনোবিদ্গণের মতে অনুভূতি এবং সংবেদন দুটিই সমান মৌলিক। মনোবিদ্ হ্ব্ণ্ড প্রথমে সংবেদনকে অনুভূতির তুলনায় মৌলিক বলে মনে করলেও পরে উভয়কে মৌলিক বলে স্বীকার করেছেন।

আধুনিক মনোবিদ্গণ অনুভূতির স্বাধীন সত্তা স্বীকার করেন না।

সংবেদন ও অনুভূতির মধ্যে সাদৃশ্য: (ক) সংবেদনের গুণ, তীব্রতা এবং স্থিতিকালের কথা আমরা বলে থাকি, অনুরূপভাবে অনুভূতিরও গুণ, তীব্রতা এবং স্থিতিকালের কথা বলা হয়। সংবেদনের মতো অনুভূতিও হয় সুখগুণযুক্ত কিংবা দুঃখগুণযুক্ত। সংবেদনের মতো অনুভূতিও কম তীব্র বা বেশী তীব্র হতে পারে। সংবেদনের মতো অনুভূতিও ক্ষণস্থায়ী কিংবা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে।

(খ) কোন কোন সংবেদনের সঙ্গে আমাদের উপযোজন এমনভাবে ঘটে যে, উদ্দীপক যদি অধিক সময় স্থায়ী হয়, তাহলে সংবেদন চেতনার কেন্দ্র থেকে অন্তর্হিত হয়ে যায়। অনুরূপভাবে একই উদ্দীপক অধিক সময় স্থায়ী হলে আমাদের মধ্যে আর অনুভূতি জাগে

না। কোন মুখরোচক খাদ্য দু-একদিন বেশ তৃপ্তিকর মনে হলেও একাদিক্রমে বেশ কয়েকদিন ধরে খেতে থাকলে আর তৃপ্তিদায়ক মনে হয় না।

(গ) অনুভূতি বলতে আমরা আনন্দজনক বা দুঃখজনক মানসিক অবস্থা বুঝি। আনন্দজনক এবং দুঃখজনক মানসিক অবস্থার সঙ্গে দৈহিক সংবেদনের (Organic sensation) সাদৃশ্য আছে।

সংবেদন ও অনুভূতির মধ্যে বৈসাদৃশ্য : (ক) সংবেদন সুস্পষ্ট ; অনুভূতি সুস্পষ্ট নয়। কোন সংবেদনের প্রতি যত বেশী আমরা মনোযোগী হই, ততই সে সংবেদন সুস্পষ্ট হয়। কিন্তু অধিকাংশ অনুভূতির প্রকৃতি এমন যে, তাদের প্রতি যদি আমরা খুব বেশী মনোযোগী হই, তাহলে সে অনুভূতি অন্তর্হিত হয়ে যায়। 'আনন্দ' বা 'সুখ'—এই অনুভূতির প্রতি যদি আমরা খুব বেশী মনোযোগী হই তাহলে আনন্দ অন্তর্হিত হয়।

(খ) সংবেদন বস্তুনিষ্ঠ (Objective), কেননা সংবেদন বাহ্যউদ্দীপক নির্ভর। অনুভূতি ব্যক্তিনিষ্ঠ (Subjective), যেহেতু অনুভূতিকে মনের ওপর নির্ভর করতে হয়। মনোবিদ্ টিচেনারের মতে সংবেদন বস্তুনিষ্ঠ, কারণ অনুভূতির সঙ্গে জড়িত না হয়েও সংবেদন স্বাধীনভাবে আমাদের চেতনায় বিরাজ করতে পারে। কিন্তু আমাদের চেতনায় যখন কোন অনুভূতির আবির্ভাব ঘটে তখন কোন-না কোন সংবেদনের অনুষঙ্গি হিসেবেই তার আবির্ভাব ঘটে। সে কারণে অনুভূতি ব্যক্তিনিষ্ঠ।

(গ) সংবেদনের ব্যাপ্তি আছে, অনুভূতির ব্যাপ্তি (extensity) নেই। সংবেদনের স্থানীয় বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করা যেতে পারে, কিন্তু অনুভূতিকে কোন বিশেষ স্থানে নির্দিষ্ট করা চলে না ; অনুভূতি চেতনার সঙ্গে সমব্যাপক। যতটুকু জুড়ে চেতনা, ততটুকু জুড়ে অনুভূতি।

(ঘ) সময় সময় মনে করা হয় অনুভূতি সংবেদনের গুণ বিশেষ। কিন্তু এ অভিমত যথার্থ নয়। অনেকে মনে করেন যে, সংবেদনের ভাল লাগা বা না লাগা একটা গুণ আছে এবং এই গুণটিই অনুভূতি। কিন্তু আসলে কোন বস্তুর সঙ্গে ইন্দ্রিয় সংযোগ ঘটলে সংবেদনের সৃষ্টি হয় এবং এই সংবেদন অনুভূতি সৃষ্টি করে। অনুভূতি সংবেদনের গুণ নয়, কেননা, অনুভূতিরও গুণগত বৈশিষ্ট্য আছে, যেমন তীব্রতা, স্থিতিকাল ইত্যাদি।

(ঙ) বিভিন্ন সংবেদন একই কালে উৎপন্ন হতে পারে। যেমন, একটা কমলালেবুর স্বাদগত, ঘ্রাণগত; স্পর্শগত এবং দৃষ্টিগত সংবেদন একই সঙ্গে হতে পারে, কিন্তু সুখ-দুঃখের অনুভূতি একই সময়ে ঘটতে পারে না।

(চ) প্রতিরূপের সাহায্যে সংবেদনের স্মরণ হয় ; অনুভূতির প্রতিরূপ নেই ; সুতরাং তার স্মরণ হয় না।

(ছ) একই উদ্দীপকের পুনরাবৃত্তিতে সংবেদন উৎপন্ন হয় ; কিন্তু অনুভূতি ক্রমশঃ ক্ষীণ হতে হতে বিলীন হয়ে যায়।

সুতরাং, অনুভূতির সঙ্গে সংবেদনের কোন কোন বিষয়ে সাদৃশ্য থাকলেও কোন কোন বিষয়ে অসাদৃশ্য আছে। সেহেতু অনুভূতি সংবেদন বা সংবেদনের কোন গুণ নয়।

৪। অনুভূতির শ্রেণীবিভাগ (Classification of Feeling) :

সংবেদন কিভাবে উৎপন্ন হয়, তার ওপর ভিত্তি করে সংবেদনকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে ; যথা—(ক) **সংবেদনাত্মক অনুভূতি** (Sense feeling) এবং (খ) **আবেগ** বা **প্রক্ষোভ** (Emotion)।

(ক) **সংবেদনাত্মক অনুভূতি** (Sense feeling) : সংবেদনাত্মক অনুভূতি সংবেদনের দ্বারা উৎপন্ন হয়। যেমন, সুস্বাদু খাদ্য খেলে, মধুর সঙ্গীত শ্রবণ করলে বা কোন সুন্দর দৃশ্য দেখলে আমাদের মধ্যে যে সুখের অনুভূতি জাগে তাকে সংবেদনাত্মক অনুভূতি বলে। আবেগ হল এক ধরনের জটিল অনুভূতি, যেমন ভয়, ক্রোধ ইত্যাদি।

সংবেদনাত্মক অনুভূতির ও আবেগের মধ্যে কয়েক বিষয়ে সাদৃশ্য লক্ষ করা যায় ; প্রথমতঃ, উভয়ই সুখজনক কিংবা দুঃখজনক। দ্বিতীয়তঃ, উভয়ের মূলেই সংবেদন ও প্রত্যক্ষণের অস্তিত্ব আছে। তৃতীয়তঃ, উভয়ই কমবেশী ব্যক্তিগত ও নিষ্ক্রিয় অভিজ্ঞতার বিষয়। চতুর্থতঃ, উভয়ক্ষেত্রেই কিছুটা মানসিক ও দৈহিক উত্তেজনার ভাব বর্তমান থাকে।

উপরিউক্ত সাদৃশ্য সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে অনেক বিষয়ে পার্থক্য দেখা যায়।

সংবেদনাত্মক অনুভূতি ও আবেগ

(১) সংবেদনাত্মক অনুভূতি সংবেদনের দ্বারা উৎপন্ন হয়। কিন্তু আবেগ উৎপন্ন হয় মনের কোন ভাব বা ধারণার (idea) দ্বারা। (২) সংবেদনাত্মক অনুভূতি স্নায়ুর বহিঃপ্রান্ত দ্বারা উদ্দীপিত (Peripherally excited) এবং আবেগ বা প্রক্ষোভ কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র দ্বারা উদ্দীপিত (centrally excited)। (৩) দৈহিক বহিঃপ্রকাশ আবেগের একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ; কিন্তু সংবেদনাত্মক অনুভূতির কোন দৈহিক বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করা যায় না। (৪) সংবেদনাত্মক অনুভূতি সরল, কিন্তু আবেগ জটিল। (৫) সংবেদনাত্মক অনুভূতি সুখ কিংবা দুঃখের অনুভূতি কিন্তু আবেগের ক্ষেত্রে সুখদুঃখের অনুভূতি ছাড়াও মানসিক উত্তেজনা লক্ষ্য করা যায়।

সংবেদনাত্মক অনুভূতির দৈহিক প্রকাশ নেই, আবেগের আছে

(৬) **আবেগ হল পরাশ্রয়ী বা সহজাত প্রবৃত্তির পরগাছা। ক্ষুধার্ত কুকুরের সামনে থেকে যদি মাংসের টুকরোটি কেড়ে নেওয়া হয় তাহলে সে ক্রুদ্ধ হয়। এই ক্রোধের** কারণ হল তার ক্ষুধারূপ সহজাত প্রবৃত্তি মেটাবার পথে বাধার সৃষ্টি করা। কিন্তু সংবেদনাত্মক অনুভূতির সঙ্গে কোন সহজাত প্রবৃত্তির প্রত্যক্ষ সংযোগ লক্ষ্য করা যায় না। সংবেদনাত্মক অনুভূতিতে দেহ মনের ওপর ক্রিয়া করে, আর আবেগের ক্ষেত্রে মন দেহের ওপর ক্রিয়া করে।

আবেগ পরাশ্রয়ী ও সহজাত প্রবৃত্তি নির্ভর, সংবেদনাত্মক অনুভূতি নয়

৫। প্রক্ষোভ বা আবেগের স্বরূপ (Nature of Emotion):

বিভিন্ন মনোবিদ্ আবেগের বিভিন্ন সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন। কোনো কোনো মনোবিদের মতে, **আবেগ হল দৈহিক পরিবর্তন থেকে উদ্ভূত এক জাতীয় সংবেদন**। কোন কোন মনোবিদের মতে, **আবেগ হল অতীত সুখ-দুঃখের পুনরাবির্ভাব**। আবার কোনো কোনো মনোবিদের মতে, **আবেগ হল কোন বিশেষ পদ্ধতি অনুযায়ী আচরণ করার প্রবণতা এবং আবেগ একপ্রকার ইচ্ছামূলক চেতনা**।

আবেগের সংজ্ঞা এভাবে দেওয়া যেতে পারে—**আবেগ বা প্রক্ষোভ হল এমন এক ধরনের জটিল অনুভূতি যার মূলে কতকগুলি সহজাত প্রবৃত্তি বর্তমান; কোন বিশেষ বস্তু বা ধারণা একে জাগরিত করে এবং দেহের আভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের জন্য এমন কতকগুলি বিশেষ ধরনের দৈহিক প্রকাশ ঘটে যার জন্য আমরা নানারকম কাজে প্রবৃত্ত হই। ভয়, ক্রোধ, হিংসা প্রভৃতি আবেগের উদাহরণ**।

আবেগের সংজ্ঞা

আবেগের পূর্বোক্ত সংজ্ঞাটি বিশ্লেষণ করলে এর নিম্নলিখিত দিকগুলি আমাদের চোখে পড়ে:

(১) আবেগ সৃষ্ট হয় কোন ভাব বা ধারণার দ্বারা। কোন বস্তুকে প্রত্যক্ষ করার ফলেও আবেগের সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু আসলে বস্তুকে প্রত্যক্ষ করার ফলে কোন ভাব বা ধারণা মনে জাগরিত হয় এবং ঐ ধারণাটিই আবেগের সৃষ্টি করে।

(২) আবেগ হল একটি জটিল অনুভূতি, অর্থাৎ সুখ-দুঃখ বা এজাতীয় কোনরূপ অনুভূতির অভিজ্ঞতা।

(৩) আবেগ জাগরিত হলে দেহের অভ্যন্তরে কতকগুলি পরিবর্তন দেখা দেয়।

(৪) আবেগের ক্ষেত্রে দেহের আভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের ফলে কতকগুলি বাহ্যিক-

প্রকাশ ঘটে। যেমন, ক্রুদ্ধ হলে চীৎকার করা, দাঁত কড়মড় করা, মুষ্টিবদ্ধ করা, ভ্রূকুটি করা ইত্যাদি।

(৫ আবেগ আমাদের কাজে প্রবৃত্ত করে, যেমন, ভয় পেলে আমরা সঙ্গে সঙ্গে পালাবার চেষ্টা করি বা আত্মরক্ষার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করি।

মনোবিদ্ জেমস্-এর মতে বস্তুর প্রত্যক্ষণ যে দৈহিক সংবেদন সৃষ্টি করে, তাই হল আবেগ। মনোবিদ্ ম্যাকডুগাল-এর মতে আমাদের সব রকম আচরণ ও চিন্তার মূলে কতকগুলি সহজাত প্রবৃত্তি বর্তমান। প্রতিটি সহজাত প্রবৃত্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রয়েছে একটি করে আবেগ। এই আবেগ যখন প্রাণীর মনে জাগে, তখন ঐ সহজাত প্রবৃত্তিটি কার্যকর হয়ে ওঠে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, পলায়ন বৃত্তি হল একটি সহজাত প্রবৃত্তি এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যে মৌলিক আবেগ সেটি হল ভয়। প্রাণীর মনে যখন ভয় জাগে তখন ঐ সহজাত প্রবৃত্তিটি অর্থাৎ পলায়ন প্রবৃত্তিটি কার্যকর হয়।

জেমস-এর মত

ম্যাকডুগাল এর মত

মনোবিদ্ মেলন আবেগের দুটি উপাদানের কথা বলেছেন।

(i) **মানসিক দিক ঃ** (ক) কোন একটা অবস্থা বা পরিস্থিতি (Situation) প্রত্যক্ষ করা, স্মরণ করা, কল্পনা করা বা চিন্তা করা। এই পরিস্থিতি ব্যক্তির জাগতিক, মানসিক, সামাজিক বা উচ্চতর কোন উদ্দেশ্যের সঙ্গে যুক্ত। (খ) একটা অনুভূতির দিক যা সুখকর বা দুঃখজনক। (গ) কর্ম করার প্রবৃত্তি এবং (ঘ) দৈহিক সংবেদন ও পেশীগত সংবেদন।

(ii) **দৈহিক দিক ঃ** (ক) দেহের আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন এবং (খ) পেশী সঞ্চালন।

পূর্বোক্ত উপাদানগুলি মিলিত হয়ে আবেগ সৃষ্টি করে।

প্রথমতঃ, কোন একটি অবস্থা বা পরিস্থিতি প্রত্যক্ষ করলে, কল্পনা করলে, স্মরণ করলে বা চিন্তা করলে আবেগ জাগরিত হয়। যেমন, ছাড়া বাঘ দেখলে মনে ভয় জাগে, অতীত দুর্ঘটনার কথা চিন্তা করলেও মনে ভয় জাগে।

দ্বিতীয়তঃ, আবেগের একটা অনুভূতির দিক আছে যা হয় সুখজনক বা দুঃখজনক। যেমন, ভীতি যে অনুভূতি সৃষ্টি করে তা সুখকর নয়।

তৃতীয়তঃ, আবেগ ইচ্ছার ওপর ক্রিয়া করে-এবং আমাদের মধ্যে কর্মপ্রবৃত্তি জাগিয়ে তোলে। সে কারণে বাঘ দেখে যখন মনে ভয়ের আবেগ জাগে তখন আমরা পালাবার জন্য সংকল্প করি।

চতুর্থতঃ, আবেগ দেহের অভ্যন্তরে কতকগুলি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং প্রতিক্রিয়ার ফলে যে উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়, সেই উদ্দীপনা যখন সংবেদনবাহী স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কে পৌঁছায়, তখন কতকগুলি দৈহিক সংবেদনের সৃষ্টি হয়। এই দৈহিক সংবেদন আবেগের প্রয়োজনীয় অংশস্বরূপ।

পঞ্চমতঃ, আবেগ পেশীগুলির মধ্যে গতির সঞ্চার করে। এই সঞ্চালনের ফলে যে উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়, সেই উদ্দীপনা যখন সংবেদনবাহী স্নায়ু মস্তিষ্কে বহন করে নিয়ে যায় তখন পেশীগত সংবেদন (motor sensation) সৃষ্টি হয়।

সুতরাং, আবেগের মধ্যে জ্ঞানগত, অনুভূতিমূলক এবং ইচ্ছাগত তিনটি দিকই বর্তমান। প্রত্যক্ষ, কল্পনা, বা স্মরণ হল জ্ঞানগত দিক ; সুখ-দুঃখের অনুভূতি হল অনুভূতিমূলক দিক এবং কর্ম প্রবৃত্তি হল ইচ্ছামূলক দিক।

৬। আবেগের বৈশিষ্ট্য (Characteristic of Emotion) :

মনোবিদ স্টাউট আবেগের কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন।[1]

(ক) **আবেগের ব্যাপক পরিধি** (Wide Range) : প্রত্যক্ষ থেকে আরম্ভ করে ধারণা পর্যন্ত—মনের বিকাশের বিভিন্ন স্তরে এই আবেগ দৃষ্টিগোচর হয়। বিড়াল বাচ্চাটির গায়ে হাত দিলে বিড়ালটি রেগে যায়। একটি শিশুর কাছ থেকে খেলনাটি কেড়ে নিলে সে ক্রুদ্ধ হয়। উভয় ক্ষেত্রে ক্রোধরূপ আবেগটি উদ্দীপিত হচ্ছে প্রত্যক্ষণের দ্বারা। আমরা ক্রুদ্ধ হই যখন অতীতের অপমানের কথা স্মরণ করি। এক্ষেত্রে স্মরণক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রোধ উদ্দীপিত হচ্ছে। আমরা যখন কল্পনা করি যে, আমাদের শত্রু সুযোগ পেলেই আমাদের আঘাত করবে তখনই মনে ক্রোধের উদ্রেক হয়। এক্ষেত্রে ক্রোধ উদ্দীপিত হচ্ছে কল্পনার মাধ্যমে। আবার যখন অন্য ব্যক্তি আমাদের বক্তব্য বিষয় বুঝতে চায় না, তখনও আমরা ক্রুদ্ধ হই। এক্ষেত্রে ক্রোধ উদ্দীপিত হচ্ছে চিন্তার দ্বারা। সুতরাং, মনের বিকাশের বিভিন্ন স্তরে এই একই আবেগ দৃষ্ট হচ্ছে। অবশ্য সব ক্ষেত্রেই আবেগের মূলে রয়েছে কোন ধারণা। এই আবেগ মানুষ এবং মনুষ্যেতর জীব সকলের ক্ষেত্রেই দেখা দিতে পারে।

(খ) **একই আবেগ বিভিন্ন অবস্থার দ্বারা উদ্দীপিত হতে পারে** (Varied nature of the Conditions) : একটি বিশেষ আবেগ—যেমন ভয়, বিভিন্ন অবস্থার দ্বারা উদ্দীপিত হতে পারে। আমাদের সামনে যদি একটা পাগলা কুকুর দেখি তাহলে আমরা ভীত হই। ভাল চাকরিটা অপরের ষড়যন্ত্রে হারাতে পারি এই ভয়ে ভীত হই।

1. Stout : Manual of Psychology. Page 362

আবার কোন প্রিয়জনের আকস্মিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার ফলে মৃত্যু ঘটতে পারে—এই ভয়ে ভীত হই। একই ভয় নানা কারণে উদ্দীপিত হচ্ছে। কোন কুকুরের কাছ থেকে তার খাবার কেড়ে নিয়ে আমরা তাকে ক্রুদ্ধ করে তুলতে পারি বা তার বাচ্চাদের বিরক্ত করে বা তার লেজ ধরে টানাটানি করেও তাকে ক্রুদ্ধ করে তুলতে পারি। একই ক্রোধ নানা কারণে জাগছে। মনোবিদ্ স্টাউট-এর মতে কোন বিশেষ ধরনের অবস্থা বা পরিস্থিতিই বিশেষ ধরনের আবেগ জাগিয়ে তোলে।[1] আবেগটি যে আচরণের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করে তা বস্তু বিশেষের তারতম্যের ওপর নির্ভর করে না। যেমন, কুকুরকে যেভাবেই ক্রুদ্ধ করে তোলা যাক না কেন, তার বাইরের আচরণ মোটামুটি একই প্রকৃতির। যেমন, দাঁত দেখান, গর্জন করা, কামড়াবার চেষ্টা করা ইত্যাদি।

(গ) **আবেগ জাগার কারণ**ঃ প্রথমতঃ, প্রত্যক্ষ, চিন্তা, কল্পনা, স্মরণক্রিয়া প্রভৃতির মাধ্যমে আবেগ জাগতে পারে; যেমন, ভাল সংবাদ পেলে মনে আনন্দের আবেগ জাগে। আবার দৈহিক পরিবর্তনের (organic changes) ফলেও আবেগ জাগতে পারে: যেমন— কোন মানুষ মদ্যপান করে আনন্দ লাভ করে।

(ঘ) **কোন আবেগ উদ্দীপিত হলে তা একটা মেজাজ (Mood) সৃষ্টি করে যার মাধ্যমে আবেগটি দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়**ঃ যখন আমাদের মনে কোন আবেগ জেগে ওঠে, সেই আবেগের উত্তেজনা প্রশমিত হওয়ার পরও আবেগটি স্থায়ী হয়। সেই আবেগ একটা আবেগের মেজাজ (emotional mood) সৃষ্টি করে। যদি কোন কারণে আমরা ক্রুদ্ধ হই, তখন অনেক সময় লক্ষ্য করি যে, আমাদের ক্রোধের উপশম হলেও একটা খিটখিটে ভাব বা বদমেজাজ অনেকক্ষণ ধরে চলতে থাকে যার জন্য যে কোন সামান্য উত্তেজনাতেই আমরা আবার ক্রুদ্ধ হয়ে উঠি।

(ঙ) **আবেগ হল পরাশ্রয়ী** (Parasitical): আবেগ পরাশ্রয়ী, যেহেতু সহজাত প্রবৃত্তি থেকেই আবেগ উদ্ভূত হয়। ক্ষুধার্ত কুকুরের সামনে থেকে যদি মাংসের টুকরোটি কেড়ে নেওয়া হয় তাহলে সে ক্রুদ্ধ হয়। এই ক্রোধের কারণ তার ক্ষুধার প্রবৃত্তি মেটাবার পথে বাধার সৃষ্টি করা হচ্ছে। ক্ষুধা হল তার সহজাত প্রবৃত্তি (instinct)। যদি কোন বিড়ালের নবজাত সন্তানকে তার কাছ থেকে সরিয়ে নেওয়া হয় তাহলে সে ক্রুদ্ধ হবে; কারণ, অপত্যস্নেহের পথে বাধার সঞ্চার হচ্ছে। তার মাতৃত্বই তাকে তার সন্তান রক্ষা করার জন্য প্রবৃত্ত করে। মাতৃত্ব হল সহজাত প্রবৃত্তি। সুতরাং, আবেগের পূর্বাবস্থা

---

1. It is a certain general kind of situation, not a specific class of objects which excites a certain kind of emotion."

—Stout: Manual of Psychology, Page 368

(pre-supposition) হল সহজাত প্রবৃত্তি। সে কারণেই মনোবিদ্ স্টাউট বলেছেন যে, আবেগ হল পরাশ্রয়ী বা সহজাত প্রবৃত্তির পরগাছা।

(চ) **তীব্র-আবেগের ক্ষেত্রে দৈহিক সংবেদন** (Organic Sensation)**:** যখনই আমাদের মধ্যে কোন আবেগ তীব্র হয়ে ওঠে ; যেমন, অতিরিক্ত ভীতি বা ক্রোধ, তখন দেহের অভ্যন্তরে কতকগুলি পরিবর্তন ঘটে এবং তার ফলে দৈহিক সংবেদন দেখা দেয়। মনোবিদ্ জেমসের মতে এসব দৈহিক সংবেদনই হল আবেগ।

মনোবিদ্ স্টাউট প্রদত্ত পূর্বোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি ছাড়াও আমরা আবেগের আরো কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করি।

(ছ) **আবেগের আবির্ভাব আকস্মিক ঘটে থাকে :** যে ব্যক্তি কিছু পূর্বেও বেশ শান্ত ছিল, হঠাৎ সামান্য উত্তেজনায় সে এমন ক্রোধোন্মত্ত হয়ে উঠল যে তার আবেগের এই তীব্রতা বিস্ময়কর বলে মনে হয়।

(জ) **আবেগ অনেক সময় আমাদের বিচার-বুদ্ধি আচ্ছন্ন করে ফেলে :** অনেক সময় খুব বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিও ক্রোধবশতঃ অপরের প্রতি এমন রূঢ় আচরণ করে যে, সাময়িকভাবে সে তার সকল রকম বিচার-ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। অনেক সময় আবেগবশতঃ মানুষ আত্মহত্যা করতে উদ্যত হয় বা আত্মহত্যা করে থাকে।

যদিও আবেগের পূর্বোক্ত বৈশিষ্ট্য আছে বলে আমরা মনে করি তবু সব আবেগের ক্ষেত্রেই যে সব বৈশিষ্ট্যগুলি সমানভাবে আত্মপ্রকাশ করে তা নয়। তীব্র আবেগের ক্ষেত্রে (যেমন—ক্রোধ, ভয় প্রভৃতি) এই বৈশিষ্ট্যগুলি যেরূপভাবে প্রকাশিত হয়, মৃদু আবেগের ক্ষেত্রে (স্নেহ, প্রেম, সহানুভূতি প্রভৃতি) এগুলি সেরূপভাবে প্রকাশিত হয় না।

৭। মৌলিক আবেগ (Basic Emotion) :

মৌলিক আবেগের সংখ্যা কত ? এ বিষয়ে মনোবিদ্দের মধ্যে মতভেদ আছে।

মৌলিক আবেগের সংখ্যা কত ?

মনোবিদ্ ওয়াটসন-এর মতে মানুষের মৌলিক আবেগ হল তিনটি—**ক্রোধ, ভয়** এবং **আনন্দ**। শিশু এই তিনটি আবেগ নিয়েই জন্মগ্রহণ করে। উচ্চ শব্দ শুনলে শিশু ভয় পায়। হঠাৎ পড়ে যাওয়ার অবস্থা হলেও শিশু ভয় পেয়ে থাকে। শিশুর চলাফেরায় যদি বাধা দেওয়া হয় তাহলে সে ক্রুদ্ধ হয়। আবার তার গায়ে যদি হাত বুলানো যায় বা তাকে আদর করা হয় তাহলে সে আনন্দ পায়।

ওয়াটসন-এর মতে মৌলিক আবেগ তিনটি

সারমেন কিন্তু ওয়াটসনের মত গ্রহণ করেন নি এই বলে যে, পূর্ব থেকে যদি উদ্দীপকের স্বরূপটি জানা না থাকে তাহলে আবেগের দেহগত প্রকাশের মধ্যে তারতম্য করা কঠিন হয়ে পড়ে। ধরা যাক, কোন শিশু কাঁদছে, এবং শিশুর কান্না দেখে সে কি কারণে কাঁদছে, অর্থাৎ ভয়বশতঃ বা ক্রোধবশতঃ তা বুঝে ওঠা কঠিন। ওয়াটসন মনে করেন যে, আবেগ হল উত্তরাধিকারসূত্রে বা জন্মগতভাবে পাওয়া। সারমেন-এর মতে আবেগ শিশুর মনের বিকাশের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

ওয়াটসন-এর অভিমতের সমালোচনা

কোনো কোনো মনোবিদের মতে মৌলিক আবেগ হল একটিমাত্র। আরউইন-এর মতে মৌলিক আবেগ হল সামগ্রিক ক্রিয়াশীলতা (mass activity)। ব্রিজেস-এর মতে এই মৌলিক আবেগটি হল উত্তেজনা (excitement)। হারলো এবং স্টাগনার-এর মতে ভাল লাগা, মন্দ লাগা, উত্তেজনা এবং বিমর্ষতা—এই চারটি অবস্থা থেকেই আবেগ উদ্ভূত হয়।

কারও মতে মৌলিক আবেগ একটি

মনোবিদ্ ম্যাকডুগাল (*McDougall*) মানুষের সাতটি সহজাত প্রবৃত্তির (instinct) কথা বলেছেন এবং তার সংশ্লিষ্ট মৌলিক আবেগের কথা উল্লেখ করেছেন। ম্যাকডুগাল আবেগকে তিনভাগে বিভক্ত করেছেন—**প্রাথমিক মৌলিক আবেগ** (Primary Emotion), **অপ্রাথমিক বা মিশ্র আবেগ** (Secondary Emotion), এবং **উদ্ভূত আবেগ** (Derived Emotion)। মৌলিক আবেগের সংখ্যা সতেরটি। এগুলি সহজাত প্রবৃত্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। যেমন—ভয়, ক্রোধ, বিরক্তি, স্নেহ, দুঃখ ইত্যাদি। মিশ্র আবেগ হল একাধিক মৌলিক আবেগের সংমিশ্রণ। যেমন—ক্রোধ, ভীতি এবং বিরক্তি সংমিশ্রিত হয়ে ঘৃণার সৃষ্টি করে। উদ্ভূত আবেগ হল সেগুলি, যেগুলির সঙ্গে সহজাত প্রবৃত্তির কোন সংযোগ নেই, ইচ্ছামূলক প্রবণতার সঙ্গে সহজাত প্রবৃত্তির কোন সংযোগ নেই, ইচ্ছামূলক প্রবণতার সঙ্গে এগুলি যুক্ত; যেমন—আশা, উদ্বেগ, অনুশোচনা ইত্যাদি।

ম্যাকডুগাল-এর মতে সতেরটি

৮। আবেগ ও দৈহিক পরিবর্তন: জেমস্-ল্যাঙ্গ মতবাদ (Emotion and Organic changes : James-Lang Theory) :

আবেগের দুটি দিক আছে—একটি হল মানসিক বা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার দিক এবং অপরটি হল দৈহিক পরিবর্তনের দিক।

প্রশ্ন হল, কোন্‌টি আগে? অর্থাৎ, প্রথমে আবেগ জাগে এবং পরে দৈহিক পরিবর্তন

দেখা দেয়, বা প্রথমে দৈহিক পরিবর্তন ঘটে এবং তারপর আবেগটি জাগে—যেমন, যখন কোন ব্যক্তি বাঘ দেখে, তখন প্রথমে সে ভয় পায় এবং তারপর দৌড়ে পালায়, না প্রথমে সে দৌড়ায় এবং পরে ভয় পায়।

সাধারণ মতানুযায়ী প্রথমে আমাদের মধ্যে আবেগ উদ্দীপিত হয় এবং তারপর কতকগুলি দৈহিক পরিবর্তনের মাধ্যমে তার বাহ্যিক প্রকাশ ঘটে। যেমন, কোন একটি লোক একটি পাগলা কুকুর দেখে ভয় পেল—অর্থাৎ তার মধ্যে 'ভয়' এই আবেগটি জাগল। যার ফলে শেষ পর্যন্ত সে দৌড়ে পালাল। সুতরাং লৌকিক মতানুযায়ী প্রথমে আবেগ, তারপর দৈহিক পরিবর্তন। আবেগ দৈহিক প্রকাশের পূর্বাগামী।

কিন্তু আমেরিকান মনোবিদ্ উইলিয়াম জেম্‌স ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে এবং ড্যানিস্ শারীরতত্ত্ববিদ্ কার্ল ল্যাঙ্গ ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে এই মতবাদের ঠিক বিপরীত একটি মতবাদ উপস্থিত করেন। তাঁদের মতে আবেগ হল দৈহিক পরিবর্তনের ফলস্বরূপ। দেহগত পরিবর্তন যে দৈহিক সংবেদন (Organic sensation) সৃষ্টি করে, সেই দৈহিক সংবেদন হল আবেগ।

জেমস্-এর মতে দৈহিক পরিবর্তন আবেগের অনুগামী নয়, পূর্বগামী। তাঁর মতে, আমরা যখন কোন একটি বস্তু প্রত্যক্ষ করি, তখন দেহের অভ্যন্তরে কতকগুলি পরিবর্তন ঘটে। সংবেদনবাহী স্নায়ু এই পরিবর্তনের সংবাদ মস্তিষ্কে বহন করে নিয়ে যায় ও তার ফলে দৈহিক সংবেদন সৃষ্টি হয় এবং আবেগ হল এই দৈহিক সংবেদনের অনুভূতি। কোন একটি লোক যখন তার সামনে একটি বুনো ভালুক দেখেতে পেল, তখন বুনো ভালুকটি দেখা মাত্রই তার মস্তিষ্কে উদ্দীপনার সৃষ্টি হল। সেই স্নায়বিক উদ্দীপনা স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুমণ্ডলীর মাধ্যমে শরীরের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ল। ফলে মাংসপেশী, গ্রন্থি প্রভৃতিতে নানাপ্রকার শারীরিক প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। এই প্রতিক্রিয়াগুলি ঘটার ফলে স্নায়বিক উদ্দীপনা স্নায়ুপথ বেয়ে আবার মস্তিষ্কে গিয়ে পৌছল, তার ফলে 'ভয়'—এই আবেগের সৃষ্টি হল। সুতরাং **জেম্‌স-এর মতে প্রথমে দৈহিক পরিবর্তন তারপর আবেগ; প্রথমে আবেগ তারপর দৈহিক পরিবর্তন নয়।**[1]

প্রথমে দৈহিক পরিবর্তন, পরে আবেগ

1. জেম্‌স বলেন' "আমার মতবাদটি হল, উত্তেজনামূলক বস্তু প্রত্যক্ষ করার সঙ্গে সঙ্গেই দৈহিক পরিবর্তন তার অনুগামী হয় এবং সেই পরিবর্তন সম্পর্কে আমাদের যে অনুভূতি তাই হল আবেগ। সাধারণ বুদ্ধি বলে, আমাদের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটে, আমরা দুঃখিত হই ও ক্রন্দন করি। একটি ভালুকের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ ঘটে, আমরা ভীত হই এবং দৌড়াই। আমাদের কোন প্রতিদ্বন্দীর দ্বারা আমরা অপমানিত হই, আমরা ক্রুদ্ধ হই এবং আঘাত করি।" অধিক যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা হল, 'আমরা কাঁদি বলেই দুঃখ অনুভব করি, আমরা আঘাত করি বলেই ক্রুদ্ধ হই, আমরা কাঁপি বলেই ভীত হই এবং দুঃখিত হই, ক্রুদ্ধ হই বা ভীত হই বলে কাঁদি, আঘাত করি বা কাঁপি না'
—W. James : "Text Book of Psychology; Pages, 375-76

জেম্‌স-এর মত এবং সাধারণ মত : জেম্‌স-এর মতানুযায়ী আবেগ অনুভব করার প্রক্রিয়াটি হল :

পরিস্থিতি→দেহগত পরিবর্তন→দৈহিক সংবেদন বা আবেগ

সাধারণ মতানুযায়ী এই প্রক্রিয়াটি পূর্বোক্ত প্রক্রিয়ার ঠিক বিপরীত। যথা—

পরিস্থিতি→আবেগ→দেহগত পরিবর্তন→দৈহিক সংবেদন

জেম্‌স তাঁর মতবাদের স্বপক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি উপস্থাপিত করেছেন :

জেম্‌স এর **যুক্তি :** (ক) জেম্‌স-এর মতে প্রত্যক্ষ এবং দৈহিক সংবেদনের মাঝামাঝি আবেগ বলে কিছুই নেই। অন্ধকারে যদি আমরা কোন একটি অজানা মূর্তিকে বন থেকে বেরিয়ে আসতে দেখি, সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায় এবং শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়ার স্বাভাবিক গতি বাধাপ্রাপ্ত হয়। কোন রকম ভয়ের ধারণা করার পূর্বেই দেহগত পরিবর্তনগুলি ঘটে যায়। এক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ এবং দেহগত পরিবর্তনের মাঝামাঝি আমরা কোন আবেগ মনে উদ্দীপিত হয়েছে দেখি না। বস্তুটি প্রত্যক্ষণ করবার সঙ্গে সঙ্গেই দেহগত পরিবর্তন ঘটে চলেছে। সুতরাং, যাকে আবেগ বলছি তা দেহগত পরিবর্তন ছাড়া আর কিছুই নয়।

আবেগ দেহগত পরিবর্তন ছাড়া কিছুই নয়

(খ) যদি আমরা কোন একটি আবেগ সম্পর্কে মনে মনে চিন্তা করি এবং এই আবেগের যে দৈহিক প্রকাশ সেগুলিকে যদি বাদ দিয়ে দেই তাহলে আবেগের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না, যা অবশিষ্ট থাকবে তা হল, 'উত্তেজনাবিহীন নিরপেক্ষ বুদ্ধিগত প্রত্যক্ষণ' (a cold and neutral state of intellectual perception)। দৈহিক প্রকাশ ছাড়া আমরা কোন আবেগের কথা ভাবতেই পারি না। কোন লোক ক্রুদ্ধ হয়েছে অথচ ক্রোধের কোনরূপ বাহিক প্রকাশ—যেমন, ভ্রূকুটি করা, দাঁত কড়মড় করা, নাসিকা স্ফীত করা বা ঘন ঘন নিঃশ্বাস নেওয়া কোনটিই প্রকাশ করছে না—এ আমরা ভাবতেই পারি না। জেম্‌স বলেন, 'কায়াবিহীন মনুষ্য-আবেগ অলীক বস্তু ছাড়া কিছুই নয়" (A disembodied human emotion is a sheer non-entity)।

দৈহিক প্রকাশ বাদ দিলে আবেগ হল উত্তেজনাবিহীন বুদ্ধিগত প্রত্যক্ষ

(গ) আবেগের দেহগত বহিঃপ্রকাশকে যদি রুদ্ধ করা যায়, তাহলে আবেগটিও তিরোহিত হয়। ক্রোধের সময় ক্রোধকে রোধ করার উপায় হল ক্রোধের বহিঃপ্রকাশকে অভিব্যক্ত হওয়ার সুযোগ না দেওয়া।

(ঘ) মানসিক বিকারগ্রস্ত ব্যক্তিদের (Pathological cases) লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, বাহ্য জগতের কোন উদ্দীপক ছাড়াই তাদের মনে আবেগের সৃষ্টি হয়েছে। উন্মাদ বা মূর্ছারোগগ্রস্ত রোগীদের (Hysterical patient) ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, কখনও তারা হাসছে, কখনও কাঁদছে বা কখনও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছে। বাহ্যিক কারণ ছাড়াই বিভিন্ন ধরনের আবেগ, যেমন—রাগ, আনন্দ, দুঃখ তাদের মধ্যে দেখা যায়। কিন্তু এ কিভাবে সম্ভব? এর দ্বারা প্রমাণিত হয় কেবলমাত্র দৈহিক অবস্থা বা পরিবর্তনের ফলেই আবেগ জন্মাতে পারে।

বিকারগ্রস্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে উদ্দীপক ছাড়াই আবেগ সৃষ্ট হয়

(ঙ) কৃত্রিমভাবে যদি আবেগের দেহগত বহিঃপ্রকাশকে বাইরে ঘটান যায়, তাহলে মনের মধ্যে আবেগের সঞ্চার হয়। অনেক সময় দেখা যায় অভিনয় করার সময় ক্রোধ, দুঃখ, বিরক্তি, ভয় প্রভৃতি আবেগের বহিঃপ্রকাশকে বাইরে ঘটাবার প্রচেষ্টায় অভিনেতা-দের মনে সেই সব আবেগ জেগে ওঠে।

কৃত্রিমভাবে দেহগত প্রকাশ সৃষ্টি করলে আবেগ সৃষ্ট হয়

(চ) মাদক দ্রব্য এবং উত্তেজক বস্তু গ্রহণ করার পর দেখা গেছে অনেক লোক বেশ প্রফুল্ল বোধ করছে বা কেউ কেউ খুব সাহসী হয়ে উঠেছে। এক্ষেত্রে দেহগত অবস্থাই যে আবেগগুলিকে জাগিয়ে তুলেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

মাদক দ্রব্য দেহগত অবস্থার পরিবর্তন এনে আবেগ সৃষ্টি করে

(ছ) দৈহিক প্রকাশের মাত্রাকে যতই বাড়ান যায় আবেগও সে অনুপাতে বাড়তে থাকে। ভয়ের সময় মানুষ যত অধিক কাঁপতে থাকে, ভয়ের মাত্রা সে অনুপাতে বাড়তে থাকে। রাগের সময় যত বেশী হৈ-চৈ করা যায় রাগও সেই পরিমাণে আরও বেড়ে যায়।

পূর্বোক্ত যুক্তিগুলির ভিত্তিতে জেম্‌স বলতে চান যে, কোন বস্তু প্রত্যক্ষ করার ফলে যে দৈহিক পরিবর্তন ঘটে এবং এ সকল দৈহিক পরিবর্তন যে দৈহিক সংবেদন (Organic Sensation) সৃষ্টি করে তাই হল আবেগ। **আবেগ দৈহিক সংবেদন ছাড়া আর কিছুই নয়।**

মনোবিদ্ কার্ল ল্যাঙ্গ পূর্বোক্ত মতবাদটি স্বাধীনভাবে ব্যক্ত করেছেন। তিনি তাঁর মতবাদে বাহ-নিয়ামক প্রতিক্রিয়া (Vaso-motor reactions) এবং আন্তরযন্ত্রীয় প্রতিক্রিয়ার (Visceral reactions) ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ল্যাঙ্গ-এর আবেগের মধ্যে দুটি উপাদান আছে—একটি হল কারণ (cause) এবং অপরটি হল কার্য (effect)। কারণ হল কোন প্রত্যক্ষণ বা ধারণা এবং কার্য হল বাহ-

নিয়ামক প্রতিক্রিয়া (Vaso-motor reactions) বা দেহের বিভিন্ন অংশে রক্ত-প্রবাহ-গত পরিবর্তন এবং তার ফলে দৈহিক ও মানসিক পরিবর্তন। উভয়ের অন্তর্বর্তী হিসেবে কোন অনুভূতির স্থান নেই। ল্যাঙ্গও মনে করেন যে, আবেগ হল অনুভূতিবর্জিত দৈহিক সংবেদনের সমষ্টি। তিনি বলেন, "আমাদের মানসিক জীবনের সমগ্র আবেগময় দিকটি, আমাদের আনন্দ এবং বেদনা, সুখ এবং দুঃখ—এসব কিছুর জন্যই আমাদের বাহ-নিয়ামক প্রণালীর (Vaso-motor system) কথা চিন্তা করতে হবে।"

কার্ল ল্যাঙ্গ-এর মতবাদ

যেহেতু ল্যাঙ্গ স্বাধীনভাবে জেম্‌স-এর পূর্বোক্ত মতটিকেই সমর্থন করেছেন সেহেতু মতবাদটিকে জেম্‌স-ল্যাঙ্গ মতবাদ (James-Lang Theory নামে অভিহিত করা হয়।

জেম্‌স-এর মতবাদ

জেম্‌স-ল্যাঙ্গ মতবাদের সমালোচনা (Criticism of the James-Lange Theory): জেম্‌স-ল্যাঙ্গ-এর মতবাদের মধ্যে যে বেশ কিছুটা অভিনবত্ব আছে তাতে সন্দেহ নেই এবং এই অভিনবত্বের জন্যই একদিন এই মতবাদ মনোবিদ্‌দের জগতে বেশ আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল এবং বহু মনোবিদ্‌কে এ বিষয়ে গবেষণাকার্যে প্রণোদিত করেছিল। এইসব গবেষণাও প্রমাণ করেছে যে, দৈহিক পরিবর্তনই আবেগের একমাত্র কারণ নয়। কোন রকম মানসিক অনুভূতি ছাড়া আবেগ সম্ভব নয়। সমালোচকরা এই মতের বিরুদ্ধে নিম্নে উল্লিখিত যুক্তিগুলি উপস্থাপিত করেছেন:

সমালোচনা

দৈহিক পরিবর্তনই আবেগের একমাত্র কারণ নয়

(ক) জেম্‌স-এর মতে দৈহিক প্রকাশ ছাড়া আবেগ সম্ভব নয়। কিন্তু সে কারণে এ কথা বলা যায় না, দৈহিক প্রকাশ এবং আবেগ অভিন্ন। দৈহিক প্রকাশ এবং আবেগের সহ-অবস্থান এ কথাই প্রমাণ করে যে, একটিকে আর একটি থেকে পৃথক করা চলে না। কিন্তু উভয়কে অভিন্ন মনে করার কোনরূপ যুক্তি নেই। মনোবিদ্ স্টাউট এই মতবাদের সমালোচনায় বলেন যে, "একটা পাথর জলের মধ্যে পড়ে ক্ষুদ্র তরঙ্গ সৃষ্টি না করে পারে না। তাই বলে ক্ষুদ্র তরঙ্গগুলি পাথর নয়।...আগুন ছাড়া ধুঁয়ো হয় না। কিন্তু ধুঁয়ো এক জিনিস এবং আগুন আর এক জিনিস।"[1]

দৈহিক প্রকাশ ও আবেগ অভিন্ন নয়

(খ) যে-সব দৈহিক সংবেদন আবেগ সৃষ্টি করে এবং যেগুলি আবেগ সৃষ্টি করে

1. Stout: Manual of Psychology (Fifth Edition) Page 367

না—এই উভয় প্রকার দৈহিক সংবেদনের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? মনোবিদ্ স্টাউট বলেন, "সুনিশ্চিতভাবে বলা যেতে পারে যে, দৈহিক সংবেদনই আবেগ নয়, ক্ষুধা বা পেটব্যাথা আবেগ সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা নয়।"[1] জেম্‌স দৈহিক সংবেদন বলতে কি বোঝেন তা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেননি।

জেম্‌স দৈহিক সংবেদনের অর্থ সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেন নি

(গ) কোন রকম বাইরের জগতের উদ্দীপক ছাড়াই বিকারগ্রস্ত ব্যক্তিদের মনে আবেগের সঞ্চার হয়। জেম্‌স-এর এই অভিমতের বিরুদ্ধে একথা বলা যেতে পারে যে, এসব ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে যাকে আমরা আবেগ বলি সেগুলি হল আবেগের মেজাজ (Emotional mood)। এসব ক্ষেত্রে দৈহিক পরিবর্তন প্রত্যক্ষভাবে কোন আবেগের সৃষ্টি করে না, আবেগের একটা মেজাজ সৃষ্টি করে এবং কোন প্রত্যক্ষ বা ধারণা সঙ্গে সঙ্গে এই আবেগের মেজাজটিকে আবেগে রূপান্তরিত করে। উন্মাদ ব্যক্তির সব সময়ই একটা বিশেষ ধরনের মেজাজ থাকে এবং কোন উদ্দীপক, যখন সামান্য কারণেই তার মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করে, তখনই তার আবেগ প্রকাশিত হয়।

বিকারগ্রস্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে যা দেখা যায় তা আবেগ নয়, আবেগের মেজাজ

অনুরূপভাবে বলা যেতে পারে যে, মাদক বা উত্তেজক দ্রব্য আবেগ সৃষ্টি করে না, আবেগের মেজাজ সৃষ্টি করে। দৈহিক পরিবর্তনও আবেগের মেজাজ সৃষ্টি করে, আবেগ সৃষ্টি করে না।

(ঘ) জেম্‌স-এর মতে যদি কৃত্রিমভাবে আবেগের দৈহিক প্রকাশগুলিকে ঘটান যায় তাহলে আবেগের উদ্ভব হয়, কিন্তু এ সিদ্ধান্ত যথার্থ নয়। অভিনেতারা কৃত্রিমভাবে যে আবেগ সৃষ্টি করে তা স্থায়ী হয় না। অনেক অভিনেতাকে রঙ্গমঞ্চে করুণভাবে ক্রন্দন করার পরই যবনিকার অন্তরালে গিয়ে হাসতে দেখা গেছে, অর্থাৎ রঙ্গমঞ্চ পরিত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে আবেগটি দূরীভূত হয়েছে।

(ঙ) জেম্‌স আবেগ এবং দৈহিক সংবেদনকে অভিন্ন মনে করেন। কিন্তু মনোবিদ্ ওয়ার্ড-এর মতে আবেগ হল অনুভূতিমূলক অবস্থা (Affective state) এবং দৈহিক সংবেদন হল জ্ঞান সম্পর্কীয় অবস্থা (Cognitive state)। আবেগের প্রতি মনোযোগী হলেই তা অদৃশ্য হয়ে যায়, কিন্তু দৈহিক সংবেদনের প্রতি মনোযোগী হলে তা অদৃশ্য হয়ে যায় না। যে লোক খুব সামান্য রাগ করেছে, সেই রাগের প্রতি যেই

আবেগ হল অনুভূতি-সম্পর্কীয়, দৈহিক সংবেদন হল জ্ঞান সম্পর্কীয়

1. Stout: Manual of Psychology (Fifth Edition) Page 367

সে মনোযোগী হতে চায় তখনই রাগ পালায়। কিন্তু ক্ষুধার প্রতি মনোযোগী হলে ক্ষুধা অদৃশ্য হয়ে যায় না।

(চ) আবেগ এবং তার দৈহিক প্রকাশ যদি অভিন্ন হয় তাহলে একই রকম দৈহিক প্রকাশ একই আবেগ নির্দেশ করত। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় বিভিন্ন আবেগের ক্ষেত্রে একই রকম দৈহিক প্রকাশ ঘটে থাকে। আমরা ভীত হলেও আঘাত করি, আবার ক্রুদ্ধ হলেও আঘাত করি; ব্যস্ত হলেও দৌড়াই, অবার ভীত হলেও দৌড়াই। তাছাড়া, একই আবেগের বিভিন্ন ধরনের বহিঃপ্রকাশ ঘটে থাকে। সভ্য ও শিক্ষিত ব্যক্তি একভাবে রাগকে প্রকাশ করে, আবার অসভ্য ও অশিক্ষিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে রাগের প্রকাশ অন্যভাবে দেখা দিতে পারে।

একই আবেগের ক্ষেত্রে একই রকম দৈহিক প্রকাশ ঘটে না

এ ছাড়াও, যে দৈহিক প্রকাশকে আমরা কোন একটি আবেগের সঙ্গে যুক্ত বলে মনে করি, সেই দৈহিক প্রকাশটি দেখা দিলেও সেই আবেগটি দেখা নাও দিতে পারে। যেমন, আমরা ভীত হলে কাঁপি, আবার শীতেও কাঁপি। যখন শীতে কাঁপি, তখন ভয়ের আবেগ কোথায়? সুতরাং কম্পনই ভয় নয়। মনোবিদ্ টিচেনার-এর মতেও দৈহিক সংবেদন—দৈহিক সংবেদনই; হৃৎপিণ্ড ধুক ধুক করাকেই ভয়ের আবেগ বলা যেতে পারে না; রক্তগণ্ড হওয়াকেই লজ্জার আবেগ বলা চলে না।[1]

(ছ) আবেগের মধ্যে যে একটা চেতনা বা অনুভূতির দিক আছে, তা কিছুতেই উপেক্ষা করা চলে না। মনোবিদ্ টিচেনার বলেন, "আবেগ হল খুব জটিল চেতনা, যেহেতু এর উদ্দীপক কোন বস্তু নয়, কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উদ্দীপক নয় বরং একটা সমগ্র পরিস্থিতি বা সঙ্কট। এ হল পুরোপুরি অনুভূতিমূলক চেতনা, যেহেতু এই পরিস্থিতি এবং আবেগের প্রতিক্রিয়াজনিত দৈহিক সংবেদন সুনিশ্চিতভাবে হয় প্রীতিকর বা না হয় অপ্রীতিকর।"[2] মনোবিদ্ স্টাউট-এর মতেও অনুভূতি আবেগের একটা উপাদান।[3]

---

1. "A group of organic sensation is after all a group of organic sensations, palpitation of the heart is not, in itself, the emotion of dread, and blushing is not in itself, the emotion of shame."

—Titchener: Text Book of Psychology; Page 482

2. "It is a highly complex consciousness since its stimulus is not an object, a perceptive stimulus, but some total situation or predicament. It is through and through an affective consciousness, since both the situation itself and the organic sensation of the emotive reaction are definitely pleasant or unpleasant."

—Titchener: Text Book of Psychology; Page 482

3. "...and emotions would seem to involve a specific affective component."

—Stout: Manual of Psychology, Page 367

(জ) জেম্স-এর মতে বস্তু প্রত্যক্ষণ করার সঙ্গে সঙ্গেই কতকগুলি দেহগত প্রতিক্রিয়া ঘটে এবং এই দেহগত প্রতিক্রিয়াগুলি আসলে প্রতিবর্ত ক্রিয়া (Reflex Action) এবং এগুলিই আবেগ। কিন্তু দেহগত প্রতিক্রিয়া যদি প্রতিবর্ত ক্রিয়া হয় তাহলে একই বস্তু বা উদ্দীপক একই প্রকৃতির প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে। প্রতিবর্ত ক্রিয়া সব ক্ষেত্রেই এক-প্রকার। কিন্তু বস্তু অনুযায়ী যে আমাদের দেহগত প্রতিক্রিয়া ভিন্ন হয়, দৈনন্দিন জীবনে আমরা এর বহু উদাহরণ দেখি। খাঁচায় ভালুক দেখলে আমরা ভয় পাই না, ছাড়া ভালুক দেখলে দৌড়তে শুরু করি। সুতরাং বস্তু দেখে নয়, আসলে পরিস্থিতিই আমাদের মনে আবেগ জাগিয়ে তোলে।

দেহগত প্রতিক্রিয়া ও প্রতিবর্ত ক্রিয়া এক নয়

(ঝ) মনোবিদ্ স্টাউট-এর মতো জেম্স, আবেগ যে পরাশ্রয়ী বা সহজাত প্রবৃত্তির ওপরই যে আবেগের ভিত্তি, সেকথা ভুলে গেছেন। কোন বিড়ালীর বাচ্চাগুলিকে তার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সে যে ক্রুদ্ধ হয় তার কারণ হল তার অপত্যস্নেহের পথে বাধার সঞ্চার হচ্ছে। মনোবিদ্ ম্যাক্‌ডুগাল-এর মতে আবেগের একটা ইচ্ছামূলক দিক আছে। উডওয়ার্থ এবং ড্রেভারও মনে করেন যে, সহজাত প্রবৃত্তিগুলির ক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত হলেই আবেগের সঞ্চার হয়।

আবেগ পরাশ্রয়ী বা সহজাত প্রবৃত্তিব ওপর নির্ভর

(ঞ) শেরিংটন একটি কুকুরীর ওপর পরীক্ষণকার্য চালিয়ে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, জেম্স-ল্যাঙ্গ মতবাদ ভ্রান্ত। তিনি কুকুরীটির সংবেদনবাহী স্নায়ুগুলি কেটে দিয়ে তার সব রকম আন্তরযান্ত্রীয় সংবেদন (visceral sensations) রহিত করে দিলেন, কিন্তু দেখা গেল তার পরেও কুকুরীটি ক্রোধ, আনন্দ, বিরক্তি এবং ভয় প্রকাশ করেছে। সুতরাং আবেগ আন্তরযান্ত্রীয় সংবেদন নির্ভর নয়।

শেরিংটন-এর পরক্ষীণ

(ট) ক্যানন, লুইস ও ব্রিটন বিড়ালের ওপর অনুরূপ পরীক্ষণকার্য চালিয়ে জেম্স-ল্যাঙ্গ-মতবাদকে ভ্রান্ত প্রমাণিত করেছেন। তাঁরা কয়েকটি বিড়ালের স্বয়ংক্রিয় স্নায়ু (Sympathetic nerves) অস্ত্রোপচারের সহায়তায় অপসারিত করলেন এবং স্নায়ুর ওপর নির্ভর যে ক্রোধের আবেগটি তার প্রকাশের সর্বপথ রুদ্ধ করে দিলেন। কিন্তু তবু দেখা গেল যে, বিড়ালগুলি ক্রোধের বাহ্যিক লক্ষণগুলি, যেমন,—গর্জন করা, দাঁত দেখান প্রভৃতি প্রকাশ করছে। সুতরাং দৈহিক অবস্থাই যে ক্রোধরূপ আবেগের কারণ নয়—এর দ্বারা তা প্রমাণিত হল, আবেগ দৈহিক সংবেদনের সমষ্টি নয়।

ক্যানন, লুইস ও ব্রিটন-এর পরীক্ষণ কার্য

জেম্‌স পরবর্তীকালে তাঁর মতবাদটিকে পরিবর্তিত করেছিলেন। তিনি তাঁর মূল মতবাদটির মধ্যে দুটি পরিবর্তন এনেছিলেন। প্রথমতঃ, তিনি প্রত্যক্ষণের অনুভূতির দিকটিকে স্বীকার করেছিলেন। তিনি স্বীকার করেছিলেন, প্রত্যক্ষণ অনুভূতিবর্জিত ও উত্তেজনাবিহীন নয়। দ্বিতীয়তঃ, যে পরিস্থিতিতে বস্তুটিকে প্রত্যক্ষণ করা হয়, সেই পরিস্থিতিকেও তিনি স্বীকার করে নিয়েছিলেন? সুতরাং জেম্‌স-এর মতবাদটির পরিবর্তিত রূপটি হল, আমরা প্রথমে একটি পরিস্থিতি (situation) পর্যবেক্ষণ করি যার একটি অনুভূতিমূলক দিক আছে। এই অনুভূতিযুক্ত প্রত্যক্ষণ দেহগত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং এ সংবাদ মস্তিষ্কে পৌছলেই আবেগের সঞ্চার হয।

জেম্‌স পরে নিজের মতবাদ পরিবর্তন করেন

প্রথমতঃ, প্রত্যক্ষণ এবং দেহগত প্রতিক্রিয়ার অন্তর্বর্তী অনুভূতিকে স্বীকৃতি দিয়ে এবং দ্বিতীয়তঃ বস্তুটি যে অবস্থায় বা পরিস্থিতিতে বর্তমান সেই পরিস্থিতিকে স্বীকৃতি দিযে জেম্‌স মূল মতবাদটির অভিনবত্বকে অনেকখানি ক্ষুণ্ণ করেছেন এবং পরোক্ষভাবে লৌকিক মতবাদটিকেই যেন স্বীকৃতি দিয়েছেন।

সুতরাং, **আমাদের সিদ্ধান্ত হল, আবেগ দেহগত প্রকাশের পূর্বগামী।** জেম্‌স-এর মতবাদের মূল্য হল এই যে, দেহগত সংবেদন যে আবেগের অপরিহার্য অংশ সেটি তিনি নির্দেশ করেছেন।

৯। আবেগ বা প্রক্ষোভ সম্পর্কীয় বিভিন্ন মতবাদ (Different Theories of Emotion) :

(ক) ক্যানন-বার্ড মতবাদ : হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ক্যানন জেম্‌স-ল্যাঙ্গ-এর মতবাদ পরিহার করে পরীক্ষণলব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে আবেগ বা প্রক্ষোভ সম্পর্কে একটি নতুন মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করেন। ক্যানন-এর সহকর্মী ফিলিপ ‧বার্ড তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করায় এই মতবাদটি ক্যানন-বার্ড মতবাদ নামে পরিচিত।

ক্যানন কয়েকটি বিড়ালের স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের সমবেদী (Sympathetic) অংশের সবটুকুই অস্ত্রোপচারের সহায়তায় অপসারিত করলেন। ক্রোধ, ভয় প্রভৃতি আবেগের প্রকাশ স্বযংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র নির্ভর। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখা গেল, বিড়ালগুলি কুকুরের আওয়াজ শোনা মাত্রই ক্রোধের বাহ্য লক্ষণ, যেমন—চীৎকার করা, দাঁত দেখান প্রভৃতি লক্ষণগুলি প্রকাশ করছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, কৃত্রিম উপায়ে আন্তরযান্ত্রীয় সংবেদন রহিত করা সত্ত্বেও আবেগের প্রকাশ বন্ধ হয় নি। সুতরাং এই পরীক্ষণ থেকে জানা যায়

দৈহিক সংবেদন আবেগের অনিবার্য কারণ

যে, আবেগের ক্ষেত্রে দৈহিক সংবেদনের উপস্থিতি থাকলেও আবেগ দৈহিক সংবেদনের সমষ্টি নয় বা দৈহিক সংবেদন আবেগের অনিবার্য শর্ত নয়।

ক্যানন সুস্থ ব্যক্তির ওপর অ্যাড্রিনন ইনজেক্‌সন প্রয়োগ করে দেখালেন যে, তার ফলে কোন আবেগের সৃষ্টি হচ্ছে না। অ্যাড্রিনন গ্রন্থিরস অত্যন্ত উত্তেজক। এই রস প্রয়োজনের অতিরিক্ত ক্ষরিত হলে হৃৎপিণ্ডের গতি বৃদ্ধি পায়, রক্তের চাপ বাড়ে, চক্ষুতারকা স্ফীত হয়। ভয়, ক্রোধ, উদ্বেগ প্রভৃতি আবেগের ক্ষেত্রে এই রস অধিক পরিমাণে ক্ষরিত হয়। কিন্তু ক্যানন আড্রিনন প্রয়োগ করে দেখালেন যে, ব্যক্তির মধ্যে ভয়, ক্রোধ প্রভৃতি আবেগ সৃষ্টি হচ্ছে না।

সুস্থ ব্যক্তির ওপর অ্যাড্রিনন ইনজেক্‌সন প্রয়োগে আবেগের সৃষ্টি হয় নি

ক্যানন-বার্ড মতবাদ অনুসারে থ্যালামাসের অঙ্গ হাইপোথ্যালামাসই (Hypothalamus) আবেগের কেন্দ্রস্থল। এই মতবাদ অনুসারে উদ্দীপকের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ ঘটার ফলে স্নায়বিক উদ্দীপনা অন্তর্মুখী স্নায়ুর মাধ্যমে থ্যালামাস, সুনির্দিষ্ট করে বলতে গেলে, হাইপোথ্যালামাস (Hypothalamus) নামক স্থানে পৌঁছায়। এই উদ্দীপনা একাধারে মস্তিষ্কে পৌঁছায় এবং অপরদিকে বহির্মুখী স্নায়ুপথ বেয়ে আন্তরযন্ত্রে (Viscera) অনালী গ্রন্থি, মাংসপেশী-প্রভৃতিতে গিয়ে পৌঁছায় ও সেগুলিকে উদ্দীপিত করে এবং তার ফলে দৈহিক উত্তেজনা বা পরিবর্তন দেখা যায়। সুতরাং ক্যানন-বার্ড মতবাদ অনুসারে দৈহিক পরিবর্তনই আবেগের কারণ নয়, হাইপোথ্যালামাসই আবেগের কেন্দ্রস্থল।

হাইপোথ্যালামাসই আবেগের কেন্দ্রস্থল

অনেক মনোবিদ্‌ ক্যানন্‌-বার্ডের মতবাদের সমালোচনা করেছেন এবং তাঁরা হাইপোথ্যালামাসকে আবেগের কেন্দ্রস্থল মনে করেন না।

(খ) আবেগ সম্পর্কে আচরণবাদীদের মতবাদ (Behaviouristic Theory of Emotion): জে. বি. ওয়াটসন আচরণবাদ বা চেষ্টিতবাদের প্রবর্তক। ওয়াটসন (Watson) দৈহিক পরিবর্তনকে আবেগের সঙ্গে অভিন্ন করে দেখেছেন। সাধারণতঃ মনে করা হয় দৈহিক পরিবর্তন আবেগের ফলস্বরূপ (effect of the emotion)। জেম্‌স এবং ল্যাঙ্গ দৈহিক পরিবর্তনকে আবেগের কারণ (cause of the emotion) মনে করেন। মনোবিদ্‌ উডওয়ার্থ দৈহিক পরিবর্তনকে আবেগের অবিচ্ছেদ্য অংশ (part and parcel) বলে মনে করেন। কিন্তু আচরণবাদী ওয়াটসন দৈহিক পরিবর্তন ও আবেগকে অভিন্ন (identical) মনে করেন। ওয়াটসনের মতে 'ভয়' এই

দৈহিক পরিবর্তন ও আবেগ অভিন্ন

আবেগ পাণ্ডুবর্ণ মুখমণ্ডল, নতভঙ্গি, কম্পন এবং অন্যান্য বাহ্য দৈহিক পরিবর্তন ও আভ্যন্তরীণ দেহযন্ত্রের বিশৃঙ্খল ক্রিয়াকলাপের (disturbed functions) সঙ্গে অভিন্ন। তিনি আবেগ বা প্রক্ষোভের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, "আবেগ হল বংশগত প্রতিক্রিয়ার ছাঁদ, যার সঙ্গে সমগ্র দেহযন্ত্রের বিশেষ করে আন্তরযন্ত্র এবং গ্রন্থিতন্ত্রের গভীর পরিবর্তন সংযুক্ত"।[1] প্রতিক্রিয়া-ছাঁদ (pattern-reaction) বলতে তিনি মনে করেন যে, যতবারই উদ্দীপক উপস্থাপিত হয়, ততবারই প্রতিক্রিয়ার বিভিন্ন দিকগুলি একই স্থিরতার সঙ্গে একই নিয়মানুযায়ী এবং একই পারম্পর্য অনুযায়ী আবির্ভূত হয়।

ওয়াটসনের সংজ্ঞা

আচরণবাদী ওয়াটসনের মতবাদের সঙ্গে জেম্‌স-ল্যাঙ্গ, ক্যানন ও উডওয়ার্থের অভিমতের কোন মিল নেই। কেননা, শেষোক্ত মনোবিদ্‌গণ আবেগের সঙ্গে দৈহিক পরিবর্তনের সংযোগের কথা উল্লেখ করলেও আবেগ যে মূলতঃ এক অনুভূতিমূলক চেতনা, তা স্বীকার করেছেন। কিন্তু আচরণবাদী ওয়াটসন যেহেতু মন, চেতনা প্রভৃতির অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, সেহেতু আবেগ ও দেহযান্ত্রিক প্রতিক্রিয়াকে অভিন্ন মনে করেছেন।

ওয়াটসন আবেগের মধ্যে কোন চেতনার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না।

সমালোচনা (Criticism): ওয়াটসন আবেগের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা গ্রহণযোগ্য নয়। প্রথমতঃ, আবেগের মধ্য থেকে চেতনাকে বর্জন করা কোনমতেই সম্ভব নয়। আবেগ অনুভূতির এক বিশেষ প্রকাশ। অনুভূতি হল সুখ-দুঃখ প্রভৃতির চেতনা। দ্বিতীয়তঃ, দৈহিক পরিবর্তন আবেগের বিশিষ্ট লক্ষণ। কিন্তু সে কারণে আবেগকে দৈহিক পরিবর্তনের সঙ্গে অভিন্ন করে দেখা যুক্তিযুক্ত নয়। তৃতীয়তঃ, আবেগ ও দেহযান্ত্রিক পরিবর্তন যদি অভিন্ন হয়, তবে বিভিন্ন আবেগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার দেহযান্ত্রিক পরিবর্তন সংগঠিত হওয়া উচিত। কিন্তু ক্রোধ, ভয় প্রভৃতি আবেগের ক্ষেত্রে দেহযান্ত্রিক পরিবর্তন একই ধরনের হয়ে থাকে বলে শারীরবৃত্তিবিদগণ স্বীকার করেন। বস্তুতঃ, চেতনাই আবেগের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য সূচনা করে।

১০। আবেগের দৈহিক প্রকাশ (Physiological Aspect of Emotion):

আবেগের সময় যেসব দেহযান্ত্রিক পরিবর্তন সাধিত হয় সেগুলিকে সাধারণতঃ দুভাগে ভাগ করা যেতে পারে—প্রথমতঃ, যেগুলি দেহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, যেমন—

1. "An hereditary pattern-reaction involving profound changes of the bodily mechanism as a whole, but particularly of the visceral and grandular systems." —Watson

হৃদপিণ্ডের গতিবৃদ্ধি, দ্রুত রক্তসঞ্চালন, দ্রুত শ্বাসক্রিয়া, কম্পন ইত্যাদি। সাধারণতঃ এগুলিকেই আবেগের প্রকাশ বলে মনে করা হয়। দ্বিতীয়তঃ, যে উদ্দীপক বা পরিস্থিতি আবেগ সৃষ্টি করে তার সঙ্গে উপযোজনের জন্য যে দৈহিক পরিবর্তন সংযুক্ত, যেমন—আঘাত করা, কামড়ান, দৌড়ানো ইত্যাদি। প্রথম ধরনের দৈহিক পরিবর্তনকে আবার দুভাগে ভাগ করা যেতে পারে—আন্তর (internal) এবং বাহ্য (external)। আন্তর পরিবর্তন অর্থে যেগুলি দেহের অভ্যন্তরে সংগঠিত হয়; যা অপরে পর্যবেক্ষণ করতে পারে না। যেমন—আবেগকালীন হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, পরিপাক যন্ত্র এবং অন্যান্য আন্তরযন্ত্রের ক্রিয়ার হ্রাস-বৃদ্ধি। বাহ্য পরিবর্তন অর্থে পাণ্ডুবর্ণ মুখমণ্ডল, চোখের মণি স্ফীত হওয়া, হাস্য অর্থাৎ যেগুলি অপরের পর্যবেক্ষণের বিষয়বস্তু এবং যেগুলির সাহায্যে অপরের আবেগের অস্তিত্ব ও স্বরূপ অনুমান করা হয়। এবার এই পরিবর্তনগুলি পরপর বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা যাক :

দেহযান্ত্রিক পরিবর্তন দুপ্রকারের

আন্তর ও বাহ্য দৈহিক পরিবর্তন

(ক) **আবেগ চলাকালীন দেহযন্ত্রের অভ্যন্তরে পরিবর্তন :** আবেগ চলাকালীন দেহযন্ত্রের অভ্যন্তরে যেসব পরিবর্তন সাধিত হয় সেগুলির ওপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বিশেষ করে স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র, অনালী গ্রন্থিগুলির ক্রিয়া আবেগের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত। স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের জন্যই দৈহিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়। স্বয়ংক্রিয় তন্ত্রের দুটি ভাগ আছে—সমবেদী (sympathetic) ও পরাসমবেদী (parasympathetic)। মৃদু আবেগের ক্ষেত্রে পরাসমবেদী বিভাগ সক্রিয় হয় যার জন্য হৃৎপিণ্ডের গতি মৃদু হয়, রক্তচাপ হ্রাস পায়, পাক-যন্ত্রের ক্রিয়া বর্ধিত হয়। আবার তীব্র আবেগের ক্ষেত্রে সমবেদী বিভাগ সক্রিয় হয় যার জন্য হৃৎপিণ্ডের গতিবৃদ্ধি, দ্রুত শ্বাসক্রিয়া, রক্তচাপ বৃদ্ধি এবং পেশীসমূহের উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। অ্যাড্রিন্যাল গ্রন্থি থেকে রক্তে ক্ষরিত রসের জন্য হৃৎপিণ্ড, রক্তকোষ প্রভৃতির ক্রিয়া দীর্ঘস্থায়ী হওয়া ইত্যাদিও উল্লেখযোগ্য আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন। রক্তে ক্ষরিত এই রস জীবকে পরিস্থিতির সম্মুখীন হবার জন্য উপযুক্ত অতিরিক্ত শক্তি সরবরাহ করে।

(খ) **আবেগ চলাকালীন প্রকাশমান আচরণ** (Expressive Movements) **:** হাসা, কাঁদা, চীৎকার করা প্রভৃতি বাহ্য-আচরণগুলি আবেগের ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়। এই সব প্রকাশমান আচরণের মধ্যে কতকগুলি শিক্ষানিরপেক্ষ এবং অপরগুলি অনুকরণশীল।

আবেগের কোন কোন বাহ্য-প্রকাশ শিক্ষা ও সামাজিক প্রভাবের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। যেমন, অনেক সময় ভীত হলেও আমরা ভয়ের বাহ্য লক্ষণগুলির প্রকাশকে সাধ্যমত

নিয়ন্ত্রিত করার জন্য সচেষ্ট হই। প্রকাশমান আচরণ বা আবেগের বাহ্য দৈহিক প্রকাশের মধ্যে মুখের এবং কণ্ঠস্বরের পরিবর্তনই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তারপর হৃৎপিণ্ডের এবং নিঃশ্বাসের গতি। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য বহিঃপ্রকাশ হল চোখের মণি স্ফীত হওয়া, ঘর্মাক্ত হওয়া, কাঁপা, শরীরের লোম খাড়া হওয়া ইত্যাদি। এ ছাড়াও বিশেষ বিশেষ আবেগের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট দেহভঙ্গিমার প্রকাশ ও ভাষা ব্যবহার আমাদের শিক্ষানির্ভর।

আবেগের কোন কোন প্রকাশ শিক্ষা ও সামাজিক প্রভাবের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়

(গ) **উপযোজনমূলক দৈহিক প্রকাশ** (Adaptive Movements): যে উদ্দীপক আবেগ সৃষ্টি করে, সেই উদ্দীপকের সঙ্গে উপযোজনের জন্য কতকগুলি দৈহিক প্রকাশ ঘটে,যেমন—সামনে বাঘ দেখলে আমরা ভয়ে কাঁপতে থাকি এবং পালাবার জন্য ছুটতে থাকি। এক্ষেত্রে কাঁপা হল আবেগের প্রকাশমান আচরণ এবং পলায়ন হল উপযোজনমূলক আচরণ। জেম্‌স, ম্যাকডুগাল, ওয়াটসন প্রমুখ মনোবিদ্‌গণ এই উপযোজনমূলক অঙ্গ সঞ্চালনকে সহজাত মনে করেন। ক্যানন, উডওয়ার্থ, ম্যাক্‌ডুগাল প্রমুখ শারীরবৃত্তবিদ্‌ এবং মনোবিদ্‌গণ ডারউইনের অনুসরণে বলেন যে, দেহযন্ত্রের অভ্যন্তরে যেসব পরিবর্তন সাধিত হয় সেগুলি উপযোজনমূলক অঙ্গসঞ্চালনের সহায়ক। ভয়, ক্রোধ প্রভৃতি আবেগের ক্ষেত্রে যে পরিপাক যন্ত্রের ক্রিয়া রুদ্ধ হয়ে যায় তার কারণ কিছুটা শক্তি মুক্ত করে দেওয়া, যাতে পেশীগুলি আক্রমণ, আত্মরক্ষা বা পলায়ন কার্যে সেই শক্তির সহায়তা গ্রহণ করতে পারে। ম্যাক্‌ডুগাল-এর মতে, যে কোন প্রাণীর যাবতীয় দৈহিক পরিবর্তন, যেগুলিকে আমরা আবেগের প্রকাশ বলে অভিহিত করি, সেগুলি প্রাণীর সহজাত ক্রিয়ার জন্য দেহের উপযোজন। যেমন, পলায়ন প্রবৃত্তি প্রাণীর একটা সহজাত প্রবৃত্তি। পলায়নের জন্য দ্রুত অঙ্গ সঞ্চালনের প্রয়োজন। কিন্তু দ্রুত অঙ্গ সঞ্চালন সম্ভব হয় যদি আন্তরযন্ত্রের ক্রিয়া সেভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। এর জন্য প্রয়োজন হৃৎপিণ্ডের ও ফুসফুসের দ্রুত ক্রিয়া, ফুসফুস, পেশী এবং মস্তিষ্কে অধিক রক্ত সঞ্চালিত হওয়া, চোখের মণি স্ফীত হওয়া যাতে চোখে বেশী আলো প্রবেশ করলে সমস্ত পরিস্থিতির চাক্ষুষ প্রত্যক্ষণ স্পষ্ট হয়।[1]

ম্যাক্‌ডুগালের পূর্বোক্ত মতবাদকে যথার্থ মতবাদরূপে গ্রহণ করার পক্ষে বাধা আছে। একটি প্রকল্প হিসেবে একে গ্রহণ করা যেতে পারে, যা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে। আবেগের সময় আমাদের সব আচরণই উপযোজনমূলক, একথা বলা সম্ভব নয়; যেহেতু দেখা যায় যে, অত্যধিক ভয়ের সময় কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যক্তি পলায়নের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে এবং সাময়িকভাবে ব্যক্তির দেহে পক্ষাঘাতের সূচনা হয়।[2]

---

1. McDougall: Outlines of Psychology, Page 321-22
2. S. C. Sen: A Text Book of Psychology; Fifth Edition, Page 395

১১। আবেগ, মেজাজ, স্বভাব, অতিরাগ, আয়ান (Emotion, Mood, Disposition, Passion and Temperament) :

আবেগ ও মেজাজ : আবেগ হল অনুভূতির এক বিশেষ রূপ। আবেগকে জটিল অনুভূতি বলা যেতে পারে। আবেগের বেলায় অনুভূতির এক বিশেষ ধরনের প্রকাশ ঘটে ; যেমন—ভয়, ক্রোধ, হিংসা ইত্যাদি। যখন আমি কোন লোকের ওপর ক্রুদ্ধ হয়েছি বা কোন কারণে ভয় পেয়েছি তখন আমার মধ্যে ভয় বা ক্রোধ এই আবেগের আবির্ভাব ঘটেছে বলা যেতে পারে।

আবেগ অনুভূতির এক বিশেষ রূপ

কিন্তু এমন হতে পারে যে, আমার মধ্যে একটা ক্রোধের বা ভীতিগ্রস্ত অবস্থার ভাব রয়েছে যদিও আমি আসলে ক্রুদ্ধ বা ভীত হইনি। মনের এ জাতীয় অবস্থাকে বলা হয় মেজাজ (mood) [1]। মেজাজ হল আবেগের বাস্তবে প্রকাশিত হবার প্রবণতা। আবেগের সঙ্গে মেজাজের পার্থক্য হল—(১) মেজাজ আবেগের তুলনায় অপেক্ষাকৃত দীর্ঘস্থায়ী। (২) মেজাজের ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট বস্তু থাকে না, কিন্তু মেজাজের এমনই বৈশিষ্ট্য যে নিজের থেকে একটা বস্তু সৃষ্টি করে নিয়ে সে আবেগে রূপান্তরিত হয়। যদি আমার রাগের মেজাজ হয়, তাহলে যে-কোন সামান্য বিষয়কে, তা ভালই হোক বা মন্দই হোক, কেন্দ্র করে আমার রাগ ফেটে পড়ে। (৩) আবেগ হল বাস্তব অনুভূতি, মেজাজ হল আবেগের বাস্তবে প্রকাশিত হবার প্রবণতা।

মেজাজ হল দীর্ঘস্থায়ী অনুভূতি

একই মেজাজ নানা ধরনের আবেগ, যেমন—দুঃখ, ক্রোধ, ঘৃণা প্রভৃতি সৃষ্টি করতে পারে। আবার, আবেগ তার আনুষঙ্গিক মেজাজের ওপর প্রতিক্রিয়া ঘটায়। যদি আমার মধ্যে হামেশাই রাগ দেখা দেয়, তখন আমার মধ্যে একটা রাগের মেজাজ তৈরি হয়ে যায় এবং এই মেজাজ আমার মধ্যে স্থায়ী হতে পারে। এক্ষেত্রে মেজাজ আবার অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। কিন্তু সাধারণতঃ মেজাজ অতখানি দীর্ঘস্থায়ী হয় না। আমরা নিজেরাই দেখি কখনও খুশির মেজাজে, কখনও বা দুঃখের মেজাজে, কখনও খুব স্ফূর্তির মেজাজে আবার কখনও বা অবসন্ন মেজাজে থাকি।

---

1. Mood: an affective condition or attitude enduring for sometime, characterised by particular emotions in a condition of sub-excitation, so as to be readily evoked e. g. an irritable mood or a cheerful mood."

—J. Drever: A Dictionary of Psychology; (Penguin Book) Page 173

দৈহিক অবস্থা সাধারণতঃ মেজাজ সৃষ্টি করে। যার হজম ভালভাবে হয় না, তার মেজাজ খুব রুক্ষ এবং খিটখিটে হয়ে যায়। যেসব লোক অনিদ্রারোগে ভোগে তারাও খুব খিটখিটে মেজাজের হয়। আর যারা স্নায়বিক রোগে ভোগে তাদের মধ্যে একটা বিষণ্ণতা বা হতাশার মেজাজ লক্ষ্য করা যায়।

মেজাজের কারণ

আবেগ ও স্বভাব ঃ অনুভূতির বাস্তব প্রকাশ হল আবেগ ; স্বভাব (Emotional Disposition) অনুভূতির বাস্তব প্রকাশ নয়—এ আবেগ হল কোন বস্তু সম্পর্কে কোন বিশেষ অবস্থায় কোন অনুভব করার স্থায়ী মানসিক প্রবণতা। স্বভাব মেজাজের তুলনায় অধিকতর স্থায়ী প্রবণতা।

স্বভাব হল আবেগ অনুভব করার স্থায়ী মানসিক প্রবণতা

এই স্বভাব সহজাত হতে পারে, আবার অর্জিত হতে পারে। মনোবিদ্ টিচেনার বলেন যে, নারীরা মাতৃসুলভ স্বভাব, অর্থাৎ ছোট ছোট শিশুদের প্রতি ভালবাসার এক সহজাত প্রবণতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। অনুরূপভাবে শিশুর মধ্যেও দেখা যায় উচ্চ শব্দ শুনে ভীত হওয়ার স্বভাব। কিন্তু স্বভাব অর্জিতও হতে পারে। যখন আমি বলি যে, আমি কোন মানুষকে ভালবাসি বা ঘৃণা করি, তখন আমার ভালবাসা বা ঘৃণা করার প্রবণতা হল স্বভাব। আবেগের বা মেজাজের বেলায় আমাদের সে সম্পর্কে সচেতনতা থাকে। কিন্তু স্বভাবের বেলায় আমরা সব সময় সচেতন থাকি না। পিতা পুত্রের প্রতি স্নেহশীল। কিন্তু এই স্নেহশীলতা সম্পর্কে পিতা যে সব সময়ই সচেতন তা নয়। বিশেষ বিশেষ অবস্থায় যখন পিতার এই স্বভাবের আত্মপ্রকাশের প্রয়োজন দেখা দেয়, তখনই স্বভাব আত্মপ্রকাশ করে। পিতা তার স্নেহশীল স্বভাবের জন্য পুত্রের পরীক্ষার সাফল্যে আনন্দিত হন, পুত্রের বিফলতায় দুঃখিত হন বা ভাবী বিপদের আশঙ্কায় ভীত হন।

স্বভাব সহজাত এবং অর্জিত, উভয় প্রকার হতে পারে

স্বভাবের সঙ্গে আবেগের পার্থক্য হল, আবেগের তুলনায় স্বভাব অনেক বেশী স্থায়ী। তাছাড়া, আবেগ হল চেতন অবস্থা, কিন্তু চেতনার সর্বনিম্ন সীমায় নীচে অবস্থান করে, কেননা, আমি যে ভালবাসি বা ঘৃণা করি সে সম্পর্কে আমি প্রতি মুহূর্তে সচেতন নই।

মেজাজ ও স্বভাবের পার্থক্য

অবশ্য মনোবিদ্‌রা এ জাতীয় পার্থক্যকে বড় বেশী আমল দেন না। বিষণ্ণতা, ভালবাসা, ঘৃণা এগুলি আবেগ এবং স্বভাব উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়। মনোবিদ্ জেম্‌স আবেগের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন যে, ‘আবেগ হল অনুভব করার প্রবণতা’

(a tendency to feel)। আবেগের এই জাতীয় সংজ্ঞা মেনে নিলে আবেগ ও স্বভাবের তারতম্য করা কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়।

অতিরাগ (Passion) **শব্দটি** একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। (১) মনের নিষ্ক্রিয় অবস্থা—এই অর্থে সংবেদন এবং অনুভূতিও অতিরাগের অন্তর্ভুক্ত। (২) তীব্র বা ক্ষীণ, যে-কোন আবেগ। (৩) তীব্রআবেগ, যেমন, ক্রোধ হল আবেগ কিন্তু অতিক্রোধ বা 'উগ্রচণ্ডীভাব' হল অতিরাগের দৃষ্টান্ত। (৪) তীব্র স্থায়ী মানসিক প্রবণতা বা স্বভাব (emotional disposition), যেমন—প্রতিহিংসাপরায়ণতা। (৫) তীব্র আসক্তি অর্থেও ব্যবহৃত হয়, যেমন, জুয়াখেলা বা মদ্যপানের তীব্র আসক্তি।

মনোবিদ্যায় 'অতিরাগ' শব্দটিকে একটা বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়। যখন কোন আবেগ স্বাভাবিকভাবে আত্মপ্রকাশ করতে না পারার জন্য প্রশমিত হয়ে মনেই বিরাজ করতে থাকে, তখন অতিরাগের সৃষ্টি হয় এবং সুযোগমত এই আবেগের আত্মপ্রকাশ ঘটে। 'ক্রোধ' এই আবেগটি অনেক সময় আত্মপ্রকাশের সুযোগ পায় না, তখন একটা ক্রোধোন্মত্ততা বা উগ্রচণ্ডী ভাবের সৃষ্টি হয়। ক্রোধোন্মত্ততা (fury or rage) হল অতিরাগ। সুযোগমত এই ক্রোধোন্মত্ততা একজন নিষ্ঠুর কার্যের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে।

আয়ান (Temperament) হল অনুভব করার, কার্য করার এবং চিন্তা করার সহজাত স্থায়ী প্রবণতা। আয়ান বলতে আমরা সাধারণতঃ যাকে 'ধাত' বলি তাকেই বোঝায়। অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলির রসক্ষরণের জন্য ব্যক্তিবিশেষের দেহের মধ্যে যে রাসায়নিক পরিবর্তন অবিরত সাধিত হচ্ছে তা এর মূলে বর্তমান। এই রাসায়নিক পরিবর্তন বিভিন্ন প্রকারের আয়ান উৎপন্ন করে। আয়ানের সঙ্গে ব্যক্তির মানসিক গঠনের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে। মেজাজের সঙ্গে মানসিক গঠনের সম্পর্ক অল্প, আবেগের সঙ্গে এ সম্পর্ক নেই বলা যেতে পারে।

১২। আবেগের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Emotion):

আবেগকে সাধারণ (Common) এবং বিশেষ (Special) এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়। প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হল আনন্দ ও দুঃখ। এই দুই আবেগ অন্য সব আবেগ, যেমন—ক্রোধ, ভয়, ভালবাসা, ঘৃণা প্রভৃতির সঙ্গে জড়িত। দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হল ক্রোধ, ভয়, ভালবাসা, ঘৃণা প্রভৃতি। এই সব আবেগের নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য আছে। শেষোক্ত আবেগকে আবার দু'শ্রেণীতে ভাগ করা হয়—ব্যক্তিগত বা মূর্ত (Personal or

সাধারণ আবেগ ও বিশেষ আবেগ

Concrete) এবং নৈর্ব্যক্তিক বা অমূর্ত (Impersonal or Abstract)। প্রথম ধরনের আবেগগুলি কোন মূর্তবস্তু বা ধারণাকে কেন্দ্র করে দেখা দেয়। দ্বিতীয় ধরনের আবেগগুলি সত্য, শিব ও সুন্দর এই অমূর্ত আদর্শ বা ধারণাকে কেন্দ্র করে দেখা দেয়।

আত্মকেন্দ্রিক ও পরকেন্দ্রিক আবেগ

ব্যক্তিগত আবেগগুলিকে আবার 'দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়—আত্মকেন্দ্রিক (Egoistic) এবং পরকেন্দ্রিক (Altruistic)। ভয়, ক্রোধ, ঘৃণা, অহঙ্কার হল আত্মকেন্দ্রিক আবেগ এবং সহানুভূতি, ভালবাসা, দয়া, প্রেম ইত্যাদি পরকেন্দ্রিক আবেগ।

এবার প্রধান প্রধান কয়েকটি আবেগের স্বরূপ ও আনুষঙ্গিক দৈহিক প্রকাশের বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে ঃ

ভাবী বিপদের ভাবনা থেকে ভয় হয়

(ক) **ভয় (Fear)** ঃ ভাবী বিপদের ভাবনা থেকেই ভয়ের উদ্রেক হয়। এ এমন বিপদ যাকে আমরা ঠেকাতে চাই কিন্তু যাকে ঠেকাবার মতো ক্ষমতা বা সামর্থ্য আমাদের নেই। ভয়ের উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ক্রিয়াশক্তি বৃদ্ধি পায় এবং বিপদের কারণটিকে এড়াতে আমাদের প্রবৃত্ত করে। যেমন, পথের মাঝে হঠাৎ একটা বাঘ দেখলে আমরা পলায়নের জন্য উদ্যত হই। ভয় হল আত্মরক্ষামূলক আবেগ; অত্যধিক ভয় অনেক সময় আত্মরক্ষার সহজাত প্রবৃত্তি প্রকাশের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে। কারণ, সে সময় আমরা আত্মরক্ষা করার ক্ষমতা ও আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলি এবং ফলে দেহ ও মন শিথিল ও অবশ হয়ে পড়ে। ম্যাকডুগালের মতে পলায়ন-প্রবৃত্তির সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে আছে ভয়—এই আবেগ।

ভয়ের কারণ

নিম্নলিখিত কারণে ভয়ের উদ্রেক হয়—(১) যে বস্তু পূর্বে বেদনার সঞ্চার করেছিল তার প্রত্যক্ষণ বা ভাবনা—কথায় বলে 'ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায়।' (২) কোন বস্তুর আকস্মিক আবির্ভাব ও অসাধারণ তীব্রতা যেমন—হঠাৎ কোন প্রচণ্ড শব্দ শোনার জন্য আমরা প্রস্তুত ছিলাম না বা বজ্রের গর্জন যদিও ক্ষতিকর নয় বলে আমরা জানি, তবু তার আকস্মিক তীব্র শব্দ মনে ভয়ের উদ্রেক করে।

(৩) অপরিচয়ও মনে ভীতির উদ্রেক করে, যেমন—অন্ধকার রাত্রে হঠাৎ কোন অপরিচিত জন্তু-জানোয়ার দেখলে মনে ভয় হয়। ছোট ছোট শিশুরা ভূত-প্রেতের কথা শুনলেই যে ভয় পায় কারণ ভূত প্রেতের যে কাল্পনিক মূর্তি তারা মনে গড়ে তোলে সেগুলি কিম্ভূতকিমাকার এবং অপরিচিত আকৃতির।

অধিকাংশ মনোবিদ্‌দের মতে পরিস্থিতির আকস্মিক পরিবর্তন ঘটলে এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতি সাধনে ব্যর্থ হলেই ভয়ের উদ্ভব হয়।

ভয় হল বেদনাদায়ক আবেগ এবং এটি হল সহজাত মৌলিক আবেগ। কেননা শিশু, পরিণত বয়স্ক ব্যক্তি, ইতর প্রাণী সকলেই ভীত হয় এবং পালিয়ে বা ভীতিমূলক পরিস্থিতির প্রতিরোধ করে বিপদসঙ্কুল জগতে আত্মরক্ষার জন্য সচেষ্ট হয়। ভয়কে ছোঁয়াচে আবেগও বলা যেতে পারে, কেননা যখন কোন ভীড়ের মধ্যে একজন লোককে ভয় পেতে দেখা যায়, ছোঁয়াচে রোগের মতো ভয় অপরের মনেও সংক্রমিত হয়।

ভয়ের সময় দৈহিক পরিবর্তন

ভয়ের সময় কতকগুলি উল্লেখযোগ্য দৈহিক পরিবর্তন দেখা দেয়। হৃদযন্ত্র ও ফুসফুসের গতিবৃদ্ধি, ফুসফুস, মস্তিষ্ক ও পেশীতে দ্রুত রক্ত সঞ্চালন, চোখের মণি স্ফীত হওয়া, দেহ কম্পিত হওয়া, মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করা, জিভ ও কণ্ঠ শুকিয়ে যাওয়া, বক্ষের দ্রুত স্পন্দন, দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস, গলার স্বর অস্পষ্ট হয়ে যাওয়া এবং ধীরে ধীরে বাক্‌শক্তি হারিয়ে ফেলা। চোখের মণি স্ফীত হয়, যাতে চোখের মণি অধিক আলোক গ্রহণ করে ভয়ের বস্তুটিকে সুস্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করতে পারে। অত্যধিক ভীতির ক্ষেত্রে দেহ অবশ ও শিথিল হয়ে পড়ে, দেহচর্ম বিবর্ণ হয়ে যায়, শরীর থেকে ঘাম ঝরতে থাকে এবং দেহের রোমরাজি খাড়া হয়ে যায়। আবার কোন কোন আকস্মিক ভয়ের ক্ষেত্রে মানুষ অনেক দুঃসাহসিক কার্য সম্পন্ন করে। যেমন, কোন উঁচু জায়গা থেকে লাফ দেওয়া, খুব ভারী বস্তু তুলে দূরে নিক্ষেপ করা, সামর্থ্যের অতিরিক্ত পরিশ্রম করা ইত্যাদি।

অধ্যাপক ক্যানন পরীক্ষণের সাহায্যে দেখিয়েছেন যে, ভয়ের সময় মূত্রাশয়ের কাছাকাছি অবস্থিত অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি রক্তের মধ্যে অ্যাড্রেনালিন নামে একপ্রকার শক্তিশালী রাসায়নিক পদার্থ ক্ষরণ করে যা পেশীকে অতিরিক্ত শক্তি জোগায়, ফলে পেশীগুলি খুব শক্তিশালী হয়। এই কারণেই বিপদের মুহূর্তে মানুষ নানারকম দুঃসাহসিক কার্য সম্পন্ন করতে পারে।

আতঙ্ক (terror) হল ভয়ের চরম অবস্থা। এই অবস্থায় ব্যক্তির দেহের ওপর কর্তৃত্ব লোপ পায়, কর্মক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। আতঙ্কে ব্যক্তি দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে।

(খ) ক্রোধ (Anger) : কোন কোন মনোবিদের মতে ক্রোধ ভয়ের মতো সহজাত আবেগ ; কেননা—শিশু, ইতর প্রাণী সকলের মধ্যেই জন্ম থেকেই ক্রোধের আবির্ভাব দেখা যায়। আবার কারও কারও মতে ভয়ের কিছু পরে ক্রোধের আবির্ভাব ঘটে। আচরণবাদী ওয়াটসনের মতে ক্রোধ জন্ম থেকেই দেখা দেয়।

আমাদের কোন ইচ্ছা, কামনা, বাসনা ও সহজাত প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তির পথে বাধা সঞ্চারিত হলে মনে ক্রোধের সঞ্চার হয়। যা কিছু দুঃখদায়ক তা আমাদের আত্মরক্ষামূলক সহজাত প্রবৃত্তির পথে ব্যাঘাত ঘটায়। সুতরাং দুঃখের কোন উৎস প্রত্যক্ষ করলে বা ধারণা করলেও মনে ক্রোধের সঞ্চার হয়। কোন শিশুর হাত থেকে খাবার কেড়ে নিলে সে ক্রুদ্ধ হয়। বিড়ালের লেজ ধরে টানাটানি করলে বা ক্ষুধার্ত কুকুরের মুখের কাছ থেকে খাদ্য কেড়ে নিলে সে ক্রুদ্ধ হয়।

ইচ্ছা, কামনা বা সহজাত প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তির পথে বাধা মনে ক্রোধ জাগায়

মনোবিদ্ ম্যাক্‌ডুগাল মনে করেন যে, ক্রোধ প্রাণীর সহজাত আক্রমণাত্মক প্রবৃত্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ভয়ের সময় যেমন দেহের সক্রিয়তার প্রয়োজন হয়, ক্রোধের সময়ও দেহের সক্রিয়তার প্রয়োজন যাতে ব্যক্তি প্রতিপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারে।

ক্রোধের সময় কতকগুলি দৈহিক লক্ষণ প্রকাশ পায়, যেমন—মুষ্টি বদ্ধ করা, দাঁত কড়মড় করা, তর্জন-গর্জন করা, দ্রুত শ্বাসক্রিয়া, হৃদ্‌যন্ত্রের গতিবেগ বৃদ্ধি পাওয়া ইত্যাদি।

ক্রোধের দৈহিক লক্ষণ

ভয় এবং ক্রোধের মধ্যে নিম্নলিখিত পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়:

(১) ভয় পেলে লোকে ভীতিজনক বস্তু থেকে দূরে সরে থাকতে চায় কিন্তু ক্রোধের সময় লোকে ক্রোধের যেটি কারন তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়। (২) ক্ষতির সম্ভাবনা থেকেই ভয়ের উদ্রেক, কিন্তু ক্ষতি করা হয়েছে বা হবে, এরকম চিন্তার জন্যই ক্রোধের উদ্রেক হয়। (৩) ভয়ের সময় আমরা দুর্বল হয়ে পড়ি, আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলি, বিপজ্জনক পরিস্থিতিকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা নেই বলে মনে করি; কিন্তু ক্রোধের সময় আমরা নিজেদের শক্তিশালী বলে মনে করি এবং প্রতিপক্ষকে প্রতিরোধ করে তাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে পারব বলে মনে করি। (৪) ভয়ের বস্তু চেতন ও অচেতন উভয় প্রকারই হতে পারে, কিন্তু আমরা চেতন বস্তু সম্পর্কেই ক্রুদ্ধ হই। আমরা বন্দুক দেখে ভয় পাই কিন্তু বন্দুকধারীর ওপর ক্রুদ্ধ হই।

ভয় ও ক্রোধের মধ্যে পার্থক্য

(ক) **প্রেম (Love):** প্রেম হল পরকেন্দ্রিক আবেগ। প্রেম শব্দটিকে তিনটি ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়। প্রথমতঃ, প্রেম বলতে কামের আবেগকে (Emotion of lust) বোঝায়। দ্বিতীয়তঃ, প্রেম বলতে কোন কোমল অনুভূতি (Tender emotion) বোঝায়, যেমন—পিতৃস্নেহ, মাতৃস্নেহ ইত্যাদি। তৃতীয়তঃ, প্রেম বলতে একটা স্থায়ী আবেগমূলক স্বভাবকে (Permanent emotional disposition) বোঝাতে পারে যা বিভিন্ন আবেগের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করে।

প্রেম শব্দটির বিভিন্ন অর্থ

প্রেমের মধ্যে দুটি উপাদান আছে—আকর্ষণ এবং সহানুভূতি। আকর্ষণ—আদর, আলিঙ্গন, স্নেহ প্রভৃতির মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে। সহানুভূতি হল অপরের অনুভূতির অংশীদার হওয়া। মনোবিদ্ সালি মনে করেন যে, আকর্ষণ বা স্বার্থকেন্দ্রিক ভালবাসা হল প্রেমের আত্মকেন্দ্রিক উপাদান এবং সহানুভূতি প্রেমের পরকেন্দ্রিক উপাদান। মনোবিদ্ বেইন মনে করেন যে, আকর্ষণ হল কোমল অনুভূতি যা দৈহিক সংযোগ, যেমন—স্পর্শন, আলিঙ্গন ইত্যাদির মাধ্যমে প্রকাশ পায়।

প্রেমের মধ্যে দুটি উপাদান

ফ্রয়েড প্রেম ও কামকে অভিন্ন মনে করেন। ওয়াটসন ফ্রয়েডকে সমর্থন করেন এবং মনে করেন যে, প্রেম হল ভয় ও ক্রোধের মতো এক মৌলিক আবেগ। কিন্তু প্রেমের মধ্যে কামভাব থাকলেও, প্রেম ও কাম অভিন্ন নয়।

(খ) ঘৃণা (Hate): প্রেম হল পরকেন্দ্রিক, ঘৃণা হল আত্মকেন্দ্রিক অনুভূতি। বস্তুতঃ, প্রেম এবং ঘৃণা হল অন্যোন্যসাপেক্ষ পদ; একটিকে ছাড়া আর একটির অর্থ সুস্পষ্ট-ভাবে বোঝা যায় না। ঘৃণা শব্দটি দ্ব্যর্থক; ঘৃণা আবেগকে বোঝাতে পারে, আবার স্থায়ী মানসিক প্রবণতাকে বোঝাতে পারে। ম্যাকডুগালের মতে ঘৃণা হল এক মিশ্র আবেগ। ঘৃণার মধ্যে ক্রোধ, ভয় এবং বিরক্তি—এই তিনটি আবেগের সংমিশ্রণ রয়েছে। ঘৃণার বস্তু আমাদের মধ্যে ক্রোধের উদ্রেক করে, আমাদের ভীত করে এবং আমাদের নিবৃত্তও করে।

ঘৃণার স্বরূপ

ঘৃণা প্রেমের বিপরীত। কোন ব্যক্তির মনে ঘৃণার উদ্রেক হলে সে ঘৃণার বস্তুকে পরিহার করে। প্রেমাস্পদ দূরে চলে গেলে আমরা বিচ্ছেদ ব্যথা অনুভব করি; আর ঘৃণার পাত্র দূরে চলে গেলে আমরা স্বস্তি লাভ করি। প্রেমের মধ্যে আছে ব্যাপকতা, একটা বিস্তৃতির ভাব। ঘৃণার মধ্যে আছে নিজের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে নেবার ভাব।

প্রেম ও ঘৃণার পার্থক্য

(গ) সহানুভূতি (Sympathy): সহানুভূতি শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হল অপরের দুঃখে দুঃখ বোধ করা (sympathise with pathos and sufferings), কিন্তু মনোবিদ্যায় একে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করা হয়। এ অর্থে সহানুভূতি হল অপরের সুখ-দুঃখের অংশীদার হওয়া, অপরের সুখে হাসা, দুঃখে কাঁদা। অপরের অনুভূতির প্রকাশ, কল্পনা ও চিন্তনের সাহায্যে অনুধাবন করা, অপরের সুখ-দুঃখে—আশায়, নিরাশায় অনুরূপ অনুভূতি অনুভব করাই (feeling the feelings of others) হল সহানুভূতি।

সহানুভূতি শব্দটির সংকীর্ণ ও ব্যাপক অর্থ

সহানুভূতি পরকেন্দ্রিক অনুভূতি—শুধু পরকেন্দ্রিক নয়; দয়া, মায়া, মমতা, প্রেম, স্বদেশপ্রেম প্রভৃতি পরকেন্দ্রিক আবেগের ভিত্তিস্বরূপ। সহানুভূতির সক্রিয় দিকটি পরোপকার-প্রবৃত্তির মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে।

সহানুভূতি নিম্নলিখিত শর্তের ওপর নির্ভর করে:

(১) যিনি সহানুভূতি বোধ করবেন, তাঁর মধ্যে আবেগ প্রবণতা থাকা প্রয়োজন। যার মধ্যে অনুভূতিপ্রবণতা নেই, তিনি কখনও অপরের অনুভূতি অনুভব করতে পারেন না। পরম আত্মীয়ের মৃত্যুতে যার হৃদয় শোকে অভিভূত হয় না, তিনি অপরের মৃত্যুতে কিভাবে দুঃখে অনুভূত হতে পারেন?

(২) যিনি অনুভূতি বোধ করেন, তাঁর মধ্যে অপরের অনুভূতির প্রকাশ লক্ষ্য করার আগ্রহ থাকা বাঞ্ছনীয়।

(৩) যিনি অনুভূতি বোধ করবেন তাঁকে অপরের অনুভূতি উপলব্ধি করার জন্য সক্রিয় কল্পনাশক্তির অধিকারী হতে হবে।

(৪) ব্যক্তিগত সম্পর্ক অনুভূতি উদ্রেক করে। সাধারণ মানুষ তার নিকট আত্মীয়ের জন্য যতটা সহানুভূতি বোধ করে, অপরের জন্য তা করে না।

(৫) একত্র বসবাস, একই কর্মস্থল প্রভৃতি সহানুভূতি উদ্রেকের শর্ত। যেমন, একই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছাত্র বা একই অফিসের কেরাণীর মধ্যে সহজেই পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি জাগে।

(৬) পারস্পরিক অনুরাগ সহানুভূতি উদ্রেক করে। যাকে আমরা ভালবাসি বা যার সঙ্গে বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ, তার প্রতি সহজেই সহানুভূতি বোধ করি। শত্রুর জন্য আমাদের সহানুভূতি জাগে না।

(৭) একই স্বভাবের লোক পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি বোধ করে। কোন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি অন্য ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির জন্য সহানুভূতি বোধ করে।

সহানুভূতির বিকাশ কোন্ অবস্থায় ঘটে?

নিম্নলিখিত অবস্থা সহানুভূতির বিকাশ সাধনে সহায়তা করে। অনুভূতি সম্পর্কে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বৃদ্ধি সহানুভূতির বিকাশ-সাধনে সহায়তা করে। জীবনে বহু সুখ-দুঃখের অভিজ্ঞতা যার হয়েছে তিনি অপরের সুখ-দুঃখে সহজেই সহানুভূতি বোধ করেন। দ্বিতীয়তঃ, বন্ধু এবং পরিচিত ব্যক্তির সংখ্যার বৃদ্ধি সহানুভূতির বিকাশে সহায়তা করে; কল্পনার ব্যাপকতা বা বিস্তৃতিও সহানুভূতির বিকাশ-সাধন করে।

অনেকে **সহানুভূতি** (Sympathy) ও **সমানুভূতি** (Empathy) র মধ্যে পার্থক্য করেন। সহানুভূতি হল কোন ব্যক্তির অনুভূতিতে অপর ব্যক্তির অনুরূপ অনুভূতি অনুভব

করা (feeling with)। সহানুভূতি হল কোন ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে অনুভূতি বোধ করা (feeling into a person or thing)। সহানুভূতিতে ব্যক্তি-বিশেষ যেন বস্তুর মধ্যে নিজেকে প্রতিফলিত করে দেয়।

সহানুভূতির স্বরূপ

সহানুভূতিতে ব্যক্তি ব্যক্তির সদৃশ হয়, কিন্তু সমানুভূতি তাদের অবিচ্ছেদ্যরূপে একাত্ম বা অঙ্গীভূত করে তোলে। ছোট শিশুরা আকাশে ঘুড়ি উড়তে দেখে যে খুশীতে বিহ্বল হয়ে পড়ে, তার কারণ এই যে, তারা যেন অনুভব করে তারা পৃথিবীর আকর্ষণকে অতিক্রম করে আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে।

১৩। রস (Sentiment):

(১) **রস শব্দটির বিভিন্ন অর্থ:** 'রস' শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রথমতঃ, রস বলতে কোন কোমল অনুভূতি বা আবেগ (Tender emotion) বোঝায়। যেমন, আমরা কথায় কথায় বলে থাকি 'sentiment of love'। দ্বিতীয়তঃ, রস বলতে কোন কোমল অনুভূতি বা আবেগবোধ করার স্থায়ী প্রবণতাকে (disposition to feel a tender emotion) বোঝায়। আমরা বলি নারীরা স্বভাবতঃ ভাবপ্রবণ (sentimental)। তৃতীয়তঃ, রস বলতে যে-কোন আবেগ অনুভব করার মেজাজকে (emotional disposition) বোঝাতে পারে, সে আবেগ মূর্তই হোক বা অমূর্তই হোক; যেমন—ঘৃণা, ক্রোধ, ভয় ইত্যাদি। চতুর্থতঃ, রস বলতে কোন অমূর্ত আবেগকে (abstract emotion) বোঝাতে পারে। পঞ্চমতঃ, রস বলতে কোন অমূর্ত আবেগ অনুভব করার স্বভাবকে (abstract emotional disposition) বোঝাতে পারে। শেষতঃ, রস বলতে অমূর্ত আবেগ এবং এই আবেগ অনুভব করার প্রবণতা বা মেজাজ উভয়কে বোঝাতে পারে।

রস শব্দটির বিভিন্ন অর্থ

মনোবিদ শেণ্ড (Shand) রস-এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন যে, রস হল "কোন বস্তুকে কেন্দ্র করে আবেগমূলক প্রবণতার গঠনমূলক এক সংহতি (an organized system of emotional tendencies centred about some object.)।" মনোবিদ ম্যাকডুগাল 'রস' অর্থে বুঝেছেন কোন বস্তুর প্রতি আবেগ বা কামনা অনুভব করার অর্জিত ইচ্ছামূলক মনোভাব (acquired conative disposition)।'[1] স্টাউট-এর মতে রস হল একটা জটিল আবেগমূলক স্বভাব, যা বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্নভাবে আত্মপ্রকাশ করে।

রস-এর বিভিন্ন সংজ্ঞা

1. "It is a complex emotional disposition which manifests itself variously under varying conditions." —Stout: A Manual of Psychology, Page 627

কোন রকম তর্কবিতর্কের মধ্যে প্রবেশ না করে আমরা এখানে রস শব্দটিকে অমূর্ত নৈর্ব্যক্তিক আদর্শের (abstract impersonal ideals) চিন্তায় মনে যে আবেগের সৃষ্টি হয় তাকে বুঝতে পারি।

অমূর্ত নৈর্ব্যক্তিক আদর্শের চিন্তায় মনে যে আবেগের সৃষ্টি হয় তাকে রস বলে

(২) **রসের বিভিন্ন প্রকার**ঃ সাধারণতঃ আমরা সত্যতা (Truth), মঙ্গল (Goodness) এবং সৌন্দর্য (Beauty)—এই তিন আদর্শের কথা বলে থাকি। সুতরাং প্রতিটি আদর্শকে কেন্দ্র করে আমাদের মনে এক ধরনের রসের সঞ্চার হতে পারে। যথা—

(ক) **সত্যাশ্রয়ী রস** (Intellectual Sentiment): সত্যের অনুসন্ধান, চিন্তা, ধ্যান ও অনুরাগ মনে যে রসের উদ্রেক করে, তাকে সত্যাশ্রয়ী রস বলে। বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, কবি, শিল্পী প্রভৃতি যাঁরা সত্যের পূজারী, তাঁরা এই জাতীয় রস মনের মধ্যে অনুভব করেন। এই রস বিভিন্ন আবেগের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করতে পারে; যেমন,সত্যকে লাভ করার আনন্দ, কোন চিত্তাকর্ষক বস্তু প্রত্যক্ষ করার বিস্ময়, অপ্রত্যাশিত বস্তু পর্যবেক্ষণ করার জন্য আশ্চর্যানুভূতি এবং বিষয়বস্তুর মধ্যে সঙ্গতি, শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য প্রত্যক্ষ করার জন্য মনের অনুভূতি।

সত্যের অনুসন্ধান, চিন্তা, ধ্যান ও অনুরাগ থেকে সৃষ্ট রসই সত্যাশ্রয়ী রস

(খ) **নীতিবোধাশ্রয়ী রস** (Moral Sentiment): নৈতিক আদর্শের চিন্তা এবং নৈতিক আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে আচরণ করার জন্য মনে যে অনুভূতির উদ্রেক হয় তাকে নীতিবোধাশ্রয়ী রস বলা হয়।

(গ) **সৌন্দর্যরস** বা **কান্ত রস** (The Aesthetic Sentiment): সৌন্দর্যের চিন্তা, ধ্যান, প্রত্যক্ষণ এবং সুন্দরকে লাভ করার আকাঙ্ক্ষা থেকে মনে যে অনুভূতির সঞ্চার হয় তাকে সৌন্দর্য রস বলে।

নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি রসকে অন্যান্য সুখানুভূতি থেকে পৃথক করে।

(১) সৌন্দর্য রস হল বিশুদ্ধ অনুভূতি (refined or pure)। একে বিশুদ্ধ বলার কারণ, এই অনুভূতির মধ্যে দুঃখজনক কোন অনুভূতির মিশ্রণ নেই—কোন মলিনতাই একে কলঙ্কিত করেনি।

(২) সৌন্দর্য রস হল স্থায়ী (permanent)। দুই অর্থে একে স্থায়ী বলা যেতে পারে। প্রথমতঃ, সুখানুভূতি ক্ষণস্থায়ী, উপভোগের সঙ্গে সঙ্গেই ইন্দ্রিয়ানুভূতির সমাপ্তি ঘটে; কিন্তু সৌন্দর্য রসের যে বিমল আনন্দানুভূতি তার মধ্যে পরিতৃপ্তির পূর্ণতা আছে এবং এতে অবসাদ নেই। দ্বিতীয়তঃ, যে বস্তুকে কেন্দ্র করে এই সৌন্দর্য রসের উদ্ভব, ভোগের মধ্যেও সেই বস্তু নিঃশেষ হয়ে যায় না। যেমন—মহৎ সাহিত্য যুগে যুগে

সৌন্দর্য রসের সৃষ্টি করে। এই জন্যই বলা হয়—'A thing of beauty is a joy for ever.'

(৩) সৌন্দর্য রস কোন স্বার্থসিদ্ধি করে না (disinterested)। ব্যবহারিক প্রয়োজন, বা জাগতিক অভাব মেটাবার উপায় হিসেবে একে প্রয়োগ করা হয় না। কোন একটি সুন্দর বস্তু প্রত্যক্ষ করার ফলে মনে সৌন্দর্য রসের সৃষ্টি হল, তা হয়ত কোন ব্যক্তিকে সেই সুন্দর বস্তুটির অধিকারী হওয়ার জন্য প্রবৃত্ত করতে পারে, কিন্তু সুন্দর বস্তু লাভের এই যে আকাঙ্ক্ষা তা সৌন্দর্য রস ভোগের কোন অঙ্গ নয়।

(৪) বহু ব্যক্তি একই সৌন্দর্য রসের অংশীদার হতে পারে। কোন সুন্দর বস্তু প্রত্যক্ষ করার ফলে বহু ব্যক্তির মনে একই সৌন্দর্য রসের সৃষ্টি হতে পারে, খাদ্য ও পানীয় মাত্র নির্দিষ্ট কয়েকজন ব্যক্তিকে তৃপ্তিদান করতে পারে।

(৫) সৌন্দর্য রসের মধ্যে একটা প্রশান্তির ভাব আছে। সুন্দর বস্তু প্রত্যক্ষ করার ফলে বা সুন্দরের ধ্যান বা কল্পনা করতে গিয়ে আমরা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে পড়ি, নিজেদের মধ্যে নিজেদের হারিয়ে ফেলি। গভীর মনোযোগের সঙ্গে এর ধ্যান করি।

সত্যাশ্রয়ী রসের (Intellectual Sentiment) **সঙ্গে সৌন্দর্য রসের উল্লেখযোগ্য পার্থক্য আছে**। সত্য অনুসন্ধান করার বা সত্য আবিষ্কারের প্রচেষ্টার মধ্যে অনেক বিপদ, দুঃখ-কষ্ট নিহিত থাকে, সেহেতু সত্যাশ্রয়ী রস অবিমিশ্র ও বিশুদ্ধ একথা বলা চলে না। দ্বিতীয়তঃ, সত্যাশ্রয়ী রস সম্পূর্ণভাবে ব্যবহারিক প্রয়োজন বা স্বার্থসিদ্ধির কলঙ্কমুক্ত, একথাও বলা চলে না। কারণ, আমরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সত্যানুসন্ধানের মাধ্যমে আমাদের ব্যবহারিক প্রয়োজন সিদ্ধ করতে চাই। যদিও সত্যের অনুসন্ধান ও সুন্দরের উপভোগ—উভয় ক্ষেত্রে চিন্তন বা অনুধাবন প্রক্রিয়া বর্তমান, তবু প্রথম ক্ষেত্রে আমাদের সক্রিয় হতে হয়, কারণ সত্যানুসন্ধানের জন্য প্রচেষ্টার প্রয়োজন আছে। কিন্তু শেষের ক্ষেত্রে আমরা নিষ্ক্রিয়, কেননা কোন অপরিপূরিত বাসনার চেতনা এবং তা লাভ করার প্রচেষ্টা তার মধ্যে নেই।

সত্যাশ্রয়ী রসের সঙ্গে সৌন্দর্য রসের পার্থক্য

(১) সুন্দরের মধ্যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উপাদান থাকে, যা আনন্দজনক সংবেদন সৃষ্টি করে যেমন—অস্তগামী সূর্যের লোহিত বর্ণ বা সঙ্গীতের মধুর শব্দ। সুন্দরের এই ইন্দ্রিয়গত দিকটি জীবনে সর্বপ্রথম আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শিশু মনোরম দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে এবং মধুর শব্দ শুনে আনন্দ পায় যদিও বস্তুর বিভিন্ন অংশের পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্ধারণ করার ক্ষমতা তার মধ্যে তখনও জাগেনি।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উপাদান

(২) সুন্দরের মধ্যে আছে সঙ্গতি, বিন্যাস, সংগঠন, সামঞ্জস্য এবং বিভেদের মধ্যেও এক ঐক্য। কোন একটি সুন্দর মূর্তির বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে যদি কোন সঙ্গতি বা সামঞ্জস্য না থাকে, তাহলে তা কথনও মনে সৌন্দর্য রসের সৃষ্টি করতে পারে না। সুরের ঐক্যতান বিভিন্ন শব্দের সামঞ্জস্যপূর্ণ সংহতি বা ঐক্য।

সঙ্গতি, বিন্যাস, সামঞ্জস্য এবং বিভেদের মধ্যে ঐক্য

(৩) তৃতীয়তঃ, সুন্দরের মধ্যে আছে এক অনির্দেশ্য ব্যঞ্জনা (Suggestiveness)। ভাল কবিতা, চাঁদনী রাত, শরতের প্রভাত বা কোকিলের ডাক—এরা আমাদের মনে এক বিমল আনন্দানুভূতির সৃষ্টি করে। কারণ আমাদের মন তখন এক সুদূর লোকে পাড়ি দেয়। সুন্দরের বর্ণনার মধ্যে সুন্দর নিঃশেষিত হয় না, তার মধ্যে আছে ব্যঞ্জনা। তাছাড়া, সুন্দরের মধ্যে আছে এক গভীর অন্তর্নিহিত অর্থ যা দেখা শোনার অতিরিক্ত কিছু।

অনির্দেশ্য ব্যঞ্জনা

বিরাট রস (Sentiment of the sublime) এবং কৌতুকরস (sentiment of the ludicrous) সৌন্দর্য রসের অন্তর্ভুক্ত।

(ক) **বিরাট রস** (Sentiment of the Sublime): যা কিছু বিরাট, অসাধারণ এবং গাম্ভীর্যপূর্ণ তার ধ্যান, ধারণা, প্রত্যক্ষণ বা কল্পনা আমাদের মনে যে আবেগের সৃষ্টি করে তাকে বিরাট রস বলা হয়। যেমন—সীমাহীন দেশকাল, অতলান্তিক সমুদ্র, বিরাট পর্বতমালা বা ব্যক্তির মহৎ কার্যকলাপ ইত্যাদি। বিরাট রস হল এক মিশ্র অনুভূতি। যা কিছু বিরাট, যা মহৎ, তা আমাদের মনে বিস্ময়ের (wonder) উদ্রেক করে। বিরাট বা অসাধারণ কোন কিছু প্রত্যক্ষ করে আমরা তাকে অবধারণ বা উপলব্ধি করতে চাই। কিন্তু বিষয়ের বিরাটত্ব আমাদের উপলব্ধির প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দেয়। আমরা তার সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট ধারণা করতে পারি না—তার ফলে আমাদের মধ্যে জাগে ভীতি (dread) ও ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধার ভাব (awe) এবং আমরা নিজেদের ক্ষমতা, তুচ্ছতা সম্পর্কে সচেতন হই। তা সত্বেও এর মধ্যে রয়েছে একটা উল্লাসের অনুভূতি (elation), যেহেতু এর সঙ্গে আমাদের পরিচিত হবার সৌভাগ্য হয়েছে।

বিরাট রসের প্রয়োজন

বিরাট রস এক মিশ্র অনুভূতি

সুন্দরের অনুভূতির সঙ্গে এর পার্থক্য আছে। বিরাট রসের মধ্যে মিশ্রিত হয়ে আছে এক প্রীতিকর অনুভূতি ও অপ্রীতিকর অনুভূতি, কিন্তু সুন্দরের মধ্যে আছে নিছক প্রীতিকর অনুভূতি। যা সুন্দর তা কেবল আকর্ষণ করে; যা বিরাট তা আকর্ষণও করে আবার দূরান্তে সরিয়েও দেয়।

বিরাট রস ও সৌন্দর্যানুভূতির মধ্যে পার্থক্য

অবশ্য কোন কোন মনোবিদ্ যেমন হফডিং বিরাট রসের মধ্যে কোন দুঃখের অনুভূতির মিশ্রণ আছে বলে মনে করেন না।

(খ) কৌতুক রস (The Sentiment of the Ludicrous): কোন কিছু যা অদ্ভুত, সামঞ্জস্যহীন, সঙ্গতিহীন এবং বিশৃঙ্খল তা দেখে আমাদের মনে যে রসের উদ্রেক হয় তাকে কৌতুক রস বলে। কৌতুক রসের বহিঃপ্রকাশ হল হাস্য।

সঙ্গতির অভাব মনে যে রসের সৃষ্টি করে তাই কৌতুক রস

তবে যা কিছু হাসির উদ্রেক করে তাই অদ্ভুত সামঞ্জস্যহীন এমন ধারণা করলে ভুল হবে। কৌতুক রস হাসির অন্যতম কারণ—একমাত্র কারণ নয়। হাসির আরও নানা কারণ থাকতে পারে। সুড়সুড়ি দিয়ে হাসির উদ্রেক করা যেতে পারে; নাকে 'লাফিং গ্যাস' (laughing gas) দিয়ে হাসির উদ্রেক করা যেতে পারে; হাসির কারণ না জেনেও অপরকে হাসতে দেখে হাসা যেতে পারে। এছাড়াও খেলায় জিতে আমরা জয়ের হাসি হেসে থাকি বা সার্কাসে ক্লাউনের কৌতুকপূর্ণ অঙ্গভঙ্গি দেখে হাসি।

হাসির বিভিন্ন কারণ

কৌতুক রসের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য আছে:

(১) কৌতুক রসের মধ্যে বিশুদ্ধ আনন্দ থাকে, অপরের প্রতি ঘৃণা, হিংসা বা অশ্রদ্ধার ভাব থাকে না।

(২) মানুষকে কেন্দ্র করেই কৌতুক রসের উদ্ভব হয়। ইতর প্রাণীদের নিয়ে কৌতুক হাস্য করা চলে না, তবে সময় সময় ইতর প্রাণীদের নিয়েও কৌতুক হাস্য করি—যেমন বাঁদরের ধূমপান করা দেখে। তার কারণ, ইতর প্রাণীর আচরণের সঙ্গে মানুষের আচরণের সাদৃশ্য লক্ষ্য করি বলেই হাস্য করে থাকি।

(৩) কৌতুক রসের একটি সামাজিক তাৎপর্য আছে। সামাজিক সঙ্গতিবোধ সম্পর্কে ধারণা থাকে বলেই যা সমাজে পরিচিত মাপকাঠির সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ তা আমাদের মনে কৌতুক রসের উদ্রেক করে। অবশ্য সামাজিক মূল্যবোধের দিকটি সম্পর্কে ব্যক্তি সচেতন থাকে না। ব্যক্তির মধ্যে থাকে নিছক কৌতুক উপভোগের বাসনা এবং তার জন্যই কৌতুক রসের উদ্ভব হয়।

(৪) অনেক ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তির মহত্ত্ব সম্পর্কে আমাদের যে ধারণা থাকে তার সঙ্গে তার আসল কাজের কোন সামঞ্জস্য পাই না। ফলে, ব্যক্তির সম্পর্কে আমরা যা প্রত্যাশা করি এবং ব্যক্তি যা কার্যতঃ করে—এই উভয়ের অসঙ্গতি থেকেই কৌতুক রসের সৃষ্টি হয়।

বিরাট রসের সঙ্গে কৌতুক রসের নিম্নলিখিত বিষয়ে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়:

(১) বিরাট রসের ক্ষেত্রে, যার মনে রসের উদ্রেক হয়, তার মনের মধ্যে একটা ক্ষুদ্রতাবোধ জাগে। আর কৌতুক রসের ক্ষেত্রে, মনের মধ্যে একটা মহত্ত্ববোধ জাগে।

(২) বিরাট রসের ক্ষেত্রে যে বস্তু বা ব্যক্তি রস উদ্রেক করে তাকে মহান মনে হয়। আর কৌতুক রসের ক্ষেত্রে যে বস্তু বা ব্যক্তি রসের উদ্রেক করে তাকে ক্ষুদ্র বা তুচ্ছ মনে হয়।

(৩) বিরাট রসের ক্ষেত্রে মনে জাগে ভয়, ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধা এবং নিজের প্রতি তুচ্ছতার অনুভূতি, আর কৌতুক রসের ক্ষেত্রে মনে জাগে আনন্দের অনুভূতি।

(৪) বিরাট রসের ক্ষেত্রে মনে জাগে এক প্রশান্তির ভাব, গাম্ভীর্যের অনুভূতি। কৌতুক রসের ক্ষেত্রে মনে জাগে লঘু চপল ভাব এবং কখনও বা কৌতুক হাসি।

কৌতুক হাস্যের কারণ (Cause of Laughter) :

কৌতুক রস আমাদের মনে উদ্রিক্ত হলে কৌতুক হাসির সৃষ্টি হয়। প্রশ্ন হল, আমরা হাসি কেন?

কৌতুক হাস্য সম্পর্কে অনেক মতবাদ প্রচলিত আছে। মনোবিদ্ সালির মতে এই সব মতবাদকে দুটি মাত্র মতবাদের অধীনে আনা যেতে পারে।

(ক) যে ব্যক্তির মধ্যে মহত্ত্ব বা মর্যাদা আছে বলে আমরা মনে করি, সে ব্যক্তি যখন নিজের মহত্ত্ব বা মর্যাদার পরিচয় দিতে গিয়ে ব্যর্থ হয় তখন তার দুর্বলতা সকলের কাছে প্রকাশিত হয়ে পড়ে এবং আমাদের মধ্যে কৌতুক হাস্যের সৃষ্টি হয়। যেমন, যে ব্যক্তি নিজেকে একজন নামকরা অশ্বারোহী বলে পরিচয় দিয়ে বেড়ান, তিনি যদি ঘোড়ায় উঠতে গিয়েই ভূমিতলে চিৎপটাং হন, তাহলে দর্শকদের পক্ষে কৌতুক হাসি সংবরণ করা কষ্টকর হয়।

(খ) কারও কথাবার্তায়, আচার-ব্যবহারে, পোশাক-পরিচ্ছদে যদি অসঙ্গতি ও অসামঞ্জস্য দেখা যায় তাহলে আমাদের মধ্যে কৌতুক হাস্যের সৃষ্টি হয়। যেমন, কোন লোক যদি ধুতি-পাঞ্জাবী পরার পর গলায় টাই বেঁধে এবং মাথায় টুপি পরে ঘোরাঘুরি করে তাহলে তার পোশাকের অসামঞ্জস্য আমাদের মনে কৌতুক রসের সৃষ্টি করে।

আবার কোন ছোট ছেলে যদি বৃদ্ধ লোকের মতো ভাবভঙ্গি করে বা কথাবার্তা বলে তাহলে আমাদের মনে কৌতুক-হাস্যের সৃষ্টি হয়।

পূর্বোক্ত দুটি মতবাদের মধ্যে কোন্‌টি যথার্থ তার বিতর্কমূলক আলোচনায় প্রবেশ না করে আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, পূর্বোক্ত মতবাদের যে কোন একটি পৃথকভাবে এবং উভয় মতবাদ সংযুক্ত হয়েও কৌতুক হাস্যের কারণ নির্দেশ করতে পারে। অবশ্য এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, যেসব দৃশ্যে কারও মহত্ত্বের পতন ঘটেছে বা দৃশ্যে

কোন সামঞ্জস্যবিহীন কিছু প্রত্যক্ষ করা হচ্ছে তখন যেন অন্য কোন অনুভূতি মনে না জাগে, তাহলে কৌতুক রসের হানি ঘটবে; অর্থাৎ মহত্ত্বের পতন বা অসামঞ্জস্যের মাত্রা খুবই কম হওয়া দরকার এবং তা নির্দোষ (harmless) হওয়া প্রয়োজন। যেমন, কোন গম্ভীর বা পদমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি যদি হঠাৎ কোন আসরে নৃত্য করতে থাকেন তাহলে যথেষ্ট কৌতুক রসের সৃষ্টি হবে, কিন্তু নাচতে নাচতে যদি হঠাৎ তিনি পড়ে গিয়ে গুরুতর আঘাত পান তাহলে তা আর কৌতুক রসের সৃষ্টি করবে না। ছোট ছেলে দাদুর চশমা নাকে লাগিয়ে দাদু সাজতে গেলে হাসির উদ্রেক হবে ঠিকই কিন্তু দামী চশমাটা পরতে গিয়ে যদি ভেঙে যায় তখন মনে ক্রোধের সঞ্চার হবে। মহত্ত্বের পতন বলতে আমরা কৃত্রিম মহত্ত্বের পতনের কথাই বলছি। প্রকৃত মহৎ ব্যক্তির পতন কৌতুক রস উদ্রেক না করে দুঃখের উদ্রেক করে।

মতবাদ দুটি সম্পর্কে মন্তব্য

এই প্রসঙ্গে ফরাসী দার্শনিক **বার্গশোঁ** এবং **ম্যাকডুগাল**-এর মতবাদ উল্লেখযোগ্য। বার্গশোঁ-এর মতে কৌতুক-হাস্য উদ্দেশ্যমূলক এবং এই উদ্দেশ্য হল মানুষের অসঙ্গতিপূর্ণ আচরণের সংশোধন করা। তাঁর মতে, 'হাসি সামাজিক শাসনের উদ্দেশ্যসাধন করে, কারণ আমরা সাধারণতঃ আচরণের মধ্যে একগুয়েমি, কদর্যতা এবং যান্ত্রিকতা দেখে হাসি'।[1] কোন ব্যক্তির আচরণের মধ্যে যদি নারীসুলভ মনোভাব প্রকাশ পায় তাহলে বিদ্রূপ করে আমরা তার আচরণ সংশোধনের চেষ্টা করি।

বার্গশোঁর-মত

কিন্তু এই মতবাদের মধ্যে কিছুটা সত্যতা থাকলেও একে পুরোপুরি গ্রহণ করা যায় না। আমাদের সব হাসির উদ্দেশ্য কোন সামাজিক দুর্নীতির সংশোধন করা, তা বলা চলে না। আমাদের সব হাসির মধ্যেই পরোপকার প্রবৃত্তি আছে, তা'ও নয়। নিছক হাসির জন্যই আমরা হাসি, উদ্দেশ্য ছাড়া শুধু মাত্র কৌতুকের জন্য'ও আমরা হাসি।

স্পেন্সার ও হবস-এর মত

স্পেন্সার-এর মতে হাসি হল অতিরিক্ত স্নায়বিক শক্তির **প্রকাশ**। কিন্তু অতিরিক্ত স্নায়বিক শক্তি (nervous energy) যেমন—লাফালাফি; নাচা, চীৎকার. এগুলির মাধ্যমে প্রকাশিত না হয়ে হাসির মাধ্যমে কেন প্রকাশিত হবে তার কোন ব্যাখ্যা এই মতবাদ থেকে পাওয়া যায় না। হবস্-এর মতে হাসির কারণ হল অপরের ওপর আমাদের আকস্মিক জয়লাভ, আমাদের আত্মগৌরব। কিন্তু এ মতবাদও যুক্তিযুক্ত নয়, কারণ

1. "Laughter serves the ends of social discipline because we naturally laugh at whatever in behaviour is stif "clumsy or machine like." —*Bergson*.

অপরের ওপর হঠাৎ জয়ী হলেই আমরা হাসি না। আর মানুষ অনেক ক্ষেত্রে হাসে যেখানে আত্মগৌরবের প্রশ্ন নেই।

মনোবিদ্ ম্যাগডুগাল পূর্বোক্ত মতবাদগুলিকে হাসির সুখসম্বন্ধীয় মতবাদ (pleasure theories of laughter) বলে অভিহিত করেছেন, কারণ অতিরিক্ত স্নায়বিক শক্তি ও আত্মগৌরব উভয়ই সুখের কারণ। এই মতবাদের সমালোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন যে, আমরা প্রীতিকর কিছু দেখলে হাসি না। যা অসামঞ্জস্যপূর্ণ, অদ্ভুত, নিছক কাল্পনিক, তাই দেখে হাসি। প্রশ্ন হল, কেন হাসি? এর উত্তরে ম্যাকডুগাল

ম্যাকডুগালের মতবাদ

বলেছেন যে, মানুষ হল সামাজিক জীব। মানুষ যাতে তার সামাজিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে না পড়ে তার জন্য প্রকৃতি মানুষের মধ্যে বেশী মাত্রায় সহানুভূতি দিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তারপর প্রকৃতি উপলব্ধি করল যে, অতিরিক্ত মাত্রায় সহানুভূতি দিয়ে মানুষের প্রতি সুবিচার করা হয়নি। কেননা, অপরের ছোটখাটো যে কোন দুর্ভাগ্যে যদি মানসিক সহানুভূতি জানাতে হয়, তাহলে তার জীবন অত্যন্ত দুঃসহ হয়ে উঠবে। সে কারণে মানুষ অপরের বড় রকম দুর্ভাগ্যে সহানুভূতি জানাবে, কিন্তু ছোটখাটো দুর্ভাগ্যে হাসবে, যে সব দুর্ভাগ্যের বেলায় সক্রিয় সাহায্যের কোন প্রয়োজন নেই। কাজেই যে-সব ছোটখাটো দুঃখে সহানুভূতির প্রয়োজন হয় না তারাই কৌতুক হাস্যের উদ্দীপক। হাসি হল সহানুভূতির প্রতিষেধক (Laughter is the antidote to sympathy)।

ম্যাকডুগালের মতে হাসি আমাদের মনের ভাব লাঘব করে, হাসি আমাদের দৈহিক-মানসিক তন্ত্রকে সজীব করে তোলে এবং ক্লান্তি, উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা থেকে মনকে মুক্ত করে। প্রকৃতি আমাদের মধ্যে দুটি পরস্পরবিরুদ্ধ প্রবণতা দিয়েছেন—একটি হল অপরের দুঃখে সহানুভূতি জানান এবং অপরটি হল অপরের ছোটখাটো ক্ষয়-ক্ষতি, দুঃখ, যেক্ষেত্রে সাহায্যের কোন প্রয়োজন নেই, সেগুলিতে হাসার জন্য।[1]

সুতরাং ম্যাকডুগালের মতে হাসির একটা জৈবিক প্রয়োজন আছে। মানুষের মধ্যে হাসির একটা সহজাত প্রবৃত্তি আছে এবং যা হাসির উদ্রেক করে তাহল অপরের সামান্য দুঃখ, যার জন্য সক্রিয় সাহায্যের প্রয়োজন ঘটে না।

ম্যাকডুগালের মতবাদের সমালোচনায় বলা চলে যে, সব সময় আমাদের মনের দুঃখ লাঘব করার জন্য আমরা হাসি, তা ঠিক নয়; নিছক হাসির জন্যও আমরা হাসি এমন বহু দৃষ্টান্ত আমাদের জীবনে আমরা দেখতে পাই।

1. "......weep when your friend's misfortunes are great and laugh when they are small. Weep when he breaks his neck by a fall and laugh when he breaks only a finger."

—McDougall: Outliness of Psychology: Pages 165-170

Questions

1. Describe the nature of Feeling. What are its characteristics ?

2. Explain the Different Laws of pleasure and pain or, discuss the condition of Feeling.

3. Explain Wundt's Tri-dimensional view of feeling.

4. Explain the characteristics of feelings. Examine in this connection the validity of Wundt's Tri-dimensional Theory of Feeling.

5. How would you distinguish between sensation and feeling.

6. Discuss the question of Natural feeling. Can there be Mixed feeling ?

7. What are the Theories of Pleasure and Pain ?

8. What are the different classes of feeling ? Are there natural feelings ?

9. What is an Emotion ? Discuss the nature of an Emotion ?

10. Explain after Stout the general characteristics of Emotion and indicate how he establishes his view of Emotion as a complex experience involving sensory, affective and conative factors.

11. Is there any relation between Emotion and Instinct ? Discuss fully.

12. What do you understand by Basic Emotion ? How many basic emotions are there ? Discuss in this connection, the Theory of McDougall.

13. "We feel sorry because we cry, angry because we strike, afraid because we tremble." Do you agree ?

14. Explain and examine James-Lange-Theory of Emotion. How does Cannon criticize this theory ? What alternative theory does he offer ?

15. Critically expound the experimental evidences against the peripheral theory of emotion as advanced by Sherington, Cannon and Dane.

16. It is correct to say that emotion is the effect of stirred up bodily states. Discuss with reference to the James-Lange Theory of Emotion.

17. Is emotion caused by its expression ? Cite experimental evidence in favour of your answer.

18. Explain and illustrate the 'expressive compounds' of emotion.

19. Analyse the emotion of fear and discuss briefly whether we are afraid because we run.

20. Discuss briefly James Lange Theory of emotion. List the evidences for and against this theory.

21. Explain and examine James-Lange theory of Emotion. Compare it with Cannon-Bard Theory.

22. Distinguish between Emotion, Emotional Mood and Emotional Disposition.

23. Discuss the part played by organic sensations in creation of Emotion.

24. Discuss whether emotion is essentially a group of organic sensations.

25. Define sentiment. How is sentiment related to Emotion. Give a psychological analysis of the comic sentiment.

26 Analyse fear and its organic expression.

28. Analyse anger and its organic expression.

28. Distinguish with illustration between Emotional Mood and Emotoinal Disposition.

29. What is emotion ? Give an account of the conditions of fear.

30. Analyse the following emotions :

(a) Love, (b) Hate, (c) Sympathy.

31. What is sentiment ? What are its kinds ?

32. Distinguish between the Sentiment of the Sublime and the Sentiment of the Ludicrous.

33. Explain Psychology of laughter.

34. Distinguish between Emotion, Passion and Temperament.

35. Write notes on :

(a) Mood and Disposition (b) Mood and Temperament.

দশম অধ্যায়

অবচেতন এবং নির্জ্ঞান

(The-Sub-conscious and the Un-conscious)

ভূমিকা: অবচেতনও নির্জ্ঞান চেতনার এই স্তরগুলি সম্পর্কে আলোচনা করতে হলে চেতনার স্বরূপ, বৈশিষ্ট্য ও ক্ষেত্র সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন। নীচে সেগুলি আলোচনা করা হচ্ছে:

১। চেতনার স্বরূপ (Nature of Consciousness):

চেতনা কি? চেতনা মনের ধর্ম। কোন কোন মনোবিদ্ যেমন—দেকার্ত, লক প্রমুখ চেতনা ও মনকে অভিন্ন মনে করেন। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে মনোবিদ্গণ মনে করেন যে, চেতনা ও মন সমব্যাপক নয়। মন চেতনা থেকে ব্যাপক। চেতনার নীচে মনের আরও দুটি স্তর আছে, অচেতন ও নির্জ্ঞান। চেতনার কোন তর্কবিদ্যাসম্মত সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ কোন বিষয়ের তর্কবিদ্যাসম্মত সংজ্ঞায় সে বিষয়টি কোন্ জাতির অন্তর্ভুক্ত তা উল্লেখ করতে হয়। কিন্তু চেতনা হল মৌলিক অবস্থা, সে কারণে কোন জাতির অন্তর্ভুক্ত নয়। এ ছাড়া তর্কবিদ্যাসম্মত সংজ্ঞায় প্রতিশব্দ বা সমার্থক শব্দ ব্যবহার করা নিষেধ; কিন্তু কোন প্রতিশব্দ ব্যবহার না করে চেতনার কোন সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয়। তবে নানাভাবে চেতনাকে বর্ণনা করে তার স্বরূপ সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা যেতে পারে:

চেতনা হল মৌলিক অবস্থা, সেহেতু চেতনার তর্কবিদ্যাসম্মত সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয়

প্রথমতঃ, প্রতিশব্দ ব্যবহার করে। যেমন, চেতনা হল মনের নিজের অবস্থা সম্পর্কে বোধ বা অবগতি (awarness)।

দ্বিতীয়তঃ, চেতনার বিভিন্ন উপাদানের উল্লেখ করে। যেমন, চেতনা হল চিন্তা, অনুভূতি ও ইচ্ছা প্রভৃতি মানসিক প্রক্রিয়ার সাধারণ লক্ষণ।

তৃতীয়তঃ, চেতনার সঙ্গে তার বিপরীত অবস্থার, অর্থাৎ বস্তুর পার্থক্য দেখিয়ে। যেমন, চেতনা হল মনের ধর্ম, বিস্তৃতি হল জড়ের ধর্ম।

চতুর্থতঃ, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়র সম্পর্ক নির্দেশ করে। যেমন, চেতনা হল জ্ঞাতা, মন এবং জ্ঞেয় বস্তুর মধ্যে এক সম্বন্ধ।

পঞ্চমতঃ, কোন উপমার ব্যবহার করে। যেমন, 'চেতনা হল কোন আভ্যন্তরীণ আলোক যার সাহায্যে মনে যা কিছু ঘটে তা আমাদের কাছে প্রত্যক্ষগোচর হয়ে ওঠে।'[1]

ল্যাড (Ladd)-এর বর্ণনা অনুসরণ করে বলা যায়, "গভীর এবং শব্দহীন ঘুমে নিমগ্ন থাকার যে অবস্থা তার সঙ্গে তুলনা করলে আমাদের যে জাগ্রত অবস্থা দেখি তাই হল চেতনা।"

চেতনাকে এভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে যে, এ হল আন্তর অভিজ্ঞতা যা প্রত্যেক মনেরই হয়ে থাকে। যেমন, সুখ-দুঃখরূপ অনুভূতির অভিজ্ঞতা, যে অভিজ্ঞতার অংশীদার অপর লোকে হতে পারে না। ভিন্ন ভাষায় বলা যেতে পারে, "যাকে আমরা বাহ্যতঃ মন বলি তারই অবগতি হওয়া রূপ যে আভ্যন্তরীণ ক্রিয়া, তাই হল চেতনা।"

২। চেতনার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Consciousness) :

যদিও চেতনার কোন তর্কবিদ্যাসম্মত সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয়, তবু চেতনার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে, যার সাহায্যে আমরা চেতনার স্বরূপকে ভাল করে বুঝে নিতে পারি।

(১) চেতনার মধ্যে একটা নিরবচ্ছিন্নতা বা ধারাবাহিকতা (continuity) আছে। আমাদের চিন্তা, অনুভূতি ও ইচ্ছা প্রভৃতি চেতন প্রক্রিয়াগুলি একটির পর একটি যাওয়া আসা করছে, এই পারম্পর্যের মধ্যে কোন ফাঁক নেই, এর গতি অব্যাহত। চেতনার এই ঐক্যভূত অবিরাম ধারা লক্ষ্য করে মনোবিদ্ উইলিয়ম জেম্স্ চেতনাকে একটি নদী বা স্রোতস্বিনীর সঙ্গে তুলনা করেছেন এবং চেতনার অবিচ্ছিন্ন স্রোত প্রবাহকেই (stream of consciousness) মন বলে অভিহিত করেছেন।

নিরবচ্ছিন্নতা

(২) চেতনার সাধারণ ঐক্য এবং নিরবচ্ছিন্নতার মধ্যে আবার বিশেষ এক ঐক্য এবং নিরবচ্ছিন্নতা লক্ষ্য করা যায় (special continuity within the general unity and continuity of consciousness)। সময়ের দিক থেকে চেতনার বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে যদিও অনেক সময় কোন নিরবচ্ছিন্নতা লক্ষ্য করা যায় না, তবু কোন উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য এবং এই লক্ষ্য সাধনের জন্য যে আগ্রহ, এইসব আপাতভিন্ন চেতনার অবস্থাগুলিকে একটি যোগসূত্রের দ্বারা পরস্পরকে সংযুক্ত করে। যেমন, একটি বই রচনা করার পূর্বে লেখকের বিভিন্ন কার্য—চিন্তার ধারা, অনুভূতি একটি বিশেষ উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য

চেতনার সাধারণ নিরবচ্ছিন্নতার মধ্যে বিশেষ নিরবচ্ছিন্নতা

1. Consciousness may be compared to an internal light, by means of which and which alone, what passes in the mind, is rendered visible. —Hamilton

করেই অগ্রসর হয়। কাজেই লেখকের বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়ার মধ্যে একটা অবিচ্ছিন্ন ধারা বর্তমান।

(৩) পরিবর্তনশীলতা চেতনার অন্যতম ধর্ম। কোন বস্তু সম্পর্কে সচেতন হতে হলে, অন্য বস্তু থেকে তাকে পৃথক করে নিতে হয়। অর্থাৎ, অন্য বস্তুর সঙ্গে পার্থক্য বা বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করেই তবে আমরা কোন একটি বস্তু সম্পর্কে সচেতন হতে পারি; এর জন্য প্রয়োজন চেতনার পরিবর্তনশীলতা। যদি একই বস্তু আমরা ক্রমান্বয়ে প্রত্যক্ষ করতে থাকি, তাহলে ধীরে ধীরে সেই বস্তুর চেতনা লুপ্ত হয়ে যায়। সে কারণেই সংবেদন, ধারণা এবং অনুভূতির অবিরত পরিবর্তন প্রয়োজন। একেই বলা হয় **'চেতনার আপেক্ষিকতা সম্বন্ধীয় নীতি'** (Law of Relatativity of Consciousness)।

পরিবর্তনশীলতা

(৪) 'জ্ঞাতা' ও 'জ্ঞেয়'র পার্থক্যের বোধ চেতনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। চেতনার মধ্যে একদিকে আছে 'জ্ঞাতা' (Self or Subject) এবং অপর দিকে আছে 'জ্ঞেয় বস্তু' (Object)। যখন আমরা কোন বিষয় সম্পর্কে সচেতন হই, তখন আমাদের এই চেতনা থাকে যে, আমিই জ্ঞাতা, আমিই জানছি। অপরদিকে আবার এই চেতনা থাকে যে, আমি কোন কিছুকে জানছি। 'আত্ম-জ্ঞান' এবং 'বস্তু-জ্ঞান' এবং উভয়ের পার্থক্যের যে বোধ, তা চেতনার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়র পার্থক্যের বোধ

(৫) মনোনয়ন বা নির্বাচন করা চেতনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। একটি পরিবেশের সব বস্তুর প্রতিই সচেতন হওয়া চেতনার পক্ষে সম্ভব নয়। চেতনা পরিবেশের বস্তুবিশেষের ওপর নিজেকে নিবিষ্ট করে এবং অপর বস্তুকে বর্জন করে। মনের আগ্রহই নির্ধারণ করে, চেতনা কার ওপর নিবিষ্ট হবে বা কার ওপর হবে না।

মনোনয়ন

(৬) চিন্তা, অনুভূতি ও ইচ্ছা মনের এই সাধারণ প্রক্রিয়াগুলির মাধ্যমেই চেতনা নিজেকে প্রকাশ করে।

৪। চেতনার বিভিন্ন স্তর (Levels of Consciousness) :

মনোবিদরা চেতনার তিনটি স্তরের কথা উল্লেখ করেছেন—(১) **চেতন** বা **সংজ্ঞান** (Conscious), (২) **অবচেতন** বা **অন্তর্জ্ঞান** (Sub-conscious) এবং (৩) **নির্জ্ঞান** (Un-conscious)।

চেতন স্তর বলতে আমরা বুঝি যে বিষয় সম্পর্কে আমরা সুস্পষ্টভাবে সচেতন। অর্থাৎ যে বিষয়টি থাকে আমাদের চেতনার কেন্দ্রস্থলে। সালি, স্টাউট, এঞ্জেল প্রমুখ মনোবিদ্‌গণের মতে চেতনার কেন্দ্রস্থলের পর থেকে শুরু করে চেতনার প্রান্তদেশ পর্যন্ত ক্ষেত্রই অবচেতন বা অন্তর্জ্ঞান (Subconscious)। একেই জেম্‌স চেতনার প্রান্তদেশ বলে অভিহিত করেছেন। যে বিষয়টি আমদের চেতনার কেন্দ্রস্থলে বিরাজ করে না, অথচ যেটি চেতনার ক্ষেত্রবহির্ভূত নয় সেটি অবচেতন স্তরে রয়েছে বলতে হবে। অর্থাৎ, চেতনার কেন্দ্রস্থলকে ঘিরে রয়েছে যে অস্পষ্ট স্বল্প চেতনার প্রান্তদেশ, তাকেই অবচেতন স্তর বা অন্তর্জ্ঞান বা চেতনার প্রান্ত (Fringe of Consciousness) বলা হয়।

চেতনার স্তর

অবচেতন স্তর
চেতনার প্রান্তদেশ

সাম্প্রতিক মনোবিদ্‌রা চেতনার আর একটি গভীরতর স্তরের কথা উল্লেখ করেছেন। চেতনার এই স্তর সম্পর্কে আমরা কি সুস্পষ্টভাবে,কি অস্পষ্টভাবে কোনভাবেই চেতন নই। এটা চেতনার বহির্ভূত স্তর; একেই বলা হয় **নির্জ্ঞান স্তর** (Unconscious)। এই নির্জ্ঞান স্তর চেতনার ক্ষেত্র বহির্ভূত, কিন্তু মনোরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। 'নির্জ্ঞান স্তর' সম্পর্কে একথা বলা যেতে পারে যে, এটি হল এমন একটি চেতনার স্তর যা একদিন চেতনার ক্ষেত্রের অন্তর্গত ছিল, কিন্তু কোন কারণবশতঃ চেতনার ক্ষেত্র থেকে দূরে সরে গেছে, মন থেকে সরে যায়নি। সুযোগমত চেতনার অন্তরাল থেকে এ আবার চেতনার কেন্দ্রস্থলে এসে পেঁছিতে পারে।

নির্জ্ঞান স্তর

স্টাউট প্রমুখ মনেবিদ্‌দের মতে চেতন ও অবচেতন মনের পার্থক্য শুধু চেতনার পরিমাপ বা মাত্রাগত পার্থক্য। চেতন স্তরে চেতনা স্পষ্টভাবে থাকে এবং অবচেতন স্তরে অস্পষ্টভাবে থাকে। মনোবিদ্‌ হফডিং মনে করেন যে, অবচেতন স্তর কোন অস্পষ্ট চেতন স্তর নয়, নির্জ্ঞান স্তর। ফ্রয়েড অবচেতন স্তর স্বীকার করেন না। তিনি নির্জ্ঞান এবং সংজ্ঞান বা চেতন স্তরের মধ্যবর্তী একটি চেতনাবিহীন স্তর স্বীকার করেন, যার নাম তিনি দিয়েছেন **আসংজ্ঞান** (Pre-conscious)। আসংজ্ঞান চেতনার ক্ষেত্রের কোন অস্পষ্ট স্তর নয়, চেতনার ক্ষেত্র-বহির্ভূত একটি চেতনাবিহীন স্তর। যেসব মানসিক বৃত্তি মনের চেতন বা সংজ্ঞান স্তরে উপস্থিত নেই অথচ একটু চেষ্টা করলেই চেতন স্তরে উপস্থিত হয়, চেতনার আসংজ্ঞান স্তরই সেগুলির আবাসস্থল।

৩। মন ও চেতনার ক্ষেত্র কি সমব্যাপক? (Are Mind and Consciousness co-extensive?):

অনেকেই 'মন' এবং 'চেতনাকে' সমার্থক শব্দ বলে মনে করেন এবং মনের ক্ষেত্রকেই চেতনার ক্ষেত্র বলে মনে করেন; কিন্তু এ ধারণা ভুল। 'মন' ও 'চেতনা' সমার্থক শব্দ নয়, চেতনা মনের স্বরূপ ধর্ম। মন ও চেতনার ক্ষেত্রও সমব্যাপক নয়। চেতনার ক্ষেত্রের তুলনায় মনের ক্ষেত্রের ব্যাপকতা অনেক বেশী। মনের চেতন স্তর ছাড়াও রয়েছে নির্জ্ঞান স্তর (Un-conscious)। চেতন স্তর ও নির্জ্ঞান স্তর উভয়কে একত্রে যুক্ত করে দিলেই মনের ক্ষেত্রটিকে পাওয়া যাবে এবং মনের বিস্তৃতি বা ব্যাপকতা কতদূর তা বোঝা যাবে। নির্জ্ঞান স্তরটি চেতনার স্তরের বহির্ভূত হলেও মনোরাজ্যের বহির্ভূত নয়। দু-একটি উপমার সাহায্যে বিষয়টিকে বুঝে নেওয়া যাক: মনকে আমরা একটা বৃহৎ বৃত্তাকার হলঘরের সঙ্গে তুলনা করতে পারি। এই হলঘরটি বিচিত্র বস্তুতে পূর্ণ; এর মাঝে রয়েছে একটা ছোট বৈদ্যুতিক বাতি যেটির নীচের কিছুটা অংশ ছাড়া আর সবটা একটি আচ্ছাদনী দিয়ে ঢাকা। বৈদ্যুতিক বাতিটির ঠিক নীচের কিছুটা অংশ বেশ স্পষ্টালোকিত, যার জন্য সেখানকার সব জিনিসগুলি স্পষ্টভাবে দেখা যায়। তবে তার দূরের যে অংশ সেটি হল স্বল্পালোকিত, সেখানকার বস্তুগুলির আকার অস্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করা যায়। হলের এই স্পষ্টালোকিত ও অর্ধালোকিত, বা স্বল্পালোকিত ক্ষেত্রগুলিই মনের চেতন স্তর। এর দূরের যে অংশে কোন আলো পৌঁছায়নি, সেটি সম্পূর্ণ অন্ধকারে নিমজ্জিত এবং এই অন্ধকারের ক্ষেত্রটিই হল মনের নির্জ্ঞান স্তর। হল-ঘরের অন্ধকার অংশে যে বস্তুগুলি রয়েছে সেগুলি প্রত্যক্ষের সাহায্যে জানা সম্ভব নয়, তাদের অনুমানের সাহায্যে বা অন্য উপায়ে জানতে হয়। আমাদের মনের এই নির্জ্ঞান স্তরের অস্তিত্ব সম্পর্কেও আমাদের অন্যভাবে সচেতন হতে হয়। মানুষের আচরণ দেখে বা পরোক্ষ উপায়ে, অর্থাৎ মনঃসমীক্ষণ (Psycho-analysis) বা স্বপ্নের বিশ্লেষণের সাহায্যেই মনের এই নির্জ্ঞান স্তরের অস্তিত্ব জানতে পারা যায়। আরও একটি উপমার সাহায্যে মনের এই ব্যাপকতা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যেতে পারে। সমুদ্রে ভাসমান তুষার শিলার একটা ক্ষুদ্র অংশ জলের ওপরে থাকার জন্যই আমাদের প্রত্যক্ষগোচর হয় এবং এর বৃহত্তর অংশ জলের মধ্যে নিমজ্জিত থাকার জন্য আমাদের দৃষ্টির আড়ালে থাকে। সেরূপ মনের যেটি চেতন স্তর, সেটি ছাড়াও একটি বৃহত্তর অংশ আছে, সেটি হল নির্জ্ঞান স্তর। এই চেতন স্তর ও নির্জ্ঞান স্তর মিলেই মনের ক্ষেত্র। সুতরাং মন ও চেতনার ক্ষেত্র সমব্যাপক নয়।

মন ও চেতনা সমার্থক শব্দ নয়

চেতনার স্তর + নির্জ্ঞান স্তর = মন

উদাহরণ

৬। অবচেতন মনের প্রমাণ (Proofs of the existence of the Sub-conscious) :

নিম্নলিখিত ঘটনাগুলি অবচেতন মনের অস্তিত্ব প্রমাণ করে।

(ক) স্মৃতি : অনেক অতীত অভিজ্ঞতা আমাদের মনে সংরক্ষিত হয়ে থাকে যেগুলিকে পরে আমরা প্রয়োজনমত পুনরুজ্জীবিত করি। অতীত অভিজ্ঞতার ফল প্রতিরূপের (image) আকারে অবচেতন মনে সংরক্ষিত থাকে।

(খ) প্রত্যভিজ্ঞা (Recognition) : অতীতে দেখেছি কোন কোন ব্যক্তিকে দেখা মাত্র আমি চিনতে পারি। ব্যক্তিটির প্রতিরূপ অবচেতন মনে সংরক্ষিত থাকে বলেই তাকে চেনা সম্ভব।

(গ) অভ্যাস এবং সহজাত প্রবৃত্তি : অভ্যাস এবং সহজাত প্রবৃত্তির প্রকাশের মাধ্যমে অবচেতন মনের ক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। অভ্যাসসিদ্ধ কাজের বেলায় লক্ষ্য করা যায় যে, কাজটির সঙ্গে আর একটি কাজও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হচ্ছে। মোটর গাড়ীর চালক অপরের সঙ্গে কথোপকথনে রত থেকে গাড়ী চালনা করতে পারেন। এক্ষেত্রে মনের অবচেতন স্তর গাড়ী চালনার কাজটি সম্পন্ন করে এবং কথোপকথনের কাজটি সম্পন্ন করে মনের চেতন স্তর।

(ঘ) সংবেদন, প্রত্যক্ষ, চিন্তন প্রভৃতি মানসিক প্রক্রিয়াগুলিও অবচেতন মনের অস্তিত্ব প্রমাণ করে,যেমন—সংবেদনের প্রতিরূপ অবচেতন মনে সংরক্ষিত থেকে যদি পুনরায় পুনরুজ্জীবিত (revived) না হয় তাহলে প্রত্যক্ষ সম্ভব হয় না। সাদৃশীকরণ (assimilation), পৃথকীকরণ (discrimination), প্রত্যভিজ্ঞা (recognition) প্রভৃতি যেসব ক্রিয়ার ওপরে প্রত্যক্ষ নির্ভর, সেগুলি অবচেতন মনের দ্বারাই সম্পন্ন হয়।

(ঙ) অব্যক্ত যুক্তি : খুব সাধারণ একটি প্রত্যক্ষের বিষয়কে বিশ্লেষণ করলে অনেক সময় অবচেতন মনের ক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। একটি লাঠি দেখান মাত্রই শিশু চট্ করে সিদ্ধান্ত করে নেয় এবং ভয়ে দৌড়তে থাকে। এক্ষেত্রে শিশুটির অবচেতন মনই অব্যক্ত যুক্তির বিভিন্ন স্তরগুলি দ্রুত অতিক্রম করে।

৭। চেতনার ক্ষেত্র (Field of Consciousness) :

চেতনার কেন্দ্র থেকে আরম্ভ করে চেতনার পরিধি পর্যন্ত ক্ষেত্রকে চেতনার ক্ষেত্র বলা হয়। পরিবেশের যেটুকু অংশ জুড়ে আমাদের চেতনা পরিব্যাপ্ত থাকে, তাকেই চেতনার ক্ষেত্র বলা হয়। চেতনার ক্ষেত্রের সমস্ত অংশটুকু চেতনার আলোকে সমভাবে আলোকিত নয় ; অর্থাৎ চেতনার ক্ষেত্রের সব জায়গায় চেতনা সমান পরিমাণে থাকে না,

কোথাও বেশী, কোথাও কম। কোন একটা বিশেষ অংশে আমাদের চেতনা কেন্দ্রীভূত থাকে, তাকে চেতনার কেন্দ্রস্থল (Focus of consciousness) বলা হয়। এই অংশ সম্পর্কে আমাদের চেতনা সুস্পষ্ট। এই অংশের বাইরে বা এই অংশকে ঘিরে আর একটি বৃহত্তর অংশ আছে যেখানে চেতনার পরিমাণ কম। এই অংশ সম্পর্কে আমাদের চেতনা অস্পষ্ট। এই অংশ, চেতনার আলোকে সুস্পষ্টভাবে আলোকিত নয়। এই অংশ হল চেতনার প্রান্তদেশ (Margin of consciousness)। আমাদের মনোযোগ সব বস্তুর ওপর সমানভাবে নিবদ্ধ থাকে না। কোন একটি বিশেষ বস্তুর ওপর আমরা বিশেষভাবে মনঃসংযোগ করি। যে বস্তুর ওপর বিশেষভাবে মনঃসংযোগ করি সেই বস্তুটি সম্পর্কে আমাদের সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকে। আর আশপাশে যে বস্তুগুলি থাকে, সেগুলি চেতনার প্রান্তদেশে বিরাজ করে, অর্থাৎ সেগুলি সম্পর্কে আমাদের চেতনা খুব সুস্পষ্ট নয়। যে বিষয়টি আমাদের সর্বাধিক মনোযোগ দাবি করে, সেটিই চেতনার কেন্দ্রস্থল (Focus of consciousness) আর কেন্দ্রীভূত চেতনার আশপাশে যেগুলি আবছা এবং অস্পষ্টভাবে থাকে সেগুলি হল চেতনার প্রান্তদেশ। স্পষ্টতম চেতনার কেন্দ্রস্থল এবং অস্পষ্টতম চেতনার প্রান্তদেশ, উভয়কে যুক্ত করেই চেতনার ক্ষেত্রটিকে পাওয়া যায়।

চেতনার কেন্দ্রস্থল

চেতনার প্রান্তদেশ

চেতনার কেন্দ্রস্থল + চেতনার প্রান্তদেশ = চেতনার ক্ষেত্র

চেতনা-ক্ষেত্রের কোন বস্তু চেতনার কেন্দ্রস্থলের যত কাছাকাছি থাকে তার চেতনা সেই পরিমাণে স্পষ্ট এবং চেতনার কেন্দ্র থেকে যত দূরে থাকে তার চেতনাও সেই পরিমাণে অস্পষ্ট হয়। অপর পক্ষে চেতনা-ক্ষেত্রের কোন বস্তু যত চেতনার প্রান্তদেশের কাছে থাকে ততই অস্পষ্ট হয় এবং যত প্রান্তদেশ থেকে দূরে সরে যায় তত তার চেতনা স্পষ্ট হয়।

একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি বুঝে নেওয়া যাক: আমি ঘরে বসে একটি বই পড়ছি। আমার মাথার ওপর পাখা ঘুরছে, ঘরের মধ্যে একটি বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলছে, একটা ঘড়ি টিকটিক শব্দ করছে, কাছে বসে একটি শিশু আপন মনে কথা বলছে ও খেলনা নিয়ে খেলা করছে, ঘরের মধ্যে রেডিওটা ক্ষীণ শব্দে বাজছে। এখানে বইটির বিষয়বস্তুর ওপর আমার মনোযোগ নিবদ্ধ, কাজেই বইটির বিষয়বস্তু আছে আমার চেতনার কেন্দ্রস্থলে (Focus of Consciousness) এবং রেডিওর ক্ষীণ শব্দ, ঘড়ির টিক টিক শব্দ, শিশুর অস্ফুট কলকাকলি—সবই রয়েছে চেতনার প্রান্তদেশে (Margin of Consciousness), এগুলির ওপর আমার

উদাহরণ

মনোযোগ নিবিষ্ট নয়। তবু এগুলি চেতনার ক্ষেত্রেই রয়েছে, তবে স্পষ্ট আলোকিত কেন্দ্রস্থলে নয়, চেতনার প্রান্তদেশে; যার সম্পর্কে আমি অস্পষ্টভাবে সজাগ।

এ হল কম-বেশী চেতনা, যে সম্পর্কে ব্যক্তি সচেতন হতে পারে। যে বৈদ্যুতিক পাখার তলায় বসে ব্যক্তি পুস্তক পাঠ করছে সে বৈদ্যুতিক পাখা সম্পর্কে ব্যক্তির স্পষ্ট চেতনা নেই। কিন্তু যদি অপর কোন ব্যক্তি ঐ ব্যক্তির অজ্ঞাতে পাখার গতি বাড়িয়ে দেয় তাহলে তিনি ঐ গতিবৃদ্ধি বুঝতে পারবেন। এর দ্বারা বোঝা যায় পাখার সম্বন্ধে তাঁর স্পষ্ট চেতনা ছিল, নতুবা পাখার গতিবৃদ্ধি সম্পর্কে তিনি সচেতন হতেন না।

৮। চেতনার প্রান্তদেশের বৈশিষ্ট্য (The characteristics of Marginal Consciousnsse):

মনোবিদ্ স্টাউট চেতনার প্রান্তদেশের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন:

চেতনার প্রান্তদেশে অবস্থিত বস্তু সম্পর্কে আমাদের চেতনা অস্পষ্ট

(ক) চেতনার প্রান্তদেশে যে বস্তুগুলি অবস্থান করে, তাদের সম্পর্কে আমাদের চেতনা স্পষ্ট। চেতনার প্রান্তদেশস্থিত বস্তুগুলি চেতনার কেন্দ্রস্থলে বিরাজ করে না। সুস্পষ্ট চেতনা ও মনোযোগের ক্ষেত্র থেকে তারা দূরে সরে থাকে।

চেতনার প্রান্তদেশ থেকে বস্তু সরে গেলেই তার সম্পর্কে আমরা সচেতন হই

(ক) যখন কোন বিষয় আমাদের চেতনার কেন্দ্রস্থলে অবস্থান করে, তখন যে বিষয়গুলি চেতনার প্রান্তদেশে অবস্থান করে, তার সম্পর্কে আমরা স্পষ্ট সচেতন থাকি না, কিন্তু যখনই চেতনার প্রান্তদেশ থেকে সেগুলি সরে যায়, তখনই আমরা তার সম্পর্কে সচেতন হই। যেমন, যখন আমার মনোযোগ বইয়ের বিষয়বস্তুর ওপর নিবদ্ধ, তখন ঘাড়র টিকটিক শব্দ সম্পর্কে আমি স্পষ্টভাবে সচেতন নই, কিন্তু যে মুহূর্তে ঘড়ির শব্দ বন্ধ হয়ে যায় তখনই আমি সে সম্পর্কে সচেতন হই।

চেতনার প্রান্তদেশে অবস্থিত বিষয়গুলি আমাদের বিচার এবং বিশ্বাসের ক্ষেত্র বহির্ভূত

(গ) যে বিষয়গুলি চেতনার প্রান্তদেশে অবস্থান করে সেগুলি আমাদের বিচার এবং বিশ্বাসের ক্ষেত্র-বহির্ভূত হয়েই অবস্থান করে। অর্থাৎ, সেগুলি সম্পর্কে আমরা কোন কিছু স্বীকার বা অস্বীকার করি না। এমন কি মনে মনে তাদের অস্তিত্বও আমরা স্বীকার করে নিই না। যেমন, যখন আকাশের চাঁদের দিকে তাকিয়ে আছি এবং আশেপাশের তারাগুলি সম্পর্কে আমি অস্পষ্টভাবে সচেতন, তখন সেই তারার সংখ্যা কত বা তাদের আলোক ধীর, না চঞ্চল তা আমরা ভাবি না।

(ঘ) তৃতীয়তঃ, চেতনার প্রান্তদেশে অবস্থিত বিষয়গুলি স্থির নয়, নিত্য পরিবর্তনশীল। যদিও সেগুলি চেতনার কেন্দ্রস্থল থেকে দূরে থাকে তবু তারা চেতনার কেন্দ্রস্থলে প্রবেশ করার জন্য সচেষ্ট হয়। যে বিষয়টি আমাদের চেতনার কেন্দ্রস্থলে, তার থেকে মনোযোগ একটু সরে গেলেই, অমনি চেতনার প্রান্তবর্তী বিষয়গুলি চেতনার কেন্দ্রস্থলে এসে উপস্থিত হয়। আমার মনোযোগ যখন বই থেকে সরে যায় তখন ঘরের মধ্যে যে ঘড়িটি রয়েছে তার টিকটিক শব্দ কেন্দ্রস্থলে উপস্থিত হতে পারে।

চেতনার প্রান্তদেশে অবস্থিত বিষয়গুলি চেতনার কেন্দ্রস্থলে প্রবেশ করতে চায়

৯। চেতনার প্রান্তদেশের অস্তিত্ব সম্পর্কে আমরা কিভাবে অবহিত হই? (How is it possible for us to know the existence of Marginal Consciousness?):

মনোবিদ্ স্টাউট (Stout)-এর মতে আমরা দু'ভাবে চেতনার প্রান্তদেশের এই অস্তিত্ব সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতে পারি। প্রথমতঃ, চেতনার প্রান্তদেশ চেতনার কেন্দ্রস্থলকে প্রভাবিত করে। চেতনার কেন্দ্রস্থলে যে বিষয়টি আছে, চেতনার প্রান্তদেশ তার ছায়াচ্ছন্ন পটভূমিকা। যেমন, কোন ব্যক্তি যদি একটি অন্ধকার ঘরে বসে একটি বই পড়তে থাকে, তাহলে বইটি থাকে তার চেতনার কেন্দ্রস্থলে, আর ঘরের অন্ধকারাচ্ছন্ন পটভূমিকা থাকে তার চেতনার প্রান্তদেশে। ঘরের অন্ধকারময় পরিবেশ ব্যক্তির চেতনার ওপর প্রভাব বিস্তার করে, যার জন্য বইটির বিষয়বস্তুর ওপর মনোযোগ নিবিষ্ট রাখা ব্যক্তিটির পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। দ্বিতীয়তঃ, চেতনার প্রান্তদেশের অস্তিত্ব সম্পর্কে আমরা তখনই অবহিত হই, যখন চেতনার প্রান্তদেশে অবস্থিত বিষয়টি চেতনার প্রান্তদেশ থেকে সরে যায়। যদিও চেতনার কেন্দ্রস্থলে রয়েছে বইয়ের বিষয়বস্তু তবুও ঘড়ির টিকটিক শব্দ থেমে যাওয়া মাত্র আমরা বুঝি যে এতক্ষণ ঘড়িটি চলছিল।

চেতনার প্রান্তদেশ চেতনার কেন্দ্রস্থলকে প্রভাবিত করে

চেতনার প্রান্তদেশে অবস্থিত বিষয়টি চেতনার প্রান্তদেশ থেকে সরে গেলেই চেতনার প্রান্তদেশের অস্তিত্ব সম্পর্কে আমরা অবহিত হই

১০। নির্জ্ঞান স্তর (The Unconscious):

মন এবং চেতনার ক্ষেত্র সমব্যাপক নয়। চেতনার পরিধি অপেক্ষা মনের পরিধি অনেক বেশী ব্যাপক। মনের সামান্য অংশই চেতন স্তর। এই চেতনার স্তরকে অতিক্রম করেও এক গভীরতর স্তর আছে যেটি মনের নির্জ্ঞান স্তর। এই নির্জ্ঞান স্তর চেতনার স্তর-বহির্ভূত, কিন্তু মনোরাজ্যের বহির্ভূত নয়। প্রশ্ন হল—এই নির্জ্ঞান স্তরের

যে অস্তিত্ব আছে তার প্রমাণ কি? কি যুক্তির ওপর ভিত্তি করে এই নির্জ্ঞান স্তরে বিশ্বাস স্থাপন করা যায়? এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে, নির্জ্ঞান স্তরে বিশ্বাস স্থাপন না করলে আমাদের অনেক মানসিক ঘটনার কোন যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হয় না। যাঁরা মনকে চেতনার ক্ষেত্রের সঙ্গে সমব্যাপক মনে করেন তাঁরাই মনের নির্জ্ঞান স্তরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী নন। কিন্তু মনোবিদ্‌রা নির্জ্ঞান স্তরের অস্তিত্বের স্বপক্ষে কতকগুলি যুক্তি উপস্থাপিত করেছেন। ফ্রয়েড-এর মতে শৈশবকালে ব্যক্তির অনেক অন্যায় কামনা স্বাভাবিক ও সমাজানুমোদিত পথে আত্মপ্রকাশের সুযোগ পায় না। শাস্তি,নিন্দা প্রভৃতির ভয়ে এই সব অন্যায় কামনা অবদমিত হয়ে নির্জ্ঞান মনে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং আত্মপ্রকাশের সুযোগ খোঁজে, কিন্তু স্বাভাবিক পথে প্রকাশিত হতে না পেরে বিকৃতরূপ নিয়ে বা ছদ্মবেশে সেগুলি প্রকাশিত হয়। দৈনন্দিন জীবনে ভুলভ্রান্তি, স্বপ্ন, মানসিক রোগ প্রভৃতির মাধ্যমে এগুলির আত্মপ্রকাশ ঘটে। মনঃসমীক্ষণের (psycho-analysis) ফলে এগুলি জানা যায়। কাজেই ফ্রয়েড-এর মতে নির্জ্ঞান মন অবদমিত ইচ্ছার আশ্রয়স্থল। অনেক মনোবিদ্ মনে করেন যে, অবদমিত ইচ্ছার ব্যাখ্যা ছাড়াও স্বভাবী মনের মানসিক প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যার জন্যও নির্জ্ঞান স্তরের সহায়তার প্রয়োজন হয়। আমরা এবার নির্জ্ঞান স্তরের অস্তিত্বের স্বপক্ষে যে প্রমাণগুলি উপস্থাপিত করা হয় সেগুলি আলোচনা করব:

মনের নির্জ্ঞান স্তর স্বীকার করে না নিলে অনেক মানসিক ঘটনার কোন যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না

(ক) নির্জ্ঞান স্তরের অস্তিত্বের পক্ষে যুক্তি (Proofs for the existence of the Unconscious):

(১) **দৈনন্দিন জীবনের ভুলভ্রান্তি:** ফ্রয়েড-এর মতে দৈনন্দিন জীবনের অনেক ভুলভ্রান্তি, যেমন—নাম ভুলে যাওয়া, কথা বলার ভুল, লেখার ভুল প্রভৃতি নির্জ্ঞান মনের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। কোন ব্যক্তি কতকগুলি নিমন্ত্রিত ব্যক্তির তালিকা তৈরি করতে গিয়ে দেখলেন যে, একটি পরিচিত ব্যক্তির নাম তিনি ভুলে গেছেন। কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে জানা গেল যে, লোকটিকে আদৌ তার পছন্দ নয়। আসল কারণ তাঁর নির্জ্ঞান মনে লুকিয়ে আছে।

দৈনন্দিন জীবনের ভুল-ভ্রান্তি

(২) **স্বপ্ন:** নির্জ্ঞান মনের অবদমিত কামনা-বাসনা যখন চেতন বা সংজ্ঞান (Conscious) মনে বিকৃতভাবে প্রবেশ করে তখনই ব্যক্তি স্বপ্ন দেখে। কাজেই স্বপ্ন নির্জ্ঞান মনের অস্তিত্ব প্রমাণ করে।

(৩) **দিবা-স্বপ্ন (Day-Dream):** অনেক সময় ব্যক্তি জাগ্রত অবস্থায়ও স্বপ্ন

দেখে। অলীক কল্পনায় বিভোর হয়ে সে হাস্যকর আচরণ করে। নিজেকে বিরাট ধনী ব্যক্তি ভেবে কল্পিত কোন অধীনস্থ ব্যক্তিকে আঘাত করার চেষ্টা করে। এই রকম আচরণের ক্ষেত্রেও বর্তমান থাকে কোন অবদমিত ইচ্ছা যা নির্জ্ঞান মনে আশ্রয় নিয়ে তার সংজ্ঞান মনের আচরণকে প্রভাবিত করে।

(৪) **সংবেদন ও সংবেশনোত্তর অভিভাবন** (Hypnotism and post-hypnotic suggestion) : সংবেশন বা কৃত্রিম উপায়ে উৎপাদিত স্বপ্নাবস্থাও মনের নির্জ্ঞান স্তরের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। আমাদের অতীত জীবনের অনেক ঘটনা আমরা অনেক চেষ্টা করেও স্মরণ করতে পারি না, আবার সংবিষ্ট অবস্থায় আমরা সে-সব স্মরণ করতে পারি। আবার সংবিষ্টকাল অতীত হয়ে গেলে, জাগ্রত অবস্থায় সে-সব ঘটনা আমরা বিস্মৃত হই। সুতরাং, এই সব ঘটনার স্মৃতি মনের নির্জ্ঞান স্তরে প্রচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে, এইরূপ অনুমানই যুক্তিসঙ্গত মনে হয়।

সংবেশন ও সংবেশনোত্তর অভিভাবন

আবার সংবিষ্ট অবস্থায় কোন ব্যক্তিকে সংবেশনোত্তর কালে একটি নির্দিষ্ট সময়ে কার্য করার জন্য আদেশ করে দেখা গেছে যে, ব্যক্তি সংবেশনোত্তর কালে কার্যটি সম্পন্ন করেছে। কিন্তু সংবেশকের আদেশের কথা তার মোটেই মনে নেই। এই ঘটনা থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, নির্জ্ঞান স্তর ব্যক্তির অগোচরে ব্যক্তিকে দিয়ে কাজটি করিয়ে নিয়েছে।

(৫) **অনেক উদ্দেশ্যের বিকৃত প্রকাশ, যেমন—উদ্গতি, অভিক্রান্তি, বিপরীত গঠন প্রভৃতি** নির্জ্ঞান মনের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। কোন নারী সেবিকাব্রত গ্রহণ করেছে,কিন্তু আসল কারণ মাতৃত্বের কামনা নির্জ্ঞান মনে আত্মগোপন করে আছে। একে বলা হয় উদ্গতি (Sublimation)। আবার কোন নারী হয়ত পশুপাখী পুষে খুব আনন্দ পান, আসল কারণ অবদমিত মাতৃত্বের কামনা। একে বলা হয় অভিক্রান্তি (Displacement)। কোন সৎ ব্যক্তির অন্যায় শাস্তি লাভ করে হঠাৎ এক বিরাট দুর্বৃত্তে পরিণত হওয়া বিপরীত গঠনের (Reaction formation) উদাহরণ। এরূপ ক্ষেত্রে নির্জ্ঞান ইচ্ছা তার বিপরীত রূপের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে। এছাড়াও প্রতিফলন বা অভিক্ষেপ (Projection), যুক্ত্যাভাস (Rationalisation), ক্ষতিপূরণ (Compensation), অবাধ কল্পনা (Fantascy), প্রত্যাবৃত্তি (Regression) প্রভৃতি ঘটনাও নির্জ্ঞান মনের অস্তিত্ব প্রমাণ করে।

উদ্গতি, অভিক্রান্তি, বিপরীত গঠন

(৬) **মানসিক রোগগ্রস্থ ব্যক্তিদের কার্যকলাপ** নির্জ্জান মনের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। যেমন, ভয়বায়ুগ্রস্ত (Fear mania) রোগী অকারণে ভীতিগ্রস্ত হয়। শৈশবের কোন অবদমিত অন্যায় কামনা নির্জ্জান মনে লুকিয়ে থেকে সংজ্ঞান মনের আচরণকে প্রভাবিত করে। শুচিবায়ু (Touch mania), হিষ্টিরিয়া, বিষাদবায়ু (Melancholia), চিত্তভ্রংশী বাতুলতা (Dementia prœcox) প্রভৃতি মানসিক ব্যাধিগুলির মূলেও কোন অবদমিত নির্জ্জান কামনা থাকে, যেগুলি নির্জ্জান মনে আত্মগোপন করে থাকে।

মানসিক রোগ

(৭) **আকস্মিক স্মৃতি :** অনেক সময় কোন একটি বিষয় আপ্রাণ চেষ্টা করেও আমরা মনে আনতে পারি না। কিন্তু অন্য আর একটি বিষয় চিন্তা করার সময় সেই বিষয়টি হঠাৎ মনে জেগে ওঠে। নির্জ্জান মনের স্তর থেকেই যে বিষয়টি চেতনার কেন্দ্রস্থলে এসে পৌঁছয়, এরূপ অনুমানই এ জাতীয় ঘটনাকে ব্যাখ্যা করতে সহায়তা করে।

আকস্মিক স্মৃতি

(৮) **নিদ্রাকালে মনের ক্রিয়া :** ঘুমুতে যাবার আগে যে সমস্যার সমাধান খুঁজে পাওয়া যায়নি, দেখা গেছে ঘুম ভাঙবার পর বিনা প্রচেষ্টায় তার সমাধান খুঁজে পাওয়া গেছে। মনের চেতনস্তর যখন এই সমস্যার সমাধান যোগায়নি তখন নির্জ্জান স্তরই যে সমস্যার সমাধানটি যুগিয়ে দিয়েছে এরূপ অনুমান করাই যুক্তিযুক্ত মনে হয়।

নিদ্রাকালে মনের ক্রিয়া

(৯) **অগোচর আবেগ :** অনেক সময় কোন লোকের প্রতি আমরা অকারণেই আকর্ষণ বোধ করি বা অকারণেই ঘৃণা বোধ করি। কিন্তু এই আকর্ষণ বা ঘৃণা বিনা কারণেই মনে উৎপন্ন হয়েছে এরকম অনুমান যুক্তিসঙ্গত নয়। বস্তুতঃ মনের নির্জ্জান স্তরেই আবেগগুলি মনের অগোচরে জন্মলাভ করেছে, দিন দিন বৃদ্ধি লাভ করেছে এবং সুযোগমত মনের চেতনস্তরে এসে উপস্থিত হয়েছে, এরূপ অনুমানই যুক্তিসঙ্গত।

অগোচর আবেগ

(১০) **কবি ও শিল্পীদের সৃষ্টি-প্রেরণা :** যে স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণা ও উৎসাহ কবি ও শিল্পীদের সৃষ্টি-কার্যে উদ্বুদ্ধ করে, নির্জ্জান স্তরকেই সেই স্বতঃস্ফূর্ত উৎসাহ ও প্রেরণার উৎস বলে ধারণা করা হয়। কবি কোলরিজ বলেছিলেন যে, তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'Kubla Khan'-এর বেশীর ভাগ অংশই তাঁর ঘুমন্ত অবস্থায় রচিত, জাগ্রত অবস্থায় তিনি কেবল সেগুলি লিপিবদ্ধ করেছেন।

কবি ও শিল্পীর সৃষ্টি-প্রেরণা

১১। অবচেতন বা অন্তর্জ্ঞান (Subconscious) এবং নির্জ্ঞান (Unconscious) মনের পার্থক্য :

(১) অবচেতন স্তর, চেতনার ক্ষেত্র-অন্তর্ভুক্ত ; কিন্তু নির্জ্ঞান স্তর চেতনার ক্ষেত্র-বহির্ভূত।

(২) অবচেতন মন অবদমিত কামনা-বাসনার আবসস্থল নয়, নির্জ্ঞান মন অবদমিত কামনা-বাসনার আবাসস্থল।

(৩) চেতন স্তরে যে মানসিক বৃত্তিগুলির প্রকাশ ঘটে এবং অবচেতন স্তরে যে মানসিক বৃত্তিগুলির প্রকাশ ঘটে, উভয়ের মধ্যে কোন স্বরূপগত পার্থক্য হল পরিমাণ বা মাত্রার। চেতন স্তরের মানসিক বৃত্তিগুলি স্পষ্টতম, অবচেতন স্তরের মানসিক বৃত্তিগুলি অস্পষ্ট থেকে আরম্ভ করে ক্রমশঃ অস্পষ্টতম হয়েছে। কিন্তু নির্জ্ঞান ইচ্ছা এবং তার চেতন স্তরে প্রকাশ—এই দুই বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। নির্জ্ঞান মনে অবদমিত ইচ্ছাগুলির অব্যক্তরূপ (latent content) এবং চেতন স্তরে ওদের প্রকাশিত যে ব্যক্তরূপ (manifest content) সমজাতীয় নয়।

(৪) অবচেতন স্তরের মানসিক বৃত্তি চেতন স্তরে নিজরূপেই আত্মপ্রকাশ করে। নির্জ্ঞান ইচ্ছা চেতন স্তরে ছদ্মরূপ (disguised) নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে।

(৫) অবচেতন মনের বৃত্তিগুলিকে নিজের চেষ্টায় চেতন স্তরে আনা সম্ভব। কিন্তু নির্জ্ঞান স্তরে যেসব কামনা-বাসনা অবদমিত হয়ে থাকে সেগুলিকে ব্যক্তি নিজের চেষ্টায় চেতন স্তরে আনতে পারে না। মনঃসমীক্ষকই বলে দেন যে, অনেক মানসিক ঘটনাই আপাতদৃষ্টিতে কারণবিহীন মনে হলেও নির্জ্ঞান স্তরে তাদের কারণ লুকিয়ে আছে।

(৬) অবচেতন মনের ইচ্ছা মানসিক ব্যাধির রূপ গ্রহণ করে আত্মপ্রকাশ করে না। ব্যক্তি নিজের ইচ্ছায় কোন কোন ইচ্ছাকে অবচেতন মনে নিরুদ্ধ (suppressed) করে রাখতে পারে কিন্তু সেগুলি আত্মপ্রকাশের সময় কোন বিকৃত রূপ গ্রহণ করে না। কিন্তু নির্জ্ঞান ইচ্ছা, হিষ্টিরিয়া, বিষাদ বায়ু (melancholia), ভ্রমবাতুলতা প্রভৃতি মানসিক ব্যাধির রূপ গ্রহণ করে আত্মপ্রকাশ করে।

Questions

1. Can Consciousness be defined ? If not, why not ? How would you describe it ? What are its characteristics ?

2. What do you mean by the field of consciousness ? Bring out the distinction between the sub-conscious and the unconscious.

3. Distinguish between the conscious, the sub-conscious and the unconscious mind. Adduce some reasons for the unconscious.

4. Distinguish between the conscious and the unconscious with the help of suitable examples. How would you prove the existence of the unconscious ?

5. What is meant by conscicusness ? Is conciousness extensive with mind ? Discuss the question with reference to different levels of mind.

6. Ellucidate with an example different modes of consciousness. Are they constituents of one concrete whole ?

7. Distinguish between the Unconscicus and the Pre-conscious. Discuss in this connection the value of the Freudean theory of the Unconscious.

8. Distinguish between the focus and margin of consciousness. How is it possible to know the existence of margin consciousness ?

9. Are mind and consciousness co-extensive ?

10. Explain the idea of the Unconscious ? What are the proofs for the existence of the Unconscious ?

তৃতীয় পত্র

'খ' বিভাগ

সমাজদর্শন

(Social Philosophy)

প্রথম অধ্যায়

সমাজদর্শনের স্বরূপ বা প্রকৃতি
(Nature of Social Philosophy)

১। ভূমিকা (Introduction) ঃ

মানুষ সামাজিক জীব। সে সমাজবদ্ধ জীবন-যাপনে অভ্যস্ত। আদিমতম যুগ থেকেই মানুষ সঙ্ঘবদ্ধভাবে জীবন-যাপন করে আসছে। যেসব বিজ্ঞান সমাজ-জীবনে মানুষের বিভিন্ন কার্যকলাপ নিয়ে আলোচনা করে সেগুলিকে আমরা বলি **সামাজিক বিজ্ঞান** (Social Sciences)। যেমন—রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থবিজ্ঞান, নীতিবিজ্ঞান প্রভৃতি সামাজিক বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। যে বিজ্ঞান মানব-সমাজের ক্রমবিকাশের ধারা এবং সমাজের রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার, অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানগুলির স্বরূপ বর্ণনা করে এবং তাদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করে তাকে বলা হয় **সমাজবিজ্ঞান** (Sociology)। সামাজিক বিজ্ঞানের সঙ্গে সমাজবিজ্ঞানের প্রভেদ আছে। সামাজিক বিজ্ঞানগুলি সমাজ-জীবনে মানুষের বিভিন্ন কার্যকলাপের বিভিন্ন দিক পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনা করে। কিন্তু সামাজিক বিজ্ঞানগুলি মানুষের কার্যকলাপের সামগ্রিক আলোচনা করে না। সমাজ-জীবনের সামগ্রিক আলোচনা করে সমাজবিজ্ঞান। অর্থাৎ সমাজ-জীবনে মানুষের পারস্পরিক সম্বন্ধের সামাজিক আলোচনা করাই সমাজবিজ্ঞানের কাজ। গিন্‌সবার্গ (Ginsberg) সমাজবিজ্ঞান সম্পর্কে বলেন, 'মানুষের পারস্পরিক সম্বন্ধহেতু তাদের যা কিছু ঘটে সব কিছুই এর অন্তর্ভুক্ত।'[1] যদিও সমাজবিজ্ঞানের আলোচনা ক্ষেত্র বা পরিধি খুবই ব্যাপক তবু এমন কয়েকটি প্রশ্ন আছে যার আলোচনা সমাজবিজ্ঞান করে না। অথচ সমাজ-জীবনের আলোচনা ক্ষেত্রে এ সকল প্রশ্নের আলোচনা একেবারেই

সামাজিক বিজ্ঞান সমাজ-জীবনে মানুষের বিভিন্ন কার্যকলাপ নিয়ে আলোচনা করে

সমাজ-বিজ্ঞান মানব সমাজের ক্রমবিকাশের ধারা, সমাজের রীতিনীতি, অনুষ্ঠান প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করে

সামাজিক বিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য

1. "It is concerned with all that happens to human beings in virtue of their relation to each other."

—Morris Ginsberg: Reason and Unreason in Society; Page 1

অবাস্তব বা অপ্রাসঙ্গিক নয়। বস্তুতঃ, এ বিষয়গুলির আলোচনা ভিন্ন সমাজ-জীবনের আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

সমাজ-জীবনের আলোচনা প্রসঙ্গে কতকগুলি প্রশ্ন আমাদের সামনে দেখা দেয়। যথা, সমাজ-জীবনের উদ্দেশ্য (Ends), আদর্শ (Ideal) ও মূল্য (Value) কি? সামাজিক বিজ্ঞানগুলি যেসব নীতি এবং পদ্ধতি অনুসরণ করে সেগুলি কি যথার্থ বা যুক্তিযুক্ত? এসব নীতি এবং পদ্ধতির সত্যতা কিভাবে নির্ধারণ করা যেতে পারে? ব্যক্তির যেমন একটা আদর্শ আছে, উদ্দেশ্য আছে; সমাজ-জীবনেরও তেমন একটা আদর্শ ও উদ্দেশ্য আছে। বস্তুতঃ, আমরা ব্যক্তির উন্নতির কথা যেমন বলি, সমাজ-জীবনের উন্নতির কথাও তেমনি বলি। ব্যক্তি যেমন একটা আদর্শ বা নীতিকে সামনে রেখে তার ব্যক্তিগত জীবন চালিত করে তেমনি একটা আদর্শ ও নীতি অনুযায়ী তার সমাজ-জীবন পরিচালিত হয়। প্রশ্ন হল, এই আদর্শের স্বরূপ কি? ব্যক্তির আদর্শ ও সমাজের আদর্শ কি পৃথক, না অভিন্ন? মানুষ ও সমাজ ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সম্পর্কযুক্ত, মানুষকে নিয়েই সমাজ। মানুষের ব্যক্তিগত আশা, আকাঙ্ক্ষা, উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় সমাজের সামগ্রিক জীবনের ওপর যে প্রভাব বিস্তার করে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কাজেই সমাজ-জীবনের আলোচনায় মানুষের উদ্দেশ্য, আদর্শ, আশা-আকাঙ্ক্ষার আলোচনা কি অবান্তর আলোচনা? মানুষ তার ব্যক্তিগত কল্যাণ (Individual Good) চায়, কিন্তু জনকল্যাণের (Common Good) কথা চিন্তা না করে ব্যক্তিগত কল্যাণ লাভ করা কি সম্ভব? জনকল্যাণের ধারণা হল একটা আদর্শ। কি উপায়ে এই আদর্শ লাভ করা যায়?

সমাজ-জীবনের কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের আলোচনা করে সমাজদর্শন

সমাজের আদর্শের স্বরূপ কি?

জনকল্যাণের আদর্শ কিভাবে লাভ করা যেতে পারে?

সমাজবিজ্ঞান সমাজ-জীবনের আলোচনায় যেসব মৌলিক নীতি এবং ধারণা (fundamental principles or concepts) বিনা বিচারে গ্রহণ করেছে সেগুলির স্বরূপ বা প্রকৃতি কি? সমাজবিজ্ঞানের স্বীকার্য বিভিন্ন সত্য, নীতি এবং সিদ্ধান্ত কতদূর সত্য? বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞানের ফলাফলগুলিকে কি নিয়মানুসারে সংশ্লিষ্ট করা যেতে পারে? সামাজিক পরিবর্তন বা ক্রমবিকাশ কি কোন উদ্দেশ্য অনুযায়ী সাধিত হয়, না তা নিছক আকস্মিক ঘটনা? সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে মানুষের ইচ্ছার কি সম্বন্ধ আছে? সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি কি উদ্দেশ্য পূর্ণ করে? সামাজিক উন্নতি কি কেবলমাত্র ঐতিহাসিক ঘটনা, না এই

সমাজবিজ্ঞানের মৌলিক নীতি এবং ধারণাগুলির স্বরূপ কি?

উন্নতি নৈতিক মানদণ্ডে বিচার্য ? সমাজ-জীবনের পরমমূল্য (ultimate value) কি ? সামাজিক অগ্রগতি কোন্ কোন্ বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল ? আমরা যে সামাজিক ঐক্যের (Social Unity) কথা বলে থাকি, সে ঐক্যের আলোকে মানুষের সামাজিক দিকগুলি আলোচনা করলে তার কি তাৎপর্য পরিস্ফুট হয় ? সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন সিদ্ধান্তের সঙ্গে অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের কতদূর সঙ্গতি বর্তমান ?

সামাজিক পরিবর্তন বা ক্রমবিকাশের উদ্দেশ্য কি ?

যেহেতু সামাজিক বিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান জ্ঞাননিষ্ঠ বিজ্ঞান (positive sciences) সেহেতু তারা সমাজ-জীবনের আদর্শ ও মূল্য সম্পর্কীয় প্রশ্নগুলি নিয়ে আলোচনা করে না। অন্য একটি শাস্ত্র এইসব প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করে। তার নাম **সমাজদর্শন** (Social philosophy)। সমাজদর্শন আদর্শনিষ্ঠ (normative) শাস্ত্র। সামাজিক ঘটনার দার্শনিক তাৎপর্য নিরূপণ করাই সমাজদর্শনের কাজ। সমাজদর্শন পূর্বোক্ত প্রশ্নগুলির উত্তর দেবার জন্য সচেষ্ট হয়, কারণ সামাজিক ঘটনার (social facts) নিছক বর্ণনা ও ব্যাখ্যা সমাজদর্শনের কাজ নয়, আদর্শ ও মূল্যের পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক ঘটনার তাৎপর্য নির্ধারণ ও যৌক্তিকতা বিচার করাই সমাজদর্শনের কাজ। সামাজিক ঘটনার বর্ণনা ও ব্যাখ্যা নয় ; তার মূল্য নির্ধারণই সমাজদর্শনের লক্ষ্য।

সমাজবিজ্ঞান ও সমাজদর্শনের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য

গিন্‌সবার্গ বলেন, 'একথা সত্য যে, জড়বস্তু-সম্পর্কীয় বিজ্ঞানগুলি কি পদ্ধতি অবলম্বন করবে তা নির্দেশ করা যেমন দর্শনের কাজ নয়, তেমনি সামাজিক বিজ্ঞানগুলি কি পদ্ধতি অবলম্বন করবে দর্শন তা নির্দেশ করতে পারে না। কিন্তু সামাজিক বিজ্ঞানগুলি যেসব পদ্ধতি এবং ধারণাগুলিকে স্বীকার করে নেয়—বিশেষ করে সেই সব প্রাথমিক ধারণাগুলি যার থেকে সামাজিক বিজ্ঞানগুলির সংযোগ-সাধনের কাজ শুরু হতে পারে—সেগুলিকে বিচার করার এবং তাদের মূল্য অবধারণ করার একটা সমালোচনামূলক হাতিয়ার দর্শন দিতে পারে এবং বর্তমানে তা দেবার জন্য তার সচেষ্ট হওয়া একান্ত প্রয়োজন।'[1]

গিন্‌সবার্গ (Ginsberg)-এর মন্তব্য

1. "It is further true that philosophy can no more prescribe the methods to be employed by the social sciences than it can prescribe the methods to be employed by the physical sciences. But philosophy can and it seems urgently necessary just now that it should attempt to provide a critical apparatus for scrutinising and evaluating the methods and assumptions made by the social sciences and particularly the more fundamental conceptions from which a synthesis of the social sciences might proceed."

Morris Ginsberg : Reason and Unreason in Society.

২। সমাজদর্শনের স্বরূপ (Nature of Social Philosophy) :

দর্শনের কাজ অভিজ্ঞতার অর্থ, তাৎপর্য ও মূল্য নিরূপণ করা। সমাজদর্শনের কাজ সামাজিক ঘটনার অর্থ, তাৎপর্য ও মূল্য নিরূপণ করা। সমাজদর্শন হল সমাজবিজ্ঞান এবং দর্শনের মিলন ক্ষেত্র। গিসবার্ট (Gisbert) সমাজদর্শন এবং সামাজিক বিজ্ঞানগুলির সম্বন্ধ আলোচনা প্রসঙ্গে সমাজদর্শনের স্বরূপ ও কার্য সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।[1]

সমাজদর্শন সমাজবিজ্ঞান ও দর্শনের মিলনস্থল

তিনি বলেন, সমাজদর্শন নামটিই নির্দেশ করে যে, সমাজদর্শন সমাজবিজ্ঞান ও দর্শনের মিলনস্থল এবং সমাজদর্শন উভয়েরই অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।' তাঁর মতে সমাজদর্শনের কাজ হল বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞানে ব্যবহৃত সমাজ-জীবনের মৌলিক নীতিগুলি এবং ধারণাগুলিকে জ্ঞানের ও মূল্যের দিক থেকে আলোচনা করা। এছাড়া সমাজদর্শন সামাজিক বিজ্ঞানগুলির ফলাফলগুলিকে সংযুক্ত করে এবং জ্ঞান-জগতে এই সংযোগের স্থান নির্ধারণ করে।

সমাজদর্শনের দুটি দিক—জ্ঞানের দিক এবং মূল্যের দিক

সমাজদর্শনের দুটি অংশ আছে, একটি হল জ্ঞানের দিক (Epistemological) এবং অপরটি হল মূল্যের দিক (Axiological)। সমাজদর্শনের যেটি জ্ঞানের দিক সেটি জ্ঞান-বিষয়ক প্রশ্নগুলি আলোচনা করে এবং যেটি মূল্যের দিক সেটি মূল্য-সম্পর্কীয় প্রশ্নগুলি নিয়ে আলোচনা করে।

জ্ঞানের দিক থেকে বিচার করতে গেলে সমাজদর্শনের কাজ তিন ধরনের; যথা—(১) **তত্ত্বমূলক** (Ontological), (২) **সমালোচনামূলক** (Criteriological) এবং (৩) **সংযোগাত্মক** (Synthetic)। সমাজদর্শনের তত্ত্বমূলক কাজ হল, সমাজ-জীবনের মৌলিক নিয়মগুলি এবং ধারণাগুলি আলোচনা করা।

সমাজদর্শনের জ্ঞান-বিষয়ক কাজ তিন ধরনের—তাত্ত্বিক, সমালোচনামূলক এবং সংযোগাত্মক

যেমন—মানুষ, সমাজ, ন্যায়, সুখ প্রভৃতি ধারণাগুলির তাৎপর্য নির্ণয় করা। সমাজদর্শনের সমালোচনামূলক কাজ হল, সামাজিক বিজ্ঞানগুলির স্বীকার্য সত্য, মূল নিয়ম এবং সিদ্ধান্তগুলি সমালোচকের দৃষ্টিতে বিচার করা এবং তাদের সত্যতা নির্ধারণ করা।

সমাজদর্শনের সংযোগাত্মক কাজ হল যে-সকল সামাজিক বিজ্ঞান মানুষকে বিষয়বস্তু হিসেবে গ্রহণ করেছে সে-সকল সামাজিক বিজ্ঞানের ফলাফলগুলির সঙ্গে নিজের ফলাফলকে সংযুক্ত করা। এ জাতীয় সংযোগের কাজ সমাজবিজ্ঞানের কাজ নয়। এ সংযোগের কাজ সাধিত হয় সমাজদর্শনে।

সমাজদর্শনের কাজ সংযোগাত্মক

বস্তুতঃ এই সংযোগের কাজ সমাজবিজ্ঞানের স্তরে সীমাবদ্ধ না থেকে দর্শনের স্তরে উন্নীত হয়।

1. P. Gisbert : Fundamentals of Sociology ; Page 21.

সমাজদর্শনের মূল্য সম্পর্কীয় দিকটির কাজ হল সমাজ-জীবনের পরমমূল্য (Ultimate Values) নির্ধারণ করা এবং কিভাবে তাদের লাভ করা যায় সে উপায় নির্ধারণ করা।

সমাজদর্শন মূল্য নিয়ে আলোচনা করে

সমাজদর্শনের অন্যতম উদ্দেশ্য হল পরম নৈতিক মূল্যের সঙ্গে সম্বন্ধ রক্ষা করে সামাজিক কল্যাণ (Social Good) কিভাবে লাভ করা যায় তা নির্দেশ করা। এই সামাজিক কল্যাণ হল একটা আদর্শ। সকলের বা বহু লোকের সমবেত চেষ্টায় এ আদর্শ লাভ করা যায়। সমাজদর্শন এই সামাজিক কল্যাণের আদর্শ নিয়ে আলোচনা করে এবং কি উপায়ে এ আদর্শ লাভ করা যেতে পারে তা নির্দেশ করে। মূল্যের (Values) আলোচনা ছাড়া যে সমাজবিজ্ঞান বা সামাজিক বিজ্ঞানের আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়—এ বিষয়টি আজ সর্বজন-স্বীকৃত।[1]

সামাজিক বিজ্ঞানগুলি উদ্দেশ্যের (End) যথার্থতা নিয়ে আলোচনা করে না, সাধারণতঃ উপায়ের (Means) আলোচনা করে। কিন্তু উপায় ও উদ্দেশ্য সাপেক্ষ পদ। উদ্দেশ্য লাভ করার জন্যই উপায়। সমাজদর্শন উদ্দেশ্য বা আদর্শের যথার্থতা নিয়ে আলোচনা করে।

সমাজদর্শন উদ্দেশ্য বা আদর্শের সত্যতা সম্পর্কে আলোচনা করে

ম্যাকেঞ্জি এ প্রসঙ্গে বলেন, "সমাজদর্শন বিশেষ করে মানুষের সামাজিক ঐক্যের ওপর তার মনোসংযোগ করে এবং ঐ ঐক্যের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের জীবনের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দিকগুলির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে চায়। প্রধানতঃ এর অর্থ হল মূল্য, উদ্দেশ্য, এবং আদর্শের আলোচনা করা—কি আছে, কি ছিল, কি থাকতে পারে তা নয়—বরং এগুলির থাকার তাৎপর্য ও তার মূল্য আলোচনা করা।"[2]

গিন্‌স্‌বার্গ (Ginsberg) সমাজদর্শন এবং সমাজবিজ্ঞানের আলোচনা করতে গিয়ে সমাজদর্শনের স্বরূপ ও কাজের আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, সমাজদর্শনের দুটি

সমাজদর্শনের দুটি দিক—সমালোচনামূলক এবং সংগঠনমূলক

অংশ আছে—একটি হল **সমালোচনার দিক** (Critical or Logical) এবং অপরটি হল **গঠনমূলক** বা **সংযোগাত্মক দিক** (Constructive or Synthetic)। প্রথম অংশটির কাজ সামাজিক বিজ্ঞানগুলির যৌক্তিকতা নিয়ে এবং যেসব পদ্ধতি ও

---

1. মূল্য বলতে কি বুঝি? সাধারণতঃ যা মানুষের কোন প্রয়োজন মেটায় তাকেই আমরা মূল্য বলে মনে করি। মূল্য দুপ্রকার: যথা—স্বতঃমূল্য ও পরতঃমূল্য (Intrinsic and Extrinsic value)। যার নিজস্ব কোন মূল্য নেই, অন্য মূল্যের সহায়ক, তাহল পরতঃমূল্য। যেমন—অর্থ। যার নিজস্ব মূল্য আছে নিজগুণে যা মূল্যবান তাহল স্বতঃমূল্য। মানবমনের তিনটি বৃত্তি: চিন্তা, অনুভূতি ও ইচ্ছা। এই তিনটি বৃত্তির আদর্শ হিসেবে তিনটি মূল্য পাই; যথা—সত্য (Truth), শিব (Goodness) ও সুন্দর (Beauty)।

2. Mackenzie: Outlines of Social Philosophy; Page 14.

নীতি এই বিজ্ঞানগুলি প্রয়োগ করে সেগুলির সত্যতা নিয়ে। বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞানে 'যে সামাজিক পরিবর্তনের (Social change) ধারণাকে প্রয়োগ করা হয়, সমাজদর্শন তার দার্শনিক বিশ্লেষণ করে এবং সমাজের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে মানুষের ইচ্ছার সঙ্গে তার সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে।' দ্বিতীয় অংশটি—যেটি গঠনমূলক তার কাজ হল সামাজিক আদর্শের সত্যতা (Validity of social ideals) নিয়ে আলোচনা করা। এই দিক থেকে বিচার করতে গেলে বলতে হয় সমাজদর্শনের কাজ সমাজ-জীবনের বিভিন্ন সমস্যার ক্ষেত্রে নীতিবিজ্ঞানের ফলাফলগুলি প্রয়োগ করা। ধরা যাক, সামাজিক উন্নতির সমস্যা। এ হল একাধারে সমাজবিজ্ঞানের প্রশ্ন এবং অপরদিকে সমাজদর্শনের প্রশ্ন। সামাজিক উন্নতির প্রশ্নের ক্ষেত্রে যেমন একদিকে সমাজে যা ঘটেছে তার তথ্য আমাদের সংগ্রহ করতে হবে তেমনি নৈতিক আদর্শের মাপকাঠিতে সেগুলি ভাল কি মন্দ তা বিচার করতে হবে। অর্থাৎ একদিকে আছে সামাজিক ঘটনা অপরদিকে তার মূল্য বিচার।

হবহাউস-এর মন্তব্য

[1]হবহাউস-এর মতে 'সমাজদর্শনের কাজ হল শান্তিপূর্ণ জীবনের জন্য মানুষের ক্ষমতার সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিপূর্ণতার ধারণাকে আমাদের সামনে তুলে ধরা', এবং তাকে লাভ করার উপায়গুলি অন্বেষণ করা। সমাজের নিয়ম, প্রথা বা প্রতিষ্ঠানগুলির আসল উদ্দেশ্য সমাজ-জীবনকে বজায় রাখা নয়, একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনকে রক্ষা করা এবং উন্নত করা।

৩। সমাজদর্শন কি সম্ভব? (Is Social Philosophy Possible ?)

কোন কোন সমাজবিজ্ঞানী সমাজদর্শনের সম্ভাবনাকেই স্বীকার করতে নারাজ। তাঁদের মতে সামাজিক বিজ্ঞানগুলিতে ঘটনার আলোচনা করা হয়, সমাজদর্শনে মূল্য বা আদর্শের আলোচনা করা হয়। কাজেই সামাজিক বিজ্ঞান সম্ভব, সমাজদর্শন সম্ভব নয়। সমাজদর্শনের কাজ সামাজিক ঘটনার মূল্যাবধারণ। কিন্তু যেহেতু মূল্যাবধারণের ব্যাপারটি ব্যক্তিগত ব্যাপার, সেহেতু সমাজদর্শনের আলোচনায় সামাজিক ঘটনার যথাযথ স্বরূপ প্রকাশিত না হয়ে তার পক্ষপাতদুষ্ট ও বিকৃত স্বরূপটি প্রকাশিত হয়। আদর্শ ও

---

1. "A conception of the harmonious fulfilment of human capacity as the substance of happy life."

—Hobbouse : Elements of Social Justice.

মূল্যের আলোচনা যেহেতু নৈতিক আলোচনা, সেহেতু সামাজিক বিজ্ঞানগুলিকে সামাজিক ঘটনার স্বরূপ অন্বেষণের প্রচেষ্টায় নীতিবিজ্ঞান থেকে দূরে সরে থাকতে হবে, অর্থাৎ সামাজিক ঘটনার মূল্য অবধারণের কোন প্রয়োজন নেই। সামাজিক ঘটনাকে ব্যক্তিগত অনুভূতি, সংস্কার ও পক্ষপাতিত্ব থেকে দূরে রাখাই শ্রেয়ঃ। তাঁরা মনে করেন যে, সমাজদর্শন পাঠে সামাজিক ঘটনার প্রকৃত রূপটিকে জানা যায় না। তাছাড়া বিজ্ঞানের সাধারণ পদ্ধতি অনুসরণ করেও মূল্যাবধারণের বিষয়টিকে বিচার করা সম্ভব হয় না। সামাজিক বিজ্ঞানগুলি নৈতিক নিরপেক্ষতা বজায় রেখে কি আছে তারই আলোচনা করে, কি হওয়া উচিত তার আলোচনা করে না। সেহেতু সামাজিক বিজ্ঞানগুলিতেই সামাজিক ঘটনার যথাযথ রূপ জানা যায়।

সমাজদর্শনের সম্ভাবনা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ

আমাদের মতে সমাজদর্শনের সম্ভাব্যতা অস্বীকার করা চলে না। কারণ ঘটনা ও মূল্যের আলোচনা এমনভাবেই পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত যে একটিকে উপেক্ষা করে আর একটির আলোচনা চলতে পারে না।

সামাজিক তথ্য আলোচনা করতে গিয়ে মানুষের উদ্দেশ্য, আশা, আকাঙ্ক্ষার কথা বাদ দেওয়া যায় না। এই কারণে গিন্‌সবার্গ বলেন, "এটা কি স্পষ্ট নয় যে কোন-না-কোন অর্থে উদ্দেশ্য ও মূল্য সামাজিক বিজ্ঞানের অংশরূপে গণ্য হবে এবং সমাজদর্শন ও সমাজ-বিজ্ঞানের যে পার্থক্য সে পার্থক্য ঠিক তথ্য আলোচনার এবং মূল্যের আলোচনার পার্থক্য নয়?"[1] সুতরাং সমাজদর্শনের কাজ হল সংযোগের কাজ। এ সম্পর্কে ম্যাক্‌ডুগাল বলেন, 'সমাজদর্শনের উচিত সুচিন্তিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত মূল্যের তারতম্য অনুসারে তার নির্দেশগুলিকে সাজিয়ে দেওয়া এবং বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞানগুলির উচিত কিভাবে এ মূল্যগুলিকে সম্পূর্ণভাবে লাভ করা যায় তার উপায় আবিষ্কার করা।"[2]

1. "Is it not clear that in some sense ends and values must form part of social science and that the distinction between social philosophy and sociology does not quite correspond to the distinction between the study of facts and the study of values ?"

—Morris Ginsberg : Sociology ; Page 28.

2. "...Social philosophy, should first lay down its specifications in accordance with a hierarchy of values completely thought out and validated. Then the various social sciences should proceed to discover how these values may best be realised."

—W. McDougall in Human affairs—edited by Cattel, Cohen and Travers ; Page 840

কি সামাজিক বিজ্ঞান, কি নীতিবিজ্ঞান, উভয়ের যে কোনটির প্রয়োজনের দিক থেকে বিচার করলেই বোঝা যাবে যে, ঘটনাকে ও আদর্শকে সম্পূর্ণ পৃথক রেখে আলোচনা সম্ভব নয়। প্রথমতঃ, আদর্শের সত্যতা ও মিথ্যাত্বের প্রশ্ন না তুলে, তাদের নিছক সামাজিক ঘটনারূপে আলোচনা করা সম্ভব নয়। যেহেতু আদর্শ সমাজস্থ মানুষের আচরণকে প্রভাবিত করে সেহেতু সমাজ-জীবনের অঙ্গ হিসেবে তার মূল্য বিচার করার সময় তার সত্যতা ও মিথ্যাত্বের প্রশ্নকে এড়িয়ে যাওয়া যায় না। কোন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কি সম্ভাবনা নিহিত আছে সেটি আলোচনা না করলে শুধুমাত্র তার বর্তমান ও অতীত রূপের আলোচনা করে তার যথাযথ প্রকৃতিকে জানা যাবে না। তার অন্তর্নিহিত সম্ভাবনার বিষয়টি নিরূপণ করা যেতে পারে যদি তার কি হওয়া উচিত সেটা নিরূপণ করা যায়। অর্থাৎ কিনা একটা আদর্শের সঙ্গে তুলনা করেই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সম্ভাবনা ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায় এবং তাদের ক্রমায়ন (gradation) সম্ভব হয়। দ্বিতীয়তঃ, তত্ত্বের দিক থেকে ঘটনা ও আদর্শকে যতই পৃথক রাখার চেষ্টা করা হোক না কেন, বাস্তবে এই পার্থক্য বজায় রাখা সম্ভব নয়। আমরা সমাজকে কোন্ পথে পরিচালিত করতে চাই তার ওপরই নির্ভর করে সামাজিক বিজ্ঞানগুলির উপাদান নির্বাচন। নির্বাচনের বিষয়টি নিছক ঘটনা নয়, এটি আদর্শ-নির্ভর।

সমাজবিজ্ঞানী আদর্শকে উপেক্ষা করে সামাজিক ঘটনার আলোচনা করতে পারে না

নীতিবিদ্যার দিক থেকেও অগ্রসর হতে গেলে দেখা যায় যে, এক্ষেত্রেও আদর্শের আলোচনাকে ঘটনার আলোচনা থেকে বিচ্ছিন্ন করা যেতে পারে না। প্রথমতঃ, মানুষ সাধারণভাবে যে নৈতিক বিচার করে, সেগুলিকে সামাজিক ঘটনারূপে গণ্য করা হলেও, নীতিবিদ্যার অনুসন্ধানের কাজ তাদের কেন্দ্র করেই শুরু হয়।

নীতিবিদ্যা সামাজিক ঘটনাকে উপেক্ষা করতে পারে না

দ্বিতীয়তঃ, মানুষের বাস্তব প্রকৃতি ও সম্ভাবনাকে বাদ দিয়ে আদর্শ সম্পর্কে কোন সন্তোষজনক মতবাদে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া, নীতিবিদ্যার মতানুসারে বিভিন্ন ধরনের আচরণের ভালত্ব ও মন্দত্ব বিচার করতে গিয়ে তাদের ফলাফলগুলিকে উপেক্ষা করা চলে না এবং এই ফলাফলগুলি নির্ধারণ করা সামাজিক বিজ্ঞানের কাজ।

কাজেই সামাজিক বিজ্ঞান যদি ঘটনার আলোচনা করে এবং সমাজদর্শন মূল্য বা আদর্শের আলোচনা করে তাহলে পূর্বোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্তে আসতে হয় যে, সামাজিক বিজ্ঞান যদি সম্ভব হয়, তাহলে সমাজদর্শনও সম্ভব। সমাজদর্শনের সম্ভাবনাকে কোন মতেই অস্বীকার করা চলে না; কারণ ঘটনা ও আদর্শের আলোচনা ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

সমাজদর্শন সম্ভব

তবে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে যাতে ঘটনার আলোচনার সঙ্গে আমরা আদর্শের আলোচনাকে গুলিয়ে না ফেলি। আলোচনার ক্ষেত্রে তথ্যের ও আদর্শের আলোচনাকে সব সময় পৃথক রাখতে হবে, যদিও চরম সমন্বয়ের (final synthesis) ক্ষেত্রে উভয় প্রকার অনুসন্ধানকে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। আলোচনার প্রতি ক্ষেত্রে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে আমরা কি তথ্যের না আদর্শের আলোচনা করছি।

আলোচনার সময় মূল্য ও ঘটনার আলোচনাকে পৃথক রাখা ও চরম সমন্বয়ের সময় তাদের যুক্ত করা উচিত

হবহাউস বলেন, "ঘটনা ভাল বলেই ঘটছে, বা ঘটেছে বলেই ভাল, এই ধরনের চিন্তা আমাদের পরিহার করতে হবে। নতুবা আমাদের ঘটনা সম্পর্কীয় বিবরণ পক্ষপাতদুষ্ট হবে এবং মূল্য সম্পর্কীয় বিচার বিকৃতরূপ ধারণ করবে।" গিন্‌সবার্গ (Ginsberg) বলেন, মানুষের জীবনের পরিপূর্ণ আলোচনাতে সামাজিক বিজ্ঞান ও সমাজদর্শনের সমন্বয় সাধিত হবে, কিন্তু উভয়ের মিশ্রণ ঘটবে না।"[1]

৪। সমাজদর্শনের আলোচনার ক্ষেত্র বা পরিধি (The Scope of Social Philosophy) :

ইংরেজী '(Scope)' কথাটির অর্থ হল আলোচনার ক্ষেত্র বা পরিধি। প্রতিটি বিজ্ঞান প্রকৃতির এক বিশেষ বিভাগ সম্পর্কে আলোচনা করে ; অর্থাৎ তার আলোচনার

"Scope" কথাটির অর্থ

একটি নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু আছে। এই নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুই হল তার আলোচ্য বিষয়বস্তু, আলোচনার ক্ষেত্র বা পরিধি। সমাজদর্শনেরও একটি নির্দিষ্ট আলোচনা ক্ষেত্র আছে।

ইতিপূর্বে সমাজদর্শনের অর্থ বা স্বরূপ সম্পর্কে যে আলোচনা করা হয়েছে সেই আলোচনা থেকেই সমাজদর্শনের আলোচনা ক্ষেত্র বা পরিধি সম্পর্কে একটা ধারণা করা যাবে। সমাজদর্শন ও সমাজবিজ্ঞানের আলোচনা ক্ষেত্রের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বর্তমান।

সমাজবিজ্ঞানের আলোচনা ক্ষেত্র অত্যন্ত ব্যাপক। সমাজবিজ্ঞান মানব সমাজের উৎপত্তি, তার বিভিন্ন রূপ. আইনকানুন, রীতিনীতি, সামাজিক প্রতিষ্ঠান, ভাষা, মানুষের চিন্তাধারা, অনুভূতি, কার্য সবগুলিই আলোচনা করে। বস্তুতঃ মানুষের সমগ্র জীবনই

1. Sociology Page 37

তার আলোচ্য বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু সমাজদর্শনের আলোচনা ক্ষেত্র বা পরিধি সমাজবিজ্ঞানের মতো এতটা ব্যাপক নয়। ম্যাকেঞ্জি বলেন, "সমাজদর্শনের পরিধি খুবই সীমাবদ্ধ। দর্শনকে যেভাবে অন্যান্য বিজ্ঞান থেকে পৃথক করা হয়, সমাজবিজ্ঞানের বিশেষ শাখার বা অন্যান্য শাখার সঙ্গে সমাজদর্শনের সেরকম পার্থক্যই বর্তমান।"[1]

সমাজদর্শনের আলোচনা ক্ষেত্র সমাজবিজ্ঞানের মত ব্যাপক নয়

সমাজদর্শনের আলোচ্য বিষয়ঃ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সমাজদর্শনের আলোচনা ক্ষেত্র বা পরিধির অন্তর্ভুক্ত। যথা—

(ক) মানুষ সামাজিক জীব। মানুষের সামাজিক প্রকৃতি, এ বিশ্বে মানুষের স্থান (Man's place in the cosmos), ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদ, জনকল্যাণ, জনকল্যাণের সঙ্গে ব্যক্তিগত কল্যাণের সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয়গুলি সমাজদর্শনের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত।

মানুষের সামাজিক প্রকৃতি, ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক ইত্যাদি

(খ) বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠী এবং অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান সমাজবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। কিন্তু কোন আদর্শের আলোকে সমাজবিজ্ঞান এগুলি আলোচনা করে না। এগুলির মনোবিজ্ঞানসম্মত এবং দার্শনিক ভিত্তি (Psychological and Philosophical basis) সমাজদর্শনের আলোচ্য বিষয়। পরিবার, সমাজ, সম্প্রদায়, রাষ্ট্র, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, শিল্প প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, যেমন—গীর্জা, সঙ্ঘ প্রভৃতি সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির উদ্দেশ্য বা আদর্শ সমাজদর্শন নিরূপণ করে। এ সকল প্রতিষ্ঠানের ক্রমোন্নতি বা ক্রমবিকাশ কোন্ আদর্শের মাপকাঠিতে বিচার করা যেতে পারে, সে-সব প্রশ্নের আলোচনাও সমাজদর্শনে করা হয়।

সামাজিক গোষ্ঠী এবং প্রতিষ্ঠান

(গ) সামাজিক আদর্শের (Social Ideals) আলোচনা সমাজদর্শনের অন্যতম প্রয়োজনীয় আলোচ্য বিষয়। মূল্য (Values), উদ্দেশ্য (Ends) ও আদর্শের (Ideals) আলোচনা সমাজদর্শনের অন্তর্ভুক্ত।

সামাজিক আদর্শ

---

1. "Social philosopny has much more restricted province. It differs from the special branches of sociology or from the other branches of sociology in the way in which philosophy in general is distinguished from the particular sciences."

—Mackenzie : Outlines of Social Philosophy , Page 13.

(ঘ) সামাজিক অগ্রগতি (Social Progress) সমাজদর্শনের অন্যতম আলোচ্য বিষয়। আদর্শের সঙ্গে বাস্তবের পার্থক্য, সামাজিক অগ্রগতির মাপকাঠি বা মানদণ্ড (Criterion of Social Progress), সামাজিক অগ্রগতির প্রসারণ ও গভীরতা (Extensive and Intensive aspects of Social Progress) সামাজিক উন্নতির পক্ষে অপরিহার্য বিষয় সমূহ (Conditions of Social Development), সামাজিক দুর্নীতি প্রতিরোধের উপায় (Methods of checknig social evils) প্রভৃতি সমাজদর্শনের আলোচনা ক্ষেত্র বা পরিধির অন্তর্ভুক্ত।

সামাজিক অগ্রগতি

(ঙ) সমাজ-জীবনে ধর্ম এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। বস্তুতঃ, সমাজ-জীবনের ঐক্যের মূলে এই ধর্ম। ধর্মের প্রকৃত অর্থ, ধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য, বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা ও ধর্মের সম্পর্ক, ধর্ম ও সমাজসেবা, রাষ্ট্র ও ধর্ম, ধর্মের উন্নতি ও বিকাশ প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় সমাজদর্শনের আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত।

ধর্ম

(চ) সমাজ-জীবনের যেমন আছে একটা সুস্থ ও বলিষ্ঠ দিক, তেমনি আছে তার ব্যাধির দিক। সমাজ-ব্যাধিবিজ্ঞান (Social Pathology) সমাজদর্শনের আলোচ্য বিষয়বস্তুর অন্তর্গত। সমাজ-জীবন ব্যাধিগ্রস্ত হয় বলেই সমাজে অপরাধ অনুষ্ঠিত হয়, অপরাধীর শাস্তিবিধানের প্রয়োজন দেখা দেয়। সামাজিক অপরাধ এবং শাস্তির আলোচনা সমাজদর্শনের আলোচ্য বিষয়।

সমাজ-ব্যাধিবিজ্ঞান

(ছ) সমাজের বিবর্তন (Social Evolution), মানুষের সামাজিক সত্তা (The Social Self), মানুষের সামাজিক প্রকৃতি (The Social Nature of Man), লোকায়ত নীতিতত্ত্ব (The Ethos of a People)—এগুলিও সমাজদর্শনের আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত।

সমাজের বিবর্তন

(জ) সমাজ-জীবনের মৌলিক নীতি এবং ধারণাগুলি সমাজদর্শনের আলোচ্য বিষয়-বস্তুর অন্তর্গত; যেমন,—মানুষ, গোষ্ঠী, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, ন্যায়, সুখ ইত্যাদি। সমাজ-জীবনের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও মূল্যের (values) আলোচনাও সমাজদর্শনের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত।

সমাজ জীবনের মৌলিক নীতি এবং ধারণা

বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞানগুলির সঙ্গে সমাজদর্শনের সম্পর্ক বর্তমান। বিশেষ করে জীববিদ্যা, মনোবিজ্ঞান, শিক্ষাবিজ্ঞান, নীতিবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থবিজ্ঞান, আইন-

বিজ্ঞান, ইতিহাস এবং ধর্মদর্শনের (Philosophy of Religion) সঙ্গে এর সম্পর্ক খুবই নিবিড়। সুতরাং পূর্বোক্ত বিজ্ঞানগুলির অনেক বিষয় সমাজদর্শনের আলোচ্য বিষয়। মানুষকে জানতে হলে সাধারণভাবে মানুষের জীবন সম্পর্কে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। জৈবিক বিবর্তনবাদ জীবনের ক্রম-বিকাশের ওপর প্রচুর আলোকপাত করে। সেহেতু 'জীববিদ্যার' এই বিষয়টি সমাজদর্শনের আলোচ্য বিষয়। মানুষের স্বভাবকে জানা মানে তার মনকে জানা। মনোবিজ্ঞান মন নিয়ে আলোচনা করে। সে কারণে মনোবিজ্ঞানের অনেক বিষয় সমাজদর্শনের আলোচ্য বিষয়বস্তুর অন্তর্গত। সামাজিক মনোবিজ্ঞান (Social psychology) বর্তমানে অন্যতম জ্ঞানের শাখারূপেই স্বীকৃতি লাভ করেছে। সামাজিক অগ্রগতি সমাজদর্শনের আলোচ্য বিষয়-বস্তু। সামাজিক অগ্রগতি বস্তুতঃ ব্যক্তি বিশেষের উন্নতির ওপর নির্ভরশীল। শিক্ষা সম্পর্কীয় বিভিন্ন নীতি ব্যক্তি বিশেষের উন্নতিকে নিয়ন্ত্রিত করে। সুতরাং এগুলিও সমাজদর্শনের আলোচ্য বিষয়বস্তুর অন্তর্গত। সমাজদর্শন সামাজিক আদর্শ নিয়ে আলোচনা করে এবং এই আলোচনা নীতিবিজ্ঞানের আলোচনার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত; যেহেতু নীতিবিজ্ঞান মানুষের পরমকল্যাণের আদর্শটিকে নির্ধারিত করে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্র-সম্পর্কীয় বিজ্ঞান। এই রাষ্ট্র-সম্পর্কীয় ধারণা ও আইনবিজ্ঞানের ন্যায়ের (Justice) ধারণা সমাজদর্শনের আলোচনার বিষয়বস্তু। অর্থ-নীতি বস্তুর উৎপাদন, ভোগ, বিনিময় এবং বিতরণ নিয়ে আলোচনা করে। কিন্তু এ সবই জনকল্যাণের ধারণার সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত। জন-কল্যাণের ধারণা সমাজদর্শনের অন্যতম আলোচ্য বিষয়, সেহেতু সমাজদর্শনকেও প্রত্যক্ষভাবে অর্থবিজ্ঞানের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে হয়। সামাজিক বিকাশ বা অগ্রগতি ইতিহাসের আলোচ্য বিষয় এবং তা সমাজদর্শনেরও আলোচ্য বিষয়। ধর্মদর্শন ধর্ম নিয়ে আলোচনা করলেও সমাজদর্শন সমাজে ধর্মের ভূমিকা এবং তার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করে। সুতরাং সমাজদর্শনের পরিধি সীমাবদ্ধ হলেও নিতান্ত ক্ষুদ্র নয়।

বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞানের সঙ্গে সমাজদর্শনের সম্পর্ক

সমাজদর্শন মনোবিজ্ঞানের অনেক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে

সমাজদর্শন অর্থবিজ্ঞানের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে

৩। সমাজদর্শনের সঙ্গে অন্যান্য বিষয়ের সম্পর্ক (Relation of Social Philosophy to other Subjects)

(ক) সমাজদর্শন ও সমাজবিজ্ঞান (Social Philosophy and Sociology):

সমাজদর্শন ও সমাজবিজ্ঞানের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। বস্তুতঃ, এ দুটি জ্ঞানের শাখা পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল এবং একটি আর একটির পরিপূরক। উভয়েই মানুষের সমষ্টি-গত চেতনা ও বাস্তব জগতে সেই চেতনার বহিঃপ্রকাশ নিয়ে আলোচনা করে। সমাজ-দর্শন সমাজের উদ্দেশ্য, আদর্শ এবং মূল্য নিয়ে আলোচনা করে। ম্যাকেঞ্জি বলেন, সমাজ-দর্শন সামাজিক ঐক্যের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে ঐক্যের আলোকে মানুষের জীবনের বিশেষ দিকগুলি আলোচনা করে।' সমাজবিজ্ঞান সমাজের উৎপত্তি, গঠন ও বিকাশ; সমাজের রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার, নিয়ম-কানুন, বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের স্বরূপ ও ক্রমবিকাশ নিয়ে আলোচনা করে। ব্যাপক অর্থে, সামাজিক মানুষের সমগ্র জীবনই সমাজবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। তবে সমাজবিজ্ঞান বিশেষ করে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক ও ক্রিয়া এবং তার কারণ ও পরিণাম নিয়ে আলোচনা করে।

সমাজদর্শন সমাজের উদ্দেশ্য ও আদর্শ নিয়ে এবং সমাজ-বিজ্ঞান সামাজিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে

সমাজদর্শন এবং সমাজবিজ্ঞানের মধ্যে কয়েক বিষয়ে যেমন সাদৃশ্য আছে তেমনি কয়েক বিষয়ে আবার পার্থক্যও আছে:

সমাজদর্শন আদর্শনিষ্ঠ (Normative), সমাজবিজ্ঞান বস্তুনিষ্ঠ (Positive)। সমাজদর্শন সমাজের প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করে না; সমাজ কি রকম হওয়া উচিত, কি আদর্শে সমাজ পরিচালিত হওয়া উচিত তাই নিয়ে আলোচনা করে। সমাজদর্শন সমাজের বিধি-ব্যবস্থা ও গঠনের মধ্যে যে আদর্শ নিহিত আছে তা নির্ধারণ করে এবং ঐ আদর্শের আলোকে বিভিন্ন সামাজিক বিষয়ের মূল্যাবধারণ করে। সমাজবিজ্ঞানের কাজ কিন্তু ভিন্ন। বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞানের (Positive Science) দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সমাজ-বিজ্ঞান সমাজের বিভিন্ন দিক; যথা—বিভিন্ন সামাজিক নিয়ম, সামাজিক আইন-কানুন, ভাষা, বিশ্বাস, সংস্কার সব কিছু নিয়েই আলোচনা করে। সমাজ কি রকম হওয়া উচিত, আদর্শ সমাজ কোন্ কোন্ বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল—এ সব বিষয় সমাজবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত নয়। পর্যবেক্ষণের ওপর ভিত্তি করে সমাজের বিভিন্ন দিকগুলিকে ব্যাখ্যা করতে সমাজবিজ্ঞান সচেষ্ট। কিন্তু সমাজদর্শনের কাজ শুধু বাস্তবকে

সমাজদর্শন ও সমাজবিজ্ঞানের পার্থক্য

নিয়ে নয়, আদর্শকে নিয়ে। সমাজদর্শন চায় জনকল্যাণের আদর্শটি নির্ধারণ করতে, যার দ্বারা সমাজের সামগ্রিক কল্যাণসাধন হতে পারে। এ ছাড়া সমাজবিজ্ঞান হল তাত্ত্বিক বিজ্ঞান এবং জ্ঞানদান ছাড়া এর বিশেষ ব্যবহারিক উপযোগিতা নেই। কিন্তু সমাজদর্শন যে আদর্শ নির্ধারণ করে, ব্যক্তির সমাজজীবনের ওপর তার ব্যবহারিক উপযোগিতা বর্তমান। তাছাড়া, বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সংস্কার ও উন্নতি সমাজদর্শন দ্বারা নির্ধারিত আদর্শ অনুসারেই করা সম্ভব। জনকল্যাণকে বাস্তব রূপ দিতে হলে সমাজদর্শন দ্বারা স্থিরীকৃত কোন বলিষ্ঠ ও সুষ্ঠু আদর্শ অবলম্বনের দ্বারাই তা সম্ভব।

সমাজদর্শনের ব্যবহারিক উপযোগিতা

উভয়ের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও সমাজদর্শন ও সমাজবিজ্ঞান এক হিসেবে একই সমাজ-জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করে, সেজন্য এদের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। উভয়ই পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল। একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তির পেছনে কি উদ্দেশ্য বর্তমান, কি আদর্শে প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত হচ্ছে—এসব তথ্য সম্পর্কে যদি সমাজ বিজ্ঞানী অবহিত হয়, তাহলে সে প্রাতিষ্ঠানটির স্বরূপ নির্ভুলভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে। সমাজ-জীবনের বিভিন্ন বিষয়গুলি সম্পর্কে তার জ্ঞান হবে যথার্থ, সুসঙ্গত ও সুসামঞ্জস্যপূর্ণ। অনুরূপভাবে বলা যেতে পারে যে, সমাজ-দার্শনিক জনকল্যাণের যে আদর্শ নির্ধারণ করতে চায়, বাস্তব সমাজে সেই আদর্শ কতটুকু রূপ পেয়েছে, তা তার জানা প্রয়োজন। সমাজবিজ্ঞানের দেওয়া তথ্যের ওপর ভিত্তি করেই এই আদর্শ সমাজের স্বরূপ সমাজদার্শনিককে নির্ধারণ করতে হয়। সুতরাং সমাজ-দর্শনকে সমাজবিজ্ঞানের ওপর নির্ভর করতে হয়। তাছাডা সমাজদার্শনিক সমাজের রীতিনীতি, বিভিন্ন সামাজিক ধারণাগুলি (Concepts) বিচার করে এবং তার মূল্য অবধারণ করে। এই অবধারণ তখনই সহজ হয়, যখন সামাজিক রীতিনীতি ও অন্যান্য বিষয়ের প্রকৃতি সম্বন্ধে সমাজদার্শনিকের সঠিক জ্ঞান থাকে। অর্থাৎ সামাজিক বাস্তব তথ্যগুলি অবহেলা করে সমাজদর্শন আদর্শ সমাজের স্বরূপ নির্ধারণ করতে পারে না।

সমাজদর্শনের আদর্শ সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞানীর অবহিত হওয়া প্রয়োজন

সামাজিক তথ্যের ভিত্তিতে আদর্শ সমাজের রূপ সমাজ-দর্শন নির্ণয় করে

যে প্রাকৃতিক নিয়ম দ্বারা সমাজ নিয়ন্ত্রিত হয়, সমাজবিজ্ঞান সে সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান দেয়। সমাজের বিকাশ ও অগ্রগতির জন্য কি কি বিষয় সহায়ক, কোন্‌গুলি তার প্রতিবন্ধক এবং সমাজ-সম্পর্কীয় অনুসৃত নীতিগুলির পরিমাণ কি হতে পারে সেই সম্পর্কেও সমাজ-বিজ্ঞান

সমাজবিজ্ঞানের তথ্যের ওপর সমাজদর্শন নির্ভরশীল

জ্ঞান দেয়। সমাজবিজ্ঞান সমাজ-জীবন সম্পর্কে যে সব তথ্য সরবরাহ করে বা জ্ঞান নির্ণয় করে সমাজ-সংস্কারক এবং রাজনীতিবিদদের পক্ষে সমাজের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার জন্য তা একান্ত প্রয়োজন এবং এগুলির ওপর ভিত্তি করেই তারা ভবিষ্যৎ সমাজের উন্নত রূপটি নির্ণয় করতে পারে।

পরিশেষে, আমাদের একথা মনে রাখতে হবে যে, যদিও সমাজবিজ্ঞান ও সমাজ-দর্শনের মধ্যে সম্পর্ক নিবিড়, তবুও দুটোকে এক করে ফেললে চলবে না। আলোচনার প্রত্যেকটি ধাপে আমাদের জানতে হবে আমরা কী তথ্য নিয়ে বা আদর্শ নিয়ে আলোচনা করছি। তথ্য এবং মূল্যের আলোচনাকে সব সময় পৃথক রাখাই বাঞ্ছনীয়, যদিও মানুষের জীবনের সামগ্রিক আলোচনার ক্ষেত্রে উভয়ের সংযোগ সাধনের প্রয়োজন আছে। সমাজবিজ্ঞানের সঙ্গে সমাজদর্শনের সংযোগের প্রয়োজন আছে, কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে উভয়ের মিশ্রণ (fusion) না ঘটে।

(খ) সমাজদর্শন ও মনোবিজ্ঞান (Social Philosophy and Psychology):

সমাজদর্শন ও মনোবিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক খুবই গভীর। সমাজদর্শন সমাজ-জীবনের মৌলিক নীতি এবং ধারণাগুলির যৌক্তিকতা বিচার করে এবং আদর্শের মানদণ্ডে তাদের মূল্যাবধারণ করে। মনোবিজ্ঞান মন সম্পর্কীয় বিজ্ঞান। মন বলতে বুঝি বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়া—চিন্তা, অনুভূতি ও ইচ্ছা। সমাজদর্শনের সঙ্গে মনোবিজ্ঞানের সম্পর্ক নির্ণয় করার পূর্বে উভয়ের মধ্যে কোন্ কোন্ বিষয়ে সাদৃশ্য আছে এবং কোন্ কোন্ বিষয়ে পার্থক্য আছে নির্ণয় করা দরকার। সমাজদর্শন ও মনোবিজ্ঞানের মধ্যে সাদৃশ্য হল এই যে, উভয়ই মানসিক বিদ্যা (Mental Science), জড়বস্তু সম্পর্কীয় বিজ্ঞান (Meterial Science) নয়।

সমাজদর্শন ও মনোবিজ্ঞানের মধ্যে সাদৃশ্য

উভয়ই মানসিক প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করে। মনোবিজ্ঞান মানসিক প্রক্রিয়ার প্রকৃতি নির্ণয় করে। সমাজদর্শন সমাজ-জীবনের ধারণা, নীতি ও আদর্শের আলোচনা প্রসঙ্গে বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়া আলোচনা করে।

কিন্তু উপরিউক্ত বিষয়ে সাদৃশ্য থাকলেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য বর্তমান। সমাজদর্শন হল আদর্শনিষ্ঠ (Normative), মনোবিজ্ঞান হল বস্তুনিষ্ঠ (Positive)। সমাজের আদর্শ কি রকম হওয়া উচিত তাই হল সমাজদর্শনের প্রধান আলোচ্য বিষয়, আর মনোবিজ্ঞান মানসিক প্রক্রিয়ার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে। মানসিক প্রক্রিয়াগুলি কি রকম হওয়া উচিত মনোবিজ্ঞান তা আলোচনা

সমাজদর্শন ও সমাজবিজ্ঞানের পার্থক্য

করে না, অর্থাৎ কোন আদর্শের আলোকে মানসিক প্রক্রিয়াগুলিকে ব্যাখ্যা করা মনোবিজ্ঞানের কাজ নয়। মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হল ব্যক্তিসাপেক্ষ (Subjective), সমাজদর্শনের বিষয়বস্তু ব্যক্তিনিরপেক্ষ (Objective)। সমাজদর্শন ব্যক্তিনিরপেক্ষ বিষয়বস্তু ; যথা—সমাজ, রাষ্ট্র, পরিবার, সঙ্ঘ, সম্প্রদায়, গোষ্ঠী—এসব নিয়ে আলোচনা করে। এ ছাড়া সমাজদর্শন সমষ্টিগত চেতনা (Collective Mind) নিয়ে আলোচনা করে, মনোবিজ্ঞান ব্যক্তিচেতনার (Individual Mind) প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে। মনোবিজ্ঞান আলোচনা করে মানসিক ক্রিয়ার প্রকৃতি কি, সমাজদর্শন আলোচনা করে মানুষের ক্রিয়াকে কিভাবে নিয়ন্ত্রিত করলে জনকল্যাণের আদর্শ লাভ করা যায়। মানুষের ব্যবহারিক জীবনের ওপর মনোবিজ্ঞানের কোন প্রত্যক্ষ প্রভাব নেই, সেহেতু মনোবিজ্ঞান পুরোপুরি তাত্ত্বিক বিজ্ঞান (Theoretical science)। সমাজদর্শন জনকল্যাণের আদর্শটি নির্ধারণ করে, সেহেতু মানুষের ব্যবহারিক জীবনের ওপর তার প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। মনোবিজ্ঞানের পরিধি (Scope) সমাজদর্শনের পরিধির তুলনায় অনেক ব্যাপক। মনোবিজ্ঞান সকল রকম মানসিক প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করে। সমাজদর্শন সামাজিক জীব হিসেবে মানুষের বিশেষ কতকগুলি মানসিক প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করে।

সমাজদর্শন ও মনোবিজ্ঞানের মধ্যে যে সাদৃশ্য ও পার্থক্য বর্তমান সে সম্পর্কে আলোচনা করা হল। এবার উভয়ের মধ্যে যে গভীর সম্বন্ধ বর্তমান তা নির্ধারণ করা যাক :

সমাজদর্শন ও মনোবিজ্ঞানের গভীর সম্পর্ক

সমাজদর্শন সমাজ-জীবন নিয়ে আলোচনা করে। ব্যক্তিকে নিয়েই সমাজ। ব্যক্তির চিন্তা, অনুভূতি, ইচ্ছা—এক কথায় ব্যক্তির মনই সমাজ-জীবনে প্রতিবিম্বিত হয় এবং বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ব্যক্তির আশা, অনুভূতি, আকাঙ্ক্ষাই রূপ লাভ করে। সুতরাং ব্যক্তির মনকে বাদ দিয়ে সমাজ-জীবনের কোন আলোচনা সম্ভব নয়। অর্থাৎ সমাজ-জীবনের একটি মনস্তত্ত্বমূলক ভিত্তি (Psychological Basis) আছে যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।[1]

---

1. এ প্রসঙ্গে ম্যাকাইভার (MacIver) বলেন, 'যা কিছু একটি জীবিত মানুষ করে বা ভোগ করে, যা কিছু ইতিহাস বা অভিজ্ঞতায় পাওয়া যায় সবই হল মানসিক ঘটনা এবং মানসিক বৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তির উদ্দেশ্য, প্রয়োজন এবং ভাবাবেগকে বাদ দিয়ে এসব ঘটনাকে বুঝে ওঠা যায় না।'
("Everything a living creature does or suffers, every event in history or experience is a psychical phenomenon and cannot be understood execpt in terms of the purpose, needs and passions of psychical beings.)"
—MacIver, Community, Page 59

সমাজদর্শন সামাজিক সম্পর্কের (social relations) অর্থ ও মূল্য নিরূপণ করতে চায়। এই কারণে তাকে সকল প্রকার সামাজিক সম্পর্ক আলোচনা করতে হয়। কিন্তু মানস জীবনের সাধারণ নিয়ম (general laws of mental life), যা মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় তার সম্পর্কে জ্ঞান থাকলেই সামাজিক সম্পর্কের অর্থ ও মূল্য নিরূপণ করা সম্ভব। সামাজিক সম্পর্কের তাৎপর্য নিরূপণ করতে হলে সমাজস্থ ব্যক্তি-মানুষের কামনা, বাসনা, অনুভূতি, আবেগ, সহজাত প্রবৃত্তি, প্রয়োজন, আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রকৃতি জানা দরকার। এই সব মানসিক বৃত্তিই মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক নির্ধারণ করে। এর জন্য মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান অত্যাবশ্যকীয়।

সামাজিক অনুষ্ঠানের-প্রতিষ্ঠানের অর্থ, উদ্দেশ্য ও মূল্য নিরূপণ করা সমাজদর্শনের কাজ। কিন্তু সমাজস্থ মানুষের মনের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার ফলেই সামাজিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব। কাজেই এক্ষেত্রেও সমাজদার্শনিকের পক্ষে মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান লাভ করার প্রয়োজন আছে। অর্থাৎ সমাজ-জীবনের একটি মনস্তত্ত্বমূলক ভিত্তি (Psychological Basis) আছে যা গুরুত্বপূর্ণ।

সমাজ-জীবনের বিভিন্ন স্তরকে বিশ্লেষণ করে, তার মনস্তত্ত্বমূলক ভিত্তিকে অনুধাবন করেই সমষ্টিগত চেতনার আশা, আকাঙ্ক্ষা, অনুভূতি, চিন্তাধারা সকল কিছুই জানতে পারা যায় এবং এগুলিই জনকল্যাণের আদর্শটি নির্ধারিত করতে সহায়তা করে, যা বিশেষ-ভাবে সমাজদর্শনের কাজ।

মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান সমাজদার্শনিকের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজন

যে জনকল্যাণের আদর্শে সমাজ গঠিত হওয়া উচিত এবং যে উপায়ে এই আদর্শ লাভ করা যেতে পারে, সমাজদর্শন তার নির্দেশ দেয়। কিন্তু সমাজস্থ ব্যক্তির সামর্থ্য এবং ক্ষমতা, তাদের ইচ্ছা এবং কামনা-বাসনার পরিপ্রেক্ষিতেই আদর্শ নির্ধারিত হতে পারে। অর্থাৎ মানুষের ইচ্ছা, অনুভূতি এবং চিন্তাকে কিভাবে নিয়ন্ত্রিত করলে এ আদর্শ লাভ করা যেতে পারে সমাজদার্শনিককে সে সম্পর্কে অবহিত হতে হবে। এ জন্য মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান সমাজদার্শনিকের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

সমাজে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং বিভিন্ন মনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে আলোচনার ফলে নতুন একটি জ্ঞানের শাখার সৃষ্টি হয়েছে, যাকে বলা হয় সামাজিক মনোবিজ্ঞান (Social Psychology)।[1] সামাজিক মনোবিজ্ঞান সামাজিক প্রতিষ্ঠান,

---

1. "Psychology when it studies mind as revealed in social relation is often called Social Psychology." —MacIver, Community Page 69

সংঘ, রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার, জনসাধারণের মতামত—এগুলি মানুষের অনুভূতি ও আবেগের সঙ্গে কিভাবে সম্পর্কযুক্ত তা আলোচনা করে। জনতার মনস্তত্ত্ব (Crowd Psychology), মানুষের ভাষার উৎপত্তি এবং বিকাশ সামাজিক মনোবিজ্ঞানের অন্যতম আলোচ্য বিষয়বস্তু। অতি সহজেই বুঝতে পারা যায়, সামাজিক মনোবিজ্ঞানের আলোচনা সমাজদর্শনের সঙ্গে কিভাবে প্রত্যক্ষ সম্পর্কে সম্পর্কযুক্ত। সমাজদর্শন যেসব মূল্য এবং আদর্শকে আবিষ্কার করতে চায় সামাজিক মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন আলোচনা থেকে সেগুলির সমর্থন পাওয়া যায়, কারণ সমাজ ব্যক্তিমনেরই প্রকাশ। সমাজদর্শনের অন্যতম লক্ষ্য হল মানুষের ঐক্য (Unity of Mankind)। আধুনিক মনোবিজ্ঞান সমাজদর্শনের এই লক্ষ্যকে সমর্থন করে।

সামাজিক মনোবিজ্ঞানের স্বরূপ

পূর্বোক্ত আলোচনার ওপর ভিত্তি করে বলা যেতে পারে যে, সমাজদর্শনের সঙ্গে মনোবিজ্ঞানের সম্পর্ক খুবই কঠিন।

কোন কোন মনোবিজ্ঞানী যেমন ম্যাকডুগাল (McDougall) এবং ফ্রয়েড (Freud), মানুষের সমাজ-জীবনকে কতকগুলি মানসিক শক্তিতে (Psychological Forces) রূপান্তরিত করেছেন। সেক্ষেত্রে সমাজবিজ্ঞান হয়ে ওঠে মনোবিজ্ঞানের অর্থাৎ সামাজিক মনোবিজ্ঞানের শাখা এবং সেহেতু সমাজদর্শনও হয়ে পড়ে পুরোপুরি ব্যক্তিসাপেক্ষ (subjective)। কিন্তু এ ধারণা যুক্তিযুক্ত নয়। গিসবার্ট (Gisbert) বলেন, যেহেতু যেসব কারণ আমাদের সামাজিক আচরণকে প্রভাবিত করে সেগুলি সবই মনস্তত্ত্বমূলক নয়, সেহেতু কেবলমাত্র মনোবিজ্ঞানের পদ্ধতি অনুসরণ করেই সামাজিক জীবনের আলোচনা চলতে পারে না।[1] মানুষের সামাজিক আচরণের মূলে কেবলমাত্র মানসিক কারণই বর্তমান নেই, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক এবং জৈবিক কারণও বর্তমান। এজন্য সামাজিক প্রথা ও প্রতিষ্ঠানগুলির ভিন্নতা এবং তাদের বিকাশ কেবলমাত্র মনোবিজ্ঞানসম্মত নিয়মের সহায়তায় ব্যাখ্যা করা যাবে না।

(গ) সমাজদর্শন ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান (Social Philosophy and Politics):

সমাজদর্শন ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। সমাজদর্শনের কাজ হল সামাজিক নীতি, নিয়ম এবং ধারণাগুলির যৌক্তিকতা বিচার করা ও তাদের মূল্যাবধারণ করা, জনকল্যাণের আদর্শটি নির্ধারণ করা এবং যে সমাজ-ব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষের জনকল্যাণের

1. "But as the causes affecting social behaviour are likewise other than psychological, social life cannot be studied exclusively with the methods of the psychologist" —P. Gisbert. Fundamentals of Sociology. Page 20

আদর্শটি বাস্তব রূপ পেতে পারে তার স্বরূপ নির্ণয় করা। রাষ্ট্রবিজ্ঞান হল রাষ্ট্র-সম্পর্কীয় বিজ্ঞান। গার্নার (Garner)-এর মতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মূল সমস্যাগুলি হল রাষ্ট্রের উৎপত্তি এবং স্বরূপ নির্ণয় করা, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির স্বরূপ, ইতিহাস ও গঠন সম্পর্কে অনুসন্ধান করা এবং তার থেকে রাজনৈতিক ক্রমবিকাশ ও ক্রমোন্নতির বিধিগুলি অনুমান করে নেওয়া। রাষ্ট্রের লক্ষ্য হল মানুষের কল্যাণের জন্যই মানুষের আচরণকে উপযুক্ত শাসনযন্ত্রের সহায়তায় নিয়ন্ত্রিত করা এবং সেজন্য ব্যক্তির অধিকার ও কর্তব্য নির্ণয় করা।

সমাজদর্শন ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের স্বরূপ

সমাজদর্শন এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে সাদৃশ্য এবং কয়েকটি বিষয়ে পার্থক্য আছে। সমাজদর্শন ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান উভয়ই আদর্শনিষ্ঠ (Normative), যেহেতু উভয়ই জনকল্যাণের আদর্শ নিয়ে আলোচনা করে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান ব্যবহারিক বিজ্ঞান। সমাজদর্শনও সমাজস্থ ব্যক্তির ব্যবহারিক জীবনের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। সমাজদর্শন ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান উভয়ই সমাজ-জীবন সম্পর্কে আলোচনা করে। সমাজদর্শন ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান উভয়েরই আলোচ্য বিষয় সমষ্টিগত চেতনা (Collective Mind), ব্যক্তি-চেতনা (Individual mind) নয়।

সমাজদর্শন ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মধ্যে সাদৃশ্য

রাষ্ট্র একটি সুসংগঠিত শাসনব্যবস্থার মাধ্যমে রাষ্ট্রের নাগরিকবৃন্দের আনুগত্য লাভের জন্য কতকগুলি আইন প্রণয়ন করে। সামাজিক ঐক্য এবং সহযোগিতা বজায় রাখার জন্য রাষ্ট্রের নাগরিকবৃন্দ এসব আইন পালন করতে বাধ্য হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভিন্ন রাষ্ট্রের গঠন সম্পর্কে আলোচনা করে এবং বিভিন্ন রাষ্ট্র পূর্বোক্ত সামাজিক ঐক্য এবং সহযোগিতার আদর্শের দিকে নাগরিকবৃন্দকে কতখানি পরিচালিত করছে তারই পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রের দোষত্রুটি বিচার করে। সুতরাং রাষ্ট্রবিজ্ঞান সেই আদর্শের দ্বারাই পরিচালিত হয়, যে আদর্শ বস্তুতঃ সমাজদর্শনই বিচার ও নির্ণয় করে। সমাজদর্শনেরও আদর্শ হল সামাজিক ঐক্য, সামাজিক সঙ্গতি এবং সমাজস্থ ব্যক্তিদের পারস্পরিক সহযোগিতায় লব্ধ জনকল্যাণ। একথা ঠিক যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিধি সীমাবদ্ধ, যেহেতু একমাত্র মানুষের রাজনৈতিক সম্বন্ধের মাধ্যমেই এই আদর্শের দ্বারা তাকে পরিচালিত হতে হয়। সমাজদার্শনিক আদর্শ সমাজের পক্ষে অপরিহার্য যে সকল বিষয় নির্ধারণ করে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর পক্ষে সেগুলিকে উপেক্ষা করা কোন মতেই সম্ভব হয় না। সমাজদর্শনের নির্ণীত আদর্শ থেকে দূরে সরে গেলে রাষ্ট্রের অধিবাসীদের জীবনের ওপর অবাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। কোন রাজনৈতিক নেতা যদি আদর্শশূন্য হয়ে নিজের

সমাজদর্শনের আদর্শ রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে পরিচালিত করে

খেয়াল-খুশিমত রাষ্ট্র পরিচালনা করে তবে রাষ্ট্রে অব্যবস্থা এবং অরাজকতা দেখা দিতে বাধ্য।

সমাজদর্শন ব্যক্তির সামাজিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করে তার মূল্য নির্ধারণ করে। কিন্তু কোন-না-কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে থেকেই ব্যক্তি তার সামাজিক জীবন যাপন করে। সুতরাং এইসব রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য এবং তাৎপর্য সম্পর্কে অবহিত না হলে ব্যক্তির সামাজিক সম্পর্ক সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া এবং সমাজের আদর্শ নির্ধারণ করা সমাজ-দার্শনিকের পক্ষে সম্ভব নয়।

সমাজদর্শন ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মধ্যে যথেষ্ট যোগাযোগ থাকা সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। সমাজদর্শন সকল প্রকার সামাজিক সম্বন্ধ ও সংগঠন নিয়ে আলোচনা করে। এক হিসেবে রাষ্ট্র, পরিবার, ধর্ম, নীতিবোধ, কলা সব কিছুই সমাজদর্শনের আলোচ্য বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞান মাত্র একপ্রকার সামাজিক কার্যকলাপ অর্থাৎ রাষ্ট্রনৈতিক কার্যকলাপ নিয়ে আলোচনা করে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক কার্যকলাপ, রাষ্ট্রের উৎপত্তি, রাষ্ট্রের প্রকৃতি, রাষ্ট্রের শাসনযন্ত্র ইত্যাদি। বর্তমান যুগে রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রধানতঃ তিনটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করে, যথা—(১) রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা এবং যে সকল বিষয়ের ওপর এদের উৎপত্তি নির্ভরশীল সেই বিষয়গুলি, (২) রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য এবং রাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থার নৈতিক ভিত্তি এবং (৩) শাসনব্যবস্থা পরিচালনার কায়দা-কানুন। প্রথম এবং তৃতীয় বিষয়ের সঙ্গে সমাজদর্শনের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই। তার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক দ্বিতীয় বিষয় নিয়ে অর্থাৎ বিভিন্ন শাসনব্যবস্থার উদ্দেশ্য ও আদর্শ নিয়ে। সমাজদর্শনের প্রধান আলোচ্য বিষয় সমাজ-জীবনে মানুষের উদ্দেশ্য, আদর্শ, মূল্য ও মানুষের সামাজিক ঐক্য এবং এদের সাহায্যে সামাজিক তথ্যের মূল্যাবধারণ।

সমাজদর্শন ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য

(ঘ) সমাজদর্শন ও নীতিবিজ্ঞান (Social Philosophy and Ethics):

সমাজদর্শনের সঙ্গে অন্যান্য জ্ঞানের শাখার সম্পর্কের তুলনায় নীতিবিজ্ঞানের সঙ্গে এর সম্পর্ক সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ। সমাজদর্শন সমাজের মৌলিক নীতি এবং ধারণাগুলির যৌক্তিকতা বিচার করে ও মূল্যাবধারণ করে। সমাজদর্শন মূল্য, উদ্দেশ্য এবং আদর্শ (Value, Ends and Ideals) নিয়ে আলোচনা করে এবং মানুষের ঐক্যের (Unity of Mankind) আলোকে মানুষের সামাজিক জীবনের বিশেষ দিকগুলির তাৎপর্য ব্যাখ্যা

সমাজদর্শন ও নীতি-বিজ্ঞানের স্বরূপ

করার জন্য সচেষ্ট হয়। নীতিবিজ্ঞান সমাজে বসবাসকারী মানুষের আচরণের ভালত্ব ও মন্দত্ব নৈতিক আদর্শের আলোকে বিচার করে। এজন্য নীতিবিজ্ঞানকে মানুষের জীবনের নৈতিক আদর্শ অর্থাৎ পরমকল্যাণ বা পরমার্থের স্বরূপটি নির্ধারণ করতে হয়।

সমাজদর্শন ও নীতিবিজ্ঞানের মধ্যে সাদৃশ্য হল যে, উভয়ই আদর্শনিষ্ঠ (Normative) এবং উভয়ই মনুষ্য-জীবনের আদর্শ, মূল্য এবং উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে চায়। সমাজদর্শন ও নীতিবিজ্ঞান উভয়েরই কাজ হল সমাজস্থ মানুষ নিয়ে। যে আদর্শ সমাজদর্শন নির্ধারণ করতে চায় সে-আদর্শ সমাজের ব্যক্তিদের জন্যই প্রয়োজন। নীতিবিজ্ঞান পরম-কল্যাণের বা পরমার্থের যে আদর্শটি নির্ধারণ করতে চায় তাও প্রয়োজন সমাজস্থ ব্যক্তিদের আচরণ নিয়ন্ত্রিত করার জন্য। সমাজদর্শন ও নীতিবিজ্ঞান উভয়েই সমাজকেন্দ্রিক।

সমাজদর্শন ও নীতিবিজ্ঞানের মধ্যে সাদৃশ্য

এক হিসেবে সমাজদর্শন ও নীতিবিজ্ঞান একই আদর্শ নিয়ে আলোচনা করে। সমাজদর্শনের আদর্শ হল জনকল্যাণ (Common Good)। এই জনকল্যাণের আদর্শ নীতিবিজ্ঞানের পরমকল্যাণের আদর্শ বা পরমার্থ থেকে পৃথক বা বিযুক্ত নয়। নীতিবিজ্ঞান ব্যক্তিবিশেষের দিক থেকেই এই পরমার্থের স্বরূপ নির্ধারণ করতে চায়। কিন্তু মানুষ সামাজিক জীব এবং তার সমাজ-বহির্ভূত পৃথক কোন সত্তা নেই। সে কারণে নীতিবিজ্ঞানে পূর্ণতাবাদীরা (Perfectionists) স্পষ্টই প্রকাশ করেছেন যে, মানুষের ব্যক্তিগত কল্যাণ বা জনকল্যাণের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। মানুষের পরমকল্যাণ হল তার সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ এবং এই কল্যাণ জনকল্যাণের বিরোধী নয় ; বরং এক হিসেবে তা জনকল্যাণেরই অঙ্গ বা অংশবিশেষ।

উভয়ই এক আদর্শ নিয়ে আলোচনা করে

পূর্বোক্ত সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও সমাজদর্শন ও নীতিবিজ্ঞানের মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে পার্থক্য বর্তমান। সমাজদর্শনের কাজ সমাজ নিয়ে বা সমষ্টিগত চেতনার বিকাশ নিয়ে, আর নীতিবিজ্ঞানের কাজ সমাজস্থ ব্যক্তি-চেতনার বিকাশ নিয়ে। সমাজদর্শন হল ব্যক্তি-নিরপেক্ষ মানসিক জ্ঞানের শাখা (Objective Mental Study), যেহেতু সমাজদর্শন যেসব বিষয়গুলি আলোচনা করে সেগুলি নিছক মানসিক প্রক্রিয়া নয়, প্রক্রিয়ার বস্তুগত রূপ ; যেমন—সমাজের নিয়ম-কানুন, আচার ব্যবহার, রীতিনীতি, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি। নীতিবিজ্ঞান হল ব্যক্তিসাপেক্ষ মানসিক বিদ্যা (Subjective Mental Science), যেহেতু নীতিবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় মানুষের কামনা, বাসনা, সঙ্কল্প, অভিপ্রায় ইত্যাদি।

সমাজদর্শন ও নীতিবিজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য

বস্তুতঃ, সমাজদর্শন ও নীতিবিজ্ঞান পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল এবং একটি অপরটির পরিপূরক। সমাজদর্শন সামাজিক নিয়ম ও অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের নৈতিক মূল্য নিরূপণ করে। সামাজিক উন্নতির প্রকৃতি নির্ধারণের জন্য সমাজদর্শনকে নৈতিক নীতিগুলি প্রয়োগ করতে হয়। কাজেই সমাজদর্শনকে নীতিবিজ্ঞানের সহায়তা গ্রহণ করতে হয়। আবার সমাজদর্শন যে আদর্শটি নির্ধারণ করে তা নীতিসঙ্গত হওয়া প্রয়োজন এবং এর জন্য নীতিবিজ্ঞানের ওপর তাকে নির্ভর করতে হয়। নীতিবিজ্ঞান ব্যক্তির আচরণের ভালত্ব ও মন্দত্ব বিচার করে। কিন্তু সামাজিক সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন করে ব্যক্তির আচরণকে কখনও বিচার করা যায় না। সামাজিক জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যক্তির আচরণই নীতিবিজ্ঞানের বিচার্য বিষয় এবং যেহেতু সামাজিক সম্পর্কের অর্থ ও মূল্য নিরূপণ করা সমাজদর্শনের কাজ, সেহেতু নীতিবিজ্ঞানকে সমাজদর্শনের ওপর নির্ভর করতে হয়। তাছাড়া, নীতিবিজ্ঞান ব্যক্তির পরম কল্যাণের যে আদর্শটির স্বরূপ নির্ধারণ করে, সমাজস্থ মানুষের পারস্পরিক সম্বন্ধের পরিপ্রেক্ষিতেই তাকে নির্ধারণ করে। সমাজদর্শনের কাজ মানুষের এই পারস্পরিক সম্পর্কের ফলে উদ্ভূত যে সমাজ, পরিবার, রাষ্ট্র, সঙ্ঘ ও প্রতিষ্ঠান, সেগুলির যৌক্তিকতা বিচার ও মূল্যাবধারণ। সুতরাং নীতিবিজ্ঞানকে পরোক্ষভাবে সমাজদর্শনের ওপর নির্ভর করতে হয়।

নীতিবিজ্ঞান ও সমাজদর্শন পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল

আর একটি বিষয়ে নীতিবিজ্ঞানের সঙ্গে সমাজদর্শনের সম্পর্ক বর্তমান। ম্যাকেঞ্জি (Mackenzie) বলেন, 'সমাজদর্শন মানুষের সামাজিক ঐক্যের ওপর বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।'[1] মানুষের সামাজিক ঐক্য তখনই সম্ভব ও দৃঢ় হয় যখন তা কোন আদর্শকে অবলম্বন করে বর্তমান থাকে এবং সমাজব্যবস্থাকে সেই আদর্শ অনুযায়ী গঠন করা হয়। সমাজদর্শন যে জনকল্যাণের আদর্শ বা যে আদর্শ সমাজের কথা বলে তা যদি মানুষের ব্যক্তিগত কল্যাণের বিরোধী হয় বা মানুষের পরমার্থ লাভের পক্ষে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় তাহলে তা কখনও কার্যকর হতে পারে না। সে কারণে নীতিবিজ্ঞানসম্মত উপায়ে জনকল্যাণের আদর্শকে রূপ দেবার চেষ্টা না করলে সমাজদর্শন মানুষের যে সামাজিক ঐক্যের কথা বলে তা লাভ করা সম্ভব নয়।

সুতরাং বলা যেতে পারে যে, সমাজদর্শনের সঙ্গে নীতিবিজ্ঞানের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ।

---

1. "Social Philosophy, in particular, concentrates its attention on the social unity of mankind" – Mackenzie : Outlines of Social Philosophy.

(ঙ) সমাজদর্শন কি নীতিবিজ্ঞানের উপাঙ্গ ? (Is Social Philosophy a mere appendage to Ethics) :

গ্রীক দার্শনিক প্লেটো (Plato) এবং অ্যারিস্টটল (Aristotle) যেমন সমাজদর্শনকে নীতিবিজ্ঞানের বাড়তি অংশরূপে গণ্য করেছেন তেমনি কেউ কেউ মনে করেন যে, সমাজদর্শনকে স্বতন্ত্র শাস্ত্ররূপে গণ্য করা চলে না। সমাজদর্শন নীতিবিজ্ঞানের উপাঙ্গ (appendage) ছাড়া কিছুই নয়। তাঁদের মতে সামাজিক সংগঠন ও সম্পর্কের ক্ষেত্রে নৈতিক আদর্শকে প্রয়োগ করে সামাজিক সংগঠন ও সম্পর্কের অর্থ ও মূল্য নির্ধারণ করাই সমাজদর্শনের একমাত্র কাজ। বস্তুতঃ, হবহাউস (Hobhouse) উপরিউক্ত অভিমতের সমর্থক। তাঁর মতানুসারে সামাজিক এবং রাজনৈতিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান লক্ষ্য লাভের উপায়মাত্র ; তাদের নিজেদেরই লক্ষ্যরূপে গণ্য করা চলে না, সামাজিক জীবনের উপায়-স্বরূপ তাদের গণ্য করা চলে। তারা কোন্ ভাবের পোষক, তারই ভিত্তিতে তাদের ভালত্ব ও মন্দত্ব বিচার্য। হবহাউসের মতে নীতিবিদ্যা হল লক্ষ্য বা মূল্যের মতবাদ, তাকে সামাজিক সম্পর্ক বা ব্যক্তির আচরণ যার মধ্য থেকেই পাওয়া যাক না কেন। হবহাউসের পদ্ধতি হল প্রথমে লক্ষ্য বা আদর্শ সম্পর্কে মতবাদ প্রতিষ্ঠা করা এবং তারপর সামাজিক সংগঠনের নীতিগুলিকে অবরোহাত্মক পদ্ধতিতে তা থেকে নিঃসৃত করা। সামাজিক এবং রাজনৈতিক সংস্কারের যে নৈতিক ভিত্তির প্রয়োজন আছে ইংলণ্ডে বেন্থাম (Bentham) এবং মিল (Mill) দার্শনিকবৃন্দ সর্বপ্রথম তার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছিলেন।

সমাজদর্শন যে সামাজিক ঘটনা ও সম্পর্কের তাৎপর্য নিরূপণের জন্য নৈতিক আদর্শের সহায়তা গ্রহণ করে না তা নয়। [1]গিনসবার্গ (Ginsberg) স্পষ্টই বলেছেন যে, সমাজ-দর্শনের দুটি অংশ আছে—একটি সমালোচনার দিক (critical or logical) এবং অপরটি গঠনমূলক বা সংযোগাত্মক দিক (constructive or synthetic)। দ্বিতীয় অংশটির কাজ সামাজিক আদর্শের সত্যতা নিয়ে আলোচনা করা। এই দিক থেকে বিচার করলে সমাজদর্শনের কাজ বিভিন্ন সমস্যার ক্ষেত্রে নীতিবিজ্ঞানের ফলাফলগুলি প্রয়োগ করা।

যেমন, সামাজিক উন্নতির প্রশ্নের ক্ষেত্রে সমাজে যা কিছু ঘটছে তাকে নৈতিক আদর্শের মানদণ্ডের সহায়তায় বিচার করার প্রশ্ন দেখা দেয়। ম্যাকেঞ্জি (Mackenzie) সমাজদর্শনের ও নীতিবিজ্ঞানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন যে, সমাজ-

---

1. Ginsberg: Sociology, Page, 26

দর্শনকে নীতিবিজ্ঞানের অংশরূপে অভিহিত করা যেতে পারে কিংবা নীতিবিজ্ঞানকে এর অংশরূপে অভিহিত করা যেতে পারে।" কিন্তু তাঁর মতে সমাজদর্শন ও নীতিবিজ্ঞানকে পৃথক শাস্ত্ররূপে গণ্য করা যুক্তিযুক্ত ; কারণ দুটি স্বতন্ত্র শাস্ত্ররূপে গণ্য হওয়ার জন্য উভয়-ক্ষেত্রেই পর্যাপ্ত মালমশলা পাওয়া যাবে।[1] অধ্যাপক কোলও (Prof. Cole) ম্যাকেঞ্জিকে এই বিষয়ে সমর্থন করেছেন। তাঁর মতে সমাজদর্শন নীতিবিজ্ঞানের অধীনস্থ নয়, বরং নীতিবিজ্ঞানের পরিপূরক।[2]

আমাদের মতেও সমাজদর্শনকে নীতিবিজ্ঞানের উপাঙ্গরূপে গণ্য না করে তাকে পৃথক শাস্ত্ররূপে গণ্য করা উচিত, কারণ সামাজিক ঘটনার নৈতিক তাৎপর্য নিরূপণই সমাজ-দার্শনিকের একমাত্র কাজ নয়। তাছাড়া সমাজদর্শনের সমালোচনামূলক দিকটিও উপেক্ষার বিষয় নয়।

(চ) সমাজদর্শন ও দর্শন (Social Philosophy and Philosophy):

ওয়েবার (Weber) দর্শনের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন যে, "দর্শন হল প্রকৃতির বিষয়ে এক সামগ্রিক দৃষ্টিলাভের অনুসন্ধান, বস্তুর সার্বিক ব্যাখ্যা দেবার প্রচেষ্টা।"[3]

সমাজদর্শনের প্রকৃতি

জগৎ এবং জীবনের স্বরূপ ব্যাখ্যা এবং তার মূল্যাবধারণই-দার্শনিকের কাজ। দর্শনের লক্ষ্য এই জগৎ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও সুসংহত এবং মানুষের সঙ্গে এই জগতের সম্পর্কবিষয়ক জ্ঞান দান করা। অর্থাৎ কিনা জগৎ ও জীবন সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস ও ধারণাগুলির যৌক্তিকতা বিচার করে এই বিশ্বজগৎ সম্পর্কে একটা যুক্তিযুক্ত ও সুসংবদ্ধ ধারণা দেওয়া এবং মানুষের জীবনের প্রকৃত অর্থ ও মূল্য নিরূপণ করে জগতের সঙ্গে তার সম্পর্ক নির্ধারণ করাই দর্শনের কাজ।

তত্ত্ববিদ্যা ও জ্ঞানবিদ্যার প্রকৃতি

দর্শনের একটি প্রধান বিভাগ হল অধিবিদ্যা (Metaphysics) বা তত্ত্ববিদ্যা যা বস্তুর বাহ্যরূপের অন্তরালে অবস্থিত আন্তর সত্তাটি নির্ণয় ক'রে বস্তুর যথাযথ স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনা করে। অধিবিদ্যা আলোচনা করে—বিশ্বজগতে যাবতীয় বস্তু কি কোন চরম সত্তার প্রকাশ? দ্রব্য, মন, প্রাণ এগুলির যথার্থ স্বরূপ কী? আত্মার যথাযথ স্বরূপ কী? ঈশ্বরের প্রকৃতি ও তাঁর

1. Mackenzie: Outlines of Social Philosophy; Pages. 16-17
2. Cole; Social Theory.
3. 'Philosophy is the search for a comprehensive view of nature, an attempt at a universal explanation of things'—Weber.

গুণাবলীর স্বরূপ কী? ঈশ্বরের সঙ্গে জীব ও জগতের সম্পর্ক কী? দর্শনের অপর একটি বিভাগ হল জ্ঞানবিদ্যা (Epistemology), যা জ্ঞানের স্বরূপ, উৎপত্তি, সম্ভাবনা, সীমা এবং যাথার্থ্য নিয়ে আলোচনা করে।

সমাজদর্শনের স্বরূপ

গিসবার্ট (Gisbert)-এর মতে সমাজদর্শনের কাজ হল বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞানে ব্যবহৃত সমাজ-জীবনের মৌলিক নীতিগুলিকে এবং ধারণাগুলিকে জ্ঞানের ও মূল্যের দিক থেকে আলোচনা করা। এছাড়া সমাজদর্শন সামাজিক বিজ্ঞানগুলির ফলাফলগুলিকে সংযুক্ত করে এবং জ্ঞান জগতে এই সংযোগের স্থান নির্দেশ করে।

গিসবার্টের মন্তব্য

দর্শনের স্বরূপ ও প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করলে আমাদের মনে হবে দর্শনের কাজ মূলতঃ তাত্ত্বিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা। কাজেই তার থেকে মনে হতে পারে যে, সমাজদর্শন সমাজ-জীবনের যে সব সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে তার সঙ্গে দর্শনের কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই। কিন্তু দার্শনিক গিসবার্ট বলেন, "সমাজদর্শন সমাজ-বিজ্ঞান ও দর্শনের মিলনস্থল এবং সমাজ-দর্শন উভয়েরই অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।'

সমাজদর্শন কি দর্শনের শাখা—মতবিভেদ

প্রশ্ন হল, সমাজদর্শনকে কি দর্শনের একটি প্রকৃত শাখরূপে গণ্য করা যেতে পারে? এ সম্পর্কে মতবিভেদ আছে। কোন কোন চিন্তাবিদ দর্শনের আলোচনার পরিসরকে সীমিত করে সমাজদর্শনকে দর্শনের শাখারূপে গণ্য না করার পক্ষপাতি। তাঁদের মতে দর্শেনর কাজ মূলতঃ রূপবিদ্যা (Phenomenology), অধিবিদ্যা (Metaphysics), জ্ঞানবিদ্যা (Epistemology), এবং আদর্শবিদ্যা বা মূল্যবিদ্যা (Axiology) সম্পর্কীয় প্রশ্নের অলোচনা করা। সুতরাং সমাজদর্শনকে দর্শনের শাখারূপে গণ্য না করাই যুক্তিসঙ্গত।

সমজদর্শনকে দর্শনের শাখা গণ্য করা যেতে পারে

কিন্তু আবার কেউ কেউ মনে করেন যে, সমাজদর্শনকে অবশ্যই দর্শনের শাখা হিসেবে গণ্য করা উচিত, কেননা দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সামাজিক বিষয়ের ব্যাখ্যা দেওয়া ও মূল্যাবধারণ করা সমাজদর্শেনের কাজ। দর্শনের কাজ অভিজ্ঞতার অর্থ, তাৎপর্য ও মূল্য নিরূপণ করা। সমাজদর্শন হল সমাজবিজ্ঞান এবং দর্শনের মিলনক্ষেত্র। আমাদের মতে দর্শনের পরিসরকে একটু ব্যাপক দৃষ্টিতে দেখে সমাজদর্শনকে দর্শনের শাখারূপে গণ্য করা যেতে পারে।

দর্শন ও সমাজদর্শনের পারস্পরিক সম্বন্ধ আলোচনাকালে উপরিউক্ত সিদ্ধান্তের তাৎপর্য আরও বেশী অর্থবহ হয়ে উঠবে। দর্শন ও সমাজদর্শনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান।

সমাজদর্শন সামাজিক সম্বন্ধের ব্যাখ্যা দিতে চায়, এবং এর জন্য প্রয়োজন সামাজিক পরিবেশের নিবিড় জ্ঞান। সামাজিক পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে সামাজিক সম্বন্ধের নির্ভুল ও যথাযথ ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়। আবার সামাজিক পরিবেশের যথার্থ জ্ঞানের জন্য এই জগৎ সংহতির (world system) এবং এই জগতের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের জ্ঞানলাভের প্রয়োজন আছে। কিন্তু সেক্ষেত্রে সমাজদর্শনকে দর্শন ও তত্ত্ববিদ্যার রাজ্যে প্রবেশ করতে হবে।

দর্শন ও সমাজদর্শনের স্বরূপ

সমাজদর্শনের দুটি অংশ আছে—জ্ঞানের দিক এবং অপরটি হল মূল্যের দিক। সমাজদর্শনের মূল্য সম্পর্কীয় দিকটির কাজ হল সমাজ-জীবনের পরম মূল্য নির্ধারণ করা এবং কিভাবে তাদের লাভ করা যায় সে উপায় নির্ধারণ করা। কিন্তু মূল্যের আলোচনা করতে গিয়ে সমাজদর্শনকে সাধারণভাবে মূল্যের, বিশেষ করে সত্য, শিব ও সুন্দর এই পরম মূল্যের আলোচনা করতে হয়, সেক্ষেত্রে সমাজদর্শনকে দর্শন ও তত্ত্ববিদ্যার রাজ্যে প্রবেশ করতে হয়।

সমাজদর্শন আরও এক কারণে দার্শনিক প্রদত্ত জগৎ ব্যাখ্যাকে অগ্রাহ্য করতে পারে না। কেননা দার্শনিক প্রদত্ত এই জগৎ ব্যাখ্যা সমাজদার্শনিকের সামাজিক ঘটনার ব্যাখ্যা ও মূল্যাবধারণকে প্রভাবিত করে। কেননা কোন সমাজদার্শনিক যদি হন জড়বাদী, আবার কোন সমাজদার্শনিক যদি হন ভাববাদী, তাহলে সামাজিক ঘটনার তাৎপর্য বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা ও তার মূল্যাবধারণ ভিন্ন হতে বাধ্য।

সুতরাং আমাদের মতে সমাজদর্শন ও দর্শনের সম্বন্ধ খুবই ঘনিষ্ঠ। সমাজদার্শনিকের প্রদত্ত ব্যাখ্যা তখনই সন্তোষজনক মনে হবে যখন দেখা যাবে যে, সেই ব্যাখ্যা জগতের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের যুক্তিসঙ্গত মতবাদের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

তাহলে সমাজদর্শনের সঙ্গে দর্শনের পার্থক্য কোথায়? দর্শনের পরিসর সমাজদর্শনের পরিসরের তুলনায় অনেক ব্যাপক। দর্শনের কাজ মানুষের সামগ্রিক অভিজ্ঞতার অর্থ তাৎপর্য ও মূল্যনির্ধারণ করা। সমাজদর্শনের কাজ শুধুমাত্র সামাজিক ঘটনার অর্থ, তাৎপর্য ও মূল্য নিরূপণ করা। দর্শনের লক্ষ্য হল তাত্ত্বিক; সমাজদর্শনের লক্ষ্য হল তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক উভয়ই। সমাজদর্শন সামাজিক সম্পর্কের তাৎপর্য নিরূপণ করে, জনকল্যাণের আদর্শ নিরূপণ করে, মানুষকে তাদের অধিকার এবং কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে এবং তাদের সৎ ও দায়িত্বশীল নাগরিক রূপে সমাজ-জীবনে বসবাস করতে সহায়তা করে।

উভয়ের পার্থক্য

দ্বিতীয় অধ্যায়

সামাজিক গোষ্ঠী, সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং সঙ্ঘ
(Social Groups, Social Institutions and Associations)

১। ভূমিকা (Introduction) :

সমাজ হল একটা বৃহত্তর সামাজিক সংগঠন, যা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামাজিক সংগঠনের দ্বারা গঠিত। এগুলিকে বলা হয় সামাজিক গোষ্ঠী (Social groups)। সমাজের স্বরূপ এবং ব্যক্তির সামাজিক জীবন সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান অর্জন করতে হলে সামাজিক গোষ্ঠী-গুলির জ্ঞান একান্তই প্রয়োজনীয়। কারণ, যদিও ব্যক্তি সাধারণভাবে সমাজের অন্তর্ভুক্ত, তাদের দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপ সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যেই সম্পাদিত হয়। ব্যক্তির সামাজিক জীবনে সামাজিক গোষ্ঠীগুলির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সামাজিক গোষ্ঠীগুলি ব্যক্তির জীবনে পরিবর্তন আনে, চরিত্র গঠন করে এবং ব্যক্তির অভ্যাস, বিশ্বাস ও চিন্তাধারার ওপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে। বস্তুতঃ, বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর মাধ্যমেই ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে।

২। সামাজিক গোষ্ঠীর স্বরূপ (Nature of Social groups) :

গোষ্ঠীর প্রকৃতি

সামাজিক গোষ্ঠী কাকে বলে ?[1] বিশেষ উদ্দেশ্য লাভের জন্য সঙ্ঘবদ্ধ একাধিক ব্যক্তির সমষ্টিকেই সামাজিক গোষ্ঠী বলা হয়। গিস্‌বার্ট (Gisbert) বলেন, "সামাজিক গোষ্ঠী হল ব্যক্তির সমষ্টি, যারা একটি স্বীকৃত সংগঠনের মধ্যে থেকে পরস্পরের ওপর কার্য করে"।[2] যেমন—কোন রাজনৈতিক দল বা কোন ফুটবল ক্লাব।

---

1. ম্যাকাইভার ও পেইজ (MacIver and Page) বলেন, গোষ্ঠী বলতে আমরা বুঝি কোন সামাজিক ব্যক্তির সমষ্টি, যারা পরস্পরের সঙ্গে নির্দিষ্ট সামাজিক সম্পর্কে সম্পর্কযুক্ত। আমরা যেভাবে বুঝি তাতে গোষ্ঠীর অর্থ হচ্ছে এর ব্যক্তিদের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ' ("By a group we mean any collection of social beings who enter into distinctive social relationship with one another. A group, then as we understand it, involves reciprocity between its members.")

—MacIver and Page : Society, Page 14

2. "A social group is a collection of individuals, interacting on each other unedr a recognizable structure."

—Gisbert : Fundamentals of Sociology, Page 25

কতকগুলি ব্যক্তির সমষ্টি মাত্রকেই সামাজিক গোষ্ঠী বলা চলে না। সমাজবিজ্ঞানের দিক থেকে এ জাতীয় সমষ্টির সঙ্গে কোন জড় দ্রব্যের সমষ্টির পার্থক্য নেই, যেহেতু গোষ্ঠীর সভ্যদের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক নেই। ব্যক্তিদের মধ্যে পারস্পরিক চেতনা না থাকলে সামাজিক গোষ্ঠীর কোন অস্তিত্বও নেই। যখন সমষ্টির বিভিন্ন অংশের মধ্যে সুস্পষ্ট সামাজিক সম্পর্ক থাকে এবং একটা স্বীকৃত সংগঠনের মধ্যে থেকে কোন সাধারণ স্বার্থ বা লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে ব্যক্তিরা পরস্পরের ওপর কার্য করে তখনই সামাজিক গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটে। সামাজিক গোষ্ঠী হল এক 'মানসিক সামাজিক ঐক্য' (psycho-social unity) এবং যান্ত্রিক সমষ্টি থেকে সব সময়ই পৃথক।

সমাজ (Society) এবং সামাজিক গোষ্ঠীর (Social groups) মধ্যে প্রভেদ আছে। যে-কোন সামাজিক গোষ্ঠীকেই সমাজ বলে গণ্য করা যেতে পারে না। সামাজিক গোষ্ঠীর তুলনায় সমাজের স্থায়িত্ব এবং সংগঠন অনেক বেশী।

সামাজিক গোষ্ঠীর সঙ্গে 'আপাত-গোষ্ঠী'র (Quasi-Group) পার্থক্য আছে। সামাজিক গোষ্ঠীর একটা নির্দিষ্ট সংগঠন আছে, যা সকলের স্বীকৃতি লাভ করে; আপাত-গোষ্ঠীর বেলায় এরূপ কোন স্বীকৃত সংগঠন নেই। অবশ্য আপাত-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তির মধ্যে অনেক বিষয়ে হয়ত সাদৃশ্য থাকতে পারে। যেমন—একই ব্যবসায় নিযুক্ত যে জনসমষ্টি, যাদের পেশাগত উদ্দেশ্য এক, কিন্তু যাদের নির্দিষ্ট কোন সংগঠন নেই। যখনই এসব ব্যক্তি সংগঠনের মাধ্যমে নিজেদের সংগঠিত করে তখনই আপাত-গোষ্ঠী সামাজিক গোষ্ঠীর স্তরে উন্নীত হয়। অনেক সময় দেখা যায় অর্থনৈতিক, সামাজিক বা রাজনৈতিক কারণবশতঃ ব্যবসায়ীরা দলবদ্ধ হয়ে এক সুদৃঢ় সংগঠনের মাধ্যমে নিজেদের দাবী-দাওয়াকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সচেষ্ট হয় এবং এর ফলে সামাজিক-গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়।

সমাজ ও সামাজিক গোষ্ঠী এবং আপাত-গোষ্ঠী

৩। গোষ্ঠী-জীবনের কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য (Some general characteristics of group life):

গোষ্ঠী তার অন্তর্ভুক্ত সভ্যদের মনে এক অখণ্ডতা বা সমগ্রতার চেতনা সৃষ্টি করে। যখন কোন ব্যক্তি কোন গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয় বা তার মধ্যে থেকে কাজ করে তখন সে উপলব্ধি করে যে, সে কেবল নিজেকে নিয়েই কেন্দ্রীভূত নয়, সে এক অখণ্ড সমগ্রতার অংশস্বরূপ যা কোন কোন সময় তার ব্যক্তিগত ইচ্ছার বিরুদ্ধেও কাজ করতে পারে। যখন সমস্ত পরিবারটিই কোন একটি কার্য করার জন্য সংকল্পবদ্ধ তখন সেই পরিবারের

গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত সভ্যদের মনে সমগ্রতার চেতনা

অন্তর্ভুক্ত কোন বিশেষ সভ্য উপলব্ধি করতে পারে যে, এই ব্যাপারে তার অনিচ্ছার বিশেষ কোন গুরুত্ব নেই। ব্যক্তি উপলব্ধি করে যে, গোষ্ঠী তার থেকে বড় এবং তার স্বাধীনভাবে কাজ করার অধিকার আছে।

গোষ্ঠীর সভ্যবৃন্দ আরও অবহিত হয় যে, গোষ্ঠী তার অন্তর্ভুক্ত সভ্যদের কার্যকলাপের ওপর চাপ দিতে পারে। ব্যক্তির ওপর এই চাপ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আসতে পারে। ব্যক্তি উপলব্ধি করে যে স্বাধীনভাবে খুশিমত যে-কোন কাজ করা তার পক্ষে সম্ভব নয় এবং সমষ্টিগত স্বার্থের সংরক্ষণের জন্য ব্যক্তি-স্বার্থকে অনেক সময় বিসর্জন দিতে হয় বা ব্যক্তিকে স্বার্থমূলক কার্য সম্পাদন থেকে বিরত থাকতে হয়। অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যক্তি গোষ্ঠীর স্বার্থকেই নিজের স্বার্থ বলে মনে করে এবং তার সঙ্গেই নিজেকে অভিন্ন মনে করে।

ব্যক্তির ওপর গোষ্ঠীর চাপ

সামাজিক গোষ্ঠী তার সভ্যদের মধ্যে একটা দলীয় মনোভাব (group spirit) বা চেতনার সঞ্চার করে। গোষ্ঠীর সভ্যবৃন্দ পরস্পরের সাহচর্য পছন্দ করে, পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ও শ্রদ্ধাশীল হয়, গোষ্ঠীর সাধারণ জীবনের অংশীদার মনে করে গর্বিত বোধ করে। প্রতিটি সভ্যই গোষ্ঠীর মধ্যে থেকে একটা স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে। এই মনোভাবে উদ্‌বুদ্ধ হয়েই ব্যক্তি নিজের স্বার্থের কথা বিস্মৃত হয়ে গোষ্ঠীর বৃহত্তর স্বার্থের সঙ্গে নিজের স্বার্থকে অভিন্ন মনে করে।

দলীয় মনোভাব

গোষ্ঠী-জীবন তার সভ্যদের মধ্যে এই চেতনা আনে যে, যারা এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত নয় সেইসব ব্যক্তিদের সঙ্গে তাদের কোথায় যেন কিছু পার্থক্য আছে। গোষ্ঠীর যারা সভ্য এবং গোষ্ঠীর যারা সভ্য নয়—উভয়ের মাঝে যে একটা ব্যবধান আছে, এ বোধ তাদের মধ্যে জাগ্রত হয়।

সভ্য হওয়ার চেতনা

পরস্পরের আবেদনে সাড়া দেওয়া, পরস্পরের ভাব-বিনিময়ে ক্রিয়া করা সামাজিক গোষ্ঠীর সংহতি বা ঐক্যের ভিত্তিস্বরূপ। গোষ্ঠীর সভ্যদের মধ্যে প্রথম শুরু হয় সংযোগ বা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, কিন্তু অচিরেই সভ্যরা উপলব্ধি করে যে, পারস্পরিক স্বীকৃতির প্রয়োজন। অপরের আচরণের সঙ্গে নিজের আচরণের সামঞ্জস্য সাধন, গোষ্ঠীর সাধারণ উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যের কথা স্মরণে রেখে পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা গোষ্ঠীর সংহতি বা ঐক্য সংরক্ষণের জন্য একান্ত প্রয়োজন। মোটামুটি স্থায়ী কোন গোষ্ঠীর সভ্যদের মধ্যে এই পারস্পরিক আদান-প্রদানের ভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। যেমন—পরিবারে মাতাপিতা সন্তানের

পরস্পর ভাব-বিনিময়ে ক্রিয়া

ভরণ-পোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং সন্তান মাতাপিতার প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি প্রদর্শন করে তার প্রতিদান দেয়।

প্রত্যেক সামাজিক গোষ্ঠীই কিছু সাধারণ সম্পত্তির মালিক। এই সম্পত্তি জাগতিক বস্তু হতে পারে বা ভাবমূলক আধ্যাত্মিক কিছু হতে পারে। নির্দিষ্ট বাসস্থান, অট্টালিকা, পতাকা, এক বা একাধিক লক্ষ্য এই জাতীয় সম্পত্তির উদাহরণ।

৪। সামাজিক গোষ্ঠীর শ্রেণীবিভাগ (Division of Social Groups):

নানা ভিত্তিতে গোষ্ঠীর শ্রেণীবিভাগ

বিভিন্ন আদর্শের মাপকাঠিতে এই সামাজিক গোষ্ঠীগুলিকে বিভিন্নভাবে শ্রেণীবিভক্ত করা যেতে পারে। যেমন—গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তির উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে বা ব্যক্তিদের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে বা গোষ্ঠীর স্থায়িত্বের ভিত্তিতে এবং আরও নানা ভিত্তিতে সামাজিক গোষ্ঠীর শ্রেণীবিভাগ হতে পারে। এই শ্রেণীবিভাগের মধ্যে যেগুলি উল্লেখযোগ্য সেগুলিই আমরা আলোচনা করব:

(১) প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং অন্তর্বর্তী গোষ্ঠী: কুলে (C. H. Cooley) সামাজিক গোষ্ঠীগুলিকে (১) প্রাথমিক গোষ্ঠী (Primary Groups) এবং (২) মাধ্যমিক গোষ্ঠী (Secondary Groups)—এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন।

প্রাথমিক গোষ্ঠী

প্রাথমিক গোষ্ঠীগুলিকে বলা হয় মুখোমুখী গোষ্ঠী (Face-to-Face Groups)। এ নামে অভিহিত করার একটা কারণও আছে। প্রাথমিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে যে সম্পর্ক বর্তমান, সে সম্পর্ক হল প্রত্যক্ষ এবং ঘনিষ্ঠ। মুখোমুখী পরিচয় তার বৈশিষ্ট্য। একটা নিবিড় সম্পর্ক এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে গড়ে ওঠে। পরিবার, ছোট শিশুদের খেলার দল, পাড়া ইত্যাদি প্রাথমিক গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন সভ্যরা পরস্পর মিলিত হয়ে এক আঙ্গিক ঐক্য গড়ে তোলে।

উল্লিখিত ছোট ছোট গোষ্ঠী ভিন্ন সমাজে অনেক বড় বড় গোষ্ঠী আছে। যেমন—ট্রেড ইউনিয়ন, ছাত্র সংগঠন, রাজনৈতিক দল, শিক্ষকদের সমিতি ইত্যাদি। এ-সব গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে একটা সাধারণ গোষ্ঠীচেতনা আছে এবং সেই চেতনা-উদ্ভূত একটা ঐক্যবোধও আছে। কিন্তু ব্যক্তিদের পরস্পরের মধ্যে যে সম্পর্ক, সে সম্পর্ক তত প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠ নয়। প্রাথমিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের মত এদের সকলের

মধ্যে কোন মুখোমুখী পরিচয় নেই। এ জাতীয় গোষ্ঠী হল মাধ্যমিক গোষ্ঠী (Secondary Groups)।

সমাজ জীবনে প্রাথমিক বা মুখোমুখি গোষ্ঠীগুলির (Primary or Face to-Face Groups) উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। পরিবারের পরেই এই প্রাথমিক গোষ্ঠীগুলি ব্যক্তির জীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। এসব ছোট ছোট স্থানীয় গোষ্ঠীগুলির (Local Groups) নীতি ও আদর্শ ব্যক্তির চরিত্রকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। অনেক সময় এসব প্রাথমিক গোষ্ঠী কোন বৃহত্তর সংগঠনের অঙ্গীভূত হয়েও নিজ বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে পারে। যেমন, 'কলেজ ক্রিকেট ক্লাব'। এই ক্ষুদ্র সংগঠনটি 'কলেজ'—এই বৃহত্তর সংগঠনের অঙ্গীভূত, কিন্তু 'কলেজ ক্রিকেট ক্লাব' হিসেবে তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। প্রাথমিক গোষ্ঠী কৃষ্টিমূলকও হতে পারে; যেমন, কোন সাংস্কৃতিক সংগঠন। প্রাথমিক গোষ্ঠীগুলি সুসংগঠিত হলে গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে দেখা যায় নিবিড় অন্তরঙ্গতা, পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস ও সহানুভূতি এবং পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করার আগ্রহ ও উৎসাহ। প্রাথমিক গোষ্ঠীর কোন সভ্য নিজের সঙ্গে সমস্ত গোষ্ঠীর একাত্মতা অনুভব করে। প্রাথমিক গোষ্ঠীর সভ্যদের মধ্যে 'আমরা' এই ভাবটা (we-feelling) খুব প্রবল হয়ে ওঠে এবং পরস্পর পরস্পরকে অত্যন্ত কাছে টেনে নিয়ে আসে। কোন প্রাথমিক গোষ্ঠী যদি অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্ত হয়, তাহলে সমাজ-জীবনে নানারকম দুর্নীতির আবির্ভাব ঘটে। কৃষ্টিমূলক প্রাথমিক গোষ্ঠীগুলি, যেমন—'সাহিত্য সংবাদ,, 'দর্শন-চক্র' প্রভৃতি যদি সুসংগঠিত হয় তবে এদের সভ্যদের মধ্যে সহযোগিতার ভাব খুবই প্রবল হয়, কারণ তারা তাদের লক্ষ্য সম্পর্কে যেমন সচেতন হয় তেমনই লক্ষ্যকে লাভ করার জন্যও যথেষ্ট সচেষ্ট হয়।

প্রাথমিক গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য

প্রাথমিক গোষ্ঠীগুলির বৈশিষ্ট্যই এমন যে, এর ব্যক্তির সংখ্যা সাধারণতঃ সীমিত হয়। বস্তুতঃ, গোষ্ঠীগুলির বৈশিষ্ট্যই এমন যে এর ব্যক্তির সংখ্যা সীমিত হওয়াই প্রয়োজন। এই প্রাথমিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও রুচির যদি সাদৃশ্য না থাকে, তাহলে ক্রমশঃ তাদের পারস্পরিক আচরণ কৃত্রিম হয়ে পড়ে। প্রাথমিক গোষ্ঠীগুলি সার্বিক এবং মানব সমাজের ক্রমবিকাশের সর্বস্তরে এগুলি দৃষ্ট হয়।

মাধ্যমিক গোষ্ঠীগুলি (Seeondary Groups) অর্থনৈতিক অবস্থা ও স্বার্থের ভিত্তিতে সাধারণতঃ গড়ে ওঠে। প্রাথমিক গোষ্ঠীর তুলনায় মাধ্যমিক গোষ্ঠীর বিস্তৃতি একটু ব্যাপক কিন্তু প্রাথমিক গোষ্ঠীর তুলনায় এ গোষ্ঠী অপেক্ষাকৃত কৃত্রিম। ব্যক্তির জীবন ও চরিত্রের ওপর প্রাথমিক গোষ্ঠীর তুলনায় মাধ্যমিক গোষ্ঠীর প্রভাব অনেক কম।

এরূপ গোষ্ঠীর ব্যক্তিদের মধ্যে সম্পর্ক তেমন আন্তরিক ও নিবিড় হয় না বরং এ সম্পর্ক অনেকটা নৈর্ব্যক্তিক, পরোক্ষ এবং বাহ্যিক, ('impersonal, secondary and formal')। এরূপ গোষ্ঠীতে সমষ্টিগত চেতনার স্থান দখল করে স্বাতন্ত্র্যভাব, সামাজিক কাজকর্ম হয়ে ওঠে নেহাত চুক্তির ব্যাপার।

মাধ্যমিক গোষ্ঠী

প্রাথমিক গোষ্ঠীর তুলনায় মাধ্যমিক গোষ্ঠীগুলির স্থায়িত্ব অনেক বেশী। একটা ছোট শিশুদের খেলার দলের তুলনায় শিক্ষক-সমিতির স্থায়িত্ব অনেক বেশী। প্রাথমিক গোষ্ঠীগুলি স্বাভাবিক, মাধ্যমিক গোষ্ঠীগুলি কৃত্রিম। প্রাথমিক গোষ্ঠীর তুলনায় মাধ্যমিক গোষ্ঠীগুলি অনেক বেশী নৈর্ব্যক্তিক ও বাহ্যিক এবং সে কারণে আইন-কানুনের মাধ্যমে মাধ্যমিক গোষ্ঠীর সভ্যদের আচরণ নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন দেখা দেয়।

প্রাথমিক গোষ্ঠী (Primary Groups) এবং মাধ্যমিক গোষ্ঠী (Secondary Groups) ছাড়াও আরও এক ধরনের গোষ্ঠী আছে, যাকে বলা হয় **অন্তর্বর্তী গোষ্ঠী** (Intermediate Groups)। এ তৃতীয় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের পারস্পরিক সম্পর্ক ততখানি ব্যক্তিগত নয়, যতখানি বাইরে থেকে চোখে পড়ে। অবশ্য পরস্পরের অস্তিত্ব সম্পর্কে তারা সচেতন, কিন্তু নিজেদের মধ্যে এদের সম্পর্ক অনেকটা ক্রেতা ও বিক্রেতার সম্পর্কের সমতুল্য; প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে, কিন্তু ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নেই। প্রাথমিক গোষ্ঠীর তুলনায় এদের সম্পর্ক ততখানি নিবিড় নয়, আবার মাধ্যমিক গোষ্ঠীর তুলনায় এরা ততখানি কৃত্রিম নয়, সেহেতু এগুলিকে অন্তর্বর্তী গোষ্ঠী বলা হয়। ক্রেতা-বিক্রেতা, পুলিস নাগরিক প্রভৃতি অন্তর্বর্তী গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।

অন্তর্বর্তী গোষ্ঠী

(২) অস্থায়ী গোষ্ঠী, স্বল্পকাল স্থায়ী গোষ্ঠী, দীর্ঘকাল স্থায়ী গোষ্ঠী এবং চিরস্থায়ী গোষ্ঠী ঃ এই সকল গোষ্ঠীগুলিকে গিস্‌বার্ট (Gisbert) সংগঠনের মাত্রা বা দৃঢ়তা (Degree of Organization) অনুযায়ী শ্রেণী বিভক্ত করেছেন।[1]

সংগঠনের মাত্রা অনুযায়ী প্রথম স্তরে দেখা যায় এমন গোষ্ঠী, সংগঠনের কথা চিন্তা বা স্থির না করেই যাদের আবির্ভাব ঘটেছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। যেমন, কোন দুর্ঘটনা দেখে রাজপথে সমবেত কৌতূহলী জনতা। এ হল **অস্থায়ী গোষ্ঠীর** উদাহরণ।

সংগঠনের দ্বিতীয় স্তরে দেখা যায় এমন গোষ্ঠী যার ব্যক্তিরা পূর্ব থেকে সংগঠনের কথা চিন্তা করে সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছে। যেমন—ছাত্রসংসদ, কোন বিশেষ দলের সভ্য ইত্যাদি।

1. P. Gisbert : Fundamentals of Sociology, Page 29.

এরকম গোষ্ঠীর সভ্যবৃন্দ যখন স্বেচ্ছায় দল পরিত্যাগ করে, গোষ্ঠীও তখন ভেঙে যায়। এ হল **স্বল্পকাল স্থায়ী গোষ্ঠীর** উদাহরণ।

সংগঠনের তৃতীয় স্তরে সংগঠন ব্যক্তিদের ইচ্ছার ওপর ততখানি নির্ভর করে না যতখানি নির্ভর করে ব্যক্তিদের স্থায়ী সম্পর্কের ওপর। ফলে এ জাতীয় গোষ্ঠীর স্থায়িত্ব অনেক বেশী। একটা বিশেষ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই এখানে ব্যক্তিরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়। যেমন—শ্রমিক সংসদ, শিক্ষা সমিতি ইত্যাদি। এ হল **দীর্ঘকাল স্থায়ী গোষ্ঠীর** উদাহরণ।

সংগঠনের চতুর্থ স্তরে দেখা যায় সেই জাতীয় গোষ্ঠী যার সংগঠনের একটা অবিচ্ছিন্ন স্থায়িত্ব আছে। এই জাতীয় সংগঠন গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের ইচ্ছানির্ভর নয়। ব্যক্তির আসা যাওয়ার ওপর গোষ্ঠীর স্থায়িত্ব নির্ভর করে না। যেমন—রাষ্ট্র, গ্রাম্য-সমাজ, শহর ইত্যাদি। এ হল **চিরস্থায়ী গোষ্ঠীর** উদাহরণ।

(৩) **অন্তর্গোষ্ঠী ও বহির্গোষ্ঠী (In-groups and Out-groups)** : সাম্নার (W. G. Sumner) গোষ্ঠীগুলিকে অন্তর্গোষ্ঠী (In-groups) এবং বহির্গোষ্ঠী (Out-groups)—এটি দুই শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। অন্তর্গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত সভ্যদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক খুবই মধুর এবং গোষ্ঠীর প্রতি তাদের আনুগত্য খুবই প্রবল। অন্তর্গোষ্ঠীর মধ্যে 'আমরা' এই ভাবটা (we-feeling) আছে এবং 'আমরা করি', 'আমরা অনুভব করি', 'আমরা বিশ্বাস করি', —এই সব উক্তির মাধ্যমে সেই ভাবটা প্রকাশিত হয়। যেমন—পরিবার, পাড়া (neighbourhood) হল অন্তর্গোষ্ঠীর উদাহরণ। অন্তর্গোষ্ঠীর সভ্যদের মধ্যে গোষ্ঠী-সংহতির চেতনা খুবই প্রবল থাকে।

অন্তর্গোষ্ঠী

বহির্গোষ্ঠী হল সেই গোষ্ঠী যার প্রতি অন্তর্গোষ্ঠীর সভ্যরা শত্রুভাবাপন্ন, বা যাকে তারা কোন কারণবশতঃ পছন্দ করে না, বা যা তাদের কাছে ভীতির কারণস্বরূপ। আমাদের পাড়া আমাদের কাছে অন্তর্গোষ্ঠী, কিন্তু আমাদের কাছের পাড়া, যাদের সঙ্গে আমাদের শত্রুতার ভাব লেগেই রয়েছে আমাদের দিক থেকে সেটি বহির্গোষ্ঠী। শ্রমিকদের কাছে শ্রমিক সংসদ হল অন্তর্গোষ্ঠী, কিন্তু মালিকদের সংসদ হচ্ছে বহির্গোষ্ঠী।

বহির্গোষ্ঠী

৪। সামাজিক অনুষ্ঠান (প্রতিষ্ঠান) (Social Institutions):

সাধারণ লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য সাধন করার জন্যই মানুষ সঙ্ঘ গঠন করে। এইসব সঙ্ঘের কতকগুলি অস্থায়ী এবং কতকগুলি স্থায়ী। পরিবার, গীর্জা এবং রাষ্ট্র হল স্থায়ী সঙ্ঘ।

স্থায়ী সঙ্ঘগুলি তাদের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য কতকগুলি কর্ম-পদ্ধতি, বিধি ও নিয়মের ওপর নির্ভর করে, যেগুলি দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন করার জন্য বা সঙ্ঘের বিভিন্ন সভ্যদের সামাজিক মেলামেশাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য প্রয়োজন হয়। এইসব অনুষ্ঠান, প্রচলিত বিধি এবং কর্মপদ্ধতিগুলি স্থায়িরূপ লাভ করলে সামাজিক অনুষ্ঠানে (Social institutions) পরিণত হয়। কোন কর্তৃপক্ষ এই সব অনুষ্ঠান প্রচলন করেন এবং সামাজিক গোষ্ঠীর বা সঙ্ঘের সভ্যবৃন্দ এগুলিকে স্বীকার করে নেন। যেমন—পরিবারের বিবাহ-প্রথা, গীর্জার দীক্ষাদান পদ্ধতি, রাষ্ট্রের শাসন পদ্ধতি, কারখানার বেতন পদ্ধতি ইত্যাদি।

Institutions-এর দুটি অর্থ

ইংরেজী Institution কথাটি দুটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। 'Institution' কথাটির একটি অর্থ হল প্রতিষ্ঠান। যে-কোন ধরনের সঙ্ঘই হল প্রতিষ্ঠান। পরিবার, রাষ্ট্র—এই সবই প্রতিষ্ঠান যেহেতু এগুলি মানুষের দ্বারা তৈরি সামাজিক এক-একটি কাঠামো (Social Structure)। বার্নেস তাঁর 'Sccial Instituticn' গ্রন্থে সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন, "সামাজিক প্রতিষ্ঠান হল সামাজিক কাঠামো এবং যন্ত্র যার মাধ্যমে জনসমাজ মানুষের প্রয়োজন মেটাবার জন্য বিভিন্ন ধরনের কার্যকলাপ সংগঠন, পরিচালন এবং সম্পাদন করে।"[1]

প্রতিষ্ঠান

দ্বিতীয় অর্থে Institution কথাটির অর্থ হল অনুষ্ঠান, প্রচলিত বিধি, কর্মপদ্ধতি ইত্যাদি। এই অর্থে 'Instituticn'-এর অর্থ হল সঙ্ঘ বা প্রতিষ্ঠান নয়, যে প্রচলিত বিধি অনুযায়ী সঙ্ঘগুলি গঠিত হয় ও তাদের কার্যকলাপ পরিচালিত হয় তাই। এই অর্থে বিবাহ-প্রথা হল Institution, পরিবার বা রাষ্ট্র নয়। ম্যাকাইভার ও পেজ গিস্‌বার্ট, এলউড, হেয়েস প্রমুখ সমাজবিজ্ঞানীরা এই অর্থে Intsitution কথাটিকে গ্রহণ করেছেন। MacIver ও Page 'Institution' কথাটির অর্থ বোঝাতে গিয়ে বলেছেন, "সেই সব প্রচলিত কর্মপদ্ধতি যার মাধ্যমে গোষ্ঠীর কার্যকলাপের বৈশিষ্ট্য সূচীত হয়।"[2]

অনুষ্ঠান

---

1. "The social structure and machinery through which human society organizes, directs and executes the multifarious activities required to satisfy human needs." —H. E. Barnes: Social Institutions, Page 29.

2. "...the established forms or conditions of Procedure characteristic of group activity'. —MacIver and Page : Society, Page 15.

গিস্‌বার্ট-ও 'Institution' বলতে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের জন্য কতকগুলি স্থায়ী ও স্বীকৃত কর্মপদ্ধতিকেই বুঝিয়েছেন। এলউড (C. A. Ellwood) 'Institution' বলতে বোঝেন, "সম্প্রদায়ের কর্তৃপক্ষের দ্বারা অনুমোদিত, সংগঠিত এবং প্রতিষ্ঠিত একত্র বসবাস করার অভ্যাসসিদ্ধ পদ্ধতি।"[1]

হেয়েস-এর মতে 'Institution' হল একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যলাভের জন্য কোন সামাজিক গোষ্ঠীর দ্বারা গৃহীত কর্মপদ্ধতি।

সুতরাং উল্লিখিত লেখকবৃন্দ Institution কথাটির অর্থে বুঝেছেন কোন প্রচলিত বিধি বা কর্মপন্থা। সাধারণতঃ Institution বলতে আমরা যে প্রতিষ্ঠানকে বুঝে থাকি, তার সঙ্গে এঁরা একে সমার্থক বলে মনে করেন নি।

সমাজের সংরক্ষণ এবং তার ক্রিয়াকলাপ চালনার জন্য এই সব অনুষ্ঠান, প্রচলিত বিধি বা কর্মপন্থার একান্ত প্রয়োজন। বস্তুতঃ, এগুলির মাধ্যমেই সমাজ সভ্যদের শারীরিক এবং মানসিক প্রয়োজন মেটাবার জন্য যেসব কার্যকলাপের প্রয়োজন সেগুলিকে সংগঠিত করে ও পরিচালিত করে। বার্নেস (Barnes)-এর ভাষায়, অনুষ্ঠানগুলি হল যন্ত্রবিশেষ যার মাধ্যমে সমাজ তার কার্য পরিচালনা করে।

এই সব অনুষ্ঠান বা কর্মপদ্ধতি সমাজকে প্রাণবান ও গতিশীল করে রাখে। এদের জন্যই সমাজের অগ্রগতি রুদ্ধ হয় না। এগুলির জন্যই ব্যক্তির আচরণ জটিলতা মুক্ত হয়। এই সব অনুষ্ঠান ব্যক্তির কর্মপদ্ধতির ওপর প্রভাব বিস্তার ক'রে তাদের একটি নির্দিষ্ট আকার দান করে। যে-কোন ব্যক্তিকে জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্নভাবে আচরণ করতে সাহায্য করে। সামাজিক অনুষ্ঠান বা কর্মপদ্ধতিগুলি একই প্রকৃতিবিশিষ্ট আচরণ-পদ্ধতি ব্যক্তির সামনে তুলে ধরে তাকে সামাজিক জীবনের বিভিন্ন অবস্থায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে এবং সুশৃঙ্খলভাবে আচরণ করতে সহায়তা করে।

সামাজিক অনুষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য

বস্তুতঃ, এই সব সামাজিক অনুষ্ঠানগুলি সমাজ-জীবনে ব্যক্তির ভূমিকা নির্ধারণ করে। এগুলির মাধ্যমে সমাজের স্থায়িত্ব রক্ষা হয়। অবশ্য একথা অস্বীকার করা যায় না যে, এই সব সমাজিক অনুষ্ঠান ব্যক্তির স্বাধীনতাকে সীমিত করে এবং অনেক সময় এগুলি এতই কঠোর হয় যে ব্যক্তির আত্মবিকাশের পথে এগুলি প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। সময় সময় এই সব অনুষ্ঠানের বেড়াজাল থেকে মানুষ মুক্তি চায় বা এর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া

1. "Habitual ways of living together which have been sanctioned, systematised, and established by the authority of communities.

—C. A. Ellwood : The Psychology of Human Society ; Page 30.

করে। অবশ্য এইসব সামাজিক অনুষ্ঠান বা কর্মপদ্ধতি যদি অত্যন্ত কঠোর ও উৎপীড়নমূলক মনে হয় তবেই ব্যক্তির মধ্যে এক তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। সামাজিক অনুষ্ঠানগুলি নির্দিষ্ট কর্মপদ্ধতির মাধ্যমে ব্যক্তির আচরণে স্থিতিশীলতা আনয়ন করে যার জন্য সামাজিক নিয়ন্ত্রণের কাজ সহজতর হয়। এইসব প্রচলিত বিধি বা অনুষ্ঠান সমাজের সভ্যদের মধ্যে সামাজিকতার সৃষ্টি করে গোষ্ঠীর নৈতিকতা বজায় রাখতে সহায়তা করে।

৬। অনুষ্ঠান এবং আচার (Institution and Customs) :

প্রশ্ন হল, 'Institution'-এর অর্থ যদি হয় অনুষ্ঠান,[1] পদ্ধতি বা রীতি তাহলে Custom বা 'আচারের' সঙ্গে এর পার্থক্য কোথায়? আচার বলতে বুঝি সামাজিক আচরণের অভ্যাসলব্ধ পদ্ধতি বা ধারা। যেমন, পরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হলে আমরা পরস্পরকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করি, এসব আচরণগুলির সামাজিক সম্পর্কের প্রতি আমরা উদাসীন নই। যদি কোন কারণে কোন আচার ভঙ্গ করা হয় তাহলে তার ফলে আমাদের মধ্যে মনস্তাপ দেখা দেয়।

আচার-এর স্বরূপ

গিসবার্ট (Gisbert) আচারের তিনটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন; যথা—আচরণের ধারাবাহিকতা (a constant way of acting), সামাজিকতা (social in character) এবং আদর্শগত মূল্য (normative value)। সেহেতু সাধারণ অভ্যাস থেকে একে পৃথক করা যেতে পারে। যেমন, ধূমপানের অভ্যাস। সাধারণ অভ্যাসের সঙ্গে আচারের সাদৃশ্য লক্ষ্য করেই একে 'অনুমোদিত অভ্যাস' বলে অভিহিত করা হয়। অভ্যাস হল ব্যক্তিগত বিষয়, এর কোন সামাজিক অনুমোদনের প্রয়োজন হয় না। আচার হল নৈর্ব্যক্তিক এবং আচারের সঙ্গে সামাজিক অনুমোদন যুক্ত।

আচারের বৈশিষ্ট্য

আচারের মধ্যে একটা ব্যক্তিগত দিক আছে। আচার বলতেই আমরা বুঝি কতকগুলি স্বীকৃত কর্মপদ্ধতি যেগুলি মানুষ ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে একত্রে করে থাকে। অনুষ্ঠান (Institution) বলতে আমরা বুঝি নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি (system of control) যা ব্যক্তিগত সম্পর্কের সীমার বাইরে চলে যায়। এই নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি হল অতীত এবং

---

1. Mackenzie-ও সামাজিক অনুষ্ঠানকে ব্যাপক অর্থে এবং সঙ্কীর্ণ অর্থে গ্রহণ করেছেন। অনুষ্ঠানের ব্যাপক অর্থে 'যে-কোন সঙ্ঘই অনুষ্ঠান'। যেমন—পরিবার, রাষ্ট্র। সঙ্কীর্ণ অর্থে সামাজিক অনুষ্ঠান হল বিশেষ ধরনের উপায় বা পদ্ধতি, যার দ্বারা সঙ্ঘ গঠিত হয়, রক্ষিত হয় এবং তার বিশেষ কাজগুলি সম্পন্ন হয়।

বর্তমান, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের মধ্যে যোগসূত্র বা মানুষকে তার পূর্বপুরুষ এবং বংশধরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করে।

আচার ও অনুষ্ঠানের পার্থক্য

সুতরাং আচার (Custom) এবং অনুষ্ঠানের (Institution) মধ্যে যে পার্থক্য তা জাতিগত নয়, মাত্রাগত। অনুষ্ঠানের একটা সামাজিক এবং আদর্শগত মূল্যের দিক আছে, কিন্তু আচারের তুলনায় অনুষ্ঠান অধিক নৈর্ব্যক্তিক (impersonal) এবং কম স্বতঃস্ফূর্ত (spontaneous)। সমাজে আচারের থেকে অনুষ্ঠানের স্বীকৃতিই বেশী। যেমন, উত্তরাধিকার ও ভদ্রতা। সমাজ অনুষ্ঠান হিসেবে উত্তরাধিকারকেই বেশী স্বীকৃতি দেয়। উত্তরাধিকারের দ্বারা পরিবারের স্থায়িত্ব রক্ষা হয়। কিন্তু আচার হিসাবে ভদ্রতার গুরুত্ব অত বেশী নয়। এ ছাড়া অধিকাংশ অনুষ্ঠানই সুনির্দিষ্ট, আচার সাধারণতঃ তেমন সুনির্দিষ্ট নয়। আচার অনুষ্ঠানে পরিণত হতে পারে যখন আচরণ সাধারণের সুস্পষ্ট স্বীকৃতি লাভ করে।

৭। বিভিন্ন প্রকারের সামাজিক অনুষ্ঠান (প্রতিষ্ঠান) (Various Modes or forms of Social Institution) :

সামাজিক অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানগুলিকে বিভিন্নভাবে শ্রেণীভুক্ত করা যেতে পারে। সামাজিক অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানগুলি যে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে, সেই উদ্দেশ্যের দিক থেকে, সমাজ জীবনে প্রয়োজনের দিক থেকে, তাদের সাধারণতঃ (generality) এবং সীমাবদ্ধতার (restriction) দিক থেকে আমরা তাদের শ্রেণীভুক্ত করতে পারি। যে উদ্দেশ্য তারা সিদ্ধ করে সেই উদ্দেশ্যের দিক থেকে যদি তাদের শ্রেণীভুক্ত করি তাহলে অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের শ্রেণীবিভাগ হবে নিম্নরূপ :

(ক) পারিবারিক অনুষ্ঠান (প্রতিষ্ঠান) (Domestic Institution) **:** পারিবারিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের প্রধান লক্ষ্য জৈবিক প্রয়োজন মেটান, যদিও জৈবিক প্রয়োজন ছাড়া তারা অন্যান্য প্রয়োজন পূরণ করে। পারিবারিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পরিবার সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বা গুরুত্বপূর্ণ। পরিবারের প্রধান কাজ বংশধারা অক্ষুণ্ণ রাখতে সহায়তা করা। শিশু প্রতিপালন করা এবং বৃহত্তর জীবনের জন্য শিশুকে গঠন করার দায়িত্ব পরিবারের।

(খ) শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান (প্রতিষ্ঠান) (Educational Institutions) **:** ব্যাপক অর্থে সব শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ব্যক্তির মধ্যে সুপ্ত বুদ্ধিগত ও নৈতিক ক্ষমতাগুলিকে বিকশিত করে তার ব্যক্তিত্বকে সুগঠিত করা। শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানগুলি ব্যক্তির চরিত্র গঠন করে এবং বৃহত্তর সমাজ-জীবনে তার দায়িত্ব-

গুলি পালন করার জন্য তাকে যোগ্য করে তোলে। ক্ষুদ্রতর অর্থে শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানগুলি একটা বিশেষ লক্ষ্য লাভের জন্য কোন বিশেষ বিষয়ে ব্যক্তিকে শিক্ষা দিয়ে থাকে এবং জীবনে যাতে সে তার নির্বাচিত পেশা অনুসরণ করতে পারে তার জন্য তাকে যোগ্য করে তোলে। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি বিভিন্ন শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান—প্রতিষ্ঠানের উদাহরণ। এইগুলি ব্যক্তির জীবন গঠনের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

প্রধান প্রধান অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের আলোচনায় ম্যাকেঞ্জি (Mackenzie) গঠনমূলক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের (Formative Institutions) আলোচনা করেছেন।

কতকগুলি অনুষ্ঠান আছে যেগুলির প্রধান উদ্দেশ্য হল শুধু কোন এক ধরনের সামাজিক ঐক্যকে টিকিয়ে না রেখে সামাজিক ঐক্য গঠন করা। এই সব গঠনমূলক প্রতিষ্ঠান মূলতঃ শিক্ষামূলক, তবে কোন কোন ক্ষেত্রে শিক্ষাবিষয়ক উদ্দেশ্য খুব সুনির্দিষ্ট-ভাবে পরিস্ফুট হয় না। যেমন—পরিবার, এর প্রধান উদ্দেশ্য হল শিক্ষামূলক, তবে তাছাড়াও অন্যান্য উদ্দেশ্য একে পূর্ণ করতে হয়।

(গ) অর্থ**নৈতিক অনুষ্ঠান (প্রতিষ্ঠান)** (Economic Institutions) : সমাজে কতকগুলি অনুষ্ঠান যেমন গঠনমূলক, তেমনি কতকগুলি অনুষ্ঠান আছে যারা রক্ষণমূলক ; যাদের উদ্দেশ্য যতটা না মানুষের জীবনকে গঠন করা তার বেশী মানুষের জীবন রক্ষা করা। মানুষের বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য, পানীয়, আশ্রয়, নিদ্রা প্রভৃতির প্রয়োজন। অর্থনৈতিক অনুষ্ঠানগুলি মানুষের এসব প্রয়োজন মেটায়। অবশ্য এ অনুষ্ঠানগুলিকে মানুষের আরও নানারকম প্রয়োজন বা দাবী ; যেমন—খেলাধূলা, গানবাজনা, যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রভৃতি মেটাতে হয়। সেসব অনুষ্ঠানগুলিকেই আমরা অর্থনৈতিক বলে অভিহিত করতে পারি যেগুলি আমাদের বেড়ে ওঠার জন্য যেসব অভাব, সেগুলি দূরীকরণের উদ্দেশ্যেই কার্যকারী হয়।

(ঘ) **শিল্পসম্পর্কীয় অনুষ্ঠান (প্রতিষ্ঠান)** (Industrial Institutions) : বেড়ে ওঠার প্রয়োজন ছাড়া মানুষের আরও কতকগুলি প্রয়োজন আছে, যেগুলির সঙ্গে তার জৈবিক ও বুদ্ধিগত দিকের সম্পর্ক আছে। তার জ্ঞান অর্জনের জন্য পুস্তক পাঠের প্রয়োজন, ঘর সাজানোর জন্য চিত্রের প্রয়োজন, গৃহনির্মাণের জন্য উপাদানের প্রয়োজন, সঙ্গীত অনুশীলনের জন্য বাদ্যযন্ত্রের প্রয়োজন এবং প্রয়োজনীয় বস্তু উৎপাদনের জন্য যন্ত্রপাতির প্রয়োজন। বিভিন্ন শিল্প সম্পর্কীয় অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান—যেমন মিল, কারখানা, শ্রমিক সঙ্ঘ, মানুষের এসব প্রয়োজন মেটাবার চেষ্টা করে।

(ঙ) **সরকারী অনুষ্ঠান (প্রতিষ্ঠান)** (Governmental Institutions) : সমাজের মধ্যে নানা ধরনের সঙ্ঘ আছে। এই সঙ্ঘগুলিকে যদি নিয়ন্ত্রিত এবং সংযোজিত করা না হয় তাহলে বিভিন্ন সংঘের মধ্যে বিরোধিতার ফলে তারা আদর্শভ্রষ্ট হবে এবং ফলে সমাজ-জীবনের শান্তি এবং ঐক্য ব্যাহত হবে। মানুষ একটি স্বীকৃত শাসনব্যবস্থার সাহায্যে বিভিন্ন সঙ্ঘগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে। সমাজের প্রাথমিক অবস্থায় এই শাসন-ব্যবস্থা ন্যস্ত ছিল সমাজপতিদের ওপর। কিন্তু বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের মধ্যে বিরোধিতার ফলে এবং আভ্যন্তরীণ অশান্তি দূর করার জন্য একটি সুসংহত শাসনব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। ধীরে ধীরে আবির্ভাব ঘটল রাষ্ট্রের। রাষ্ট্র তার কর্তৃত্ব বিভিন্ন সঙ্ঘ এবং প্রতিষ্ঠানগুলির ওপর প্রসারিত করল। মানুষের অধিকার ও কর্তব্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারিত হল। মানুষের প্রতি ন্যায়সঙ্গত আচরণ-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হল। মানুষ যাতে স্বীকৃত শাসন-ব্যবস্থা মেনে চলে তার জন্য প্রয়োজনবোধে বলপ্রয়োগ করা দরকার, তাই দেখা দিল পুলিসী ও সামরিক ব্যবস্থা।

(চ) **সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান (প্রতিষ্ঠান)** (Cultural Institutions) : আমরা ইতিপূর্বে মানুষের তিনটি দিকের কথা উল্লেখ করেছি—(১) বর্ধনশীল দিক (Vagetative aspect), (২) জৈবিক দিক (Animal aspect) এবং আর একটি হল তার (৩) বিচার-বুদ্ধির দিক (Rational aspect)। মানুষের অগ্রগতি ও বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ উপলব্ধি করল যে, তার বিচারবুদ্ধির বিকাশের দিকটিই আসল উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য এবং অপর দুটি সেই উদ্দেশ্য-সাধনের উপায় মাত্র। বিচার-বুদ্ধির অনুশীলনকেই মানুষ করে নিল মুখ্য উদ্দেশ্য। তার ফলে দেখা দিল নতুন এক ধরনের সঙ্ঘ। কেবলমাত্র শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যেই সঙ্ঘ গঠিত হল না ; জ্ঞান, বুদ্ধির এবং চরিত্রের বিকাশের জন্যও সঙ্ঘ গঠিত হল। মানুষের যে আবেগ তার জৈবিক প্রবৃত্তির মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে সেই আবেগ এক নতুন রূপ পরিগ্রহণ করলো। সে আবেগ সূক্ষ্ম এক চিন্তামূলক আবেগ ও মনোভাবের মাধ্যমে প্রকাশ করল। ললিতকলার মাধ্যমে মানুষ নিজের এই আবেগ বা মনোভাবকে প্রকাশ করতে লাগল। শিক্ষা ও কলার অনুষ্ঠান, বৈজ্ঞানিক অনুষ্ঠান প্রভৃতি বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আবির্ভাব ঘটল। কলা ও সাহিত্যের মাধ্যমে মানুষের সৃজনমূলক প্রবৃত্তির প্রকাশ ঘটে এবং সুনির্দিষ্ট ও সুসঙ্গত উপায়ে মানুষের সুকোমল ও সূক্ষ্ম অনুভূতি ও আবেগকে প্রকাশ করার জন্য অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের আবির্ভাব ঘটে। এই জাতীয় অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান। সাহিত্য সঙ্ঘ, সঙ্গীত সভা, চিত্র প্রদর্শনী প্রভৃতি এই জাতীয় অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের উদাহরণ।

এসব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান মানুষের জীবনের ঐক্য এবং মূল্য সম্পর্কে চেতনাকে গভীরতর করে বিভিন্ন মনুষ্য সমাজের মধ্যে বিরোধিতাকে দূরীভূত করে, যার ফলে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এই আন্তর্জাতিক সম্পর্ক উন্নত ও দৃঢ় হওয়ার জন্য আরও অনেক নতুন নতুন অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের আবির্ভাব ঘটে।

(ছ) ধর্মমূলক অনুষ্ঠান (প্রতিষ্ঠান) (Religious Institutions): অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের মতো ধর্মমূলক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান সামাজিক জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। ধর্মমূলক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান রূপেও গণ্য করা যেতে পারে। ধর্ম কোন পরমসত্তায় বিশ্বাস সূচনা করে, যে সত্তার সঙ্গে ব্যক্তি ব্যক্তিগত সংযোগ স্থাপনের জন্য সচেষ্ট হয়। ধর্মের আভ্যন্তরীণ দিক হল ব্যক্তির বিশ্বাস, ধারণা, অনুভূতি ও আবেগের দিক এবং ধর্মের বাহ্য দিক হল কতকগুলি আচার ও অনুষ্ঠান— যেমন উপাসনা পদ্ধতি, যার মাধ্যমে ব্যক্তির ধর্মীয় মনোভাব প্রকাশ পায়। ধর্মের এই বাহ্য দিক থেকেই কতকগুলি ধর্মীয় অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের আবির্ভাব ঘটে যেগুলি বাহ্য আচার-অনুষ্ঠানগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে। গীর্জা, মন্দির, মসজিদ, ধর্মসভা প্রভৃতি ধর্মীয় অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের উদাহরণ। যদিও ধর্ম ব্যক্তিগত বিশ্বাসের বিষয় তবু ধর্মের একটা সামাজিক দিক আছে। বহু ধর্মীয় অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান অনেক সময় সামাজিক ক্রিয়া ও অনুষ্ঠানের কেন্দ্ররূপেও কার্য করে।

(জ) আমোদ-প্রমোদ সম্পর্কীয় অনুষ্ঠান (প্রতিষ্ঠান) (Recreational Institutions): খেলাধুলা, আমোদ-প্রমোদ প্রভৃতিরও অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান আছে, যেগুলিকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান রূপেও গণ্য করা যেতে পারে। ফুটবল ক্লাব, ক্রিকেট ক্লাব, নাট্য-সঙ্ঘ, সঙ্গীত-সঙ্ঘ প্রভৃতি এই জাতীয় অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের উদাহরণ।

(ঝ) বন্য অনুষ্ঠান (Barbaric Institutions): যে সকল অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষ তার জৈবিক আবেগকে প্রকাশ করে ম্যাকেঞ্জি (Mackenzie) সেই অনুষ্ঠানগুলির নাম দিয়েছেন 'Barbaric Institution'। এই অনুষ্ঠানগুলির শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য থাকলেও, আসলে এগুলি হল জৈব আবেগকে তৃপ্ত করার একটা উপায়। আগেকার দিনে ষাঁড়ে মানুষে যে লড়াই (Bull-fight) হত, বর্তমানকালেও যে মল্লযুদ্ধ বা কুস্তির ব্যবস্থা তা হল এই জাতীয়।

৮। বিভিন্ন অনুষ্ঠানের (প্রতিষ্ঠানের) পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া (Interactions of Institutions):

সমাজের মধ্যে আমরা বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান দেখতে পাই। এসব অনুষ্ঠানের পরস্পরের ওপর ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া সময় সময় বিরোধিতা সৃষ্টি করে যায় ফলে সমাজ

জীবনের নানারকম জটিলতা দেখা যায়। একথা সত্য যে, মানুষ বিচার-বুদ্ধির দ্বারাই নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করে, তবু সময় সময় মানুষের এই বিচার-বুদ্ধির দিকটি তার ওপর প্রাধান্য লাভ করতে পারে না। সেই কারণে এমন সব অনুষ্ঠান আছে যার নৈতিক ভিত্তি সব সময় খুঁজে পাওয়া যায় না। অনেক সময় অধিকার অপেক্ষা বলপ্রয়োগকেই আমরা প্রাধান্য দিয়ে থাকি। কিন্তু মানুষ চায় ঐক্য, সংহতি—তাই জীবনে বিরোধের ওপর শেষ পর্যন্ত ঐক্যের জয় ঘটে এবং মানুষ ধীরে ধীরে বিভিন্ন অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যে বিরোধিতা দেখে তাকে দূরীভূত করে তাদের মধ্যে সামঞ্জস্য আনবার জন্য সচেষ্ট হয়। তবে এ হল সময় সাপেক্ষ। সে কারণে সামঞ্জস্য ও বিরোধিতা পাশাপাশি চলতে থাকে এবং এর থেকে সমাজকে খুব সহজে মুক্ত করা সকল সময় সম্ভব হয় না। তবে সব রকম বিরোধিতা দূর করে ও দ্বন্দ্ব পরিহার করে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে সুষম-সমন্বয় সাধন করে আদর্শ সমাজ গঠনের পরিকল্পনা মানুষের আছে এবং মানুষের সে স্বপ্ন সার্থক হবে কিনা ভবিষ্যতই তা বলতে পারে। মানুষ সভ্য, তবে তাকে আরও সভ্য হতে হবে যাতে সব রকম বিরোধ দূর করে বিভিন্ন অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় সাধনের ক্রিয়াটিকে আরও নিখুঁতভাবে কার্যকর করে তোলা যায়।

৯। সঙ্ঘ (Association) :

ম্যাকাইভার (MacIver) সঙ্ঘ (Association) এবং প্রচলিত বিধি বা অনুষ্ঠান (Institution) উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। **সঙ্ঘ কাকে বলে?** MacIver-এর মতে সাধারণ স্বার্থ অনুসরণের জন্য সামাজিক ব্যক্তির যে সংগঠন তাই হল সঙ্ঘ।[1] শ্রমিক সংসদ, শিক্ষক সমিতি, সাহিত্য-সংসদ, নাট্য-সমিতি প্রভৃতি সঙ্ঘের উদাহরণ। যে-কোন জনসমষ্টিকেই সঙ্ঘ নামে অভিহিত করা যেতে পারে না। একটি সুন্দর উদাহরণের সাহায্যে ম্যাকাইভার (MacIver) বিষয়টি বুঝিয়ে দিয়েছেন। পথের ধারে দাঁড়িয়ে যে জনতা আগুন লাগা দেখছে তাকে সঙ্ঘ বলা যেতে পারে না। একই স্বার্থ (interest) তাদের এক জায়গায় সমবেত করেছে, কিন্তু তাদের মধ্যে কোন সামাজিক সম্পর্ক সৃষ্ট হয় নি। কিন্তু যদি পথের জনতা মনে করে যে, সমবেতভাবে সকলে সহযোগিতা করে আগুন নেভাবে, তখনই সেই জনসমষ্টি সঙ্ঘে পরিণত হবে, তাদের পরস্পরের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক গড়ে উঠবে।

সঙ্ঘের স্বরূপ

1. "An association is an organisation of social beings (or a body of social beings as organised) for the pursuit of some common interest or interests."
—MacIver : Community, Page 24.

Institution হল প্রচলিত বিধি, কর্মপদ্ধতি বা সামাজিক ব্যষ্টিসমূহের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত সম্পর্কের রীতি (established forms of relation between social beings)। সঙ্ঘ তার চাইতে ব্যাপক, কেবলমাত্র প্রথা নয়,এ হল প্রচলিত বিধি বা কর্মপদ্ধতির উৎস। সঙ্ঘের ব্যক্তি-নিরপেক্ষ (subjective) এবং ব্যক্তি-সাপেক্ষ (objective) উভয় প্রকার দিক আছে। সাধারণের ইচ্ছায় যেমন প্রচলিত বিধি

অনুষ্ঠান সঙ্ঘ

গড়ে ওঠে, তেমনি সঙ্ঘও গড়ে ওঠে। কিন্তু সঙ্ঘের বেলায় কোন সাধারণ স্বার্থ এই সাধারণ ইচ্ছাকে সংগঠিত করে। প্রচলিত বিধি হল উপায় মাত্র। সঙ্ঘ প্রয়োজন অনুসারে প্রচলিত বিধি বা কর্মপদ্ধতিকে পরিবর্তিত করতে পারে, বাতিল করে দিতে পারে, নতুন বিধি গড়ে তুলতে পারে। সে কারণে Institution বা প্রচলিত বিধিকে কোন মতেই বাইরের জিনিস বলে মনে করা যুক্তিযুক্ত নয়। ম্যাকাইভার (Maclver) বলেন, "কোন অনুষ্ঠান বা প্রচলিত বিধির (Institutiou) তাৎপর্য তার বাহ্যাংশে খুঁজে পাওয়া তেমনি ভুল, যেমন ভুল হচ্ছে কোন আচরণ ও তার বহিঃপ্রকাশকে এক মনে করা। প্রচলিত বিধি হল সামাজিক কার্যের সংগঠিত ধারা এবং সেহেতু এদের একটা বাইরেব দিক আছে, যে দিকটি দেশ ও কালে প্রকাশিত।"[1] অনুষ্ঠান বা প্রচলিত বিধির একটা বাইরের দিক আছে। যেমন—কলেজ-গৃহ, যেখানে ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। তবে Institution বা প্রচলিত বিধির আভ্যন্তরীণ দিকটিই অধিক গুরুত্বপূর্ণ, যেহেতু এই বিধি সমাজের সভ্যদের সামাজিক জীবনের ওপর বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে।

মানুষ সঙ্ঘ গঠন করে, কিন্তু সঙ্ঘ গঠন করলেই সঙ্ঘের কাজ চালাবার জন্য এবং সঙ্ঘের ব্যক্তিদের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কতকগুলি নিয়ম বা কার্যধারার প্রয়োজন হয়। এই নিয়ম বা কার্যধারাই হল Institution বা সামাজিক বিধি। প্রত্যেকটি সঙ্ঘেরই তার নিজস্ব নিয়ম, পদ্ধতি বা কার্যধারা আছে। পরিবারের বিবাহ আছে, গীর্জার উপাসনা-পদ্ধতি আছে, রাষ্ট্রের আইন সংক্রান্ত বিধি আছে। আমরা ব্যক্তিরা সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু কোন প্রচলিত বিধির

1. 'It is a mistake to find the essence of any institution in externality just as it is a mistake to make conduct equivalent to its external manifestation. Institutions are organised forms of social activity and have therefore an external aspect, an aspect in time and space.''

—Maclver : Community ; Page152.

(Institution) অন্তর্ভুক্ত নই। সময় সময় সঙ্ঘের বিধিকে আমরা গুলিয়ে ফেলি, কিন্তু ম্যাকাইভার (MacIver) বলেন, এ দুটোর মধ্যে কোন গোলমাল হবার কারণ নেই। পরিবার হল একটি সঙ্ঘ, বহুবিবাহ হল একটি সামাজিক প্রথা বা বিধি। যখন কোন সংগঠিত গোষ্ঠীর কথা চিন্তা করব, তখন সেটি হল সঙ্ঘ এবং যদি প্রথা বা নিয়মের কথা চিন্তা করি তখন সেটি হল বিধি (Institution)। যখন শিক্ষায়তন বলতে বুঝি শিক্ষক এবং ছাত্র তখন সেটি হল সঙ্ঘ। যখন শিক্ষায়তন বলতে বুঝি শিক্ষা সম্পর্কীয় বিধি-ব্যবস্থা সেটা বিধি বা অনুষ্ঠান। আমরা "রাষ্ট্রের বা পরিবারের অন্তর্ভুক্ত" এমন কথা বলি, কিন্তু আমরা 'বিবাহের বা সম্পত্তির ব্যবস্থার অন্তভুর্ক্ত' এমন কথা বলি না। সঙ্ঘের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য এবং সেই উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যকে লাভ করার পদ্ধতি—এ উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করা প্রয়োজন। পরিবারের প্রধান উদ্দেশ্য হল বংশ রক্ষা করা, কিন্তু বিবাহ, সম্পত্তি ব্যবস্থা—এগুলি হল এর প্রধান প্রথা বা নিয়ম। সেরকম ধর্মীয় সঙ্ঘ-গুলির উদ্দেশ্য হল ধর্ম সম্পর্কীয় প্রয়োজন মেটান, কিন্তু উপাসনা, পূজাপদ্ধতি হল এর পদ্ধতি বা প্রথা। সঙ্ঘ থাকলেই তার কার্যপদ্ধতিও থাকবে।

ম্যাকেঞ্জি (Mackenzie) বলেন, "যদিও কোন বিশেষ প্রকারের সঙ্ঘ (A mode of association) এবং এর উপায়ের মধ্যে পরিষ্কার পার্থক্য করা যায়, কোন অনুষ্ঠান এদের উভয়ের মাঝামাঝি স্থানে আছে বলে উভয়ের বৈশিষ্ট্যের অংশ গ্রহণ করে।[1]

সঙ্ঘ (Association) এবং অনুষ্ঠান, প্রচলিত পদ্ধতি বা প্রথা (Institution)—এই উভয়ের প্রভেদটুকু মনে রাখা একান্ত প্রয়োজন। সমাজ-জীবনের পক্ষে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সংগঠন অপরিহার্য, কিন্তু বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি এবং অনুষ্ঠানই সামাজিক সংগঠনগুলিকে গতিশীল করে রাখে। গিস্‌বার্ট (Gisbert) বলেন,"Associations are things, institutions are modes and ways" অর্থাৎ, "সঙ্ঘ হল বস্তু, অনুষ্ঠান হল এর বিভিন্ন পদ্ধতি।"[2] সঙ্ঘতেই আমাদের জন্ম হয়, সেখানেই আমরা প্রতিপালিত হই এবং বড় হই, কিন্তু আমরা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই কাজ করি। গিস্‌বার্ট (Gisbert)-এর মতে যদিও সমাজ-জীবনের এ দুটি উপাদান গভীরভাবে সংযুক্ত, তবু একটির বৈশিষ্ট্য অপরের বৈশিষ্ট্য নয়।

সঙ্ঘ এবং অনুষ্ঠানের মধ্যে পার্থক্য

1. "But, while the distinction between a mode of association and its instruments can generally be clearly drawn. An institution—which lies somewhat between the two—is apt to partake of the nature of both."
—Mackenzie : Outlines of Social Philosophy , Page 63.

2 P.Gisbert : Fundamentals of Sociology ; Page 36.

এইসব অনুষ্ঠান বা প্রচলিত বিধির মধ্যে কোন কোনটি স্বতঃস্ফূর্তভাবেই উদ্ভূত হয়েছে। যেমন—সম্পত্তি ব্যবস্থা, সরকার ইত্যাদি। আবার কোন কোন প্রচলিত বিধি বিশেষ চেষ্টার ফলে উদ্ভূত। যেমন, উত্তরাধিকার কর প্রথা (Inheritance tax)। অবশ্য কালক্রমে এইসব প্রচলিত বিধি বা অনুষ্ঠানের যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটেছে।

১০। সামাজিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের মনস্তত্ত্বমূলক এবং দার্শনিক ভিত্তি (The Psychological and Philosophical Bases of Social Institutions) :

আমরা ইতিপূর্বে বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি সমাজ-দার্শনিকের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করেছি। এখন এই সব অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের মনস্তত্ত্বমূলক এবং দার্শনিক ভিত্তি স্বতন্ত্রভাবে একটু আলোচনা করা যাক :

বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষ যেমন নিজেদের জৈবিক আবেগ অনুভূতিকে নানাভাবে প্রকাশ করে; তেমনই এই সব অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষ নিজেদের আত্মবিকশিত করার সুযোগ লাভ করে। আত্মোপলব্ধিই মানুষের জীবনের পরমকল্যাণ (Supreme good)। ব্যক্তির সুপ্ত গুণের পূর্ণ বিকাশের মধ্য দিয়েই এই আত্মোপলব্ধি আসে। কিন্তু এর জন্য ব্যক্তিকে সমাজের ওপর নির্ভর করতে হয় এবং সমাজস্থ বিভিন্ন অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান (Institution) ব্যক্তির এই আত্মবিকাশের কাজকে সহজতর করে তোলে। এই সব অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই ব্যক্তির সৃজনী বৃত্তির স্ফূরণ হয় এবং ব্যক্তি ব্যক্তি-কল্যাণ ও জনকল্যাণের আদর্শকে সংযুক্তভাবে লাভ করার জন্য ইচ্ছুক হয়।

পরিবারের (Family) একটা মনস্তত্ত্বমূলক দিক আছে এবং তার একটা দার্শনিক দিকও আছে। পরিবারের একটা আবেগময় ভিত্তি আছে। আমাদের দৈহিক প্রবৃত্তি, মানসিক আবেগ, অনুভূতি ও প্রবণতার কেন্দ্র এই পরিবার। সহবাস ও সন্তান উৎপাদন ছাড়াও, ব্যক্তির স্নেহ, যত্ন, মায়া-মমতা, অনুরাগ, প্রীতি প্রভৃতি অনুভূতি ও আবেগ পরিবারকে কেন্দ্র করেই তার পরিতৃপ্তি খুঁজে বেড়ায়। পরিবারের দার্শনিক ভিত্তি হল—পরিবার তার অন্তর্ভুক্ত সভ্যদের মধ্যে নৈতিক আদর্শের চেতনা ও নৈতিক গুণের উন্মেষসাধন করে। সামাজিক দায়িত্ববোধ, পারস্পরিক সহযোগিতাবোধ ও সম্ভ্রমবোধ পরিবার তার সভ্যদের মধ্যে জাগিয়ে তোলে এবং এই বোধ পরিবারের সভ্যদের জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে জনকল্যাণমূলক কার্য সম্পাদনের জন্য উপযুক্ত করে তোলে।

সম্প্রদায়েরও (Community) একটা মনস্তত্ত্বমূলক ভিত্তি আছে। মানুষ সঙ্ঘবদ্ধ

হয়ে, ঐক্যবদ্ধ হয়ে বসবাস করতে চায়। মানুষের এই সঙ্ঘবদ্ধতার প্রবৃত্তি বা যূথ প্রবৃত্তি সম্প্রদায়ের মাধ্যমেই পরিতৃপ্ত হয়। স্বাজাত্যবোধ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত সভ্যদের মধ্যে গোষ্ঠী-দায়িত্ববোধের স্মচনা করে। এই বোধ মানুষের পরহিত সাধনের প্রবৃত্তিকে তীব্র করে তোলে। অবশ্য এই জাতীয় স্বাজাত্যবোধ কোন কোন ক্ষেত্রে অত্যন্ত উগ্রভাবে অত্মপ্রকাশ ক'রে সম্প্রদায়িক বিরোধ ও ভেদবুদ্ধির স্মচনা করে। তবে সমাজের বিবর্তন ও অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই জাতীয় বোধেরও যে পরিবর্তন হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। সম্প্রদায়ের একটা দার্শনিক ভিত্তিও আছে। প্রতিটি সম্প্রদায়ই কতকগুলি সামাজিক আদর্শে বিশ্বাস স্থাপন করে,যে আদর্শগুলি সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত সভ্যদের মধ্যে স্বজাতিবোধের সঞ্চার করে। অবশ্য সব সম্প্রদায়ই যে এইসব সামাজিক আদর্শের দার্শনিক তাৎপর্য পুর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম বা উপলব্ধি করে তা নয়, তবে সমাজের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই আদর্শে বিশ্বাস যে বিচার, বিশ্লেষণ ও যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে তা বলা বাহুল্য।

রাষ্ট্রের (State)-ও একটা মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি আছে। রাষ্ট্র সমাজের সভ্যদের সামাজিক আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে, নাগরিকদের মধ্যে সামাজিক চেতনার উন্মেষ ঘটায়; রাষ্ট্রের অধীনে থেকে নাগরিকরা সুশৃঙ্খলভাবে আচরণ করতে শেখে। রাষ্ট্রের অস্তিত্বের মূলে একটা দার্শনিক ভিত্তি আছে। সাম্য, মৈত্রী ও ন্যায়ের আদর্শ এবং সামজিক নীতির আদর্শকে কার্যকর করে তোলার পক্ষে রাষ্ট্রই উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান। কোন্ ধরনের রাষ্ট্র পূর্বোক্ত আদর্শকে কার্যকর করে তুলতে পারে তা বিতর্কের বিষয়। তবে সমাজের সকল দিকের ওপর ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করার ক্ষমতা রাষ্ট্রেরই আছে।

সম্পত্তির (Property) একট মনস্তত্ত্বমূলক ভিত্তি আছ। অনেকের মতে মানুষের সংগ্রহণের সহজাত প্রবৃত্তির জন্যই মানুষ সম্পত্তির অধিকারী হতে চায়। কিন্তু অনেকের মতে মানুষের সম্পত্তির মালিকানার যে ইচ্ছা তার মূলে রয়েছে নানারকম জটিল আবেগ। নিজের এবং সন্তান সন্ততির ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার চিন্তা, অপরের ওপর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার বাসনা, দৈনন্দিন জীবনের চাহিদার পরিতৃপ্তি বা উচ্চতর লক্ষ্য সাধনের ইচ্ছা, ব্যক্তির অহং-ভাব, অর্থাৎ ভালবাসা, প্রত্যাশা, ভীতি, উদ্বেগ, অহঙ্কার, ঈর্ষা প্রভৃতি সম্পত্তির অধিকারী হবার মূলে বর্তমান। সম্পত্তির দর্শনিক ভিত্তি হল সীমিত পরিমাণে সম্পত্তির মালিকানা ব্যক্তির আত্মবিকাশ ও আত্মোপলব্ধির পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। সম্পত্তি পরিশ্রমের পুরস্কার। সম্পত্তিই ব্যক্তির কাজে উদ্দীপনা যোগায়।

শিক্ষা সম্পর্কীয় প্রতিষ্ঠানগুলিরও (Educational Institutions) মনস্তত্ত্বমূলক ও দার্শনিক ভিত্তি আছে। এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান মানুষের বৌদ্ধিক দিকটিকে সুগঠিত ও বিকশিত করতে সাহায্য করে; মানুষের সৃজনী প্রতিভাকে বিকশিত করে সহায়তা করে

মানুষের ব্যক্তিত্বকে পূর্ণভাবে বিকশিত করার জন্য সাহায্য করে। এই হল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির দার্শনিক গুরুত্ব হল যে, সমাজের সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল হল এই সব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান। সত্য, শিব ও সুন্দর—জীবনের এই পরমমূল্যের বোধও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি মানুষের মনে জাগ্রত করে। সে কারণে সভ্য সমাজে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির গুরুত্ব সমধিক। উন্নত সমাজে অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠান-গুলি কোন্ পথে অগ্রসর হবে, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি তার নির্দেশ প্রদান করে।

সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলির (Cultural Institutions) মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি হল যে, এগুলি মানুষের বিভিন্ন আবেগ ও অনুভূতিকে সুস্থভাবে পরিতৃপ্ত করার কেন্দ্রস্বরূপ। সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান মানুষের সৃজনী প্রবৃত্তির বিকাশে সহায়তা করে। এর দার্শনিক ভিত্তি হল এই সব সামাজিক প্রতিষ্ঠান মানুষের মনে পারস্পরিক সহযোগিতা, নীতিবোধ ও পরমমূল্যের বোধ জাগ্রত ক'রে সামাজিক ঐক্য ও জনকল্যাণের আদর্শকে সুদৃঢ় করে তোলে। বস্তুতঃ সমাজের গুণগত অগ্রগতি (qualitative development) শিক্ষা-মূলক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলির ওপর নির্ভর করে।

ধর্ম-সম্পকীয় অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানেরও (Religious Institutions) মনস্তত্ত্বমূলক ভিত্তি আছে। কারণ ধর্মের মধ্যে মানুষের তিনটি মানসিক প্রক্রিয়া—বুদ্ধি, অনুভূতি ও ইচ্ছা প্রকাশিত হয়। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষের মনের এই তিনটি দিকেরই প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। সমাজ-দার্শনিকের চোখে যা কিছু শুভ, শ্রেয় ও সুন্দর তার প্রতি অনু-রাগই যথার্থ ধর্ম সম্পর্কীয় অনুরাগ। সুতরাং যেসব প্রতিষ্ঠান যথার্থ ধর্ম-প্রতিষ্ঠান তাদের উচিত মানুষের মনে এই অনুরাগ জাগ্রত করা ও বর্ধিত করা। ধর্ম সম্পর্কীয় অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের দার্শনিক ভিত্তি হল যে, ধর্মের আচারগত দিকটির ওপর গুরুত্ব না দিয়ে যদি ধর্মের প্রকৃত ভাবকে উপলব্ধি করা যায় তবে ধর্ম সম্পর্কীয় প্রতিষ্ঠানগুলি এক বিরাট ঐক্যের সূত্ররূপে সমস্ত মানুষের মধ্যে এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করে মানবজাতির সামগ্রিক কল্যাণের আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করতে সহয়তা করে।

তৃতীয় অধ্যায়

রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে মতবাদ
(Theories of the Nature of State)

১। ভূমিকা: রাষ্ট্র শব্দটিকে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার
(Introduction : Various uses of the term 'State' :

'রাষ্ট্র' শব্দটির সঙ্গে যদিও আমরা বিশেষভাবে পরিচিত, তবু 'রাষ্ট্রের' সংজ্ঞা নির্ণয় করা খুব সহজসাধ্য নয়। বস্তুতঃ, অনেক সময় রাষ্ট্র কথাটিকে জাতি, সম্প্রদায়, সরকার বা দেশ অর্থে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু রাষ্ট্র এগুলি থেকে স্বতন্ত্র। সে কারণে সম্প্রদায়, জনসাধারণ, দেশ, জাতি, খণ্ড-জাতি, সরকার, রাষ্ট্র এবং সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রভৃতি শব্দগুলির প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করা একান্ত প্রয়োজন।

(ক) সমাজ (Society) : যখন কিছু লোক একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হয় তখনই তাকে সমাজ বলা হয়। ভিন্ন ভাষায়, মানুষের ইচ্ছাকৃত যে কোন পারস্পরিক সম্পর্কই হল সমাজ। যেমন, আমরা বলি যৌথ সমাজ (Co-operative Society), বৈজ্ঞানিক সমাজ (Scientific Sciety) ইত্যাদি। এরূপ সমাজের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে সকল সময়ই ব্যক্তিগত সম্পর্ক নাও থাকতে পারে।

(খ) সম্প্রদায় (Community) : সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রেও বহু ব্যক্তি একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হয় এবং এরূপ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য হল একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলে অবস্থান এবং এর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে বর্তমান কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্যের অস্তিত্ব (common characteristics)। একই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে একটি আধ্যাত্মিক সম্পর্ক সৃষ্টি করে। যেমন—গ্রাম্য সম্প্রদায়, সমাজতন্ত্রবাদী সম্প্রদায় ইত্যাদি। অনেক সময় আমরা 'বিশ্ব-সম্প্রদায়' কথাও ব্যবহার করে থাকি। সমগ্র মনুষ্যজাতি যদি একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একই ভ্রাতৃত্বের নিবিড় বন্ধনের পারস্পরিক সম্পর্কে যুক্ত হতে পারে, তাহলে সমগ্র মনুষ্য জাতিকেও এক মনুষ্য সম্প্রদায় হিসেবে অভিহিত করা যেতে পারে।

(গ) জনসাধারণ (People) : যখন কিছুসংখ্যক লোকের মধ্যে ঐতিহ্যমূলক ও ভাবগত ঐক্য পরিলক্ষিত হয়, তখনই তাদের আমরা জনসাধারণ বলি। জনসাধারণ

সকল সময়ই যে একত্রে বসবাস করে তা নয়। তবে ভাষায়, আচার-ব্যবহারে, ধর্মীয় অনুভূতি, অধিকারবোধ ও অভাব-অভিযোগ সম্পর্কে সমচেতনা—এগুলিই বহু লোককে জনসাধারণে পরিণত করে। যেমন—ইহুদী জনসাধারণ সকল সময়ই একত্রে বসবাস করে নি, তবু কৃষ্টি, ঐতিহ্য, ভাষা, আচার-ব্যবহারের ঐক্য তাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়।

(ঘ) **দেশ** (Country) : দেশ বলতে বুঝি সেই ভূখণ্ড যেখানে কোন জাতি বসবাস করে। দেশ কথাটি একটু দুর্বোধ্য এবং যেভাবে দেশ কথাটিকে ব্যবহার করা হয় তাতে মনে হয় যে এর মধ্যে ভৌগোলিক এবং রাজনৈতিক উভয় উপাদানই বর্তমান। সময় সময় দেশ কথাটিকে জাতির সঙ্গে একার্থক বলে মনে করা হয়। গ্রেট ব্রিটেনকে দেশ বলে অভিহিত করা হলেও গ্রেট ব্রিটেনের অন্তর্ভুক্ত ইংল্যাণ্ড এবং স্কটল্যাণ্ড ভিন্ন দেশ। আয়ারল্যাণ্ডকে গ্রেট ব্রিটেনের সঙ্গে যুক্ত করা হলেও উভয়কে একই দেশরূপে গণ্য করা যেতে পারে না।

(ঙ) **বংশ** (Race) : প্রাকৃতিক গঠন, মনোভাব, অভ্যাস, চিন্তাধারা অনুভূতি ও কার্যকলাপ কতকগুলি লোককে অন্যান্য লোক থেকে পৃথক করে। এসব দৈহিক, মানসিক ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়ার জন্য এসব লোককে একই বংশগত বলে অভিহিত করা হয়। যেমন, আর্য বা দ্রাবিড় বংশ। অনেক ক্ষেত্রে বংশগত পার্থক্য এত সুস্পষ্ট যে, এক বংশকে অপর বংশ থেকে পৃথক করে নেওয়া মোটেই কষ্টসাধ্য নয়। যেমন, নেপালীদের সহজেই কাবলীওয়ালাদের থেকে পৃথক করে নেওয়া যায়। কিন্তু সব সময় যে বংশগত বৈশিষ্ট্য লোকদের পৃথক করে রাখবে এ রকম কোন কথা নেই। যেমন, দার্জিলিং অঞ্চলে অনেক নেপালী আছে যারা বাংলা তথা ভারতের অন্যান্য অধিবাসীদের সঙ্গে নিজেদের সুন্দরভাবে মিশিয়ে দিয়েছে।

(চ) **জাতি** (Nation) : জাতি হল গভীর রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন জনসমষ্টি যা সাধারণতঃ কোন একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে স্থায়িভাবে বসবাস করে এবং যাদের পরস্পরের মধ্যে ধর্মগত, সংস্কৃতিগত, ঐতিহ্যগত, ভাষা ও সাহিত্যগত প্রভৃতি কোন-না-কোন বা ঐ সকল বিষয়ে ঐক্য বর্তমান। জাতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল রাজনৈতিক চেতনা এবং ঐক্য-চেতনা ও ঐক্যবোধের জন্য তারা একটা স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করে বা গঠন করার জন্য সচেষ্ট হয়, অথবা কোন সময়ে তারা রাষ্ট্র গঠন করেছিল। এজন্য রাজনৈতিক চেতনা ও ঐক্যবোধই জাতীয়তাবোধের ভিত্তি। গত ইংরেজ শাসনের আমলে যদিও ভারত-বাসী কোন রাষ্ট্র গঠন করতে সক্ষম হয় নি, তবুও তাদের মধ্যে বংশগত, ঐতিহ্যগত, ভাষাগত, ধর্মগত ও সাহিত্যগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও এক সুমহান রাজনৈতিক চেতনা ও ঐক্যবোধ ভারতবাসীকে একটি জাতিতে পরিণত করেছিল।

(ছ) খণ্ডজাতি (Nationality) : খণ্ড জাতি এমন একটি দল যার ব্যক্তিরা গোষ্ঠীগত, ভাষাগত বা অতীতের কোন বন্ধন বা বৈশিষ্ট্যের দ্বারা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। খণ্ড জাতির লোকেরা যে একই ভূখণ্ডে বাস করবে এরকম কোন কথা নেই। যেমন—বহু বাঙালী ব্রহ্মদেশে এবং আন্দামানে বংশানুক্রমে বাস করা সত্ত্বেও নিজেদের বাঙালী বলে থাকে, যদিও এদের আচারব্যবহার স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে অনেক পরিমাণে মিলে গেছে। এজন্য জাতি এবং খণ্ড জাতিকে অনেক সময় একই অর্থে ব্যবহার করা হলেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য বর্তমান।

(জ) রাষ্ট্রের শাসনযন্ত্র বা সরকার (Government) : জনসাধারণ অনুমোদিত আইনের সহায়তায় সুশৃঙ্খলভাবে জীবনযাপন করে। এই আইন প্রয়োগ করার জন্য এবং আইন লঙ্ঘনকারীদের শাস্তি দেওয়ার জন্য একটি শাসনযন্ত্রের বা সরকারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। যে কর্তৃপক্ষ আইন প্রণয়ন করে এবং আইনগুলিকে প্রয়োগ করে সেই কর্তৃপক্ষই হল সরকার। এই সরকারের কর্তৃত্ব এক বা একাধিক ব্যক্তির ওপর ন্যস্ত থাকতে পারে এবং এই সরকারের শাসনের কর্তৃত্ব নিরপেক্ষ বা শর্তাধীন হতে পারে। তাছাড়া, এই কর্তৃত্ব সমস্ত জাতির ওপর এবং জাতির অংশবিশেষের ওপর প্রযুক্ত হতে পারে। কাজেই সরকার এবং রাষ্ট্র এক ও অভিন্ন নয়।

২। রাষ্ট্র কাকে বলে ? (What is a state ?) :

বিভিন্ন লোক রাষ্ট্রের বিভিন্ন ধরনের সংজ্ঞা দিয়েছেন। ম্যাকেঞ্জি (Mackenzie) রাষ্ট্রের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন—"রাষ্ট্র হল এমন একটি জনসমষ্টি যা কোন একটি সরকারের অধীন, যে সরকার অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় না।" আমেরিকার ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতি উইলসন (W. Wilson) রাষ্ট্রের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন—'একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে আইনানুসারে সংগঠিত জনসমষ্টিই হল রাষ্ট্র।' অধ্যাপক হল (Hall) রাষ্ট্রের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন—'রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্থায়িভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ থেকে সর্বপ্রকার মুক্ত জনসমাজ, তাই রাষ্ট্র।' অধ্যাপক গার্নার (Prof. Garner) রাষ্ট্রের সংজ্ঞা এইভাবে নির্দেশ করেছেন : 'রাষ্ট্র হল বহু সংখ্যক ব্যক্তির দ্বারা গঠিত এমন একটি জনসমষ্টি যা একটা নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্থায়িভাবে বসবাস করে, যা সম্পূর্ণভাবে বা বহুল পরিমাণে বহিঃশক্তির শাসনমুক্ত এবং যার একটি সুসংগঠিত শাসন ব্যবস্থা আছে, যার প্রতি জনসমষ্টির

অধিকাংশ স্বাভাবিক আনুগত্য প্রদর্শন করে।'[1] গার্নার (Garner)-এর সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে রাষ্ট্রের চারটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়া যায়, যথা—(i) জনসমষ্টি (ii) নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, (iii) সরকার এবং (iv) সার্বভৌমিকতা।

(i) **জনসমষ্টি** (Population) : জনসমষ্টি ছাড়া কোন রাষ্ট্রের গঠন সম্ভব নয়। জনহীন শূন্যতার মাঝখানে কোন রাষ্ট্রের উদ্ভবের কথা কল্পনা করা যায় না। বিশৃঙ্খল জনসমষ্টিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্যই রাষ্ট্রের সৃষ্টি। সুতরাং জনসংখ্যা রাষ্ট্রের প্রধান উপাদান। রাষ্ট্রের জনসমষ্টির কোন নির্দিষ্ট সীমা নেই। জনসংখ্যা কমও হতে পারে, বেশীও হতে পারে।

(ii) **নির্দিষ্ট ভূখণ্ড** (Territory) রাষ্ট্রের জনসমষ্টির একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের অধিকারী হওয়া প্রয়োজন। যেহেতু কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের অধিকারী নয়, সেহেতু যাযাবর জাতির পক্ষে রাষ্ট্র গঠন করা সম্ভব নয়। রাষ্ট্রের জনসমষ্টির মতো রাষ্ট্রের আয়তনেরও কোন নির্দিষ্ট সীমা নেই। রাষ্ট্র ক্ষুদ্রায়তনের অথবা বৃহদায়তনের হতে পারে।

(iii) **সরকার** বা **শাসনতন্ত্র** (Government) : জনসমষ্টি যদি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাস করে তাহলেই রাষ্ট্র গঠিত হয় না। রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য কোন একটি শাসনযন্ত্র বা সরকার প্রয়োজন। সরকার রাষ্ট্রের ইচ্ছা, উদ্দেশ্য, নীতি ও আইন-কানুনকে কার্যে পরিণত করে, আইন প্রণয়ন, শাসন ও বিচার—সরকারের এই তিনটি প্রধান বিভাগ বর্তমান। সরকার ছাড়া কোন রাষ্ট্র গঠিত হতে পারে না। কোন কারণে যদি রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা অকেজো হয়ে পড়ে তাহলে রাষ্ট্রে দেখা দেয় অরাজকতা এবং জনসাধারণের মধ্যে কোন শৃঙ্খলা থাকে না।

অনেক সময় রাষ্ট্র (State) এবং সরকারকে (Government) অভিন্ন মনে করা হয়। কিন্তু এরূপ ধারণা ভ্রান্ত। রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা সরকারের মাধ্যমেই পরিচালিত হয়। সরকার রাষ্ট্রের অংশ বিশেষ। সুতরাং সমগ্র রাষ্ট্রের সঙ্গে সরকারকে এক করে দেখার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ নেই। তাছাড়া দেশের জনসমষ্টিকে নিয়ে রাষ্ট্র গঠিত হয়, আর মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক নিয়েই সরকার গঠিত হয়। দেশের শাসনযন্ত্র বা সরকারের নানারকম পরিবর্তন ঘটতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্র হল মোটামুটি স্থায়ী। শাসনযন্ত্রের পরিবর্তন ঘটলেও রাষ্ট্রের পরিবর্তন ঘটে না। রাষ্ট্র হল বস্তুনিরপেক্ষ, সরকার হল বাস্তব ঘটনা।

---

1. "A state is a community of persons more or less numerous, permanently occupying a definite portion of territory, independent or nearly so, of external contol and possessing an organised Goverment to which a great body of inhabitants render habitual obedience."—Garner.

সরকারের কার্যাবলী জনসাধারণ প্রত্যক্ষ করে এবং সরকারের সংস্পর্শে আসতে পারে। বিভিন্ন রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য এক, সেহেতু রাষ্ট্রের কোন প্রকারভেদ নেই। কিন্তু রাষ্ট্রের সরকার বিভিন্ন নীতি অনুযায়ী গঠিত হতে পারে, সেহেতু সরকারের প্রকারভেদ আছে।

(iv) **সার্বভৌমিকতা** (Sovereignty): সার্বভৌমিকতাই রাষ্ট্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার দুটি দিক আছে:

প্রথমতঃ, আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে রাষ্ট্রের অপ্রতিহত ক্ষমতা এবং সর্বপ্রকারের বহিঃশক্তির শাসন থেকে মুক্ত বা স্বাধীন থাকা। আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য রাষ্ট্র অধিবাসীদের ওপর আইন-কানুন প্রয়োগ করতে পারে। এ ব্যাপারে রাষ্ট্র চরম ক্ষমতার অধিকারী। দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্র সর্বপ্রকার বহিঃশাসন বা নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হয়ে বৈদেশিক ব্যাপারে নিজ নীতি নির্ধারণ করতে পারে। অবশ্য অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে নানারকম চুক্তি করার জন্য রাষ্ট্রকে তার নিজের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত করতে হয়; তবে তার অর্থ এই নয় যে রাষ্ট্রের কোনো সার্বভৌমিকতা নেই। ম্যাকেঞ্জি (Mackenzie) বলেন, "এর সার্বভৌমিকতার পক্ষে যা প্রয়োজন তা হল, যে সব সীমার দ্বারা এ সীমিত হয় সেগুলি সে নিজেই স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে।"[1] রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রকৃতপক্ষে জনসাধারণেরই ক্ষমতা এবং রাষ্ট্রের শাসনযন্ত্র বা সরকার জনসাধারণের পক্ষ থেকেই দেশের শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করেন।

গার্নারের সংজ্ঞা রাষ্ট্রের দুটি বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে—একটি সামাজিক, অপরটি রাজনৈতিক, রাষ্ট্র সমাজ এবং এছাড়াও আরও কিছু। এই আরও কিছু হল রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা। এই কারণেই গিস্‌বার্ট (Gisbert) রাষ্ট্রের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, রাষ্ট্র হল সমাজের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংগঠন (the supreme regulating structure of the community)।

৩। রাষ্ট্রের উৎপত্তি (Origin of the state):

মানুষের সঙ্ঘবদ্ধতাই রাষ্ট্র ও অন্যান্য সামাজিক সংগঠনের উদ্ভবের কারণ। বর্তমানে রাষ্ট্রের উৎপত্তির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভবপর হলেও কিছুদিন পূর্বেও তা সম্ভবপর হয়নি। কাজেই অনেক কল্পনাপ্রসূত মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে। রাষ্ট্র সম্পর্কে বর্তমানে গৃহীত মতবাদটি আলোচনার পূর্বে আমরা অন্যান্য কয়েকটি মতবাদও আলোচনা করব:

---

1. "All that is essential to its sovereignty is that the restriction by which it is limited should have been voluntarily adopted."

—Mackenzie: Outlines of Social Philosophy; Page 130.

(ক) **ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদ** (Theory of Divine Origin) : রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে এইটিই সবচেয়ে প্রাচীন মতবাদ। এই মতবাদ অনুসারে রাষ্ট্র ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্ট। ঈশ্বর এই পৃথিবীর কয়েকজন নির্বাচিত প্রতিনিধির কাছে তাঁর ইচ্ছাকে প্রকাশ করেন। এই প্রতিনিধিরাই সাধারণের কাছে ঈশ্বরের ইচ্ছাকে প্রকাশ করেন এবং সাধারণের নায়ক হিসেবে দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই মতবাদের চরম রূপ হল, রাজা যেহেতু ঈশ্বরের প্রতিনিধি, তিনি একমাত্র ঈশ্বরের কাছেই দায়ী। প্রজাদের কাছে তাঁর কোন দায়িত্ব নেই। রাজাকে অমান্য করার অর্থ ঈশ্বরের ইচ্ছাকে অমান্য করা।

সমালোচনা (Criticism) :

রাজা ঈশ্বরের প্রতিনিধি

প্রথমতঃ, ঈশ্বরের ইচ্ছা তাঁর নির্বাচিত কয়েকজন প্রতিনিধির কাছেই কেবলমাত্র প্রকাশিত হয়েছিল, এটি বিশ্বাসের ব্যাপার, এর সমর্থনে কোন যুক্তিসঙ্গত তথ্য উপস্থাপিত হয় নি। দ্বিতীয়তঃ, রাজা একমাত্র ঈশ্বরের নিকট দায়ী, প্রজাদের নিকট নয়, এই বিষয়টি স্বীকার করে নিলে স্বৈরাচারিতাকে সমর্থন করতে হয়। তৃতীয়তঃ, প্রজা উৎপীড়নকারী রাজাও ঈশ্বরের প্রতিনিধি, এই সিদ্ধান্ত যুক্তিসঙ্গত নয়। চতুর্থতঃ, রাষ্ট্রের উৎপত্তির ব্যাপারে জনসাধারণের ইচ্ছার যে একটা ভূমিকা আছে, এই মতবাদ সেই বিষয়টিকে অগ্রাহ্য করে, যা যুক্তির দ্বারা স্বীকার করে নেওয়া যায় না।

(খ) **বলপ্রয়োগ মতবাদ** (Theory of Force) : এই মতবাদ অনুসারে রাষ্ট্রের উৎপত্তির মূলে রয়েছে পাশবিক বলের কর্তৃত্ব। মনুষ্য সমাজের আদিম স্তরে কেবলমাত্র বলবান ব্যক্তিই যে দুর্বল ব্যক্তিকে বশীভূত করার জন্য সচেষ্ট হত তা নয়, বলশালী গোষ্ঠী দুর্বল গোষ্ঠীকে বশীভূত করে তার ওপর কর্তৃত্ব করত। এইভাবে উপজাতির (tribes) উদ্ভব হয়। এই উপজাতির মধ্যে আবার সংঘর্ষ দেখা দিল, তখন বিজয়ী উপজাতি বিজিত উপজাতিদের ওপর নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করল। উপজাতিগুলি আরও বিস্তৃতি লাভ করে রাজ্যে এবং রাজ্যগুলি ক্রমশঃ সাম্রাজ্যে পরিণত হল।

রাষ্ট্রের উৎপত্তির মূলে রয়েছে পাশবিক বল

সমালোচনা (Criticism) : প্রথমতঃ, পাশবিক বল রাষ্ট্র গঠনের অন্যতম উপাদান হতে পারে, কিন্তু একমাত্র উপাদান নয়। মানুষের সামাজিক প্রকৃতি, ধর্মের বন্ধন, রাজনৈতিক চেতনা প্রভৃতি অন্যান্য উপাদানগুলিও রাষ্ট্রের গঠনে প্রয়োজনীয় উপাদান রূপে গণ্য। দ্বিতীয়তঃ, জনসাধারণের সম্মতিই রাষ্ট্রের ভিত্তি, পাশবিক বল নয়।

(গ) পিতৃতান্ত্রিক ও মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ (Patriarchal and Matriarchal Theories) : কোন কোন লেখকের মতে পরিবারের সম্প্রসারণ থেকেই রাষ্ট্রের উদ্ভব। এ সম্পর্কে দুটি মতবাদ প্রচলিত—পিতৃতান্ত্রিক ও মাতৃতান্ত্রিক। পিতৃতান্ত্রিক মতবাদ অনুসারে আদিমতম সমাজে পরিবারের পিতাই ছিল গৃহকর্তা এবং পিতার দিক থেকেই উত্তরাধিকার, বংশ প্রভৃতি নির্ধারিত হত। আধুনিক কালের লেখকদের মধ্যে স্যার হেনরী মেইন (Sir Henry Maine)-ই এই মতবাদের সমর্থক। ম্যাকলেনান (Mclennan), মর্গান (Morgan), জেঙ্কস্ (Jenks) প্রমুখ মাতৃতান্ত্রিক মতবাদের সমর্থক। এই মতবাদ অনুসারে আদিমতম সমাজে পরিবারে ছিল মাতারই কর্তৃত্ব এবং উত্তরাধিকার, বংশ প্রভৃতি মাতার দিক থেকেই নির্ধারিত হত।

পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের পিতার এবং মাতৃতান্ত্রিক পরিবারের মাতার দিক থেকেই উত্তরাধীকারীর বংশ প্রভৃতি নির্ধারিত হত

সমালোচনা (Criticism) :

যেসব কারণবশতঃ পিতৃতান্ত্রিক ও মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ গ্রহণযোগ্য নয় সেগুলি হল, প্রথমতঃ, আদিমতম সমাজে পিতৃতান্ত্রিক বা মাতৃতান্ত্রিক, কোন প্রকার পরিবারই সর্বজনীন ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, কারও কারও মতে সমাজ সংগঠনের আদিমতম রূপ হল উপজাতি (Tribe), পরিবার নয়। তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্রের উৎপত্তির ব্যাপারে রক্তের সম্বন্ধই একমাত্র উপাদান নয়, অন্যান্য বহু গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের—যেমন, রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার অস্তিত্ব আছে। চতুর্থতঃ, এই মতবাদ পরিবার ও রাষ্ট্রের মধ্যে যে পার্থক্য বর্তমান তা উপেক্ষা করে। গার্নার (Garner)-এর মতে পরিবার ও রাষ্ট্রের মধ্যে সংগঠন, কার্য ও উদ্দেশ্য সকল দিক থেকেই পার্থক্য বর্তমান। উভয়ের মধ্যে কোন সম্পর্ক আছে বা একটি অপরটি থেকে উদ্ভূত, এরূপ ধারণা করার পেছনে অল্পই যুক্তি রয়েছে।

(ঘ) সামাজিক চুক্তি মতবাদ (Social Contract Theory) : এই মতবাদ অনুসারে আদিম মানুষের মধ্যে চুক্তির ফলে রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। রাষ্ট্রের উদ্ভবের পূর্বে মানুষ 'প্রকৃতি রাজ্যে' (State of Nature) বাস করত। যেহেতু তখন রাষ্ট্র প্রণীত কোন আইন-কানুন ছিল না, মানুষ স্বাধীনভাবে যে যার খুশিমত চলত। কতকগুলি স্বাভাবিক আইন (Natural laws) এই সময় মানুষের স্বেচ্ছাচারিতাকে নিয়ন্ত্রণ করত। কিন্তু এই অবস্থায় বেশীদিন বাস করা সম্ভব নয় বলে মানুষ নিজের সুবিধার জন্য পরস্পরের মধ্যে চুক্তি করে রাষ্ট্রের পত্তন করল। রাষ্ট্রের উদ্ভবের পর রাষ্ট্র প্রণীত আইন-কানুন স্বাভাবিক আইনে নয়

সামাজিক চুক্তির ফলেই রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়

স্থান অধিকার করল। প্রাচীন গ্রীসের সোফিস্ট দার্শনিকরা (Sophists) এই মতবাদ সমর্থন করেছেন। সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরেজ দার্শনিক হব্‌স্ (Hobbes) ও লক (Locke) এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী দার্শনিক রুশো (Rousseau) এই মতবাদের প্রধান সমর্থক। হব্‌স্-এর মতে প্রকৃতির অবস্থা হল প্রাক্-সামাজিক অবস্থা এবং এই অবস্থা ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ। তখন মানুষ ছিল স্বার্থপর, ক্ষমতালিপ্সু এবং বিবাদপ্রিয়। মানুষের স্বার্থপরতার জন্য মানুষের মধ্যে বিবাদ, কলহ লেগেই থাকত। ফলে ঐ পরিবেশে মানুষের জীবন ছিল 'নিঃসঙ্গ, নিঃস্ব, কদর্য, পাশবিক এবং সঙ্কীর্ণ। লকের মতে প্রাথমিক অবস্থা ছিল প্রাক্ রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থা। এই অবস্থা ছিল শান্তি, শুভেচ্ছা ও পারস্পরিক সহযোগিতার অবস্থা। এ অবস্থায় মানুষের জীবন-যাত্রা প্রাকৃতিক আইন ও স্বাভাবিক আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত। কিন্তু এই আইনের কোন সুস্পষ্ট সংজ্ঞা ছিল না। এই আইন ব্যাখ্যা করার ও লঙ্ঘন করলে শাস্তি দেবার কোন কর্তৃপক্ষ ছিল না। রুশোর মতে প্রাকৃতিক অবস্থায় মানুষ সুন্দর, সহজ, সরল, মুক্ত ও সুখী জীবন-যাপন করত। জনসংখ্যার বৃদ্ধি, ব্যক্তিগত সম্পত্তির সূচনা এবং মানুষের মধ্যে চিন্তার উন্মেষ এই 'প্রকৃতি রাজ্যের' সাম্য ও সুখ-শান্তি নষ্ট করল—সংঘর্ষ, বিরোধ, বিবাদ, অরাজকতার সৃষ্টি হল। অবশেষে মানুষ নিজেদের মধ্যে একটি পারস্পরিক চুক্তি সম্পাদন করে নিজেদের ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে সমষ্টির ইচ্ছার অধীনস্থ করল। সমষ্টিগত ইচ্ছার দ্বারাই সমাজের সাম্য রক্ষিত হল।

সমালোচনা (Criticism) :

প্রথমতঃ, এই মতবাদের কোন ঐতিহাসিক সত্যতা নেই। রাষ্ট্রনৈতিক চেতনাশূন্য মানুষ হঠাৎ একদিন সামাজিক চুক্তির সাহায্যে রাষ্ট্র গঠন করল, এরূপ উদাহরণ ইতিহাসে পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়তঃ, প্রাকৃতিক অবস্থায় মানুষ পূর্ণ স্বাধীন ছিল, এ কল্পনা যথার্থ নয়। প্রাকৃতিক অবস্থায় যথেচ্ছাচারিতা থাকতে পারে, প্রকৃত স্বাধীনতা থাকতে পারে না। তৃতীয়তঃ, এ মতবাদ অযৌক্তিক, কেননা, মানুষের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা থাকলেই সামাজিক চুক্তির প্রশ্ন ওঠে। রাষ্ট্র উদ্ভবের পূর্বে রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার অস্তিত্ব স্বীকার করা যেতে পারে না।

(ঙ) ঐতিহাসিক মতবাদ বা বিবর্তনবাদ (Historical or Evolutional Theory) **:** এই মতবাদই রাষ্ট্রের উৎপত্তির ব্যাখ্যা হিসেবে গ্রহণযোগ্য মতবাদরূপে স্বীকৃত হয়েছে। এই মতবাদ অনুসারে রাষ্ট্র হঠাৎ কোন একদিন ঈশ্বরের খেয়াল বা মানুষের চুক্তির ফলে উদ্ভূত হয়নি। মানব সমাজ বহুদিন ধরে বিবর্তিত হতে হতে বর্তমানের জটিল রূপ পরিগ্রহণ করেছে। রাষ্ট্রের উদ্ভবের মূলে রয়েছে চারটি উপাদান

—রক্তের সম্পর্ক (kinship), ধর্ম (religion), বল (force), এবং রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা (Political consciousness)। মানুষের স্বভাবের মধ্যেই রাষ্ট্রের উৎপত্তির কারণ নিহিত। মানুষের মধ্যে রয়েছে সঙ্ঘবদ্ধ হবার এবং বিচ্ছিন্ন হবার প্রবণতা। সঙ্ঘবদ্ধ হবার প্রবণতা থেকেই মানুষ পরিবার গঠন করেছে এবং বিচ্ছিন্ন হবার প্রবণতা থেকেই মানুষ দল গঠন করেছে। রক্তের সম্বন্ধই বিভিন্ন দলের মধ্যে সংহতি বজায় রেখেছে। ঐক্যবদ্ধ বিভিন্ন পরিবার গোষ্ঠী (clan)-রূপে গণ্য হতে লাগল। রক্তের সম্পর্কই গোষ্ঠীপতিকে গোষ্ঠীর ওপর কর্তৃত্ব করার সুযোগ করে দিল। গোষ্ঠীর সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি পাবার পর যখন রক্তের সম্পর্কের বন্ধন শিথিল হয়ে পড়ল, তখন ধর্মই ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখতে লাগল। সমাজ বিবর্তনের তৃতীয় স্তরে তখন গোষ্ঠী সম্প্রসারিত হয়ে উপজাতি (tribe)-র সৃষ্টি হল এবং শক্তিশালী উপজাতি বল প্রয়োগ করে অন্য উপজাতিদের বশীভূত করতে লাগল। এই বল প্রয়োগকারী শক্তি ক্রমশঃ সার্বভৌম শক্তিতে পরিণত হল এবং যে নায়ক এই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হলেন মানুষ তারই আনুগত্য স্বীকার করল। এই অবস্থায় মানুষ উপজাতীয় ঐক্য সম্পর্কে সচেতন হল। মানুষের মধ্যে রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার উদ্ভব হল। রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার উদ্ভবের ফলে মানুষ সচেতনভাবে উপজাতিদের নায়কের আনুগত্য স্বীকার করল। অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপও রাষ্ট্র উদ্ভবে নানাভাবে সহায়তা করেছে। অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের জন্য সমাজে শ্রেণীর সৃষ্টি। সমাজস্থ শক্তিশালী শ্রেণীই শাসনতন্ত্র বা সরকারকে করতলগত করে নিজেদের স্থায়ী প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করে অন্যান্য শ্রেণীর ব্যক্তিদের স্বার্থসিদ্ধির কাজে নিয়োজিত করল। রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার উদ্ভবের ফলে মানুষের বিভিন্ন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য অনেক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের আবির্ভাব ঘটল।

সামাজিক বিবর্তনের ফলে রাষ্ট্রের উদ্ভব

রক্তের সম্পর্ক, ধর্ম, বল এবং রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা রাষ্ট্রের উদ্ভবের মূলে বর্তমান

কাজেই বিবর্তনের ফলেই রাষ্ট্রের উদ্ভব। গার্নার বলেন, "রাষ্ট্র ঈশ্বরের সৃষ্ট নয়, পাশবিক বলের ফল নয়, চুক্তির দ্বারা সৃষ্ট নয় বা পরিবারের সম্প্রসারণ রূপেও একে গণ্য করা চলে না"।

৪। সমাজ এবং রাষ্ট্র (Society and State) :

অনেক সময় 'রাষ্ট্র' এবং 'সমাজ' কথা দুটিকে একই অর্থে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু উভয়ের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বর্তমান। রাষ্ট্র হল অন্যান্য সামাজিক সংগঠনের মতো একটি সামাজিক সংগঠন, যদিও সমাজে যত রকম সঙ্ঘ বা প্রতিষ্ঠান আছে রাষ্ট্রের স্থান তার মধ্যে সর্বোচ্চ। মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক থেকেই সমাজের সৃষ্টি। মানুষ পরস্পরের সঙ্গে মিলেমিশে সঙ্ঘবদ্ধ জীবনযাপন করতে চায়, তার এই সহজাত আকাঙ্ক্ষাই সমাজের ভিত্তি। মানুষের যে-কোন সম্পর্কই সামাজিক সম্পর্ক নয়। মানুষ পরস্পরের

সম্পর্কে সচেতন না হলে সামাজিক সম্পর্কের উদ্ভব হয় না। গিসবার্ট (Gisbert)-এর মতে 'পারস্পরিক স্বীকৃতি' সে প্রত্যক্ষই হোক বা পরোক্ষই হোক সামাজিক সম্পর্কের বৈশিষ্ট্য কিন্তু রাষ্ট্র হল এমন একটি সংগঠন, যে কতকগুলি বিধি, নিয়ম বা আইন প্রবর্তিত করে সমাজ-জীবনের বিভিন্ন দিকগুলিকে পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধবদ্ধ রাখে। সমাজের মধ্যে নানা প্রতিষ্ঠান বা সঙ্ঘ বর্তমান। এই সকল সঙ্ঘ বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অনেক সময় বিরোধ দেখা দেয়। কোন একটি সংগঠনের ওপর যদি এই সঙ্ঘ বা প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার কর্তৃত্ব না থাকে তাহলে সমাজ-জীবনের ঐক্য ও শান্তি বিনষ্ট হয় এবং সমাজ-জীবনে অরাজকতা দেখা দেয়। রাষ্ট্রই সেই সংগঠন যা সমাজের বিভিন্ন সঙ্ঘ ও প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে তাদের মধ্যে সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য রক্ষা করে। সুতরাং রাষ্ট্র সমাজ, তবে গিসবার্ট যুক্তিযুক্তভাবেই নির্দেশ করেছেন যে, রাষ্ট্র আরও অধিক কিছু। এই অধিক কিছুই হল রাষ্ট্রের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য, অর্থাৎ রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা

অনেকে মনে করেন, সমাজ ও রাষ্ট্র হল এক ও অভিন্ন। প্রাচীন গ্রীকরা রাষ্ট্র ও সমাজকে অভিন্ন বলে মনে করতেন। পরবর্তী যুগে রুশো (Rousseau), হেগেল (Hegel) এবং বোসাঙ্কয়েট (Bosanquet)-ও সমাজ ও রাষ্ট্রকে অভিন্ন বলে মনে করেছেন। কিন্তু রাষ্ট্র এবং সমাজ এক ও অভিন্ন নয়। সমাজের পরিসর বা ক্ষেত্র রাষ্ট্রের পরিসর বা ক্ষেত্রের তুলনায় অনেক ব্যাপক। রাষ্ট্র সমাজের মধ্যে একটি সংগঠন। উভয়ের মধ্যে প্রভেদ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ম্যাকাইভার (MacIver) বলেন, "রাষ্ট্র হল এমন একটি গঠন যা সমাজের সঙ্গে সমকালীন বা সমব্যাপক নয় বরং বিশেষ উদ্দেশ্য লাভ করার জন্য একটি নির্দিষ্ট সংগঠনরূপে সৃষ্ট।"[1] সমাজের অভ্যন্তরে রাষ্ট্র ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের সংগঠন আছে, যেমন—আর্থিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় সংগঠন প্রভৃতি, যেগুলি মানুষের নানা ধরনের প্রয়োজন মিটিয়ে থাকে। সমাজের অন্তর্ভুক্ত সভ্যদের এবং সমাজের বিভিন্ন সঙ্ঘ বা প্রতিষ্ঠানগুলিকে রাষ্ট্র নিরাপত্তা দান করে। সামাজিক শৃঙ্খলা ও শান্তি সংরক্ষণের পক্ষে রাষ্ট্রই সবচেয়ে উপযুক্ত সংগঠন। সমাজের অন্তর্ভুক্ত সভ্যবৃন্দ বিভিন্ন সঙ্ঘ বা প্রতিষ্ঠানের সভ্য হতে পারেন কিন্তু তাঁরা একটি মাত্র রাষ্ট্রেরই নাগরিক হতে পারেন। রাষ্ট্রের লক্ষ্য সমাজের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের আত্মোপলব্ধিতে সহায়তা করা। এই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রকে এমন কতকগুলি কার্য করতে হয়, যা অন্য কোন সামাজিক সংগঠনের পক্ষে করা সম্ভব নয়। অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠান যেসব কার্য

1. "........The State is structure and co-extensive with society but built within it as a determinate order for the attainment of specific ends."

—MacIver : The Modern State, Page 40

সম্পাদন করে রাষ্ট্র বিনা প্রয়োজনে তাদের কার্যে হস্তক্ষেপ করে না, সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য কখনও কখনও হস্তক্ষেপ করতে হয়। তাছাড়া, মানুষের সকল রকম সামাজিক সম্পর্ক রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণাধীনে আসতে পারে না।

সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান। মানুষের বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনকে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব মেনে চলতে হয়। মানুষের সকল রকম সামাজিক সম্পর্ক রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন না হলেও মানুষকে তার সামাজিক আচার-আচরণকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হয় যাতে রাষ্ট্রের নীতির সঙ্গে তার কোন বিরোধিতা দেখা না দেয়।

অপরপক্ষে, রাষ্ট্রেরও এমন নীতি প্রবর্তন করা উচিত নয়, যার ফলে সমাজ-জীবনের শান্তি ও শৃঙ্খলা বিনষ্ট হয়। বস্তুতঃ সুশৃঙ্খল সমাজ-জীবনের জন্যই রাষ্ট্রের প্রয়োজন। সমাজ-জীবনকে নিয়ন্ত্রিত ও সংগঠিত করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের ওপরই ন্যস্ত। প্রত্যেকটি ব্যক্তিরই নিজেকে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত করে সমাজের অগ্রগতিতে সহায়তা করা প্রয়োজন। কিন্তু ব্যক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করার পথে যেসব অন্তরায় বর্তমান, সেগুলিকে দূরীভূত করা রাষ্ট্রের কর্তব্য। ন্যায়পরায়ণতার ওপরই রাষ্ট্রের ভিত্তি হওয়া প্রয়োজন, সুতরাং রাষ্ট্রের পক্ষে এমন কিছু করা উচিত নয় যাতে সমাজ-জীবনের শান্তি ও ঐক্য ব্যাহত হয়। লাস্কি (Laski) বলেন, "আমরা রাষ্ট্রকে মেনে চলি, কারণ রাষ্ট্র শেষ পর্যন্ত আমাদের যথার্থ প্রতিনিধিত্ব করে। ...যখন আমরা একে মানি, আমরা প্রকৃতপক্ষে তখন নিজেদেরই মানছি, অথবা আমরা সেই শ্রেষ্ঠ সত্তাকে মেনে চলেছি যা আমাদের সঙ্গীদের সঙ্গে আমাদের অভিন্ন করে তোলে।"[1]

৩। রাষ্ট্রের স্বাভাবিক ভিত্তি (The Natural Basis of the State):

রাষ্ট্র সম্পর্কে আমরা একটি প্রশ্নের সম্মুখীন হই যে, রাষ্ট্রের কি কোন স্বাভাবিক ভিত্তি আছে বা রাষ্ট্র কি একটি স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠান? এই প্রসঙ্গে এ প্রশ্নও উত্থাপন করা হয় যে, আমাদের সামাজিক জীবনে যেসব প্রাথমিক সংগঠনের অস্তিত্ব আমরা দেখি সেগুলিরও কি কোন স্বাভাবিক ভিত্তি আছে, অথবা, এরা সব কৃত্রিম? আমরা ইতিপূর্বে

1. "We obey the state because in the end it most truly represents ourselves when we obey it. We are, in truth, obeying ourselves or rather we are obeying the best self which makes us one with and of our fellows."

—Laski : A Grammar of Politics, Page 29

দেখেছি যে, পরিবার সমাজ-জীবনের স্বাভাবিক সংগঠন, কৃত্রিম নয়। পরিবার ছাড়াও মানুষের শিক্ষা ও অন্যান্য প্রয়োজন মেটাবার জন্য যেসব শিক্ষা ও শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে সেগুলিও নানা রকমের সংগঠনের সৃষ্টি করে। এসব প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য যখন কোন শাসনযন্ত্রের প্রয়োজন দেখা দেয় তখন মনে হতে পারে যে এ শাসনযন্ত্র হল কৃত্রিম এবং মানুষের ওপর একে জোর করে বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু এ নিয়ন্ত্রণ বা শাসনের ব্যাপারটি নিছক কৃত্রিম, স্বাভাবিক নয়,—এ কথা বলা চলে না। প্রাণিজগতেও দেখা যায় যে, বিভিন্ন দলের দলপতি থাকে এবং প্রয়োজনানুসারে তার নির্দেশ মানতে সমস্ত দলটিই বাধ্য হয়। অবশ্য কেউ কেউ মনে করেন যে, এ জাতীয় নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন মানুষের দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক। কিন্তু বস্তুতঃ, সমাজ-জীবনে ঐক্য বজায় রাখার জন্য পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের যে প্রয়োজন আছে তা অস্বীকার করা চলে না।

সামাজিক চুক্তি মতবাদের সমর্থকবৃন্দ, নৈরাজ্যবাদী এবং মার্কসবাদীরা মনে করেন যে সমাজ স্বাভাবিক নয়, কৃত্রিম প্রতিষ্ঠান। সামাজিক চুক্তি মতবাদের সমর্থকবৃন্দ মনে করেন যে, মানুষের সামাজিক প্রকৃতি থেকে স্বাভাবিকভাবে রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে নি। রাষ্ট্র মানুষের সৃষ্টি এবং সে কারণে একটি কৃত্রিম সংগঠন। নৈরাজ্যবাদীরাও মানুষের সামাজিক প্রকৃতি থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাষ্ট্রের উৎপত্তি ঘটেছে মনে করেন না, কারণ রাষ্ট্র উৎপীড়নের যন্ত্র মাত্র। যে সমাজে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বর্তমান সে সমাজে ব্যক্তির স্বাধীন বিকাশ সম্ভব নয়। নৈরাজ্যবাদীরা রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে রহিত করে, সমাজের মধ্যে উদ্ভূত স্বতঃস্ফূর্ত সংগঠনগুলির (voluntary associations) দ্বারাই রাষ্ট্রের অত্যাবশ্যক কার্যগুলি, যেমন—আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষা, বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করা প্রভৃতি সম্পন্ন করতে চান। মার্কসবাদীদের মতে রাষ্ট্র মোটেও স্বাভাবিক সংগঠন নয়। মানুষের সামাজিক প্রকৃতি থেকে রাষ্ট্র উদ্ভূত নয়। তাঁদের মতে এমন এক সময় ছিল যখন কোন রাষ্ট্রের অস্তিত্বই ছিল না।[1] এ্যাঙ্গেলস (Engels) বলেন, "অনন্তকাল" ধরেই যে রাষ্ট্র অস্তিত্বশীল তা নয়। এমন অনেক সমাজের অস্তিত্ব ছিল যারা এটা ছাড়াই কাজ চালিয়েছে, যাদের রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রের শক্তি সম্পর্কে কোন ধারণা ছিল না। অর্থনৈতিক উন্নয়নের এক বিশেষ স্তরে যখন সমাজে অনিবার্য কারণবশতঃ শ্রেণী বিভাগ দেখা দিয়েছিল তখন এই শ্রেণী বিভাগের ফলেই রাষ্ট্র অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছিল। মার্কসবাদীদের মতে রাষ্ট্র একটি

সামাজিক চুক্তি মতবাদের সমর্থকবৃন্দ, নৈরাজ্যবাদী এবং মার্কসবাদীরা মনে করেন সমাজ স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠান নয়

1. The Origin of the Family. Private Property and the State. Page. 161

বলপ্রয়োগের প্রতিষ্ঠান। শোষিত শ্রেণীর ওপর বল প্রয়োগ করার জন্য পুঁজিবাদীরা এই যন্ত্রের ব্যবহার করেন।"

সমালোচনা

পূর্বোক্ত অভিমতগুলি সমর্থনযোগ্য নয়। সামাজিক চুক্তি মতবাদ ভ্রান্ত মতবাদ। এই মতবাদের কোন ঐতিহাসিক সত্যতা নেই। নৈরাজ্যবাদীরা সমাজে উদ্ভূত স্বতঃস্ফূর্ত সংগঠনগুলির দ্বারা রাষ্ট্রের কাজ চালাতে চান। কিন্তু তাঁরা লক্ষ্য করেন নি যে, এই সংগঠনগুলিরই একটির রাষ্ট্রে পরিণত হবার সম্ভাবনা থাকতে পারে। অর্থনৈতিক সম্পর্কের সাহায্যে মার্কসবাদীরা রাষ্ট্রের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করতে চান। কিন্তু শুধুমাত্র অর্থনৈতিক কারণেই রাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘটেনি। জৈবিক ও জাগতিক প্রয়োজন ছাড়াও উচ্চতর প্রয়োজনের পরিতৃপ্তি সাধনের জন্যও রাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘটেছে। রাষ্ট্র কখনও বিলুপ্ত হতে পারে না।

রাষ্ট্র মানুষের সামাজিক প্রকৃতি থেকেই উদ্ভূত

রাষ্ট্র স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠান, এই অর্থে যে, মানুষের মধ্যে অন্তর্নিহিত যে সামাজিক প্রকৃতি তার থেকেই রাষ্ট্রের উদ্ভব। রাষ্ট্রকে মানুষের ওপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়নি। জৈবিক, মানসিক ও উচ্চতর, সব রকম প্রয়োজনের পরিতৃপ্তির বাসনা থেকেই মানুষ-কোন সংগঠনের নিয়ন্ত্রণকে মেনে নিয়েছে। অ্যারিস্টটল (Aristotle)-এর মতে মানুষ একটি রাজনৈতিক জীব। নিছক জীবনের প্রয়োজন থেকেই রাষ্ট্রের উদ্ভব, কিন্তু সৎ জীবনযাপনের জন্যই এর স্থায়িত্ব। রাষ্ট্র স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠান কারণ অ্যারিস্টটলের মতে পরিপূর্ণ সভ্য জীবনের সম্ভাবনা এর মধ্যে নিহিত। সময়ের দিক থেকে পরিবার আগে, কিন্তু প্রকৃতির দিক থেকে রাষ্ট্র আগে, কেননা, পরিবারের তুলনায় রাষ্ট্র অনেক বেশী উন্নত। কাজেই রাষ্ট্র স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠান, কোন কৃত্রিম প্রতিষ্ঠান নয়।

৬। রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ (Different theories of the Nature of State) :

রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ যদিও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়, তবু রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও আদর্শ নির্ধারণ করার জন্য এগুলি সমাজদর্শনেরও আলোচ্য বিষয়বস্তু। এ মতবাদগুলির মধ্যে মাত্র উল্লেখযোগ্য কয়েকটির আলোচনা নীচে করা হচ্ছে :

(ক) **রাষ্ট্র হল ব্যক্তিসত্তাবিশিষ্ট** (The State as Personal) : কোন কোন লোক মনে করেন রাষ্ট্র তার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের ব্যক্তিসত্তা ছাড়াও এক অতিরিক্ত ব্যক্তিসত্তার অধিকারী। একজন শরীরধারী ব্যক্তি ব্যক্তিত্ব, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য, আত্মসচেতনতা এবং ইচ্ছার অধিকারী। রাষ্ট্র ব্যক্তিসত্তার অধিকারী হওয়ার জন্য উপরি-উক্ত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। একজন স্বাভাবিক ব্যক্তির মতো রাষ্ট্রও ইচ্ছা করতে ও

কাজ করতে পারে। কয়েকজন জার্মান চিন্তাবিদ এই মতবাদের সমর্থক, ব্লাঙ্‌লি তাঁদের মধ্যে একজন। ব্লাঙ্‌লি (Bluntchli) রাষ্ট্রের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে রাষ্ট্রকে পুরুষরূপে কল্পনা করেছেন। তাঁর মতে রাষ্ট্র পুরুষ, গীর্জা হল স্ত্রী। সে যাই হোক, বহু বিষয়ে মানুষের কার্যাবলীর সঙ্গে রাষ্ট্রের কার্যকলাপের সাদৃশ্য লক্ষ্য করেই এ মতবাদের সমর্থক-বৃন্দ রাষ্ট্রের ওপর মানুষের ব্যক্তিত্ব আরোপ করেছেন।

সমালোচনা (Criticism) **:**

কিন্তু এ মতবাদ গ্রহণযোগ্য নয়। মানুষের সঙ্গে রাষ্ট্রের অবশ্য কয়েক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে কিন্তু তা বলে রাষ্ট্রকে যথার্থ ব্যক্তি বা মানুষ রূপে কল্পনা করা যেতে পারে না। ব্যক্তি যেমন পূর্ব থেকে বিচার-বিবেচনা করে কাজ করতে পারে বা তার কাজের জন্য যেমন তাকে দায়ী করা হয়, তেমনি যে কোন প্রতিষ্ঠানকেই দায়ী করা যেতে পারে; তা বলে তাকে ব্যক্তিরূপে কল্পনা করা যেতে পারে না। বস্তুতঃ রাষ্ট্রের ব্যাপারে দায়িত্ব কার, এ স্থির করা অনেক সময় কঠিন হয়ে পড়ে। কার্যতঃ, রাষ্ট্রের দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয় কোন এক বা একাধিক ব্যক্তির ওপর যাঁরা রাষ্ট্রের বিভিন্ন শাসনকার্য পরিচালনা করেন। সুতরাং বিশেষ ব্যক্তির ওপরেই রাষ্ট্রের শাসনভার ন্যস্ত থাকে, রাষ্ট্রের পক্ষ হয়ে তাঁরাই কার্য পরিচালনা করেন। এজন্য রাষ্ট্রকেই ব্যক্তি মনে করা কোন কারণেই সংগত নয়। আঙ্গিক মতবাদে (Organic Theory) এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। রাষ্ট্রকে পুরুষরূপে গণ্য করা শুধুমাত্র অযৌক্তিক নয়, অবাস্তব ব্যাপার।

(খ) রাষ্ট্র সম্পর্কীয় দার্শনিক মতবাদ (**The Philosophical Theory of the State**) **:** দার্শনিক Kant, Fichte, Hegel, Bosanquet এবং Green—এ মতবাদের সমর্থক। এ মতবাদ অনুযায়ী রাষ্ট্রকে অতিমানবীয় ব্যক্তি (Super-Personal) রূপে কল্পনা করা হয়েছে। প্লেটো (Plato) এবং অ্যারিস্টটল (Aristotle)-এর ধারণা থেকেই রাষ্ট্রের স্বরূপ সম্পর্কে এই দার্শনিক তত্ত্ব বা মতবাদের উদ্ভব। প্লেটো (Plato) এবং অ্যারিস্টটল (Aristotle)-এর মতে রাষ্ট্র হল স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠান এবং রাষ্ট্রের মধ্য থেকেই মানুষ তার জীবনকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তুলতে পারে। জার্মান দার্শনিক কাণ্ট (Kant)-ও রাষ্ট্রের কর্তৃত্বকে ঐশ্বরিক অবদান বলে কল্পনা করেছেন। কাণ্ট (Kant)-এর পর জার্মান দার্শনিক হেগেল (Hegel) রাষ্ট্রের ওপর দেবত্ব বা অতিমানবীয় সত্তা আরোপ করে রাষ্ট্রকেই দেবতা বলে কল্পনা করেছেন। হেগেল (Hegel) বলেন, "এই মর্তে স্বর্গীয় ভাবের মূর্তরূপ রাষ্ট্র।[1] তাঁর মতে রাষ্ট্রের মধ্যে বসবাস করেই ব্যক্তি তার প্রকৃত

---

1. "The state is the Divine Idea as it exists on earth."
— Hegel : Philosophy Of History (English Translation). Page 41.

স্বাধীনতা উপভোগ করতে পারে, সেজন্য ব্যক্তির পরম কর্তব্য হল রাষ্ট্রের সভ্য হওয়া (His highest duty is to be a member of the state)।[1] রাষ্ট্রের ইচ্ছা রাষ্ট্রের অধীনস্থ ব্যক্তিদের প্রকৃত ইচ্ছার সমন্বয়। একেই বলা হয় সর্বগত ইচ্ছা (general will)। এই সর্বগত ইচ্ছাই রাষ্ট্রের কার্যকলাপের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। এজন্য রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করা প্রত্যেক ব্যক্তির অবশ্য কর্তব্য। ব্যক্তি তার নাগরিক কর্তব্য যথারীতি সম্পাদন করেই নিজের সত্তাকে পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পারে এবং যদি ব্যক্তি এই কর্তব্য সম্পাদান করা থেকে বিরত হয় তাহলে সে তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে হারায়। হেগেলের (Hegel) মতে নৈতিকতা মূর্তরূপ গ্রহণ করেছে রাষ্ট্রের মধ্যে। তাঁর মতে রাষ্ট্র হল একটি আত্মসচেতন নৈতিক সত্তা।

বোসাঙ্কোয়েট (Bosanquet)-এর মতবাদ অনুযায়ী মানুষের প্রকৃত ইচ্ছা এবং অপ্রকৃত ইচ্ছার মধ্যে পার্থক্য আছে। হবহাউস (Hobhouse) বলেন, "ডক্টর বোসাঙ্কোয়েট (Dr. Bosanquet)-এর মতে আমরা যাকে জানি সেই বাস্তব ইচ্ছার অন্তরালে একটা গভীর যথার্থ ইচ্ছা আছে যা হল বাস্তব ইচ্ছার সুসংগঠিত ও সম্পূর্ণভাবে সংগতি বা সামঞ্জস্যযুক্ত রূপ।"[2] কোন ব্যক্তির ইচ্ছা যদি রাষ্ট্রের ইচ্ছার বিরোধী হয় তাহলে মনে করতে হবে যে সেই ব্যক্তি তার প্রকৃত ইচ্ছার দ্বারা পরিচালিত না হয়ে অপ্রকৃত ইচ্ছার দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। ব্যক্তির ঊর্ধে রাষ্ট্রের স্থান। ব্যক্তির ঊর্ধ্বে রাষ্ট্রের নিজস্ব ইচ্ছা আছে, অধিকার আছে। যেহেতু সর্বগত বা সর্বসাধারণের ইচ্ছা রাষ্ট্রের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়, সেহেতু রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করা প্রতিটি ব্যক্তিরই অবশ্য কর্তব্য। রাষ্ট্র সকল রকম সমালোচনার ঊর্ধ্বে। রাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যক্তির ইচ্ছার সংঘর্ষ বা বিরোধিতা দেখা দিলে ব্যক্তিকেই তার ইচ্ছা পরিবর্তিত করে রাষ্ট্রের ইচ্ছার সঙ্গে নিজের ইচ্ছার সামঞ্জস্য স্থাপন করতে হবে।

বোসাঙ্কোয়েট (Bosanquet) যদিও দার্শনিক মতবাদকে সমর্থন করেছেন এবং ব্যক্তির ঊর্ধ্বে রাষ্ট্রের স্থান নির্দিষ্ট করেছেন, তবুও ব্যক্তির ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সম্পূর্ণ বিলোপ-সাধনের কথা তিনি সমর্থন করেন নি। রাষ্ট্রের কাজ হল ব্যক্তির আত্মবিকাশের পথে যে সব অন্তরায় বর্তমান সেগুলিকে অপসারিত করে ব্যক্তির আত্মবিকাশের উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলা। বোসাঙ্কোয়েট (Bosanquet) রাষ্ট্রের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, "রাষ্ট্র হল সেই সমাজ যা সাধারণতঃ আইনসংগতভাবে বলপ্রয়োগ করার

1. Hegel: Philosophy of Right, Page 306.
2. "According to Dr. Bosanquet, then there is underlying the actual will of which we are aware. A deeper real will which is the actual will recognised and made completely consistent or coherent."
—Hobhouse: A Metaphysical Theory of State, Page 42

সংগঠনরূপেই স্বীকৃত হয়ে আসছে।"[1] গ্রীন (Green)-ও ব্যক্তির মৌলিক অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়ে রাষ্ট্রের কর্তৃত্বের সীমা নির্দেশ করেছেন। ব্যক্তির অধিকারকে উপযুক্ত স্বীকৃতি দিলেই রাষ্ট্র ব্যক্তির আনুগত্য লাভের প্রকৃত অধিকারী হয়। গ্রীন (Green) বলেন, "সমাজ-প্রদত্ত কতকগুলি ক্ষমতালাভের জন্য ব্যক্তির যে দাবী বা অধিকার এবং ব্যক্তির ওপর ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য সমাজের যে অনুরূপ দাবী, উভয় নির্ভর করছে এই শর্তের ওপর যে, নৈতিক জীব হিসেবে মানুষের কর্তব্যকর্মকে পূর্ণ করার জন্য এবং নিজের ও অপরের চরিত্রের পূর্ণ বিকাশের জন্য ঐ ক্ষমতা ব্যবহার করতে হবে।"[2]

সমালোচনা (Criticism):

প্রথমতঃ, রাষ্ট্র সম্পর্কীয় দার্শনিক মতবাদের সমালোচনায় বলা যেতে পারে যে, এ মতবাদ যে রাষ্ট্রের কথা বলে, সে রাষ্ট্র হল আদর্শ রাষ্ট্র, কোন বাস্তব রাষ্ট্র নয়। ল্যাস্কি (Laski)-র মতে রাষ্ট্র সম্পর্কীয় দার্শনিক মতবাদ, আদর্শের সঙ্গে বাস্তবের সম্পর্কের যে সমস্যা তার সন্তোষজনক সমাধান করতে পারেনি।[3] এর ফলে এ মতবাদ রাজনৈতিক বাধ্যতাবোধ ব্যাখ্যা করতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ, এ মতবাদ অনুযায়ী রাষ্ট্র ও সমাজ অভিন্ন। কিন্তু এ ধারণা ভ্রান্ত। রাষ্ট্র ছাড়াও সমাজের মধ্যে নানারকম সংগঠন বর্তমান; যেমন— শিক্ষাসম্পর্কীয় সংগঠন, ধর্মীয় সংগঠন, অর্থনৈতিক সংগঠন ইত্যাদি।

তৃতীয়তঃ, এ মতবাদ অনুসারে রাষ্ট্রের ইচ্ছা সকল ব্যক্তির প্রকৃত ইচ্ছার সমন্বয় এবং ব্যক্তির ইচ্ছা যদি রাষ্ট্রবিরোধী হয় তাহলে সেই ইচ্ছা ব্যক্তির অপ্রকৃত ইচ্ছা, প্রকৃত ইচ্ছা নয়। কিন্তু ইচ্ছার এই বিভাগ মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। ল্যাস্কি (Laski) বলেন,

---

1. "The state is that society which is habitually recognised as a unit lawfully exercising force"

—Bosanquet: Philosophical Theory of the state: Page 189

2. "The claim or right of the individual to have certain powers secured to him by society and the counter claim of society to exercise certain powers over the individual alike rest on the fact that these powers are necessary to the fulfilment of man's vocation as a moral being, to an effectual self-devotion to the work of developing the perfect character in himself and others"

—T. H. Green; Principles of Political Obligation, Page 387

3. "The truth in short is that the idealist theory of the state has not satisfactorily solved, at least in its most notable modern formulation, the essential problem of the relation between the ideal and the real."

—Laski: State in Theory and Practice; Page 57.

"ইচ্ছার বিশ্লেষণে এ মতবাদ মনস্তত্ত্বের দিক থেকে পর্যাপ্ত নয়।"[1] ইচ্ছাকে এভাবে ভাগ করা যায় না।

চতুর্থতঃ, এ মতবাদ অনুযায়ী রাষ্ট্র একটি অতিমানবীয় সত্তা, কিন্তু রাষ্ট্রের ওপর দেবত্ব আরোপ করা কোন মতেই যুক্তিযুক্ত নয়।

পঞ্চমতঃ, ল্যাস্কি (Laski) বলেন, "এই দার্শনিক মতবাদের আর একটি ত্রুটি হল, এ মতবাদ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের স্বরূপকে বুঝতে পারে না।"[2] ব্যক্তি যদিও রাষ্ট্রের অধীন, তবু তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে উপেক্ষা করা সমীচীন নয়। দার্শনিক মতবাদ মানুষকে পূর্ণরূপে দেখে না। মানুষের মধ্যে যেমন বুদ্ধিবৃত্তি আছে তেমনি প্রবৃত্তি আছে; মানুষ প্রবৃত্তি এবং বিচারশক্তি উভয়ের দ্বারা পরিচালিত হয়। কিন্তু এ মতবাদ মানুষের প্রবৃত্তির দিকটিকে উপেক্ষা ক'রে মানুষের বিচারশক্তির ওপরই অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করে। এই আংশিক দৃষ্টিভঙ্গিই এ মতবাদকে ত্রুটিপূর্ণ করে রেখেছে।

(গ) রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্কসীয় মতবাদ (Marxian Theory of the State) **:** এই মতবাদ অনুসারে মালিকশ্রেণী কর্তৃক শ্রমিকশ্রেণীকে শাসন করার জন্য রাষ্ট্র একটি যন্ত্র বা উপায় (The State is the organ of class rule)। মার্কসীয় মতবাদ রাষ্ট্রের কোন অতিমানবীয় সত্তা স্বীকার করে না। ভাববাদী দার্শনিক Hegel, Fichte এবং Bosanquet রাষ্ট্রের ওপর যে আধ্যাত্মিক সত্তা আরোপ করেন মার্কসবাদ তা অস্বীকার করে। এ মতবাদ অনুসারে রাষ্ট্র হল প্রধানতঃ বলপ্রয়োগের প্রতিষ্ঠান এবং সমাজ বিবর্তনের এক বিশেষ স্তরে এই রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটেছে। অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজে যে ধনগত বৈষম্যের সৃষ্টি হল তার ফলে সমাজ কতকগুলি শ্রেণীতে বিভক্ত হল, কতকগুলি শ্রেণী উৎপাদনের উপকরণের ওপর নিজেদের মালিকানাকে প্রতিষ্ঠিত করল। এরাই হল পুঁজিপতি শ্রেণী। এদের সংখ্যা স্বল্প হলেও উৎপাদনের একচেটিয়া অধিকার এদের হাতে। এই মালিকশ্রেণী কেবলমাত্র উৎপাদনের উপকরণের একচেটিয়া অধিকারী নয়, সমাজের আইন-কানুনের প্রতিষ্ঠান, এক হিসেবে সব কিছুরই মালিক। এই মালিকশ্রেণী নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য শ্রমিকশ্রেণীর অগণিত জনসাধারণকে শোষণ করে। শ্রমজীবীরা দিনের পর দিন শোষিত হওয়ার ফলে মালিকশ্রেণীর সঙ্গে তাদের বিরোধ বা সংঘর্ষ দেখা দেয়। তখন এই মালিকশ্রেণী রাষ্ট্রের সহায়তায় এই শ্রমিক-

1. "It is psychologically inadequate in its analysis of the nature of will.
—Laski : State in Theory and Practice, Page 57.

2. "It is a further weakness in the idealist view that it fails to understand the nature of individuality."
—Laski : State in Theory and Practice ; Page 58

শ্রেণীর ওপর শোষণ ও দমন নীতি চালায়। এইভাবে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে যে অর্থ-নৈতিক সংঘর্ষ বা দ্বন্দ্ব দেখা দেয় তা রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে। শ্রমিকশ্রেণী চায় মালিক শ্রেণীর হাত থেকে রাষ্ট্রের ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে নিজেদের করায়ত্ত করতে।

মার্কস (Marx)-এর সহকর্মী এঙ্গেল্‌স (Engels) 'রাষ্ট্রের বিলুপ্তির' (withering away of the state) কথা বলেছেন। সমাজের মধ্যে শ্রেণীর দ্বন্দ্ব চরমে পৌছায় যখন সমাজে মাত্র দুটি শ্রেণী থাকে—এক শোষক-পুঁজিপতির দল আর এক শোষিত-শ্রমজীবীর দল,—যারা হল সর্বহারা। পুঁজিপতির দল আপ্রাণ চেষ্টা করে এই শোষিতকে বশীভূত করে রাখার জন্য। কিন্তু পুঁজিপতি-সমাজের আভ্যন্তরীণ বিরোধের অস্তিত্বের ফলে সেই সমাজের ভাঙন ধরে এবং শ্রমিকশ্রেণী অধিকতর শক্তির অধিকারী হয়। অবশেষে মালিকশ্রেণীর সম্পূর্ণ বিলোপ সাধিত হবে। সর্বহারাদের এই বিপ্লবের সঙ্গে পূর্ববর্তী বিপ্লবের পার্থক্য আছে। কার্ল মার্কস (Karl Marx) বলেন, "পূর্ববর্তী সব ঐতিহাসিক আন্দোলন ছিল সংখ্যালঘুদের আন্দোলন বা সংখ্যালঘুদের স্বার্থে আন্দোলন। সর্বহারাদের এই আন্দোলন হল অসংখ্য সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বার্থে অসংখ্য সংখ্যাগরিষ্ঠের সচেতন স্বাধীন আন্দোলন।"[1] পুঁজিপতিদের রাষ্ট্রের জায়গা দখল করবে শ্রমজীবীদের শাসনব্যবস্থা এবং ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের স্থলে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু শ্রেণী-সংগ্রাম বা শ্রেণীবিরোধ ততদিন একেবারে বিলুপ্ত হবে না যতদিন না জগৎ থেকে শোষকশ্রেণীকে সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত করে এক শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ততদিন পর্যন্ত রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বজায় থাকবে। ধীরে ধীরে যখন বিরোধী শক্তি সম্পূর্ণভাবে বশীভূত হবে, সমাজের বুকে যখন আর কোন শ্রেণীবিরোধ থাকবে না, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা যখন দ্রুত বিস্তার লাভ করতে থাকবে এবং রাষ্ট্রের শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা ক্রমশঃ হ্রাস পাবে, তখন শেষ পর্যন্ত শ্রেণীহীন সমাজ উদ্ভূত হবে এবং রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ বিলোপ ঘটবে (The State will wither away)। এই শ্রেণীহীন সমাজ-ব্যবস্থাই হল **সমভোগবাদ** (Communism)।

মার্কসীয় মতানুসারে সমভোগবাদের আদর্শই হল সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ যার দিকে সমস্ত মনুষ্যসমাজ ধাবিত হচ্ছে।

---

1. All previous historical movements were movements of minorities or in the interests of minorities, The Proletarian movement is the self-conscious independent movement of the immense majority in the interest of the immense majority."—Karl Marx.

সমালোচনা (Criticism) :

(১) মার্কসবাদীরা মনে করেন যে, রাষ্ট্র স্বভাবতঃই একটি বল প্রয়োগের যন্ত্র। একথা সত্য যে, শক্তিশালী শ্রেণী দুর্বলের ওপর অত্যাচার ও উৎপীড়নের জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে প্রয়োগ করেছে, কিন্তু তার থেকেই এই সিদ্ধান্ত করা যুক্তিযুক্ত নয় যে রাষ্ট্র বলপ্রয়োগের যন্ত্রমাত্র।

(২) আধুনিক জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের লক্ষ্য বিভিন্ন পরিকল্পনার মাধ্যমে রাষ্ট্রের নাগরিকবৃন্দের জনকল্যাণ সাধন করা। এই রাষ্ট্রের লক্ষ্য সব রকম শোষণ ও উৎপীড়ন বন্ধ করা ও গণতন্ত্রের মূল নীতিগুলিকে কার্যকর করে তোলা। প্রতিটি নাগরিক যাতে নিজের সুপ্ত গুণগুলিকে বিকশিত করে নিজের ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করতে পারে সেই উদ্দেশ্যে সকলকে সমান সুযোগ দেওয়া ও সকলের স্বার্থ রক্ষা করা জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের লক্ষ্য। কাজেই আধুনিক জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রকে বলপ্রয়োগের যন্ত্ররূপে আখ্যাত করা যেতে পারে না।

(৩) মার্কসবাদীরা রাষ্ট্রের উৎপত্তির যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা যথার্থ নয়। কেবলমাত্র অর্থনৈতিক কারণের সাহায্যেই রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও বিকাশ ব্যাখ্যা করা সমীচীন নয়। জাগতিক প্রয়োজন ছাড়াও, অন্যান্য প্রয়োজনও রাষ্ট্রের উৎপত্তির ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

(৪) আধুনিক ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষার জন্য প্রভূত যত্ন নেওয়া হয়। শ্রমিক সঙ্ঘগুলি শ্রমিকদের কল্যাণের দিকে এতই নজর রাখে যে পুঁজিবাদীদের পক্ষে শ্রমিকদের ওপরে অত্যাচার চালান খুবই কঠিন হয়ে পড়ে।

(৫) মার্কসবাদ অনুসারে যখন সমাজে কোন শ্রেণীবিরোধ থাকবে না তখন রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ বিলোপ ঘটবে। ভবিষ্যতে যথার্থ কোন রাষ্ট্র থাকবে কি থাকবে না—তা নিয়ে আলোচনা চলতে পারে, কিন্তু সে সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌছান যায় না। যা ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত তাহল দূর কল্পনার বিষয় যার কোন বিজ্ঞানসম্মত রূপ স্থির করা যায় না। এ প্রসঙ্গে মার্কসবাদ অবৈজ্ঞানিক মতবাদে পরিণত হচ্ছে।

মার্কসবাদের সমালোচনা

(৬) শ্রেণীহীন এবং রাষ্ট্রহীন সমাজ-ব্যবস্থা কল্পনার বিষয়; বাস্তবে এই জাতীয় সমাজ-ব্যবস্থার প্রবর্তন আদৌ সম্ভব কিনা চিন্তার বিষয়।

(ঘ) রাষ্ট্র সম্পর্কীয় যান্ত্রিক মতবাদ (The State as Mechanism) : এই মতবাদের সমর্থকবৃন্দ রাষ্ট্রকে একটি যান্ত্রিক সংগঠনরূপে গণ্য করেন। রাষ্ট্র কোন আঙ্গিক ঐক্য নয়, বরং একটি কৃত্রিম যন্ত্র, যেটি মানুষ তার কতকগুলি উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য সৃষ্টি করেছে। একটি সামাজিক চুক্তি থেকেই রাষ্ট্রের উদ্ভব। একটি যন্ত্রের যেমন ইচ্ছানুসারে সংস্কার সাধন করা যেতে পারে, বা তাকে নতুন করে গঠন করা যেতে পারে, তেমনি ইতিহাসের নিয়মকে অগ্রাহ্য করেও রাষ্ট্রের অনুরূপ পরিবর্তন সাধন করা যেতে পারে। পুরাতন অট্টালিকাকে ধ্বংস করে যেমন তার জায়গায় নতুন একটি অট্টালিকা নির্মাণ করা যেতে পারে, তেমনি ইতিহাসের নিয়ম ও ধারাকে অগ্রাহ্য করে পুরাতন রাষ্ট্রের স্থানে নতুন রাষ্ট্রীয় সংগঠনকে প্রতিষ্ঠিত করা যেতে পারে।

এ মতবাদ অনুযায়ী ব্যক্তির স্বাধীনতাতে হস্তক্ষেপ করা রাষ্ট্রের কর্তব্য নয়। ব্যক্তির ভাল-মন্দ ব্যক্তি নিজেই নির্ধারণ করতে পারে। ব্যক্তি যাতে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে রাষ্ট্রের কর্তব্য কেবলমাত্র তারই ব্যবস্থা করা। অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্যই রাষ্ট্রের প্রয়োজন। রাষ্ট্রের কাজ হল পুলিসী কাজ—রাষ্ট্রের কাজ হল নেতিবাচক। জনকল্যাণমূলক কাজ করার এবং অকল্যাণ প্রতিহত করার প্রত্যক্ষ দায়িত্ব রাষ্ট্রের ওপর নেই। এ মতবাদেরই অন্যতম রূপ হল স্বাচ্ছন্দ্য নীতি বা অবাধ নীতি (Laissez Faire) এ মতবাদের বিরোধী মতবাদ হল সমাজতন্ত্রবাদ।

সমালোচনা (Criticism) :

রাষ্ট্র সম্পর্কীয় যান্ত্রিক মতবাদ যথার্থ নয় এবং সেহেতু রাষ্ট্র সম্পর্কে এটি সন্তোষজনক মতবাদরূপে গৃহীত হতে পারে না। রাষ্ট্র মানুষের দ্বারা সৃষ্ট, কিন্তু সে কারণে রাষ্ট্রকে একটি যান্ত্রিক বিষয়রূপে গণ্য করা চলে না। যেহেতু মানুষের দ্বারা সৃষ্ট সেহেতু রাষ্ট্র কোন অট্টালিকার সমতুল্য নয়। রাষ্ট্রের উৎপত্তির ব্যাপারে ইতিহাসের নিয়ম ও ধারার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। রাষ্ট্রের ভিত্তি জনগণের ইচ্ছা, কাজেই খেয়ালখুশীমত রাষ্ট্রের সংস্কারসাধন বা পুনর্গঠন সম্ভব নয়। রাষ্ট্র পরস্পর বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির যান্ত্রিক সমষ্টিমাত্র নয়, রাষ্ট্র পরস্পর নির্ভর ব্যক্তির ঐক্য, যে ব্যক্তিরা জনকল্যাণ সাধনের জন্য পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করে। রাষ্ট্রের কার্য নঞর্থক নয়, সদর্থক; কারণ যে-কোন সভ্য রাষ্ট্র জনগণের কল্যাণসাধনের জন্য সংগঠনমূলক পরিকল্পনাকে কার্যকর করার জন্য সচেষ্ট হয়। প্রয়োজনে সব রাষ্ট্রকেই ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে হয় এবং বলপ্রয়োগ করতে হয়, জনকল্যাণের আদর্শকে কার্যকর করার জন্যই এর প্রয়োজন দেখা দেয়।

সিদ্ধান্ত (Conclusion) :

সামাজিক ঐক্যের রূপ হল রাষ্ট্র (The State as a Mode of Social Unity) : 'রাষ্ট্র সামাজিক ঐক্যের রূপ'—এই মতবাদই চরমপন্থী মতবাদগুলিকে এড়িয়ে একটি মধ্যপন্থা গ্রহণের সন্তোষজনক উপায়। এ মতবাদ জনকল্যাণের আদর্শকে কার্যকর করে তুলতে পারে। রাষ্ট্রের স্বাভাবিক বৃদ্ধি এবং বিকাশ আছে। রাষ্ট্রকে যন্ত্ররূপে কল্পনা করা কোন মতেই যুক্তিযুক্ত নয়। রাষ্ট্রের বিশেষ ধরনের কাজ আছে এবং এ কাজের সীমাও নির্দিষ্ট আছে। রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের কল্যাণই রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ লক্ষ্য। গ্রীন (Green) বিশেষ করে রাষ্ট্রের এই জনকল্যাণমূলক আদর্শের দিকটিকেই নির্দেশ করেছেন। একদিকে উগ্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও অপরদিকে সর্বগ্রাসী সমাজতন্ত্রবাদকে পরিহার করে রাষ্ট্রকে সমাজ-কল্যাণের পক্ষে একটি অপরিহার্য প্রতিষ্ঠানরূপে গণ্য করাই যুক্তিযুক্ত। মানুষের জন্য রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের জন্য মানুষ নয়; কিন্তু যেহেতু ভাল-মন্দের দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে মানুষকে তার মনুষ্যত্ব ধীরে ধীরে অর্জন করতে হয়, সেজন্য কোনরূপ নিয়ন্ত্রণমূলক প্রতিষ্ঠান ছাড়া সে চলতে পারে না। রাষ্ট্র হচ্ছে এরূপ নিয়ন্ত্রণমূলক প্রতিষ্ঠান, যার বিশেষ বিশেষ কতকগুলি ক্ষমতা, উপায় ও অধিকার আছে।

চতুর্থ অধ্যায়

ধর্মের সামাজিক ভূমিকা
(Social role of Religion)

১। ধর্মের অর্থ (The Meaning of Religion) :

ইংরেজী Religion কথাটি উদ্ভূত হয়েছে 'Religere' শব্দ থেকে যার অর্থ হল বন্ধন (Bond)। এর থেকে ধরা যেতে পারে যে, ব্যক্তির জীবনে এবং জাতির জীবনেও বটে, যা যথার্থ সংহতি আনে তাই ধর্ম। 'ধৃ-ধাতুর' সঙ্গে 'মন' প্রত্যয় যোগ করে সংস্কৃতে 'ধর্ম' শব্দটির উৎপত্তি। যা ধারণ করে তাই ধর্ম—ধর্ম শব্দটির ধাতুগত অর্থ তাই। অন্তর এবং বাহির মিলে মানুষের জীবনের যে পূর্ণ সামঞ্জস্য তার মধ্যে যা মানুষের জীবনকে ধরে রাখে, সামাজিক জীবনের বৃহত্তর ঐক্যের মধ্যে যা মানুষের জীবনকে ধরে রাখে তাকেই ধর্ম বলা যেতে পারে।

ধর্মের ধাতুগত অর্থ

নানাভাবে ধর্মের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। টাইলার (Tylor) ধর্মের খুব ছোট সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে যে, 'ধর্ম হল আত্মিক জীবে বিশ্বাস' (the belief in spiritual beings)। কিন্তু এ সংজ্ঞা সন্তোষজনক নয়; কেননা, এই সংজ্ঞায় আত্মিক জীবের স্বরূপ সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে কিছুই বলা হয় নি। ম্যাক্সমুলার (Max Muller)-এর সংজ্ঞা, 'ধর্ম হল অসীমের প্রত্যক্ষণ বা উপলব্ধি'। এই সংজ্ঞাটিও খুবই অস্পষ্ট। ক্রিস্টোফার ডসন (Christopher Dawson)-এর মতে 'যখন এবং যেখানে বাহ্যশক্তির ওপর মানুষের নির্ভরতা বোধ জেগেছে এবং মানুষ সেই শক্তিকে নিজের থেকে বড় ও রহস্যময় বলে মনে করেছে সেখানেই ধর্মের অস্তিত্ব সূচিত হয়েছে এবং এই শক্তির সামনে উপস্থিত থেকে মানুষের মনে যে ভীতি ও আত্মঅবমাননার ভাব জাগ্রত হয়েছে তা অবশ্যই ধর্মীয় অনুভূতি যা উপাসনা ও প্রার্থনার মূলে বর্তমান।' ধর্মের এই বর্ণনাও সন্তোষজনক নয়। কারণ এই বর্ণনা খুবই ব্যাপক। এই বর্ণনা অনুযায়ী ইন্দ্রজাল ধর্মের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বে এবং সর্বভূতে চৈতন্যের অস্তিত্ব স্বীকার করে নেওয়া হবে।

ধর্মের বিভিন্ন সংজ্ঞা

ধর্মকে বুদ্ধি, অনুভূতি এবং ইচ্ছা—মনের এই তিনটি মানসিক প্রক্রিয়ার দিক থেকেও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যেমন, হার্বার্ট স্পেন্সার (Herbert Spencer) ধর্মের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন—'ধর্ম হল একটা আনুমানিক ধারণা যা এ বিশ্বজগতকে বুদ্ধিগম্য করে তোলে'। এই সংজ্ঞা অনুযায়ী ধর্মের ক্রিয়া হল বুদ্ধির ক্রিয়া যা প্রকৃতপক্ষে সত্য নয়।

ম্যাকটাগার্ট (McTaggart) অনুভূতির দিক থেকে ধর্মের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন—'ধর্ম হল আমাদের ও বহির্বিশ্বের মধ্যে এক সামঞ্জস্য আছে, এই বিশ্বাসের ওপর নির্ভরশীল একটি আবেগ।"[1] এই সংজ্ঞা ধর্মের মধ্যে অনুভূতি বা আবেগের দিকটিকে প্রকাশ করে কিন্তু ধর্মের মধ্যে যে ক্রিয়ামূলক দিকটি আছে তাকে প্রকাশ করে না। সেহেতু সংজ্ঞাটি সন্তোষজনক নয়। ফ্রেজার (Sir James Frazer) ধর্মের মধ্যে যে ক্রিয়ামূলক দিকটি বর্তমান তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং তাঁর মতে, ধর্ম হল মানুষেব থেকে উচ্চতর যে সকল শক্তি, প্রকৃতি এবং মানবজীবনের গতিপথ পরিচালিত বা নিয়ন্ত্রিত করে তাদের তুষ্টতা বা প্রসন্নসাধন।[2] যদিও এই সংজ্ঞার মধ্যে ধর্মের তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক উভয় দিকই বর্তমান তবু এমন কথা বলা চলে না যে, কোন শক্তিকে তুষ্ট বা প্রসন্ন করাই ধর্মের প্রকৃত দিক।

আসলে যে ঈশ্বরের ওপর মানুষের নির্ভরতাবোধ জাগে সেই ঈশ্বরের প্রতি সক্রিয় বিশ্বাস এবং আত্মসমর্পণই ধর্ম। ধর্মের দুটি দিক আছে। একটি তার অন্তরঙ্গ দিক, অপরটি বহিরঙ্গ দিক। ধর্মের অন্তরঙ্গ দিক হল ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে কেন্দ্র করে ব্যক্তির মনে যে ভাব-ধারণা, চিন্তা এবং অনুভূতির আবির্ভাব ঘটে সেগুলি এবং এর বহিরঙ্গ দিক হল ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, উৎসব যার মাধ্যমে ঐ অনুভূতির প্রকাশ ঘটে। বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এই সব আচার-অনুষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। ক্রলে (Crawley)-এর মতে পবিত্র অনুষ্ঠানই হল ধর্মের আসল বৈশিষ্ট্য। এ সংজ্ঞা ধর্ম থেকে ঈশ্বরকে নির্বাসিত করেছে এবং ধর্মের বহিরঙ্গ দিকের ওপরই গুরুত্ব আরোপ করেছে। কিন্তু ধর্মের সঙ্গে ঈশ্বরের ধারণা এমনভাবে যুক্ত যে ঈশ্বরের কল্পনা ছাডা ধর্মের কোন ধারণা করা যায় না। অবশ্য ঈশ্বর ছাড়াও ধর্মের কথা বলা চলে কিনা, এমন প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে। যেমন, বলা হয় বৌদ্ধধর্মে কোন ঈশ্বরের কথা নেই এবং কোঁতে (Comet) মানবত্বকে ধর্মের সঙ্গে অভিন্ন মনে করেছেন। তবু এ কথা বলা যায়, যে-ধর্মে ঈশ্বরের বা পরমাত্মার কোন স্থান নেই, সে-ধর্ম হয় ঈশ্বরোপম কাউকে বিশ্বাস করে, না হয় তা কতকগুলি মূল্যহীন আচার-অনুষ্ঠানে পর্যবসিত হয়। সুতরাং যে সংজ্ঞাতে ঈশ্বরের কথা থাকবে না তাকে ধর্মের সন্তোষজনক সংজ্ঞা বলা চলে না।

ধর্মের পূর্বোক্ত সংজ্ঞাগুলি ধর্মের সমস্ত দিকগুলিকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে পারে

---

1. "An emotion resting on a conviction of a harmony between ourselves and the universe at large." —McTaggart.

2. "Propitiation or conciliation of powers superior to man which are believed to direct and control the course of nature and of human life." —Sir James Fraser

নি। ধর্ম জটিল বিষয়, কাজেই যে-কোন একটি সংজ্ঞার মাধ্যমে এর সকল দিকগুলিকে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। ধর্মের সংজ্ঞা দিতে আমাদের মনে রাখতে হবে ধর্ম হল মানুষের চিন্তা এবং আচরণের একটা স্বাভাবিক, বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং সর্বব্যাপক রূপ। ধর্মের মধ্যে বিশ্বাস এবং ক্রিয়া উভয় উপাদানই বর্তমান। তাছাড়া ধর্মের মধ্যে পরমকল্যাণ বা পরমার্থের (Values) দিকটিও উল্লেখযোগ্য, যা মানুষ কামনা করে কিন্তু সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় তা লাভ করা সম্ভব নয় জেনে কোন উচ্চতর শক্তির সহায়তায় তা লাভ করতে চায়। ধর্ম কেবল পূজা বা আচার-অনুষ্ঠান নয়।

উল্লিখিত বিভিন্ন সংজ্ঞা ধর্মের যে অর্থই সূচনা করুক না কেন সমাজ-দার্শনিকের কাছে ধর্মের যে দিকটি মূল্যবান তাহল ম্যাকেঞ্জির (Mackenzie) ভাষায়—"এক সর্বোচ্চ ও সর্বাধিক মূল্যবান সত্তার প্রতি অব্যাহত ভক্তিময় অনুরাগ" (A certain absolute devotion to what is recognised as highest and most valuable)। প্রকৃত ধর্ম হল গঠনমূলক এবং সৃষ্টিমূলক। খ্রীষ্টধর্মও সামাজিক ঐক্যের আদর্শের প্রতি অনুরাগ এবং এই আদর্শকে রক্ষা করার ও উন্নত করার জন্য যা কিছু প্রয়োজনীয় তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। ধর্মের মধ্যে যে মানবতার দিকটি বর্তমান, যে দিকটি বৌদ্ধধর্ম, কোঁতের (Comete) মানবতাবাদ বা খ্রীষ্টধর্মের মধ্যে বর্তমান, সেটি ধর্মের এই সামাজিক দিকটিকেই বড় করে দেখেছে। এই ধর্মকে পরিপূর্ণ করে তুলতে হলে এর সঙ্গে আর যা কিছুই যুক্ত করা হোক না কেন, সমাজদার্শনিকের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আমরা ধর্মের মানবতার দিকটিকেই বড় করে দেখব, যেহেতু এটি সামাজিক ঐক্যেরই যোগসূত্র। ম্যাকেঞ্জি (Mackenzie) বলেন, "ধর্মকে মানুষের জীবনকে পূর্ণ করে তোলার জন্য উৎসর্গমূলক মনোভাব বলে গণ্য করলেই যথেষ্ট হবে"।[1] তাছাড়া ধর্মের প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারলে বোঝা যাবে যে, ধর্ম বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান, রীতিনীতি, উপদেশ বা আদেশবাণী নয়, অলৌকিকতাও নয়। ধর্ম হল মানুষের জীবনের শ্রেষ্ঠ মূল্যগুলির (values) স্বীকৃতি—অর্থাৎ সত্য, শিব ও সুন্দরের উপলব্ধি। সে কারণেই রাধাকৃষ্ণন (S. Radhakrishnan) বলেছেন, "সুন্দর, শিব ও সত্যের জন্য মনের যে অন্বেষণ তাই হল ঈশ্বরান্বেষণ"।[2] মায়েল এডওয়ার্ডস্ (Miall Edwards)-ও ধর্মকে এই দৃষ্টিতেই

I. "It may be enough to regard religion as meaning the spirit of devction to the perfction on human life."

. —Mackenzie : Outlines of Social Philosophy ; Page 210.

2' "The search of the mind for beauty, goodness and truth is the search for God." —S. Radhakrishnan : Religion and Society ; Page 47.

দেখেছেন। তিনি বলেন, "ধর্ম সম্পর্কীয় জাগতিক দৃষ্টিভঙ্গির সত্যতার প্রশ্ন প্রধানতঃ আমাদের পরমমূল্যের বাস্তবতার প্রশ্ন।"[1] সমাজদর্শনে আমরা ধর্মকে এই দৃষ্টিতেই দেখব —তাহল ধর্মের মূল্যবোধের দিকটি, মানবতার দিকটি এবং তার সামাজিক সংহতির দিকটি।

২। ধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য (Chief Aspect of Religion):

আমরা ইতিপূর্বে মানুষের তিনটি দিকের কথা আলোচনা করেছি। যথা— (ক) বর্ধনশীল দিক, (খ) জৈবিক দিক এবং (গ) মানুষের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের দিক।

মানুষের মনুষ্যত্ব ফুটে ওঠে তার বিচারবুদ্ধির মধ্যে যার দ্বারা সে তার আবেগ-অনুভূতিকে বা নিম্নস্তরের প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত করে। মানুষ হিসেবে মানুষের যে বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ মানুষের যে বিচারবুদ্ধির দিক, সেই দিকটিই জীবনের মূল্যবোধের জন্য সবচেয়ে প্রয়োজনীয় দিক। বিচারবুদ্ধির অধিকারী বলেই মানুষ কামনা করে সত্য, শিব ও সুন্দরের আদর্শকে। ধর্মের আসল কাজ হল এই সত্য, শিব ও সুন্দরের প্রকাশকে নিয়ে। সমাজ-জীবনে সামাজিক কাজের মধ্যে এ সকল মূল্যের অনুসন্ধান আমরা করি, যদিও অপর মূল্যগুলিও উপেক্ষণীয় নয়।

সামাজিক কাজের ক্ষেত্রে এসে আমরা দেখি নীতি এবং ধর্মের সমন্বয়। ধর্মের কাজ সত্য ও সুন্দরকে নিয়ে। নৈতিকতাকে একটু উচ্চতর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে বলা যায় তার কাজও সত্য ও সুন্দরকে নিয়ে। সামাজিক কাজের মধ্যে আমরা এই একই সত্য ও সুন্দরকে পেতে চাই। কাজেই সত্য ও সুন্দরের অনুসরণ কেবল নৈতিকতা নয়, মানুষের ধর্মবোধেরও পরিচয়। আমরা ধর্মকে অত্যন্ত সংকীর্ণ দৃষ্টিতে দেখি বলেই ধর্মের এই অন্তর্নিহিত তাৎপর্যটুকু উপলব্ধি করতে পারি না। এই সংকীর্ণ দৃষ্টির জন্য আমরা ধর্মকে আচার-অনুষ্ঠান, নীতি, বিচারহীন মতবাদ এবং অলৌকিকতার সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে করি। ধর্ম কেবলমাত্র কোন পরম সত্তায় বিশ্বাস নয়; এ হল সেই পরম সত্তায় বিশ্বাস, যিনি সত্য, শিব ও সুন্দরের প্রতীক। ধর্মবোধ মানুষের নীতিবোধকে উন্নত করে, আবার উন্নত নীতিবোধ ধর্মবোধের অগ্রগতিকে সহায়তা করে। সত্য ও সুন্দরের সাধনা শুধু নীতিবোধেরও পরিচয় নয়, ধর্মবোধেরও পরিচয়। কলা, বিজ্ঞান এবং নীতির ক্ষেত্রে যেমন আমরা সত্য, শিব ও সুন্দরের আদর্শের সমন্বয় দেখতে পাই, ধর্মের ক্ষেত্রেও এ তিনটি বিষয়ের সমন্বয় দেখি।

নীতি ও ধর্মের সমন্বয় সমাজ জীবনের আদর্শ

1. "......the question of the truth of the religious world view is largely the question of the objectivity of our highest values."

—Miall Edwards: The Philosophy of Religion, Page 955.

ম্যাকেঞ্জি (Mackenzie)-র মতে উচ্চতর দার্শনিক চিন্তা, কাব্য সৃষ্টি এবং নৈতিক প্রচেষ্টা সবই ধর্ম সম্পর্কীয় বিষয়।[1]

ধর্মের সামাজিক ভূমিকা (The Social Role of Religion):

ধর্ম যদিও এক হিসেবে ব্যক্তিবিশেষের বিশ্বাসের ব্যাপার, তবু সমাজ-জীবনে ধর্মের একটা বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। সমাজবিজ্ঞানী ব্লেকমার এবং গিলিন্ (Blackmar and Gillin)-এর মতানুসারে ধর্ম যতখানি না ব্যক্তিগত ব্যাপার তার তুলনায় অনেক বেশী সামাজিক। তাঁদের মতানুযায়ী সামাজিক উপাসনা ছাড়া, শুধুমাত্র ব্যক্তিগত উপাসনার মধ্য দিয়ে ধর্ম বেঁচে থাকতে পারে না। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, যখন কোন গোষ্ঠী সমবেতভাবে উপাসনা করা থেকে বিরত হয়, তখন তাঁদের ধর্মেরও পরিসমাপ্তি ঘটে।

সমাজ-জীবনে ধর্ম নানাভাবে নিজেকে প্রকাশ করে। বিভিন্ন পারিবারিক, অর্থ-নৈতিক, রাজনৈতিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের ওপর ধর্ম তার প্রভাব বিস্তার করে। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি সামাজিক মেলামেশার গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তিরা পূজা, উপাসনা প্রভৃতির জন্য এসব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে সমবেত হয়। এই সামাজিক মেলামেশার ফলে সমাজস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে পারস্পরিক সহানুভূতি ও প্রীতির সঞ্চার হয়।

ধর্ম ও সমাজ জীবন

কাজেই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করার গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। ধর্মীয় মনোভাব অনেক সময় মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে ও জনকল্যাণমূলক কার্য সম্পাদন করার জন্য প্রণোদিত করে। বস্তুতঃ, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি ধর্মবোধ জাগ্রত করা ছাড়াও নানা ধরনের কার্য সম্পাদন করে। অনেক ধর্ম-প্রতিষ্ঠান, বিদ্যালয়, হাসপাতাল, অনাথ আশ্রম প্রভৃতির পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করে।

সমাজ-নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে ধর্মের কার্যকারিতা যে এখনও অক্ষুন্ন আছে তা বোঝা যায় যখন আমরা দেখি যে, সমাজ-জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ধর্মীয় আচার ও অনুষ্ঠান মানুষের কর্ম

সমাজ নিয়ন্ত্রণে ধর্মের কার্যকারিতা

পদ্ধতিকে এখনও প্রভাবিত করে। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই সাধারণতঃ ব্যক্তির ধর্মীয় অনুভূতির প্রকাশ ঘটে। আদিম ধর্মীয় অনুষ্ঠান যদিও তার প্রকৃতির বিচারে ছিল কিছুটা স্থূল, তবু আদিম সমাজে ব্যক্তি-জীবনের প্রায় সর্ব ক্ষেত্রেই তার প্রকাশ ঘটেছিল। আদিম সমাজে সমাজ-জীবনের প্রায় সর্বক্ষেত্রেই যেমন জন্ম, দীক্ষা, বিবাহ, রোগ, মৃত্যু, কৃষিকার্য প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে

---

1. Mackenzie : Outlines of Social Philosophy ; Page 212.

নানারকম ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের প্রকাশ ঘটত। বর্তমান যুগেও জন্ম, বিবাহ, মৃত্যু প্রভৃতি নানা সামাজিক অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের আয়োজন লক্ষ্য করা যায়। মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের বিবিধ অনুষ্ঠান 'যেমন—শস্য বপন, শস্য কর্তন, শিকার, মাছ ধরা প্রভৃতির ক্ষেত্রেও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের আয়োজন দেখা যায়। এ ছাড়াও সামাজিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে—যেমন গৃহপ্রবেশ, নতুন কর্মভার গ্রহণ, কোন শুভ কার্য শুরু করার সময় প্রায় সব সমাজেই ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের আয়োজন প্রচলিত। নতুন কর্মভার গ্রহণের সময় শপথ গ্রহণের রীতি বর্তমান সমাজে দেখা যায়। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের আয়োজন থেকে নির্দিষ্ট বর্মপদ্ধতির উদ্ভব ঘটে, যার ফলে সমাজ নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি সহজতর হয়। আদিম যুগে সামাজিক ঐক্য বজায় রাখার ব্যাপারে ধর্মের ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ক্রিস্টোফার ডসন (Christopher Dawson), টয়েনবি (Arnold J. Toynbee) এবং ডেমেণ্ট (V. A. Dement) প্রমুখ লেখকবৃন্দ তাঁদের রচনার মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন যে, ধর্মই হল সভ্যতার কেন্দ্রস্থিত উপাদান এবং ধর্মের বিপর্যয় ঘটলে সভ্যতারও বিপর্যয় ঘটবে।[1]

ধর্ম মানুষের চরিত্রকে প্রভাবিত করে সামাজিক জীবনকে গঠিত করে। ধর্ম ব্যক্তির মনে সামাজিক মূল্যের বোধ সঞ্চারিত করে, ধর্ম ব্যক্তিকে সামাজিক নিয়ম মেনে চলতে, অপরের চিন্তা, অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে, সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে এবং চিন্তায় ও কার্যে বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন হতে শিক্ষা দেয়। ধর্ম কেবলমাত্র এক ধর্ম-সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তির প্রতি নয়, সমস্ত বিশ্বের মানুষের প্রতি প্রীতি ও শুভেচ্ছার ভাব জাগরিত করে।

মার্কস (Marx) এবং তাঁর সমর্থকবৃন্দ মনে করেন যে, ধর্ম হল জনগণের আফিং এবং তাঁদের মতে ধর্মকে হাতিয়ার করে সমাজের এক শ্রেণী আর এক শ্রেণীর ওপর শোষণ চালিয়ে যাচ্ছে। কোন কোন ক্ষেত্রে যে ধর্মকে হাতিয়ার করে জনসাধারণের ওপর অত্যাচার এবং দমননীতি চালান হয়েছে একটা অস্বীকার করা চলে না। তবে তার থেকে এই সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, ধর্মের সাহায্যে সমাজ-জীবনে কোন উন্নতি সম্ভব হয় নি। অনেক ক্ষেত্রে সামাজিক উন্নতি, সংস্কার, বিপ্লব ইত্যাদি মানুষের ধর্মবোধের জন্যই

1. রাধাকৃষ্ণন (S. Radhakrishnan) বলেন, "আধ্যাত্মিক মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধা, সত্য ও সুন্দরের প্রতি অনুরাগ, সততা, ন্যায়পরায়ণতা ও অনুকম্পা, অত্যাচারিতদের প্রতি সহানুভূতি এবং মানুষের ভ্রাতৃত্বে বিশ্বাস হল সেই সকল গুণ যেগুলি বর্তমান সভ্যতাকে রক্ষা করবে।"

("Regard for spiritual values, love of truth and beauty, righteousness, justice and mercy, sympathy with the oppressed and belief in the brotherhood of man, are qualities which will save modern civilisation.)"

—Radhakrishnan : Religion and Society ; Page 18.

সম্ভব হয়েছে। অনেক সামাজিক এবং অর্থনৈতিক আন্দোলনের মূলে ধর্ম বর্তমান। অনেক সময় অত্যাচার ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি প্রতিরোধ জানিয়েছে। তাছাড়া, ধর্মই বহু মঙ্গলজনক সামাজিক ক্রিয়াকর্মের উদ্দীপক।

যথার্থ ধর্মভাব যদি প্রচার করা যায় তাহলে ধর্মের মাধ্যমে সামাজিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার কাজ সহজতর হতে পারে। অনেক মনীষী বিশ্বঐক্য ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যথার্থ ধর্মভাব প্রচারের প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করে নিয়েছেন। অনেক সময় আমরা ধারণা করি, ধর্ম মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করে ভেদাভেদ আনয়ন করে, ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধির দ্বারা প্রণোদিত করে জনকল্যাণের আদর্শ লাভের পথে বাধার সঞ্চার করে। কিন্তু আমাদের মনে রাখা দরকার, যে-ধর্ম সমাজ-জীবনে এই ভূমিকা গ্রহণ করে তা যথার্থ ধর্ম নয়, তা ধর্মের বিকৃত রূপ। ধর্মান্ধতাই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ সৃষ্টি করে, সামাজিক ঐক্যের বন্ধনকে শিথিল করে, যথার্থ ধর্মভাব তা করে না। যথার্থ ধর্মভাব মানুষকে সমাজকল্যাণমূলক কাজে আত্মনিয়োগের জন্য প্রেরণা দেয়। স্বামী বিবেকানন্দের মতে জীব সেবাই ঈশ্বর সেবা। যথার্থ ধর্মভাব মানুষকে সংযত করে, সহনশীল করে, মানুষকে নৈতিক শক্তি যোগায় এবং অপরের সঙ্গে সম্প্রীতির সূত্রে আবদ্ধ হয়ে সামাজিক ঐক্যের আদর্শ রক্ষায় প্রণোদিত করে।

বস্তুতঃ, যা কিছু শুভ, শ্রেয় ও সুন্দর তার প্রতি অনুরাগ আসলে ধর্ম-সম্পর্কীয় অনুরাগ। বর্তমানে যে সব সমাজ-কল্যাণমূলক ও জনকল্যাণমূলক কাজ আমরা দেখি, তার মূলেও ধর্মের মনোভাব অনেক সময় বর্তমান থাকে। অনেক সময় শিক্ষা এবং দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলি প্রতিষ্ঠিত হয় এমন ব্যক্তিদের দ্বারা যাদের লক্ষ্য হল ধর্মমূলক। অনেক সময় কোন প্রতিষ্ঠান হয়ত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নয়, কিন্তু ধর্মীয় মনোভাব এসব প্রতিষ্ঠানের মূলে কার্যকরী আছে।

৪। সংহতি শক্তিরূপে ধর্মের স্বরূপ (Religion as a cohesive Force):

ধর্ম কি সংহতি শক্তি, না বিচ্ছেদ সৃষ্টি করার শক্তি? ধর্ম কি সামাজিক ঐক্যকে সুদৃঢ় করে, না সামাজিক ঐক্যের বিনাশ সাধন করে?

ধর্মের দুটি প্রধান ভূমিকা আছে—"একটি হল ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মের উন্মেষ যার জন্য ব্যক্তি সসীম হলেও এক অসীম সত্তার মাঝে নিজের পূর্ণতা ও অমরতাকে খুঁজে পেতে চায় এবং তার সঙ্গে মিলিত হতে চায়। কিন্তু এ ছাড়াও আছে ধর্মের একটা সামাজিক দিক। এই দিকটিই মানুষকে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত করে। যে বন্ধন মানুষকে

ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত করে, সেই বন্ধনই মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে সুদৃঢ় করে, মানুষের ঐক্যকে শক্তিশালী করে তোলে। গিসবার্ট বলেন (Gisbert) বলেন, ঈশ্বরের পিতৃত্বের অধীনে মানুষের ভ্রাতৃত্বের এই হল ভিত্তি।"[1]

ট্রটার (W. Trotter)-এর মতে[2] যূথ-মনোভাবের ওপরই ধর্মের ভিত্তি। ধর্ম সমষ্টিগত অনুভূতির প্রকাশ। তাঁর মতে ব্যক্তি যদি পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বসবাস করে তাহলে তাদের মধ্যে এক অসম্পূর্ণতা জাগে। সে কারণেই তারা ধর্মীয় গোষ্ঠী গঠন করে।

এমিলি দুর্খীম (Emile Durkheim)-এর মতেও[3] সমষ্টিগত চেতনা বা গোষ্ঠী চেতনার প্রকাশই হল ধর্ম। ধর্মের প্রধান কাজ সামাজিক ঐক্য বা সংস্কৃতিকে সুদৃঢ় করে তোলা। তাছাড়াও ধর্ম বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষের সংযোগ সাধন করে তাদের পরস্পরের বন্ধু করে তোলে। গীর্জা বা অন্যান্য উপাসনালয়ে বিভিন্ন ব্যক্তি উপাসনা বা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের জন্য সমবেত হয়। অনেক সময় এসকল প্রতিষ্ঠান গরীব-দুঃখীদের জন্য অর্থ সংগ্রহ করে বা অন্যান্য জনকল্যাণমূলক কার্য করে থাকে বা শিক্ষা ও আমোদ-প্রমোদের জন্য নানারকম অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। সকল সময়ই এসব কাজ যে পুরোপুরি ধর্মসম্পর্কীয় তা নয়। তবে ধর্মের আদর্শই প্রত্যক্ষভাবে সকল কাজের প্রেরণা দান করে।

ধর্মবন্ধনই সামাজিক ঐক্যের সুদৃঢ় ভিত্তি

অনুষ্ঠান-পদ্ধতি ও উৎসব সামাজিক জীবনের ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। এসব উৎসব ও অনুষ্ঠান যে সব সময় প্রত্যক্ষভাবে ধর্মমূলক তা নয়, তবে এসব অনুষ্ঠান ও উৎসবের অনেকগুলিরই মূলে ধর্মসম্পর্কীয় মনোভাব বিদ্যমান। ব্যক্তির জীবনে এসব ধর্মীয় উৎসব ও অনুষ্ঠান মানুষকে পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত করে। অনেক ক্ষেত্রে বহু সামাজিক অনুষ্ঠান, যেমন—বীজবপন, শস্য সংগ্রহ, গৃহপ্রবেশ, শপথ গ্রহণ প্রভৃতি ধর্মাচরণরূপে অনুষ্ঠিত হয়। সুতরাং সমাজ-জীবনে সংহতি শক্তিরূপে ধর্ম এখনও পর্যন্ত খুব প্রবল ও সজীব। ধর্মই সমাজের স্থায়িত্বের অন্যতম কারণ। ধর্মীয় গোষ্ঠীর সভ্যদের মধ্যে গোষ্ঠী চেতনা খুব প্রবলভাবেই আত্মপ্রকাশ করে যার জন্য এই সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে ভালবাসে না, এমনকি, মৃতের সঙ্গেও সম্পর্ক ত্যাগ করতে তারা প্রস্তুত নয়।

1. "This is the basis of the brotherhood of man under the fatherhood of God." —Gisbert : Fundamentals of Sociology ; Page 215.
2. W. Trotter : Instinct of War and Peace, Page 113.
3. Emile Durkheim : The Elementary Forms of Religious Life : Page 167

ধর্মীয় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত সভ্যদের মধ্যে একই অবস্থায় একই ধরনের অনুভূতি দেখা যায় এবং গোষ্ঠীর নেতাদের নির্দেশ বিনা বিচারে গ্রহণ করার প্রবণতা দৃষ্ট হয়। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সংগঠনের মূলে যুথ-মনোবৃত্তি উল্লেখযোগ্যভাবে ক্রিয়া করে। ম্যাক্‌ডুগ্যালের (McDougall) মতে ধর্মসম্পর্কীয় গোষ্ঠীর মধ্যে ঐক্য ও সংহতি বেশ উল্লেখযোগ্য ভাবেই পরিলক্ষিত হয়।[1]

ধর্মের বিরুদ্ধে অভিযোগ

অনেকের ধারণা ধর্ম ও ব্যক্তি সমাজের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে সমাজ-জীবনকে উপেক্ষা করে ব্যক্তি জীবনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। ব্যক্তিগত উন্নতির ওপর অত্যধিক মনঃসংযোগ করার ফলে সামাজিক চেতনা এবং কল্যাণের দিকটিকে অবহেলা করা হয়। তাছাড়া, ব্যক্তির আচার-অনুষ্ঠান পালনের ওপর ধর্ম এতখানি গুরুত্ব আরোপ করে যে, ব্যক্তির আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশের দিক হয়ে পড়ে গৌণ। ধর্মের মধ্যে সর্বব্যাপক আদর্শের কথা যাই থাক না কেন প্রতিটি ধর্মেরই একটি স্থানীয় বৈশিষ্ট্য এবং বিশেষ রূপ আছে যার জন্য বিভিন্ন ধর্মের অস্তিত্ব মানুষের সঙ্গে মানুষের সংযোগসাধনের পথে অনেক সময় অন্তরায় সৃষ্টি করে। প্রোটেসটেন্ট ও রোমান ক্যাথলিকদের মধ্যে যে বিরোধের কথা ইতিহাস পাঠে জানা যায়, তা বিশেষতঃ ধর্মমূলক। ষোড়শ শতাব্দীর ধর্মীয় যুদ্ধের ভিত্তি হল ধর্ম সম্পর্কীয় বিরোধ। প্রতিটি ধর্মই নিজ নিজ আচার-অনুষ্ঠানের ওপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করে।

কিন্তু বিভিন্ন ধর্মের বাহ্যিক প্রকাশভঙ্গির মধ্যে যতই পার্থক্য থাক না কেন, ধর্মের মূল তাৎপর্যটুকু উপলব্ধি করলেই বোঝা যায় যে, সংযোগকারী বা সংহতি শক্তি হিসেবে ধর্ম মোটেই অনুপযোগী নয়। প্রতিটি ধর্মেরই মূল লক্ষ্য এক পরম সত্তার (Supreme Reality) উপলব্ধি, ধর্ম হল সসীম মনের অসীমকে জানার প্রচেষ্টা ও আগ্রহ।

মানুষ যখন উপলব্ধি করে যে, এই পরম সত্তা সত্য, শিব ও সুন্দরের মূর্ত প্রতীক এবং সব মানুষই এক পরম সত্তার প্রকাশ তখনই মানুষের মধ্যে যথার্থ ধর্মবোধ জাগরিত হয়। প্রকৃত ধর্মবোধ জাগরিত হলে মানুষের সমস্ত ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধি তিরোহিত হয়, মানুষ অপরকে ভালবাসতে শেখে; প্রেম, মৈত্রী ও ভালবাসার নিগূঢ় বন্ধনে মানুষ পরস্পরের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে সম্পর্কযুক্ত হয়। প্রকৃত ধর্ম মানুষকে মানুষের কাছে টেনে নিয়ে আসে, ধর্মান্ধতা বা বিকৃত ধর্মই মানুষের সঙ্গে মানুষের বৈষম্য সৃষ্টি করে। যথার্থ ধর্মবোধ মানুষকে অপরের ভাব, বিশ্বাস ও ধারণাকে শ্রদ্ধা করতে শেখায়, মানুষকে ত্যাগী, ক্ষমাশীল, উদারমনা ও সংযমী করে তোলে।

1. McDougall : An Introduction to Social Philosophy ; Page 267.

ধর্মকে কেন্দ্র করে মানুষ যে সকল মনগড়া ধারণার সৃষ্টি করেছে, সেগুলিকে অতিরিক্ত প্রাধান্য দেওয়ার কোন সংগত কারণ নেই। রাধাকৃষ্ণন (Radhakrishnan) বলেন, "যখন আমরা সংস্কার বা সংজ্ঞা নিয়ে মতবিরোধ সৃষ্টি করি তখন আমরা পৃথক হয়ে পড়ি। কিন্তু যখন আমরা ধর্ম জীবনের প্রার্থনা এবং ধ্যানকে আশ্রয় করি তখনই আমরা একত্র হই।"[1] অর্থাৎ ধর্মের আচারগত দিকটির ওপর গুরুত্ব না দিয়ে ধর্মের মূল ভাবকে উপলব্ধি করতে পারলেই মানুষ বুঝতে পারে যে, সব ধর্মই এক; সব মানুষই এক পরম সত্তার প্রকাশ। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক হল আধ্যাত্মিক সম্পর্ক। সব মানুষই এক বিশ্ব-সত্তার অংশ। একই ঐক্যের সূত্রে সমস্ত মানুষের মধ্যে এক নিগূঢ় বন্ধন বর্তমান। রাধাকৃষ্ণনের মতে এই মূলীভূত ঐক্যের স্বীকৃতিই মানবজাতির সামগ্রিক কল্যাণের ভিত্তিতে কিছু পরিমাণ সহযোগিতাকে সম্ভব করে তুলবে।[2] বস্তুতঃ, ধর্মই বিশ্বঐক্য ও বিশ্বশান্তির প্রতিষ্ঠার পথকে সুগম করে তুলতে পারে। সুতরাং সংহতি শক্তিরূপে ধর্মের উপযোগিতা কোনমতেই উপেক্ষণীয় নয়।

যথার্থ ধর্ম ও আচার-অনুষ্ঠান পৃথক

---

1. "When we dispute over dogmas and definitions we are divided. But when we take to the religious life of prayer and contemplation, we are brought together." —S. Radhakrishnan : Religion and Society ; Page 53

2. "The recognition of this fundamental unity should make possible a certain measure of co-operation on a common basis for the good of mankind as a whole." —S. Radhakrishnan : Religion and Society ; Page 54

পঞ্চম অধ্যায়

শিক্ষার আদর্শ
(Ideals of Education)

১। 'শিক্ষা' কথাটির সাধারণ তাৎপর্য (The General Significance of Education) :

ইংরেজী Education শব্দটি এসেছে ল্যাটিন Educare কথাটি থেকে, যার অর্থ হল প্রতিপালন করা (to bring up) এবং Educare—এই ক্রিয়াপদটির সঙ্গে যুক্ত, যার অর্থ হল উৎপাদন করা (to bring forth)। এই কারণে পাশ্চাত্ত্য দেশে শিক্ষার প্রকৃত অর্থ হল, কেবলমাত্র ছাত্রকে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জনে সহায়তা করা নয়, বরং তার মধ্যে সেইসব অভ্যাস এবং মনোভাবের সৃষ্টি করা যার সহায়তায় সে কৃতিত্বের সঙ্গে ভবিষ্যৎ জীবনের সম্মুখীন হতে পারে এবং জ্ঞানকে বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারে। প্লেটো (Plato)-র মতে শিক্ষার উদ্দেশ্য হল ছাত্রের সামর্থ্য অনুযায়ী তার দেহ ও মনের সৌন্দর্য ও পূর্ণতাকে বিকশিত করে তোলা ; ভিন্ন ভাষায় সুস্থ শরীরে একটি সুস্থ মনকে (a sound mind in a sound body) বিকশিত করে তোলা। প্লেটো (Plato)-র মতে মনে জ্ঞানের সঞ্চার করাই শিক্ষার কাজ নয়, মনের মধ্যে যে গুণগুলি আছে তার বিকাশ সাধন করাই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। অ্যারিস্টটল (Aristotle)-এর মতে শিক্ষার অর্থ মানুষের বৃত্তিকে বিশেষ করে তার মনকে বিকশিত করে তোলা যাতে সে সত্য, শিব এবং সুন্দরের ধারণাকে পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পারে এবং এর মধ্যেই পূর্ণ সুখ নিহিত। হোয়াইটহেড (Whitehead) বলেন, "শিক্ষা হল কিভাবে জ্ঞানকে কাজে লাগাতে হয় সেই কৌশল অর্জন করা।"[1]

তাঁর মতে শিক্ষা শৈশব থেকেই ছাত্রদের মনে আবিষ্কারের আনন্দের অনুভূতি জাগিয়ে তুলবে। অপ্রয়োজনীয় এবং নিষ্ক্রিয় ধারণা ছাত্রদের মনে অনুপ্রবিষ্ট করা উচিত নয় কারণ তাহলে ছাত্রদের মধ্যে বুদ্ধিগত জড়তা এসে যাবে।

জন্ ডিউই (John Dewey)-র মতে শিক্ষা হল একটা সামাজিক প্রক্রিয়া যা ব্যক্তিকে সামাজিক করে তোলে। তাঁর মতে শিক্ষার উদ্দেশ্য সমাজের স্বীকৃত আদর্শের

1. "Education is the acquisition of the art of the utilisation of knowledge"
—A. N. Whitehead : The Aims of Education and other Essays, Page 6.

সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে ব্যক্তির কার্যকে নিয়ন্ত্রিত করা। শিক্ষার ব্যাপারে পরিবেশের স্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের পরিবেশের মধ্যে যদি কোন অবাঞ্ছিত বিষয়ের উপস্থিতি থাকে তাহলে সেগুলি সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করতে হবে। শিক্ষাই ব্যক্তিকে সামাজিক দিক থেকে উপযুক্ত করে তোলে। ডিউই (Dewey)-র শিক্ষা সম্পর্কীয় ধারণা গণতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার ওপর প্রতিষ্ঠিত।

ম্যাকেঞ্জি (Mackenzie) তাঁর "Outlines of Social Philosophy' গ্রন্থে শিক্ষার তাৎপর্যকে দুদিক থেকে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে শিক্ষাকে ব্যাপক অর্থে এবং সঙ্কীর্ণ অর্থে দুভাবে নেওয়া যেতে পারে। ব্যাপক অর্থে শিক্ষা হল এমন একটি প্রক্রিয়া যা আমাদের সমস্ত জীবন ধরে চলতে থাকে এবং জীবনের সব রকম অভিজ্ঞতাই এই শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে সহায়তা করে: তিনি বলেন, "এই অর্থে এটি হল সাধারণ প্রক্রিয়া যার দ্বারা আমাদের ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয় এবং যার দ্বারা মানুষ তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও যে-বিশ্বে তারা বসবাস করে তাদের সম্পর্ককে উপলব্ধি করতে পারে"।[1] ম্যাকেঞ্জি (Mackenzie) ব্যাপক অর্থে শিক্ষা বলতে আত্মোপলব্ধিকেই বোঝাচ্ছেন। আত্মোপলব্ধির (Self-realisation) অর্থ হল মানুষের ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করা। হোয়াইটহেড (Whitehead) বলেন, "শিক্ষার একটিমাত্র বিষয় আছে এবং তাহল সর্বতোভাবে প্রকাশিত জীবন।"[2] যে-কোন মানুষ অনেক সদ্‌গুণের অধিকারী হতে পারে, কিন্তু সব গুণগুলিই যে স্বাভাবিকভাবে পরিস্ফুট হয় তা নয়, অনেক গুণ থাকে সুপ্ত হয়ে। উপযুক্ত শিক্ষার দ্বারাই মানুষের এই সুপ্ত গুণকে বিকশিত করা সম্ভব এবং তারই ফলে মানুষ নিজের অন্তর্নিহিত মহৎ ও বৃহৎ সত্তাকে আবিষ্কার করতে পারে। মানুষের আত্মোপলব্ধি তখনই আসে যখন তার জীবনে জ্ঞান, ইচ্ছা ও অনুভূতির পূর্ণ সামঞ্জস্য ঘটে।

শিক্ষার ব্যাপক অর্থ

সঙ্কীর্ণ অর্থে শিক্ষাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ম্যাকেঞ্জি (Mackenzie) বলেন, 'সঙ্কীর্ণ

1. It means, in this sense, the general process by which personality is developed and by which persons are enabled to realize their relations to one another and the universe in which they live."

—Mackenzie : Outlines of Social Philosophy , Page 24

2. "There is only one subiect matter of education, and that is life in all its manifestations."

Whitehead : The Aims of Education and other Essays ; Page 10

অর্থে একে মনে করা যেতে পারে—আমাদের ক্ষমতাকে বিকশিত এবং অনুশীলন করার জন্য সচেতনভাবে পরিচালিত যে-কোন প্রচেষ্টা।"[1]

ম্যাকেঞ্জি (Mackenzie)-র মতে ব্যাপক অর্থে যে শিক্ষার কথা বলা হয়েছে সে শিক্ষার অধিকাংশই মানুষ নিজের অজ্ঞাতসারে লাভ করে। জীবনের বিভিন্ন সমস্যা, প্রকৃতির প্রভাব ও প্রেরণা, মানুষের সঙ্গে মেলামেশা, জীবনের সুযোগ ও সাফল্য এবং ব্যর্থতা ও দুর্ভোগ থেকে মানুষ এই শিক্ষা লাভ করে। সঙ্কীর্ণ অর্থে যে-শিক্ষা, সে-শিক্ষা মানুষ সচেতনভাবেই গ্রহণ করে। একেই বোঝাতে গিয়ে ডিউই (Dewey) 'ইচ্ছামূলক শিক্ষা[1] (Intentional Education) কথাটি ব্যবহার করেছেন। সাধারণতঃ সঙ্কীর্ণ অর্থে শিক্ষা বলতে বোঝায় যখন রাষ্ট্র, পরিবার বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কোন একটি সংগঠনের বা ব্যবস্থার মাধ্যমে কোন উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য সাধনের জন্য তরুণদের ক্ষমতাকে বিকশিত করার ব্যবস্থা করেন। সমাজদর্শনে 'শিক্ষা' কথাটিকে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ না করে সঙ্কীর্ণ অর্থেই ব্যবহার করা হবে। 'শিক্ষা' কথাটিকে সঙ্কীর্ণ অর্থে গ্রহণ করলে এর সামাজিক তাৎপর্যটুকু অতি সহজেই পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। প্রথমে শিশুর শিক্ষার দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে পরিবারের ওপর। তারপর ধীরে ধীরে সে দায়িত্ব এসে পড়ে স্কুল ও কলেজের ওপর।

২। শিক্ষার সামাজিক তাৎপর্য (Social Significance of Education):

শিক্ষার দুপ্রকার তাৎপর্য আছে। একটি ব্যক্তিগত ও অপরটি সামাজিক। ব্যক্তির পক্ষে শিক্ষা অর্জনের প্রয়োজনীয়তা হল শিক্ষার দ্বারাই ব্যক্তি তার গুণগুলিকে বিকশিত করে তুলতে পারে, তার পরিবেশের (environment) সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করতে এবং মনুষ্যত্ব অর্জনে সমর্থ হয়। কিন্তু এ ছাড়াও শিক্ষার একটা সামাজিক তাৎপর্য আছে।

সামাজিক ঐক্য ও উন্নতির জন্য শিক্ষা অপরিহার্য

আদর্শ সমাজ তখনই গড়ে উঠতে পারে যখন প্রতিটি ব্যক্তি তার আচরণকে বিচারবুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করে। সমাজ-জীবনে প্রতিটি ব্যক্তিরই উচিত অপরের অধিকারকে স্বীকার করে নেওয়া। কিন্তু যে ব্যক্তি বিচারবুদ্ধির দ্বারা নিজের আবেগ, প্রবৃত্তি এবং ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রিত করতে না পাবে তার পক্ষে অপরের অধিকারে হস্তক্ষেপ করা খুবই স্বাভাবিক। ব্যক্তি যদি অধিকার এবং

---

1. "In a narrow sense, it may be taken to mean any consciously directed effort to develop our powers."

—Mackenzie : Outlines of Social Philosophy, Page 24

কর্তব্যবোধ সম্পর্কে সচেতন না থাকে তাহলে সমাজ-জীবনের শান্তি ও ঐক্য বিশেষভাবে ব্যাহত হবে এবং তাতে সমাজের উন্নতিও সম্ভব হবে না। এর জন্য প্রয়োজন সমাজের প্রতিটি ব্যক্তিকে শিক্ষিত ও নিয়মানুবর্তী করে তোলা যাতে সে তার আচরণ বুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করতে পারে এবং সমাজ-জীবনের শান্তি ও ঐক্য বজায় রাখতে পারে। তাছাড়া, একমাত্র শিক্ষার মারফতেই সমাজের উন্নতি সম্ভব। শিক্ষার এ হল প্রাথমিক উদ্দেশ্য। শিক্ষাব্যবস্থা এমনভাবে গঠন করা দরকার, যাতে প্রতিটি ব্যক্তি, নিজের পরিবার ও সমাজ-জীবনের গণ্ডী উত্তীর্ণ হয়ে বৃহত্তর মনুষ্য-সমাজের কল্যাণের জন্য চিন্তা ও চেষ্টায় ব্রতী হতে পারে। শিক্ষা ভিন্ন এরূপ আদর্শের চেতনা সমাজস্থ ব্যক্তির মধ্যে আনা সম্ভব নয়।

ব্যক্তি নিয়েই সমাজ। সমাজের উন্নতি বা অগ্রগতি ব্যক্তির উন্নতি ভিন্ন কখনই সম্ভব নয়। প্রতিটি ব্যক্তিকে সমাজ-জীবনে তার অবস্থান অনুযায়ী সমাজের দ্বারা নির্দেশিত কতকগুলি কর্তব্য সম্পন্ন করতে হয়। ব্যক্তির মধ্যে দায়িত্ববোধ ও সামাজিক চেতনা থাকলেই ব্যক্তি এই কর্তব্যগুলি সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে পারে, শিক্ষার দ্বারাই ব্যক্তির মনে এই দায়িত্ববোধ ও সামাজিক চেতনা সৃষ্টি করা যেতে পারে। যে সমাজে সুস্থ, শ্রমশীল, সচ্চরিত্র, আদর্শনিষ্ঠ, আধ্যাত্মিক চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তির সংখ্যা অধিক সে-সমাজ যে তত উন্নত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এসব গুণ একমাত্র শিক্ষার দ্বারাই বিকশিত হওয়া সম্ভব। সুতরাং শিক্ষা মানব সমাজের অন্যতম প্রাথমিক প্রয়োজন। শিক্ষা ভিন্ন আদর্শ সমাজের কল্পনা করা মূর্খতারই নামান্তর। এ কারণে যেসব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান নানাভাবে মানুষকে শিক্ষিত করে তোলার জন্য সচেষ্ট হয়, সমাজ-জীবনে সেগুলির অবদান এবং মূল্য অপরিসীম। সমাজদর্শনের কাজ এসব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করা।

ব্যক্তির বিকাশই শিক্ষার উদ্দেশ্য

৩। শিক্ষার উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য (The Ends of Education):

যে-কোন সুসংগঠিত সমাজে শিক্ষা দেওয়ার সুমহান দায়িত্ব কতকগুলি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বা বিশেষ ধরনের কর্তৃপক্ষের ওপর ন্যস্ত করা হয়। প্রশ্ন হল, এসব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য কি বা কোন্ আদর্শ এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে নিয়ন্ত্রিত করে? শিক্ষার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন অভিমত দিয়েছেন। প্লেটো (Plato), অ্যারিস্টটল (Aristotle) এবং কোন কোন শিক্ষাবিদ্ মনে করেন, জ্ঞান

অর্জনই শিক্ষার লক্ষ্য। আবার কেউ কেউ মনে করেন, সংস্কৃতিই (culture) শিক্ষার উদ্দেশ্য। সংস্কৃতি অর্থে তাঁরা বোঝেন ব্যক্তিগত মানসিক উন্নতি। হারবার্ট (Herbert), বার্ট্রাণ্ড রাসেল (Bertrand Russell) প্রমুখ দার্শনিকদের মতানুসারে সৎ চরিত্র গঠন শিক্ষার উদ্দেশ্য। হারবার্ট স্পেন্সার (Herbert Spencer) পরিপূর্ণভাবে বেঁচে থাকার জন্য যেসব কর্ম করার প্রয়োজন তার জন্য শিক্ষার্থীকে উপযুক্ত করে তোলাকেই শিক্ষার উদ্দেশ্য মনে করেন। রুশো (Rousseau)-র মতে জীবনের সব গুণের স্বাভাবিক বিকাশকেই শিক্ষার উদ্দেশ্যরূপে নির্দেশ করা যেতে পারে। কোন কোন শিক্ষাবিদের মতে উত্তম নাগরিকতাই শিক্ষার লক্ষ্য, আবার কেউ কেউ মনে করেন যে, ব্যক্তির সহজাত সামর্থ্যের আত্মপ্রকাশের সুযোগ দেওয়াই শিক্ষার লক্ষ্য। নান্ (T. P. Nunn)-এর মতে শিশুর ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনই শিক্ষার লক্ষ্য। ডিউই (John Dewey)-র মতে সামাজিক কর্মকুশলতাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। পেস্তালোজি (Pestalozzi)-র মতে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যক্তিত্ব (harmonious personality) শিক্ষার লক্ষ্য।

বিভিন্ন শিক্ষাবিদের অভিমত

উপরিউক্ত অভিমতগুলির মধ্যে যথেষ্ট সত্যতা আছে সত্য, তবু এই সকল অভিমতের মধ্যেই শিক্ষার উদ্দেশ্যকে খুঁজে পাওয়া যায় না, কারণ এঁরা মানুষের জীবনের কোন বিশেষ একটি দিকের ওপরই গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এই কারণে কোন কোন শিক্ষাবিদ শিক্ষার একাধিক উদ্দেশ্যের কথা বলেছেন।

জোয়াড (Joad)-এর মতে শিক্ষার একাধিক উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য আছে। তার মধ্যে তিনটি প্রধান উদ্দেশ্য : যথা, (ক) ছেলেমেয়েদের জীবিকা অর্জনের জন্য উপযুক্ত করে তোলা ; (খ) গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যাতে নাগরিক হিসেবে তারা কাজ করতে পারে তার জন্য তাদের উপযুক্ত করে তোলা এবং (গ) তাদের মধ্যে যত সুপ্তশক্তি এবং বৃত্তি আছে সেগুলি বিকশিত করে সৎ জীবন যাপন করার জন্য তাদের সমর্থ করে তোলা।[1]

মানুষের জীবনের যে বিভিন্ন দিকের বিকাশের কথা ওপরে বলা হয়েছে, শিক্ষার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের মধ্যে এই সবকটিই অন্তর্ভুক্ত হবে, বিশেষ কোন একটি দিক শিক্ষার লক্ষ্য হতে পারে না। শিক্ষার লক্ষ্য সম্পূর্ণ মানুষটিকে শিক্ষা দেওয়া, ব্যক্তির সমগ্র ব্যক্তিত্বের উন্নতি সাধন করা। শিক্ষার লক্ষ্য হল ব্যক্তির আত্মোপলব্ধিতে সহায়তা করা।

সাধারণ জীবনে আমরা দেখি, একজন মানুষ একটি পরিবারভুক্ত ব্যক্তি হিসেবে, একটি জাতির অন্তর্ভুক্ত নাগরিক হিসেবে এবং সমস্ত মনুষ্যজাতির অন্তর্ভুক্ত একজন

1. G. E. M. Joad : About Education , Page 23

সভ্য হিসেবে শিক্ষালাভ করে। যদিও মানুষের জীবনে এ তিনটি স্তরের মধ্যে একটা নিবিড় সংযোগ আছে তবু এ তিনটি স্তর অনুযায়ী মানুষের শিক্ষা-পদ্ধতি ভিন্ন।

সমাজের মূল কেন্দ্র হল পরিবার। পরিবারের মধ্যেই ব্যক্তির প্রথম শিক্ষা শুরু হয়। পরিবারের মধুর পরিবেশ, মাতাপিতা, ভাইবোন ও আত্মীয়স্বজনের সহানুভূতি, সমবেদনা ও ভালবাসা ব্যক্তির শিক্ষা জীবনকে করে তোলে স্বতঃস্ফূর্ত, স্থায়ী ও প্রাণবন্ত। কিন্তু যে বৃহত্তর পরিবেশে ব্যক্তিকে ভবিষ্যৎ জীবনে প্রবেশ করতে হবে তার কথা যদি বিস্মৃত হওয়া যায় তাহলে এ শিক্ষা হবে স্বার্থকেন্দ্রিক, ক্ষুদ্র ও অর্থহীন। পরিবারের সীমিত গণ্ডির মধ্যে থেকে ব্যক্তির শিক্ষা যদি সীমাবদ্ধভাবে গড়ে ওঠে, ব্যক্তি যদি কেবলমাত্র নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধি করার কথা ভাবে, উচ্চতর আশা, আকাঙ্ক্ষা, বৃহত্তর সমাজ-জীবনের চেতনা যদি তার মধ্যে না জাগে, তাহলে সমাজের দিক থেকে এরূপ ব্যক্তি উপযুক্ত ব্যক্তি নয়।[1] কেবলমাত্র নিজের প্রয়োজনে রুটি রোজগার করা এবং জীবনের বৃহত্তর অর্থ ও উদ্দেশ্যকে বিস্মৃত হওয়া ক্রীতদাসত্বেরই লক্ষণ।

শিক্ষার যথার্থ আদর্শ

পরিবারের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে শিক্ষাজীবন শুরু হলেও মানুষের পরিচয় সেখানেই শেষ নয়। মানুষ একটা জাতির বা সমাজের অন্তর্ভুক্ত এবং মানুষের এই পরিচয়ে নিহিত আছে তার বৃহত্তর দায়িত্ব সাধনের কর্তব্য। তাকে তার সমাজের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে জানতে হবে, সমাজ-জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও জীবনধারার সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দিতে হবে।

ব্যক্তির সামাজিক দায়িত্ববোধ জাগ্রত করা শিক্ষার উদ্দেশ্য

কিন্তু এছাড়াও আছে মানুষের আর এক বৃহত্তর পরিচয়। মানুষ কেবল পরিবার বা সমাজেরই সভ্য নয়, সে বৃহত্তর মনুষ্য সমাজের বা আন্তর্জাতিক সমাজের (International Society) সভ্য। মানুষে মানুষে বর্ণগত, দেশগত ও জাতিগত যত পার্থক্যই থাক না কেন, প্রতিটি মানুষের মধ্যে আছে মন এবং অনুভূতি যার দ্বারা মানুষ পরস্পরকে

1. গিসবার্ট (Gisbert) মানুষের বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গির কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন,—"মানুষ একজন পরিশ্রমী কর্মী যা একজন দক্ষ কারিগরের চেয়ে অনেক বেশী। এর থেকে বড় কথা তাকে বৃহত্তর কর্তব্য সম্পাদন করতে হবে এবং উচ্চতর আশাকে পরিপূর্ণ করে তুলতে হবে" (',Man is far more than a hard worker or a skilful artisan , what is more, he has wide duties to discharge and higher aspiration to fulfil.")

—P. Gisbert : Fundamentals of Sociology ; Page 220.

বুঝতে পারে, জানতে পারে, পরের দুঃখ,সহানুভূতি ও সমবেদনা উপলব্ধি করতে পারে[1]। বস্তুতঃ, বহু প্রভেদ ও পার্থক্য সত্ত্বেও মূল বিষয়ে মানুষে মানুষে কোন ভেদ নেই। বর্তমান যুগে সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানের নিত্য নতুন আবিষ্কার ও যোগাযোগ ব্যবস্থার দ্রুত উন্নতির ফলে আন্তর্জাতিক সমাজ প্রতিষ্ঠা বাস্তবে রূপায়িত হতে চলেছে। এ কারণে কেবলমাত্র আন্তর্জাতিক নিয়মকানুনের জ্ঞানই যথেষ্ট নয়। প্রতিটি মানুষকে এমন শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে, যাতে সে তার মানসিক, সামাজিক, নৈতিক, ইচ্ছামূলক এবং সৌন্দর্য সম্পর্কীয় শক্তিগুলিকে বিকশিত করে নিজের বিশ্ব-মানবত্ব উপলব্ধি করতে পারে। এর ফলে ভবিষ্যতে এক বন্ধুত্বের এবং ভালবাসার যোগসূত্রে সমস্ত জাতি বাঁধা পড়বে এবং পরস্পরের মধ্যে এক মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠবে। আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার এই হল প্রধান লক্ষ্য—প্রকৃত মানুষ গড়ে তোলা, মানুষের পূর্ণ ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করা।

শিক্ষা হল একটা গতিশীল প্রক্রিয়া। শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবলমাত্র ছাত্রদের পুঁথিগত বিদ্যা দান করা নয়। যে জ্ঞানকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাবে না সে জ্ঞানের ব্যবহারিক উপযোগিতা নেই। হিল্‌ডা জেবা (Hilda Jaba)-এর[2] মতে আমাদের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে দোষত্রুটি দেখি, তার প্রধান কারণ, আমরা এখনও মনে করি যে সাংস্কৃতিক ও নৈতিক আদর্শের বুঝি কোন পরিবর্তন নেই, সেগুলি স্থির ও অপরিবর্তনীয়। সে কারণে অনেকে মনে করেন যে, শিক্ষার উদ্দেশ্য যুবকদের মনে কতকগুলি স্বীকৃত সত্য ও মূল্যের ধারণা অনুপ্রবিষ্ট করে দেওয়া, কিন্তু এ ধারণা ভ্রান্ত। হিল্‌ডা জেবা-এর মতে শিক্ষার্থীর অনুরাগ, সামর্থ্য, প্রবণতা ও প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। শিক্ষার্থী এবং তার পরিবেশের মধ্যে একটা গতিশীল আন্তরসম্পর্ক বর্তমান এবং উভয়ের এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের মধ্য দিয়েই শিক্ষণীয় বিষয়ের নতুন তাৎপর্য শিক্ষার্থীর কাছে উদ্‌ঘাটিত হয়।

1. গিসবার্ট (Gisbert) বলেন, "এতে মানুষের প্রকৃতির সবচেয়ে অন্তরঙ্গ দিক—মানুষের ব্যক্তিত্ব এবং তার সবচেয়ে বাহ্যিক দিক—আন্তর্জাতিক সমাজ, পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়।"
("It is here that the most intimate aspect of human nature—man's personality—and its most external aspect—international society—meet."

—Gisbert : Fundamentals of Sociology, Page 922

2. Hilda Jaba : The Dynamics of Education, Page 195

২। শিক্ষার আদর্শের দার্শনিক বিচার (Philosophical Evaluation of the Ideals of Education) :

সমাজদর্শন যেহেতু সামাজিক আদর্শ ও মূল্যের বিচার করে, শিক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন আদর্শের আপেক্ষিক মূল্য বিচার করা সমাজদর্শনের কাজ। শিক্ষার লক্ষ্য প্রসঙ্গে যদিও এই আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে, তবু শিক্ষার আদর্শ সম্পর্কীয় কয়েকটি দার্শনিক মতবাদের আলোচনা নীচে করা হচ্ছে :

(ক) স্বভাববাদ (Naturalism) :

স্বভাববাদ অনুসারে শিশুর স্বাভাবিক বৃত্তিগুলির বিকাশের পরিপূর্ণ সুযোগ দেওয়াই শিক্ষার আদর্শ হওয়া উচিত। এই মতের প্রধান প্রবর্তক হলেন রুশো (Rousseau)। রুশো গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করেন। তাঁর মতে যেহেতু শিশুর বিকাশ ও বর্ধন স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া (Natural Process) সেহেতু শিক্ষার শিক্ষাব্যবস্থা যদি প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক পথে অগ্রসর না হয়ে কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করে অগ্রসর হয়, তাহলে সেই শিক্ষাব্যবস্থা হবে ত্রুটিপূর্ণ। শিশুর শিক্ষা-ব্যবস্থা যেন স্বাভাবিকভাবে অগ্রসর হয়। বাইরে থেকে কোন বাধা যেন শিশুর স্বাভাবিক বৃত্তিগুলির বিকাশের পথে কোন অন্তরায় সৃষ্টি না করে। শিশুর বৃত্তিগুলির স্বাভাবিক বিকাশের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করাও শিক্ষার আদর্শের অন্তর্ভুক্ত। যান্ত্রিকভাবে পাঠ মুখস্থ করা, পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্নিহিত অর্থের তাৎপর্য উপলব্ধি না করে পাঠ্যবিষয় শিক্ষা করা এবং তার পুনরুৎপাদন করা প্রভৃতি কৃত্রিমতাপূর্ণ শিক্ষা। শিশুর শিক্ষাব্যবস্থায় শিশুর সহজাত বৃত্তি এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আবেগ, শিশুর ইচ্ছা, কামনা, বাসনা প্রভৃতি প্রকাশের সুযোগ থাকা দরকার। শিশুকে খেলাধূলার মাধ্যমে, আনন্দের মধ্য দিয়ে শিক্ষা দিতে হবে। শিক্ষার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত বাধানিষেধ শিশুর শিক্ষাব্যবস্থার পথে এক প্রধান অন্তরায়। পাঠ্যবিষয় যেন শিশুর কাছে বোঝা বলে মনে না হয়। শিক্ষার ব্যাপারে যেন কোন বাধ্যবাধকতার মনোভাব শিশুমনে সৃষ্টি না হয়। শিশুর ওপর জোর করে কতকগুলি আদর্শ চাপিয়ে দেওয়া হলে, শিশুর মনে তার বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে এবং শিক্ষার প্রতি শিশুর স্বাভাবিক অনুরাগ দেখা দেবে না। শিক্ষায়তনের পরিবেশ যেন শিশুর নিকট আনন্দজনক হয়। শিশুর প্রথম দিকের শিক্ষাব্যবস্থাকে রুশো (Rousseau) নঞর্থক শিক্ষারূপে (negative education) অভিহিত করেছেন। নঞর্থক শিক্ষা বলতে শিক্ষার অভাব বোঝায় না, বরং শিশুকে শিক্ষাদানের ব্যাপারে প্রাপ্তবয়স্কের প্রচেষ্টার অনুপস্থিতি বা

শিশুর স্বাভাবিক বৃত্তিগুলির বিকাশ শিশুর আদর্শ

অভাব বোঝায়। শিশুর শিক্ষা হবে প্রকৃতি নির্ভর, প্রকৃতির সঙ্গে পরিপূর্ণভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং কেবলমাত্র প্রকৃতি প্রদত্ত।

পরবর্তীকালে রুশো (Rousseau) প্রবর্তিত পূর্বোক্ত শিক্ষা-আদর্শ অনেক শিক্ষাবিদ্, যেমন—পেসটালোৎসি (Pestalozzi), হারবার্ট (Herbert), ফ্রোয়েবেল (Froebel) এবং মন্টেসরী (Montessori) সমর্থন করেন এবং তাঁর অভিমতকে আরও সুস্পষ্ট রূপ দান করেন।

সমালোচনা (Criticism) :

এই মতবাদ শিক্ষার কোন যথাযথ আদর্শ উপস্থাপনে ব্যর্থ হয়। শিশুর সব বৃত্তিকেই স্বাভাবিকভাবে প্রকাশিত হবার সুযোগ দেওয়াও শিক্ষার আদর্শ হতে পারে না। কারণ তাহলে শিশুর কুপ্রবৃত্তিকেও স্বাভাবিক বিকাশের সুযোগ দিতে হয়। কিন্তু শিশুর কুপ্রবৃত্তিকে স্বাভাবিক বিকাশের সুযোগ দান না করে, সেগুলি যাতে আত্মপ্রকাশের সুযোগ না পায়, এবং সেই আবেগ কোন সৎপথে যাতে চালিত হয় তার ব্যবস্থা করাই যথাযথ শিক্ষার আদর্শের অন্তর্ভুক্ত। প্রকৃতি প্রদত্ত বৃত্তিগুলির অব্যাহত প্রকাশই যদি শিক্ষার আদর্শ হয় তাহলে শিক্ষাদান করার প্রয়োজন থাকে না। আর যদি মনে করা হয় শিশুর স্বাভাবিক বৃত্তিগুলির বিকাশ ও পরিচালনার জন্য শিক্ষকের প্রয়োজন তাহলে কোন্ শিক্ষার আদর্শ স্বীকার করা দরকার, যে আদর্শ অনুযায়ী এই পরিচালনকার্য সম্পাদিত হবে। কাজেই স্বভাববাদীদের কোন উপযুক্ত শিক্ষা-আদর্শকে স্বীকার করে নিতেই হয়।

(খ) **প্রয়োগবাদ** (Pragmatism) :

প্রয়োগবাদীদের মতে সকল প্রবৃত্তি (fruitful-activity) অর্থাৎ বাস্তব জীবনে কার্যকারিতাই সত্যাসত্যের মানদণ্ড। কাজেই শাশ্বত সত্যের অস্তিত্ব নেই। সত্য সদা পরিবর্তনশীল। প্রয়োজনানুসারে সত্যেরও পরিবর্তন ঘটে। পার্স (Peirce), জেমস্ (James), ডিউই (Dewey), এবং শিলার (Schiller) প্রভৃতি প্রয়োগবাদের সমর্থক।

প্রয়োগবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শিক্ষার আদর্শ নিরূপণের জন্য সচেষ্ট হয়েছেন ডিউই (Dewey)। ডিউইর মতে মানুষের কাছে সবচেয়ে বাস্তব বিষয় হল অভিজ্ঞতা (experience)। শিক্ষার আদর্শ হল মানুষের অভিজ্ঞতার গুণগত উৎকর্ষ সাধন।[1] তাঁর

---

1 " .....The business of education was to improve the quality of experience that human beings had."

—Selected Readings in the Philosophy of Education ; Edited by Joe Park, Fourth printing, Page 73

মতে পুরাতন শিক্ষা আদর্শ হল, ব্যক্তিকে তার অভিজ্ঞতাকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করে কার্যসিদ্ধ করতে শিক্ষা দেওয়া। কোন নির্দিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন করে কতকগুলি শাশ্বত সত্যের শিক্ষাদান শিক্ষার আদর্শ হতে পারে না। শিক্ষার আদর্শ হল অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে অভিজ্ঞতার পুনর্গঠন ও পুনর্বিন্যাস (reconstruction or re-organisation of experience)। যার দ্বারা অভিজ্ঞতা আরও অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং পরবর্তীকালের অভিজ্ঞতার গতিপথ নির্ধারণে শিশুর দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষ কোন আদর্শের ওপর নির্ভর করে শিক্ষাদান কার্য সম্পাদিত হলে, শিক্ষা ফলপ্রসূ হতে পারে না। কার্যের মাধ্যমে শিশুকে শিক্ষাদান করতে হবে। শিশুকে 'বলা' অপেক্ষা কার্য করতে শিক্ষা দিতে হবে। শিক্ষার আদর্শ হবে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই যেন শিশু কোন কিছুর মূল্য নিরূপণ করতে সমর্থ হয়। শিশুর চিন্তাই যেন অভিজ্ঞতাতে পরিণত হয়।

অভিজ্ঞতার পুনর্গঠন ও পুনর্বিন্যাস

সমালোচনা: শিক্ষার আদর্শ বাস্তব অভিজ্ঞতাভিত্তিক হওয়া উচিত এ অভিমত খুবই যুক্তিযুক্ত। কিন্তু প্রয়োগবাদীদের অভিমত সম্পূর্ণরূপে গ্রহণযোগ্য নয়। কার্যের সফলতাই কি সত্য নির্ধারণ করে, না কোন কিছু সত্য বলেই কার্যে সফলতা লাভ হয়? উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য স্বীকার করে না নিলে অভিজ্ঞতার পুনর্গঠন সম্ভব হত না। পদ্ধতিকে কোন উদ্দেশ্যের সঙ্গে যুক্ত হতে হবে, কার্যের সাফল্যের মাপকাঠিতে পদ্ধতির মূল্য নিরূপিত হয় না। স্থায়ী ও শাশ্বত সত্যের কোন অস্তিত্ব যদি না থাকে তাহলে প্রয়োগবাদীদের শিক্ষাদর্শের স্থায়িত্বও স্বীকার করা যেতে পারে না।

(গ) বাস্তববাদ (Realism):

বাস্তববাদীরা মনে করেন যে, শিক্ষার আদর্শ বাস্তব হওয়া প্রয়োজন। জীবনের কর্মক্ষেত্রে যা প্রয়োজনীয়, শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে সেই শিক্ষা দান করা, নিছক পুঁথিগত বিদ্যা শিক্ষার আদর্শ হওয়া উচিত নয়। ব্যাকরণ, ছন্দ প্রভৃতি অধ্যয়ন করাতেই শিক্ষা পরিসমাপ্ত হয় না। চারপাশের পরিবেশকে ভালভাবে জানাও শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত। হার্বার্ট স্পেন্সার, হাক্সলি প্রমুখ এই মতবাদের সমর্থক। বাস্তববাদীদের মতে শিক্ষার লক্ষ্য হবে ভাবী জীবনে কোন বৃত্তির জন্য শিক্ষার্থীকে উপযুক্ত করে তোলা। শিক্ষার সঙ্গে জীবনের ঘনিষ্ঠ সংযোগ থাকা বাঞ্ছনীয়। বাস্তববাদীরা আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারাকে শিক্ষাসূচীর অন্তর্ভুক্ত করতে চান। সবরকম কুসংস্কার থেকে শিক্ষাকে দূরে রাখা একান্ত প্রয়োজন। বিজ্ঞানমুখী শিক্ষাই ব্যক্তিকে জীবিকা সংগ্রহে সমর্থ করে। নিছক কাল্পনিক বিষয় বা অতীন্দ্রিয় সত্তার আলোচনা শিক্ষাসূচীর অন্তর্ভুক্ত না হওয়াই যুক্তিযুক্ত।

সমালোচনা : শিক্ষা অবশ্যই বাস্তব ভিত্তিক হওয়া প্রয়োজনীয়, কিন্তু নিছক বৃত্তির জন্য শিক্ষা লাভ করলে শিক্ষার আদর্শ সীমিত হয়ে পড়ে। শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যক্তির সমগ্র মানবসত্তার বিকাশ। যে শিক্ষা সেই লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত সেই শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। কাজেই শুধু বৃত্তিমূলক শিক্ষার ওপরে গুরুত্ব আরোপ করা যুক্তিযুক্ত নয়। বিজ্ঞান শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কলা, দর্শন (Philosophy), নীতি (Ethics) এগুলিরও যথাযথ স্থান শিক্ষার কর্মসূচীতে থাকা বাঞ্ছনীয়।

(ঘ) **ভাববাদ** (Idealism) ঃ

ভাববাদীদের মতে মানুষের শিক্ষার আদর্শ হওয়া উচিত পূর্ণতা লাভ। শিক্ষার আদর্শ হবে মানুষের সুপ্ত গুণগুলিকে বিকশিত করে তার পূর্ণ সত্তাকে বিকশিত করা। ব্যক্তিত্বের যথাযথ বিকাশসাধনই শিক্ষার উদ্দেশ্য। ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীন বিকাশসাধনই শিক্ষার লক্ষ্য। সমাজের মধ্যে বসবাস করে, সামাজিক কর্তব্য পালন করে, অর্থাৎ কিনা সমাজের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ জীবন যাপন করে ব্যক্তিকে তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন করতে হবে। ভাববাদীরা মনে করেন, জীবাত্মা বা ব্যক্তি পরমাত্মা বা বিশ্বচেতনার প্রকাশ। ব্যক্তি যে এক পরমচেতনা থেকে উদ্ভূত, যথাযথ শিক্ষা ব্যক্তির মধ্যে সেই চেতনার সৃষ্টি করে এবং ব্যক্তিকে তার মধ্যে যে দেবত্ব প্রচ্ছন্ন তাকে বিকশিত করতে উদ্বুদ্ধ করে।

ভাববাদীরা মনে করেন যে, যথাযথ শিক্ষাব্যবস্থায় সকল রকম শিক্ষার সুষম সমন্বয় সাধিত হবে। শুধুমাত্র বৈজ্ঞানিক শিক্ষা নয়, ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষারও শিক্ষাব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে। যে শিক্ষা ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীন বিকাশে সহায়ক, শিক্ষা-ব্যবস্থায় সে শিক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করতে কোন বাধা নেই। কাজেই বৃত্তিমূলক শিক্ষাও প্রয়োজনীয়, তবে শিক্ষা যদি শুধুমাত্র বৃত্তির উপযোগী হয়, তাহলে সে-শিক্ষা হবে একদেশদর্শী। ব্যক্তির সুপ্ত গুণগুলির বিকাশ সাধন করে ব্যক্তিকে পূর্ণ মনুষ্যত্ব অর্জনে সহায়তা করাই শিক্ষাদানের আদর্শ।

সমালোচনা ঃ ভাববাদীরা যে শিক্ষার আদর্শের কথা বলেছেন, সেই শিক্ষাদর্শের যথাযথ অনুধাবন কষ্টকর। প্রথমতঃ, ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধনের বিষয়টি দুরূহ এবং কিভাবে শিক্ষাব্যবস্থাকে গঠিত করলে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধিত হবে তা নিরূপণ করাও সহজসাধ্য নয়। প্রকৃতপক্ষে কোন ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের

সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধিত হয়েছে কিনা তা নিরূপণ করা কষ্টসাধ্য, কেননা বিষয়টি বিতর্ক-মূলক। তাছাড়া, ব্যক্তি কোন অতীন্দ্রিয় সত্তার প্রকাশ, এই অভিমতও সকলে স্বীকার করেন না। 'আত্মোপলব্ধি' শব্দটির যথাযথ অর্থ অনেকের নিকট সুস্পষ্ট নয়।

মন্তব্য: পূর্বোক্ত মতবাদগুলির মধ্যে কোন একটিই স্বয়ংসম্পূর্ণ মতবাদ নয়। ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে স্বভাববাদ, প্রয়োগবাদ ও বাস্তববাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে সংযুক্ত করেই যথাযথ শিক্ষার আদর্শ নিরূপিত হওয়া যুক্তিযুক্ত।

৫। রাষ্ট্র এবং শিক্ষা (The State and Education):

রাষ্ট্র এবং শিক্ষার সম্পর্ককে কেন্দ্র করে দুটি মত দেখা যায়। কোন কোন লেখক মনে করেন যে, যেহেতু শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যক্তিকে ভাল নাগরিকে পরিণত করা, সেহেতু শিক্ষার দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তির ওপর ছেড়ে দেওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। ব্যক্তিকে শিক্ষিত করার বিরাট এবং সুমহান দায়িত্ব কেবলমাত্র রাষ্ট্রের ওপর ন্যস্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। অপরপক্ষে, অন্যান্য লেখকরা বলেন যে, রাষ্ট্র অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষাব্যবস্থাকে নিজের আয়ত্তে এনে শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে নিজের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধন করেন এবং শিক্ষকদের স্বাধীনতা হরণ করে তাদের বেতনভুক চাকুরেতে পরিণত করেন। তাঁদের মতে, শিক্ষা হল সামাজিক বিষয়, রাজনৈতিক বিষয় নয় এবং শিক্ষকদের ওপরই ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষিত করার দায়িত্ব অর্পণ করা উচিত। শিশুর শিক্ষাব্যবস্থা নির্ধারিত হওয়া দরকার তার ব্যক্তিগত মানসিক প্রবণতা অনুযায়ী এবং শিক্ষকদের শিক্ষা-ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকা প্রয়োজন ও তাঁদের দায়িত্ব পালনের পূর্ণ স্বাধীনতা এবং সুযোগ দেওয়া দরকার। শিক্ষা-ব্যাপারে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ করা ঠিক নয় এবং শিক্ষা-ব্যাপারে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিকেও রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত রাখাই যুক্তিযুক্ত।

শিক্ষার ব্যাপারে রাষ্ট্রের দায়িত্ব সম্বন্ধে দুটি মত

পূর্বোক্ত দুটি মতবাদই চরম মতবাদ, সেহেতু একটি মধ্যপন্থা অবলম্বন করাই যুক্তি-যুক্ত। প্রথমতঃ, শিক্ষার ব্যাপারে রাষ্ট্রের যে করণীয় কিছু নেই, তা ঠিক নয়। একটা সুনির্দিষ্ট সংগঠন ছাড়া শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালিত হতে পারে না এবং যেহেতু রাষ্ট্রই সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশীল সংগঠন, সেহেতু রাষ্ট্রের ওপর এ দায়িত্ব আংশিকভাবে না এসে পারে না। অপরপক্ষে, শিক্ষাব্যবস্থার ওপরে রাষ্ট্রের অত্যধিক কর্তৃত্ব বা হস্তক্ষেপ শিক্ষার বিভিন্ন প্রয়োজন, অবস্থা ও ব্যবস্থাকে উপেক্ষা করে শিক্ষাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কোন

যান্ত্রিক পথে পরিচালিত করে এবং তা ব্যক্তির উন্নতি ও বিকাশের পক্ষে একান্তই ক্ষতিকর। তাছাড়া, শিক্ষকদের ওপর অযথা আধিপত্য করে শিক্ষকদের স্বাধীনতা হরণ করা প্রকৃত গণতান্ত্রিক আদর্শের বিরোধী। ব্রুবাকার (J. B. Brubacoer) বলেন, "রাষ্ট্র যেমন স্কুল তৈরি করতে পারে তেমনি পরিবার, গীর্জা, শিল্প-প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য স্বেচ্ছামূলক সংগঠনও তাই পারে। সুতরাং শিশুদের শিক্ষার বিষয়ে একচেটিয়া অধিকার দাবি করার ব্যাপারে রাষ্ট্রের নিজেকে সতর্ক রাখতে হবে।"[1] গিসবার্ট (Gisbert) বলেন, "শিক্ষার ব্যাপারে রাষ্ট্রের একচেটিয়া অধিকার বা কোন বিশেষ ধরণের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বিপক্ষতা করা প্রকৃত গণতন্ত্রের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ।"[2]

সুতরাং মধ্যপন্থা অবলম্বনই যুক্তিযুক্ত। শিক্ষাব্যবস্থার ওপরে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব হবে খুবই সীমিত। ম্যাকেঞ্জি (Mackenzie)-র মতে রাষ্ট্রের কাজ হল শিক্ষাব্যবস্থাকে যথার্থভাবে কার্যকরী করার জন্য উপযুক্ত সুযোগের ব্যবস্থা করে দেওয়া এবং এই সুযোগগুলির যথার্থ সদ্ব্যবহার হচ্ছে কিনা সেদিকে লক্ষ্য রাখা। রাষ্ট্রের কাজ হল অর্থনৈতিক সাহায্যের দ্বারা শিক্ষাব্যবস্থাকে দৃঢ়ভিত্তির ওপরে প্রতিষ্ঠিত করা, উপযুক্ত শিক্ষকের ব্যবস্থা করা এবং তাদের স্বাধীনভাবে কাজ করার পূর্ণ সুযোগ দান করা। যেহেতু সমাজের বিভিন্ন বিষয় এবং শক্তিগুলিকে সংযোজন করার একমাত্র কর্তৃপক্ষ হল রাষ্ট্র, সেহেতু শিক্ষাসম্পর্কীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে রাষ্ট্রের সকল রকম সহায়তা প্রদান করা উচিত। রাষ্ট্র শিক্ষাবিদ্‌দের সহায়তায় নতুন নতুন পরিকল্পনার সাহায্যে বা বিভিন্ন শিক্ষাবিদের পরিকল্পনাকে অনুমোদন করে এবং শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতির জন্য যে-কোন পরিকল্পনাকে সহায়তা করে শিক্ষা-ব্যবস্থাকে উন্নত করে তুলতে পারে। রাষ্ট্রের মধ্যে সকলেই যাতে শিক্ষা লাভ করার সম্পূর্ণ সুযোগ পায় তার জন্য প্রয়োজন রাষ্ট্রের সবরকম প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করা, শিক্ষাব্রতী এবং উদ্যোগী ব্যক্তিদের সহায়তায় অশিক্ষা এবং অজ্ঞতাকে দূরীভূত করা।

শিক্ষাব্যবস্থায় রাষ্ট্রের দায়িত্ব থাকলেও তার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হওয়া উচিত

---

1 'The state may provide schools but so also may the family, church, industry, and other voluntary agencies. Therefore, the state must guard itself against claiming a monopoly in the education of children."

—J. S. Brubacher : Modern Philosopies of Education , Page 139.

2 State monopoly of education or discrimination against any type of educational institution, is incompatible with true democracy."

Gisbert : Fundamentals of Sociology , Page 235

শিক্ষার একটি লক্ষ্য শিক্ষার্থীর মধ্যে অনুসন্ধিৎসা জাগ্রত করা, শিক্ষার্থীর সৃজনমূলক ক্ষমতাকে বিকশিত করা। অনেক সময় কোন কোন শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে শিক্ষা এই উদ্দেশ্যে সিদ্ধ করলেও অনুকূল পরিবেশের অভাব এবং প্রতিকূল পরিবেশের দ্বারা সৃষ্ট বাধাহেতু শিক্ষার্থীর জানার আগ্রহ বেশীদূর অগ্রসর হতে পারে না বা শিক্ষার্থীর সৃজনমূলক ক্ষমতা নিজেকে পরিপূর্ণভাবে কিকশিত করতে পারে না। রাষ্ট্রের কর্তব্য হল সকল রকম বাধাবিপত্তি দূর করে এবং অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়তা করে শিক্ষার্থীর জানার আগ্রহ এবং সৃজনমূলক ক্ষমতাকে তার নির্দিষ্ট পথে চলতে সহায়তা করা। কাজেই নিয়ন্ত্রণ নয়, শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে সর্বপ্রকার সহযোগিতাই রাষ্ট্রের লক্ষ্য হওয়া দরকার।

উপযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমেই সুশিক্ষিত, সচ্চরিত্র ও দায়িত্বশীল নাগরিক সৃষ্টি হতে পারে। রাষ্ট্রের কাজ হল শিক্ষাব্যবস্থাকে সুসংহত ও সুগঠিত করতে সহায়তা করে এমন দায়িত্বশীল নাগরিক সৃষ্টি করা। ব্রুব্যাকার (J. S. Brubacher) বলেন, "ছাত্রকে এই নিশ্চয়তা দিতে হবে যে, তাকে নাগরিক হিসেবে নয়, পরন্তু ব্যক্তি হিসেবে শিক্ষিত করে তোলা হবে। রাষ্ট্রের মুখপাত্র বা হাতিয়ার রূপে নয়, তাকে একটি বিশেষ লক্ষ্য হিসেবে শিক্ষিত করা হবে। তার মানে এই নয় যে, ভাল ব্যক্তির শিক্ষা এবং ভাল নাগরিকের শিক্ষার মধ্যে কোন বিরোধিতা আছে; এটা হল কেবলমাত্র স্মরণ করিয়ে দেওয়া যে, এক্ষেত্রে দুটি ভিন্ন ধরনের মূল্য বর্তমান; যে বিষয়ে যে-কোন গণতন্ত্রকে অন্ততঃ অবিরত সচেতন থাকতে হবে।"[1]

---

1. "In this way too this people will be assured of being educated as an individual and not exclusively as a citizen. He will be educated as an end and not just as mouthpiece or instrument of the state. This is not to imply that there is any necessary antithesis between the education of the good individual and the education of the good citizen but it is a reminder that there are two different kinds of value here to which a democracy at least, must be constantly sensitive."
—John. S. Brubacher : Modern Philosophies of Education ; Page 146

ষষ্ঠ অধ্যায়

সংস্কৃতি এবং সভ্যতা
(Culture and Civilisation)

১। সংস্কৃতি বলতে কি বুঝ? (What is the meaning of Culture) :

'সংস্কৃতি' শব্দটি ক্ষুদ্রতর ও ব্যাপকতর, দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। ক্ষুদ্রতর অর্থে সংস্কৃতি বলতে আমরা বুঝি মার্জিত রুচি বা অভ্যাসজাত উৎকর্ষ। ডিউই (Dewey) বলেন, "সংস্কৃতি বলতে বোঝায় কোন একটা কিছু যার অনুশীলন করা হয়েছে, যা পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। এ হচ্ছে অপরিণত ও অমার্জিতের বিরোধী।"[1] নৃতত্ত্ববিদরা 'সংস্কৃতি' শব্দটিকে ব্যপকতর অর্থে ব্যবহার করেছেন। এই অর্থে আমাদের জীবনের সব দিকগুলিই সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। জ্ঞান, বিশ্বাস, কলা, নৈতিকতা, রীতিনীতি, মানুষের অর্জিত বিভিন্ন অভ্যাস সবই সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। এই ব্যপকতর অর্থে যখন সংস্কৃতি শব্দটি ব্যবহৃত হয় তখন তার দুটি দিক আছে, পার্থিব ও আধ্যাত্মিক।

মানুষের প্রতিটি কাজ প্রত্যক্ষভাবেই হোক বা পরোক্ষভাবেই হোক তার সামাজিক এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। মানুষ ও তার পরিবেশের মধ্যে যে ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া চলেছে তার মূলে রয়েছে মানুষের কোন-না-কোন প্রয়োজন। মানুষের এই প্রয়োজনকে দুটি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করা যেতে পারে। প্রথমতঃ, পার্থিব প্রয়োজন —যার জন্য মানুষ জমি চাষ করে, খাদ্য উৎপাদন করে, নতুন নতুন যন্ত্র আবিষ্কার করে, প্রকৃতির ভাণ্ডার থেকে খনিজ সম্পদ নিয়ে নিজের প্রয়োজনীয় বস্তু তৈরি করে।

কিন্তু মানুষের আরও এক ধরনের প্রয়োজন আছে। সে প্রয়োজন হল, সৌন্দর্য-সম্পর্কীয় এবং আধ্যাত্মিক (Aesthetic and Spiritual)। এরই জন্য মানুষ সঙ্গীত শিক্ষা করে, কবিতা লেখে, সাহিত্য রচনা করে। পার্থিব বস্তু সম্পর্কে যেমন মানুষের আগ্রহ কিভাবে এই জিনিসগুলি উৎপন্ন করা যায়, তেমনি উৎকর্ষমূলক প্রয়োজন সম্পর্কেও মানুষের আগ্রহ কম নয়। সে কারণে দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় বস্তু ছাড়াও আমরা

---

1. "Culture means at last something cultivated, something ripened' it is opposed to the raw and crude."

—Dewey : Democrcy and Education , Page 142

দেখি রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহারের বৈচিত্র্য, প্রচলিত প্রথা, নানা ধরনের অনুষ্ঠান, বহু রকমের প্রতিষ্ঠান এবং এগুলি মানুষের সঙ্গে তার সামাজিক পরিবেশের সম্পর্ককে বিভিন্ন-ভাবে প্রভাবিত করে ; একে আমরা মানুষের সাংস্কৃতিক দিক বলতে পারি।

গিসবার্ট (Gisbert) বলেন, "এ সকল বস্তু এবং আচরণের ধারা, পার্থিব ও অপার্থিব স্বার্থ এবং সন্তোষ—এ সকল কিছুর জটিল সমগ্রতাকেই প্রাচীন এবং আধুনিক নৃতত্ত্ববিদ্‌রা 'সংস্কৃতি' নামে অভিহিত করেছেন।"[1] টাইলর (Tylor) বলেন, "সংস্কৃতি হচ্ছে সমাজস্থ মানুষের অর্জিত জ্ঞান, বিশ্বাস, কলা, নীতি, নিয়ম, সংস্কার ও অন্যান্য যে-কোন বিষয়ে দক্ষতার জটিল সমাবেশ।"[2]

'সংস্কৃতির' যে বিভিন্ন সংজ্ঞা দেওয়া হল সেগুলি লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে, সংস্কৃতি বলতে কেবলমাত্র মার্জিত রুচি, ব্যবহার বা অভ্যাসের উৎকর্ষ বোঝায় না, সংস্কৃতি তার চেয়েও বেশী কিছু। সংস্কৃতি হল মানুষের আচরণের সমষ্টি। মানুষের জাগতিক নৈপুণ্য ও কর্মকুশলতা, তার বিশ্বাস, আশা-আকাঙ্ক্ষা, কলা, নৈতিকতা, রীতিনীতি, ভাষা, মূল্যবোধ সবকিছুই সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। বিভিন্ন মানুষের মধ্যে উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যের বিরোধিতা দেখা দেয়। মানুষ তার ব্যক্তিত্বের অনুশীলনের মাধ্যমেই এ বিরোধিতা থেকে মুক্ত হতে পারে এবং এমন এক দৃষ্টিভঙ্গি লাভ করতে পারে যাতে সকলে অংশ গ্রহণ করতে পারে। ম্যাকেঞ্জি (Mackenzie) 'Culture'বলতে এই ব্যষ্টিগত ব্যক্তিত্বের (Individual Personality) অনুশীলনকেই বুঝেছেন। শিক্ষার ব্যপকতর এবং সঙ্কীর্ণতর দু'ধরনের তাৎপর্য আছে এবং ব্যাপকতর অর্থে শিক্ষা বলতে যা বোঝায় তাই হল 'সংস্কৃতি'। ম্যাকেঞ্জি (Mackenzie) বলেন, "সঙ্কীর্ণ অর্থে এ হল সমাজের জীবনে দীক্ষা লাভ করা, ব্যাপকতর অর্থে এ হল মানুষের আধ্যাত্মিক প্রকৃতিকে উন্নত করা, যার জন্য সমাজ-জীবন হল একটি উপায় মাত্র।"

অনেকে আবার সংস্কৃতিকে বিশেষ এক শ্রেণীর লোকদের একচেটিয়া জিনিস বলে মনে করেন, কিন্তু এ ধারণা ভ্রান্ত। প্রতিটি ব্যক্তিরই সংস্কৃতিবান হওয়ার অধিকার আছে

---

1. "This complex whole of objects and ways of behaviour, of material and immaterial interests and satisfactiots, has been designated by early and modern anthropologists by the name of culture."

—Gisbert : Fundamantals of Sociology , Page 285

2. "Culture is that complex whole which includes knowledge, belief art, morals, law, custom and any other capabilities acquired by men as a member of Society"

—E. B. Tylor : Primitive Culture , Page 1

এবং নিজের চেষ্টায় সে সংস্কৃতিসম্পন্ন হতে পারে। বস্তুতঃ, সংস্কৃতির মধ্যে ব্যক্তিগত এবং সামাজিক দুটি দিকই আছে। 'সংস্কৃতি' মানুষের পশুভাবকে দূর করে। সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করেই মানুষের সঙ্গে নিম্নতর শ্রেণীর পার্থক্য। সংস্কৃতিসম্পন্ন ব্যক্তি জানে কিভাবে বুদ্ধিমানের মতো আচরণ করতে হয়; সে পরিবেশের চাহিদা অনুযায়ী প্রতিক্রিয়া করতে পারে। জ্ঞান মানুষের বুদ্ধিকে উন্নত করে, সংস্কৃতি তার হৃদয়কে গঠিত করে। সংস্কৃতির সঙ্গে সামাজিক লক্ষ্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান। সংস্কৃতিসম্পন্ন ব্যক্তি একনিষ্ঠভাবে তার সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে পারে, সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে হলে সমাজের সংস্কৃতির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা উচিত। ব্যক্তির সংস্কৃতি সমাজের জীবনকে প্রভাবিত করে, আর ব্যক্তির জীবন সমাজের সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়। সংস্কৃতিকে অনেক সময় কৃত্রিম বলে গণ্য করা হয়। কিন্তু বিশ্বের বিভিন্ন ব্যক্তির ও গোষ্ঠীর সংস্কৃতির সাধারণ উপাদানগুলি লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে যে, মানুষের অনেক প্রয়োজনের মতন সংস্কৃতিও স্বাভাবিক, কৃত্রিম কিছু নয়।

যথার্থ সংস্কৃতির স্বরূপ

২। সংস্কৃতি এবং সভ্যতা (Culture and Civilisation):

'সংস্কৃতি' ও 'সভ্যতা' শব্দ দুটিকে অনেক সময় সমার্থক শব্দ রূপে ব্যবহার করা হয় যদিও তাদের সমার্থক শব্দরূপে ব্যবহার করা চলে না। নৃতত্ত্ববিদ্‌রা 'সংস্কৃতি' শব্দটিকে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেছেন। তাঁদের মতে জ্ঞান, বিশ্বাস, কলা, নৈতিকতা, আচার-ব্যবহার এবং সমাজের সভ্য হিসেবে মানুষের অর্জিত অভ্যাস ও কর্মক্ষমতা সবই সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। 'সভ্যতা' বলতে তাঁরা বোঝেন মনুষ্য সমাজের উন্নত স্তরে, শহর এবং রাষ্ট্রে মানুষের যে কর্মকুশলতার আবির্ভাব ঘটেছে, তার সমষ্টি।

কোন কোন লেখক মনে করেন, মানুষের আচরণের দুটি দিক আছে—বাইরের দিক এবং ভেতরের দিক। আচরণের বাইরের দিক হল সভ্যতা, তার ভেতরের দিক হল সংস্কৃতি। এসব লেখকদের মতে সংস্কৃতির মাধ্যমেই আমাদের প্রকৃতি প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশিত হয়। আমাদের চিন্তা-ভাবনা, কাজকর্ম, শিল্পকলা, নীতিবোধ, ধর্ম, আমোদ-প্রমোদ সব কিছুর মাধ্যমেই আমাদের সংস্কৃতির প্রকাশ। বিভিন্ন বিষয়ের আকর্ষণ ও মূল্য হল লক্ষ্য এবং বস্তু ও ক্রিয়া হল এই লক্ষ্য লাভ করার উপায়; আর মানুষ যত রকম যন্ত্র বা উপায় নির্ধারণ করেছে সেগুলি সব মিলিয়ে হল মানুষের সভ্যতা। পার্থিব ও শিল্প সংক্রান্ত যত রকম ব্যবস্থা বা কৌশল এবং মানুষের জীবনকে পরিচালিত করার জন্য যত আর্থিক ও রাজনৈতিক সংগঠন, সবই সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত।

আচরণের বাইরের দিক সভ্যতা, ভেতরের দিক সংস্কৃতি

বিভিন্ন লেখক 'সংস্কৃতি' ও 'সভ্যতার' মধ্যে প্রভেদ করেছেন। কাণ্ট (Kant)-এর মতে নৈতিকতা সংস্কৃতির প্রয়োজনীয় উপাদান; সংস্কৃতি মনের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার, সভ্যতার সঙ্গে ব্যক্তির বাহ্য আচরণের সম্পর্ক। মেথ্ আরনল্ড (Metthew Arnold)-ও মনে করেন যে, সংস্কৃতি হল আভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া,যেহেতু মানুষের সমগ্র পূর্ণতাতেই সংস্কৃতি নিহিত, আর সভ্যতা বাইরের ব্যাপার, যা বাহ্য ঘটনার ওপর নির্ভর। ম্যাকাইভার (MacIver)-এর মতে সংস্কৃতি হল লক্ষ্য, সভ্যতা হল সেই লক্ষ্য লাভের উপায়। তাঁর ভাষায়, সভ্যতা হল সংস্কৃতির যন্ত্র, শরীর বা পরিচ্ছদস্বরূপ। সভ্যতা রাজনীতি, অর্থনীতি এবং যন্ত্রশিল্পের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে, আর সংস্কৃতি নিজেকে প্রকাশ করে কলা, সাহিত্য, ধর্ম ও নৈতিকতার মধ্য দিয়ে। আমাদের সংস্কৃতি হল আমরা যা তাই, আমাদের সভ্যতা হল আমরা যা ব্যবহার করি।[1]

গিসবার্ট (Gisbert)[2] বলেন, "সভ্যতা হল বাহ্যিক ও যান্ত্রিক, জনকল্যাণকর এবং উপায়ের সঙ্গেই এর সম্পর্ক। কিন্তু সংস্কৃতির কাজ যেহেতু 'লক্ষ্য নিয়ে, সেহেতু এ হল আভ্যন্তরীণ, আঙ্গিক এবং সম্পূর্ণ।' তিনি আরও বলেন, সভ্যতা হল যা আমাদের আছে, সংস্কৃতি হল আমরা যা তাই।"[3]

সংস্কৃতি এবং সভ্যতার মধ্যে নিম্নলিখিত প্রভেদ লক্ষ্য করা যায়। যথা—

(ক) দক্ষতার ভিত্তিতে সভ্যতার পরিমাণ নির্ধারণ করা যেতে পারে কিন্তু সংস্কৃতির বিচার হয় মানুষের মানসিক উৎকর্ষের মানদণ্ডে। সভ্যতার পরিমাপ করতে গিয়ে আমরা বাইরের উন্নতি লক্ষ্য করি, যেমন—হাতে বোনা তাঁতের তুলনায় যান্ত্রিক তাঁতের ক্ষমতা অনেক বেশি। আর শিল্প কলার ক্ষেত্রে মতবিভেদের জন্য কোন ভাল চিত্র কারও কাছে সুন্দর কারও কাছে অসুন্দর।

(খ) সভ্যতার অবদানগুলিকে সহজেই বোঝা যায়, উপলব্ধি করা যায়। সংস্কৃতির অবদান সাধারণ মানুষ অত সহজে উপলব্ধি করতে পারে না। সাধারণ লোক সামান্য শিক্ষা পেলেই আধুনিক যন্ত্রপাতির কলাকৌশল ও ব্যবহার বুঝে নিতে পারে। কিন্তু

1. The Modern State : Page 325

2. 'Thus civilisation is external and mechanical, utilitarian and concerned only with means, while culture as dealing, exclusively with ends, is internal, organic and final."

—Gisbert : Fundamentals of Sociology : Page 286

3. 'Civilisation is what we have, culture is what we are.'—

—Gisbert : Fundamentals of Sociology

কোন লোককে কবিতা লেখা বা ছবিআঁকা ভালোভাবে শেখালেই যে সেই বিষয়ে সে দক্ষতা লাভ করবে তা নিশ্চয় করে বলা যায় না।

(গ) সভ্যতার গতি যেমন দ্রুত, সংস্কৃতির গতি তেমন দ্রুত নয়। সংস্কৃতির গতি অনেক সময় বাধাপ্রাপ্ত হয়, ফলে একটা থমথমে নিশ্চল ভাব দেখা দেয়। কখনও বা সংস্কৃতি হয় পশ্চাদগামী।

(ঘ) সভ্যতার ক্ষেত্রে পরিণতি বা ফলাফল হল বড় কথা। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পরিণতির থেকে কাজটাই বড়, সেটাই হল লক্ষ্য। তাছাড়া, সভ্যতার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা যত তীব্র, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা তত তীব্র নয়। মানুষ সৌন্দর্যকে নানাভাবে উপভোগ করতে পারে, বুদ্ধির সাধনায় নানাভাবে ব্রতী হতে পারে, ধর্ম সম্পর্কীয় অভিজ্ঞতাও বিভিন্নভাবে হতে পারে; এগুলি একত্রেও বিরাজ করতে পারে। কিন্তু সভ্যতার ক্ষেত্রে দেখি, আধুনিকতম সভ্যতার অবদান প্রাচীন আবিষ্কারকে অনেক দূরে সরিয়ে দিয়েছে।

ঙ) সভ্যতা হল ক্রমবর্ধিষ্ণু, কেননা মানুষ পুরাতনের পরিবর্তন বা উন্নতি সাধন করতে পারে কিন্তু সংস্কৃতি তা নয়। কারণ সংস্কৃতি সকলকেই নতুন করে অর্জন করতে হয়। সভ্যতা উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করা যেতে পারে, কিন্তু সংস্কৃতি অর্জন করতে হয়।

পূর্বোক্ত পার্থক্যের মধ্যেই সবগুলিই যে যুক্তিযুক্ত তা বলা চলে না। সংস্কৃতি ও সভ্যতার পার্থক্য লক্ষ্য ও উপায়ের পার্থক্যের সমতুল্য, তা বলা চলে না। কারণ সভ্যতার অবদানগুলির স্বতঃ ও পরতঃ উভয় প্রকার মূল্যই থাকতে পারে। বিজ্ঞানের অবদান যেমন বাহ্যলক্ষ্য সাধন করে, তেমনি তার নিজস্ব মূল্য আছে। সংস্কৃতির তুলনায় সভ্যতার গতি নিরবচ্ছিন্ন। এ অভিমতও যুক্তিযুক্ত নয়। হবহাউস (Hobhouse) এবং হোয়াইটহেড (Whitehead)-এর মতে নৈতিকতা ও ধর্মের সম্মুখ গতি লক্ষ্য করা যায়, কোন নিশ্চল ভাব দেখা যায় না। সংস্কৃতির তুলনায় সভ্যতার অবদানগুলির বিনিময় সহজতর; এ অভিমতও যুক্তিযুক্ত নয়। আধুনিক আবিষ্কারগুলির বিনিময় যেমন সহজ, এই আবিষ্কারগুলির পিছনে যে জ্ঞানের ব্যাপার রয়েছে, তা তেমন সহজে অপরকে জানানো যায় না।

সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যে প্রভেদ থাকলেও একটির সঙ্গে আর একটির সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। জাতি এবং ব্যক্তির সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তার সংস্কৃতির উন্নতি সাধিত হয় এবং সভ্যতার অবদানকে উপেক্ষা করে সংস্কৃতি নিজেকে বিকশিত বা উন্নত করতে

পারে না। কাজেই 'সংস্কৃতি' ও 'সভ্যতা' সমার্থক শব্দ নয় বা এদের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। সভ্যতাকে সংস্কৃতির একটি দিকরূপে গণ্য করাই যুক্তিযুক্ত।

৩। সংস্কৃতির সামাজিক তাৎপর্য (The Social Significance of Culture):

আমরা ইতিপূর্বে বলেছি যে, সংস্কৃতির সামাজিক এবং ব্যক্তিগত উভয় দিকই বর্তমান। সাধারণতঃ মনে করা হয় সংস্কৃতি হল ব্যক্তিগত ব্যাপার, মানুষকে নিজের চেষ্টায় সংস্কৃতিসম্পন্ন হতে হয় এবং খুব অল্প সংখ্যক ব্যক্তিই এর অধিকারী হতে পারে। তবে সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে কোন বিরোধ নেই, সকলেরই এতে অধিকার আছে। মানুষ তার প্রয়োজনীয় বস্তু নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে বিরোধে মত্ত হয়, কিন্তু সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে এ জাতীয় বিরোধিতা দেখা যায় না। বিজ্ঞান, কলা, শিল্প, দর্শন এসবের ক্ষেত্রে যে বিভিন্ন মতবাদ ও মতভেদ দেখা যায় তাহল সভ্যতার বিভেদ বা বিরোধ, সংস্কৃতির বিরোধ নয়। প্রয়োজনীয় বস্তুর জন্য মানুষে মানুষে যে বিরোধিতা এবং যে প্রতিযোগিতা দেখা যায়, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সেগুলি দৃষ্টিগোচর হয় না। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সংস্কৃতির বিরোধ আমরা লক্ষ্য করি সে কেবল তার প্রাথমিক অবস্থায়; সংস্কৃতির প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারলেই এ বিরোধিতা মিলিয়ে যায়।

সাংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে কোন বিরোধ নেই

সংস্কৃতি যদিও ব্যক্তিগত অনুশীলনের ব্যাপার তবু এর একটা সামাজিক দিক আছে। সংস্কৃতির প্রথম শুরু গোষ্ঠীকে কেন্দ্র করে। তারপর এই সংস্কৃতি অনেকটা ব্যক্তিগত ব্যাপারে পরিণত হয়েছে এবং কালে এই সংস্কৃতি সীমাবদ্ধ হয়ে রয়েছে বিশেষ কয়েকজন লোকের মধ্যে। সাহিত্য, কলা, দর্শন এসবের প্রকৃত সমঝদার অল্প লোকই, তবে এসব জটিল বিষয়কে সহজতর করার চেষ্টা করা হচ্ছে যাতে অধিক সংখ্যক লোক এসবের রসাস্বাদ করতে পারে। ম্যাকেঞ্জি (Mackenzie) বলেন, "তবু এ বিষয়ে জোর দেওয়া ভাল যে সংস্কৃতিকে আভিজাত্যের একচেটিয়া দখল থেকে মুক্ত করার মধ্যে নিহিত রয়েছে ভবিষ্যতের আশা।"[1]

কতকগুলি বিষয় লক্ষ্য করলেই সংস্কৃতির সামাজিক তাৎপর্যের বিষয়টি উপলব্ধি করা যায়। প্রথমতঃ, সমাজকে বাদ দিয়ে সংস্কৃতি বেঁচে থাকতে পারে না। আবার

"1. Yet it is well to insist that the hope of the future lies in rescuing culture from its aristocratic exclusiveness."

—Mackenzie: Outlines of Social Philosophy; Page. 239

প্রতিটি মনুষ্যসমাজের একটা সংস্কৃতি আছে। সংস্কৃতি যেমন ব্যক্তির উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য তেমনি সামাজিক উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যও সাধন করে। সংস্কৃতি সামাজিক সংহতি সংরক্ষণে সহায়তা করে। সংস্কৃতি সমাজের ঐক্য কল্যাণের পরিপোষক। সংস্কৃতি সমাজকে প্রভাবিত করে, আর সমাজ সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখে। সংস্কৃতি মানুষের মনে মূল্যবোধ সঞ্চারিত করে তার সামাজিক আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে। সংস্কৃতি সমাজের সভ্যদের মধ্যে 'আমরা-ভাব' (we feeling) জাগিয়ে তুলে সবাইকে এক ঐক্য ও বন্ধুত্বের বন্ধনে বেঁধে ফেলে। সামাজিক ঐক্য দৃঢ় করার ব্যাপারে সংস্কৃতি সংহতি শক্তিরূপে ক্রিয়া করতে পারে। আবার সংস্কৃতির আদান-প্রদানের মাধ্যমে বিভিন্ন সমাজের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়। কাজেই সংস্কৃতি সামাজিক ঐক্য ছাড়াও, আন্তর্জাতিক ঐক্য সৃষ্টি করার পক্ষে সহায়ক।

সমাজকে বাদ দিয়ে সংস্কৃতি এবং সংস্কৃতিকে বাদ দিয়ে সমাজ বাঁচে না।

৪। সংস্কৃতিই জীবনের লক্ষ্য (Culture as the End of Human Life):

মানুষের পরিপূর্ণ আত্মবিকাশের মধ্যেই নিহিত আছে মানুষের জীবনের পরমকল্যাণ। মানুষ তার বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে যখন কামনা, বাসনা, ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি ইত্যাদি নিম্নতর বৃত্তিগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে, তখনই তার আত্মবিকাশের পথ প্রশস্ত হয়। বিভিন্ন ধরনের সংস্কৃতি মানুষের জীবনের পরমকল্যাণ লাভের পক্ষে সহায়ক। যে ব্যক্তি সংস্কৃতিসম্পন্ন সে তার প্রকৃতি বা স্বভাবকে সম্পূর্ণভাবে বিকশিত করার জন্য যত্নবান হয়। জ্ঞানের অধিকারী হওয়া বা সুন্দর বস্তুর অধিকারী হওয়াই সংস্কৃতি নয়; সত্য, শিব ও সুন্দরের প্রতি যে ব্যক্তি মানসিক প্রবণতা অর্জন করেছেন তিনিই প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃতিসম্পন্ন ব্যক্তি। প্রকৃতি ও মানুষের জীবনের মধ্যে যা সুন্দর তার প্রকৃত তাৎপর্য বা মূল্য উপলব্ধি করতে তিনিই সক্ষম। কাজেই পার্থিব জগতের মাপকাঠিতে যদি তিনি দীন ও নিঃস্ব হন, আসলে তিনি এক মহান সম্পদের, এক অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী।

বস্তুতঃ, জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে জীবনের পরমমূল্যগুলির সৃষ্টি ও মূল্যাবধারণের প্রচেষ্টা থেকেই সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলির উৎপত্তি ঘটে থাকে। বুদ্ধি সম্পর্কীয় নৈতিক ও সৌন্দর্য সম্পর্কীয় মূল্যগুলির সমন্বয় থেকেই সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলির উদ্ভব। অবশ্য সমাজ-ভেদে এই মূল্যেরও পার্থক্য ঘটে।

৫। সাংস্কৃতিক সঙ্ঘের ভূমিকা (Role of Cultural Association):

সঙ্ঘের উদ্ভব হয় তখন যখন কিছু লোক কোন একটি সাধারণ লক্ষ্যকে সামনে রেখে বা কোন সাধারণ উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে সঙ্ঘবদ্ধ হয়। ম্যাকাইভার ও পেজ (MacIver

and Page) বলেন, "উদ্দেশ্যসাধনের উপায় হিসেবেই সঙ্ঘ উদ্ভূত হয়।[1] লক্ষ্যের তারতম্য অনুযায়ী সঙ্ঘের প্রকৃতি নির্ধারিত হয়। যখন কিছু সংখ্যক ব্যবসায়ী তাদের স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে সমবেত হয় তখন তাদের আমরা ব্যবসায়ী সঙ্ঘ বলি। অনুরূপভাবে যখন সংস্কৃতির অনুশীলনকেই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যরূপে নির্ধারণ করে কিছু লোক সঙ্ঘবদ্ধ হয় তখন তাকে আমরা সাংস্কৃতিক সঙ্ঘ বলি। যেমন—'পাঠচক্র', 'শিল্পচক্র', 'সঙ্গীত সঙ্ঘ' ইত্যাদি। সাংস্কৃতিক সঙ্ঘের মধ্যেই জীবনের সামাজিক এবং সংস্কৃতির দিকগুলির এক সমন্বয় দেখা যায়। সাংস্কৃতিক সঙ্ঘ মানুষের ব্যক্তিত্বের সৃজনমূলক দিককে পরিতৃপ্ত করে।

এই সব সাংস্কৃতিক সঙ্ঘের মারফত বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক কার্য সম্পন্ন হয়। মানুষ যাতে সন্তোষজনকভাবে তার অবসর বিনোদন করতে পারে, সাংস্কৃতিক সঙ্ঘ তার উপায় নির্ধারণ করতে পারে। সাংস্কৃতিক সঙ্ঘগুলির লক্ষ্য পার্থিব উন্নতি সাধন নয়, জ্ঞানের, মনের এবং চরিত্রের উন্নতিসাধন। সত্য, শিব ও সুন্দরের সাধনা এবং সৃজন-মূলক ক্রিয়ার পরিতৃপ্তি সাধনই সব সাংস্কৃতিক সঙ্ঘের প্রাথমিক কাজ।

সাংস্কৃতিক সঙ্ঘের এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে, যে বৈশিষ্ট্যের দ্বারা একটি সঙ্ঘকে সাংস্কৃতিক সঙ্ঘরূপে গণ্য করা যেতে পারে।

প্রথমতঃ, যেভাবে অংশ গ্রহণ করা হয় (the mode of participation) সেইটি নির্ধারণ করে যে, কোন সঙ্ঘ সাংস্কৃতিক সঙ্ঘ, না অন্য কোন সঙ্ঘ। কোন সাংস্কৃতিক সঙ্ঘ একটি প্রাথমিক গোষ্ঠী বা জনসমষ্টি হতে পারে, বা একাধিক গোষ্ঠীর সমন্বয় হতে পারে, বা কোন কেন্দ্রীয় সংগঠনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠান হতে পারে। যদি এই প্রাথমিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিরা পরস্পরের সঙ্গে মিলিত না হন তাহলে সাংস্কৃতিক সঙ্ঘের উদ্দেশ্য কখনও সাধিত হতে পারে না। যদি কোন 'সঙ্গীত সঙ্ঘের' সভ্যরা সঙ্গীত চর্চার জন্য সমবেত না হন তাহলে সেই সঙ্ঘ টিকে থাকতে পারে কিভাবে? অর্থাৎ কিনা সাংস্কৃতিক সঙ্ঘের সভ্যদের মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ও ঘনিষ্ঠ আন্তরিকতা বর্তমান। তবে সব সাংস্কৃতিক সঙ্ঘের সভ্যদের যোগাযোগ যে একই ভাবে হবে, সেরকম কোন বাধ্যবাধকতা নেই। যেমন, আন্তর্জাতিক এমন সাহিত্যিক সঙ্ঘ আছে যার সভ্যরা পত্র বা পত্রিকাদির মারফত নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রাখেন। সাংস্কৃতিক সঙ্ঘের সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক উভয় দিকই বর্তমান। কোন অর্থনৈতিক সঙ্ঘের কিন্তু এই বৈশিষ্ট্য নেই। অর্থনৈতিক সঙ্ঘের কোন কোন সদস্য সঙ্ঘের সঙ্গে কোন রকম

---

1. 'Associations develop as means or modes of attaining interests.'

—MacIver and Page : Society ; Page 437

ব্যক্তিগত সম্পর্ক না রেখেও লাভবান হতে পারে। সাংস্কৃতিক সঙ্ঘে পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশার মাধ্যমেই উদ্দেশ্য সাধিত হয়। কিন্তু অন্যান্য সঙ্ঘে মেলামেশা নয়, মেলামেশার ফলে যা পাওয়া যায় বা যা তার ফল (product) সেটাই বড়।

দ্বিতীয়তঃ, বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণের স্বাধীনতা (the liberty of alternatives) সাংস্কৃতিক সঙ্ঘের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। একাধিক সাংস্কৃতিক সঙ্ঘ পাশাপাশি থাকতে পারে। একটির সঙ্গে আর একটির কোন বিরোধের প্রশ্ন ওঠে না। সে কারণে আমরা খুব ছোট সীমানার মধ্যেও একাধিক সাংস্কৃতিক সঙ্ঘ দেখতে পাই। মানুষ নানাভাবে শিল্পকলার অনুশীলনে ব্রতী হতে পারে, নানাভাবে আমোদ-প্রমোদ করতে পারে, বিভিন্ন রুচি অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক সঙ্ঘ গঠন করতে পারে।

এ বিষয়ে যে কোন অর্থনৈতিক সঙ্ঘের সঙ্গে সাংস্কৃতিক সঙ্ঘের পার্থক্য খুব সুস্পষ্ট। বিভিন্ন অর্থনৈতিক সঙ্ঘের মধ্যে যে শুধু একটা একরূপতা (uniformity) বর্তমান তা নয়; উপরন্তু অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক সঙ্ঘকে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত করার জন্য কোন-না-কোন কেন্দ্রীয় সংগঠন থাকে। এ আমরা সাংস্কৃতিক সঙ্ঘের ক্ষেত্রে দেখি না।

সাংস্কৃতিক সঙ্ঘের এ বৈশিষ্ট্য থাকা স্বাভাবিক। কারণ, সৃষ্টির স্বাধীনতা না থাকলে সংস্কৃতি নিশ্চল হয়ে পড়ে, সংস্কৃতির মৃত্যু ঘনিয়ে আসে। কিন্তু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যদি উদ্দেশ্যকে যথার্থভাবে লাভ করতে হয় তাহলে বিভিন্ন সঙ্ঘের কাজের সমন্বয় সাধন একান্তই অপরিহার্য। বিভিন্ন সঙ্ঘের মাধ্যমে মানুষ যখন স্বাধীনভাবে সংস্কৃতির অনুশীলন করার সুযোগ পায় তখনই সংস্কৃতির বিকাশ পরিলক্ষিত হয়। যদি এসব সঙ্ঘগুলিকে রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক সঙ্ঘের ওপর নির্ভর করতে হয় তবে তাদের নিজেদের স্বাধীন সত্তা বিসর্জন দিতে হবে এবং ফলে সঙ্ঘগুলির যথার্থ উদ্দেশ্য সাধিত হবে না। সংস্কৃতির বৈচিত্র্য ও স্বতঃস্ফূর্ত আত্মপ্রকাশ কখনও সম্ভব হয় না যদি তার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হয়। সে কারণে জাতির সংস্কৃতির পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য সাংস্কৃতিক সঙ্ঘগুলিকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত রাখাই বাঞ্ছনীয়।

সাংস্কৃতিক সঙ্ঘ ও অর্থনৈতিক সঙ্ঘের প্রভেদ

সংযোজন এবং একরূপতার (co-ordination and uniformity) শর্তগুলি যা অন্যান্য সঙ্ঘের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়, সেগুলিকে যদি সাংস্কৃতিক সঙ্ঘের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় তাহলে ম্যাকাইভার ও পেজ-এর মতে নৈতিক, ধর্ম এবং সৌন্দর্য সম্পর্কীয় আবেগগুলিকে বিজাতীয় বাধানিষেধের দ্বারা হাত পা বেঁধে রাখারই সমতুল্য হয়। সমশ্রেণীভুক্ত করার ব্যবস্থা অন্যান্য ক্ষেত্রে সুফল প্রদান করলেও সাংস্কৃতিক সঙ্ঘের ক্ষেত্রে তা বিপর্যয়েরই সৃষ্টি করে।

প্রশ্নমালা

প্রথম অধ্যায়

সমাজদর্শনের স্বরূপ বা প্রকৃতি

(1) Define the meaning of Social Philosophy. Explain in this connection the statement 'Social Philosophy is the meeting-point of Sociology and Philosophy.'

(2) Define Social Philosophy and indicate its scope.

(3) Point out clearly how Social Philosophy is concerned not with the discovery of social facts but with the interpretation of social values.

(4) State and explain the nature and scope of Social Philosophy. How do you distinguish between Social Philosophy and social sciences ?

(5) State the chief features of Social Philosophy. What in your opinion, should be its proper method of study ?

(6) What is Social Philosophy ? How does a philosophical examination of social phenomenon differ from the psychological and sociological examinations of the same ?

(7) What is Social Philosophy ? Explain how social facts are approached differently by a philosopher, by an ethicist, by psychologist and a sociologist ?

(8) How would you distinguish between Sociology and Social Philosophy ? What according to you, is the central problem of Social Philosophy ?

(9) What is Social philosophy ? What is its utility ?

(10) What are the possible objections to the study of Social Philosophy ? How would you meet them ?

(11) Explain the relation of Social Philosophy to Psychology.

(12) What is the relation of Social Philosophy to Ethics ? Is Social Philosophy a branch of Ethics ?

(13) Explain the relation of Social Philosophy (a) to Philosophy, (b) to Sociology, (c) to Politics.

(14) Give a clear idea of the subject-matter of Social Philosophy and discuss its relation to Sociology.

(15) Discuss the relation of Social Philosophy and Politics. Is Social Philosophy a branch of Politics ? Discuss fully.

দ্বিতীয় অধ্যায়

সামাজিক গোষ্ঠী, সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং সংঘ

(1) Enumerate and define briefly the various kinds of social groups. Contrast the primary with the secondary groups stressing their importance in social life.

(2) What is Institution ? How do you distinguish it from Association ? Give suitable illustrations of both and explain the part which they play in our social life ? What is the philosophical basis of the different forms of institution ?

(3) How may social institutions be classified ?

(4) What is a Primary Group ? How does it differ from a Secondary Group ? Is every primary group a face to face group ? Is a college class a primary or a secondary group ?

তৃতীয় অধ্যায়
রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে মতবাদ

(1) Distinguish between (a) State, (b) Nation and (c) Government.

(2) Explain and examine the following theories of the State :

(a) The State as Personal. (b) The State as Superpersonal.

(b) The State as Mechanism. (c) The Marxian Theory of State.

(3) What seems to you to be the most satisfactory view of State ? Give reasons for your answer.

চতুর্থ অধ্যায়
শিক্ষার আদর্শ

(1) Explain the general significance of education.

(2) What should be the proper aims and ideals of education ? What role should be taken by the state in the sphere of education ?

(3) Attempt a philosophical evaluation of the aims and ideals of education. Should education be state controlled ?

(4) Give a comparative estimate of idealistic and realistic theories of education.

(5) Explain and examine either the Pragmatic Theory of Education or the Idealistic Theory of Education.

পঞ্চম অধ্যায়
সংস্কৃতি ও সভ্যতা

(1) Explain the meaning of Culture. How do you distinguish between Culture and Civilization ?

(2) Explain the social significance of Cultural Associations.

(3) Describe the impact of cultural institutions in society ?

(4) Distinguish between Culture and Civilization. Do you agree to the view that the end of culture is civilization.

(5) What is the social significance of culture ? State how it influences the Individual mind.

প্রথম পরিচ্ছেদ

মনোবিদ্যার স্বরূপ এবং বিষয়বস্তু

(Nature and Subject-matter of Psychology)

১। মনোবিদ্যার স্বরূপ (Nature of Psychology)

মনোবিদ্যার স্বরূপ বিশ্লেষণে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচ্য। প্রথমতঃ, মনোবিদ্যা কি অথবা কাহাকে বলে? দ্বিতীয়তঃ, মনোবিদ্যা বিজ্ঞান কিনা? তৃতীয়তঃ, মনোবিদ্যা কোন্ শ্রেণীর বিজ্ঞান? সর্বশেষে, মনোবিদ্যা প্রাকৃতিক বিজ্ঞান কিনা?

(১) মনোবিদ্যা কাহাকে বলে?

মনোবিদ্যার স্বরূপ কি? অথবা, মনোবিদ্যা কাহাকে বলে? সাধারণভাবে বলা যায় যে মনোবিদ্যা **'মনের বিদ্যা'**। কিন্তু ইহাতে মনোবিদ্যা কি তাহা বুঝা গেল না, শুধু মনোবিদ্যা কথাটি ভাঙ্গিয়া বলা হইল মাত্র। 'মন' বলিতে কি বুঝায় এবং 'বিদ্যা' বলিতে কি বুঝায়, তাহা বলা হইল না। এই দুইটি কথার অর্থ বুঝানো দরকার।

'**মন**' বলিতে বুঝায়, প্রথমতঃ কতকগুলি **বৃত্তি** বা **ক্রিয়া**, যেমন দেখা, শোনা, স্পর্শ করা, আস্বাদন করা, গন্ধ নেওয়া, সুখ, দুঃখ, ভালবাসা, ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, ক্রোধ, ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, সংকল্প, স্মৃতি, কল্পনা, চিন্তা করা প্রভৃতি। কিন্তু ইহারা যে মনের বৃত্তি, সেই মন বৃত্তি ছাড়া ও অন্য কিছু। বলিতে হয় যে দ্বিতীয়তঃ মন এই ক্রিয়া বা বৃত্তিগুলির কর্তা বা আশ্রয়। অর্থাৎ, মন শুধু ক্রিয়া বা বৃত্তি নয়। মন একটি **সত্তা**-ও বটে।

মনোবিদ্যা প্রধানতঃ মানসবৃত্তি বা ক্রিয়াই আলোচনা করে। মানসসত্তা দার্শনিক আলোচনার বিষয়। অধিকাংশ মনোবিদের মতে মনোবিদ্যা মানসক্রিয়ার বিদ্যা। **মানস বৃত্তি বা ক্রিয়ার বিদ্যাকেই মনোবিদ্যা বলে।**

'বিদ্যা' কথাটির অর্থ বিজ্ঞান। তাহা হইলে মনোবিদ্যা একটি বিজ্ঞান। এইবার আলোচনা করা যাক, কেন এবং কোন্ অর্থে মনোবিদ্যাকে বিজ্ঞান বলা হইয়া থাকে।

(২) মনোবিদ্যা একটি বিজ্ঞান

(Psychology is a science)

মন সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনাকে মনোবিদ্যা বলে। মনোবিদ্যা একটি বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের সকল লক্ষণগুলিই মনোবিদ্যায় অল্পাধিক ভাবে রহিয়াছে।

(১) প্রত্যেক বিজ্ঞানের যেমন একটি বিশেষ বা নির্দিষ্ট আলোচ্য বিষয় থাকে, মনোবিদ্যারও তেমন একটি **নির্দিষ্ট আলোচ্য বিষয়** আছে। মনোবিদ্যার বিশেষ বা নির্দিষ্ট আলোচ্য বিষয় হইল মনের কাজ বা বৃত্তি।

(২) প্রত্যেক বিজ্ঞানের লক্ষ্য উহার বিশেষ বিষয়বস্তু সম্বন্ধে কতকগুলি **সাধারণ নিয়ম** আবিষ্কার করা। মনোবিদ্যাও মন সম্বন্ধে কতকগুলি সাধারণ নিয়ম বাহির করে। যেমন, হ্বেবর-ফেক্‌নার সূত্র (Weber-Fechner Law) একটি মনোবৈজ্ঞানিক নিয়ম। হ্বেবর-ফেক্‌নার সূত্রের সাহায্যে, উদ্দীপককে কি পরিমাণে বাড়াইলে প্রতিক্রিয়া ঠিক বাড়িয়াছে বলিয়া বোঝা যায়, তাহা নির্ণয় করা হয়। ল্যাঙ্গ্‌-জেম্‌স্‌ (Lange James Theory) সূত্র আরও একটি মনোবৈজ্ঞানিক সাধারণ নিয়ম। এই সূত্রের সাহায্যে দৈহিক সংবেদন ও প্রকাশের সহিত প্রক্ষোভের সম্বন্ধ নির্ণয় করা যায়।

(৩) আবার প্রত্যেক বিজ্ঞান বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যে উহার বিষয়ের আলোচনা করে। মনোবিদ্যাও **প্রায়োগিক পদ্ধতি** অবলম্বন করিয়া থাকে।

(৪) বিজ্ঞানের মত মনোবিদ্যাও **সুশৃঙ্খল** ভাবে বিষয়ের আলোচনা করে। অন্যান্য বিজ্ঞানের মত মনোবিদ্যাও ধাপে ধাপে সহজ এবং সরল বিষয় হইতে জটিলতর বিষয়ের আলোচনায় অগ্রসর হয়।

(৫) বিজ্ঞান যেমন নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছাইতে চায়, মনোবিদ্যাও নিশ্চিত সিদ্ধান্ত লাভে সচেষ্ট। তাহা ছাড়া, অন্যান্য বিজ্ঞানের মত মনোবিদ্যাও উহার ফলগুলি গাণিতিক হিসাবের সাহায্যে **নিখুঁত** করিবার চেষ্টা করে।

(৩) মনোবিদ্যা কোন্‌ শ্রেণীর বিজ্ঞান?

(Nature of Psychology as a science)

এখন দেখা যাক মনোবিদ্যা কোন্‌ শ্রেণীর বিজ্ঞান।

(ক) মনোবিদ্যা একটি **মানস বিজ্ঞান** (mental science), কারণ মনই ইহার আলোচ্য বিষয়। পদার্থবিদ্যা বা রসায়নের মত মনোবিদ্যা জড় বিজ্ঞান (Physical science) নয়, কারণ ইহা বাহ্য প্রকৃতির কোনো জড় বস্তু লইয়া আলোচনা করে না। আবার মানসবিদ্যা হইলেও মনোবিদ্যা জীববিদ্যার (biology) সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। প্রাণ ও শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন মনের আলোচনা না করিয়া **শরীরী প্রাণীর মন** (embodied mind) লইয়া মনোবিদ্যা আলোচনা করে।

(খ) মনোবিদ্যা আদর্শনিষ্ঠ বিদ্যা নয়, কিন্তু **ঘটনানিষ্ঠ বিদ্যা** (Positive

Science)। আদর্শের মানদণ্ডে মনের বিচার না করিয়া মনোবিদ্যা নিছক ঘটনা হিসাবে মানসবৃত্তির আলোচনা করে। মানসবৃত্তি ঠিক যেভাবে ঘটে তাহাই মনোবিদ্যার আলোচ্য। উহার কিভাবে ঘটা উচিত তাহা মনোবিদ্যার আলোচ্য নয়।

(গ) মনোবিদ্যা যেমন মানসবৃত্তিগুলিকে ঘটনা রূপে বর্ণনা করে, তেমনি আবার কতকগুলি সাধারণ নিয়ম বা সূত্র আবিষ্কার করিয়া উহাদের ব্যাখ্যাও করে। সুতরাং মনোবিদ্যা যেমন **বর্ণনামূলক** বিজ্ঞান, তেমন **ব্যাখ্যামূলক** বিজ্ঞানও বটে।

(ঘ) মনোবিদ্যাকে সাধারণতঃ **জ্ঞাননিষ্ঠ** (Theoretical) বিজ্ঞান বলা হইয়া থাকে। মনোবিদ্যা মনের গঠন ও ক্রিয়া সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে চায়। কি কি মানসবৃত্তি লইয়া মন গঠিত? এই সকল মানসবৃত্তি কোন্ কোন্ নিয়ম অনুসারে কাজ করে,—এই সকল প্রশ্ন মনোবিদ্যার আলোচ্য। সুতরাং মনোবিদ্যা জ্ঞাননিষ্ঠ বিজ্ঞান। এই অর্থে ইহাকে সাধারণ বা **শুদ্ধ মনোবিদ্যা** (General or Pure Psychology) বলা যাইতে পারে।

[কিন্তু বর্তমানে মনোবিদ্যাকে শুধু জ্ঞাননিষ্ঠ বিদ্যাই বলা চলে না। আজকাল নানা-প্রকার ব্যবহারিক সমস্যা সমাধানে মনোবিদ্যার সাধারণ জ্ঞানকে কাজে লাগানো হইতেছে। যেমন, শিক্ষা-মনোবিদ্যা হাতে-কলমে শিক্ষার্থীর শিক্ষাপ্রণালী উদ্ভাবনে সচেষ্ট। আবার, শিল্পীয় মনোবিদ্যা কল-কারখানা, নানা ব্যবসায় প্রভৃতিতে প্রযুক্ত হইতেছে। এইরূপে শুদ্ধ মনোবিদ্যার মত **ফলিত মনোবিদ্যার** (Applied Psychology) উদ্ভব হইয়াছে। মনোবিদ্যাকে শুধু জ্ঞাননিষ্ঠ বলিলে ইহাকে সঙ্কীর্ণ করা হয়।]

(৪) মনোবিদ্যা কি প্রাকৃতিক বিজ্ঞান?

(Is Psychology a natural science ?)

সর্বশেষে বিজ্ঞান হিসাবে মনোবিদ্যার আর একটি দিকও আলোচ্য। মনোবিদ্যা কি পদার্থবিদ্যা, শারীরবৃত্ত, রসায়ন প্রভৃতির ন্যায় প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, অথবা নীতিবিদ্যা প্রভৃতির ন্যায় সাংস্কৃতিক (cultural) বিজ্ঞান? কোন কোন মনোবিদ্ মনে করেন যে মনোবিদ্যা প্রাকৃতিক বিজ্ঞান। উভয় পক্ষের যুক্তিগুলি উল্লেখ করিয়া মনোবিদ্যা প্রাকৃতিক বিজ্ঞান কিনা তাহা দেখা যাক।

যে সকল মনোবিদ্ মনোবিদ্যাকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বলিয়া স্বীকার করেন না, তাঁহাদের যুক্তিগুলি নিম্নরূপ। (১) প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিষয় বাহ্য প্রকৃতির কোনো

না কোনো অংশ। পক্ষান্তরে মনোবিদ্যার বিষয় মন। মন বাহ্যপ্রকৃতির কোনো অংশ নয়। (২) প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পদ্ধতি বাহ্য-পর্যবেক্ষণ এবং প্রয়োগ। কিন্তু শুধু বাহ্য-পর্যবেক্ষণ এবং প্রয়োগ সাহায্যে মন আলোচ্য নয়। নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় পর্যবেক্ষণ ও অন্তর্দর্শন সাহায্যেই মন আলোচ্য। (৩) তাহা ছাড়া, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিষয় কোনো উদ্দেশ্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়, কিন্তু মনোবিদ্যার বিষয় **মন** উদ্দেশ্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। (৪) মনের আসল রূপ মনোবিদ্যার বিষয় না হইলেও, মনোবিদ্যা উহা ধরিয়া লইয়া মনের ভাসমান রূপ আলোচনা করিতে অগ্রসর হয়।

উপরোক্ত কারণে অনেক মনোবিদ্, যেমন স্টাউট্ (Stout), ম্যাক্‌ডুগ্যাল (Mc Dougall) প্রভৃতি মনে করেন যে মনোবিদ্যা **প্রাকৃতিক বিজ্ঞান নয়**।

পক্ষান্তরে যে সকল মনোবিদ মনোবিদ্যাকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বলিয়া সাব্যস্ত করেন, তাঁহাদের যুক্তিগুলি নিম্নরূপ। (১) আলোক, তাপ, শরীর প্রভৃতির মত মনও প্রকৃতিরই অংশ। অন্যান্য প্রাকৃতিক বস্তুর মত মনও মানুষের সৃষ্ট পদার্থ নয়। যে নিয়মে মন কাজ করে সেই নিয়মও মনের স্বভাব অথবা প্রকৃতিগত। (২) তাহা ছাড়া, বাহ্য বস্তুকে যেমন আমরা পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োগ সাহায্যে বুঝি, মনকেও অনুরূপ ভাবে জানিয়া থাকি। হাসি কান্না প্রভৃতি পর্যবেক্ষণ করিয়া, সুখ দুঃখ প্রভৃতি মানসবৃত্তির জ্ঞানলাভ সম্ভব হয়। অতএব **মনোবিদ্যাও একটি প্রাকৃতিক বিজ্ঞান**। (৩) কোন উদ্দেশ্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত মন মনোবিদ্যার আলোচ্য নয়। (৪) মনোবিদ্যা আলোচনা করে শরীরের মধ্যস্থতায় প্রকাশিত মনের বহিঃপ্রকাশগুলির।

এই সকল কারণে হ্বুণ্ড্, উইলিয়ম্ জেম্‌স্ (William James), ওয়াট্‌সন্ (Watson) প্রভৃতি মনোবিদ্‌গণ মনোবিদ্যাকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। ইঁহারা মনে করেন যে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মত মনোবিদ্যাও একটি বিশিষ্ট প্রাকৃতিক বস্তুর আলোচনা করে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মত মনোবিদ্যাও প্রকৃতির একরূপতা (Uniformity of Nature) এবং কার্যকারণ সূত্র (Law of Causation) স্বীকার করে এবং পর্যবেক্ষণ, প্রয়োগ এবং বিশ্লেষণ-মূলক পদ্ধতি অবলম্বন করে।

[হ্বুণ্ড্-এর পূর্ববর্তী মনোবিদ্‌গণ দর্শন হইতে পৃথক্ করিয়া মনোবিদ্যার অনুশীলন করেন নাই। সুতরাং মনোবিদ্যা ছিল দর্শনের পুচ্ছলগ্ন একটি বিষয়। পদার্থবিদ্যা, রসায়ন এবং সর্বশেষে জীববিদ্যা দর্শনের বন্ধনপাশ ছিন্ন করিয়া ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছিল। ইহা দেখিয়া বহু মনোবিদ্ মনোবিদ্যাকেও দর্শনের আশ্রয়চ্যুত করিতে চাহিলেন। হ্বুণ্ড্ এবং জেম্‌স্ মনোবিদ্যাকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

চেষ্টিতবাদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা জন্ ওয়াট্‌সন্ জীববিদ্যার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া মনোবিদ্যাকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানরূপে ব্যাখ্যা করিলেন। অন্তর্দর্শন, মন, চেতনা প্রভৃতিকে মনোবিদ্যার এই অগ্রগতির অন্তরায় মনে করিয়া ওয়াট্‌সন্ উহাদিগকে মনোবিদ্যা হইতে নির্বাসিত করিলেন।]

উপসংহার ঃ

উপসংহারে বলিতে হয় যে, **মনোবিদ্যাকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান মনে করা অসঙ্গত। কারণ—**

(ক) মনোবিদ্যাকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বলিলে মন ও জড় বস্তুর মধ্যে পার্থক্য থাকে না। অথচ মন ও জড়ের একটি মৌলিক পার্থক্য এই যে মন চেতন, কিন্তু জড়প্রকৃতি অচেতন।

(খ) বাহ্য বস্তুর যেমন বাহ্য প্রত্যক্ষ হয়, সুখ দুঃখ প্রভৃতি মানসবৃত্তিগুলির তেমন হয় না। সুখ দুঃখ প্রভৃতি মানসবৃত্তির বাহ্য প্রকাশগুলিরই বাহ্য প্রত্যক্ষ বা পর্যবেক্ষণ হয়, কিন্তু ইহাদের অন্তরঙ্গ রূপ শুধু অন্তর্দর্শন সাহায্যেই ধরা পড়ে। মনোবিদ্যার অন্তর্দর্শন পদ্ধতি ইহাকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান হইতে পৃথক করিয়া দিতেছে।

(গ) প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিষয়গুলিকে, যেমন—আলোক, তাপ প্রভৃতিকে একাধিক ব্যক্তি একই সময়ে পর্যবেক্ষণ করিতে পারে। এই অর্থে ইহারা সর্বজনগ্রাহ্য। কিন্তু মানসবৃত্তি এই অর্থে সর্বজনগ্রাহ্য নয়। যাহার মানসবৃত্তি, শুধু তাহার নিকটই উহা গ্রাহ্য। অন্তর্দর্শনের সহিত পর্যবেক্ষণের মিলিত **প্রায়োগিক পদ্ধতির** সাহায্যে উহা সর্বজনগ্রাহ্য হইতে পারে।

(ঘ) প্রাকৃতিক বিজ্ঞানগুলির প্রধান ভিত্তি হইল প্রকৃতির একরূপতা এবং কার্যকারণ সূত্র। ইহারা পূর্ববর্তী ঘটনা দিয়া পরবর্তী ঘটনার ব্যাখ্যা করে। অর্থাৎ উহাদের দৃষ্টি **যান্ত্রিক** (mechanical)। পক্ষান্তরে, ওয়ার্ড, স্টাউট্, ম্যাকডুগ্যাল্ প্রভৃতি মনোবিদ্‌গণ দেখাইয়াছেন যে, **উদ্দেশ্যমূলক নিয়ন্ত্রণ** মনের একটি প্রধান লক্ষণ। মন কোন জ্ঞাত বা অজ্ঞাত উদ্দেশ্য অনুসারে কাজ করে।

[স্প্র্যাঙ্গার্ (Spranger), ডিল্‌থে (Dilthey) প্রমুখ জার্মান মনোবিদ্‌গণ প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে একটি মূল পার্থক্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। তাঁহারা জড় প্রকৃতির বিজ্ঞানকে বলিয়াছেন প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এবং মনোবিদ্যাকে বলিয়াছেন **মানবিক** বিজ্ঞান বা **সাংস্কৃতিক** বিজ্ঞান (cultural science)। মানুষের মন বুঝিতে হইলে তাহার ব্যক্তিত্ব (individuality) বুঝিতে হইবে। আবার ব্যক্তিত্ব কোনো

মূল্য (value) এবং অর্থ (significance) বোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ডিল্‌থে প্রকৃতি ও মানুষের মূল পার্থক্যটি এই বলিয়া বুঝাইয়াছেন, "আমরা প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করি: আমরা মানুষকে বুঝি (we explain nature : we understand man)।" এই প্রকার পার্থক্য নির্দেশ করিয়া ইঁহারা মনোবিদ্যাকে সাংস্কৃতিক বিজ্ঞানের শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন।]

২। মনোবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গী

(The Psychological Point of View)

মনের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনাই মনোবিদ্যা। কিন্তু মনের আলোচনা যে শুধু মনোবিদ্যাই করে এমন নয়। নীতিবিদ্যা, তর্কবিদ্যা এবং নন্দনবিদ্যা প্রভৃতি মানস বিজ্ঞানগুলিও মনের আলোচনা করে। **নীতিবিদ্যা** (Ethics), **তর্কবিদ্যা** (Logic) এবং **নন্দনবিদ্যা** (Aesthetics) যথাক্রমে মনের ইচ্ছামূলক, চিন্তামূলক, এবং বেদনামূলক দিকগুলির আদর্শনিষ্ঠ রূপ আলোচনা করে।

আবার সকল বিজ্ঞানই এক দিক্ দিয়া মনের আলোচনা করে, কারণ উহারা প্রকৃতির বিভিন্ন অংশগুলির জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে।

মনের এই ব্যাপকতার দিক বিবেচনা করিয়া কোনো কোনো মনোবিদ্ মনোবিদ্যাকে **"সকল বিজ্ঞানের বিজ্ঞান"** (Science of sciences) বলিয়াছেন।

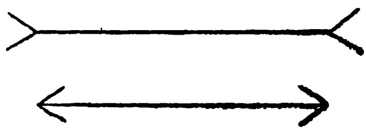
বিষয়ের দিক দিয়া মনোবিদ্যার সহিত অন্যান্য বিজ্ঞানের পার্থক্য নাই। কারণ জড়, জীব, মানস, সকল বিজ্ঞানই **অভিজ্ঞতার** কোনো অংশ লইয়া আলোচনা করে। তাহা হইলে বিজ্ঞানগুলির মধ্যে আসল পার্থক্য কি? ইহাদের **মূল পার্থক্য বিষয়ের নয়, কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গীর।**

মনোবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গী **পাত্রগত** (Subjective) বা পাত্রের দৃষ্টিভঙ্গী। যে ব্যক্তির মন মনোবিদ্যার আলোচ্য তাহাকে **পাত্র** (Subject) বলে। পাত্রের মানসক্রিয়া বা বৃত্তিগুলি তাহার উপর নির্ভরশীল। মনোবিদ্যা মানসবৃত্তিগুলির আলোচনা করে পাত্রের দিক হইতে। পাত্র হয়ত তীরে বসিয়া নিবিষ্ট মনে সমুদ্রের ঢেউ দেখিতেছে। 'ঢেউ দেখা' রূপ মানসবৃত্তিটিকে দুই দিক হইতে আলোচনা করা যাইতে পারে। একটি দিক হইল 'দেখা' মানসবৃত্তির বিষয় 'ঢেউ' সম্বন্ধে আলোচনা এবং অপরটি হইল 'ঢেউ' রূপ বিষয়ের 'দেখা' মানসক্রিয়ার আলোচনা। প্রথম দিকটি হইল বিষয়গত (objective) এবং দ্বিতীয়টি পাত্রসাপেক্ষ (subjective)। **বিষয়গত দৃষ্টিভঙ্গীটি** সেই সব বিজ্ঞানের,

যাহাদের পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ। আবার **পাত্রসাপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীটি** সেই বিজ্ঞানের যাহার পদ্ধতি অন্তর্দর্শন।

মনোবিদ্যার এই পাত্রসাপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী আরও দুই-একটি **দৃষ্টান্ত** দিয়া বুঝানো যাইতে পারে। যেমন, ঘড়ির হিসাবে অথবা বিষয়গত দৃষ্টিভঙ্গীতে যে **সময়ের পরিমাণ** এক ঘণ্টা, তাহাই পাত্রসাপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীতে এক ঘণ্টার বেশী বা কম বলিয়া মনে হইতে পারে। ঘড়ির কাঁটায় এই সময় এক ঘণ্টা মাত্র হইলেও, যে ঘণ্টাটি আমোদ-প্রমোদ কাটে সেইটি এক ঘণ্টার কম বলিয়া মনে হয়, আবার সেই ঘণ্টাটি দুঃখে কাটিলে যেন কাটিতেই চায় না এবং এক ঘণ্টা অপেক্ষা বেশী বলিয়া অনুভূত হয়। আবার **দূরত্ব এবং ওজন** সম্পর্কেও এই দুইটি দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। মনের মত সঙ্গীর সহিত হাঁটিলে দূরপথও নিকট লাগে, আবার অনিচ্ছায়, অসুস্থ শরীরে, নিঃসঙ্গভাবে অথবা ভয়ে ভয়ে ঐ একই পথ হাঁটিলে, উহা আর যেন ফুরাইতে চায় না। আবার **মাপ** বা **ওজন** সম্বন্ধেও একই কথা খাটে। কোন বস্তুর ওজন এক হইলেও, সতেজ শরীর ও মন লইয়া বস্তুটিকে তুলিলে, উহা হাল্কা এবং অবসন্ন শরীর ও মন লইয়া উহাকে তুলিলে, উহা ভারী মনে হয়।

নীচে দুইটি সমান সরলরেখার মধ্যে একটির দুই প্রান্তই উন্মুক্ত বা খোলা এবং অপরটি উভয় প্রান্তই আবদ্ধ। এই সরলরেখা দুইটি বস্তুতঃ বা **বিষয়গত দৃষ্টিভঙ্গী** হইতে সমান। কিন্তু **পাত্রসাপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী** হইতে উন্মুক্ত সরলরেখাটি বড় এবং আবদ্ধ সরলরেখাটি ছোট বলিয়া মনে হয়।



১নং চিত্র

কয়েকটি জড়বিজ্ঞান হইতে মনোবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য: একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে বুঝানো যাউক। যেমন, একটি **শব্দ** শুনিতেছি। এই স্থলে শব্দ বিষয়টিকে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী হইতে আলোচনা করা যাইতে পারে। **মনোবিদ্যা** শব্দকে বাহিরের বস্তু হিসাবে বা বিষয়গত দৃষ্টিভঙ্গী হইতে না দেখিয়া শোনা বা **'শ্রবণ করা'** রূপ মানস অভিজ্ঞতা বা শ্রবণ সংবেদনের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে দেখে। মনোবিদ্যা শব্দের নিজস্ব বিষয়গত রূপ লইয়া মাথা ঘামায় না। অভিজ্ঞতা বা শ্রবণ সংবেদনের দিক হইতে, অর্থাৎ ইহার পাত্রসাপেক্ষ রূপই মনোবিদ্যার আলোচ্য। পক্ষান্তরে **শারীরবৃত্ত**

'শব্দ শোনা' রূপ ব্যাপারটিকে অন্য দৃষ্টিভঙ্গী হইতে দেখে। শব্দ শুনিতে হইলে কর্ণের কোন্ অংশ কি কাজ করে এবং শব্দ-উদ্দীপক নার্ভপ্রবাহের আকারে কোন্ নার্ভের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া মস্তিষ্কে প্রতিক্রিয়া জাগায়, এই জাতীয় প্রশ্নই শারীরবৃত্তের আলোচ্য। শারীরবৃত্তের দৃষ্টিভঙ্গী বিষয়গত, কারণ ইহা শব্দকে অভিজ্ঞতা বা শ্রবণ সংবেদনের দিক হইতে না দেখিয়া যে সকল শারীরক্রিয়া ঘটিলে এই সংবেদন ঘটে উহাদের দিক হইতে দেখে। আবার **পদার্থবিদ্যাও** শব্দ লইয়া আলোচনা করে। বায়ু-কম্পনের বিভিন্ন দৈর্ঘ্য, উচ্চতা, গঠন প্রভৃতি কিরূপে শব্দের বিভিন্নতা ঘটায়, এই জাতীয় প্রশ্নগুলিই পদার্থবিদ্যার আলোচ্য। **পদার্থবিদ্যা** শব্দকে উহার শোনা বা শ্রবণ রূপ অভিজ্ঞতা হইতে পৃথক করিয়া বাহ্য বিষয় হিসাবে গ্রহণ করে। ইহার দৃষ্টিভঙ্গী বিষয়গত, মনোবিদ্যার মত পাত্রগত বা অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ নয়।

উপসংহার :

উপরের আলোচনায় মনোবিদ্যার পাত্রগত বা অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী স্পষ্টভাবে বুঝানো হইয়াছে। তাহা হইলে, মনোবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গী হইল বিষয়কে অভিজ্ঞতা হইতে স্বতন্ত্র বিষয় হিসাবে না দেখিয়া **বিষয়ের জ্ঞাতা ব্যক্তির অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরশীল** বিষয় হিসাবে দেখা। অতএব এই দৃষ্টিভঙ্গীই মনোবিদ্যাকে অন্যান্য বিজ্ঞান হইতে পৃথক করিয়াছে। একই বিষয়কে অভিজ্ঞতানিরপেক্ষ এবং অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ রূপে আলোচনা করা যাইতে পারে। **অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ বা পাত্রগত দৃষ্টিভঙ্গীই মনোবিদ্যার বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী।**

৩। মনোবিদ্যার বিষয়বস্তু
(Subject-matter of Psychology)

স্টাউট্ বলিয়াছেন, মানসক্রিয়াবলীর অথবা মানসজীবনের আলোচনাই মনোবিদ্যা। অর্থাৎ, সকল মানসক্রিয়া অথবা সমগ্র মানবজীবনই মনোবিদ্যার বিষয়।

মানসক্রিয়া অসংখ্য। মানবসজীবন বিরাট। মানুষের চেতনাকে যাহা কিছু স্পর্শ করে, তাহা মানসক্রিয়ার মধ্য দিয়াই স্পর্শ করে। যেমন, একটি ফুল দেখিলাম। এখানে 'দেখা' একটি মানসক্রিয়া। এই মানসক্রিয়াটির নাম 'দর্শন সংবেদন'। এইরূপ শব্দ 'শোনা' উষ্ণ বা শীতল বস্তু 'স্পর্শ করা', কোন খাদ্য 'আস্বাদন করা' বা তাহার 'গন্ধ নেওয়া' প্রভৃতি মানসক্রিয়ার নাম যথাক্রমে শব্দ সংবেদন, স্পর্শ সংবেদন, স্বাদ সংবেদন এবং ঘ্রাণ সংবেদন। এই মানসক্রিয়া এবং অন্যান্য আলোচ্য

মানসক্রিয়া লইয়াই মানসজীবন। ইহারা সমগ্র মানসজীবনের আসল ভিত্তি। এইবার আরও বিস্তৃতভাবে মনোবিদ্যার বিষয় আলোচ্য।

(ক) মনোবিদ্যার আলোচ্য বিষয় মন। **চেতনা** (consciousness) মনের বিশেষ ধর্ম। সুতরাং, চেতনা মনোবিদ্যার বিষয়ীভূত কিন্তু চেতনাই মনের সবটুকু নয়। মূর্চ্ছায়, নিদ্রায় চেতনা অনুভূত হয় না। তাই চেতনার গভীরে আরও মানস স্তর অবশ্যই আছে। চেতনার ঠিক নিম্নতলে রহিয়াছে **অবচেতন** (subconscious) অথবা অস্পষ্ট চেতন। অবচেতন ক্রিয়া চেতনায় না থাকিলেও, একটু চেষ্টা করিলেই চেতনায় আসে। যেমন 'পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল' লাইনটি ইতঃপূর্বে আমাদের চেতনায় ছিল না। কিন্তু মনে করিয়া দেওয়া মাত্র আমাদের মনে হইল। আবার চেতনার গভীরতম স্তর **নির্জ্ঞান** (unconscious)। সব মানসক্রিয়া চেতন বা অবচেতন নয়। মনের গভীরতম তলদেশে নির্জ্ঞান মন রহিয়াছে। যেমন, চেষ্টা করিয়াও আমরা আমাদের প্রথম শৈশব অভিজ্ঞতা চেতনায় আনিতে পারি না। অথচ মনঃসমীক্ষক (psychoanalyst) তাঁহার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যে এই নির্জ্ঞান অভিজ্ঞতা পুনরুদ্ধার করিতে পারেন।

তাহা হইলে **চেতন, অবচেতন, নির্জ্ঞান প্রভৃতি যাবতীয় মানসক্রিয়াই মনোবিদ্যার বিষয়বস্তু।**

(খ) মনোবিদ্যা 'মনের বিদ্যা' বুঝায়। মনের দুটি দিক। একটি মনের **সত্তা,** অপরটি **ক্রিয়া**। মানসসত্তা স্থির। মানসক্রিয়া চঞ্চল। মনোবিদ্যা স্থির মানস-সত্তা লইয়া মাথা ঘামায় না। মানসসত্তা দর্শনের আলোচ্য, মনোবিদ্যার নয়। মনোবিদ্যার বিষয় **মানসক্রিয়া।** মনোবিদ্যা মানসবৃত্তির বা মানসক্রিয়ার বিদ্যা।

(গ) মানসক্রিয়া বা বৃত্তিকে **তিন শ্রেণীভুক্ত** করা হইয়া থাকে। যথা **ইচ্ছামূলক** বা **ক্রিয়ামূলক** (conative), **বেদনামূলক** (affective) এবং চিন্তন বা **জ্ঞানমূলক** (cognitive)।

(১) ইচ্ছামুলক মানসক্রিয়ার উদাহরণ—যথা **স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়া** (সদ্যোজাত শিশুর হাত পা ছোঁড়া); **প্রতিবর্ত ক্রিয়া** (reflex action) যথা আগুনে হাত লাগিলে হাত সরাইয়া লওয়া; **সহজাত প্রবৃত্তি** (instinct), যথা শিশুর মাতৃস্তন্য পান; **অনৈচ্ছিক ক্রিয়া** (voluntary action, যথা বাজ পড়ার শব্দে অনিচ্ছায় আকৃষ্ট হওয়া; **ঐচ্ছিক ক্রিয়া** (non-voluntary action), যেমন স্বেচ্ছায় পাঠে মনোযোগী হওয়া; **মনোযোগ** (attention), যেমন আগের উদাহরণটি; ইত্যাদি।

(২) বেদনামূলক মানসক্রিয়ার উদাহরণ—যথা **যান্ত্রিক সুখ দুঃখ** (Organic pleasure and pain), যথা ক্ষুধার কষ্ট বা দুঃখ এবং পরিতৃপ্ত আহারের সুখ বা স্বস্তিবোধ ; **সুখ দুঃখ বেদনা** (feelings of pleasure and pain), যথা গরম ভাল লাগা, ঠাণ্ডা ভাল না লাগা ; **প্রক্ষোভ বা অনুভূতি** (emotion), যথা পরীক্ষায় সাফল্যে সুখ, ব্যর্থতায় দুঃখ ; **রসবোধ** (Sentiment), যথা জ্ঞানান্বেষণের, চারিত্রিক আদর্শ বোধের, সৌন্দর্য অনুভূতির আনন্দ এবং এদের বিপরীত অনুভূতির নিরানন্দ, প্রভৃতি।

(৩) জ্ঞানমূলক মানসক্রিয়ার উদাহরণ—যথা **সংবেদন** (Sensation), যথা দেখা শোনা, প্রভৃতি ; **প্রত্যক্ষ** (perception), যথা একটি ফুলকে ফুল বলিয়া দেখা ; **স্মৃতি** (memory), যথা পঠিত বিষয় মনে রাখা ; **কল্পনা** (Imagination), যথা বাড়ী তৈয়ারীর আগে মনে মনে তার একটি নক্সা চিন্তা করা ; **প্রত্যয়** (Conception), যথা মানুষের সাধারণ গুণসূচক 'মনুষ্যত্ব' সম্বন্ধে ধারণা অথবা idea গঠন . **অবধারণ** (Judgment), যথা 'মানুষ মরণশীল' এই মানসিক সত্য প্রতিষ্ঠা বা affirmation, এবং **অনুমান বা ন্যায়** (Inference or reasoning), যথা যেহেতু সকল মানুষ মরণশীল এবং রাম মানুষ, সুতরাং রাম মরণশীল। ইহাদিগকে মনের **চিন্তনমূলক** (thinking) ক্রিয়াও বলা হইয়া থাকে।

উপরোক্ত সব মানসবৃত্তি বা ক্রিয়াই মনোবিদ্যার বিষয়।

(ঘ) আসলে শারীরবৃত্তের (physiology) আলোচ্য অনেকগুলি **দেহযন্ত্রের গঠন এবং ক্রিয়া** মনোবিদ্যারও আলোচ্য বিষয়। মনোবিদ্যার এই অংশকে শারীর-বৃত্তীয় মনোবিদ্যা (Physiological psychology) বলা হইয়া থাকে। বিষয়টি বিশাল, কিন্তু সংক্ষেপে আলোচ্য।

(১) **কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্র** মস্তিষ্ক, মেরুদণ্ড এবং তৎসম্পর্কিত নার্ভতন্ত্র লইয়া গঠিত। মন দেহের সহিত ঘনিষ্ঠ সূত্রে সম্পর্কিত। **মস্তিষ্ক** এবং মেরুদণ্ডের নিয়ন্ত্রণেই বহু মানসক্রিয়া সাধিত হয়। যেমন স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়া, প্রতিবর্ত প্রভৃতি **মেরুদণ্ডের** নিয়ন্ত্রণাধীন। মস্তিষ্কের নিম্নাঞ্চলের উপরও উহারা নির্ভর করিতে পারে। উন্নততর মানসক্রিয়াগুলি মস্তিষ্কের উপর নির্ভর করে, যেমন স্মৃতি, কল্পনা, চিন্তা প্রভৃতি। যান্ত্রিক বেদনা নির্ভর করে দেহের **অভ্যন্তরীণ যন্ত্রগুলির** সুষম বা বিষম ক্রিয়ার উপর। প্রক্ষোভ—, যেমন ভয়, ক্রোধ, প্রভৃতির প্রকাশ নিয়ন্ত্রিত হয় অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির (যেমন

অ্যাড্রেন্যাল) রসক্ষরণ দ্বারা এবং অভ্যন্তরীণ রক্তসঞ্চালন, হৃৎকম্প, নাড়ীসঞ্চালন প্রভৃতির দ্বারা। এই সকল দৈহিক ব্যাপার মনোবিদ্যার বিষয়ীভূত।

(২) দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, আস্বাদন, ঘ্রাণন প্রভৃতি সংবেদন ইন্দ্রিয়যন্ত্রের সাহায্য ছাড়া ঘটিতে পারে না। যেমন, দর্শন চক্ষুরিন্দ্রিয়ের, শ্রবণ কর্ণেন্দ্রিয়ের, স্পর্শন ত্বকের, আস্বাদন জিহ্বার এবং ঘ্রাণন নাসিকার দ্বার দিয়া সাধিত হয়। সুতরাং মনোবিদ্যা এই সকল **ইন্দ্রিয়যন্ত্রের গঠন এবং ক্রিয়ার** আলোচনায় বাধ্য হয়। ইহাদের গঠন এবং কার্য না জানিলে ঐ সংবেদনগুলির আকার প্রকার জানা যায় না। তাই এই ইন্দ্রিয়যন্ত্রগুলির গঠন এবং ক্রিয়া মনোবিদ্যার বিষয়বস্তু হইয়া দাঁড়ায়।

(ঙ) মনোবিদ্যা বিজ্ঞান, সুতরাং পদ্ধতিনিষ্ঠ। অন্তর্দর্শন (introspection), পর্যবেক্ষণ (observation) এবং প্রয়োগ (experiment) লইয়া মনোবিদ্যার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি (experimental method) গঠিত। মাত্রিক পদ্ধতিও (Quantitative method) মনোবিদ্যার বিষয়ীভূত। কারণ এই পদ্ধতির সাহায্যে মানসবৃত্তির পরিমাপ (measurement) করা হয়। পরিসংখ্যান পদ্ধতিও (statistical method) মনোবিদ্যায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করে। কাজে কাজেই মনোবিদ্যায় এইসব পদ্ধতি অবশ্য আলোচ্য বিষয়।

(চ) **ব্যক্তিত্ব** (personality) একটি মস্ত বড় মানস-জৈব-শারীর গঠন। ইহার গঠন, স্বভাব, বিকাশ, লক্ষণ, মাত্রা, পরিমাপ প্রভৃতি মনোবিদ্যার অঙ্গীভূত। ব্যক্তিত্বের বংশগতি (heredity) অথবা পরিবেশগতি, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে ভেদ (individual diffenences), ব্যক্তিত্বের শ্রেণীভেদ (types), অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির রসক্ষরণের উপর ব্যক্তিত্বের নির্ভরশীলতা, ব্যক্তিত্বের নানাত্ব (multiple personality), একান্তরতা (alternation) প্রভৃতি সমস্যার আলোচনায় অগ্রসর হয় মনোবিদ্যা।

(ছ) **বুদ্ধির** আলোচনা মনোবিদ্যায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বুদ্ধি কি এবং কাহাকে বলে, বুদ্ধির অঙ্ক অথবা বুদ্ধ্যঙ্ক (Intelligence quotient) সাহায্যে বুদ্ধির তারতম্য নির্ণয় বা স্তরভেদ, বুদ্ধির ক্রমবিকাশ, বুদ্ধির উন্নতিবিধান, বুদ্ধির অভীক্ষা বা পরিমাপ (Intelligence tests, measurement of intelligence) প্রভৃতিব আলোচনা মনোবিদ্যার অপরিহার্য বিষয়।

(জ) **শিক্ষণ** (learning) মনোবিদ্যাব আবশ্যিক বিষয়। শিক্ষণ কি এবং কাহাকে বলে, শিক্ষণের মূল নীতি বা সূত্র (Laws of learning), শিক্ষণকে দ্রুত এবং সফল করিবার পদ্ধতি প্রভৃতি প্রশ্নের সমাধানে মনোবিদ্যা প্রচুর আলোকপাত করে।

(ঝ) মানসজীবন মনুষ্যজীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তাই মনুষ্যজীবনের **যাবতীয় বিষয়** মনোবিদ্যার অঙ্গীভূত। ব্যক্তি মনোবিদ্যা (Individual psychology), সমাজ মনোবিদ্যা (Social psychology), অস্বভাবী মনোবিদ্যা (Abnormal psychology), প্রাণী মনোবিদ্যা (Animal psychology), শিশু মনোবিদ্যা (Child psychology), কিশোর মনোবিদ্যা (Adolescent psychology), ধর্মীয় মনোবিদ্যা (Psychology of religion) প্রভৃতি মানসজীবনের অগণিত শাখা-প্রশাখা মনোবিদ্যার বিষয়।

এক কথায়, **যাহা কিছু মানসজীবন তথা মানবজীবনকে স্পর্শ করে তাহাই মনোবিদ্যার বিষয়বস্তু।**

অনুশীলনী (Exercise)

1. Define the nature of psychology as a science. (Ans : Pages 1—6)
   (বিজ্ঞান হিসাবে মনোবিদ্যার স্বরূপ নির্দেশ কর।)
2. What is psychology ? Is psychology a natural science ? Discuss. (Ans : pp 1 ; 4—6)
   (মনোবিদ্যা কাহাকে বলে ? মনোবিদ্যা প্রাকৃতিক বিজ্ঞান কিনা আলোচনা কর।)
3. What is the psychological point of view ? Explain and illustrate. (Ans : pp 6—8)
   (উদাহরণ সাহায্যে মনোবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গী বুঝাইয়া দাও।)
4. Define the subject-matter of psychology. (Ans : pp 8—12)
   (মনোবিদ্যার বিষয়বস্তু নির্দেশ কর।)
5. What is meant by saying that psychology is the 'science of mind' ? (Ans : pp 1—3)
   (মনোবিদ্যা 'মনের বিদ্যা' বলিতে কি বুঝায় ?)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মনোবিদ্যার সংজ্ঞা, ক্ষেত্র এবং শাখা

(Definition, Scope and Branches of Psychology)

১। মনোবিদ্যার সংজ্ঞার ইতিহাস

মন সম্বন্ধে বিদ্যাই মনোবিদ্যা। কাজেই 'মন' বলিতে আমরা কি বুঝিব **মনোবিদ্যার** সংজ্ঞা তাহার উপর নির্ভর করে। মনের ধারণা বদলাইবার সঙ্গে সঙ্গে **মনোবিদ্যার** সংজ্ঞা বদলায়।

প্লেটো (Plato) মন বলিতে দেহাতিরিক্ত আত্মসত্তা এবং মনোবিদ্যা বলিতে "আত্মসত্তার বিদ্যা" বুঝাইয়াছেন। তাঁহার মতে, কূটস্থ ও নিত্য **"আত্মসত্তার বিদ্যাই মনোবিদ্যা"** (Science of the psyche or soul)।

কিন্তু আত্মসত্তা তত্ত্ববিদ্যার (metaphysics) জ্ঞাতব্য বিষয়। এই সংজ্ঞা মনোবিদ্যাকে **দর্শনের পুচ্ছলগ্ন** করিয়া রাখে, উহাকে বিজ্ঞানপদবাচ্য হইতে দেয় না। কারণ আত্মস্বরূপে মনোবিদ্যার প্রয়োগিক পদ্ধতি প্রযোজ্য নয়।

প্লেটোর শিষ্য **অ্যারিস্টটল** (Aristotle) য়ুরোপীয় মনোবিদ্যার জনক। তিনি মনকে নিছক দেহাতিরিক্ত আত্মা বলিয়া নির্দেশ করেন নাই। আত্মা শরীরী এবং শরীর হইতে অভিন্ন, কারণ শরীর-বিচ্ছিন্ন আত্মা ক্রিয়াশীল হইতে পারে না। অ্যারিস্টটল্-এর মতে **"মনোবিদ্যা শরীরী আত্মার বিদ্যা"** (Science of the living organisation)।

মধ্যযুগীয় মনোবিদ্যার সংজ্ঞা **"মন সম্বন্ধীয় বিদ্যা"** (Science of mind)। কিন্তু এই সংজ্ঞায় মন বলিতে কি বুঝায় তাহা অস্পষ্ট রহিয়া গেল।

দেকার্তেও (Descartes) মনোবিদ্যাকে **"মন সম্বন্ধীয় বিদ্যা"** বলিলেন। "মন" বলিতে কি বুঝায় তিনি তাহার সুস্পষ্ট নির্দেশ দিলেন। তিনি বলিলেন যে, চিন্তন (thought) অথবা চেতনাই (consciousness) মনের স্বরূপ। এইরূপে মনের বিদ্যার পরিবর্তে মনোবিদ্যা **"চেতনার বিদ্যা"** (science of consciousness) হইয়া দাঁড়াইল।

কিন্তু মনোবিদ্যার এই তৃতীয় সংজ্ঞাটিও মনোবিদ্যার ক্ষেত্রকে চিন্তন বা চেতনায় সীমাবদ্ধ করিল। কিন্তু চেতনার নিম্নেও মনের কয়েকটি স্তর আছে, যেগুলি মনের

অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ—যেমন অবচেতন (subconscious) এবং নির্জ্ঞান (unconscious)। দে কার্তে মনকে **চেতনার সহিত সমব্যাপ্ত** করিয়া মনের ক্ষেত্র হইতে এই দুইটি স্তরকে বাদ দিয়াছেন।

জার্মান্ মনোবিদ্যার প্রতিষ্ঠাতা **লাইব্‌নিজ্** (Leibnitz) মনের ক্ষেত্রকে চেতনায় বা সংজ্ঞানে সীমাবদ্ধ রাখেন নাই। তিনি মনোবিদ্যাকে "চেতনার বিদ্যা" হইতে **"চেতন এবং অবচেতন মনের বিদ্যা"** রূপে প্রসারিত করিয়াছেন।

প্রাযোগিক মনোবিদ্যার প্রথম প্রয়োগশালার প্রতিষ্ঠাতা হ্বুণ্ড্ (Wundt), **টিশ্‌নার্** (Titchener), **কুল্পে** (Kulpe) প্রভৃতি মনোবিদ্‌গণ মনোবিদ্যাকে **মানস-বৃত্তির বিদ্যায়** পরিণত করিলেন। হ্বুণ্ড্-এর মতে মনোবিদ্যা হইল **"ব্যক্তির অভিজ্ঞতাবিদ্যা" (Science of individual experience)"**।

আবার, অনেকের মতেই মনোবিদ্যা **"মানসবৃত্তির বিদ্যা"** (Science of mental states and processes) হইয়া দাঁড়াইল। মনোবিদ স্টাউট্‌ও (Stout) মনোবিদ্যার এই সংজ্ঞাই গ্রহণ করিয়াছেন।

মানসক্রিয়া বা অভিজ্ঞতার বিদ্যা হইলে, মনোবিদ্যা অভিজ্ঞতার (experiening individual) উপর নির্ভরশীল হইয়া দাঁড়ায়। এই কারণে টিশ্‌নার্ বলিয়াছেন যে **"অভিজ্ঞাতাসাপেক্ষ অভিজ্ঞতার বিদ্যাই মনোবিদ্যা"** (Science of experience dependent upon an experiencing person)

আধুনিক মনোবিদ্যা মনের ক্রিয়াশীল (Dynamic) দিকটি গ্রহণ করে এবং মনোবিদ্যাকে একটি ঘটনানিষ্ঠ বিদ্যা হিসাবে স্বীকার করে। উইলিয়াম ম্যাক্‌ডুগ্যাল্ (William McDougall) তদনুসারে বলেন **"মনোবিদ্যা প্রাণিচেষ্টিতের ঘটনানিষ্ঠ বিদ্যা"**—(positive science of the behaviour of living things)।

চেষ্টিতবাদী ওয়াট্‌সন্ (Watson), মনোবিদ্যাকে **"প্রাণীচেষ্টিতের বিদ্যা"** (science of behaviour)—বলিয়া থাকেন। কিন্তু চেষ্টিতবাদী "চেষ্টিত" বলিতে শুধু "উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়া একক" (stimulus-response units) বুঝিয়া থাকেন। এই অর্থে চেষ্টিত একটি যান্ত্রিক (mechanical) ক্রিয়া মাত্র। চেষ্টিতের উপর চেতনা বা মনের নিয়ন্ত্রণ নাই। ম্যাক্‌ডুগ্যাল এর মতে প্রাণিচেষ্টিত যান্ত্রিক ব্যাপার নয়—ইহা কোনো না কোনো জ্ঞাত বা অজ্ঞাত উদ্দেশ্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ম্যাক্‌ডুগ্যাল চেষ্টিতবাদী নহেন, কিন্তু উদ্দেশ্যবাদী মনোবিদ্ (hormic psychologist)। তাহা ছাড়া, চেষ্টিতবাদীরা মন বা অন্তর্দর্শন স্বীকার করেন না, কিন্তু ম্যাক্‌ডুগ্যাল্ করেন।

গেস্টাল্ট্ মনোবিদ্যাও (Gestalt psychology) চেষ্টিতবাদীর বিরুদ্ধ মত পোষণ করে। গেস্টাল্ট্ মনোবিদ্যার মতে "উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়া" এককগুলি বিচ্ছিন্ন। পক্ষান্তরে মন একটি **সমগ্র বস্তু** (whole)—এমন কি প্রত্যেক মানসক্রিয়াই একটি গোটা বা সম্পূর্ণ বস্তু। "সমগ্র হিসাবে মনের ক্রিয়াগুলির বিদ্যাই মনোবিদ্যা"। অথবা **"মনোবিদ্যা গোটা মানসক্রিয়ার বিদ্যা"**। কফ্কা (Koffka) মনে করেন যে মনোবিদ্যা **"মানস-শারীর ক্ষেত্রের সহিত কার্যকারণসূত্রে আবদ্ধ চেষ্টিতের বিদ্যা"**।

উড্ওয়ার্থ (Woodworth) **"ব্যক্তির ক্রিয়া সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক আলোচনা"কে** (Science of the activities of the individual) মনোবিদ্যা বলিয়াছেন। ব্যক্তিই মনোবিদ্যার বিষয়। মানুষের জীবন ক্রিয়াময় এবং ব্যক্তির কর্ম বা ক্রিয়াই মনোবিদ্যার আলোচ্য।

মনোবিদ্যার আধুনিক সংজ্ঞাগুলির **সাধারণ লক্ষণ** এই যে ইহারা মনোবিদ্যাকে দর্শন হইতে মুক্ত করিতে চায়, মনের সচল ও সক্রিয় রূপটি তুলিয়া ধরে এবং মনোবিদ্যাকে একটি প্রায়োগিক বিদ্যার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে।

মনোবিদ্যার আরও দু'একটি আধুনিক সংজ্ঞা উল্লেখ্য। **অবয়বী মনোবিদ্যা** (Organismic Psychology) এবং **পূর্ণাঙ্গ মনোবিদ্যা** (Holistic Psychology) উড্ওয়ার্থীয় মনোবিদ্যার মত শুধু ব্যক্তিকে একক না ধরিয়া ব্যক্তি ও যে-বস্তুর সম্পর্কে সে সক্রিয়, এই উভয়ের মিলিত পূর্ণাঙ্গ বস্তুকে একক বলিয়া মনে করে। উহাদের মতে ব্যক্তি ও বস্তুর সম্বন্ধজনিত ক্রিয়াই মনোবিদ্যার বিষয়। তাহা হইলে এই মতে **"অবয়বী** (organism) **এবং উদ্দীপকের বিশিষ্ট পারস্পরিক ক্রিয়ার আলোচনা"কে** (Science of the specific interactions between organisms and stimulating objects) মনোবিদ্যা বলে।

অস্মিতা মনোবিদ্যা (Personalistic Psychology) মনোবিদ্যার আর একটি সংজ্ঞা দিয়াছে। এই মতে 'অহং' বা 'আমি'ই মনোবিদ্যার বিষয়। আধুনিক মনোবিদ্যায় উইলিয়ম্ জেম্স্ (William James) এই মতবাদের পথিকৃৎ। প্রত্যেক মানসক্রিয়া 'অহং' চেতনার অংশরূপেই ঘটিয়া থাকে। মেরি ক্যাল্কিন্স (Mary Calkins) এবং উইলিয়ম স্টার্ন্ (William Stern) প্রভৃতির মতে অহং-চেতনা একটি অবিসংবাদী সত্য। মানসক্রিয়া পরিবর্তনশীল, কিন্তু ইহারা যে অহং-চেতনারই পরিবর্তন এই বোধটি বদ্ধমূল এবং স্থির। **"অহং-চেতনাকে কেন্দ্র করিয়া যে**

মানসক্রিয়া ঘটে মনোবিদ্যা তাহার বিদ্যা", কারণ অহং-চেতনা সকল মানসক্রিয়ার মূলকেন্দ্র। গেস্টাল্ট্ মনোবিদ্যার পূর্ণ বা সমগ্র বস্তুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ 'অহং'কে গেস্টাল্ট্ মনোবিদ্যা উপেক্ষা করিয়াছে এবং অস্মিতা মনোবিদ্যা ইহার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে।

২। মনোবিদ্যার সংজ্ঞা (Definition of Psychology)

উপরোক্ত আলোচনায় মনোবিদ্যার কতকগুলি সংজ্ঞা পাওয়া গিয়াছে। উহাদেরও সমালোচনা আবশ্যক।

(১) প্রথম শ্রেণীর সংজ্ঞাগুলিতে মনোবিদ্যা **আত্মস্বরূপ-বিদ্যা** হইয়া দাঁড়ায়। **প্লেটো-**র মতে "আত্মস্বরূপের বিদ্যাই মনোবিদ্যা (Science of the psyche or soul)"। **অ্যারিস্টট্‌লও** মনোবিদ্যাকে আংশিকভাবে এইরূপ বলিয়া মনে করেন। পার্থক্য এই যে, প্লেটো আত্মাকে শরীর হইতে পৃথক এবং অ্যারিস্টট্‌ল্ ইহাদের ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধ বলিয়া বিবেচনা করেন। অ্যারিস্টট্‌লের মত প্লেটোর তুলনায় বাস্তবধর্মী সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার মতেও আত্মার বিচারশীল অংশ শরীর হইতে বিযুক্ত। এই সংজ্ঞা মনোবিদ্যাকে **আত্মবিদ্যা হইতে স্বতন্ত্র** বিদ্যারূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে না। ফলে মনোবিদ্যা বিজ্ঞান-পদবাচ্য হয় না। বৈজ্ঞানিক প্রায়োগিক পদ্ধতির সাহায্যে আত্মস্বরূপ অজ্ঞেয়। সুতরাং এই সংজ্ঞা গ্রহণযোগ্য নয়।

(২) **"মনের বিদ্যাই মনোবিদ্যা"** (Science of mind)। মধ্যযুগীয় দার্শনিকগণের মতে, আত্মার পরিবর্তে মনই মনোবিদ্যার বিষয়। এই সংজ্ঞাটি প্রথমটির তুলনায় গ্রহণীয়। কারণ মন আত্মা হইতে স্থূল এবং বৈজ্ঞানিক আলোচনার পক্ষে আত্মার তুলনায় অধিক উপযোগী। আত্মার তুলনায় মনের সহিত শরীরের সম্বন্ধ অধিকতর স্পষ্ট। কিন্তু মনোবিদ্যার এই সংজ্ঞাটিও **সর্বাংশে গ্রহণীয় নয়।** (ক) এই সংজ্ঞাটি অতিব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট। নীতিবিদ্যা, যুক্তিবিদ্যা এবং সৌন্দর্যবিদ্যাও মনের বিদ্যা। ইহারা মনের ইচ্ছামূলক, চিন্তামূলক এবং অনুভূতিমূলক আদর্শ, যথা শিব, সত্য ও সুন্দরের আলোচনা করে। (খ) মনোবিদ্যা ঘটনানিষ্ঠ অথবা আদর্শনিষ্ঠ বিদ্যা, এই সংজ্ঞায় ইহার স্পষ্ট নির্দেশ নাই।

(৩) **"চেতনার বিদ্যাই মনোবিদ্যা"** (Science of consciousness)। দেকার্তে এই সংজ্ঞার নির্দেশক। এই সংজ্ঞা দ্বিতীয়টির তুলনায় অধিকতর স্পষ্ট, কারণ ইহাতে মনোবিদ্যাকে শুধু মনের বিদ্যা বলিয়া অস্পষ্ট রাখা হয় নাই। ইহাতে মনোবিদ্যাকে অন্তর্দর্শন পদ্ধতির উপযোগী করিয়া তোলা হইয়াছে। কিন্তু এই সংজ্ঞাটিও

অব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট। ইহাতে মনকে চেতনার সহিত সমব্যাপ্ত করা হইয়াছে। মন বলিতে শুধু চেতনাই বুঝায় না। চেতনা বা সংজ্ঞান স্তরের নীচে অবচেতন এবং নির্জ্ঞান। এই সংজ্ঞা গ্রহণ করিলে মনের উক্ত স্তরগুলি বাদ পড়িয়া যায় এবং মনোবিদ্যার ক্ষেত্র অযথা সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে।

(৪) **"চেতন বা সংজ্ঞান এবং অবচেতন মনের বিদ্যাই মনোবিদ্যা"।** লাইব্‌নিজ্-সমর্থিত এই সংজ্ঞা তৃতীয় সংজ্ঞাটির তুলনায় অপেক্ষাকৃত নির্দোষ, কারণ ইহাতে মনোবিদ্যাকে শুধু সংজ্ঞান মনে সীমাবদ্ধ রাখা হয় নাই। কিন্তু এই সংজ্ঞাও দোষমুক্ত নয়, কারণ ইহাতে মনের আরও গভীরতর নির্জ্ঞান স্তরের উল্লেখ না থাকায় অব্যাপ্তি দোষ রহিয়াই গিয়াছে।

(৫) **"মনোবিদ্যা মানসবৃত্তির বিদ্যা** (Science of mental processes)"। এই সংজ্ঞাটি আত্মস্বরূপ, চেতনা প্রভৃতি সূক্ষ্ম বিষয়ের পরিবর্তে স্থূল মানসবৃত্তিকে মনোবিদ্যার বিষয়রূপে গ্রহণ করিয়া এই বিজ্ঞানটিকে স্পষ্টরূপ দেয়। কিন্তু এই সংজ্ঞাটির প্রধান **দোষ** এই যে ইহা কোন **মানসসত্তা** স্বীকার করে না। ফলে মানসবৃত্তির ধারাবাহিকতা এবং ঐক্য ব্যাখ্যা করিতে অসমর্থ হয়। এই সংজ্ঞার প্রথম প্রধান নির্দেশক হইলেন ডেভিড্ হিউম্। তিনি মনকে অসংখ্য দ্রুত পরিবর্তনশীল মানসবৃত্তিতে পরিণত করিয়াছেন এবং উহাদের ঐক্য ও শৃঙ্খলা ব্যাখ্যা করিতে পারেন নাই।

(৬) অনেকেই মনোবিদ্যাকে **"মানস অবস্থা ও বৃত্তির বিদ্যা** (Science of mental states and processes)"-রূপে অভিহিত করিয়াছেন। মনোবিদ্ স্টাউট্‌ও মনোবিদ্যার অনুরূপ সংজ্ঞা নির্ধারণ করিয়াছেন। কিন্তু অনেক মনোবিদ্ই মানসসত্তা স্বীকার করেন নাই। অপর দিকে স্টাউট্ উহা স্বীকার করিয়াছেন। এই সংজ্ঞায় মনকে সম্পূর্ণভাবে মানসবৃত্তিতে পরিণত করিবার দোষ পরিহার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন ওয়ার্ড, স্টাউট্, ক্যালকিন্‌স্, উইলিয়ম্ স্টার্ন প্রভৃতি মনোবিদ্‌গণ। ইঁহাদের মতে মন শুধু মানসবৃত্তির সমষ্টি নয়। তাহা ছাড়াও মন একটি বিশিষ্ট সত্তা, যাহা বহু মানসবৃত্তির মধ্যে একত্ব সূত্রের মত ক্রিয়া করে। আবার মনোবিদ্যাকে মানসবৃত্তির বিজ্ঞান বলিয়া ইহা ইঙ্গিত করে যে মনোবিদ্যা একটি ঘটনানিষ্ঠ বিদ্যা।

(৭) ক। **"প্রাণিচেষ্টিতের ঘটনানিষ্ঠ বা ব্যবহারিক বিদ্যাই মনোবিদ্যা** **(Positive Science of the behaviour of living beings)**।" ম্যাক্‌ডুগ্যাল্-প্রদত্ত মনোবিদ্যার এই সংজ্ঞাটি পূর্ববর্তী সংজ্ঞাগুলির তুলনায় অনেকাংশে নির্দোষ।

(ক) এই সংজ্ঞা অনুসারে মনোবিদ্যা একটি ঘটনানিষ্ঠ বিদ্যা। (খ) পূর্বের সংজ্ঞাগুলি অনুসারে মনোবিদ্যা মানুষের মনেই সীমাবদ্ধ। এই সংজ্ঞাটিতে মনোবিদ্যার ক্ষেত্র শুধু মনুষ্যমনে সীমাবদ্ধ হয় নাই। (গ) যান্ত্রিকভাবে ব্যাখ্যা না করিয়া চেষ্টিতের উদ্দেশ্যমুখী ব্যাখ্যা এই সংজ্ঞার মূল অভিপ্রায়।

খ। **"ব্যক্তির ক্রিয়াকলাপের বিদ্যা মনোবিদ্যা** (Science of the activities of the individual)"—উড্ওয়ার্থ্-প্রদত্ত এই সংজ্ঞাটির **গুণ** এই যে ইহা মনোবিদ্যার সক্রিয় (dynamic) রূপের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। তাহা ছাড়া, মনোবিদ্যার ব্যক্তিকেন্দ্রিক বা পাত্রগত রূপও এই সংজ্ঞায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহার **দোষ** এই যে (ক) ইহা মানসসত্তার অস্তিত্ব অস্বীকার করায় মানসক্রিয়ার ঐক্য কিরূপে ব্যাখ্যা করে তাহা বুঝা কঠিন। (খ) এই সংজ্ঞা শুধু সংজ্ঞান মনেই মনোবিদ্যার ক্ষেত্রকে সঙ্কুচিত করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। (গ) বেদনা, প্রক্ষোভ প্রভৃতি মানসবৃত্তিগুলি নিষ্ক্রিয়। ইহারা ব্যক্তির ক্রিয়াকলাপের অন্তর্ভুক্ত কি? তাহা না হইলে এই সংজ্ঞানুসারে ইহারা মনোবিদ্যার বাহিরে থাকিয়া যায়।

গ। **"চেষ্টিতের বিদ্যাই মনোবিদ্যা** (Science of behaviour)"—ওয়াট্সন্-প্রদত্ত এই সংজ্ঞা মনোবিদ্যাকে যান্ত্রিক বিদ্যায় পরিণত করিয়াছে। ইহার **দোষ** এই যে ইহাতে উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়াকে চেষ্টিতের একক হিসাবে ধরা হইয়াছে এবং উহার উদ্দেশ্যাভিমুখিতা উপেক্ষিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া, এই সংজ্ঞাটি মনোবিদ্যা হইতে 'মন', 'চেতনা', 'অন্তর্দর্শন' প্রভৃতি নির্বাসিত করিয়াছে। কিন্তু এই সংজ্ঞার **গুণ** এই যে ইহা মনোবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গীকে বিষয়গত (objective) রূপে গ্রহণ করিয়া ইহাকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সমগোত্রীয় করিয়াছে। ফলে মনোবিদ্যা ব্যাপক এবং নৈর্ব্যক্তিক হইয়া দাঁড়ায়।

(৮) ক। কয়েকটি সংজ্ঞা মনোবিদ্যার বিষয়ের সম্পূর্ণতা বা সমগ্রতা ফুটাইয়া তোলে। এই জাতীয় একটি সংজ্ঞা হইল গেস্টাল্ট্ মনোবিদ্যা প্রদত্ত সংজ্ঞা। **সমগ্র বা পূর্ণ মানসবৃত্তির বিদ্যাই মনোবিদ্যা** (Science of mental processes as wholes) অথবা কফ্কার (Koffka) ভাষায় **"মানস-শারীর ক্ষেত্রের সহিত কার্যকারণসূত্রে আবদ্ধ চেষ্টিতের বিদ্যা"** (Study of behaviour in its causal connections with the psychophysical field) হইল মনোবিদ্যা। মানসবৃত্তি কতকগুলি মৌলিক উপাদানের যৌগিক ফল নয়, কিন্তু একটি সমগ্র অথবা পূর্ণ বস্তু। এই সংজ্ঞার **গুণ** এই যে ইহা মনোবিদ্যাকে অনুষঙ্গবাদ (Associationism)

হইতে মুক্ত করে। প্রত্যেক মানসবৃত্তিই যে একটি সম্পূর্ণ এবং নূতন জিনিস, ইহা যে কতকগুলি পরস্পর-বিচ্ছিন্ন ক্রিয়ার সমষ্টিমাত্র নয়—এই বিষয়টি স্পষ্ট করিয়া বুঝানোই এই সংজ্ঞার লক্ষ্য। তাহা ছাড়া, এই সংজ্ঞাটি প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে বহু পরীক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত।

খ। **"উদ্দীপকবস্তু ও জীবের বিশেষ পারস্পরিক ক্রিয়ার বিজ্ঞানই মনোবিদ্যা** (Science of specific interactions between organisms and stimulus objects)"—অবয়বী মনোবিদ্যা (Organismic psychology) ও পূর্ণাঙ্গ মনোবিদ্যা (Holistic Psychology) প্রদর্শিত এই সংজ্ঞা গেস্টাল্ট্ মনোবিদ্যার মত মনের সমগ্র রূপটি ব্যাখ্যা করিয়াছে। কিন্তু ইহাতেও উদ্দীপকবস্তু-ও-জীবের সমগ্র রূপটির মূলে ঐক্যসূত্ররূপে মনের স্বীকৃতি নাই।

(৯) **"অহং-চেতনাকে কেন্দ্র করিয়া যে সকল মানসবৃত্তি ঘটে, তাহার আলোচনাই মনোবিদ্যা"** ('Science of personal consciousness')—এই সংজ্ঞাটি অস্মিতা মনোবিদ্যার (Personalistic Psychology) সমর্থিত সংজ্ঞা। মানসবৃত্তি অসংখ্য হওয়া সত্ত্বেও অহং-চেতনার অবিভাজ্য অংশ। এই সংজ্ঞার গুণ এই যে ইহা মানসসত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া মানসবৃত্তির ঐক্য ব্যাখ্যা করিতে পারে। তাহা ছাড়া, অহং-চেতনা শুধু একটি তত্ত্বমাত্র নয়, বরং অভিজ্ঞতালব্ধ বাস্তব সত্য। কিন্তু অধিকাংশ প্রায়োগিক মনোবিদ্ মনোবিদ্যার এই সংজ্ঞাকে গ্রহণ করেন না। তাঁহারা অহং-চেতনারূপ মানস ঐক্যসূত্রের তুলনায় মানসবৃত্তিগুলিকেই মনোবিদ্যার যোগ্যতর বিষয় রূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন।

মনোবিদ্যার সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বর্তমান অনুচ্ছেদটিকে পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদটির সহিত যুক্ত করিয়া পাঠ করা আবশ্যক।

৩। উপসংহার—গ্রহণীয় সংজ্ঞা

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলি হইতে ইহাই বুঝা যাইতেছে যে এক কথায় বা সংক্ষেপে মনোবিদ্যার স্পষ্ট সংজ্ঞা নির্দেশ করা সহজসাধ্য নয়। মনোবিদ্যার সংজ্ঞা নির্দেশ কালে লক্ষ্য রাখিতে হইবে সংজ্ঞাটি যেন মনোবিদ্যা ঠিক যাহা তাহাই বুঝায় এবং মনোবিদ্যা যাহা নয় তাহাকে ইহার উপর আরোপ না করে।

এই দিক দিয়া বিচার করিলে **স্টাউট্**-প্রদত্ত **"মনোবিদ্যা মনের অবস্থা এবং**

ক্রিয়া সংক্রান্ত বিদ্যা" ('Science of mental states and processes')—এই সংজ্ঞাটি নিম্নোক্ত কারণে গ্রহণীয় বলিয়া মনে হয়।

(ক) এই সংজ্ঞার ভিত্তিতে মনোবিদ্যা স্বভাবতঃ **ঘটনানিষ্ঠ বিদ্যা** (positive science) হইয়া দাঁড়ায়। মনের যে সকল অবস্থা বা ক্রিয়া ঘটিয়া থাকে, মনোবিদ্যা সেইগুলির আলোচনা করে।

(খ) এই সংজ্ঞা প্রায়োগিক পদ্ধতি এবং মাত্রিক (Quantitative) পদ্ধতি স্বীকার করিয়া লইয়াছে। বাস্তব মানস অবস্থা বা ক্রিয়ার প্রায়োগিক এবং মাত্রিক পদ্ধতি-নিষ্ঠ আলোচনাই মনোবিদ্যা।

(গ) এই সংজ্ঞা মনোবিদ্যাকে ঘটনানিষ্ঠ বিজ্ঞানরূপে গ্রহণ করিয়াও উহাকে যান্ত্রিক বিদ্যায় পর্যবসিত করে নাই, কারণ মানসবৃত্তির উদ্দেশ্যমূলক নিয়ন্ত্রণ (teleological determination) ইহার একটি মূল সূত্র। ইহা চেষ্টিতবাদের দোষগুলি পরিহার করিয়া ম্যাক্‌ডুগ্যাল্‌-প্রদর্শিত উদ্দেশ্যাত্মক মনোবিদ্যার গুণগুলি গ্রহণ করিয়াছে।

(ঘ) এই সংজ্ঞার মূল ভিত্তি অনুসারে মনোবিদ্যা শুধু সংজ্ঞান মনে সীমাবদ্ধ নয়, কিন্তু মনের অবচেতন ও নির্জ্ঞান স্তর দুইটিও ইহার অন্তর্ভুক্ত। বস্তুতঃ, স্টাউট্‌ তাঁহার মনোবিদ্যার গ্রন্থগুলিতে সংজ্ঞানের নিম্নতর মানসস্তরগুলির উপর যথাযোগ্য গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন।

(ঙ) এই সংজ্ঞা মনকে শুধু মানসবৃত্তিরাশিতে পর্যবসিত করে নাই, কিন্তু সকল পরিবর্তনশীল বৃত্তিগুলিতে অনুপ্রবিষ্ট মানস-সত্তাকে ঐক্যসূত্র রূপে গ্রহণ করিয়াছে, যদিও ইহাকে মনোবিদ্যার বিষয় রূপে গ্রহণ করিয়া এই বিজ্ঞানটিকে দর্শনে পরিণত করে নাই।

(চ) সর্বোপরি এই সংজ্ঞা আধুনিক গেস্টাণ্ট্‌, অবয়বী এবং পূর্ণাঙ্গ মনোবিদ্যার পূর্বেই মানসবৃত্তি যে একটি পূর্ণ অথবা গোটা বস্তু তাহা স্বীকার করিয়াছে।

দেখা যাইতেছে যে, স্টাউট্‌-এর সংজ্ঞাটিকে তাঁহার অনুসৃত ধারায় ব্যাখ্যা করিলে ইহা অনেকাংশে সন্তোষজনক। কিন্তু মনোবিদ্যার **কোন সংজ্ঞাকেই সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করা অনুচিত**, কারণ মনোবিদ্যা উন্নতিশীল বিজ্ঞান। মনোবিদ্যার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে উহার সংজ্ঞার পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং মনোবিদ্যাকে কোনো বাঁধাধরা সংজ্ঞায় শৃঙ্খলিত না করাই সঙ্গত। গৃহীত সংজ্ঞাটি মনোবিদ্যার আলোচনায় **একটি সঙ্কেত** মাত্র।

৪। মনোবিত্তার ক্ষেত্র বা পরিসর
(Scope of Psychology)

মনের ক্রিয়াবলীই মনোবিত্তার বিষয়। মনের ক্রিয়াবলীর ক্ষেত্র বা পরিধি বিস্তৃত। কারণ, **যাহা মনের সহিত সংশ্লিষ্ট, যাহা মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে অথবা যাহার উপর মন প্রভাব বিস্তার করে, তাহাই মনোবিত্তার ক্ষেত্র।**

যাহা মানুষের মনকে স্পর্শ করে তাহাই মনোবিত্তার ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত। মনোবিত্তার ক্ষেত্র হইতে কোনো বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত, ভাস্কর্য—এক কথায়, যাহাই মানবিক-তাহার কিছুই বাহিরে পড়ে না। পদার্থবিত্তা, রসায়ন প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানগুলিও মানসবৃত্তির ফলরূপে মনোবিত্তার ক্ষেত্রে আসিয়া পড়ে। সুতরাং এই অর্থে মনোবিত্তা "**সকল বিজ্ঞানের বিজ্ঞান**" (Science of Sciences)।

কিন্তু মনোবিত্তার ক্ষেত্রকে এইরূপ ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করিলে মনোবিত্তা প্রকৃত-পক্ষে অর্থহীন হইয়া পড়ে। যে বিজ্ঞান সকল জ্ঞেয় বস্তুরই অনুশীলন করে তাহাকে বিজ্ঞান বলা চলে না, কারণ বিজ্ঞানের প্রধান লক্ষণ হইল বৈশিষ্ট্য এবং এইরূপ সর্বান্তর্ভাবী বিজ্ঞানকে বিশিষ্ট বা বিশেষ প্রকারের জ্ঞান বলা চলে না। দ্বিতীয়তঃ, সকল বিজ্ঞানকেই মনোবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত করিলে একটি মারাত্মক ভুল করা হয়। মনোবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গী আলোচনা করিলে আমরা দেখি যে ইহা পাত্রগত বা অভিজ্ঞাতৃ-সাপেক্ষ। কিন্তু প্রাকৃতিক বিজ্ঞানগুলির দৃষ্টিভঙ্গী বিষয়গত বা বস্তুসাপেক্ষ। সকল বিজ্ঞানকে মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে ফেলিলে এই দুইটি দৃষ্টিভঙ্গীর মৌলিক পার্থক্য অস্বীকার করা হয়।

প্রথমতঃ, সাধারণ মনোবিদ্যার (General psychology) সকল বিষয়ই উহার ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত। মনোবিদ্যার সংজ্ঞা, দৃষ্টিভঙ্গী, ইহার সহিত অন্যান্য বিজ্ঞানের সম্বন্ধ, ইহার পদ্ধতি, শরীর ও মনের সম্বন্ধ, প্রতিবর্ত, সহজ প্রবৃত্তি, সংবেদন, প্রত্যক্ষ, প্রতিরূপ, স্মৃতি, কল্পনা, চিন্তন, অনুভূতি, প্রক্ষোভ, রস, বংশানুগতি ও পরিবেশ, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে ভেদ, ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধি প্রভৃতি মনোবিদ্যার আলোচ্যগুলি উহার ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট।

দ্বিতীয়তঃ, মনোবিদ্যার বিষয়ের তুলনায় উহার **ক্ষেত্র ব্যাপকতর**।

যাহা প্রত্যক্ষ বা মুখ্যভাবে মনোবিদ্যার বিষয়ীভূত নয় এমন অনেক বিষয়ই মনোবিদ্যার পরোক্ষ ক্ষেত্র।

(ক) যেমন, মনোবিদ্যার প্রধান বিষয় পরিণত ব্যক্তির মন (adult mind)। কিন্তু কিরূপে শিশুর, এমন কি নিম্নতর প্রাণীর, অপরিণত মন পরিণত মনে বিকাশ লাভ করে তাহা বুঝিতে হয়। সুতরাং **শিশুমনোবিদ্যা** এবং **প্রাণিমনোবিদ্যাও** মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে প্রবেশ করে।

(খ) শিক্ষণ ব্যাপারে মনোবিদ্যার জ্ঞান দরকার। শিক্ষকের শিক্ষাদান এবং শিক্ষাগ্রহণ, এই দুইটি ব্যাপারই কতকগুলি মনোবৈজ্ঞানিক নিয়মের অধীন। **শিক্ষা-মনোবিদ্যা** (Educational Psychology) এই নিয়মগুলিকে সাধারণ মনোবিদ্যার আলোকে আলোচনা করে। সুতরাং শিক্ষামনোবিদ্যাও মনোবিদ্যার ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত।

(গ) আবার সাধারণ মনোবিদ্যা গোষ্ঠীর, সমাজের বা জাতির মন লইয়া মুখ্যভাবে আলোচনা করে না। অথচ এই সংগঠনগুলির মানসপ্রকাশও মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে আসিয়া পড়ে। কারণ মন সম্বন্ধে মনোবিদ্যার সাধারণ জ্ঞানের আলোকেই ইহাদের বুঝিতে হয়। এইরূপে **সমাজ-মনোবিদ্যাও** মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হয়।

(ঘ) শিল্প, কারিগরি প্রভৃতি বিদ্যাগুলির সৃষ্টি মানুষের মন হইতেই। শ্রমিক, কারিগর, শিল্পী, মালিক বা নিয়োগকর্তার মন কি কি নিয়মে কাজ করে তাহা আলোচনা করে শিল্পীয় মনোবিদ্যা। এই সকল আলোচনায় সাধারণ মনোবিদ্যার জ্ঞান আবশ্যক হয়। সুতরাং **শিল্পীয় মনোবিদ্যাও** (Industrial Psychology) মনোবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত।

(ঙ) **অস্বভাবী মনোবিদ্যাও** (Abnormal Psychology) মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে স্থান অধিকার করে। কিরূপে অস্বভাবী মনের ক্রিয়া বুঝা যাইতে পারে তাহা এই বিদ্যাটির জ্ঞাতব্য। কিন্তু সাধারণ মনোবিদ্যা-আলোচিত স্বভাবী মনের আলোকেই অস্বভাবী মন বুঝিবার চেষ্টা করিতে হয়।

(চ) **শারীরবৃত্তীয় মনোবিদ্যাও** (Physiological Psychology) মনোবিদ্যার ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত। এই বিদ্যায় শরীরের সহিত মনের সম্বন্ধ আলোচিত হয়। প্রায়োগিক মনোবিদ্যায় ইহার স্থান অপরিহার্য, কারণ এই মনোবিদ্যার আলোচ্য শরীরী মন (embodied mind), অশরীরী আত্মা নয়।

(ছ) শারীরবৃত্তীয় মনোবিদ্যার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ **চিকিৎসা-মনোবিদ্যাও** (Medical Psychology) মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট। আবার চিকিৎসা-মনোবিদ্যার নিকটবর্তী **মনোরোগবিদ্যাও** (psychiatry) মনোবিদ্যার ক্ষেত্র হইতে বাদ পড়ে না। বিভিন্ন মনোরোগের প্রকৃতি ও চিকিৎসায় সাধারণ মনোবিদ্যার জ্ঞান অত্যাবশ্যক।

এক কথায়, মানুষের মনকে যাহাই স্পর্শ করে এবং যাহার উপর মন প্রভাব বিস্তার করে অথবা যাহাই মনকে প্রভাবিত করে, তাহাই মনোবিদ্যার ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত।

(জ) সাম্প্রতিককালে **যুদ্ধ মনোবিদ্যা** (Psychology of War) যথেষ্ট গুরুত্ব লাভ করিয়াছে। মানুষের মধ্যে যোধন বা যুদ্ধ করিবার প্রবৃত্তিই প্রধান, অথবা শান্তিতে মিলিয়া মিশিয়া থাকিবার সামাজিক প্রবৃত্তিই প্রধান? শান্তিকালীন ও যুদ্ধকালীন বহু সমস্যা মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে প্রবেশ করে।

(ঝ) এই জাতীয় প্রশ্নের সম্মুখীন হইয়া বিভিন্ন জাতির মনোভাব বুঝিতে হয়। ফলে **জাতীয় মনোবিদ্যাও** (National Psychology) মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে স্থান লাভ করে।

(ঞ) তাহা ছাড়া মানুষের রীতিনীতি, আচার-বিচার, ন্যায়-অন্যায় বোধ প্রভৃতিকে কেন্দ্র করিয়া আচার বা **সংস্কৃতি মনোবিদ্যার** (Cultural Psychology) উদ্ভব হয়। সংস্কৃতি মনোবিদ্যা মনোবিদ্যার একটি বিশিষ্ট ক্ষেত্র।

(ট) বর্তমানে মনোবিদ্যার শাখার অন্ত নাই। প্রতিনিয়ত ইহার ক্ষেত্র প্রসারিত হইতেছে। **পেশা মনোবিদ্যা** (Vocational Psychology), **অভীক্ষা মনোবিদ্যা** (Test Psychology) প্রভৃতি শাখাগুলি মনোবিদ্যায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করিয়াছে। সুতরাং ইহারাও মনোবিদ্যার উর্বর ক্ষেত্র।

উপরের আলোচনায় মনোবিদ্যার বিস্তৃত ক্ষেত্রের আভাস দেওয়া হইল। মানবীয় বিষয়মাত্রই ইহার ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত। যেমন ধর্ম, নীতি, সৌন্দর্য প্রভৃতি বোধগুলি সম্বন্ধেও বিশেষ বিশেষ মনোবিদ্যার শাখা উৎপন্ন হইয়াছে। **ধর্মীয় মনোবিদ্যা** (Psychology of Religion) মনোবিদ্যার একটি নবীন শাখা। আবার **বিকাশ মনোবিদ্যা** Developmental Psychology) মনের বিকাশ আলোচনা করে বলিয়া মনোবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে **মনোবিদ্যার ক্ষেত্র সুবিস্তীর্ণ**।

৫। মনোবিদ্যার বিভিন্ন শাখা (Different Branches of Psychology)

মনোবিদ্যা মহীরুহটি উহার সুবিশাল ক্ষেত্রে বহু শাখায় শাখান্বিত। নমুনা স্বরূপ মাত্র কয়েকটি শাখা সংক্ষেপে আলোচ্য—যথা **শিশু মনোবিদ্যা, প্রায়োগিক মনোবিদ্যা, শারীরবৃত্তীয় মনোবিদ্যা, অস্বভাবী মনোবিদ্যা, শিক্ষা মনোবিদ্যা** এবং **শিল্পীয় মনোবিদ্যা**।

(১) শিশু মনোবিদ্যা (Child Psychology)

শিশুমনের প্রকাশ, বিকাশ এবং প্রকৃতির বৈজ্ঞানিক আলোচনাই শিশু মনোবিদ্যা। শিশুর হাবভাব, মতিগতি, হাসি কান্না, খেলাধূলা প্রভৃতি আচরণের পর্যবেক্ষণই শিশু মনোবিদ্যার **পদ্ধতি**। নিতান্ত শিশু তাহার মনের অবস্থা বুঝিতে বা অন্তর্দর্শন করিতে পারে না। শিশু মনোবিদ্যার এই প্রধান **অন্তরায়**। আর এক প্রধান অন্তরায় এই যে বড়রা শিশুর আচরণকে পরিণত মনের উপমায় বুঝিতে চায়।

শিশু মনোবিদ্যার **উপাদান** শিশুর মাতা, ধাত্রী, শিক্ষক প্রভৃতির প্রদত্ত **বিবরণ** হইতে সংগ্রহ করিতে হয়। কিন্তু মনোবৈজ্ঞানিকের নিরপেক্ষ বা নিস্পৃহ দৃষ্টি না থাকিলে ঐ বিবরণ পক্ষপাতিত্বশূন্য হয় না। এই জাতীয় পর্যবেক্ষণমূলক **পদ্ধতি** ছাড়াও শিশুমন গবেষণায় অন্যান্য পদ্ধতি অনুসৃত হয়—যেমন **প্রশ্নাবলী (Questionnaire)** পদ্ধতি, **প্রায়োগিক** পদ্ধতি প্রভৃতি।

শিশু মনোবিদ্যায় শিশুর জীবনকে **বিভিন্ন খণ্ডে (Periods of Childhood)** বিভক্ত করা হয়। প্রকৃতপক্ষে শিশুজীবন আরম্ভ হয় মাতৃগর্ভস্থ ভ্রূণাবস্থা হইতে। কিন্তু সাধারণতঃ ভূমিষ্ঠ হইবার সঙ্গে সঙ্গে শৈশবের সূত্রপাত হইল, এমন মনে করা হয়। **অপোগণ্ড** অবস্থা (Infancy) চলে আঠারো মাস বা দেড় বৎসর পর্যন্ত। এই অবস্থায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নাড়াচাড়া শিখিয়া উদ্ভিদ হইতে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনেই শিশুর সকল শক্তি ব্যয়িত হয়। তারপর সাড়ে তিন বৎসর পর্যন্ত চলে **প্রকৃত শৈশব (Babyhood)** অবস্থা। এই অবস্থায় শিশুর মন সংবেদন স্তর হইতে প্রত্যক্ষের, এমন কি কল্পনার স্তরে অগ্রসর হয়। শিশুজীবনের তৃতীয় খণ্ড **প্রাথমিক বাল্যাবস্থা** (**Early Childhood**)। সাড়ে তিন বৎসর হইতে পাঁচ বৎসর পর্যন্ত এই অবস্থা চলে। এই অবস্থায় বুদ্ধি ও বিচারশক্তির উন্নতি, ব্যক্তিত্বের বিকাশ, সামাজিক প্রবৃত্তি, বিবেক বা অধিশাস্তার (Conscience, Super-ego) উন্মেষ ঘটে।

পঞ্চম বৎসর শিশুর জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্টার্ন (Stern), পিয়াজে

(Piaget) প্রভৃতি শিশুমনোবিদ্ মনে করেন যে এই সময় শিশুর বিচার ও **অনুমান-শক্তি** জন্মে। তাছাড়া এই বয়সেই শিশুর প্রকৃত **বিদ্যারম্ভ।** পরবর্তী প্রায় বারো বৎসর পর্যন্ত **উত্তর বাল্যাবস্থা** (Later childhood)। এই অবস্থায় প্রাথমিক বাল্যে অর্জিত ক্ষমতাগুলির আরও বিকাশ হয়। বিচলন, জ্ঞান, শব্দভাণ্ডার, পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য ক্ষমতা আরও পরিণতি লাভ করে।

পরবর্তী অবস্থা **কৈশোর বা নবযৌবন** (adolesence) প্রায় কুড়ি বৎসর পর্যন্ত চলিতে থাকে। এইটি শৈশবের সীমারেখা, যখন শিশু তার পরমুখাপেক্ষী, অসহায় অবস্থা হইতে আত্মনির্ভরশীল হইয়া উঠে।

শিশু মনোবিদ্যার প্রধান আলোচ্য শিশুমনের প্রকৃতি ও বিকাশ এবং ইহার বিভিন্ন খণ্ডগুলি। কিন্তু ইহার সহিত বহু প্রশ্ন জড়িত। কাজে কাজেই শিশু-মনোবিদ্যার ক্ষেত্রটি সুবিশাল। সকল মানসবৃত্তিই ইহার আলোচ্য হইয়া দাঁড়ায়।

(২) প্রায়োগিক মনোবিদ্যা (Experimental Psychology)

যে মনোবিদ্যা কৃত্রিম অথবা নিয়ন্ত্রণাধীন অবস্থায় মানসবৃত্তি উৎপন্ন করিয়া উহার অন্তর্নিহিত এবং বহিঃপ্রকাশিত রূপ আলোচনা করে, তাহার নাম প্রায়োগিক মনোবিদ্যা।

১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দে হ্বিল্‌হেল্‌ম্ হ্বুণ্ড্ (Wilhelm Wundt) জার্মানীর লাইপ্‌জিগ শহরে প্রথম প্রয়োগশালা স্থাপন করিয়া প্রায়োগিক মনোবিদ্যার ভিত্তি স্থাপন করেন। হ্বেবর (Weber), ফেক্‌নার (Fechner), জোহানেস মুয়েলার (Johannes Muller), লট্‌জা (Lotze) প্রভৃতি মনোবিদ্‌গণ হ্বুণ্ড্-এর প্রায়োগিক মনোবিদ্যার ভূমি প্রস্তুত করিতেছিলেন। এবিংহাউস (Ebbinghaus), টিশ্‌নার (Titchener), কুল্পে (Kulpe) প্রভৃতি পরবর্তী প্রায়োগিক মনোবিদ্‌গণ বিজ্ঞানটির ভিত্তি আরও সুদৃঢ় করিয়া তোলেন।

প্রায়োগিক মনোবিদ্যার পদ্ধতি

মানসবৃত্তির দুইটি রূপ— যথা অন্তর্নিহিত বা অনুভবগম্য রূপ এবং বহিঃপ্রকাশিত রূপ। অন্তর্নিহিত রূপটি জানা যায় অন্তর্দর্শন পদ্ধতির সাহায্যে। কিন্তু মানসবৃত্তির বহিঃপ্রকাশিত রূপ জানিবার উপায় হইল পর্যবেক্ষণ বা বহির্দর্শন। এই দুইটি পদ্ধতিকে মিলিতভাবে প্রয়োগ করিতে পারিলে উভয়েরই পৃথক গুণগুলি গ্রহণ এবং দোষগুলি বর্জন করা যায়।

কিন্তু একই ব্যক্তির পক্ষে এই দুই পদ্ধতির সম্মিলিত প্রয়োগ সম্ভব নয়। অন্ততঃ দুই ব্যক্তির সহযোগিতায় এই যুগ্ম পদ্ধতির অনুসরণ সম্ভব। প্রথম ব্যক্তি তাহার মানসবৃত্তির অন্তর্দর্শন করে এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি উহার বহিঃপ্রকাশগুলি পর্যবেক্ষণ করে। প্রথম ব্যক্তিকে বলা হয় পাত্র (Subject) এবং দ্বিতীয় জনকে বলা হয় প্রয়োগকর্তা বা পর্যবেক্ষক (Experimenter, Observer)—এই দুই ব্যক্তির যুক্ত প্রচেষ্টায় মানসবৃত্তির যে রূপটি পাওয়া যায় তাহাই উহার সম্পূর্ণ রূপ।

প্রায়োগিক মনোবিদ্যার প্রথম সূচনা সংবেদনের গবেষণায়, কারণ সংবেদনের সহিত শরীরের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ। তারপর প্রত্যক্ষ, প্রতিরূপ, স্মৃতি, কল্পনা, ভাব, চিন্তন, অনুভূতি, প্রক্ষোভ, রস প্রভৃতি উচ্চতর মানসবৃত্তিগুলির উপর প্রায়োগিক মনোবিদ্যা প্রচুর আলোকপাত করিয়াছে। তাহা ছাড়া, প্রতিবর্ত, ইচ্ছা, ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধি, মনোযোগ প্রভৃতি ক্রিয়াগুলির গভীর গবেষণায় সমৃদ্ধ প্রায়োগিক মনোবিদ্যা। সর্বোপরি, ইহার প্রভাবে মনোবিদ্যার প্রত্যেক শাখা অল্পাধিক প্রায়োগিক রূপ লাভ করিয়াছে।

(৩) শারীরবৃত্তীয় মনোবিদ্যা (Physiological Psychology)

প্রায়োগিক মনোবিদ্যার অগ্রগতির সহিত শারীরবৃত্তের অগ্রগতির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে, কারণ মানসবৃত্তির শারীর প্রকাশ পর্যবেক্ষণ না করিয়া প্রায়োগিক পদ্ধতি অচল। সংবেদনের প্রয়োগগুলি যেমন মনোবিদ্যার তেমনই শারীরবৃত্তেরও। যেমন, **হেল্‌মহোল্‌জ**্ বলিলেন যে তিনটি মৌলিক রং বা রূপ দর্শনেব মূলে রহিয়াছে অক্ষিপটে (Retina) অবস্থিত তিনটি নার্ভতন্তুর উত্তেজনা। ডঃ **হেড**্ বলিলেন যে বিভিন্ন স্তরের স্পর্শ সংবেদন ত্বকের নিম্নে অবস্থিত বিভিন্ন নার্ভের উদ্দীপনার ফলে ঘটিয়া থাকে। প্রত্যেক মানসবৃত্তির সহিতই শারীরবৃত্তি জড়িত। মনোবিদ্যার বিষয় অশরীরী আত্মা নয়, কিন্তু শরীরাশ্রিত বা শরীরী মন অথবা স্টাউট্-এর ভাষায় "embodied mind"।

কোন্ কোন্ মানসবৃত্তি কোন্ কোন্ শরীরাংশের কোন্ কোন্ ক্রিয়ার সহিত সম্পর্কিত, এই বিষয়ের আলোচনাই শারীরবৃত্তীয় মনোবিদ্যা। শারীরবৃত্তীয় মনোবিদ্যা শরীরের সেই সকল অংশের গঠন ও ক্রিয়া লইয়া আলোচনা করে, যাহাদের সহিত মানসক্রিয়ার সম্বন্ধ বিশেষ ঘনিষ্ঠ এবং যাহা বাদ দিয়া তত্তৎ-সংশ্লিষ্ট মানসবৃত্তি ভালভাবে বুঝা যাইতে পারে না।

মনের সহিত শরীরের যে অংশ বিশেষ ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ সেইটি হইল নার্ভতন্ত্র

(nervous system), বিশেষ করিয়া কেন্দ্রীয় (central) নার্ভতন্ত্র। আবার কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্রের প্রধান অঙ্গ হইল (১) মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশগুলি, যেমন গুরু-মস্তিষ্ক (cerebrum, brain), মধ্যমস্তিষ্ক (mid-brain), লঘুমস্তিষ্ক (cerebellum), সুষুম্নাশীর্ষক (medulla), (২) সুষুম্নাকাণ্ড (spinal cord) এবং (৩) স্বতন্ত্র নার্ভতন্ত্র (autonomic nervous system)। সুতরাং শারীরবৃত্তীয় মনোবিদ্যা ইহাদের গঠন এবং ক্রিয়ার বিশদ আলোচনা করে। ইন্দ্রিয়যন্ত্রগুলির আলোচনা এই মনোবিদ্যার একটি প্রধান বিষয়, কারণ ইহাদের দ্বার দিয়াই সকল সংবেদন উৎপন্ন হয়। যেমন চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক, জিহ্বা এই পাঁচটি ইন্দ্রিয় রূপ, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ এবং রস সংবেদনের কারণ। ইহাদের গঠন ও ক্রিয়া না জানিয়া এই সংবেদন-গুলি বুঝিবার চেষ্টা বৃথা।

(৪) অস্বভাবী মনোবিদ্যা (Abnormal Psychology)

যে মনোবিদ্যা স্বাভাবিক বা সুস্থ মানসিকতার মান (Norm) বা মাপ-কাঠি (standard) হইতে বিচ্যুত মনের চেষ্টিত বা আচরণ আলোচনা করে এবং এই বিচ্যুতির কারণ ও উহা নিরাকরণের উপায় নির্দেশ করে, তাহাকে অস্বভাবী মনোবিদ্যা বলে।

ব্যাবিন্‌স্কি (Babinski), **সিজ্‌মণ্ড্‌ ফ্রয়েড** (Sigmund Freud), **সি. জি. য়ুঙ্গ** (C. G. Jung), **অ্যালফ্রেড্‌ অ্যাড্‌লার** (Alfred Adler), **মর্টন্‌ প্রিন্স্‌** (Morton Prince), **উইলিয়াম্‌ ম্যাক্‌ডুগ্যাল্‌** (William McDougall) প্রভৃতি অস্বভাবী মনোবিদ্যার পথিকৃৎ। ইঁহারা প্রত্যেকেই অস্বভাবী মনোবিদ্যার এক একটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা।

মানসিক রোগ, স্নায়বিক বিকার, স্বপ্ন এবং দৈনন্দিন জীবনের ভুলভ্রান্তি ইহার সাধারণ আলোচ্য। কিন্তু **মানস রোগই** অস্বভাবী মনোবিদ্যার **প্রধান আলোচ্য বিষয়**। মানসিক লক্ষণের উপর দৈহিক প্রভাবের মাত্রা অনুসারে মানসিক রোগ-গুলিকে সাধারণতঃ **তিন শ্রেণীতে** বিভক্ত করা হয়। যথা **উদ্বায়ু** (Neurosis), **বায়ুরোগ** (Psychoneurosis) এবং **বাতুলতা** (Psychosis)। এইসব মানস-রোগের উৎপত্তি, নির্ণয়, **নিদান** (Diagnosis), **আরোগ্য সম্ভাবনা** (Prognosis) এবং **চিকিৎসা** (Treatment) প্রভৃতি অস্বভাবী মনোবিদ্যার **বিষয়ীভূত**।

অস্বভাবী মনোবিদ্যা **পদ্ধতিনিষ্ঠ**। ইহার গবেষণা পদ্ধতি প্রায়োগিক। রোগ চিকিৎসায় **অভিভাবন** (suggestion), **সংবেশন** (hypnosis), **বিরেচন**

(catharsis) প্রভৃতি এই পদ্ধতির বিভিন্ন অঙ্গ। ফ্রয়েড্-এর মতে **অবাধ ভাবানুষঙ্গই** (free association) মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতি। নানা **সম্প্রদায়ে** বিভক্ত অন্বভাবী মনোবিদ্যার প্রধান সম্প্রদায় ফ্রয়েড্-এর **মনঃসমীক্ষণ** (Psychoanlysis), য়ুঙ্গ-এর **বিশ্লেষণ মনোবিদ্যা** (Analytical Psychology), অ্যাড্‌লার-এর **ব্যক্তি মনোবিদ্যা** (Individual Psychology), ম্যাক্‌ডুগ্যাল-এর **হর্মিক** বা **উদ্দেশ্যমূলক মনোবিদ্যা** (Hormic Psychology) প্রভৃতি।

(৫) শিক্ষা-মনোবিদ্যা (Educational Psychology)

শিক্ষা-মনোবিদ্যা ফলিত মনোবিদ্যার (Applied Psychology) একটি প্রধান শাখা বা বিভাগ। সাধারণ বা বিশুদ্ধ মনোবিদ্যার (General or Pure Psychology) নিয়ম বা সূত্রগুলির শিক্ষণ ব্যাপারে প্রয়োগের নামই শিক্ষা-মনোবিদ্যা। **মানুষের আচরণ বা চেষ্টিত** (behaviour) **কি প্রকারে নূতন শিক্ষণীয় বস্তু জানিবার ফলে ক্রমে ক্রমে উন্নত হইয়া ওঠে, ইহাই শিক্ষা-মনোবিদ্যার আলোচ্য**।

শিক্ষা আরম্ভ হয় জন্মের প্রথম মুহূর্ত হইতে এবং চলিতে থাকে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত। কিন্তু এই শিক্ষা প্রাকৃতিক। প্রাকৃতিক শিক্ষা নিয়ন্ত্রণশীল অবস্থায় প্রায়োগিক শিক্ষা নয়, কাজেই শিক্ষা-মনোবিদ্যার গণ্ডীর বাহিরে। নিয়ন্ত্রণাধীন প্রায়োগিক শিক্ষাই শিক্ষা-মনোবিদ্যার **উদ্দেশ্য**।

কিন্তু যদিও শিক্ষা আবালবৃদ্ধবনিতা নির্বিশেষে সকলেরই ধর্ম, পরিণত অপেক্ষা **অপরিণত শিশু বা কিশোর মনই শিক্ষা-মনোবিদ্যার প্রধান লক্ষ্য।** কারণ শিশু বা কিশোর মন অপেক্ষাকৃতভাবে বিশুদ্ধ এবং সংস্কারমুক্ত। এইরূপ মনই নূতন শিক্ষা গ্রহণের উপযোগী। পক্ষান্তরে পরিণত মন দৃঢ়মূল সংস্কারবদ্ধ। এই মন সহজে বা স্বতঃস্ফূর্তভাবে নূতন শিক্ষণীয় বিষয় গ্রহণে অপারগ।

শিক্ষা-মনোবিদ্যা **পদ্ধতিনিষ্ঠ**। কোন্ পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করিলে উহা ফলপ্রসূ হয়, শিক্ষা মনোবিদ্যার পক্ষে ইহা একটি বড় সমস্যা। নানা শিক্ষা পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়া শিক্ষা সংক্রান্ত নিয়ম বা সূত্র আবিষ্কার করে শিক্ষা-মনোবিদ্যা। কোন্ শিক্ষণ পদ্ধতি সাহায্যে শিক্ষা দ্রুত বা ত্বরান্বিত হয়, পরিশ্রম এবং সময় কম লাগে—এই জাতীয় প্রশ্নগুলি শিক্ষা-মনোবিদ্যার বিবেচ্য। শিক্ষার্থীর **শিক্ষা-গ্রহণের যোগ্যতা** বিচার করিয়া শিক্ষণ পদ্ধতি নির্ধারণ করিতে হয়। অবাধ্য,

উচ্ছৃঙ্খল এবং অস্বভাবী শিশুকে শিক্ষাদানের পদ্ধতি কি? জড়ধী (Idiot), মন্দধী (Imbecile), উজ্জ্বলধী (Bright) এবং প্রতিভাবান (Genius) শিশুকে কিরূপে শিক্ষাদান করিতে হয়—এই সকল শিশুশিক্ষণমূলক প্রশ্ন শিক্ষা-মনোবিদ্যার বিশেষ ভাবে আলোচ্য বিষয়। ব্যক্তিত্ব এবং বুদ্ধির পরিমাপ সাহায্যে এই জাতীয় প্রশ্নের সমাধান করিতে হয়। এই সকল পরিমাপে **পরিসংখ্যান পদ্ধতি** (Statistical method) অবলম্বনীয়।

শিক্ষামনোবিদ্যা **শিক্ষকশিক্ষণে** কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। কিরূপে শিক্ষাদান করিলে সেই শিক্ষা ফলপ্রসূ হয়, তাহা শিক্ষা করাই শিক্ষকের শিক্ষা।

এক কথায় শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষামনোবিদ্যার গুরুত্ব অপরিসীম।

(৬) শিল্পীয় মনোবিদ্যা (Industrial Psychology)

মনোবিদ্যার যে শাখা ব্যবসায়, শ্রম, শিল্প প্রভৃতির সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মন বা চেষ্টিত সম্বন্ধে আলোচনা করে তাহাকে শিল্পীয় মনোবিদ্যা বলে।

শিল্প, ব্যবসায়, শ্রমের সহিত মানুষের মন যুক্ত। শিল্পী শুধু শিল্প উৎপাদনের যন্ত্রমাত্র নয়, কিন্তু একজন মনবিশিষ্ট, সুখ দুঃখ স্বাচ্ছন্দ্য প্রভৃতি বোধসম্পন্ন মানুষ। শিল্পের উৎপাদনবৃদ্ধি, লভ্যাংশবৃদ্ধি, প্রসার শিল্পীমনের উপর নির্ভর করে।

শ্রমজনিত **ক্লান্তি বা অবসাদ** (fatigue) শিল্পোৎপাদনের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। উৎপাদন উদ্দেশ্যে কর্মীর শ্রম বা চেষ্টার ফলেই উৎপাদন হয়। আবার শ্রম বা চেষ্টার ফল ক্লান্তি বা অবসাদও বটে। অবসন্ন শ্রমের ফলে উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কাজেই শ্রমই শিল্পোৎপাদনের একমাত্র নিয়ামক নয়। শ্রম বা কর্মকুশলতা (Efficiency) শিল্পোৎপাদনের একটি মস্ত বড় কারণ। শিল্পীয় মনোবিদ্যা এই কর্ম-কুশলতা পরিমাপের উপায় বাহির করে।

শিল্পীয় মনোবিদ্যা লক্ষ্য রাখে শ্রম যাহাতে **আনন্দদায়ক ও চিত্তাকর্ষক** হয়, এই বিষয়ের দিকে। উৎপাদনের প্রকার ও পরিমাণ রেখাচিত্রের (curve) সাহায্যে প্রতিফলিত করে। **কর্ম ও বিশ্রামকালের বিন্যাস** করিয়া শ্রমকুশলতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করে। আলো বাতাসের অভাব, যন্ত্রপাতির বিশৃঙ্খলা প্রভৃতি উৎপাদনের অন্তরায়গুলি দূর করে। বোনাস, চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা প্রভৃতির সাহায্যে শ্রমিককে সফল শ্রমে উৎসাহিত করে।

বৃত্তীয় পরিচালনা (Vocational Guidance) শিল্পীয় মনোবিদ্যার বিশেষ

গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। কোন্ ব্যক্তি কোন্ কাজের উপযুক্ত তাহা নির্ণয় করিয়া, নিরূপিত কাজে সেই ব্যক্তিকে উপদেশ ও নির্দেশ দানই বৃত্তীয় পরিচালনা।

প্রচার বিজ্ঞাপন (Advertisement) শিল্পীয় মনোবিদ্যার একটি কাজ। প্রচার বিজ্ঞাপন শিল্প-প্রতিষ্ঠানের জনসংযোগ যন্ত্র। ইহারই মাধ্যমে জনসাধারণ ঐ প্রতিষ্ঠান, উহার উৎপাদন এবং ঐ উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়।

অনুশীলনী (Exercise)

1. **Give a short history of the definitions of Psychology.** **(Ans : pp. 13-16)**
   (মনোবিদ্যার সংজ্ঞার ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।)
2. **Can Psychology be defined as the Science of (*a*) Soul, (*b*) Mind, (*c*) Consciousness or (*d*) Bahaviour ? Discuss.** **(Ans : pp. 16-18)**
   (ক) আত্মার, (খ) মনের, (গ) চেতনার অথবা (ঘ) চেষ্টিতের বিদ্যারূপে মনোবিদ্যার সংজ্ঞা করা যায় কিনা আলোচনা কর।)
3. **Define Psychology after Woodworth and Stout.** **(Ans : pp. 17, 19-20)**
   (উড্ওয়ার্থ এবং স্টাউট-কৃত মনোবিদ্যার সংজ্ঞা বুঝাইয়া দাও।)
4. What, according to you, is the proper definition of psychology ? Give reasons for your answer. (Ans : pp. 19-20)
   মনোবিদ্যার গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা কি ? উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দেখাও।)
5. How does Mc Dougall Define psychology ? Is this definition different from that of the behaviourist ? (Ans : 17-18)
   (ম্যাক্ডুগ্যাল মনোবিদ্যার কিরূপ সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন ? এই সংজ্ঞার সহিত চেষ্টিতবাদীর সংজ্ঞার পার্থক্য আছে কি ?)
6. How do Gestalt and personalistic psychology define psychology ? Examine these definitions. (Ans : pp. 18-19)
   (গেস্টাল্ট এবং অস্মিতা মনোবিদ্যা কিরূপে মনোবিদ্যার সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছে ? এই সংজ্ঞা দুইটি বিচার কর।)
7. Define the scope of Psychology. Can Psychology he called the science of sciences ? (Ans : pp. 21-23)

(মনোবিদ্যার ক্ষেত্র নির্দেশ কর। মনোবিদ্যাকে সকল বিজ্ঞানের বিজ্ঞান বলা যায় কি ?)

8. Write notes on (*a*) Child psychology ; (*b*) Experimental Psychology ; (*c*) Physiological psychology ; (*d*) Abnomal Psychology ; (*e*) Educational psychology and (*f*) Industrial psychology. (Ans : pp. 24-30)

সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর :—

(ক) শিশু মনোবিদ্যা ; (খ) প্রায়োগিক মনোবিদ্যা ; (গ) শারীরবৃত্তীয় মনোবিদ্যা; (ঘ) অস্বভাবী মনোবিদ্যা ; (ঙ) শিক্ষা মনোবিদ্যা এবং (চ) শিল্পীয় মনোবিদ্যা ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মনোবিদ্যার পদ্ধতি

(Methods of Psychology)

১। ভূমিকা

(Introduction)

বিজ্ঞান পদ্ধতিনিষ্ঠ (Methodical)। নির্দিষ্ট পদ্ধতি ছাড়া কোনো বিজ্ঞানই অগ্রসর হইতে পারে না। বিজ্ঞান হিসাবে মনোবিদ্যারও একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি আবশ্যক। কিন্তু মনোবিদ্যার পদ্ধতি বিষয়ে মনোবিদ্‌গণের মধ্যে গুরুতর মতভেদ রহিয়াছে।

কেহ কেহ বলেন যে **অন্তর্দর্শনই** মনোবিদ্যার পদ্ধতি। আবার কেহ কেহ বলেন যে অন্তর্দর্শন নিতান্ত ব্যক্তিগত (individualistic) পদ্ধতি। এই পদ্ধতি সাহায্যে কোনো সর্বজনগ্রাহ্য ফল লাভ করা যায় না, সুতরাং মনোবিদ্যা বিজ্ঞান রূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। ইঁহাদের মতে মানসবৃত্তির বহিঃপ্রকাশগুলির **পর্যবেক্ষণ** সাহায্যেই মনোবিদ্যাকে বিজ্ঞান রূপে প্রতিষ্ঠিত করা যাইতে পারে। সুতরাং **পর্যবেক্ষণই মনোবিদ্যার অনুসরণীয় পদ্ধতি।**

তৃতীয় মতাবলম্বী মনোবিদ্‌গণ বলেন যে মনোবিদ্যার পদ্ধতি শুধু অন্তর্দর্শন বা শুধু পর্যবেক্ষণ নয়। **পর্যবেক্ষণের সহিত যুক্ত অন্তর্দর্শন** ইহার **আদর্শ পদ্ধতি**। এই পদ্ধতিই প্রকৃত **প্রায়োগিক পদ্ধতি** (Experimental method) এবং ইহার সাহায্যেই মনোবিদ্যা প্রায়োগিক বিদ্যায় উন্নীত হয়।

কোনো কোনো মনোবিদ্‌ বলেন যে **জনি পদ্ধতি** বা বিবর্তনমূলক (Genetic Method) পদ্ধতি মনোবিদ্যার অবলম্বন। মনকে জানিতে হইবে উহার **ক্রমবিকাশ** লক্ষ্য করিয়া। কিরূপে একটি মানসবৃত্তি বিভিন্ন ক্রমবিকাশের স্তর অতিক্রম করিয়া পরিণত অবস্থায় উপনীত হয়, এই ধারাবাহিক বিকাশ লক্ষ্য করিবার পদ্ধতিই মনোবিদ্যার অনুসরণ করা উচিত। এই পদ্ধতিতে বিভিন্ন মানস উপাদানগুলির বিশ্লেষণ (analysis) করিতে হয়। সুতরাং বিবর্তন পদ্ধতির আনুষঙ্গিক **বিশ্লেষণ পদ্ধতিই** (analytical method) মনোবিদ্যার অভিপ্রেত। আবার মনের ক্রম-বিকাশকে বিশ্লেষণ করিতে হইলে পশুর মনের সহিত শিশুর মন এবং শিশুর মনের

সহিত শিশুর মন এবং শিশুর মনের সহিত পরিণত মনের তুলনামূলক আলোচনা করিতে হয়। সুতরাং কাহারও কাহারও মতে **তুলনামূলক পদ্ধতিকেই** **(Comparative Method)** মনোবিদ্যার অনুসরণ করা উচিত।

মানসবৃত্তির দুইটি দিক

মানসবৃত্তির **দুইটি দিক**। প্রথমটি উহার **অন্তর্মুখী** বা অনুভবগম্য দিক্। শুধু জ্ঞাতা বা **পাত্র** (subject), অর্থাৎ যাহার মানসবৃত্তি অনুসন্ধানের বিষয় সেই ব্যক্তিই, ইহার এই অন্তর্মুখী দিকটি সাক্ষাৎভাবে জানিতে পারে। দ্বিতীয়টি মানসবৃত্তির **বহিঃপ্রকাশিত** দিক্। পাত্র বা জ্ঞাতা মানসবৃত্তির এই দিকটি অনুসন্ধান করিতে পারে না। ইহা জানিতে পারে অপর কোনো **পর্যবেক্ষক ব্যক্তি** (observer), যাহার পক্ষে অন্তর্মুখী বা অনুভবগম্য রূপটি জানা সম্ভব নয়।

২। পর্যবেক্ষণ বা বহির্দর্শন পদ্ধতি
(Observation or Extrospection)

মনের বহিঃপ্রকাশিত রূপটি পাত্রের অন্তর্দর্শনে ধরা পড়ে না। ইহা জানিবার উপায় একমাত্র পর্যবেক্ষণ। **মনের বৃত্তিগুলির বহিঃপ্রকাশ (external manifestation) দেখিয়া উহাদিগকে জানিবার পদ্ধতিকে মনোবিদ্যায় পর্যবেক্ষণ বা বহির্দর্শন** বলে। হাসি, গান, নাচ, হাততালি প্রভৃতি দেখিয়া সুখবোধের জ্ঞান হয়। কান্না, আকুলি-ব্যাকুলি, কপাল চাপড়ানো প্রভৃতি পর্যবেক্ষণ করিয়া দুঃখানুভূতি হইয়াছে বলিয়া বুঝা যায়। আরক্ত চক্ষু, দন্তে দন্তে ঘর্ষণ, আস্তিন গুটাইয়া ঘুষি মারিতে যাওয়া প্রভৃতি বহিঃপ্রকাশ পর্যবেক্ষণ করিয়া ক্রোধের জ্ঞান হয়। পলায়ন করা, মুখচোখ ফ্যাকাশে হইয়া যাওয়া, গলা শুকাইয়া যাওয়া প্রভৃতি বহিঃপ্রকাশের পর্যবেক্ষণ ভয়ের জ্ঞাপক। গায়ে হাত বুলানো, আদর করা, চুম্বন করা, প্রভৃতি বহিঃপ্রকাশ পর্যবেক্ষণ করিলে ভালবাসা জন্মিয়াছে বলিয়া বুঝা যায়। নিশ্বাস-প্রশ্বাস, রক্তপ্রবাহ, রক্তচলাচল, নাড়ির গতি, যকৃৎ, প্লীহা প্রভৃতির ক্রিয়া পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করিলে মানসবৃত্তির জ্ঞান জন্মে। আবার গ্রন্থির রসক্ষরণ, পেশীর সঙ্কোচন-প্রসারণ প্রভৃতি শারীরিক লক্ষণ পর্যবেক্ষণ করিয়াও উহাদের সহকারী মানসবৃত্তির জ্ঞান লাভ করা যায়।

যাঁহারা অন্তর্দর্শনকে মনোবিদ্যার বিশিষ্ট পদ্ধতি বলিয়া স্বীকার করেন না, তাঁহাদের মতে পর্যবেক্ষণই মনোবিদ্যার প্রকৃত পদ্ধতি। তাঁহারা বলেন যে পর্যবেক্ষণ

সাহায্যে আমরা প্রত্যক্ষভাবেই মানসবৃত্তির জ্ঞান লাভ করি। মানসবৃত্তি এবং উহার বাহ্যপ্রকাশ আলাদা জিনিস নয়। পর্যবেক্ষণ সাহায্যে জানা যায় না এমন মন বা মানসবৃত্তি নাই। উহা থাকিলেও, বহিঃপ্রকাশই উহার একমাত্র পরিচায়ক। সুতরাং **পর্যবেক্ষণ সাহায্যে মানসবৃত্তির প্রত্যক্ষ বা সোজাসুজি জ্ঞান ঘটে**। কাহাকেও কাঁদিতে দেখা এবং তাহাকে দুঃখিত বা শোকার্ত দেখা একই বস্তু।

অপর পক্ষে সাধারণতঃ পর্যবেক্ষণ বলিতে মানসবৃত্তির প্রত্যক্ষ জ্ঞান বুঝায় না, বুঝায় উহার **পরোক্ষ জ্ঞান**। বাহ্যলক্ষণ মানসবৃত্তি নয়, কিন্তু মানসবৃত্তির প্রকাশ। আমরা বাহ্যলক্ষণ পর্যবেক্ষণ করিয়া থাকি, উহার অন্তর্নিহিত মানসবৃত্তি পর্যবেক্ষণ করি না। বাহ্যলক্ষণ প্রত্যক্ষ করিয়া আমরা অন্তর্নিহিত মানসবৃত্তির আন্দাজ করি মাত্র। কোনো ব্যক্তিকে হাসিতে বা নাচিতে দেখিয়া আমরা অনুমান করি যে ঐ ব্যক্তি সুখ অনুভব করিতেছে। আবার কোনো ব্যক্তিকে কাঁদিতে বা কপালে করাঘাত করিতে দেখিয়া আমরা মনে করি যে সে দুঃখিত হইয়াছে। সুখ-দুঃখ প্রভৃতি মানসবৃত্তির হাসি, কান্না প্রভৃতি বাহ্যপ্রকাশের পর্যবেক্ষণ পর্যবেক্ষককে নিজ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। সুতরাং অনেকটা **সাদৃশ্য বা উপমান** (analogy) ন্যায় অনুসারে পর্যবেক্ষক অনুমান করেন যে, অপর ব্যক্তি যখন তাঁহারই মত হাসিতেছে বা কাঁদিতেছে, অতএব সে তাঁহারই মত সুখ বা দুঃখ অনুভব করিতেছে। হাসি, কান্না প্রভৃতি **বাহিরের লক্ষণগুলির মিল দেখিয়া** সুখ-দুঃখ প্রভৃতি **মানসবৃত্তিরও মিল আছে,** এইরূপ অনুমানই পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির ভিত্তি।

পর্যবেক্ষণের অনুমান অংশটি স্পষ্ট ও পৃথকভাবে আমাদের মনে আসে এমন নয়। মানসবৃত্তি এবং উহার বহিঃপ্রকাশ এইরূপ অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, যে দ্বিতীয়টি দেখিয়া প্রথমটি মনে আসে। ফলে, সুখদুঃখের বহিঃপ্রকাশ দেখিয়া উহাদের যে জ্ঞান হয় তাহা প্রত্যক্ষেরই সামিল, যদিও এই প্রত্যক্ষের সহিত মানসবৃত্তি এবং উহার প্রকাশের অতীত সাহচর্যজ্ঞান অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত থাকে। একটি লোক হাসিতেছে **সুতরাং** সে সুখী, আর একজন কাঁদিতেছে, **সুতরাং** সে দুঃখিত—পর্যবেক্ষণের তথাকথিত অনুমান বা পরোক্ষ জ্ঞান নিশ্চয়ই এইরূপ স্পষ্ট অনুমানের আকারে উপস্থিত হয় না। একটি সুখী লোক হাসিতেছে অথবা একটি দুঃখী লোক কাঁদিতেছে—এই আকারে পর্যবেক্ষণ হয়। বহিঃপ্রকাশের পর্যবেক্ষণ এবং মানসবৃত্তির জ্ঞান দুইটি পৃথক্ অথবা বিচ্ছিন্ন মানসপ্রক্রিয়ার আকারে ঘটে না।

পর্যবেক্ষণের গণ্ডী বা পরিধি

মনের যে কোন বহিঃপ্রকাশই বহির্দর্শন বা পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির বিষয় হইতে পারে। আবার শুধু যে **ব্যষ্টিমনের** (individual mind) বহিঃপ্রকাশই পর্যবেক্ষণের বিষয়, তাহা নয়। **সমষ্টিমনের** (collective mind) নানা বহিঃপ্রকাশও ইহার বিষয় হইয়া থাকে। **শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন** প্রভৃতি উন্নত সৃষ্টিগুলি নানা বহিঃপ্রকাশে আকার লাভ করে। অবনীন্দ্রনাথের শিল্পকীর্তি, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সম্পদ, জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান সাধনা অথবা আচার্য শঙ্করের দার্শনিক চিন্তা তাঁহাদের বহিঃপ্রকাশিত সৃষ্টির মধ্য দিয়া সংরক্ষিত হইয়া আছে। এই সকল ছবি, কাব্য, আবিষ্কার, তত্ত্ব যে সকল গ্রন্থে বা কাজে আকারিত হইয়াছে সেইগুলি পর্যবেক্ষণ করিয়া স্রষ্টার মন সম্বন্ধে আমরা জ্ঞান লাভ করি। তাজমহল দেখিয়া সাজাহানের মমতাজপ্রেম বুঝি। স্বামীজীর মঠ সংগঠন দেখিয়া, তাঁহার বক্তৃতা, পত্রাবলী প্রভৃতি পাঠ করিয়া তাঁহার এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের মানসরাজ্য সম্বন্ধে ধারণা করিতে পারি। এইরূপে ব্যষ্টিমনের যে কোনো বহিঃপ্রকাশই পর্যবেক্ষণের বিষয়। যেহেতু মানুষ যাহা করে তাহাই তাহার কোনো না কোনো মানস অবস্থার পরিচায়ক, এই সকল কার্যের পর্যবেক্ষণ মনের জ্ঞান লাভে সহায়ক।

ব্যষ্টিমনের মত **সমষ্টিমনের** নানা বহিঃপ্রকাশও পর্যবেক্ষণের বিষয়। পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, জাতি প্রভৃতি সমষ্টিমনগুলির পরিচয় পাওয়া যায় উহাদের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিমনের বিভিন্ন বহিঃপ্রকাশের পর্যবেক্ষণ করিয়া। যেমন, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় রীতিনীতি, আচার-বিচার, বিধিনিষেধ, মন্দির, বিদ্যায়তন, সঙ্গীত, নৃত্য, ভাস্কর্য প্রভৃতি সমষ্টিমনেরই বহির্মুখী প্রকাশ।

সমালোচনা : পর্যবেক্ষণের গুণ (Merits of observation)

(১) মনের গতি স্বভাবতঃ **বহির্মুখী**। সুতরাং মনের বহিঃপ্রকাশ পর্যবেক্ষণ করাই মনোবিদ্যার স্বাভাবিক পদ্ধতি।

(২) নিজ মনের অন্তর্দর্শন সম্ভব হইলেও, **অপর ব্যক্তির মন** সম্বন্ধে জানিবার প্রধান পদ্ধতি হইল পর্যবেক্ষণ। বহিঃপ্রকাশ পর্যবেক্ষণ না করিয়া অপর ব্যক্তির মানসবৃত্তিতে প্রবেশ অথবা উহার অন্তর্দর্শন অসম্ভব।

(৩) অন্তর্দর্শন সাহায্যে নিজ মনের যে জ্ঞান হয় তাহা অসম্পূর্ণ। মানসবৃত্তির অনুভবগম্য বা ভিতরকার দিকটিই শুধু অন্তর্দর্শন সাহায্যে জানা যায়। অথচ মনের **অন্তর ও বাহির** না জানিলে জ্ঞান অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। বাহিরের দিকটি জানিবার

অপরিহার্য উপায় পর্যবেক্ষণ। এই উদ্দেশ্যে অপর ব্যক্তির বা পর্যবেক্ষকের সাহায্য দরকার। সুতরাং মনের সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভের জন্য অন্তর্দর্শনের মত পর্যবেক্ষণও আবশ্যক।

(৪) **অন্তর্দর্শন** সমষ্টিমনের জ্ঞানলাভে সহায়তা করে না। সমষ্টিমনের, যেমন পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, জাতি প্রভৃতির মানসিকক্রিয়া-প্রণালীর জ্ঞান লাভ করিতে হইলে উহাদের আচার-বিচার, রীতিনীতি, বিধিনিষেধ, সঙ্ঘজীবন প্রভৃতি পর্যবেক্ষণ করিতে হয়। সুতরাং **সমষ্টিমন** জানিবার প্রয়োজনীয় পদ্ধতি হইল পর্যবেক্ষণ।

(৫) **শিশুর মন** কিরূপে ক্রিয়া করে তাহা অন্তর্দর্শন সাহায্যে জানিবার উপায় নাই, কারণ শিশু নিজ মনের অন্তর্দর্শন করিতে পারে না। পর্যবেক্ষণই শিশু-মনোবিদ্যার একমাত্র পদ্ধতি। আবার **পশু মন** গবেষণা করিবারও পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ।

(৬) **জড়ধী** (idiot) ব্যক্তির বুদ্ধি গর্দভের ন্যায়। **অস্বভাবী** (abnormal) ব্যক্তির বুদ্ধিও স্বাভাবিক নয়। ইহারা নিজ মনের অন্তর্দর্শন করিতে পারে না। কিন্তু উহাদের মনের বহিঃপ্রকাশগুলির পর্যবেক্ষণ সম্ভব।

(৭) সংজ্ঞান বা চেতন মনের অন্তস্তলে একাধিক মানসস্তর রহিয়াছে, যেমন অবচেতন (subconscious) এবং নির্জ্ঞান (unconscious)। এই স্তরগুলির অন্তর্দর্শন অসম্ভব। উহাদের বাহ্য প্রকাশগুলির পর্যবেক্ষণ সম্ভব।

উপরের আলোচনা হইতে দেখা যায় যে পর্যবেক্ষণপদ্ধতি মনোবিদ্যায় একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করে।

পর্যবেক্ষণের দোষ (Defects of Observation)

পর্যবেক্ষণের উপরোক্ত গুণ থাকা সত্ত্বেও উহার দোষগুলিও উপেক্ষণীয় নয়।

(১) পর্যবেক্ষণে বিশেষ **সাবধানতা** প্রয়োজন। বাহিরের প্রকাশ বহির্দর্শন বা প্রত্যক্ষ করিয়া মনের স্বভাব ও প্রকৃতি বুঝিবার পদ্ধতিই পর্যবেক্ষণ। কিন্তু পর্যবেক্ষণলব্ধ মানসজ্ঞান **প্রায়ই ভ্রান্তিমূলক** হইয়া থাকে।

(ক) **বিভিন্ন মানসবৃত্তির বাহ্যিক প্রকাশ একই প্রকার** হইতে পারে। দুঃখের মত আনন্দেও অশ্রুমোচন ঘটিতে পারে। সুতরাং অশ্রুমোচন দেখিয়া অন্তর্নিহিত মানসবৃত্তির জ্ঞান সঠিক না হইবার সম্ভাবনা। তেমনই দৌড়ানো দেখিয়া অন্তর্নিহিত মানসবৃত্তির জ্ঞান সম্ভব নয়, কারণ ক্রোধান্ধ, ভয়ার্ত, আনন্দিত এবং শোকার্ত ব্যক্তি একই প্রকারে দৌড়াইতে পারে।

(খ) **একই মানসবৃত্তির বহিঃপ্রকাশ বিভিন্ন** অবস্থায় বিভিন্ন আকার ধারণ করিতে পারে। যেমন, সুখ অনুভূতি মানুষকে যেমন স্থির ও নিস্পন্দ করিতে পারে,

তেমনই চঞ্চল ও আত্মহারা করিতে পারে। সুতরাং বাহ্যলক্ষণ পর্যবেক্ষণ করিয়া উহার অন্তর্নিহিত মানসবৃত্তির জ্ঞানলাভ অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়।

(গ) পর্যবেক্ষণের আরও একটি গুরুতর দোষ আছে। বাহ্য প্রকাশ দেখিয়া আমরা প্রায়ই উহার অন্তর্নিহিত মানসবৃত্তি সম্বন্ধে ভুল করিয়া বসি। এই ভুল মারাত্মক হয়, যখন পর্যবেক্ষণ সাহায্যে পর্যবেক্ষক তাঁহার মনের তুলনায় ভিন্ন মনকে জানিতে চেষ্টা করেন। কোনো ব্যক্তির হাসি কপট বা ক্রূর অথবা সরল বা অমায়িক, ইহা সঠিকভাবে বুঝিতে পারা কঠিন। তাহা ছাড়া শিশুর এবং মনুষ্যেতর প্রাণীর বা পশুর আচরণের অন্তর্নিহিত মানস অবস্থা জানিতে গিয়া আমরা বিভ্রান্ত হইয়া পড়ি। ইহাদের চেষ্টিত অথবা বাহ্য প্রকাশ দেখিয়া অন্তর্নিহিত মানসবৃত্তির জ্ঞান সেই পরিমাণে ভ্রান্ত হইবার সম্ভাবনা যে পরিমাণে ইহারা পরিণত মানুষ হইতে ভিন্ন। এই সকল ক্ষেত্রে প্রায়ই **শিশুর এবং পশুর মনকে পরিণত মনুষ্যমনের মানদণ্ডে বুঝিবার চেষ্টা** হইয়া থাকে। এই দোষ পরিহার উদ্দেশ্যে **লয়েড্ মর্গান-এর সূত্র** (Lloyd Morgan's Canon) অনুসরণ করিতে হয়। সূত্রটি এই : "কোনো নিম্নতর মনের চেষ্টিত মানুষের নিম্নতর মানসবৃত্তির আলোকে ব্যাখ্যা করা। সম্ভব হইলে, উচ্চতর মানসবৃত্তির সাহায্যে উহার ব্যাখ্যা করা অনুচিত"।

(২) পর্যবেক্ষণ স্বাধীন পদ্ধতি হইতে পারে না। আসলে ইহা অন্তর্দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত। বহিঃপ্রকাশগুলি যে সকল মানসবৃত্তির প্রকাশ সেই মানসবৃত্তির সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয় না থাকিলে, উহাদের পর্যবেক্ষণ সাহায্যে মানসবৃত্তির জ্ঞান সম্ভব হয় না। হাসি যে আনন্দের অথবা কান্না যে দুঃখের বহিঃপ্রকাশ, এই জ্ঞান তাহার পক্ষেই লাভ করা সম্ভব, যাহার আনন্দের হাসি এবং দুঃখের কান্নার সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটিয়াছে। যাহার সুখ এবং দুঃখ অনুভূতি হয় নাই এবং উহাদের বাহ্যপ্রকাশ হাসি এবং কান্নার অভিজ্ঞতা ঘটে নাই, তাহার পক্ষে হাসি যে সুখের এবং কান্না যে দুঃখের বহিঃপ্রকাশ, এই জ্ঞান লাভ করা অসম্ভব। অথচ এই মানসবৃত্তিগুলির প্রত্যক্ষ পরিচয় পর্যবেক্ষণ সাহায্যে হয় না, কিন্তু হয় অন্তর্দর্শন সাহায্যে।

(৩) পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির গণ্ডী বা প্রসার ব্যাপক হইলেও, মনের কতকগুলি অবস্থার জ্ঞান ইহার গণ্ডীর বাহিরে। যেমন, মনের চেতনবৃত্তিগুলির পর্যবেক্ষণ সম্ভব। কিন্তু চেতনার অন্তস্তলে মনের গভীরতর স্তরগুলি, বিশেষ করিয়া নির্জ্ঞান স্তরের পর্যবেক্ষণ অসম্ভব। নির্জ্ঞান মনের বহিঃপ্রকাশ বিকৃত। সুতরাং বহিঃপ্রকাশের পর্যবেক্ষণ করিয়া নির্জ্ঞান মনের গবেষণা সম্ভব নয়।

৩। অন্তর্দর্শন পদ্ধতি

(Introspection or Inspection)

অন্তর্দর্শনকে মনোবিদ্যার **আসল বা মূল পদ্ধতি** (psychological method par excellence) বলা হইয়া থাকে। অন্তর্দর্শন বলিতে মানসবৃত্তির দর্শন বুঝায়। চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বাহ্য বস্তুর মত মানসবৃত্তির পর্যবেক্ষণ হয় না। মানসবৃত্তি মনে অথবা অন্তরে ঘটে বলিয়া উহাকে 'দেখিতে' অর্থাৎ প্রত্যক্ষভাবে জানিতে হয় মনে অথবা অন্তরে। এই কারণে ইহাকে বলে অন্তর্দর্শন, অন্তরবলোকন বা অন্তর্নিরীক্ষণ।

এক ব্যক্তি অপরের মানসবৃত্তি সাক্ষাৎভাবে দর্শন করিতে পারে না। পাত্র বা দ্রষ্টা স্বয়ং শুধু নিজ মানসবৃত্তির অন্তর্দর্শন করিতে পারে। এই কারণে অন্তর্দর্শনকে **পাত্রগত** (Subjective) **পদ্ধতি** বলা হয়। একটি দৃষ্টান্ত দিয়া বিষয়টি বুঝানো যাউক। পাঠক পুস্তকটি পাঠ করিতেছেন। তাঁহার মন পুস্তকপাঠে মগ্ন রহিয়াছে। হয়ত অপর কোনো ব্যক্তি পাঠককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি করিতেছেন ?" অমনি পাঠকের দৃষ্টিভঙ্গী বদলাইয়া যাইবে। এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া তিনি হয়ত বলিবেন, "আমি মনোযোগ দিয়া পুস্তকটি পাঠ করিতেছি।" পাঠকের যে দৃষ্টিভঙ্গী ইতঃপূর্বে পুস্তকরূপ বিষয়ের দিকে ছিল, তাহা এখন মোড় ফিরিয়া "মনোযোগ দেওয়া" রূপ মানসবৃত্তির দিকে ঘুরিয়াছে। এখন তাঁহার মন আর বহির্মুখী নাই, কিন্তু **অন্তর্মুখী** হইয়াছে। একটি বাহ্য বিষয় হইতে মনোযোগ ফিরাইয়া তিনি এখন "মনোযোগ দেওয়া" রূপ মানসক্রিয়ার উপর উহা নিবদ্ধ করিয়াছেন। পাঠকের প্রথম দৃষ্টিভঙ্গীটি ছিল বহির্দর্শন অথবা পর্যবেক্ষণমূলক, কিন্তু দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গীটি হইয়া দাঁড়াইল অন্তর্দর্শন বা অন্তর্নিরীক্ষণমূলক। এই দৃষ্টান্তে পাঠকের প্রথম মনোভাবটি **বিষয়গত** (Objective) কিন্তু পরবর্তী মনোভাবটি **পাত্রগত** (Subjective)। দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে মন পুস্তকরূপ মনোযোগের বিষয়ে আর নিবদ্ধ নাই, কিন্তু ঐ মানসক্রিয়ায় নিবদ্ধ হইয়াছে। এই পাত্রগত দৃষ্টিভঙ্গীই মনোবিদ্যার বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী। এই বিষয়টি পূর্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

অন্তর্দর্শনের তিনটি স্তর

মানসবৃত্তির যে কোনো প্রকারের দর্শনই অন্তর্দর্শন নয়। বৈজ্ঞানিক অন্তর্দর্শন **স্পষ্ট আত্মচেতনা** বিশেষ। স্টাউট্ বলেন, স্পষ্ট আত্মচেতনা বিকাশলাভ করে তিনটি স্তরের মধ্য দিয়া। প্রথম স্তরটিতে মানসবৃত্তি স্পষ্টভাবে আত্মসচেতন হইলেও,

উহা **নির্বিচার** (non-reflective)। স্পষ্ট আত্মচেতনার (explicit self-consciousness) দ্বিতীয় স্তরটি **সবিচার** (reflective) এবং সর্বোচ্চ স্তরটি হইল সবিচার ও **জ্ঞাননিষ্ঠ** (theoretical) স্পষ্ট আত্মচেতনা। প্রথম স্তরে মন মানসবৃত্তির বিষয় হইতে মানসবৃত্তিতে অভিমুখী হয় (transition from the objective to the subjective point of view) মাত্র। দ্বিতীয়টিতে মানসবৃত্তি সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন উদিত হয়। এই দুইটি স্তরই **প্রাগ্-বৈজ্ঞানিক** (pre-scientific) এবং স্বতঃস্ফূর্ত। **তৃতীয় স্তরটিই বৈজ্ঞানিক** অন্তর্দর্শনের স্তর। ইহা মানসবৃত্তির জ্ঞানলাভ উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়।

যে আন্তর দর্শন বৈজ্ঞানিক জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়, তাহাই বিশেষ অথবা নির্দিষ্ট অর্থে মনোবিদ্যা-সঙ্গত অন্তর্দর্শন। ইহার পূর্ববর্তী দুই প্রকারের মানসজ্ঞান সাধারণ অর্থে অন্তর্দর্শন হইলেও, মনোবিদ্যার বিশেষ অর্থে অন্তর্দর্শন নয়।

সমালোচনা : অন্তর্দর্শনের গুণ

অন্তর্দর্শন পদ্ধতির প্রধান গুণ এই যে (১) ইহাতে কোনো যন্ত্রপাতি বা **প্রয়োগশালার প্রয়োজন হয় না**। মনই অন্তর্দর্শন পদ্ধতির প্রয়োগশালা। বাহিরের অবস্থার উপর নির্ভর না করিয়াই অন্তর্দর্শন চলিতে পারে। যে কোনো সময়ে এবং স্থানে অন্তর্দর্শন পদ্ধতি সাহায্যে মানসিক বৃত্তির গবেষণাকার্য চালানো যায়। তাহা ছাড়া, এইরূপ গবেষণায় **অর্থব্যয়ের প্রয়োজন নাই**।

(২) অন্তর্দর্শন **মানসবৃত্তির অনুভবগম্য অথবা অন্তরঙ্গ স্বভাব** জানিবার একমাত্র পদ্ধতি। বহির্দর্শন বা পর্যবেক্ষণ সাহায্যে মানসবৃত্তির বহিঃপ্রকাশ জানা যায়। কিন্তু নির্দিষ্ট বহিঃপ্রকাশ যে নির্দিষ্ট মানসবৃত্তির বা অভিজ্ঞতার প্রকাশ, তাহা জানিবার একমাত্র উপায় হইল অন্তর্দর্শন। হাসি বা কান্না যে সুখ বা দুঃখ অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ, তাহা জানিতে হইলে ঐ ঐ অনুভূতির প্রত্যক্ষ জ্ঞান থাকা দরকার। এই প্রত্যক্ষ জ্ঞান শুধু অন্তর্দর্শন সাহায্যেই সম্ভব। সুখ বা দুঃখের প্রত্যক্ষ অন্তর্দর্শনলব্ধ জ্ঞান থাকিলে, উহাদের ফলই যে হাসি বা কান্না তাহা জানা যায়।

(৩) সুস্থ ও পরিণত অন্তর্দর্শন যে শুধু মানুষের মন জানিবার প্রধান উপায় তাহাই নয়। শিশু, পশু, অস্বভাবী ব্যক্তি প্রভৃতির অনুভূতি বা মানস অবস্থা জানিতে হইলেও পরোক্ষভাবে **অন্তর্দর্শনের উপর নির্ভর করিতে হয়**। ইহারা ইহাদের মানস অবস্থা অন্তর্দর্শন করিতে পারে না। কিন্তু ইহাদের মানসবৃত্তির বহিঃপ্রকাশ

দেখিয়াই পরিণত ও সুস্থ মনুষ্যমনের জ্ঞানালোকে ইহাদের মানসবৃত্তি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে হয়। ইহাদের ক্ষেত্রেও, কোন্ বহিঃপ্রকাশ কোন্ মানসবৃত্তির বহিঃপ্রকাশ, তাহা জানিতে পারা যায় অন্তর্দর্শন সাহায্যে।

সে যাহা হউক, অন্তর্দর্শন যে মনোবিদ্যায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অনেক মনোবিদই অন্তর্দর্শনকে মনোবিদ্যার শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি বলিয়াছেন।

কিন্তু অন্তর্দর্শনের গুণগুলির সঙ্গে উহার দোষগুলিও পরীক্ষা করা দরকার।

অন্তর্দর্শনের দোষ বা অসুবিধা

নিজ মনকে নিজ মানসবৃত্তির উপর নিবদ্ধ করিয়া উহাকে জানিবার পদ্ধতিই অন্তর্দর্শন। এই পদ্ধতির কতকগুলি দোষ রহিয়াছে।

(১) নিজ মনের উপর নিজ মন নিবদ্ধ করিবার অন্তর্মুখী দৃষ্টিভঙ্গী মানুষের **স্বাভাবিক দৃষ্টিভঙ্গী নয়**। মানুষের স্বাভাবিক দৃষ্টিভঙ্গী বহির্মুখী বা বিষয়গত। অর্থাৎ পর্যবেক্ষণ বা বহির্দর্শনই স্বাভাবিক পদ্ধতি এবং অন্তর্দর্শন অস্বাভাবিক।

(২) প্রত্যেক মানসবৃত্তিই কোনো না কোনো বিষয়কে অবলম্বন করিয়া ঘটে। বাহিরের বস্তু মানসবৃত্তির বিষয় হইতে পারে, যেমন "রং দেখা"-রূপ সংবেদনের বিষয় হইল বাহিরের রংটি। আবার অন্য কোনো মানসবৃত্তিও মানসবৃত্তির বিষয় হইতে পারে, যেমন সুখ বা দুঃখের অনুভূতিতে সুখদুঃখরূপ মানসবৃত্তি অনুভূতিরূপ মানসবৃত্তির বিষয়। মোটের উপর কোনো মানসবৃত্তিই সাধারণতঃ নির্বিষয় নয়। অন্তর্দর্শনে যে মানসবৃত্তির উপর মনকে নিবদ্ধ করা হয়, সেই মানসবৃত্তির বিষয় থাকা চাই। কিন্তু মনের বিষয় মানসবৃত্তি, আবার মানসবৃত্তির বিষয় অন্য কোনো মানসবৃত্তি অথবা বাহিরের বস্তু। এইরূপ অবস্থায় অন্তর্দর্শনে দুইটি বিষয়ে একই সময়ে নিবদ্ধ থাকিয়া মন **দ্বিধাবিভক্ত** (bifurcated into two halves) হইয়া পড়ে।

মনের এই **দ্বিধা বিভাগ** (bifurcation) দুই প্রকারে ঘটে। (ক) প্রথমতঃ, অন্তর্দর্শনে মানসবৃত্তিতে মনোযোগ নিবদ্ধ করিতে হয়। ইহাতে মনই জ্ঞাতা বা বিষয়ী (Subject), আবার মনই জ্ঞেয় বা বিষয় (object)। এই রূপে দুইটি ভাগে বিভক্ত হইবার ফলে মনের একত্ব (unity) নষ্ট হয়। আবার একই মন বিষয়ী ও বিষয় হওয়ায় কর্মকর্তৃ-বিরোধ ঘটে। সুতরাং অন্তর্দর্শন অসম্ভব।

(খ) অন্তর্দর্শনে মনের দ্বিধা বিভাগ আর এক প্রকারেও ঘটিয়া থাকে। মনের

বিষয় যেমন কোনো মানসবৃত্তি, আবার মানসবৃত্তির বিষয় অন্ত কোনো বস্তু। মানসবৃত্তি না থাকিলে যেমন অন্তর্দর্শন অসম্ভব, মানসবৃত্তির বিষয় না থাকিলেও তেমনই মানসবৃত্তি অসম্ভব। কোনো নির্বিষয় (objectless) মানসবৃত্তি সম্ভবতঃ ঘটে না। সুতরাং এইরূপ ক্ষেত্রে মনকে দুইটি কাজ করিতে হয়। প্রথমতঃ মানসবৃত্তি দর্শন করিতে হয় এবং দ্বিতীয়তঃ মানসবৃত্তির বিষয়ের দিকেও লক্ষ্য রাখিতে হয়। কিন্তু মনের পক্ষে এই দুইটি কাজ চালাইয়া যাওয়া সম্ভব কি না তাহাতে সন্দেহ আছে। সুতরাং এই কারণেও অন্তর্দর্শন অসম্ভব হইয়া পড়ে। মানসবৃত্তির অন্তর্দর্শন করিলে উহার বিষয় হইতে মন সরিয়া যায় এবং মানসবৃত্তি নির্বিষয় হইয়া পড়ায়, উহা বিনষ্ট হয়। আবার অন্তর্দর্শনের বিষয় মানসবৃত্তিটি নষ্ট হওয়ায়, অন্তর্দর্শন অর্থহীন এবং বিষয়হীন হইয়া যায়। অন্ত দিক দিয়া, বিষয়ের দিকে লক্ষ্য করিলে অন্তর্দর্শনের মুখ্য বিষয় যে মানসবৃত্তি, তাহা হইতে মন সরিয়া আসে। এইরূপে উভয় ক্ষেত্রেই অন্তর্দর্শন অসম্ভব হইয়া পড়ে।

(৩) তৃতীয়তঃ, অন্তর্দর্শন মনের **আসল রূপ** জানিতে পারে না। এই পদ্ধতিতে মনের যে রূপটি ধরা পড়ে সেটি উহার বিকৃত রূপ। নিয়ত পরিবর্তনশীল অথবা নিত্য প্রবহমান নদীর স্রোতের মত মনও নিরন্তর অস্থির বা চঞ্চল। গাছ, পাথর প্রভৃতি স্থূল বস্তুর মত মনের সম্মুখে মানসবৃত্তিকে নিশ্চলভাবে রাখিয়া উহা দর্শন করা সম্ভব নয়। কোনো মানসবৃত্তিই এক মুহূর্তের বেশী স্থায়ী হয় না—ঘটিবার পরক্ষণেই উহা অতীতের গর্ভে বিলীন হইয়া যায়। ফলে মানসবৃত্তির অন্তর্দর্শন অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়, কারণ মানসবৃত্তির অন্তর্দর্শন করিতে হইলে উহা ঘটিবার পরও উহাকে কিছুক্ষণ ধরিয়া রাখা দরকার।

(৪) সুতরাং অন্তর্দর্শন আসলে **পশ্চাদ্দর্শন** (retrospection) হইয়া দাঁড়ায়। মানসবৃত্তি পরিবর্তনশীল। ঘটিবার পরমুহূর্তেই ইহা বিলীন হইয়া যায়। অথচ ঘটিবার সঙ্গে সঙ্গে উহার অন্তর্দর্শন অসম্ভব এবং পরমুহূর্তে বিলীন হইয়া যায় বলিয়া তখনও ইহার অন্তর্দর্শন সম্ভব নয়। ঘটিবার পরে মিলাইয়া যাইতেছে এইরূপ অবস্থায় উহার পশ্চাদবলোকন অথবা পশ্চাদ্দর্শন সম্ভব, যেমন সবেগে ধাবমান গাড়ি দেখিতে না দেখিতেই ছুটিয়া চলিয়া যায় বলিয়া উহাকে দেখিতে হইলে পিছন ফিরিয়া দেখিতে হয়। সুতরাং যাহাকে অন্তর্দর্শন বলা হয় তাহা বস্তুতঃ পশ্চাদ্দর্শনের সামিল।

অন্তর্দর্শনে মন দ্বিধাবিভক্ত হইয়া যায়, সুতরাং অন্তর্দর্শন সম্ভব নয়—**অগাস্ট কোঁৎ** (Auguste Comte)-এর এই আপত্তির উত্তরে **জন স্টুয়ার্ট মিল** (John

Stuart Mill) বলিয়াছেন যে যদিও ঘটিবার কালে মানসবৃত্তির অন্তর্দর্শন সম্ভব নয়, কিন্তু ঘটিবার পর উহার স্মৃতি (Memory) সম্ভব। মিল্-এর এই প্রকার যুক্তি অন্তর্দর্শনকে পশ্চাদ্দর্শনে (retrospection) পরিণত করারই নামান্তর।

(৫) মিল্-এর উক্তির চূড়ান্ত রূপ দিয়াছেন অধ্যাপক উইলিয়ম্ জেম্স্। পশ্চাদ্দর্শনই যদি অন্তর্দর্শনের প্রকৃত রূপ হইয়া থাকে, তাহা হইলে অন্তর্দর্শন **শব-ব্যবচ্ছেদে** (post-mortem dissection) পরিণত হয়। **জেমস** (James) বলিয়াছেন, "শব-ব্যবচ্ছেদই মানসবৃত্তির একমাত্র পরীক্ষা।" এইরূপ আপত্তির তাৎপর্য বুঝানো যাইতেছে। কোনো মানসবৃত্তিকে উহার বর্তমান বা ঘটমান মহূর্তে অন্তর্দর্শন করা যায় না। উহা ঘটিয়া অদৃশ্য হইলে উহাকে স্মরণ করা যায় মাত্র। অর্থাৎ জীবন্ত বা বাস্তব মানসবৃত্তি আমাদের ধরাছোঁয়ার বাহিরে। এই মানসবৃত্তি অদৃশ্য হইয়া গেলেও উহা আমাদের মনে রাখিয়া যায় উহার প্রতিরূপ (image) যাহা উহার সজীব সত্তার মৃতাবশেষ মাত্র। এই মৃতাবশেষ রাখিয়া মানসবৃত্তি মরিয়া যায়। অন্তর্দর্শন বলিতে এই মৃত প্রতিরূপেরই স্মরণ এবং বিশ্লেষণ বুঝায়, সজীব মানসবৃত্তির অন্তর্দর্শন বা প্রত্যক্ষ জ্ঞান বুঝায় না। সুতরাং জীবন্ত মানসবৃত্তির অন্তর্দর্শন সম্ভব নয়, সম্ভব উহার মৃত-প্রতিরূপসত্তার অঙ্গব্যবচ্ছেদ মাত্র।

(৬) এই প্রধান আপত্তিগুলি ছাড়াও **ওয়াটসন্** (Watson) অন্তর্দর্শনের বিরুদ্ধে কয়েকটি প্রবল আপত্তি তুলিয়াছেন।

(ক) তিনি বলিয়াছেন যে অন্তর্দর্শন **পাত্রগত** (subjective) পদ্ধতি, সুতরাং উহার ফলাফল পাত্রের বা জ্ঞাতার মনেই সীমাবদ্ধ। অন্তর্দর্শন পদ্ধতি সাহায্যে আমরা এমন কোনো সিদ্ধান্তে পৌছাইতে পারি না যাহা সর্বজনগ্রাহ্য (universal) অথবা সার্বভৌম। অন্তর্দর্শন সাহায্যে লব্ধ ফলাফল সংশয়পূর্ণ।

(খ) একই সমস্যার সমাধানে অন্তর্দর্শন **বিভিন্ন** এবং অনেক সময় **পরস্পর-বিরোধী** সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। যেমন, "অপ্রতিরূপ চিন্তা" (imageless thought) সম্ভব কি না, অর্থাৎ প্রতিরূপের সাহায্য না লইয়া চিন্তা করা যায় কি না, এই প্রশ্নের অন্তর্দর্শনলব্ধ উত্তর পরস্পরবিরোধী। **টিশ্‌নার্** (Titchener) অন্তর্দর্শন পদ্ধতির সাহায্যে গবেষণা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে "অপ্রতিরূপ চিন্তা" অসম্ভব। আবার একই পদ্ধতির সাহায্য লইয়া **কুল্পে** (Kulpe) সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে "অপ্রতিরূপ চিন্তা" সম্ভব। যে অন্তর্দর্শন পদ্ধতি এইরূপ পরস্পরবিরোধী ফল উৎপন্ন করে তাহা কখনও নির্ভরযোগ্য হইতে পারে না।

(গ) অন্তর্দর্শন পদ্ধতি **অবৈজ্ঞানিক**। অন্যান্য বিজ্ঞানের অগ্রগতির মূলে রহিয়াছে উহার বিষয়গত পদ্ধতি (objective method) অথবা পর্যবেক্ষণ। পক্ষান্তরে, অন্তর্দর্শন পদ্ধতিকে আঁকড়াইয়া রাখিয়া মনোবিদ্যা বিজ্ঞান হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। সুতরাং এই পদ্ধতি মনোবিদ্যার উন্নতির অন্তরায় এবং পর্যবেক্ষণই উহার অবলম্বনীয় পদ্ধতি।

(ঘ) ব্যক্তির **বাচিক বিবরণ** (Verbal Report) অথবা উদ্দীপকের প্রতিক্রিয়ায় পাত্র যাহা বলে তাহাই মনোবৈজ্ঞানিক গবেষণার পদ্ধতি হওয়া উচিত। প্রতিক্রিয়ায় কি কি মানসবৃত্তি ঘটে তাহা ওয়াট্সন প্রভৃতি চেষ্টিতবাদীর আলোচ্য নয়, কারণ তাঁহাদের মতে নার্ভতন্ত্র হইতে পৃথক্ মন নাই। মানুষের ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া ভাষার আকারেই প্রকাশ পায়, এই ভাষা বা বাচিক বিবরণ মনোবিদ্যার পদ্ধতি।

(৭) তাহা ছাড়া কতকগুলি মানসবৃত্তি আছে যাহাদের অন্তর্দর্শন অসম্ভব। **প্রক্ষোভ বা আবেগ** (emotion) এই শ্রেণীর মানসবৃত্তি। ইহাদের অন্তর্দর্শন করিতে গেলেই ইহারা অন্তর্হিত হয়। যেমন, ক্রুদ্ধ ব্যক্তির পক্ষে তাহার ক্রোধ অন্তর্দর্শন করা অসম্ভব, কারণ (ক) ক্রোধকালে ক্রোধের অন্তর্দর্শন করিবার মত মানসিক অবস্থা সৃষ্টি করা কঠিন, যেহেতু এইরূপ অবস্থা সৃষ্টি করিতে যে **শান্ত মনোভাবের প্রয়োজন**, তাহা ক্রোধের মত চঞ্চল অবস্থার প্রতিকূল। আবার (খ) এই শান্ত মানস অবস্থা সৃষ্টি করিতে গিয়া ক্রোধ অন্তর্হিত হয় এবং অন্তর্দর্শন **বিষয়হীন** হইয়া পড়ে।

(৮) আর একটি কারণেও অন্তর্দর্শন মনোবিদ্যার সাধারণ পদ্ধতি হইতে পারে না। যেমন ইহার সাহায্যে মনুষ্যেতর প্রাণীর, শিশুর এবং অস্বভাবী মনের (abnormal mind) গবেষণা করা যায় না। মনুষ্যেতর প্রাণীর চেষ্টিত সম্বন্ধে চেতনা আছে কিনা সন্দেহ। আবার শিশু তাহার মানসবৃত্তি সম্বন্ধে চেতন হইলেও অন্তর্দর্শনক্ষম নয়। অস্বভাবী ব্যক্তিও তাহার মানসবৃত্তির অন্তর্দর্শন করিতে অক্ষম। সুতরাং অন্তর্দর্শনের ক্ষেত্র অত্যন্ত **সঙ্কীর্ণ**, কারণ, ইহা শুধু পরিণত ও স্বভাবী (normal) মানুষের মানসবৃত্তিতে প্রযোজ্য।

(৯) অন্তর্দর্শনের বিরুদ্ধে আর একটি আপত্তি এই যে ইহা শুধু **সংজ্ঞান** মানস-বৃত্তিতেই সীমাবদ্ধ এবং অবচেতন ও নির্জ্ঞান মনে অপ্রযোজ্য। মনের এই স্তরগুলির এমন চেতনা থাকে না যাহার ফলে উহাদের অন্তর্দর্শন সম্ভব হইতে পারে।

অন্তর্দর্শনের দোষ পরীক্ষা

কিন্তু অন্তর্দর্শনের বিরুদ্ধে প্রদর্শিত দোষগুলির অধিকাংশই অযৌক্তিক।

(১) বলা হইয়া থাকে যে মনের স্বাভাবিক গতি বহির্মুখী, অন্তর্দর্শন অন্তর্মুখী, সুতরাং ইহা অস্বাভাবিক পদ্ধতি। কিন্তু তরবারির দুইটি পৃষ্ঠের মত বহির্মুখী এবং অন্তর্মুখী মনেরই দুইটি দিক, যাহাদের একটি অপরটিকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। প্রত্যেক মানসবৃত্তি যেমন কোনো বস্তুকে আশ্রয় করিয়া ঘটে, তেমনই এই মানসবৃত্তির সঙ্গে থাকে উহার চেতনা।

(২) অন্তর্দর্শনের বিরুদ্ধে একটি আপত্তি এই যে ইহা মনকে দ্বিধাবিভক্ত করে। উত্তরে বলা যায় যে এই আপত্তি স্বীকার করিলে সকল প্রকার মানসজ্ঞানই অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। মনের পক্ষে নিজকে জানা একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। অন্তর্দর্শনে মনের একসঙ্গে দুইটি কাজ করিতে হয় সত্য। মন এক দিকে মানসক্রিয়ায় নিযুক্ত থাকে, অন্য দিকে মানসক্রিয়ার অন্তর্দর্শনে নিযুক্ত থাকে। আবার অন্য অর্থে মন এক দিক্ দিয়া মানসক্রিয়ায় ব্যাপৃত থাকে এবং অন্য দিক্ দিয়া মানসক্রিয়ার বিষয়েও ব্যাপৃত থাকে। প্রশ্ন এই, দুইটি ক্রিয়া করিতে গিয়া মন বিচ্ছিন্ন বা বিভক্ত হইয়া পড়ে কিনা। সাম্প্রতিক প্রায়োগিক মনোবিদ্যার (Experimental Psychology) গবেষণায় প্রমাণিত হইয়াছে যে একই সময়ে একাধিক বস্তুতে মনোনিবেশ করা যায় এবং তাহাতে মনের ঐক্যসূত্র ছিন্ন হয় না। **মায়ার্স্** (Myers) প্রভৃতি মনোবৈজ্ঞানিক দেখাইয়াছেন যে অভ্যাস ও অনুশীলনের ফলে মনকে দোলকের মত মানসবৃত্তি হইতে বিষয়ে, আবার বিষয় হইতে মানসবৃত্তিতে দ্রুতভাবে দোলানো (oscillate) যায়। সুতরাং অন্তর্দর্শনের বিরুদ্ধে মনকে **দ্বিধাবিভক্ত করিবার আপত্তি অযৌক্তিক** বলিয়া মনে হয়।

(৩) অন্তর্দর্শন বিজ্ঞানসম্মত হইলে মনের **স্বাভাবিক গতিকে ব্যাহত করে না**। অভ্যাস ও প্রস্তুতির ফলে মানসবৃত্তিকে অব্যাহত রাখিয়া উহার অন্তর্দর্শন সম্ভব।

(৪, ৫) অন্তর্দর্শন পশ্চাদ্দর্শন কিনা এবং মৃত মানসবৃত্তির শবব্যবচ্ছেদ কিনা আলোচনা করা যাউক। অন্তর্দর্শনকে যাঁহারা এই আপত্তিতে খণ্ডন করিতে চাহিয়াছেন, তাঁহারা ভাবেন নাই যে অনধিগত বিষয়ের স্মরণ হয় না। ঘটিবার কালেই যদি মানসবৃত্তির কোন চেতনা না ঘটিয়া থাকে, তবে উহাকে স্মরণ করা যায় না। এই চেতনাকে বৈজ্ঞানিক অন্তর্দর্শন বলা যায় না বটে। কিন্তু ইহাকে অবশ্যই

প্রাগ্‌বৈজ্ঞানিক অন্তর্দর্শন বলিতে হয়। সুতরাং মানসবৃত্তির পশ্চাদ্দর্শন সম্ভব হইলে উহার অন্তর্দর্শন অবশ্যই সম্ভব।

আরও বলিতে হয় যে অন্তর্দর্শন মৃত মানসবৃত্তির, অর্থাৎ মানসবৃত্তি ঘটিয়া অন্তর্হিত হইলে উহার পরিত্যক্ত প্রতিরূপের **অব্যবচ্ছেদমাত্র নয়,** কিন্তু ঘটিতেছে এমন বাস্তব মানসবৃত্তির অন্তর্দর্শনও বটে। অবশ্য এই আপত্তির স্বপক্ষে স্বীকার করিতে হয় যে এই অন্তর্দর্শন বৈজ্ঞানিক স্তরের ইচ্ছা এবং উদ্দেশ্যমূলক অন্তর্দর্শন নয়। কিন্তু ইহা যে এক প্রকারের প্রাগ্‌-বৈজ্ঞানিক অন্তর্দর্শন তাহাতে সন্দেহ নাই। দ্বিতীয়তঃ, মানসবৃত্তি নিত্যচঞ্চল হইলেও, **অভ্যাস ও অনুশীলনের ফলে,** ঘটিবার সঙ্গে সঙ্গে মানসবৃত্তিকে আংশিকভাবে দেখিয়া লওয়া যায়। আবার ভবিষ্যতে ঐ মানসবৃত্তি ঘটিবার সঙ্গে সঙ্গে উহার অন্য একটি অন্তর্দর্শন করা যাইতে পারে। এইভাবে পুনঃ পুনঃ একই মানসবৃত্তির বিভিন্ন দিক্‌ অন্তর্দর্শন করিয়া উহার একটি **সম্পূর্ণ রূপ** সংকলন করা যায়। **মানসবৃত্তির সমগ্র রূপ** একটি অন্তর্দর্শনে ধরা না পড়িলেও, ঐ বিলীয়মান বৃত্তিকে পুনঃ পুনঃ **তির্যগ্‌দৃষ্টিতে** দেখিয়া (casting sideglances) উহাকে সমগ্রভাবে জানা যাইতে পারে। অবশ্য এইরূপ অন্তর্দর্শন দীর্ঘ **অভ্যাস ও অনুশীলনসাপেক্ষ**। এই পদ্ধতিকে যত সহজ ও অনায়াসসাধ্য বলিয়া মনে করা হয়, ইহা সেইরূপ নয়। মানসবৃত্তি ঘটিবার সঙ্গে সঙ্গে উহার অন্তর্দর্শনের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হয়। তাহা ছাড়া, একই মানসবৃত্তিকে পুনঃ পুনঃ অন্তর্দর্শন করিবার ধৈর্য থাকা আবশ্যক।

(৬) **চেষ্টিতবাদী ওয়াট্‌সন** অন্তর্দর্শনের বিরুদ্ধে যে সকল আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন সেগুলিও অযৌক্তিক বলিয়া মনে হয়।

(ক) অন্তর্দর্শন **পাত্রগত** বলিয়া উহার ফল শুধু পাত্রে বা জ্ঞাতাতেই সীমাবদ্ধ থাকে, এইরূপ আক্ষেপ করা হইয়াছে। কিন্তু শুধু এক ব্যক্তিমনের অন্তর্দর্শন মনোবিদ্যার অবলম্বিত পদ্ধতি নয়। বিভিন্ন পাত্র একই প্রকারের মানসবৃত্তি অন্তর্দর্শন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের অন্তর্দর্শনলব্ধ ফলগুলি তুলনা করিয়া যে **সম্মিলিত ফল** (common results) লাভ করা যায় তাহাই অন্তর্দর্শনের ফল। সুতরাং অন্তর্দর্শন **ব্যক্তিবিশেষের খেয়াল খুশীর ব্যাপার নয়।** এই পদ্ধতি কোনো একক ব্যক্তির প্রচেষ্টায় সীমাবদ্ধ নয়। বহু মনোবিদের সমবেত প্রচেষ্টায় যথাসম্ভব সর্বজন-গ্রাহ্য সিদ্ধান্তে পৌঁছানোই অন্তর্দর্শনের লক্ষ্য।

(খ) ওয়াট্‌সন একই সমস্যার সমাধানে অন্তর্দর্শনের পরস্পরবিরুদ্ধ ফলের কথা

উল্লেখ করিয়াছেন। এই দোষটি অন্তর্দর্শনের নয়, কিন্তু **নির্দোষভাবে অন্তর্দর্শন না করিবার ফল।**

(গ) সুতরাং অন্তর্দর্শন **অবৈজ্ঞানিক** অথবা অবিশ্বাস্য এই আপত্তিও দুর্বল হইয়া পড়ে। তাহা ছাড়া অন্তর্দর্শনই একক পদ্ধতি নয়। ইহার সহিত **পর্যবেক্ষণ** মিলিত হইয়া অন্তর্দর্শনকে অনেক দোষ হইতে মুক্ত করে।

(ঘ) ওয়াট্‌সন বলিয়াছেন যে **বাচিক বিবরণই** মনোবিদ্যার অনুসরণীয় পদ্ধতি। কিন্তু বাচিক বিবরণ অন্তর্দর্শনকে একেবারে বাদ দিয়া সম্ভব হয় কিনা তাহা ভাবিবার বিষয়। পাত্র তাহার মানস অবস্থার জ্ঞানকেই বাচিক বিবরণে প্রকাশ করে এবং এই জ্ঞান **অন্তর্দর্শনসাপেক্ষ** বলিয়া মনে হয়।

(৭) **প্রক্ষোভ** প্রভৃতি মানসবৃত্তির অন্তর্দর্শন সুকঠিন সন্দেহ নাই। এই ক্ষেত্রে পশ্চাদ্দর্শনই অন্তর্দর্শনের স্থান গ্রহণ করে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এই ক্ষেত্রেও মানসিক প্রস্তুতি ও **অনুশীলনের ফলে** অন্তর্দর্শন অপেক্ষাকৃতভাবে সহজ হইতে পারে।

(৮, ৯) অন্তর্দর্শনের ক্ষেত্র যে সর্বব্যাপক নয়, তাহা ঠিক। মনুষ্যেতর প্রাণীর, শিশুর এবং অস্বভাবী ব্যক্তির মন অন্তর্দর্শন সাহায্যে গবেষণীয় নয়। কিন্তু এই সব মনের **বহির্দর্শন পরিণত মনের অন্তর্দর্শনের আলোকেই সম্ভব।** আবার অবচেতন এবং নির্জ্ঞান মনের অন্তর্দর্শন সম্ভব না হইলেও উহাদের জ্ঞান নির্ভর করে সংজ্ঞান মনের অন্তর্দর্শন-লব্ধ জ্ঞানের উপর।

৪। মিলিত অন্তর্দর্শন ও বহির্দর্শন পদ্ধতি

অন্তর্দর্শনের বিরুদ্ধে উত্থাপিত আপত্তিগুলি বহির্দর্শন বা পর্যবেক্ষণ হইতে বিচ্ছিন্ন অন্তর্দর্শনের ক্ষেত্রে আংশিকভাবে প্রযোজ্য হইলেও হইতে পারে। কিন্তু বর্তমানকালে বহির্দর্শনকে বাদ দিয়া মনোবিদ্যায় অন্তর্দর্শন পদ্ধতির প্রয়োগ হয় না বলিলেই চলে। অন্তর্দর্শন ও বহির্দর্শনের দোষগুলি হইতে উহাদের মিলিত পদ্ধতি মুক্ত। অন্তর্দর্শন ব্যক্তিকেন্দ্রিক, অথবা পাত্রের মনেই সীমাবদ্ধ। ইহা পাত্রের মানসবৃত্তির অন্তর্নিহিত বা অনুভবগম্য রূপটির সন্ধান করে। কিন্তু মানস-ক্রিয়ার যেমন একটি অন্তর্নিহিত রূপ আছে, তেমন উহার একটি বহিঃপ্রকাশিত রূপও আছে। এই দুইটি একত্রে মানসবৃত্তির সমগ্র রূপ।

অন্তর্দর্শন শুধু মানসবৃত্তির **অন্তরঙ্গ** রূপটির সহিত পরিচিত। আবার বহির্দর্শন

বা পর্যবেক্ষণ শুধু উহার **বহিরঙ্গ** রূপের জ্ঞান। সুতরাং পৃথকভাবে উহারা উভয়েই মনের একদেশদর্শী। মানসবৃত্তির সমগ্র রূপ দর্শন করিতে হইলে অন্তরঙ্গ এবং বহিরঙ্গ এই উভয় রূপেরই সন্ধান করা আবশ্যক। যেমন সুখ-অনুভূতির একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বা অন্তর্নিহিত রূপ আছে, যাহা শুধু সুখী ব্যক্তির অনুভবগম্য। কিন্তু অন্তর্নিহিত বা অনুভবগম্য দিক্‌টির সঙ্গে সঙ্গে সুখ প্রভৃতি মানসবৃত্তির কতকগুলি বহিঃপ্রকাশও ঘটে, যেমন সুখের হাসি, ধীর নিশ্বাস-প্রশ্বাস প্রভৃতি শারীর লক্ষণগুলি। এই বহিঃপ্রকাশগুলি না জানিলে সুখ, ক্রোধ প্রভৃতি মানসবৃত্তির সমগ্র রূপ জানা যায় না। আবার বহিঃপ্রকাশগুলির অন্তর্দর্শন করা যায় না, কিন্তু বহির্দর্শন করা যায় এবং অন্তর্নিহিত অনুভবগম্য রূপ বহির্দর্শন করা যায় না, কিন্তু অন্তর্দর্শন করা যায়।

দেখা যাইতেছে যে অন্তর্দর্শনের একদেশদর্শিতা সংশোধন করে বহির্দর্শন বা পর্যবেক্ষণ, আবার দ্বিতীয়টির একদেশদর্শিতা সংশোধন করে প্রথমটি—এই দুই পদ্ধতির মিলিত প্রয়োগে মানসবৃত্তির সমগ্র রূপ জানা সম্ভব হইতে পারে। অর্থাৎ অন্তর্দর্শন এবং বহির্দর্শন পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক (complementary)। সুতরাং ইহাদের মিলিত পদ্ধতিই মনোবিদ্যার পদ্ধতি।

৫। প্রায়োগিক পদ্ধতি (Experimental Method)

প্রায়োগিক পদ্ধতিই মনোবিজ্ঞার স্বীকৃত পদ্ধতি। অন্তর্দর্শন মানসক্রিয়ার মানস পর্যবেক্ষণ (internal observation, inspection), আবার পর্যবেক্ষণ উহার বহির্দর্শন (Extrospection, external observation)।

পরস্পর বিচ্ছিন্ন অন্তর্দর্শন এবং বহির্দর্শন **অসম্পূর্ণ** এবং **ত্রুটিপূর্ণ।** উভয় প্রকারের পর্যবেক্ষণই নির্ভর করে মানসবৃত্তির নিজস্ব ধারায় ঘটিবার উপর। কখন মানসবৃত্তিটি ঘটিবে, তাহার প্রতীক্ষায় নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া থাকা অন্তর্দর্শন ও বহির্দর্শন এই দুই পদ্ধতিরই সাধারণ ত্রুটি। অন্তর্দর্শন বা পর্যবেক্ষণের মানসক্রিয়াগুলি মনোবিদের ইচ্ছা বা প্রয়োজন অনুসারে ঘটে না, উহারা ঘটে উহাদের স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে। ফলে বৈজ্ঞানিক প্রয়োজন অনুসারে উহাদের গবেষণা অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। কাজেই মানসবৃত্তিগুলিকে বৈজ্ঞানিক প্রয়োজনে কৃত্রিমভাবে ঘটাইবার বা উৎপন্ন করিবার প্রয়োজন উপস্থিত হয়।

নিয়ন্ত্রণাধীন অবস্থায় (Controlled conditions) মানসবৃত্তিকে বৈজ্ঞানিক প্রয়োজনে উৎপন্ন করিয়া উহার অন্তর্দর্শন এবং বহির্দর্শনকে মনোবিজ্ঞার

প্রায়োগিক পদ্ধতি (Experimental method of Psychology) বলে। কিরূপে মানসবৃত্তির অন্তর্দর্শনলব্ধ অন্তরঙ্গ রূপকে বাদ না দিয়া নিয়ন্ত্রণাধীন অবস্থায় উহার বাহ্যরূপকে পর্যবেক্ষণ করা যায়, ইহাই মনোবিদ্যার **প্রায়োগিক পদ্ধতির আসল সমস্যা**। যে মনোবিদ্যা প্রয়োগ পদ্ধতির সাহায্যে মানসবৃত্তির গবেষণা করে তাহাকে বলে **প্রায়োগিক মনোবিদ্যা** (Experimental Psychology)। আজকাল মনোবিদ্যা বলিতে প্রায়োগিক মনোবিদ্যাই বুঝায়।

মনোবিদ্যায় প্রায়োগিক পদ্ধতি প্রয়োগের একটি উদাহরণ দিয়া উহা বিশদভাবে বুঝানোর চেষ্টা করা যাইতে পারে। যেমন একটি উদ্দীপককে কি পরিমাণে বাড়াইলে, সংবেদনরূপ প্রতিক্রিয়ার বৃদ্ধি ঠিক বোধগম্য হয়, এই হেবর-ফেক্‌নার (Weber-Fechner) সমস্যাটির সমাধানে প্রায়োগিক পদ্ধতির প্রয়োগ প্রদর্শন করা যাইতে পারে।

একটি পাঁচ কিলোগ্রাম ওজনের জিনিস হাতে দিয়া তুলিতে একটি ওজন সংবেদন হয়। পাঁচ কিলোগ্রামের জিনিসটিকে এক গ্রাম বাড়াইলে ওজন সংবেদনের ঠিক বোধগম্য বৃদ্ধি ঘটে না। উহাকে একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় বাড়াইলেই ঠিক বোধগম্য ওজন সংবেদন বৃদ্ধি ঘটে।

প্রয়োগকর্তা ও পাত্র

মনোবিদ্যার প্রায়োগিক পদ্ধতিতে সাধারণতঃ কমপক্ষে দুই ব্যক্তির সহযোগিতা আবশ্যক। মনোবিদ্ স্বয়ং **প্রয়োগকর্তা** বা পর্যবেক্ষক (observer, experimenter) এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি, যাঁহার মানসবৃত্তি গবেষণার বিষয়, তিনি **পাত্র** (subject)। দ্বিতীয় ব্যক্তিকে বিষয়ও (object) বলা হয়, কারণ তাঁহার মনই প্রায়োগিক পর্যবেক্ষণের বিষয়।

প্রয়োগকর্তা বা পর্যবেক্ষকের কি কি **করণীয়** দেখা যাউক।

(ক) প্রয়োগকর্তা প্রয়োগের অবস্থাগুলি প্রয়োজনমত তৈয়ারী করেন বা সাজান। তিনি প্রয়োগশালার পারিপার্শ্বিক অবস্থাগুলি আয়ত্তে লইয়া আসেন—যেমন উপযুক্ত আলোক, তাপ প্রভৃতি, পাত্রের বসিবার আরামদায়ক স্থান, প্রয়োগের যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য উপকরণ প্রভৃতির ব্যবস্থা করেন—এবং পাত্র যাহাতে স্বচ্ছন্দভাবে এবং আরামে প্রয়োগ গ্রহণ করিতে পারে তাহার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করেন।

(খ) তিনি পাত্রকে বুঝাইয়া দেন তাহার করণীয় কি। যেমন উদ্দীপক উপস্থাপিত হওয়া মাত্র তাহার কিরূপে প্রতিক্রিয়া করিতে হইবে এবং প্রতিক্রিয়ার

পূর্ববর্তী (fore-period), মধ্যবর্তী (mid-period) এবং পরবর্তী (after-period) কালে তাহার মানস অবস্থার অন্তর্দর্শন বিবরণ (introspective report) দিতে হইবে। [যেমন প্রতিক্রিয়ার পূর্ববর্তীকালে প্রতিক্রিয়া করিবার প্রস্তুতি (readiness), তাহার জন্য মনোযোগ (attention) প্রভৃতি মানসিক অবস্থা ঘটিয়া থাকে। আবার উহার মধ্যবর্তীকালে অর্থাৎ প্রতিক্রিয়া করিবার সময় এবং প্রতিক্রিয়া সম্পন্ন হইবার পরবর্তী সময়েও পাত্রের বিভিন্ন মানসিক ব্যাপার ঘটে।]

(গ) প্রয়োগকর্তার আর একটি করণীয় রহিয়াছে, যাহা পাত্রের পক্ষে করা সম্ভব হইতে পারে না। তিনি পর্যবেক্ষণ করিবেন প্রতিক্রিয়ার বিভিন্ন কালে পাত্রের বহিঃপ্রকাশগুলি।

(ঘ) সর্বশেষে প্রয়োগকর্তার প্রধান কাজ হইল পাত্রের অন্তর্দর্শন এবং তাঁহার নিজ পর্যবেক্ষণ বিবরণের ভিত্তিতে কি কি ফল বা সিদ্ধান্ত বাহির করা যায় তাহা সঠিকভাবে নির্ণয় করা। এই উদ্দেশ্যে তাঁহাকে নানাপ্রকার **পরিসংখ্যান পদ্ধতির** (statistical method) সাহায্য লইতে হয়।

আবার **পাত্রের কর্তব্য** হইল (ক) স্বচ্ছন্দে ও আরামে আসন গ্রহণ করা, (খ প্রয়োগকর্তার সহিত সহযোগিতা করা, (গ) তাঁহার নির্দেশ এবং উপদেশ ভাল করিয়া বুঝিয়া তদনুসারে উপস্থাপিত উদ্দীপকের সাড়া দেওয়া বা প্রতিক্রিয়া করা এবং (ঘ) প্রয়োগ শেষ হইবার পর প্রতিক্রিয়ার বিভিন্ন কালে নিজ অভিজ্ঞতার বা মানস বৃত্তির অন্তর্দর্শন বিবরণ লিপিবদ্ধ করা। প্রয়োগকর্তা বা পর্যবেক্ষক এবং পাত্রের সহযোগিতায় মানসক্রিয়ার অন্তর্নিহিত এবং বহিঃপ্রকাশিত এই দুইটি দিকই বুঝিতে পারা যায়। প্রয়োগকর্তা পাত্রের বহিঃপ্রকাশগুলি পর্যবেক্ষণ করেন এবং পাত্র স্বয়ং তাঁহার মানসবৃত্তি বা অভিজ্ঞতার প্রতি মনোনিবেশ করেন। ফলে মানসবৃত্তির একটি **পূর্ণাঙ্গ পরিচয়** পাওয়া যায়।

প্রায়োগিক পদ্ধতির অসুবিধা

মনোবিদ্যায় প্রায়োগিক পদ্ধতির প্রয়োগ সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। এই পদ্ধতির মনোবৈজ্ঞানিক প্রয়োগে কতকগুলি **অসুবিধার** সম্মুখীন হইতে হয়।

(ক) মানসবৃত্তি নিত্য **চঞ্চল**। স্থূল বস্তুর মত উহাকে **নিশ্চল** করিয়া রাখা যায় না। অথচ প্রয়োগকালে পরীক্ষণীয় মানসবৃত্তিকে নিশ্চল রাখিতে না পারিলে উহার পরীক্ষা-নিরীক্ষা অসম্ভব। এই কারণে মনোবিদ্যায় প্রয়োগ পদ্ধতি কঠিন অসুবিধার সম্মুখীন হয়।

(খ) প্রয়োগের এবং প্রয়োগশালার **কৃত্রিম পরিবেশে** মনের স্বাভাবিক ক্রিয়া ব্যাহত হইতে পারে। কাজেই পরীক্ষণীয় মানসবৃত্তিগুলি **বিকৃত** হইবার সম্ভাবনা থাকিয়া যায়। ফলে, মনোবিদ্ প্রয়োগশালায় মনের প্রকৃত রূপ জানিতে পারেন কিনা তাহাতে সন্দেহ থাকে।

(গ) পাত্র হয়ত প্রয়োগকর্তাকে **খুশী** করিবার জন্য প্রয়োগকর্তার অভীপ্সিত প্রতিক্রিয়া এবং উহার অন্তর্দর্শন করিতে পারেন। প্রয়োগকর্তাও পাত্রকে তাঁহার বাঞ্ছিত সিদ্ধান্তের যন্ত্রহিসাবে ব্যবহার করিতে পারেন। এইরূপ অবস্থায় প্রয়োগের মূল উদ্দেশ্যই **ব্যর্থ** হইয়া যায়।

(ঘ) সর্বোপরি এমন কতকগুলি মানসবৃত্তি আছে যাহাদের উপর প্রয়োগপদ্ধতি প্রায় **অচল**। এই মানসবৃত্তিগুলি প্রয়োগশালার কৃত্রিম পরিবেশে, এমন কি উহাদের পরীক্ষা করিতে গেলেই, বিকৃত হয় অথবা একেবারে মিলাইয়া যায়। আবেগ বা প্রক্ষোভ এই শ্রেণীর মানসবৃত্তি। যেমন **ক্রোধ** প্রক্ষোভের পরীক্ষা এবং অন্তর্দর্শন করিবার উপক্রম করিলেই উহা শান্ত হইয়া যায়।

(ঙ) প্রায়োগিক পদ্ধতির অপরিহার্য অঙ্গ অন্তর্দর্শন। সুতরাং অন্তর্দর্শনের অসুবিধাগুলিও প্রায়োগিক পদ্ধতিকে বিড়ম্বিত করে।

অসুবিধার প্রতিকার

উত্তরে বলিতে হয় যে প্রয়োগ-পদ্ধতির অনেক অসুবিধা আছে সত্য, কিন্তু প্রায়োগিক মনোবিদ্যা এই অসুবিধাগুলি অনেকাংশে নিজ আয়ত্তে আনিতে পারিয়াছে।

(ক) মানসবৃত্তি চঞ্চল হইলেও, উহা একবার ঘটিয়াই শেষ হইয়া যায় না, প্রয়োজন মত এবং নিয়ন্ত্রণাধীন অবস্থায় উহার পুনরুৎপাদন সম্ভব। একই মানসবৃত্তিকে বারংবার উৎপন্ন করিয়া পরীক্ষার ফলে, উহার চঞ্চলতা সত্ত্বেও, উহাকে জানা যাইতে পারে।

(খ) আবার প্রয়োগের কৃত্রিম পরিবেশ স্বাভাবিক করিবার চেষ্টায়ও মনোবিদ্যার ত্রুটি নাই। পাত্র যাহাতে স্বচ্ছন্দে ও সুস্থ মনে প্রয়োগে অংশ গ্রহণ করিতে পারেন সেদিকে সযত্ন লক্ষ্য রাখিয়াই প্রয়োগে অগ্রসর হইতে হয়। সুতরাং মানসবৃত্তির বিকৃতির অসুবিধাটিও অনেকাংশে দূর করা যাইতে পারে।

(গ) উপরন্তু, পাত্রকে প্রয়োগ সম্বন্ধে এমনভাবে সুশিক্ষিত করা যায়, যাহার

ফলে তাঁহার মধ্যে প্রায়োগিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়িয়া ওঠে। এই দৃষ্টিভঙ্গী গড়িয়া উঠিলে, পাত্র তাঁহার প্রতিক্রিয়া এবং অন্তর্দর্শন যথাযথভাবে করিতে পারেন এবং প্রয়োগ-কর্তার অভীপ্সিত প্রতিক্রিয়া করিয়া তাঁহার মনোরঞ্জনে সচেষ্ট হন না। তাহা ছাড়া, একটি মাত্র পাত্রের উপর একটি মাত্র প্রয়োগ করিয়াই প্রয়োগকর্তা নিরস্ত হন না। তিনি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পাত্রের উপর অসংখ্য প্রয়োগ করিয়া মনোবৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে পৌছাইতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। কাজেই পাত্রকে ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত স্থাপনের যন্ত্ররূপে ব্যবহারের সম্ভাবনা কমিয়া যায়।

(ঘ) প্রক্ষোভ প্রভৃতি মানসবৃত্তি মনোবৈজ্ঞানিক প্রয়োগে অসুবিধা সৃষ্টি করে সত্য। কিন্তু এই অসুবিধা দূর করিবার চেষ্টায় মনোবিদের বিরাম নাই। পাত্রকে পরীক্ষা করিবার অভিপ্রায় না জানাইয়া, তাহার ক্রোধ বা অন্য প্রক্ষোভ নিয়ন্ত্রণাধীন অবস্থায় উৎপন্ন করা যাইতে পারে। তদুপরি, পাত্রকে এমনভাবে শিক্ষা দেওয়া যায়, যাহার ফলে তিনি প্রক্ষোভের অন্তর্দর্শন, অথবা উহা সম্ভব না হইলে, পশ্চাদ্দর্শন করিতে পারেন।

(ঙ) অন্তর্দর্শনের অসুবিধাগুলি দুরতিক্রম্য হইলেও অনতিক্রম্য নয়। অন্তর্দর্শন আলোচনায় ইহা দেখানো হইয়াছে।

প্রায়োগিক পদ্ধতির গুণ বা সুবিধা

প্রয়োগিক পদ্ধতির প্রধান গুণ অথবা সুবিধা এই যে, ইহা মনোবিদ্যাকে দর্শন বা তত্ত্ববিদ্যার পক্ষপুট হইতে মুক্ত করিয়া **বিজ্ঞানরূপে প্রতিষ্ঠিত** করে। এই সাধারণ গুণটি ছাড়াও প্রায়োগিক পদ্ধতির নিম্নোক্ত গুণগুলি উল্লেখ করা যাইতে পারে।

(ক) প্রায়োগিক পদ্ধতিতে মানসবৃত্তি কখন নিজ স্বভাববশে ঘটিবে, তাহার অনির্দিষ্ট প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিতে হয় না। যতবার প্রয়োজন ততবারই মানস-বৃত্তি উৎপন্ন করিয়া উহা বুঝিবার চেষ্টা করা যায়। প্রায়োগিক পদ্ধতির এই অসাধারণ গুণ বা সুবিধার জন্য মনোবিদ্যায় ইহা অপরিহার্য।

(খ) দ্বিতীয়তঃ, সকল মানসবৃত্তিই অন্যান্য মানসবৃত্তির সহিত সংশ্লিষ্ট অবস্থায় ঘটিয়া থাকে। এমতাবস্থায়, শুধু অন্তর্দর্শন বা বহির্দর্শন সাহায্যে উহাদের আসল রূপ এবং উহাদের কোন্‌টি কোন্‌টির কারণ বা কার্য তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন।

এই পদ্ধতিতে জ্ঞাতব্য মানসবৃত্তিকে উহার অসংখ্য সহকারী অবস্থা হইতে পৃথক

করিয়া দেখা যায়। ফলে মানসবৃত্তির আসল বা বিশুদ্ধ রূপটি এবং কোন্ মানসবৃত্তি কোন্ মানসবৃত্তির কারণ বা কার্য তাহা মনোবিদের নিকট ধরা পড়ে।

(গ) প্রায়োগিক পদ্ধতির সাহায্যে মানসবৃত্তির ভিতরকার এবং বাহিরের উভয় রূপই জানা যায়। ফলে উহার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় লাভ হয়। মানসবৃত্তির অন্তরঙ্গ রূপটি ধরা পড়ে পাত্রের অন্তর্দর্শনে এবং উহার বহিরঙ্গ রূপটি ধরা পড়ে প্রয়োগকর্তার পর্যবেক্ষণে। অর্থাৎ, প্রত্যেক মানসবৃত্তির দুইটি দিক থাকে, যথা মানস এবং শারীর। প্রায়োগিক পদ্ধতি মানস এবং শারীর, এই উভয় দিক গবেষণা করে।

(ঘ) এই পদ্ধতির সাহায্যে কোন্ মানসবৃত্তির সহিত কোন্ শারীর প্রকাশ ঘটে অর্থাৎ মনের সহিত শরীরের সম্বন্ধ কি, তাহা জানা যায়।

(ঙ) সর্বোপরি, প্রায়োগিক পদ্ধতির সাহায্যে আমরা এমন কতকগুলি সিদ্ধান্ত বা ফল লাভ করি, যাহাকে মাত্রিক (Quantitative) উপায়ে নির্ণয় করিয়া মনোবৈজ্ঞানিক নিয়ম আবিষ্কার করিতে পারি। গণিত ও পরিসংখ্যান সাহায্যে নির্ণীত হওয়ায়, প্রায়োগিক পদ্ধতিলব্ধ সিদ্ধান্ত সঠিক বা নিশ্চিত এবং নিখুঁত হইতে পারে। প্রায়োগিক পদ্ধতির সাহায্যেই মনোবিদ্যাকে একটি তাত্ত্বিক (theoretical) বিষয় হইতে প্রায়োগিক (experimental) বিষয়ে উন্নীত করা যায়।

৬। জনি বা বিবর্তন পদ্ধতি (Genetic Method)

উল্লিখিত পদ্ধতিগুলি মনোবিদ্যার উপাত্ত (data) বা মালমশলা সংগ্রহের সহায়ক। উহাদিগকে পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতি বলা যাইতে পারে। কিন্তু উপাত্ত বা মালমশলা সংগ্রহ করিলেই হইল না। উহাদের ব্যাখ্যা করাও দরকার। জনি বা বিবর্তন পদ্ধতি একটি **ব্যাখ্যামূলক পদ্ধতি**। ইহা মানসবৃত্তির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ব্যাখ্যা করে। সুতরাং ইহাকে মনের **পরিণাম বা বিকাশমূলক** পদ্ধতিও বলা যাইতে পারে।

মন স্থির বা অচঞ্চল সত্তা নয়। স্থির বা অচঞ্চল মন যদি বা থাকেও, তাহা মনোবিদ্যার বিষয় নয়। মনোবিদ্যা মানসক্রিয়ার বিদ্যা। বিশ্বের অন্যান্য বস্তুর মত মনও পরিণামী বা ক্রমবিকাশশীল। সাধারণ মনোবিদ্যা যে পরিণত মনের আলোচনা করে, তাহা সুদীর্ঘ পরিণাম বা বিবর্তনের ফল। সুতরাং প্রশ্ন এই, অপরিণত মন কোন্ কোন্ অবস্থা বা স্তর অতিক্রম করিয়া পরিণত অবস্থা লাভ করিয়াছে? **মনের প্রাথমিক অপরিণত অবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া উহার**

পরিণত অবস্থায় ক্রমবিকাশের আলোচনাই জনি বা বিবর্তন পদ্ধতির বিষয়।

জনি পদ্ধতির সহিত **বিশ্লেষণ পদ্ধতির** (Analytic Method) ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। পরিণত মনের বিশ্লেষণ করিয়া উহার ক্রমবিকাশের ধারা বুঝিবার চেষ্টাই জনি পদ্ধতির উদ্দেশ্য। **ওয়ার্ড্** (Ward), **ম্যাক্ডুগ্যাল্** (McDougall) প্রভৃতি মনোবিদ্ এই উভয় পদ্ধতির মিলিত পদ্ধতিতে মনোবিদ্যার আলোচনা করিয়াছেন। যে মনোবিদ্যা এই পদ্ধতির সাহায্যে মনের আলোচনা করে তাহাকে **বিবর্তন বা জনি মনোবিদ্যা** (Genetic Psychology) বলা হয়। এই পদ্ধতিটি শিশু মনোবিদ্যায় (Child Psychology) বিশেষভাবে প্রযোজ্য, কারণ মনের ক্রমপরিণতি বুঝিতে হইলে শিশুর অপরিণত মন হইতে অনুসন্ধান আরম্ভ করা আবশ্যক।

জনি পদ্ধতি মন সম্বন্ধে যে সকল তথ্য এবং সূত্র উপস্থিত করে সেইগুলি এই। (ক) মন নিয়ত **পরিবর্তনশীল**। মানসবৃত্তি এক মুহূর্তও স্থির হইয়া থাকে না। (খ) একটি মানসবৃত্তির সহিত অপরটির **ধারাবাহিকতা** (continuity) আছে। মানসবৃত্তিগুলির মধ্যে ছেদ বা ব্যবধান নাই। ইহারা **একরূপতা** (uniformity) এবং **কার্যকারণসূত্র** (Law of Causation) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। জনি পদ্ধতি প্রমাণ করে যে মন নিরবচ্ছেদ। (গ) ক্রমবিকাশের ধারায় প্রত্যেক পরবর্তী মানসবৃত্তি, উহার পূর্ববর্তী মানসবৃত্তির সহিত ধারাবাহিক হইলেও, উহা একটি **নূতন** মানসবৃত্তি। যেমন সংবেদনের সহিত প্রত্যক্ষের ধারাবাহিকতা থাকিলেও, প্রথমটির তুলনায় দ্বিতীয়টি নূতন।

(ঘ) জনি পদ্ধতি মানসবৃত্তির ক্রমবিকাশ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া অপেক্ষাকৃত সহজ অথবা সরল মানসবৃত্তি হইতে অপেক্ষাকৃত **জটিল** মানসবৃত্তিকে পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী রূপে সাজাইয়া ফেলে। যেমন, জ্ঞান কোন্ কোন্ সহজতর মানস অবস্থার ক্রমিক পরিণতি? সংবেদন (Sensation) জ্ঞানের সহজতম বা নিম্নতম স্তর, কারণ জ্ঞানের মৌলিক উপাদান শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, যাহা সংবেদন সাহায্যে সংগৃহীত হয়। আবার প্রত্যক্ষ, স্মৃতি, কল্পনা, অবধারণ এবং অনুমান পূর্বাপর ক্রমে একটি অপরটির সহজতর অবস্থা।

শিশু মনোবিদ্যায় এই পদ্ধতির বিশেষ প্রয়োগ হইয়া থাকে। শিশুমনের আরম্ভ এবং ক্রমবিকাশ ইহার আলোচ্য। এই পদ্ধতি শিশুমন সম্বন্ধে নিম্ন-প্রকার

প্রশ্ন উত্থাপন এবং আলোচনা করে। শিশুর কোন্ কোন্ মানসবৃত্তি **বংশগত** (hereditary) অথবা **সহজাত** (native, innate)? **পরিবেশ** (environment) শিশুমনের বিকাশে কি প্রভাব বিস্তার করে? শিশুর আচরণ বা চেষ্টিত কি সহজ প্রবৃত্তি (instinct) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, অথবা অর্জিত (acquired) এবং বুদ্ধির দ্বারা অল্লাধিক পরিমাণে প্রভাবিত? বুদ্ধির প্রকৃতি কি? বুদ্ধি কি উপায়ে নির্ণয় করা যায়? বুদ্ধি অথবা নীতিবোধের অল্পতা কি কি উপায়ে দূর করা যায়? সামাজিক বোধ কিভাবে বিকাশ লাভ করে?

বিবর্তন বা জনি পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া **শিশুর মানসবিকাশের স্তরগুলিকে** কয়েকটি খণ্ডে (period) ভাগ করা যায়। জন্ম হইতে প্রায় দেড় বৎসর পর্যন্ত অবস্থাকে বলে **অপোগণ্ড** (infancy) অবস্থা; পরবর্তী প্রায় সাড়ে তিন বৎসর পর্যন্ত স্থায়ী **শৈশব** অবস্থা (babyhood); পরবর্তী প্রায় সাত বৎসর পর্যন্ত স্থায়ী অবস্থা হইল **পূর্ব বাল্যাবস্থা** (early childhood); তারপর বারো বৎসর পর্যন্ত **পশ্চাৎ বাল্যাবস্থা** (later childhood); তৎপরবর্তী প্রায় কুড়ি বৎসর পর্যন্ত খণ্ড হইল **কৈশোর** বা নবযৌবন (adolescence)। শিশু মনোবিদ্যা ক্রমপরিণতির পরবর্তী অবস্থাগুলি আলোচনা করে না। তথাপি বলিয়া রাখা ভাল যে, পরবর্তী অবস্থাগুলি **যৌবন** (youth) প্রায় ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত, **মধ্যবয়স** (middle age) প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পর্যন্ত, **পরিণত অবস্থা** (maturity) প্রায় ষাট বৎসর পর্যন্ত, **পূর্ব বৃদ্ধবয়স** (early old age) প্রায় সত্তর বৎসর পর্যন্ত, **বৃদ্ধাবস্থা** (old age) প্রায় আশী বৎসর পর্যন্ত, **স্থবির অবস্থা** (senile age) প্রায় নব্বুই বৎসর পর্যন্ত এবং সর্বশেষে **মৃত্যু**।

জনি বা বিবর্তন পদ্ধতির সহিত **তুলনামূলক পদ্ধতির** (comparative method) ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। শিশুর মন বুঝিতে হইলে উহাকে পরিণত বা বয়স্ক ব্যক্তির মনের সহিত তুলনা করিয়া বুঝিতে হয়। আবার মনুষ্যেতর অথবা নিম্নতর প্রাণীর বা পশুর মন বুঝিতে হইলে উহাকে শিশুমনের সহিত তুলনা করিয়া বুঝিতে হয়। **পরিণত মনুষ্যমনের সহিত তুলনা করিয়া শিশুমনের এবং দ্বিতীয়টির সহিত তুলনা করিয়া নিম্নতর প্রাণিমনের জ্ঞান লাভ করিবার পদ্ধতিকে বলা হয় তুলনামূলক পদ্ধতি**। আবার যে মনোবিদ্যা এইরূপ তুলনামূলকভাবে শিশু এবং প্রাণিমন বুঝিতে চেষ্টা করে তাহাকে বলে **তুলনামূলক মনোবিদ্যা** (comparative psychology)।

জনি পদ্ধতির **গুণ** এই যে ইহা মনের সক্রিয়তা (dynamism) লক্ষ্য করে। মনের সক্রিয়তা একটি স্বীকৃত সত্য। মনের এই যথার্থরূপের উপর আলোকপাত করিয়া জনি পদ্ধতি মনোবিদ্যার সহায়তা করে।

কিন্তু জনি পদ্ধতির **দোষ** এই যে (ক) মানসবৃত্তির অন্তরালে যে মানসসত্তা থাকিতে পারে, এই পদ্ধতি তাহাতে মূল্য আরোপ করে না। অথচ **স্টাউট্** প্রভৃতি মনোবিদ্‌গণের মতে একটি মানসসত্তা স্বীকার না করিলে মনের ঐক্য এবং ধারাবাহিকতা ব্যাখ্যা করা যায় না। তাহা ছাড়া (খ) ইহা শিশুর মনকে অনেক সময় পরিণত মনের মানদণ্ডে বিচার করিয়া বসে। এই প্রকার বিচার শিশুকে বৃদ্ধে পরিণত করার নামান্তর।

কিন্তু এই অসুবিধা জনি পদ্ধতির **বৈজ্ঞানিক মূল্য** হ্রাস করে না। পরিণাম বা ক্রমবিকাশ একটি বৈজ্ঞানিক সত্য। জনি পদ্ধতি মনের ক্রমোন্নতির উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া বৈজ্ঞানিক পথই অনুসরণ করে।

অনুশীলনী (Exercise)

1. Briefly state the different methods of psychological study. (Ans : pp. 32-33)

   মনোবৈজ্ঞানিক গবেষণার বিভিন্ন পদ্ধতি সংক্ষেপে উল্লেখ কর।

2. Explain and examine the objective method of Psychology. What is its importance in psychology ? (Ans : pp. 33-37)

   মনোবিদ্যার বহির্দর্শন বা পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি আলোচনা কর। মনোবিদ্যায় উহার গুরুত্ব কি ?

3. What do you mean by the subjective method of Psychology ? Do you accept it ? Explain the reasons for your answer. (Ans : pp. 38-47)

   মনোবিদ্যার অন্তর্দর্শন পদ্ধতি কাহাকে বলে ? ইহা গ্রহণযোগ্য কিনা বুঝাইয়া দাও।

4. Is introspection possible ? If so, in what sense ? (Ans : pp. 40-47)

   অন্তর্দর্শন সম্ভব কি ? যদি সম্ভব হয়, তাহা হইলে কি অর্থে উহা সম্ভব ?

5. Is introspection possible ? Discuss the question in the context of the objections raised by Watson against introspection. (Ans : pp. 42-43 ; 45-46)

অন্তর্দর্শন সম্ভব কি? অন্তর্দর্শনের বিরুদ্ধে ওয়াট্‌সন যে আপত্তিগুলি উত্থাপন করিয়াছেন উহাদের প্রসঙ্গে প্রশ্নটির আলোচনা কর।

6. Examine the Psychological method of introspection in the light of the behaviourist's objections raised against it. (Ans : pp. 42-43 ; 45-46)

মনোবৈজ্ঞানিক অন্তর্দর্শন পদ্ধতির বিরুদ্ধে চেষ্টিতবাদীর উপস্থাপিত আপত্তিগুলির আলোকে এই পদ্ধতিটি পরীক্ষা কর।

7. What do you mean by the experimental method of Psychology ? Is it possible ? Discuss. (Ans : pp. 47-52)

মনোবিদ্যার প্রায়োগিক পদ্ধতি বলিতে কি বুঝ? ইহা সম্ভব কিনা আলোচনা কর।

8. Explain the experimental method of Psychology. What are the functions of the experimenter and the subject in a psychology experiment ? (Ans : pp 47-52)

মনোবৈজ্ঞানিক প্রয়োগপদ্ধতি ব্যাখ্যা কর। মনোবৈজ্ঞানিক প্রয়োগে প্রয়োগ-কর্তার এবং পাত্রের কাজ কি ?

9. Can the experimental method be applied to Psychology ? Explain the advantages and disadvantages of this method as applied to Psychology. (Ans : pp. 47-52)

মনোবিদ্যায় প্রায়োগিক পদ্ধতি প্রযোজ্য কি? মনোবিদ্যায় প্রযুক্ত প্রায়োগিক-পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধা আলোচনা কর।

10. Explain and illustrate the application of the experimental method to Psychology. (Ans : pp. 47-52)

উদাহরণসহ মনোবিদ্যায় প্রায়োগিক পদ্ধতির প্রয়োগ বুঝাইয়া দাও।

11. Are the objective and subjective methods of Psychology opposed to each other ? Discuss. (Ans : pp. 46-47)

বহির্দর্শন এবং অন্তর্দর্শন পদ্ধতি পরস্পরবিরোধী কিনা বুঝাইয়া দাও।

12. Write notes on : (*a*) The Genetic Method. (*b*) Verbal Report. (*c*) Comparative Psychology. (*d*) The Comparative Method, (*e*) Lloyd Morgan's Canon. (Ans : pp. 52-55 ; 37)

সংক্ষেপে লিখ : (ক) জনি পদ্ধতি, (খ) বাচিক বিবরণ, (গ) তুলনামূলক মনোবিদ্যা, (ঘ) তুলনামূলক পদ্ধতি, (ঙ) লয়েড্‌ মর্গ্যান সূত্র।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মানসজীবনের শারীর ভিত্তি

(Physiological Basis of Mental Life)

১। মানসজীবনের শারীর ভিত্তি

(ক) ভূমিকা এবং প্রমাণ (Introduction-Proofs)

সংবেদন হইতে আরম্ভ করিয়া **যুক্তি** বা **বিচার** পর্যন্ত, **অনুভূতি** হইতে আরম্ভ করিয়া **রসবোধ** পর্যন্ত এবং **স্বতঃসঞ্জাত ক্রিয়া** হইতে আরম্ভ করিয়া **ঐচ্ছিক ক্রিয়া** পর্যন্ত সকল মানসবৃত্তিরই মূল ভিত্তি শারীর গঠন এবং ক্রিয়া। যেমন **বর্ণ সংবেদন** (colour sensation), চক্ষুর সাহায্যে ঘটে। ইথরতরঙ্গ চক্ষুর বিভিন্ন অংশের মধ্য দিয়া অক্ষিপটের (Retina) **পীতবিন্দুতে** (Yellow spot) প্রতিফলিত হয়। ফলে উহার সন্নিহিত দর্শন নার্ভের (optic nerve) বহিঃপ্রান্ত উদ্দীপিত হয়। এই উদ্দীপনা নার্ভপ্রবাহের আকারে মস্তিষ্কের দৃষ্টিকেন্দ্রে (occipital lobe) বাহিত হইয়া রূপ সংবেদন উৎপন্ন করে। সুতরাং বর্ণ সংবেদন কি তাহা বুঝিতে হইলে চক্ষুর বিভিন্ন অংশগুলির গঠন এবং ক্রিয়া বুঝিতে হয়। **দর্শন নার্ভ, মস্তিষ্কের দৃষ্টিকেন্দ্র** এবং উহাদের কাজ বুঝিতে হয়।

প্রত্যেক মানসবৃত্তিই ঘটে বিশেষতঃ **কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্রের** (central nervous system) সহযোগিতায়। যুক্তি বা বিচার প্রভৃতি **উচ্চতর মানসবৃত্তিগুলিও** শরীরের সাহায্যে ঘটিয়া থাকে। **মেরুদণ্ড** (spinal cord) নিষ্ক্রিয় হইলে **প্রতিবর্ত** (reflex action) প্রভৃতি **অনৈচ্ছিক ক্রিয়া** এবং **স্বতঃক্রিয় নার্ভতন্ত্র** (autonomic nervous system) নিষ্ক্রিয় হইলে, শ্বাস-প্রশ্বাস প্রভৃতি জৈব এবং **প্রক্ষোভ** প্রভৃতি মানসক্রিয়া ব্যাহত হয়। আবার, **মস্তিষ্কের অনুষঙ্গ প্রদেশ** (association area) কার্যকরী না হইলে **স্মৃতি, কল্পনা, ধারণা, অবধারণা, বিচার** প্রভৃতি ক্রিয়াগুলি সম্ভব হয় না।

আবার সকল কর্মের **প্রেরণা** (motivation) আমাদের **জৈব প্রয়োজন,** যেমন আহার, নিদ্রা প্রভৃতি। এই সকল জৈব প্রয়োজন দেহের প্রয়োজনও বটে। অধিকন্তু বুদ্ধি, ব্যক্তিত্ব, শিক্ষণ প্রভৃতি দেহ ও মনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ককে আশ্রয় করিয়া গঠিত এবং ক্রিয়াশীল হয়। সুতরাং দেহ ও মনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

মন শরীরের উপর নির্ভরশীল। ইহার **অনেক প্রমাণ** দেওয়া যাইতে পারে।

(১) নিম্নতম প্রাণী হইতে মানুষ পর্যন্ত সকল প্রাণীর নার্ভতন্ত্র **তুলনামূলক** ভাবে **আলোচনা** করিলে দেখা যায় যে নার্ভতন্ত্রের ক্রমবিকাশের সহিত মানসিক ক্রমবিকাশের সামঞ্জস্য রহিয়াছে। যে প্রাণীর নার্ভতন্ত্র যত উন্নত, তাহার আচরণ বা চেষ্টিতও তত উন্নত।

(২) বিশেষ করিয়া **মস্তিষ্কের ক্রমিক বিকাশের সহিত বুদ্ধির ক্রমিক বিকাশ** সমান তালে অগ্রসর হয়। যেমন এমিবা, প্রটোজোয়া প্রভৃতি এককোষীয় জীবের (unicellular organism) মধ্যে বুদ্ধির ক্রিয়া নাই বলিলেই চলে এবং উহাদের কোনো মস্তিষ্ক আছে বলিয়া মনে হয় না। আবার বানর বা শিম্পাঞ্জী জাতীয় নরবানর প্রভৃতির বুদ্ধিবৃত্তি যেমন উন্নত, উহাদের মস্তিষ্কও তেমন উন্নত।

(৩) তাহা ছাড়া শরীরের ওজনের অনুপাতে **মস্তিষ্কের ওজনের উপরও বুদ্ধিবৃত্তি নির্ভরশীল** বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। মানুষের শরীরের ওজনের অনুপাতে যেমন তাহার মস্তিষ্কের ওজন অন্যান্য প্রাণী অপেক্ষা বেশী, তাহার বুদ্ধিও তেমন অন্যান্য প্রাণী অপেক্ষা বেশী। হাতীর মস্তিষ্ক মানুষের মস্তিষ্কের তুলনায় ভারী হইলেও হাতীর বুদ্ধিমত্তা মানুষের তুলনায় কম, কারণ হাতীর দৈহিক ওজনের অনুপাতে মস্তিষ্কের ওজন মানুষের তুলনায় কম।

(৪) অধিকন্তু, মস্তিষ্কের কোনো প্রদেশ **রুগ্ন বা আহত** হইলে কোনো না কোনো মানসক্রিয়া ব্যাহত হয়। যথা, দর্শনকেন্দ্র বিকল হইলে দর্শন সংবেদন ক্ষতিগ্রস্ত হয়, অথবা ব্রোকা আবিষ্কৃত প্রদেশ ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বাক্‌শক্তি এবং উহার সহিত অন্যান্য অনেক শক্তি বিকল হইয়া পড়ে। মস্তিষ্ক আহত হইলে, চেতনা বিলুপ্ত হয়। মস্তিষ্ক স্বাভাবিক থাকিলে, চেতনা অব্যাহত থাকে। এই সকল যুক্তি **প্রমাণ** করে যে **শরীর মানসজীবনের মূল ভিত্তি**।

(খ) সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ (Brief Analysis)

মানসজীবনের শারীরভিত্তির প্রমাণ দেখানো হইয়াছে। এইবার উহার সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ করা হইতেছে।

(১) মানসজীবনের প্রধান শারীরভিত্তি **নার্ভতন্ত্র** (Nervous System), বিশেষ করিয়া **কেন্দ্রীয় (Central) নার্ভতন্ত্র**। আবার কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্রের প্রধান অংশ **মস্তিষ্ক,** এবং **মেরুদণ্ড** বা **সুষুম্নাকাণ্ড**। সুতরাং মানসজীবনের শারীরভিত্তি

বুঝিতে হইলে, কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্রের গঠন এবং ক্রিয়া বুঝিতে হইবে। পরবর্তী পঞ্চম এবং ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে উক্ত দুইটি অংশ আলোচিত হইয়াছে।

সংবেদন, প্রত্যক্ষ এবং স্মৃতি, কল্পনা, চিন্তন প্রভৃতি উচ্চতর মানসক্রিয়ার মূলে রহিয়াছে **মস্তিষ্কের নিয়ন্ত্রণ**। মস্তিষ্কের **অনুষঙ্গ অঞ্চল** (Association Area) উচ্চতর মানসজীবনের কেন্দ্র। তাহা ছাড়া, দর্শন, শ্রবণ, আস্বাদন এবং ঘ্রাণ সংবেদনের কেন্দ্র মস্তিষ্কে অবস্থিত। তাই মানস জীবন-সংগ্রামে নার্ভতন্ত্রের অন্যান্য অংশগুলিকে যদি সৈনিক বলা যায়, তবে **মস্তিষ্ক এই সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক**।

আবার **প্রতিবর্ত** (Reflex action), **অভ্যাস** (Habit), **স্বতঃক্রিয়া**, (Automatic action) এবং **সহজ প্রবৃত্তির** (Instinct) কেন্দ্র অবস্থিত সুষুম্নাকাণ্ডে। গ্রন্থের **ষষ্ঠ** পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

(২) মানসজীবনের মৌলিক ক্রিয়া **সংবেদন**। সংবেদনের একক (unit) **উদ্দীপক এবং উহার প্রতিক্রিয়া** (Stimulus-response)। যে শক্তি কোনো ইন্দ্রিয়যন্ত্রের সংলগ্ন নার্ভের **বহিঃপ্রান্তকে** (Peripheral end) উত্তেজিত করে, তাহাকে **উদ্দীপক** বলে। উদ্দীপনাটি নার্ভ-প্রবাহের (nervous impulse) আকারে কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্রে অবস্থিত ঐ নার্ভের **অন্তঃপ্রান্তে** (Central end) পরিচালিত হইলে সংবেদন উৎপন্ন হয়। তাই **বহিঃপ্রান্তীয় নার্ভতন্ত্রও** মানস-জীবনের শারীরভিত্তি। এই প্রসঙ্গে গ্রন্থের **সপ্তম** পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

(৩) উপরোক্ত সংবেদনের ফলে যে সকল ক্রিয়া ঘটে, তাহা কোনো **পেশী** (Muscle) অথবা **গ্রন্থি** সক্রিয় হইবার ফল। পেশী প্রতিক্রিয়া করে কোনো **বিচলন** (movement) ঘটাইয়া। গ্রন্থির প্রতিক্রিয়া ঘটে **রসক্ষরণে** (glandular secretion)। গ্রন্থির রসক্ষরণ **প্রক্ষোভ** (Emotion), **ব্যক্তিত্ব** (Personality) এবং **বুদ্ধির** (Intelligence) উপর অসীম প্রভাব বিস্তার করে। প্রসঙ্গটি **সপ্তম** পরিচ্ছেদেই আলোচিত হইয়াছে।

(৪) অধিকন্তু পরিপাক ক্রিয়া, শ্বাসপ্রশ্বাস, রক্ত চলাচল, প্রজনন প্রভৃতি **জৈবক্রিয়া** (Vital process) মানসজীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এই সকল জৈবক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হয় **স্বতন্ত্র নার্ভতন্ত্রের** (Autonomic Nervous System) দ্বারা। এই কারণে স্বতন্ত্র নার্ভতন্ত্রও মানসজীবনের গুরুত্বপূর্ণ শারীরভিত্তি।

(৫) **ইন্দ্রিয়গুলি** বহির্বিশ্বের সহিত সংযুক্ত হইবার **দ্বার**। ইন্দ্রিয় যন্ত্রগুলির

সাহায্যেই কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্র মানসজীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। আবার ইন্দ্রিয়গুলির মাধ্যমেই মন বহির্বিশ্বের সহিত যুক্ত হয়। কাজে কাজেই মানসজীবনের শারীর-ভিত্তি হিসাবে ইন্দ্রিয়যন্ত্রগুলির (sense-organs) কার্য এবং গঠন বুঝিতে হয়। গ্রন্থের **ত্রয়োদশ** এবং **চতুর্দশ** পরিচ্ছেদে বিষয়টির আলোচনা করা হইয়াছে।

২। মনোবিদ্যায় দেহ ও মনের সম্বন্ধ

দেহ ও মনের সম্বন্ধকে কেন্দ্র করিয়া মনোবিদ্যার অনেক মতবাদ গড়িয়া উঠিয়াছে।

কোনো কোনো মনোবিদ্ মন বা চেতনার স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে মনোবিদ্যা চেষ্টিতের বিদ্যা (Science of behaviour) এবং উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়াই চেষ্টিতের একক। তাঁহারা বলেন, মনোবিদ্যায় মন বা চেতনার বালাই নাই। সুতরাং **চেষ্টিতবাদী** মনোবিদ্‌গণের পক্ষে শরীর ও মনের সম্বন্ধ আলোচনা পণ্ডশ্রম মাত্র। সাম্প্রতিক কালের চেষ্টিতবাদ-প্রভাবিত মনোবিদ্যা গ্রন্থগুলিতে এই আলোচনার স্থান নাই। কিন্তু চেষ্টিতবাদীর জড়বাদী দৃষ্টিভঙ্গীই মনোবিদ্যার একমাত্র দৃষ্টিভঙ্গী নয়। ডবলু. কে. ক্লিফোর্ড (Clifford) প্রভৃতির **মনোবাদ** (self-psychology) চেষ্টিতবাদের বিপরীত প্রতিক্রিয়া। ইঁহাদের মতে চেতনাই একমাত্র সত্য এবং জড় পদার্থও চেতন। এই মতেও দেহ-মনের সম্বন্ধ মনোবিদ্যার আলোচ্য নয়।

চরম মতবাদিগণের পক্ষে দেহ ও মনের সম্বন্ধ আলোচনা মনোবিদ্যায় অপ্রাসঙ্গিক। **অবৈজ্ঞানিক জড়বাদ** (Naive Materialism) মনকে জড়পদার্থের বিকার বলিয়া মনে করে। যকৃৎ যেমন পিত্ত নিঃসরণ করে, তেমন মস্তিষ্কও চিন্তা নিঃসরণ করে (The brain secretes thought, as the lever secretes bile) ইহাই **এপিফেনমেনালিজ্‌ম্** (Epiphenomenalism) নামধেয় জড়বাদের মত।

দেহ-মন-সম্বন্ধ বিষয়ে মতবাদের অন্ত নাই। বিশেষ করিয়া দুইটি মত মনোবিদ্যায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাভ করিয়াছে—যথা **অন্যোন্য-ক্রিয়াবাদ** অথবা মিথস্ক্রিয়াবাদ (Interactionism) এবং **সমান্তরালবাদ** (Parallelism)। সুতরাং দেহ ও মনের সম্বন্ধ বিষয়ে এই দুইটি মতের বক্তব্য আলোচনা এবং ইহাদের দোষগুণ বিচার করা বাঞ্ছনীয়।

৩। অন্যোন্যক্রিয়াবাদ (Interactionism)

দেহ ও মনের অন্যোন্যক্রিয়াশীলতা বুঝিতে হইলে, উহাদের বিশ্লেষণ অপরিহার্য হইয়া পড়ে। মন বিস্তার এবং পরিমাণহীন পদার্থ। তবে বিস্তার ও পরিমাণশীল

দেহ কিরূপে মনের উপর এবং মন কিরূপে দেহের উপর ক্রিয়া করিতে পারে? অথচ **ইহারা যে পরস্পর-ক্রিয়াশীল তাহাও অনস্বীকার্য**। সংবেদন হইতে আরম্ভ করিয়া চিন্তা প্রভৃতি উচ্চতম মানসবৃত্তি পর্যন্ত কোনটিই দেহের সাহায্য না লইয়া ঘটিতে পারে না। যেমন চক্ষু, দর্শন নার্ভ এবং মস্তিষ্কের দর্শনকেন্দ্র না থাকিলে দর্শন সংবেদন ঘটিতে পারে না। আবার মস্তিষ্কের অনুষঙ্গ এলাকা স্বাভাবিক না থাকিলে, স্মরণ, কল্পনা, চিন্তা প্রভৃতি উচ্চতর মানসবৃত্তিগুলিও ঘটিতে পারে না। সুতরাং দেহ যে ভাবেই মনের উপর, অথবা মন যে ভাবেই দেহের উপর কাজ করুক না কেন, ইহারা যে অন্যোন্যক্রিয়াশীল তাহাতে সন্দেহ নাই। ইন্দ্রিয়যন্ত্র, মেরুমজ্জা, মস্তিষ্ক এবং নার্ভতন্ত্র ক্রিয়া না করিলে, মনের ক্রিয়াগুলি সংঘটিত হইতে পারে না, এই অর্থে দেহ অবশ্যই মনের উপর ক্রিয়াশীল।

মন দেহের উপর কিভাবে ক্রিয়াশীল হইতে পারে তাহা নির্ণয় করা অপেক্ষাকৃত কঠিন। মনের বিস্তার নাই, সুতরাং দেহের সহিত ইহার কোনো স্থূল সংস্পর্শ হইতে পারে না। কিন্তু **মনুষ্যদেহের সকল ক্রিয়াই কোনো মন-বিশিষ্ট চেতন জীবের ক্রিয়া**। এই অর্থে সকল দৈহিক ক্রিয়াই যে মূলতঃ আত্মরক্ষা এবং আত্মপ্রজননমূলক দুইটি জৈবিক প্রয়োজনে সাধিত হয়, এই বিষয়ে অনেকেই একমত। সুতরাং দৈহিক ক্রিয়াগুলি শুধু উদ্দেশ্যহীন অন্ধ ঘটনাপরম্পরা নয়, কিন্তু মন ও প্রাণবিশিষ্ট জীবের প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য সাধনের সহায় বা উপায়। এই উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন সম্বন্ধে জীবের চেতনা নাও থাকিতে পারে। কিন্তু ইহা অচেতন হইলেই যে মনের সম্পূর্ণ বাহিরে, এইরূপ মনে করিবার কোনো হেতু নাই। পক্ষান্তরে ইহা অবচেতন অথবা নির্জ্ঞান মনের উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন হইতে পারে।

সুতরাং উল্লিখিত অর্থে **মন শরীরের উপর ক্রিয়াশীল**। তাহা ছাড়া, সংজ্ঞান উদ্দেশ্য বা প্রয়োজনও দৈহিক ক্রিয়ার উপর প্রভাব বিস্তার করে। সকল ঐচ্ছিক ক্রিয়াগুলিই কোনো না কোনো প্রয়োজন বা উদ্দেশ্যসাধন করিবার জন্য সম্পন্ন হয়। কাহারও বসিবার, দাঁড়াইবার, কথা বলিবার বা চিন্তা করিবার ইচ্ছা হইলে, সঙ্গে সঙ্গে এই কাজগুলি সম্পন্ন হয়।

স্টাউট্, ম্যাক্‌ডুগ্যাল প্রভৃতি মনোবিদ্‌গণ উদ্দেশ্যাভিমুখিতাকেই (Teleological determination) মানসক্রিয়ার অসাধারণ লক্ষণ বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে কোনো মানসক্রিয়াই উদ্দেশ্যহীনভাবে সম্পন্ন হয় না। যেহেতু স্বয়ংক্রিয় দৈহিক ক্রিয়াগুলি হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চতর ঐচ্ছিক ক্রিয়া পর্যন্ত সকল

দৈহিক ক্রিয়াই জীবের কোনো না কোনো উদ্দেশ্য সাধন করে, সুতরাং ইহারা মনের দ্বারা অল্পাধিক নিয়ন্ত্রিত। আবার **উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন সাধন** করিতে হইলে, **দেহের সাহায্যেই মন তাহা করিতে পারে।** সুতরাং দেহ যেমন মনের উপর ক্রিয়াশীল, তেমনই মনও দেহের উপর ক্রিয়াশীল। অর্থাৎ দেহ ও মন অন্যোন্যক্রিয়াশীল বা অন্যোন্যসাপেক্ষ। ইহাদের প্রত্যেকটি অপরটির উপর নির্ভর করে। কোনোটিই অপরটিকে বাদ দিয়া অথবা অপরটির উপর প্রতিক্রিয়া না করিয়া সক্রিয় হইতে পারে না।

তাহা হইলে দেহ-মন-সম্বন্ধ বিষয়ে **অন্যোন্যক্রিয়াবাদের বক্তব্য** এই যে (১) দেহ মনের উপর এবং মন দেহের উপর ক্রিয়া করে। দেহ মানসিক কার্য বা পরিবর্তন এবং মন দৈহিক কার্য বা পরিবর্তন উৎপন্ন করিয়া থাকে। (২) দেহের বিভিন্ন পরিবর্তন মনের বিভিন্ন পরিবর্তন ঘটায়। দেহ সুস্থ বা অসুস্থ হইলে মন, এবং মন সুস্থ বা অসুস্থ থাকিলে দেহও ঐরূপ হয়। মস্তিষ্কে আঘাতের ফলে চেতনালোপ ঘটে। দেহের নানারূপ বিশৃঙ্খল অবস্থায়, যেমন অজীর্ণে, আফিং, কোকেইন প্রভৃতি ঔষধ সেবনে, মনের পরিবর্তন সকলেই দেখিয়া থাকিবেন। প্রক্ষোভের দৈহিক পরিবর্তন, ক্রোধে মুষ্টিবদ্ধ করা বা দাঁতে দাঁত ঘষা, ভয়ে বক্ষস্পন্দন বা দেহকম্পন, দুঃখে অশ্রুবিসর্জন, সুখে হাসি প্রভৃতি অন্যোন্যক্রিয়াবাদের প্রমাণ। (৩) শারীরস্থান (Anatomy) প্রমাণ করিয়াছে কিরূপে মস্তিষ্কবিকৃতি মানসিক বিকৃতি ঘটায়। এই গবেষণায় বিভিন্ন মানসবৃত্তিগুলির মস্তিষ্ককেন্দ্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। (৪) তাহা ছাড়া, তুলনামূলক শারীরস্থান (Comparative Anatomy) প্রমাণ করিয়াছে যে দৈহিক ক্রমোন্নতির সহিত মানসিক ক্রমোন্নতির সম্বন্ধ রহিয়াছে।

সমালোচনা

অন্যোন্যক্রিয়াবাদের বিরুদ্ধে ইহার বিরোধী মনোবিদ্‌গণ নিম্নলিখিত আপত্তি তুলিয়াছেন।

(১) অন্যোন্যক্রিয়াবাদের বিরুদ্ধে একটি প্রবল **আপত্তি** এই যে **মন ও দেহ পরস্পরবিরুদ্ধ** বস্তু, সুতরাং ইহারা অন্যোন্যক্রিয়াশীল হইতে পারে না। মন চেতন, দেহ অচেতন। আবার দেহ বিস্তার ও পরিমাণশীল, কিন্তু মন বিস্তার ও পরিমাণহীন। সুতরাং ইহাদের পারস্পরিক ক্রিয়াশীলতা অযৌক্তিক।

এই আপত্তির **উত্তর** এই যে (ক) দেহ ও মনের পার্থক্য অনস্বীকার্য হইলেও, ইহাদের পরস্পরক্রিয়াশীলতাও অনস্বীকার্য। মনোবিদ্যা ঘটনানিষ্ঠ বিজ্ঞান। দেহ

ও মনের অন্যোন্যক্রিয়া একটি বাস্তব ঘটনা। এই বাস্তব ঘটনাকে স্বীকার করিয়া মনোবিদ্যা ইহার আলোচনায় অগ্রসর হয়। (খ) দেহ ও মন পৃথক হইলেও, ইহারা জীবের স্বভাবে অবিচ্ছিন্নভাবে মিলিত হইয়াছে। ইহার ফলে মন হইতে বিচ্ছিন্নভাবে দেহ এবং দেহ হইতে বিচ্ছিন্নভাবে মন কাজ করিতে পারে না। (গ) দেহ ও মনের সম্বন্ধ বিষয়ে মতগুলি মনের ক্রিয়া বুঝিবার অথবা ব্যাখ্যা করিবার সূত্র বিশেষ। যে মত স্বীকার করিলে মনের ক্রিয়া সন্তোষজনকভাবে বুঝা যায়, সেই মতই মনোবিদ্যা-সম্মত। অন্যোন্যক্রিয়াবাদ দেহ ও মনের যে সম্বন্ধ নিরূপণ করে তাহার সাহায্যে মানসবৃত্তিগুলিকে বুঝিবার চেষ্টা করা যায়। প্রত্যেক বিজ্ঞানই কতকগুলি মূলসূত্র মানিয়া লয়। মনোবিদ্যাও অন্যোন্যক্রিয়াবাদকে মূলসূত্র হিসাবে মানিয়া লইয়া বৈজ্ঞানিক গবেষণায় অগ্রসর হয়।

(২) অন্যোন্যক্রিয়াবাদের বিরুদ্ধে আর একটি প্রচলিত **আপত্তি** এই যে, ইহা পদার্থবিদ্যার **শক্তিসংরক্ষণ সূত্র** (Law of Conservation of Energy) **লঙ্ঘন করে**। শক্তির সংরক্ষণ-সূত্র অনুসারে কোনো শক্তিরই হ্রাসবৃদ্ধি নাই। একটি শক্তি আর একটি শক্তিতে রূপান্তরিত হইতে পারে, কিন্তু বিনষ্ট হইতে পারে না। যেমন পেশীয় শক্তি (muscular energy) তাড়িৎ (electrical) অথবা রাসায়নিক (chemical) শক্তিতে রূপান্তরিত হইতে পারে। বিশ্বশক্তির নানা রূপান্তরের মধ্যেও, উহার পরিমাণ অক্ষুণ্ণ থাকে, ইহা বাড়েও না, কমেও না। কিন্তু মন যদি দেহের উপর ক্রিয়া করে, তাহা হইলে মনের শক্তি মন হইতে ব্যয়িত হইয়া দেহের শক্তিতে রূপান্তরিত হয় এবং দেহের শক্তি বাড়িয়া যায়। আবার দেহ মনের উপর ক্রিয়া করিলে, দেহের শক্তি দেহ হইতে ব্যয়িত হইয়া মনের শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। উভয় ক্ষেত্রেই শক্তি-সংরক্ষণ সূত্র—অর্থাৎ বিশ্বশক্তির হ্রাসও নাই বৃদ্ধিও নাই, ইহার পরিমাণ অপরিবর্তনীয়—এই নিয়ম লঙ্ঘিত হয়। সুতরাং অন্যোন্যক্রিয়াবাদ অসমর্থনীয়।

এই আপত্তিটিও মনোবিদ্যার দিক হইতে যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয় না। অন্যোন্য-ক্রিয়াবাদ শক্তির সংরক্ষণ-সূত্রকে লঙ্ঘন করে না। (ক) শক্তির সংরক্ষণ-সূত্র পদার্থবিদ্যার সূত্র। ইহাকে জোর করিয়া মনোবিদ্যায় টানিয়া না আনাই সঙ্গত। (খ) জড়শক্তি বা দৈহিক শক্তিই পদার্থবিদ্যার শক্তিসংরক্ষণ সূত্রের লক্ষ্য—মানস শক্তি ইহার লক্ষ্য নয়। সুতরাং মনের উপর ক্রিয়ার ফলে দৈহিক শক্তি বাড়ুক কি কমিয়া যাউক, তাহাতে পদার্থবিদ্যার এই সূত্রটি ক্ষুণ্ণ হয় না। (গ) শক্তি-সংরক্ষণ

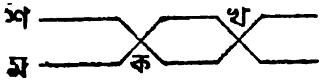
সূত্র শুধু যদি জড় বা দৈহিক শক্তিতে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া মানস বা চেতন শক্তিতেও প্রযোজ্য হয়—অবশ্য এই প্রয়োগ পদার্থবিদ্যায় অভিপ্রেত নয়—তাহা হইলেও অন্যোন্যক্রিয়াবাদ এই সূত্রের বিরোধী হয় না। শক্তি কথাটিকে এইরূপ ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করিলে শক্তির হ্রাস-বৃদ্ধি প্রসঙ্গ ওঠে না। এইরূপ ক্ষেত্রে মন দেহের উপর, অথবা দেহ মনের উপর ক্রিয়াশীল হইলে, শক্তির রূপান্তর হয় মাত্র, হ্রাসবৃদ্ধি হয় না। এই স্থলে মানসশক্তি দৈহিক শক্তিতে এবং দৈহিক শক্তি মানসশক্তিতে রূপান্তরিত হয় মাত্র, শক্তির হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে না।

৪। সমান্তরালবাদ (Parallelism)

সমান্তরালবাদ মতে মন ও দেহ—কোনটিই অপরটির উপর নির্ভরশীল নয়, অথবা কোনটিই অপরটির কারণ বা কার্য নয়। দেহ মনের উপর ক্রিয়াশীল হইয়া ইহার কার্য হিসাবে কোনো মানসবৃত্তি উৎপন্ন করে না। আবার মনও দেহের উপর ক্রিয়াশীল হইয়া ইহার কার্য হিসাবে কোন দৈহিক পরিবর্তন ঘটায় না। শরীর ও মন পরস্পরনিরপেক্ষ। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও দেহ ও মনের ক্রিয়ার মধ্যে সঙ্গতি বা মিল (correspondence) আছে, যাহার ফলে একটি অপরটির উপর নির্ভর না করিয়াও একযোগে বা সমতালে কাজ করে।

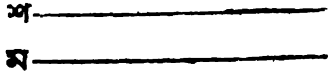
দুইটি সমান্তরাল সরলরেখার কোনোটি অপরটির উপর নির্ভর করে না, অথবা একটি আর একটিকে কোনো বিন্দুতে ছেদ করে না, অথচ উহারা সমান তালে একই দিকে অগ্রসর হয়। তেমনি দেহ, এবং মনও পরস্পরকে কোনো বিন্দুতেই ছেদ না করিয়া, কোনোটি অপরটির উপর নির্ভর না করিয়া অথবা অপরটির সহিত সংযুক্ত না হইয়া, একযোগে অগ্রসর বা পরিবর্তিত হইতে থাকে।

নিম্নে প্রদর্শিত নক্সা দুইটির সাহায্যে এই মতবাদ দুইটির মৌলিক পার্থক্য দেখানো যাইতে পারে।



২ নং চিত্র

২ নং চিত্রে 'শ' চিহ্নিত শরীর এবং 'ম' চিহ্নিত মন দুইটি সরল রেখার দ্বারা সূচিত হইয়াছে। শরীর এবং মন 'ক' এবং 'খ' ছেদবিন্দুতে পরস্পরের উপর প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন করিয়াছে।



৩ নং চিত্র

৩ নং চিত্রে 'শ' চিহ্নিত শরীর এবং 'ম' চিহ্নিত মন কোথাও পরস্পর মিলিত হয় নাই কিন্তু দুইটি সমান্তরাল সরলরেখার মত পারস্পরিক ব্যবধান বা দূরত্ব সমান রাখিয়া অগ্রসর হইয়াছে।

সমান্তরালবাদ মতে প্রত্যেক মানসবৃত্তির **সমানুপাতিক** দৈহিকবৃত্তি এবং প্রত্যেক দৈহিকবৃত্তিরও সমানুপাতিক মানসবৃত্তি থাকে। এমন কোনো দৈহিকবৃত্তি ঘটে না, যাহার সমানুপাতিক মানসবৃত্তি নাই, আবার এমন কোনো মানসবৃত্তিও ঘটে না, যাহার সমানুপাতিক দৈহিকবৃত্তি নাই। উহাদের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। অথচ উহাদের মধ্যবর্তী পার্থক্য বা ব্যবধান অক্ষুণ্ণ।

তাহা হইলে **অন্যোন্যক্রিয়াবাদের সহিত সমান্তরালবাদের পার্থক্য** সুস্পষ্ট। প্রথম মত অনুসারে দেহ ও মন পরস্পর ক্রিয়াশীল, কিন্তু দ্বিতীয় মত অনুসারে একটি আর একটির উপর ক্রিয়া না করিয়াই পারস্পরিক সঙ্গতি বজায় রাখে। সমান্তরালবাদ দেহকে মনের কারণ বা কার্য অথবা মনকে দেহের কারণ বা কার্য বলিয়া নির্দেশ করে না। এই মতানুসারে দৈহিক কারণ দৈহিক কার্যই উৎপন্ন করে এবং মানস কারণ মানস কার্যই ঘটায়, একটি অপরটির কারণ বা কার্য হয় না। প্রত্যেক মানসবৃত্তিকেই দৈহিক দিক হইতে, আবার প্রত্যেক দৈহিক অবস্থাকেই মানস দিক হইতে দেখা যায়। মানস দিক হইতে যে বেদনাকে আমরা দুঃখ এবং সুখরূপে অনুভব করি, তাহাই দৈহিক দিক হইতে ক্রন্দন বা অশ্রুবিসর্জন এবং হাসি বা নৃত্যরূপে দেখিতে পাই। অথবা (**Every psychosis has its corresponding neurosis and every neurosis has its corresponding psychosis**) প্রত্যেক মানসবৃত্তিরই সমানুপাতিক দৈহিক পরিবর্তন এবং প্রত্যেক দৈহিক পরিবর্তনেরই সমানুপাতিক মানসবৃত্তি আছে। দেহ এবং মনের প্রত্যেকটি পরিবর্তনই (**one-to-one correspondence**) সমানুপাতিক, একটি অপরটির কারণ বা কার্য না হইয়াও, সমান্তরাল বা সমানুপাতিক। কিরূপে ইহা সম্ভব, এই প্রশ্ন মনোবিদ্যার নয়, কিন্তু তত্ত্ববিদ্যার। মনোবিদ্যার বিবেচনায় ইহা শুধু সম্ভব নয়, কিন্তু বাস্তব। সমান্তরাল সম্বন্ধ স্বীকার করিলেই, মনোবিদ্যার আলোচনা বোধগম্য হয়, এই স্বীকৃতির দার্শনিক মূল্য যাহাই হউক না কেন।

সমালোচনা

(১) সমান্তরালবাদ মতে প্রত্যেক মানসবৃত্তির সমানুপাতিক দৈহিক বৃত্তি আছে। কিন্তু **প্রত্যেক মানসবৃত্তির সমান্তরাল দৈহিক বৃত্তি** থাকিলেও, উহা **নির্ণয় করা দুঃসাধ্য**। যেমন নির্জ্ঞান মানসবৃত্তির সমান্তরাল দৈহিক বৃত্তি কি? **উত্তরে** বলা যাইতে পারে যে নির্জ্ঞান মানসবৃত্তিরও দৈহিক বৃত্তি অবশ্যই আছে—ইহা মস্তিষ্কের মধ্যবর্তী কোনো অস্পষ্ট সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় অবস্থা, যেমন মস্তিষ্কীয় কোষগুলির অবিশ্রাম

স্পন্দন বা ক্রিয়া (vibration of brain-cells), অথবা মস্তিষ্কের কোনো কোনো অংশের স্থায়ী পরিবর্তন (Permanent modification)। কিন্তু এই উত্তরের বিরুদ্ধে **আপত্তি** করা যাইতে পারে যে নির্জ্ঞান মনের এই জাতীয় সমান্তরাল মস্তিষ্কীয় পরিবর্তন বা স্পন্দন কোনো যন্ত্রে ধরা পড়ে না। আবার, এই আপত্তির **বিরুদ্ধে** এবং সমান্তরালবাদের **স্বপক্ষে** বলা যাইতে পারে, নির্জ্ঞান মনের সমান্তরাল দৈহিক বৃত্তি বাহির করা বিজ্ঞানের অগ্রগতির উপর নির্ভর করে।

(২) **সকল সংজ্ঞান বৃত্তির সমান্তরাল শারীরবৃত্তি নিরূপণ করাও যে সহজ, তাহা নয়।** যেমন একটি কঠিন অঙ্ক কষিবার অথবা কোনো জটিল দার্শনিক সমস্যা সমাধান করিবার জন্য যে উচ্চ চিন্তা বা ভাবনার প্রয়োজন হয়, উহার সমান্তরাল শারীরবৃত্তি সঠিকভাবে নিরূপণ করা সম্ভব নয়।

এইরূপ আপত্তির **উত্তরও** পূর্বটির অনুরূপ। জটিল মানসবৃত্তির সমান্তরাল শারীরবৃত্তিও অবশ্যই জটিল হইবে। উহাদের শারীরভিত্তি হয়ত মস্তিষ্কের অনুষঙ্গ এলাকায় অবস্থিত।

(৩) **আকস্মিক অভিজ্ঞতায়** (Sudden experience) যে মানসবৃত্তি ক্রিয়া করে উহার সমান্তরাল শারীর অবস্থা কি তাহা নির্ণয় করাও দুঃসাধ্য। আকস্মিক অভিজ্ঞতায় উহার সমান্তরাল দৈহিক অবস্থা উৎপন্ন হইতে পারে, যদি এই দৈহিক অবস্থার কারণ হিসাবে কোনো পূর্ববর্তী দৈহিক অবস্থা থাকে।[১] অথচ আকস্মিক অভিজ্ঞতায় এমন কোনো পূর্ববর্তী দৈহিক অবস্থা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, যাহা উহার সমানুপাতিক দৈহিক অবস্থার কারণ হইতে পারে।

এই **আপত্তির উত্তর** দেওয়া যাইতে পারে, যেমন আকস্মিক মানসবৃত্তিও কোন্ পূর্ববর্তী মানসবৃত্তির কার্য, তাহা জানিতে পারা যায় না, তেমন উহার সমান্তরাল দৈহিক বৃত্তিও আকস্মিক বলিয়া, উহা কোন্ পূর্ববর্তী দৈহিক বৃত্তির কার্য, তাহা নিরূপণ করা নাও যাইতে পারে; অবশ্য ইহা হইতে এইরূপ সিদ্ধান্ত করা অনুচিত যে আকস্মিক মানস অভিজ্ঞতার এবং দৈহিক অবস্থার কোনো সমানুপাতিক কারণ নাই।

(৪) সমান্তরালবাদের বিরুদ্ধে আরও **অভিযোগ** করা হইয়াছে যে উহার

১। সমান্তরালবাদ মতে মন দেহের এবং দেহ মনের কারণ বা কার্য হইতে পারে না। প্রত্যেক পরবর্তী মানস অবস্থার কারণ উহার পূর্ববর্তী কোন মানস অবস্থা। আবার প্রত্যেক পরবর্তী দৈহিক অবস্থার কারণ উহার পূর্ববর্তী কোন শারীর অবস্থা।

পরিণতি **সর্বমানসবাদ (Panpsychism)**। প্যান্‌সাইকিজ্‌ম্‌ অনুসারে আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত সব কিছুই মন বা আত্মা। অবশ্য সমান্তরালবাদ নিশ্চয়ই বলে না যে দেহও আত্মা বা মন। এই অর্থে সমান্তরালবাদের বিরুদ্ধে সর্বমানসবাদের আপত্তি অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া মনে হয়। কিন্তু যদি প্রত্যেক দৈহিক অবস্থারই সমান্তরাল মানস অবস্থা থাকে, তবে প্রত্যেক ধূলিকণারও মন আছে, যেহেতু উহা জড় পদার্থ—এইরূপ আপত্তি অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া মনে হয় না।

উত্তরে বলা যাইতে পারে যে এইরূপ আপত্তি দার্শনিক দিক হইতে সমীচীন হইলেও হইতে পারে, কিন্তু মনোবিদ্যায় ইহার কোনো যৌক্তিকতা আছে বলিয়া মনে হয় না। মনোবিদ্যা জড়পদার্থ এবং মানসপদার্থ কিরূপভাবে সম্বন্ধ, ইহার আলোচনা করে না, কিন্তু মন ও দেহ কিরূপে সম্বন্ধ, তাহাই আলোচনা করে।

৫। উপসংহার

উপরের আলোচনা হইতে অন্যোন্যক্রিয়াবাদ এবং সমান্তরালবাদের মধ্যে কোন্‌টি গ্রহণীয় এবং কোন্‌টি বর্জনীয়, এই প্রশ্নের সমাধান পাওয়া যায় না। বাস্তবিকপক্ষে, এইরূপ কোনো সমাধান মনোবিদ্যার পক্ষে অপরিহার্যও নয়। মনোবিদ্যা বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞান। যে মত অনুসারে মানসবৃত্তিগুলিকে ভাল করিয়া বুঝা যায়, মনোবিদ্যার পক্ষে সেই মতটিই গ্রাহ্য। অনেক মনোবিদ্‌ মনে করেন যে অন্যোন্যক্রিয়াবাদই মানসবৃত্তির সন্তোষজনক ব্যাখ্যা করিতে পারে। আবার কোনো কোনো মনোবিদ্‌—এবং সাম্প্রতিক কালে অধিকাংশ মনোবিদই—সমান্তরালবাদকে অধিকতর সন্তোষজনক বলিয়া গ্রহণ করেন। এমতাবস্থায় এই প্রশ্নটির কোনো সঠিক উত্তর না দিয়া এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গী লইয়াই মনোবিদ্যা গবেষণায় প্রবৃত্ত হওয়া উচিত যে, **যে মতটি অধিকতর সন্তোষজনক বলিয়া অধিকাংশ মনোবিদ্‌ গ্রহণ করেন সেইটিই গ্রহণীয়।** এই দিক্‌ দিয়া বিচার করিলে অন্যোন্যক্রিয়াবাদ অপেক্ষা সমান্তরালবাদই অধিক বিজ্ঞানসম্মত বলিয়া মনে হয়। সাম্প্রতিক মনোবিদ্‌গণের মধ্যে অনেকেই, যেমন হ্বুণ্ড, টিশ্‌নার প্রভৃতি সমান্তরালবাদী। আবার ম্যাক্‌ডুগাল প্রমুখ মনোবিদ্‌গণ অন্যোন্যক্রিয়াবাদী। পক্ষান্তরে, স্টাউট্‌ প্রভৃতি মনোবিদ্‌গণ কোনো মতবাদেরই পূর্ণ সমর্থক নহেন, যদিও স্টাউট্‌-এর উদ্দেশ্যমূলক নিয়ন্ত্রণবাদ হইতে তাঁহার **অন্যোন্যক্রিয়াবাদের দিকে ঝোঁক** অনুমিত হয়।

অনুশীলনী (Exercise)

1. Explain with proofs the physiological basis of mental life.
(Ans : pp. 57-58)
(মানসজীবনের শারীরভিত্তি প্রমাণ সহ ব্যাখ্যা কর।)

2. Give an analysis of the physiological basis of mental life.
(Ans : pp. 58-60)
(মানসজীবনের শারীর ভিত্তি বিশ্লেষণ কর।)

3. Explain Interactionism as a theory of mind-body relation.
(Ans : pp. 60-62)
(দেহ ও মনের সম্বন্ধ বিষয়ে অন্যোন্যক্রিয়াবাদ আলোচনা কর।)

4. Are mind and body parallel to each other ? Discuss.
(Ans : pp. 64-67)
(মন এবং দেহ পরস্পরের সমান্তরাল কিনা তাহা আলোচনা কর।)

5. How are mind and body related to each other ? Diseuss.
(Ans : pp. 60-67)
(দেহ এবং মনের সম্বন্ধ কিরূপ তাহা আলোচনা কর।)

6. Which of the theories of Interactionism and Parallelism do you accept and why ? (Ans : pp. 60-67)
(অন্যোন্যক্রিয়াবাদ এবং সমান্তরালবাদের মধ্যে কোন্ মতবাদটি তোমার গ্রহণীয়, এবং কেন গ্রহণীয় ?)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্র—মস্তিষ্ক এবং সুষুম্নাকাণ্ড

(Central Nervous System—Brain and the Spinal Cord)

১। ভূমিকা

(Introduction)

কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্র সমগ্র নার্ভতন্ত্রের (Nervous System) প্রধান অংশ। সুতরাং ইহা যে সমগ্রের অংশ সেই সমগ্র নার্ভতন্ত্রের আলোচনা আবশ্যক।

নার্ভতন্ত্র বলিতে বুঝায় শরীরের যাবতীয় নার্ভ গঠনগুলি, যাহা শরীরের বিভিন্ন অংশগুলিকে পারস্পরিক যোগসূত্রে আবদ্ধ করে। শুধু তাহাই নয়। নার্ভতন্ত্র জীবশরীরকে বহির্জগৎ অথবা পরিবেশের সহিত যুক্ত এবং অভিযোজিত (adjusted) করে। এইজন্যই জীব বিশ্বের সহিত নিজকে খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারে।

বহির্বিশ্বের সহিত অভিযোজনের জন্য বহির্বিশ্বের অথবা পরিবেশের শক্তি উদ্দীপকের (stimulus) আকারে **সংবেদীয়** নার্ভকে (sensory or afferent nerve) উদ্দীপিত করে। এই উদ্দীপনা (excitation) নার্ভপ্রবাহের (Nerve impulse) আকারে প্রবাহিত হইয়া কেন্দ্রীয় নার্ভকেন্দ্রে (মস্তিষ্কে অথবা সুষুম্না কাণ্ডে) পৌঁছায়। ঐ কেন্দ্রের সন্নিহিত **চেষ্টীয়** নার্ভের (motor or efferent nerve) উদ্দীপনা হইলে উহা চেষ্টীয় নার্ভপ্রবাহের আকারে কোন মাংসপেশীতে অথবা গ্ল্যাণ্ডে পৌঁছিয়া যথাক্রমে বিচলন (movement) এবং রসক্ষরণ (Secretion) উৎপন্ন করে। এইরূপে জীবদেহের সহিত পরিবেশ অথবা বহির্জগতের অভিযোজন ঘটে।

কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্রের গঠন এবং কার্য বুঝিতে হইলে নিম্নোক্ত ধাপগুলি বুঝিতে হয়। (১) ইন্দ্রিয়ে অবস্থিত কতকগুলি **সংগ্রাহক যন্ত্র** (receptor organs), (২) সংগৃহীত উদ্দীপনা যে নার্ভ দিয়া প্রবাহিত হয় সেই **সংবেদীয় নার্ভ**, (৩) এই উদ্দীপনা যে স্থানে পৌঁছিয়া সংবেদন উৎপন্ন করে সেই, **মস্তিষ্ক বা সুষুম্নাকাণ্ডরূপ কেন্দ্রস্থল** (centre), (৪) আবার এই সংবেদনের ফলে যে চেষ্টীয় নার্ভ উদ্দীপিত হইয়া গতি অথবা ক্ষরণ ঘটায় সেই, **চেষ্টীয় নার্ভ** সম্বন্ধে জ্ঞান আবশ্যক। সাধারণ নার্ভতন্ত্রের অন্যান্য অংশও আলোচনা করা দরকার।

অর্থাৎ কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্র বুঝিবার পক্ষে নার্ভ কাহাকে বলে, উহার গঠন কি, উহার কাজই বা কি, নার্ভ কত প্রকার, প্রভৃতি বিষয়ের জ্ঞান অপরিহার্য।

২। নার্ভতন্ত্রের প্রধান অংশ
(Parts of the Nervous System)

নার্ভতন্ত্রের অংশগুলি কি কি তাহা জানা দরকার। সাধারণ নার্ভতন্ত্র প্রধানতঃ **তিনভাগে বিভক্ত**।

(১) প্রথম ভাগটি কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্র (Central Nervous System)। ইহা **মস্তিষ্ক** (Brain) এবং **মেরুমজ্জা** (Spinal Cord) লইয়া গঠিত। মস্তিষ্ক এবং মেরুমজ্জাই শরীরের মূলকেন্দ্র। এই কারণে এই দুইটিকে কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্র বলা হয়।

(২) সাধারণত নার্ভতন্ত্রের দ্বিতীয় ভাগটি **বহিঃপ্রান্তীয় নার্ভপুঞ্জ** (peripheral nerves)। ইহা কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্ররূপ বৃক্ষের শাখাপ্রশাখারূপে সমগ্র দেহে ছড়াইয়া আছে। এই নার্ভগুলি কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্রের সহিত শরীরের বিভিন্ন অংশের সংযোগ সূত্র।

(৩) সাধারণ নার্ভতন্ত্রের তৃতীয় ভাগটি **স্বতন্ত্র নার্ভতন্ত্র** (Autonomic Nervous System)। এই নার্ভতন্ত্রকে স্বতন্ত্র বলা হয় কারণ ইহা কেন্দ্রীয় নার্ভ-তন্ত্রের উপর নির্ভর না করিয়া মোটামুটি স্বাধীনভাবে সক্রিয়। স্বতন্ত্র নার্ভতন্ত্র যকৃৎ, হৃদয় প্রভৃতি আভ্যন্তরীণ অঙ্গগুলিকে (visceral organs) মস্তিষ্ক ও মেরুমজ্জার সহিত সংযুক্ত করে।

এইবার নার্ভতন্ত্রের উপরোক্ত তিনটি প্রধান অংশের গঠন ও ক্রিয়া আলোচ্য। প্রথমে **নার্ভ কি, কয় প্রকার** এবং **উহাদের কার্য কি** প্রভৃতি প্রশ্ন আলোচিত হইতেছে।

৩। নিউরোন্-এর গঠন এবং ক্রিয়া
(Structure and Function of Neurones)

নার্ভতন্ত্র অসংখ্য নিউরোন্-এর সমষ্টি। জড়পদার্থকে বিশ্লেষণ করিলে ন্যূনতম বিভাজ্য পরমাণু পাওয়া যায়। তেমনই নার্ভতন্ত্রকে বিশ্লেষণ করিলে কতগুলি ন্যূনতম বিভাজ্য অংশ পাওয়া যায় যাহাদের সংযোগে অথবা সমন্বয়ে সমগ্র নার্ভতন্ত্র গঠিত।

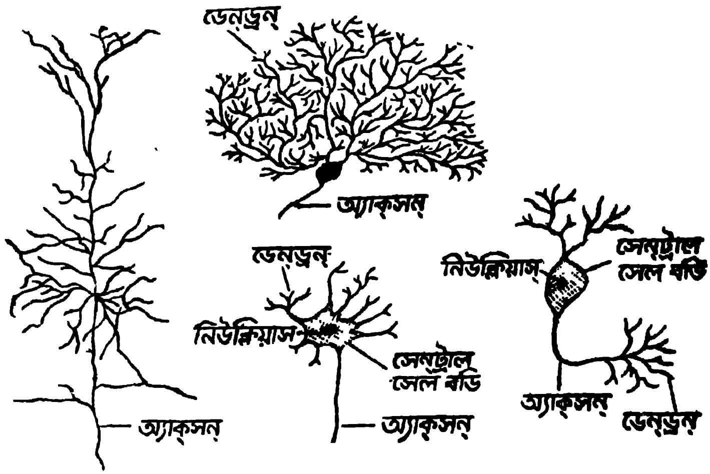
নিউরোন্‌ নার্ভতন্ত্রের ন্যূনতম বিভাজ্য অংশ। অসংখ্য নিউরোন্‌-এর সমন্বয় বা সংযোগবৈচিত্র্যে নার্ভতন্ত্র গঠিত। গঠনের দিক্‌ হইতে নিউরোন্‌ই নার্ভতন্ত্রের মৌলিক একক। অনুমান করা হয় যে মানুষের নার্ভতন্ত্র অন্তত: এক কোটি নিউরোন্‌ লইয়া গঠিত। ইহারা আকারে এত ক্ষুদ্র যে শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেও উহাদের দেখা দুরূহ। ৪, ৫, ৬ ও ৭ নং চিত্রগুলিতে কয়েকটি নিউরোন্‌ দেখানো হইয়াছে।

নিউরোন্‌-এর অংশত্রয়

সাধারণতঃ প্রত্যেক নিউরোন্‌ তিনটি অংশ লইয়া গঠিত : (১) প্রথম অংশটিকে বলে **অন্তর্মুখী কোষদেহ** (Central cell-body, Nerve-cell) (২) দ্বিতীয় অংশটি হইল **কোষদেহের কেন্দ্র** (৩) আবার তৃতীয় অংশটির নাম **নার্ভতন্তু** (nerve-fibre)। ইহা কোষদেহের কেন্দ্র হইতে উৎপন্ন হয়। এই অংশগুলি ৬ ও ৭ নং চিত্রে দেখানো হইল।

কোষদেহের অংশ

কোষদেহ আবার চারটি অংশে গঠিত। যথা (১) ইহার কঠিন বহিরাবরণ বা **কোষপ্রাচীর** (cell-wall); (২) ইহার মধ্যস্থিত তরলাকৃতি অংশের নাম



৪, ৫, ৬ ও ৭নং চিত্র। ৪, ৬ ও ৭নং চিত্র বাম দিক হইতে আরম্ভ করিয়া পর পর এবং ৫নং চিত্র উপরে রহিয়াছে

জীবকোষ (protoplasm)। ইহাকে অনেকটা ডিমের শ্বেতাংশের (albumen)

মত দেখায় ; (৩) এই জীবকোষের কেন্দ্রস্থ একটি অপেক্ষাকৃত ঘনীভূত কেন্দ্রের নাম **নিউক্লিয়াস্** এবং (৪) নিউক্লিয়াস্-এর মধ্যে ভাসমান ক্ষুদ্রতম অংশগুলির নাম **নিউক্লিওলাই**।

সম্ভবতঃ **কোষদেহের কার্য** নিউরোন্-এর পুষ্টি জোগানো। কোষদেহ অসুস্থ হইলে নিউরোন্ কাজ করিতে পারে না। কোষদেহ আবার নার্ভপ্রবাহের শক্তি উৎপন্ন (evolve) করে এবং প্রয়োজন মত উহাকে বাড়াইয়া (reinforce) বা ব্যাহত করিয়া (inhibit) দেয়।

নিউরোন্-এর শাখা—অ্যাক্সন্ ও ডেনড্রেন্ (Axon and Dendron)

শাখাপ্রশাখা-সমন্বিত কোষদেহকে নিউরোন্ বলে। নার্ভতন্ত্র অসংখ্য নিউরোন্-এর সমষ্টি। অধিকাংশ নিউরোন্-এর দুই শ্রেণীর শাখা থাকে—যথা একটি অ্যাক্সন্ এবং একাধিক ডেন্ড্রন্। সকল নিউরোন্-এরই একটি করিয়া অ্যাক্সন্ থাকে, কিন্তু কোনো কোনো নিউরোন্-এর ডেন্ড্রন্ নাও থাকিতে পারে। অ্যাক্সন্ কোষদেহ হইতে প্রসৃত একটি শাখা। ইহা অপেক্ষাকৃত মসৃণ, দীর্ঘ এবং প্রশাখাহীন।

অ্যাক্সন্-এর তুলনায় ডেন্ড্রন্ অপেক্ষাকৃত হ্রস্ব বা ক্ষুদ্র, অসম এবং অধিকসংখ্যক। কোনো কোনো অ্যাক্সন্-এর দৈর্ঘ্য কয়েক ফুট পর্যন্ত হইতে পারে। ডেন্ড্রন্গুলি অনেকটা বৃক্ষপল্লবের মত দেখায়। অ্যাক্সন্ এবং ডেন্ড্রন্ এই উভয়েরই প্রান্তসীমায় কেশের মত ব্রাশ্ থাকে—এই আকারের জন্য উহাদের প্রান্তসীমাকে প্রান্তমার্জনী (end-brush) বলে।

৪। নিউরোন্-এর শ্রেণীভেদ

নিউরোন্ নিম্নোক্ত **তিন** শ্রেণীতে বিভক্ত।

(১) **অন্তর্মুখী বা সংবেদীয়** (sensory, afferent) নিউরোন্। ইহা কোনো ইন্দ্রিয়যন্ত্র হইতে বহির্গত হইয়া নার্ভতন্ত্রের কেন্দ্রে, অর্থাৎ মস্তিষ্কে বা মেরুমজ্জায় পৌঁছায় এবং সংবেদন উৎপন্ন করে। ইহার কোষদেহ ইন্দ্রিয়যন্ত্রে অবস্থিত।

(২) **বহির্মুখী বা চেষ্টীয়** (motor, efferent) নিউরোন্। ইহা নার্ভতন্ত্রের কোনো কেন্দ্র হইতে বহির্গত হইয়া কোনো পেশীতে বা গ্রন্থিতে পৌঁছায় এবং পেশীর বিচলন (movement) অথবা গ্রন্থির রসক্ষরণ (secretion) উৎপন্ন করে। এই নিউরোন্-এর কোষদেহ নার্ভতন্ত্রের কোনো কেন্দ্রে, যথা মস্তিষ্কে অথবা মেরুমজ্জায়, অবস্থিত।

(৩) **সংযোজক বা সংযোগকারী** (connective) নিউরোন্। ইহা

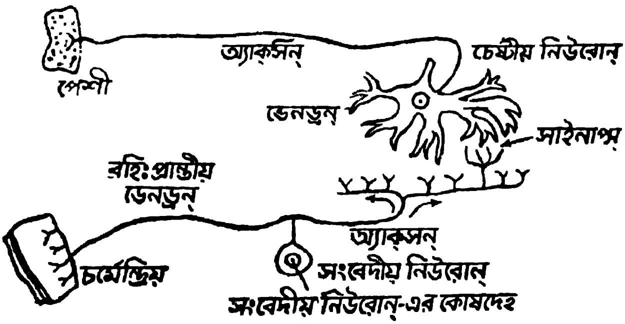
নার্ভতন্ত্রের কেন্দ্রে অবস্থান করিয়া সংবেদীয় এবং চেষ্টীয় নিউরোন্-এর সংযোগ সাধন করে।

উপরোক্ত তিন শ্রেণীর নিউরোন্ই ৫, ৬ ও ৭নং চিত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে।

ক্রিয়া এবং **গঠন**, এই দুই দিক হইতেও নিউরোন্-এর শ্রেণীবিভাগ করা যাইতে পারে।

নিউরোন-এর ক্রিয়াগত শ্রেণীভেদ

ক্রিয়ার (function) দিক দিয়া নিউরোন্ প্রথমতঃ দুই শ্রেণীর—যথা **সংবেদীয়** বা অন্তর্মুখী (sensory, afferent) এবং **চেষ্টীয়** বা বহির্মুখী (motor,



৮নং চিত্র—সংবেদীয় এবং চেষ্টীয় নিউরোন্

efferent)। সংবেদীয় বা অন্তর্মুখী নিউরোন্-এর কোষদেহ কোনো না কোনো ইন্দ্রিয়যন্ত্রের (sense-organ) মধ্যে অবস্থিত। আবার চেষ্টীয় বা বহির্মুখী নিউরোন্-এর কোষদেহ মস্তিষ্কের বা মেরুমজ্জার কোনো চেষ্টীয় কেন্দ্রে অবস্থিত। ঐ কেন্দ্র হইতে বাহির হইয়া উহা কোনো পেশী অথবা গ্রন্থিতে পৌছায়।

৮নং চিত্রে সংবেদীয় এবং চেষ্টীয় নিউরোন্-এর নক্সা দেখানো হইয়াছে।

সংবেদীয় এবং চেষ্টীয় এই দুই শ্রেণীর অতিরিক্ত একটি তৃতীয় শ্রেণীর নিউরোন্ও আছে। ইহাকে **সংযোজক** (connective) নিউরোন্ বলা যায়, কারণ ইহা সংবেদীয় এবং চেষ্টীয় নিউরোন্-এর মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে। সংযোজক নিউরোন্গুলি কেন্দ্রীয়, কারণ ইহারা নার্ভতন্ত্রের কেন্দ্রে অবস্থিত। ৭নং চিত্রটি সংযোজক নিউরোন্-এর চিত্র।

নিউরোন্-এর গঠনগত শ্রেণীভেদ

আবার গঠনের (structure) দিক হইতেও নিউরোন্ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—যথা, **একশাখাবিশিষ্ট** (unipolar), **দ্বিশাখাবিশিষ্ট** (bipolar) এবং **বহুশাখা-**

বিশিষ্ট (multipolar)। একশাখাবিশিষ্ট নিউরোন্ উহার কোষদেহ এবং উহা হইতে নিঃসৃত একটি শাখা লইয়া গঠিত। বাস্তবিকপক্ষে এই নিউরোন্ মনুষ্যদেহে দ্বিশাখাবিশিষ্ট, কারণ কোষদেহ হইতে এককভাবে নিঃসৃত হওয়া সত্ত্বেও একটু দূরে গিয়া ইহা দুই দিকে বিভক্ত হইয়া যায়। বহুশাখাবিশিষ্ট নিউরোন্-এর একটি অ্যাক্সন্ এবং একাধিক ডেন্‌ড্রন্ থাকে। উপরে এই দুই শ্রেণীর নিউরোন্-এর নক্সা দেওয়া হইয়াছে। যেমন, ৫, ৬, ৭নং চিত্রগুলি বহুশাখাবিশিষ্ট এবং ৮নং চিত্র দ্বিশাখাবিশিষ্ট নিউরোন্-এর চিত্র।

৫। অ্যাক্সন্ ও ডেন্‌ড্রন্-এর ভিন্ন ক্রিয়া

অ্যাক্সন্ ও ডেন্‌ড্রন্-এর ক্রিয়ার পার্থক্য লক্ষ্য করিবার মত। ডেন্‌ড্রন্-এর কাজ হইল নার্ভপ্রবাহ **গ্রহণ** করা এবং একটু দূরে অবস্থিত কোষদেহে উহাকে প্রেরণ করা। কিন্তু অ্যাক্সন্-এর কাজ ইহার বিপরীত। ইহার কাজ হইল নার্ভপ্রবাহকে কোষদেহ হইতে দূরে, অর্থাৎ নার্ভতন্ত্রের কেন্দ্রে **প্রেরণ** করা। অর্থাৎ, ডেন্‌ড্রন্ নার্ভপ্রবাহের **সংগ্রাহক** (receptor) এবং অ্যাক্সন্ উহার **নিঃসারক** (discharger) বা **প্রেরক** (transmitter)। বিষয়টি এই পরিচ্ছেদের পরবর্তী অনুচ্ছেদে স্পষ্টতর হইবে।

অ্যাক্সন্-এর গঠন

অ্যাক্সন্ অথবা নার্ভতন্তু (nerve-fibre) সাধারণতঃ তিনটি অংশের দ্বারা গঠিত। (১) ইহার কঠিন বহিরাবরণটির নাম **আদিম কোষ** (Primitive or Schwann Sheath, Neurilemma)। এই কোষটি একপ্রকার **শ্লেষ্মা-ঝিল্লী পদার্থ** (membranous substance) দ্বারা এবং (২) ইহার অন্তরাবরণটি একপ্রকার **শুভ্র স্নেহ পদার্থ** (fatty matter) দ্বারা নির্মিত। ইহাকে মধ্যস্থ আবরণ (medullary or myelin sheath) বলে। এই দুইটি আবরণের দ্বিতীয়টি প্রথমটির দ্বারা আবৃত। (৩) ইহাদের দ্বারা সুদৃঢ়ভাবে রক্ষিত **কোমল সারাংশ** (core) রহিয়াছে। উহার নাম Axis cylinder। ইহা জীবকোষীয় পদার্থ (Protoplasmic substance) দিয়া নির্মিত।

সকল প্রকার অ্যাক্সনেই যে উপরোক্ত তিনটি অংশ থাকে তাহা নয়। যেমন মেডুলেটেড্ নার্ভে সব অংশগুলিই থাকে, কিন্তু নন্-মেডুলেটেড্ নার্ভে তৃতীয় অংশটি থাকে না।

৬। নার্ভপ্রবাহের বা নিউরোন্ কার্যের নিয়মাবলী
(Laws of Nervous Impulse)

নিউরোন্ কি কি নিয়মে কাজ করে তাহার আলোচনা করিলে নিউরোন্-এর শ্রেণী ও ক্রিয়াভেদ আরও স্পষ্ট ভাবে বুঝিতে পারা যাইবে। নিউরোন্-এর ক্রিয়া কতকগুলি নিয়ম অনুসারে সম্পন্ন হইয়া থাকে। নিম্নে ইহার ক্রিয়ার প্রধান নিয়মাবলী আলোচিত হইতেছে।

(১) **উদ্দীপনশীলতা** নিউরোন-এর একটি প্রধান ধর্ম। প্রত্যেক নিউরোন্ উহার যোগ্য উদ্দীপকের দ্বারা উদ্দীপিত হয়। যেমন ইথর তরঙ্গ দর্শন-নিউরোন্‌কে উদ্দীপিত করে। এই নিয়মকে **উদ্দীপনশীলতার নিয়ম** (Law of Irritability) বলে।

(২) উপরন্তু এই উদ্দীপনা নিউরোন্ এর মধ্য দিয়াপ্রবাহিত হয়। এই নিয়মকে **পরিবহনশীলতার নিয়ম** (Law of Conductivity) বলা হইয়া থাকে।

(৩) সাধারণতঃ উদ্দীপনা এবং পরিবহনের ফলে নিউরোন্-এর অবসাদ আসে। তখন কোনো উদ্দীপকই উহাকে উত্তেজিত করিতে পারে না। এই অবস্থাটিকে **অবসাদ কাল** (Refractory Period) বলে। অনেক শারীরবৃত্তবিৎ মনে করেন যে ইহা ঘটে প্রান্তসন্নিকর্ষের প্রতিকূলতার (Synaptic resistance) জন্য। বর্তমান পরিচ্ছেদের অষ্টম অনুচ্ছেদে প্রান্তসন্নিকর্ষের প্রতিকূলতা আলোচিত হইয়াছে।

আবার প্রান্তসন্নিকর্ষের সন্ধিস্থল অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতে নার্ভপ্রবাহের বিলম্ব হয়। এই কালবিলম্বকে **প্রান্তসন্নিকর্ষজ বিলম্ব** (Synaptic Delay) বলা হয়।

(৪) নার্ভপ্রবাহের আর একটি প্রধান নিয়মের নাম **অগ্রে পরিবাহিত হইবার নিয়ম** (Law of Forward Conduction)। নার্ভপ্রবাহের অগ্রগতি হয় নিউরোন্-এর অ্যাক্‌সন হইতে ডেনড্রনে, অথবা ইন্দ্রিয়যন্ত্র হইতে নার্ভতন্ত্রের কোনো কেন্দ্রে এবং ঐ কেন্দ্র হইতে কোনো পেশীতে বা গ্রন্থিতে। ইহার বিপরীতক্রমে, অর্থাৎ গ্রন্থি বা পেশী হইতে কেন্দ্রে অথবা কেন্দ্র হইতে ইন্দ্রিয়যন্ত্রে, অথবা ডেনড্রন্ হইতে অ্যাকসনে নার্ভপ্রবাহ পরিচালিত হয় না। নার্ভপ্রবাহ সংবেদীয় নার্ভের নিউরোন্ হইতে চেষ্টীয় নিউরোনে প্রবাহিত হয়, কিন্তু ইহার বিপরীত গতিতে হয় না।

এই নিয়মটিও সাইনাপ্স-এর প্রতিকূলতা বা বাধা দ্বারা প্রভাবিত হইয়া থাকে। যে নিউরোন্-পথে কোন নার্ভপ্রবাহ পুনঃ পুনঃ পরিচালিত হইয়াছে, সেই নিউরোন্-

পথই ঐ নার্ভপ্রবাহের চলাচল করিবার পক্ষে **নিম্নতম বাধাসঙ্কুল পথ** (Path of least resistance) হইয়া দাঁড়ায়, কারণ সাইনাপ্স্ এই পথে নার্ভপ্রবাহকে নিম্নতম বাধা দেয়। আবার নার্ভপ্রবাহ যে নিউরোন্‌পথে সর্বপ্রথম পরিচালিত হয়, ঐ পথের সাইনাপ্স্ নার্ভপ্রবাহের গতিতে সর্বোচ্চ বাধা সঞ্চার করে। সুতরাং এই নিউরোন্-পথ **সর্বোচ্চ বাধাসঙ্কুল পথ** (Path of greatest resistance) হইয়া দাঁড়ায়।

এই নিয়মটিকে ম্যাক্‌ডুগ্যাল্-প্রদর্শিত **স্নায়ু-অনুষঙ্গ নিয়ম** (The Law of Neural Association) অনুসারেও ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে।

(৫) আবার যদি দুই বা ততোধিক নার্ভপ্রবাহ একযোগে একই প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন করে, তাহা হইলে ঐ নার্ভপ্রবাহগুলি যুক্ত বা সম্মিলিত হইয়া প্রতিক্রিয়াটিকে প্রবলতর করিয়া তোলে। এই নিয়মটিকে **যোগ নিয়ম** (The Law of Summatlon) বলা হইয়া থাকে।

(৬) একই নিউরোন্-পথে একটানা ভাবে নার্ভপ্রবাহ চলিতে থাকিলে ঐ পথের সাইনাপ্স্ বা প্রান্তসন্নিকর্ষ ঐ নার্ভপ্রবাহের অগ্রগমনে বাধা দিয়া থাকে। এই প্রতিকূলতার কারণ হয়ত পুনঃ পুনঃ ক্রিয়ার ফলে সাইনাপ্সে সঞ্চিত কোনো বিষাক্ত (toxin) পদার্থ। নার্ভপ্রবাহের অনুকূলতা এবং প্রতিকূলতা এই দুইটি বিপরীত ক্রিয়াই সাইনাপ্সের ধর্ম। এই নিয়মকে **অনুকূলতা** এবং **প্রতিকূলতা নিয়ম** (The Law of Facilitation and Inhibition) বলা হয়।

(৭) দুই বা ততোধিক নার্ভপ্রবাহ একযোগে বিপরীত প্রতিক্রিয়া-মুখে চালিত হইলে, একটি অপরটিকে **অবরুদ্ধ** (Inhibit) করে এবং উহারা একযোগে একই প্রতিক্রিয়া-মুখে চালিত হইলে, একটি অপরটিকে **সাহায্য** (Facilitate) করে।

(৮) নিউরোন্ ক্রিয়ার আরও একটি প্রধান নিয়ম হইল **পূর্ণ-বা-শূন্য নিয়ম** (All or None Law)। নিউরোন উত্তেজিত হয়, নতুবা হয় না। উত্তেজিত হইলে, নিউরোন্ পূর্ণশক্তিতে ক্রিয়াশীল হয়, কিন্তু কিছু শক্তি ব্যবহার করিয়া এবং বাকীটুকু সঞ্চিত রাখিয়া ক্রিয়াশীল হয় না। আবার উহা উত্তেজিত না হইলে একেবারেই ক্রিয়াশীল হয় না।

৭। নার্ভপ্রবাহের প্রকৃতি (Nature of Nervours Impulse)

শারীরবৃত্তবিদ্‌গণ বলেন যে নার্ভপ্রবাহের স্বরূপ আংশিকভাবে তাড়িৎ (electrical), **রাসায়নিক** (chemical) এবং **তাপীয়** (thermal)। তড়িৎ পরিমাপক (Galvanometer) যন্ত্রে নার্ভপ্রবাহের তড়িৎ-ক্রিয়া ধরা পড়ে।

আবার তাপপরিমাপক যন্ত্রে (Thermopyle) নার্ভপ্রবাহের উদ্দীপনাকালে এবং উদ্দীপনার পর বিরামকালে উহার তাপীয় ক্রিয়া পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া, নার্ভপ্রবাহ যে রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন হয়, তাহাতেও সন্দেহ নাই। নিউরোন্-এর পরিপুষ্টি ক্রিয়ার ফলে উহা সক্রিয় থাকে।

নার্ভক্রিয়াকে নার্ভপ্রবাহ (nerve-current, nerve-impulse) বলা হয়, কারণ সম্ভবতঃ এই ক্রিয়ায় নিউরোনে তাড়িৎ-রাসায়নিক তরঙ্গের (electro chemical waves) সৃষ্টি হয়। এই তরঙ্গ খুবই মৃদু। ইহাতে নিউরোন্-এর খুবই কম শক্তি ব্যয়িত হয়। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ইহা পেশীকে বা নার্ভকেন্দ্রকে সক্রিয় করিয়া তুলিতে পারে।

জোহানেস্ মুয়েলার-এর মতে নার্ভপ্রবাহের গতিবেগ তড়িৎ এবং আলোকের গতিবেগের সহিত তুলনীয়। কিন্তু নার্ভপ্রবাহ যে পূর্ণভাবে তাড়িৎ নয়, তাহা উহার **গতিবেগ** (velocity) দ্বারা প্রমাণিত হয়। তড়িৎপ্রবাহ আলোকের গতিতে অর্থাৎ প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬,০০০ মাইল ভ্রমণ করে। পক্ষান্তরে হেল্ম্‌হোলজ দেখাইয়াছেন যে মানুষের বড় নার্ভগুলির প্রবাহের গতিবেগ প্রতি সেকেণ্ডে ১৩১ গজের অথবা ১২০ মিটারের কাছাকাছি, অর্থাৎ শব্দের গতিবেগ অপেক্ষা কম। তাহা ছাড়া, নার্ভপ্রবাহের জন্য অম্লজানের (oxygen) দরকার, কারণ অম্লজানের অভাব ঘটিলে, নিউরোন্ পরিবহন ক্রিয়া চালাইতে পারে না।

নার্ভগুলি **সহজে ক্লান্ত হয় না**। উহাদের ক্লান্তি জন্মিলেও, উহারা ইহাকে দ্রুত কাটাইয়া উঠিতে পারে। নার্ভপ্রবাহের তথাকথিত অবসাদ আসলে নার্ভের জন্য নয়, কিন্তু সাইনাপ্স্-এর প্রতিকূলতার জন্য ঘটে।

৮। প্রান্তসন্নিকর্ষ (Synapse)

মেরুমজ্জাবিশিষ্ট প্রাণীর (vertebrates) নার্ভপ্রবাহ সংগ্রাহক ইন্দ্রিয়যন্ত্র (receptor sense-organ) হইতে সম্পাদক (effector) পেশী বা গ্রন্থি পর্যন্ত চক্রাংশ (arc) পরিভ্রমণ করে অন্ততঃ দুইটি নিউরোন্-এর মধ্য দিয়া। ইন্দ্রিয়যন্ত্র বলিতে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক্, জিহ্বা বুঝায়। ইন্দ্রিয়যন্ত্র সংগ্রাহক, কারণ ইহাতে অবস্থিত সংবেদীয় নার্ভের বহিঃপ্রান্ত উহার উপযোগী উদ্দীপক দ্বারা উত্তেজিত হয় এবং উহা ঐ উত্তেজনা সংগ্রহ করিয়া নার্ভপ্রবাহের আকারে নার্ভতন্ত্রের কেন্দ্রে,—যেমন মস্তিষ্কে বা মেরুদণ্ডে প্রেরণ করে। কেন্দ্রে অবস্থিত চেষ্টীয় নার্ভের অন্তঃপ্রান্তে ঐ প্রবাহ পরিচালিত হয়।

উহা চেষ্টীয়-নার্ভ দিয়া কোন মাংসপেশী বা গ্ল্যাণ্ডে অবস্থিত ঐ নার্ভের বহিঃপ্রান্তে পৌঁছিয়া উক্ত মাংসপেশী অথবা গ্ল্যাণ্ডকে সক্রিয় করে। ফলে কোন বিচলন (movement) অথবা নিঃসরণ (secretion) ঘটে। উক্ত নার্ভপ্রবাহের পথকে একটি বৃত্ত বা চক্র (circle) বলা চলে না, কারণ উহা উহার যাত্রাপথে ফিরিয়া আসে না। কাজেই উহা একটি circuit বা arc, অর্থাৎ **চক্রাংশ**। প্রথম এবং দ্বিতীয় নিউরোন্-এর মধ্যে একটি সংযোগস্থল না থাকিলে এই দুইটি নিউরোন্ একই চক্রাংশের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না।

একটি নিউরোন্-এর শেষ প্রান্তের সহিত অপর একটি নিউরোন্-এর প্রথম প্রান্তের সংযোগ সন্ধিকে সাইনাপ্স্ বা প্রান্তসন্নিকর্ষ বলে। অবশ্য এই সন্ধিস্থানে নিউরোন্ দুইটির সংস্পর্শ স্থূল কিনা অথবা ক্রিয়াত্মক, এই বিষয়ে সন্দেহ রহিয়াছে। কোন কোন শারীরতত্ত্ববিদ্ মনে করেন যে সাইনাপ্সে দুইটি নিউরোন্-এর স্থূল বা গঠনাত্মক সংস্পর্শ হয় না, কিন্তু যে সংস্পর্শ হয় তাহা ক্রিয়াত্মক (functional contact)। কিন্তু স্থূল সংস্পর্শ ঘটুক বা না ঘটুক, এই সন্ধিস্থলে যে একটি নিউরোন্-এর মধ্য দিয়া পরিচালিত নার্ভপ্রবাহ বাধা অতিক্রম করিয়া পরবর্তী নিউরোন্টিতে সঞ্চারিত হয় তাহাতে সন্দেহ নাই।

৮ নং চিত্রে একটি চেষ্টীয় এবং একটি সংবেদীয় নিউরোন্-এর প্রান্তসন্নিকর্ষ দেখানো হইয়াছে।

প্রান্তসন্নিকর্ষ নিউরোন্-এর মত কোনো স্থূল বস্তু নয়। নিউরোন্ নষ্ট হইয়া গেলে উহার ক্ষয় প্রান্তসন্নিকর্ষকে অতিক্রম করিয়া পরবর্তী নিউরোন্-এ সংক্রামিত হয় না। প্রান্তসন্নিকর্ষ পূর্ববর্তী নিউরোন্-এর অ্যাক্সন এবং পরবর্তী নিউরোন্-এর ডেনড্রন-এর সান্নিধ্যস্থল। **নার্ভপ্রবাহের অ্যাক্সন হইতে ডেনড্রনে প্রবাহ-পথে মধ্যবর্তী সন্ধিস্থানটিই প্রান্তসন্নিকর্ষ।**

নার্ভপ্রবাহের অ্যাক্সন্ হইতে ডেনড্রনে যাত্রাপথে প্রান্তসন্নিকর্ষ উহার গতিবেগকে বাধা দিয়া থাকে। কিন্তু এই বাধার পরিমাণ বা মাত্রা অবস্থানুসারে পরিবর্তিত হইতে পারে। ইহার একটি বিশেষ ধর্ম এই যে নার্ভপ্রবাহ যতবার প্রান্তসন্নিকর্ষকে অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হয়, উহার বাধা বা প্রতিকূলতা সেই পরিমাণে কমিতে থাকে। এইরূপে নিউরোনে ঐ নার্ভপ্রবাহের একটি অবাধ বা নিম্নতম বাধাসঙ্কুল পথ তৈয়ারী হয়। ঐ নিউরোন্-পথে নার্ভপ্রবাহটি যখন সর্বপ্রথম পরিচালিত হইয়াছিল, তখন

উহাই ছিল ইহার পক্ষে সর্বোচ্চ বাধাসঙ্কুল পথ, কারণ তখন প্রান্তসন্নিকর্ষের বাধা অতিক্রম করা উহার পক্ষে কষ্টকর ছিল।

অভ্যাস এবং ক্লান্তি বা অবসাদ এবং নিদ্রা

নার্ভতন্ত্রের দিক দিয়া সকল প্রকার অভ্যাস বা শিক্ষা বলিতে বুঝায় প্রান্তসন্নিকর্ষের বাধা দূর হওয়া। প্রথমে যে নিউরোন্-পথ প্রান্তসন্নিকর্ষে প্রতিকূলতার জন্য দুর্গম ছিল, তাহাই পুনঃ পুনঃ অনুশীলনের জন্য প্রান্তসন্নিকর্ষের বাধা বা প্রতিকূলতা কমিয়া যাইবার ফলে সুগম হইয়া দাঁড়ায়। অনেকের মতে নিউরোন্-পথে পুনঃ পুনঃ নার্ভপ্রবাহ পরিচালিত হইবার দরুন প্রান্তসন্নিকর্ষে একপ্রকার বিষাক্ত মল (toxic product) সঞ্চিত হয় এবং তাহার ফলে নার্ভপ্রবাহের পক্ষে প্রান্তসন্নিকর্ষের বাধা বা প্রতিকূলতা প্রায় দুর্লঙ্ঘ্য হইয়া পড়ে বলিয়া ক্লান্তি বা অবসাদ (fatigue) এবং নিদ্রা (sleep) উৎপন্ন হয়।

৯। মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ ও গঠন
(Parts and Structure of Brain)

মস্তিষ্ক এবং মেরুদণ্ড মিলিত হইয়া কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্র (Central nervous system) গঠন করে। মস্তিষ্কের প্রধান বিভাগগুলি নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

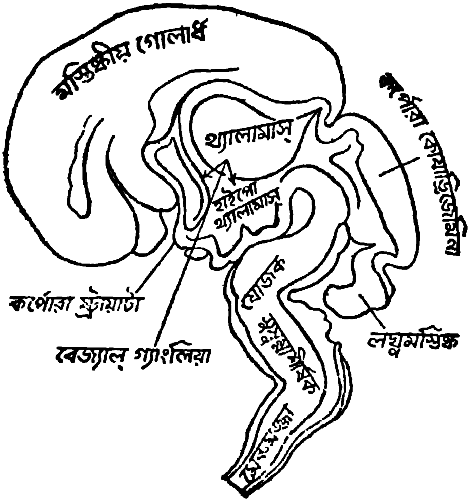
(১) মস্তিষ্কের প্রথম বিভাগ **পশ্চাদ্দেশীয় মস্তিষ্ক** (Hind Brain) ইহার তিনটি অংশ। গ্রীবার উপরে মেরুদণ্ড ক্রমশঃ প্রশস্ত ও স্থূল হইয়া একটি পুষ্পবৃন্তের আকারে মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়াছে এবং এই বৃন্তের উপর ভর করিয়া যেন পুষ্পাকৃতি মস্তিষ্কটি বিরাজ করিতেছে। মস্তিষ্কের এই নিম্নতম পুষ্পবৃন্তাকার অংশকে **আয়ত-মজ্জা বা সুষুম্নাশীর্ষক** (Medula oblongata, Brain-stem, Bulb) বলে। সুষুম্নাশীর্ষকের সম্মুখে একটি বৃহৎ নলাকৃতি স্ফীতাংশ সেতুর মত আড়াআড়িভাবে চলিয়া গিয়াছে। ইহার নাম **যোজক** (Pons)। আবার যোজক ও সুষুম্নাশীর্ষকের দুই পার্শ্বে এবং অধোভাগে রহিয়াছে মস্তিষ্কের আর একটি প্রধান অংশ **লঘুমস্তিষ্ক** বা **ক্ষুদ্র-মস্তিষ্ক** (Cerebellum)। মস্তিষ্কের পশ্চাতে অবস্থিত লঘু মস্তিষ্ককে খোঁপার মত বেণীবদ্ধ দেখায়।

(২) মস্তিষ্কের দ্বিতীয় বিভাগটি **মধ্যমস্তিষ্ক** (Mid-brain)। পশ্চাদ্দেশীয় মস্তিষ্ক উপরের দিকে আরও বিস্তৃত হইয়া মধ্যমস্তিষ্কের আকার ধারণ করিয়াছে। মানুষের মস্তিষ্কে এই অংশটি অতি ক্ষুদ্র।

মধ্য-মস্তিষ্কের নিম্নাংশে **চারটি ঢিবি, পিণ্ড** বা **উচ্চস্থান** Corporta Quadrigemina) এবং ভিতর দিকে দুইটি অত্যন্ত **মোটা তন্তুগুচ্ছ** বা মস্তিষ্কের ডাঁটা (Peduncles) আছে। এই দুইটি পিডাংকল্স্-এর মধ্যে কিছু নার্ভতন্ত্র আছে, যাহার নাম টেগমেণ্টাম (Tegmentum)। ইহার মধ্যাংশে দুইটি সুস্পষ্ট অংশ আছে। ইহারা লোহিত নিউক্লিয়াস্ (Red nucleus) নামক ধূসর পদার্থ এবং সাব্‌স্ট্যানসিয়া নাইগ্রা (Substantia nigra) নামক কৃষ্ণ উপাদান।

(৩) **সম্মুখ মস্তিষ্কই** (Fore-brain) মনুষ্য-মস্তিষ্কের বৃহত্তম অংশ। ইহার পশ্চাদংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে **অন্তঃ মস্তিষ্ক** (Inter-brain)। অন্তঃমস্তিষ্কে রহিয়াছে **বেজ্যাল্ গ্যাংলিয়া** (Basal Ganglia)। ইহা অপ্‌টিক থ্যালামাস (Optic Thalamus), উহার নিম্নদেশে অবস্থিত **হাইপোথ্যালামাস** (Hypothalamus) এবং দুইটি **কর্পোরা স্ট্রায়েটা** (Corpora Striata) লইয়া গঠিত। কিন্তু অন্তঃমস্তিষ্কের প্রধান সম্মুখ আশ হইল **গুরুমস্তিষ্ক** (Cerebrum)। গুরু মস্তিষ্কের আবরণকে বলে **কর্টেক্স** (Cortex)।

গুরুমস্তিষ্ক (cerebrum) মস্তিষ্কের অন্যান্য অংশের তুলনায় আকারে সর্বাপেক্ষা বড়। ইহা আদ্যোপান্ত দুইটি **গোলকার্ধে** (hemisphere) বিভক্ত। প্রত্যেক গোলকার্ধের উপরিভাগ **ভাঁজে** (convolutions) পূর্ণ · দুই গোলকার্ধের ভিতরে **কর্পাস কেলোসাম** (corpus calosum) যোগসূত্র স্থাপন করিয়াছে। যোগসূত্রটি পন্‌স বা যোজকের উপরে।



৯নং চিত্র—মস্তিষ্কের ক্রিয়াঞ্চল

মেরুদণ্ডের মত গুরুমস্তিষ্কেও **ধূসর পদার্থ** (grey matter) এবং **শুভ্র পদার্থ** (white matter) আছে। গুরুমস্তিষ্কে এই দুইটি পদার্থের সন্নিবেশ মেরুদণ্ডের বিপরীত। গুরুমস্তিষ্কে উপরের অংশ ধূসর এবং ভিতরের অংশ শুভ্র পদার্থে পূর্ণ। পক্ষান্তরে মেরুদণ্ডে উপরের অংশই শুভ্র, কিন্তু ভিতরের অংশ ধূসর পদার্থে পূর্ণ।

এই বিপরীত বিন্যাসের কারণ এই যে, গুরুমস্তিষ্কের অনেক সংবেদীয় এবং চেষ্টীয় নার্ভগুচ্ছ সুষুম্নাশীর্ষকে পরস্পর ছেদ করিয়া মেরুদণ্ডের বিপরীত দিকে চলিয়া যায়। পারস্পরিক ছেদ হেতু নার্ভগুচ্ছের এই দিক্ পরিবর্তনকে **ডিকাসেশন্ অফ্ পিরামিড্স** (Decussation of Pyramids) বলে।

গুরুমস্তিষ্কে কয়েকটি চির (fissures) আছে। এই চিরগুলির মধ্যে দুইটি প্রধান—যথা, সম্মুখের **রোলাণ্ডো চির** (Fissure of Rolando) এবং পশ্চাতের পার্শ্ববর্তী (lateral) **সিল্ভিয়স্ চির** (Fissure of Sylvius)। ফিসার অফ্ রোলাণ্ডোকে মধ্য চিরও (central fissure) বলা হয়।

উপরোক্ত চির দুইটি গুরুমস্তিষ্ককে প্রধানতঃ চারটি অঞ্চলে (lobes) বিভক্ত করিয়াছে। ইহাদের নাম **ললাটাঞ্চল** (Frontal lobe, **রগাঞ্চল** (Temporal lobe), **শিরকুণ্ডলাঞ্চল** (Parietal lobe) এবং **শিরনিম্নাঞ্চল** (Occipital lobe)।

মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ ৯নং চিত্রে এবং উহার ভাঁজ, চির এবং অঞ্চলগুলি ১০ নং চিত্রে দেখানো হইয়াছে।

১০। মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের কাজ বা ফাংশন্
(Function of the Brain parts)

(১) পশ্চাৎ মস্তিষ্কের (Hind Brain) কাজ

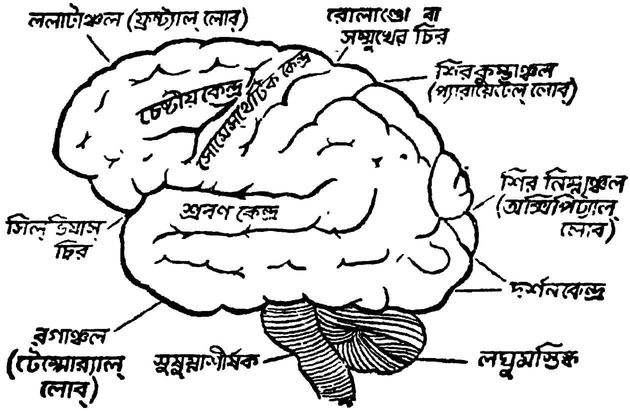
(ক) সুষুম্নাশীর্ষকের (Medulla oblongata) **কাজ**—যোজকের নিম্নে বড় খাঁজ (convolution) হইতে আরম্ভ করিয়া মেরুমজ্জার প্রথম গ্রীবাদেশীয় নার্ভের উদ্গম স্থান পর্যন্ত মস্তিষ্কের অংশকে সুষুম্নাশীর্ষক বলে। সুষুম্নাশীর্ষকের কাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

(১) **ইতর প্রাণীর মস্তিষ্কের সর্বপ্রধান কেন্দ্র সুষুম্নাশীর্ষক**। মানুষ এবং অন্যান্য উচ্চতর প্রাণীদের উচ্চতর কার্যাবলীর প্রধান কেন্দ্র গুরুমস্তিষ্ক। উহাদের সুষুম্নাশীর্ষক জীবন ধারণের পক্ষে অত্যাবশ্যক কাজগুলির কেন্দ্র।

(২) সুষুম্নাশীর্ষক যে স্থানে অবস্থিত তাহা আহত হইলে **সংজ্ঞালোপ**, এমন কি **মৃত্যু** ঘটিতে পারে।

(৩) মেরুদণ্ডের পশ্চাদংশ হইতে যে সকল **সংবেদীয় প্রেরণা** আসে তাহা সুষুম্নাশীর্ষক দ্বারা গৃহীত হয় এবং এই স্থান হইতে উহা গুরুমস্তিষ্কের বহিরাবরণে (cortex) যায়। **শ্রবণযন্ত্র, করোটির চর্ম** এবং **মুখগহ্বরের শ্লেষ্মা ঝিল্লি** হইতে অন্তর্মুখী বা সংবেদীয় নার্ভপ্রবাহ এইস্থানে পৌঁছায়।

(৪) আবার এই স্থান হইতে বহির্মুখী বা **চেষ্টীয় নার্ভপ্রবাহ** পেশীসমূহের এবং লালাগ্রন্থিতে **(Salivary gland)** প্রেরিত হয়।



১০ নং চিত্র—মস্তিষ্কের গোলকার্ধের ভাঁজ, চির এবং অঞ্চল।

(৫) তাহা ছাড়া, দ্বিতীয় স্তরের এবং তৃতীয় স্তরের **প্রতিবর্ত** এই কেন্দ্র দিয়া চলাচল করে।

(৬) শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া, রক্তসঞ্চালন, মুখের পেশীগুলির মুখভাব প্রকাশ, গলাধঃকরণ বা উদ্গীরণ, বমন, হাঁচি, কাশি, লালা-নিঃসরণ, পরিপাক প্রভৃতি **জৈব ক্রিয়াগুলির কেন্দ্র** সুষুম্নাশীর্ষকে অবস্থিত। যে সকল যন্ত্র এই ক্রিয়াগুলি সম্পন্ন করে, উহাদের সহিত সুষুম্নাশীর্ষকের যোগসূত্র কাটিয়া ফেলিলে, ক্রিয়াগুলি বন্ধ হইয়া যায় এবং যোগসূত্র অক্ষুণ্ণ থাকিলে, ক্রিয়াগুলি অটুট থাকে।

(৭) ক্লড্ বার্নাড (Claude Bernard) বলেন যে যকৃতে শর্করার গ্লাইকোজেনে **রূপান্তর** ঘটে সুষুম্নাশীর্ষকের নিয়ন্ত্রণে।

(খ) **যোজকের (Pons) কাজ**—যোজকের মধ্যে আড়াআড়িভাবে অবস্থিত নার্ভগুচ্ছগুলি গুরুমস্তিষ্কের **বহির্মুখী বা চেষ্টীয় নার্ভপ্রবাহ** লঘুমস্তিষ্কে পৌছায়। তাহা ছাড়া এই কেন্দ্রের মধ্য দিয়া **সংবেদীয় ও চেষ্টীয় নার্ভপ্রবাহ** ইহার উপরে ও নীচে চলাচল করে।

যোজক আরও কতগুলি কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। প্রথমতঃ শ্বাসপ্রশ্বাসে নাসিকা, কণ্ঠনালী এবং বাগ্যন্ত্র প্রভৃতির ক্রিয়া এবং কথা বলিবার কালে বাগ্যন্ত্রের ক্রিয়াও

যোজক নিয়ন্ত্রণ করে। তদুপরি আহার করিবার সময় "মুখের ও গলাধঃকরণের পেশীগুলির ক্রিয়া এবং চক্ষু, কর্ণ, ও গ্রীবার সংস্থানও এই অংশের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তাহা ছাড়া নাসিকা, নেত্রবর্ত্মকলা (conjunctiva), পিচুটি-গ্রন্থি (lachrymal glands) এবং নিম্নচোয়াল-সংশ্লিষ্ট নানা প্রতিবর্তিত ক্রিয়াও ইহার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে।"

(গ) **লঘুমস্তিষ্কের (Cerebellum) কাজ**

অঙ্গবিন্যাসের (posture) জন্য আবশ্যক প্রতিবর্ত (reflex action) নিয়ন্ত্রণ করে লঘুমস্তিষ্ক। তাহা ছাড়া, **দেহের ভারসাম্য বোধ** (Equilibrium sense) ও **সুসংবদ্ধ পেশীচালনা** (coordinated movement) এবং **গতিবিধির** নিয়ন্ত্রণ-কেন্দ্র লঘুমস্তিষ্ক। যে অঙ্গের বিন্যাস আবশ্যক সেই দিকের পেশী কণ্ডরা (tendon), অস্থিসন্ধি ও বন্ধনী এবং বিপরীত দিকস্থ অন্তঃকর্ণের অর্ধবৃত্তাকার প্রণালী (Semicircular canal) প্রভৃতি হইতে সংবেদীয় নার্ভপ্রবাহ লঘুমস্তিষ্কে পৌঁছায়। তারপর এই প্রবাহগুলি তিনটি সংযোজক বৃন্তের সাহায্যে যথাক্রমে গুরুমস্তিষ্কে, যোজকে এবং সুষুম্নাকাণ্ডে পরিচালিত হয়। **ফলে অঙ্গবিন্যাস, দেহের ভারসাম্য, সুসংবদ্ধ পেশীচালনা এবং গতিবিধির নিয়ন্ত্রণে দেহের স্থিতিশীলতা এবং গতিশীলতা** সম্ভব হয়।

লঘুমস্তিষ্ক নষ্ট বা ক্ষতিগ্রস্ত হইলে, **হস্তপদ বিচ্ছুরণ, টলায়মানতা, অঙ্গ-কম্পন** প্রভৃতি দেখা দেয়। এই অঙ্গের বিকৃতি ঘটিলে, গতি বা **বিচলন শক্তি, লিখিবার, দেখিবার এবং কথা বলিবার ক্ষমতা** ব্যাহত হয়। যে দিকের লঘুমস্তিষ্ক বিকৃত হয় সেই দিকের **অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিকলতা** (Ataxia) জন্মে।

(২) **মধ্যমস্তিষ্কের (Mid-Brain) কাজ**

কর্পোরা কোয়োড্রিজেমিনা এবং দুইটি সেরিব্র্যাল্ পিডাংকল্স্-এর মধ্যে যে টেগ্‌মেণ্টাম্ নামক নার্ভতন্তু আছে, উহার ভিতর দিয়া বড় বড় **সংবেদীয় নার্ভতন্তু** উহার উপরে অবস্থিত থ্যালামাসে উঠিয়া গিয়াছে। আবার পিডাংকল্স্ হইতে সংবেদীয় নার্ভ রেড্ নিউক্লিয়াসে পৌঁছিয়াছে। রেড্ নিউক্লিয়াস্ **পেশীর ক্ষমতা, শ্রবণ ও অঙ্গসংস্থান ক্রিয়া** নিয়ন্ত্রণ করে। আবার এই কেন্দ্রের মধ্য দিয়া চেষ্টীয় নার্ভপ্রবাহ উপর হইতে নীচে পৌঁছায়।

কর্পোরা কোয়াড্রিজেমিনা চারটি পিণ্ড লইয়া গঠিত। **উপরের পিণ্ড** দুইটি নীচের দিকে দৃষ্টি নিয়ন্ত্রিত করে। তীব্র আলোকে চোখের তারা ছোট হওয়া, চোখের

পাতা বুজিয়া আসা প্রভৃতি প্রতিবর্তের কেন্দ্র ইহারা। এই কারণে ইহাদিগকে **নিম্নদৃষ্টিকেন্দ্র** বলা হয়। আবার নিম্ন পিণ্ড দুইটিকে বলা হয়, **নিম্নশ্রুতিকেন্দ্র**, কারণ সংবেদীয় শ্রবণনার্ভগুলি এই কেন্দ্রে পরিসমাপ্ত।

লোহিত নিউক্লিয়াস্ এবং কৃষ্ণ উপাদানের (Substantia nigra) কাজও উপেক্ষণীয় নয়। প্রথমটি পেশীর বিশেষ সঞ্চালনক্রিয়া সাধন করে। গুরুমস্তিষ্ক, লঘুমস্তিষ্ক প্রভৃতি হইতে আগত চেষ্টীয় নার্ভপ্রবাহ এই কেন্দ্রে প্রয়োজন মত পরিবর্তিত হয়। কৃষ্ণ উপাদান নামক অংশও নৃত্য, ব্যায়াম প্রভৃতিতে প্রয়োজনীয় নিপুণ অঙ্গসঞ্চালন নিয়ন্ত্রিত করে।

(৩) সম্মুখ-মস্তিষ্কের (Fore-Brain) কাজ

(ক) **থ্যালামাস (Thalamus)**-এর কাজ—সম্মুখ মস্তিষ্কের একটি অংশ হইল অন্তঃমস্তিষ্ক বা থ্যালামাস্। শরীরের বিভিন্ন অংশ হইতে অন্তর্মুখী বা সংবেদীয় নার্ভপ্রবাহ এবং উহাদের পেশী বা গ্রন্থিতে পরিচালিত বহির্মুখী বা চেষ্টীয় নার্ভপ্রবাহ নার্ভকোষের সংযোজক নিউরোন্‌গুলির সাহায্যে মস্তিষ্কের সম্মুখভাগে, বিশেষতঃ কর্টেক্সে পৌঁছায় অথবা ঐ কেন্দ্র হইতে বহির্গত হয়। কিন্তু কর্টেক্সে এবং পেশীতে ও গ্রন্থিতে পৌঁছিবার পূর্বে উহারা অন্তঃমস্তিষ্কের, বিশেষতঃ থ্যালামাস্-এর মধ্য দিয়া যায়। থ্যালামাস্-এ অবস্থিত নার্ভকোষ হইতে নার্ভতন্তুসমূহ গুরুমস্তিষ্কের কর্টেক্স-এ এবং কর্টেক্স-এর ভিতরে অবস্থিত চেষ্টীয় বা মোটরকেন্দ্রগুলিতে প্রেরিত হয়।

থ্যালামাস্ **আদিম সংবেদীয় কেন্দ্ররূপে** পরিচিত। ইহা তীব্র অনুভূতির কেন্দ্র। যেমন তীব্র শীত, প্রখর তাপ, অত্যন্ত বেদনা প্রভৃতির চেতনা এই কেন্দ্রে ঘটিয়া থাকে। আবার ক্রোধ, লজ্জা, অনুরাগ প্রভৃতি মানসিক উত্তেজনার ফলে যে সকল প্রতিবর্ত ঘটে, সেইগুলিকে থ্যালামাস্ নিয়ন্ত্রিত করে।

(খ) **কর্পাস্ স্ট্রায়াটাম্ বা বেজ্যাল্ গ্যাংলিয়াকে সমন্বয় কেন্দ্র** বলা হয়, কারণ ইহার ভিতরের নার্ভকোষ চেষ্টীয় ও সংবেদীয় নার্ভপ্রবাহগুলির সমন্বয় সাধন করে। কর্পাস্ স্ট্রায়াটামে থ্যালামাস্ হইতে অন্তর্মুখী বা সংবেদীয় প্রেরণা আসে এবং বহির্মুখী বা চেষ্টীয় প্রেরণা হাইপোথ্যালামাসে যায়। মানুষের মস্তিষ্কে কর্পাস্ স্ট্রায়াটাম্ আকারে ক্ষুদ্র এবং কম ক্রিয়াশীল, কিন্তু ঐচ্ছিক গতিক্রিয়া (voluntary movement) ইহার দ্বারা নিয়মিত। কর্পাস্ স্ট্রায়াটাম্ বিকৃত হইলে পেশীর বিচলন ক্ষমতা ব্যাহত হয়।

(গ) থ্যালামাস্-এর নিম্নে অবস্থিত **হাইপোথ্যালামাস্** বা নিম্নথ্যালামাস্

পরিপাক ক্রিয়া এবং পেশীয় বা চেষ্টীয় ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। তাহা ছাড়া, ইহা অনুভূতি বা প্রক্ষোভের একটি প্রধান কেন্দ্র বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। পরাসমবেদী এবং সমবেদী-নার্ভের (Parasympathetic and Sympathetic nerves) আত্ম-রক্ষামূলক বা আক্রমণাত্মক ক্রিয়া নিম্নথ্যালামাস্ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। আবার পিটুইটারি গ্রন্থি (pituitary gland) কতগুলি মূত্রপ্রতিরোধক ও জরায়ুসঙ্কোচক উত্তেজক উপাদান ক্ষরণ করে। এই ক্ষরিত উপাদান দেহের জলীয় ভাগ, স্নেহ ও শর্করাজাতীয় উপাদানের বিপাক (metabolism) ঘটায়। নিম্নথ্যালামাস্ উপরোক্ত বিপাক প্রক্রিয়ার কেন্দ্র। তাহা ছাড়া, নিদ্রা এবং দেহের তাপসংরক্ষণে নিম্নথ্যালামাস্-এর নিয়ন্ত্রণ অনস্বীকার্য।

(৪) **গুরুমস্তিষ্কের (Cerebrum) কাজ**

সেরিব্রাম্ বা গুরুমস্তিষ্ক নার্ভতন্ত্রের **প্রধান এবং সর্বোচ্চ নিয়ামক কেন্দ্র**। নার্ভতন্ত্রের নিম্নস্তরগুলির সহিত ইহার প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ না থাকিলেও, গৌণ সম্বন্ধ রহিয়াছে। সৈন্যবাহিনীর সর্বময় কর্তা প্রধান সেনাপতি। তিনি প্রত্যেকটি সৈনিকের সহিত প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থাকেন না, অথচ তাঁহার অধস্তন কর্মচারিগণের পর্যায়ক্রমিক মধ্যস্থতায় প্রত্যেকটি সৈনিকের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করেন। গুরুমস্তিষ্কও প্রত্যেকটি নিম্নস্থ নার্ভস্তরকে প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে না, কিন্তু উহার অধস্তন নার্ভস্তরগুলির পর্যায়ক্রমিক সহায়তায় সর্বনিম্ন যে কোনো নার্ভক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করে। এই কারণে **উড্‌ওয়ার্থ্ গুরুমস্তিষ্ককে সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়কের সহিত তুলনা করিয়াছেন।** গুরুমস্তিষ্ক বা সেরিব্রাম্ মনের সকল **উচ্চতর বৃত্তিগুলির কেন্দ্র**। ইচ্ছাশক্তি (volition), চিন্তা, বিচারশক্তি, জ্ঞান, এমন কি উচ্চতর অনুভূতি এবং রস (Sentiment) নিয়ন্ত্রিত হয় ইহা দ্বারা।

মোটের উপর গুরুমস্তিষ্কের কাজগুলি এই: (১) মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার প্রভৃতি উচ্চতর বৃত্তিগুলির কেন্দ্রস্থল গুরুমস্তিষ্ক। (২) গুরুমস্তিষ্কের বহিরাবরণ বা কর্টেক্সে সকল প্রকার সংবেদন, অনুভূতি ও ইচ্ছামূলক ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হয়। বাগিন্দ্রিয়, কথা বলা, লেখা পড়া প্রভৃতির সহিত সংশ্লিষ্ট চেষ্টীয় সংবেদনগুলির কেন্দ্র এই স্থানে অবস্থিত। (৩) শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গতি বা বিচলন কেন্দ্রও সেরিব্রামেই অবস্থিত। এক কথায় **জ্ঞানাত্মক, অনুভূতিমূলক এবং ইচ্ছামূলক সকল মানসক্রিয়ার মূলে রহিয়াছে সেরিব্রাম বা গুরুমস্তিষ্ক।**

১১। মস্তিষ্কের কেন্দ্র বা অঞ্চলের ক্রিয়া এবং স্থান নির্দেশ (Localization of Brain centres, Lobes or Areas and Their Functions)

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে গুরুমস্তিষ্কে (Cerebrum) **তিন প্রকার কেন্দ্র বা অঞ্চল** (Centre, area) রহিয়াছে। ইহারা বিভিন্ন **মস্তিষ্ক-ক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র**।

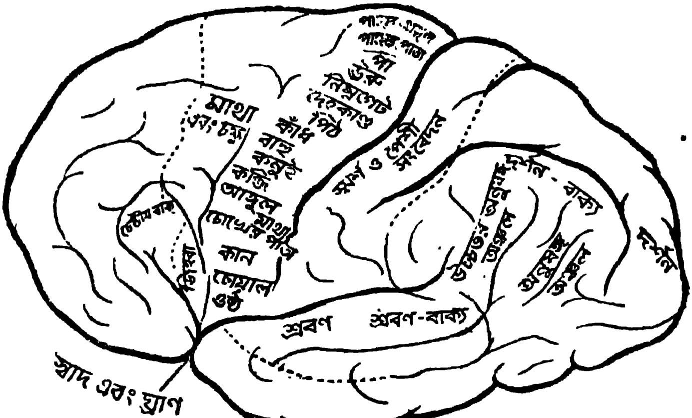
(ক) **চেষ্টীয় কেন্দ্র** (Motor Area)—গুরুমস্তিষ্কস্থ ফিসার্ অফ্ রোলাণ্ডো বা সম্মুখ চিরের সম্মুখে ললাটাঞ্চলে (Frontal lobe) চেষ্টীয় কেন্দ্র অবস্থিত। পায়ের আঙুল হইতে আরম্ভ করিয়া হাঁটু, জঙ্ঘা, পেট, বুক, ঘাড়, কনুই, কব্জি, হাত, গলা, মুখ, ঠোঁট, জিহ্বা, স্বরনালী, চোখ, কপাল, মাথা প্রভৃতি অংশগুলির কেন্দ্র **বিপরীতক্রমে** এই অঞ্চলে অবস্থিত। অর্থাৎ সর্বোচ্চ অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলির বিচলন নিয়ন্ত্রিত হয় এই অঞ্চলের সর্বাপেক্ষা সম্মুখাংশীয় বা নিম্নে অবস্থিত কেন্দ্রের দ্বারা এবং সর্বনিম্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলির বিচলন নিয়ন্ত্রিত হয় ইহার সর্বাপেক্ষা পশ্চাদংশীয় বা উচ্চে অবস্থিত কেন্দ্রগুলির দ্বারা। ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে বাম অঙ্গের মোটর কেন্দ্র দক্ষিণ সেরিব্রামে এবং দক্ষিণ অঙ্গের মোটর কেন্দ্র বাম সেরিব্রামে অবস্থিত। পূর্বোল্লিখিত ডিকাসেশন্ অফ্ পিরামিড্স্ই ইহার কারণ।

১০ এবং ১১নং চিত্রে মস্তিষ্কের উপরোক্ত ক্রিয়াঞ্চলগুলি দেখানো হইয়াছে।

ডাঃ ব্রোকা ফ্রণ্ট্যাল্ প্রদেশে 'কথা বলার কেন্দ্র' (motor speech centre) আবিষ্কার করেন। সেই কারণে এই প্রদেশকে **ব্রোকার প্রদেশ'** (Broca's Area) বলা হয়। দর্শন, শ্রবণ, মনন, লিখন ও পঠন, এই সংবেদনগুলি লইয়া বাগিন্দ্রিয় গঠিত। এই সংবেদনগুলির কেন্দ্র যথাক্রমে টেম্পোর‍্যাল, ফ্রণ্ট্যাল্ এবং প্যারায়েট্যাল্ লোবে অবস্থিত। এই কেন্দ্রগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে নানাপ্রকার শব্দরোগ (aphasia) উৎপন্ন হয়। দর্শনকেন্দ্রে আঘাত লাগিলে লেখা অক্ষর বুঝা যায় না। আবার শ্রবণ এবং দর্শনের মোটর কেন্দ্রে আঘাত লাগিলে মোটর অ্যাফেসিয়া ঘটে, অর্থাৎ শব্দ উচ্চারণ এবং লিখন শক্তি নষ্ট হয়।

(খ) **সংবেদীয় ক্ষেত্র** (Sensory Area)—রোলাণ্ডো চিরের (Fissure of Rolando) ঠিক পশ্চাতে শিরকুন্তলাঞ্চলের (Parietal lobe) সম্মুখে রহিয়াছে **চেষ্টাবেদন** (Kinaesthetic) সংবেদন এবং **স্পর্শ** সংবেদনের ক্ষেত্র। ইহাকে সোমাটিক্ বা সোমেস্থেটিক্ (Somatic, Somaesthetic) অঞ্চল বলে। দর্শন

সংবেদনের কেন্দ্র সিল্‌ভিয়াস্ চিরের (Fissure of Sylvius) ঠিক নীচে—অন্তঃ-মস্তিষ্কের রগাঞ্চলে (Temporal lobe) অবস্থিত। **আস্বাদন** এবং **ঘ্রাণ** সংবেদনের



১১নং চিত্র—মস্তিষ্কের ক্রিয়াঞ্চল

কেন্দ্র সঠিকভাবে জানা যায় নাই, সম্ভবতঃ ইহা ললাটাঞ্চলের পশ্চাদংশে অবস্থিত হিপ্পোক্যাম্প্যাল্ অঞ্চলে (Hippocampal Area) অবস্থিত। **বেদনার** মস্তিষ্ককেন্দ্র এখনও অজ্ঞাত।

(গ) **অনুষঙ্গ অঞ্চল** (Association Area) সম্বন্ধে জ্ঞান এখনও অত্যন্ত অস্পষ্ট। এই অঞ্চলের কার্য সম্বন্ধেও কোনো সঠিক জ্ঞান লাভ করা যায় নাই। এই জাতীয় প্রধান প্রধান অঞ্চলের সংখ্যা **চারটি**। প্রথমটি ফ্রণ্ট্যাল্ লোব্-এর অধিকাংশ লইয়া গঠিত। দ্বিতীয়টি রহিয়াছে চেষ্টাবেদন, স্পর্শ এবং দর্শন কেন্দ্রের স্থানগুলিতে প্যারায়েটেল্ লোবে। তৃতীয়টি টেম্পোর্যাল্ লোব্-এর অধিকাংশ লইয়া গঠিত। চতুর্থ ক্ষেত্রটি রহিয়াছে রেইল্ এলাকায় অথবা আয়ল্যাণ্ড্ অব্ রেইলে (Island of Reil)।

কিন্তু পৃথক্ ক্রিয়াসকল সেরিব্রাম্-এর পৃথক্ পৃথক্ কেন্দ্রগুলি দ্বারা প্রধানতঃ নিয়ন্ত্রিত হইলেও, সেরিব্রাম্-এর বিভিন্ন কেন্দ্রগুলি **বিচ্ছিন্নভাবে কার্য করে না**, কিন্তু কার্য করে সংযুক্ত ও সমবেতভাবে। অর্থাৎ একটি ক্রিয়ায় মস্তিষ্কের একাধিক অংশ একযোগে ক্রিয়াশীল হয়। ফলে, কোনো একটি কেন্দ্র ক্ষতিগ্রস্ত হইলে, উহার পাশাপাশি কেন্দ্রগুলি উহার কাজ আংশিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করিবার ভার লয়।

যেমন, **ফ্লাউরেন্স্** (Flourens) প্রভৃতি শারীরবৃত্তবিদ্ মনে করেন যে মস্তিষ্কের উপরোক্ত বিভাগগুলি পরস্পর-বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে না। তাঁহাদের মতে **মস্তিষ্ক সমগ্র হিসাবে কাজ করে** (The brain acts as a whole)। ইহার অর্থ এই নয় যে, প্রত্যেক কার্যে মস্তিষ্কের প্রত্যেকটি অংশই একযোগে ক্রিয়াশীল হইয়া থাকে। যেমন, **হেরিক** (Herrick) দেখাইয়াছেন, ইহার অর্থ এই যে মস্তিষ্কের কয়েকটি এলাকা বা অঞ্চল জুড়িয়া একটি **বিস্তৃত প্যাটার্ন্ বা নক্সা** গঠিত হয়। এই প্যাটার্ন্-এর কোনো ক্ষুদ্র অংশ বিকল হইলে, উহার সন্নিহিত কোনো অংশ উহার কাজ সম্পাদন করে। কিন্তু উহার কোনো বৃহৎ অংশ ক্ষুন্ন হইলে, কোনো সন্নিহিত অংশ উহার কাজ সম্পাদন করে না, ফলে কাজটি ব্যাহত হয়। ইহাই **ফ্রান্জ্** (Franz) এবং **ল্যাশ্লে** (Lashley) প্রদর্শিত মস্তিষ্কের সমশক্তিমূলক ক্রিয়া সূত্র (Law of Equipotential Function) এবং সমষ্টিগত ক্রিয়া সূত্র (Law of Mass Action)।

মস্তিষ্কের উপরোক্ত কেন্দ্রনির্দেশ অথবা উহাদের ক্রিয়াস্থানগুলি **নিরূপণের** জন্য যে **বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি** অনুসৃত হইয়াছে সেইগুলি আলোচনা করা যাইতেছে :—

(ক] **তুলনামূলক পদ্ধতি** Comparative Method)—ভ্রূণবিদ্যা পদ্ধতি (Embryological method) ইহার অন্তর্ভুক্ত। নার্ভতন্ত্রের বিভিন্ন অংশের আবির্ভাব ও ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের আবির্ভাব ও ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করিলে, নার্ভতন্ত্রের কোন্ অংশের সহিত কোন্ ক্রিয়ার সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহা বিশুদ্ধভাবে না হইলেও মোটের উপর বুঝা যাইতে পারে।

(খ) **রোগিপরীক্ষামূলক** (Clinical) **এবং রোগবিদ্যামূলক** (Pathological) **পদ্ধতি**—দ্বিতীয়তঃ বিভিন্ন অস্বভাবী লক্ষণের সহিত সংশ্লিষ্ট নার্ভতন্ত্রের বিভিন্ন অংশের অসুস্থতা বা বিকৃতি অনুসন্ধান করিয়াও উহার কেন্দ্রগুলি নিরূপণ করা যাইতে পারে।

(গ) **শারীরবৃত্তীয়** (Physiological) **পদ্ধতি** - এই পদ্ধতিটি তিন প্রকারের হইতে পারে—যথা (১) **নার্ভতন্তুর উৎস সন্ধান** (fibre-tracing) প্রণালী সাহায্যে নার্ভক্ষয় (nerve degeneration) গবেষণা করিয়া শারীরবৃত্তবিদেরা ঐ নার্ভের গতি যে ধ্বংসপ্রাপ্ত নার্ভ-প্রান্তে শেষ হইয়াছে, তাহা নিরূপণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। (২) **অঙ্গব্যবচ্ছেদ** (Extirpation) প্রণালী সাহায্যে শারীরবৃত্তবিদেরা অস্ত্রোপচারের ফলে নার্ভতন্ত্র হইতে বিভিন্ন কেন্দ্রগুলিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া গবেষণা পরিচালনা

করিয়াছেন। তাঁহারা লক্ষ্য করিয়াছেন, এই ব্যবচ্ছেদের ফলে কোন্ ক্রিয়া ব্যাহত হয়। যে অংশ বিচ্ছেদের ফলে যে ক্রিয়া লুপ্ত বা বিকৃত হয় সেই অংশ সেই ক্রিয়ার কেন্দ্র। তৃতীয় শারীরবৃত্তীয় গবেষণা প্রণালী হইল তাড়িত **উদ্দীপনা** (Electrical Stimulation)। শারীরবৃত্তীয়বিদেরা গবেষণা করিয়া দেখিয়াছেন যে মস্তিষ্কের কোনো কোনো স্থানকে বিদ্যুতের সাহায্যে উদ্দীপিত করিলে, কোনো কোনো ক্রিয়া সংঘটিত হয়। এই পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়, ঐ ঐ স্থানগুলি ঐ ঐ ক্রিয়াগুলির নিয়ন্ত্রণকেন্দ্র।

১২। সুষুম্নাকাণ্ড (Spinal Cord)

(১) ভূমিকা

যে কারণে সুষুম্নাকাণ্ডকে কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্রের অংশ বলা হয় তাহা এই। **ঊর্ধ্ববাহী** (ascending, অর্থাৎ সংবেদীয়) এবং **নিম্নবাহী** (descending, অর্থাৎ চেষ্টীয়) নার্ভসমূহ দিয়া সুষুম্নাকাণ্ড উচ্চতর মস্তিষ্ককেন্দ্রে উদ্দীপনা **প্রেরণ** করে, আবার ঐ কেন্দ্র হইতে উদ্দীপনা **গ্রহণ** করে।

উপরোক্ত উদ্দেশ্যটি ছাড়া সুষুম্নাকাণ্ডের আরও একটি উদ্দেশ্য আছে। সুষুম্নাকাণ্ড প্রতিবর্তের (reflex) সংযোজক কেন্দ্র এবং জীবশরীরের সামগ্রিকতার (integration) প্রথম স্তর। মস্তিষ্ক জটিলতম সামগ্রিক চেষ্টিতের বা আচরণের কেন্দ্র। কিন্তু সুষুম্নাকাণ্ড প্রতিবর্তের মত সহজ (Simple) চেষ্টিতের কেন্দ্র।

সুষুম্নাকাণ্ডে প্রবিষ্ট নার্ভপ্রবাহ উহাতে সীমাবদ্ধ থাকে না। অধিকাংশ নার্ভপ্রবাহ মস্তিষ্কে ঊর্ধ্ববাহিত হয়। এই প্রবাহগুলি মস্তিষ্কের অসংখ্য বক্রপথ (circuits) পরিভ্রমণের ফলে যে চেষ্টীয় প্রবাহ উৎপন্ন হয়, তাহা নিম্নবাহিত হইয়া সুষুম্নাকাণ্ডে পৌঁছায়।

সুষুম্নাকাণ্ডের ঊর্ধ্ববাহী এবং নিম্নবাহী পথ নির্দিষ্ট। উহাদের অধিকাংশেরই শরীরের বিপরীত পার্শ্বে স্থানপরিবর্তন ঘটে। যেমন, মস্তিষ্ক হইতে যে সকল চেষ্টীয় নার্ভ প্রবাহিত হয়, সেইগুলি সুষুম্নাকাণ্ডে পৌঁছিয়া, পারস্পরিক ছেদের ফলে, বিপরীত পার্শ্বের চেষ্টীয় নার্ভে পরিচালিত হয়। আবার, সুষুম্নাকাণ্ড হইতে যে সকল সংবেদীয় নার্ভপ্রবাহ মস্তিষ্কে ঊর্ধ্ববাহিত হয়, সেইগুলিও পারস্পরিক ছেদের ফলে বিপরীত পার্শ্বের সংবেদীয় নার্ভে পরিচালিত হয়। এই বিপরীত গতির কারণ সুষুম্নাশীর্ষকে decussation of Pyramids অথবা নার্ভগুচ্ছের কোনাকুনি বিভাগ।

(২) মেরুদণ্ডের গঠন
(Structure of the Spinal Cord)

সুষুম্নাকাণ্ড মলদ্বার বা বস্তিগহ্বরের (rectum) একটু উপর হইতে আরম্ভ হইয়া সুষুম্নাশীর্ষকের (medulla oblongata) নিম্নে স্কন্ধদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত। অথবা সুষুম্নাকাণ্ড সুষুম্নাশীর্ষকের বৃহৎ ছিদ্রের (Foramen Magnum) সমভূমিতে উৎপন্ন হইয়া নীচে কটিদেশীয় (lumbar) দ্বিতীয় অস্থির সমভূমিতে প্রলম্বিত হয়।

মোটের উপর ৩৩ অথবা ৩৪ খানি দণ্ডাস্থি বা **কশেরুকা** (vertebrae) দ্বারা মেরুদণ্ড গঠিত। কশেরুকাগুলি একটি আর একটির উপর সুষমভাবে সাজানো। ফলে সুষুম্নাকাণ্ড একটি দণ্ডের (Spinal column) আকার ধারণ করে। এই কারণে ইহাকে **মেরুদণ্ড বলা যাইতে পারে**। আবার প্রত্যেকটি দণ্ডাস্থি বা কশেরুকা সচ্ছিদ্র অথবা গহ্বরবিশিষ্ট। উহারা একটি আর একটির উপর সমভাবে স্থাপিত। ফলে, মেরুদণ্ডের নিম্নতর প্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া মস্তিষ্কের অধোভাগ পর্যন্ত একটি **ছিদ্র** বা নালিকার সৃষ্টি হইয়াছে। ছিদ্র বা নালিকাটি একপ্রকার কোমল পদার্থে পরিপূর্ণ। মেরুদণ্ডের মধ্যস্থিত এই কোমল পদার্থকে **মেরুমজ্জা** (spinal cord) বা সুষুম্নকাণ্ড বলে। মেরুমজ্জা একটি সূত্রের মত সমস্ত মেরুদণ্ড-নালিকায় (spinal canal) ব্যাপ্ত হইয়া আছে।

প্রস্থচ্ছেদ (dissection) করিলে দেখা যায় যে মেরুদণ্ডে দুই প্রকার পদার্থ আছে—উহার ভিতরের অংশটি **ধূসর** এবং ধূসর পদার্থকে বেষ্টন করিয়া উহার বাহিরে যে অংশটি আছে তাহা **শ্বেত**। যে বহিরাবরণ মেরুদণ্ডকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে তাহা কঠিন বাহ্যঝিল্লি (tough outer membrane) এবং ইহার নাম ডিউরা মাতের (dura mater)। মাধ্যমিক আবরণী স্তরটির নাম অ্যারাকনয়েড (arachnoid) এবং আভ্যন্তরীণ আবরণটির নাম পায়া মাতের (pia mater)। ধূসর এবং শ্বেত পদার্থটিকে আকৃতিতে একটি প্রজাপতির মত অথবা ইংরাজী এইচ্ (H)-এর মত দেখায়। ধূসর পদার্থ নার্ভকোষগুচ্ছ (nerve-cell) এবং শ্বেতপদার্থ নার্ভতন্তু দিয়া গঠিত। ধূসর এবং শ্বেত মজ্জার উপাদান হইল লসিকার (lymph) মত একপ্রকার তরল পদার্থ। তরল পদার্থে সংযোজক নিউরোন (connector neurons) এবং অন্যান্য কোষ বিদ্যমান। আবার শ্বেতপদার্থ ঊর্ধ্ববাহী এবং নিম্নবাহী নার্ভশ্রেণী লইয়া গঠিত। এইগুলিকে সাদা দেখায়, কারণ উহাদের মধ্যে যে তন্তুগুলি (fibre) রহিয়াছে, সেইগুলি মায়েলিন সীদরূপ (myelin sheath) একটি সাদা মেদময় আবরণে আবৃত।

মেরুদণ্ডের গড় দৈর্ঘ্য প্রায় ৪৫ সেন্টিমিটার। দুইটি অবনমিত **অর্ধনালী** (fissure) বা খাঁজ দ্বারা মেরুদণ্ড দক্ষিণ ও বাম অংশে (lateral halves) বিভক্ত। এই ফিসার্ অথবা চির দুইটিকে সম্মুখের মধ্যচির (anterior or ventral median fissure) এবং পশ্চাতের মধ্য খাঁজ (posterior or dorsal median sulcus) বলে। এই চির দুইটি থাকিবার ফলে, মেরুমজ্জার একটি সঙ্কীর্ণ সেতু ইহার দুইটি অর্ধকে যুক্ত করে। এই সেতুটির নাম ট্র্যান্স্ভার্স কমিসার্ (transverse commissure)। ইহার মধ্যে একটি নালি (central canal) একটানাভাবে চলিয়া গিয়াছে। এই নালিটি মেরুদণ্ডস্থিত চতুর্থ গহ্বরের (ventricle) উপরের দিকে উন্মুক্ত হয় এবং ফাইলাম্ টার্মিনেলে বদ্ধভাবে শেষ হয়।

উপরে **সাধারণভাবে** মেরুদণ্ডের গঠন আলোচিত হইয়াছে। ইহার গঠন আর একটু **বিশেষভাবে** আলোচনা করা যাউক।

মেরুদণ্ডের **পাঁচটি ভাগ** আছে—যথা **গ্রীবাদেশীয়** (cervical), **বক্ষোদেশীয়** (thoracic), **কটিদেশীয়** (lumbar), **নিম্নদেশীয় বা ত্রিকাস্থি** (sacral) এবং **অনু-ত্রিকাস্থি** (coccyx)। এই পাঁচটি যথাক্রমে সাত, বার, পাঁচ, পাঁচ এবং চার বা পাঁচখানি অস্থি বা কশেরুকা লইয়া গঠিত। তাহা হইলে, মেরুদণ্ড **তেত্রিশ বা চৌত্রিশখানি অস্থি** লইয়া গঠিত হইয়াছে দেখা যায়। আবার প্রতি দুইটি কশেরুকার মধ্যস্থলে একটি করিয়া নমনীয় উপাস্থির **চাক্তি** (disc) থাকায় কশেরুকাগুলি মজবুত অথচ নমনীয়ভাবে সংবদ্ধ থাকে।

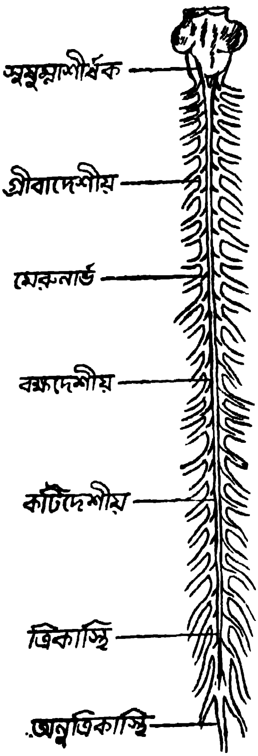
মেরুদণ্ডের বিভিন্ন দেশে অস্থিসংখ্যার বণ্টন নিম্নতালিকায় দেখানো হইল :

মেরুদণ্ডের পাঁচটি ভাগ	**অস্থিসংখ্যা**
গ্রীবাদেশীয়	সাত
বক্ষোদেশীয়	বার
কটিদেশীয়	পাঁচ
ত্রিকাস্থিদেশীয়	পাঁচ
অনুত্রিকাস্থিদেশীয়	চার বা পাঁচ

উপর হইতে নীচে সুষুম্নাকাণ্ডের আকার অল্প হ্রাস পায়। ইহাতে দুইটি বর্ধিত আকার (enlargement) রহিয়াছে, একটি গ্রীবাদেশীয় (cervical) এবং অপরটি কটিদেশীয় (lumbar), অর্থাৎ এই দুইটি অঞ্চলে সুষুম্নাকাণ্ড বর্ধিত আকার ধারণ করিয়াছে। শেষোক্ত স্থল হইতে নামিয়া কোনাস্ মেডুলারিস্ (conus medullaris)

নামক স্থানে উহার আকার ছোট হয় এবং এই স্থানে অসংখ্য অ-নার্ভীয় (non-nervous) সূত্রের মত বস্তু বাহির হয় যাহার নাম ফাইলাম্ টার্মিনেল (filum terminale)। এই সূত্রগুলি দ্বিতীয় ত্রিকাস্থিদেশীয় অস্থির (sacral vertebra) সমভূমিতে ডিউরা মাতেরকে বিদ্ধ করে এবং প্রথম অনুত্রিকাস্থিদেশীয় অস্থিতে (coccygeal vertebra) শেষ হয়।

প্রথম এবং দ্বিতীয় বর্ধিত স্থলের নার্ভগুলি যথাক্রমে বাহুর এবং পায়ের সহিত যুক্ত। সুষুম্নাকাণ্ড প্রথম এবং দ্বিতীয় কটিদেশীয় অস্থির বিপরীত পার্শ্বে শেষ হয়। অথচ অস্থিগুলির অন্তর্দেশে যে ছিদ্র রহিয়াছে, কটিদেশীয়, ত্রিকাস্থিদেশীয় এবং অনুত্রিকাস্থিদেশীয় নার্ভগুলির তাহার মধ্যে যথাস্থানে প্রবেশ করার উপায় থাকা চাই। সুতরাং এই নার্ভগুলি কঠিন আবরণস্থ থলিতে (dural sac), ফাইলাম্ টার্মিনেল সহ নামিয়া আসে। তন্তুব এই গুচ্ছের নাম কডা ইকুইনা (cauda equina), কারণ ইহা দেখিতে ঘোড়ার লেজের মত।



১২নং চিত্র—মেরুদণ্ডের পাঁচটি ভাগ দেখানো হইয়াছে

মেরু-নার্ভ (spinal nerve) মেরুদণ্ডের উভয় দিক হইতে বাহির হয়। মেরুদণ্ডে প্রবেশ করিবার মুখে প্রত্যেক নার্ভের **দুইটি মূল** বা রুট্ থাকে—একটি সম্মুখের (anterior, ventral) এবং অপরটি পশ্চাতের পৃষ্ঠদেশের (posterior, dorsal)। ইহাদের প্রথমটি বহির্মুখী বা চেষ্টীয় এবং দ্বিতীয়টি অন্তর্মুখী বা সংবেদীয় নার্ভের উৎসমুখ।

দেখা গেল যে, প্রতিটি মেরুনার্ভ মেরুদণ্ড হইতে একটি সম্মুখ ও একটি পশ্চাৎ এই দুইটি মূল লইয়া বাহির হইয়াছে। অথবা মেরুদণ্ডের দক্ষিণে ও বামে প্রত্যেক জোড়া কশেরুকার সংযোগস্থল হইতে মেরুনার্ভগুলি নির্গত হইয়াছে।

মেরুনার্ভগুলির সংখ্যা একত্রিশ জোড়া। মেরুদণ্ডের গ্রীবাদেশে (Cervical) আট জোড়া, বক্ষোদেশে (Thoracic) বার জোড়া, কটিদেশে (Lumbar) পাঁচ জোড়া,

ত্রিকাস্থি দেশে (Sacral) পাঁচ জোড়া এবং অনুত্রিকাস্থি দেশে (Coccygeal) এক জোড়া করিয়া মেরুনার্ভ মেরুদণ্ডের দক্ষিণ ও বাম অংশে প্রবেশ করিয়াছে।

যেহেতু মেরুনার্ভগুলি বহিঃপ্রান্তীয় নার্ভতন্ত্রের অংশ, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের বহিঃপ্রান্তীয় নার্ভতন্ত্র শীর্ষক ২য় অনুচ্ছেদে উহাদের তালিকা দেওয়া হইল।

মেরুদণ্ডের শ্বেত ও ধূসর পদার্থ সম্মুখবর্তী (anterior) এবং পশ্চাদ্বর্তী (posterior) হর্ন দ্বারা **তিন ভাগে** (column) বিভক্ত হইয়াছে যথা, সম্মুখবর্তী, পার্শ্ববর্তী (lateral) এবং পশ্চাদ্বর্তী ভাগ। এই তিনটি ভাগের নার্ভগুলি গুচ্ছাকারে সজ্জিত হইয়া মেরুদণ্ডের **অঞ্চল** (tract) গঠিত করে—যথা, উর্ধ্বগামী অঞ্চল (ascending tracts) এবং নিম্নবাহী অঞ্চল (descending tracts)।

মেরুনার্ভগুলি বহিঃপ্রান্তীয় নার্ভ। কাজে কাজেই উহাদের আরও বিস্তৃত আলোচনা পরবর্তী পরিচ্ছেদের বহিঃপ্রান্তীয় নার্ভতন্ত্র শীর্ষক ২নং অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

(৩) মেরুদণ্ডের গতিপথ

(The Pathways of Spinal Cord)

মেরুদণ্ডের গতিপথ প্রথমতঃ (ক) **উর্ধ্বগামী** (ascending) (খ) এবং **নিম্নগামী** (descending) ভেদে দ্বিবিধ।

(ক) উর্ধ্বগামী গতিপথ :

মেরুদণ্ডের উর্ধ্বগামী গতিপথ চারিটি, যথা (১) পশ্চাদ্বর্তী (Dorsal), (২) মেরুথ্যালামীয় (Spinothalamic), (৩) পশ্চাদ্বর্তী মেরুলঘুমস্তিষ্কীয় (Dorsal Spinocerebellar) এবং (৪) সম্মুখবর্তী মেরুলঘুমস্তিষ্কীয় (Ventral Spinocerebellar) গতিপথ।

(১) **পশ্চাদ্বর্তী** সংবেদীয় নার্ভের কতকগুলি মেরুমজ্জার পশ্চাদংশের **মধ্যভাগ** (medial), আবার কতকগুলি ইহার পার্শ্ব (lateral) হইতে উর্ধ্বগামী হইয়া থ্যালামাস-এ শেষ হয় এবং তথা হইতে গুরুমস্তিষ্কের সংবেদীয় কেন্দ্রে প্রেরিত হয়। প্রথমোক্ত নার্ভগুলি ত্রিকাস্থি, কটি এবং নিম্ন বক্ষোদেশীয় পশ্চাৎমূলের নার্ভগ্রন্থি হইতে উৎপন্ন হইয়া উর্ধ্বগামী হয়। আবার শেষোক্ত নার্ভগুলি উপরের বক্ষোদেশীয় এবং গ্রীবাদেশীয় নার্ভগ্রন্থি হইতে উৎপন্ন হইয়া উর্ধ্বগামী হয়। উভয় নার্ভগুলিই থ্যালামাস-এ পৌছিবার পূর্বে এই নার্ভগুলি পরস্পরকে ছেদ করিয়া বিপরীত দিকে

স্থান পরিবর্তন করে। মেরুমজ্জায়ই স্থান পরিবর্তন (Decussation) ঘটে। সকল মেরুনার্ভই মস্তিষ্কে পৌঁছিবার পূর্বে স্থান পরিবর্তন করে।

উপরোক্ত উভয় গতিপথই পেশী, কণ্ডরা এবং সন্ধি প্রভৃতি গতিসংবেদয়ী সংগ্রাহক যন্ত্র হইতে নার্ভপ্রবাহ পরিচালনা করে। তাহা ছাড়া, দৈশিক বিনিশ্চয় (spatial discrimination), স্পর্শসংবেদনের স্থান নির্দেশ (tactile localization), স্পন্দন সংবেদন (vibratory sensation) এবং দ্বিবিন্দু অথবা আপেক্ষিক বিনিশ্চয় (two-point or relative discrimination) প্রভৃতির সহিত সংশ্লিষ্ট নার্ভপ্রবাহ এই গতিপথে সঞ্চরণ করে।

(২) **মেরুথ্যালামীয়** নার্ভ মেরুমজ্জার পশ্চাদ্বর্তী ধূসর পদার্থস্থ বড় নার্ভকোষ হইতে উদ্ভূত। ইহারা পার্শ্ববর্তী এবং সম্মুখবর্তী মেরুথ্যালামীয় গতিপথে ঊর্ধ্বগামী হয় এবং থ্যালামাস-এ শেষ হয়। পার্শ্ববর্তী গতিপথ বেদনা এবং তাপের নার্ভপ্রবাহ বহন করে এবং সম্মুখবর্তী গতিপথে বাহিত হয় স্পর্শ এবং চাপ সংবেদনের নার্ভপ্রবাহ।

(৩) মেরুমজ্জার মধ্যভাগীয় ধূসর পদার্থ (gray matter) হইতে **পশ্চাদ্বর্তী মেরুলঘুমস্তিষ্কীয়** গতিপথ আরম্ভ হয়। ইহা স্থান পরিবর্তন করিয়া মেরুমজ্জার **শ্বেতপদার্থে** (white matter) আসে এবং সুষুম্নাশীর্ষকে ঊর্ধ্বগামী হইয়া লঘু-মস্তিষ্কের বহিঃস্তরে (cortex) শেষ হয়। এই গতিপথ সকল দেহাংশের, বিশেষতঃ দেহকাণ্ডের এবং নিম্ন দেহপ্রান্তের পেশী এবং কণ্ডরা হইতে নার্ভপ্রবাহ পরিচালনা করে।

(৪) **সম্মুখবর্তী মেরুলঘুমস্তিষ্কীয়** গতিপথও আরম্ভ হয় মেরুমজ্জার মধ্যভাগস্থ ধূসর পদার্থের নার্ভকোষ হইতে। অধিকাংশ নার্ভই মেরুমজ্জায় পরস্পরকে ছেদ করিয়া ঊর্ধ্বগামী হয় এবং লঘুমস্তিষ্কে পৌঁছায়। এই নার্ভগুলি আভ্যন্তরীণ ইন্দ্রিয়ের (internal organs) নার্ভপ্রবাহ বহন করে সকল দেহাংশ হইতেই।

শেষোক্ত দুইটি মেরুলঘুমস্তিষ্কীয় গতিপথই পেশী, কণ্ডরা, সন্ধি প্রভৃতি সংগ্রাহক যন্ত্র হইতে নার্ভপ্রবাহ বহন করে। ফলে, ঐচ্ছিক পেশীর উপর লঘুমস্তিষ্ক প্রভাব বিস্তার করিতে পারে।

(খ) নিম্নগামী গতিপথ :

মেরুদণ্ডের নিম্নগামী গতিপথও প্রধানতঃ চারটি, যথা (১) ছিন্ন (crossed) পিরামিডাল, (২) অ-ছিন্ন (uncrossed) পিরামিডাল, (৩) অ-পিরামিডাল (৪) অন্যান্য নিম্নগামী গতিপথ।

(১) এই গতিপথকে মস্তিষ্কীয়-মেরুদণ্ডীয় (cortico-spinal) বলা হয়। ইহার নার্ভগুলি গুরুমস্তিষ্ক হইতে শুরু হইয়া মধ্যমস্তিষ্ক, যোজক ও সুষুম্নাশীর্ষকের মধ্য দিয়া নামে এবং মেরুমজ্জায় স্থান পরিবর্তন করিয়া ছিন্ন পিরামিডাল গতিপথ রূপে নিম্নগামী হয়।

(২) অ-ছিন্ন পিরামিডাল গতিপথের নার্ভগুলি স্থান পরিবর্তন না করিয়া একই পার্শ্বে সোজা পিরামিডাল গতিপথ রূপে নিম্নগামী হয়। ইহার নার্ভগুলি মেরুমজ্জার ধূসর পদার্থে শেষ হয়। ইহারা ঐচ্ছিক বিচলনের (movements) নার্ভপ্রবাহ বহন করে।

(৩) অ-পিরামিডাল নার্ভ সকল সুষুম্নাশীর্ষকে উদ্ভূত হইয়া অ-ছিন্নভাবে মেরুমজ্জায় নিম্নগামী হয়। ইহারা মধ্যকর্ণ এবং লঘুমস্তিষ্ক হইতে গৃহীত নার্ভপ্রবাহ পরিচালিত করে। এই নার্ভপ্রবাহ দেহকাণ্ডের এবং দেহপ্রান্তের পেশীকে প্রভাবিত করিয়া দেহসাম্য (body equilibrium) এবং অবস্থান (posture) সংরক্ষণে সহায়ক হয়।

আরও কতকগুলি অ-পিরামিডাল নার্ভ মধ্যমস্তিষ্কের লোহিত কোষদেহকেন্দ্র (Red Nucleus) হইতে উৎপন্ন হইয়া পারস্পরিক ছেদের পরে মেরুমজ্জায় নিম্নগামী হয়। ইহারা বক্ষোদেশীয় মেরুমজ্জার সম্মুখস্থ ধূসর পদার্থের পশ্চাদ্দেশীয় অংশের কোষের নিকট শেষ হয়। অবস্থানমূলক প্রতিবর্ত (postural reflex) এবং প্রয়োজনীয় সমন্বয় (co-ordination) সাধনে ইহারা সহায়তা করে। কারণ লোহিত কোষ-দেহকেন্দ্র লঘুমস্তিষ্ক এবং ভেস্টিবিউল হইতে প্রাপ্ত নার্ভপ্রবাহ মস্তিষ্কবৃন্তে অথবা আয়তমজ্জায় (brain stem) এবং মেরুমজ্জায় প্রেরণ করে।

আবার তৃতীয় শ্রেণীর অ-পিরামিডাল নার্ভসকল মধ্যমস্তিষ্কস্থ কোষ হইতে বাহির হইয়া মেরুমজ্জায় নামিয়া স্থানবদল করে এবং উহার সম্মুখস্থ ধূসর পদার্থের চারিপাশের কোষে শেষ হয়। ইহারা দর্শন এবং শ্রবণ উদ্দীপকের প্রতিক্রিয়ায় মস্তিষ্কীয় এবং গ্রীবাদেশীয় প্রতিবর্তের নার্ভপ্রবাহ বহন করে।

চতুর্থশ্রেণীর অ-পিরামিডাল নার্ভগুলির উৎপত্তি হয় সুষুম্নাশীর্ষক এবং উচ্চতর প্রদেশের কোষ হইতে। আবার ইহারা শেষ হয় মেরুমজ্জার উর্ধ্বাংশে সম্মুখবর্তী ধূসর পদার্থে। এই নার্ভপ্রবাহ লঘুমস্তিষ্ক হইতে গৃহীত হয়, আবার ঐ কেন্দ্রে প্রেরিতও হয়।

(৪) মেরুমজ্জার কতকগুলি নিম্নবাহী নার্ভ স্বতন্ত্র নার্ভতন্ত্রের চেষ্টীয় নিউরোন-এ শেষ হয়। ইহারা মসৃণ পেশী, হৃদ্‌যন্ত্রীয় পেশী এবং গ্রন্থির বহিঃস্তরকে (epithelium)

সক্রিয় করে। হাইপোথ্যালামাস স্বতন্ত্র নার্ভতন্ত্রের প্রধান সমন্বয় কেন্দ্র। আবার হাইপোথ্যালামাসের সমন্বয় কেন্দ্র থ্যালামাস এবং গুরুমস্তিষ্ক। উক্ত নার্ভগুলি হাই-পোথ্যালামাস হইতে নিম্নগামী হইয়া মেরুমজ্জার সম্মুখবর্তী ধূসর পদার্থে অবস্থিত স্বতন্ত্র কোষে শেষ হয়।

(৪) মেরুদণ্ডের কার্য (Functions)

প্রথম অনুচ্ছেদে (ভূমিকায়) মেরুদণ্ডের ঊর্ধ্ববাহী এবং নিম্নবাহী নার্ভপ্রবাহ দেখানো হইয়াছে। মেরুদণ্ডের কার্য আলোচনায় উহারও আলোচনা আবশ্যক। পুনরাবৃত্তি আশঙ্কায় উহা এই অনুচ্ছেদে বাদ দেওয়া হইল।

প্রতিবর্তের কেন্দ্র (Reflex Centre)

মেরুদণ্ড প্রতিবর্তের প্রধান কেন্দ্র (Reflex Centre) এবং মেরুদণ্ডের প্রধান কাজ হইল **প্রতিবর্ত ক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ** করা। ইহা প্রতিবর্ত ক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র। মেরুদণ্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিবর্ত নিম্নোক্ত প্রকারের। (১) **অপসারণ অথবা অবনমন** প্রতিবর্ত (flexion reflexes), যেমন হাঁটা অথবা সরাইয়া লওয়া প্রভৃতি, এই প্রতিবর্তগুলিতে পেশীর অবনমন (bending) ঘটে। অনিষ্টকর উদ্দীপক হইতে সরিয়া যাওয়াই এই প্রতিবর্তের সারকথা। (২) **প্রসারণ প্রতিবর্ত** (extensor or stretch reflexes) যেমন জানুক্ষেপ (knee-jerk) এবং অঙ্গবিন্যাস (posture) ও পেশীর বল বজায় রাখা প্রভৃতির সহিত সংশ্লিষ্ট প্রতিবর্ত। (৩) স্থানীয় উত্তেজনার (local irritation) ফলে scratch reflex অথবা **আঁচড়** প্রতিবর্ত।

প্রাথমিক স্তরের প্রতিবর্তকে মেরুদণ্ডী প্রতিবর্ত (Spinal Reflex) অথবা প্রাথমিক স্তরের প্রতিবর্ত (Reflex of the primary level) বলা হয়। ইহা সম্পূর্ণভাবে মেরুদণ্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন। আগুনে হাত লাগিবামাত্র হাত সরাইয়া লওয়া একটি মেরুদণ্ডীয় প্রতিবর্তের উদাহরণ। আবার, নাকে সুড়সুড়ি লাগিবা মাত্র হাঁচি আসা ইহার আর একটি উদাহরণ। এই প্রতিবর্ত দুইটিকে কেন মেরুদণ্ডীয় প্রতিবর্ত বলা যাইতে পারে, উহাদের একটিকে বিশ্লেষণ করিয়া তাহা বুঝানো হইতেছে।

আগুনে হাত লাগিবামাত্র হাত সরাইয়া লওয়া—এই প্রতিবর্তটির শারীরবৃত্তীয় বিশ্লেষণ এইরূপ। স্পর্শ-নার্ভের বহিঃপ্রান্ত থাকে ত্বকের ঠিক নীচে। আবার ইহার অন্তঃপ্রান্ত থাকে মেরুদণ্ডে। স্পর্শ-নার্ভের বহিঃপ্রান্ত আগুনের স্পর্শে উত্তেজিত হইল। এই উত্তেজনা নার্ভ-প্রবাহের আকারে অন্তর্গামী (incoming) অথবা সংবেদীয়

(sensory) নিউরোন্ দিয়া মেরুদণ্ডে পৌছিল। আবার মেরুদণ্ডেই রহিয়াছে সংবেদীয় স্পর্শ-নার্ভের অন্তঃপ্রান্তের সন্নিহিত বহির্গামী (outgoing) অথবা চেষ্টীয় (Motor) নিউরোনের অন্তঃপ্রান্ত। উত্তেজনাটিকে এই চেষ্টীয় নার্ভের অন্তঃপ্রান্ত গ্রহণ করিল এবং ইহা চেষ্টীয় নার্ভ-প্রবাহের আকারে পরিচালিত হইল হস্তের পেশীতে, যাহার ফলে হাত সরাইয়া-লওয়ারূপ বিচলন উৎপন্ন হইল। আগুনে-হাত-দেওয়ারূপ উদ্দীপক এবং আগুন হইতে-হাত-সরাইয়া-লওয়ারূপ প্রতিক্রিয়ার মধ্যবর্তী এমন চেতনা বা ঐচ্ছিক ক্রিয়া থাকে না, যাহা এই প্রতিক্রিয়াকে সংযত বা নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। ইহা একটি চেতনা-নিরপেক্ষ, অনৈচ্ছিক প্রতিবর্ত, যাহার নিয়ন্ত্রণ-কেন্দ্র মেরুদণ্ড। এই কারণে ইহা একটি মেরুদণ্ডীয় প্রতিবর্ত।

৮নং চিত্রে এই প্রতিবর্তটি প্রদর্শিত হইয়াছে।

অসংখ্য প্রতিবর্ত ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হয় মেরুদণ্ডের অন্তর্মুখী বা সংবেদীয় (Sensory) এবং বহির্মুখী বা চেষ্টীয় (Motor) মেরুনার্ভের সাহায্যে। চক্ষুর পাতার (eye-lid) স্পন্দন, কনীনিকার (iris) স্পন্দন, শরীরের ভারসাম্য (balance) রক্ষার জন্ম বিভিন্ন, বিচলন, উদ্গীরণ (swallowing), ঝাঁকানি (knee-jerk), পায়ের অঙ্গুলির স্পন্দন, হাঁচি প্রভৃতি যে সকল প্রতিক্রিয়া প্রধানতঃ বিপজ্জনক উদ্দীপক দ্বারা উৎপন্ন হয়, সেই সকল প্রতিক্রিয়া বা প্রতিবর্ত মেরুদণ্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন।

তাহা ছাড়া, কতকগুলি **শিক্ষালব্ধ** ক্রিয়া, যাহা পুনঃ পুনঃ অনুশীলনের ফলে অভ্যাসে বা **অভ্যস্ত ক্রিয়ায়** (habitual actions) পরিণত হইয়াছে, মেরুদণ্ড দ্বারা অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। হাঁটা, সাঁতার কাটা, সাইকেল চালনা, টাইপ করা প্রভৃতি যে সকল প্রতিক্রিয়া প্রথমে বা মুখ্যভাবে ঐচ্ছিক (primarily voluntary) থাকে কিন্তু পুনঃপুনঃ অনুশীলনের বা শিক্ষার ফলে গৌণভাবে স্বতঃক্রিয় (secondarily automatic) অভ্যাসে পরিণত হয়, সেই সকল ক্রিয়ার কেন্দ্রও মেরুদণ্ডে অবস্থিত।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে দেখানো হইয়াছে যে প্রত্যেক মেরুনার্ভের দুইটি মূল আছে। প্রথমটি **সম্মুখের মূল**। এই মূলটি বহির্মুখী বা চেষ্টীয় মেরুনার্ভের উৎস। দ্বিতীয়টি **পশ্চাতের** মূল। এই মূলটি অন্তর্মুখী বা সংবেদীয় মেরুনার্ভের উৎস। একটি **পরীক্ষা** দ্বারা এই দুইটি মূলের পার্থক্য প্রমাণিত হয়।

পরীক্ষাটি এই। একটি ব্যাঙের মেরুদণ্ডের **দক্ষিণাংশস্থ সম্মুখের নার্ভমূল কাটিয়া ফেলা হইল।** এইবার উহার দক্ষিণ দিকের পিছনের পা উত্তেজিত করিলে

উহার কোনো বিচলন হয় না, কারণ এই অবস্থায় মেরুদণ্ড হইতে পেশীয় নার্ভসংযোগ ছিন্ন হইয়াছে। কিন্তু উহার চর্মের উত্তেজনা হইতে উৎপন্ন মেরুদণ্ডের অন্তর্মুখী বা সংবেদীয় নার্ভপ্রবাহ অক্ষুন্ন থাকে। আবার, যদি ব্যাঙটির মেরুদণ্ডের **বামভাগের পশ্চাদ্দেশীয় নার্ভমূল** কাটিয়া ফেলা হয়, তাহা হইলে দেখা যায়, উহার বাম দিকের পিছনের পায়ে উত্তেজনার ফলে কোনো প্রতিক্রিয়া ঘটে না।[১] এইরূপ পরীক্ষায় প্রমাণিত হয় যে, মেরুদণ্ডের সম্মুখের নার্ভমূলগুলি বহির্মুখী বা চেষ্টীয় এবং পশ্চাতের নার্ভমূলগুলি অন্তর্মুখী বা সংবেদীয়।

মেরুদণ্ডের **দ্বিতীয় কাজ** হইল সংবাদ প্রেরণ করা (transmission of messages)। মেরুদণ্ড সংবেদীয় (afferent) নার্ভপ্রবাহ উর্ধ্বে এবং চেষ্টীয় নার্ভপ্রবাহ নিম্নে প্রেরণ করে। মেরুদণ্ডের **পশ্চাদংশীয়** (posterior) নার্ভ-গুচ্ছ **স্পর্শ ও রূপের** জ্ঞান মস্তিষ্কে প্রেরণ করে। উহার **পার্শ্ববর্তী** (lateral) নার্ভগুচ্ছ পেশী ও সন্ধিসমূহের বার্তা ও বেদনসংবেদীয় নার্ভপ্রবাহ মস্তিষ্কে লইয়া যায়। আবার, এই নার্ভগুচ্ছ মস্তিষ্কের **চেষ্টীয় কেন্দ্র** (motor centre) হইতে চেষ্টীয় নার্ভপ্রবাহ মেরুদণ্ডের সম্মুখ (anterior) ভাগে পৌঁছাইয়া দেয় এবং সেখান হইতে ঐ প্রবাহ পেশীতে পৌঁছায়।

মেরুদণ্ডের শ্বেত এবং ধূসর পদার্থদ্বয়ের কাজ দুই প্রকার। ধূসর পদার্থ প্রথম স্তরের সামগ্রিকতা (first level of integration) সাধনের সহিত সংশ্লিষ্ট। কারণ ইহাতে সংযোজক নিউরোন্ রহিয়াছে। পক্ষান্তরে শ্বেত পদার্থে যে উর্ধ্ববাহী এবং নিম্নবাহী তন্তুগুলি রহিয়াছে, প্রতিবর্তের পক্ষে অত্যাবশ্যক সেইগুলি মেরুদণ্ডের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য সাধন করে। ইহারা মস্তিষ্কে এবং মস্তিষ্ক হইতে নার্ভপ্রবাহ প্রেরণ করিয়া থাকে।

অনুশীলনী (Exercise)

1. Sketch out the parts of the Central nervous system.

(Ans : pp. 69-70)

কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্রের অংশগুলি আঁকিয়া দেখাও।

১. আমাদের হস্তে অবস্থিত মেরুনার্ভের পশ্চাদ্বর্তী মূলগুলি নষ্ট হইলে হস্তের বেদনা বা স্পর্শানুভূতি লুপ্ত হয়, যদিও উহা নাড়াচাড়া বা সঞ্চালন করিবার ক্ষমতা অটুট থাকে। আবার উহার সম্মুখবর্তী মূল নষ্ট হইলে অনুভূতি অক্ষুন্ন থাকিয়া হস্তসঞ্চালনের ক্ষমতা লোপ পায়।

2. What is the neuron ? Explain its structure and function.
(Ans : pp. 70-74)

নিউরোন্ কাহাকে বলে ? উহার গঠন এবং কার্য বুঝাইয়া দাও।

3. State and explain the laws of nervous impulse.
(Ans : pp. 75-77)

নার্ভপ্রবাহের সূত্র উল্লেখ করিয়া বুঝাইয়া দাও।

4. Define the synapse and explain its function.
(Ans : pp. 77-79)

সাইনাপ্‌স্ বা প্রান্তসন্নিকর্ষ কাহাকে বলে ? উহার কার্য ব্যাখ্যা কর।

5. What are the principal parts of the brain ? Explain their funciion. (Ans : pp. 79-85)

মস্তিষ্কের প্রধান অংশগুলি কি কি ? উহাদের ক্রিয়া আলোচনা কর।

6. What are the evidences in favour of localisation of functions in the brain ? What are the functions localised ?
(Ans : pp. 86-89)

মস্তিষ্কক্রিয়ার স্থাননির্দেশের প্রমাণ কি ? স্থাননির্দেশিত মস্তিষ্কক্রিয়াগুলি কি কি ?

7. Explain the different parts of thc spinal cord with their functions. (Ans : pp. 89-93)

সুষুম্নাকাণ্ডের বিভিন্ন অংশ এবং তাহাদের কার্য বুঝাইয়া দাও।

8. Describe the ascending and descending pathways of the spinal cord.
(Ans : pp. 93-96)

মেরুদণ্ডের ঊর্ধ্ববাহী এবং নিম্নবাহী গতিপথগুলি বর্ণনা কর।

9. What part does the spinal cord play in central nervous system ? (Ans : pp. 96-98)

কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্রে সুষুম্নাকাণ্ড কি অংশ গ্রহণ করে ?

10. Explain how the spinal cord helps the integration of the organism. (Ans : pp. 97-98)

জীবশরীরের সামগ্রিকতায় সুষুম্নাকাণ্ড যে সাহায্য করে তাহা আলোচনা কর।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বহিঃপ্রান্তীয় এবং স্বতন্ত্র নার্ভতন্ত্র ; পেশী ; গ্রন্থি

(Peripheral and Autonomic Nervous System ; Muscles ; Glands)

১। ভূমিকা (Introduction)

সাধারণ নার্ভতন্ত্রের তিনটি প্রধান বিভাগ, যথা কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্র (মস্তিষ্ক এবং সুষুম্নাকাণ্ড), বহিঃপ্রান্তীয় নার্ভতন্ত্র এবং স্বতন্ত্র নার্ভতন্ত্র। পঞ্চম পরিচ্ছেদে কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্র আলোচিত হইয়াছে। বর্তমান পরিচ্ছেদে সাধারণ নার্ভতন্ত্রের বাকী দুইটি বিভাগ—যথা বহিঃপ্রান্তীয় নার্ভতন্ত্র এবং স্বতন্ত্র নার্ভতন্ত্র আলোচিত হইতেছে।

বহিঃপ্রান্তীয় নার্ভতন্ত্রের তন্তুগুলি মস্তিষ্ক-খুলি অথবা সুষুম্নাকাণ্ড হইতে বাহির হইয়া শরীরের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়াইয়া পড়ে। উহারা নার্ভপ্রবাহ কেন্দ্র হইতে প্রান্তে লইয়া যায়। এই জাতীয় নার্ভ সংগ্রাহক অথবা সম্পাদক যন্ত্রের বহিঃপ্রান্তের সহিত সংযুক্ত থাকে। সাধারণতঃ সংগ্রাহক বলিতে বুঝায় বহিঃপ্রান্তীয় নার্ভতন্ত্রের কোন সংবেদীয় অথবা অন্তর্গামী (afferent) নিউরোন্-এর মুক্তপ্রান্ত। সংবেদীয় বহিঃপ্রান্ত নিউরোন্ (peripheral sensory neurone) সংগ্রাহক যন্ত্রকে কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্রের সহিত যুক্ত করে। কাজেই একটি নিউরোন্-এর বহিঃপ্রান্তীয় তন্তু দৈর্ঘ্যে কয়েক ফুট হইতে পারে, কারণ ইহার প্রসার কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্র পর্যন্ত, যদিও ইহার প্রস্থ অতি সূক্ষ্ম। এই নিউরোন্-এর তন্তুগুলি (fibres) উহাদের আবরণ (sheath) দ্বারা বিচ্ছিন্ন হইলেও অন্য কলা (tissue) দ্বারা সমষ্টিভূত হইয়া একটি বহিঃপ্রান্তীয় নার্ভ গঠন করে। এই সকল বিষয় পরবর্তী অনুচ্ছেদে স্পষ্টতর হইবে।

স্বতন্ত্র নার্ভতন্ত্র একপ্রকার চেষ্টীয় নার্ভতন্ত্র। ইহা কেন্দ্রীয় এবং বহিঃপ্রান্তীয় নার্ভতন্ত্রের অধীন নয়, কিন্তু অনেকাংশে স্বাধীন। অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলির ক্ষরণের সহিত স্বতন্ত্র নার্ভতন্ত্র যুক্ত হইলে, একটি নার্ভীয়-গ্রন্থীয় তন্ত্র (neurohumoral system) গঠিত হয়। এই তন্ত্রটি শরীরের জৈব ক্রিয়াবলী, যেমন পরিপাক ক্রিয়া, শ্বাসক্রিয়া প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করে।

স্বতন্ত্র-নার্ভতন্ত্র শরীরের অভাব (needs) মিটাইবার জন্য শ্বাসক্রিয়ার উপযোজন (adjustment), হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া, হজমক্রিয়ার জন্য রসক্ষরণ, ক্রমসঙ্কোচ ক্রিয়া

(Peristaltic action) প্রভৃতি আভ্যন্তরীয় পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করে। পক্ষান্তরে কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্র নিয়ন্ত্রণ করে পরিবেশের পরিবর্তন এবং উহার প্রতিক্রিয়া।

২। বহিঃপ্রান্তীয় নার্ভতন্ত্র (Peripheral Nervous System)

বহিঃপ্রান্তীয় নার্ভতন্ত্র বা শাখা-নার্ভতন্ত্র বলিতে বুঝায় সেই সকল নার্ভের সমষ্টি, যেগুলি কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্রকে সংগ্রাহক (receptors) এবং সম্পাদক (effectors) যন্ত্রগুলির সহিত সংযুক্ত করে। ইহা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা (১) করোটি (cranial) নার্ভ এবং (২) মেরুনার্ভ (Spinal)।

মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ হইতে **বারো জোড়া** করোটি নার্ভ বাহির হয় এবং করোটির বিভিন্ন ছিদ্রপথে নাক, কান, চোখ, মুখ, হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, অন্ত্র, জিহ্বা প্রভৃতিতে গিয়া শেষ হয়। আবার সুষুম্নাকাণ্ডের উভয় দিক হইতে **একত্রিশ জোড়া** মেরুনার্ভ বাহির হইয়া হাতে, পায়ে, বুকে, পিঠে এবং পেটে সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে।

উপরোক্ত নার্ভগুলি মস্তিষ্ক এবং সুষুম্নাকাণ্ডের ভিতরে উৎপন্ন হইলেও, উহাদের **বাহিরে নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বহিঃপ্রান্ত পর্যন্ত ছড়াইয়া থাকে বলিয়া উহাদিগকে বহিঃপ্রান্তিক নার্ভতন্ত্র বলা হয়**। বহিঃপ্রান্তীয় নার্ভতন্ত্র সম্বন্ধে মনে রাখিতে হইবে যে ইহা সংযোগকারী (co-ordinating) তন্ত্র নয়। ইহার কাজ হইল সংযোগকারী কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্র হইতে সংবাদ লইয়া আসা এবং ঐ স্থানে সংবাদ পৌছাইয়া দেওয়া।

ক্র্যানিয়াল নার্ভ (Cranial Nerves)

করোটির (skull) যে অংশ মস্তিষ্কে রহিয়াছে তাহাকে ক্র্যানিয়াম্ (cranium) বলা হয়। সেই কারণে মস্তিষ্কের করোটি হইতে উদ্ভূত বহিঃপ্রান্তীয় নার্ভগুলির নাম ক্র্যানিয়াল (cranial) বা করোটি নার্ভ। মস্তিষ্কের, গ্রীবার এবং শরীরের বিভিন্ন অংশ হইতে ইহারা সোজাসুজি করোটির গহ্বরে প্রবেশ করে এবং উহার ছিদ্রপথে মুখ, নাক, কান, চোখ প্রভৃতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গে শেষ হয়।

ক্র্যানিয়াল নার্ভগুলির বিবরণ নিম্নতালিকায় প্রদর্শিত হইল।

ক্র্যানিয়াল্ নার্ভ	ক্রিয়া	প্রকৃতি	উৎপত্তি স্থান
১। অলফ্যাক্টরি বা ঘ্রাণীয়	ঘ্রাণেন্দ্রিয়	সংবেদীয়	নাকের অলফ্যাক্টরি বাল্ব

:ক্র্যানিয়াল নার্ভ		ক্রিয়া	প্রকৃতি	উৎপত্তি স্থান
২।	অপ্‌টিক্‌ বা দর্শন	চক্ষুরিন্দ্রিয়	সংবেদীয়	রেটিনার গ্যাংলিয়নিক স্তর
৩।	অকুলোমোটর্‌	"	চেষ্টীয়	থ্যালামাস্‌ (ঘিলুর জাইরাস্‌)
৪।	ট্রক্লিয়ার	"	"	" "
৫।	ট্রাইজেমিনাল্‌	চক্ষু, মুখ, নাক	"	" "
		স্পর্শ, বেদনাজ্ঞান	সংবেদীয়	" "
৬।	এব্‌ডুসেন্স	চক্ষুরিন্দ্রিয়ের পেশী	চেষ্টীয়	" "
৭।	ফেসিয়াল্‌	মুখভঙ্গী, গ্রন্থিরসক্ষরণ	চেষ্টীয়	থ্যালামাস্‌ (ঘিলুর জাইরাস্‌)
		আস্বাদন	সংবেদীয়	" "
৮।	অডিটারি	কর্ণেন্দ্রিয়	"	ভেস্টিবুলার, সেরিবেলাম্‌
৯।	গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়াল্‌	গলাধঃকরণ, রসক্ষরণ	চেষ্টীয়	ঘিলুর জাইরাস্‌
		আস্বাদন	সংবেদীয়	থ্যালামাস্‌
১০।	ভেগাস্‌	গলাধঃকরণ, বাগিন্দ্রিয়	চেষ্টীয়	ঘিলুর জাইরাস্‌
		অন্ননালীর কুঞ্চন কানের	"	" "
		স্পর্শানুভূতি মাথা ও	সংবেদীয়	থ্যালামাস্‌
১১।	অ্যাক্সেসারি	ঘাড়ের নড়নচড়ন	চেষ্টীয়	ঘিলুর জাইরাস্‌
১২।	হাইপোগ্লস্যাল্‌	জিহ্বার নড়নচড়ন	"	" "

বহিঃপ্রান্তীয় মস্তিষ্ক-নার্ভের তালিকাটিতে চারটি সারি রহিয়াছে। প্রথম সারিতে নার্ভগুলির **নাম**, দ্বিতীয় সারিতে উহাদের **ক্রিয়া**, তৃতীয় সারিতে নার্ভগুলির প্রকৃতি, এবং চতুর্থ সারিতে নার্ভগুলির উৎপত্তিস্থান অথবা উৎস দেখানো হইয়াছে।

প্রথম জোড়া দর্শন ঘ্রাণীয় (olfactory) নার্ভ। ইহা নাসিকার ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে উৎপন্ন হয় এবং ঘ্রাণ সংবেদন ঘটায় নার্ভপ্রবাহকে হাইপো-ক্যাম্পাস-এ পৌঁছাইয়া দিয়া। দ্বিতীয় জোড়া দর্শন (optic) নার্ভ। এইটি অক্ষিপট (retina) হইতে আরম্ভ হয় এবং নার্ভপ্রবাহকে গুরুমস্তিষ্কের অক্সিপিটাল লোব্‌ নামক দর্শনকেন্দ্রে পৌঁছাইয়া দেয়। তৃতীয় জোড়া (occulo-motor nerve) অক্ষি-গোলকের (eye-ball) পেশীসমূহের

চেষ্টীয় নার্ভ। ইহার সাহায্যে চক্ষু উপরে, নীচে ঘুরানো যায়। আবার ইহার সাহায্যে চোখের উপরের পাতা উঠানো যায় এবং তীব্র আলোকে চোখের তারা ছোট করা যায়। চতুর্থ জোড়া (trochlear nerve) অক্ষিগোলকের পেশীর নার্ভ। ইহার সাহায্যে চক্ষু নীচের দিকে ঘুরানো যায়। পঞ্চম জোড়ার (trigeminal) সাহায্যে মুখমণ্ডলের সংবেদনগুলি অর্ধচন্দ্রাকার নার্ভগ্রন্থিতে পরিচালিত হয়। ষষ্ঠ নার্ভ (abducens) সাহায্যে এক চোখকে বাহিরের দিকে এবং অপর চোখকে একই সঙ্গে নাকের দিকে ঘুরানো যায়। সপ্তম নার্ভ (facial) মুখের সকল পেশীর ক্রিয়া ঘটায়। অষ্টম নার্ভ সাহায্যে শ্রবণ (auditory) নার্ভপ্রবাহ পরিচালিত হয় এবং শ্রবণ কেন্দ্রে (temporal lobe) পৌছায়। নবম নার্ভ (glosso pharayngeal) গলবিলের পেশীর সংকোচন ঘটায় এবং স্বাদ সংবেদন কেন্দ্রে বহন করে। দশম নার্ভদ্বয় (vagus) পরাসমবেদী। ইহারা হৃৎস্পন্দন হ্রাস করে, পাচকাম্লরস ও অগ্ন্যাশয়-রসের ক্ষরণ ঘটায়, পাকস্থলী ও অন্ত্রের সঙ্কোচন করে এবং শ্বাসক্রিয়ার সংবেদন শ্বাসকেন্দ্রে বহন করে। একাদশ নার্ভ (accessory) ঘাড়ের পেশীর ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। দ্বাদশ নার্ভদ্বয় (hypoglossal) জিহ্বার নিম্নবর্তী। ইহারা জিহ্বার পেশীগুলির ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে।

ক্র্যানিয়াল নার্ভগুলি প্রধানতঃ মস্তিষ্কের সংগ্রাহক (receptors) এবং সম্পাদক (effectors) যন্ত্ররূপে কাজ করে। বিষয়টি পূর্বেই বলা হইয়াছে।

স্পাইনাল নার্ভ (Spinal nerves)

বারো জোড়া করোটি-নার্ভ ছাড়া আরও একত্রিশ জোড়া বহিঃপ্রান্তীয় মেরুনার্ভ (Spinal nerves) আছে। ইহাদের প্রত্যেক জোড়াই মেরুদণ্ডের কোন না কোন অংশে প্রবিষ্ট। পঞ্চম পরিচ্ছেদে সুষুম্নাকাণ্ডের কোন্ স্থান হইতে কয় জোড়া স্পাইনাল নার্ভ বাহির হইয়াছে তাহার উল্লেখ আছে। তথাপি নিম্নতালিকায় এই নার্ভগুলির বণ্টন দেখানো যাইতেছে।

স্পাইনাল নার্ভ

উৎপত্তিস্থান	সংখ্যা
গ্রীবাদেশীয় (Cervical)	আট জোড়া
বক্ষোদেশীয় (Thoracic)	বারো জোড়া
কটিদেশীয় (Lumbar)	পাঁচ জোড়া

ত্রিকাস্থিদেশীয় (Sacral) পাঁচ জোড়া

অনুত্রিকাস্থিদেশীয় (Coccygeal) এক জোড়া

মেরুনার্ভগুলি যুগ্ম (compounded , কারণ ইহাদের মধ্যে সংবেদীয় এবং চেষ্টীয়, এই উভয় নার্ভই রহিয়াছে। সংবেদীয় নার্ভগুলির কোষদেহ সুষুম্নাকাণ্ডের পশ্চাদ্দেশীয় (posteior, dorsal) মূলে এবং চেষ্টীয় নার্ভগুলির কোষদেহ উহার সম্মুখবর্তী (anterrior, ventral) মূলে অবস্থিত।

সংবেদীয় নার্ভ আভ্যন্তরীণ যন্ত্রের (viscera), পেশীর এবং ত্বকের বহিঃপ্রান্তীয় যন্ত্রের (end organs) সহিত সম্পর্কিত আবার চেষ্টীয় নার্ভ পেশীর চেষ্টীয় বহিঃপ্রান্ত যন্ত্রের সহিত সম্পর্কিত। অধিকাংশ নার্ভ মায়েলিন সীদ দ্বারা পরস্পর-বিচ্ছিন্ন। কাজেই উহাদের সংমিশ্রিত হইবার সম্ভাবনা নাই। অবশ্য বেদনায় সংবেদীয় নার্ভ এবং সমবেদী নার্ভ এই সীদ (sheath) বা আবরণ হইতে বঞ্চিত।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে, বহিঃপ্রান্তীয় নার্ভগুলিকে দুইশ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে, যথা সংবেদীয় (sensory) নার্ভ এবং চেষ্টীয় (motor) নার্ভ।

দেহের ত্বকে স্পর্শ, বেদনা, চাপ এবং তাপ প্রভৃতির ইন্দ্রিয় ছড়াইয়া আছে। সংবেদীয় নার্ভ এই সকল ইন্দ্রিয় হইতে নার্ভপ্রবাহ মস্তিষ্কের কেন্দ্রে বহন করিয়া স্পর্শ, বেদনা, চাপ এবং তাপ সংবেদন উৎপন্ন করে। তেমনই সংবেদীয় নার্ভ সাহায্যে চোখ, কান, নাক, জিহ্বা হইতে নার্ভপ্রবাহ উহাদের মস্তিষ্ক-কেন্দ্রে নীত হইয়া দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ ও আস্বাদন সংবেদন ঘটায়।

আবার মস্তিষ্ক অথবা মেরুদণ্ডীয় কেন্দ্র হইতে চেষ্টীয় নার্ভপ্রবাহ শরীরের নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, পেশী ও গ্রন্থিতে পৌছায় এবং তাহাদের বিচলন বা রসক্ষরণ উৎপন্ন করে।

৩। স্বতন্ত্র বা স্বতঃক্রিয় নার্ভতন্ত্র

(Autonomic Nervous System)

নার্ভতন্ত্রের তৃতীয় বিভাগ স্বতন্ত্র নার্ভতন্ত্র। স্বতন্ত্র বা স্বতঃক্রিয় নার্ভতন্ত্র মস্তিষ্ক এবং মেরুদণ্ড হইতে **অনেকটা স্বাধীনভাবে** কাজ করে। সেই কারণে ইহাকে স্বতন্ত্র বা স্বতঃক্রিয় নার্ভতন্ত্র বলে। অবশ্য স্বতন্ত্র নার্ভতন্ত্র কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্র হইতে **সর্বাংশে স্বাধীন নয়**। ইহার স্বাধীনতা আংশিক মাত্র।

স্বতন্ত্র নার্ভতন্ত্র আন্তরযন্ত্র (visceral) অথবা **অনৈচ্ছিক** (involuntary) নার্ভতন্ত্র নামেও পরিচিত। মস্তিষ্ক-মেরুদণ্ডীয় (cerebro-spinal) অর্থাৎ কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্র

ইচ্ছার নিয়ন্ত্রণাধীন। কিন্তু স্বতন্ত্র নার্ভতন্ত্র ইচ্ছার নিয়ন্ত্রণাধীন নয়। নার্ভতন্ত্রের যে সকল অংশ রক্তবাহের (blood vessel) এবং আন্তর যন্ত্রগুলির মসৃণ পেশী সক্রিয় করে সেইগুলি ইহার অন্তর্ভুক্ত।

স্বতঃক্রিয় নার্ভতন্ত্র তিনটি অংশ লইয়া গঠিত, যথা (১) **মস্তিষ্কীয়-গ্রীবা-দেশীয়** (Cranial-Cervical), (২) **বক্ষোদেশীয়-কটিদেশীয়** (Thoracico-Lumbar) এবং (৩) **বস্তি বা ত্রিকাস্থিদেশীয়** (Sacral)। ইহাদের মধ্যে দ্বিতীয়টিকে, অর্থাৎ বক্ষোদেশীয়-কটিদেশীয় অংশটিকে বলা হয় **সমবেদী** (Sympathetic) অথবা Thoracico-Lumbar নার্ভতন্ত্র। আবার, প্রথম এবং তৃতীয়টি, অর্থাৎ মস্তিষ্কীয়-গ্রীবাদেশীয় এবং ত্রিকাস্থিদেশীয় অংশদ্বয় লইয়া **পরাসমবেদী** (Parasympathetic) অথবা Cranio-Sacral নার্ভতন্ত্র গঠিত। এই অংশ দুইটি মস্তিষ্কের নিম্নদেশ হইতে আরম্ভ হইয়া মেরুদণ্ডের উভয় পার্শ্ব দিয়া অনুত্রিকাস্থি (Coccyx) পর্যন্ত প্রলম্বিত। যেহেতু ইহারা সমবেদী তন্ত্রের চারিপাশে অবস্থিত, ইহাদিগকে **পরাসমবেদী নার্ভতন্ত্র** (Parasympathetic Nervous System) বলা হয়।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে **স্বতঃক্রিয় নার্ভতন্ত্রের দুইটি বিভাগ**—যথা, **সমবেদী এবং পরাসমবেদী।**

স্বতন্ত্র নার্ভতন্ত্রের চেষ্টীয় (efferent, motor) এবং সংবেদীয় (afferent, Sensory) বিভাগ এইরূপ। ইহার চেষ্টীয় নার্ভগুলি পরাসমবেদীয় এবং সমবেদীয়, এই উভয়শ্রেণীভুক্ত। আন্তরযন্ত্রের চেষ্টীয় তন্তুগুলি দেহপ্রাচীরে (Somatic) তন্তুগুলির সঙ্গে থাকে। দেহপ্রাচীরের এবং স্বতন্ত্র নার্ভতন্ত্রের সংবেদীয় তন্তুগুলির কোষদেহ (Cell-bodies) মেরুদণ্ডীয় নার্ভগ্রন্থিতে (ganglion) থাকে। ইহারা পশ্চাতের মূল (dorsal root) দিয়া মেরুদণ্ডে প্রবেশ করে।

স্বতঃক্রিয় নার্ভতন্ত্র এক দিকে যেমন মেরুদণ্ডের সহিত সম্বন্ধ, আবার তেমনই পাকস্থলী, হৃদয়, ফুস্‌ফুস্‌ প্রভৃতি আভ্যন্তরীণ যন্ত্রগুলির (Visceral organs) সহিত ঘনিষ্ঠসূত্রে সম্বন্ধ। তাহা ছাড়া, গ্রন্থি (gland) ও মসৃণ পেশীর (Smooth muscles) ক্রিয়াও স্বতঃক্রিয় নার্ভতন্ত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। উপরন্তু ইহা রক্ত সরবরাহেরও (Blood supply) নিয়ামক কেন্দ্র। আভ্যন্তরীণ যন্ত্রগুলির উপর ইহার নিয়ন্ত্রণক্ষমতা থাকার ফলে প্রক্ষোভের বহিঃপ্রকাশগুলিও—যেমন, ক্রোধে দন্তে দন্তে

ঘর্ষণ বা আক্রমণ, ভয়ে পলায়ন, দ্রুত বক্ষস্পন্দন প্রভৃতি—এই নার্ভতন্ত্রের উপর অনেকাংশে নির্ভর করে।

সুতরাং স্বতন্ত্র নার্ভতন্ত্রের **ক্রিয়া প্রধানতঃ তিন শ্রেণীর,** যথা মসৃণ পেশী, হৃদয় এবং গ্রন্থিগুলিকে সক্রিয় করা। ইহাদের নার্ভগ্রন্থি যেমন মধ্যমস্তিষ্ক, যোজক, সুষুম্নাশীর্ষক এবং মেরুদণ্ড হইতে স্বাধীনভাবে কাজ করিতে পারে, আবার তেমনই উহাদের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াও কাজ করিতে পারে। হৃৎস্পন্দন, ধমনীয় সংকোচন, গলাধঃকরণ, বমন, অ্যাড্রিনেলিন অথবা ইনসুলিনের অন্তঃক্ষরণ প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণকেন্দ্র মস্তিষ্কে অবস্থিত। হাইপোথ্যালামাসের উত্তেজনায় এই সকল ক্রিয়ার আংশিক পরিবর্তন ঘটে। কাজেই মস্তিষ্কের এই অংশের স্বতন্ত্র নার্ভতন্ত্রের ক্রিয়ার উপর প্রভাব রহিয়াছে বলিতে হয়! শুধু তাহাই নয়, গুরুমস্তিষ্কও স্বতন্ত্র নার্ভতন্ত্রের উপর প্রভাব বিস্তার করে হাইপোথ্যালামাস এবং অতিরিক্ত পিরামিডগুচ্ছের সাহায্যে।

৪। সমবেদী এবং পরাসমবেদী নার্ভতন্ত্র—তুলনা

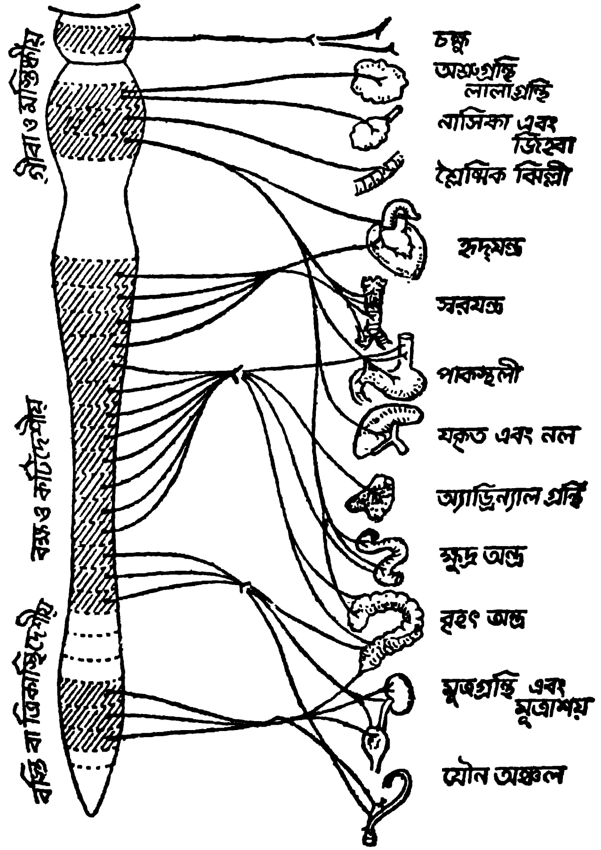
স্বতঃক্রিয় নার্ভতন্ত্রের মস্তিষ্কীয় এবং বস্তিদেশীয় বা ত্রিকাস্থি বিভাগকে **পরাসমবেদী** (Parasympathetic) নার্ভতন্ত্র বলা হয়। আবার ইহার বক্ষ এবং কটি-দেশীয় অংশকে বলা হয় **সমবেদী** (Sympathetic) নার্ভতন্ত্র। ইহাদের **সংগঠনগত** (Structural) অথবা আঙ্গিক সম্বন্ধ যেমন পৃথক, ইহাদের **কার্যপ্রণালীও** (functions) তেমন অনেকাংশে বিপরীত।

অধঃমস্তিষ্কের যে অংশ পরাসমবেদী এবং সমবেদী নার্ভতন্ত্রের ক্রিয়া নিয়মিত করে তাহা হইল **হাইপোথ্যালামাস**। পরাসমবেদী ক্রিয়া নিয়মিত করে হাইপোথ্যালামাস-এর সম্মুখবর্তী এবং মধ্যবর্তী অংশ। আবার সমবেদী ক্রিয়া নিয়মিত করে হাইপোথ্যালামাস-এর পশ্চাদ্‌বর্তী এবং পার্শ্ববর্তী অংশ।

উর্ধ্বতন বা মস্তিষ্কীয় পরাসমবেদী বিভাগটি পরিপাক রস (gastric juice) ক্ষরণে এবং পাকস্থলী ও অন্ত্রের (intestines) ক্রিয়ার, যেমন পিত্ত নিঃসরণে (bile secretion) সহায়তা করিবার ফলে পরিপাক বা হজম ক্রিয়া সম্ভব হয়। আবার এই বিভাগ অশ্রুগ্রন্থির অশ্রুবর্ষণ, লালাগ্রন্থির লালানিঃসরণ প্রভৃতি উদ্দীপিত করে। নিম্ন বা ত্রিকাস্থিদেশীয় পরাসমবেদী বিভাগটি মূত্রাশয় (bladder), মলনালী (rectum) এবং যৌনযন্ত্রের সহায়তা করে।

অপর পক্ষে মধ্যদেশীয় বা সমবেদী বিভাগটি পরিপাক রসক্ষরণ, পিত্ত নিঃসরণ, প্রভৃতি হজমক্রিয়া এবং যৌন উত্তেজনা সংযত করে। আবার সমবেদীতন্ত্র অশ্রুবর্ষণ, লালানিঃসরণ প্রভৃতি গ্রন্থিক্রিয়াও ব্যাহত করে।

অন্য দিকে সমবেদীতন্ত্র সাহায্যে চক্ষুমণি প্রসারিত হয়, হৃদস্পন্দন বর্ধিত হয়, ঘর্মগ্রন্থির ঘর্মনিঃসরণ, গ্লুকোজক্ষরণ প্রভৃতি ঘটে। কিন্তু পরাসমবেদীতন্ত্রের প্রভাবে



১৩নং চিত্র—স্বতন্ত্র নার্ভতন্ত্রের ইঙ্গিত

চক্ষুমণির সংকোচন ও হৃৎস্পন্দনের হ্রাস ঘটে এবং ঘর্মনিঃসরণ ও গ্লুকোজক্ষরণে কোন পরিবর্তন ঘটে না।

পরাসমবেদী নার্ভতন্ত্রের ক্রিয়াকে ব্যাহত করাই সমবেদীতন্ত্রের একটি প্রধান কাজ। অনুভূতি বা প্রক্ষোভ প্রতিক্রিয়ার সহিত গ্রন্থির রসক্ষরণ এবং

আভ্যন্তরীণ যন্ত্রগুলির কার্যের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। কিন্তু পরাসমবেদী এবং সমবেদী নার্ভতন্ত্রের প্রক্ষোভপ্রতিক্রিয়া, **বিপরীতভাবে** প্রকাশ পায়। যেমন সুখজনক দৈহিক প্রতিক্রিয়া, পরিপাক এবং যৌনক্রিয়া মস্তিষ্কীয় এবং বস্তিদেশীয় অথবা উর্ধ্বাধোভাগীয় পরাসমবেদী নার্ভতন্ত্রের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধ। আবার দুঃখজনক দৈহিক প্রতিক্রিয়া, ভয় ক্রোধ প্রভৃতি অনুভূতির প্রতিক্রিয়া বক্ষ এবং কটিদেশীয় অথবা মধ্যভাগীয় সমবেদী নার্ভতন্ত্রের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। অবশ্য এই বিপরীত প্রতিক্রিয়াগুলি একই সময়ে চলিতে পারে না,—যেমন একই সময়ে ক্রুদ্ধ এবং প্রেমানুরক্ত হওয়া যায় না।

মোটের উপর বলিতে হয় যে, পরাসমবেদী এবং সমবেদী নার্ভতন্ত্রের সম্পর্ক **পরস্পরবিরুদ্ধ**। একটির ক্রিয়াকে ব্যাহত করাই অপরটির প্রধান কাজ।

১৩ নং চিত্রে স্বতন্ত্র নার্ভতন্ত্রের ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে।

৫। পরাসমবেদী নার্ভতন্ত্রের গঠন ও ক্রিয়া।

মধ্যমস্তিষ্ক, সুষুম্নাশীর্ষক, যোজক (Pons) ত্রিকাস্থিদেশ হইতে উদ্ভূত সব নার্ভতন্তুগুলিই পরাসমবেদী অথবা **মস্তিষ্কীয়-ত্রিকাস্থিদেশীয়** (Cranio-sacral) নার্ভতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। মধ্যমস্তিষ্ক (midbrain) হইতে উদ্ভূত তন্তুগুলি মধ্যবর্তী গতিপথ অতিক্রম করিয়া চক্ষুর সিলিয়ারি (ciliary) এবং চক্ষুমণির (pupil) পেশীতে যুক্ত হয়। আবার সুষুম্নাশীর্ষক এবং যোজক হইতে উদ্ভূত নার্ভ-তন্তুগুলি অশ্রুস্রাবী (Lachrymal) ও নাসিক (nasal) অস্থি এবং নিম্নহনুস্থ লালা-গ্রন্থি (Sub-maxilary) ও জিহ্বানিম্নস্থ লালাগ্রন্থি (Sublingual), কর্ণমূলগ্রন্থি (parotid), হৃৎপিণ্ড, ফুস্‌ফুস্‌, কণ্ঠনালী (oesophagus), পাকস্থলী, ক্ষুদ্রান্ত্র (Small intestines), বৃহদন্ত্রের (colon, large intestines) নিকটতম অর্ধাংশ, পিত্তকোষ (gall bladder), যকৃৎ (liver) এবং ক্লোম বা পাচনগ্রন্থির (pancreas) সহিত যুক্ত হয়।

ফুস্‌ফুস্‌-পাকাশয়িক স্নায়ুর (Vagus nerve) কতকগুলি তন্তু শ্বাসনালীর উর্ধ্বভাগে (Larynx) এবং গলকোষে (Pharynx) পরিবেশিত হয়। অধিকন্তু ভেগাস্‌-এর আর একটি কাজ হইল ধমনীর (arteries) সংকোচনী সংগ্রাহক (pressor receptors) এবং ফুস্‌ফুসের প্রসারণী সংগ্রাহক (stretch receptors) হইতে সংবেদীয় নার্ভতন্তু সুষুম্নাশীর্ষকে বহন করা।

কতকগুলি ত্রিকাস্থিদেশীয় মেরুনার্ভ (Sacral spinal nerve) বস্তিতে (pelvis) তন্তু প্রেরণ করিয়া বস্তিকোটরীয় (pelvic) নার্ভ-এ পরিণত হয়। এখান হইতে চেষ্টীয় তন্তু নিম্নগামী বৃহদন্ত্রের, সরলান্ত্র বা মলনালী (rectum), মলদ্বার (anus), মূত্রাশয় (bladder) এবং প্রজনন যন্ত্রের (reproductive organs) মসৃণ পেশীতে অতিক্রম করে। রক্তবাহের স্ফীতিকর (vasodilator) তন্তুগুলি পরিবেশিত হয় প্রজননযন্ত্রে এবং বাহ্য জননেন্দ্রিয়ে (genitals)।

৬। সমবেদী নার্ভতন্ত্রের গঠন ও ক্রিয়া

মেরুদণ্ডের সমবেদী কেন্দ্রগুলি যে সকল কোষদেহ (cells) লইয়া গঠিত, সেইগুলি বক্ষোদেশীয় এবং কটিদেশীয় মেরুমজ্জার পার্শ্ববর্তী (lateral) ধূসর পদার্থে অবস্থিত। এই কোষদেহগুলি হইতে যে সকল তন্তু উদ্ভূত হয় সেইগুলি শেষ হয় সমবেদী নার্ভ-গ্রন্থিতে (gangila)। সমবেদী নার্ভগ্রন্থিতে রহিয়াছে জোটবদ্ধ নার্ভগ্রন্থির শৃঙ্খল। এইগুলি কশেরুকার (vertebral) সম্মুখস্থ পার্শ্ববর্তী দিকে অবস্থিত এবং করোটির (skull) নিম্নদেশ হইতে চঞ্চু অস্থি অথবা অনুত্রিকাস্থি (coccyx) পর্যন্ত বিস্তৃত।

সমবেদী নার্ভগ্রন্থি **গ্রীবাদেশীয়, বক্ষদেশীয়, কটিদেশীয় এবং ত্রিকাস্থি-দেশীয়—এই চার শ্রেণীর**। ইহাদের অধিকাংশের সংখ্যা, ইহারা যে কশেরুকা-গুলির সন্নিহিত তাহাদের সংখ্যার সমান। ইহাদের সংখ্যা নিম্নরূপ :

গ্রীবাদেশীয়	বক্ষোদেশীয়	কটিদেশীয়	ত্রিকাস্থিদেশীয়
তিন জোড়া	দশ হইতে বার জোড়া	চার জোড়া	চার হইতে পাঁচ জোড়া

ককতগুলি নার্তন্ত্র সমবেদী নার্ভগ্রন্থিগুলিকে সংযুক্ত করে এবং কতকগুলি শাখা ইহাদিগকে মেরুনার্ভের সহিত সংযুক্ত করে। বক্ষোদেশীয় এবং কটিদেশীয় অঞ্চলে ইহাদের যোগাযোগ ঘটায় একটি শ্বেত শাখা এবং একটি ধূসর শাখা। শ্বেত শাখার তন্তুসকল কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্র হইতে সমবেদীয় নার্ভগ্রন্থিতে উত্তরণ করে।

এই নার্ভগ্রন্থির তন্তুগুলি হৃদ্‌যন্ত্র, ফুসফুস এবং রক্তবাহে (blood vessels) প্রেরিত হয়। কতকগুলি তন্তু অন্তঃকোষ্ঠীয় নার্ভগঠন করে। কতকগুলি কণ্ঠনালী, বৃহযন্ত্র, সরলান্ত্র, যকৃৎ এবং পিত্তকোষে পরিবেশিত হয়। আবার কতগুলি তন্তু জনন-মূত্র (genito urinary) যন্ত্রে পরিবেশিত হয়।

ধূসর শাখাতন্তুসকল সমবেদীয় নার্ভগ্রন্থিকোষের অ্যাকসন (axon) এবং উহার

মেরুনার্ভের বহিঃপ্রান্তিক শাখার সঙ্গে সঙ্গে বহিঃপ্রান্তে পরিবেশিত হয়। ইহারা মেরুনার্ভ হইয়া (via) ধমনী, শিরা, শ্বেতগ্রন্থি এবং কেশসঞ্চালকপেশীতে পরিবেশিত হয়।

বিভিন্ন সমবেদী নার্ভগ্রন্থি রক্তবাহ, গ্রন্থি এবং আভ্যন্তরীণ যন্ত্রের তন্তু পরিবেশন করে। আবার মস্তিষ্ক অঞ্চলের তন্তু সমবেদীতন্ত্রে প্রবেশ করিয়া গ্রীবাদেশে পরিচালিত হয়।

সমবেদী তন্ত্রের গ্রন্থিগুলি (Plexuses) **পাঁচ** প্রকার।

(১) **হৃৎপিণ্ডীয়** (Cardiac) গ্রন্থি হৃদ্‌যন্ত্রের মূলদেশে অবস্থিত এবং হৃদ্ধমনীর (aorta) ঊর্ধ্বগামী অংশে শায়িত।

(২) **উদরদেশীয়** গ্রন্থিটিকে স্নায়ুবর্তুল (Solar plexus) বলা হইয়া থাকে। এই বর্তুলটি উদরদেশীয় ধমনী এবং ঊর্ধ্ব মধ্যান্ত্রত্বক ধমনীর মূলদেশকে ঘিরিয়া অবস্থিত। (৩, ৪, ৫) **মধ্যান্ত্রত্বক** গ্রন্থি (mesenteric) কটিদেশীয় শেষ কশেরুকা এবং ত্রিকাস্থির প্রবর্ধিত অংশের সম্মুখে অবস্থিত।

সমবেদীতন্ত্র এবং আন্ত্রিকতন্ত্র (Enteric System)

আন্ত্রিকতন্ত্র বলিতে বুঝায় পরিপাক প্রণালীর গায়ে অবস্থিত তন্ত্রের পেশীয় আস্তরণ গ্রন্থি (myenteric) এবং অধঃশ্লেষ্মাঝিল্লীর (submucous) গ্রন্থি। ইহারা গলনালীর ঊর্ধ্বদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া মলনালী পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রথমটি অন্ত্র-প্রাচীরের সঙ্কোচন এবং রসনিঃসরণের শক্তি বিধান করে।

৭। পেশীর গঠন ও ক্রিয়া
(Structure and Function of Muscles)

কি বাহ্যিক, কি আভ্যন্তরীণ, সকল শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়াই গতি অথবা বিচলনের (motion) সহিত সংশ্লিষ্ট। বিচলন প্রাণীর (living organism) একটি অপরিহার্য ধর্ম। বহির্বিশ্ব বা পরিবেশের সহিত সমতারক্ষা করিবার একটি প্রধান উপায় বিচলন। শুধু তাহাই নয়। আভ্যন্তরীণ যন্ত্রগুলির (visceral organs) বিচলন, যেমন হৃৎস্পন্দন, রক্তসঞ্চালন, যকৃতের পিত্ত নিঃসরণ, বিভিন্ন গ্রন্থির রসক্ষরণ প্রভৃতি শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়া পেশী সাহায্যে ঘটিয়া থাকে। আবার বিচলন ঘটে পেশীর সংকোচনের ফলে। কাজেই শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়ায় পেশীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

চর্ম (skin) দেহকে আবৃত করিয়া রাখে এবং ভিতরের কোমল টিস্যু অথবা

কলাগুলিকে রক্ষা করে। চর্মের দুইটি স্তর রহিয়াছে। প্রথমটি উপত্বক বা উপচর্ম (epidermis) এবং দ্বিতীয়টি অধস্ত্বক্ (dermis) অথবা নিম্নচর্ম। নিম্নচর্মের ঠিক নীচের চর্বি-আবরণের নীচে প্রত্যেকটি হাড়ের সহিত সংযুক্ত অনেকগুলি মাংসপেশী (muscle) থাকে। চর্বি-আবৃত মাংসপেশী থাকে বলিয়াই দেহ সুগঠিত ও কোমল দেখায়। "আমাদের দেহে এরূপ পেশীর সংখ্যা প্রায় পাঁচশো। সাধারণতঃ ইহাদের মধ্যভাগ পুষ্ট এবং সরু ও পাতলা প্রান্তভাগ হাড়ের সহিত দৃঢ়ভাবে যুক্ত থাকে; এজন্যই এদের সাহায্যে দেহের যে কোন অংশকে ইচ্ছামত চালনা করা যায়। ইচ্ছাধীন এরূপ পেশীকে ঐচ্ছিক পেশী (voluntary muscle) বলে। উপযুক্ত ক্রিয়া ও পরিমিত চালনায় এই পেশীগুলি পুষ্ট ও বর্ধিত হয়।"

কতকগুলি নার্ভতন্তু (nerve-fibre) একত্র বা গুচ্ছবদ্ধ হইবার ফলে পেশী (muscle) নির্মিত হয়। পেশীয় নার্ভতন্তুর ধর্ম হইল (১) উদ্দীপন-প্রবণতা (irritability), (২) সংকোচনশীলতা (contractility) ও (৩) প্রসারণশীলতা (extensibility) এবং নমনীয়তা (elasticity)। পেশী উদ্দীপনা গ্রহণ করে এবং প্রতিক্রিয়া করে। এইরূপ করিতে গিয়া পেশী ক্ষুদ্রতর অথবা কঠিনতর হয়। প্রতিক্রিয়ার পর পেশী উহার নিজস্ব আকারে ফিরিয়া আসে।

মনুষ্যদেহে **তিন শ্রেণীর মাংসপেশী** আছে। যথা, (ক) **ঐচ্ছিক** (voluntary), (খ) **অনৈচ্ছিক** (involuntary) এবং (গ) **মিশ্রিত** (mixed)। তৃতীয় শ্রেণীর পেশীকে হৃৎপিণ্ডের পেশী (Cardiac muscle) বলা হয়।

যে পেশীগুলির বিচলন আমাদের ইচ্ছাধীন, সেইগুলিকে ঐচ্ছিক বলে। ঐচ্ছিক পেশীগুলি রেখাঙ্কিত (Striped, Striated)। ঐচ্ছিক পেশী চলাফেরা, কথা বলা প্রভৃতি ঐচ্ছিক কার্য সম্পাদনে সক্রিয় হয়। ঐচ্ছিক পেশীতে বিপরীতধর্মী এক এক জোড়া পেশী থাকে। ইহাদের একটি সংকোচনী (flexor) এবং অন্যটি প্রসারণী (extensor)। একটি পেশী সঙ্কুচিত হইলে, অন্যটি প্রসারিত হয়। যেমন, দ্বিমূল পেশীর (bicep) সাহায্যে বাহু সঙ্কুচিত এবং ত্রিশীর্ষ পেশী (triceps) সাহায্যে বাহু প্রসারিত হয়। এই ব্যাপারটিকে বলা হয় reciprocal innervation অথবা পারস্পরিক নার্ভ-ক্রিয়া।

প্রত্যেক পেশীকোষের বিশ্রামকালীন আকুঞ্চন (tonus) আছে। মেরুদণ্ড এবং স্বতন্ত্র নার্ভতন্ত্রের প্রভাবে পেশীর আকুঞ্চন বজায় থাকে। আবার প্রক্ষোভের ফলে ইহা ক্ষুণ্ণ হয়।

যে সকল পেশীর ক্রিয়া আমাদের ইচ্ছাধীন নয়, তাহাদের **অনৈচ্ছিক** পেশী বলে। ইহারা রেখাবিহীন (unstriped)। ঐচ্ছিক পেশীর মত অনৈচ্ছিক পেশীও কেশের মত লম্বা ও সরু তন্তু দিয়া তৈয়ারী। কিন্তু ইহা ঐচ্ছিক পেশীর তুলনায় বেশী ধীরে এবং সমতালে সক্রিয় হয়। ইহার আকুঞ্চনও বেশী এবং অধিক স্থায়ী। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, মলত্যাগ প্রভৃতি স্থাবর (vegetative) ক্রিয়ার সহিত ইহার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। কণ্ঠ, অন্ননালী, শ্বাস ও বায়ুনালী, পিত্তকোষ ও পিত্তনালী, মূত্রযন্ত্র, জননেন্দ্রিয়, চর্ম, স্বেদগ্রন্থি প্রভৃতি যন্ত্রের মাংসপেশী এই শ্রেণীর। এই সকল পেশী শিরা, ধমনী, পাকস্থলী, অন্ত্র, মূত্রগ্রন্থি প্রভৃতি যন্ত্রের ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে।

সকল অনৈচ্ছিক পেশীই যে রেখাবিহীন এমন নয়। যেমন, হৃৎপিণ্ডের পেশী রেখাঙ্কিত অথচ অনৈচ্ছিক। এই পেশী মিশ্রিত (mixed) বলিয়াই ইহারা আংশিক-ভাবে রেখাঙ্কিত। হৃৎযন্ত্রীয় পেশীর সংকোচন ফলেই হৃৎযন্ত্রের সমতালিক (rhythmic) ক্রিয়া ঘটে। হৃৎযন্ত্রীয় (cardiac) পেশীর সংকোচন সর্বাপেক্ষা বেশী (maximal) এবং উহার অবসাদ অথবা বিশ্রামকালও (refractory period) তুলনামূলকভাবে বেশী। ঐচ্ছিক পেশীর সংকোচন এবং অবসাদকাল অপেক্ষাকৃত কম।

সকল পেশীই কুঞ্চনশীল। নার্ভতন্ত্র হইতে আগত চেষ্টীয় নার্ভপ্রবাহই পেশী সঙ্কোচনের কারণ। পেশী অত্যধিক ক্রিয়া করিলে ক্লান্ত বা অবসন্ন হইয়া পড়ে। মাংসপেশীর অত্যধিক ক্রিয়ায় উহার মধ্যে দূষিত পদার্থ সঞ্চিত হওয়ার ফলেই উহাতে অবসাদ বা ক্লান্তি উপস্থিত হয়। পরিশ্রমের ফলে দেহের তাপ বাড়ে এবং ঘর্মনিঃসরণের সাহায্যে এই তাপ নিয়মিত হয়।

৮। গ্রন্থি বা গ্লাণ্ড-এর শ্রেণীভেদ এবং অবস্থান

মোটর বা চেষ্টীয় নার্ভপ্রবাহ যে শুধু পেশীকেই সক্রিয় করে তাহা নয়, ইহা গ্রন্থি বা গ্ল্যাণ্ডকেও সক্রিয় করিয়া তোলে। **গ্রন্থির ক্রিয়া বলিতে উহা হইতে শক্তিশালী রসের ক্ষরণ বুঝায়।** গ্রন্থির ক্ষরিত রসকে হরমোন্ (Hormone) বা অটাকয়েড্ (Autacoid) বলে। গ্রন্থি দুই শ্রেণীর—যথা অন্তঃক্ষরা বা নালিকা-বিহীন গ্রন্থি (Ductless Glands) এবং বহিঃক্ষরা বা নালিকাযুক্ত গ্রন্থি (Duct Glands)।

থাইরয়েড (Thyroid), এড্রিনেল (Adrenal), পিটুইটারি (Pituitary) প্রভৃতি গ্রন্থিগুলির কোনো নল (duct) নাই, যাহার মধ্য দিয়া উহাদের ক্ষরিত রস শরীরের

বাহিরে নিঃসৃত হইতে পারে। উহাদের ক্ষরিত রস শরীরের মধ্যেই থাকে। শরীর ঐ ক্ষরিত রস শোষণ করিয়া লয় এবং ঐ রস হইতে নিজ বল ও পুষ্টি আকর্ষণ করে।



১৪ নং চিত্র—প্রধান অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলির অবস্থান এবং নাম

আবার যৌন গ্রন্থি (Gonads) লালাগ্রন্থি (Parotid gland), অশ্রুগ্রন্থি (Lachrymal gland), স্বেদ গ্রন্থি (Sweat gland) প্রভৃতি নলযুক্ত গ্রন্থিগুলি যে রসক্ষরণ করে, তাহা কোনো নলপথের মধ্য দিয়া শরীরের বাহিরে উপ্‌চাইয়া পড়ে।

থাইরয়েড বা গলগ্রন্থি গ্রীবাদেশে স্বরযন্ত্রের কিছু নিম্নে অবস্থিত। ইহার কোনো রসনিঃস্রাবী ডাক্ট্ বা নল নাই। থাইরয়েড্ যে আঠাল, শ্লেষ্মাজাতীয় তরল পদার্থ ক্ষরণ করে, তাহাকে থাইরক্সিন্ (thyroxin) বলে। থাইরয়েড-এর অধিক এবং অল্প রসক্ষরণ মানুষের মন ও শরীরের উপর অসামান্য প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

পিটুইটারি আর একটি নলহীন গ্রন্থি। ইহা মস্তিষ্কের নিম্নদেশে অপ্‌টিক্ বা দর্শন নার্ভের নির্গমন পথের নিকট অবস্থিত। ইহা ডিম্বাকৃতি এবং পরিমাণে একটি ছোলার মত। ইহা পিটুইটিন (pituitin) নামক এক প্রকার শক্তিশালী হরমোন্ ক্ষরণ করে।

এই গ্রন্থির অতিরিক্ত ও অল্প ক্রিয়াশীলতা মনুষ্য-মন ও দেহের উপর অসীম প্রভাব বিস্তার করে।

আবার, এড্রিনেলও একটি নলহীন গ্রন্থি। ইহা মূত্রযন্ত্রের মাথায় টুপীর মত অবস্থিত রহিয়াছে। ইহার ক্ষরণকে এড্রেনেলিন্ (adrenelin) বলে। এই হরমোনকে আপৎকালীন বা এমার্জেন্সী হরমোন্ বলা হয়, কারণ ভয়ের বা ক্রোধের উত্তেজনায় পলায়ন বা আক্রমণ করিয়া আত্মরক্ষার শক্তি জোগায় এই হরমোন্।

উপরের গ্রন্থিগুলির সাধারণ পরিচয় দেওয়া হইল মাত্র। এইবার গ্রন্থিগুলির বিস্তৃততর আলোচনায় অগ্রসর হওয়া যাউক। এই গ্রন্থিগুলির অবস্থান ১৪নং চিত্রে দ্রষ্টব্য। অধিকাংশ বহিঃক্ষরা গ্রন্থি দেহের অভ্যন্তরে অবস্থিত। কাজেই, উহাদিগকে দেখানো সম্ভব নয়।

৯। অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি (Ductless glands)

অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলি শরীর ও মনের ক্রিয়াকে অসামান্ত ভাবে প্রভাবিত করে। ইহাদের ক্ষরিত রস শরীরের বাহিরে নির্গত হইবার কোনো পথ বা দ্বার পায় না। কাজেই এই রস রক্তের সহিত মিশিয়া শরীরের বিভিন্ন অংশে ছড়াইয়া পড়ে। অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলির ক্ষরিত রস একপ্রকার বিশেষ শক্তিশালী পদার্থ। এই রসগুলি শরীরের সকল যন্ত্রে ক্রিয়া করে বলিয়া ইহাদিগকে বলা হয় রাসায়নিক বার্তাবহ (chemical messengers), হর্‌মোন্ বা অটাকয়েড।

অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলিকে এন্‌ডোক্রিন্ অর্গ্যান (Endocrine organs) বলা হয়, কারণ ইহারা ইহাদের ক্ষরিত রস শরীরের দ্বারগুলি দিয়া বাহির না করিয়া রক্তের সহিত মিশাইয়া দেয়। অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির সংখ্যা অনেক—যেমন থাইরয়েড, প্যারাথাইরয়েড, থাইমাস, পিনিয়াল্, পিটুইটারী, সুপ্রারেনাল্ বা এড্রিনেল, প্যান্‌ক্রিয়াজ-এর অংশ, যৌনগ্রন্থির অংশ প্রভৃতি। মানুষের আচরণ ও ব্যক্তিত্বের উপর সকল অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির রসক্ষরণই প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু ইহার উপর থাইরয়েড, এড্রিনেল এবং পিটুইটারি গ্রন্থির রসক্ষরণই সমধিক প্রভাবশালী।

(ক) থাইরয়েড্ ও প্যারাথাইরয়েড্ গ্ল্যাণ্ড (Thyroid and Parathyroid glands)—থাইরয়েড্ গ্রন্থি দুইটি বেগুনী রং-এর ডিম্বাকৃতি অংশ। ইহারা **স্বরযন্ত্র এবং শ্বাসনালীর দুই দিকে** অবস্থিত। উহার প্রত্যেকটির পাশে দুইটি করিয়া, সাকুল্যে চারটি প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি অবস্থিত। থাইরয়েড এবং

প্যারাথাইরয়েডের ক্রিয়া বিভিন্ন। মাথা পিছনে ঝুঁকাইয়া ঢোক গিলিলে, আয়নায় থাইরয়েড্ গ্রন্থিপিণ্ড সহজেই দেখা যায়।

থাইরয়েড্-এর ক্ষরিত রসকে **থাইরক্সিন্** (Thyroxin) বলে। এই রস কম বা বেশী পরিমাণে ক্ষরিত হইলে ব্যক্তিত্বের নানারূপ বিকৃতি ঘটে। থাইরক্সিন্ **কম** হইলে (Hypo-Thyroidism) শিশু বামন (dwarf) হইয়া থাকে। এই অবস্থাকে বলে **খর্বকায়তা** (Cretinism)। ক্রেটিন্ শিশুর বুদ্ধি কমিয়া যায় এবং সে উচ্চ শিক্ষালাভ করিতে অসমর্থ হয়। আবার বয়স্ক লোকদিগের থাইরক্সিন্ কম হইলে তাহাদের **মাইক্সিডেমা** (Myxoedema) নামক রোগ হয়। এই সকল ব্যক্তি অলস, কর্মবিমুখ এবং নিস্তেজ হয়। তাহাদের যৌন ক্ষমতার বিকাশ হয় না এবং তাহারা বিনা কারণেই ঝিমাইয়া বা ঘুমাইয়া পড়ে।

আবার থাইরক্সিন্ **অধিক** পরিমাণে (Hyper-Thyroidism) নিঃসৃত হইলেও, শরীর ও মনের নানা বিকৃত অবস্থা ঘটে। এই রসের আধিক্য হইলে **গলগণ্ড** (Exophthalmic Goitre) দেখা দেয়। ইহার ফলে অনিদ্রা (Insomnia), সর্বাঙ্গীণ অস্থিরতা বা চাঞ্চল্য ঘটে। তাহা ছাড়া, শরীরের ক্রিয়া অত্যন্ত দ্রুততালে চলিতে থাকে, যেমন হৃৎস্পন্দন প্রভৃতি জৈবক্রিয়াগুলি অত্যন্ত তাড়াতাড়ি সম্পন্ন হয়।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, থাইরয়েড্ গ্রন্থি দেহ ও মনের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। ইহার স্বাভাবিক ক্ষরণের উপর শরীর ও মনের স্বাভাবিক বিকাশ নির্ভর করে। **থাইরয়েড্-এর ক্রিয়াকে হাপরের বাতাসের সহিত তুলনা করা যায়। বাতাস না থাকিলে আগুন নিভিয়া যায়। বাতাস থাকিলে আগুন প্রখরভাবে জ্বলে।**

আবার প্যারাথাইরয়েড্-এর রসক্ষরণও সাধারণভাবে শরীর ও মনের নিয়ন্ত্রণকে প্রভাবিত করে। ইহার অভাব হইলে চরম অস্থিরতা, অবসাদ, পেশীর দুর্বলতা প্রভৃতি দৈহিক ও মানসিক বিপর্যয় ঘটে। ফলে শরীর ও মনের অবনতি হয়। আবার, ইহার আধিক্য হইলে, বিপরীত কুফলগুলি উৎপন্ন হয়।

কেহ কেহ **মন ও ব্যক্তিত্ব-নিয়ন্ত্রণ** বিষয়ে থাইরয়েড্ গ্রন্থির উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেন, যেন ইহাই একমাত্র মন ও ব্যক্তিত্বের নিয়ামক। অনুভূতি বা প্রক্ষোভের বৈশিষ্ট্য অনেকাংশে থাইরয়েড্ গ্ল্যাণ্ড দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় সত্য, কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে অনুভূতি বা প্রক্ষোভও থাইরয়েড্ গ্ল্যাণ্ডের ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করে, অর্থাৎ ইহারা পরস্পর নির্ভরশীল।

প্যারাথাইরয়েড্ গ্রন্থিও যে প্রক্ষোভের সাম্য (emotional stability) নিয়ন্ত্রণ করে, তাহা দেখা গিয়াছে। তাহা ছাড়া, এই ক্ষুদ্র গ্রন্থি চারটি দেহের ক্যাল্সিয়াম ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রণ করে। ক্যাল্সিয়াম ব্যবহারের ফলেই দন্ত এবং অস্থি ঠিক মত গঠিত হয়। সুতরাং প্যারাথাইরয়েড্ গ্রন্থির গুরুত্ব অবশ্যই স্বীকার্য।

(খ) **এড্রিনেল্ অথবা সুপ্রারেনাল গ্রন্থি** (Adrenal or Suprarenal gland)—এড্রিনেল্ গ্রন্থি বলিতে দুইটি ক্ষুদ্র, পীতাভ ত্রিভুজাকৃতি যন্ত্র বুঝায়। ইহারা **বৃক্ক বা মূত্রগ্রন্থির (kidney) উপর দুইটি টুপীর মত চাপানো থাকে।** ইহাদের প্রত্যেকটির আবার স্বতন্ত্র ক্ষরণশীল অংশ রহিয়াছে। যথা, উহাদের কেন্দ্রকে বলা হয় এড্রিনেল মেডুলা (medulla) এবং বহিরাবরণকে বলা হয় এড্রিনেল কর্টেক্স (cortex)। এড্রিনেল কর্টেক্স্ কতকগুলি পদার্থ নিঃসরণ করে এবং এইগুলিকে একসঙ্গে কর্টিন্ (Cortin) বলা হয়। কর্টিন্-এর ক্রিয়া সম্বন্ধে গবেষণা চলিতেছে। তবে ইহা ঠিক যে জীবনের কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইলে কর্টিন্-এর দরকার। কর্টিন বেশী নিঃসৃত হইলে নারীদের দেহে ও মনে পুরুষের লক্ষণ প্রকাশ পায়, অথবা অত্যধিক কর্টিন কি নারী কি পুরুষ উভয়েরই যৌন বিকাশ ব্যাহত করে। আবার কর্টিন-এর ক্ষরণ কম হইলে, শরীরের কৃশতা, অবসাদ ও দুর্বলতা ঘটে।

এড্রিনেল মেডুলা যে পদার্থ ক্ষরণ করে তাহার নাম **এড্রিনেলিন, এড্রিনিন্** বা **এপিনেফ্রিন্**। জীবন ধারণের পক্ষে এড্রিনিন তেমন প্রয়োজনীয় নয়। আপৎ-কালীন অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইলে, ইহা বিশেষ প্রয়োজনীয়। এড্রিনিন্ প্রাণীকে বিপদের সম্মুখীন হইতে প্রস্তুত করে। এই কারণে ক্যানন্ (Cannon) এড্রিনেল্ গ্রন্থিকে **আপৎকালীন** (Emergency gland) **গ্রন্থি** বলিয়াছেন। তাহা ছাড়া, এই গ্রন্থি সমবেদী নার্ভতন্ত্রের দ্বারা পরিচালিত হয়। আবার সমবেদী নার্ভতন্ত্রের দ্বারা উদ্দীপিত প্রায় সকল প্রান্তীয় যন্ত্রের ক্রিয়াকেই ইহা সাহায্য করে।

মোটের উপর বলা যাইতে পারে যে, এড্রিনিন দেহের বিভিন্ন অংশের রং (pigment), চর্মে চুলের উন্মেষ প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করে। বেদনা, ক্রোধ, ভয় প্রভৃতি প্রবল প্রক্ষোভগুলির প্রকাশও ইহার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। অধ্যাপক ক্যানন্ দেখাইয়াছেন যে, প্রবল প্রক্ষোভে রক্তের এড্রিনিন পরিমাণে বাড়িয়া যায়। তিনি আরও প্রমাণ করিয়াছেন যে, এড্রিনিন যকৃৎ হইতে রক্তশর্করা (Blood-Sugar) রেখাঙ্কিত পেশীতে সরবরাহ করিয়া উহার শক্তি বাড়ায়, আভ্যন্তরীণ যন্ত্রের পেশীর ক্রিয়াকে নিরুদ্ধ করে, রক্তের চাপবাঁধা (Coagulation of blood) বাড়ায়,

হৃৎস্পন্দন এবং ফুসফুসের ক্রিয়া দ্রুততর করে; স্বেদগ্রন্থির ক্রিয়া বৃদ্ধি করে এবং আরও নানা পরিবর্তন ঘটায়। মোটের উপর, ক্যানন্ দেখাইয়াছেন যে এড্রিনেল গ্ল্যাণ্ড্ একটি জরুরী বা আপৎকালীন গ্রন্থি। **ইহা মানুষকে যুদ্ধে, অথবা পলায়নে প্রস্তুত করে।**

এই গ্রন্থির ক্রিয়া সম্বন্ধে আরও জ্ঞান লাভ করিবার জন্য এই খণ্ডের 'ব্যক্তিত্ব' শীর্ষক নবম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

(গ) **পিটুইটারি গ্রন্থি (Pituitary gland)**—পিটুইটারি গ্রন্থি একটি ক্ষুদ্র যন্ত্র। ইহা আকারে একটি ডিমের মত এবং পরিমাণে একটি মটর দানার মত। ইহার অবস্থান মস্তিষ্কের ঠিক নীচে, অপ্টিক নার্ভের নিকটে। পিটুইটারি গ্রন্থির দুইটি অংশ—সামনের অংশটিকে বলা হয় অ্যান্টিরিয়র (Anterior) পিটুইটারি এবং পেছনের অংশটিকে বলা হয় পষ্টিরিয়র্ (Posterior) পিটুইটারি।

এই গ্রন্থির ক্ষরিত রসকে বলা হয় পিটুইটিন (Pituitin)। সামনের অংশটির ক্ষরণ কম হইলে, শরীরের তাপ (body temperature) কমিয়া যায়, চলন (movement) অস্থির হয়, শীর্ণতা, উদরাময় প্রভৃতি রোগলক্ষণ প্রকাশ পায়। আবার ইহার ক্ষরণ অত্যধিক হইলে, **বিরাটকায়ত্তা** (Gigantism) ঘটে। দেহের পূর্ণ বিকাশের পর ইহার ক্ষরণ বেশী হইলে এক্রমেজেলি (Acromegaly) নামক অবস্থা প্রকাশ পায়। এক্রমেজেলি ঘটিলে দেহের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্বাভাবিক থাকিয়া হাত, পা, নাক প্রভৃতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি অতিমাত্রায় বড় হয়।

আবার পিটুইটারি গ্রন্থির পেছনের অংশটিও গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে। ইহা আভ্যন্তরীণ অঙ্গের পেশীশক্তি, মূত্রগ্রন্থি, স্তনগ্রন্থি এবং অন্যান্য গ্রন্থিগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে। ইহার রসক্ষরণ কম হইলে শরীর স্থূল হয়, মানসিক এবং যৌন বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়।

থাইরয়েড্ গ্রন্থির মত পিটুইটারি গ্রন্থিও শারীরিক ও মানসিক বিকাশের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। মানুষের স্বাভাবিক বিকাশ ও আচরণ এই গ্রন্থির স্বাভাবিক ক্রিয়ার উপর অনেকাংশে নির্ভর করে।

পিটুইটারি গ্রন্থি যে শরীর ও মনের স্বাভাবিক বিকাশকে নিয়ন্ত্রিত করে, শুধু তাহাই নয়। ইহা কতকগুলি শক্তিশালী পদার্থ বা হরমোন নিঃসরণ করে, যাহা অন্যান্য গ্রন্থির রসক্ষরণকে সাহায্য করে বা বাধা দেয়। এই জন্য পিটুইটারি গ্রন্থিকে **প্রধান বা অভিভাবক গ্রন্থি** (Master gland) বলা হইয়া থাকে।

পিটুইটারি গ্রন্থি আরও কতকগুলি রসক্ষরণ করে এবং সেইগুলি শারীর বিপাকের (body metabolism) উপর প্রাধান্য বিস্তার করে। এই রসগুলির মধ্যে একটির নাম বৃদ্ধিমূলক রস (Growth Hormone)। ইহা শিশুর বৃদ্ধিহারকে নিয়ন্ত্রণ করে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, এই হরমোন্-এর অভাব ঘটিলে শিশু বামন বা খর্বকায় হইয়া থাকে এবং ইহার আতিশয্য ঘটিলে শিশু বিরাটকায় হয়।

পিটুইটারি গ্রন্থি ব্যক্তিত্বকে কিরূপে নিয়ন্ত্রণ করে তাহা 'ব্যক্তিত্ব' শীর্ষক নবম পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে।

(ঘ) **থাইমাস গ্রন্থি (Thymus gland)**—থাইমাস গ্রন্থি আর একটি অন্তঃক্ষরা বা নলবিহীন (ductless) গ্রন্থি। ইহা গলার নীচে অবস্থিত। ইহার রাসায়নিক ক্রিয়া এখনও অজ্ঞাত। তবে ইহার রসক্ষরণের উপরও যে শরীর ও মনের বিকাশ নির্ভর করে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই গ্রন্থির বৈশিষ্ট্য এই যে ইহার ক্রিয়া শৈশবেই সীমাবদ্ধ। এই গ্রন্থিটি কৈশোরের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

(ঙ) **পিনিয়াল গ্রন্থি (Pineal gland)**—পিনিয়াল গ্রন্থিও একটি অন্তঃক্ষরা বা নলবিহীন গ্রন্থি। ইহা দেখিতে অনেকটা বেগুনী রং-এর অঙ্কুরের মত। ইহা মস্তিষ্কের পশ্চাতে অবস্থিত। সম্ভবতঃ পিনিয়াল্ গ্রন্থির ক্ষরণ জননযন্ত্রের বিকাশকে নিয়ন্ত্রণ করে। এই গ্রন্থিটির ক্রিয়াও থাইমাস গ্রন্থির ন্যায় শৈশবে সীমাবদ্ধ, কারণ ইহা কৈশোরে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। কতকগুলি নিম্নস্তরের মেরুদণ্ডবিশিষ্ট প্রাণীতে ইহা তৃতীয় মধ্যক চক্ষু' (third median eye) রূপে বর্তমান বলিয়া মনে হয়। ইহাদের মধ্যমস্তিষ্কের কর্পোরা কোয়াড্রিজেমিনা অংশের উপর ইহা অবস্থিত। দেকার্তে মনে করেন যে আত্মার অধিষ্ঠান (Location of the soul) হইল পিনিয়াল গ্ল্যাণ্ড। তাঁহার মতে ইহাই আত্মা এবং দেহের সংযোগস্থল।

(চ) **প্যান্‌ক্রিয়াজ্ গ্রন্থি (Pancreas gland)**—প্যান্‌ক্রিয়াজ্ গ্রন্থি পাকস্থলীর নিম্ন প্রাচীরে অবস্থিত। ইহা দুইটি অংশে বিভক্ত। ইহার বাহিরের অংশ একটি বহিঃক্ষরা গ্রন্থি। কিন্তু ইহার কেন্দ্রীয় অংশ অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি। কেন্দ্রীয় অংশটি কতকগুলি কোষ-গুচ্ছ দিয়া তৈয়ারী। ইহার নিঃসৃত হরমোন্‌কে **ইনস্যুলিন** (Insulin) বলে। ইন্‌সুলিন্-এর আবিষ্কার চিকিৎসা-বিদ্যায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করিয়াছে। যেমন ডায়াবিটিস্ রোগীর দেহে ইন্‌সুলিন্-এর অভাব হয় এবং তাহার দেহে কৃত্রিম উপায়ে ইন্‌সুলিন্ দিয়া তাহাকে সুস্থ করিয়া তুলিতে হয়। ইন্‌সুলিন্ কম হইলে

রক্তশর্করার বৃদ্ধি হয়, আবার ইহা বাড়িয়া গেলে রক্তশর্করা কমিয়া যায়। স্বাস্থ্যের পক্ষে রক্তশর্করার পরিমাণ ঠিক সেইটুকুই হওয়া দরকার, নার্ভতন্ত্রর ইন্ধন (Fuel) জোগাইবার জন্য যতটুকু লাগে। শরীরে রক্তশর্করা বেশী হইলে বুঝা যায়, মস্তিষ্ক উহার প্রয়োজনীয় খাদ্য পাইতেছে না। আবার শরীরে রক্তশর্করা কম হইলে বুঝায় যে ইন্‌সুলিন্‌ হর্‌মোন্‌ বাড়িয়া গিয়াছে। প্যান্‌ক্রিয়াজ-এর বহিরংশ একটি বহিঃক্ষরা গ্রন্থি। ইহার কাজ হইল হজমি রস (gastric juice) নিঃসরণ করা। এই রস হজম ক্রিয়ার সহায়তা করে।

(ছ) **যৌনগ্রন্থি (Gonads)**—পুরুষের যৌনগ্রন্থি বলিতে বুঝায় অণ্ডকোষ (testes) এবং নারীর যৌনগ্রন্থি বলিতে বুঝায় ডিম্বাশয় (ovaries)। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই উহারা জোড়ায় জোড়ায় থাকে। যৌনগ্রন্থিগুলি কয়েকটি পরস্পরসম্বন্ধ শক্তিশালী পদার্থ বা হর্‌মোন্‌ নিঃসরণ করে। পুরুষের যৌন হর্‌মোন্‌ নারীর যৌন হর্‌মোন্‌ হইতে পৃথক।

যৌন হর্‌মোন্‌ শিশুতে সক্রিয় হয় না। কৈশোর আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে যৌন গ্রন্থি যে রসক্ষরণ করে, তাহার ফলে যৌবন লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই যৌবন লক্ষণগুলিকে গৌণ যৌনলক্ষণ (Secondary sexual characters) বলে। গৌণ যৌন লক্ষণগুলি প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে পুরুষের গোঁফের রেখা এবং রোম দেখা দেয়, গলার স্বর গভীরতর হয়—স্ত্রীলোকের মাসিক রজঃস্রাব আরম্ভ হয়, তাহার বক্ষঃস্থল প্রশস্ত হয় এবং মাথা হইতে কোমর পর্যন্ত শরীরের অংশ এবং নিতম্ব বৃদ্ধি পায়। এই পার্থক্যগুলি প্রকাশিত হইলেই কিশোর-কিশোরীর আচরণে মৌলিক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

পুরুষের অণ্ডকোষ হইতে যে শক্তিশালী পদার্থ বা হর্‌মোন্‌ নিঃসারিত হয়, তাহার নাম অ্যান্‌ড্রোজেন (androgen) এবং নারীর ডিম্বাশয় হইতে যে শক্তিশালী পদার্থ বা হর্‌মোন্‌ নিঃসারিত হয় তাহর নাম এস্ট্রোজেন্‌ (aestrogen)। প্রধান অ্যান্‌ড্রোজেনকে বলে টেস্টোস্টেরোন্‌। ইহারই প্রভাবে বালক যুবকে পরিণত হয়, তাহার যৌনযন্ত্র পরিণত হয় এবং গৌণ যৌনলক্ষণগুলি প্রকাশ পায়। কাজেই অ্যান্‌ড্রোজেন্‌কে শুধু যৌন পদার্থ বা হর্‌মোন্‌ বলা যথেষ্ট নয়। ইহা পুরুষের বিপাক (metabolism) ক্রিয়াকে সাহায্য করে এবং শরীর ও মনের নানা লক্ষণ নিয়ন্ত্রিত করে। আবার নারীর এস্ট্রোজেন্‌ সম্পর্কেও একই কথা খাটে।

দেখা যাইতেছে যে যৌনগ্রন্থি শুধু বহিঃক্ষরা গ্রন্থিই নয়, অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিও বটে। ইহার রস কতক পরিমাণে দেহযন্ত্রের বাহিরে উপচাইয়া পড়িলেও, এই রসের কিছু অংশ ব্যক্তির দৈহিক ও মানসিক বিকাশে ব্যবহৃত হয়। যৌনগ্রন্থির স্বাভাবিক বিকাশের উপর দৈহিক এবং মানসিক বিকাশ যথেষ্ট নির্ভর করে। এই গ্রন্থির অল্প বা অধিক ক্ষরণ নানাপ্রকার যৌন ও সামাজিক বিকৃতি বা অসামঞ্জস্য ঘটায়। অবশ্য যৌনগ্রন্থি যে একক ভাবে কাজ করিতে পারে, তাহা নয়। আরও কয়েকটি গ্রন্থিও স্বাভাবিক যৌন বিকাশের সহায়তা করে। আমরা দেখিয়াছি যে ইহারা প্রধানতঃ পিনিয়াল, থাইমাস্ এবং পিটুইটারি গ্রন্থি।

১০। অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির পরস্পরসাপেক্ষতা
(Interaction of the Ductless Glands)

গ্রন্থিগুলি পরস্পরবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে না, কিন্তু একটি দলবদ্ধ সংগঠনের মত পরস্পর সহযোগিতায় কাজ করে। প্রমাণস্বরূপ গোনাড্স্ গ্ল্যাণ্ড্-এর থাইমাস গ্ল্যাণ্ড্-এর সামঞ্জস্য উল্লেখ করা যাইতে পারে। "শৈশবের গ্রন্থি (Gland of childhood)" থাইমাস্ কৈশোরের পূর্ববর্তী বৃদ্ধি অথবা বিকাশ নিয়ন্ত্রিত করে। তের হইতে উনিশ বৎসর পর্যন্ত থাইমাস দ্রুতভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। থাইমাস গ্রন্থির ক্ষয়ই যৌন-গ্রন্থির ক্রিয়াকে নিয়মিত করে। থাইমাস যদি অতি শীঘ্র ক্ষীণ হয়, তবে নবযৌবন (adolescence) ত্বরান্বিত হয়, আবার ইহা অপেক্ষাকৃত বিলম্বে নিষ্ক্রিয় হইলে, নবযৌবন বিলম্বিত হইয়া থাকে।[১] তাহা ছাড়া, স্বাভাবিক যৌন বিকাশে যৌন গ্রন্থির সহিত পিনিয়াল এবং পিটুইটারি গ্রন্থির সহযোগিতা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।[২]

আবার, প্যানক্রিয়াজ্ গ্রন্থি পিটুইটারি গ্রন্থির ক্রিয়াকে বাধা দেয় এবং অ্যাড্রিনেল্ প্যান্‌ক্রিয়াজ্-এর ক্রিয়াকে ব্যাহত করে। যৌনগ্রন্থির ক্রিয়াকে যে শুধু থাইমাস এবং পিনিয়াল্ গ্রন্থিই ব্যাহত করে তাহা নয়, অ্যাড্রিনেল, থাইরয়েড্ এবং পিটুইটারি গ্রন্থিও যৌনবিকাশকে বাধা দেয়। অধিকন্তু থাইরয়েড অত্যধিক ক্রিয়াশীল হইলে অ্যাড্রিনেল্ বেশী এবং পিটুইটারি কম সক্রিয় হয়।

১১। অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলির পরিণতি (Maturation)

এণ্ডোক্রিন্ গ্রন্থিগুলির পরিণতি লাভে অনেক সময় লাগে, ইহারা চট্ করিয়া পরিণতি লাভ করে না। ইহার আংশিক কারণ সম্ভবতঃ এই যে মাতাই ভ্রূণকে

১ জি. মার্ফি—জেনারাল সাইকলজি—পৃঃ ৫৫-৫৬
২ জি. এল্. ফ্রীম্যান—ফিজিয়লজিক্যাল সাইকলজি—পৃঃ ১২৪-১২৫

(foetus) হর্‌মোন্ বা শক্তিশালী অন্তঃক্ষরা রসগুলি পরিবেষণ করিয়া থাকেন, যাহার ফলে ভ্রূণকে স্বয়ং রসক্ষরণ করিতে হয় না। তাহা ছাড়া, বেশীর ভাগ হর্‌মোন্ই প্রাথমিক জীবনে দরকার হয় না।

যৌনগ্রন্থি একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। কৈশোরের পূর্বে এই গ্রন্থি পরিণতি লাভ করে না – প্রায়ই বার বৎসরের পূর্বে বালক-বালিকাদের পুরুষ ও নারীর ভূমিকা গ্রহণ করিতে হয় না। এই সময়ে বালকদের গোঁফের উদ্গম এবং কণ্ঠস্বরের গভীরতা এবং বালিকাদের স্তনবিকাশ ঘটিয়া থাকে। এই পরিবর্তনগুলি ঘটে যৌনগ্রন্থির বিকাশের ফলে।

১২। বহিঃক্ষরা গ্রন্থি (Duct Glands)

অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলির রসক্ষরণ মন ও শরীরের উপর অধিক প্রভাব বিস্তার করে সন্দেহ নাই। কিন্তু বহিঃক্ষরা গ্রন্থিগুলির রসক্ষরণও যে উহাদের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে, তাহাও স্বীকার্য। বহিঃক্ষরা গ্রন্থি প্রধানতঃ এইগুলি :—লালাগ্রন্থি (Parotid, Salivary), হজমি গ্রন্থি (Gastric), যকৃৎ, প্যান্‌ক্রিয়াজ্, মূত্রগ্রন্থি, স্বেদগ্রন্থি (Sweat gland), অশ্রুগ্রন্থি (Lachrymal gland), শ্লেষ্মাগ্রন্থি (Mucus), যৌনগ্রন্থি (Sex) প্রভৃতি। অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলিকে বলা হয় এণ্ডোক্রিন্ (Endocrine) এবং বহিঃক্ষরা গ্রন্থিগুলিকে বলা হয় এক্সোক্রিন (Exocrine) গ্ল্যাণ্ড্।

এই গ্রন্থিগুলিকে বহিঃক্ষরা গ্রন্থি বলা হয়, কারণ উহাদের ক্ষরিত রস নালিকা বা প্রণালী দিয়া দেহের বাহিরে নিঃসৃত হয়। ইহারা অধিকাংশই হজমের অথবা দূষিত পদার্থ নিঃসরণের কাজ করে। অধিকাংশ বহিঃক্ষরা গ্রন্থিই শরীরের অভ্যন্তরে অবস্থিত বলিয়া অক্ষত দেহের উপর উহাদের গবেষণা চলে না। শুধু লালা এবং স্বেদগ্রন্থি সম্বন্ধে গবেষণা করিয়াই সুফল পাওয়া গিয়াছে। এই গ্রন্থির উপর প্যাভ্‌লো-এর গবেষণা প্রসিদ্ধ। তিনি সাপেক্ষ প্রতিবর্ত-গবেষণায় কুকুরের লালানিঃসরণের অনুসন্ধান করিয়াছেন হজমক্রিয়ার সহিত লালাক্ষরণের সম্বন্ধ অনস্বীকার্য। এমন কি আহার করিবার ব্যাপারেও এই ক্ষরণ বিশেষ প্রয়োজনীয়। স্বেদক্ষরণ দৈহিক বিপাকের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। স্বাভাবিক স্বেদক্ষরণ স্বাস্থ্যের লক্ষণ। গ্যাল্‌ভ্যানিক্ চর্ম-প্রতিক্রিয়া (Galvnic Skin Response) স্বেদক্ষরণের উপর নির্ভর করে। গ্যাল্‌ভানোমিটার যন্ত্রের চক্র (Circuit) দিয়া যে তড়িৎপ্রবাহ চর্মের উপর ক্রিয়া করে, স্বেদক্ষরণের জন্যই চর্ম তাহাতে প্রতিক্রিয়া করিয়া থাকে। এই প্রতিক্রিয়া প্রক্ষোভের সূচক বলিয়া গৃহীত।

অনুশীলনী (Exercise)

1. Give a sketch of the peripheral nervous system. (Ans : pp. 100-104)
   বহিঃপ্রান্তীয় নার্ভতন্ত্রের সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।
2. What are the principal peripheral nerves? What are their functions? (Ans : pp. 101-104)
   প্রধান বহিঃপ্রান্তীয় নার্ভগুলি কি? উহাদের কার্য কি?
3. Distinguish between cranial and spinal nerves. (Ans : pp 101-104)
   মস্তিষ্কীয় নার্ভ এবং মেরুনার্ভের পার্থক্য প্রদর্শন কর।
4. What do you mean by the autonomic nervous system? What are its different parts? (Ans : pp. 104-106)
   'স্বতন্ত্র নার্ভতন্ত্র' বলিতে কি বুঝায়? ইহার বিভিন্ন অংশগুলি কি?
5. Compare the Parasympathetic and Sympathetic nervous system. Are they antagonistic? (Ans : pp. 106-108)
   পরাসমবেদী এবং সমবেদী নার্ভতন্ত্রের তুলনা কর। উহারা বিপরীত কি?
6. Explain the structure and functions of the parasympathetic nervous system. (Ans : pp. 108-109)
   পরাসমবেদী নার্ভতন্ত্রের গঠন এবং ক্রিয়া আলোচনা কর।
7. Explain the structure and functions of the Sympathetic nervous system. (Ans : pp. 109-110)
   সমবেদী নার্ভতন্ত্রের গঠন এবং ক্রিয়া আলোচনা কর।
8. Is the autonomic nervous system really 'autonomous'? Discuss. (Ans : pp. 104-105)
   স্বতন্ত্র নার্ভতন্ত্র বাস্তবিকই 'স্বতন্ত্র' কিনা তাহা আলোচনা কর।
9. Explain the structure and funciions of muscles. (Ans : pp. 110-111)
   পেশীর গঠন এবং ক্রিয়া আলোচনা কর।
10. What are the different kinds of muscle? How do they differ? (Ans : pp. 110-111)
    পেশী কত প্রকার? তাদের পার্থক্য কি?

11. What are the endocrine organs ? Point out their position in the body. (Ans : pp. 112-114)
অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলি কি কি ? দেহে উহাদের স্থান নির্দেশ কর।

12. Explain the structure, position and function of the thyroid and parathyroid glands. (Ans : pp. 114-116)
থাইরয়েড এবং প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থির স্থান, গঠন এবং ক্রিয়া বুঝাইয়া দাও।

13. What do you know of the adrenal gland ? Why is it called the emergency gland' ? (Ans : pp. 116-117)
অ্যাড্রিনেল গ্রন্থি সম্বন্ধে কি জান ? উহাকে 'বিপৎকালীন গ্রন্থি' বলা হয় কেন ?

14. Point out the structure, position and function of the pituitary gland. Why is it called the 'master gland' ?
(Ans : pp. 117-118)
পিটুইটারি গ্রন্থির গঠন, স্থান এবং ক্রিয়া নির্দেশ কর। ইহাকে 'প্রধান গ্রন্থি' বলা হয় কেন ?

15. Explain the interaction of the endocrine organs and their maturation. (Ans : p. 120)
অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলির পরস্পর-সাপেক্ষতা এবং বিকাশ ব্যাখ্যা কর।

16. Distinguish between the endocrine and cxocrine glands.
(Ans : p. 121)
অন্তঃক্ষরা এবং বহিঃক্ষরা গ্রন্থির পার্থক্য বুঝাইয়া দাও।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

প্রতিবর্ত এবং সাপেক্ষ প্রতিবর্ত

(Reflex and Conditioned Reflex)

১। প্রতিবর্ত (Reflex Action)

(১) ভূমিকা

পঞ্চম পরিচ্ছেদের ১২। (৪) অনুচ্ছেদ প্রতিবর্তের কেন্দ্র হিসাবে মেরুদণ্ডের কার্য আলোচিত হইয়াছে। ঐ প্রসঙ্গে নানাপ্রকার প্রতিবর্ত উদাহরণ সহ বুঝানো গিয়াছে।

এই পরিচ্ছেদে প্রতিবর্তের স্বরূপ, প্রকারভেদ এবং সাপেক্ষ প্রতিবর্ত আলোচিত হইতেছে।

(২) প্রতিবর্তের সংজ্ঞা এবং স্বরূপ

(Definition and Nature of Reflex Action)

উদ্দীপক ইন্দ্রিয়ের বহিঃপ্রান্তকে উদ্দীপিত করিলে, চেতনার সাহায্যে বা উহার নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই, অতীত শিক্ষার উপর নির্ভর না করিয়া, একরূপ-ভাবে (uniformly), **সোজাসুজি** (immediatly) **যে প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন হয় তাহাকে প্রতিবর্ত (Reflex) বলে।** যেমন আগুনে হাত লাগিবা মাত্র হাত সরাইয়া লওয়া হয়, অথবা নাকে সুড়সুড়ি লাগিবা মাত্র হাঁচি আসে। এই দুইটিই প্রতিবর্ত ক্রিয়া। আগুনে হাত লাগিবা মাত্র হাত সরাইয়া লওয়া,—এই প্রতিবর্তের শারীর ধাপ বা স্তরগুলি বুঝিতে পারিলেই প্রতিবর্ত বুঝিবার সুবিধা হইবে। এই স্তরগুলি বর্তমান অনুচ্ছেদের (৩) চিহ্নিত অংশে প্রদর্শিত হইয়াছে। পরবর্তী ১৫নং চিত্রে প্রতিবর্তের শরীর ধাপ বা স্তরগুলি দেখানো হইল।

প্রতিবর্ত ক্রিয়া, স্বরূপ বা বৈশিষ্ট্য

প্রতিবর্ত একপ্রকার (ক) **সহজ** (Simple) **প্রতিক্রিয়া**, কারণ ইহাতে ক্রিয়-শীল নিউরোন, পেশী বা গ্রন্থির সংখ্যা ঐচ্ছিক প্রতিক্রিয়ার তুলনায় কম। (খ) প্রতিবর্ত **সহজাত** (Hereditary), অর্থাৎ জন্মের মুহূর্ত হইতেই ইহার গঠন এবং প্রকৃতি সম্পূর্ণ থাকে। (গ) **প্রতিবর্ত শিক্ষালব্ধ নয়** এবং (ঘ) ইহা **অভিজ্ঞতা সাহায্যে সহজে সংশোধিত বা পরিবর্তিত হয় না** (not easily modified by experience)। (ঙ) প্রতিবর্ত ক্রিয়ার **আকার নির্দিষ্ট** (Definite, Stereotyped,

Fixed)—যেমন আগুনে হাত সরাইয়া লওয়া একটি নির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়া। (চ) **একরূপতা** (uniformity) প্রতিবর্তের আর একটি বিশেষ ধর্ম—যেমন সকল নবজাত শিশুই একরূপে স্তন্যপান করে। (ছ) উদ্দীপক ক্রিয়াশীল হইবামাত্র (immediately) **সঙ্গে সঙ্গে** প্রতিবর্ত ঘটিয়া থাকে। ইহা দ্রুত (prompt) অথবা ত্বরান্বিত। (জ) চেতনা বা ইচ্ছাশক্তি দ্বারা প্রতিবর্ত সংযত বা নিয়ন্ত্রিত হয় না।

প্রতিবর্তের বিশ্লেষণ

উপরে প্রতিবর্তক্রিয়ার সহজে সংশোধন বা পরিবর্তন ঘটে না, এইরূপ বলা হইয়াছে। কিন্তু **জটিল অবস্থায়** ইহার **পরিবর্তন বা সংশোধন ঘটিয়া থাকে**। এই দিক দিয়া প্রতিবর্তকে **পাঁচটি শ্রেণীতে** বিভক্ত করা যাইতে পারে।

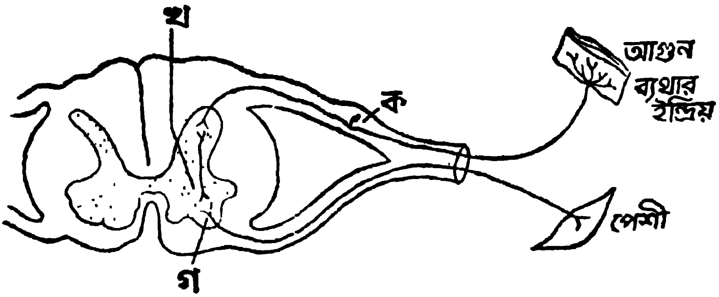
(১) কতকগুলি বিশুদ্ধ প্রতিবর্ত **কোনক্রমেই পরিবর্তন হয় না**—যেমন তারারন্ধ্রীয় প্রতিবর্ত (Pupillary Reflex), উত্তাপে বা ব্যথায় হাত সরাইয়া লওয়া, পাকস্থলীয় হজমক্রিয়া, নাক ডাকা প্রভৃতি। আবার, (২) কতকগুলি প্রতিবর্ত প্রধানতঃ বিশুদ্ধ হইলেও, **ব্যাহত বা বর্ধিত** হইতে পারে—যেমন কাশি, হাইতোলা, বমন, লালা-নিঃসরণ প্রভৃতি। আবার, (৩) আরও কতগুলি প্রতিবর্ত প্রায়ই বিশুদ্ধ হইলেও, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই **সংশোধিত** হইয়া থাকে—যেমন হাসি, কান্না, হাঁপানো প্রভৃতি। (৪) কতকগুলি প্রতিবর্ত শৈশবে বিশুদ্ধ থাকিলেও, পরিণত বয়সে অবশ্যই **পরিবর্তিত** হয়—যেমন স্তন্যপান, কামড়ানো, থুথু ফেলা প্রভৃতি। ইহা ছাড়াও, (৫) কতকগুলি দেহভঙ্গিমা (posture) সংক্রান্ত প্রতিবর্ত **সর্বদা পরিবর্তিত** হইয়া থাকে—যেমন মাথা সোজা করিয়া রাখা, বসা, দাঁড়ানো, দেহের ভারসাম্য বজায় রাখা প্রভৃতি।

(৩) প্রতিবর্ত বৃত্তাংশ (Reflex Arc)

প্রতিবর্ত ক্রিয়া সহজ হইলেও, ইহা নার্ভতন্ত্রের একাধিক অংশ সাহায্যে ঘটিয়া থাকে। এই অংশগুলি চিত্রাকারে আঁকিলে, উহাদিগকে একটি **বৃত্তাংশের** (Arc) মত দেখায়। সেই কারণে যে নার্ভ-পথ সাহায্যে প্রতিবর্ত ঘটে, তাহাকে বলা হয় প্রতিবর্ত বৃত্তাংশ (Reflex Arc)। এই নার্ভ-পথ বুঝিতে হইলে, নার্ভতন্ত্রের যে যে অংশ ক্রিয়া করিবার ফলে প্রতিবর্ত ঘটে, তাহা বুঝা দরকার।

প্রতিবর্ত ক্রিয়ায় প্রথমতঃ কোনো ইন্দ্রিয়যন্ত্রের সংবেদীয় বা অন্তর্গামী নার্ভের বহিঃপ্রান্ত উত্তেজিত হয়। এই উত্তেজনার ফলে একটি নার্ভপ্রবাহের সৃষ্টি হয়।

নার্ভপ্রবাহটি উত্তেজিত নার্ভ দিয়া প্রবাহিত হইয়া ঐ নার্ভের অন্তঃপ্রান্তে, যাহা মেরুদণ্ডে বা মস্তিষ্কের কোন অংশে অবস্থিত রহিয়াছে সেইখানে, পৌঁছায়। সংবেদীয়



১৫নং চিত্র—তিনটি নিউরোনবিশিষ্ট সহজ প্রতিবর্ত বৃত্তাংশ

(ক) সংবেদীয় নিউরোন, (খ) চেষ্টীয় নিউরোন, (গ) সংযোজক নিউরোন। আগুন (উদ্দীপক), মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়া অতিক্রম করে এবং পেশীর প্রতিক্রিয়া ঘটায়। ইহা একটি মেরুদণ্ডীয় প্রতিবর্ত (স্পাইনাল রিফ্লেক্স)।

নার্ভের কেন্দ্রীয় অন্তঃপ্রান্তের পাশেই রহিয়াছে চেষ্টীয় বা বহির্গামী নার্ভের অন্তঃপ্রান্ত। ঐ নার্ভপ্রবাহ এইবার চেষ্টীয় নার্ভের অন্তঃপ্রান্তকে উত্তেজিত করে। এই উত্তেজনা চেষ্টীয় নার্ভপ্রবাহের আকারে চেষ্টীয় নার্ভ দিয়া প্রবাহিত হইয়া উহার বহিঃপ্রান্তে, যাহা কোনো পেশীতে বা গ্রন্থিতে অবস্থিত রহিয়াছে সেইখানে, পৌঁছায়। ফলে পেশীর বিচলন বা গ্রন্থির রসক্ষরণরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটে।

সংবেদীয় নার্ভের অন্তঃপ্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া চেষ্টীয় নার্ভের বহিঃপ্রান্ত পর্যন্ত নার্ভ-পথকেই প্রতিবর্ত বৃত্তাংশ বলে।

প্রতিবর্ত বৃত্তাংশে পাঁচটি বিভাগ থাকে। (১) **সংগ্রাহক নার্ভতন্ত্র** (Receptive nerve-ending)—ইহা কোনো ইন্দ্রিয়যন্ত্রের বহিঃপ্রান্তে অবস্থিত। (২) **অন্তর্মুখী সংবেদীয় নার্ভ**—উদ্দীপকের দ্বারা ইহার বহিঃপ্রান্ত উত্তেজিত হওয়ার ফলে, ইহাতে নার্ভপ্রবাহের সৃষ্টি হয়, যাহা কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্রে পরিচালিত হয়। (৩) **কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্র**, অর্থাৎ মেরুদণ্ড বা মস্তিষ্ক—সংবেদীয় নার্ভপ্রবাহ এই স্থানে পৌঁছায়। (৪) **বহির্মুখী বা চেষ্টীয় নার্ভ**—ইহার অন্তঃপ্রান্ত সংবেদীয় নার্ভের অন্তঃপ্রান্তের সংবেদীয় নার্ভের অন্তঃপ্রান্তের সংলগ্ন থাকে। ফলে সংবেদীয় নার্ভপ্রবাহ চেষ্টীয় নার্ভে পরিচালিত হয়। (৫) **সম্পাদক যন্ত্র** (Effector organ), যেমন পেশী, গ্রন্থি, প্রভৃতি—চেষ্টীয় নার্ভপ্রবাহ পেশী বা গ্রন্থিতে পরিচালিত হইয়া যথাক্রমে বিচলন এবং রসক্ষরণ ঘটায়।

(৪) প্রতিবর্ত বৃত্তাংশের স্তরভেদ

প্রতিবর্ত বৃত্তাংশের কয়েকটি স্তরভেদ রহিয়াছে। এই স্তরভেদের উপর প্রতিবর্ত বৃত্তাংশের সহজতা বা জটিলতা নির্ভর করে। সাধারণতঃ প্রতিবর্ত একাধিক বৃত্তাংশের একসঙ্গে কাজ করিবার ফল। সহজতর প্রতিবর্তে অপেক্ষাকৃত কম এবং জটিলতর প্রতিবর্তে অপেক্ষাকৃত বেশী বৃত্তংশ থাকে।

নিম্নতর প্রতিবর্তের কেন্দ্র হইল নার্ভতন্ত্রের কোনো নিম্নতর অংশ, যেমন মেরুদণ্ড বা লঘুমস্তিষ্ক। উচ্চতর প্রতিবর্তের কেন্দ্র হইল ইহার কোনো উচ্চতর অংশ, যেমন গুরুমস্তিষ্ক। সহজতর বৃত্তাংশগুলি নিম্নতর এবং জটিলতর বৃত্তাংশগুলি উচ্চতর। যেমন জানুক্ষেপ (knee-jerk) একপ্রকার সহজতর এবং নিম্নতর অথবা মেরুদণ্ডীয় (Spinal) প্রতিবর্ত। আবার স্তন্যপান একপ্রকার জটিলতর এবং উচ্চতর মস্তিষ্কীয় (Cerebral) প্রতিবর্ত।

আগুনে হাত লাগিবামাত্র হাত সরাইয়া লওয়া একটি সহজ ও নিম্নস্তরের প্রতিবর্ত। এই প্রতিবর্তে নার্ভপ্রবাহ যে বৃত্তাংশ (Reflex Arc) দিয়া পরিচালিত হয় তাহা ১৫ নং চিত্রে দেখানো হইয়াছে।

উপরোক্ত প্রতিবর্ত বৃত্তাংশের মত চোখের পাতার স্পন্দন, দেহের ভারসাম্য বজায় রাখা, জানুক্ষেপ, হাঁচি প্রভৃতি যে সকল প্রতিবর্ত বিপজ্জনক উদ্দীপকের ফলে উৎপন্ন হয়, উহারা ছোট বৃত্তাংশের সাহায্যে ঘটিয়া থাকে। এইগুলি মেরুদণ্ডীয় প্রতিবর্তেরই উদাহরণ।

উপরে **তিনটি স্তরের** বৃত্তাংশ উল্লিখিত হইয়াছে। এই তিনটি স্তরের ব্যাখ্যা না করিলে, ইহারা সহজবোধ্য হইবে না।

প্রাথমিক স্তরের প্রতিবর্ত বৃত্তাংশ (Reflex Arc of the Primary Level or Spinal Reflex) মেরুদণ্ডের উপরে ওঠে না। এইরূপ সহজতম বৃত্তাংশ বিপজ্জনক উদ্দীপকের ফলে দ্রুত প্রতিক্রিয়ার জন্য আবশ্যক হয়। ইহাকে স্থানীয় টেলিফোনের ডাকের সহিত তুলনা করা যায়। আগুনে হাত দেওয়া মাত্র হাত সরাইয়া লওয়ার উদাহরণ দেখানো হইয়াছে। ঐরূপ পায়ের পাতা বিদ্ধ হইলে, ঐ উত্তেজনা পায়ের পাতা হইতে আরম্ভ করিয়া মেরুদণ্ড পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে এবং চেষ্টীয় নার্ভ দিয়া পরিচালিত হইয়া পায়ের পেশীতে পৌছায় এবং উহার সঙ্কোচন উৎপন্ন করিয়া পায়ের অপসারণ ঘটায়।

সর্বাপেক্ষা সরল বৃত্তাংশে একটি সংবেদীয় এবং একটি চেষ্টীয়, মাত্র এই

দুইটি নিউরোন থাকে। অবশ্য মাত্র দুইটি নিউরোন-এ গঠিত বৃত্তাংশ কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। জানুর বামদিকে আঘাত করিলে জানুর পেশী-সঙ্কোচ হয়। ইহাকে জানু-কম্পন বা হাঁটুর ঝাঁকানি (knee-jerk) বলে। পায়ের তলায় চিম্‌টি কাটিলে তৎক্ষণাৎ পা সরাইয়া লওয়া হয়। এই দুইটি ক্রিয়ার চক্রাংশও দুইটি নিউরোন দ্বারা গঠিত। ইহাদিগের কেন্দ্র মেরুদণ্ড। এইজন্য ইহাদিগকে বলা হয় মেরুদণ্ডীয় প্রতিবর্ত বৃত্তাংশ।

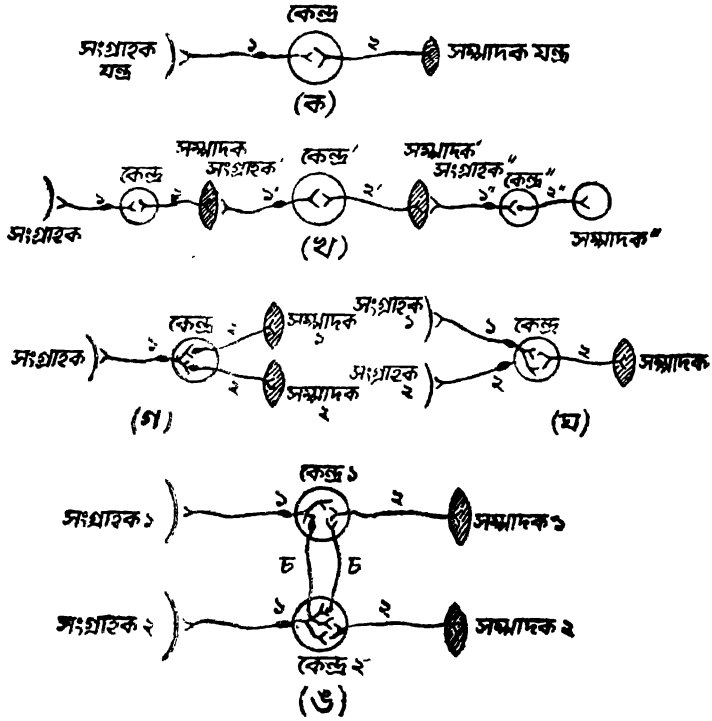
দ্বিতীয় স্তরের (Secondary Level) **প্রতিবর্ত বৃত্তাংশ** প্রাথমিক স্তরেরটির তুলনায় অপেক্ষাকৃত জটিল। ইহা গঠিত হয় মেরুদণ্ডীয় বৃত্তাংশের সংবেদীয় নার্ভের শাখাপ্রশাখা সাহায্যে। এইজন্য এই প্রতিবর্ত বৃত্তাংশকে সংবেদীয় স্তরের বলা হয়। ইহা উদ্দীপিত নার্ভের বহিঃপ্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া মেরুদণ্ডের উপরাংশে সুষুম্নাশীর্ষক এবং মস্তিষ্কের বহিঃস্তর বা ধূসর পদার্থের (Cortex) মধ্যবর্তী কেন্দ্রে পৌঁছায় এবং চেষ্টীয় নার্ভের মধ্য দিয়া কোনো পেশীতে বা গ্রন্থিতে শেষ হয়।

দ্বিতীয় স্তরের বৃত্তাংশে তিনটি বা তাহার বেশী নিউরোন থাকে। এই স্তরে সংবেদীয় এবং চেষ্টীয় নিউরোন-এর মধ্যবর্তী নার্ভকোষ—সংযোগকারী নিউরোনগুলি মেরুদণ্ডে এবং মস্তিষ্কে ছড়াইয়া পড়ে। দেহের ভারসাম্য বজায় রাখা, হাঁটা, দৌড়ানো প্রভৃতি জটিল সমন্বয় (coordination) মাধ্যমিক স্তরের বৃত্তাংশ সাহায্যে সম্পন্ন হয়। চক্ষুতে আলো পড়িয়া চক্ষু উদ্দীপিত হইবার ফলে তারারন্ধ্রের সংকোচন এই স্তরের প্রতিবর্ত। এইরূপ প্রতিবর্তকে দূরাগত টেলিফোন ডাকের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে।

তৃতীয় স্তরের মস্তিষ্ককেন্দ্রিক প্রতিবর্ত বৃত্তাংশ দ্বিতীয়টির তুলনায় আরও জটিল। উচ্চস্তরের চিন্তনকে তৃতীয় স্তরের প্রতিবর্ত বৃত্তাংশ বলা যাইতে পারে। ইহা দ্বিতীয় স্তর অপেক্ষা আরও উন্নত ও জটিল নার্ভসংযোগ সাধন করে। ইহাতে মাধ্যমিক স্তরের বৃত্তাংশের সহিত আরও জটিল সম্বন্ধপথ রচিত হয়। মাধ্যমিক স্তরটি যেমন প্রাথমিক স্তরের সমন্বয় সাধন করে, তৃতীয় স্তরটিও তেমন মাধ্যমিক স্তরের সমন্বয় সাধন করে। ফলে মস্তিষ্কের আকার আরও বড় হয়। মানুষ এবং অন্যান্য উচ্চতর প্রাণীর গুরুমস্তিষ্কের **অনুষঙ্গ এলাকাই তৃতীয় স্তরের প্রতিবর্ত বৃত্তাংশের কেন্দ্র**। উচ্চতর মানসবৃত্তিগুলি এই বৃত্তাংশের ক্রিয়া। এই অঞ্চলের উন্নতির সহিত মানুষের সেই উচ্চতর মানস শক্তিগুলি সংশ্লিষ্ট, যাহার ফলে মানুষ অন্যান্য প্রাণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই অঞ্চলগুলির উপর শিক্ষালব্ধ উন্নতি নির্ভর করে। তৃতীয়

স্তরের প্রতিবর্ত বৃত্তাংশকে বহু দূর হইতে আগত টেলিফোন ডাকের সহিত তুলনা করা যায়।

প্রাথমিক স্তরের বৃত্তাংশ সর্বাপেক্ষা মৌলিক এবং স্থায়ী। তৃতীয় স্তরের বৃত্তাংশ যেমন সর্বশেষে বিকাশ লাভ করে, তেমনই ইহারা সর্বাপেক্ষা জটিল। প্রাথমিক



১৬নং চিত্র—পাঁচ শ্রেণীর প্রতিবর্ত বৃত্তাংশ

(ক) সহজ প্রতিবর্ত। ১, ২ যথাক্রমে উহার সংবেদীয় এবং চেষ্টীয় নিউরোন।

(খ) প্রতিবর্ত-শৃঙ্খল (চেইন-রিফ্লেক্স্)। ইহাতে প্রথম প্রতিক্রিয়া দ্বিতীয় প্রতিক্রিয়ার উদ্দীপক হইয়াছে।

(গ) একটি উদ্দীপক দুইটি সম্পাদকের ক্রিয়া উৎপন্ন করিয়াছে।

(ঘ) দুইটি উদ্দীপক একটি সম্পাদকের ক্রিয়া উৎপন্ন করিয়াছে।

(ঙ) দুইটি অনুষক্ত প্রতিবর্ত বৃত্তাংশের চিত্র। একটি বৃত্তাংশের সংগ্রাহক অপর বৃত্তাংশটির সম্পাদকের সহিত যুক্ত হইয়াছে অনুষঙ্গ নিউরোন্ চ-এর সাহায্যে।

এবং মাধ্যমিক স্তরের বৃত্তাংশ প্রধানতঃ সহজাত কিন্তু তৃতীয় স্তরের বৃত্তাংশ শিক্ষার ফলে অর্জিত এবং মানুষের জীবিতকালে গঠিত হয়। সুতরাং নবজাত শিশুর মধ্যেই

হৃৎস্পন্দন, শ্বাস-প্রশ্বাস প্রভৃতি জৈব বৃত্তির নিয়ন্ত্রণকারী প্রাথমিক বৃত্তাংশগুলি সম্পূর্ণ কর্মক্ষম থাকে। মাধ্যমিক বৃত্তাংশগুলি অল্পকালের মধ্যেই বিকাশ লাভ করে। কিন্তু তৃতীয় স্তরের বৃত্তাংশ শিশুর জীবন ও অভিজ্ঞতার ফলে বিকশিত হয় এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ক্রমশঃ বিকশিত হইতে থাকে।

১৬নং চিত্রটি দেখিলে প্রতিবর্ত বৃত্তাংশের প্রকারভেদ বুঝা যাইবে।

শরীর ও চেতন প্রতিবর্ত (Physiological and Conscious Reflex)—প্রতিবর্ত ক্রিয়াকে প্রধানতঃ শারীর এবং চেতন এই দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথমটির উদাহরণ হইল **তীব্র আলোকে চক্ষুতারার সঙ্কোচন**। ইহাতে চেতনার কোনো ক্রিয়া নাই। এই প্রতিবর্ত চলিতে থাকা কালে এবং ইহা ঘটিবার পরেও উহার কোনো চেতনা হয় না।

কিন্তু চেতন প্রতিবর্তে, প্রতিক্রিয়া চলিতে থাকা কালে, উহার কম বেশী চেতনা থাকে। প্রতিক্রিয়ার উৎপাদনে চেতনার কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না। তথাপি চেতনা প্রতিক্রিয়াকে অল্পাধিক নিয়ন্ত্রিত করে। যেমন **কাশি এক প্রকার চেতন প্রতিবর্ত**, যাহা চেতনার দ্বারা অল্পাধিক নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। কাশি চেতনা দ্বারা সাময়িক বা স্থায়ীভাবে থামানো যায় এবং প্রতিক্রিয়াটি স্বেচ্ছায় উৎপাদনও করা যায়।

প্রতিবর্ত—নার্ভ ক্রিয়ার একক (unit of nerve-function)

নিউরোন যেমন নার্ভতন্ত্র সংগঠনের একক, প্রতিবর্ত তেমনই নার্ভ-ক্রিয়ার একক। প্রতিবর্ত বলিতে সংবেদ-চেষ্টীয় (Sensori-motor) একক বুঝায়। কোনো সংগ্রাহক যন্ত্র হইতে কার্যকরী যন্ত্রে পরিচালিত হইতে হইলে, নার্ভপ্রবাহের পক্ষে অন্ততঃ দুইটি নিউরোন-এর সংযোগ আবশ্যক। নার্ভপ্রবাহ কোনো প্রান্ত-সন্নিকর্ষের মধ্য দিয়া একটি নিউরোন হইতে অপরটিতে পরিচালিত হয়। নার্ভতন্ত্রের সহজতম কর্মীয় একক (functional unit) হইল একটি সংবেদ-চেষ্টীয় বৃত্তাংশ (Sensori-motor Arc)।

যদিও দুইটি নিউরোন-এর দ্বারা গঠিত প্রতিবর্ত আছে, কিন্তু সাধারণতঃ এই দুইয়ের মধ্যবর্তী একটি কেন্দ্রীয় নিউরোন থাকে এবং এই নিউরোনটি উহাদের সহিত প্রান্ত-সন্নিকর্ষের সাহায্যে সংযুক্ত হয়। অর্থাৎ, প্রতিবর্ত সাধারণতঃ দুইটির বেশী নিউরোন লইয়া গঠিত হইয়া থাকে।

২। সাপেক্ষ প্রতিবর্ত (Conditioned Reflex)

প্রতিবর্তকে আরও দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে—যথা, সহজ নিরপেক্ষ বা অপ্রতিবন্ধ প্রতিবর্ত (Simple or unconditioned) এবং সাপেক্ষ বা সপ্রতিবন্ধ (Conditioned) প্রতিবর্ত।

উজ্জ্বল আলোকের উদ্দীপনায় তারারন্ধ্রীয় প্রতিবর্ত (Pupillary Reflex) একটি নিরপেক্ষ বা সহজ প্রতিবর্ত। আবার ঘণ্টাধ্বনির সহজ প্রতিবর্ত উহা শুনিয়া কান খাড়া করা। কিন্তু উজ্জ্বল আলোকের সঙ্গে সঙ্গে একটি ঘণ্টা বাজাইলে ঘণ্টাধ্বনিই তারারন্ধ্রীয় প্রতিবর্ত উৎপন্ন করিতে পারে। এই ক্ষেত্রে দ্বিতীয় প্রতিবর্তটি সাপেক্ষ বা সপ্রতিবন্ধ। কারণ ঘণ্টাধ্বনি স্বাধীনভাবে এই প্রতিবর্ত ঘটাইতে পারে না। কিন্তু এই প্রতিবর্তের সহজ বা স্বাভাবিক উদ্দীপকের (এই ক্ষেত্রে উজ্জ্বল আলো) সহিত অনুষক্ত হইবার ফলে পারে। **কোন সহজ বা স্বাভাবিক উদ্দীপক অন্য কোন বস্তুর সহিত অনুষক্ত হইবার ফলে, উহা ঐ বস্তুটির সর্ত (condition) হইয়া দাঁড়ায়।** সেজন্য ঐ বস্তুটি ঐ স্বাভাবিক উদ্দীপকের কাজ করিতে পারে। যেমন উজ্জ্বল আলোকের সহিত ঘণ্টাধ্বনি চলিবার ফলে উজ্জ্বল আলোকের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াটি ঘণ্টাধ্বনিতে সংক্রামিত হয়। ফলে উজ্জ্বল আলোকের সাহায্য ছাড়াই ঘণ্টাধ্বনি উজ্জ্বল আলোকের সহজ প্রতিক্রিয়া—যেমন তারারন্ধ্রের সঙ্কোচন—সাপেক্ষভাবে ঘটাইতে পারে। আবার, যেমন উচ্চ শব্দের প্রতি শিশুর ভীতি স্বাভাবিক। কয়েকবার উচ্চ শব্দ করিবার সঙ্গে সঙ্গে যদি শিশুকে একটি খেলার পুতুল দেওয়া হয়, ক্রমে উচ্চ শব্দের ভীতি খেলার পুতুলে সংক্রামিত হইবে। ফলে যে খেলার পুতুল তাহার নিকট কৌতুকের বস্তু ছিল, তাহাই ভয়ের বস্তু হইয়া দাঁড়াইবে।

তাহা হইলে **সাপেক্ষ প্রতিবর্ত বলিতে বুঝায় সেই প্রতিবর্ত, যাহা উহার স্বাভাবিক উদ্দীপকের সহিত অনুষক্ত অন্য কোনো বস্তুর দ্বারা উৎপন্ন হয়, অথবা যাহা যে বস্তুর দ্বারা স্বভাবতঃ বা নিরপেক্ষভাবে উৎপন্ন হয় না, তাহা দ্বারাই উৎপন্ন হয় সাপেক্ষভাবে, অর্থাৎ স্বাভাবিক উদ্দীপকের উপর নির্ভর করিয়া।** নিরপেক্ষ উদ্দীপক স্বাভাবিকভাবে উহার প্রতিবর্ত উৎপন্ন করে, অন্য কোনো উদ্দীপকের উপর নির্ভর করিয়া। এই কারণে নিরপেক্ষ প্রতিবর্তকে স্বাভাবিক অথবা সহজ প্রতিবর্ত (natural or simple reflex) বলা যায়। কিন্তু সাপেক্ষ উদ্দীপক অস্বাভাবিকভাবে প্রতিবর্ত উৎপন্ন করে, নিরপেক্ষ উদ্দীপকের

উপর নির্ভর করিয়া। এই কারণে সাপেক্ষ প্রতিবর্তকে **অস্বাভাবিক** প্রতিবর্ত (**unnatural or artificial reflex**) বলা যাইতে পারে।

সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ঘটে **স্বাভাবিক** উদ্দীপকের সহিত **অস্বাভাবিক** উদ্দীপকের অনুষঙ্গের ফলে। এই প্রতিবর্ত অস্বাভাবিক উদ্দীপকের নিজস্ব শক্তিপ্রসূত। কাজেই অস্বাভাবিক উদ্দীপকটি যদি মাঝে মাঝে স্বাভাবিক উদ্দীপকের সহিত পুনরায় অনুষক্ত হইয়া, উহা হইতে উহার শক্তি আহরণ না করে, তাহা হইলে উহার দ্বারা উৎপন্ন সাপেক্ষ প্রতিবর্ত **ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে হইতে বিলুপ্ত হইয়া** যায়; যেমন উজ্জ্বল আলোকের সহিত অনুষক্ত হইবার ফলে, ঘণ্টাধ্বনি তারারন্ধ্রীয় সঙ্কোচন উৎপন্ন করিতে পারে। কিন্তু যাহাতে এই অস্বাভাবিক উদ্দীপকটির পক্ষে অস্বাভাবিক তারারন্ধ্রীয় সঙ্কোচন উৎপন্ন করা সম্ভব হইতে পারে, সেইজন্য মাঝে মাঝে উজ্জ্বল আলোকের সহিত ঘণ্টাধ্বনি করা প্রয়োজন। নতুবা উজ্জ্বল আলোক হইতে উহার ধার করা শক্তি ফুরাইয়া যায়।

৩। প্যাভ্‌লো-উদ্ভাবিত সাপেক্ষ প্রতিবর্তবাদের পরীক্ষা

সাপেক্ষ প্রতিবর্তবাদ রুশ্ শারীরবৃত্তবিৎ **আই. পি. প্যাভলো** (I. P. Pavlov) এবং তাঁহার সহকর্মিগণের আবিষ্কার।

একটি ক্ষুধার্ত কুকুরের মুখে মাংসখণ্ড দিলে, উহার একটি স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হইবে লালাগ্রন্থি হইতে লালানিঃসরণ। এই লালানিঃসরণ একটি স্বাভাবিক প্রতিবর্ত। ইহা উৎপন্ন হয় ঘ্রাণ এবং স্বাদের সংগ্রাহক ইন্দ্রিয় এবং লালানিঃসারক গ্রন্থির সম্বন্ধ থাকিবার ফলে। এইবার যদি, যতবার কুকুরটিকে মাংস খাওয়ানো হয়, ততবারই উহার পূর্বে অথবা সঙ্গে সঙ্গে একটি ঘণ্টা বাজানো যায়, তাহা হইলে শীঘ্রই ঘণ্টার শব্দ শুনিবামাত্র তাহার লালানিঃসরণ আরম্ভ হইবে। শব্দ-সংগ্রাহক ইন্দ্রিয়ের এবং লালানিঃসারক গ্রন্থির এই সম্বন্ধ স্বাভাবিক নয়, কিন্তু ইহা একটি অভিজ্ঞতা বা শিক্ষালব্ধ সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধ নিম্নলিখিত ভাবে দেখানো যাইতে পারে। এখানে 'উ' এবং 'প্র' যথাক্রমে উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়ার পরিবর্তে ব্যবহৃত হইয়াছে। $উ_1$ মাংসের এবং $উ_2$ ঘণ্টাশব্দের সূচক।

$উ_1$ (মাংস)————→$প্র_1$ (লালানিঃসরণ—নিরপেক্ষ প্রতিবর্ত)

$উ_2$ (ঘণ্টাশব্দ)———→$প্র_2$ (শব্দ প্রতিক্রিয়া—নিরপেক্ষ প্রতিবর্ত)

$উ_1$ + $উ_2$ (যুগপৎ উপস্থাপিত)→$প্র_1$ (লালানিঃসরণ প্রতিক্রিয়া)—

কয়েকবার দেওয়া হইল।

উ$_2$ (ঘণ্টাশব্দ)———→প্র$_1$ (লালানিঃসরণ — সাপেক্ষ প্রতিবর্ত)

দেখা যাইতেছে যে ঘণ্টাশব্দের ফলে লালানিঃসরণ হইতেছে, অর্থাৎ লালানিঃসরণ প্রতিবর্তটি সাপেক্ষ হইয়াছে।

কুকুরকে মাংস দিবার পূর্বে বা সঙ্গে সঙ্গে একটি ঘণ্টা বাজাইলে, অথবা কয়েকবার ঘণ্টা-ও মাংস, ঘণ্টা-ও-মাংস, এই ক্রমের পুনরাবৃত্তি করিলে, মুখে মাংসের সংস্পর্শ-জনিত লালানিঃসরণ ঐ ঘণ্টাধ্বনির দ্বারাও সংঘটিত হয়। এইরূপ ক্ষেত্রে ঘণ্টাধ্বনি করিবামাত্র লালানিঃসরণ হইতে থাকে।

শুধু যে ঘণ্টাধ্বনির দ্বারাই লালানিঃসরণরূপ সাপেক্ষ প্রতিবর্ত উৎপন্ন হয় তাহা নয়। মাংসের সহিত অনুষক্ত যে কোন অবস্থা দ্বারাই ইহা উৎপন্ন হইতে পারে। যেমন যে ব্যক্তি মাংস দেয়, অথবা যে পাত্রে মাংস দেওয়া হয়, তাহার দর্শন মাত্র লালানিঃসরণ ঘটিতে পারে। আবার যে ব্যক্তি মাংস দেয়, তাহার পদধ্বনি শোনা মাত্র লালানিঃসরণ আরম্ভ হইতে পারে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই লালানিঃসরণের স্বাভাবিক উদ্দীপক মাংসের শক্তি, উহার আনুষঙ্গিক অবস্থায় সংক্রামিত হওয়ার ফলে, ঐ আনুষঙ্গিক অবস্থাগুলি স্বাভাবিক উত্তেজকের অনুরূপ ক্রিয়া উৎপাদন করিতে পারে।

কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে সাপেক্ষ উদ্দীপকের নিজস্ব শক্তি নাই। উহা স্বাভাবিক উদ্দীপকের উপর নির্ভর না করিয়া সাপেক্ষ প্রতিবর্ত উৎপন্ন করিতে পারে না। উহা যে শক্তিতে সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন করে, তাহা নিরপেক্ষ বা স্বাভাবিক উদ্দীপক হইতে ধার করা শক্তি। যদি কয়েকবার ঘণ্টাধ্বনির পরেই বা সঙ্গে সঙ্গে মাংসখণ্ড না দেওয়া হয়, তাহা হইলে উহার দ্বারা উৎপন্ন লালানিঃসরণ কয়েকবার ঘটিবার পরে আর ঘটিবে না। উহা কমিতে কমিতে ক্রমশঃ লুপ্ত হইয়া যাইবে। এই ঘটনাটিকে সাপেক্ষ প্রতিবর্তের **লোপ** (Extinction) বলে। সুতরাং মাঝে মাঝে মাংসখণ্ডের সঙ্গে সঙ্গে ঘণ্টাধ্বনি উপস্থাপিত করিয়া উহার লালানিঃসরণের উৎপাদন-শক্তি বর্ধিত করিয়া লইতে হয়। নিরপেক্ষ উদ্দীপকের সহিত সাপেক্ষ উদ্দীপককে এইরূপ মাঝে মাঝে অনুষক্ত করিয়া উহার শক্তিবৃদ্ধিকে **বর্ধন-ক্রিয়া** (Re-inforcement) বলা হয়।

সাপেক্ষ প্রতিবর্তের প্রকারভেদ

সাপেক্ষ প্রতিবর্ত অনেক প্রকারের হইতে পারে। দুইটি প্রকারভেদের উল্লেখ করা যাইতেছে। যদি ঘণ্টাধ্বনি কিছুকাল চলিতে থাকিবার পর, যেমন পাঁচ, দশ বা পনর মিনিট পর, কুকুরকে মাংসখণ্ড দেওয়া হয়, তাহা হইলে লালানিঃসরণ আরম্ভ

হইবে ঘণ্টাধ্বনি আরম্ভের এবং মাংসখণ্ড দেওয়ার মধ্যবর্তী সময় অতিবাহিত হইবার পর। এইরূপ সাপেক্ষ প্রতিবর্তকে বলা হয় **বিলম্বিত সাপেক্ষ প্রতিবর্ত** (Delayed Conditioned Reflex)। এই ক্ষেত্রে লালানিঃসরণ ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে না ঘটিয়া কিছু বিলম্বে ঘটে।

আর এক প্রকার সাপেক্ষ প্রতিবর্তের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ঘণ্টাধ্বনি খানিকক্ষণ চলিবার পর থামানো হইল এবং উহা থামানোর কিছুক্ষণ পরে মাংসখণ্ড দেওয়া হইল। এইরূপ ক্ষেত্রে ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে লালানিঃসরণ উৎপন্ন হইবে না, কিন্তু ঘণ্টাধ্বনি থামিয়া যাইবার পর মাংসখণ্ড দিবার ঠিক পূর্বে এই সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইবে। এইরূপ সাপেক্ষ প্রতিবর্তকে **রেখাত্মক সাপেক্ষ প্রতিবর্ত** (Trace Conditioned Reflex) বলে।

সহজ অথবা নিরপেক্ষ প্রতিবর্তকে যেমন সাপেক্ষ বা সপ্রতিবন্ধ প্রতিবর্তে রূপান্তরিত করা যায়, তেমন **সাপেক্ষ প্রতিবর্তকেও নিরপেক্ষ প্রতিবর্তে ফিরাইয়া আনা যায়।** যেমন ঘণ্টাধ্বনির দ্বারা লালানিঃসরণরূপ যে সাপেক্ষ প্রতিবর্ত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাকে নিরপেক্ষ (unconditioned) করা যাইতে পারে। যদি ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে কয়েকবার মাংসখণ্ড না দেওয়া যায়, তবে উহার ফলে লালানিঃসরণ ক্রমশঃ কমিয়া কমিয়া একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবে, অর্থাৎ ঘণ্টাধ্বনি আর লালানিঃসরণ উৎপন্ন করিতে পারিবে না।

৪। ওয়াটসন্ ও সাপেক্ষ প্রতিবর্ত

শিশুর স্বাভাবিক অনুভূতি বা প্রক্ষোভকে কিরূপে সাপেক্ষ করা যাইতে পারে, চেষ্টাবাদী ওয়াট্সন তাহা অনুসন্ধান করিয়াছেন। তাঁহার মতে **ক্রোধ** (anger), **ভয়** (fear) এবং **ভালবাসা** (love), **এই তিনটিই** শিশুর নিরপেক্ষ বা স্বাভাবিক প্রক্ষোভ। ক্রোধের স্বাভাবিক উদ্দীপক হইল শিশুর স্বাধীন বিচলনকে বাধা (interference of movement) দেওয়া। এইরূপে উচ্চ শব্দ (loud sound) বা আশ্রয়চ্যুতি (loss of support) ভয়ের এবং আদর করা (fondling) বা গায়ে হাত বুলানো (patting), ভালবাসার স্বাভাবিক উদ্দীপক।

উপরোক্ত তিনটি নিরপেক্ষ বা স্বাভাবিক প্রক্ষোভকে সাপেক্ষ (conditioned) করা যাইতে পারে। যেমন উচ্চ শব্দ স্বভাবতঃ শিশুর ভীতি উৎপাদন করে। শিশুর এই ভয় একটি সহজ অথবা নিরপেক্ষ প্রক্ষোভ। কিন্তু যে বস্তুতে শিশুর স্বাভাবিক

ভয় নাই, যেমন শাদা ইঁদুর বা খেলনা, যদি সেইরূপ কোনো বস্তু উচ্চ শব্দ করিবার পূর্বে শিশুকে দেওয়া হয়, তবে ঐ বস্তুতেও শিশুর ভীতি জন্মিবে। আবার এই সাপেক্ষ ভীতিকে নিরপেক্ষ (unconditioned) করা যাইতে পারে। ঐ সাপেক্ষ ভীতিজনক বস্তুটি উপস্থাপিত করিবার পূর্বে যদি নিরপেক্ষ বা স্বাভাবিক ভীতিজনক বস্তু উপস্থাপিত করা না হয়, তাহা হইলে ঐ সাপেক্ষ ভীতি দূর হইবে। অবশ্য কার্যকালে দেখা যায় যে শিশুর সাপেক্ষ প্রক্ষোভ সহজে যায় না।

সাপেক্ষ প্রতিবর্ত একটি বিশাল আলোচ্য বিষয়। প্যাভ্‌লো ইহার উপর বিস্তৃত গবেষণা করিয়াছেন এবং বিছ্‌টেরিও (Bechterev) প্রভৃতি ইহার উপর আলোকপাত করিয়াছেন। বিছ্‌টেরিও সাপেক্ষ প্রতিবর্তের নাম দিয়াছেন অনুষঙ্গ প্রতিবর্ত (Associated Reflex), কারণ নিরপেক্ষ উদ্দীপকের সহিত অনুষঙ্গ হইবার ফলেই সাপেক্ষ উদ্দীপক প্রথমটির প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন করিতে পারে। সাপেক্ষ কথাটির বদলে 'পরিবর্তিত' বা 'প্রতিকল্প' (transferred or substitute) প্রতিবর্ত নামটিও ব্যবহার করা যাইতে পারে, কারণ সাপেক্ষ প্রতিবর্তে নিরপেক্ষ উদ্দীপকের ক্রিয়া সাপেক্ষ উদ্দীপকে সঞ্চারিত হয় এবং দ্বিতীয়টি প্রথমটির প্রতিকল্প হইয়া দাঁড়ায়।

৫। সাপেক্ষ প্রতিবর্তের সাধারণ ধর্ম

সাপেক্ষ প্রতিবর্তের কয়েকটি সাধারণ ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য। (১) সাপেক্ষ প্রতিবর্ত যে কোন শিক্ষালব্ধ প্রতিক্রিয়ার মত অল্পাধিক অস্থায়ী বা অস্থির। (২) সাপেক্ষ প্রতিবর্ত একটি বিশেষ সাপেক্ষ উদ্দীপকের দ্বারাই উৎপন্ন হইতে পারে, যে কোনো উদ্দীপকের দ্বারাই উৎপন্ন হইতে পারে না। (৩) সাপেক্ষ প্রতিবর্ত যোগাত্মক নিয়ম (Law of Summation) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। একই সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া দুইটি সাপেক্ষ উদ্দীপকের সহিত যুক্ত হইলে প্রতিক্রিয়াটি প্রবলতর হয়। (৪) সাপেক্ষ প্রতিবর্ত কালক্রমে ক্ষীণ হইয়া অবলুপ্ত হয়, বিশেষতঃ যদি সাপেক্ষ উদ্দীপক নিরপেক্ষ উদ্দীপকের সহিত উপস্থাপিত হইয়া শক্তিশালী না হয়। (৫) কয়েকটি সাপেক্ষ প্রতিবর্ত প্রতিষ্ঠিত হইলে, একটির বিলুপ্তিতে অপরটির বিলোপ হয় না। (৬) সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ঘটিবার সময় অথবা ঠিক পূর্বে অন্য কোন উদ্দীপক উপস্থাপিত করিলে, সাপেক্ষ প্রতিবর্তটি সাময়িকভাবে দুর্বল হয়। (৭) এই বাধাকে (Inhibition) আবার বাধা দেওয়া (Dis-inhibition) যায়। যেমন প্রতিকূল উদ্দীপকটিকে ব্যর্থ বলিয়া বুঝিলে, ইহা বাধা

জন্মাইতে পারে না। (৮) বৃদ্ধ ব্যক্তিদের তুলনায় অল্পবয়স্ক ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে সাপেক্ষ প্রতিবর্ত সহজতরভাবে উৎপন্ন করা যায়।

২য় খণ্ডের শিক্ষণ শীর্ষক পরিচ্ছেদে সাপেক্ষ প্রতিবর্তবাদের আলোচনা দ্রষ্টব্য।

৬। প্যাভ্‌লো-অনুসৃত পদ্ধতি

প্যাভ্‌লো কুকুরের সাহায্যেই সাপেক্ষ প্রতিবর্তবাদের গবেষণা করিয়াছেন। তাঁহার অনুসৃত পদ্ধতি এইরূপ। (ক) শব্দ ঢুকিতে পারে না, এমন বদ্ধ ঘরে পশুটিকে ঢিলা করিয়া বাঁধিয়া রাখা প্রয়োজন। (খ) ঘরের বাহির হইতে একটি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র সাহায্যে কুকুরটিকে খাদ্য দেওয়ার ব্যবস্থা করা বিধেয়। (গ) প্যারোটিড্‌ গ্রন্থি হইতে লালানিঃসরণের পরিমাপ করা দরকার। (ঘ) এই উদ্দেশ্যে প্যাভ্‌লো তাঁহার কুকুরের গণ্ডদেশ কাটিয়া উহার ভিতরে একটি পরিমাপ-নল স্থাপন করিয়াছিলেন। নিঃসৃত লালা এই নলে সঞ্চিত হয় এবং নলের দাগ বা চিহ্ন দিয়া উহার পরিমাণ স্থির করা যায়। (ঙ) আর একটি প্রয়োজনীয় বিষয় এই যে, পশুটিকে পরীক্ষাগার বা প্রয়োগশালার অবস্থায় অভ্যস্ত করিয়া লইতে হয়।

প্যাভ্‌লোর উদ্দেশ্য

প্যাভ্‌লো একজন প্রসিদ্ধ শারীরবৃত্তবিৎ। তিনি সাপেক্ষ প্রতিবর্তের গবেষণায় কোনো মনোবৈজ্ঞানিক উদ্দেশ্য সাধন করিতে চাহেন নাই। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল সাপেক্ষ প্রতিবর্তে ক্রিয়াশীল উচ্চতর মস্তিষ্ক পথগুলি আবিষ্কার করা এবং ক্লান্তি, নিদ্রা প্রভৃতি শারীরবৃত্তীয় সমস্যার সমাধান বাহির করা।

কিন্তু তাঁহার গবেষণা-ফল শুধু শারীরবৃত্তে সীমাবদ্ধ থাকে নাই। শিক্ষণ মত সম্বন্ধে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন ঘটাইয়াছে সাপেক্ষ প্রতিবর্তবাদ। পূর্বোক্ত শিক্ষণ শীর্ষক পরিচ্ছেদে এই বিষয়টি আলোচিত হইয়াছে। যথাস্থানে দ্রষ্টব্য।

অনুশীলনী (Exercise)

1. **What is reflex action ? Explain its characteristics. Show how reflex action is controlled by the spinal cord.**

   (Ans : pp. 124—125)

   প্রতিবর্ত কাহাকে বলে ? উহার বৈশিষ্ট্য কি কি ? প্রতিবর্ত কিরূপে সুষুম্নাকাণ্ড দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহা দেখাও।

2. Explain, with a diagram, the reflex arc. Show the reflex arc of different levels. (Ans : pp 125—130)
নক্সা সাহায্যে প্রতিবর্তচক্র বুঝাইয়া দাও। বিভিন্ন স্তরের প্রতিবর্তচক্র প্রদর্শন কর।

3. Bring out the importance of reflex action in psychology. Distinguish between physiological and conscious reflexes. (Ans : p. 130)
মনোবিদ্যায় প্রতিবর্তের সাধারণ গুরুত্ব আলোচনা কর। শারীরবৃত্তীয় এবং চেতন প্রতিবর্তের পার্থক্য দেখাও।

4. Explain with examples the conditioned reflex. How does it differ from the simple reflex ? (Ans : pp. 131—132)
সাপেক্ষ প্রতিবর্ত কাহাকে বলে ? উদাহরণ দিয়া নিরপেক্ষ ও সাপেক্ষ প্রতিবর্তের পার্থক্য আলোচনা কর।

5. How is a conditioned reflex established ? Show how Pavlov carried on his C. R. experiments. (Ans : pp. 132—134)
সাপেক্ষ প্রতিবর্ত কিরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় ? প্যাভ্‌লো প্রদর্শিত উপায়ে ইহার ব্যাখ্যা কর।

6. Write short notes on (*a*) Re-inforcement ; (*b*) Extinction, (*c*) Inhibition and Disinhibition, (*d*) 'Delayed Conditioned Reflex' ; and (*e*) Trace Conditioned Reflex. (Ans : pp. 133–136)
সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর : (ক) বর্ধন ক্রিয়া ; (খ) লোপ ; (গ) বাধা এবং বাধার বাধা, (ঘ) বিলম্বিত সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ; এবং (ঙ) রেখাত্মক সাপেক্ষ প্রতিবর্ত।

7. Point out briefly Watson's contributions to the conditioning of emotions. (Ans : pp. 134—135)
প্রক্ষোভের সাপেক্ষকরণে ওয়াটসন্‌-এর অবদান নির্দেশ কর।

8. Explain the general conditions of the conditioned reflex. (Ans : pp. 135—136)
সাপেক্ষ প্রতিবর্তের ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।

9. Explain the method and purpose of Pavlov's experiments on the conditioned reflex. (Ans : p. 136)
সাপেক্ষ প্রতিবর্ত সম্বন্ধে প্যাভ্‌লো-র উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি বর্ণনা কর।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সহজ প্রবৃত্তি অভ্যাস

(Instinct and Habit)

১। 'সহজ প্রবৃত্তি'—কথাটির অর্থ

আধুনিক মনোবিদ্যায় "সহজ প্রবৃত্তি" তিনটি অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যথা, (১) নিম্নতর প্রাণীর অন্ধ আবেগ, (২) শিক্ষালব্ধ নয়, এমন জটিল প্রতিযোজক প্রতিক্রিয়া এবং (৩) বিশেষ প্রক্ষোভের উত্তেজনাযুক্ত সহজাত আবেগ।

সকল সহজ প্রবৃত্তিই সহজাত বা জন্মগত। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি **জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই পরিণত** অবস্থায় থাকে। যেমন মুরগীর বাচ্চা জন্মগ্রহণ করিয়াই এক প্রকার ক্ষুদ্র বস্তু ঠোকরাইতে পারে, অথবা হাঁসের বাচ্চা ডিম হইতে বাহির হইয়াই জলে সাঁতার কাটিতে পারে। কিন্তু আরও কতকগুলি সহজাত প্রবৃত্তি **দৈহিক ও মানসিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পরিণতি লাভ করে**। এইগুলিকে **বিলম্বিত সহজ প্রবৃত্তি** (Delayed instinct) বলে। বিলম্বিত সহজ প্রবৃত্তির পরিণতির জন্য দেহযন্ত্রের উপযুক্ত বিকাশ দরকার, যাহার ফলে সহজ **পরিপাক** (Instinctive maturation) ঘটে।

আবার কতকগুলি সহজ প্রবৃত্তি আছে যেগুলি প্রাণীর **স্থায়ী ধর্ম নয়**। ইহারা প্রাণীর ক্রমবিকাশের কোনো বিশেষ অবস্থায় দেখা দিয়া পরে লোপ পায়। এই জাতীয় সহজ প্রবৃত্তিকে অস্থায়ী সহজ প্রবৃত্তি (transitory instinct) বলে। যেমন, বৎসরের কোনো নির্দিষ্ট ঋতুতেই অভিপ্রয়াণকারী পাখী (Migratory bird) দেশান্তরে উড়িয়া যায়, আবার আসন্নপ্রসবা পক্ষিণী ভাবী সন্তানের আশ্রয় বা বাসা নির্মাণে ব্যস্ত হয়।

কতকগুলি জটিল ক্রিয়া প্রত্যেক প্রাণীরই অন্তত: একবার করিতে হয়। গুটিপোকা গুটি বাহির করিবেই, পাখী বাসা তৈয়ারী করিবেই, মৌমাছি ডিম পাড়িবার উপযুক্ত জায়গা খুঁজিবেই।

২। সহজ প্রবৃত্তির সংজ্ঞা ও উদাহরণ

কোনো সমগ্র পরিস্থিতির প্রতিক্রিয়া হিসাবে সমগ্র অবয়বীর বা অঙ্গীর (organism) যে জটিল এবং অনৈচ্ছিক ক্রিয়া-সমষ্টি বা যৌগিক ক্রিয়া

অচেতনভাবে ও অজ্ঞাতসারে আত্মরক্ষা বা বংশ বিস্তারমূলক কোনো জৈব উদ্দেশ্য সাধন করে এবং যাহা পূর্ববর্তী শিক্ষা বা অভিজ্ঞতার ফলে অর্জিত হয় নাই, কিন্তু বংশগত বা সহজাতভাবে একই শ্রেণীর প্রত্যেক প্রাণীতে একই প্রকারে বর্তমান, তাহাকে সহজাত প্রবৃত্তি বলে।

সংজ্ঞাটির বিশ্লেষণ

(১) সহজ প্রবৃত্তি **জটিল বা যৌগিক** (Compound) **ক্রিয়া**। ইহা কতকগুলি ক্রমিক বা ধারাবাহিক ক্রিয়ার সমন্বয়।

(২) **একটি সমগ্র বা গোটা উদ্দীপক বা পরিস্থিতির প্রতিক্রিয়া** হিসাবে সহজ প্রবৃত্তি ঘটিয়া থাকে।

(৩) সহজ প্রবৃত্তির প্রতিক্রিয়া **সমগ্র অবয়বীয় প্রতিক্রিয়া**।

(৪) সহজ প্রবৃত্তি **অনৈচ্ছিক ক্রিয়ার** অন্তর্ভুক্ত।

(৫) সহজ প্রবৃত্তির জটিল প্রতিক্রিয়া কোনো উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য করিয়া ঘটে না, অথবা ইহা **চেতনভাবে বা জ্ঞাতভাবে উদ্দেশ্যমূলক নয়**।

(৬) কিন্তু সহজ প্রবৃত্তি চেতনভাবে উদ্দেশ্যহীন হইলেও, **অচেতনভাবে উদ্দেশ্যমূলক**। ইহা **আত্মরক্ষা** এবং **বংশবিস্তারমূলক** কোনো জৈব উদ্দেশ্য সাধন করে। অর্থাৎ সহজ প্রবৃত্তি চেতনভাবে না হইলেও, **জৈবভাবে উদ্দেশ্য-মূলক** (Biologically purposive)।

(৭) সহজ প্রবৃত্তি **বংশগত** (hereditary)। ইহা বংশপরম্পরাক্রমে একই জাতীয় প্রত্যেক প্রাণীতে সঞ্চারিত হয়।

(৮) সহজ প্রবৃত্তি **একই জাতীয় প্রত্যেক প্রাণীতে প্রায় সমভাবে বা একরূপে প্রকাশিত** হইয়া থাকে।

(৯) সহজ প্রবৃত্তি কোনো **শিক্ষা বা অভিজ্ঞতার ফলে অর্জিত হয় না।** জন্মের প্রথম মুহূর্ত হইতেই অনেকগুলি সহজ প্রবৃত্তি সম্পূর্ণ অথবা পরিণতভাবে প্রকাশ পায়।

(১০) কিন্তু শিক্ষা বা অভিজ্ঞতার ফলে অর্জিত না হইলেও, কোনো কোনো সহজ প্রবৃত্তির বিকাশে **শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা সাহায্য করিতে পারে।**

(১১) সহজ প্রবৃত্তি প্রায়ই **অস্বস্তিবোধ হইতে উৎপন্ন হয়**। কোনো অস্পষ্ট অভাব বা প্রয়োজন বোধই অস্বস্তির কারণ।

উদাহরণ

স্নাইডার (Sneider) সহজ প্রবৃত্তির উদাহরণ দিয়াছেন। **গুবরে পোকা** (Dung beetle) গলিত মাংস দেখিয়া উহার দিকে অগ্রসর হয়, উহার উপর ডিম পাড়িতে এবং উহা মাটির ভিতর পুঁতিয়া রাখিবার ক্রিয়াগুলি করিতে প্রবৃত্ত হয়। **পাখী** তাহার স্ত্রী-পাখীকে দেখিয়া উহাকে আদর করিতে, উহার চারিদিকে গর্বিতভাবে ঘুরিয়া বেডাইতে, উহার সম্মুখে নাচিতে অথবা অন্য প্রকারে উহার নিকট প্রেম নিবেদন করিতে প্রবৃত্তি হয়। আবার **বাঘ** হরিণ দেখিয়া গোপনে উহার নিকট আসিতে, উহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতে এবং উহাকে শ্বাসরুদ্ধ করিয়া মারিয়া ফেলিতে প্রবৃত্ত হয়।

দর্জি-মৌমাছি গোলাপ পাতা টুকরা টুকরা করিয়া, ঐগুলি নোয়াইয়া গাছে গুটি পোকার গর্তে অথবা মাটিতে ইঁদুরের গর্তে লইয়া যায়; ঐ টুকরায় দুই ধারের ফাঁকগুলি অন্য টুকরা দিয়া ঢাকিয়া ফেলে, এইরূপে অঙ্গুস্তানা বা আঙ্গুলের টুপির মত একটি পাত্র তৈয়ারী করে এবং উহা মধুপূর্ণ করিয়া উহাতে ডিম পাড়ে। পূর্বোক্ত উদাহরণগুলির মত মৌমাছির সহজ প্রবৃত্তিও কতকগুলি ধারাবাহিক ক্রিয়ার সমষ্টি। ডিম পাড়িবার সময় উপস্থিত হইলেই দর্জি-মৌমাছিরা যন্ত্রচালিতের মত এই ক্রিয়াগুলিতে প্রবৃত্ত হয়। এই সময়ে কোন গুটিপোকার বা ইঁদুরের গর্ত এবং গোলাপ পাতা দেখার সহিত উহার অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীলগুলি এমনভাবে সম্বন্ধ যে উহারা যেন স্বাভাবিকভাবেই ঘটে।

এই জাতীয় ক্রিয়াগুলি সহজাত, জটিল এবং অনৈচ্ছিক। যে পরিস্থিতিতে ইহারা উৎপন্ন হয় তাহা একটি গোটা বা সমগ্র পরিস্থিতি এবং প্রাণী তাহার সমগ্র সত্তা দিয়াই ইহাতে প্রতিক্রিয়া করে। তাহা ছাড়া এই ক্রিয়াগুলি আপাতদৃষ্টিতে যান্ত্রিক হইলেও ইহারা আত্মরক্ষা বা বংশরক্ষামূলক জৈব উদ্দেশ্য সাধন করে, যদিও এই উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রাণীর কোনো স্পষ্ট চেতনা থাকে না। আবার, এই ক্রিয়াগুলি সমজাতীয় প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যে সমভাবে বা একইরূপে প্রকাশিত হয়। গুবরে পোকা, পুরুষ পাখী, বাঘ, বা দর্জি-মৌমাছি আবহমান কাল হইতে একই প্রকারে উল্লিখিত ক্রিয়াগুলি করিয়া আসিয়াছে। এই ক্রিয়াগুলি শিক্ষা বা অভিজ্ঞতা ফলে অর্জিত নয়—ইহারা বংশানুক্রমিক। শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা ইহাদের উপর প্রভাব বিস্তার করিলেও, ইঁহাদের আসল রূপ বদলাইতে পারে না। আবার, এই ক্রিয়াগুলি

প্রায়ই কোনো অস্পষ্ট অভাব বা প্রয়োজনবোধ এবং তজ্জনিত অস্বস্তি অনুভব হইতে উৎপন্ন হয়।

৩। সহজ প্রবৃত্তির শ্রেণীভেদ

সহজ প্রবৃত্তি **প্রাণীর জীবনযাত্রায় যে উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন সাধন করে সেই অনুসারে** বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত। ইহা (১) খাদ্যসংগ্রহ, (২) আত্মরক্ষা, (৩) সন্তান পালন এবং (৪) বংশরক্ষা—এই চারিটি উদ্দেশ্য সাধন করে। উক্ত চারিটি উদ্দেশ্যকে আত্মরক্ষা এবং বংশরক্ষা এই দুইটি উদ্দেশ্যে সংক্ষেপিত করা যাইতে পারে। তথাপি বুঝিবার সুবিধার জন্য চারিটি উদ্দেশ্য অনুযায়ী চার শ্রেণীর সহজ প্রবৃত্তি আলোচিত হইতেছে।

(১) খাদ্যসংগ্রহ :

খাদ্যসংগ্রহ-সংক্রান্ত সাধারণ সহজ প্রবৃত্তি নানা প্রকারের হইতে পারে। শিকার অথবা খাদ্য-সন্ধান, ওঁৎ পাতিয়া থাকা, শিকারের অনুসরণ করা, উহার উপর লাফাইয়া বা ঝাঁপাইয়া পড়া, শিকার ধরিয়া ফেলা, উহাকে অধিকার বা আয়ত্ত করা, ফাঁদ পাতা, শিকারকে ভয় দেখাইয়া উহার আশ্রয় হইতে তাড়া দিয়া আনা, প্রভৃতি জটিল ক্রিয়াগুলি খাদ্যসংগ্রহাত্মক সহজ প্রবৃত্তির অন্তর্ভুক্ত।

মাকড়সা সূত্রজাল বিস্তার করিয়া ফাঁদ পাতে। **ডারুইন** বলিয়াছেন যে বড় পোকা উহার জালে আটকাইলে বৃহৎ ইপাইরা জাতীয় **মাকড়সা** অতি নিপুণভাবে সূতা গুটাইয়া লয় এবং অতি সন্তর্পণে অন্য সূতা বাহির করিয়া গুটিকাধারে উহাকে জড়াইয়া ফেলে। তারপর এই মাকড়সা ধৃত পোকাটিকে খুব সাবধানে পরীক্ষা করিয়া দেখে এবং উহাকে মৃত্যুদংশন করিয়া উহার উপর দংশনের বিষক্রিয়া না হওয়া পর্যন্ত দূর হইতে ধৈর্যের সহিত অপেক্ষা করে।

(২) আত্মরক্ষা :

শত্রুর কাছে গুঁড়ি মারিয়া থাকা, লুকানো, পলায়ন করা, যুদ্ধ করা, উপযুক্ত জায়গায় গর্ত খোঁড়া, আশ্রয় তৈয়ারী করা, সতর্কভাবে আশ্রয় হইতে বাহিরে আসা, অজানা অথবা অপরিচিত বস্তুকে সাবধানে পরীক্ষা করা, অঙ্গভঙ্গী বা শব্দ করিয়া শত্রুর অনুকরণ প্রভৃতি ক্রিয়াগুলি আত্মরক্ষামূলক সহজ প্রবৃত্তির অন্তর্ভুক্ত।

প্রাণীরা বাসা বা গর্ত তৈয়ারী করিতে গিয়া বিশেষ গঠনমূলক শক্তির পরিচয় দিয়া থাকে। বাবুই পাখীর বাসা নির্মাণের চাতুর্য প্রসিদ্ধ। পিপীলিকা মাটির নীচে

বিস্তৃত জায়গা জুড়িয়া বাসা তৈয়ারী করে। ইহাতে ঘর, উচ্চ মঞ্চ প্রভৃতি থাকে। বীবর বাঁধ নির্মাণ করে। এক জাতীয় কৌশলী মাকড়সা মাটিতে নালী তৈয়ারী করে—এই নালীর আবার প্রবেশদ্বারও থাকে। কোন শত্রু দ্বার খুলিতে চেষ্টা করিলে এই মাকড়সা নালীর প্রাচীরে পা দিয়া বাধা দেয়।

(৩) **সন্তান-পালন ঃ**

সন্তান-পালনের সহিত সংশ্লিষ্ট সহজ প্রবৃত্তি বিচিত্রভাবে ক্রিয়াশীল হয়। উপযুক্ত স্থানে ডিম পাড়িয়া উহার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা, বাসা তৈয়ারী করা, ডিমে তাপ দেওয়া, ডিম এবং গুটিকা স্থান হইতে স্থানান্তরে সরাইয়া লওয়া, বাচ্চাগুলিকে খাওয়ানো এবং পরিচ্ছন্ন রাখা, ডিম এবং বাচ্চাগুলিকে নানাভাবে লুকাইয়া রাখা প্রভৃতি বিভিন্ন ক্রিয়ার মধ্যে এই সহজ প্রবৃত্তি প্রকাশিত হয়।

যেমন এক শ্রেণীর গুব্‌রে পোকা ডিম পাড়িয়া সন্তানের আশ্রয় এবং খাদ্য-সংস্থানের নিম্নরূপ ব্যবস্থা করে। পুরুষ এবং স্ত্রী গুব্‌রে পোকা একতাল গোবর হইতে উহার খানিকটা অংশ লইয়া পায়ের সাহায্যে গোবরের বল তৈয়ারী করে। এইবার একটি পোকা ঐ বলটিকে সামনের পা দিয়া সামনের দিক হইতে ঠেলে এবং অপরটি উহাকে পিছনের পা দিয়া পিছন দিক হইতে টানে। এখানে উহারা একটি গর্ত খুঁড়িয়া লয়। স্ত্রী-পোকাটি গোবরের বলের উপর একটি ডিম পাড়ে এবং দুইটি পোকা মিলিত চেষ্টায় বলটিকে গর্তের ভিতরে প্রবেশ করায়। সর্বশেষে গর্তটি ভরাট করিয়া উহারা ঐ স্থান ত্যাগ করে।

(৪) **বংশরক্ষা ঃ**

বংশরক্ষামূলক সহজ প্রবৃত্তি প্রাণীর একটি সাধারণ বা সার্বভৌম ধর্ম। স্ত্রী পুরুষের মিলনই এই সহজ প্রবৃত্তির স্থূল প্রকাশ। সমজাতীয় প্রাণীরা মূলতঃ একরূপভাবে মিলিত হয়। যেমন ইঁদুরের এই সহজ প্রবৃত্তির ক্রিয়াপদ্ধতি কুকুর, বিড়াল, বানর প্রভৃতি প্রাণী হইতে স্বতন্ত্র। কিন্তু প্রত্যেক পুরুষ এবং স্ত্রী-প্রাণীই কোনো প্রকার শিক্ষা অথবা অভিজ্ঞতার সাহায্য না লইয়া স্বজাতির বিশেষ বিশেষ মিলন-পদ্ধতি অনুসরণ করে। এই ক্রিয়াকে সহজ প্রবৃত্তিই বলিতে হয়, কারণ ইহা অনেকগুলি ক্রিয়ার জটিল এবং ধারাবাহিক সমষ্টি—বংশরক্ষারূপ জৈব উদ্দেশ্য-সাধন ইহার লক্ষ্য, একটি শারীর এবং মানস অস্বস্তি ইহার উৎপত্তি এবং একটি সমগ্র পরিস্থিতিতে সমগ্র প্রাণীর প্রতিক্রিয়াই ইহার বৈশিষ্ট্য।

অবশ্য মানুষ, শিম্পাঞ্জী প্রভৃতি উচ্চতর প্রাণীর ক্ষেত্রে এই প্রবৃত্তিকে পুরাপুরি

সহজ প্রবৃত্তি বলা যায় কিনা সন্দেহ। কারণ শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতা উহাদের এই সহজ প্রবৃত্তিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে।

৪। সহজ প্রবৃত্তির জৈব মতবাদ
(Biological theory of Instinct)

জৈব মতবাদে সহজ প্রবৃত্তির ক্রিয়াগুলির উপর গুরুত্ব দিয়া মানস অভিজ্ঞতা বা অনুভূতিকে গৌণ করা হয়। সহজ প্রবৃত্তি ক্রিয়াগুলি জৈব প্রতিযোজনে (adaptation) সাহায্য করে। অর্থাৎ ইহারা প্রাণীকে আত্মরক্ষা এবং বংশরক্ষার পক্ষে প্রয়োজনীয় অবস্থার সহিত মানাইয়া লইতে সাহায্য করে। এই ক্রিয়াগুলি যে সকল মানস কারণে ঘটিতে পারে সহজ প্রবৃত্তির জৈব ব্যাখ্যায় উহাদের স্থান নাই।

সহজ প্রবৃত্তির জৈব মতবাদ অনুসারে প্রাণীর সহজাত উপকরণ—যেমন মাকড়সার সূত্র বাহির করিবার অঙ্গ, অথবা কাঁকড়ার নখ বা থাবা, নার্ভতন্ত্র প্রভৃতি—এই ক্রিয়া সম্পাদন করিবার পক্ষে যথেষ্ট। এই সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বা উপকরণ আছে বলিয়াই একটি সমগ্র পরিস্থিতির সম্মুখীন হইয়া প্রাণী ধারাবাহিকভাবে প্রতিক্রিয়া করিতে পারে।

সুতরাং জৈব দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে সহজ প্রবৃত্তি বলিতে বুঝায় নার্ভতন্ত্রের পূর্ব-উপযোজন (Pre-adaptation), যাহা জন্মগত এবং যাহার ফলে উপযুক্ত উদ্দীপকের প্রতিক্রিয়া-রূপে বিশেষ প্রকারের দৈহিক ক্রিয়া উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই ক্রিয়া প্রাণীর আত্মরক্ষা এবং বংশরক্ষার অনুকূল, যদিও এইরূপ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাহার কোনো ভবিষ্যৎ দৃষ্টি থাকে না।

প্রশ্ন এই যে, প্রাণী জীবন ধারণের পক্ষে অনুকূল উপকরণ জন্মগতভাবে পায় কি করিয়া। ইহার উত্তরে **ডারুইনীয় মতবাদের** প্রধান সূত্রগুলি উল্লেখ করিতে হয়। প্রকৃতির খাদ্য-ভাণ্ডারের তুলনায় প্রাণীর বংশবৃদ্ধি বেশী হইতে থাকায়, প্রাণীদের মধ্যে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য যুদ্ধ অথবা **জীবন-সংগ্রাম** (Struggle for existence) দেখা দেয়। এই সংগ্রামে সেই সকল প্রাণীই **জয়লাভ করে** যাহাদের মধ্যে বাঁচিয়া থাকিবার অনুকূল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বা উপকরণগুলি থাকে (Survival of the Fittest) এবং সেই সকল প্রাণী নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়, যাহাদের এই যোগ্যতা নাই (Elimination of the unfit)। ডারুইন (Darwin) মনে করেন যে আপতিক পরিবর্তনের (Accidental Variation) ফলে প্রাণীদেহের নিরন্তর পরিবর্তন হয়। যে সকল

প্রাণীর বাঁচিয়া থাকিবার অনুকূল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বা উপকরণ থাকে তাহাদিগকেই যেন **প্রকৃতি নির্বাচন করিয়া লয়** (Natural Selection)। এই সকল জয়ী প্রাণীদের সন্তানসন্ততিরা উহাদের পূর্বপুরুষদের অনুকূল পরিবর্তনগুলি **বংশগতি** (Heredity) অনুসারে পাইয়া থাকে।

এই ব্যাখ্যায় সহজ প্রবৃত্তি একপ্রকার জৈব উপযোজন। কি কাজের (Function), কি গঠনের (Structure), উভয় দিক দিয়া, সহজ প্রবৃত্তি আত্মরক্ষা এবং বংশরক্ষার উপযোগী প্রতিক্রিয়া। জীববাদীরা প্রথমে সহজ প্রবৃত্তির ক্রিয়াগুলিকে সম্পূর্ণ একরূপ (Uniform) বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহাদের মতে সহজ প্রবৃত্তি বংশগতি অনুসারে বংশপরম্পরায় একই রূপে সঞ্চারিত হয়। বর্তমান জীববিদ্যার মতে সহজ প্রবৃত্তি সম্পূর্ণ অপরিবর্তনীয় নয়, কিন্তু অভিজ্ঞতার ফলে বহুলাংশে পরিবর্তনীয়। তাহা ছাড়া বর্তমান জীববিদ্‌দের মধ্যে অনেকেই সহজাত পরিবর্তন (Congenital variation) স্বীকার করিয়া থাকেন। দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মত নার্ভতন্ত্রও অপরিবর্তনীয় নয়। প্রত্যেক প্রাণীর সহজ প্রবৃত্তি মোটের উপর তাহার জাতিগত হইলেও ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে ভেদ অবশ্যই স্বীকার্য। যেমন একই পিতামাতার সন্তানদের চেহারায় পিতামাতার ছাপ থাকিলেও, প্রত্যেক সন্তানের চেহারায় ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য থাকে। ডারুইন এই পরিবর্তন স্বীকার করিয়াছেন, যদিও তাঁহার মতে ইহা আপতিক বা আকস্মিক।

ডারুইন সহজ প্রবৃত্তির **জীববৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা দিতে চেষ্টা করিয়াছেন**। তিনি সহজ প্রবৃত্তি সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "কোনো কাজ হয়ত আমরা অভিজ্ঞতার ফলে করিতে পারি। সেই কাজই যখন কোনো প্রাণী, এমন কি শিশু অবস্থায়, এবং অনেক প্রাণীই **অভিজ্ঞতা ছাড়া, একইভাবে এবং কি উদ্দেশ্যে উহা করা হইতেছে তাহা না জানিয়া করিতে পারে** তাহাই সহজ প্রবৃত্তি।"

সহজ প্রবৃত্তির উপরোক্ত ডারুইনীয় সংজ্ঞা প্রধানতঃ জীববৈজ্ঞানিক হইলেও, ইহাতে দুইটি বিষয়ে **মানস বৃত্তির ইঙ্গিত** রহিয়াছে। ইহাতে অভিজ্ঞতা এবং উদ্দেশ্যের উল্লেখ রহিয়াছে। কাজে কাজেই ডারুইনীয় মতটির উপর মনোবৈজ্ঞানিক প্রভাব অনস্বীকার্য।

৫। সহজ প্রবৃত্তির উৎপত্তি

সহজ প্রবৃত্তির উৎপত্তি সম্বন্ধে জীববৈজ্ঞানিক মত উক্ত হইয়াছে। এই মত অনুসারে সহজ প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয় জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইবার চেষ্টায়। যে সকল

প্রাণীর মধ্যে বাঁচিয়া থাকিবার অনুকূল পরিবর্তন ঘটে তাহারাই টিকিয়া থাকে এবং তাহাদের পরিবর্তনগুলি বংশগতি অনুসারে পরবর্তী পুরুষে সংক্রামিত হয়। এইরূপে সমশ্রেণীভুক্ত প্রাণীরা অভিজ্ঞতা ছাড়াই একই রূপে যে কাজ করে তাহাই সহজ প্রবৃত্তি। **ইহাই ডারুইনীয় বিবর্তনবাদ।**

স্পেন্‌সার বলেন যে, সহজ প্রবৃত্তি প্রথম হইতেই সহজাত নয় কিন্তু জীবন-সংগ্রামের উপযোজন করিবার চেষ্টা হইতে প্রাপ্ত। কিন্তু যে উপযোজন জীবনসংগ্রামের অনুকূল হয়, তাহা বংশপরম্পরায় সংক্রামিত হয় বিনা চেষ্টায় এবং বিনা অভিজ্ঞতায়। তাহা হইলে, প্রথমে যে ক্রিয়া ছিল চেষ্টা এবং অভিজ্ঞতালব্ধ, তাহাই পরবর্তী পুরুষে হইয়া দাঁড়ায় সহজাত বা অনায়াসলভ্য। এইটি স্পেন্‌সেরীয় বিবর্তনবাদ।

সহজ প্রবৃত্তির উৎপত্তি বিষয়ে আর একটি মতবাদ উল্লেখযোগ্য। ইহাকে **লুপ্তবুদ্ধি মতবাদ** (Theory of Lapsed intelligence) বলা হয়। এই মতানুসারে পূর্ববর্তী বা পূর্বপুরুষীয় জীবের বুদ্ধিকৃত এবং ইচ্ছাকৃত ক্রিয়াগুলিই পুনঃপুনঃ অনুশীলনের ফলে অভ্যাসে পরিণত হইয়া পরবর্তী বংশধারায় সহজাত প্রবৃত্তি হিসাবে সংক্রামিত হয়।

এই মতের সহিত স্পেন্‌সেরীয় মতের একটি আপাতদৃশ্য মিল আছে, কারণ উভয় মতেই পূর্বপুরুষদের ক্রিয়া অভিজ্ঞতা এবং চেষ্টা সাহায্যে সম্পন্ন হয় এবং পরবর্তী পুরুষে উহা অভ্যাসে পরিণত হইয়া যায়। কিন্তু প্রথম মতটি জীববৈজ্ঞানিক, আর দ্বিতীয় মতটি মনোবৈজ্ঞানিক।

দ্বিতীয় মতটির দুইটি প্রধান দোষ। প্রথমতঃ, এই মত অনুসারে প্রাণীর পূর্বপুরুষকে বুদ্ধিমান এবং উচ্চতর মানসিকশক্তিসম্পন্ন মনে করা হইয়াছে। এই মত গ্রহণ করিলে স্বীকার করিতে হয় যে, বুদ্ধিমান পূর্বপুরুষদের উত্তরাধিকারীরা বুদ্ধিহীন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু এইরূপ মত বিবর্তনবাদের বিরোধী। এই মতের দ্বিতীয় দোষ এই যে, ইহা জীববিজ্ঞানের একটি মূল সত্যের অপলাপ। এই মতে প্রথমে বুদ্ধিকৃত এবং অভিজ্ঞতালব্ধ ক্রিয়া অনুশীলনের ফলে অভ্যাস হইয়া দাঁড়ায়, এবং এই অর্জিত অভ্যাস পরবর্তী পুরুষে সংক্রামিত হয়। কিন্তু **হ্বাইস্‌মান্** (Weismann) প্রমুখ জীববিজ্ঞানীর মতে অর্জিত অভ্যাস বংশগতির নিয়মে পরবর্তী বংশধারায় সংক্রামিত হইতে পারে না।

৬। সহজ প্রবৃত্তির মনোবৈজ্ঞানিক মতবাদ
(Psychological Theory of Instinct)

অন্যান্য জৈব উপযোজনের মত সহজ প্রবৃত্তির কতকগুলি লক্ষণ বংশগতি, সহজাত ভেদ এবং প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রভৃতি সূত্র দিয়া ব্যাখ্যাত হইতে পারে না। কারণ অন্যান্য জৈব উপযোজনের সহিত সহজ প্রবৃত্তির পার্থক্য কি তাহা এই মতবাদের সাহায্যে বুঝা কঠিন। সহজ প্রবৃত্তির এমন কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে, যাহা অন্যান্য জৈব উপযোজনে নাই।

জীববিজ্ঞানী এবং **শারীরবৃত্তীয় মতবাদ** অনুসারে সহজ প্রবৃত্তি নার্ভতন্ত্রের একজাতীয় সহজাত স্বভাব। অথচ এইরূপ বলিলে সহজ প্রবৃত্তির বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে না, কারণ প্রতিবর্তও নার্ভতন্ত্রের এক প্রকার স্বভাব। অর্থাৎ জীববিজ্ঞানী এবং শারীরবৃত্তীয় মতানুসারে সহজ প্রবৃত্তির সহিত প্রতিবর্তের পার্থক্য থাকে না, অথচ মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে ইহাদের পার্থক্য স্বীকার্য।

সহজ প্রবৃত্তি এবং প্রতিবর্ত :

যে সকল জীববিদ্ সহজ প্রবৃত্তিকে জৈব উপযোজন বলিয়া ব্যাখ্যা করেন তাঁহারা ইহার সহিত প্রতিবর্তের কোনো গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য দেখেন না। তাঁহারা সহজ প্রবৃত্তিকে **প্রতিবর্তের জটিল সংযোগ** বলিয়া মনে করেন।

কিন্তু সহজ প্রবৃত্তিকে প্রতিবর্তে পরিণত করিবার এই শারীরবৃত্তীয় এবং জীববৈজ্ঞানিক মত গ্রহণীয় নয়। এই মত যে শুধু শারীরবৃত্তবিদ্ এবং জীববিজ্ঞানীদের অনুমোদিত, তাহা নয়। কোনো কোনো জীববিদ্যাপ্রভাবিত মনোবিদ্ও এই মত পোষণ করিয়া থাকেন, যেমন স্পেন্সার, থর্নডাইক্ প্রভৃতি। সে যাহা হউক, এই দুইটি ক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রহিয়াছে।

সহজ প্রবৃত্তি এবং প্রতিবর্তের পার্থক্য :

ইহাদের প্রধান পার্থক্য এই যে, সহজ প্রবৃত্তিতে **বুদ্ধি, চেতনা, আকর্ষণ, মনোযোগ, সন্তোষজনক অথবা অসন্তোষজনক ফল অনুসারে আচরণের পরিবর্তন** এবং **অভিজ্ঞতালব্ধ শিক্ষা** থাকে, কিন্তু প্রতিবর্তে থাকে না।

(১) প্রতিবর্ত কোনো অনুভূতি বা সংবেদন ছাড়াও ঘটিতে পারে, কিন্তু সহজ প্রবৃত্তিতে **অস্বস্তি অনুভূতি** বা সংবেদন থাকেই। যেমন জানুক্ষেপ প্রভৃতি প্রতিবর্তে সাধারণতঃ কোনো অনুভূতি বা সংবেদন থাকে না, কিন্তু পাখীর বাসা নির্মাণ প্রভৃতি সহজ প্রবৃত্তিতে থাকে।

(২) **যে সকল প্রতিবর্তে অনুভূতি বা সংবেদন থাকে, উহারা ঐ মানস অবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না।** হাঁচি দিতে যে অস্বস্তিবোধ বা সংবেদন হয়, তাঁহা হাঁচির কোনো পরিবর্তন ঘটায় না। কিন্তু সহজ প্রবৃত্তির ধারা বিভিন্ন জটিল সংবেদনের উপর নির্ভর করে এবং উহাদের সহিত উপযোজিত হয়। গুব্‌রে পোকার ডিম-পাড়া, বিড়ালের ইঁদুর-শিকার, পাখীর বাসা-নির্মাণ, মাকড়সার সূতা-কাটা এবং পিপীলিকার খাদ্যসংগ্রহ প্রভৃতি সহজ প্রবৃত্তি এই নিয়ম মানিয়া চলে।

(৩) **মনোযোগ ছাড়া সহজ প্রবৃত্তি কাজ করিতে পারে না।** ইহাতে ইন্দ্রিয়গুলি সকল উদ্দীপকের দ্বারাই উদ্দীপিত হয় না, কিন্তু হয় উদ্দেশ্যসাধনের অনুকূল উদ্দীপকের দ্বারা। শিকারী প্রাণীর শিকারের প্রতীক্ষায় থাকা, শিকার অনুসন্ধান এবং লক্ষ্য করা প্রভৃতি ক্রিয়াগুলি মনোযোগসাপেক্ষ। উপযুক্ত উদ্দীপক উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত সহজ প্রভৃত্তি নিষ্ক্রিয় থাকে। ইহাতে ভাবী উদ্দীপকের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হয়। সহজ প্রবৃত্তির পূর্বাপর ক্রিয়াগুলি একই বস্তুতে মনোযোগের সূত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

(৪) সহজ প্রবৃত্তিতে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য **লয়েড্ মর্গ্যান্** এর ভাষায় **পরিবর্তিত চেষ্টার মধ্য দিয়া দৃঢ়তা বা লাগিয়া থাকা** (Persistency with varied effort) প্রকাশ পায়। যদি এক রকমের ক্রিয়ায় উদ্দেশ্য সাধিত না হয়, তাহা হইলে সাফল্য লাভ না হওয়া পর্যন্ত বিভিন্ন রকমের চেষ্টা চলিতে থাকে। গুব্‌রে পোকা হয়ত গোবরের বল গড়াইয়া লইতে একটু নীচু জায়গায় আসিয়া পড়িল। এই অবস্থায় বার বার চেষ্টা করিয়াও যখন সে এই বলটিকে লইয়া অগ্রসর হইতে পারিল না, তখন মাটিতে ধাক্কা দিয়া উহাকে ঢালু করিয়া লইল, যাহাতে গোবরের বলটি গড়াইয়া লইতে আর অসুবিধা না হয়। সুতরাং এই সকল সহজ আচরণ শুধু নির্দিষ্ট উদ্দীপকের জন্মগত প্রতিক্রিয়া নয়। ইহাতে পরিবর্তিত চেষ্টার মধ্য দিয়া দৃঢ়তা প্রকাশ পায়।

(৫) সহজ প্রবৃত্তি শুধু অন্ধ বা বুদ্ধিহীন জৈব বা শারীরক্রিয়া নয়। বুদ্ধি ও চেতনা ইহার বিশেষ লক্ষণ। ইহাতে অতীত অভিজ্ঞতা বা শিক্ষার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। শিক্ষা বা অভিজ্ঞতার ফলে যে শুধু সহজ প্রবৃত্তির ধরন বদলায় তাহাই নয়, কিন্তু **বিশেষ প্রকারে বদলায়,** যেমন ইহাতে বস্তুকে পৃথক এবং নির্দিষ্ট করিয়া বুঝিবার এবং পুরাতন অভিজ্ঞতার সাহায্যে নূতন পরিস্থিতির সম্মুখীন হইবার ক্ষমতা আসে। সদ্যোজাত মুরগীর বাচ্চা—যাহার কোনো অতীত অভিজ্ঞতা নাই—সহজ প্রবৃত্তির বশে সে কোনো ক্ষুদ্র বস্তু ঠোক্‌রাইতে থাকে। কিন্তু শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার

ফলেই সে সুস্বাদু এবং অখাদ্য বস্তুগুলির পার্থক্য বুঝিতে শিখে। ইহার ক্ষুদ্র বস্তুতে ঠোক্‌রাইবার সহজ প্রবৃত্তি অভিজ্ঞতা ও শিক্ষার ফলে কোনো কোনো ক্ষুদ্র বস্তুতে **নিষিদ্ধ** এবং কতকগুলিতে **সীমাবদ্ধ** হইয়া পড়ে।

আবার অভিজ্ঞতার ফলে সহজ প্রবৃত্তি যে **শুধু পুরাতন বস্তু হইতে নিবারিত হইয়া সঙ্কীর্ণ হয় তাহাই নয়, কিন্তু নূতন বস্তুতে প্রসারিতও হইতে পারে।** যেমন কাক বা অন্যান্য পাখীর লাঙ্গল অনুসরণ করা সহজ প্রবৃত্তি নয়। কিন্তু উহারা লাঙ্গলের পিছনে ছোটে, কারণ অতীত অভিজ্ঞতা অনুসারে উহারা লাঙ্গল দেখিয়া প্রচুর খাদ্যশস্য আশা করে। আবার যে সকল মাছ জলাশয়ে খাবার পাইতে অভ্যস্ত হইয়াছে তাহারা যথাসময়ে জলাশয়ের নিকট কাহাকেও আসিতে দেখিলেই জলের উপর ভাসিয়া ওঠে এবং ছোঁ মারিয়া খাদ্য লইবার জন্য প্রস্তুত হয়।

(৬) বলা যাইতে পারে যে, নিছক প্রতিবর্তেও এইরূপ অতীত অভিজ্ঞতার শিক্ষালব্ধ ফল দেখা যায়। যেমন কাতুকুতু বা সুড়সুড়ি দেওয়ার কথা বলিলেই অনেক সময় প্রকৃত কাতুকুতু বা সুড়সুড়ি দেওয়ার ফল হয়। কিন্তু এই ব্যাপারেও প্রতিবর্তের সহিত সহজ প্রবৃত্তির পার্থক্য রহিয়াছে। **প্রতিবর্তে উদ্দীপকের সহিত উপযোজন নাই, কিন্তু সহজ প্রবৃত্তিতে আছে।** সুড়সুড়ি দেওয়ার পূর্বেই উহার প্রতিক্রিয়া, যেমন হাসিতে হাসিতে গড়াইয়া পড়া প্রভৃতি আরম্ভ হয়, কিন্তু সহজ প্রবৃত্তিতে উদ্দীপকের জন্য প্রস্তুতি থাকিলেও উহা উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত প্রতিক্রিয়া হয় না।

উপসংহার ঃ

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, প্রতিবর্ত এবং সহজ প্রবৃত্তির মধ্যে বিশেষ পার্থক্য থাকায়, **উহাদিগকে একাকার করা অসঙ্গত।** সহজ প্রবৃত্তি ক্রমিক বা যৌগিক প্রতিবর্ত নয়, কিন্তু তদপেক্ষা উন্নততর অনৈচ্ছিক ক্রিয়া। অধিকাংশ মনোবৈজ্ঞানিক মতবাদ ইহাদের এই পার্থক্য স্বীকার করে এবং জীববৈজ্ঞানিক বা শারীরবৃত্তীয় মতবাদ ইহা স্বীকার করে না বলিয়া প্রথমটিই গ্রহণীয় বলিয়া মনে হয়।

৭। সহজ প্রবৃত্তি অন্ধ কিনা—সহজ প্রবৃত্তি ও বুদ্ধি

(Are Instincts Blind ? Instinct and Intelligence)

সহজ প্রবৃত্তি অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষার ফল কাজে লাগাইতে পারে। সুতরাং ইহাতে বুদ্ধি ক্রিয়াশীল। কিন্তু প্রশ্ন এই যে সহজ প্রবৃত্তি কি প্রথম হইতেই বুদ্ধিসম্পন্ন,

অথবা উহা প্রথমে বুদ্ধিহীন এবং **অন্ধ** থাকিয়া শুধু অভিজ্ঞতা ও শিক্ষার ফলে বুদ্ধিযুক্ত হইয়া দাঁড়ায়।

অনেকের মতে সহজ প্রবৃত্তি **প্রথম অবস্থায় বুদ্ধিহীন বা অন্ধ**, কারণ বুদ্ধিমত্তার লক্ষণ হইল ভবিষ্যৎ উদ্দেশ্যের জ্ঞান বা দূরদৃষ্টি এবং **অভিজ্ঞতার সাহায্যে সহজ** প্রবৃত্তিতে ভবিষ্যতের ইঙ্গিত, দূরদৃষ্টি অথবা **বুদ্ধির উদয় হয়**।

স্টাউট্-এর মতে সহজ প্রবৃত্তি প্রথম হইতেই বুদ্ধিযুক্ত। পূর্বোক্ত মতে অভিজ্ঞতা সাহায্যে শিক্ষালাভের সামর্থ্যই বুদ্ধির পরিচায়ক এবং যেহেতু সহজ প্রবৃত্তির প্রথম ক্রিয়ার অভিজ্ঞতা সাহায্যে শিক্ষালাভ ঘটে না, সুতরাং ইহা অন্ধ বা বুদ্ধিহীন। কিন্তু এইরূপ মনে করা অসঙ্গত। সহজ প্রবৃত্তির প্রথম ক্রিয়ায় অতীত অভিজ্ঞতার ফল না থাকিলেও, উহাতে এমন কিছু ঘটে, যাহার ফলে উহার পুনরাবৃত্তিতে শিক্ষার পরিচয় পাওয়া যায়। অর্থাৎ সহজ প্রবৃত্তির প্রাথমিক ক্রিয়াতেই শিক্ষার সূত্রপাত হয়। ইহাতে শিক্ষালাভের উপযোগী যে বুদ্ধিবৃত্তি ক্রিয়াশীল, তাহার ফলেই সহজ প্রবৃত্তির পরবর্তী অবস্থার শিক্ষালাভের পরিচয় পাওয়া সম্ভব। বুদ্ধি প্রথমে একেবারেই নাই, হঠাৎ পরে দেখা দিল, এইরূপ যুক্তি দুর্বোধ্য। **প্রথম হইতেই সহজ প্রবৃত্তিতে মনোযোগ, আকর্ষণ, উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য, সাফল্য ও ব্যর্থতার পার্থক্য-বোধ এবং তদনুসারে ক্রিয়ার পরিবর্তন প্রভৃতি বুদ্ধির লক্ষণগুলি বর্তমান থাকে**। যেমন পাখীর প্রথম বাসা-নির্মাণই উহার উপযোগী জিনিসগুলিতে মনোযোগ, এই জিনিসগুলি লইয়া বাসা তৈয়ারী করিবার আকর্ষণ, উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য প্রভৃতি বুদ্ধিমত্তার লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

সহজ প্রবৃত্তিতে প্রথম হইতেই উদ্দেশ্যের ভবিষ্যৎদৃষ্টি বা দূরদৃষ্টি থাকিলেও এই দৃষ্টি চেতন নয়, কিন্তু অবচেতন বা অস্পষ্টচেতন। যখন পাখী তাহার বাসা তৈয়ারী করে তখন সে উহাতে ডিম পাড়িবে এবং বাচ্চাগুলিকে পালন করিবে তাহার এইরূপ দূরদৃষ্টি বা ভবিষ্যৎদৃষ্টি নাও থাকিতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া বাসা তৈয়ারী করিবার সহজ ক্রিয়ায় উদ্দেশ্যের কোনো চেতনা নাই, এইরূপ মনে করা অহেতুক। দূর (remote) উদ্দেশ্যের দিকে পাখীর দৃষ্টি না থাকিলেও নিকট (proximate) উদ্দেশ্যের প্রতি তাহার দৃষ্টি থাকা সম্ভব। পাখী তাহার বাসা তৈয়ারী করিবার কালে, এই খড় বা কুটাটি গাছের উপর লইয়া যাইতে হইবে, অথবা এই কাঠিটি ঐ কাঠিটির পাশে সাজাইতে হইবে, এই জাতীয় **নিকট উদ্দেশ্য** সম্বন্ধে চেতন থাকিতে পারে। আবার বাসা তৈয়ারী হইয়া গেলে সে ইহার উপর ডিম পাড়িবে, ডিমের

উপর তাপ দিয়া শাবকগুলিকে ভূমিষ্ঠ হইতে সাহায্য করিবে, এই জাতীয় **দূর উদ্দেশ্য** দূর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে পাখীর চেতনা নাও থাকিতে পারে।

মায়ার্স (Myers) বলিয়াছেন যে, মুরগীর বাচ্চা যখন সর্বপ্রথম যে কোনো ক্ষুদ্র বস্তু ঠোক্‌রাইতে আরম্ভ করে, হাঁসের বাচ্চা যখন সর্বপ্রথম জল দেখিয়া উহাতে ঝাঁপাইয়া পড়ে এবং সাঁতার কাটে, তখন তাহাদের এই ক্রিয়া সম্বন্ধে অস্পষ্ট চেতনা থাকে। মায়ার্স-এর মতে এই ক্রিয়াগুলি প্রথম বা নূতন মনে হইলেও, একেবারে নূতন নয়, কিন্তু পূর্ব-অভিজ্ঞতাযুক্ত। ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্বে মাতৃগর্ভে ভ্রূণাবস্থায়ই উহাদের এই জাতীয় কতকগুলি ক্রিয়ার অভিজ্ঞতা ঘটে।

কিন্তু **স্টাউট্** মনে করেন যে, শুধু পূর্ব-অভিজ্ঞতা এই ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করিতে পারে না। বাজপাখী দেখিয়াই অন্যান্য পাখী পলাইয়া যায় অথবা আত্মগোপন করে। পাখীরা প্রথম বাজ দেখিয়াই যে নির্দিষ্ট ক্রিয়াগুলি লাভ করে, তাহা সহজাত এবং পূর্ব-অভিজ্ঞতার প্রভাবমুক্ত। তাহা ছাড়া, মায়ার্স-এর মতানুসারে কিরূপে সহজ প্রবৃত্তির প্রথম ক্রিয়ায় শিক্ষালাভ হইতে পারে, তাহা দুর্বোধ্য।

আবার বুদ্ধি পূর্ব-অভিজ্ঞতার ফল হইলে, অভিজ্ঞতার অল্পাধিক্য অনুসারে বুদ্ধিরও অল্পাধিক্য ঘটিবে। কিন্তু সেইরূপ ঘটে না। মনোযোগের বস্তু নির্বাচন (Selective attention), ইহার ধারাবাহিকতা (continuity of attention), পরিবর্তিত চেষ্টা সত্ত্বেও দৃঢ়তা বা লাগিয়া থাকা (persistency with varied effort), প্রভৃতি বুদ্ধির লক্ষণগুলি পাখীর বাসা নির্মাণ এবং অন্যান্য সহজ প্রবৃত্তিতে আদ্যোপান্ত সমানভাবে পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং **সহজ প্রবৃত্তির বুদ্ধি অভিজ্ঞতাপ্রসূত নয়, কিন্তু সহজাত।**

মনোযোগের বিষয়নির্বাচন আকর্ষণের (Interest) উপর নির্ভর করে। কিন্তু আকর্ষণ একটি সহজাত স্বভাব। আকর্ষণ এক জাতীয় আবেগ যাহাতে বেদনা-রাগ (affective tone) এবং প্রক্ষোভের উত্তেজনা থাকে। আকর্ষণে ভবিষ্যৎমুখীনতা (prospective attitude) আছে। কিন্তু এই কারণে ইহাকে পূর্ব-অভিজ্ঞতা-নির্ভর না বলিলেও চলিতে পারে। পাখী বাসা তৈয়ারী করিবার খড়, কুটা প্রভৃতি সংগ্রহ করে এবং তাহাকে এইগুলি সংগ্রহ করিয়া যাইতে হইবে, এইরূপ ভবিষ্যৎমুখী দৃষ্টিই পাখীর পক্ষে যথেষ্ট।

সহজ প্রবৃত্তি একটি **অন্ধ অস্বস্তি বা অস্থিরতা বোধ** হইতে উৎপন্ন হয়। কিন্তু *ইহাতে শুধু অন্ধ অস্থিরতাই থাকে না, সুপ্ত ইচ্ছা বা ক্রিয়াপ্রবণতাও থাকে, যাহা*

প্রাণীকে উদ্দেশ্যের দিকে পরিচালিত করে। উদ্দেশ্যসাধনচেষ্টা সহজাত। কিন্তু উদ্দেশ্যসাধনের অনুকূল উপায়জ্ঞান সহজাত নয়! উদ্দেশ্যসাধনে কি কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে সেই বুদ্ধি অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ। কারণ উপায়গুলি কর্মপ্রচেষ্টার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়াই জানা যাইতে পারে।

বিষয়টি **উদাহরণ** সাহায্যে বুঝানো যাউক। নিঃসঙ্গ বোল্‌তা (Solitary wasp) উহার বাসায় মাকড়সা মজুত করিয়া রাখে, কিন্তু বাসার প্রবেশরন্ধ্রে মাকড়সা ঢুকাইতে গিয়া প্রায়ই অসুবিধায় পড়ে। ফলে, এই বোল্‌তা উহার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দৃঢ়তার সহিত নানাপ্রকার চেষ্টা করিতে করিতে সাফল্য লাভ করে। এইরূপ সহজ প্রবৃত্তিতে প্রথম হইতেই বুদ্ধির লক্ষণগুলি বর্তমান থাকে। কিন্তু কি উপায়ে, অর্থাৎ কোন্ চেষ্টা বিফল হইলে অন্য কোন্ চেষ্টা করিতে হইবে, এই জ্ঞান চেষ্টা করিবার ফলে **অভিজ্ঞতা** হইতে আসে। এই চেষ্টা "চেষ্টা ও ভুল সংশোধন (Trial and Error)" প্রণালীতে ঘটে না। ইহাতে প্রথম হইতে উদ্দেশ্যাভিমুখিতা (teleological determination), সাফল্য এবং ব্যর্থতার পার্থক্যবোধ (appreciation of failure and success), মনোযোগের ফলে বিষয়নির্বাচন (Selective attention) এবং আকর্ষণ প্রভৃতি **বুদ্ধিমূলক ক্রিয়াগুলি** কাজ করে।

৮। সহজ প্রবৃত্তির মানস রূপ

সহজ প্রবৃত্তির ক্রিয়া বুদ্ধি এবং চেতনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। চেতনা কি পরিমাণে সহজ প্রবৃত্তির অংশ এবং কি পরিমাণে ইহার প্রকাশের কারণ, তাহা আলোচনা করা দরকার। মনোযোগ, অনুভূতি, অভিজ্ঞতার ফলে শিক্ষা প্রভৃতি মানসবৃত্তিগুলিই যে সহজ প্রবৃত্তি, তাহা নয়। আকৃষ্ট অথবা মনোযোগী হইবার সাধারণ ক্ষমতাকে সহজ প্রবৃত্তি বলা চলে না। **বিশেষ বস্তু বা উদ্দীপকের প্রথম উপস্থিতিতেই যে উহার সম্পর্কে বিশেষ ধরনের উত্তেজিত প্রক্ষোভ, মনোযোগ এবং আকর্ষণ উৎপন্ন হয় তাহা সহজ প্রবৃত্তির ফল।** বিড়ালশাবক যে অন্য অনেক বস্তু থাকা সত্ত্বেও, একটি পশমী সুতার দোলানো গুল লইয়া ব্যস্ত হয়, অথবা স্বভাবশত্রু প্রাণী দেখিবামাত্র রাগিয়া অস্থির হয়, এইগুলি সহজ প্রবৃত্তিরই ফল।

মোটের উপর, একটি ধারাবাহিক ক্রিয়া করিবার সহজাত শক্তির সহিত বিশেষ বস্তুর সান্নিধ্যে ঐ শক্তি প্রয়োগ করিবার প্রবৃত্তি থাকে। এই সকল ক্ষেত্রে কোন জন্মগত প্রবৃত্তির গুণেই এই বস্তু উহার পরিবেশ হইতে পৃথকভাবে এবং অনায়াসে জ্ঞাত হয়।

উইলিয়ম্ ম্যাক্ডুগ্যাল্ (McDougall) সহজ প্রবৃত্তির মানসরূপের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। তাঁহার **সহজ বৃত্তির সংজ্ঞা** এই : "সহজ প্রবৃত্তি হইল সেই স্বাভাবিক প্রকৃতি, যাহা প্রাণীকে কোনো শ্রেণীর যে কোনো বস্তু প্রত্যক্ষ করিতে এবং উহাতে মনোযোগ দিতে, উহার সম্মুখে প্রক্ষুব্ধ উত্তেজনা এবং এইরূপ ক্রিয়ার আবেগ অনুভব করিতে বাধ্য করে, যে ক্রিয়াবেগ ঐ বস্তু সম্পর্কে একটি নির্দিষ্ট প্রকারের আচরণে প্রকাশিত হয়।"

মনোবিদ্যার দিক হইতে ম্যাক্ডুগ্যাল প্রদত্ত সহজ প্রবৃত্তির উপরোক্ত সংজ্ঞাটি **ব্যাপক**। ইহাতে সহজ প্রবৃত্তির অবগতি, বেদনা এবং ইচ্ছামূলক, এক কথায় সকল মানস উপাদানগুলিই উল্লিখিত হইয়াছে। বিভিন্ন সহজ প্রবৃত্তিতে এই মানসবৃত্তিগুলি বিভিন্ন মাত্রায় বর্তমান থাকে। যে সকল সহজ প্রবৃত্তিতে ক্রিয়ার আবেগ বেশী তাহাতে অবগতি বা জ্ঞান স্বভাবতঃ কম, এবং অধিকাংশ সহজ প্রবৃত্তিতেই বেদনা বা প্রক্ষোভের স্বভাবটি বিশিষ্টভাবে ফুটিয়া উঠে না।

এই দিক দিয়া বিচার করিলে ম্যাক্ডুগ্যাল-এর সংজ্ঞাটি **জটিলতর এবং উচ্চতর সহজ প্রবৃত্তিগুলির বেলায়ই খাটে** এবং ইহার ভিত্তিতে অধিকাংশ সহজতর এবং নিম্নতর সহজ প্রবৃত্তি কমবেশী ত্রুটিপূর্ণ হইয়া দাঁড়ায়। যেমন, হাঁটিবার সহজ প্রবৃত্তি ক্রমবিকাশের একটি অবস্থায় দেখা দেয়। ইহাতে প্রত্যক্ষ করিবার মত কোনো স্পষ্ট বিষয় এবং প্রক্ষুব্ধ উত্তেজনার কোনো বিশেষত্ব থাকে না।

অভিজ্ঞতা হইতে শিক্ষালাভকে (learning by experience) একটি সহজ প্রবৃত্তি বলিতে হয়, কারণ সহজাত স্বভাব অনুসারে কোন কোন অভিজ্ঞতায় শিক্ষা হয়, কিন্তু অন্যগুলিতে হয় না। সেই সকল অভিজ্ঞতার ফলেই শিক্ষালাভ হয়, যাহাতে সহজাত আকর্ষণ থাকে। যেমন কুকুর এবং বিড়াল শিকার এবং যুদ্ধ প্রভৃতি স্বাভাবিক ক্রিয়াগুলিই সহজে আয়ত্ত করিতে পারে, কিন্তু যে সকল কেরামতি উহাদিগকে জোর করিয়া শেখানোর চেষ্টা করা হয়, সেইগুলি তত সহজে শিখিতে পারে না।

যে প্রাণী যত নিম্নস্তরের, তাহার অভিজ্ঞতালব্ধ শিক্ষার পরিধি তত সংকীর্ণ এবং যে প্রাণী যত উচ্চস্তরের, তাহার অভিজ্ঞতালব্ধ শিক্ষার পরিধি তত ব্যাপক। কীট পতঙ্গ প্রভৃতি প্রাণীরা অভিজ্ঞতার ফলে খুব কমই শিক্ষালাভ করে, আবার কুকুর বা বানরশ্রেণীর প্রাণী উহার ফলে অনেক কিছুই শিখিতে পারে।

৯। মানুষের সহজ প্রবৃত্তি

মানুষের সহজ প্রবৃত্তির প্রাধান্য কিরূপ, ইহা নির্ভর করে সহজ প্রবৃত্তি বলিতে আমরা কি বুঝি, তাহার উপর।

মনুষ্যেতর প্রাণীর ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, পূর্বে শিক্ষা করা হয় নাই, এমন কতকগুলি বিশিষ্ট এবং জটিল ক্রিয়া করিবার ক্ষমতাই সহজ প্রবৃত্তির বিশেষ ধর্ম। চাতক পাখীর (swallow) প্রথম উড়িবার চেষ্টাই সফল হয়—সে প্রথমবার উড়িতে গিয়াও মাটিতে পড়িয়া যায় না বা মরে না। আবার চড়াই পাখীর প্রথম ওড়াই পরিণত পাখীর ওড়ার মত পরিপক্ক।

মানুষের ক্ষেত্রে সহজ ক্রিয়াসামর্থ্যের উপযোগী জন্মগত উপকরণ অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় কম। উত্থান পতনের মধ্য দিয়াই মানুষ প্রায় প্রত্যেকটি ক্রিয়ায় অভ্যস্ত হইয়া থাকে। "হাঁটিতে শিখে না কেহ না খেয়ে আছাড়"। মানুষের মাত্র একটি ক্ষমতাই সহজাত, যথা, শিশুর পা মাটি স্পর্শ করে এমনভাবে তাহাকে ধরিলে সে **পর্যায়ক্রমে দুইটি পা নাড়িতে** থাকে। মুখে কোনো জিনিস দিলে তাহা **কামড়ানো**, কোনো জিনিস ধরিয়া **মুখে দেওয়া, হামাগুড়ি দেওয়া,** স্পষ্টভাবে নানা **শব্দ করা, কাঁদিয়া, হাসিয়া, ভ্রূভঙ্গী** প্রভৃতি **করিয়া প্রক্ষোভ প্রকাশ** করা, এইগুলি শিশুর সহজ ক্রিয়া। কিন্তু সহজ প্রবৃত্তির মানদণ্ডে চাতক বা চড়াই পাখীর প্রথম ওড়ার সহিত তুলনীয় আর বিশেষ কিছু সহজাত সম্পদ মানবশিশুর বড় একটা থাকে না। **ক্রিয়া করিবার সহজাত শক্তি অর্থে মানুষের সহজ প্রবৃত্তি নগণ্য।**

কিন্তু যদি ক্রিয়া করিবার সহজাত ক্ষমতাকে সহজ প্রবৃত্তির প্রধান লক্ষণ মনে না করিয়া, **বিশেষ অবস্থার উপযোগী সহজ আচরণকে** ইহার প্রধান লক্ষ্য বলিয়া মনে করা যায়, তাহা হইলে মানুষের সহজ প্রবৃত্তির ক্ষেত্র প্রাণীর তুলনায় অধিক ব্যাপক। পলায়ন এবং আত্মগোপন ক্রিয়াগুলি অর্জিত হইতে পারে, কিন্তু কোনো ভীতিজনক বস্তুর উপস্থিতিতে এই ক্রিয়াগুলি শুধু অর্জিত নাও হইতে পারে।

আবার যদি বিশেষ অবস্থায় নির্দিষ্ট ক্রিয়া করিবার মূল স্বভাবের পরিবর্তে **নির্দিষ্ট বিষয়ে বা বস্তুতে বিশিষ্ট আকর্ষণ, মনোযোগ এবং অভিজ্ঞতার ফলে শিক্ষার ক্ষমতাকেই** সহজ প্রবৃত্তির প্রধান লক্ষণ বলিয়া মনে করা হয়, তাহা হইলে প্রাণী অপেক্ষা মানুষের সহজ প্রবৃত্তি বেশী বিচিত্র এবং জটিল হইয়া দাঁড়ায়। এই ধরনের সহজ প্রবণতাতেই মনুষ্যমনের বিকাশের মূল কারণ নিহিত।

সহজ প্রবৃত্তি বলিতে যদি সেই সকল ক্রিয়াই বুঝায়, যেগুলি অভিজ্ঞতা বা শিক্ষার উপর নির্ভর না করিয়া চাতক পাখীর প্রথম ওড়ার মত প্রথম হইতেই পরিণত, তাহা হইলে সহজ প্রবৃত্তি কথাটি মানুষের প্রায় কোনো আচরণেই খাটিবে কিনা সন্দেহ।

আবার সহজ প্রবৃত্তি বলিতে **যদি সহজাত স্বভাবের দ্বারা প্রভাবিত ক্রিয়া-মাত্রকেই বুঝায়,** তাহা হইলে সহজ প্রবৃত্তি কথাটি সর্বব্যাপক এবং অর্থহীন হইয়া পড়ে। সংবেদন, প্রত্যক্ষ, স্মৃতি, কল্পনা, চিন্তন প্রভৃতি সকল মানসবৃত্তিগুলিই সহজাত স্বভাবের উপর নির্ভর করে। এমতাবস্থায় সকল মানসবৃত্তিই সহজ প্রবৃত্তি হইয়া দাঁড়ায়।

সহজ প্রবৃত্তি কথাটিকে এই অস্পষ্টতা এবং নিরর্থকতা হইতে মুক্ত রাখিতে হইলে ইহার **অর্থসঙ্কোচন দরকার**। স্মৃতি, চিন্তন প্রভৃতি উচ্চতর মানসবৃত্তিগুলিকে সহজ প্রবৃত্তি বলা চলে না, কারণ ইহারা মুক্তভাব (Free idea) দ্বারা অল্পবিস্তর প্রভাবিত। কিন্তু সহজ প্রবৃত্তি কথাটির অর্থ টানিয়া যতই বাড়ানো যাউক না কেন, মনে রাখিতে হইবে যে **উহাতে মুক্ত ভাব বা চিন্তার স্থান নাই**।

সহজ প্রবৃত্তি প্রত্যক্ষের স্তরে সীমাবদ্ধ। আবার প্রত্যক্ষে সীমাবদ্ধ যে কোনো প্রতিক্রিয়াই সহজ প্রবৃত্তি নয়। বজ্রের সহিত বিদ্যুৎ দেখিবার ফলে বিদ্যুতের ভয়কে সহজ প্রবৃত্তি বলা যায় না, কারণ এই ভয় পূর্ব-অভিজ্ঞতা হইতে অর্জিত।

মানুষের সহজাত সম্পদ

মানুষের সহজাত সম্পদ প্রাণীদের তুলনায় কম নয়। কিন্তু ইহা নূতন প্রকাশের ক্ষমতা এবং ব্যক্তিগত ভেদের দ্বারা অধিক প্রভাবিত। সহজাত আকর্ষণ এবং দক্ষতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিসাবে অসাধারণ, বিশেষ করিয়া প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিগণের মধ্যে পরিলক্ষিত, **প্রকৃতিদত্ত বিশেষ বিশেষ ক্ষমতার** উল্লেখ করা যাইতে পারে। "যদি মোজার্ট তিন বৎসর বয়সে বিস্ময়কর কম অনুশীলনের সাহায্যে পিয়ানো না বাজাইয়া বিনা অনুশীলনে কোনো সুর বাজাইতেন," তাহা হইলে চড়াই পাখীর প্রথম উড্ডয়নের মত সহজ প্রবৃত্তিমূলক ক্ষমতা দেখাইতেন। তাঁহার সঙ্গীতে কৃতিত্ব যে সহজাত সংস্কারের ফলে ঘটিয়াছিল, উহাকে সহজ প্রবৃত্তি বলা যাইতে পারে। জন্মগত প্রবণতা বা ঝোঁকের জন্য সঙ্গীতে ছিল তাঁহার অনমনীয় এবং আত্মহারা আকর্ষণ এবং ইহাতে ছিল তাঁহার অভিজ্ঞতার ফলে দ্রুত, নিখুঁত এবং নিরেট শিক্ষা। গণিতে নিউটন-এর, প্রাকৃতিক ইতিহাসে ডারুইন-এর এবং অঙ্কনে গিয়েটো-এর ছিল একই জাতীয় আকর্ষণ এবং স্বাভাবিক দক্ষতা।

সাধারণ লোকের মধ্যেও কোনো বিশেষ বিষয়ে এইরূপ আকর্ষণ এবং দক্ষতা দেখা যায়। কেহ হয়ত জলে হাঁসের মত গতিতে গণিতে যথেচ্ছ সঞ্চরণ করে, আবার কেহ বা নামতার কোঠা ছাড়াইতেই গলদ্‌ঘর্ম হইয়া যায়।

সকল স্বভাবী শিশুকেই বহু পরিশ্রম করিয়া সোজাভাবে বসিতে, দাঁড়াইতে, হাঁটিতে, দৌড়াইতে, উঠিতে, নামিতে, লক্ষ্য স্থির করিয়া কোনো বস্তু ধরিতে, অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে, স্পষ্ট-উচ্চারিত শব্দ করিতে শিক্ষালাভ করিতে হয়। এই ক্ষমতা-গুলি তাহারা জন্মগতভাবে অথবা বিনা অনুশীলনে আয়ত্ত করে না। কিন্তু উপযুক্ত বয়সে বা কালে তাহারা এইগুলি শিখিবার বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করে এবং ধারাবাহিক মনোযোগের সাহায্যে, পরিবর্তিত চেষ্টার মধ্যে দৃঢ়তা সহকারে অগ্রসর হয়। অভিজ্ঞতার সাহায্যে এইগুলি শিখিতে গিয়াও তাহারা বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দেয়।

সহজ প্রবৃত্তি বিষয়টি স্বভাবতঃ অস্পষ্ট। মানুষের ক্ষেত্রে ইহার অস্পষ্টতা আরও বেশী। মানুষের প্রায় সকল ক্ষমতাগুলিই অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষার ফলদ্বারা পুষ্ট হয়। কাজেই মানুষের সহজ প্রবৃত্তি কি কি তাহা বলা কঠিন।

যে সকল স্বাভাবিক আবেগ এবং ক্ষমতা শুধু শৈশবে সীমাবদ্ধ নয়, কিন্তু সকল বা অধিকাংশ পরিণত মানুষের মানসজীবনে ব্যাপ্ত, সেইগুলি সম্বন্ধে অধিকতর নির্ভুল গবেষণা ও বিশ্লেষণ আবশ্যক।

১০। সহজ প্রবৃত্তি এবং প্রক্ষোভ

জেম্‌সীয় মতবাদ

উপরের আলোচনা হইতে দেখা গিয়াছে যে অস্বস্তি বা অভাব-বোধ হইতে সহজ প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয়। জেম্‌স্ বলিয়াছেন যে, যে বস্তু সহজ প্রবৃত্তি জাগায় তাহা প্রক্ষোভও জন্মাইতে থাকে। তিনি ভয়, ক্রোধ প্রভৃতি সহজ প্রবৃত্তি হিসাবে ব্যবহার করিয়াছেন, যদিও সহজ প্রবৃত্তিকে প্রক্ষোভের সহিত একাকার করেন নাই। তাঁহার মতে সহজ প্রবৃত্তি সেই দৈহিক ক্রিয়া, যাহা প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন করে এমন বস্তুর সহিত সম্পর্কিত। প্রক্ষোভ-প্রতিক্রিয়া সহজ প্রবৃত্তির প্রতিক্রিয়ার তুলনায় অধিকতর সূক্ষ্ম এবং দেহে সীমাবদ্ধ। কিন্তু এই উভয়েরই দৈহিক প্রতিক্রিয়া একরূপ।

ম্যাক্‌ডুগ্যালীয়-মতবাদ

জেম্‌স্-এর মত ম্যাক্‌ডুগ্যাল-এর মত অপেক্ষা স্পষ্টতর বলিয়া মনে হয়। ম্যাক্‌ডুগ্যাল মৌলিক অথবা সরল প্রক্ষোভকে প্রধান সহজ প্রবৃত্তিগুলির

ক্রিয়ার বেদনাগত দিক (affective aspect) বলিয়াছেন। কিন্তু ভয়ের মত একটি প্রক্ষোভ নিশ্চয়ই অন্য কোনো সহজ প্রবৃত্তির একটি দিক মাত্র নয়। পক্ষান্তরে ইহা একটি সমগ্র মানসবৃত্তি, যাহা একাধারে অবগতি, ইচ্ছা এবং বেদনামূলক। ইহাতে দুঃখময় অনুভূতি এবং ইহার বিষয় সম্বন্ধে চেতনা বা জ্ঞানও থাকে।

ম্যাক্‌ডুগ্যাল প্রদত্ত সহজ প্রবৃত্তি এবং তদঙ্গীভূত প্রক্ষোভের তালিকা :—

সহজ প্রবৃত্তি	প্রাথমিক প্রক্ষোভ
পলায়নী প্রবৃত্তি	ভয় ,,
যোধন ,,	ক্রোধ ,,
বিতাড়ন ,,	বিরক্তি ,,
পিতৃত্ব-মাতৃত্ব ,,	কোমল ,,
আবেদন ,,	দুঃখ ,,
যৌন ,,	কাম ,,
কৌতূহল ,,	বিস্ময় ,,
অধীনতা ,,	নম্রতা ,,
প্রাধান্য ,,	অহঙ্কার ,,
যৌথ ,,	নির্জনতা ,,
খাদ্যসন্ধান ,,	ক্ষুধা ,,
সঞ্চয় ,,	স্বত্বাধিকার ,,
গঠনমূলক ,,	সৃজনী ,,
হাস্য ,,	আমোদ ,,

ম্যাক্‌ডুগ্যালীয় মতের সমালোচনা

ম্যাক্‌ডুগ্যাল্ প্রদত্ত প্রধান **চৌদ্দটি** সহজ প্রবৃত্তি ও উহাদের অঙ্গীভূত **চৌদ্দটি** প্রাথমিক প্রক্ষোভের তালিকা মূল্যবান। তিনি সহজ প্রবৃত্তিকে শুধু শারীর বা জৈব ক্রিয়া বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, কিন্তু উহার মানস রূপটিও তুলিয়া ধরিয়াছেন। এই তালিকাটির মূলে যে নিয়ম রহিয়াছে তাহা ঠিক। প্রক্ষোভ অবশ্যই সহজ প্রবৃত্তির উপর নির্ভর করে। কিন্তু যে সহজ প্রবৃত্তির সহিত যে প্রক্ষোভ জড়িত বলিয়া ম্যাক্‌ডুগ্যাল দেখাইয়াছেন, তাহা ঠিক নাও হইতে পারে। যেমন ক্রোধ যে যোধন প্রবৃত্তির এবং কোমল অনুভূতি (tenderness) যে পিতৃত্ব-মাতৃত্ব প্রবৃত্তির সহিত সংযুক্ত হইবেই,

এমন কোনো নিশ্চয়তা নাই। আবার কয়েকটি সহজ প্রবৃত্তির প্রক্ষোভ স্পষ্ট নয়। যেমন যৌন, যৌথ, সঞ্চয় এবং গঠন প্রবৃত্তির প্রক্ষোভ কাম, নির্জনতা, স্বত্বাধিকার, এবং সৃজনী অনুভূতি না হইয়া যথাক্রমে প্রেম, নিরাপত্তা বা আত্মপ্রসারণ, অধিকার বা আত্মবিস্তার এবং সাফল্য হইতে পারে। বলা যাইতে পারে যে প্রক্ষোভগুলির নাম উদ্ভট। কিন্তু ম্যাক্‌ডুগ্যাল-এর উল্লিখিত আনুগত্য, উৎকর্ষবোধ প্রভৃতি প্রক্ষোভের নামগুলিও কম উদ্ভট নয়।

মোটের উপর বলা যায় যে, সহজ প্রবৃত্তি এবং উহার অঙ্গীভূত প্রক্ষোভের সম্পূর্ণ শ্রেণীভেদ দুঃসাধ্য।

১১। সহজ প্রবৃত্তির লক্ষণ সম্বন্ধে আরও কয়েকটি মত

ড্রিভার্-এর (Drever) মত

ড্রিভার-এর মতে সহজ প্রবৃত্তির নিম্নোক্ত তিনটি ভেদলক্ষণ আছে।

(১) অন্তর্দর্শন সাহায্যে সহজ প্রবৃত্তির বিশ্লেষণ করিয়াও উহাকে আর মৌলিক উপাদানে পরিণত করা যায় না। অর্থাৎ সহজ প্রবৃত্তি একটি **অবিভাজ্য বা মৌলিক বৃত্তি**।

(২) কতকগুলি নির্দিষ্ট বস্তু অথবা নির্দিষ্ট শ্রেণীর বস্তু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার পূর্বেই উহাদের নির্দিষ্ট এবং অভ্রান্ত প্রকাশলক্ষণগুলির সহিত সহজ প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভ উৎপন্ন করে।

(৩) সহজ প্রবৃত্তি এবং উহার প্রক্ষোভ শৈশবের প্রথম অবস্থায়ই পরিলক্ষিত হয়।

ওয়াট্‌সন্[১]-এর মত

ওয়াট্‌সন্-এর মতে মানুষের মূল প্রকৃতিতে তিন শ্রেণীর প্রক্ষোভ প্রতিক্রিয়া দেখা যায়—যথা ভয়, ক্রোধ এবং ভালবাসা। তাঁহার মতে মানুষের সহজ প্রবৃত্তির সংখ্যা নগণ্য। অভ্যাস গঠনের ক্ষমতা দিয়াই অধিকাংশ সহজ প্রবৃত্তি ব্যাখ্যা করা যায়। দৈহিক ক্রিয়ার সহিত জড়িত সহজ প্রবৃত্তি বাদ দিলে, মানুষের প্রধান সহজ প্রবৃত্তি হইয়া দাঁড়ায় আক্রমণ, প্রতিরক্ষণ এবং নড়াচড়া।

১। ওয়াট্‌শন্ "সহজ প্রবৃত্তি" কথাটি মনোবিদ্যা হইতে তুলিয়া দিবার পক্ষপাতী। তাঁহার মতে অবয়বীর সহিত পরিবেশের সম্বন্ধে যে প্রতিক্রিয়া ঘটে, তাহার সাহায্যেই মনোবিদ্যার সকল প্রশ্ন মীমাংসা করা যায়। তিনি উগ্র পরিবেশবাদী। তাঁহার পরবর্তী কালের মত অবশ্য এতটা উগ্র নয়।

সহজ প্রবৃত্তির অস্থায়িতা (Transitoriness) এবং অনির্দিষ্টতা

স্পল্‌ডিং (Spaulding) মুরগীশাবকের সহজ প্রবৃত্তির যে উদাহরণ দিয়াছেন তাহা হইতে ইহার অস্থায়িতা এবং অনির্দিষ্টতা প্রমাণিত হয়। মুরগীর বাচ্চা ডিম হইতে বাহির হইয়াই যে কোনো গতিশীল বস্তুর অনুসরণ করে, কিন্তু জন্মের প্রথম তিন চার দিন উহার চোখ ঢাকিয়া রাখিলে এইরূপ করে না। এইরূপ করিলে গতিশীল বস্তুর অনুসরণ প্রবৃত্তি উহার মাতাকে অনুসরণ করিবার অভ্যাসে পরিণত হইয়া অদৃশ্য হয়। তেমনই শিশুর কৌতূহল প্রবৃত্তির জ্ঞান অনুসন্ধান করিবার অভ্যাসে পরিণত হইতে পারে। সহজ প্রবৃত্তি অভ্যাস গঠনে সহায়তা করে।

যে বস্তু সহজ প্রবৃত্তিকে পরিতৃপ্ত করে, তাহা এক দিক দিয়া অনির্দিষ্ট। যেমন শিশুর শিকার প্রবৃত্তি খেলায় নিবদ্ধ হইতে পারে, অথবা উচ্চতর জ্ঞানের অনুসন্ধানে পরিণত হইতে পারে। অর্থাৎ সহজ প্রবৃত্তির বস্তুর নির্দিষ্টতা নাই। ইহা বদলাইতে (transferred) পারে।

১২। অভ্যাস (Habit)

যে ক্রিয়া প্রথমে ঐচ্ছিকভাবে করিবার ফলে অনৈচ্ছিক হইয়া দাঁড়ায়, তাহাকে অভ্যাস বলে। অভ্যাস আপাতদৃষ্টিতে একপ্রকার স্বতঃবৃত্ত ক্রিয়া। কিন্তু অভ্যাস আসলে স্বতঃবৃত্ত ক্রিয়া নয়। ইহা মুখ্যভাবে (Primarily) ঐচ্ছিক এবং গৌণভাবে (Secondarily) অনৈচ্ছিক। অভ্যাস এক দিক দিয়া ঐচ্ছিক এবং আর এক দিক দিয়া অনৈচ্ছিক ক্রিয়া। অভ্যাস ইচ্ছামূলক শিক্ষার ফল। ইচ্ছাপূর্বক পুনঃপুনঃ অনুশীলনের ফলে ইহা স্বাভাবিক, সহজ অথবা স্বতঃবৃত্ত হইয়া দাঁড়ায়। প্রথম অনুশীলনের কালে যে ক্রিয়া ঐচ্ছিক ছিল, পুনরাবৃত্তির ফলে তাহাই অনৈচ্ছিকভাবে সম্পন্ন হয়। যেমন মদ্যপায়ী প্রথমে ইচ্ছাপূর্বক মদ্যপান করে। **প্রথমাবস্থায় এই ক্রিয়াটি মুখ্য অথবা প্রধানভাবে ঐচ্ছিক থাকে এবং পুনঃপুনঃ অনুশীলনের ফলে পরবর্তী অবস্থায় উহা গৌণ বা অপ্রধানভাবে অনৈচ্ছিক** (Primarily voluntary, but Secondarily automatic) হইয়া দাঁড়ায়।

যে ব্যক্তির সূর্যোদয়ের পূর্বেই ঘুম ভাঙিয়া যায়, সে ভোরে উঠিবার অভ্যাস করিয়াছে। প্রথম অবস্থায় সূর্যোদয়ের পূর্বে উঠিবার জন্য তাহাকে পুনঃপুনঃ চেষ্টা করিতে হইয়াছে। পুনঃপুনঃ অনুশীলন অথবা ইচ্ছা করিয়া করিবার ফলে, পরবর্তী প্রাতরুত্থান অনৈচ্ছিক ক্রিয়া হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আবার কেহ হয়ত "পাখী সব

করে রব রাতি পোহাইল" ইত্যাদি কবিতাটি অভ্যাস করিয়া ফেলিয়াছে। প্রথমে তাহাকে এই কবিতাটি পুনঃপুনঃ পাঠ করিতে হইয়াছিল, তখন এই অভ্যাস ছিল একটি ঐচ্ছিক ক্রিয়া। কিন্তু পরে ঐ ব্যক্তি অনায়াসে বা ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ না করিয়াই কবিতাটি মুখস্থ বলিতে পারে। অর্থাৎ, তাহার ক্রিয়াটি অনৈচ্ছিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে অথবা অভ্যাসে পরিণত হইয়াছে।

এইরূপে দেখানো যাইতে পারে যে সহজাত ক্রিয়াগুলি বাদ দিলে, **পরবর্তী জীবনের বহু ক্রিয়াই অভ্যাসজনিত**। শিশুর বসিতে, দাঁড়াইতে, হাঁটিতে, দৌড়াইতে, খেলিতে, লিখিতে, পড়িতে, উচ্চতর চিন্তা করিতে শেখার মূলে রহিয়াছে অভ্যাস-গঠন।

১৩। অভ্যাস গঠনের উপকারিতা

অধ্যাপক উইলিয়াম জেম্‌স্ অভ্যাস গঠনের উপকারিতা দেখাইয়াছেন।

(১) অভ্যাস-গঠনের ফলে ক্রিয়া **সহজ এবং কম পরিশ্রমসাধ্য হয়**। জেম্‌স্ বলেন, "যদি কয়েকবার করিবার ফলে কোনো কাজ সহজতর না হইত, তাহা হইলে সমগ্র কর্মজীবন একটি দুইটি ক্রিয়ায় সীমাবদ্ধ থাকিয়া যাইত এবং বিকাশ-লাভে কোনো উন্নতি ঘটিত না।"

(২) অভ্যাস-গঠনের ফলে **বিনা মনোযোগেই কাজ করা যায়**। পুনঃপুনঃ অনুশীলনের ফলে ভুল ক্রিয়াগুলি ক্রমশঃ বন্ধ হইয়া যায়, ঠিক ক্রিয়াগুলির মধ্যে অনুষঙ্গ গঠিত হয় এবং উহারা অভ্যাসে পরিণত হয়। অভ্যাস গঠনের ফলে এই ক্রিয়াগুলি বিনা মনোযোগে এবং স্বতঃবৃত্তভাবে সম্পন্ন হইতে পারে।

(৩) সুতরাং অভ্যাস-গঠনের ফলে নিম্নতর কাজগুলি করিবার জন্য মনোযোগ আবদ্ধ না থাকায় **উচ্চতর ক্রিয়ায় মনোযোগের অভাব হয় না**। ফলে বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম, নীতি, সৌন্দর্য প্রভৃতি উচ্চতর আদর্শগুলির অনুসন্ধানে আত্মনিয়োগ করা সম্ভব হয়।[১]

১৪। অভ্যাস-গঠনের নিয়ম

অধ্যাপক উইলিয়ম্ জেম্‌স্ ইচ্ছাকৃতভাবে অভ্যাস-গঠনের উদ্দেশ্যে চারটি নিয়ম নির্দেশ করিয়াছেন।

(১) নূতন অভ্যাস গঠন করিতে হইলে **যতদূর সম্ভব প্রবল উদ্যম বা**

---

[১] ডবল্যু জেম্‌স্—প্রিন্সিপ্‌ল্‌স্ অফ্ সাইকলজি—প্রথম খণ্ড, চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

প্ররোচনা (Initiative) লইয়া সচেষ্ট হইতে হয়। সত্য সঙ্কল্প বা প্রেরণা যাহাতে অটুট থাকে বা বর্ধিত হয়, সেই জন্য অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি আবশ্যক।

(২) নূতন অভ্যাস গঠিত বা দৃঢ়মূল না হওয়া পর্যন্ত, কোনো প্রকার **আলস্য বা অব্যাহতিকে প্রশ্রয় দিলে চলিবে না,** অর্থাৎ আজ থাক, কাল দেখা যাইবে, এইরূপ গয়ংগচ্ছ ভাব বর্জন করিতে হইবে।

(৩) অভ্যাসটির অনুশীলনের **যে কোনো সুযোগ লইতে হইবে।** অভ্যাসে অনুশীলনের কোনো সুযোগই হেলায় হারাইলে চলিবে না।

(৪) চেষ্টা করিবার ইচ্ছাকে সজাগ রাখিতে হইবে। অকারণে হইলেও, **প্রত্যহ অভ্যাসের অনুশীলন বা চেষ্টা করিয়া যাইতে হইবে।** জেম্‌স্ বলেন যে অভ্যাস অটুট রাখিতে হইলে, নিষ্প্রয়োজন ছোটোখাটো বিষয়গুলি সম্বন্ধেও নিয়মিতভাবে সচেষ্ট থাকা দরকার। অভ্যাস গঠনের অনুকূল নিতান্ত তুচ্ছ বিষয়কেও উপেক্ষা করা সঙ্গত হইবে না।[১]

১৫। অভ্যাস-গঠনের দৈহিক ভিত্তি

অভ্যাস-গঠনের দৈহিক ভিত্তি নার্ভতন্ত্রের মধ্যে কতকগুলি নার্ভের অনুষঙ্গ সৃষ্টি করিয়া একটি নার্ভ-পথ (Nervous path) গঠন। একটি কাজ পুনঃপুনঃ অনুশীলনের মানসিক ক্রিয়ার সহিত ঐ কাজ করিতে গিয়া যে সকল নার্ভ সক্রিয় হয়, উহাদেরও অনুশীলন ঘটে। ফলে মানসিক অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে **নার্ভগুলিরও অভ্যাস** (Nervous habit) গঠিত হইয়া ওঠে। নার্ভীয় অভ্যাস গঠিত হইলে একটি নার্ভ সক্রিয় হইবার সঙ্গে সঙ্গে উহার সহিত অনুষক্ত নার্ভগুলিও পর পর সক্রিয় হয়। এইরূপে মনোযোগ বা চেষ্টা ছাড়াই অভ্যাসমূলক ক্রিয়া সম্পন্ন হইতে পারে।

অভ্যাস গঠনের দৈহিক ভিত্তি এই যে, উদ্দীপনার ফলে কোনো নার্ভপ্রবাহ নার্ভতন্ত্রের কোনো পথ দিয়া প্রবাহিত হইলে, উহাতে একটি 'রেখা' (trace) রাখিয়া যায়, যাহার ফলে ভবিষ্যতে ঐ নার্ভপ্রবাহের পক্ষে ঐ নার্ভ-পথে প্রবাহিত হওয়া সহজতর হয়। এই ক্রিয়ার পুনরাবৃত্তির কারণে রেখাটি গভীর হয়। ফলে, (১) কোনো উদ্দীপক ঐ পথের একটি অংশকে উদ্দীপিত করিলে, অবশিষ্ট অংশগুলি উদ্দীপিত না হইয়া পারে না; (২) ভবিষ্যতে এই উদ্দীপনা সৃষ্টির জন্য প্রাথমিক উদ্দীপক এবং উহার জন্য প্রয়োজনীয় মনোযোগও অত্যন্ত কম হইলে চলে।

মস্তিষ্কের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন শ্রেণীর স্বতঃবৃত্ত ক্রিয়ার তথা অভ্যাসের

১ ডবল্যু. জেম্‌স্—প্রিনসিপ্‌লস্ অফ্ সাইকোলজি—১ম খণ্ড, ৪র্থ পরিচ্ছেদ

কেন্দ্র অবস্থিত। সহজাত ক্রিয়া মস্তিষ্কের গভীরতম স্তরে অধিষ্ঠিত এবং শৈশবের প্রাথমিক শিক্ষার ফলে অর্জিত প্রবণতাগুলিও (Tendencies) এই মস্তিষ্ক স্তরের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। যে সকল অভ্যাস পরিণত বয়সে অর্জিত হয় সেইগুলির কেন্দ্র মস্তিষ্কের অপেক্ষাকৃত কম গভীর স্তরে অবস্থিত। মস্তিষ্কের সর্বাপেক্ষা কম গভীর স্তরে অবস্থিত হইল সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতার ফলে গঠিত অভ্যাসগুলি। এই অভিজ্ঞতার স্মৃতি ক্ষীণ হইবার সঙ্গে সঙ্গে শেষোক্ত অভ্যাসগুলি লোপ পায়।

১৬। সহজ প্রবৃত্তি ও অভ্যাস

আপাতদৃষ্টিতে অভ্যাস ও সহজ প্রবৃত্তির মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে বলিয়া মনে হয় না, কারণ উভয় প্রকারের ক্রিয়াই স্বতঃবৃত্তভাবে সম্পন্ন হয়। কিন্তু আসলে সহজ প্রবৃত্তি এবং অভ্যাস একজাতীয় স্বতঃবৃত্ত ক্রিয়া নয়। সহজ প্রবৃত্তি এবং অভ্যাসের **সাদৃশ্য** এই যে উহারা উভয়েই জটিল ক্রিয়া, অর্থাৎ উহারা উভয়েই অনেকগুলি ক্রিয়া ধারাবাহিকভাবে সম্পন্ন হইবার ফলে কোনো উদ্দেশ্য সাধন করে।

উহাদের **পার্থক্যও** লক্ষণীয়। সহজ প্রবৃত্তি সহজাত বা জন্মগতভাবে স্বতঃবৃত্ত। কিন্তু অভ্যাস প্রাথমিকভাবে বা মুখ্যভাবে ঐচ্ছিক। পুনঃপুনঃ অনুশীলনের ফলেই অভ্যাস স্বতঃবৃত্ত হইয়া দাঁড়ায়, অর্থাৎ অভ্যাস গৌণভাবে স্বতঃবৃত্ত। অথবা অভ্যাস প্রথমে ইচ্ছামূলক এবং পরে অনৈচ্ছিক, কিন্তু সহজ প্রবৃত্তি আদ্যোপান্ত অনৈচ্ছিক।

সহজ প্রবৃত্তির উপর অভ্যাসের প্রভাব একটি বিচার্য বিষয়। সহজ প্রবৃত্তি এবং অভ্যাসের সম্বন্ধ বিষয়ে জেম্‌স্‌ দুইটি নিয়মের উল্লেখ করিয়াছেন। (১) অভ্যাসের ফলে সহজ প্রবৃত্তি নিরুদ্ধ (inhibited) হয়, অর্থাৎ উহার প্রকাশ সঙ্কুচিত (restricted) হয়।

(২) সহজ প্রবৃত্তির **অস্থায়িতাও** অভ্যাসের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।[১]

ম্যাকডুগ্যাল্‌ সহজ প্রবৃত্তির উপর অভ্যাসের প্রাধান্য অস্বীকার করেন। তাঁহার মতে সহজ প্রবৃত্তি অভ্যাস অপেক্ষা বেশী শক্তিশালী, সুতরাং প্রথমটি দ্বিতীয়টির দ্বারা প্রভাবিত হইতে পারে না।

১ ডবল্যু. জেম্‌স্‌—প্রিনসিপ্‌ল্‌স্‌ অফ্‌ সাইকোলজি—প্রথম খণ্ড, ৪র্থ পরিচ্ছেদ।

অনুশীলনী (Exercise)

1. Define instinct and explain it with examples.
(Ans : pp. 138—141)
দৃষ্টান্ত সাহায্যে সহজ প্রবৃত্তির সংজ্ঞা আলোচনা কর।

2. State the main classes of intinct and give an example of each.
(Ans : pp. 141—143)
প্রত্যেকটির দৃষ্টান্ত সাহায্যে সহজ প্রবৃত্তির শ্রেণীভেদ বুঝাও।

3. Explain the psychological as distinguished from the biological theory of instinct. (Ans : pp. 143—144 ; 146—146)
সহজ প্রবৃত্তির মনোবৈজ্ঞানিক এবং জীববৈজ্ঞানিক মতদ্বয়ের পার্থক্য নির্ণয় কর।

4. Are instincts blind ? Explain the relation of instinct and intelligence. (Ans : pp. 148—151)
সহজ প্রবৃত্তি অন্ধ কি ? ইহার সহিত বুদ্ধির সম্বন্ধ আলোচনা কর।

5. State how McDougall defines instinct. How does he relate it to emotion ? Do you agree with his view ?
(Ans : pp. 152 ; 155—157)
ম্যাকডুগ্যাল প্রদর্শিত সহজ প্রবৃত্তির সংজ্ঞা কি ? তাঁহার মতানুযায়ী সহজ প্রবৃত্তি এবং প্রক্ষোভের সম্বন্ধ আলোচনা কর এবং এই বিষয়ে তোমার মত ব্যক্ত কর।

6. Define habit and distinguish it from voluntary action.
(Ans : p. 158)
অভ্যাসের সংজ্ঞা এবং ঐচ্ছিক ক্রিয়ার সহিত ইহার পার্থক্য আলোচনা কর।

7. How is habit formed ? State the rules of habit formation. What are the uses of habit formation ?
(Ans : pp. 159—160)
কিরূপে অভ্যাস গঠিত হয় ? অভ্যাস গঠনের নিয়ম উল্লেখ কর। অভ্যাস গঠনের উপকারিতা কি ?

8. Explain the physiological basis of habit. Briefly explain the relation of habit to instinct. (Ans : pp. 160—161)
অভ্যাসের শারীরবৃত্তীয় ভিত্তি ব্যাখ্যা কর এবং অভ্যাসের সহিত সহজ প্রবৃত্তির সম্বন্ধ সংক্ষেপে আলোচনা কর।

নবম পরিচ্ছেদ
ঐচ্ছিক ও অনৈচ্ছিক ক্রিয়া
(Voluntary and Nonvoluntary Actions)

ক্রিয়া দুই প্রকার, যথা ঐচ্ছিক (Voluntary) এবং অনৈচ্ছিক (Non-voluntary)। যে ক্রিয়া স্বেচ্ছায় করা হয়, তাহাকে ঐচ্ছিক ক্রিয়া, এবং যে ক্রিয়া ইচ্ছা না করিয়া করা হয়, তাহাকে অনৈচ্ছিক ক্রিয়া বলে। যেহেতু এই দুই প্রকার ক্রিয়াই 'ইচ্ছা'-র সহিত সংশ্লিষ্ট, 'ইচ্ছা' কথাটির অর্থ জানা দরকার।

১। ইচ্ছা কথাটির অর্থ

ইচ্ছার তিনটি অর্থঃ

ইচ্ছা (Conation) কথাটি **তিনটি অর্থে** ব্যবহৃত হয়, যথা ব্যাপকতর, ব্যাপক এবং সঙ্কীর্ণ। **ব্যাপকতর অর্থে** যে কোনো ক্রিয়াই ইচ্ছামূলক। ইচ্ছা কথাটি সাধারণতঃ এইরূপ অর্থে গৃহীত হয় না। **ব্যাপক অর্থ** অনুসারে স্বতঃসঞ্জাত (automatic) বা সহজ ক্রিয়া হইতে আরম্ভ করিয়া, উচ্চ স্তরের সংকল্প (will) বা স্পষ্ট উদ্দেশ্যমূলক ক্রিয়া পর্যন্ত সকল ক্রিয়াই ইচ্ছার অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু **সঙ্কীর্ণ অর্থে** ইচ্ছা সহজ ক্রিয়া বুঝায় না, বুঝায় শুধু সেই সকল ক্রিয়া যেগুলি সংজ্ঞান বা স্পষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের দিকে পরিচালিত।

ব্যাপক অর্থে অনৈচ্ছিক (non-voluntary) ক্রিয়াও ইচ্ছার অন্তর্ভুক্ত। সঙ্কীর্ণ অর্থে শুধু ঐচ্ছিক বা সজ্ঞান উদ্দেশ্যমূলক এবং সঙ্কল্পিত ক্রিয়াই ইচ্ছা।

তাহা হইলে ব্যাপক অর্থে ইচ্ছা (Conation) দুই প্রকার, যথা (১) অনৈচ্ছিক ক্রিয়া (non-voluntary action) এবং (২) ঐচ্ছিক ক্রিয়া (voluntary action)।

(১) **অনৈচ্ছিক ক্রিয়া** বলিতে বুঝায় স্বতঃক্রিয়, স্বতঃবৃত্ত বা অক্রম গতি (automatic, random or spontaneous movement), প্রতিবর্ত গতি (reflex movement), সহজ প্রবৃত্তি (instinct), ভাবগতি ক্রিয়া (ideomotor action) এবং অভ্যাস (habit)।

(২) **ঐচ্ছিক ক্রিয়া** সেই ক্রিয়া যাহা অভাব বা অস্বস্তিকর অনুভূতি হইতে জন্মে, যাহাতে ঐ অনুভূতি দূর করিতে পারে এমন কোনো বিষয় বা বস্তু সম্বন্ধে

ধারণা থাকে এবং উহা লাভ করিবার জন্ম আকাঙ্ক্ষা জাগে। তাহা ছাড়া, অধিকাংশ স্থলেই ঐচ্ছিক ক্রিয়ায় একাধিক আকাঙ্ক্ষার দ্বন্দ্ব (conflict) উপস্থিত হয়। বিরোধী আকাঙ্ক্ষাগুলির দোষগুণ বিচার (deliberation), একটি আকাঙ্ক্ষার নির্বাচন (selection) এবং নির্বাচিত আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণ করিবার সঙ্কল্প (determination) ঐচ্ছিক ক্রিয়ার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য। শুধু এইগুলিই নয়। ঐচ্ছিক ক্রিয়ার ধর্ম বাস্তব ক্রিয়ায় পরিণত হওয়া এবং বাহিরের জগতে অথবা ব্যক্তির আচরণে পরিবর্তন ঘটানো।

২। ঐচ্ছিক ক্রিয়া কাহাকে বলে

ঐচ্ছিক ক্রিয়া (Voluntary movement) বলিতে বুঝায় এইরূপ আত্ম-নিয়ন্ত্রিত (Self-controlled) এবং আত্মসচেতন (Self conscious) ক্রিয়া, যাহা কোনো উদ্দেশ্যের ধারণা এবং ঐ উদ্দেশ্য লাভ করিবার ইচ্ছা লইয়া করা হয়। অথবা, **স্বাধীন ইচ্ছা হইতে যে ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, যাহা কর্তার নিজ ইচ্ছার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং যাহা কোন উদ্দেশ্য লাভের জন্য সজ্ঞান ভাবে সম্পন্ন হয় তাহাই ঐচ্ছিক ক্রিয়া।** ঐচ্ছিক ক্রিয়ার একটি প্রধান লক্ষণ হইল স্বাধীন নির্বাচন (Free choice)। কোনো ক্রিয়া স্বেচ্ছায় করিবার অর্থ, একাধিক কাজ করিবার সম্ভাবনা আছে এমন অবস্থায় অন্যান্য সম্ভব কাজগুলি বর্জন করিয়া একটি কাজকেই কর্তব্য বলিয়া বাছিয়া লওয়া। অনেকগুলি কামনার দ্বন্দ্ব (Conflict of desires) বা সংঘাত না থাকিলে ঐচ্ছিক ক্রিয়ার কোনো অর্থ হয় না। যেমন ধরিয়া লওয়া হইল যে, ক, খ এবং গ এই তিনটি কামনা অথবা সম্ভব কাজ একই সময়ে মনকে অধিকার করিয়াছে। এইরূপ ক্ষেত্রে মন একই সময়ে বিভিন্ন পথে পরিচালিত হইতে চাহিয়া সাময়িকভাবে নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে। বিভিন্ন কামনা একত্র পরিতৃপ্ত হইতে পারে না। সুতরাং ইহাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। বিচার শক্তির (Deliberation) সাহায্যে ক, খ এবং গ এই তিনটি কামনা পরিতৃপ্তির ফলে কোন্ উদ্দেশ্য সাধিত হয়, অথবা উহাদের দোষ এবং গুণ কি, এইরূপ তুলনামূলক আলোচনা করিয়া যে কামনাটি গ্রহণীয় বলিয়া মনে হয় সেইটিই নির্বাচিত হয় এবং অন্য কামনাগুলি বর্জিত হয়।

ঐচ্ছিক ক্রিয়ার আর একটি লক্ষণ দায়িত্ব-বোধ (Sense of responsibility)। যে কামনা বা ইচ্ছাটি স্বাধীন ইচ্ছায় কার্যে পরিণত করা হয়, তাহার ফলাফল যাহাই হউক না কেন, কর্তা উহার জন্য নিজেকে সম্পূর্ণভাবে দায়ী বলিয়া অনুভব করেন।

আবার ইচ্ছা করিয়া কোনো কাজ করিবার অর্থ ঐ কাজটিকে কর্তব্য বলিয়া মনে

করা। অথবা ঐচ্ছিক ক্রিয়ার সহিত **কর্তব্যবোধ** জড়িত থাকে। কোনো কাজ স্বেচ্ছায় করিবার অর্থ উহা ভাল বলিয়া মনে করা, এবং উহা ভাল বলিয়া মনে করার অর্থ উহা উচিত বলিয়া মনে করা।

আবার ঐচ্ছিক ক্রিয়ার আরও তাৎপর্য এই যে শুধু ক্রিয়াটিই যে ইচ্ছাকৃত তাহা নয়, কিন্তু ইহা করিতে হইলে যে সকল উপায় অবলম্বন করিতে হইবে সেইগুলিও স্বীকৃত। কেহ যদি ইচ্ছা করেন যে তিনি দেশের সেবা করিবেন, তাহা হইলে এই উদ্দেশ্য-সাধনের প্রতিকূল অবস্থার বিরোধিতা করা এবং অনুকূল অবস্থার সাহায্য লওয়া এইরূপ ইচ্ছার অঙ্গীভূত।

ঐচ্ছিক ক্রিয়ার সকল ফলই যে ভাল তাহা নয়। দেশসেবার ফলে নিজের এবং পরিজনবর্গের ভাগ্যে অনেক লাঞ্ছনা ঘটিতে পারে। এই ফলগুলি তাঁহার উদ্দেশ্য নয়। তাঁহার উদ্দেশ্য হইল দেশের কল্যাণরূপ ফললাভ।

দেশসেবক যে শেষোক্ত বাঞ্ছিত ফলই ইচ্ছা করেন তাহা নয়, কিন্তু পূর্বোক্ত অবাঞ্ছিত ফলগুলিও ইচ্ছা করিয়া বরণ করেন।

৩। ঐচ্ছিক ক্রিয়ার বিশ্লেষণ

অনেক মনোবিদের মতে ঐচ্ছিক ক্রিয়া একটি মৌলিক মানসবৃত্তি। কিন্তু এইরূপ মত গ্রহণীয় হইলেও, ঐচ্ছিক ক্রিয়ার বিশ্লেষণ সম্ভব। এই বিশ্লেষণ উহার বিভাগ নয়, কিন্তু দিগ্‌দর্শন অথবা নানা দিক্ বা স্তর হইতে আলোচনা।

(১) ঐচ্ছিক ক্রিয়ার মূল ভিত্তি বা **উৎস** (Spring of action) **অভাব-বা প্রয়োজন-বোধ**। অভাববোধের **যান্ত্রিক কারণ** হয়ত দেহযন্ত্রের পুষ্টির চাহিদা। কিন্তু **মানস দিক** হইতে অভাব একটি অস্থিরতা বা অস্বস্তির আকারে অনুভূত হইয়া থাকে। অস্বস্তি বা অস্থিরতাবোধের ধর্ম অঙ্গীকে (Organism) বা মনকে উহা দূর করিবার জন্ম চঞ্চল করিয়া তোলা। কর্মচাঞ্চল্য অভাববোধ হইতেই উৎপন্ন হয়। এই কারণে অভাববোধকে কর্মের উৎস (Spring of action) বলে।

(২) অস্বস্তিবোধের অস্থিরতার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চতর প্রাণীর, বিশেষ করিয়া মানুষের, ঐ অভাব সম্বন্ধে **চেতনা** থাকে। স্টাউট্ বলিয়াছেন যে এমন কি নিম্নতর প্রাণীর সহজ ক্রিয়াতেও অস্পষ্ট চেতনা থাকে। তাঁহার মতে ক্রিয়ার অন্তিম বা সুদূর (remote) উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নিম্নতর প্রাণীর চেতনা না থাকিলেও, উহার আসন্ন বা নিকট (proximate) উদ্দেশ্য সম্বন্ধে চেতনা থাকে। যে বস্তু বা উদ্দেশ্য লাভ

করিলে ঐ অস্বস্তিবোধ নিবারিত হইতে পারে, তাহার **ধারণা বা জ্ঞান** থাকা স্বাভাবিক।

(৩) অস্বস্তি বা অভাববোধ দূরীকরণে সহায়ক বস্তু বা উদ্দেশ্যের ধারণা হইবার সঙ্গে সঙ্গে উহা লাভ করিবার **কামনা** (desire) জাগে। কামনার একটি বিশেষ লক্ষ্য হইল অভাববোধ দূর করিবার সহায়তা করা।

(৪) কামনা অস্পষ্ট চেতনা এবং অন্ধভাবে নানাবস্তুর দিকে পরিচালিত। ফলে, একটি কামনার সহিত অনেক কামনা জাগিয়া ওঠে এবং এই **কামনাগুলির মধ্যে বিরোধ বা দ্বন্দ্ব** (Conflict of desire) দেখা দেয়।

একটি কামনার সহিত অপর একটির দ্বন্দ্ব ঘটিলে, ক্রিয়া ব্যাহত হয়। এই অবস্থা নিরসনের জন্য বিবেচনার (Deliberation) প্রয়োজন হয়। বিভিন্ন কামনার মধ্যে কোন্‌টি পরিতৃপ্ত হইলে কিরূপ সুফল বা কুফল লাভ হয়, অথবা কোন্‌টির কি গুণ বা দোষ, এইরূপ **তুলনামূলক বিচারই বিবেচনা বা ডেলিবারেশন্‌**।

(৫) বিভিন্ন কামনা-পরিতৃপ্তির দোষ গুণ বিবেচনার ফলে স্থির হইয়া যায় যে একটি কামনার পরিতৃপ্তি হইলেই, বাঞ্ছিত উদ্দেশ্য সাধিত হইবে। এইরূপ নিশ্চয়তা-বোধ হইলেই কামনাদ্বন্দ্বের অবসান ঘটে। উদ্দেশ্যসাধনের প্রতিকূল কামনাগুলি বর্জন করিয়া উহার অনুকূল কামনাটির গ্রহণকে **স্বাধীন নির্বাচন** (free choice) বলে। স্বাধীন নির্বাচন ঐচ্ছিক ক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ।

(৬) নির্বাচনের সঙ্গে সঙ্গে কোন্ কামনাটি পূর্ণ করিতে হইবে তাহার নিশ্চিত মীমাংসা হইয়া যায় এবং উহাকে কার্যে পরিণত করিবার স্থির সঙ্কল্প জাগে। **স্থির সঙ্কল্পকেই** (determination, resolve) **ইচ্ছা** (will) **বলে**। ইচ্ছার চেতনায় থাকে **স্বাতন্ত্র্যবোধ বা আত্ম-নিয়ন্ত্রণবোধ**। স্বাধীন চেতনাই ঐচ্ছিক ক্রিয়ার সারভূত লক্ষণ। আত্ম-নিয়ন্ত্রণবোধ বা স্বাধীন চেতনার সহিত জড়িত থাকে দায়িত্ববোধ।

ঐচ্ছিক ক্রিয়ার উপরোক্ত স্তরগুলি **মানস** (mental) বা **আন্তর** (Internal)। মানস স্তরগুলির জ্ঞান হয় অন্তর্দর্শনের সাহায্যে। বাহ্য পর্যবেক্ষণ (observation) ইহাদের জ্ঞানলাভে সহায়তা করে না। কিন্তু ঐচ্ছিক ক্রিয়া এই মানস স্তরগুলি অতিক্রম করিয়া কার্যে পরিণত হয়। মনের বেগ বা শক্তি বাহিরে প্রকাশিত হইতে চায়। ফলে অন্তঃযন্ত্রের মধ্যে নানা পরিবর্তন ঘটে। হয়ত পেশী শক্ত ও সবল হইয়া ওঠে, গ্রন্থিগুলি উহাদের শক্তিশালী রস বা পদার্থ নিঃসরণ করিতে থাকে। হয়ত

শরীরযন্ত্রে চাপ অনুভূত হয়, যাহার ফলে শরীর আর নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকিতে পারে না, কিন্তু সক্রিয় হয়। শরীরের অন্যান্য অন্তঃযন্ত্র, যেমন হৃদ্‌যন্ত্র, ফুসফুস, যকৃৎ প্রভৃতি, কর্মচঞ্চল হইয়া ওঠে। ঐচ্ছিক ক্রিয়ার সহিত জড়িত এইরূপ পরিবর্তনগুলিকে উহার **অন্তঃযন্ত্রীয়** (organic, intra-organic) স্তর বলা যায়।

অন্তঃযন্ত্রীয় স্তরের চাঞ্চল্য বাহ্য বা বাস্তব ঐচ্ছিক ক্রিয়ার প্রস্তুতি। এইগুলির ফলে যে বাস্তব ঐচ্ছিক ক্রিয়া সম্পন্ন হয় উহাকে ঐচ্ছিক ক্রিয়ার বাহ্য স্তর (external, extra-organic) বলা যাইতে পারে। ইহা পর্যবেক্ষণযোগ্য।

৪। প্রেষক (Motive)

প্রেষণা সেই শক্তি যাহা ঐচ্ছিক ক্রিয়াকে কার্যে প্রেরণ বা প্রেষণ করে। অথবা, ঐচ্ছিক ক্রিয়াকে যে শক্তি কার্যে পরিণত করে তাহাকে উহার প্রেরক বা প্রেষক বলে।

ঐচ্ছিক ক্রিয়ার প্রেরক বা **প্রেষক** কি ? কোনো অভাব বা প্রয়োজনবোধ এবং তজ্জনিত অস্বস্তি বা অস্থিরতাই ঐচ্ছিক ক্রিয়ার প্রেরক বা প্রেষক।

প্রেষকের উপরোক্ত ব্যাখ্যা **বেদনামূলক** (affective)। ইহার ফলে প্রেষণা ব্যক্তিগত অস্বাচ্ছন্দ্য বা অস্বস্তিবোধে পরিণত হয়। বেদনা **নিষ্ক্রিয়**। নিষ্ক্রিয় বেদনাকে ঐচ্ছিক ক্রিয়ার উৎস বলিয়া স্বীকার করা যায় না। বেদনা বড়জোর সুখে হাসাইতে অথবা দুঃখে কাঁদাইতে পারে, কিন্তু সক্রিয় করিতে পারে না। দুঃখীর দুঃখ দেখিয়া শুধু বিষন্ন হইয়া থাকিলেই দুঃখ নিবারণ হয় না। দুঃখীর দুঃখ নিবারণ করা একটি ক্রিয়া, শুধু বেদনা নয়।

তাহা হইলে, শুধু বেদনাকে ঐচ্ছিক ক্রিয়ার প্রেষক বা প্রেরক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। ঐচ্ছিক ক্রিয়ার উৎস হিসাবে বেদনা শুধু নিষ্ক্রিয় বেদনা মাত্র নয়, কিন্তু ক্রিয়া-প্রবণতাও বটে। ইহাকে অস্বস্তিবোধ নিবারণের ক্রিয়াপ্রবণতাও বলিতে হয়। আবার ইহা শুধু বেদনামূলক এবং ক্রিয়াত্মকই নয়, কিন্তু জ্ঞানাত্মক বা অবগতিমূলকও বটে। অস্বস্তিবোধের সঙ্গে সঙ্গে কোন্ বস্তু লাভ করিলে উহা দূর হইবে সেই সম্বন্ধে জ্ঞানও অনিবার্য।

সুতরাং **প্রেষক (Motive) একাধারে বেদনা, ক্রিয়া এবং অবগতিমূলক**। অর্থাৎ অস্বস্তি-অনুভূতি, উহা দূর করিবার আবশ্যক জ্ঞান এবং ঐ জ্ঞানকে কার্যে পরিণত করিবার ক্রিয়া এই তিনটি মিলিত হইয়াই ইচ্ছার প্রেরক, প্রেষক বা মোটিভ্ গঠন করে।

আসলে প্রেষক বা মোটিভ্ বলিতে নির্বাচিত কামনা বুঝায়। কামনা-

গুলির দ্বন্দ্ব চলিতে থাকিলে নিষ্ক্রিয় অবস্থা ঘটে। নির্বাচিত কামনা নিষ্ক্রিয়তা দূর করিয়া সক্রিয়তা ঘটায়। অতএব **নির্বাচিত কামনাই (chosen desire) প্রেষক বা মোটিভ্‌**।

অন্যদিক দিয়া বলা যায়, যে **উদ্দেশ্য** লাভ করিলে নির্বাচিত কামনাটি পরিতৃপ্ত হইবে, তাহার চেতনা বা ধারণাই ঐচ্ছিক ক্রিয়ার প্রেষক বা মোটিভ্‌। উদ্দেশ্যের ধারণাই বিবেচনার সাহায্যে স্পষ্ট হইয়া ঐচ্ছিক ক্রিয়ার প্রেষণা বা প্রেরণা যোগায়।

ঐচ্ছিক ক্রিয়ার প্রেষক বা মোটিভ্‌ শুধু উদ্দেশ্যের ধারণাই নয়, কিন্তু এই ধারণাকে বাস্তবে পরিণত করিবার প্রবণতাও বটে। ধারণাটি পিছন হইতে ঐচ্ছিক ক্রিয়াকে তাড়না করে, আবার উহাকে কার্যে পরিণত করিবার প্রবৃত্তিটি সম্মুখ হইতে উহাকে আকর্ষণ করে।

যে উদ্দেশ্য লাভ করিবার জন্য ঐচ্ছিক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তাহাই উহার মোটিভ্‌ বা প্রেষক। কিন্তু উদ্দেশ্য সাধনের ইচ্ছা হইলেই, প্রকারান্তরে উদ্দেশ্য সাধনের উপায় এবং ফলাফল স্বীকার করিয়া লওয়া হয়। পিতা পুত্রের মঙ্গল কামনায় পুত্রকে শাস্তি দিয়া প্রকারান্তরে বা গৌণভাবে পুত্রের কষ্টও কামনা করেন। অস্ত্রচিকিৎসক সদুদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য রোগীর দেহে অস্ত্রোপচার, রক্তপাত, এমন কি প্রকারান্তরে রোগীর মৃত্যুও কামনা করেন। পুত্রের মঙ্গল সাধন এবং রোগীর নিরাময়ই যথাক্রমে পিতার এবং চিকিৎসকের মোটিভ্‌ বা উদ্দেশ্য। কিন্তু এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পিতা এবং চিকিৎসক যে উপায় অবলম্বন করেন এবং যে সকল জ্ঞাত ও অজ্ঞাত ফলের জন্য প্রস্তুত থাকেন, সেইগুলি তাঁহাদের উদ্দেশ্য নয়, তথাপি অভিপ্রায়ের অঙ্গীভূত। সুতরাং যে উদ্দেশ্যসাধনের জন্য ঐচ্ছিক ক্রিয়া ঘটে, তাহাই উহার প্রেষক বা মোটিভ্‌। কিন্তু যে সকল বাঞ্ছিত বা অবাঞ্ছিত উপায় এবং ফলাফল ঐ উদ্দেশ্য সাধনের সহিত জড়িত থাকে, তাহা উহার উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু অভিপ্রায় অথবা ইন্‌টেন্‌শন্‌।

উদ্দেশ্য এবং অভিপ্রায় অভিন্ন নয়। উদ্দেশ্য বুঝায় সেই লক্ষ্য বা বস্তু, যাহা লাভ করিবার জন্য ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ইহাতে লক্ষ্যে পৌঁছাইবার জন্য অবলম্বিত উপায় এবং ফলাফল অন্তর্ভুক্ত নয়। কিন্তু **অভিপ্রায় বলিতে বুঝায় যে উদ্দেশ্যে ক্রিয়া সম্পন্ন হয় তাহা, উদ্দেশ্যলাভের অবলম্বিত উপায় এবং উহার ফলাফল**। অথবা **যে জন্য** ক্রিয়া সম্পন্ন হয় তাহাই উদ্দেশ্য এবং **যাহা সত্ত্বেও** ক্রিয়া সম্পন্ন হয় তাহাও অভিপ্রায়ের অঙ্গীভূত।

৫। কামনা, আকাঙ্ক্ষা ও ইচ্ছা

কামনা (Desire) ইচ্ছার নিম্নতর স্তর। ইচ্ছায় সঙ্কল্পবোধ আছে, কিন্তু কামনায় তাহা নাই। কামনা-দ্বন্দ্বের অবসান না হইলে ইচ্ছা উৎপন্ন হয় না। সুতরাং কামনার তুলনায় ইচ্ছা উন্নততর মানসবৃত্তি।

অভাব বা প্রয়োজনবোধ হইতে কামনা জন্মে। কিন্তু কামনা শুধু প্রয়োজন বা অভাববোধ মাত্র নয়। অভাববোধে উহার বস্তু সম্বন্ধে চেতনা থাকে কিনা সন্দেহ, থাকিলেও, সেই চেতনা অত্যন্ত অস্পষ্ট। কিন্তু কামনায় উহার **বস্তু সম্বন্ধে স্পষ্টতর চেতনা** থাকে। আবার কামনায় উহার বস্তু সম্বন্ধে যে চেতনা থাকে তাহা অন্ধ অভাববোধের তুলনায় স্পষ্টতর হইলেও, ইচ্ছা বা সঙ্কল্পের তুলনায় অস্পষ্ট।

একই সময়ে অনেকগুলি **কামনার দ্বন্দ্ব** ঘটিতে পারে। কাহারও হয়ত আহার করিবার কামনা হইয়াছে, কিন্তু সে কি আহার করিতে চায় সেই সম্বন্ধে স্পষ্ট জ্ঞান নাই। শিশু হয়তো একটি ভালো জামা চায়, কিন্তু সে ঠিক কোন্ জামাটি চায় সেই বিষয়ে তাহার স্পষ্ট জ্ঞান প্রায়ই থাকে না। নিছক অভাববোধের স্তরে দ্বন্দ্ব ঘটে না। কিন্তু কাম্য বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান, অথচ স্পষ্ট জ্ঞান না থাকায়, একটি কামনার সহিত অপর কামনার দ্বন্দ্ব বা বিরোধ ঘটে। নিছক অন্ধ শক্তি ইহাকে অনিবার্য আত্মতৃপ্তির দিকে ছুটাইয়া লয়। কামনা এইরূপ অনিবার্য পরিতৃপ্তির পথে ছুটিতে পারে না। কারণ ইহাতে বস্তুর অস্পষ্ট চেতনা থাকে, যাহা অন্ধ আবেগে থাকে না। ফলে, কামনায় দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয় এবং দ্বন্দ্বের অবসান না হওয়া পর্যন্ত কামনা কার্যকরী হইতে পারে না।

কামনা দ্বন্দ্বের কারণ এই যে কর্তা নিজেকে কোন্ কামনাটির সহিত মানাইয়া লইবেন তাহা বুঝিতে পারেন না। কামনা সমগ্র ব্যক্তিত্বের বা চরিত্রেরই অংশ। কোন্ কামনাটি ব্যক্তিত্বের বা চরিত্রের সহিত খাপ খায় সেই সম্বন্ধে স্পষ্ট জ্ঞানের অভাবই কামনা-দ্বন্দ্বের কারণ। সন্তান সম্বন্ধে পিতৃত্ব স্বভাবটির সহিত যে কামনা শোভা পায় না, তাহাতে আকর্ষণ বোধ করিলেও, হয়ত পিতা তাহা চরিতার্থ করেন না। সত্যবাদী বা সদাশয় ব্যক্তি সেইরূপ কামনাকেই প্রশ্রয় দিতে পারেন, যাহার পরিতৃপ্তি তাঁহার চরিত্রের সহিত মানায়। কিন্তু কামনা যে স্তরের ইচ্ছা, তাহাতে চরিত্রের সহিত উহার সামঞ্জস্য আছে বা নাই, এইরূপ উচ্চতর জ্ঞান থাকে না। সেইজন্য একটি কামনার সহিত অন্যান্য কামনার দ্বন্দ্ব বা বিরোধ লাগিয়া যায়।

আকাঙ্ক্ষা (Wish)

আকাঙ্ক্ষা, কামনা এবং ইচ্ছার মধ্যবর্তী একটি ক্রিয়াত্মক অবস্থা। সুতরাং কামনার সহিত আকাঙ্ক্ষার একটু পার্থক্য আছে, যদিও কামনা এবং আকাঙ্ক্ষা প্রায়ই সমার্থকরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কামনা ও আকাঙ্ক্ষা (Desire and Wish)

কামনা এবং আকাঙ্ক্ষা উভয়ই ক্রিয়াত্মক বৃত্তি। কিন্তু কামনা অন্তর্বিরোধের জন্য কার্যকরী হইতে পারে না। ইহা কার্যকরী হইতে পারে তখনই, যখন উহার সহিত অন্য কামনার বিরোধ দূর হয়। আকাঙ্ক্ষা কামনার তুলনায় উচ্চতর ক্রিয়াত্মক বৃত্তি, কারণ ইহাতে আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর জ্ঞান বা চেতনা স্পষ্টতর। তাহা ছাড়া, আকাঙ্ক্ষা কার্যে পরিণত হইয়া থাকে।

কোনো বস্তুর প্রতি কামনা থাকিলেও, আকাঙ্ক্ষা না থাকিতে পারে। ক্ষুধার্ত ব্যক্তি খাদ্য কামনা করে, কিন্তু পূজা বা শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে খাদ্য আকাঙ্ক্ষা করে না, বরং স্বেচ্ছায় উপবাস করে। এই ব্যক্তি ধর্মকার্যকেই আকাঙ্ক্ষার বস্তু মনে করিয়া খাদ্য কামনাকে সংযত করিয়া রাখে। তাহা হইলে সকল **আকাঙ্ক্ষাই কামনা, কিন্তু সকল কামনা আকাঙ্ক্ষা নয়**। সেই কামনাকেই আকাঙ্ক্ষা বলে যাহা কার্যকরী হয়, অথবা কার্যে পরিণত হয়।

মনোবিদ্যায় প্রায়ই কামনা এবং আকাঙ্ক্ষার উল্লিখিত পার্থক্য ধরা হয় না। আবার যে সকল মনোবিদ্ ইহাদের পার্থক্য স্বীকার করেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বিপরীতভাবে ইহার ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। যেমন তাঁহারা মনে করেন যে কামনা এবং আকাঙ্ক্ষার মধ্যে প্রথমটিই দ্বিতীয়টির তুলনায় উচ্চতর।

ফ্রয়েড্-এর মত

ফ্রয়েড্ কামনার সহিত আকাঙ্ক্ষার ভেদ গ্রহণ করেন নাই, বরং এই দুইটিকে সমার্থকরূপে ব্যাখ্যা করিয়া আকাঙ্ক্ষা কথাটির প্রতি বেশী পক্ষপাতিত্ব দেখাইয়াছেন। তাঁহার মতে আকাঙ্ক্ষার বৈপরীত্যই (opposition of wishes) সকল ক্রিয়ার মূলশক্তি। একই আকাঙ্ক্ষা নির্জ্ঞান ও সংজ্ঞান মনে দুই রূপে প্রকাশ পায়। যে আকাঙ্ক্ষাটি সংজ্ঞানে ভালবাসা রূপে প্রকাশিত তাহারই অন্তর্নিহিত নির্জ্ঞান রূপ ঘৃণা। তিনি বলেন যে কতগুলি আকাঙ্ক্ষা মানুষের শিক্ষা, সমাজ এবং সংস্কারের বিরোধী। ইহারা অবদমিত হইয়া নির্জ্ঞান মনে নির্বাসিত হয় এবং সংজ্ঞান মনের সতর্কতা এড়াইয়া বিকৃতভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে সচেষ্ট থাকে।

ইচ্ছা বা সঙ্কল্প (Will)

আবার ইচ্ছা বা সঙ্কল্প আকাঙ্ক্ষা অপেক্ষা উচ্চতর ক্রিয়াত্মক বৃত্তি। আকাঙ্ক্ষায় বস্তুর স্পষ্ট জ্ঞান থাকে না। কিন্তু ইচ্ছা যে উদ্দেশ্য-সাধনে সক্রিয় হয়, **উহা** সেই **উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সজ্ঞান** থাকে। যে উদ্দেশ্যটি সাধন করিতে হইবে, তাহা কর্তার ব্যক্তিত্ব এবং চরিত্রের সহিত সুসমঞ্জস কি না, সেই জ্ঞান না থাকিলে, ঐচ্ছিক ক্রিয়া ঘটে না। ঐচ্ছিক ক্রিয়ায় কর্তার ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পায়। ঐচ্ছিক ক্রিয়া চরিত্রের নির্দেশক বা প্রকাশক। কর্তার ব্যক্তিত্ব এবং চরিত্র যেরূপ, তাহার ঐচ্ছিক ক্রিয়াও তদ্রূপ হইয়া থাকে। কর্তা কিরূপ উদ্দেশ্যসাধনে ইচ্ছুক হইবেন, তাহা নির্ভর করে তাঁহার ব্যক্তিত্ব এবং চরিত্রের উপর।

ঐচ্ছিক ক্রিয়ার অন্তর্দর্শন করিলে দেখা যায় যে ইহা সেই ক্রিয়া যাহাতে কর্তা পূরণীয় উদ্দেশ্যের ভাল-মন্দ অথবা ন্যায়-অন্যায় বিচার করিয়া, উদ্দেশ্যসাধনের উপায় সম্বন্ধে চেতন হইয়া এবং উহার ফলাফলের সকল দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া সক্রিয় হন।

ঐচ্ছিক ক্রিয়া **সহজাত নয়।** ইহা কোনো উদ্দীপকের সাক্ষাৎ বা ত্বরিত ফল নয়, কিন্তু কতগুলি মধ্যবর্তী স্তরের সাহায্যে উহার বিলম্বিত ফল। অর্থাৎ, উদ্দীপনা ঘটিবার সঙ্গে সঙ্গেই ঐচ্ছিক ক্রিয়া ঘটে না। উদ্দীপক ও ঐচ্ছিক ক্রিয়ার মধ্যে কামনা-দ্বন্দ্ব, বিবেচনা, স্বাধীন নির্বাচন প্রভৃতি ব্যাপারগুলি ঘটিবার পর ইহা ঘটে। এই ব্যাপারগুলির উপর ঐচ্ছিক ক্রিয়া নির্ভর করে বলিয়াই উহা উদ্দীপক উপস্থিত হইবারও কিছুকাল পরে ঘটে।

ইচ্ছা অথবা উইল্‌কে সকল মনোবিদ্‌ মৌলিক মানসবৃত্তি বলিয়া স্বীকার করেন নাই। ইঁহাদের মতে ইচ্ছা একটি যৌগিক মানসবৃত্তি। ইচ্ছাকে বিশ্লেষণ করিলে পাওয়া যায় অনুভূতি বা প্রক্ষোভেরই (emotion) একটি বিশেষ আকার বা প্রকার। যেমন হ্বুণ্ড্‌ মনে করেন যে ইচ্ছা অনুভূতি বা প্রক্ষোভের কালিক সংগঠন মাত্র; ইহাতে সঙ্কল্প বা সমাধানকালে প্রক্ষোভের একটি আকস্মিক পরিবর্তন ঘটে। সুতরাং এই মতে ইচ্ছা বা সঙ্কল্পকে পৃথক মানসবৃত্তি বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

৬। ঐচ্ছিক ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য—উড্‌ওয়ার্থ-এর মত

উড্‌ওয়ার্থ্‌ ঐচ্ছিক ক্রিয়ার ছয়টি বৈশিষ্ট্য দেখাইয়াছেন।

(ক) ঐচ্ছিক ক্রিয়া **উদ্দেশ্যমুখী বা** Purposive। অর্থাৎ ঐচ্ছিক ক্রিয়া কোনো উদ্দেশ্যলাভের জন্য সাধিত হয়। এই উদ্দেশ্য সজ্ঞানভাবে অনুসরণ করাই ঐচ্ছিক ক্রিয়ার ধর্ম।

(খ) কোনো সজ্ঞান উদ্দেশ্যলাভের **জন্য সঠিক উপায় অবলম্বন** ঐচ্ছিক ক্রিয়ার আর একটি বৈশিষ্ট্য। উদ্দেশ্যটি উপেয় বা লক্ষ্য এবং নির্দিষ্ট উপায় অবলম্বিত না হইলে উদ্দেশ্য বা উপেয় সাধিত হয় না। ঐচ্ছিক ক্রিয়া নির্দিষ্ট উপায় অবলম্বন করিয়া উদ্দেশ্যলাভের পথে পরিচালিত হয়।

(খ) সহজ বা স্বতঃবৃত্ত এবং প্রতিবর্ত ক্রিয়ার মত ঐচ্ছিক ক্রিয়া **নির্দিষ্ট বা সীমাবদ্ধ নয়।** আগুনে হাত লাগিলে হাত সরাইয়া লওয়া হয়। এই প্রতিক্রিয়ায় কোনো বৈচিত্র্য বা নূতনত্ব নাই—ইহা নির্দিষ্ট এবং সীমাবদ্ধ। কিন্তু ঐচ্ছিক ক্রিয়া অর্জিত এবং বুদ্ধিমূলক ক্রিয়া। নূতন পরিস্থিতির সম্মুখীন হইলে, ঐচ্ছিক ক্রিয়ায় নূতন উপায় অবলম্বিত হয়। ঐচ্ছিক ক্রিয়া নূতন পরিস্থিতির সহিত নূতন সামঞ্জস্য বা উপযোজনা স্থাপন করে।

(ঘ) ঐচ্ছিক ক্রিয়ায় পরিস্থিতির সহিত **উপযোজনের তীব্রতা** নির্ভর করে ঐ পরিস্থিতির উপর। **পরিস্থিতি** জটিল হইলে, অথবা উদ্দেশ্যসাধনে বাধা উপস্থিত হইলে, ঐচ্ছিক ক্রিয়া তীব্র হইয়া ওঠে এবং বাধা অতিক্রম করিয়া উদ্দেশ্য সাধনে অগ্রসর হয়।

(ঙ) ঐচ্ছিক ক্রিয়ার উপযোজন যেমন তীব্র হইতে তীব্রতর হইতে পারে, তেমনই **প্রশস্ত হইতে প্রশস্ততর** হইতে পারে। উদ্দেশ্য সাধনে একটি উপযোজন ব্যর্থ হইলে, আর একটি, আবার ঐটি ব্যর্থ হইলে, আর একটি উপযোজন সাধিত হইতে পারে।

(চ) অবশ্য কতকগুলি অনৈচ্ছিক ক্রিয়াতেও, যেমন সহজ প্রবৃত্তিতেও, উপযোজনের প্রসারণ দেখা যায়। কিন্তু এই উপযোজন সজ্ঞানভাবে প্রসারিত হয় না। পক্ষান্তরে ঐচ্ছিক ক্রিয়ার উপযোজন **সজ্ঞানভাবে প্রসারিত** হইয়া থাকে।

৭। অনৈচ্ছিক ক্রিয়া কাহাকে বলে ?

যে ক্রিয়া ইচ্ছার উপর নির্ভর না করিয়া ঘটে, তাহাকে অনৈচ্ছিক ক্রিয়া বলে। যেমন, হাঁচি, কাশি, হাই তোলা, চোখের পাতার স্পন্দন, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস, রক্ত-চলাচল, নাড়ির স্পন্দন, যকৃৎ, ফুস্ফুস্, হৃদ্‌যন্ত্র প্রভৃতি আভ্যন্তরীণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ক্রিয়া, চোখে পোকা ঢুকিবে আশঙ্কায় চোখ বন্ধ করিয়া ফেলা, পাখীর বাসা নির্মাণ, পশুর শিকার-সন্ধান প্রভৃতি ক্রিয়াগুলি ইচ্ছার উপর নির্ভর না করিয়া ঘটে, সুতরাং ইহারা অনৈচ্ছিক।

অনৈচ্ছিক ক্রিয়ায়ও ঐচ্ছিক ক্রিয়ার মত অভাববোধ থাকে। কিন্তু অনৈচ্ছিক ক্রিয়ার অভাববোধ অস্পষ্ট। ঐ অভাব যে বস্তু লাভ করিলে দূর হইতে পারে, উহাকে সেই সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা থাকে না। তাহা ছাড়া, ঐচ্ছিক ক্রিয়ার দায়িত্ব এবং কর্তব্যবোধ অনৈচ্ছিক ক্রিয়ায় অনুপস্থিত। অনৈচ্ছিক ক্রিয়ায় কর্মের ফলাফল সম্বন্ধেও কোনো স্পষ্ট ধারণা থাকে না।

যে সকল ক্রিয়া ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঘটে সেইগুলি অনৈচ্ছিক কি? আবার যে সকল ক্রিয়া প্রথমে ইচ্ছাপূর্বক করা হয়, কিন্তু পুনঃপুনঃ অনুশীলনের ফলে অনৈচ্ছিক হইয়া দাঁড়ায়, অর্থাৎ **অভ্যাস,** অনৈচ্ছিক কি?

ইচ্ছার বিরুদ্ধে সংঘটিত ক্রিয়া ঐচ্ছিক। ইহাতে **ইচ্ছা-অনিচ্ছামূলক দ্বন্দ্ব** দেখা দেয়। ইহা অনৈচ্ছিক ক্রিয়ার মত সোজাসুজিভাবে অভাববোধ হইতেই উৎপন্ন হয় না। ইচ্ছা-বিরুদ্ধ ক্রিয়ায় কামনা-দ্বন্দ্ব থাকে। ইহাতে নির্বাচিত কামনাটি পূর্ণ না হইয়া অবাঞ্ছিত কামনা পূর্ণ হইয়া থাকে। কিন্তু **অভ্যাস প্রথমে ঐচ্ছিক, অনুশীলনের ফলে অনৈচ্ছিক।** ইহা প্রথমে ইচ্ছা করিয়া সম্পন্ন হইলেও, ভবিষ্যতে ইচ্ছার উপর নির্ভর না করিয়াই অনৈচ্ছিক ক্রিয়ার মত সম্পন্ন হয় এবং অনৈচ্ছিক বলিয়াই অনুভূত হয়। মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে এইরূপ ক্রিয়াকে অনৈচ্ছিক-অনৈচ্ছিক বলাই সঙ্গত।

অনৈচ্ছিক ক্রিয়ার গুরুত্ব অসীম। মানুষের বাঁচিয়া থাকা নির্ভর করে কতকগুলি অনৈচ্ছিক ক্রিয়ার উপর। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস, রক্ত চলাচল, নাড়ির গতি, হজম ক্রিয়া, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা, যৌন কামনা প্রভৃতি জৈব ক্রিয়াগুলি অনৈচ্ছিক। এই ক্রিয়াগুলি ব্যাহত হইলে ঐচ্ছিক ক্রিয়ার ভিত্তিমূল ধ্বসিয়া পড়ে।

অনৈচ্ছিক ক্রিয়াই ঐচ্ছিক ক্রিয়াই ভিত্তি। ঐচ্ছিক ক্রিয়ার মূল উৎস অভাববোধজনিত তাড়না। অভাববোধ দূর করিবার অনৈচ্ছিক তাড়না বা বেগ না থাকিলে ঐচ্ছিক ক্রিয়া, সম্ভব হয় না। ঐচ্ছিক ক্রিয়ার মূল মাল-মশলা বা উপাদান সংগৃহীত হয় অনৈচ্ছিক ক্রিয়া হইতে। একটি অনৈচ্ছিক আবেগ বা কামনার সহিত আর একটির সংঘাত উপস্থিত হইলেই ঐচ্ছিক ক্রিয়া সম্পাদনের সুযোগ উপস্থিত হইতে পারে। এইরূপ সংঘাত না থাকিলে কোনো ঐচ্ছিক ক্রিয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

৮। অনৈচ্ছিক ক্রিয়ার শ্রেণীভেদ

অনৈচ্ছিক ক্রিয়া প্রধানতঃ **স্বতঃক্রিয়, স্বতঃবৃত্ত** বা অক্রম গতি বা ক্রিয়া, **প্রতিবর্ত** গতি বা ক্রিয়া, **সহজ প্রবৃত্তি, ভাবগতি ক্রিয়া** এবং **অভ্যাস,** এই কয় শ্রেণীর।

স্বতঃক্রিয়, স্বতঃবৃত্ত এবং অক্রম গতি বা ক্রিয়াকে মোটামুটিভাবে সমার্থক বলিয়া ধরা হইলেও, ইহাদের পার্থক্য রহিয়াছে।

স্বতঃক্রিয় গতি (Automatic action) বলিতে বুঝায় দৈহিক জৈব ক্রিয়া। রক্ত চলাচল, শ্বাসপ্রশ্বাস, পরিপাক, নাড়ির গতি, যকৃৎ, প্লীহা প্রভৃতির কাজ, দেহমল নিঃসারণের কাজ, এক কথায় আভ্যন্তরীণ দৈহিক যন্ত্রগুলির কাজ, স্বতঃক্রিয় গতির উদাহরণ। এই ক্রিয়াগুলি আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে দেহযন্ত্রস্থ উদ্দীপকের দ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাদের স্বাভাবিক সম্পাদন ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে না।

অনেক মনোবিদ মনে করেন যে স্বতঃক্রিয় গতি প্রতিবর্ত ক্রিয়ার নামান্তর মাত্র। আবার কেহ কেহ এইগুলিকে অস্পষ্টভাবে উদ্দেশ্যমূলক বলিয়া মনে করেন। কেহ কেহ স্বতঃক্রিয় গতি হইতে স্বতঃবৃত্ত ক্রিয়াকে পৃথক করিয়া নির্দিষ্ট করিতে চাহেন।

অক্রম বা স্বতঃবৃত্ত ক্রিয়া (Random or Spontaneous movement) পরিলক্ষিত হয় শিশুর অকারণে বা খেলাচ্ছলে হাত পা ছোঁড়া, হাসি, কান্না প্রভৃতি ক্রিয়ার মধ্য দিয়া। এই জাতীয় ক্রিয়াগুলিও সম্পূর্ণ অনৈচ্ছিক। **কিন্তু উপরোক্ত দুই প্রকার ক্রিয়াকেই সাধারণভাবে স্বতঃবৃত্ত ক্রিয়া বলা হইয়া থাকে।**

যেহেতু স্বতঃবৃত্ত ক্রিয়া সম্পূর্ণ দৈহিক ক্রিয়ার ফল, সেই কারণে ইহাকে ক্রিয়া না বলিয়া গতি বলাই যুক্তিযুক্ত মনে হয়। কিন্তু **এইরূপ হইলে, স্বতঃবৃত্ত ক্রিয়াকে মনোবিদ্যার বিষয় মনে না করিয়া শারীরবৃত্তের বিষয়রূপে সীমাবদ্ধ রাখিতে হয়। টিশনার** বলেন যে যে গতির সহিত মানসবৃত্তি ঘটে, তাহাই ক্রিয়াপদবাচ্য। তাঁহার মতে স্বতঃবৃত্ত গতির সহিত মানসবৃত্তি ঘটিয়া থাকে বলিয়া ইহাও **মনোবিদ্যার বিষয়**। ইহারা যান্ত্রিক সংবেদনের দৈহিক কারণ। দ্বিতীয়তঃ, ইহাদের গতি অস্বাভাবিক হইলে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, মাথাঘোরা প্রভৃতি অসুস্থ সংবেদন অনুভূত হয়। তৃতীয়তঃ, ইহাদের ফলে বেদনা এবং অনুভূতি ঘটে। বুক ধড়ফড় করা, গলা শুকাইয়া যাওয়া, সমস্ত শরীরে কাঁটা দিয়া ওঠা প্রভৃতি স্বতঃবৃত্ত ক্রিয়াগুলি ভয়ের সহচর। আবার কতকগুলি যন্ত্রীয় স্বতঃবৃত্ত ক্রিয়া ক্রোধের সহকারী কারণ।

স্বতঃবৃত্ত ক্রিয়া অন্য দিক দিয়াও মনোবিদ্যায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। শিশুর প্রাথমিক হাত-পা ছোঁড়া বা সমগ্র-শরীর-সঞ্চালন বিশৃঙ্খল এবং উদ্দেশ্যহীন ক্রিয়া বলিয়া মনে হইতে পারে। একটি টুকটুকে লাল ফুল ধরিতে গিয়া শিশু হাত,

পা এবং অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ—এলোপাথাড়িভাবে আন্দোলিত করে। সে তাহার সর্বাঙ্গ দিয়া ফুলটিকে ধরিতে চায়। **এই অসংলগ্ন গতি হইতেই ক্রমে ক্রমে সুসংবদ্ধ ও সুশৃঙ্খল গতি বিকাশ লাভ করে।** আবার এই অসংলগ্ন ও বিশৃঙ্খল স্বতঃবৃত্ত ক্রিয়াগুলি শিশুর পেশী, স্নায়ু প্রভৃতির শক্তি ও সামর্থ্য বাড়াইয়া তোলে। স্বতঃবৃত্তঃ ক্রিয়াই শিশুর **উন্নততর ক্রিয়ার ভিত্তি**। সুতরাং স্বতঃবৃত্ত ক্রিয়া অনৈচ্ছিক হইলেও, ঐচ্ছিক ক্রিয়ার ভূমি প্রস্তুত করে।

কোনো কোনো মনোবিদ্ মনে করেন যে শিশুর অকারণ হাত পা ছোঁড়া, হাসি, কান্না প্রভৃতি স্বতঃবৃত্ত ক্রিয়াগুলি সম্পূর্ণ অনৈচ্ছিক হইলেও, অজ্ঞাত **উদ্দেশ্য সাধক**। যেমন কেহ কেহ বলেন যে এই সকল গতি বা ক্রিয়ায় শিশুর **অতিরিক্ত শক্তি** (Surplus energy) ব্যবহৃত হয়। আবার কেহ কেহ বলেন যে এই সকল গতির মধ্য দিয়া সেই সকল নিম্নস্তরীয় প্রাণীর ক্রিয়ার **পুনরাবৃত্তি** (Recapitulation) করে যে সকল স্তর সে ক্রমবিকাশের নিয়মে অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে। কাহারও বা মতে এই সকল গতির মধ্য দিয়া শিশু ভাবী জীবনের কাজের প্রস্তুতি (Rehearsal) লাভ করে।

স্বতঃবৃত্ত ক্রিয়ার কারণ প্রধানতঃ দৈহিক। দেহযন্ত্রের সঞ্চিত শক্তিই স্বতঃবৃত্ত ক্রিয়ার আকারে প্রকাশিত হয়। সুতরাং উহারা প্রতিবর্ত ক্রিয়ারই নামান্তর। স্বতঃবৃত্ত ক্রিয়ার উপরোক্ত **প্রতিবর্ত মতবাদ** (reflex theory) অনেকেই স্বীকার করেন না। ইঁহারা মনে করেন যে স্বতঃবৃত্ত ক্রিয়ার মূলে অথবা ইহার সঙ্গে সঙ্গে থাকে কোনো না কোনো মানস অবস্থা। যাহাকে আমরা সুস্থ রক্তসঞ্চালন, শ্বাস-প্রশ্বাস বা পরিপাক বলি, সেই সকল স্বতঃবৃত্ত ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘটে মানসিক আরাম বা স্বাতন্ত্র্য বোধ এবং ইহাদের অসুস্থ ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘটে মানসিক অস্বস্তি বা অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ। কেহ কেহ মনে করেন যে মস্তিষ্কের গতিকেন্দ্রে অতিরিক্ত শক্তি সঞ্চয়ের ফলে অস্বস্তি বা অস্বাচ্ছন্দ্য বোধই সকল প্রকার স্বতঃবৃত্ত ক্রিয়ার আনুষঙ্গিক লক্ষণ। সুতরাং এই ক্রিয়াকে শুধু দৈহিক না বলিয়া **মানসিকও** বলিতে হয়।

৯। প্রতিবর্ত ক্রিয়া (Reflex Action)

সপ্তম পরিচ্ছেদে প্রতিবর্ত ক্রিয়া সবিস্তারে এবং অষ্টম পরিচ্ছেদে আংশিকভাবে আলোচিত হইয়াছে। **প্রতিবর্ত বাহিরের অথবা ভিতরের উদ্দীপকপ্রসূত এক প্রকার দ্রুত, সহজ, নির্দিষ্ট এবং সাধারণ অনৈচ্ছিক প্রতিক্রিয়া, যাহাতে উদ্দেশ্যের কোনো চেতনা বা জ্ঞান থাকে না।** জানুর কাপালিকে আঘাতের ফলে জানুক্ষেপ (knee-jerk), অথবা আগুনের সহিত হাতের সংস্পর্শ হইলে হাত

সরাইয়া লওয়া, প্রতিবর্ত ক্রিয়ার উদাহরণ। প্রতিবর্ত ক্রিয়াও আত্মরক্ষা বংশবিস্তার প্রভৃতি জৈব উদ্দেশ্য সাধনে অংশ গ্রহণ করে, যদিও ক্রিয়া সম্পাদনকালে ইহাতে উদ্দেশ্যের কোনো চেতনা বা জ্ঞান থাকে না।

ক্রমিক প্রতিবর্ত বা প্রতিবর্ত-শৃঙ্খল[১] (Chain-Reflex)

প্রতিবর্ত সহজ সরল প্রতিক্রিয়া হইলেও, ইহা জটিল আকার ধারণ করিতে পারে। যেমন একটি উদ্দীপক উহার প্রতিবর্ত ক্রিয়া উৎপন্ন করিল। এই প্রতিবর্ত ক্রিয়াটি অপর একটি প্রতিবর্তের উদ্দীপক হইতে পারে। আবার এই দ্বিতীয় প্রতিবর্তটি হইয়া দাঁড়ায় আর একটি তৃতীয় প্রতিবর্তের উদ্দীপক। এইরূপে **উদ্দীপক→প্রতিক্রিয়া →উদ্দীপক→প্রতিক্রিয়া** ক্রমে একটি ক্রমিক প্রতিবর্ত বা প্রতিবর্ত-শৃঙ্খল উৎপন্ন হইতে পারে। ক্রমিক প্রতিবর্ত বলিতে বুঝায় কতকগুলি প্রতিবর্তের সমষ্টি। এই প্রতিবর্তগুলি এমনভাবে সম্বদ্ধ যে প্রত্যেক পূর্ববর্তী প্রতিবর্ত শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে পরবর্তী প্রতিবর্তটি ক্রিয়াশীল হয়। **লৌহশৃঙ্খলের একটি আংটির (ring) সহিত পরবর্তী এবং পূর্ববর্তী আংটির সম্বন্ধের মত ক্রমিক প্রতিবর্তের ক্রমিক বা একটানা সম্বন্ধ থাকে।** ফলে এই প্রতিবর্ত-শৃঙ্খলের একটি প্রতিবর্ত ঘটিলেই, উহার পরবর্তীটি ঘটে।

একটি উদাহরণ সাহায্যে প্রতিবর্ত-শৃঙ্খলের অর্থ বুঝিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে। **থর্নডাইক (Thorndike)-এর বিখ্যাত** উদাহরণটি দেওয়া যাউক। পিঞ্জরাবদ্ধ ক্ষুধার্ত বিড়াল পিঞ্জরের ঠিক বাহিরে স্থাপিত খাদ্যের নিকট পৌঁছাইবার বারংবার চেষ্টায় অসংখ্য ভুল ক্রিয়া করিয়া থাকে। ক্রমে ক্রমে তাহার ভুল ক্রিয়াগুলির সংখ্যা কমিয়া আসে এবং ঠিক ক্রিয়াগুলি টিকিয়া বা থাকিয়া যায়। পরিণামে সে আর ভুল ক্রিয়াগুলির পুনরাবৃত্তি করে না, কিন্তু প্রথমেই ঠিক ক্রিয়াগুলি করিয়া দ্রুত এবং অভ্রান্ত ভাবে তাহার লক্ষ্যে পৌঁছায়। বিড়ালটি পিঞ্জরের শিকগুলি দাঁত দিয়া কামড়াইতে, এবং থাবা দিয়া আঁচড়াইতে থাকে। সে নানাপ্রকার ক্রিয়া করিতে করিতে হঠাৎ পিঞ্জরের ছিটকানিতে আঘাত করে। ফলে উহার দরজা খুলিয়া যায় এবং বিড়াল পিঞ্জরের বাহিরে আসিয়া খাদ্য আহার করে।

ধরিয়া লওয়া যাউক, বিড়ালটির যে ক্রিয়াগুলি উহাকে খাদ্যে পৌঁছাইয়া দেয় উহারা ক, খ, গ, ঘ এবং ঙ। ক ক্রিয়াটির উদ্দীপক হইল খাদ্য দর্শন। ক ক্রিয়া ঘটিবার সঙ্গে সঙ্গে উহা খ ক্রিয়াটির উদ্দীপক এবং খ ক্রিয়াটি ঘটিবার সঙ্গে সঙ্গে উহা গ ক্রিয়াটির

১ প্রতিবর্ত-শৃঙ্খলের নক্সা এই খণ্ডের ১২৯ পৃষ্ঠার খ, গ, ঘ এবং ঙ চিত্রে দেখানো হইয়াছে।

উদ্দীপক হয়। আবার গ ক্রিয়াটি ঘ ক্রিয়ার এবং ঘ ক্রিয়াটি ঙ ক্রিয়ার উদ্দীপক হিসাবে কাজ করে। এইরূপে ক্রমিক প্রতিবর্তের অন্তর্ভূত প্রতিবর্তগুলি এমন শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয় যে উহাদের পূর্ববর্তীটি ঘটিলেই পরবর্তীটি ঘটে। বিড়াল যে সকল ক্রিয়ার সাহায্যে খাদ্যে পোঁছায়, উহারা প্রতিবর্ত-পরম্পরা হিসাবে গ্রথিত। ইহাদের প্রথমটি ঘটিলে দ্বিতীয়টি, আবার দ্বিতীয়টি ঘটিলে তৃতীয়টি, এইরূপ ক্রমিক ধারায় শেষ প্রতিবর্তটি ঘটিয়া উহাদের ধারাবাহিকতা শেষ করে।

প্রতিবর্ত সরল ও সহজ ক্রিয়া হইলেও, অন্যান্য প্রতিবর্তের সহিত উপরোক্তভাবে সম্বন্ধ হইয়া উহা জটিল আকার ধারণ করে। **অনুষঙ্গই (Assoctation) প্রতিবর্তের এই ক্রমিকতা বা ধারাবাহিকতার কারণ।** একটি প্রতিবর্তের পরেই আর একটি প্রতিবর্ত পুনঃপুনঃ ঘটিলে, এই দুইটি প্রতিবর্তের সহিত অনুষঙ্গ-সূত্র গঠিত হয়। ফলে, প্রথম প্রতিবর্তটি ঘটিলেই, দ্বিতীয়টি ঘটে। শারীরবৃত্তের ভাষায় বলা যায় যে এই দুইটি প্রতিবর্ত-চক্রের (Reflex-Arc)[১] সহিত অনুষঙ্গ স্থাপিত হওয়ার ফলে প্রথম প্রতিবর্ত-চক্রের ক্রিয়া শেষ হইলেই দ্বিতীয় প্রতিবর্ত-চক্র ক্রিয়াশীল হয়। এইরূপে ক্রমিক প্রতিবর্ত-চক্রানুযায়ী একটি ক্রমিক নার্ভপথের ধারা বা ক্রম গড়িয়া ওঠে। পিঞ্জরাবদ্ধ ক্ষুধার্ত বিড়ালের যে ক্রিয়াগুলি উহাকে পিঞ্জরের ছিটকানি খুলিয়া বাহিরে আসিতে এবং খাদ্য সংগ্রহ করিতে সাহায্য করে, সেই ক্রিয়াগুলির পৌর্বাপর্য অনুসারে উহাদের মধ্যে অনুষঙ্গ গঠিত হয়। ফলে, প্রথম ক্রিয়া ঘটিবার সঙ্গে সঙ্গে উহার পরবর্তী দ্বিতীয় ক্রিয়াটি ঘটে, আবার দ্বিতীয়টি ঘটিবার সঙ্গে সঙ্গে উহার পরবর্তী তৃতীয় ক্রিয়াটি ঘটিয়া থাকে।

ক্রমিক প্রতিবর্ত ও ইনস্টিংক্ট্ ঃ

অনেক মনোবিদ্, যেমন স্পেন্সর, থর্নডাইক্, ওয়াট্সন্ প্রভৃতি, ক্রমিক প্রতিবর্তকে উচ্চতর মানসবৃত্তির ভিত্তি বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের মতে সহজ প্রবৃত্তি (Instinct) হইতে আরম্ভ করিয়া শিক্ষা, স্মৃতি, কল্পনা, চিন্তন প্রভৃতি সকল উচ্চতর মানসবৃত্তি ক্রমিক প্রতিবর্তের সাহায্যে ঘটে। কিন্তু এইরূপ মতবাদ মনকে একটি যন্ত্রে পর্যবসিত করে। অথচ কোনো জ্ঞাত বা অজ্ঞাত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কাজ করা মনের বিশেষ ধর্ম। ইচ্ছা বা সঙ্কল্প প্রভৃতি ক্রিয়ায় অনেক বিকল্প সম্ভাবনা থাকিলেও, মন অন্য সম্ভাবনাগুলিকে বাতিল করিয়া একটিকে নির্বাচন করে। সঙ্কল্পের এই

১ এই খণ্ডের সপ্তম পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

উদ্দেশ্যাভিমুখী স্বভাব যান্ত্রিক মতবাদের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না। প্রতিবর্তের ধর্মই হইল এই যে ইহা একই উদ্দীপকের প্রভাবে একই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। প্রতিবর্তে বৈচিত্র্য নাই, স্বাধীন নিয়ন্ত্রণ নাই। অথচ বৈচিত্র্য এবং স্বাধীন নিয়ন্ত্রণ ইচ্ছা বা সঙ্কল্পমূলক ক্রিয়ার প্রধান লক্ষণ। **সুতরাং ক্রমিক প্রতিবর্ত সাহায্যে নিম্ন এবং উচ্চ নির্বিশেষে সকল মানসবৃত্তির ব্যাখ্যা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না।**[১]

সহজ প্রবৃত্তি (Instinct) আর একটি প্রধান অনৈচ্ছিক ক্রিয়া। ইহা পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।[২]

সরল প্রতিবর্ত ও সাপেক্ষ প্রতিবর্ত :

সরল প্রতিবর্ত (Simple Reflex) এবং সাপেক্ষ প্রতিবর্ত (Conditioned Reflex) কাহাকে বলে এবং উহাদের পার্থক্য কি প্রভৃতি প্রশ্ন অষ্টম পরিচ্ছেদে বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। যথাস্থানে দ্রষ্টব্য।

১০। ভাবচেষ্টীয় ক্রিয়া (Ideo-motor Action)

যে ক্রিয়া উহার ভাব বা চিন্তা হইতেই স্বতঃবৃত্তভাবে উৎপন্ন হয় তাহাকে ভাবগতীয় বা ভাবচেষ্টীয় ক্রিয়া বলে। যেমন একটি পোকা বা ধূলাবালি চোখে ঢুকিবার উপক্রম হইলেই চোখের পাতা আপনা-আপনি বুজিয়া যায়। কেহ পড়িয়া যাইবে এইরূপ আশঙ্কা করিতে করিতে হয়ত বাস্তবিকই পড়িয়া যায়। কেহ হয়ত কাহাকেও আঘাত করিবে ভাবিতে ভাবিতে সত্যই আঘাত করিয়া বসে। খেলা দেখিতে গিয়া, প্রিয় খেলোয়াড় কিভাবে বলটি মারিবে তদগতভাবে চিন্তা করিতে করিতে দর্শক হয়ত বলটি মারিবার ভঙ্গীতে পাশের লোকটিকে প্রচণ্ড লাথি মারিয়া বসিল। ধূমপায়ী ব্যক্তি অপর ব্যক্তির নিকট হইতে দিয়াশলাই লইয়া ফেরৎ না দিয়া হয়ত নিজ পকেটে পুরিয়া ফেলে।

এই অনৈচ্ছিক ক্রিয়ার সহিত **অন্যান্য অনৈচ্ছিক ক্রিয়ার পার্থক্য** সুস্পষ্ট। অন্যান্য অনৈচ্ছিক ক্রিয়ার কারণ সংবেদন বা প্রত্যক্ষ। যেমন শিশু একটি টুকটুকে লাল ফুল দেখিয়াই উহা ধরিতে চায়, অথবা যান্ত্রিক শুষ্কতা ঘটিলেই, জলতৃষ্ণা অনুভূত হয়। এই জাতীয় অনৈচ্ছিক ক্রিয়া সংবেদ-চেষ্টীয় (Sensori-motor), কারণ ইহাদের

১ ক্রমিক প্রতিবর্ত ও সহজ প্রবৃত্তির সম্বন্ধ অষ্টম পরিচ্ছেদে আরও বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে।

২ অষ্টম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

গতি বা ক্রিয়া ঘটে সংবেদন হইতে। কিন্তু গতিভাবজ বা ভাবচেষ্টীয় ক্রিয়া সংবেদন বা প্রত্যক্ষ হইতে ঘটে না, ঘটে কোনো ভাব বা চিন্তা হইতে।

সংবেদ-চেষ্টীয় ক্রিয়া উৎপন্ন হয় স্থূল উদ্দীপক হইতে। পক্ষান্তরে ভাবচেষ্টীয় ক্রিয়া উৎপন্ন হয় ভাব বা চিন্তারূপ সূক্ষ্ম উদ্দীপক হইতে। এই দুই প্রকার চরম ক্রিয়ার মধ্যবর্তী অন্যপ্রকারের ক্রিয়াও হইতে পারে। অজ্ঞাত বা অচেতন **অনুকরণ** (imitation) এই জাতীয় মধ্যবর্তী ক্রিয়া। একাগ্রচিত্তে কাহাকেও কাজ করিতে দেখিয়া, হয়ত দ্রষ্টা তাহার অজ্ঞাতসারে অথবা অনিচ্ছায় সেই কাজটি অথবা উহার কোনো অংশ স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে করিয়া ফেলে।

স্থূল উদ্দীপক-প্রসূত **সংবেদ-চেষ্টীয় ক্রিয়া** এবং সূক্ষ্ম ভাব বা ধারণা-প্রসূত ভাবজ ক্রিয়ার মধ্যে কোনো বিরুদ্ধতা নাই, কারণ উহাদের মধ্যবর্তী ক্রিয়াও আছে। সুতরাং ভাবচেষ্টীয় ক্রিয়াকে সংবেদ-চেষ্টীয় ক্রিয়া হইতে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করিবার কারণ নাই এবং ভাবচেষ্টীয় ক্রিয়ার মধ্যে কোনো রহস্যও নাই।

সংবেদ-চেষ্টীয় এবং ভাবজ ক্রিয়াকে সম্পূর্ণ পৃথক করিবার মূলে রহিয়াছে চিন্তন ক্রিয়া (Thinking) সম্বন্ধে প্রাচীন বিশ্লেষণীয় মনোবিদ্যার (Analytical Psychology) পক্ষপাতিত্ব। এই মতে ভাব বা ধারণা সম্পূর্ণ পৃথক মানসসত্তা। কিন্তু এই প্রাচীন মত ভ্রান্ত। মন একটি সমগ্র বা গোটা বস্তু। ভাব বা ধারণাকে সমগ্র সত্তা মনে করিয়া মন হইতে বিচ্ছিন্ন করা অসঙ্গত। আসলে কোনো নিছক ভাব বা ধারণাই সম্ভব নয়। প্রত্যেক ভাব বা ধারণার সঙ্গে সঙ্গেই মনে মনে কথা বলা চলিতে থাকে এবং এই মানস বা স্বগত ভাষার সঙ্গে সঙ্গে ঐ ভাষা বলিতে বাগ্‌যন্ত্রের যে সকল ক্রিয়া আবশ্যক, উহাদের সূক্ষ্ম কম্পন বা গতি উৎপন্ন হয়। যেমন 'বল' কথাটি চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে ওষ্ঠের কম্পন অনুভূত হয়।

অতএব গতি বা ক্রিয়ার প্রত্যেক ভাব বা চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে বাস্তব গতি বা ক্রিয়ার, অথবা উহার জন্য যে পেশীক্রিয়া প্রয়োজন তাহার সূত্রপাত বা সূচনা ঘটে। গতি বা ক্রিয়ার চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে উহার অনুভব (feel) অর্থাৎ উহার সূচনা বা সূত্রপাত হয় এবং ক্রিয়াটি প্রকাশ পায়। কাজেই শুধু ভাব বা ধারণা হইতেই ক্রিয়া ঘটে, এইরূপ মনে করিবার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই।

সকল ক্রিয়াই যে পূর্ব অভিজ্ঞতা-প্রসূত ভাব বা ধারণার দ্বারা প্রভাবিত হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং এই দিক দিয়া বিচার করিলে, **সকল ক্রিয়াকেই ভাবচেষ্টীয় বলা যায় কিনা,** তাহা ভাবিবার বিষয়। কিন্তু সকল ক্রিয়াকে পুরা-

পুরিভাবে ভাবচেষ্টীয় বলা যায় না, কারণ ভাব কার্যে পরিণত হইবার আগেই অন্যান্য বিপরীত ভাব মনে উদিত হয় এবং কি করিতে হইবে তাহা স্থির না হওয়া পর্যন্ত ক্রিয়া স্থগিত থাকে। যদি কোনো উপায়ে বিরুদ্ধ ভাবগুলি নিবারণ করা যায়, অথবা উহারা মনে উদিত হইবার পূর্বেই কার্য উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে ভাব ঘটিবামাত্র ক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

যাহাকে আমরা ভাবচেষ্টীয় ক্রিয়া বলি তাহার সহিত সংবেদন বা প্রত্যক্ষ জড়িত থাকে। ভাবচেষ্টীয় ক্রিয়ায় ইহার সংবেদন বা প্রত্যক্ষ অংশ পৃথকভাবে জ্ঞাত হয় না। কাজেই মনে হইতে পারে যে ভাবচেষ্টীয় ক্রিয়ার ভাব বা ধারণা সংবেদন বা প্রত্যক্ষের সাহায্য না লইয়াই ক্রিয়া উৎপন্ন করিতেছে। **আসলে সংবেদচেষ্টীয় এবং ভাবচেষ্টীয় ক্রিয়ার মধ্যে কোন ভেদ নাই।** টিশ্‌নার্[1] এই দুইটিকে সমার্থকরূপে গ্রহণ করিয়াছেন।

ভাবচেষ্টীয় ক্রিয়ার উদাহরণ দিতে গিয়া অধ্যাপক উইলিয়ম্ জেম্‌স্ বলিয়াছেন, "কথা বলিতে বলিতে মেজের উপর একটি আল্‌পিনে অথবা আমার আস্তিনের উপর ধূলায় নজর পড়িল। কথা চালাইতে চালাইতেই আল্‌পিনটি তুলিয়া লইলাম, অথবা ধূলা ঝাড়িয়া ফেলিলাম। ইহাতে কোনো স্পষ্ট সঙ্কল্পের দরকার হইল না, কিন্তু বস্তুর প্রত্যক্ষ এবং ক্রিয়ার একটি চকিত ভাবই যেন সোজাসুজিভাবে ক্রিয়া উৎপন্ন করিল।

"আমি ভোজনের পর টেবিলে বসিয়া নিজের অজ্ঞাতসারে বাদাম অথবা আঙুর তুলিয়া মুখে পুরিতেছি। ভোজন শেষ হইয়া গিয়াছে এবং কথার ঝোঁকে আমি কি করিতেছি তাহাতে খেয়াল নাই, কিন্তু ফলের (বিষয়ে) প্রত্যক্ষ এবং আমি উহা খাইতে পারি (ক্রিয়ার ফল) এই আচম্‌কা ভাবটি অবশ্যম্ভাবিরূপে ঐ ক্রিয়া ঘটাইল বলিয়া মনে হয়।

'যখনই ক্রিয়া কোনো ইতস্ততঃ না করিয়া সোজাসুজিভাবে উহার ভাবকে অনুসরণ করে, তখনই আমরা ভাবচেষ্টীয় ক্রিয়া পাই।"[2]

মেলোন্ এবং ড্রামণ্ড্ বলিয়াছেন, "হয়ত পড়ায় মগ্ন হইয়া আছি। আমার হাত হঠাৎ পাতার উপর দিয়া ঘষিয়া গেল। তখন দেখি যে সেখানে একটি মাছি

১ ই. বি. টিশ্‌নার্—প্রাইমার অফ্ সাইকলজি—পৃঃ ১৭১

২ ডবল্যু জেম্‌স্—প্রিন্‌সিপ্‌ল্‌স্ অফ্ সাইকলজি—২য় খণ্ড, পৃঃ ৫২২

বসিয়াছিল। ঘটনার ক্রম আমার এইরূপই মনে হয়। কিন্তু চিন্তা করিলে মনে হয় মাছিটির প্রত্যক্ষের ফলেই এই ক্রিয়াটি ঘটিয়া থাকিবে।"[১]

ভাব বা ভাবনার এমনই শক্তি যে কখনও কখনও আমাদের স্বার্থের বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও ইহা কার্যে পরিণত হয়। যেমন আত্মহত্যার ইচ্ছা না থাকিলেও, মানুষ গিরিশৃঙ্গের অত্যুচ্চ স্থান হইতে লাফাইয়া পড়িয়া মরিয়াছে। ঐ স্থান হইতে লাফাইয়া পড়িবার ধারণা বা ভাব তাহাদের এমনভাবে পাইয়া বসিয়াছে, যে এই চিন্তা ঘটিবার সঙ্গে সঙ্গে উহা কার্যে পরিণত হইয়াছে।

এইরূপ **বদ্ধভাব** (Fixed idea) স্বভাবী ব্যক্তির মধ্যেও দেখা যায়। অস্বভাবী ব্যক্তিকে তাহার বদ্ধভাব হয়ত এমন পাইয়া বসে যে, ঐ ভাব অনুযায়ী কাজ করা ছাড়া তাহার গত্যন্তর থাকে না। আবার **অভিভাব** (Suggestion) ভাবচেষ্টীয় ক্রিয়ার একটি বিশেষ শক্তিশালী উৎস। ইহার প্রভাবে বিরুদ্ধ ভাবগুলি মনে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে না। ভাবচেষ্টীয় ক্রিয়ায়ও বিরুদ্ধভাব নিবারিত থাকে।

ভাবচেষ্টীয় ক্রিয়া স্বাভিভাবের ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয়। কুই (Coue) মনে করেন যে **স্বাভিভাব** (auto-suggestion) ভাবচেষ্টীয় ক্রিয়াকে যথেষ্ট প্রভাবিত করে। তিনি স্বাভিভাবের যে সকল দৃষ্টান্ত দিয়াছেন তাহার একটি এই। হাত মুঠ করিয়া দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত যদি কেহ বারংবার বলিতে থাকে, "আমি হাতের মুঠ খুলিতে পারি না," তাহা হইলে যতক্ষণ সে এইরূপ বলিতে থাকে ততক্ষণ সে বাস্তবিকই হাতের মুঠ খুলিতে পারে না। এমন কি এই অসামর্থ্য-প্রকাশ বন্ধ হইবার পরও দেখা যায় যে সে অনেকক্ষণ হাতের মুঠ খুলিতে পারিতেছে না।

ভাবচেষ্টীয় ক্রিয়া এবং মনোযোগ

মনোযোগ ক্রিয়া বা চেষ্টাকে প্রভাবিত করে। কোনো ক্রিয়া করিবার সামর্থ্য থাকিলে আর যাহা প্রয়োজন তাহা হইল ঐ ক্রিয়া এবং উহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ঐকান্তিক চিন্তা। যে কাজ করিতে হইবে তাহার ভাবনায় চিত্ত একাগ্র হইলেই কাজটি করা যায়। জেমস্ বলিয়াছেন, "তোমার আঙুল সোজা রাখিয়া অনুভব করিবার চেষ্টা কর যেন তুমি তোমার আঙুল বাঁকাইতেছ। এক মিনিটের মধ্যেই আঙুলটি কল্পিত স্থান পরিবর্তনের ভাবে সুড়সুড় করিবে: অবশ্য তখনও ইহা বাস্তবিকই নড়িবে না, কারণ ইহা যে বাস্তবিকই নড়িতেছে না এই ভাবও তোমার

১ মেলোন্ অ্যাণ্ড ড্রামণ্ড্—এলিমেন্ট্স্ অফ্ সাইকলজি—পৃঃ ১০৪

মনে রহিয়াছে। এই ভাবটি দূর কর। শুধু সকল বাধা সরাইয়া এই গতির সহজ কথাটিই ভাব: ব্যাস্! বিনা চেষ্টায়ই এই গতি ঘটিল।"[১]

স্টাউট ভাবচেষ্টীয় ক্রিয়ার ব্যাখ্যায় (Thought-reading) **ভাব-উদ্ধার-এর** কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ভাব-উদ্ধার একশ্রেণীর ভাব-চেষ্টীয় ক্রিয়া। কোনো ব্যক্তি হয়ত একটি ছোট জিনিস লুকাইয়া রাখিয়াছে। ঐ জিনিসটি এবং গুপ্ত স্থানটির উপর যথাসম্ভব সম্পূর্ণভাবে মনোযোগ করিলে, অনৈচ্ছিকভাবে এবং অজ্ঞাতসারে তাহার মৃদু বিচলন ঘটে। এই বিচলন দেখিয়া অন্য লোক বুঝিতে পারে, লুকায়িত জিনিসটি কোথায় খুঁজিতে হইবে। স্টাউট্ ভাবচেষ্টীয় ক্রিয়ার উপর অভিভাব (Suggestion) এবং সংবেশনের (Hypnotism) প্রভাবও উল্লেখ করিয়াছেন।[২]

উপসংহার

উপরে ভাবচেষ্টীয় ক্রিয়ার আলোচনা করা হইল। সংক্ষেপে ভাবচেষ্টীয় ক্রিয়ার সংজ্ঞা নির্ধারণ করিতে গিয়া অধ্যাপক উইলিয়ম্ জেম্স্ বলিয়াছেন, **"যখনই গতির মানসভাব হইতে তৎক্ষণাৎ এবং বিনা দ্বিধায় গতি অনুসরণ করে, তখনই আমাদের ভাবচেষ্টীয় ক্রিয়া হইয়াছে বলা যায়।"** এম্. কলিন্স্ এবং জে. ড্রিভার বলেন, **"কোনো ক্রিয়ার ধারণা তৎক্ষণাৎ ক্রিয়ায় পরিণত হইলে এই ক্রিয়াকে ভাবচেষ্টীয় ক্রিয়া বলা যায়।"**

অনুশীলনী (Exercise)

1. Give an analysis of voluntary action. Distinguish between the differcnt stages analysed. (Ans : pp. 165—167)
   ঐচ্ছিক ক্রিয়ার বিশ্লেষণ সাহায্যে উহার বিভিন্ন স্তর আলোচনা কর।
2. Define motive. Can feeling be the motive ? Distinguish between motive and purpose. How does motive differ from intention ? (Ans : pp. 167—168)
   প্রেষক কাহাকে বলে ? বেদনা প্রেষক হইতে পারে কি ? প্রেষকের সহিত উদ্দেশ্য এবং অভিপ্রায়ের পার্থক্য প্রদর্শন কর।

১ উইলিয়াম জেম্স্—প্রিন্সিপ্‌ল্স্ অফ সাইকলজি—২য় খণ্ড—পৃঃ ৫২২

২ এম্. কলিন্স্ অ্যাণ্ড জে. ড্রিভার—এক্সপেরিমেন্টাল্ সাইকলজি—পৃঃ ১৭৮

3. Define will. Explain its relation to character.
(Ans : pp. 171—172)
সংকল্প কাহাকে বলে ? সংকল্পের সহিত চরিত্রের সম্বন্ধ কি ?

4. Explain Woodworth's analysis of voluntary action.
(Ans : pp. 171—172)
উড্ওয়ার্থ প্রদত্ত ঐচ্ছিক ক্রিয়ার বিশ্লেষণ আলোচনা কর।

5. Distinguish between simple reflex, chain-reflex and instinctive action. (Ans : pp. 175—178)
সহজ ও ক্রমিক প্রতিবর্তের এবং সহজ প্রবৃত্তির পার্থক্য নির্ণয় কর।

6. Define ideo-motor action. Distinguish between sensori-motor and ideo-motor action. (Ans : pp. 178-181)
ভাবচেষ্টীয় ক্রিয়া কাহাকে বলে ? সংবেদক্রিয়ার সহিত ভাবচেষ্টীয় ক্রিয়ার পার্থক্য আলোচনা কর।

দশম পরিচ্ছেদ

প্রেষণা ; নোদনা

(Motivation ; Drive)

১। প্রেষণা কাহাকে বলে

অভাব বা প্রয়োজনবোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং উহা মিটাইবার উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যে পরিচালিত চেষ্টা, কর্ম বা আচরণকে প্রেষণা বলে।

প্রেষণার বিশ্লেষণ করিলে নিম্নোক্ত স্তরগুলি পাওয়া যায়।

(ক) অভাব বা প্রয়োজনবোধ, (খ) এই অভাব মিটাইবার তাড়না বা নোদনা (drive) এবং (গ) ঐ অভাব মিটাইবার উদ্দেশ্যে চেষ্টা।

(ক) অভাব বা প্রয়োজনবোধ একটি অস্বস্তিকর অবস্থা। উহা না মিটিলে, অস্বস্তি দূর হয় না। যেমন, ডিম পাড়িবার সময় হইলে, পাখী আশ্রয় বা বাসার অভাব অস্পষ্টভাবে বোধ করে। এই অভাববোধ তাহাকে অশান্ত এবং চঞ্চল করিয়া তোলে। **ক্ষুধিত শিশু** আহার্যের অভাব বা প্রয়োজনবোধে অস্থির হইয়া ওঠে এবং তাহার পিতামাতাও তাহার আহার্য সংগ্রহের জন্য উৎকণ্ঠিত এবং চিন্তিত হন।

অভাববোধ শুধু একটি নিষ্ক্রিয় অনুভূতি মাত্র নয়। ইহা এমন একটি শক্তি, যাহা প্রাণীকে সক্রিয় করে। যেমন, আশ্রয়াভাবের অস্বস্তিবোধ পাখীকে বাসা নির্মাণে তাড়িত করে। ক্ষুধিত শিশু ক্ষুধার জ্বালা মিটাইবার জন্য কাঁদিয়া-কাটিয়া খাদ্য আদায় করে।

বর্তমান অভাববোধ প্রাণীকে পিছন হইতে তাড়িত করে, উহার ভাবী পরিতৃপ্তির দিকে। তেমনই উহা তাহাকে পরিচালিত করে একটি ভাবী অবস্থাকে বর্তমানে রূপান্তরিত করিতে। অভাবের পূর্ণতাই এই ভাবী অবস্থা, এবং ইহাই কর্মপ্রচেষ্টার উদ্দেশ্য। সাধারণতঃ এই উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রাণীর কোন স্পষ্ট জ্ঞান থাকে না, কিন্তু থাকে একটি অস্পষ্ট বা অবচেতন জ্ঞান।

প্রেষণা বা মোটিভেশন্ বলিতে এইরূপ আচরণ ক্রিয়া বুঝায়, যাহা কোনো অভাববোধের এবং ঐ অভাব দূর করিবার উদ্দেশ্যের তাড়না দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং পরিচালিত।

সকল কাজই প্রেষিত কি না

মানুষের সকল কাজই প্রেষিত (motivated) কি? উত্তরে বলা যায় যে মানুষের সকল কাজই প্রেষিত। কোনো কোনো কাজের প্রেষণা চেতন, আবার কোনো কোনো কাজের প্রেষণা অবচেতন। যেমন প্রতিবর্ত ক্রিয়া ইন্দ্রিয়ের সহিত উদ্দীপকের সংস্পর্শ হইবামাত্র ঘটে, হাতে আগুন লাগিবামাত্র হাত সরাইয়া লওয়া হয়। এইরূপ ক্রিয়ায় কোনো অভাববোধ, তাহার তাড়না বা নোদনা এবং বিপদ পরিহার করিবার উদ্দেশ্য প্রভৃতি প্রেষণার স্তরগুলি স্পষ্টভাবে জ্ঞাত হয় না কিন্তু ম্যাক্‌ডুগ্যাল প্রভৃতি মনোবিদ্‌গণের মতে, এমন কি প্রতিবর্ত ক্রিয়াও প্রেষণার উপরোক্ত কারণগুলি দ্বারা উৎপন্ন হয়, যদিও উহাদের সম্বন্ধে স্পষ্ট চেতনা থাকে না।

২। নোদনা (Drive)

মোটর গাড়ি ইঞ্জিন দ্বারা চালিত হয়। তেমন কর্ম বা চেষ্টা অভাববোধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ইঞ্জিন যেমন মোটর গাড়ির চালক, অভাববোধও তেমন কর্মপ্রবৃত্তির চালক বা নোদক। কোন্ কোন্ নোদক বা ড্রাইভ্ মানুষকে কর্মচালিত করে? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পূর্বে নোদক কাহাকে বলে, তাহা জানা দরকার। **নোদক একটি আভ্যন্তরীণ যন্ত্রের অথবা টিস্যু-এর অবস্থা, যাহা নির্দিষ্ট আচরণ বা চেষ্টিতকে উত্তেজিত করে।** এই উদ্দীপনাই মনে অভাব বা প্রয়োজন-বোধরূপে অনুভূত হয় এবং একটি অশান্ত বা অস্থির অবস্থার সৃষ্টি করে।

নোদক এবং উদ্দেশ্য

নোদক বা ড্রাইভ্ এবং উদ্দেশ্য বা মোটিভ্-এর মধ্যে পার্থক্য বিচার্য। অনেক মনোবিদ্ ইহাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তাঁহাদের মতে নোদকই উদ্দেশ্য, আবার উদ্দেশ্যই নোদক। তাঁহারা বলেন যে আভ্যন্তরীণ যন্ত্রের বা টিস্যুর পুষ্টি বা ক্রিয়ার পরিবর্তনই আচরণের বা চেষ্টিতের আসল নোদক এবং পরিবর্তিত অবস্থার সহিত অঙ্গীর উপযোজনই ইহার আসল উদ্দেশ্য।

কিন্তু নোদক এবং উদ্দেশ্যের এই অভিন্নতা মনোবিদ্যার দিক হইতে সম্পূর্ণ স্বীকার করা যায় না। নোদক একটি আভ্যন্তরীণ যন্ত্রের অবস্থা অথবা উহার ফলে উদ্ভূত মানসিক অস্বাচ্ছন্দ্য বা অভাববোধ। কিন্তু এই যান্ত্রিক এবং মানসিক কারণটি বর্তমান অথবা অতীত হইয়াও, কোনো ভবিষ্যতে পূরণীয় অবস্থার দিকে মানুষকে পরিচালিত করে। অন্ততঃ মানুষের ক্ষেত্রে চেষ্টিতের এই উদ্দেশ্যাভিমুখিতা অস্বীকার

করিবার উপায় নাই। অনেক চেষ্টিতেই যে উদ্দেশ্যের কোনো স্পষ্ট জ্ঞান বা চেতনা থাকে না তাহা ঠিক, কিন্তু এই চেতনা অবশ্যই অস্পষ্টভাবে থাকে। নতুবা মানুষের সকল কর্ম এবং চেষ্টা অন্ধকারে হাতড়াইয়া বেড়ানোর নামান্তর হইয়া দাঁড়ায়। অথচ মানুষের কর্মপ্রচেষ্টা অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়িবার মত প্রণালীতে অগ্রসর হয় না, কারণ উদ্দেশ্য সাধিত না হওয়া পর্যন্ত কর্মপ্রচেষ্টা অব্যাহতভাবে চলিতে থাকে অথবা কর্মপ্রণালীর প্রয়োজন মত রদবদল ঘটিয়া থাকে।

উপরোক্ত কারণে নোদক এবং উদ্দেশ্যের পার্থক্য স্বীকার করাই সঙ্গত।

৩। নোদনার শ্রেণীভেদ

নোদনা নানা প্রকার। কয়েক প্রকার নোদনার আলোচনা করা যাউক।

যান্ত্রিক (Organic) নোদনা

ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা প্রভৃতি যান্ত্রিক নোদকের দৃষ্টান্ত। ক্ষুধা এক প্রকার আভ্যন্তরীণ যন্ত্রের অবস্থা। উহার সঙ্গে সঙ্গে মনেরও একটি অস্থির অবস্থা ঘটে। এই অবস্থার প্রতিকার না ঘটিলে বাঁচিয়া থাকা সম্ভব নয়।

ক্ষুধা (Hunger)

শারীরবৃত্তের দিক হইতে ক্ষুধা পাকস্থলীর একপ্রকার সঙ্কোচন বিশেষ। স্বাভাবিক রক্তে শর্করা বা চিনি যতটুকু থাকা দরকার, তাহা অপেক্ষা কমিয়া গেলে, পাকস্থলীর মসৃণ পেশী সঙ্কুচিত হইতে থাকে এবং উহার ফলে ক্ষুধার যন্ত্রণা উৎপন্ন হয়। পাকস্থলীর সঙ্কোচনে নার্ভ-প্রবাহ ঘটিয়া, উহা দৈহিক ক্রিয়া বাড়ায় এবং ক্ষুধার অস্থিরতা বা চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। আবার এই অস্থিরতা খাদ্য সন্ধানে এবং খাদ্য মিলিয়া গেলে, আহারে প্রবৃত্ত করে।

শুধু পাকস্থলীর সঙ্কোচনই যে ক্ষুধার তাড়না জন্মায়, তাহা নয়। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে উপবাসী ইঁদুরের পাকস্থলীসঙ্কোচন নষ্ট করিয়া দিলেও, সে খাদ্য খুঁজিতে থাকে এবং খাদ্য পাইলে, উহা খাইতে আরম্ভ করে। তেমনই রক্তে শর্করার অভাবই যে ক্ষুধার একমাত্র কারণ, তাহাও বলা যায় না। চব্বিশ ঘণ্টা অনাহারে রাখিয়া একটি মুরগীকে এক রাশি গম দিলে, সে গমের পরিমাণ অনুসারে কম বা বেশী দানা খায়। যেমন গম রাশিতে একশত গমদানা থাকিলে, সে হয়ত পঞ্চাশটি দানা খায়, আবার উহাতে আরও বেশী গমদানা থাকিলে, সে হয়ত পঁচাশিটি বা একশতটি দানা গ্রহণ করে। এই দুইটি মুরগীরই রক্তের রাসায়নিক

অবস্থা একরূপ থাকে। সুতরাং এই আভ্যন্তরীণ অবস্থাই মুরগীর ক্ষুধার কারণ নয়, কিন্তু আহার্যের পরিমাণ উহার কারণ, যেহেতু উহার অল্পাধিক্য অনুসারে আহারের পরিমাণ কম বা বেশী হয়। আবার ক্ষুধাতৃপ্তির পরও হয়ত একটি মুরগী শস্যরাশির সম্মুখে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, এমন সময় অন্য কোন ক্ষুধার্ত মুরগী যদি তাহার সম্মুখে শস্যের দানা খাইতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে সেও উহার দেখাদেখি আবার খাইতে আরম্ভ করে। এমনও দেখা যায় যে, তৃপ্ত মানুষ ক্ষুধার্ত বন্ধুকে আহার করিতে দেখিয়া আবার খাওয়া শুরু করে।

এই সকল ঘটনা দেখিয়া মনে হয় যে **শুধু আভ্যন্তরীণ যন্ত্রের অবস্থাই ক্ষুধার একমাত্র কারণ নয়, পরিবেশও** ক্ষুধা উৎপাদনে সহায়তা করে। অপরকে খাইতে দেখিয়া আমরা খাই ; আবার খাদ্যদ্রব্য বেশী থাকিলে, বেশী খাইয়া ফেলি এবং কম থাকিলে, কম খাইয়া থাকি। আবার কোনো নির্দিষ্ট সময়ে বা স্থানে কোনো নির্দিষ্ট খাদ্য গ্রহণে অভ্যস্ত হইলে, ঐ খাদ্য ঐ সময়ে বা ঐ স্থানে দেখিলেই যেন আমরা ক্ষুধাবোধ করি।

দেখা যাইতেছে যে, ক্ষুধা একটি সহজাত তাড়না হইলেও, এই তাড়না কিভাবে কাজ করিবে, তাহা অনেকটা নির্ভর করে **শিক্ষা, অভিজ্ঞতা** এবং **অভ্যাসের** উপর।

তৃষ্ণা (Thirst)

ক্ষুধার মত তৃষ্ণা আর একটি যান্ত্রিক নোদনা। তৃষ্ণার যান্ত্রিক কারণ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন যে **মুখ ও গলা শুকাইয়া যাওয়াই** তৃষ্ণার কারণ। পানীয়ের সাহায্যে গলা এবং মুখ ভিজাইলেই তৃষ্ণা দূর হয়। কিন্তু এইরূপ কারণ যথার্থ বলিয়া মনে হয় না। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে মুখ এবং গলা না ভিজাইয়া সোজাসুজিভাবে পাকস্থলী জলপূর্ণ করিলেই তৃষ্ণা মিটিয়া যায়। কাজেই তৃষ্ণার **কারণ আরও গভীর** বলিয়া মনে হয়। **তৃষ্ণা দেহযন্ত্রে জলাভাবের সূচনা করে।** অতএব রক্তে, পাকস্থলীতে অথবা বৃহদন্ত্রে (larger intestines) জল প্রবেশ করাইলেই তৃষ্ণা মিটে।

তৃষ্ণার একটি প্রধান কারণ এই যে জলাভাবে দেহের সকল কোষগুলি উহাদের জলীয় ভাগ ত্যাগ করে। **হাইপোথ্যালামাস্‌** কেন্দ্রে জলাভাবের প্রতি বিশেষ সংবেদনশীল কতকগুলি কোষ আছে। এই কোষগুলির সহিত মস্তিষ্কের অন্যান্য অংশগুলির সম্বন্ধ থাকায়, উহারা দেহে জলের পরিমাণ অনুসারে পানক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত করে।

ক্ষুধার মত তৃষ্ণাও একটি সহজাত নোদনা। আবার ক্ষুধার মত তৃষ্ণাও **পারিবেশিক অবস্থার** দ্বারা প্রভাবিত হয়। পানের নোদনাশক্তি কতখানি তাহা বুঝা যায়, যাহারা মাতাল বা পানোন্মত্ত তাহাদের আচরণ দেখিয়া। বর্তমান কালে সভ্য জগতের একটি বিশেষ অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে চা-পানের আসর। আবার পান এমনই গুরুতর বিষয় হইয়া পড়িয়াছে যে, কেহ হয়ত অপরের "স্বাস্থ্য পান করে (drinks one's health)।"

নিদ্রা (Sleep)

অন্ন-পানের মত নিদ্রাও একটি শক্তিশালী নোদনা। একটু ঘুমাইবার জন্য মানুষ কত চেষ্টাই না করে। জাগরণের কর্মব্যস্ততায় যে শক্তি ব্যয়িত হয় অথবা দেহের ক্ষয়-ক্ষতি ঘটে, নিদ্রায় তাহার সম্পূরণ হইয়া থাকে।

নিদ্রা রক্তের রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে ঘটে না। নিদ্রিত কুকুরের রক্ত জাগ্রত কুকুরের দেহে প্রবিষ্ট করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ইহা দ্বিতীয় কুকুরকে নিদ্রাবিষ্ট করে না। মোটের উপর বলা যাইতে পারে যে, **নিদ্রার কেন্দ্র মস্তিষ্কে অবস্থিত।**

প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, নিদ্রা যখন একটি নিষ্ক্রিয় এবং কর্মবিরত অবস্থা, তখন ইহাকে কর্মপ্রচেষ্টার বা আচরণের নোদক বলা যায় কি করিয়া। উত্তর এই যে, নিদ্রা নিশ্চয়ই **প্রত্যক্ষভাবে** কর্মজীবনের **নোদক** বা চালক নয়। কিন্তু ইহা কর্মের বাধা বা উহাতে আলস্য, জড়তা ও অবসাদ দূর করিয়া কর্মশক্তির খোরাক জোগায়। সুতরাং প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও, অন্তত: **পরোক্ষভাবে,** নিদ্রা কর্মজীবন বা আচরণের একটি শক্তিশালী **নোদক।**

কামাবেগ (Sexual Impulse)

কর্মপ্রচেষ্টার বা আচরণের আর একটি মস্ত বড় নোদক কামাবেগ বা সেক্সুয়্যাল ইম্‌পালস্। কাম যে একটি শক্তিশালী নোদক তাহা **তন্ত্রশাস্ত্রকার** হইতে আরম্ভ করিয়া **ফ্রয়েড্‌** পর্যন্ত অনেকেই স্বীকার করিয়াছেন। ফ্রয়েড-এর মতে সকল প্রেষণার মূল হইল কাম।[১] ইহারই স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক গঠনের উপর নির্ভর করে সকল প্রকার আচরণ।

কাম বা যৌনশক্তির প্রাধান্য কতখানি তাহা বুঝা যায়, যখন অত্যন্ত সাহসিক

১ তন্ত্রশাস্ত্রমতে জীবের সকল শক্তি সুপ্ত থাকে মূলাধার চক্রে, যাহা গুহ্য এবং লিঙ্গের মধ্যবর্তী অঙ্গুলিদ্বয় পরিমিত স্থান। এই চক্রে কুলকুণ্ডলিনী শক্তি নিদ্রিতা থাকেন।

আচরণ বা কর্মশক্তিকে বলা হয় পুরুষোচিত (masculine), আবার অত্যন্ত মৃদু বা কোমল আচরণকে বলা হয় স্ত্রীসুলভ (feminine)।

যৌন নোদনা **সহজাত এবং বংশগত**। শৈশবে ইহা সুপ্ত থাকিয়া, নানা আচরণের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে। শিশুর যৌন কামনা লিঙ্গ বা কামকেন্দ্রকে অবলম্বন করিতে না পারিয়া, দেহের বিভিন্ন অংশ বা অঙ্গকে অবলম্বন করে। এই কারণে শিশুকে 'বহুমুখকামী' (Polymorphous Perverse) বলা হয়। যৌবনে যৌন কামনা লিঙ্গে কেন্দ্রীভূত হয়। তারপর জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ইহা সক্রিয় থাকে এবং বিভিন্ন আচরণের মধ্যে বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হয়।

কামজীবনের একটি **চক্রবৎ পরিবর্তন বা ছন্দ** (Rhythm) আছে। এই চক্রবৎ পরিবর্তন বিশেষ করিয়া পরিলক্ষিত হয় স্ত্রীলোকের যৌন নোদনায়, যাহার ফলে, ঋতুদর্শন অনুসারে তাহাদের এই নোদনা বাড়ে বা কমে। যৌন নোদনার হ্রাস-বৃদ্ধি অনুসারে নারীর কর্মশক্তিরও হ্রাস-বৃদ্ধি হয়।

যৌন বা কাম নোদনা নিয়ন্ত্রিত হয় প্রধানতঃ কামগ্রন্থি বা গোনাড্ গ্রন্থির এবং পিটুইটারি গ্রন্থির রসক্ষরণের দ্বারা। স্ত্রী প্রাণীর ডিম্বকোষ স্থানচ্যুত হইলে, উহারা নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে। আবার পিটুইটারি গ্রন্থির যে অংশ যৌন-গ্রন্থিতে বা গোনাড্-এ শক্তিশালী রস সরবরাহ করে, তাহা স্থানচ্যুত করিলেও যৌন নোদনা কমিয়া যায়।

যৌন নোদনা সহজাত এবং বংশগত হইলেও, ইহা **অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষার** ফলে পরিবর্তিত হয়। শৈশবের অপ্রীতিকর যৌন অভিজ্ঞতা ভবিষ্যৎ যৌন আচরণের সুস্থতা এবং স্বাভাবিকতা নষ্ট করিয়া দিতে পারে। ধর্ম, নীতি, শাস্ত্র প্রভৃতি যে শিক্ষা দেয়, তাহার ফলেও যৌনজীবন প্রভাবিত হইতে পারে। যৌন কামনা আচরণের একটি শক্তিশালী নোদক বলিয়া এই বিষয়ে উপদেশ এবং নির্দেশের অন্ত নাই।

কর্ম ও বিশ্রাম (Work and Rest) নোদনা

কর্ম এবং বিশ্রাম আচরণের ছন্দে ওঠানামার মত দুইটি অপরিহার্য নোদনা। কিন্তু কর্ম এবং বিশ্রামকে দুইটি নোদনা বলা যায় কি? কর্ম না করিয়া এক মুহূর্তও থাকা যায় না। কর্মপ্রবৃত্তি না থাকিলে জীবনযাত্রা অসম্ভব হইয়া পড়ে। আবার কর্মের প্রস্তুতি হিসাবে বিশ্রামও একটি আবশ্যক নোদনা। বিশ্রামের ফলে পেশী, তন্তু, নার্ভ এবং মস্তিষ্ক কর্মশক্তি ফিরিয়া পায় এবং আবার সক্রিয় হইতে পারে।

কিন্তু কর্ম এবং বিশ্রামকে পৃথকভাবে নোদনা না বলিয়া প্রধান নোদনাগুলির

সহায় বলাই অধিক সঙ্গত মনে হয়। সকল নোদনাই সক্রিয় বা ডায়নামিক্, সুতরাং ইহা কর্মেরই প্রকাশ। সুতরাং কর্মকে পৃথক নোদনা মনে করা অসঙ্গত। আবার বিশ্রামও প্রত্যেক নোদনার পক্ষে প্রয়োজনীয়, কারণ কোনো নোদনাই অবিশ্রান্তভাবে সক্রিয় থাকিতে পারে না।

জৈব (Biological) নোদনা

সকল প্রাণীই বাঁচিয়া থাকিতে চায়। আত্মরক্ষার ইচ্ছা একটি মৌলিক নোদনা। আবার সকল প্রাণীই যৌন পরিণতি লাভ করিলে, বংশবিস্তার বা আত্মপ্রজনন করিতে চায়। সুতরাং **বংশবিস্তার** করা আর একটি মৌলিক নোদনা। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলেই পিতামাতার কাজ শেষ হইয়া যায় না। তাহাকে বড় এবং স্বাবলম্বী করিয়া তোলাই পিতামাতার পরবর্তী নোদনা—ইহার মূলে রহিয়াছে সন্তানের প্রতি অন্ধ ভালবাসা।

এইরূপে নোদনার সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়াইয়া চলা যায়। কিন্তু প্রশ্ন এই যে উল্লিখিত জৈব প্রবৃত্তিগুলিকে নোদনা বলা সঙ্গত কিনা। এইগুলিকে নোদনা বলিলে নোদনার সহিত সহজ প্রবৃত্তির কোনো পার্থক্য থাকে না। অথচ ইহাদের পার্থক্য অবশ্যই স্বীকার্য।

৪। নোদনা এবং সহজ প্রবৃত্তি (Drive and Instinct)

নোদনা এবং সহজ প্রবৃত্তি প্রায়ই এক অর্থে ব্যবহৃত হয়। আত্মরক্ষা, বংশবিস্তার, মাতৃত্ব প্রভৃতি সহজ প্রবৃত্তি নোদনারূপেও আলোচিত হইয়া থাকে। মা সহজাত প্রবৃত্তির ফলেই সন্তানকে ভালবাসেন, অথবা পিতা জলমগ্ন পুত্রকে বাঁচাইবার জন্য হয়ত জলে লাফাইয়া পড়েন।

সহজাত প্রবৃত্তির অর্থ বুঝিতে হইলে, **দুইটি কথা** মনে রাখা আবশ্যক। প্রথমতঃ, ইহাতে একটি শারীরবৃত্তীয় নোদনা (Physiological drive) থাকে এবং দ্বিতীয়তঃ, একপ্রকার সহজাত, জটিল এবং সংগঠিত ক্রিয়া বা আচরণ ইহার বেদনাকে পূর্ণ করে। তৃষ্ণা, ক্ষুধা প্রভৃতি শারীরবৃত্তীয় নোদনা। উহাদের কোনো সংগঠিত এবং জটিল আচরণ থাকে না। পক্ষান্তরে **সহজ প্রবৃত্তি জটিল এবং সংগঠিত**। সুতরাং ক্ষুধা, তৃষ্ণা প্রভৃতি নোদনা, কিন্তু সহজ প্রবৃত্তি নয়। আবার যৌন আচরণ একটি শারীরবৃত্তীয় নোদনা। কিন্তু ইহা শুধু নোদনাই নয়, সহজ প্রবৃত্তিও বটে, কারণ যৌন আচরণ জটিল এবং সংগঠিত।

নোদনা এবং সহজ প্রবৃত্তির উপরোক্ত পার্থক্যের ভিত্তিতে আত্মরক্ষা, বংশবিস্তার, মাতৃত্ব বা পিতৃত্ব প্রভৃতিকে শুধু নোদনা বলা অসঙ্গত। কারণ এই সকল ক্ষেত্রে শারীরবৃত্তীয় নোদনা তো আছেই, উপরন্তু এই নোদনাগুলিকে পূর্ণ করিবার উপযোগী জটিল এবং সংগঠিত আচরণও আছে।

৫। অভাব Needs)

অভাব বা প্রয়োজন অনুভূত না হইলে নোদনা বা ড্রাইভ্ জন্মে না। অভাবই কর্মে তাড়িত বা নোদিত করে। দেহযন্ত্রের কোনো অপূর্ণতা বা অপ্রাচুর্যই অভাব বা প্রয়োজন এবং এই অভাবই মানসিক অস্বস্তি বা অস্থিরতারূপে অনুভূত হয়। ইহা দূর করিতে পারে এমন ক্রিয়া বা আচরণ না ঘটিলে, অভাব দূর হয় না।

মুখ্য অভাব (Primary Needs)

মানুষের মুখ্য অভাবগুলি কি ? **খাদ্য, জল, বাতাস, আশ্রয়, সঙ্গী** প্রভৃতি মানুষের কতগুলি মুখ্য অভাব। রক্তে শর্করা কমিয়া গেলে, পাকস্থলীর মসৃণ পেশীর সঙ্কোচন আরম্ভ হয়, অর্থাৎ পাকস্থলী কিছু খাদ্য চায় এবং ইহা ক্ষুধার তাড়নারূপে অনুভূত হইয়া থাকে। আবার দেহকোষের জলীয় ভাগ কমিয়া গেলে, দেহ জল চায় এবং দেহের এই অভাবই অনুভূত হয় তৃষ্ণারূপে। তাপ, শৈত্য, বর্ষণ প্রভৃতি দেহকে ক্লিষ্ট করে এবং এই ক্লেশই অনুভূত হয় আশ্রয়ের অভাবরূপে। মানুষ একাকী আত্মরক্ষা করিতে পারে না এবং সঙ্গী না পাইলে ব্যবহার বিনিময় করিতে পারে না, তাই সে অভাব বোধ করে সঙ্গীর।

সকল প্রকার নোদনা বা তাড়নার মূলেই থাকে কোনো না কোনো অভাব বোধ। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শ্বাসক্রিয়া, কাম, কর্ম, বিশ্রাম প্রভৃতি সকল প্রকার নোদনাই কোনো না কোনো অভাব হইতে উৎপন্ন হয়। এই **জৈব অভাবগুলি** পূর্ণ না হইলে, জীবনধারণ অসম্ভব হইয়া পড়ে। অন্যান্য প্রাণীর মত মানুষও নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে কার্বনডাই-অক্সাইড ত্যাগ এবং অক্সিজেন গ্রহণ করে, আবার খাদ্য-গ্রহণ, জল-পান, দূষিত-পদার্থ-নিঃসরণ, দেহতাপ-সংরক্ষণ প্রভৃতি কাজ করে। বিশেষ বিশেষ অভাবই এই সকল তাড়নার কারণ।

গৌণ অভাব (Secondary Needs)

কিন্তু অন্যান্য প্রাণীর মত মানুষ এই সকল অভাব মিটাইয়াই সন্তুষ্ট হয় না। এই জৈব অভাবগুলি ছাড়াও তাহার **শিক্ষা, দীক্ষা, অভিজ্ঞতা এবং অভ্যাস**

অনুসারে মানুষ বহু গৌণ অভাবও বোধ করে—যেমন ভাল ঘর-বাড়ি, গাড়ি, প্রচুর টাকা, নাম, যশ, খ্যাতি প্রভৃতির অভাব।

মুখ্য ও গৌণ অভাবের তুলনা

অভাবের মধ্যে কতকগুলি প্রাথমিক বা মুখ্য। এই অভাবগুলি **জৈব** (Biological) এবং সহজাত (Instinctive)। ইহারা অপূর্ণ থাকিলে মানুষ বাঁচিতে পারে না। এই একান্তভাবে প্রয়োজনীয় অভাবগুলি মিটিলেই নানাপ্রকার অপ্রয়োজনীয় অথবা অজৈব অভাব দেখা দেয়। ইহাদের পূরণ জীবনধারণের পক্ষে অপরিহার্য নয়। কিন্তু শিক্ষা, সমাজ প্রভৃতির মানদণ্ডে সভ্য এবং উন্নত জীবন যাপনের পক্ষে এই অভাবগুলির পূরণও মানুষের পক্ষে প্রয়োজনীয়। অভ্যাস ও শিক্ষার ফলে হয়ত এই গৌণ অভাবগুলিই মুখ্য বা জৈব অভাবগুলির তুলনায় অধিক প্রয়োজনীয় হইয়া দাঁড়ায়। যেমন নাম ও যশের জন্য হয়ত মানুষ জীবন বিসর্জনও দিতে পারে। সতী স্ত্রী পতির অভাবকে প্রাণের অভাব হইতেও হয়ত বেশী অসহনীয় মনে করিতে পারেন।

দৈহিক এবং মানস অভাব (Physical and Mental Needs)

প্রাথমিক বা মুখ্য অভাবগুলিকে দৈহিক এবং গৌণ অভাবগুলিকে মানস বলা যাইতে পারে। মানস অভাবগুলিরও প্রায়ই দৈহিক ভিত্তি থাকে। **আত্মপ্রাধান্যের অভাব** মানসিক অভাব। ইহারও হয়ত এমন দৈহিক ভিত্তি আছে, যাহা এখনও আমাদের নিকট অজ্ঞাত। আবার মানস অভাবের যেমন চেতনা থাকে, দৈহিক অভাবেরও তেমন চেতনা থাকিতে পারে। কোনো সমস্যার সমাধানে যেমন অভাবের চেতনা থাকিতে পারে, খাদ্যের অভাব সম্বন্ধেও তেমন চেতনা থাকিতে পারে।

জৈব এবং সামাজিক অভাব (Biological and Social Needs)

প্রাথমিক অভাবগুলিকে জৈব এবং গৌণ অভাবগুলিকে সামাজিকও বলা যাইতে পারে, কারণ দ্বিতীয় অভাবগুলি সামাজিক জীবনের সংস্পর্শে **উৎপন্ন** হয়। কিন্তু এই পার্থক্য চূড়ান্ত নয়, কারণ সামাজিক অভাবগুলিও জৈব। প্রধানতঃ বাঁচিবার জন্যই সামাজিক অভাবগুলির সৃষ্টি। আবার জৈব অভাবগুলিও সামাজিক, কারণ উহাদের পূরণ নির্ভর করে সামাজিক অবস্থার উপর।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে অভাব দুই প্রকার—যথা (১) **প্রাথমিক, মুখ্য, প্রয়োজনীয়, দৈহিক অথবা জৈব** এবং (২) **গৌণ, অপ্রয়োজনীয়, মানস**

অথবা সামাজিক। এই দুই শ্রেণীর অভাব পরস্পরসাপেক্ষ। সকল প্রকারের অভাবই কোন দৈহিক, জৈব, মানস বা সামাজিক অপূর্ণতার লক্ষণ। আবার সকল প্রকার অভাবেরই সাধারণ লক্ষণ এই যে. উহারা মানুষকে উহাদের প্রতিকারে তাড়িত বা নোদিত করে।

৬। উদ্দেশ্য (Motive)

উদ্দেশ্য ও নোদনার পার্থক্য পূর্বে আলোচিত হইয়াছে। মানুষের আচরণ উদ্দেশ্যাভিমুখী (Purposive)। প্রতিবর্ত প্রভৃতি অচেতন আচরণে এই **উদ্দেশ্যাভিমুখিতা** থাকে অচেতন অবস্থায়। প্রতিবর্ত হইতে আরও উচ্চতর আচরণে, যেমন সহজ প্রবৃত্তিতে আরও সুগঠিত উদ্দেশ্যাভিমুখিতা থাকিলেও, তাহা অচেতন। ইচ্ছামূলক আচরণেই উদ্দেশ্যাভিমুখিতা চেতনস্তরে উন্নীত হয়।

প্রেষণার একটি প্রধান অঙ্গ হইল মোটিভ্ বা উদ্দেশ্য। প্রেষণা বলিতে ব্যক্তির **আভ্যন্তরীণ যন্ত্রের অভাব দ্বারা তাড়িত** এবং এমন কোনো **উদ্দেশ্যের দিকে পরিচালিত** আচরণ বুঝায়, যাহা পূর্ণ হইলে, অভাব মিটিয়া যায়। যেমন ক্ষুধার্ত ব্যক্তির উদ্দেশ্য হইল আহার করা—এই উদ্দেশ্য সাধিত হইলেই ক্ষুধার তৃপ্তি হয়। আবার কামুক ব্যক্তির উদ্দেশ্য হইল যৌনসুখ –এই উদ্দেশ্য পূর্ণ হইলেই তাহার অভাব মিটিয়া যায়।

উদ্দেশ্য ও উদ্দীপক (Motive and Stimulus)

মানুষ কেন নির্দিষ্টভাবে আচরণ করে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে সে কোনো **উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য** নির্দিষ্টভাবে আচরণ করে। আবার এই উত্তরও দেওয়া যায় যে সে কোনো **উদ্দীপকের প্রভাবেই** এইরূপ আচরণ করিয়া থাকে। ক্ষুধার্ত ব্যক্তি কেন খাদ্য অন্বেষণ করে? উত্তরে বলা যাইতে পারে যে সে আহার করিবার উদ্দেশ্যে খাদ্য অন্বেষণ করে, অথবা খাদ্যরূপ উদ্দীপক দেখিয়া উহার অন্বেষণ করে। উভয় ক্ষেত্রেই আচরণটি **উদ্দেশ্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং উদ্দীপকের দ্বারা উৎপন্ন**।

কিন্তু উদ্দেশ্য এবং উদ্দীপক এই উভয়েরই আচরণ উৎপন্ন করিবার শক্তি থাকিলেও, উহাদের **পার্থক্য** জানিয়া রাখা দরকার। (ক) উদ্দেশ্য ব্যক্তির **নিজস্ব ধর্ম**। কিন্তু উদ্দীপক একটি **বাহিরের শক্তি**। কোনো কোনো স্থলে,—যেমন যান্ত্রিক সংবেদনে—উদ্দীপক যান্ত্রিকও হইতে পারে। এইরূপ স্থলেও উদ্দীপক ব্যক্তির নিজস্ব ধর্ম (Subjective) বলিয়া অনুভূত হয় না, কিন্তু ইহা যেন বাহির হইতে আসিয়া

ব্যক্তির উপর প্রভাব বিস্তার করে (objective), এইরূপ মনে হয়। (খ) উদ্দীপকের তুলনায় উদ্দেশ্য **অপেক্ষাকৃত স্থায়ী,** কারণ ইহা সমগ্র আচরণের পরিচালনা শক্তি। আচরণের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত উহার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য অব্যাহত থাকে। কিন্তু উদ্দীপকের স্থায়িত্ব অপেক্ষাকৃত কম। ইহা একটি মুহূর্তের ঘটনা মাত্র। (গ) ইহারা পরস্পরসাপেক্ষ। উদ্দীপকের প্রতিক্রিয়া উদ্দেশ্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়। ক্ষুধার্ত ইঁদুর সহজেই খাদ্য দেখিতে পায়, কারণ খাদ্য অনুসন্ধান করিবার উদ্দেশ্য উহাকে খাদ্য দেখিতে পাইবার জন্য প্রস্তুত করিয়া রাখে। আবার উদ্দীপকও উদ্দেশ্যকে নিয়ন্ত্রিত করে। যেমন গমরাশি সম্মুখে থাকিলেই, মোরগের আহার করিবার উদ্দেশ্য সাধিত হয়।

উদ্দেশ্য ও প্ররোচনা (Motive and Incentive)

ক্ষুধার্ত ইঁদুর খাদ্যের সন্ধান করে কেন? উত্তরে আরও বলা যায় যে সে খাদ্য অনুসন্ধানে প্ররোচিত হয় বলিয়াই এইরূপ করে। উদ্দেশ্য এবং প্ররোচনা অথবা ইন্‌সেন্‌টিভ্‌-এর মধ্যে **পার্থক্য** এই যে উদ্দেশ্য না থাকিলে প্ররোচনা কাজ করিতে পারে না, অর্থাৎ প্ররোচনা উদ্দেশ্যের পূর্ব অস্তিত্ব মানিয়া লয়। **উদ্দেশ্য থাকিলে প্ররোচনা সেই উদ্দেশ্য সাধনে সহায়তা করে মাত্র**। যেমন পিঞ্জরাবদ্ধ ক্ষুধার্ত ইঁদুরের স্বাভাবিক উদ্দেশ্য খাদ্য অনুসন্ধান করা। এইরূপ ইঁদুরের সম্মুখে, পিঞ্জরের বাহিরে খাদ্য রাখিলে, এই খাদ্য উহাকে পিঞ্জর হইতে বাহির হইয়া খাদ্য আহার করিতে প্ররোচিত করে। আবার নিয়োগকর্তা উৎপাদন বাড়াইতে চাহিয়া, শ্রমিককে অধিক পরিশ্রমে প্ররোচিত করিবার উদ্দেশ্যে হয়ত তাহাকে লভ্যাংশ বা বোনাস্‌ দিতে পারেন। এই ক্ষেত্রে শ্রমিকগণের পরিশ্রম করিবার উদ্দেশ্য পূর্বেই ক্রিয়াশীল ছিল। বোনাস্‌-এর প্ররোচনা শুধু এই পূর্ব হইতে ক্রিয়াশীল উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা ও ইচ্ছাকে অধিকতর শক্তিশালী করে।

৭। উদ্দেশ্যের শ্রেণীভেদ

মানুষ অসংখ্য উদ্দেশ্য লইয়া কাজ করে। অসংখ্যতা সত্ত্বেও ইহাদের মধ্যে কয়েকটি মূল ঐক্যসূত্র রহিয়াছে।

উড্‌ওয়ার্থ-এর শ্রেণীবিভাগ

উড্‌ওয়ার্থ উদ্দেশ্যকে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা (ক) যে সকল উদ্দেশ্য **যান্ত্রিক প্রয়োজনের উপর নির্ভরশীল,** (খ) **জরুরী উদ্দেশ্য** (Emergency motive) এবং (গ) **বিষয়মুখী** (objective **উদ্দেশ্য**।

(ক) যান্ত্রিক অভাব, এই অভাব পূরণের যে তাড়না এবং উদ্দেশ্যরূপে দেখা দেয়, তাহাকে **যান্ত্রিক উদ্দেশ্য** (Organic motive) বলা যায়। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শ্বাসক্রিয়া, দূষিত পদার্থের নিঃসরণ প্রভৃতি যান্ত্রিক অভাবগুলির উদ্দেশ্য হইল খাদ্য, পানীয়, বাতাস ইত্যাদি। কামের উদ্দেশ্য হইল স্ত্রী-পুরুষের যৌন মিলন। আবার কর্ম এবং কর্ম-বিরতি বা বিশ্রামের উদ্দেশ্য হইল দেহের পেশী, স্নায়ু, তন্তু প্রভৃতির স্বাভাবিকতা বজায় রাখা। যান্ত্রিক উদ্দেশ্য চেতন না হইয়া **অবচেতনও হইতে পারে**। আবার ক্ষুধা, তৃষ্ণা প্রভৃতি অভাবগুলি যে ক্রিয়া বা চেষ্টা সৃষ্টি করে উহা এক একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য লাভ না হওয়া পর্যন্ত বিরত হয় না। ইহারা চেতন এবং অচেতন এই উভয় প্রকারই হইতে পারে।

(খ) জরুরী উদ্দেশ্য (Emergency motive) যান্ত্রিক নয়। ইহারা **পারিবেশিক**, অর্থাৎ পরিবেশের কোনো বিপজ্জনক অবস্থা দূর করিতে অথবা উহার সম্মুখীন হইতে চায়। যেমন পলায়ন উদ্দেশ্যের মূলে থাকে এমন কোনো বিপদ বা বিপদের সম্ভাবনা, যাহার ফলে ভয় হয় এবং পলায়ন করিয়া নিরাপদ হইবার চেষ্টা জাগে। বিপদে ভয় প্রায়ই শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতার ফল। যেমন, হয়ত দুই বৎসরের ছোট শিশু সাপের গায়ে হাত দিতে ভয় পায় না, তিন বা চার বৎসর বয়স্ক শিশু হয়ত একটু সতর্ক হইয়া উহার গায়ে হাত দেয় এবং আরও বড় বালক বালিকারা সাপ দেখিয়া ভয় পায়।

যোধন উদ্দেশ্য (Combat motive)

আবার, যোধন বা যুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্য অতি শৈশবকালেই প্রকাশিত হয়। শিশুকে তাহার অভিপ্রেত কাজে বাধা দিলে সে রাগিয়া যায় এবং হাত পা ছুঁড়িয়া, লাফাইয়া ঝাঁপাইয়া এবং কাঁদিয়া কাটিয়া বিদ্রোহ প্রকাশ করে। বাধা অথবা স্বাধীনতা খর্ব করাই যোধন উদ্দেশ্যের প্ররোচক বা উদ্দীপক কারণ এবং ইহা দূর না করিয়া এই উদ্দেশ্য নিরস্ত হয় না। যোধন একটি **সহজাত** উদ্দেশ্য। কিন্তু **শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার** ফলে ইহার পরিবর্তন ঘটে। প্রতিপক্ষ প্রবল হইলে, অপমানিত ব্যক্তি তাহাকে সোজাসুজি আক্রমণ করিয়া তাহার সুনাম এবং সামাজিক মর্যাদা নষ্ট করিবার জন্য সচেষ্ট হয়।

বাধা দূর করিবার উদ্দেশ্য (Motive of overcoming obstacles)

আবার বাধা দূর করিবার উদ্দেশ্য একটি মৌলিক উদ্দেশ্য। কাজ করিতে করিতে বাধা উপস্থিত হইলে, তাহা দূর করিবার সঙ্কল্প জাগে। অবশ্য বাধা দুরতিক্রম্য মনে হইলে, চেষ্টাত্যাগও ঘটিতে পারে। এই উদ্দেশ্য **সহজাত**। কিন্তু **অভিজ্ঞতা ও**

শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে এই উদ্দেশ্য সাধনের নানা উপায় উদ্ভাবিত হইতে পারে। বাধা দূর করিবার চেষ্টা নানা দৈহিক ভঙ্গীতে প্রকাশিত হয়। দন্ত ঘর্ষণ, মুষ্টি বদ্ধ করা, ঘাড় শক্ত করা, ভ্রূকুঞ্চন প্রভৃতি অঙ্গ-ভঙ্গী বাধা অতিক্রম করিবার স্থির সঙ্কল্প প্রকাশ করে। এই উদ্দেশ্যটিকে প্রাধান্য বিস্তারের উদ্দেশ্যও (Mastery motive) বলা যায়। বাধা অতিক্রম করিতে গিয়া নিজ প্রাধান্য অনুভূত হয় এবং ইহার কৃতিত্ব আনন্দদায়ক হয়। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্যক্তি কাজে বেশী উৎসাহ বোধ করে এবং কাজের আকর্ষণ বাড়াইয়া তোলে।

অনুসরণ করিবার উদ্দেশ্য (Pursuit motive)

অনুসরণ করিবার উদ্দেশ্য প্রকাশিত হয় শিকার বা বাঞ্ছিত বস্তু পাইবার আগ্রহে। ইহা একটি **জরুরী উদ্দেশ্য,** কারণ শিকার বা বাঞ্ছিত বস্তু উপস্থিত হইবামাত্র উহার অনুসরণ না করিলে অথবা উহার পশ্চাতে না ছুটিলে, উহা ফসকাইয়া যাইতে পারে। এই উদ্দেশ্য নানাপ্রকার খেলায় নানাভাবে ক্রিয়াশীল হয়, যদিও আসলে ইহা সহজাত। অনুসরণ উদ্দেশ্যের সঙ্গে প্রায়ই **প্রতিযোগিতা উদ্দেশ্য** (Competitive motive) মিলিত হয়, কারণ শিকার বা বাঞ্ছিত জিনিসটি আয়ত্তের বাহিরে গিয়া অপর ব্যক্তির করতলগত হইতে পারে।

(গ) **বিষয়মুখী উদ্দেশ্য** (Objective motive) এবং আকর্ষণ (Interest) ব্যক্তির পরিবেশ এবং সমাজের সক্রিয় অংশীদাররূপে বাঁচিয়া থাকিবার উদ্দেশ্য এবং আকর্ষণ। শুধু উপস্থিত বাধা অতিক্রম করা বা শিকার লাভ করাই মানুষের বৃহত্তর জীবনের সার্থকতা নয়। মানুষ চায় তাহার চারিপাশের নানা বস্তু এবং ব্যক্তিকে জানিতে এবং উহাদের সহিত সামঞ্জস্য সাধন করিয়া আদান-প্রদান করিতে।

অনুসন্ধান উদ্দেশ্য (Exploration motive)

এই উদ্দেশ্যটি প্রধানতঃ প্রকাশিত হয় পরিবেশকে অনুসন্ধান করিয়া দেখিবার মধ্য দিয়া। শৈশব হইতেই অনুসন্ধান প্রবৃত্তি দেখা দেয়। শিশু প্রথমে চোখ, কান, হাত মুখ প্রভৃতি দিয়া পারিবেশিক বস্তু বা ব্যক্তিদের অনুসন্ধান করিয়া বুঝিতে চায়। তারপর হাঁটিতে শিখিলে, শিশু চলিয়া ফিরিয়া তাহার অনুসন্ধানকার্য চালায়।

নাড়াচাড়া উদ্দেশ্য (Manipulation motive)

নাড়াচাড়া করাও শিশুর পরিবেশ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিবার একটি প্রধান উপায়। শিশু কোনো আকর্ষণীয় বস্তুকে দেখিয়াই সন্তুষ্ট হয় না, কিন্তু উহা ধরিতে বা পাইতে চায়—উহাকে ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া ফেলিয়া-ছুঁড়িয়া নানাভাবে দেখিতে চায়। বস্তুর

অনুসন্ধান এবং নাড়াচাড়া করিয়া শিশু পৃথিবীর সহিত পরিচিত হয়। নানারকমের খেলনা লইয়া খেলা করিয়া সে তাহার অনুসন্ধান এবং নাড়াচাড়া করিবার প্রবৃত্তি মিটায়।

আকর্ষণ পারিবেশিক বস্তু এবং ব্যক্তির জ্ঞানলাভের সহায়ক। অনুসন্ধান এবং নাড়াচাড়া করিবার পর অনেক বস্তু বা ব্যক্তিতেই শিশুর আকর্ষণ থাকে না। যে সকল বস্তু বা ব্যক্তি শিশুকে আকৃষ্ট করে, সে উহাদের সম্পর্কে সক্রিয় হয়। কতকগুলি বস্তুতে শিশুর সহজাত আকর্ষণ থাকে, যেমন উজ্জ্বল রং, মিষ্ট কণ্ঠস্বর প্রভৃতি। যে সকল বস্তু শিশুকে আনন্দিত করে, সেইগুলি তাহার নিকট আকর্ষণীয়, আবার যেগুলি তাহাকে পীড়া দেয়, সেইগুলি তাহার নিকট বিরক্তিকর। অথবা সে সকল বস্তু বা ব্যক্তি সম্পর্কে শিশু নিজেকে মানাইয়া লইতে পারে, তাহারাই তাহার নিকট আকর্ষণীয়।

৮। উদ্দেশ্যের শক্তি (Strength of motive)

সকল উদ্দেশ্যই যে সমান শক্তিশালী তাহা নয়। উদ্দেশ্যের শক্তি নানারূপে নির্ণয় করা যাইতে পারে। যেমন কোনো ব্যক্তি যদি তাহার সন্তানদের লেখাপড়ার জন্য কম ব্যয় করিয়া উহাদের বিলাসিতার জন্য বেশী ব্যয় করেন, তাহা হইলে প্রমাণিত হয় যে ঐ ব্যক্তির বিলাসিতার উদ্দেশ্য শিক্ষার উদ্দেশ্য অপেক্ষা বেশী শক্তিশালী।

উদ্দেশ্যের শক্তি নির্ণয় করিবার পদ্ধতি

উদ্দেশ্যের শক্তি নির্ণয় করিবার জন্য নানারূপ পরীক্ষা ও প্রয়োগের সাহায্য লওয়া হইয়াছে। যেমন **প্রতিবন্ধক পদ্ধতির** (Obstruction method) সাহায্যে ইঁদুর প্রভৃতি প্রাণীর উদ্দেশ্য পূরণের পথে বাধা স্থাপন করিয়া উহাদের উদ্দেশ্যের আপেক্ষিক শক্তি নিরূপণ করা হইয়াছে। কোনো উদ্দেশ্য পূরণের প্রশ্ন না থাকিলেও, হয়ত এই প্রাণী বিনা কারণেই সেই বাধা কয়েকবার অতিক্রম করে। কিন্তু বিনা উদ্দেশ্যে সে যতবার এই বাধা অতিক্রম করে, কোনো উদ্দেশ্য থাকিলে, সে উহা অপেক্ষা অনেক বেশী বার বাধা অতিক্রম করিয়া থাকে। যেমন অনুসন্ধানের, যৌন মিলনের, খাদ্য বা পানীয় অন্বেষণের উদ্দেশ্য থাকিলে এবং মাতৃস্নেহের তাড়নায়, ঐ প্রাণী বিনা কারণে বাধা অতিক্রম করিবার বার বা সংখ্যার তুলনায় যথাক্রমে দ্বিগুণ, চতুর্গুণ, ছয়গুণ, এবং সাতগুণ বেশী বার সেই বাধা অতিক্রম করে।

আরও দেখা গিয়াছে যে প্রাণী উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যের যত কাছাকাছি উপস্থিত হয়,

উহার গতিবেগও তত বাড়িয়া যায়। খাঁচা বাক্সে আবদ্ধ ইঁদুর বা বিড়াল খাদ্যের কাছাকাছি আসিয়া অত্যন্ত দ্রুতগতি হয় এবং হয়ত খাদ্যের উপর লাফাইয়া পড়ে।

শিক্ষণ পদ্ধতি (Learning method) সাহায্যেও উদ্দেশ্যের শক্তি নিরূপণ করা যাইতে পারে। যত সহজে কোনো ক্রিয়া শিক্ষা করা যায়, সেই ক্রিয়ার উদ্দেশ্য তত প্রবল। ক্ষুধার্ত পিঞ্জরাবদ্ধ বিড়াল খাদ্য গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যে যত তাড়াতাড়ি পিঞ্জরের বাহিরে আসিতে শিখে, তৃপ্ত বিড়াল তত তাড়াতাড়ি তাহা শিখিতে পারে না।

৯। কার্যের প্ররোচক (Incentive)

প্রতিযোগিতা (Competition)

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে কতকগুলি প্ররোচক কার্যে সহায়ক হয়। যেমন **প্রতিযোগিতা** কার্যের প্ররোচক। কোনো শ্রেণীর একটি ব্যক্তি কোনো কাজ করিতে পারিলে, ঐ শ্রেণীভুক্ত অন্যান্য ব্যক্তিও ঐ কাজ করিতে চেষ্টা করে, অবশ্য কাজটি যদি একেবারেই তাহার আয়ত্তের বাহিরে না হয়। যেমন দৌড় প্রতিযোগিতায় অন্যান্য প্রতিযোগীকে পিছনে ফেলিয়া অগ্রসর হইবার ইচ্ছা আরও দ্রুত দৌড়ানোর কারণ হইয়া দাঁড়ায়।

আত্ম-প্রতিযোগিতা (Self-competition)

আবার আত্ম-প্রতিযোগিতাও অনেক সময় বিশেষ কার্যকরী হইয়া দাঁড়ায়। কোনো ব্যক্তি হয়ত প্রত্যেকটি পরবর্তী চেষ্টায় পূর্ববর্তী চেষ্টার ফলকে অতিক্রম করিয়া যাইতে চায়। ষান্মাসিক পরীক্ষায় যে ফল হইয়াছে, বার্ষিক পরীক্ষায় তাহা ছাড়াইয়া যাইতে হইবে—এইরূপ সঙ্কল্প অনেক ছাত্রের লেখাপড়ায় উন্নতির একটি কারণ হইতে পারে।

উদ্দেশ্য

কোন একটি স্পষ্ট উদ্দেশ্য সম্মুখে থাকিলে, কর্মে আত্মোন্নতি সম্ভব হয়। উদ্দেশ্য-হীন কাজ অনেক সময় নীরস ও নিস্তেজ হইয়া দাঁড়ায়। যেমন পরীক্ষা আসন্ন হইলে, পড়াশুনায় ছাত্রের মনোযোগ বাড়িয়া যায়। অথবা এতটা উঁচু লাফাইতে হইবে এইরূপ উদ্দেশ্য থাকিলে, লম্ফনে উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। উদ্দেশ্যহীনভাবে লাফাইয়া চলিলে, এইরূপ উন্নতি ঘটে না।

উৎসাহদান, বিশ্রাম, আত্মবিশ্বাস প্রভৃতি

অন্যের নিকট হইতে কাজ আদায় করিয়া লইতে হইলে, তাহাকে নানা-প্রকারে কাজের উৎসাহ দিতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে কাজ করিবার যোগ্যতা, উপযুক্ত স্বাস্থ্য, অন্যান্য কর্মীর সহিত সহযোগিতা, ঊর্ধ্বতন কর্মিগণের প্রতি বিশ্বাস, মাঝে মাঝে কর্মবিরতি বা বিশ্রাম থাকাও প্রয়োজন। সর্বোপরি থাকা চাই কর্মে সততা এবং আত্মবিশ্বাস। আবার, কাজ করিবার উদ্দেশ্য কি এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনে লাভ বা ক্ষতি কি, এই সকল বিষয়ের ধারণা না থাকিলে, কার্য ফলপ্রসূ হয় না। বিশেষ করিয়া যুদ্ধ-বিগ্রহ কালে যোদ্ধা বা সৈনিকের এই জাতীয় গুণগুলি থাকা দরকার।

উদ্দেশ্য এবং অভিপ্রায় (Motive and Intention)

উদ্দেশ্য (Motive) এবং অভিপ্রায় (Intention) প্রায়ই সমার্থকরূপে ব্যবহৃত হয়। বস্তুতঃ ইহাদের মধ্যে এমন পার্থক্য রহিয়াছে, যাহা লক্ষ্য করিবার মত। ব্যাপক অর্থে এই দুইটিই কোন লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যাভিমুখী শক্তি বুঝায়। কিন্তু যথার্থভাবে অভিপ্রায় শুধু লক্ষ্যাভিমুখিতাই বুঝায় না, তদুপরি বুঝায় লক্ষ্য সম্বন্ধে দূরদৃষ্টি এবং লক্ষ্যাভিমুখী কাজের দায়িত্ব স্বেচ্ছায় গ্রহণ। অভিপ্রায়ে যেমন কোনো উদ্দেশ্য সাধন করিবার স্থির সঙ্কল্প থাকে, তেমনই ঐ উদ্দেশ্য সাধন করিবার উপায়ও অবলম্বিত হয়। অভিপ্রেত উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত করিবার জন্য বুদ্ধি, শক্তি এবং নিষ্ঠা থাকাও আবশ্যক।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, **অভিপ্রায় উদ্দেশ্য হইলেও, উদ্দেশ্য অভিপ্রায় নাও হইতে পারে**। অত্যন্ত স্পষ্ট এবং শক্তিশালী উদ্দেশ্যই অভিপ্রায়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে অভিপ্রায়ে প্রায়ই একাধিক উদ্দেশ্য থাকে। কাহাকেও সাহায্য করিবার অভিপ্রায়ে যেমন তাহাকে সাহায্য করিবার উদ্দেশ্য থাকে, তেমনই আত্মপ্রাধান্য প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যও থাকিতে পারে।

৬১। শিক্ষালব্ধ বা অর্জিত উদ্দেশ্য
(Learned or Aquired motive)

উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট এবং অপরিবর্তনীয় নয়—কিন্তু শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার ফলে ইহা পরিবর্তিত হইতে পারে। দৈহিক বা জৈব প্রয়োজন মিটাইবার উদ্দেশ্যই মুখ্য। কিন্তু ইহার সহিত গৌণ বা উৎপন্ন (Derived) উদ্দেশ্যও যুক্ত হয়। যেমন ক্ষুধা

প্রয়োজনের উদ্দেশ্য হইল খাদ্য। কিন্তু কোন বিশেষ খাদ্যে রুচি এবং অরুচি অভ্যাস ও শিক্ষার ফল। সুতরাং ইহা সহজাত নয়, কিন্তু অর্জিত এবং গৌণ।

সামাজিক উদ্দেশ্য (Social motive)

অনেক প্রয়োজন মিটাইতে গিয়া অপরের সহযোগিতার দরকার হয়। এই জাতীয় প্রয়োজনকে সামাজিক প্রয়োজন বলে। আইন মানিয়া চলা, পরিচ্ছন্নতা, পারিপাট্য, সততা, শিষ্টতা, চরিত্র, গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রভৃতি সামাজিক প্রয়োজন এবং উদ্দেশ্যের দৃষ্টান্ত। সামাজিক উদ্দেশ্যকে জোরদার করিবার অনেক উপায় আছে, যেমন নানা আচার-বিচার, ন্যায়-নীতি, প্রতিষ্ঠান, বাধা-নিষেধ প্রভৃতি।

শিক্ষা এবং অভ্যাসের ফলে যে সকল উদ্দেশ্য অর্জিত হয়, তাহার বেশীর ভাগই সামাজিক। মানুষ সামাজিক জীব। সুতরাং সে সামাজিক উদ্দেশ্যের দ্বারা পরিচালিত হয়। তাহার মধ্যে কতকগুলি সামাজিক তাড়না বা নোদনা আছে। (ক) যেমন **নির্ভরতা** একটি সামাজিক নোদনা। একাকী অবস্থায় মানুষ নিজকে অসহায় বোধ করে। সে অন্যের সহিত সহযোগিতা অথবা অন্যের উপর নির্ভর করিতে চায়। শৈশব হইতে আরম্ভ করিয়া কৈশোর পর্যন্ত সে নিজে নিজের ভালোমন্দ, ন্যায়-অন্যায় প্রভৃতি বুঝিতে পারে না এবং এইজন্য সে পিতামাতার উপর নির্ভর করে। পরিণত বয়সেও মানুষ অন্যের উপর নির্ভর করিবার অভ্যাস সহজে কাটাইয়া উঠিতে পারে না।

(খ) মানুষ **সঙ্গী অথবা সাথী** এবং তাহার যৌন জীবনের অংশীদার কামনা করে এবং তাহার উপর সে নির্ভর করিতে চায়। (গ) মানুষ চায় **সমাজে একটি বিশিষ্ট স্থান (status)** বা অংশ। এই চাহিদাটি মানুষকে সমাজস্থ অন্যান্য মানুষ হইতে পৃথক করিয়া দেয়। ইহাকে ব্যক্তিগত চাহিদা (egoistic need) বলা সঙ্গত হইবে না, কারণ এই চাহিদা পূরণ করিতে হইলে ব্যক্তিকে সমাজস্থ আর পাঁচজনের সাহায্য লইতে হয়। বিশিষ্ট স্থানলাভের চাহিদার সহিত সমাজে **মর্যাদা** (prestige) এবং **ক্ষমতা** (power) লাভের চাহিদাও মিশ্রিত থাকে। এইরূপ ইচ্ছার আর একটি রূপ হইল সমাজস্থ অন্যান্য লোকের তুলনায় নিজ শ্রেষ্ঠত্ব লাভ অথবা আত্মপ্রাধান্য বিস্তার করা। (ঘ) আর একটি সামাজিক উদ্দেশ্য বা চাহিদা হইল সমাজে এমন **নিরাপদ স্থান (Security)** লাভ করা, যাহা হইতে বিচ্যুত হওয়ার সম্ভাবনা কম।

উপরোক্ত চাহিদা বা তাড়নাগুলি সামাজিক উদ্দেশ্য সাধনে সক্রিয় হয়। সুতরাং ইহাদিগকে সামাজিক উদ্দেশ্যও বলা হয়।

ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য (Egoistic motive)

ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য ও সামাজিক উদ্দেশ্য **পরস্পরসাপেক্ষ**। ব্যক্তি সমাজের অংশ। তাই নিছকভাবে ব্যক্তিগত কোনো উদ্দেশ্য সম্ভব কিনা, তাহাতে সন্দেহ আছে। আল্‌পোর্ট বলিয়াছেন যে অর্জিত বা গৌণ উদ্দেশ্য প্রায়ই প্রধান বা মুখ্য উদ্দেশ্য হইতে পৃথকভাবে কাজ করে। কোনো দরিদ্র বালক হয়ত প্রথমে অন্নবস্ত্র সংস্থানের জন্য টাকা রোজগার করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু জীবিকা সংস্থানের অভাব মিটিবার পর হয়ত সে টাকা জমানোই রোজগারের উদ্দেশ্য করিয়া লইল। বৃদ্ধ লোক কর্ম হইতে অবসর গ্রহণের পরেও হয়ত চাকুরি ছাড়িতে চাহে না, যদিও তাহার খাওয়া পরার কোনো অভাব নাই। আবার যৌন ক্ষমতা কমিয়া যাইবার পরও হয়ত মধ্যবয়স্ক বা বৃদ্ধ লোক যৌন আকর্ষণ কাটাইয়া উঠিতে পারিল না।

উচ্চাকাঙ্ক্ষা (Ambition) ব্যক্তিজীবনের উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইতে পারে। এই উচ্চাকাঙ্ক্ষার সীমা (Level) এবং আস্পৃহা (Aspiration) **পরীক্ষা করিয়া বাহির করা যায়**। যেমন, পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় কেমন করিবে বলিয়া আশা করে, তাহা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার উচ্চাকাঙ্ক্ষার সীমা বুঝা যাইতে পারে। পরীক্ষার্থী অতীতে যে সকল পরীক্ষা দিয়াছে, তাহার সাফল্য বা কৃতিত্ব কি পরিমাণে তাহার উচ্চাকাঙ্ক্ষার সীমাকে প্রভাবিত করিয়াছে, তাহাও নির্ণয় করা যায়। উচ্চাকাঙ্ক্ষার সীমা অনেকটা নির্ভর করে ব্যক্তির স্বভাব বা প্রকৃতির উপর। যেমন, কোনো কোনো ব্যক্তি স্বভাবতঃ নিস্তেজ এবং নিষ্ক্রিয়, আবার কেহ কেহ উৎসাহী এবং উদ্যোগী। উচ্চাকাঙ্ক্ষার সীমা ব্যক্তির আত্মমর্যাদাবোধের উপরও অনেকাংশে নির্ভর করে। তাহা ছাড়া, উচ্চাকাঙ্ক্ষার সীমা নির্ভর করে ব্যক্তি পূর্বে যে কৃতিত্ব লাভ করিয়াছে, তাহারও উপর।

১২। নির্জ্ঞান প্রেষণা (Unconscious mativation)

প্রেষণার উৎস যে শুধু চেতন মনেই নিহিত থাকে, তাহা নয়। নির্জ্ঞান বা অচেতন মনও প্রেষণার উৎস হইতে পারে। ব্যক্তির আচরণ যে প্রেষণার প্রকাশ, তাহা তাহার অগোচরেও থাকিতে পারে। কোনো বুদ্ধিমান এবং বিবেচক ব্যক্তি হয়ত হঠাৎ রাগিয়া গিয়া কাণ্ডজ্ঞান হারাইয়া বসিতে পারে, এবং কেন সে অকস্মাৎ এইরূপ অগ্নিশর্মা মূর্তি ধারণ করিল, তাহা তাহার নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাত থাকিতে পারে। আবার কোন ব্যক্তি হয়ত আজগুবি স্বপ্ন দেখিয়া, কেন যে এইরূপ স্বপ্ন

দেখিল, তাহা একেবারেই না জানিতে পারে। আবার কেহ হয়ত সামান্য কারণেই ভীত হইয়া পড়ে, অথচ জানে না, এইরূপ ভীত হইবার কারণ কি।

নির্জ্ঞান উদ্দেশ্যের কারণ

নির্জ্ঞান উদ্দেশ্যের একটি কারণ এই যে অনেক উদ্দেশ্যই অর্জিত হইয়া অভ্যাসে পরিণত হয়। এই সকল অর্জিত অভ্যাস **অজ্ঞাতভাবে** আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। অনেক মুদ্রাদোষ অথবা আচরণ মনের অজ্ঞাতে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে। কেহ হয়ত কথা বলিতে বলিতে নখ কামড়ায় বা খোঁটে, টেবিলে টোকা দেয়, নিজ কান টানে, ক্লাসে পড়াইতে পড়াইতে পায়চারি করিতে থাকে, অথচ সে জানে না যে সে এইরূপ আচরণ করিতেছে।

নির্জ্ঞান উদ্দেশ্যের আর একটি প্রধান কারণ এই যে, উহা প্রায়ই এমন **অপ্রীতিকর** অবস্থায় অর্জিত হয়, যাহা আমরা ভুলিতে চাই। কতকগুলি অপ্রীতিকর উদ্দেশ্য আমরা সংজ্ঞান মনে অথবা চেতন ভাবে স্বীকার করিতে চাহি না। ইহারা **অবদমিত হইয়া নির্জ্ঞান মনে অপসারিত** এবং ইচ্ছাকৃত ভাবে **বিস্মৃত** হয়। আমরা এই নির্জ্ঞান উদ্দেশ্যগুলির প্রতি চোখ বুজিয়া থাকিতে চাই। উহারা **ছদ্মবেশে বা বিকৃতভাবে প্রকাশিত হয়।** যেমন আমরা প্রায়ই ব্যক্তির অপ্রিয় নাম এবং অপ্রীতিকর কাজ অথবা ঘটনা ভুলিয়া যাই।

নির্জ্ঞান উদ্দেশ্যের বিকৃত প্রকাশ

নির্জ্ঞান উদ্দেশ্যের বিকৃত প্রকাশ নানাভাবে ঘটিতে পারে। (১) কোনো নির্জ্ঞান উদ্দেশ্য হয়ত বিপরীত ভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে। নির্জ্ঞান উদ্দেশ্যের বিপরীত প্রকাশকে ফ্রয়েড্ **"প্রতিক্রিয়া গঠন"** (Reaction formation) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। যেমন কোনো দুষ্ট বা দুর্বৃত্ত ব্যক্তি হয়ত রাতারাতি সাধু বনিয়া যাইতে পারে। অতিভক্তি যে অনেক সময় চোরের লক্ষণ হইতে পারে, তাহা সুবিদিত।

(২) **অভিক্ষেপ** (Projection) আর একটি উপায়, যাহার সাহায্যে নির্জ্ঞান উদ্দেশ্য বিকৃত উদ্দেশ্যের আকার লইয়া প্রকাশিত হয়। যেমন, যে ব্যক্তি সকলের নিকট হইতে অনিষ্টের আশঙ্কা করে (Persecution mania), সেই ব্যক্তিই হয়ত সকলের অনিষ্ট ঘটাইবার আকাঙ্ক্ষা বা উদ্দেশ্য অন্তরে অন্তরে পোষণ করে, অথবা যে পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন করে বা করিতে চায়, সে-ই হয়ত অন্যান্য নির্দোষ এবং সৎ পরীক্ষার্থীদিগের সততা-সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করে। আবার অন্য

স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্ত পুরুষ হয়ত নিজ পতিব্রতা স্ত্রীর সতীত্বে সন্দিগ্ধ হয়। এইরূপ অভিক্ষেপের ক্ষেত্রে ব্যক্তি নিজ উদ্দেশ্যটিকে চাপা দিয়া, অজ্ঞাতভাবে উহা অপরের স্কন্ধে চাপাইয়া দিতে দ্বিধাবোধ করে না।

(৩) **অভিক্রান্তি** (Displacement) অস্বীকৃত নির্জ্ঞান উদ্দেশ্যকে বিকৃতভাবে প্রকাশ করিবার আর একটি উপায়। এই উপায়ে কোনো উদ্দেশ্যের লক্ষ্যবস্তু অন্য কোন লক্ষ্যবস্তুর দ্বারা প্রচ্ছন্ন হইয়া যায়। আপিসের বড়বাবু হয়ত সাহেবের হাতে লাঞ্ছিত হইয়া, গৃহে আসিয়া নিজ স্ত্রীর উপর অত্যাচার করে। অথবা নবজাত ভ্রাতা বা ভগ্নীর উপর হয়ত শিশুর বিদ্বেষ প্রকাশিত হয় উহার পুতুল বা খেলনা নষ্ট করিবার মধ্য দিয়া। এই প্রক্রিয়াটি অনেকটা "উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে" চাপাইবার সামিল।

(৪) **যুক্ত্যাভাস** (Rationalisation) সাহায্যেও নির্জ্ঞান উদ্দেশ্য অন্য আকারে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে। ছাত্র হয়ত তাহার অকৃতকার্যতার জন্য শিক্ষকের বা পরীক্ষকের পক্ষপাতিত্ব, শিক্ষার দোষ, অথবা পড়ার সময়ের অল্পতা প্রভৃতিকে দায়ী করিতে পারে। আবার মা হয়ত ছেলের স্কুল কামাই হইবে অথবা সে অসৎ সঙ্গে মিশিবে, এই সকল আপত্তি তুলিয়া ছেলেকে নিজের কাছে আটকাইয়া রাখেন। আবার বাপ হয়ত নিতান্ত রাগের মাথায় ছেলেকে বেদম প্রহার করিয়া পরে নিজেকে এই মনে করিয়া সান্ত্বনা দেন যে, তিনি পুত্রের মঙ্গলের জন্যই তাহাকে প্রহার করিয়াছেন।

(৫) **ক্ষতিপূরণ** (Compensation) নির্জ্ঞান উদ্দেশ্যকে ছদ্ম আবরণে প্রকাশ করিবার আর একটি উপায়। ইহার সাহায্যে ব্যক্তি তাহার দুর্বলতা বা ত্রুটিকে অপেক্ষাকৃত কম দুর্বল ও ত্রুটিযুক্ত আচরণের দ্বারা গোপন করিবার চেষ্টা করে। যেমন কুরূপা নারী হয়ত গ্রন্থকীট হইয়া ওঠে, বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জন করে এবং এইরূপে সেই সম্মান বা সমাদর আদায় করিয়া লয়, যাহা সে তাহার রূপের দ্বারা লাভ করিতে পারে নাই। বেঁটে লোক হয়ত মস্ত বড় যোদ্ধা হইয়া তাহার খর্বতার ন্যূনতা পোষাইয়া লয়। আবার হয়ত নিরক্ষর পিতা সন্তানকে উচ্চশিক্ষিত করিয়া নিজ নিরক্ষরতার ক্ষতিপূরণ বা ত্রুটি সংশোধন করেন। অ্যাড্‌লার ব্যক্তির ত্রুটি সংশোধনের উপায় হিসাবে ক্ষতিপূরণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন।

(৬) **উদ্গতি** (Sublimation) নির্জ্ঞান উদ্দেশ্যের বিকৃত প্রকাশকে সাহায্য করে। অন্যান্য উপায়গুলির তুলনায় উদ্গতি নির্জ্ঞান উদ্দেশ্যকে সমাজ ও

কৃষ্টির সহায়ক কোনো ছদ্ম প্রকাশের পথে পরিচালিত করে। অর্থাৎ উদ্গতিতে কোনো নিম্নতর উদ্দেশ্য উচ্চতর উদ্দেশ্যের আবরণ লইয়া প্রকাশিত হয়। যেমন নির্জ্ঞান যৌন কামনা হয়ত বিজ্ঞান, ধর্ম, সঙ্গীত অথবা শিল্পকলা প্রভৃতি উচ্চতর সৃষ্টির মধ্য দিয়া তৃপ্তিলাভ করে। কোনো বালবিধবা হয়ত তাহার অতৃপ্ত মাতৃত্ব কামনার তৃপ্তি আস্বাদন করে সেবাব্রতের মধ্য দিয়া।

(৭) আবার **মনঃসৃষ্টির** (Phantasy) মধ্য দিয়াও নির্জ্ঞান উদ্দেশ্য সংজ্ঞানে প্রকাশিত হইতে পারে। যেমন সমাজে উপেক্ষিত বা ব্যর্থতাবিড়ম্বিত ব্যক্তি হয়ত কল্পনায় তাহার ন্যূনতা পোষাইয়া লয়।

(৮) **প্রত্যাবৃত্তি** (Regression) আর একটি উপায়, যাহার সাহায্যে নির্জ্ঞান উদ্দেশ্য সংজ্ঞানে চরিতার্থ হইতে পারে। প্রত্যাবৃত্তিতে ব্যক্তি বর্তমান পরিস্থিতিতে পরাস্ত হইয়া কোনো অতীত অবস্থায়—যেমন পরিত্যক্ত শৈশব অবস্থায়—ফিরিয়া যায়। যেমন নবজাত ভ্রাতা বা ভগ্নীর প্রাপ্য পিতামাতার মনোযোগ বা আদর কাড়িয়া লইবার উদ্দেশ্যে শিশু হয়ত তাহার বাল্যাবস্থার অভিনয় করে। সে হয়ত পাঁচ বৎসরের শিশু হইয়াও দুই বৎসরের শিশুর মত আধো আধো কথা বলে অথবা কাজ করে।

অনুশীলনী (Exercise)

1. What is motivation ? Analyse the factors constituting it. (Ans : pp. 184—185)

   প্রেষণা কাহাকে বলে ? প্রেষণার বিশ্লেষণ কর।

2. What are the main drives of behaviour ? Distinguish between purpose, drive and instinct. (Ans : pp. 185—186 ; 190—191)

   আচরণের প্রধান নোদকগুলি কি কি ? নোদকের সহিত উদ্দেশ্য এবং সহজ প্রবৃত্তির পার্থক্য দেখাও।

3. Explain hunger, thirst, sleep and sexual impulses as drives. (Ans : pp. 186—189)

   নোদকরূপে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা এবং কামাবেগের আলোচনা কর।

4. Define need. Distinguish between primary and secondary needs. (Ans : pp. 191—193)

   অভাব কাহাকে বলে ? মুখ্য এবং গৌণ অভাবের পার্থক্য দেখাও।

5. **Define motive. How does it differ from stimulus and incentive? Explain the principal motives after Woodworth.**
(Ans : pp. 193—197)
উদ্দেশ্য কাহাকে বলে? উদ্দেশ্যের সহিত উদ্দীপক এবং প্ররোচকের পার্থক্য কি? উডওয়ার্থ-এর প্রদর্শিত প্রধান উদ্দেশ্যগুলি আলোচনা কর।

6. **What are the methods of testing the strength of motives? Illustrate your answer with examples.** (Ans : pp. 197—198)
উদ্দেশ্যের শক্তি পরীক্ষার উপায়গুলি দৃষ্টান্ত সাহায্যে ব্যাখ্যা কর।

7. **Explain the main incentives to action. Distinguish between motive and intention.** (Ans : pp. 198—199)
কর্মের প্রধান প্ররোচকগুলি আলোচনা কর এবং উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায়ের পার্থক্য নির্ণয় কর।

8. **How would you distinguish between learned and the unlearned motives? Explain the main learned motives.**
(Ans : pp. 199 201)
অর্জিত এবং সহজাত উদ্দেশ্যের পার্থক্য নির্ণয় কর। প্রধান অর্জিত উদ্দেশ্য-গুলি কি কি?

9. **Explain the unconscious motivation of action. What are the mechanisms through which unconscious motivation takes place?** (Ans : pp. (201—204)
নির্জ্ঞান প্রেষণা কাহাকে বলে? কি কি উপায়ে নির্জ্ঞান প্রেষণা সক্রিয় হয়?

একাদশ পরিচ্ছেদ

উদ্দীপক, প্রতিক্রিয়া ; প্রতিক্রিয়া কাল

(Stimulus, Response ; Reaction-time)

১। উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়া

(ক) উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ ও সংজ্ঞা

উদ্দীপক কাহাকে বলে? অথবা উদ্দীপকের সংজ্ঞা কি? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে সাধারণভাবে উদ্দীপক বলিতে কি বুঝায় দেখা যাউক।

সাধারণ অর্থে উদ্দীপক বলিতে বুঝায় যাহা উদ্দীপিত বা উত্তেজিত করে। তাহা হইলে, উদ্দীপক নিশ্চয়ই কোনো শক্তি যাহা উত্তেজনা ঘটায়। এইবার প্রশ্ন ওঠে উদ্দীপক কোন্ বস্তুকে বা কাহাকে উত্তেজিত করে। আরও প্রশ্ন জাগে, উত্তেজনার ফল কি। এই প্রশ্ন দুটিরও সাধারণভাবের উত্তর দেওয়া যাইতে পারে। প্রথম প্রশ্নোত্তরে বলা যায় যে, উদ্দীপক উত্তেজিত করে কোনো প্রাণীকে বা মানুষকে। পরবর্তী প্রশ্নোত্তরে বলা যায় যে, উত্তেজনার ফল কোনো ক্রিয়া, যাকে বলা হয় প্রতিক্রিয়া।

এইবার **বৈজ্ঞানিক অর্থে** উদ্দীপক কাহাকে বলে দেখা যাউক। মানসজীবনের একটি মূল ক্রিয়া বা বৃত্তির নাম **সংবেদন**। সংবেদন, যেমন দেখা, শোনা, স্পর্শ করা, স্বাদ গ্রহণ করা, গন্ধ নেওয়া প্রভৃতি ঘটে উদ্দীপকের উত্তেজনায়। যেমন একটি রং বা **বর্ণ দেখিলাম**। এই বর্ণ-দেখা-রূপ সংবেদন ঘটে ঐ বর্ণের চক্ষুকে উত্তেজিত করার ফলে। এই ক্ষেত্রে বর্ণটি উহার দর্শন সংবেদনের **উদ্দীপক**। বর্ণটির উপস্থিতিতে ইহার সন্নিহিত ইথার (ether) আন্দোলিত হইয়া নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য এবং উচ্চতাসম্পন্ন তরঙ্গ সৃষ্টি করে। ঐ তরঙ্গ চক্ষুর বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করিয়া অক্ষিপটের (retina) পীতবিন্দু (yellow spot) সন্নিহিত দর্শননার্ভের (optic nerve) বহিঃপ্রান্তকে (peripheral end) উদ্দীপিত বা উত্তেজিত করে। এই উত্তেজনা দর্শননার্ভপ্রবাহ-রূপে অগ্রসর হইয়া মস্তিষ্কের দর্শনকেন্দ্রস্থ (Occipital lobe) দর্শননার্ভের অন্তঃপ্রান্তে (central end) পৌছায়। এই পর্যন্ত উত্তেজকরূপ বর্ণটির ক্রিয়া। এই ক্রিয়া অবশ্যই কোনো শক্তির। সুতরাং **উদ্দীপক যে একটি শক্তি তাহাতে সন্দেহ নাই**। দর্শননার্ভের উদ্দীপনার ফলে যাহা ঘটিল, তাহার নাম **প্রতিক্রিয়া**। এই

ক্ষেত্রে উদ্দীপক যে প্রতিক্রিয়া ঘটাইল, তাহা **সংবেদী প্রতিক্রিয়া** (sensory reaction), যাহার অন্য নাম সংবেদন।

এইবার **স্মরণ প্রতিক্রিয়ার উদ্দীপক** দেখাইয়া বিষয়টি বিশদ করিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে। যেমন একটি কবিতার একটি লাইন মনে আসিতেছেনা। এই অবস্থায় ঐ লাইনটির আরম্ভটুকু মনে করাইয়া দিলে, ঐটি উদ্দীপকের কাজ করিতে পারে। লাইনটির প্রথম অংশ যদি 'কাননে কুসুম কলি' হয়, তবে ঐটুকু উল্লেখ করিলেই হয়ত, পরবর্তী 'সকলি ফুটিল' অংশটি মনে পড়িয়া যায়। এইক্ষেত্রে মনে-করাইয়া-দেওয়া প্রথম অংশটি উদ্দীপকের কাজ করিল এবং তাহার **ফলে** মনে-আসা পরবর্তী অংশটি প্রতিক্রিয়া রূপে ঘটিল। এইরূপে একই লাইনের প্রথম অংশের উদ্দীপক এবং পরবর্তী অংশের প্রতিক্রিয়া হইবার কারণ কি ? কারণ এই যে, অতীতে কবিতাটি যতবার পড়া হইয়াছে, ততবারই প্রথম অংশের পরেই পরবর্তী অংশ পড়া হইয়াছে। ফলে এই দুই অংশের মধ্যে অনুষঙ্গসূত্র স্থাপিত হইয়াছে। কাজেই যেমন কাণ টানিলে মাথা আসে, তেমন পূর্ববর্তী অংশটি মনে করাইয়া দিবার ফলে, পরবর্তী অংশটি মনে পড়িল। এই ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী অংশটি মনে করাইয়া দেওয়া উত্তেজক বা **উদ্দীপক** এবং পরবর্তী অংশটি মনে পড়া **প্রতিক্রিয়া**।

তাহা হইলে, উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ সম্বন্ধে আমরা জানিলাম যে উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়া **উভয়ই শক্তিবিশেষ**। উহারা কি জাতীয় শক্তি এই বিষয়ের অধিক বিশ্লেষণ বিজ্ঞানের একটি জটিল সমস্যা। কাজেই, এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টায় বিরত হওয়া গেল। উদ্দীপক যে প্রকারের শক্তিই হউক না কেন, ইহা এমন এক শক্তি, যাহা কোন ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা ঘটাইতে সমর্থ। আবার, প্রতিক্রিয়াও এমন একটি শক্তি, যাহা উদ্দীপকের উত্তেজনায় **সাড়া** দিতে সমর্থ। শুধু তাহাই নয়। প্রতিক্রিয়া ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনায় সাড়া দিয়া উহাকে শান্ত করিতে সমর্থ।

এই আলোচনা হইতে উদ্দীপক (Stimulus) এবং প্রতিক্রিয়া (Reaction) কাহাকে বলে, অথবা উহাদের **সংজ্ঞা** স্পষ্ট হইয়া দাঁড়ায়। যে শক্তি জীবদেহকে কোনো প্রকারে বা উহার কোনো স্থানে উত্তেজিত করে তাহাকে **উদ্দীপক** বলে। আবার যে শক্তি উদ্দীপকের উত্তেজনায় কোনো ক্রিয়ায় সাড়া দেয় তাহাকে **প্রতিক্রিয়া** বলে।

বর্তমান পরিচ্ছেদের সর্বত্র উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়ার ব্যাখ্যাই স্থান পাইয়াছে।

(খ) উদ্দীপকের প্রকার ভেদ

উদ্দীপক নানাপ্রকার। উহা **ভৌত** (physical), **বৈদ্যুতিক** (electrical), **রাসায়নিক** প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার হইতে পারে। যেমন বর্ণসংবেদনের বেলায় বর্ণ এবং ইথর তরঙ্গের আকারে উহার চক্ষুকে উত্তেজিত করা একটি ভৌত উদ্দীপকের দৃষ্টান্ত। আবার কোন গন্ধদ্রব্যের গ্যাসীয় কণার মাধ্যমে নাসিকাকে উত্তেজিত করাও হয়ত ভৌত উদ্দীপকের দৃষ্টান্ত। কিন্তু কোন খাদ্যের লালাসিক্ত হইয়া জিহ্বাকে উদ্দীপিত করা একটি রাসায়নিক শক্তির দৃষ্টান্ত। এই সকল প্রকারভেদ পদার্থ-বৈজ্ঞানিক। কিন্তু যেহেতু আমাদের বিষয় পদার্থবিদ্যা নয়, কিন্তু মনোবিদ্যা, উদ্দীপকের প্রকারভেদ মনোবৈজ্ঞানিক হওয়া বাঞ্ছনীয়।

মনোবৈজ্ঞানিক দিক হইতে বলা যায় যে, উদ্দীপক **দুই প্রকার**, যথা **পর্যাপ্ত** (Adequate) এবং **অ-পর্যাপ্ত** (Inadequate)। যে উদ্দীপক ইন্দ্রিয়কে উত্তেজিত করিয়া **সংবেদন উৎপন্ন করিবার পক্ষে স্বভাবতঃ যথেষ্ট**, তাহাকে ঐ ইন্দ্রিয়ের এবং একটি বিশেষ সংবেদনের **পর্যাপ্ত উদ্দীপক** বলে। যেমন **ইথার তরঙ্গ** চক্ষুকে উত্তেজিত করিয়া দর্শন সংবেদন, **বায়ুতরঙ্গ** কর্ণকে উত্তেজিত করিয়া শব্দ সংবেদন, কোনো **দ্রবণীয় পদার্থ** জিহ্বার সংস্পর্শে আসিয়া স্বাদ সংবেদন এবং **গ্যাসীয় পদার্থ** নাসিকার ঝিল্লীকে উত্তেজিত করিয়া ঘ্রাণ সংবেদন ঘটাইবার পক্ষে **পর্যাপ্ত উদ্দীপক**।

পক্ষান্তরে যে উদ্দীপক স্বভাবতঃ কোনো সংবেদন বা প্রতিক্রিয়া **উৎপন্ন করিবার পক্ষে যথেষ্ট নয়, অথচ উহা উৎপন্ন করে,** সেই উদ্দীপককে ঐ প্রতিক্রিয়ার অ-পর্যাপ্ত উদ্দীপক বলে। যেমন আঘাত বা আঘাতের আশঙ্কা ব্যথা সংবেদনের পর্যাপ্ত উদ্দীপক। কিন্তু চক্ষুগোলকে আঘাত লাগিলে, ঐ আঘাত চক্ষুতে শুধু আঘাত সংবেদনই উৎপন্ন করে না আলোক সংবেদনও উৎপন্ন করে। এই ক্ষেত্রে **আঘাত আলোক সংবেদনরূপ প্রতিক্রিয়ার অ-পর্যাপ্ত উদ্দীপক**। আবার, চর্মকে সূচীবিদ্ধ করা ব্যথা সংবেদনের পর্যাপ্ত উদ্দীপক। কিন্তু চর্মের কোনো চাপবিন্দুকে সূচীবিদ্ধ করিলে, ঐ স্থানে ব্যথা সংবেদন না ঘটিয়া চাপ সংবেদন প্রতিক্রিয়াই ঘটে। অথচ চাপ সংবেদনের পর্যাপ্ত উদ্দীপক ইহা নয়। চাপ সংবেদনের পর্যাপ্ত উদ্দীপক চর্মের আকর্ষণ বা বিকর্ষণ। সুতরাং এই স্থলে **চাপবিন্দুতে সূচীভেদ চাপ সংবেদনের অ-পর্যাপ্ত উদ্দীপক**।

তাহা ছাড়া. উদ্দীপকের প্রকারভেদ **নানা দিক হইতে** করা যাইতে পারে।

মাত্রাভেদ অনুসারে একই উদ্দীপকের কম বা বেশী **তীব্রতা**, কম বা বেশী **ব্যাপকতা** থাকিতে পারে, যেমন আলোক, শব্দ প্রভৃতি উদ্দীপকের ক্ষেত্রে।

পরবর্তী অনুচ্ছেদে উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্টতর হইবে। ২। (ক) অনুচ্ছেদে প্রতিক্রিয়ার শ্রেণীভেদ দেখানো হইয়াছে। তৎপূর্বে উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়া এককের আলোচনা বাঞ্ছনীয়।

(গ) উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়া একক (Stimulus-response unit)

[সপ্তম পরিচ্ছেদের ১। ৪ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য]

উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়া একক বলিতে বুঝায়, সকল মানস বৃত্তিই এক বা একাধিক উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়া লইয়া গঠিত। একটি বৃহৎ সংখ্যা কতকগুলি এক-এর সমষ্টি। তেমনই কোনো জটীল মানসবৃত্তি কতকগুলি উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়া এককের সমষ্টি ছাড়া কিছু নয়। অনুষঙ্গবাদীদের (associationists) মতে প্রত্যেক মানসবৃত্তিকে বিশ্লেষণ করিলে এক বা এক অপেক্ষা বেশী উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়া একক পাওয়া যায়। শিক্ষণ (learning) একটি দৃষ্টান্ত। একটি কবিতা শিক্ষা করার অর্থ কতকগুলি উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়া একককে যুক্ত করা। 'পাখি সব' অংশটি পাঠ করিবার অব্যবহিত পরেই শিক্ষা করা হয় 'করে রব'। আবার 'করে রব' অংশটি পাঠ করিবার অব্যবহিত পরেই শিক্ষা করা হয় 'রাতি পোহাইল'। অনুরূপভাবে কবিতার অন্য প্রত্যেকটি পূর্ববর্তী অংশ এবং পরবর্তী অংশ অব্যবহিত পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সূত্রে শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়। ফলে পূর্ববর্তী অংশটি উপস্থিত হইলে, উহা উহার পরবর্তী অংশটি মনে করাইয়া দেয়।

এই ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী অংশটি উদ্দীপক এবং পরবর্তী অংশটি প্রতিক্রিয়া। ইহাদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। ইহারা,-এই সংযোজক চিহ্নে (hyphen) যুক্ত হইয়া দুইটিতে এক অথবা এককরূপে সক্রিয়। কাজেই কবিতাটি **কতকগুলি উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়া এককের (chain-reflex of stimulus-response) শৃঙ্খল ছাড়া কিছু নয়।** এই প্রসঙ্গে নবম পরিচ্ছেদের ৯ অনুচ্ছেদটি দ্রষ্টব্য।

এই মত অনেক মনোবিদই স্বীকার করেন না। যেমন **ম্যাক্‌ডুগ্যাল (McDougall)** প্রভৃতি উদ্দেশ্যবাদী (Hormic) মনোবিদ এই মতবিরোধী। ইহারা বলেন, **সব মানসবৃত্তিই চেতন বা অবচেতনভাবে কোনো উদ্দেশ্য সাধন করে।** কিন্তু উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়া একক মতবাদ (Stimulus-response unit theory)

অনুসারে প্রত্যেক মানসবৃত্তিই **যান্ত্রিক** (mechanical), **উদ্দেশ্যবিহীন এবং অন্ধ**। আবার **হ্বার-দাইমার** (Wertheimer), **কোয়েলার** (Kohler) প্রভৃতি গেষ্টাল্ট মনোবিদরাও এই মতের বিরোধী। ইহাদের মতে প্রত্যেক মানসবৃত্তিই এক একটি পূর্ণ বা গোটা বস্তু। ইহা কতকগুলি এককের সমষ্টি হইতে পারে না। **এককই বরং গোটা মানসবৃত্তির বিশ্লেষণ ফল**।

(ঘ) প্রতিক্রিয়ার প্রকারভেদ

উদ্দীপক প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন করে। **প্রতিক্রিয়া তিন শ্রেণীর** যথা কোনো **সংবেদন** দ্বিতীয়তঃ, কোনো **পেশীর বিচলন** এবং তৃতীয়তঃ, কোনো **গ্রন্থির রসক্ষরণ**।

উদাহরণ সাহায্যে তিন শ্রেণীর প্রতিক্রিয়ার পার্থক্য দেখানো যাইতে পারে। একটি তীব্র আলোক চক্ষুর বিভিন্ন অংশগুলি অতিক্রম করিয়া অক্ষিপটে প্রতিফলিত হইল। উহাকে সন্নিহিত দর্শন-নার্ভ উদ্দীপিত হইল। তারপর ঐ উদ্দীপনা নার্ভ-প্রবাহরূপে মস্তিষ্কের দর্শনকেন্দ্রে পৌঁছিল। সঙ্গে সঙ্গে আলোক **সংবেদন** রূপ প্রতিক্রিয়া ঘটিল। উত্তেজনাটি সংবেদীয় নার্ভের সন্নিহিত চেষ্টীয় নার্ভকে উদ্দীপিত করিল। ফলে চক্ষুর প্রসারণ বা সঙ্কোচনরূপ বিচলন বা **চেষ্টীয় প্রতিক্রিয়া** হইল। আলোকটি অত্যন্ত তীব্র হইলে, চক্ষুর অশ্রুগ্রন্থি (lachrymal) উত্তেজিত হইয়া **অশ্রু নিঃসারণ** ও ঘটাইতে পারে। এইটি **গ্রন্থীয়** প্রতিক্রিয়া।

তাহা হইলে, উল্লিখিত তথ্য হইতে তিন শ্রেণীর প্রতিক্রিয়া দেখা গেল—যথা, **সংবেদীয়, চেষ্টীয়** এবং **গ্রন্থীয়**। এই তিন শ্রেণী ছাড়া **অন্য তিন শ্রেণীর** প্রতিক্রিয়া হইতে পারে—যথা **সরল, যৌগিক** এবং **অনুষঙ্গ**। পরবর্তী অনুচ্ছেদে, এই তিন প্রকার প্রতিক্রিয়া প্রতিক্রিয়া-কাল প্রসঙ্গে আলোচিত হইয়াছে।

২। প্রতিক্রিয়া-কাল (Reaction-Time)

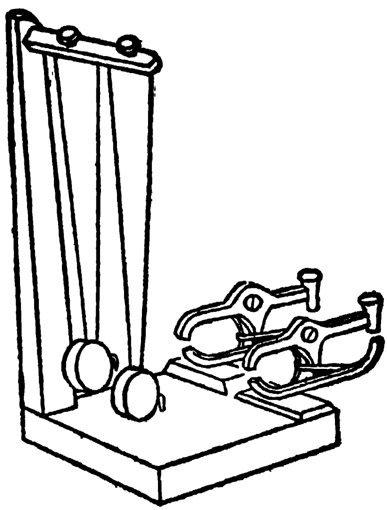
উক্ত উদাহরণটিতে মূল উদ্দীপক আলোক এবং চক্ষু মেলিয়া যাওয়া বা প্রসারণ এবং বুজিয়া যাওয়া বা সঙ্কোচন প্রভৃতি প্রতিক্রিয়ার মধ্যবর্তী ব্যবধানে অনেকগুলি ক্রিয়া ঘটিয়াছে। এই ক্রিয়াগুলি ঘটিতে কিছু কাল ব্যয়িত হয়। **উদ্দীপকের উপস্থিতি এবং প্রতিক্রিয়া ঘটিবার মধ্যবর্তী এই কাল-ব্যাবধানই প্রতিক্রিয়া-কাল**। প্রতিক্রিয়া যেমন সরল, যৌগিক এবং অনুষঙ্গভেদে তিন প্রকার, প্রতিক্রিয়া-কালও অনুরূপভাবে তিন শ্রেণীর।

নানারূপ প্রয়োগ এবং অন্তর্দর্শন পদ্ধতির সাহায্যে প্রতিক্রিয়া-কালের নির্ণয়চেষ্টা হইয়াছে। উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার বিভিন্ন প্রকৃতি এবং সংখ্যা অনুসারে প্রতিক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়াকাল (Reaction-time) প্রধানতঃ তিন প্রকার, যথা, সরল (Simple), যৌগিক বা জটিল (Compound) এবং অনুষঙ্গ (Associative)। যৌগিক প্রতিক্রিয়া-কাল আবার দুই রকমের হইতে পারে, যথা নির্বাচন (Choice) এবং ভেদ প্রতিক্রিয়া-কাল (Discrimination)। অনুষঙ্গ প্রতিক্রিয়া-কালও আবার অবাধ (Free) এবং সবাধ (Constrained) ভেদে দুই প্রকার।

(ক) সরল প্রতিক্রিয়া-কাল

যে প্রতিক্রিয়া মাত্র একটি উদ্দীপক হইতে সরাসরি সংঘটিত হয়, উহাকে **সরল প্রতিক্রিয়া** এবং উহাতে যে কাল ব্যয়িত হয় তাহাকে **সরল প্রতিক্রিয়া-কাল** বলে।

সরল প্রতিক্রিয়া-কালের নিরূপণ প্রণালী এইরূপ। প্রয়োগকর্তা (Experimenter) পাত্রকে আড়াল করিয়া একটি পর্দার পেছনে বসেন। তাঁহার নিকট হয়ত একটি সুইচ্ থাকে, যাহা টিপিবামাত্র পাত্রের নিকট স্থাপিত একটি বাল্ব জ্বলিয়া ওঠে এবং সঙ্গে সঙ্গে কাল-পরিমাপক (chronoscope) ঘড়ির কাঁটা চলিতে থাকে। পর্দার অপর দিকে পাত্র আসন গ্রহণ করেন। ঐ আলোক দেখিবামাত্র তিনি তাঁহার নিকট স্থাপিত আর একটি সুইচ্ টিপিয়া দেন, যাহার ফলে আলোকটি নিভিয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘড়ির কাঁটাটিও থামিয়া যায়। প্রয়োগকর্তা এইবার ঘড়ির কাঁটার গতির দ্বারা পরিমাপিত সময়টি লিপিবদ্ধ করিয়া নেন। ক্রনোস্কোপের প্রত্যেকটি দাগের সহিত পরবর্তী দাগের ব্যবধান এক সেকেণ্ডের এক-সহস্র-অংশ হিসাবে নির্ণীত হয়। এই পরীক্ষাটি হিপ্-এর



১৭নং চিত্র—ভার্নিয়ার ক্রনোস্কোপ—ইহাতে দোলক দুইটি চাবি দুইটিতে আটকানো থাকে। চাবি দুইটি টিপিয়া দিলে দোলক দুইটি দুলিতে থাকে। উহাদের দোলনের হার পৃথক। উহারা যতবার দুলিবার পর মিলিত হয় বা ঠিক পাশাপাশি দোলে, তাহার সংখ্যা অনুসারে প্রতিক্রিয়াকালের হিসাব করা হয়।

ক্রনোস্কোপ (Hipp's chronoscope) সাহায্যে কি ভাবে করিতে হয় বলা হইল। ৩২নং চিত্রে ভার্ণিয়ার ক্রনোস্কোপ্ সাহায্যে পরীক্ষার নিয়ম সংক্ষেপে বলা হইল।

(খ) যৌগিক প্রতিক্রিয়াকাল

এইবার যৌগিক প্রতিক্রিয়াকাল কিরূপে নির্ণীত হয় তাহা দৃষ্টান্ত সাহায্যে বুঝিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে। যৌগিক প্রতিক্রিয়াকাল দুই প্রকার, যথা—ভেদ প্রতিক্রিয়াকাল (Discrimination Reaction-time) এবং নির্বাচন প্রতিক্রিয়া-কাল (Choice Reaction-time)।

ভেদ প্রতিক্রিয়াকাল এইরূপে পরীক্ষিত হয়। যেমন পাত্রকে বলা হইল যে, তাঁহার সম্মুখে হয় লাল নতুবা নীল আলো জ্বালানো হইবে এবং শুধু লাল আলোটি দেখিলেই তিনি সুইচ্ টিপিবেন, কিন্তু নীল আলো দেখিলে তিনি কোন প্রতিক্রিয়া করিবেন না। এই প্রতিক্রিয়াকাল সরল নয়, কিন্তু যৌগিক, কারণ ইহাতে পাত্র আলো দেখিবামাত্র প্রতিক্রিয়া করেন না (যেমন সরল প্রতিক্রিয়া করিবার সময় তিনি করেন), কিন্তু একটি আলোকের সহিত আর একটি আলোকের ভেদ প্রত্যক্ষ করিয়া প্রতিক্রিয়া করেন। এই ক্ষেত্রে আলোক দেখা এবং উহার প্রতিক্রিয়া করিবার **মধ্যবর্তী আরও একটি ক্রিয়া**, অর্থাৎ আলোকটিকে অন্য একটি আলোক হইতে পৃথক রূপে বুঝিবার ক্রিয়া ঘটে।

ভেদ প্রতিক্রিয়াকাল সরল প্রতিক্রিয়াকাল অপেক্ষা বেশী হইয়া থাকে। ভেদ বুঝিবার কালই এই বিলম্বের কারণ। আলো দেখিবামাত্র প্রতিক্রিয়ায় যে সময় লাগে, আলোক দেখিবার পর ইহা বুঝিয়া প্রতিক্রিয়া করিতে তদপেক্ষা বেশী সময় লাগে।

নির্বাচন প্রতিক্রিয়াকাল নিরূপণের প্রণালী এইরূপ। পাত্রকে বলা হইল, তাঁহার সম্মুখে একটি লাল এবং অপর একটি নীল আলো জ্বালানো হইবে; লাল আলোটি দেখিবামাত্র ডান হাতে এবং নীল আলোটি দেখিবামাত্র বাম হাতে তিনি সুইচ্ টিপিবেন। এই ক্ষেত্রে ডান হাত অথবা বাম হাত দিয়া দুই প্রকার সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়ার একটিকে বাছিয়া লইতে হয়। নির্বাচন করিতে গিয়া কিছু সময় ব্যয়িত হয়—ফলে নির্বাচন প্রতিক্রিয়াকাল সাধারণতঃ সর্বাধিক হইয়া থাকে।

(গ) অনুষঙ্গ প্রতিক্রিয়াকাল

উদ্দীপক প্রত্যক্ষভাবে অনুষঙ্গ প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন করে না। উহার সহিত অনুষক্ত কোন চিন্তা বা ধারণার মধ্যস্থতায়, অর্থাৎ পরোক্ষভাবে, উদ্দীপক যে প্রতিক্রিয়া

উৎপন্ন করে, তাহাকে অনুষঙ্গ প্রতিক্রিয়া (Associative Reaction) বলে। কাজেই এই প্রতিক্রিয়া সরল প্রতিক্রিয়া হইতে আলাদা। আবার যৌগিক প্রতিক্রিয়ার একাধিক উদ্দীপক উপস্থাপিত হয়, কিন্তু মাত্র একটি উদ্দীপকের উপস্থিতিতেই অনুষঙ্গ প্রতিক্রিয়া চলিতে পারে।

অনুষঙ্গ প্রতিক্রিয়া দুই প্রকার, যথা, **অবাধ** (Free) এবং **সবাধ** (Constrained)। অবাধ অনুষঙ্গ প্রতিক্রিয়াকাল নিরূপণে পাত্রকে একটি শব্দ যেমন, 'চোর', দেখানো বা শোনানো হয় এবং ঐ শব্দ দর্শন বা শ্রবণ করিবামাত্র যে শব্দটি তাহার মনে আসে, তাহাই বলিতে বলা হয়। এই প্রতিক্রিয়ায় যে সময় ব্যয়িত হয়, তাহাই অবাধ অনুষঙ্গ প্রতিক্রিয়াকাল। অনুষঙ্গ প্রতিক্রিয়া আংশিকভাবে অথবা সম্পূর্ণভাবে সবাধ সবাধ হইতে পারে। প্রথমটিতে উপস্থাপিত শব্দের জাতি বা বিশেষাত্মক শব্দ বলিয়া প্রতিক্রিয়া করিতে হয়, যেমন—"চোর" শব্দটির জাতি অসাধু অথবা "গাঁটকাটা" শব্দ বলিয়া। দ্বিতীয়টিতে উপস্থাপিত শব্দের সহিত নির্দিষ্টভাবে সম্পর্কিত শব্দ বলিয়া প্রতিক্রিয়া করিতে হয়—যেমন "চোর" শব্দটির বিপরীত "সাধু" অথবা উহার সমার্থক "তস্কর" শব্দ বলিয়া। সরল বা যৌগিক প্রতিক্রিয়াকালের তুলনায় অনুষঙ্গ প্রতিক্রিয়াকাল দীর্ঘতর হইয়া থাকে। এই প্রতিক্রিয়াকাল গবেষণায় য়্যুঙ্ (Jung)-এর উদ্ভাবিত শাব্দিক অনুষঙ্গ পদ্ধতি (Word Association Method) গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে।

৩। প্রতিক্রিয়াকাল পরীক্ষার কালাংশ

প্রতিক্রিয়াকালের পরীক্ষাকে তিনটি কালাংশে (periods) ভাগ করা যায়—যথা পূর্বাংশ (Fore-Period), মধ্যাংশ (Mid or Main Period) এবং পরাংশ (After-Period)।

যে কালাংশে প্রতিক্রিয়া করিবার প্রস্তুতি (Preparatory Set) ঘটে তাহাকে পূর্বাংশ বলে। এই কালাংশে প্রয়োগকর্তা পাত্রকে বুঝাইয়া দেন কিরূপে তাঁহার প্রতিক্রিয়া করিতে হইবে। উদ্দীপক উপস্থাপিত হইলে, পাত্র সেইটিকে বুঝিবেন, অথবা উহা উপস্থিত হওয়া মাত্র প্রতিক্রিয়া করিবেন—এই জাতীয় মানসিক এবং দৈহিক প্রস্তুতি ঘটে পূর্বাংশে। প্রস্তুতি কাল কতটুকু হওয়া উচিত, তাহা বিভিন্ন অবস্থার উপর নির্ভর করে।

প্রতিক্রিয়ার মধ্যাংশে পাত্র প্রতিক্রিয়া করিতে আরম্ভ করেন। এই কালটি ব্যয়িত হয় উদ্দীপকের উপস্থিতি হইতে আরম্ভ করিয়া উহার প্রতি পাত্রের প্রতিক্রিয়া

পর্যন্ত কালের মধ্যে। প্রতিক্রিয়া আরম্ভ করিবার সময় পাত্রের নানা অভিজ্ঞতা হয়। এই অভিজ্ঞতাগুলি পাত্রের অন্তর্দর্শন এবং প্রয়োগকর্তার পর্যবেক্ষণ সাহায্যে জানিতে পারা যায়।

আবার প্রতিক্রিয়া শেষ হইবার পরবর্তী কালাংশকে বলা হয় পরাংশ। প্রতিক্রিয়া করিবার দায়িত্বটি পালিত হইয়াছে মনে করিয়া পাত্র এই কালাংশে সোয়াস্তি বা আরাম বোধ করেন। তাহা ছাড়া, এই কালাংশ ব্যয়িত হয় পাত্রের প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে অন্তর্দর্শন-বিবরণ দেওয়ার কাজে।

৪। সংবেদীয় এবং চেষ্টীয় প্রতিক্রিয়াকাল (Sensory and Motor Reaction-Time)

প্রতিক্রিয়াকাল আবার সংবেদীয় (Sensory) এবং চেষ্টীয় (Motor) ভেদে দুই শ্রেণীর হইতে পারে।

সংবেদীয় প্রতিক্রিয়া ঘটে উদ্দীপকের সংবেদন ঘটিবার পর। এই প্রতিক্রিয়ায় উদ্দীপকের সংবেদন বা জ্ঞান হইলে পাত্রের প্রতিক্রিয়া করিতে হইবে, এইরূপ মনোভাব বা প্রস্তুতি থাকে। আলোকটি **দেখিবার পর,** অথবা আলোকটি **ভাল ভাবে দেখিয়া,** সুইচ্ টিপিতে হইবে, এইরূপ মনোভাব (attitude) সংবেদীয় প্রতিক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য। ইহাতে ক্রিয়া বা চেষ্টার তুলনায় সংবেদন বা জ্ঞানই প্রাধান্য লাভ করে। যে পাত্র এই প্রকার সংবেদীয় প্রতিক্রিয়ার মনোভাব-সম্পন্ন তাহাকে সংবেদীয় শ্রেণীর (Sensory type) বলা যায়। সংবেদীয় প্রতিক্রিয়া-কাল স্বাভাবিক কারণেই চেষ্টীয় প্রতিক্রিয়া-কাল অপেক্ষা বেশী হয়। উদ্দীপককে বুঝিয়া বা জানিয়া প্রতিক্রিয়া করাই এই প্রতিক্রিয়াকাল বেশী হইবার কারণ।

আবার কোনো কোনো পাত্রের মনোভাব বা প্রস্তুতি চেষ্টীয় প্রকারের হইতে পারে। আলোকটি **দেখিবামাত্র** প্রতিক্রিয়া করিতে হইবে—তাহার এইরূপ নানাভাবে প্রতিক্রিয়া করিবার প্রবণতাই প্রাধান্য লাভ করে। সংবেদীয় পাত্র যেমন আলোক দেখিবার দিকে বেশী ঝুঁকিয়া পড়ে, চেষ্টীয় পাত্রের তেমনই প্রতিক্রিয়া করিবার দিকেই ঝোঁক বেশী। চেষ্টীয় প্রতিক্রিয়াকাল সংবেদীয় প্রতিক্রিয়াকালের তুলনায় কম হইয়া থাকে। মায়ার্স্[১] এই দুই প্রকার প্রতিক্রিয়াকালের পার্থক্য দেখাইয়াছেন। সংবেদীয় পাত্র প্রতিক্রিয়ার তুলনায় উদ্দীপকের উপর গুরুত্ব আরোপ

১। মায়ার্স—এক্সপেরিমেণ্টাল্ সাইকলজি—পৃঃ ১২৬

করে বেশী। আবার চেষ্টীয় পাত্র উদ্দীপকের তুলনায় প্রতিক্রিয়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করে বেশী। ফলে উহাদের প্রতিক্রিয়াকাল যথাক্রমে বেশী এবং কম হয়।

সুতরাং দেখা, জানা প্রভৃতি সংবেদন বা জ্ঞানের উপর এবং প্রতিক্রিয়া করার উপর গুরুত্ব আরোপের সহিত প্রতিক্রিয়াকালের সম্বন্ধ রহিয়াছে। সংবেদীয় প্রতিক্রিয়াকাল যে অপেক্ষাকৃত বেশী এবং চেষ্টীয় ক্রিয়াকাল যে অপেক্ষাকৃত কম হয়, তাহা মায়ার্স অবলম্বনে প্রদর্শিত তালিকা হইতে বুঝা যাইবে।

পাত্র সংবেদীয় অথবা চেষ্টীয় কিনা, এই প্রশ্নটি তাহার শিক্ষা, জীবিকা প্রভৃতি ভবিষ্যৎ জীবনের সমস্যার উপর বিশেষ আলোকপাত করে। যেমন সংবেদীয় পাত্রের বুদ্ধিজীবী এবং চেষ্টীয় পাত্রের কারিগরিজীবী হওয়া স্বাভাবিক।

উদ্দীপক	চেষ্টীয় প্রতিক্রিয়া-কাল	সংবেদীয় প্রতিক্রিয়া-কাল
শব্দ	১২৫ σ	২১০ σ
আলোক	১৭৫ σ	২৭০ σ
স্পর্শ	১১০ σ	২১০ σ
তাপ	১৩০ σ	১৯০ σ
শৈত্য	১১৫ σ	১৫০ σ

σ চিহ্নটি এক সেকেণ্ডের এক সহস্রাংশ, বা মাইক্রোমিলিমিটার বা মিলি-সেকেণ্ডস্ বুঝায়।

৫। প্রতিক্রিয়াকালের সর্ত (Conditions of Reaction-Time)

উপরের প্রতিক্রিয়া-কাল তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে যে প্রতিক্রিয়াকাল স্থির বা নির্দিষ্ট নয়। ইহা কোন্ উদ্দীপক উপস্থাপিত হয়, তাহার উপর নির্ভর করে। দেখা যাইতেছে যে, আলোকের প্রতিক্রিয়া-কাল সর্বাপেক্ষা বেশী এবং স্পর্শ ও শৈত্যের প্রতিক্রিয়া-কাল কম। এই তালিকায় স্বাদ ও গন্ধের প্রতিক্রিয়া-কাল উল্লিখিত হয় নাই। পরীক্ষা সাহায্যে দেখা গিয়াছে যে স্বাদ ও ঘ্রাণের প্রতিক্রিয়া-কাল আলোক অপেক্ষাও বেশী।

প্রতিক্রিয়া-কাল যে শুধু (ক) **উদ্দীপকের তারতম্য** অনুসারেই পৃথক হয়, তাহা নয়। ইহা আবার উদ্দীপিত (খ) **ইন্দ্রিয়যন্ত্রের তারতম্য** অনুসারেও পৃথক হয়। যেমন চক্ষু, নাসিকা, জিহ্বা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়যন্ত্রগুলির প্রতিক্রিয়া-কাল অপেক্ষাকৃত কম। আবার, শুধু যে উদ্দীপকের সাধারণ তারতম্য প্রতিক্রিয়া-কালের তারতম্য ঘটায়, তাহা নয়। (গ) **উদ্দীপকের তীব্রতা** (Intensity) বা ক্ষীণতা, স্থায়িত্ব, (Duration),

আকার (Size), প্রকার (Quality) অনুসারেও প্রতিক্রিয়া-কাল ভিন্ন হইয়া থাকে। যেমন একটি ক্ষীণ, ক্ষণস্থায়ী, ক্ষুদ্র এবং দীপালোকের তুলনায় তীব্র, দীর্ঘস্থায়ী, বড় এবং সূর্যালোকের প্রতিক্রিয়াকাল কম হয়। তাহা ছাড়া, (ঘ) পাত্রের মনোযোগের বিষয়, দৃষ্টিভঙ্গী, উদ্দেশ্য, মানসিক এবং দৈহিক স্বাস্থ্য, অনুশীলন প্রভৃতি কারণও প্রতিক্রিয়া-কাল নিয়ন্ত্রণ করে।

৬। সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—প্রতিক্রিয়া-কাল সম্বন্ধে ক্যাটেল-এর পরীক্ষা

(Cattell's Experiments on Reaction-Time)

হেলম্‌হোলজই (Helmholtz) প্রতিক্রিয়া-কালের উপর প্রথম পরীক্ষা বা প্রয়োগ করিয়াছেন, শতাধিক বৎসর পূর্বে, ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে। পরে সুইজারল্যাণ্ডদেশীয় **হিপ্** (Hipp) ক্রনোস্কোপ্ সাহায্যে চক্ষু, কর্ণ, ত্বক্ প্রভৃতির প্রতিক্রিয়া-কাল নির্ণয়ের জন্য পরীক্ষা চালাইয়াছেন। এই গবেষণায় পরবর্তী পদক্ষেপ করেন ডাচ্ শারীরবৃত্তবিদ্ **ডণ্ডার্স্** (Donders)। তিনি নির্বাচন এবং ভেদ প্রতিক্রিয়া-কাল উদ্ভাবন করেন। **এক্স্‌নারই** (Exner) রি-অ্যাকৃসন্ টাইম কথাটি প্রচলিত করেন। তিনি প্রস্তুতি ক্ষেত্রের (Preparatory Set) উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে **হ্বুণ্ড্** (Wundt) মনোবিদ্যার প্রথম প্রয়োগশালা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি এবং তাঁহার ছাত্রেরা সরল ও যৌগিক প্রতিক্রিয়া-কালের উপর গবেষণা চালাইতে থাকেন। **জেম্স্ ম্যাক্‌কিন্ ক্যাটেল্** (James Mckeen Cattell) হ্বুণ্ড-এর সুযোগ্য ছাত্র ও সহকর্মী। তিনি লাইপজিগে হ্বুণ্ড্-এর সহিত প্রতিক্রিয়া-কালের উপর দীর্ঘ গবেষণা চালাইয়া, পরে আমেরিকার পেনসিল্‌ভ্যানিয়া এবং কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘতর গবেষণা চালাইতে থাকেন :

প্রতিক্রিয়া-কালের গবেষণায় ক্যাটেল-এর স্থান হ্বুণ্ড্-এর সমপর্যায়ভুক্ত। (ক) তিনি প্রতিক্রিয়া-কাল নিরূপণের ক্রনোস্কোপ্ বা কালমাপক যন্ত্রের যথেষ্ট উন্নতিসাধন করিয়াছেন। (খ) ইন্দ্রিয়যন্ত্রের তারতম্য অনুসারে প্রতিক্রিয়া-কালের তারতম্য সম্বন্ধে তাঁহার গবেষণা গুরুত্বপূর্ণ। (গ) সংবেদীয় এবং চেষ্টীয় প্রতিক্রিয়া-কালের পার্থক্যও তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। (ঘ) তিনি ভেদ প্রতিক্রিয়া-কাল এবং নির্বাচন প্রতিক্রিয়া-কালের উপর (ঙ) এবং প্রত্যক্ষ-কাল (Perception Time), সঙ্কল্প কাল (Will Time) সম্বন্ধেও গবেষণা করিয়াছেন। তাহা ছাড়া, (চ) অনুষঙ্গ-কাল (Association Time) বিষয়ে তাঁহার গবেষণাও মূল্যবান। তিনি

প্রতিহত (Constrained) এবং অবাধ (Free) অনুষঙ্গ, এই উভয়ের কাল নিরূপণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। (ছ) আবার উদ্দীপকের তীব্রতা (Intensity), মনোযোগ, ভেদ (Discrimination) প্রভৃতির সহিত প্রতিক্রিয়া-কালের সম্বন্ধ বিষয়েও তাঁহার গবেষণা মূল্যবান। ক্যাটেল্ প্রতিক্রিয়া-কালের উপর অসংখ্য পরীক্ষা বা প্রয়োগ করিয়াছেন। (জ) তিনি প্রতিক্রিয়া-কাল নিরূপণের সঙ্গে সঙ্গে পাত্রের প্রতিক্রিয়া-কালীন অন্তর্দর্শন গ্রহণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। (ঝ) ক্যাটেল্-এর আর একটি মূল্যবান গবেষণা হইল এই যে, কোনো বিদেশী ভাষার তুলনায় মাতৃভাষা অপেক্ষাকৃত তাড়াতাড়ি পড়া যায়। বহু পরিশ্রম এবং অধ্যবসায়ের সহিত কোন বিদেশী ভাষা আয়ত্ত করিলে এবং মাতৃভাষাকে উপেক্ষা করিলেও, হয়ত এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে না। (ঞ) তাহা ছাড়া, ক্যাটেল্ মস্তিষ্ক-ক্রিয়ার কাল, উদ্দীপকের তীব্রতার ফলে প্রতিক্রিয়া-কালের অল্পতা বা আধিক্য, প্রত্যক্ষ-কালের ভিত্তিতে উদ্দীপকের তীব্রতাভেদ, স্বল্প-বিরাম উদ্দীপনার (Intermittent Stimulation) ফলে স্পর্শ সংগ্রাহক ইন্দ্রিয়গুলির প্রতিক্রিয়া, প্রভৃতি বহু মূল্যবান গবেষণা করিয়াছেন। বাহুল্য বোধে এইগুলির বিস্তৃত আলোচনা বর্জন করা হইল। নিম্নে তাঁহার **পরীক্ষার কয়েকটি নিদর্শন** উল্লেখ করা যাইতেছে ; এই পরীক্ষাগুলি প্রত্যক্ষ-কাল এবং পাঠ-কাল নির্ণয় করে। এই দুইটি বিষয়েই ক্যাটেল্ পথপ্রদর্শক।

একটি ড্রাম-এর উপর কতকগুলি অক্ষর আঁটিয়া দেওয়া হইল। তারপর ড্রামটিকে ঘুরাইয়া দেওয়া হইল। পাত্র একটি পর্দার আড়ালে বসিয়া আছেন। আড়াল বা পর্দার ছিদ্র দিয়া তিনি চলন্ত ড্রাম-এর উপর একসঙ্গে একটি করিয়া অক্ষর দেখিতে পান এবং পৃথকভাবে প্রত্যেকটি অক্ষর দেখিয়া উহার নাম বলিতে তাঁহার আধ সেকেণ্ড মাত্র সময় লাগে। অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে তাহার প্রতিক্রিয়া-কাল মাত্র আধ সেকেণ্ড। কিন্তু পর্দার ছিদ্র দিয়া ঐ একটি অক্ষর দেখিতে না দেখিতেই যদি আর একটি অক্ষর উপস্থাপিত হয়, তাহা হইলে ঐ অক্ষরের নাম বলিতে আধ সেকেণ্ডের পরিবর্তে এক/তৃতীয় অথবা এক/পঞ্চমাংশ সেকেণ্ড সময় লাগে—অর্থাৎ, প্রতিক্রিয়া-কাল-কমিয়া যায়। আবার যদি অক্ষরটির নাম বলিবার পূর্বে দুইটি, তিনটি, এমন কি পাঁচটি পর্যন্ত অক্ষর উপস্থাপিত হয়, তাহা হইলে উহার নাম বলিবার সময় আরও কমিয়া যাইবে।[১]

১। এই পরীক্ষাটির মত ক্যাটেল্-এর অধিকাংশ প্রত্যক্ষ-কাল, পাঠ-কাল, মনোযোগ-প্রসার (Range of Attention) সম্বন্ধীয় পরীক্ষাই ক্ষণদৃক্‌জাতীয় (Tachistoscope-type) পরীক্ষা।

এই পরীক্ষা হইতে বুঝা যায় যে, পৃথক পৃথক অক্ষর প্রত্যক্ষ বা পাঠ করিতে যে সময় লাগে, ঐ অক্ষরগুলি শব্দ গঠন করিলে, উহাদের প্রত্যক্ষে বা পঠনে তদপেক্ষা কম সময় লাগে। অথবা যদি অক্ষরগুলি শব্দ গঠন করে, তাহা হইলে একই সময়ে অধিক অক্ষর প্রত্যক্ষ বা পাঠ করা যায়। আবার আলাদাভাবে কতকগুলি শব্দ প্রত্যক্ষ বা পাঠ করিতে যে সময় লাগে, উহারা বাক্য গঠন করিলে, উহাদের প্রত্যক্ষে বা পাঠে আরও কম সময় লাগে।

উপরোক্ত পরীক্ষার সাহায্যে ক্যাটেল্ একটি উপসংস্থাপনের (overlapping), অর্থাৎ, একটি পূর্ববর্তী অক্ষর বা শব্দ পড়িতে পড়িতেই, কতকগুলি পরবর্তী অক্ষব বা শব্দ পড়া হইয়া যায়, তাহার পরিমাপ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

ক্যাটেল্-এর আবিষ্কারের গুরুত্ব

এক একটি পৃথক্ অক্ষর প্রত্যক্ষ বা পাঠ করিতে যে সময় লাগে, একটি নাতিদীর্ঘ শব্দ প্রত্যক্ষে বা পাঠে তাহার বেশী সময় লাগে না, ক্যাটেল্-এর এই আবিষ্কার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ সম্পূর্ণ শব্দটির প্রত্যক্ষ পৃথক্ অক্ষরগুলির তুলনায় কম সময়েই ঘটে। এই আবিষ্কার ইদানীন্তন শিক্ষা পদ্ধতির উপর অসামান্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। তাঁহার এই গবেষণার ফলে ইহাই নির্ধারিত হইয়াছে যে, শব্দ প্রত্যক্ষে উহার পৃথক অক্ষরগুলির পৃথক্ পৃথক্ প্রত্যক্ষ হয় না, অর্থাৎ অনেকগুলি শব্দের একত্র প্রত্যক্ষ ঘটিয়া থাকে।

অনুশীলনী (Exercise)

1. What is stimulus and what is response? Explain and illustrate. (Ans : pp. 206—207)
   উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়া কাহাকে বলে? উদাহরণ সাহায্যে বুঝাইয়া দাও।
2. Explain and illustrate different kinds of stimulus and response. (Ans : pp. 208—209)
   উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়ার প্রকারভেদ উদাহরণ সহ বুঝাইয়া দাও।
3. What do you mean by stimulus-response unit? (Ans : 209—210 pp.)
   উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়া একক বলিতে কি বুঝায়?

4 Define 'reaction-time'. What are the physiological processes involved in it ? Or, What are the canses of 'reaction-time ? (Ans : pp. 210—213)

প্রতিক্রিয়া-কাল কাহাকে বলে ? উহার সহিত সংশ্লিষ্ট শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়া অথবা উহার কারণ নির্ণয় কর।

5. Distinguish between the different types of reaction-time' with examples of each. (Ans : pp. 211—213)

উদাহরণ সাহায্যে বিভিন্ন প্রকার প্রতিক্রিয়াকালের পার্থক্য নির্ণয় কর।

6. What are the 'periods' in a 'reaction-time' experiment ? (Ans : pp. 213—214)

প্রতিক্রিয়া-কালের প্রয়োগে বিভিন্ন কালাংশগুলি কি ?

7. Distingutsh between sensory and motor reaction-time. What are the conditions determining reaction-time ? (Ans : pp. 214—216)

সংবেদীয় এবং চেষ্টীয় প্রতিক্রিয়াকালের পার্থক্য বুঝাইয়া দাও। প্রতিক্রিয়া-কালের নিয়ামক সর্ত উল্লেখ কর।

8. Birefly explain some of the 'reaction-time' experiments made by Cattell. (Ans. : pp. 216—218)

প্রতিক্রিয়াকাল সম্বন্ধে ক্যাটেলকৃত কয়েকটি প্রয়োগ আলোচনা কর।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

মনোযোগ

(Attention)

১। মনোযোগের স্বরূপ ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ

(Analysis of the Nature of Attention)

ব্যুৎপত্তির দিক দিয়া কোনো বিষয়ের সহিত **মনের যোগকে** মনোযোগ বলা যাইতে পারে। আশেপাশে, এমন কি সম্মুখে, অনেক বস্তু থাকিতে পারে, যাহাদের সহিত মনের যোগ নাই। যে সকল বস্তুর সহিত মনের যোগ নাই, উহাদের সম্বন্ধে কোনো **জ্ঞান** বা চেতনা নাই। আবার যে সকল বস্তু সম্বন্ধে চেতনা বা জ্ঞান আছে, উহাদের সহিত অবশ্যই মনের যোগ আছে। মনোযোগ না থাকিলে, চোখের সম্মুখ দিয়া হাতী চলিয়া গেলেও দৃষ্টি এড়াইয়া যায়। আবার মনোযোগ থাকিলে, সম্মুখের সূঁচটিও দৃষ্টিগোচর হয়। সুতরাং **মনোযোগকে সকল চেতনা ও জ্ঞানের সাধারণ কারণ বা রূপ বলা যাইতে পারে।** অনুভূতি, অবগতি এবং ক্রিয়া প্রভৃতি সকল **মানসবৃত্তির সাধারণ এবং অপরিহার্য সহচর মনোযোগ।**

যে সার্বভৌম মানসক্রিয়ার ফলে চেতনার ক্ষেত্র সঙ্কুচিত হইয়া একটি কেন্দ্রবিন্দুতে কেন্দ্রীভূত হয়, অপ্রাসঙ্গিক বিষয় হইতে চেতনা সরিয়া আসিয়া একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে সীমাবদ্ধ হয়, তাহাকে মনোযোগ বলে। আবার যে ক্রিয়ার ফলে চেতনার বিষয়গুলির মধ্যে **অদলবদল** (Redistribution) বা পুনর্বণ্টন ঘটে, **একটি বিষয়ে চেতনা কেন্দ্রস্থ এবং স্পষ্টতম হয়,** অপর বিষয়গুলি চেতনার কেন্দ্র হইতে দূরে সরিয়া অস্পষ্ট হইয়া দাঁড়ায়, তাহাকে মনোযোগ বলে। অথবা যে ক্রিয়ার ফলে **চেতনার বিষয় স্পষ্ট ও বিশদভাবে ফুটিয়া ওঠে** এবং ঐ সম্বন্ধে জ্ঞান সহজলভ্য হয়, তাহাকে মনোযোগ বলে।

তাহা হইলে, মনোযোগ **চেতনার বিষয়কে সঙ্কুচিত** (Narrowed down), **পুনর্বিন্যস্ত** (Redistributed) ও **বিশদ** (Clear) করিয়া তোলে। চেতনা সাধারণতঃ অনেক বিষয়ে ছড়াইয়া থাকে, কাজেই উহার বিষয়গুলি অবিন্যস্ত এবং অস্পষ্ট থাকে। মনোযোগ চেতনাকে একটি বিষয়ে সংহত বা কেন্দ্রীভূত করে। ফলে অন্যান্য বিষয়গুলি চেতনাকেন্দ্রের বাহিরে চলিয়া যায় এবং কেন্দ্রীকৃত বিষয়টি সম্বন্ধে জ্ঞান স্পষ্ট ও বিশদ হইয়া ওঠে।

মনোযোগ একাধারে মনের জ্ঞানাত্মক এবং ক্রিয়াত্মক বৃত্তি। স্বুণ্ট্ প্রভৃতি মনোবিদ্ মনোযোগের জ্ঞানাত্মক বা অবগতিমূলক রূপের উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে বস্তুর স্পষ্ট ও বিশদ চেতনাই মনোযোগ। আবার মড্‌সলে (Maudsley), রিবো (Ribot), মুয়েন্‌স্টার্‌বার্গ (Munsterberg) প্রভৃতি মনোবিদ মনোযোগের ক্রিয়াত্মক রূপের উপর বেশী জোর দিয়াছেন। তাঁহাদের মতে কোনো বিষয়ে মনকে কেন্দ্রীভূত করিবার ক্রিয়াই মনোযোগ।

মনোযোগ শুধু অবগতিমূলক বা শুধু ক্রিয়াত্মক নয়, কিন্তু উভয়ই। মনোযোগে বস্তুর জ্ঞান স্পষ্ট এবং বিশদ হয় সত্য, কিন্তু এই ফল লাভ করিতে হইলে **মনোযোগ রক্ষার চেষ্টা বা প্রয়াস** করিতে হয়। লিখিবার সময় লেখাতেই মনোযোগ নিবদ্ধ। কিন্তু পাশের ঘরে রেডিওতে যে রবীন্দ্রসঙ্গীত চলিতেছে, সেই দিকেও মন আকৃষ্ট হইতেছে। দ্বিতীয় মনোযোগটিতে সাক্ষাৎভাবে কোনো প্রয়াস বা চেষ্টা নাই। কিন্তু প্রথম মনোযোগটি অব্যাহত রাখিবার জন্য প্রয়াস অথবা চেষ্টা দরকার।

কিন্তু মনোযোগ যেমন অবগতিমূলক এবং ক্রিয়াত্মক মানসবৃত্তি তেমনই বেদনা বা অনুভূতিমূলক কি ? **বেদনা বা অনুভূতি প্রধানতঃ নিষ্ক্রিয়, কিন্তু মনোযোগ সক্রিয় মানসবৃত্তি।** কিন্তু ইহাদের এই পার্থক্য সত্ত্বেও বেদনা বা অনুভূতিহীন মনোযোগ ঘটে কিনা, তাহাতে সন্দেহ আছে। **টিশ্‌নার** মনোযোগ ও বেদনাকে **একই মনোবৃত্তির দুইটি দিক** বলিয়া মনে করেন। একই কেন্দ্রীভূত চেতনার বাহিরের এবং ভিতরের দিক দুইটিই যথাক্রমে মনোযোগ এবং বেদনা। **ভিতরের দিক** হইতে যেমন কোনো বিষয়ের স্পষ্ট চেতনায় সুখ বা দুঃখ অনুভূতি থাকে তেমনই **বাহিরের দিক** হইতে উহাতে মনোযোগও থাকে। সুতরাং একই চেতনার দুইটি দিক হিসাবে বেদনাকে মনোযোগ হইতে অথবা মনোযোগকে বেদনা হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। মনোযোগ-ক্রিয়া সহজসাধ্য হইলে সুখ, এবং কষ্টসাধ্য হইলে দুঃখ অনুভূতি জন্মে। অধ্যাপক **স্টাউট্**ও বেদনা এবং মনোযোগকে সমকালীন মানসবৃত্তি বলিয়া মনে করেন।

সুতরাং মনোযোগে চেতনার নিজ বিষয়ে **কেন্দ্রীভূত হইবার ক্রিয়া বা চেষ্টা, বিষয়ের স্পষ্টতা বা বিশদতা জ্ঞান** এবং **কেন্দ্রীভূত হইবার** অল্পায়াস বা অধিক আয়াস অনুসারে **সুখ-দুঃখ** বেদনা বা অনুভূতি আছে। অথবা **যে ইচ্ছাত্মক বৃত্তি জ্ঞানের স্পষ্টতা বা বিশদতা উৎপন্ন করে এবং সুখ-দুঃখ বেদনারূপে অনুভূত হয়, তাহাই মনোযোগ।**

মনোযোগের সদর্থক এবং নঞর্থক দিক :— মনোযোগ মনের একটি ব্যাপক ধর্ম। কোনো না কোনো বস্তুতে মনোযোগ না দিয়া মন থাকিতে পারে কিনা সন্দেহ। মনোযোগের বস্তু অনবরত বদলাইতে পারে। এই পরিবর্তন হয় না, কিন্তু যে বস্তুতে মনোযোগ দেওয়া হয় তাহার পরিবর্তন হয়। যেমন গানে মনোযোগ না দিয়া পড়ায়, অথবা খেলায় মনোযোগ না দিয়া লেখায় মনোযোগ দেওয়া যাইতে পারে। কোনো বিষয়ে মনোযোগ দিতে হইলে অন্য বিষয় হইতে মনোযোগ সরাইয়া লইতে হয়। অর্থাৎ **মনোযোগের সদর্থক** (Positive) **এবং নঞর্থক** (negative) **এই দুইটি দিক**। কোনো বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া উহার সদর্থক এবং অন্য বিষয় হইতে মনোযোগ সরাইয়া লওয়া উহার নঞর্থক দিক।

মনোযোগের ফল (Effects Attention) **:** কোনো বিষয়ে মনোযোগ দেওয়ার **ফলে** উহার চেতনা অন্যান্য বিষয় হইতে বিযুক্ত হইয়া উহাতেই সীমাবদ্ধ হয়। সুতরাং **মনোযোগের সাক্ষাৎ ফল চেতনার ক্ষেত্র-সঙ্কোচ**। চেতনা স্বভাবতঃ অনেক বস্তুতে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। মনোযোগের ফলে চেতনার ক্ষেত্র বা ব্যাপ্তি সঙ্কীর্ণ হইয়া যায়—অর্থাৎ মাত্র একটি বিষয়ই চেতনাবৃত্তের কেন্দ্রে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং অন্যান্য সকল বিষয় উহার বাহিরে চলিয়া যায়। চেতনা আর নানা বিষয়ে ছড়াইয়া থাকিতে পারে না, কিন্তু একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে কেন্দ্রীভূত হয়। মনোযোগের ফলে শুধু একটি বিষয়েরই স্পষ্ট চেতনা, কিন্তু অন্যান্য বিষয়ের অস্পষ্ট চেতনা থাকে।

তাহা ছাড়া, মনোযোগের সঙ্গে সঙ্গে চেতনার বিষয়গুলিতে **পুনর্বণ্টন** বা পুনর্বিন্যাস ঘটে। ক, খ, গ, ঘ এবং ঙ এই পাঁচটি বিষয় চেতনায় থাকিলে, মনোযোগের সঙ্গে সঙ্গে উহাদের মধ্যে একটি চেতনার কেন্দ্রে (Centre, focus) এবং বাকিগুলি উহার পশ্চাদভূমিতে বা বহিঃপ্রান্তে (background, periphery) স্থান পরিবর্তন করে। যেমন 'ক,-তে মনোযোগ নিবদ্ধ করিলে, ঐটি চেতনাকেন্দ্রে আসে কিন্তু খ, গ, ঘ এবং ঙ উহার পশ্চাৎভূমিতে চলিয়া যায়। আবার 'খ'তে মনোযোগ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, ঐটি চেতনার কেন্দ্রে উপস্থিত হয় এবং ক, গ, ঘ ও ঙ উহার পশ্চাদ্ভূমিতে অপসরণ করে।

তৃতীয়তঃ মনোযোগ চেতনাকে **স্পষ্ট** করে এবং জ্ঞানকে **বিশদ** করে, কারণ ইহার ফলে মন চেতনার বিষয়ে কেন্দ্রীভূত হয়। যেহেতু মনোযোগ উহার বিষয়কে স্পষ্ট এবং বিশদ করিয়া তোলে, ইহাকে জ্ঞানের বিশদতার অপরিহার্য কারণ বলা যাইতে পারে।

মনোযোগের প্রকৃতি (Nature)

মনোযোগের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিলে ইহাতে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি পাওয়া যায়।

(১) মনোযোগ (ওয়ার্ড্‌ প্রভৃতির মতে) সমগ্র **মানস-জীবনের সহিত সমব্যাপক** ক্রিয়া। এমন মানসবৃত্তি নাই যাহাতে মনোযোগ নাই। অবশ্য মনোযোগ কথাটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থেই মানসজীবনের সহিত সমব্যাপক।

(২) মনোযোগ **উদ্দেশ্যমূলক** ক্রিয়া। ইহার উদ্দেশ্য জ্ঞেয় বস্তুর অস্পষ্টতা দূর করিয়া উহাকে স্পষ্ট ও বিশদ করিয়া তোলা। প্রশ্ন উঠিতে পারে, যেহেতু অনৈচ্ছিক (non-voluntary) মনোযোগের কোন জ্ঞাত উদ্দেশ্য থাকে না, মনোযোগকে উদ্দেশ্যমূলক ক্রিয়া বলা যাইতে পারে না। উত্তর এই যে, অনৈচ্ছিক মনোযোগও উদ্দেশ্যমূলক ক্রিয়া। অবশ্য এই ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য সজ্ঞান নয়।

(৩) স্পষ্টভাবে জ্ঞেয় বস্তুর সহিত **উপযোজনও** (adjustment) মনোযোগের উদ্দেশ্য। বিষয়ের জ্ঞান স্পষ্ট করিতে হইলে, কিরূপে উহার সহিত উপযোজন করিতে হইবে, মনোযোগে তাহা নির্দিষ্ট হয়।

(৪) মনোযোগের সহিত **সুখদুঃখবেদনা** জড়িত থাকে। বাহিরের দিক হইতে যাহাকে মনোযোগ বলা হয়, ভিতরের দিক হইতে তাহাই সুখ-দুঃখ রূপে অনুভূত হয়।

(৫) মনোযোগ **বিষয় নির্বাচন** এবং বর্জন করে। যে বিষয়টি উদ্দেশ্য সাধনের অনুকূল, তাহাতে মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। কিন্তু যে বিষয়গুলি উহার প্রতিকূল, সেইগুলি অপ্রাসঙ্গিক বোধে বর্জিত হয়। নির্বাচন (Selection) মনোযোগের সদর্থক এবং বর্জন (Withdrawal) উহার নঞর্থক দিক। প্রথমটিকে মনোযোগ এবং দ্বিতীয়টিকে **অমনোযোগ** (inattention) বলা হইয়া থাকে।

(৬) মনোযোগ নিরন্তর **পরিবর্তনশীল বা দোলায়মান** (fluctuating or flickering)। একটি দোলকের মত মনোযোগ নিয়ত আন্দোলিত হয় এবং বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে পরিচালিত হয়, অথবা একই বিষয়ের বিভিন্ন অংশে বিচরণ করে, কিন্তু কোনো বিষয়েই স্থিরভাবে বসিতে চায় না।

(৭) কিন্তু মনোযোগ দোলায়মান হইলেও, ইহার **ধারাবাহিকতা** (Continuity) **এবং একত্ব** (unity) আছে। স্টাউট্‌ মনোযোগের ধারাবাহিকতা এবং একত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। একসঙ্গে অনেকগুলি বিষয়ের প্রতি মনোযোগ করিলে, বিষয়গুলি একটি শ্রেণী বা গুচ্ছরূপে, অথবা প্রত্যেকটি বিষয়

অপরটির সহিত সম্বন্ধভাবে জ্ঞাত হয়। যেমন একসঙ্গে অনেকগুলি সংখ্যা বা বর্ণ উপস্থাপিত করিলে, কতকগুলি সংখ্যা বা বর্ণ জোটবদ্ধভাবে বা একত্বসূত্রে গ্রথিতভাবে এবং ধারাবাহিকভাবে দৃষ্ট হয়।

(৮) উপরের বৈশিষ্ট্যটি অন্যভাবে প্রকাশ করিয়া বলা যায় যে, মনোযোগ উহার বিষয়গুলির মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করে, অর্থাৎ মনোযোগ একটি **সম্বন্ধ-প্রতিষ্ঠাপক ক্রিয়া**।

২। মনোযোগ এবং চেতনা
(Attention and Consciousness)

মনোযোগ ও চেতনার সম্বন্ধ নিবিড়। চেতনা অনেক বিষয়কে অধিকার করিয়া থাকে। কিন্তু একই সময়ে সবগুলি বিষয়ের চেতনা স্পষ্ট থাকে না। যাহা চেতনার কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান, করে তাহাই স্পষ্ট চেতনার বিষয়। সাধারণতঃ, **মনোযোগ বলিতে স্পষ্ট চেতনা বুঝায়**। অস্পষ্ট চেতনা মনোযোগ নয়। অর্থাৎ, মনোযোগের ক্ষেত্র চেতনার ক্ষেত্রের তুলনায় সঙ্কীর্ণ। **মনোযোগ মাত্রই চেতনা, কিন্তু চেতনা মাত্রই মনোযোগ নয়। শুধু স্পষ্ট চেতনাই মনোযোগ।**

ওয়ার্ড (Ward) প্রভৃতি মনোবিদ্ **মনোযোগ এবং চেতনা সমব্যাপ্ত** (coextensive) বলিয়া মনে করেন। মনোযোগ সকল মানসবৃত্তির সহাবস্থায়ী ক্রিয়া। কিন্তু এইরূপ মতবাদের বিরুদ্ধে আপত্তি এই যে, মনোযোগ চেতনার সাধারণ সহচর হইলে, উহাদের পার্থক্য থাকে না। চেতনাকে একটি বৃত্তরূপে (circle) কল্পনা করিলে, ঐ বৃত্তের কেন্দ্রবিন্দুতে চেতনা স্পষ্টতম, এবং ঐ বিন্দু হইতে বৃত্তের পরিধি পর্যন্ত অগ্রসর হইলে, চেতনা ক্রমশঃ অস্পষ্ট হইতে অস্পষ্টতর হইতে থাকে। মনোযোগ চেতনার সহিত অভিন্ন হইলে, মনোযোগেরও অনুরূপ মাত্রাভেদ ঘটে। সুতরাং স্পষ্ট চেতনাকে স্পষ্ট মনোযোগ এবং অস্পষ্ট চেতনাকে অস্পষ্ট মনোযোগ বলিতে হয়। এমন কোনো মানসবৃত্তি নাই যাহাতে কম-বেশী পরিমাণে মনোযোগ থাকে না। কোন মানসবৃত্তিতে মনোযোগ যত স্পষ্ট, উহার চেতনা বা জ্ঞানও তত স্পষ্ট। ওয়ার্ড প্রভৃতি মনোবিদ্, যাঁহারা এই মত পোষণ করেন, তাঁহাদের মতে **মনোযোগ মানস-জীবনের সহিত সমব্যাপক**।

কিন্তু মনোযোগ ও চেতনার **অভিন্নতার বিরুদ্ধে যুক্তি** বা আপত্তি এই যে মনোযোগ ক্রিয়াত্মক বা সক্রিয় মানসবৃত্তি, কিন্তু **চেতনা নিষ্ক্রিয়**। চেতনা উৎপন্ন করিতে কোনো চেষ্টা বা ইচ্ছার দরকার হয় না, কিন্তু মনোযোগে দরকার হয়।

এমন কি অনৈচ্ছিক মনোযোগও সক্রিয়। কাজেই **চেতনা ও মনোযোগ অভিন্ন বা সমব্যাপ্ত হইতে পারে না।**

চেতনাবৃত্তের কেন্দ্রীয় চেতনাই মনোযোগ, পরিধিস্থ চেতনা মনোযোগ নয়, কিন্তু অমনোযোগের নামান্তর। চেতনা ও মনোযোগ মানসজীবনের সমব্যাপক অবস্থা, **এই মত গ্রহণীয় নয়।**

মনোযোগের **দুইটি অর্থ—যথা ব্যাপক,** এবং **সঙ্কীর্ণ।** প্রথম অর্থে মনোযোগ এবং চেতনার কোনো পার্থক্য নাই। কিন্তু দ্বিতীয় অর্থে চেতনা ব্যাপক এবং মনোযোগ ব্যাপ্য, অর্থাৎ সকল মনোযোগই চেতনা, কিন্তু সকল চেতনাই মনোযোগ নয়। এই অর্থে, বিষয়ে কেন্দ্রীভূত চেতনাই মনোযোগ। **সঙ্কীর্ণ অর্থেই মনোযোগ কথাটি গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত।**

৩। মনোযোগ ও অমনোযোগ (Attention and Inattention)

ব্যাপক অর্থে মনোযোগ মানসজীবনের সমব্যাপক সার্বভৌম ক্রিয়া, অর্থাৎ এমন মানসবৃত্তি নাই যাহাতে মনোযোগ নাই। এই ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করিলে, সংজ্ঞান তো বটেই, এমন কি সকল অবচেতন বৃত্তিতেও মনোযোগ ক্রিয়াশীল। কিন্তু সংজ্ঞান বৃত্তিতে মনোযোগের মাত্রা যত তীব্র এবং ইহার বিষয়ের জ্ঞান যত স্পষ্ট, অবচেতন বৃত্তিতে সেইরূপ নয়।

চেতনাবৃত্ত ও মনোযোগ

সঙ্কীর্ণ অর্থে স্পষ্টভাবে জ্ঞাত বিষয়ের চেতনাই যথার্থ মনোযোগ। কিন্তু **ব্যাপক অর্থে** স্পষ্টতম চেতনা হইতে আরম্ভ করিয়া অস্পষ্টতম চেতনা পর্যন্ত চেতনার সকল স্তরই মনোযোগের বিভিন্ন স্তর। চেতনাবৃত্তের কেন্দ্রস্থ বস্তু তীব্র মনোযোগের ও স্পষ্ট জ্ঞানের বিষয় হয় এবং পরিধিস্থ বস্তুগুলি কম মনোযোগের বা অমনোযোগের বিষয় হয়। অল্পতর মনোযোগকেই **অমনোযোগ বলে।** মনোযোগ এবং অমনোযোগের পার্থক্য প্রকারগত নয়, কিন্তু চেতনার মাত্রাভেদ অনুসারে পরিমাণগত।

সুতরাং অমনোযোগ (inattention) বলিতে **মনোযোগের অভাব বুঝায় না,** কিন্তু বুঝায় কম মাত্রায় বা অল্পতর মনোযোগ।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে চেতনাকেন্দ্রের বাহিরের বিষয়গুলিতে মনোযোগ নাই। কিন্তু এই বিষয়গুলিতেও মনোযোগ রহিয়াছে। কারণ ইহাদের মধ্যে একটি বিষয় মনোযোগের কেন্দ্রে আসিয়া উপস্থিত হইলে, বিষয়টি পরিচিত বলিয়াই মনে হয়। এই **পরিচিতিবোধ** প্রমাণ করে যে অমনোযোগের বিষয়গুলিতেও মনোযোগ

ছিল, কারণ তাহা না হইলে উহারা যখন মনোযোগের ক্ষেত্রে উপস্থিত হয় তখন অপরিচিত বলিয়া মনে হইত।

৪। মনোযোগের গোচর (Range or Span of attention)

কতগুলি বিষয় একসঙ্গে মনোযোগের গোচরীভূত হয়? একই সময়ে একাধিক বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া যায় কি? একই সময়ে যে সংখ্যক বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া যায় তাহাকে **মনোযোগের গোচর** বলে।

নির্ণয় পদ্ধতি

নিম্নলিখিত পদ্ধতি সাহায্যে মনোযোগের গোচর, অর্থাৎ একই সময়ে কয়টি বস্তুতে মনোযোগ করা যায় তাহা, নির্ণয় করা যাইতে পারে।

(১) যদি একটি **ক্ষণদৃক্ যন্ত্রের** (Tachistoscope) সাহায্যে পাত্রের নিকট কতকগুলি সংখ্যা (digits) বা বর্ণ (alphabets) যুগপৎ উপস্থাপিত করিয়া পরক্ষণেই সরাইয়া লওয়া হয় এবং পাত্রকে জিজ্ঞাসা করা যায় যে তাহাকে কি কি সংখ্যা বা বর্ণ দেখানো হইয়াছে, তাহা হইলে পাত্র উহাদের কয়টি স্মরণ করিতে পারে? এই ক্ষেত্রে স্মরণই মনোযোগের গোচর পরীক্ষার উপায়, কারণ যে বিষয়ে মনোযোগ করা হয়, তাহারই শুধু স্মরণ হইতে পারে। এইরূপ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে **পাত্র সাধারণতঃ চার বা পাঁচটি হইতে ছয়টি পর্যন্ত সংখ্যা বা বর্ণের বেশী স্মরণ করিতে পারে না।** সুতরাং প্রয়োগ সাহায্যে নির্ণয় হইল, মনোযোগের গোচর সাধারণতঃ চার হইতে ছয়টি বস্তুতে সীমাবদ্ধ। অবশ্য প্রতিভাবান ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে ইহা বেশীও হইতে পারে।

উপরের পরীক্ষাটি **যুগপৎ পদ্ধতি** (Simultaneous Method) সাহায্যে করা হইয়াছে, কারণ ইহাতে মনোযোগের বিষয়গুলি একই সময়ে উপস্থাপিত।

(২) মনোযোগের গোচর পরীক্ষায় দ্বিতীয় পদ্ধতিটির নাম **পূর্বাপর উদ্দীপক পদ্ধতি** (Method of successive stimuli)। একটি মাত্রামাপক ঘণ্টা (Bell metronome) নির্দিষ্ট অল্প সময়ের ব্যবধানে পর পর কয়েকবার দুই দফায় বাজানো হয় এবং পাত্রকে জিজ্ঞাসা করা হয়, প্রথম দফার ধ্বনির সংখ্যা দ্বিতীয় দফার ধ্বনি সংখ্যার সমান কি অসমান। এই পরীক্ষায়ও দেখা যায় যে পাত্র ছয়টির বেশী ধ্বনি ঠিকভাবে মনে করিতে পারে না। সুতরাং এই পরীক্ষায় স্থির হইল, মনোযোগ-গোচরের উর্ধ্বসংখ্যা ছয়টি বস্তুর বেশী নয়। অবশ্য মাক্সার্স মাত্রামাপক ঘণ্টার

কিন্তু একমাত্র বেদনাই মনোযোগের আকর্ষক হইতে পারে না। বেদনা নিষ্ক্রিয় (passive) এবং পাত্রগত (subjective), কিন্তু মনোযোগ সক্রিয় (active) এবং বিষয়গত (objective)। সুখ-দুঃখ-বেদনার মত নিষ্ক্রিয় এবং পাত্রগত অবস্থা মনোযোগের মত একটি ক্রিয়াত্মক এবং বিষয়গত অবস্থার আকর্ষণ হইতে পারে না।

আকর্ষণে সুখ-দুঃখ-বেদনা অবশ্যই আছে, কিন্তু উহার সহিত **ক্রিয়া-প্রবণতা** বা সক্রিয়তাও আছে। শুধু সুখ-দুঃখ কর্মে প্রবৃত্ত করে না, কিন্তু নিষ্ক্রিয়ভাবে আকর্ষণ করে মাত্র। আবার সুখ-দুঃখ-বেদনা অত্যন্ত তীব্র হইলে মনোযোগ অসম্ভব করিয়া তোলে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে **আকর্ষণ শুধু বেদনাত্মক নয়, ইচ্ছাত্মকও বটে।**

আকর্ষণ ও মনোযোগ সমার্থক নয়

কোনো কোনো মনোবিদ্ আকর্ষণকে মনোযোগের সহিত অভিন্ন বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের মতে আকর্ষণ থাকিলেই মনোযোগ ঘটে, আবার মনোযোগ থাকিলেই আকর্ষণ থাকে। কিন্তু আকর্ষণ এবং মনোযোগের এই সমীকরণ ঠিক বলিয়া মনে হয় না। **আকর্ষণ থাকিলে মনোযোগ ঘটে**, ইহা সত্য। যেমন সদ্যোজাত হংসশাবক জলের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ বোধ করে বলিয়া, জল দেখিলেই সে উহাতে মনোযোগী হয়। **কিন্তু বিপরীত কথাটি সত্য নয়,** অর্থাৎ এইরূপ বলা যায় না যে মনোযোগ থাকিলেই আকর্ষণ থাকিবে। বস্তুতঃ অনেক বিষয়ে আমরা ঐচ্ছিক মনোযোগ দিয়া থাকি যাহাতে আমাদের কোনো স্বাভাবিক আকর্ষণ নাই। যেমন চাকুরী করিতে গিয়া হয়তো অনেক নীরস অথবা স্বভাবতঃ আকর্ষণহীন বস্তুর প্রতি মনোযোগী হইতে হয়। যাহার অঙ্কে স্বাভাবিক বিতৃষ্ণা থাকে তাহারও হয়ত বড় বড় যোগ বা গুণ অঙ্ক করিতে হয়। বলা যাইতে পারে যে, নীরস অঙ্কে মনোযোগ আকর্ষণ ছাড়া হয় না। আসল আকর্ষণ হয়ত জীবিকা অর্জন এবং ইহার সহিত চাকুরী অনুষক্ত হওয়ায়, চাকুরীর অঙ্গ হিসাবে অঙ্কেও আকর্ষণ উৎপন্ন হয়। এই ব্যাপক অর্থে আকর্ষণ পূর্ব স্বভাব (predisposition to be interested) এবং মনোযোগের সহিত অভিন্ন।

অনুশীলনী (Exercise)

1. **Define attention. Analyse its nature with examples.**

(Ans : pp. 220—224)

মনোযোগ কাহাকে বলে? দৃষ্টান্ত সাহায্যে মনোযোগের বিশ্লেষণ কর।

2. **What are the characteristics of attention? Distinguish between attention and inattention.** (Ans : pp. 224—226)
মনোযোগের লক্ষণ কি কি? মনোযোগের সহিত অ-মনোযোগের পার্থক্য দেখাও।

3. **What is the range or span of attention? Discuss some of the experimental methods employed in determining it.**
(Ans : pp. 226—227)
প্রায়োগিক পদ্ধতির সাহায্যে মনোযোগের ক্ষেত্র আলোচনা কর।

4. **Is attention durable or does it fluctuate? Explain the fluctuation of attention citing experimental evidences thereof. Why does attention fluctuate? Discuss.** (Ans : pp. 229—231)
মনোযোগ অস্থায়ী কি? প্রায়োগিক তথ্য সাহায্যে মনোযোগের অস্থায়িতা বিচার কর। মনোযোগের অস্থায়িতার কারণ কি?

5. **Explain the conditions of attention.** (Ans : pp. 231—234)
মনোযোগের সর্ত আলোচনা কর।

6. **Explain and illustrate the different kinds of attention.**
(Ans : pp. 234—237)
দৃষ্টান্ত সাহায্যে মনোযোগ কয় প্রকার আলোচনা কর।

7. **Distinguish between voluntary, involuntary and non-voluntary attention.** (Ans : pp. 234—237)
ঐচ্ছিক, প্রতি-ঐচ্ছিক এবং অনৈচ্ছিক মনোযোগের পার্থক্য প্রদর্শন কর।

8. **Explain the relation bewteen attention and interest.**
(Ans : pp. 237—239)
মনোযোগের সহিত আকর্ষণের সম্বন্ধ আলোচনা কর।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

সংবেদন—গুণ ও পরিমাপ

(Attributes and Measurement of Sensation)

১। সংবেদন কাহাকে বলে

সংবেদন একটি মৌলিক মানস বৃত্তি। **উদ্দীপক ইন্দ্রিয়ের সংবেদীয় বা অন্তর্মুখী নার্ভের বহিঃপ্রান্তকে উত্তেজিত করিলে এবং সেই উত্তেজনা নার্ভপ্রবাহের আকারে ঐ নার্ভ দিয়া মস্তিষ্ক বা মেরুমজ্জার কেন্দ্রে পৌঁছিলে, ঐ উদ্দীপক সম্বন্ধে যে নিম্নতম চেতনা বা চেতনামাত্র ঘটে তাহাকে সংবেদন বলে।**

সংবেদনের বিশ্লেষণে এই অংশগুলি (factors) পাওয়া যায়। (১) **উদ্দীপক** (Stimulus), যাহা ইন্দ্রিয়ের সংবেদীয় বা অন্তর্মুখী নার্ভের বহিঃপ্রান্তকে উত্তেজিত বা উদ্দীপিত করিবার পক্ষে পর্যাপ্ত। (২) **ইন্দ্রিয়ের প্রান্তীয় যন্ত্র** (End-organ , অথবা সংবেদীয় নার্ভের বহিঃপ্রান্ত, যাহা উদ্দীপকের দ্বারা উদ্দীপিত হয়। (৩) **সংবেদীয় নার্ভ**, যাহা নার্ভ-প্রবাহের আকারে উত্তেজনা বহন করে। (৪) মস্তিষ্কে বা মেরুমজ্জায় অবস্থিত **নার্ভকেন্দ্র**, যেখানে সংবেদীয় নার্ভের অন্তঃপ্রান্ত রহিয়াছে এবং নার্ভপ্রবাহ শেষ হইয়া উদ্দীপক সম্বন্ধে সংবেদন জন্মায়। (৫) **প্রতিক্রিয়া** (response), যাহা উত্তেজনার ফলে ঘটে।

প্রত্যেক নার্ভ-এর বিশিষ্ট শক্তি—জোহানেস্ মুয়েলার্ঃ

মোটের উপর বলা চলে যে, যে নার্ভের যে কাজ করিবার শক্তি আছে উহা উত্তেজিত হইলে ঐ বিশিষ্ট কাজ করে—উত্তেজক পর্যাপ্তই হউক অথবা অ-পর্যাপ্তই হউক। যেমন যে উদ্দীপকের দ্বারাই হউক না কেন, উত্তেজিত হইলে, দর্শন-নার্ভ আলোক সংবেদনই উৎপন্ন করে। আবার কর্ণস্থ শ্রবণ-নার্ভ যে কোনো উদ্দীপকের দ্বারাই উদ্দীপিত হউক না কেন, উহা উদ্দীপিত হইলে, শ্রবণ সংবেদনই উৎপন্ন করে। **প্রত্যেক নার্ভের এইরূপ একটি বিশিষ্ট ক্ষমতা থাকে, যাহার গুণে উহা উহার বিশিষ্ট স্বভাব অনুযায়ী এক প্রকারের সংবেদনই উৎপন্ন করে।** সংবেদনের নিয়ামক শুধু উদ্দীপক নয়, কিন্তু উদ্দীপিত নার্ভের শক্তিও বটে। নার্ভের এই বিশেষ শক্তি বা ক্ষমতাকে জোহানেস্ মুয়েলার্-এর (Johannes Muller) নার্ভ-এর বিশেষ শক্তির মতবাদ (Theory of Specific Energy of Nerves) বলে।

২। সংবেদনের গুণ
(Attributes of Sensation)

সংবেদন বলিতে বুঝায় মৌলিক চেতনা। এইরূপ চেতনার গুণ বা ধর্ম বুঝিলে উহা আর চেতনামাত্র (bare awareness) থাকে না, কিন্তু বিশিষ্ট চেতনা হইয়া দাঁড়ায়। সংবেদন যে ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনার ফলে ঘটে অথবা যে উদ্দীপকের দ্বারা উৎপন্ন হয়, তাহার ক্ষীণতা বা স্পষ্টতা, ব্যাপ্তি, স্থায়িত্ব প্রভৃতি গুণ অনুসারে উহার কতকগুলি গুণ উৎপন্ন হয়। সংবেদনের গুণ (Attributes) প্রধানতঃ দুইটি, যথা প্রকার (Quality) এবং পরিমাণ (Quantity)। দ্বিতীয় গুণটি আবার তিন প্রকার হইতে পারে—যথা, গভীরতা (Intensity), স্থায়িত্ব (Protensity, Duration) এবং ব্যপ্তি (Extensity)। তাহা হইলে, সাকুল্যে **সংবেদনের গুণ চারটি** হইয়া দাঁড়াইল—যথা প্রকার, গভীরতা, স্থায়িত্ব এবং ব্যপ্তি।

প্রকারগত গুণ (Quality)

যে ইন্দ্রিয় উত্তেজিত হইবার ফলে সংবেদন ঘটে, তাহার প্রকারের উপর উহার প্রকারগত গুণ নির্ভর করে। যেমন চক্ষু উত্তেজিত হইলে দর্শন সংবেদন, কর্ণ উত্তেজিত হইলে শ্রবণ সংবেদন, ত্বক উত্তেজিত হইলে স্পর্শ সংবেদন, নাসিকা উত্তেজিত হইলে ঘ্রাণ সংবেদন এবং জিহ্বা উত্তেজিত হইলে স্বাদ বা রস সংবেদন উৎপন্ন হয়। সুতরাং প্রকারগত গুণের দিক হইতে সংবেদন কয়েক শ্রেণীর হইতে পারে। **যত প্রকারের ইন্দ্রিয় আছে সংবেদনও তত প্রকারের**।

সংবেদনের উপরোক্ত প্রকারগত গুণকে **সাধারণ প্রকারগত গুণ** (Generic Quality) বলা হয়, কারণ এই সকল ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি প্রকারগত গুণই অপরটির তুলনায় জাতিতে বা প্রকারে ভিন্ন। এই ভিন্নতা নির্ভর করে যে ইন্দ্রিয় উদ্দীপিত হইবার ফলে ইহা ঘটে, উহার প্রকার বা জাতিগত ধর্মের উপর। **দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, স্বাদ এবং ঘ্রাণ সংবেদনগুলির সাধারণ প্রকারগত গুণ ভিন্ন,** কারণ উহারা ভিন্নজাতীয় ইন্দ্রিয়ের উদ্দীপনার ফলে ঘটিয়া থাকে।

কিন্তু একই ইন্দ্রিয় উদ্দীপিত হইবার ফলে একই প্রকার সংবেদন উৎপন্ন হইলেও, ঐ সাধারণ শ্রেণীর বা জাতির সংবেদন আবার নানা উপজাতির হইতে পারে। একই ইন্দ্রিয়ের উদ্দীপিত হইবার ফলে যে একই জাতির বিভিন্ন উপজাতীয় সংবেদন ঘটে, উহাদের ভেদ সাধারণ জাতিগত ভেদ নয়, কিন্তু বিশেষ উপজাতীয় অথবা একই জাতির

অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন **উপজাতির ভেদ**। সংবেদনের এই উপজাতীয় গুণগত ভেদকে **বিশেষ প্রকারগত ভেদ** (Specific Difference) বলে।

একই চক্ষু ইন্দ্রিয়ের উদ্দীপিত হইবার ফলে লাল, নীল, সবুজ, পীত প্রভৃতি নানাবর্ণের সংবেদন হইতে পারে। সাধারণ ভাবে বর্ণ-সংবেদনগুলি একজাতীয় অর্থাৎ দর্শনজাতীয় হইলেও, উহারা নানা প্রকারের দর্শন সংবেদন। সুতরাং ইহারা সাধারণ গুণের দিক দিয়া অভিন্ন হইলেও, **বিশেষ গুণ** (Specific Quality) হিসাবে ভিন্ন। আবার একই শ্রবণ সংবেদনের বিভিন্ন উপজাতিগুলি, যেমন বেহালার শব্দ, তানপুরার শব্দ, সেতারের শব্দ প্রভৃতি সমজাতীয় হইলেও, বিশেষভাবে ভিন্ন, কারণ উহারা একই শব্দজাতীয় সংবেদনের বিভিন্ন উপজাতি।

পরিমাণগত গুণ (Quantity)

সংবেদনের পরিমাণগত পার্থক্যও রহিয়াছে। একটি সংবেদন আর একটি হইতে শুধু জাতিতে বা প্রকারে নয়, কিন্তু পরিমাণেও পৃথক হইতে পারে। যেমন শব্দ সংবেদন মৃদু বা তীব্র হইতে পারে। মেঘগর্জন তীব্র, ফিস্ ফিস্ করিয়া কথা বলা মৃদু শব্দ সংবেদন। পরিমাণগত পার্থক্য নানাপ্রকার—যথা গভীরতা, স্থায়িত্ব এবং ব্যাপ্তি বা ব্যাপকতা।

(১) **গভীরতা বা তীব্রতা** (Intensity)

পরিমাণগত গুণের প্রথম দিক হইল সংবেদনের তীব্রতা বা গভীরতা। দুইটি একজাতীয় সংবেদনের মধ্যে একটি তীব্র এবং অপরটি মৃদু হইতে পারে। যেমন প্রখর সূর্যালোক তীব্র এবং স্নিগ্ধ চন্দ্রালোক মৃদু আলোক সংবেদন উৎপন্ন করে। আবার উত্তপ্ত এবং নাতিশীতোষ্ণ জলের সংস্পর্শে, বজ্রের এবং ঘড়ির টিক্ টিক্ শব্দ, সন্দেশের এবং মিষ্ট দধির মিষ্টতা স্বাদ, রাজনীগন্ধার এবং গোলাপের ঘ্রাণ, যথাক্রমে তীব্র এবং মৃদু আলোক, তাপ, শব্দ, স্বাদ এবং ঘ্রাণ সংবেদন। **সংবেদনের পরিমাণগত গভীরতা বা তীব্রতা নির্ভর করে উহার উদ্দীপকের গভীরতার উপর**। উদ্দীপক তীব্র হইলে সংবেদনও তীব্র হয় এবং উহা মৃদু হইলে সংবেদনও মৃদু হইয়া থাকে।

(২) **স্থায়িত্ব বা স্থিতিশীলতা** (Duration or Protensity)

সংবেদনের দ্বিতীয় পরিমাণগত গুণ উহার স্থায়িত্ব বা স্থিতিশীলতা। প্রত্যেক সংবেদনই কোনো নির্দিষ্ট সময়ে ঘটিয়া কিছুক্ষণ স্থায়ী হয় এবং পরে বিলুপ্ত হয়।

বর্তমানতা সংবেদনের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। কিন্তু বর্তমান বিন্দুমাত্র নয়। ইহা ভবিষ্যতের গর্ভ হইতে আবির্ভূত হয় এবং অতীতের অন্ধকারে বিলীন হইয়া যায়। **সংবেদনে বর্তমানতাবোধ কাল-জ্ঞানের ভিত্তি।**

সংবেদনের স্থায়িত্ব বা স্থিতিকাল নির্ভর করে উহার উত্তেজকের স্থায়িত্বের উপর। যে গানটি অনেকক্ষণ চলিতে থাকে, তাহার শব্দ সংবেদন অনেকক্ষণ স্থায়ী। আবার যে গানটি আরম্ভ হইরাই থামিয়া যায়, তাহার শব্দ সংবেদন অল্পক্ষণ স্থায়ী। বিদ্যুতের ঝলক একবার চমকাইয়া থামিয়া যায়, সুতরাং ইহার দর্শন সংবেদন অল্পক্ষণ স্থায়ী। আবার সূর্যালোক সূর্যোদয় হইতে আরম্ভ করিয়া সূর্যাস্ত পর্যন্ত থাকে, সুতরাং ইহার দর্শন সংবেদন বেশীক্ষণ স্থায়ী। অন্যান্য জাতীয় সংবেদনেরও এইরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

(৩) ব্যাপকতা বা বিস্তার (Extensity)

সংবেদনের পরিমাণগত তৃতীয় গুণটি হইল ব্যাপকতা বা বিস্তার। **উত্তেজকের অথবা উত্তেজিত দেহাংশের বেশী বা কম ব্যাপ্তি অনুসারে সংবেদনেরও বেশী বা কম ব্যাপ্তি ঘটে।** যেমন লাল রং-এর একটি ছোট এবং একটি বড় টুকরা দেখিয়া যে দুইটি বর্ণ বা রং-সংবেদন উৎপন্ন হয়, উহার প্রথমটি কম এবং দ্বিতীয়টি বেশী বিস্তার বা ব্যাপকতা বিশিষ্ট বলিয়া মনে হয়। আবার, প্রথমে মাত্র অঙ্গুলির অগ্রভাগ, পরে ঐ অংশ হইতে কনুই পর্যন্ত সমস্ত হাতটি গরম জলে ডুবাইলে, পর পর যে দুইটি তাপ-সংবেদন হয় তাহার প্রথমটি দ্বিতীয়টি অপেক্ষা ব্যাপ্তিতে কম, আবার দ্বিতীয়টি প্রথমটি হইতে ব্যাপ্তিতে বেশী।

স্পর্শ এবং দর্শন সংবেদন ব্যাপ্তি গুণের বিশেষ অধিকারী। কিন্তু অন্যান্য সংবেদনের ব্যাপ্তি বিষয়ে মতভেদ আছে। অধ্যাপক **উইলিয়ম্ জেমস্-এর মতে সকল সংবেদনেরই ব্যাপকতা গুণটি আছে।** তিনি বলেন যে প্রসার (Volume, Spread-outness) বা বিস্তৃতি (massiveness) প্রত্যেক সংবেদনেরই ধর্ম। যেমন **শব্দ সংবেদনের** এই গুণ আছে, কারণ শব্দ খানিকটা জায়গা জুড়িয়া থাকে বা পরিব্যাপ্ত হয়। ষাঁড়ের ডাক, অথবা সিংহ ও বাঘের গর্জন বহুদূর পর্যন্ত স্থানে ব্যাপ্ত হয়। আবার চড়াই পাখীর আওয়াজ অত্যন্ত অল্প স্থানেই ব্যাপ্ত হয়। **ঘ্রাণ** বা গন্ধ এবং রস বা **স্বাদ** সংবেদনও অল্পাধিক স্থানে ছড়াইয়া থাকে। সন্ধ্যায় বাগানে ঢুকিলেই হাস্নাহানা বা রজনীগন্ধার গন্ধ অনেক দূর হইতেই পাওয়া যায়, আবার কোনো কোনো ফুল নাকের খুব নিকটে না আনিলে উহার গন্ধ পাওয়াই যায় না।

কোনো কোনো আস্বাদনে মুখের ভিতরকার সবটাই ভরিয়া যায়, আবার কোনো কোনো আস্বাদন জিহ্বার ডগা স্পর্শ করে মাত্র।

অপর পক্ষে আধুনিক প্রয়োগ-মনোবিদ্যার (Experimental Psychology) গৃহীত মত অনুসারে জেমস্-এর উপরোক্ত যুক্তি সমর্থনযোগ্য নয়। এই মতানুসারে দর্শন এবং স্পর্শ, বিশেষ করিয়া চাপ-সংবেদন ছাড়া, অন্য কোনো সংবেদনের ব্যাপ্তি বা বিস্তার নাই। **টিশ্‌নার** প্রভৃতি প্রায়োগিক মনোবিদ্‌গণের মতে প্রধানতঃ এই দুইটি সংবেদনেরই ব্যাপ্তি আছে, কিন্তু শ্রবণ, স্বাদ এবং ঘ্রাণ সংবেদনের নাই।

অন্যান্য গুণ

অনেকের, যেমন টিশ্‌নার-এর মতে উপরোক্ত গুণগুলি ছাড়া সংবেদনের আরও কতকগুলি গুণ আছে। এই গুণগুলির মধ্যে **বিশদতা** বা **স্পষ্টতা** (Clearness) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কোনো কোনো মনোবিদ্‌ মনে করেন যে স্পষ্টতা সংবেদনের একটি প্রধান গুণ। স্পষ্টতা সেই গুণ, যাহার ফলে সংবেদন চেতনায় একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে। সংবেদনের স্পষ্টতা আছে বলিয়াই উহা চেতনার উপর প্রাধান্য স্থাপন করে অথবা মনোযোগ আকর্ষণ করে। অথবা সংবেদনে মনোযোগ করার ফলে উহার যে পরিবর্তন ঘটে তাহাই উহার স্পষ্টতা।

৩। সংবেদনের প্রকারভেদ

উদ্দীপিত ইন্দ্রিয় এবং উদ্দীপক অনুসারে ভেদ

উপরের আলোচনা হইতে দেখা যায় যে উদ্দীপিত ইন্দ্রিয়ের পার্থক্য অনুসারে সংবেদন নানাপ্রকার। যেমন **চক্ষু-ইন্দ্রিয়ের উদ্দীপনা** হইতে যে সংবেদন ঘটে তাহার নাম দর্শন-সংবেদন, **কর্ণেন্দ্রিয়ের উদ্দীপনা** হইতে যে সংবেদন ঘটে তাহার নাম শ্রবণ-সংবেদন। অনুরূপভাবে **ত্বক, জিহ্বা** এবং **নাসিকা** এই তিনটি ইন্দ্রিয়ের উদ্দীপনা হইতে যে সংবেদনগুলি উৎপন্ন হয়, উহারা যথাক্রমে স্পর্শ, স্বাদ এবং ঘ্রাণ সংবেদন।

আবার, উদ্দীপকের তারতম্য অনুসারেও সংবেদনের উপরোক্ত পাঁচটি শ্রেণীবিভাগ করা যাইতে পারে। যেমন যে সংবেদন **ইথরতরঙ্গের উদ্দীপনায়** ঘটে তাহার নাম দর্শন সংবেদন এবং যে সংবেদন **বায়ুতরঙ্গের উদ্দীপনায়** ঘটে তাহার নাম শ্রবণ সংবেদন। তেমনই **তাপ, আকর্ষণ-বিকর্ষণ, চর্মের ক্ষতি বা ক্ষতির আশঙ্কা**, যথাক্রমে তাপ, চাপ ও ব্যথা নামক স্পর্শ সংবেদন উৎপন্ন করে এবং **দ্রবণীয় বস্তু ও গ্যাসীয় কণা** যথাক্রমে স্বাদ এবং ঘ্রাণ সংবেদন জন্মায়।

বাহ্য এবং আন্তর-ভেদে সংবেদন-ভেদ

আবার অন্য দিক দিয়া উপরোক্ত পাঁচটি বিশেষ সংবেদন (Special sensation) ছাড়াও সংবেদনের আরও বিভিন্ন প্রকার শ্রেণীভেদ করা যাইতে পারে। যেমন উদ্দীপকটি বাহ্য অথবা আন্তর, এই ভেদ অনুসারে সংবেদনকে বাহ্য (external), এবং আভ্যন্তর (internal) অথবা যান্ত্রিক (organic), এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। যে সকল সংবেদন বাহ্য উদ্দীপক দ্বারা উৎপন্ন হয়, উহাদিগকে **বাহ্য সংবেদন** বলে। আবার যে সকল সংবেদন আভ্যন্তরীণ উদ্দীপক সাহায্যে উৎপন্ন হয় উহাদিগকে আভ্যন্তরীণ বা **যান্ত্রিক সংবেদন** বলে। যেমন দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, স্বাদ ও ঘ্রাণ বাহ্য সংবেদন, কারণ উহারা ইথর-তরঙ্গ, বায়ু-তরঙ্গ, তাপাদি, দ্রবণীয় পদার্থ, গ্যাসীয় কণা প্রভৃতি বাহ্য উদ্দীপকের দ্বারা উৎপন্ন হয়। পক্ষান্তরে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা, ক্লান্তি, মাথাঘোরা প্রভৃতি যান্ত্রিক সংবেদনগুলি দেহযন্ত্রের নানা আভ্যন্তরীণ উদ্দীপকের দ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে।

অন্যান্য সংবেদন

উপরোক্ত সংবেদনগুলির অতিরিক্ত আরও কতকগুলি সংবেদন আছে, যেমন **পেশী** সংবেদন (muscular), **সন্ধি** সংবেদন (joint, tendinous), **বন্ধনী** সংবেদন (articular) প্রভৃতি।

আবার কোনো কোনো ইন্দ্রিয় একাধিক সংবেদন উৎপন্ন করিতে পারে, যেমন কর্ণ শুধু যে শ্রবণ-সংবেদনই উৎপন্ন করে তাহা নয়, কিন্তু অন্যান্য সংবেদনও উৎপন্ন করে। কর্ণের আভ্যন্তরীণ অংশ, যাহাকে **অর্ধবৃত্তনালী** (semicircular canal) বলে, তাহা উত্তেজিত হইলে **মাথাঘোরা** (vertigo) সংবেদনের উৎপত্তি হয়। এই কর্ণাংশটিকে **স্থিরতা** সংবেদনের (static sense) ইন্দ্রিয়ও বলা হইয়া থাকে, কারণ ইহার উত্তেজনা দেহের **সাম্যবোধ** (equilibrium sense) উৎপন্ন করে। কেহ কেহ অর্ধবৃত্তনালীর এই সংবেদনকে **যান্ত্রিক** সংবেদনও বলিয়া থাকেন।

৪। সংবেদনের ব্যাপ্তি—দেশাভিজ্ঞান (Local Sign)

ব্যাপ্তি গুণটি প্রধানতঃ স্পর্শ এবং দর্শন সংবেদনেরই ধর্ম। স্পর্শ সংবেদনে চর্মের যে বিন্দুগুলি উদ্দীপিত হয়, উহাদের প্রত্যেকটির সংবেদন অপরটির সহিত যুক্ত হইয়া একটি **সমষ্টিগত চর্ম-সংবেদন** উৎপন্ন করে। কিন্তু এই সমষ্টিগত স্পর্শ সংবেদনের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকটি চর্মবিন্দুর স্থানীয় বা দৈশিক স্বাক্ষর বা চিহ্ন বা স্থানীয় সঙ্কেত

(Local Signature, Local Sign) আছে। **উদ্দীপিত ইন্দ্রিয়ের যে ধর্ম থাকিবার ফলে উহা উদ্দীপিত হইয়াছে বলিয়া বুঝা যায় তাহাকে উহার স্থানীয় সঙ্কেত বলে।**

যেমন পায়ের আঙুলের কোনো বিন্দু উদ্দীপিত হইলে যে সংবেদন হয়, তাহার সহিত আমরা হাতের আঙুলের কোনো বিন্দুর উদ্দীপনা-প্রসূত সংবেদনকে একাকার করিয়া ফেলি না। আমরা প্রথম সংবেদনটিকে পায়ের আঙুলের কোনো নির্দিষ্ট বিন্দুর এবং দ্বিতীয়টিকে হাতের আঙুলের কোনো নির্দিষ্ট বিন্দুর সংবেদনরূপে পৃথক-ভাবে বুঝিয়া থাকি। প্রত্যেক চর্মবিন্দুর নিজস্ব দৈশিক সংবেদন বা বোধ আছে এবং তাহা আছে বলিয়াই ঐ স্থানের সংবেদনকে অন্য স্থানের সংবেদন হইতে পৃথক বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। চর্ম সংবেদনের এই **দৈশিক নির্দেশ বা সঙ্কেতই দেশ বা স্থান প্রত্যক্ষের মৌলিক ভিত্তি**। বিষয়টি প্রত্যক্ষ শীর্ষক পরিচ্ছেদে আরও স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যাত হইবে *

আবার দর্শন সংবেদনেরও এইরূপ দৈশিক নির্দেশ বা স্থানীয় সঙ্কেত আছে। ইহা থাকিবার ফলেই কোনো বস্তু দেখিয়া আমরা বুঝিতে পারি উহা কোন্ স্থানে অবস্থিত। বস্তুর যে অংশ অক্ষিপটস্থ পীতবিন্দুর ডান দিকে প্রতিবিম্বিত হয় উহা বামদিকে দৃষ্ট হয়। আবার বস্তুর যে অংশ ঐ বিন্দুর উপরিভাগে এবং নিম্নভাগে প্রতিবিম্বিত হয়, তাহা যথাক্রমে উপরে এবং নীচে দেখা যায়।

বলা যাইতে পারে যে অক্ষিপটে বস্তুর বিপরীত প্রতিবিম্ব পড়িবার দরুন দক্ষিণ, বাম, উপর, নীচ উল্টাইয়া যায়। উত্তর এই যে শারীরবৃত্তের দিক দিয়া ইহা সত্য সন্দেহ নাই। কিন্তু দর্শন সংবেদনে এমন মানসক্রিয়া ঘটে, যাহার ফলে বস্তুকে বিপরীত না দেখিয়া যথার্থরূপে দেখা যায়।

৫। সংবেদনের গভীরতা বা তীব্রতা— মাত্রাভেদ বা পরিমাপ (Measurement)

একই প্রকারের সংবেদন গভীরতা বা মাত্রাভেদে কমবেশী হইতে পারে। স্পর্শ-সংবেদন, যেমন চাপ বা ওজন, কম বা বেশী ; দর্শন-সংবেদন, যেমন লাল বর্ণ, ফিকে বা টকটকে ; স্বাদ-সংবেদন, যেমন মিষ্ট, মৃদু বা তীব্র ; শব্দ-সংবেদন, যেমন স্বর, উচ্চ বা নিম্ন ; এবং ঘ্রাণ-সংবেদন, যেমন ফুলের গন্ধ, তীব্র বা মৃদু হইতে পারে।

* দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদের চতুর্দশ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

এই স্থলে চাপ, লাল বর্ণ, মিষ্ট স্বাদ, সুর এবং গন্ধ সংবেদনদ্বয়ের মধ্যে প্রকারগত পার্থক্য নাই, কিন্তু আছে মাত্রাগত বা পরিমাণগত পার্থক্য।

সংবেদনের মাত্রা—পরিমাপের অসুবিধা

দুইটি স্থূল বস্তুর মাত্রাভেদ যেমন ঐ বস্তুদ্বয়কে তুলাদণ্ডে ওজন করিয়া নির্ণয় করা যায়, উহাদের ওজন-সংবেদনকে এইরূপ তুলাদণ্ডে ফেলিয়া ওজন করা যায় না। এক সের চিনি হাতে তুলিলে যে ওজন বা ভার-সংবেদন অনুভূত হয়, উহার ওজন এক সের নয়, অথবা দুই সের চিনি হাতে তুলিলে যে ভার-সংবেদন হয়, উহার মাত্রা দুই সের অথবা পূর্ব সংবেদনটির তুলনায় দ্বিগুণ নয়। সুতরাং সংবেদনের মাত্রাভেদ নির্ণয় করা সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়।

সমস্যার এইরূপ মীমাংসা করা যাইতে পারে। এক, দুই এবং তিন সের ওজনের তিনটি ক্ষেত্রে চিনির ওজন সংবেদনকে পৃথকভাবে পরিমাপ করিতে না পারিলেও, **দ্বিতীয়টি প্রথমটি হইতে যেরূপ মাত্রায় বেশী, তৃতীয়টিও দ্বিতীয়টির তুলনায় সেইরূপ মাত্রায় বেশী,** সাধারণভাবে এইরূপে সংবেদনের গভীরতা বা মাত্রাভেদ করা যাইতে পারে। অর্থাৎ সংবেদনের চূড়ান্ত বা নিরপেক্ষ (absolute পরিমাপ সম্ভব না হইলেও, উহার সাপেক্ষ (relative) পরিমাপ সম্ভব।

সংবেদনের গভীরতা বা মাত্রাভেদ গুণটিকে প্রয়োগ সাহায্যে নির্ণয় করিবার চেষ্টা হইয়াছে। প্রশ্নটি দাঁড়াইয়াছে এই যে, **উদ্দীপকের হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে সংবেদনের যে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে, তাহা কি সমপরিমাণ বা সমানুপাতিক অথবা অসমান?** অর্থাৎ, উদ্দীপক যে মাত্রায় বা পরিমাণে বাড়ে বা কমে, উহার ফলে সংবেদনও কি সেই মাত্রায় বাড়ে বা কমে, অথবা উহাদের হ্রাস-বৃদ্ধি ভিন্ন মাত্রায় ঘটিয়া থাকে? এক সের চিনি তুলিতে যে ভার-সংবেদন অনুভূত হয়, দুই সের চিনি তুলিবার ভার-সংবেবন অবশ্যই উহার তুলনায় বেশী বলিয়া অনুভূত হয়। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, প্রথম সংবেদনটির তুলনায় দ্বিতীয়টি কি দ্বিগুণ বলিয়া অনুভূত হয়, অথবা দ্বিগুণ অপেক্ষা কম-বেশী বলিয়া অনুভূত হয়?

হ্বেবার্ ফেক্‌নার্ প্রভৃতি, মাত্রা-মনোবিদ্‌গণ (Quantitative psychologists) এই প্রশ্নের বিজ্ঞানসম্মত উত্তর দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সুতরাং সংবেদনের পরিমাণ বা মাত্রার পরিমাপ করিতে গিয়া হ্বেবার্ এবং ফেক্‌নার্ য সূত্র উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহাই বর্তমানে আলোচ্য।

৬। হেবার্ সূত্র (Weber's Law)

হেবার্-এর সূত্র বুঝিতে হইলে, এই কয়টি বিষয় স্মরণ রাখিতে হইবে।

সংবেদনের নিম্ন সীমা

(১) যদিও প্রত্যেক উদ্দীপকই সংবেদন উৎপন্ন করে, উদ্দীপকের গভীরতা একটি নির্দিষ্ট সীমার কম হইলে, উহার ফলে উৎপন্ন সংবেদন বোধগম্য (perceptible) হয় না। যেমন, মাথার চুলের ওজন থাকিলেও উহা বোধগম্য হয় না। আবার চুলের সহিত একটি তুলার আঁশ লাগিয়া থাকিলে চুলের ওজন বাড়িয়া যায়, অথচ এই ওজন-বৃদ্ধি বোধগম্যভাবে কোনো সংবেদন-বৃদ্ধি ঘটায় না। **সংবেদন-বৃদ্ধি যে সীমা অতিক্রম করিলে ঠিক বোধগম্য** (just perceptible) **হয়, তাহাকে সংবেদনের আরম্ভসীমা** (Threshold of Sensation) **বলে**। সংবেদনবৃদ্ধির ঠিক বোধগম্যতায় এই সীমাকে **নিম্ন-সীমা**-ও (lower limit) বলা হয়।

সংবেদনের উচ্চ সীমা

(২) ঠিক বোধগম্য সংবেদনের নিম্ন সীমা হইতে আরম্ভ করিয়া যদি উদ্দীপকটিকে ক্রমে ক্রমে বাড়ানো হইতে থাকে, সংবেদনও ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে। এই বৃদ্ধির একটি **উচ্চসীমাও** (upper limit) আছে, যাহা ছাড়াইয়া যাইবার পর কোনো উদ্দীপক-বৃদ্ধিই বোধগম্য সংবেদন-বৃদ্ধি উৎপন্ন করে না। তাহা হইলে, **যে সীমাকে অতিক্রম করিলে কোনো বোধগম্য সংবেদন-বৃদ্ধি ঘটে না, তাহাকে বলে সংবেদনের উচ্চসীমা**।

সংবেদন-ক্ষেত্র

(৩) এই দুই সীমার মধ্যবর্তী ক্ষেত্রকে বলে **সংবেদন-ক্ষেত্র** (Range of Sensibility)। সংবেদন-ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় মাত্রায় উদ্দীপক-বৃদ্ধি বোধগম্য সংবেদন-বৃদ্ধি উৎপন্ন করে। উদ্দীপক বৃদ্ধি যদি এইরূপ মাত্রায় ঘটে, যাহার ফলে একটি **ন্যূনতম বা ঠিক বোধগম্য সংবেদন-বৃদ্ধি** (Just noticeable difference or J. N. D.) অনুভূত হয়, তাহা হইলে সংবেদনটি নিম্নসীমার ঊর্ধ্বে এবং উচ্চসীমার নিম্নে, অর্থাৎ সংবেদনীয়তার সীমায় আসিল।

(৪) এইবার প্রশ্ন এই, **প্রত্যেক উদ্দীপক-বৃদ্ধিই কি বোধগম্য সংবেদন-বৃদ্ধি ঘটায়?** হেবার্-এর আবিষ্কারের ফলে জানা গিয়াছে যে তাহা ঘটায় না। একটি ঠিক বোধগম্য সংবেদন-বৃদ্ধি (অর্থাৎ এমন বৃদ্ধি যাহা একটু কম হইলে বোধগম্য হইত না) ঘটাইতে হইলে, উদ্দীপকটিকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে

বাড়াইতে হইবে এবং **উদ্দীপক-বৃদ্ধির হার বা অনুপাত হইবে বোধগম্য সংবেদন-বৃদ্ধির হার বা অনুপাত অপেক্ষা বেশী।** প্রত্যেকটি বোধগম্য সংবেদন-বৃদ্ধিই সমান। কিন্তু প্রত্যেকটি উদ্দীপক বৃদ্ধিই সমান নয়।

হেবার্‌-সূত্র

এইবার হেবার্‌-এর মতটিকে **দৃষ্টান্ত** সাহায্যে বুঝানো যাউক। একটি তুলাদণ্ডের একদিকে এক সের বাটখারা চাপাইয়া এবং অপরদিকে এক সের চিনি রাখিয়া, উহা ওজন করা হইল। ঐ এক সের বাটখারার সহিত আর এক সের বাটখারা যোগ করিয়া তুলাদণ্ডের পাল্লা সমান করিতে হইলে, অপরদিকে আরও এক সের চিনি চাপাইতে হইবে। এই ক্ষেত্রে বাটখারার ওজন যেমন দ্বিগুণ করা হইল উহার বিপরীত দিকে চাপানো চিনির ওজনও তেমন দ্বিগুণ দাঁড়াইল।

ধরা যাউক যে চর্মের উপর স্থাপিত এক সের ওজনের উদ্দীপকটি 'উ' এবং ইহার ফলে যে চাপ-সংবেদন উৎপন্ন হয় তাহা 'চ'। সুতরাং দুই সের ওজনের বর্ধিত উদ্দীপকটি উ+উ এবং ইহার ফলে যে বর্ধিত ভার-সংবেদন ঘটে, তাহা চ+চ ; আবার তিন সের ওজনের বর্ধিত উদ্দীপকটি উ+উ+উ এবং ইহার ফলে উৎপন্ন বর্ধিত ভার সংবেদন চ+চ+চ।

উ	—	চ
উ+উ	—	চ+চ
উ+উ+উ	—	চ+চ+চ

উদ্দীপক-বৃদ্ধি এবং সংবেদন-বৃদ্ধি উপরোক্তরূপ নয়। চিনির পরিবর্তে চিনির চাপ বা ভার-সংবেদনের পরিমাপ ব্যাপারটি অন্যরূপ। হেবার্‌-এর সূত্র অনুসারে উদ্দীপকের উল্লিখিত বৃদ্ধির সঙ্গে সংবেদনের সমানুপাতিক বৃদ্ধি হইবে না। চাপ উদ্দীপকের সহিত উহার সমান পরিমাণ যোগ করিলে, চাপ সংবেদনের সহিত উহার সমান পরিমাণ যোগ হইবে না। উদ্দীপক বৃদ্ধির তুলনায় সংবেদন-বৃদ্ধির পরিমাণ কম। সংবেদনের **ঠিক বোধগম্য বৃদ্ধি** উৎপন্ন করিতে হইলে উদ্দীপককে সংবেদন অপেক্ষা বেশী পরিমাণে বাড়ানো দরকার।

প্রথম উদ্দীপকটি 'উ' এবং প্রথম সংবেদনটি 'চ' হইলে প্রথম বোধগম্য সংবেদন-বৃদ্ধি উৎপন্ন করিবার জন্য **উদ্দীপককে উহা অপেক্ষা বেশী উহার একটি নির্দিষ্ট ভগ্নাংশ দিয়া গুণ করা আবশ্যক।** অথবা যতবার একটি ন্যূনতম বোধগম্য সংবেদন-বৃদ্ধি ঘটে, ততবারই বর্তমান উদ্দীপককে উহা অপেক্ষা অধিক কোনো নির্দিষ্ট

ভগ্নাংশ দিয়া গুণ করিতে হয়। সংবেদন-বৃদ্ধি ঘটে উহার একটি ন্যূনতম বোধগম্য-বৃদ্ধি ঘটিয়াছে, এই আকারে। কিন্তু উদ্দীপক-বৃদ্ধি ঘটে উহাকে উহা অপেক্ষা বেশী উহার কোনো নির্দিষ্ট ভগ্নাংশ দিয়া গুণ করিয়া। যেমন আঙুলের অগ্রভাগে **ন্যূনতম বা ঠিক বোধগম্য চাপ-সংবেদন বৃদ্ধি ঘটাইতে হইলে উদ্দীপককে অন্ততঃ উহা অপেক্ষা বেশী উহার $\frac{১}{২০}$ ভগ্নাংশ অর্থাৎ $১\frac{১}{২০}$ বা $\frac{২১}{২০}$ দিয়া গুণ করিতে হইবে।**

চাপ-উদ্দীপক বৃদ্ধি—		ন্যূনতম চাপ-সংবেদনবৃদ্ধি
উ	—	চ
উ × $\frac{২১}{২০}$	—	চ-এর প্রথম ন্যূনতম বোধগম্য বৃদ্ধি
উ × $\frac{২১}{২০}$ × $\frac{২১}{২০}$	—	প্রথমবার ন্যূনতমভাবে বর্ধিত চ-এর দ্বিতীয় ন্যূনতম বৃদ্ধি
উ × $\frac{২১}{২০}$ × $\frac{২১}{২০}$ × $\frac{২১}{২০}$	—	দ্বিতীয়বার ন্যূনতমভাবে বর্ধিত চ-এর তৃতীয় ন্যূনতম বৃদ্ধি

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে **ন্যূনতম বা ঠিক বোধগম্য সংবেদন বৃদ্ধি অথবা ভেবার-এর ভাষায়** (Just Noticeable Difference of Sensation—J.N.D.) **উৎপন্ন করিতে হইলে, উদ্দীপককে উহা অপেক্ষা বেশী উহার একটি নির্দিষ্ট ভগ্নাংশদিয়া গুণ করিয়া বাড়াইতে হইবে।**

এই **নির্দিষ্ট ভগ্নাংশটি বিভিন্ন উদ্দীপকের ক্ষেত্রে ভিন্ন।** যেমন আঙুলের ডগার বা অগ্রভাগের চাপ-সংবেদনের ন্যূনতম বোধগম্য বৃদ্ধি করিতে হইলে, বর্তমান উদ্দীপককে উহা অপেক্ষা বেশী $\frac{১}{২০}$ অর্থাৎ $\frac{২১}{২০}$ ভগ্নাংশ দিয়া গুণ করিতে হয়। আবার, **আলোকের উজ্জ্বলতা সংবেদনের** ঠিক বোধগম্য বৃদ্ধি ঘটাইতে হইলে, উহাকে উহা অপেক্ষা বেশী $\frac{১}{১০০}$ অর্থাৎ $\frac{১০১}{১০০}$ ভগ্নাংশ দিয়া গুণ করিতে হইবে। **শব্দ সংবেদনের** ঠিক বোধগম্য বৃদ্ধি উৎপন্ন করিতে হইলে উদ্দীপককে উহা অপেক্ষা বেশী $\frac{১}{৩}$ অর্থাৎ $\frac{৪}{৩}$ ভগ্নাংশ দিয়া গুণ করিতে হইবে। এইরূপে **দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ এবং স্বাদ** প্রভৃতি সকল সংবেদনের ন্যূনতম বা ঠিক বোধগম্য সংবেদন-বৃদ্ধি ঘটাইতে হইলে, উহাদের উদ্দীপকগুলিকে **পরীক্ষালব্ধ বিভিন্ন ভগ্নাংশ** দিয়া গুণ করিয়া বাড়াইতে হয়।

ন্যূনতম বা ঠিক বোধগম্য সংবেদন-বৃদ্ধির নির্দিষ্ট **ভগ্নাংশটি নিরপেক্ষ** (absolute) **নয়, কিন্তু সাপেক্ষ** (relative)। অর্থাৎ উদ্দীপক-বৃদ্ধির হার নির্ভর

করে বর্তমান উদ্দীপকের পরিমাণ বা মাত্রার উপর। ন্যূনতম অথবা ঠিক বোধগম্য সংবেদন-বৃদ্ধিও নির্ভর করে যে সংবেদন বর্তমান তাহার উপর। কোনো প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মচারীর বেতনই যদি পাঁচ টাকা বাড়ানো হয়, আপাতদৃষ্টিতে এবং নিরপেক্ষ-ভাবে সকল কর্মচারীরই একই মাত্রায় বেতন বৃদ্ধি ঘটিল বলিয়া মনে হইলেও, বস্তুতঃ সেইরূপ ঘটে না। যে কর্মচারীর মাসিক বেতন এক শত টাকা, তাহার পাঁচ টাকা বেতনবৃদ্ধি এবং যে কর্মচারীর মাসিক বেতন পাঁচ শত টাকা, তাহার পাঁচ টাকা বেতন-বৃদ্ধি নিরপেক্ষভাবে সমান হইলেও, যত টাকা বেতনের উপর এই বৃদ্ধি ঘটিয়াছে তাহার তুলনায় অথবা সাপেক্ষভাবে উহা সমান নয় কারণ পাঁচ টাকা এক শত টাকার কুড়ি ভাগের এক ভাগ, কিন্তু পাঁচ শত টাকার এক শত ভাগের এক ভাগ। সুতরাং এই বৃদ্ধি এককভাবে সমান হইলেও তুলনাগতভাবে অসমান।

৮। ফেক্‌নার্-এর সূত্র (Fechner's Law)

হ্বেবার্-এর সূত্রে উদ্দীপকের মাত্রাবৃদ্ধির গাণিতিক পরিমাণ নির্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে সংবেদনের বৃদ্ধিকে ন্যূনতম বা ঠিক বোধগম্য বৃদ্ধি অথবা 'জাস্ট্ নোটিসি-য়েব্‌ল ডিফারেন্স ইন্ সেন্‌সেশন্' বা জে. এন্. ডি. বলিয়াই ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ **হ্বেবার্ উদ্দীপক-বৃদ্ধির গাণিতিক সংখ্যা নির্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু সংবেদন-বৃদ্ধির গাণিতিক সংখ্যা বা পরিমাণ নির্দেশ করেন নাই**। প্রত্যেকটি ন্যূনতম বা ঠিক বোধগম্য সংবেদন-বৃদ্ধিকে সাধারণভাবে সমান বলিয়া ইঙ্গিত করিলেও, উহার মাত্রা বা পরিমাণ হ্বেবার্ কর্তৃক নির্দিষ্ট হয় নাই। হ্বেবার্-সূত্রের এই অসমাপ্ত অংশটি সমাপ্ত করিতে সচেষ্ট হইলেন ফেক্‌নার্। এই কারণে **এই সূত্রটিকে যুগ্মভাবে হ্বেবার্-ফেক্‌নার্ সূত্র** (Weber-Fechner Law) **বলা হইয়া থাকে**। ইহার পরিপূর্ণ রূপ শুধু হ্বেবার্-এর একার নয়, কিন্তু উভয়ের।

জি টি. ফেক্‌নার্ প্রমাণ করিলেন যে প্রত্যেকটি ন্যূনতম বা ঠিক বোধগম্য সংবেদন-বৃদ্ধিই যখন সমান, তখন উহাকে **এককরূপে** (unit) প্রকাশ করা যাইতে পারে। যেমন এক সের চাপ উদ্দীপক হইতে যে চাপ-সংবেদন উৎপন্ন হয় তাহাকে যদি 'চ' বলা হয় তবে ঐ এক সের ওজনের উদ্দীপককে $১\frac{১}{২০}$ অথবা $\frac{২১}{২০}$ দ্বারা গুণ করিয়া বাড়াইলে, প্রথম ন্যূনতম বা ঠিক সংবেদন-বৃদ্ধি, অর্থাৎ 'চ'-এর সহিত **একটি একক যুক্ত হইবে**। সুতরাং উদ্দীপকের সহিত সংবেদনের সম্বন্ধ দাঁড়াইবে $উ \times \frac{২১}{২০} = চ + ১$। আবার $\frac{২১}{২০}$ উ-কে উহার $\frac{২১}{২০}$ দিয়া গুণ করিয়া বাড়াইলে দ্বিতীয় ন্যূনতম বোধগম্য সংবেদন বৃদ্ধি অর্থাৎ পূর্ব সংবেদনের সহিত দ্বিতীয় একক যুক্ত

হইবে। সুতরাং উদ্দীপকের সহিত সংবেদনের সম্বন্ধ দাঁড়াইবে উ × $\frac{১১}{১০}$ × $\frac{১১}{১০}$ = চ + ১ + ১। আবার $\frac{১১}{১০}$ × $\frac{১১}{১০}$ উ-কে উহার $\frac{১১}{১০}$ দিয়া গুণ করিয়া বাড়াইলে, তৃতীয় ন্যূনতম বোধগম্য সংবেদন-বৃদ্ধির তৃতীয় একক পূর্ব সংবেদনের সহিত যুক্ত হইবে। ফলে উদ্দীপকের সহিত সংবেদনের সম্বন্ধ দাঁড়াইবে উ × $\frac{১১}{১০}$ × $\frac{১১}{১০}$ = চ + ১ + ১ + ১।

উদ্দীপক-বৃদ্ধি	ন্যূনতম বোধগম্য সংবেদন-বৃদ্ধি
উ	চ
উ × $\frac{১১}{১০}$	চ + ১
উ × $\frac{১১}{১০}$ × $\frac{১১}{১০}$	চ + ১ + ১
উ × $\frac{১১}{১০}$ × $\frac{১১}{১০}$ × $\frac{১১}{১০}$	চ + ১ + ১ + ১

উদ্দীপক-বৃদ্ধি এবং উহার ফলে ন্যূনতম বা ঠিক বোধগম্য সংবেদন-বৃদ্ধির সম্বন্ধ বুঝাইতে গিয়া ফেক্‌নার **গাণিতিক ধারা** (Arithmetical Progression—A.P.) এবং **জ্যামিতিক ধারার** (Geometrical Progression—G.P.) সম্বন্ধের আশ্রয় লইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে **সংবেদন-বৃদ্ধি উদ্দীপক-বৃদ্ধির লগারিথ্‌ম্‌ রূপে** (Logerithm) **ঘটিয়া থাকে** (Sensation varies as the logarithm of the Stimulus)। এক হইতে আরম্ভ করিয়া, এক-কে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা দিয়া গুণ করিয়া, দ্বিতীয় সংখ্যাটিকে ঐ নির্দিষ্ট সংখ্যা দিয়া গুণ করিয়া, আবার তৃতীয় সংখ্যাটিকে ঐ দির্দিষ্ট সংখ্যা দিয়া গুণ করিয়া, যে ধারাবাহিক বা ক্রমিক সংখ্যাগুলি পাওয়া যায়, উহারা জ্যামিতিক ধারায় অগ্রসর হয়, যেমন, ১, ৩, ৯, ২৭, ৮১ ইত্যাদি। আবার এক হইতে আরম্ভ করিয়া উহাকে ঐ নির্দিষ্ট সংখ্যার সহিত যোগ করিয়া, দ্বিতীয় সংখ্যাটিকে ঐ নির্দিষ্ট সংখ্যার সহিত যোগ করিয়া আবার তৃতীয় সংখ্যাটিকেও উহার সহিত যোগ করিয়া, যে ধারাবাহিক বা ক্রমিক সংখ্যাগুলি পাওয়া যায়, উহারা গাণিতিক ধারায় অগ্রসর হয়, যেমন ১, ৪, ৭, ১০ ইত্যাদি সংখ্যাগুলি গাণিতিক ক্রমে অগ্রসরমাণ সংখ্যা।

ফেক্‌নার্-এর মতে, এক একটি ন্যূনতম বোধগম্য সংবেদন বৃদ্ধি হয় বর্তমান সংবেদনের সহিত একক যোগ করিয়া, এবং ইহা উৎপন্ন করিতে হইলে যে হারে উদ্দীপক-বৃদ্ধি প্রয়োজন তাহাও ঘটে বর্তমান উদ্দীপকের সহিত উহা অপেক্ষা বেশী উহার একটি নির্দিষ্ট ভগ্নাংশ গুণ করিয়া। সুতরাং **উদ্দীপক-বৃদ্ধি অগ্রসর হয় অনেকাংশে জ্যামিতিক ধারায় এবং সংবেদন-বৃদ্ধি অগ্রসর হয় অনেকাংশে গাণিতিক ধারায়।**

তাহা হইলে' উদ্দীপক-বৃদ্ধির মানকে একটি অপরিবর্তিত (Constant—'C') ভগ্নাংশ দিয়া গুণ করিতে থাকিলে যে ন্যূনতম বা ঠিক বোধগম্য সংবেদনবৃদ্ধিগুলি পাওয়া যায়, উহাদের যথাক্রমে জ্যামিতিক বা জি. পি. ধারা এবং গাণিতিক বা এ. পি. ধারা বলা যায়। উদ্দীপক-বৃদ্ধির বেলায় **অপরিবর্তিত গুণনীয়ক** হইল, ঐ উদ্দীপকের একটি নির্দিষ্ট ভগ্নাংশ এবং ন্যূনতম বা ঠিক বোধগম্য সংবেদনবৃদ্ধির **যোজক** সর্বদা একটি একক বা ইউনিট।

ফেক্‌নার ইহাদের সম্বন্ধকে গাণিতিক সমীকরণের (equation) সাহায্যে প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার সংক্ষিপ্ত সমীকরণ সূত্রটি এই :—

এস্ = সি. লগ্ আর্

এই সমীকরণে 'এস্' বলিতে বুঝায় সংবেদন বা সেন্‌সেশন্, 'সি'-এর অর্থ হইল অপরিবর্তিত ভগ্নাংশ, 'লগ্'-এর অর্থ লগারিথ্‌ম্ (logarithm) এবং 'আর্'-এর অর্থ হইল উদ্দীপক।

মাতৃভাষায় এই সমীকরণটিকে এইরূপে প্রকাশ করা যাইতে পারে—

সংবেদন = অপরিবর্তনীয় ভগ্নাংশ × উদ্দীপক।

এখানে প্রথম ন্যূনতম বা ঠিক বোধগম্য সংবেদনকেই ধরা হইয়াছে।

৯। হ্বেবার্-ফেক্‌নার্ সূত্রের সমালোচনা

(১) হ্বেবার-ফেক্‌নারসূত্র মনোবিদ্যাকে বিজ্ঞানরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টায় একটি **বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।** বিজ্ঞানের বিজ্ঞানত্ব নির্ভর করে উহাকে গাণিতিক আকারে প্রকাশ করিবার সাফল্যের উপর। হ্বেবার্-ফেক্‌নার উদ্দীপক ও সংবেদনকে পরিমাণগত মনোবিদ্যার (Quantitative Psychohology) ভাষায় বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। হ্বেবার্ শুধু উদ্দীপককে গাণিতিক সংখ্যায় পরিণত করিয়াই নিরস্ত হইয়াছিলেন। তিনি সংবেদনবৃদ্ধিকে শুধু ন্যূনতম বা ঠিক বোধগম্য বৃদ্ধি বলিয়াই ছাড়িয়া দিয়া উহার গাণিতিক রূপায়ণে অগ্রসর হন নাই। কিন্তু ফেক্‌নার উদ্দীপক-বৃদ্ধির মত ন্যূনতম বোধগম্য সংবেদন-বৃদ্ধির পরিমাণও গাণিতিক সংখ্যায় প্রকাশ করিয়াছেন।

(২) কিন্তু এই বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা যতই সাধু হউক না কেন, ইহার কতকগুলি **গুরুত্বপূর্ণ এবং অসংশোধনীয় ত্রুটি আছে বলিয়া মনে হয়। উদ্দীপক এবং সংবেদনের পার্থক্য** মনে রাখা দরকার। হ্বেবার্ এই পার্থক্যের দিকে লক্ষ্য

রাখিয়াই হয়ত শুধু উদ্দীপককে সংখ্যায়ত্ত করিয়াছেন, সংবেদনকে করেন নাই। উদ্দীপক জড় পদার্থ বিশেষ। ইহা যান্ত্রিক বা রাসায়নিক। ইহাকে যে কোন যান্ত্রিক বা রাসায়নিক শক্তির মত বাড়ানো বা কমানো যাইতে পারে। সুতরাং উদ্দীপককে গাণিতিক সংখ্যার মত বাড়ানো বা কমানো যায়। এই অংশে হেবার্-ফেক্‌নার-এর চেষ্টা বিজ্ঞান-সম্মত। **সংবেদন উদ্দীপকের মত কোনো যান্ত্রিক বা রাসায়নিক শক্তি মাত্র নয়।** সংবেদন আসলে একটি মানসবৃত্তি। যোগ অঙ্কের সাহায্যে ইহার পরিমাণ বা মাত্রা বাড়ানো বা কমানো যায় না। এই দিক দিয়া, **হেববার্-এর সূত্র ফেক্‌নার-এর সূত্র অপেক্ষা সন্তোষজনক**, কারণ হেবার্ সংবেদনকে সংখ্যায়ত করেন নাই, ফেক্‌নার করিয়াছেন।

একটি দৃষ্টান্ত সাহায্যে উদ্দীপক ও সংবেদনের এই পার্থক্য দেখানো যাউক। দুইটি রসগোল্লা ওজনে হয়ত একটির দ্বিগুণ। কিন্তু দুইটি রসগোল্লার স্বাদ-সংবেদন একটির তুলনায় দ্বিগুণ না হইয়া কম বা বেশী হইতে পারে। রসগোল্লার সংখ্যা-বৃদ্ধির সহিত উহার ওজন কমিয়া যাইবার কোনো সম্ভাবনা নাই, কিন্তু স্বাদ-সংবেদনের আছে। এই কারণে **হেববার্-এর সূত্রটী ফেক্‌নার-সূত্রের তুলনায় অপেক্ষাকৃত নির্দোষ।**

(৩) তাহা ছাড়া, হেববার-ফেক্‌নার সূত্রের আর একটি দোষ হইল উহার **একদেশদর্শিতা। ফেক্‌নার** উদ্দীপক-বৃদ্ধির ভগ্নাংশকে যেমন আপেক্ষিক বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, সংবেদন-বৃদ্ধির এককে তেমন আপেক্ষিক বলিয়া নির্দেশ করেন নাই। তিনি হেববার-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া প্রথম উদ্দীপকের সহিত দ্বিতীয় উদ্দীপকের পার্থক্যের অনুপাত নির্ণয় করিয়াছেন কিন্তু প্রথম ন্যূনতম বা ঠিক বোধগম্য সংবেদন-বৃদ্ধির সহিত দ্বিতীয় **ন্যূনতম বোধগম্য সংবেদন-বৃদ্ধির অনুপাত দেখান নাই।** ফেক্‌নার সংবেদন-বৃদ্ধির এককে সমান, নির্দিষ্ট বা নিরপেক্ষরূপে নির্ধারণ করিয়াছেন। সংবেদন-বৃদ্ধির এককগুলি একক হিসাবে সমান বা নিরপেক্ষ হইলেও, পূর্ববর্তী সংবেদন-বৃদ্ধির তুলনায় দ্বিতীয় সংবেদন-বৃদ্ধিতে উহা আর একক থাকিতে পারে না। অল্প সংবেদনের একক বৃদ্ধি কখনও বর্ধিত সংবেদনের একক বৃদ্ধির সমান হইতে পারে না। চ+১ সংবেদন-বৃদ্ধিতে, যে অনুপাতে+১ 'চ'কে বাড়ায়, চ+১ +১ সংবেদন-বৃদ্ধিতে নিশ্চয়ই +১, সেই অনুপাতে চ+১-কে বাড়ায় না। আবার চ+১+১ যে অনুপাতে চ+১-কে বাড়ায়, চ+১+১+১ সেই অনুপাতে চ+১+১ -কে বাড়ায় না। অর্থাৎ, **সংবেনের একক বৃদ্ধিকে নিরপেক্ষ বা অ্যাবসল্যুট্**

(absolute) **না করিয়া সাপেক্ষ বা রিলেটিভ্** (relative) **করাই সমীচীন বলিয়া মনে হয়।**

(৪) চতুর্থতঃ, একটি পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী ন্যূনতম বোধগম্য সংবেদন-বৃদ্ধির ব্যবধানে কোনো সংবেদন-বৃদ্ধিই ঘটে না, হেবার-ফেক্‌নার সূত্র এইরূপ কোনো ইঙ্গিত করে কি? কিন্তু একটি পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সংবেদন-বৃদ্ধির মধ্যেও যে বোধের অগম্য অথবা **অবচেতন সংবেদন-বৃদ্ধি ঘটে** তাহাতে সন্দেহ নাই। সংবেদনকে ক্রমশঃ বাড়াইতে থাকিলে, একটি সংবেদন ঠিক বাড়িয়াছে বলিয়া বোধগম্য হওয়ার পূর্বে উহা বাড়ে নাই, অথবা উহার বৃদ্ধি একেবারেই বোধগম্য হয় নাই, এইরূপ বলা যায় না। এইরূপ বলিলে ন্যূনতম বোধগম্য সংবেদন-বৃদ্ধিটি আকস্মিক এবং অকারণ হইয়া পড়ে। **সমস্যাটির সমাধান** এই : সংবেদনীয় নিম্নসীমারও নিম্নে যে সকল সংবেদন-বৃদ্ধি ঘটে, তাহা ঠিক বোধগম্য হয় না ঠিকই, কিন্তু তাহার অস্পষ্ট বোধ বা চেতনা থাকে। এইরূপ যুক্তির ভিত্তিতে হেবার-ফেক্‌নারসূত্র সংজ্ঞান মনের অন্তস্তলে অন্তর্জ্ঞান বা অবচেতন মনের অস্তিত্ব প্রমাণ করে।

(৫) হেবার-ফেক্‌নার সূত্রের **সীমাবদ্ধ ক্ষেত্র** মনে রাখা দরকার। এই সীমাবদ্ধতা এই সূত্রের **দোষ বা ত্রুটি নয়**, কারণ ইহা স্বীকার করিয়াই ইঁহারা ইঁহাদের সূত্র নির্দেশ করিয়াছেন। ইহার সীমাবদ্ধতা এই : হেবার-ফেক্‌নার সূত্র সংবেদনের নিম্নসীমায় (lower limit) এবং উচ্চসীমায় (upper limit) প্রযোজ্য নয়। ইহা শুধু এই দুইটি সীমার মধ্যবর্তী সংবেদনক্ষেত্রেই (range of sensibility) প্রযোজ্য।

অনুশীলনী (Exercise)

1. Define sensation. Give an analysis of the processes involved in sensation. (Ans : p. 241)

   সংবেদন কাহাকে বলে? সংবেদন বিশ্লেষণ কর।

2. State and explain the attributes of sensation. Does extensity characterise all sensations ? Discuss.

   (Ans : pp. 242—245)

   সংবেদনের গুণ নির্দেশ এবং ব্যাখ্যা কর। সকল সংবেদনেরই ব্যাপ্তি আছে কি?

3. **What do you mean by intensity of sensation? How, if at all, does sensation admit of measurement?**

(Ans : pp. 243 ; 247-248)

সংবেদনের তীব্রতা বলিতে কি বুঝায়? সংবেদনের পরিমাপ সম্ভব হইলে, কিরূপে উহা সম্ভব?

4. **How does Weber formulate his law of sensation? Discuss.**

(Ans : pp. 249-252)

হেবার তাঁহার সংবেদন-সূত্রটি কিরূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন?

5. **State Fechner's improvement upon Weber in the measurement of sensation. Is it really an improvement at all?**

(Ans : pp. 252-254)

সংবেদনের পরিমাপে ফেক্‌নার হেবার-সূত্রের কোন উন্নতি সাধন করিতে পারিয়াছেন কিনা তাহা আলোচনা কর।

6. **State and explain the Weber-Fechner law of sensation.**

(Ans : pp. 252-256)

সংবেদনের হেবার-ফেক্‌নার সূত্র উল্লেখ করিয়া উহার সমালোচনা কর।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

দর্শন ও শ্রবণ সংবেদন : চক্ষুর এবং কর্ণের গঠন ও কার্য

(Visual & Auditory Sensation : Structure & Functions of the Eye & the Ear)

১। দর্শন সংবেদনের উৎপত্তি এবং প্রকারভেদ

(Origin & Kinds of Visual Sensation)

দর্শন সংবেদনের উৎপত্তি :

দর্শন সংবেদন বলিতে বুঝায় আলোক বা বর্ণ **দেখা**। দর্শন সংবেদনের ইন্দ্রিয় চক্ষু। ইহার **উদ্দীপক** ইথর তরঙ্গ বা আলোক। এই উদ্দীপক চক্ষুগোলকের বিভিন্ন অংশের মধ্য দিয়া **দর্শন-নার্ভের** বহিঃপ্রান্তকে উদ্দীপিত করে। এই উদ্দীপনা নার্ভ-প্রবাহের আকারে মস্তিষ্কের **দৃষ্টিকেন্দ্রস্থ দর্শন-নার্ভের** অন্তঃপ্রান্তে পৌঁছায়। ইহার ফলে দর্শন সংবেদন উৎপন্ন হয়।

দর্শন সংবেদনের প্রকার :

দর্শন সংবেদন প্রধানতঃ **দুই প্রকার**—যথা **আলোক** বা **অবর্ণ** (light, achromatic) সংবেদন এবং **বর্ণ** (chromatic or colour) সংবেদন। আবার আলোক সংবেদন **দুই প্রকার**—যথা **আলোক ও অন্ধকার** (light and darkness) সংবেদন। যেহেতু বর্ণ অসংখ্য, বর্ণ সংবেদনও অসংখ্য। কিন্তু প্রধান বর্ণ চার শ্রেণীতে বিভক্ত—যথা **লাল** (red), **হলুদ বা পীত** (yellow), **সবুজ** (green) এবং **নীল** (blue)। তাই প্রধান বর্ণ সংবেদনও চার প্রকার, যথা **লাল বর্ণ সংবেদন, পীত বর্ণ সংবেদন, সবুজ বর্ণ সংবেদন** এবং **নীল বর্ণ সংবেদন**।

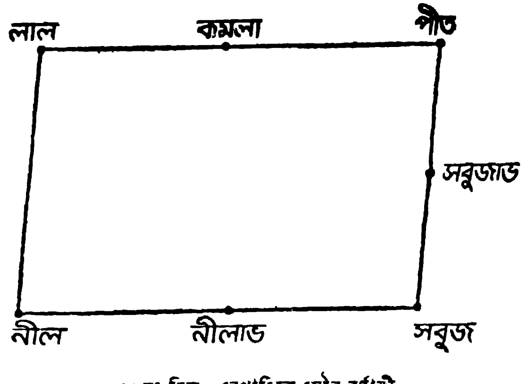
আলোক বিন্যাস :

আলোক সংবেদনগুলিকে উহাদের গভীরতা বা মাত্রার অল্পাধিক্য অনুসারে একটি সরলরেখায় সাজানো যাইতে পারে। এই সরলরেখার **প্রথম প্রান্তে শুভ্র বা শাদা** (white) থাকিলে, ইহা ক্রমশঃ ক্ষীণ, ক্ষীণতর এবং ক্ষীণতম হইয়া **শেষ প্রান্তে অন্ধকার বা কালো** (dark or black) হইয়া যায়। এই রেখার প্রথম প্রান্তে রহিয়াছে শুভ্র বা শাদা এবং শেষ প্রান্তে কালো। ইহার মধ্যবিন্দুতে থাকে আলোকান্ধকার বা শাদাকালোর মাঝামাঝি। এই সরলরেখার মধ্যবিন্দু হইতে

কালো প্রান্তের দিকে অগ্রসর হইলে আলোকরেখাটি ক্রমশঃ ধূসর (grey) হইতে ধূসরতর হইয়া শেষ প্রান্তে ধূসরতম অথবা সম্পূর্ণ কালো হইয়া দাঁড়ায়। আবার ইহার মধ্যবিন্দু হইতে শুভ্র বা শাদা প্রান্তের দিকে অগ্রসর হইলে আলোকরেখাটি ক্রমশঃ শুভ্র, শুভ্রতর হইয়া শেষ প্রান্তে শুভ্রতম বা সম্পূর্ণ-শুভ্র হইয়া দাঁড়ায়। শাদা-কালোর মধ্যবর্তী অন্ততঃ ছয় শত হইতে সাত শত আলোক সংবেদন আছে।

বর্ণ সংবেদনের বিন্যাস ঃ

কিন্তু আলোক-সংবেদনের তুলনায় **বর্ণ সংবেদনগুলি** জটিল। বর্ণের সংখ্যা অনন্ত। টিশ্‌নার বলেন যে বর্ণের সংখ্যা অন্ততঃ কয়েক হাজার। ইহাদিগকে আলোক-সংবেদনের মত একটি সরলরেখায় সাজানো যায় না। বর্ণালী-বীক্ষণ-যন্ত্র (colour prism) সাহায্যে সূর্যের আলোক দেখিলে ঐ আলোক **সৌর বর্ণালীতে** (solar spectrum) বিশ্লিষ্ট হয়। এই বর্ণালীর বাম দিকে দেখা যায় **লাল**। লাল হইতে ডান দিকে অগ্রসর হইলে দেখা যায় যে লাল ক্রমশঃ **পীতাভ**, তারপর **কমলা**-রং হইয়া **খাঁটি পীত** বর্ণে পরিণত হয়। এইখানেই লাল-পীত **প্রথম সরলরেখাটির শেষ**। তারপর সৌর বর্ণালীর দিক পরিবর্তন ঘটে। পীতবর্ণ দ্বিতীয় সরলরেখায় **সবুজাভ** অবস্থা অতিক্রম করিয়া **খাঁটি সবুজ** বর্ণে পরিবর্তিত হয়। এইস্থানে **দ্বিতীয় সরলরেখাটির শেষ**। এই পীত সবুজ সরলরেখাটি আবার দিক পরিবর্তন করে। সবুজ বর্ণ **নীলাভ** অবস্থা অতিক্রম করিয়া **খাঁটি নীল** বর্ণে পরিণত হয়। এইস্থানে **তৃতীয় সরলরেখাটির শেষ** এবং চতুর্থ সরলরেখার আরম্ভ। চতুর্থ



১৯নং চিত্র—রেখাচিত্রে সৌর বর্ণালী

সরলরেখাটি **নীল রক্তিমাভ** অবস্থা অতিক্রম করিয়া রক্ত বা লাল বর্ণে ফিরিয়া আসে।

লাল, পীত, সবুজ ও নীল, এই চারটি বর্ণকে মুখ্য, মূল বা **মৌলিক** (primary) **বর্ণ** বলে। কিন্তু **নিউটন**-এর মতে মৌলিক বর্ণ সাতটি। তিনি মনে করেন যে **রামধনুর সাতটি বর্ণ**—যথা বেগুনী (violet), নীল (indigo), আস্‌মানী (blue), সবুজ (green), পীত (yellow), কমলা (orange) এবং লাল (red), যাহাদের সংক্ষেপে বলা হয় ভিব্‌জিঅর্‌ (VIBGYOR)। মাতৃভাষায় এই সংক্ষেপণের অনুকরণে সাতটি রংকে বলা যায় বেনীআসহকলা (বেগুনী, নীল, আসমানী, সবুজ, হলুদ, কমলা, লাল)।

বর্ণালীর এই সাতটি বর্ণকে মুখ্য বা মৌলিক বর্ণ বলা চলে না, কারণ ইহাদের অনেকগুলিই একাধিক মুখ্যবর্ণের মিশ্রণ-ফল। যেমন কমলা রং লাল ও হলুদ রং-এর আবার বেগুনী রং আস্‌মানী ও লাল রং-এর সংমিশ্রণ। **হেরিং** (Hering) প্রভৃতির মতে **মুখ্য বা মূল বর্ণ চারটি,** যথা লাল, হলুদ, সবুজ এবং আস্‌মানী নীল। কিন্তু **হেল্‌ম্‌হোল্‌জ ও ইয়ং** (Helmholtz and Young)-**এর মতে মূল বর্ণ তিনটি**, যেমন লাল, সবুজ ও নীল। এই মতানুসারে হলুদ মুখ্য বর্ণ নয়, কারণ লাল ও সবুজকে নির্দিষ্ট মাত্রায় মিশাইলে হলুদ রং পাওয়া যায়।

পদার্থবিদ্যা ও মনোবিদ্যার বর্ণসংবেদন :

মনোবিদ্যায় গৃহীত বর্ণগুলি পদার্থবিদ্যা-গৃহীত বর্ণগুলির সহিত অন্ততঃ দুইটি বিষয়ে পৃথক্‌। মনোবিদ্যার বর্ণশ্রেণী সম্পূর্ণ, কিন্তু বর্ণালীর বর্ণগুলি অসম্পূর্ণ। যেমন উল্লিখিত চতুর্থ সরলরেখাটিতে নীল লালে পরিণত হইবার আগে বেগুনী-লাল (purple) এবং লাল-বেগুনী (carmine) এই দুইটি স্তর অতিক্রম করে। বর্ণালীতে কিন্তু এই দুইটি বর্ণের কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না, কারণ বর্ণালী ভায়োলেট বা বেগুনীতেই থামিয়া যায়। কিন্তু মনোবিদ্যা এই সরলরেখাকে প্রসারিত করে এবং বেগুনী অতিক্রম করিয়া বেগুনী-লাল এবং লাল-বেগুনীর মধ্য দিয়া লালে ফিরিয়া আসে। দ্বিতীয়তঃ, বর্ণালীর লাল রংটি বিশুদ্ধ বা খাঁটি লাল নয়, কিন্তু উহাতে পীত বা হলুদ বর্ণের মিশ্রণ থাকে। বিশুদ্ধ লাল বর্ণালীর বাহিরে, কিন্তু মনোবিদ্যার অন্তর্গত।

বর্ণের বৈশিষ্ট্য :

বর্ণের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য। (১) **বর্ণমাত্র বা হিউ** (Hue)—বর্ণের এই বৈশিষ্ট্যটি নির্ভর করে উহার উৎপাদক ইথর-তরঙ্গের **দৈর্ঘ্যের** উপর। লাল বর্ণের হিউ সর্বাধিক, কারণ ইহার উৎপাদক ইথর-তরঙ্গের দৈর্ঘ্য সর্বাধিক।

হেলম্‌হোলজ্‌-এর বর্ণালী-বিশ্লেষণ অনুযায়ী ইথর-তরঙ্গের দৈর্ঘ্য অনুসারে প্রধান কয়েকটি বর্ণ উল্লিখিত হইল। তিনি তরঙ্গের দৈর্ঘ্য মাইক্রোমিলিমিটার হিসাবে নির্ণয় করিয়াছেন। মাইক্রোমিলিমিটার বলিতে বুঝায় মিলিমিটার-এর দশ লক্ষ ভাগ।

তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য		বর্ণ
৭৬০·৪০ মাইক্রোমিলিমিটার		শেষ প্রান্তের লাল
৬৮৬·৮৫৩	,,	লাল
৬৫৬·৩১৪	,,	লাল-কমলা
৫৮৯·৬২৫	,,	সোনালী পীত
৫২৬·৯৯০	,,	সবুজ
৪৮৬·১৬৪	,,	সবুজ-নীল
৪৩০·৮২৫	,,	বেগুনী, নীল-বেগুনী
৩৯৬·৮৭৯	,,	বেগুনী

(২) বর্ণের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হইল ইহার **উজ্জ্বলতা** (brightness) অথবা **আভা** (Tint)। এই বৈশিষ্ট্যটি নির্ভর করে বর্ণের প্রকাশ (luminosity) বা তীক্ষ্ণতার (intensity) উপর। পীত বর্ণ সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল এবং বেগুনী সর্বাপেক্ষা অনুজ্জ্বল। বর্ণের আভা উদ্দীপক ইথর-তরঙ্গের **উচ্চতা** (amplitude) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

(৩) বর্ণের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হইল **সংপৃক্তি** (Saturation) অথবা বর্ণের গভীরতা (colour-depth) অথবা ক্রোমা (chroma)। বর্ণের সহিত আলোকের মিশ্রণ যত কম, উহা তত বেশী সংপৃক্ত (saturated) এবং এই মিশ্রণ যত বেশী, উহা তত কম সংপৃক্ত। বর্ণের এই বৈশিষ্ট্যটি ইথর তরঙ্গের গঠনদ্বারা (wave-form) নিয়ন্ত্রিত হয়।

২। অনুসংবেদন (After-sensation) বা অনু-প্রতিরূপ (After-image)

ইন্দ্রিয়ের উপর উদ্দীপকের ক্রিয়ার ফলে সংবেদন ঘটে। উদ্দীপক একবার সক্রিয় হইয়া নিষ্ক্রিয় হইলেও, অনেক সময় উহার পূর্বক্রিয়ার রেশ বা প্রতিক্রিয়া চলিতে থাকে। **উদ্দীপকের অপসারণ বা নিষ্ক্রিয়তা সত্ত্বেও, উহার পূর্বক্রিয়ার বা**

সংবেদনের প্রতিক্রিয়া চলিতে থাকার ফলে যে মানসবৃত্তি ঘটে, তাহাকে অনুসংবেদন (after-sensation) বা অনু-প্রতিরূপ (after-image) বলে।

অনুসংবেদনটি যদি সংবেদনের অনুরূপ হয়, তবে উহাকে **সবর্ণ বা সমজাতীয় অনুসংবেদন বলে** (positive after-sensation)। আবার, অনুসংবেদনটি যদি সংবেদনের বিপরীত হয়, উহাকে বলে **অসবর্ণ বা বিপরীত অনুসংবেদন** (negative after-sensation)।[১] অনুবেদন প্রায় সকল প্রকার সংবেদনের প্রতিক্রিয়া হিসাবে ঘটিতে পারে।

সবর্ণ অনুসংবেদন (Positive after-sensation)

তীব্র আলোকের দিকে ১৫ হইতে ২০ সেকেণ্ড কাল দৃষ্টি নিবদ্ধ করিবার পর চক্ষু বন্ধ করিলে, অথবা কোনো বর্ণহীন পশ্চাদভূমিতে (colourless black-ground) যেমন শাদা দেওয়ালে, দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলে, সবর্ণ আলোক অনুসংবেদন ঘটে। আবার একটি জ্বলন্ত দিয়াশলাই-এর কাঠি ঘুরাইলে যে অগ্নিবৃত্ত উৎপন্ন হয়, তাহাতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া চক্ষু বুজিলে, বা কোন বর্ণহীন পশ্চাদ্‌ভূমিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলে, উহার উপর অগ্নিবৃত্তটি দৃষ্ট হয়। দ্বিতীয় অগ্নিবৃত্তটি সবর্ণ অনুসংবেদন। আবার দুই চোখ হাত দিয়া ঢাকিয়া রাখিবার পর, খুলিয়া, একটি উজ্জ্বল আলোকের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া আবার দুই চোখ বন্ধ করিলে, অথবা কোনো বর্ণহীন পশ্চাদ্‌ভূমিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিলে, ঐ উজ্জ্বল আলোকটি সবর্ণ অনুসংবেদনরূপে দেখা যাইতে থাকে।

সবর্ণ অনুসংবেদন চঞ্চল অথবা ক্ষণস্থায়ী (flickering)। উহা একবার দেখা যায়, আবার পরক্ষণেই অদৃশ্য হয়। এইরূপ পুনঃপুনঃ দৃশ্য ও অদৃশ্য হইবার পর ইহা ক্রমশঃ মিলাইয়া যায়।

অসবর্ণ অনুসংবেদন (Negative after-sensation)

যদি একটি রঙীন কাগজের মধ্যস্থলে ১৫ হইতে ২০ সেকেণ্ড কাল স্থিরদৃষ্টি নিবদ্ধ করিবার পর একটি বৃহত্তর বর্ণহীন বা ধূসর পটভূমিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যায়, উহাতে একটি বর্ণখণ্ড (patch of colour) দৃষ্টিগোচর হয়। এই দ্বিতীয় বর্ণখণ্ডটির আকার উদ্দীপক বর্ণখণ্ডটির অনুরূপ, কিন্তু উহা প্রথমটির বিপরীত (negative) বা পরিপূরক (complementary)। উদ্দীপক অপসৃত হইলেও উহার সমাকৃতি, অথচ বিপরীত, এই প্রতিক্রিয়াকে অসবর্ণ অনুসংবেদন (negative after-sensation) বলে।

১ ২য়, খণ্ড, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

যেমন, উদ্দীপক বর্ণটি যদি যথাক্রমে লাল, সবুজ, পীত ও নীল হয়, তবে উহার উপর ১৫ হইতে ২০ সেকেণ্ড কাল স্থিরদৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া দৃষ্টি সরাইয়া লইলে এবং তাহার পর একটি বৃহত্তর বর্ণহীন বা ধূসর দেওয়াল, বস্ত্রখণ্ড, শাদা কাগজ অথবা কালো বোর্ডে দৃষ্টিপাত করিলে, ঐ পটের উপর উদ্দীপক বর্ণখণ্ডের সমাকার কিন্তু বিজাতীয় বা পরিপূরক যথাক্রমে সবুজ, লাল, নীল ও পীত বর্ণখণ্ড দেখা যাইবে। অর্থাৎ **লাল রং সংবেদনের অসবর্ণ অনুসংবেদন সবুজ, সবুজের লাল, পীত বা হলুদের নীল এবং নীলের পীত বা হলুদ**। অসবর্ণ অনুসংবেদন উহার সংবেদনের পরিপূরক। লাল অসবর্ণ অনুসংবেদন, সবুজের সংবেদনের এবং সবুজ লালের পরিপূরক। আবার পীত অসবর্ণ অনুসংবেদন, নীলের সংবেদনের এবং নীল পীতের পরিপূরক। পরিপূরক বর্ণ বা রং বলিতে এমন দুইটি বর্ণ বা রংকে বুঝায় যাহাদের মিশ্রণফল শাদা বা আলোক-সংবেদন—অর্থাৎ **যে দুইটি রংকে যথাযোগ্য পরিমাণে মিশাইলে শাদা বা আলোক-সংবেদন উৎপন্ন হয় উহাদিগকে পরিপূরক বর্ণ বলে**।

অসবর্ণ অনুসংবেদন সবর্ণ অনুসংবেদনের মত **অস্থির এবং ক্ষণিক**। ইহা একবার আসে আবার চলিয়া যায়। এই পরিবর্তন (fluctuation) ২০ হইতে ৩০ বার পর্যন্তও ঘটিতে পারে। **অনুসংবেদনের ক্ষণিকতার কারণ কি ?** কাহারও কাহারও মতে চক্ষুর অজ্ঞাত সঞ্চালনই (unconscious movement) অনুসংবেদনের গতিশীলতার কারণ। আবার কেহ কেহ মনে করেন যে অনুসংবেদনের গতিশীলতা উহার নিজস্ব নিয়ম এবং স্বভাব।

অনুসংবেদন উৎপন্ন করিতে হইলে (১) উদ্দীপক বস্তুর প্রতি বিশেষ মনোযোগ আবশ্যক, (২) আবার উহার প্রতিক্রিয়ার উপর মনকে কেন্দ্রীভূত করাও আবশ্যক। চক্ষুর সামান্যতম ইচ্ছাকৃত সঞ্চালনও দর্শন অনুসংবেদনের প্রতিবন্ধক হইতে পারে। অনিচ্ছাকৃত চক্ষুসঞ্চালন প্রতিবন্ধক হইলেও ইহার প্রতিকার নাই।

অনু-প্রতিরূপ (After-image)

অনুসংবেদনকে অনেকেই অনু-প্রতিরূপ (after image) বলিয়াছেন। তাঁহাদের এই নামকরণ সহজবোধ্য। সংবেদন উদ্দীপকের উপস্থিতিতেই ঘটিয়া থাকে। উদ্দীপকের অনুপস্থিতিতে যে মানসবৃত্তি ঘটে, তাহাকে সংবেদন বলা চলে না, কিন্তু প্রতিরূপ বলিতে হয়। সুতরাং উদ্দীপকের উপস্থিতিতে যে সংবেদন হয়, তাহা

অপসৃত হইলে, উহার প্রতিক্রিয়া হিসাবে যে মানসবৃত্তি ঘটে তাহাকে অনুসংবেদন না বলিয়া অনু-প্রতিরূপ বলা সঙ্গত

এই **মতভেদের মীমাংসা** প্রসঙ্গে বলিতে হয় যে উদ্দীপকের অনুপস্থিতিতে ঘটিলেও, অনুসংবেদন উদ্দীপকের প্রতিক্রিয়ারূপেই ঘটিয়া থাকে। তাহা ছাড়া, স্পষ্টতার দিক দিয়াও অনুসংবেদন সংবেদনের অনুরূপ। উপরন্তু ইহা পাত্রের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে না, যেমন অল্পাধিকরূপে প্রতিরূপ করে। ইহা উদ্দীপকের অনুপস্থিতিতে ঘটিলেও, সংবেদনের মতই জ্ঞাত হয় এবং ইহাকে সংবেদন বলা হয় না, কিন্তু বলা হয় অনুসংবেদন, অথবা সংবেদনের একটি পশ্চাদ্বর্তী অবস্থা। সুতরাং ইহাকে **অনু-সংবেদন বলা অসঙ্গত নয়**।

৩। পরিপূরক বর্ণ (Complementary colour)

যে দুইটি বর্ণকে মাত্রানুযায়ী মিশ্রণ করিলে শাদা বা বর্ণহীন আলোক উৎপন্ন হয়, উহাদের একটিকে অপরটির পরিপূরক বা কম্‌প্লিমেণ্টারি বর্ণ বলে। ইহাদের একটি অপরটির বিপরীত। যেমন পীত এবং আস্‌মানী নীল, পরস্পর পরস্পরের বিপরীত বা পরিপূরক বর্ণ। বর্ণালীর লাল, সবুজের পরিপূরক নয়, কিন্তু ইহা একপ্রকার নীলাভ-সবুজের পরিপূরক, কারণ বর্ণালীর লাল বিশুদ্ধ লাল নয়, কিন্তু পীতাভ লাল। বর্ণালীর বাহিরে যে বিশুদ্ধ লাল কল্পিত হয় এবং যাহা মনোবিদ্যার দিক হইতে বিশুদ্ধ লাল, তাহার পরিপূরক অবশ্যই সবুজ। বর্ণালীর বিশুদ্ধ নীলের সহিত বিশুদ্ধ পীতের মাত্রানুযায়ী মিশ্রণফলেও বর্ণহীন আলোক উৎপন্ন হয়। আবার বিশুদ্ধ লাল এবং বিশুদ্ধ সবুজ মিশ্রিত করিলেও, অনুরূপভাবে শাদা এবং বর্ণহীন আলোক পাওয়া যায়।

সুতরাং লাল-সবুজ এবং পীত-নীল বর্ণগুলির এক এক জোড়ার এক একটি অপরটির পরিপূরক বর্ণ। প্রত্যেক বর্ণেরই পরিপূরক আছে। শুধু তাহাই নয়, শাদা এবং কালো বর্ণ নয়, কিন্তু আলোক এবং আলোকাভাব। ইহাদেরও একটি অপরটির পরিপূরক।

৪। বর্ণ-বৈসাদৃশ্য (Colour Contrast)

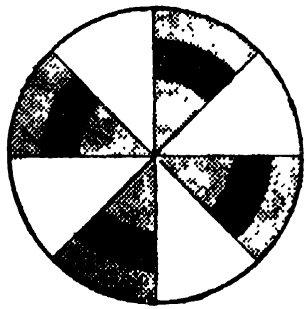
দেখা গিয়াছে যে বর্ণ-সংবেদনের প্রতিক্রিয়ারূপে উহার অসবর্ণ অনুসংবেদন ঘটে। এই ঘটনাকে (phenomenon) বলে বর্ণ-বৈসাদৃশ্য বা কালার্‌ কন্‌ট্র্যাস্ট্‌, যেমন পীতবর্ণ সংবেদনের প্রতিক্রিয়ারূপে, উহার বিপরীত নীল বর্ণের অসবর্ণ অনুসংবেদন ঘটে। এই ঘটনাটি একটি বর্ণ-বৈসাদৃশ্যের ঘটনা।

বর্ণ-বৈসাদৃশ্য **দুই প্রকার,** যথা সমকালীন বা যুগপৎ (simultaneous) এবং পরবর্তীকালীন বা অনুবর্তী (successive) বৈসাদৃশ্য।

সমকালীন বা যুগপৎ বৈসাদৃশ্য (Simultaneous Contrast)

দুইটি রং একই সময়ে পাশাপাশি বা একটির উপরে বা নীচে আর একটি থাকিলে, উহার একটি অপরটির পরিপূরক রং-এর দ্বারা অনুরঞ্জিত হয়। এই বর্ণ-বৈসাদৃশ্যের নাম সমকালীন বৈসাদৃশ্য। যেমন একটি শাদা কাগজের উপর একটি লাল রং-এর খণ্ড বা টুক্‌রা স্থাপন করিয়া উহাদিগকে একটি শাদা টিস্যু কাগজ দিয়া ঢাকিলে, শাদা রং-এর কাগজটি নীলাভ সবুজে অনুরঞ্জিত (tinged) দেখা যায়।

পার্শ্ববর্তী নক্সার (২০নং চিত্র) অনুরূপ একটি চক্রফলক বা ডিস্ক্ কাটিয়া লওয়া যাউক—ইহাতে শাদা অংশগুলি শাদার, কালো অংশগুলি কালোর এবং মলিন বা ছায়াচ্ছন্ন (shaded) অংশগুলি কোনো রং-এর পরিবর্তে ব্যবহৃত হইয়াছে। এইবার এই চক্রফলকটিকে বর্ণচক্রে (colourwheel) ঘুরানো যাউক। এইক্ষেত্রে ঘূর্ণায়মান চক্রফলকের উপরিভাগটি (surface) দেখা যাইবে ধূসর, যাহাকে ঘিরিয়া থাকিবে একটি শাদাভ ঘের (ring)। আবার কালোর পরিবর্তে রংটি কমলা হইলে, চক্রফলকের উপরিভাগ দেখা যাইবে পীতাভ, যাহার চারিদিকে রহিয়াছে একটি নীলাভ ঘের।


২০নং চিত্র—বর্ণচক্র

রংটি সবুজ হইলে, দেখা যাইবে একটি ফিকে সবুজ বা সবুজাভ উপরিভাগ, যাহাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে একটি লাল-বেগুনী purplish) ঘের বা রিং।

অনুবর্তী বৈসাদৃশ্য Successive Contrast)

অনুবর্তী বর্ণ-বৈসাদৃশ্য অসবর্ণ অনুসংবেদনের অনুরূপ। কিন্তু ইহারা অনুরূপ হইলেও, অভিন্ন নয়। অসবর্ণ অনুসংবেদনে, উহার সহিত প্রথম সংবেদনের কোনো সুস্পষ্ট পার্থক্য বা বৈসাদৃশ্য জ্ঞান না-ও থাকিতে পারে। যেমন লাল রংটিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিবার পর, উহা হইতে দৃষ্টি অপসারণ করিয়া একটি বর্ণহীন পটে তাকাইলে, লাল রং-এর বিজাতীয় যে সবুজ রং দেখিতে পাওয়া যায়, উহা অসবর্ণ অনুসংবেদনের দৃষ্টান্ত। এই অনুসংবেদনে পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী রংটিকে তুলনামূলকভাবে দেখা

হয় না। এই দুইটি রং বিসদৃশ হইলেও উহাদের **বৈসাদৃশ্য স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে না**। কিন্তু অনুবর্তী বর্ণবৈসাদৃশ্যে উহাদের পার্থক্য স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে।

৫। বর্ণান্ধতা (Colour-blindness)

সাধারণভাবে বলিতে গেলে বর্ণদর্শনে **অক্ষমতাই** বর্ণান্ধতা। **বর্ণান্ধ** ব্যক্তি বিশ্বের বর্ণবৈচিত্র্য উপভোগ করিতে **আংশিক** অথবা সম্পূর্ণভাবে **অক্ষম**। **অধিকাংশ** ক্ষেত্রেই বর্ণান্ধতা **একটি বংশগত** এবং দুরারোগ্য রোগ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বর্ণান্ধতা চিকিৎসা-সাধ্য। নারী অপেক্ষা **পুরুষই বেশী বর্ণান্ধতা-প্রবণ**।

বর্ণান্ধতার প্রকার

(১) **স্বভাবী বর্ণান্ধতা** (Normal Colour-blindness)

বর্ণান্ধতা **প্রথমতঃ** দুই প্রকার—যথা স্বভাবী (normal) এবং অস্বভাবী (abnormal)। স্বভাবী বর্ণান্ধতা সর্বসাধারণের মধ্যেই থাকে, কারণ ইহা রেটিনা বা **অক্ষিপটের নিজস্ব ধর্ম**।

অক্ষিপটীয় অঞ্চল বা স্তর (Retinal zones)

অক্ষিপটের সকল অংশই সমান বর্ণসংবেদনশীল নয়। অক্ষিপটের **তিনটি স্তর** (zones) আছে—যথা বাহিরের, মধ্যের ও ভিতরের। অক্ষিপটের **প্রথম** বা **বাহিরের স্তরটি** (outermost zone) **সম্পূর্ণ বর্ণান্ধ** (completely colour-blind)। ইহাতে **শুধু শাদা** এবং **কালো** অর্থাৎ আলোক এবং অন্ধকারের সংবেদনশীলতা আছে। অক্ষিপটের **দ্বিতীয়** বা **মধ্যম** স্তরটি (intermediate zone) **আংশিক বর্ণান্ধ** (partially colour-blind)। ইহা শাদা এবং কালো অথবা আলোক এবং অন্ধকারে সংবেদনশীল তো বটেই, **তদতিরিক্ত নীল ও পীতবর্ণেও** সংবেদনশীল। কিন্তু অক্ষিপটের এই মধ্যম স্তরটি লাল এবং সবুজ বর্ণান্ধ। অক্ষিপটের **তৃতীয়** বা **ভিতরের** স্তরটি (innermost zone) **সম্পূর্ণ বর্ণ-সংবেদনশীল**। অর্থাৎ, ইহা শাদা-কালো এবং নীল-পীত সংবেদন গ্রহণ করিতে পারে তো বটেই, **তদতিরিক্ত লাল-সবুজ** বর্ণ-সংবেদনও গ্রহণ করিতে পারে। এক কথায়, অক্ষিপটের তৃতীয় স্তরটি সকল প্রকার আলোক ও বর্ণ-সংবেদনে সক্ষম।

অক্ষিপটের এই তিনটি স্তর **ক্যাম্পিমিটার** এবং **পেরিমিটার** সাহায্যে রেটিনা বা অক্ষিপট পরীক্ষা করিয়া পাওয়া যায়। নিষ্প্রয়োজন বোধে ইহাদের আলোচনা বর্জিত হইল।

(২) **অস্বভাবী বর্ণান্ধতা** (Abnormal Colour-blindness)

অস্বভাবী বর্ণান্ধতা সকলের অক্ষিপটে থাকে না। যাহাদের অক্ষিপট রোগগ্রস্ত, তাহারাই অস্বভাবী বর্ণান্ধ। অস্বভাবী বর্ণান্ধতা প্রথমতঃ দুই শ্রেণীর—যথা **আংশিক** (partial) এবং **সম্পূর্ণ** (complete)। আংশিক বর্ণান্ধতা আবার দুই শ্রেণীর—যথা লাল-সবুজ (red green) এবং নীল-পীত (blue-yellow)।

আংশিক বর্ণান্ধতা (Partial colour-blindness)

(১) **লাল-সবুজ বর্ণান্ধতা** (Red-green blindness) দুই দিক দিয়া বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমতঃ, এই বর্ণান্ধতায় আক্রান্ত লোকের সংখ্যা বেশী। দ্বিতীয়তঃ, যেহেতু লাল-সবুজ বর্ণ দুইটি জলে ও স্থলে সঙ্কেতরূপে (signal) ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ইহাদের বর্ণান্ধতা আত্মরক্ষা এবং দেশরক্ষার কাজে মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। শতকরা প্রায় চারজন পুরুষ এবং একজন নারীর মধ্যে এই বর্ণান্ধতা দেখা যায়। ইহা **বংশগত এবং দৈহিক**। লাল-সবুজান্ধ ব্যক্তিকে বর্ণালী দিয়া পরীক্ষা করিলে দেখা যায়, তাহার বর্ণ-সংবেদন নীল-পীত, এই দুইটি বর্ণে সীমাবদ্ধ। কেহ কেহ লালকে কালো এবং সবুজকে ঘোর ধূসর দেখিয়া থাকে।

লাল-সবুজ বর্ণান্ধতার আবার **দুইটি প্রকারভেদ** রহিয়াছে। প্রথম প্রকারে লাল-সবুজান্ধ ব্যক্তি বর্ণালীকে স্বাভাবিক দৈর্ঘ্যে দেখিতে পায়, কিন্তু লাল-সবুজের পরিবর্তে নীল-পীত দেখিয়া থাকে। দ্বিতীয় প্রকার লাল-সবুজান্ধ ব্যক্তির ক্ষেত্রে বর্ণালীর দৈর্ঘ্য ছিন্ন হইয়া যায়, যাহার ফলে লাল এবং বেগুনী রং কালো দেখায়। ভন্ ক্রজ্ (Von Krause) এই দুই প্রকার লাল-সবুজান্ধ ব্যক্তিকে যথাক্রমে ডিউটারেনোপ্স্ (Deuteranopes) এবং প্রোটেনোপ্স্ (Protanopes) আখ্যা দিয়াছেন। প্রথমোক্ত প্রকারে পীতবর্ণ এবং দ্বিতীয়োক্ত প্রকারে সবুজবর্ণ উজ্জ্বলতম দেখায়। রিভার্স (Rivers) এই দুই শ্রেণীর নামকরণ করিয়াছেন যথাক্রমে ফটেরিথ্রাস (Photerythrous) এবং স্কটেরিথ্রাস (Scoterythrous)।

(২) **নীল-পীত বর্ণান্ধতা** (Blue-yellow blindess) পূর্বোক্ত বর্ণান্ধতার তুলনায় অনেক অল্পসংখ্যক ব্যক্তিতে ঘটিয়া থাকে। ইহা অক্ষিপটের কোনো রোগের সহিত জড়িত। ইহা বংশগত নয়, কিন্তু অর্জিত। নীল-পীত বর্ণান্ধতায় এই দুইটি বর্ণের মধ্যে গোলমাল ঘটে। **রিচার্ডসন্** (Richardson) পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে কোনো কোনো নীল-পীতান্ধ ব্যক্তি নীল বর্ণকে উজ্জ্বল শাদারূপে দেখিয়া থাকে। ভন্ ক্রজ্ এই বর্ণান্ধতার নামকরণ করিয়াছেন ট্রাইটানোপিয়া (Tritanopia)।

পূর্ণ বর্ণান্ধতা (Complete colour-blindness)

সম্পূর্ণ বর্ণান্ধতা হইলে কোনো বর্ণই দেখা যায় না। এই জাতীয় বর্ণান্ধতা খুব কমই ঘটিয়া থাকে। সম্পূর্ণ বর্ণান্ধ ব্যক্তির বর্ণালী **কতগুলি বর্ণহীন অংশের সমষ্টি** এবং এই ব্যক্তি বর্ণালীর অংশগুলির পার্থক্যকে শুধু আলোক বা উজ্জ্বলতার পার্থক্যরূপে দেখিতে পায়।

সম্পূর্ণ বর্ণান্ধতাও **দুই শ্রেণীর**। প্রথম শ্রেণীর ব্যক্তি বর্ণালীর পীত স্থানটিকে এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যক্তি ইহার সবুজ স্থানটিকে সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বলরূপে দেখিতে পায়। সম্পূর্ণ বর্ণান্ধতাকে এক্রোমোটোপিয়া (Achromotopia) বলা হয়। এই বর্ণান্ধতায় অক্ষিপটের পীতবিন্দুতে আলোক এবং বর্ণ এই উভয়েই অন্ধতা ঘটে, যদিও পীতবিন্দুর বাহিরে দর্শন-সংবেদন স্বাভাবিক থাকে।

৬। অন্ধ-বিন্দু (Blind spot)

অক্ষিপটের একটি অংশ স্বভাবতঃ অন্ধ। ইহাকে অন্ধ-বিন্দু বলে। দর্শন-নার্ভ মস্তিষ্ক হইতে আসিয়া অক্ষিগোলকের যে স্থানে প্রবেশ করিয়াছে ঐ স্থানটিই অন্ধ-বিন্দু। এই বিন্দুতে কোনো বস্তু প্রতিফলিত হইলে, উহা অদৃশ্য থাকে। বামদিকে একটি ক্রশ্ এবং ডানদিকে একটি বিন্দুর সাহায্যে অন্ধবিন্দু নিরূপণের চেষ্টা করা যাইতে পারে।

পরীক্ষা

× *

যদি বাম দিকের ক্রশ্ চিহ্নটিতে ডান চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যায় এবং বাম চোখটি বন্ধ রাখা হয়, তবে চোখের সাত, আট ইঞ্চি দূরে বইখানি ধরিলে অন্ধ-বিন্দু প্রমাণিত হইতে পারে। বইখানি আস্তে আস্তে সামনের ও পিছনের দিকে সঞ্চালন করিলে, কোনো সময়ে ডান দিকের বিন্দুটি অদৃশ্য হইয়া যায় পাতাটিকে ঘুরাইয়া ধরিলে, বাম চোখের অন্ধ-বিন্দুও অনুরূপভাবে নিরূপণ করা যায়।

সাধারণতঃ আমরা অন্ধ-বিন্দুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হই না, কারণ চারিপাশের সংবেদনশীল স্থানগুলির সংবেদন দিয়া আমরা অন্ধ-বিন্দুর শূন্য-সংবেদন স্থানটি মনে মনে পূর্ণ করিয়া লই।

৭। বর্ণ-সংমিশ্রণ (Colour-mixing)

বর্ণের বর্ণমাত্রত্ব (Hue) নির্ভর করে অক্ষিপটের উদ্দীপক অথবা ইথর-তরঙ্গের দৈর্ঘ্যের উপর। হেল্ম্হোল্জ্-প্রদত্ত বর্ণতালিকায় ইহা দেখানো হইয়াছে। ইথর-তরঙ্গের নানা দৈর্ঘ্য মিশ্রিত করিলে কি ফল হয় দেখা যাউক।

পীত বর্ণের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য সবুজ বর্ণের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের সহিত মিশ্রিত হইলে, পীতাভ-সবুজ বর্ণের সংবেদন ঘটে। এই নিয়ম অনুসারে নিম্নরূপে বর্ণ-সংমিশ্রণ করা যাইতে পারে। বর্ণগুলিকে চক্ষুর উপর যুগপৎ বা একসঙ্গে না ফেলিয়া, পর পর অথচ এত তাড়াতাড়ি ফেলা হয়, যে উহারা যেন যুগপৎ বা একই সময়ে অক্ষিপটকে উদ্দীপিত করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। অক্ষিপটের প্রতিক্রিয়া-প্রণালী অনুসারে প্রত্যেক উদ্দীপনক্রিয়া উদ্দীপকটির পরেও কিছুক্ষণ চলিতে থাকে। বর্ণগুলির ঘূর্ণন ক্রিয়া বাড়াইলে মিশ্রণ ঘটে।

পরীক্ষা প্রণালী

বর্ণচক্রকে উপযুক্ত আলোকে স্থাপন করিতে হয়। যে বর্ণের মিশ্রণ ঘটাইতে হইবে, মাত্রা অনুসারে উহাদের চক্রফলক কাটিয়া লইয়া বর্ণচক্রে বসাইয়া দিতে হয়। তারপর বর্ণচক্র বেগে ঘুরাইয়া দিলেই বর্ণগুলির মিশ্রণ ঘটে এবং অনেকগুলি বর্ণের পরিবর্তে উহাদের মিশ্রিত একটি বর্ণ দেখা যায়। যেমন লাল এবং পীত বর্ণ সমানভাবে মিশাইলে কমলা রং পাওয়া যায়। মিশ্রণের ফলে দেখা যায় যে বর্ণালীর সাতটি বর্ণই লাল, সবুজ, পীত এবং নীল এই চারটি বর্ণের বিভিন্ন মাত্রার সংমিশ্রণ হইতে উৎপন্ন। এমন কি **লাল, সবুজ এবং নীল** এই তিনটি বর্ণের সংমিশ্রণেই সকল বর্ণ পাওয়া যাইতে পারে। এই কারণে এই তিনটিকেই অনেকে মুখ্য বা মৌলিক বর্ণ বলিয়াছেন।

বর্ণহীন সংবেদন উৎপাদনের বিভিন্ন প্রণালী

শাদা আলোক নানাপ্রকারে উৎপন্ন হইতে পারে। (১) যে বর্ণচক্রে বর্ণালীর সকল বর্ণগুলিই মাত্রানুসারে বসানো হইয়াছে তাহা ঘুরাইলে বর্ণহীন শাদা সংবেদন উৎপন্ন হয়। (২) উপরোক্ত চারটি বর্ণ মিশ্রণ করিলেও বর্ণহীন বা শাদা আলোক উৎপন্ন হয়। (৩) তিনটি মুখ্য বা প্রধান বর্ণকেও মাত্রানুযায়ী মিশাইলে বর্ণহীন আলোক পাওয়া যায়। (৪) পরিপূরক বর্ণের সংমিশ্রণেও বর্ণহীন শুভ্র আলোক পাওয়া যাইতে পারে।

৮। দর্শন উপযোজন এবং প্রতিযোজন

(Accommodation and Adaptation)

উপযোজন (Accommodation)

দর্শন উপযোজন বা অ্যাকোমোডেশন্ এবং প্রতিযোজন বা অ্যাডাপটেশন্ এর সাধারণ অর্থ একই। পুনঃ পুনঃ উদ্দীপনার ফলে সংবেদন-প্রতিক্রিয়ার যে পরিবর্তন

ঘটে, তাহাকে উপযোজন এবং প্রতিযোজন বলে। **এই দুইটি দর্শন প্রক্রিয়ার অর্থ হইল চক্ষুকে দৃশ্য বস্তুর সহিত মানাইয়া বা খাপ খাওয়াইয়া লওয়া।** তবে প্রথম প্রক্রিয়াটি চক্ষুর বিভিন্ন অংশকে—বিশেষ করিয়া অক্ষিমুকুর বা লেন্‌স্‌কে দৃশ্যবস্তুর ক্ষুদ্রতা বা বিশালতা, দূরত্ব বা নৈকট্য অনুসারে পরিবর্তিত করা বুঝায়। যেমন একটি নিকট বা দূরের বস্তুকে দেখিতে হইলে লেন্‌স্‌-এর বক্রতার (Curvature) পরিবর্তন করিতে হয়। নিকট বস্তু দেখিতে হইলে ইহা কম এবং দূরের বস্তু দেখিতে উহা বেশী হয়। এই বক্রতার পরিবর্তন সাধিত হয় সিলিয়ারি পেশীর (Ciliary muscles) সাহায্যে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে দর্শন **উপযোজন ক্রিয়াটি প্রধানতঃ যান্ত্রিক অথবা চক্ষুযন্ত্রের।** পক্ষান্তরে প্রতিযোজন একটি মানসিক ব্যাপার।

প্রতিযোজন (Adaptation)

প্রতিযোজন বলিতে বুঝায় পুনঃ পুনঃ উদ্দীপনার ফলে প্রতিক্রিয়ার ক্রমিক পরিবর্তন এবং সামঞ্জস্য বিধান—যেমন, **প্রখর দিবালোক হইতে আসিয়া সাধারণ আলোকিত ঘরে প্রবেশ করিলে, প্রথমে ঘরের আসবাবপত্র প্রভৃতি আবছা এবং অস্পষ্ট দেখায়।** কারণ প্রখর দিবালোকে প্রতিযোজিত (light-adapted) হওয়ায়, চক্ষু অন্ধকারে অপ্রতিযোজিত (Darkness non-adapted) হইয়াছে। কিন্তু ঘরে কিছুক্ষণ থাকিলেই, উহার আসবাবপত্র স্পষ্টতর হইতে থাকে। কারণ এইবার চক্ষু অন্ধকারের সহিত প্রতিযোজিত (darkness adapted) হইয়াছে এবং **হঠাৎ দিবালোকে গেলে ঐ আলোক দুঃসহ লাগিবে, অথবা চক্ষু ঝলসাইয়া যাইবে।** আবার রঙীন চশমা পরিলে, চক্ষু প্রথমে চশমার রং-এ অপ্রতিযোজিত থাকে—ফলে, সকল দৃশ্যবস্তুই চশমার রং অনুসারে রঙীন দেখায়। চক্ষু চশমায় অভ্যস্ত হইয়া গেলে, দৃশ্যবস্তুগুলি আর রঙীন দেখা যায় না।

প্রতিযোজনের ফলে উহার বস্তু সম্বন্ধে আর কোনো অসুবিধা থাকে না—উহারা একপ্রকার 'গা-সওয়া' হইয়া যায় এবং উহাদের বৈচিত্র্য বা চমকপ্রদতা কমিয়া যায়। **নূতন দেশের নৈসর্গিক শোভা** দেখিয়া কোনো বিদেশী হয়ত ভাবে উচ্ছ্বসিত হইয়া ওঠেন, কিন্তু উহা ঐ দেশের স্থায়ী বাসিন্দাদের মনে হয়ত কোন রেখাপাত করে না। এইরূপ পার্থক্যের কারণ এই যে বিদেশী এই দেশের দৃশ্যের সহিত প্রতিযোজিত হন নাই, কিন্তু দেশের বাসিন্দাগণ হইয়াছেন।

৯। গোধূলিদর্শন (Twilight vision)

ফোভিয়া বা পীতবিন্দুই স্পষ্টতম আলোক দর্শনের স্থান। কিন্তু অন্ধকারে প্রতিযোজিত অবস্থায় এই পীতবিন্দুই হইয়া দাঁড়ায় সবাপেক্ষা কম আলোক-সংবেদন-শীল অক্ষিপটের অংশ। পীতবিন্দুকে রাত্রান্ধ বলা যাইতে পারে। অক্ষিপটের বহিঃপ্রান্ত পীতবিন্দু অপেক্ষা গোধূলি বা রাত্রিদর্শনে অধিকতর প্রতিযোজিত। পীতবিন্দু শঙ্কু (cone)-প্রধান এবং শঙ্কু দিবালোক দর্শনের সহিত প্রতিযোজিত। অপর পক্ষে অক্ষিপটের বহির্মণ্ডল রড্ বা দণ্ড-প্রধান এবং দণ্ড অন্ধকার দর্শনের সহিত প্রতিযোজিত। নিশাচর পক্ষীরা, যেমন পেচক অথবা বাদুড়, দিবালোকে দেখিতে পায় না। উহারা দিবান্ধ। উহারা রাত্রির অন্ধকারে দেখিতে পায়, কারণ উহাদের অক্ষিপটে শুধু দণ্ডই আছে, কিন্তু শঙ্কু নাই। আবার বিড়াল, বাঘ, কুকুর প্রভৃতি পশুরা দিবালোকে এবং রাত্রির অন্ধকারে সমান দেখিতে পায়, কারণ উহাদের অক্ষিপটে দণ্ড এবং শঙ্কু হয়ত সম-পরিমাণে আছে। কিন্তু মানুষ দিবালোকেই দেখিতে পায়। উহারা রাত্রির অন্ধকারে দৃষ্টিহীন, কারণ মানুষের অক্ষিপটে শঙ্কুই প্রধানভাবে এবং দণ্ড অপ্রধানভাবে রহিয়াছে।

১০। পার্কিন্জে ব্যাপার (Purkinje Phenomenon)

ধরিয়া লওয়া যাউক চক্ষু অন্ধকার-প্রতিযোজিত হইয়া রহিয়াছে। যদি এই অবস্থায় একটি অস্পষ্ট আলোকিত ঘরে প্রবেশ করিয়া বর্ণালী দেখা যায়, তাহা হইলে উহা **বর্ণহীন** দেখাইবে। তাই বলিয়া বর্ণালীর সকল অংশগুলিই সমানভাবে আলোকিত অথবা উজ্জ্বল দেখা যাইবে না, কিন্তু বিভিন্ন অংশগুলি বিভিন্ন মাত্রায় আলোকিত বা উজ্জ্বল দেখাইবে। বর্ণালীর লাল প্রান্ত অস্বাভাবিক অন্ধকার, নীল প্রান্ত অধিক উজ্জ্বল দেখা যাইবে এবং উহার **উজ্জ্বলতম প্রান্ত পীত বা হলুদ স্থান হইতে সবুজ স্থানে পরিবর্তিত হইবে।** অন্ধকার এবং আলোকে প্রতিযোজন অনুসারে উজ্জ্বলতম বর্ণের এইরূপ স্থানান্তর বা স্থান পরিবর্তন আবিষ্কার করিয়াছেন অষ্ট্রীয় গবেষক পারকিন্জে। তাঁহার নাম অনুসারে উল্লিখিত পরিবর্তনের নাম হইয়াছে পারকিন্জে ফেনোমেনন্ অথবা পার্কিন্জে ব্যাপার।

১১। ইয়ং হেল্ম্হোল্জ্-এর দর্শন-মতবাদ—
(Young-Helmholtz Theory of Vision)

দর্শন সংবেদনের বিভিন্ন ঘটনাবলী ব্যাখ্যা করিতে গিয়া ইয়ং এবং হেল্ম্হোল্জ্ যে মত উপস্থাপিত করিয়াছেন উহার নাম ইয়ং-হেল্ম্হোল্জ্ দর্শন মতবাদ। এই

মতবাদের প্রথম সূত্রপাত করিয়াছিলেন টমাস্ ইয়ং ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে এবং উহার পুনরুদ্ধার করিয়াছেন হেল্‌ম্‌হোল্‌জ ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে।

এই মতে মৌলিক বর্ণের সংখ্যা তিনটি—যথা, নীলাভ লাল (Carmine red), পীতাভ সবুজ (Yellowish green) এবং সমুদ্রপারস্থিত নীল (Ultramarine blue)। অক্ষিপটে **তিনটি নার্ভ** আছে, যাহা উল্লিখিত তিনটি বর্ণসংবেদনের উপযোগী। ইহাদের প্রত্যেকটি এক একটি ইথর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য দ্বারা উদ্দীপিত হয়। বর্ণালীর দীর্ঘতম তরঙ্গপ্রান্ত প্রথমটিকে, উহার মাঝামাঝি দীর্ঘ তরঙ্গপ্রান্ত দ্বিতীয়টিকে এবং হ্রস্বতম তরঙ্গপ্রান্ত উহার তৃতীয়টিকে উদ্দীপিত করে। এই মতবাদের **আধুনিক সংস্করণে তিনপ্রকার 'আলোক-রাসায়নিক' পদার্থ** (Photo-chemical substance) এই তিনটি নার্ভ-এর স্থান গ্রহণ করিয়াছে। উক্ত তিনটি নার্ভ বা আলোক-রাসায়নিক পদার্থের সমান উদ্দীপনা হইলে, **বর্ণহীন সংবেদন** এবং ভিন্ন মাত্রায় উদ্দীপনা হইলে, বর্ণালীর সকল বর্ণগুলি উৎপন্ন হয়। আবার যখন ইহারা একেবারেই উদ্দীপিত হয় না, তখন উৎপন্ন হয় **কালো বা অন্ধকারের সংবেদন**।

সমালোচনা

বর্ণ মতবাদের যাথার্থ্য নির্ভর করে উহার বর্ণ-সম্বন্ধীয় বিভিন্ন ঘটনা ব্যাখ্যা করিবার উপযোগিতার উপর। ইয়ং-হেল্‌ম্‌হোল্‌জ্-এর দর্শন-মতবাদ এইরূপ অনেকগুলি ঘটনার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা করিয়াছে, আবার কতকগুলির করে নাই। এই মতবাদের গুণ এই যে অক্ষিপটে যে তিনটি পদার্থ আছে তাহা পরবর্তী গবেষণায় সমর্থিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া, এই মতবাদ দর্শন সম্পর্কিত সকল ব্যাপারগুলিই ব্যাখ্যা করে, সেই ব্যাখ্যা সন্তোষজনক হউক বা না হউক। কিন্তু ইহার দোষগুলিই বিশেষভাবে দেখানো হইতেছে।

(১) প্রথমতঃ **বর্ণসংমিশ্রণ** মোটের উপর সন্তোষজনকভাবে ব্যাখ্যাত হয় তিনটি মৌলিক বর্ণের সংমিশ্রণ দ্বারা। কিন্তু (২) **বর্ণ বৈসাদৃশ্য** ব্যাখ্যায় এই মতবাদের দোষ প্রকট হইয়া পড়ে। এই মতানুসারে অনুবর্তী বৈসাদৃশ্যের ব্যাখ্যা এইরূপ। **সবর্ণ অনুসংবেদন অক্ষিপটীয় জড়তা** (retinal inertia) বিশেষ। "লাল" পদার্থটি (red substance) একবার উদ্দীপিত হইলে, উদ্দীপক অপসারিত হওয়া সত্ত্বেও এই উদ্দীপনা থামে না, কিন্তু চলিতে থাকে। ফলে একটি লাল সবর্ণ অনুসংবেদন ঘটে। আবার, **অসবর্ণ অনুসংবেদন** ব্যাখ্যা করিতে গিয়া এই মতবাদ **অক্ষিপটীয় ক্লান্তির** (retinal fatigue) আশ্রয় লয়। যেমন "লাল" নার্ভ বা পদার্থটি, উদ্দীপনার ফলে

ক্লান্ত বা অবসন্ন হইয়া পড়ে, ফলে বাকী দুইটি, বিশেষ করিয়া সবুজ পদার্থ, ক্রিয়াশীল হয়, সুতরাং সবুজ সংবেদন ঘটে। কিন্তু ক্লান্তি বা অবসাদকে অসবর্ণ অনুসংবেদনের সন্তোষজনক কারণ বলা যায় না, কারণ অসবর্ণ অনুসংবেদন উৎপন্ন করিবার জন্য উদ্দীপকের প্রতি যেরূপ অল্পকালস্থায়ী মনোযোগ দরকার হয়, তাহাতে কোনো নার্ভ বা পদার্থের ক্লান্ত হইবার কথা নয়।

আবার **যুগপৎ বা সমকালীন বর্ণ-বৈসাদৃশ্যের ব্যাখ্যাটি** হেল্‌ম্‌-হোল্‌জ্‌ এর কষ্টকল্পিত বলিয়া মনে হয়। সবুজ পটভূমির উপর স্থাপিত একটি ধূসর বর্ণখণ্ডকে কেন রক্তিমাভ দেখা যায় ? হেল্‌ম্‌হোল্‌জ্‌ বলেন যে আমরা সবুজের একটু অংশকে স্বচ্ছ বলিয়া কল্পনা করি এবং এই কল্পিত সবুজের মধ্য দিয়া ধূসর দেখি। অতীত অভিজ্ঞতা হইতে আমাদের জানা আছে যে সবুজের মধ্য দিয়া ধূসরকে ধূসর দেখিতে হইলে, ইহা অবশ্যই রক্তিমাভ হইবে। সমালোচনায় বলা যাইতে পারে যে, সাধারণতঃ অতীত অভিজ্ঞতার ফলে বৈশাদৃশ্য না বাড়িয়া ব্যাহতই হইয়া থাকে।

(৩) এই মত **বর্ণান্ধতার ব্যাখ্যা** এইরূপে করে। সম্পূর্ণ বর্ণান্ধতার কারণ, তিনটি আলোক-রাসায়নিক পদার্থেরই অভাব বা বিকৃতি। আবার আংশিক বর্ণান্ধতার কারণ, কোনো একটি নার্ভ বা পদার্থের অভাব বা বিকৃতি। এইরূপ ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে প্রধান বক্তব্য এই যে বর্ণান্ধতা এক বা একাধিক পদার্থের অভাবজনিত হইলে, বর্ণান্ধ ব্যক্তির আলোক-সংবেদন অসম্ভব হইয়া পড়ে, কারণ এই সংবেদন তিনটি মৌলিক বর্ণের সংমিশ্রণ ফল। (৪) তাহা ছাড়া এই মতবাদের প্রধান অসুবিধা এই যে ইহা শাদা বা বর্ণহীন আলোক-সংবেদনের গ্রাহক কোনো নার্ভ বা পদার্থ স্বীকার করে নাই।

১২। হেরিং-এর দর্শন-মতবাদ
(Hering's Theory of Vision)

হেরিং এবং লিওনার্ডো-এর মত হেলম্‌হোল্‌জ্‌-এর মত হইতে পৃথক। হেরিং এবং লিওনার্ডো দর্শন সংবেদনের যে মতবাদ উপস্থিত করিয়াছেন তাহা এই। দর্শন যন্ত্রে বা অক্ষিপটে অথবা উহার সহিত সংশ্লিষ্ট মস্তিষ্কের অংশে **তিনটি রাসায়নিক পদার্থ** আছে। ইহারা ইথর-তরঙ্গ দ্বারা বিভিন্নরূপে উদ্দীপিত হয়। প্রত্যেকটি পদার্থের উদ্দীপনায় **ভাঙন ও গড়ন** (decomposition and recomposition or anabolism and catabolism) এই **দুইটি বিপরীত ক্রিয়া** চলিতে থাকে, যাহার ফলে বিপরীত বর্ণ-সংবেদন উৎপন্ন হয়। একটি পদার্থের ভাঙন ও গড়ন হইতে

যথাক্রমে **শাদা ও কালো,** দ্বিতীয়টির অনুরূপ ক্রিয়ার ফলে **হলুদ ও নীল** এবং তৃতীয়টির ঐ প্রকার ক্রিয়ায় **লাল ও সবুজ** সংবেদন ঘটে। এইরূপে অক্ষিপটে মোটের উপর তিন জোড়ায় ছয়টি রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে শাদা-কালো, হলুদ-নীল এবং লাল-সবুজ, এই ছয় প্রকার দর্শনসংবেদন ঘটে।

প্রত্যেকটি রাসায়নিক পদার্থের ভাঙন (decomposition, dissimilation or catabolism) এবং গড়ন (recomposition, assimilation or anabolism) হইতে নিম্নরূপ সংবেদন ঘটে :—

লাল সংবেদন উৎপন্ন হয় লাল-সবুজ	যন্ত্রের ভাঙন দ্বারা
কমলা ,, ,, ,, ,, এবং হলুদ-নীল	,, ,, ,,
হলুদ ,, ,, ,,———————,, ,,	,, ,, ,,
সবুজ ,, ,, ,, লাল-সবুজ———	,, গড়ন ,,
নীল ,, ,, ,,——— হলুদ-নীল	,, ,, ,,
বেগুনী ,, ,, ,, লাল-সবুজ যন্ত্রের ভাঙন এবং	,, ,, ,,
শাদা ,, ,, ,, শাদা-কালো ,, ,,	———————
কালো ,, ,, ,, ,, ,, ,, গড়ন	———————

ব্যাখ্যা

শাদা-কালো পদার্থটি প্রত্যেক আলোকের দ্বারাই উদ্দীপিত হয় বলিয়া, সকল প্রকার বর্ণই অল্পবিস্তর উজ্জ্বল রূপে দৃষ্ট হয়। কিন্তু অপর দুইটি পদার্থ উদ্দীপিত হয় উহাদের বিশেষ উদ্দীপক ইথর-তরঙ্গের দ্বারা। লাল-সবুজ অথবা হলুদ-নীল আলোক অক্ষিপটের একই অংশে পতিত হইলে, এই বর্ণ দুইটি ভাঙন এবং গড়ন এই পরস্পর-বিরোধী ক্রিয়ার দ্বারা বিধ্বস্ত (cancelled) হইয়া **বর্ণহীন শাদা বা ধূসর** সংবেদন উৎপন্ন করে।

অক্ষিপটের একই অংশে এবং একই সময়ে শাদা-কালো আলোক পতিত হইলে, ইহারা পরস্পর পরস্পরকে বিধ্বস্ত করিলেও, উহাদের মিশ্রণ ফলে ধূসর সংবেদন থাকে। উদ্দীপক থাকুক, বা না থাকুক অপ্‌টিক্ নার্ভ-এর সহিত সংশ্লিষ্ট মস্তিষ্কের কোষগুলি (Cortical cells) সর্বদা উদ্দীপিত থাকে এবং অক্ষিপটের নিজস্ব আলোকরূপে (Retina's own light) এই ধূসর সংবেদন ঘটায়। হেরিং-এর মতে **কালো বা অন্ধকারও** (black or darkness) একটি সদর্থক সংবেদন (positive sensa-

tion)। হেরিং হেল্‌মহোল্‌জ্‌-এর মতই **বর্ণসংমিশ্রণ** ব্যাখ্যা করেন। পরিপূরক বা বিপরীত বর্ণ-সংমিশ্রণে বর্ণহীন বা আলোক-সংবেদন ঘটে, একই রাসায়নিক যন্ত্রের, যেমন লাল-সবুজের বিপরীত ক্রিয়ায়, একটি অপরটিকে বিধ্বস্ত করিবার ফলে।

সমালোচনা

কিন্তু এইরূপ ব্যাখ্যার **অসঙ্গতি** ধরা পড়ে (১) **সাদা-কালোর সংমিশ্রণ ক্ষেত্রে**। শাদা-কালো যন্ত্রটি উদ্দীপিত হইলে উহার একটি অপরটিকে বিধ্বস্ত করে না, কিন্তু উৎপন্ন করে উহাদের মধ্যবর্তী ধূসর সংবেদন। (২) হেরিং **অনুসংবেদন** ব্যাখ্যা করেন নিম্নোক্তরূপে। সবর্ণ অনুসংবেদন ঘটে গঠনাত্মক প্রক্রিয়ায় ক্লান্তি বা অবসাদের জন্য, যাহার ফলে ভাঙন ক্রিয়া চলিতে থাকে। এই ব্যাখ্যাও **অসঙ্গত**। সবর্ণ অনুসংবেদনের অসবর্ণ অনুসংবেদনে রূপান্তর ঘটে, যদি যে পটভূমিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে, তাহা অনুসংবেদনের পটভূমি অপেক্ষা বেশী উজ্জ্বল হয়। তাঁহার মতে **অসবর্ণ অনুসংবেদন** উৎপন্ন হয় দর্শন যন্ত্রগুলির সাম্যাবস্থা (equilibrium) রক্ষা করিবার প্রবণতা (tendency) হইতে। যেমন 'লাল' ক্রিয়া উদ্দীপিত হইলে, সাম্যাবস্থা ফিরিয়া আসিবার পূর্বে 'সবুজ' ক্রিয়াটিও উদ্দীপিত হয়। ফলে অসবর্ণ অনুসংবেদন ঘটে।

(৩) **যুগপৎ বা সমকালীন বৈসাদৃশ্য** সম্পর্কে হেরিং-এর ব্যাখ্যা হেল্‌ম্‌হোল্‌জ্‌-এর কষ্টকল্পিত ব্যাখ্যার তুলনায় **অধিক সন্তোষজনক**। হেরিং বলেন যে অক্ষিপটের কোনো অংশের ক্রিয়া হইলে, উহার বিপরীত ক্রিয়াটি নিকটবর্তী অংশে ছড়াইয়া পড়ে বলিয়া সমকালীন বৈসাদৃশ্য ঘটে। হেল্‌ম্‌হোল্‌জ্‌-এর **মানস** ব্যাখ্যার স্থলে হেরিং-এর ব্যাখ্যাটি **শারীরবৃত্তীয়**। হেরিং-এর মতে (৪) **বর্ণান্ধতার** কারণ হইল অক্ষিপটে একটি বা একাধিক দর্শনযন্ত্রের অভাব। যেমন, লাল-সবুজ যন্ত্রটির অভাব হইলে, লাল-সবুজ বর্ণান্ধতা ঘটে, আবার হলুদ-নীল যন্ত্রটির অভাব হইলে, হলুদ-নীল বর্ণান্ধতা ঘটিয়া থাকে। উপরন্তু এই দুইটিরই অভাব ঘটিলে, সম্পূর্ণ বর্ণান্ধতা উৎপন্ন হয়।

চক্ষুর বিভিন্ন স্তর

হেরিং-এর মতে সকল চক্ষুই অক্ষিপটের বহির্মণ্ডলে সম্পূর্ণ বর্ণান্ধ, কারণ এই প্রান্ত বা স্তরটি শুধু শাদা এবং কালো বা বর্ণহীন আলোকের প্রতি সংবেদনশীল। আবার সকল চক্ষুই অক্ষিপটের মধ্যমণ্ডলে আংশিক বর্ণান্ধ, কারণ ইহা শুধু শাদা-কালো এবং হলুদ-নীলের প্রতি সংবেদনশীল। তৃতীয়তঃ, সকল চক্ষুই অক্ষিপটের কেন্দ্রীয় মণ্ডলে

সম্পূর্ণ বর্ণ-সংবেদনশীল, কারণ ইহার দ্বারা শাদা-কালো, হলুদ-নীল এবং লাল-সবুজ, হেরিং-প্রদর্শিত এই ছয়টি বর্ণ এবং আলোক সংবেদনই গৃহীত হয়।*

১৩। ল্যাড্-ফ্রাঙ্ক্লিন্ দর্শন-মতবাদ (Ladd-Franklin Theory)

উপরোক্ত কোন মতই অক্ষিপটের সংগঠনের প্রতি অবহিত নয়। বিশেষতঃ, অক্ষিপটে দণ্ড এবং শঙ্কু (Rods and cones) কি পরিমাণে আছে, তাহা ঐ মতগুলিতে দেখানো হয় নাই। ল্যাড্-ফ্র্যাঙ্ক্লিন্ মতে অক্ষিপটস্থ দণ্ড এবং শঙ্কুর মাত্রাভেদই আলোক এবং বর্ণসংবেদনের কারণ। সকল বর্ণসংবেদনের মূল কারণ অক্ষিপটের একটি **আদিম ধূসর পদার্থ**। এই আদিম ধূসর পদার্থ অপরিণত হওয়ায় শুধু **আলোক সংবেদনই** উৎপন্ন করে। ক্রমপরিণতির (evolution) নিয়ম অনুসারে এই আদিম ধূসর পদার্থই ক্রমশঃ **দণ্ড** এবং **শঙ্কুতে** বিভক্ত হয়। দণ্ডগুলি শুধু আলোক সংবেদন এবং শঙ্কুগুলি এতদতিরিক্ত হলুদ এবং নীল বর্ণসংবেদন উৎপন্ন করে। আবার ক্রমপরিণতির দ্বিতীয় স্তরে হলুদ সংবেদন উৎপাদক শঙ্কুগুলি লাল এবং সবুজ সংবেদন উৎপাদক তুইটি স্তরে পৃথকীকৃত হয়।

সমালোচনা

এই মতবাদটির দৃষ্টিভঙ্গী প্রধানতঃ **শারীরবৃত্তীয়** (Physiological)। ইহাতে দর্শন সংবেদনের **মনোবৈজ্ঞানিক** তাৎপর্য উপেক্ষিত। শারীরবৃত্তীয় দিক হইতে ইহার **অসুবিধা** এই যে অক্ষিপটে শঙ্কুর উল্লিখিত পৃথকীকৃত অংশগুলি পাওয়া যায় না। কিন্তু এই মতের মস্ত বড় **গুণ** এই যে ইহা **বৈজ্ঞানিক পরিণাম-বাদের উপর প্রতিষ্ঠিত**।

১৪। চক্ষু বা অক্ষিগোলকের গঠন (Structure of the Eye)

করোটির (Skull) অক্ষিগহ্বরে বা চক্ষুকোটরে (Eye-socket) অবস্থিত **অক্ষিগোলকই** (Eye-ball) দর্শনযন্ত্রের বাহ্য রূপ। তাহা ছাড়া অক্ষিগহ্বরে অক্ষিগোলককে অনায়াসে সঞ্চালিত করিবার জন্য রহিয়াছে **চক্ষুপেশী** (Eye-muscles)। অক্ষিগোলকের সম্মুখভাগে রহিয়াছে **অক্ষিপুট, অক্ষিপল্লব বা চোখের পাতা** (Eye-lids), যাহা ইহাকে বাহিরের অনিষ্টকর বস্তু, যেমন ধূলা, বালি, পোকামাকড় হইতে রক্ষা করে।

চক্ষুগোলকের উপরিস্থ কোণে রহিয়াছে **অশ্রুক্ষরণকারী গ্রন্থিগুলি**

* বর্তমান পরিচ্ছেদের ৫ম অনুচ্ছেদ (১) দ্রষ্টব্য।

(Lachrymal or tear glands)। এই গ্রন্থি সর্বদা একপ্রকার তরল পদার্থ নিঃসরণ করিয়া অক্ষিগোলককে সিক্ত রাখে, যাহার ফলে উহা শুষ্ক হইতে পারে না। আবার অক্ষিগোলকের ভিতরের অংশ **জলীয় পদার্থে** (aqueous humor) এবং **গাঢ় তরল পদার্থে** (vitreous humor) পূর্ণ থাকে।

তিনটি পর্দা ও অন্যান্য অংশ

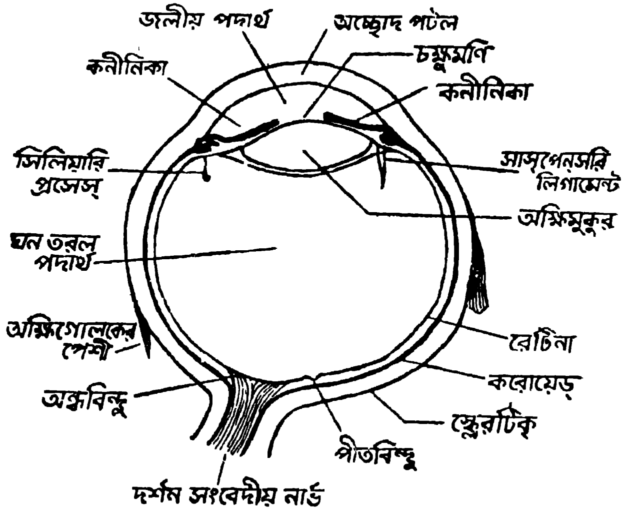
অক্ষিগোলকের তিনটি স্তর বা পর্দা (coat) আছে, যাহাদের দ্বারা ইহা সুরক্ষিত। (১) **বাহিরের ঘন, অস্বচ্ছ বা শ্বেত পর্দা** (Sclerotic coat) শক্ত তন্তুময় আবরণে চক্ষুগোলককে ঢাকিয়া রাখিয়া উহার গোল ভাব বজায় রাখে। ইহা চক্ষুগোলকের সম্মুখবর্তী **অচ্ছোদপটলের** (Cornea) সহিত মিলিত (২) শ্বেত বা স্ক্লেরোটিক্ পর্দার নীচে অবস্থিত **মধ্যবর্তী রঙ্গীন** (Choroid) **পর্দা** পাত্‌লা, কিন্তু রক্তনলীতে পূর্ণ। করয়েড্ অচ্ছোদপটলের পশ্চাদ্বর্তী চক্ষুতারকা বা **কনীনিকার** (Iris) এবং সিলিয়ারি পেশীর সহিত সংযুক্ত। আবার কনীনিকার মধ্যস্থলে অবস্থিত রহিয়াছে **চক্ষুমণি** বা তারারন্ধ্র (Pupil)। আইরিস বা কনীনিকার সংলগ্ন সিলিয়ারি পেশীগুলির সাহায্যে আলোকের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য তারারন্ধ্রের সঙ্কোচন বা প্রসারণ হইয়া থাকে। কনীনিকার পশ্চাতে রহিয়াছে **অক্ষিমুকুর** (Lens)। ইহাকে **সাস্‌পেন্‌সারি লিগামেণ্ট** (Suspensory ligament) স্বস্থানে আটকাইয়া রাখিয়াছে। লেন্স্ স্বচ্ছ এবং উত্তল (bi-convex), উহা উভয়দিকেই ঠেলিয়া আছে। সিলিয়ারি প্রোসেসের (ciliary process) সহায়তায় অক্ষিমুকুর প্রসারিত বা শ্লথ, অর্থাৎ চ্যাপ্টা বা উত্তল আকার ধারণ করে। অচ্ছোদপটল এবং অক্ষিমুকুরের মধ্যবর্তী স্থানটি (Aqueous humor) **জলীয় পদার্থে** পূর্ণ।

(৩) অক্ষিগোলকের তৃতীয় পর্দাটির নাম **অক্ষিপট** (retina)। রেটিনা হইতে **দর্শন-সংবেদীয় নার্ভ** (Optic nerve) বাহির হইয়া মস্তিষ্কে অবস্থিত দর্শনকেন্দ্রে পৌঁছিয়াছে। অক্ষিপটের ঠিক মাঝখানে এবং তারারন্ধ্রের বিপরীত দিকে রহিয়াছে **পীতাভ বিন্দু** (Yellow-spot or Macula Lutea)। পীতাভ বিন্দুর নাম (Fovea Centralis)। ম্যাকুলা লুটিয়াই স্পষ্টতম দর্শনের বিন্দু। কোনো বস্তুকে স্পষ্টভাবে দেখিতে হইলে, উহার পেশীর সাহায্যে চক্ষুর ভঙ্গী নিয়ন্ত্রিত হয়, যাহার ফলে দর্শনীয় বস্তুটি চক্ষুর পীতাভ বিন্দুতে প্রতিফলিত হয়। অক্ষিপটের যে স্থান হইতে দর্শন নার্ভ নির্গত হইয়াছে, সেই স্থানটির নাম **অন্ধ বিন্দু** (Blind

Spot)। এই বিন্দুটিতে আলোকের প্রতিফলন হয় না, কারণ ইহা আলোক-সংবেদনহীন।

তাহা হইলে চক্ষুর বিভিন্ন অংশগুলি এইরূপ। প্রথমতঃ ইহার তিনটি পর্দা, যথা স্ক্লেরোটিক্, করয়েড ও রেটিনা; দ্বিতীয়তঃ, অচ্ছোদপটল (কর্ণিয়া), কনীনিকা (আইরিস্), কনীনিকার কেন্দ্রস্থল অথবা তারারন্ধ্র (পিউপিল), অক্ষিমুকুর (লেন্স), অক্ষিপটস্থ পীতাভ বিন্দু (ম্যাকুলা লুটিয়া), তন্মধ্যবর্তী ফোভিয়া সেণ্ট্রালিস্ এবং অক্ষিপটের সন্নিহিত দর্শন সংবেদীয় নার্ভ (অপ টিক্ নার্ভ)।

অক্ষিগোলকের মধ্যে দুই প্রকার তরল পদার্থ রহিয়াছে—একটি অচ্ছোদপটল ও অক্ষিমুকুরের মধ্যবর্তী জলীয় পদার্থ (অ্যাকুইয়স্ হিউমর্) এবং অপরটি অক্ষিমুকুর এবং অক্ষিপটের মধ্যবর্তী অপেক্ষাকৃত ঘন বা গাঢ় তরল পদার্থ (ভিট্রিয়স্ হিউমর্)।



২১নং চিত্র—অক্ষিগোলকের বিভিন্ন অংশ

আবার অক্ষিগোলকের গতি নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য রহিয়াছে চারটি ঋজু পেশী (Rectii) এবং দুইটি তির্যক্ পেশী (Obliquii)। প্রথম চারটি পেশীর সাহায্যে যথাক্রমে উপরে ও নীচে, ভিতরের দিকে এবং বাহিরের দিকে অক্ষিগোলককে সঞ্চালন করা যায়। আবার দ্বিতীয় শ্রেণীর দুইটি পেশীর সাহায্যে চক্ষুগোলককে যথাক্রমে নীচে ও বাহিরের দিকে এবং উপরে ও বাহিরের দিকে সঞ্চালন করা যায়। ২০নং চিত্রে অক্ষিগোলকের বিভিন্ন অংশ দেখানো হইয়াছে।

১৫। অক্ষিপটের (Retina) বিশেষ গঠন—দণ্ড ও শঙ্কু (Rods and Cones)

অক্ষিপট অক্ষিগোলকের আলোক-সংবেদনপ্রবণ অংশ। আলোক-তরঙ্গ রেটিনায় প্রতিফলিত হইয়া এবং উহার সন্নিহিত দর্শন নার্ভকে উদ্দীপিত করিয়া সংবেদীয় নার্ভপ্রবাহে রূপান্তরিত হয় এবং মস্তিষ্কের দর্শন কেন্দ্রে পৌঁছায়। ফলে, দর্শন সংবেদন ঘটে।

দণ্ড ও শঙ্কু (Rods and Cones)

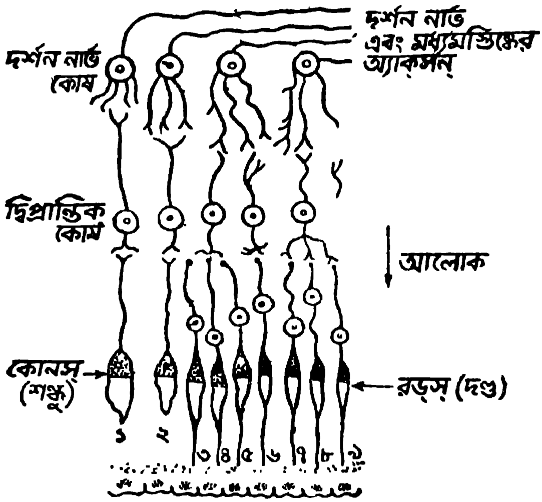
অক্ষিপটে দশটি স্তর (layers) আছে। ইহার নবম স্তর অসংখ্য আলোক-সংবেদনশীল কোষ দ্বারা পূর্ণ। এই কোষগুলি আবার দুই শ্রেণীর, যথা দণ্ড (Rods) এবং শঙ্কু (Cones)। শঙ্কু ও দণ্ডগুলির নামকরণ হইয়াছে উহাদের আকৃতি অনুসারে –প্রথমটির আকৃতি শঙ্কু বা চূড়ার মত এবং দ্বিতীয়টির আকৃতি দণ্ডের মত।

দণ্ড এবং শঙ্কু বিচিত্র আকারের কোষাণু। ইহারাই অক্ষিপটের আসল আলোক-সংগ্রাহক কোষ। ইহারা অক্ষিপটের বাহিরের স্তরে অবস্থিত। মধ্যবর্তী স্তরগুলিতে রহিয়াছে দ্বিমুখী এবং নার্ভগ্রন্থীয় কোষসকল (bipolar and ganglionic cells) এবং অসংখ্য সংযোগকারী নার্ভ। দণ্ড এবং শঙ্কুগুলির মধ্যে অনেক বিষয়ে মিল আছে। উহারা উভয়েই দীর্ঘ বা লম্বাকৃতি কোষ। উহাদের কোষদেহ কোষের ভিতর দিকে এবং আলোক-সংবেদনশীল পদার্থ কোষের বাহির অংশে অবস্থিত। কিন্তু দণ্ডগুলি নলাকৃতি এবং শঙ্কু অপেক্ষা পাত্‌লা এবং উহাদের আলোকসংবেদনশীল রং (pigment) ভিন্ন।

দণ্ড-দৃষ্টি এবং শঙ্কু-দৃষ্টি (Rod-vision and Cone-vision)

অক্ষিপটে অসংখ্য দণ্ড এবং শঙ্কু আছে, কিন্তু দণ্ডের সংখ্যা শঙ্কু অপেক্ষা বেশী। অক্ষিপটের বিভিন্ন অংশে ইহারা বিভিন্ন সংখ্যায় বর্তমান। যেমন, ফোভিয়ায় বা অক্ষিপটের দৃষ্টিকেন্দ্রে দণ্ড নাই, শুধু ঘনসন্নিবিষ্ট শঙ্কুই আছে। ফোভিয়া শুধু শঙ্কু দ্বারা পূর্ণ থাকায়, ইহাই স্পষ্টতম দিবালোক দর্শন এবং বর্ণ সংবেদনের (day-light and colour vision) স্থান। শঙ্কু-কোষগুলিই উজ্জ্বল বা প্রখর আলোক এবং বর্ণের সংগ্রাহক যন্ত্র। ফোভিয়া হইতে যতই অক্ষিপটের বহিঃপ্রান্তে অগ্রসর হওয়া যায়, এই সংবেদন দুইটি কমিতে থাকে এবং শঙ্কুর সংখ্যাও কমিয়া যায়। পক্ষান্তরে ফোভিয়ার বাহিরে অথবা অক্ষিপটের বহিঃপ্রান্তে দণ্ডের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে। দণ্ডগুলি রাত্রির বা

সাঁঝের আলোক এবং মৃদু আলোক অথবা গোধূলি-দর্শনের (twilight vision) সহায়ক যন্ত্র। ফোভিয়ায় দণ্ড না থাকায়, উহা মৃদু আলোক অথবা গোধূলি দর্শনে



২২নং চিত্র—দণ্ড ও শঙ্কু

১ ও ২নং রেখা দুইটি শঙ্কু এবং ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ রেখাগুলি দণ্ড

২১নং চিত্রে অক্ষি-গোলকের বিভিন্ন অংশগুলি এবং ২২নং চিত্রে দণ্ড ও শঙ্কুর গঠন পার্থক্য দেখানো হইল।

সহায়ক হয় না। আবার অক্ষিপটের যে সকল অংশে শুধু দণ্ডই থাকে, উহারা বর্ণান্ধ।

১৬। শব্দ-সংবেদনের উৎপত্তি এবং প্রকারভেদ
(Origin and kinds of Auditory Sensation)

শব্দ-সংবেদনের উৎপত্তি ঃ

শব্দ-সংবেদনের **উদ্দীপক** বায়ুতরঙ্গ (air vibration) এবং ইন্দ্রিয় **কর্ণ**। বায়ুতরঙ্গ কর্ণের বহিরংশ, যথা **কক্ষা** দ্বারা বিধৃত, **কর্ণবিবর** দ্বারা কর্ণের অভ্যন্তরে প্রেরিত, **কর্ণ-পটহ** দ্বারা গৃহীত, ম্যালিয়াস্, ইন্‌কাস্, স্টেপিস্, এই **তিনটি অস্থি** দ্বারা নিয়মিত এবং **অর্ধবৃত্তাকার নালীর** মধ্য দিয়া চালিত হইয়া, ককলিয়ার অর্গ্যান্ অফ্ কর্টি (organ of corti), অর্থাৎ আভ্যন্তরীণ কর্ণের **কেশ-কোশকে** (**hair-cells**) উদ্দীপিত করে। এই উদ্দীপনার ফলে, ককলিয়া-এর নিকটবর্তী **শ্রবণ-নার্ভ** উদ্দীপিত হইয়া বায়ুতরঙ্গকে নার্ভ-প্রবাহের আকারে মস্তিষ্কের **শ্রবণ-কেন্দ্রে** প্রেরণ করে। ফলে শ্রবণ-সংবেদন উৎপন্ন হয়।

বায়ুতরঙ্গের এবং শব্দের বৈশিষ্ট্য ঃ

বায়ুতরঙ্গ **দুই শ্রেণীর** - যথা নিয়মিত (periodic or regular) এবং অনিয়মিত (a-periodic or irregular)। নিয়মিত বায়ুতরঙ্গ নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে এবং অ-নিয়মিত বায়ুতরঙ্গ অনির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে কর্ণপটহে আঘাত করে। প্রথম বায়ুতরঙ্গের আঘাতে শোনা যায় **স্বন বা সুর** (musical sound) এবং দ্বিতীয় বায়ুতরঙ্গের আঘাতে শোনা যায় **রব বা গোলমাল** (noise)।

বায়ুতরঙ্গের **বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য** শব্দের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যকে নিয়ন্ত্রিত করে। বায়ুতরঙ্গের **দৈর্ঘ্যের** উপর নির্ভর করে শব্দের **পীচ্ (pitch) বা তীক্ষ্ণতা**। (১) বায়ুতরঙ্গগুলি যত তাড়াতাড়ি একটির পর আর একটি আসে, ইহারা দৈর্ঘ্যে তত ছোট হয় এবং স্বনও (tone) তত বেশী তীক্ষ্ণ হয়। আবার বায়ুতরঙ্গগুলি যত ধীরগতিতে আসে, ইহাদের দৈর্ঘ্য তত বড এবং স্বন-এর তীক্ষ্ণতাও তত কম হয়। এই **স্বনতীক্ষ্ণতাকে শব্দের পীচ বলে। স্বনতীক্ষ্ণতা নির্ভর করে, নির্দিষ্ট সময়ে কতগুলি বায়ুতরঙ্গ কর্ণকে আঘাত করে, তাহার উপর।**

(২) স্বন-এর তীক্ষ্ণতা বা পীচ্ অপরিবর্তিত থাকা সত্ত্বেও, ইহা গভীরতায় বা তীব্রতায় ভিন্ন হইতে পারে। স্বন-এর গভীরতা বা তীব্রতাকে **শব্দের উচ্চতা** (loudness or faintness) বলে। **বায়ুতরঙ্গের উচ্চতা** (amplitude) শব্দের গভীরতা বা তীব্রতার কারণ।

(৩) শব্দের আর এক প্রকার বৈশিষ্ট্যও লক্ষ্য করিবার মত ; শব্দের এই গুণকে বলা হয় **উপস্বনতা** (timbre)। উপস্বনতার কারণ হইল **বায়ুতরঙ্গের গঠন** (composition)। উপস্বনতা প্রত্যেকটি বাদ্যযন্ত্রের সেই শব্দবৈশিষ্ট্য, যাহা উহাকে অন্য বাদ্যযন্ত্রের শব্দ হইতে পৃথক বলিয়া বুঝায়। টিম্বার্-এর দ্বারাই আমরা একটি মানুষের কণ্ঠস্বরকে আর একটি মানুষের কণ্ঠস্বর হইতে পৃথক বলিয়া বুঝতে পারি।

উপস্বনতা বা টিম্বার্-এর বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে সুর বা স্বন মৌলিক নয়, কিন্তু যৌগিক শব্দ। ইহাতে একাধিক স্বন বা টোন্ থাকে। এই **জটিল শব্দটিকে সমগ্ররূপে বলা হয় ঝঙ্কার** (clang)। প্রত্যেক স্বন-এরই **একটি মূল স্বন** (fundamental tone) এবং **একাধিক উচ্চ স্বন** (over-tone) থাকে। যেমন, যদি একটি স্বন-এর কম্পন প্রতি সেকেণ্ডে ৩০০ হয়, উহার সহিত প্রতি সেকেণ্ডে ৬০০, ৯০০, ১২০০ প্রভৃতি কম্পনবিশিষ্ট উচ্চ স্বন উৎপন্ন হয়। এই উচ্চ স্বনগুলিকে বলে উচ্চস্বন বা ওভার্‌টোন্।

কাহারও কাহারও মতে শব্দের পীচ্, তীব্রতা, উপস্বনতা এই তিনটি গুণের অতিরিক্ত একটি **চতুর্থ গুণ বা বৈশিষ্ট্য** আছে। এই বৈশিষ্ট্যকে বলা হয় শব্দের **বিস্তার** (volume)। যেমন, সমুদ্র-গর্জনের বিস্তার (volume) তীরে ক্রীড়ারত শিশুদের রব বা গোলমালের বিস্তার অপেক্ষা বেশী।

শব্দের আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য :

শব্দের **আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য** আলোচিত হইতেছে। যদি এমন দুইটি স্বন, যাহাদের পীচ্ খুব নিকটবর্তী নয়, একসঙ্গে বাজিতে থাকে, তাহা হইলে মূল স্বন এবং উচ্চ স্বন ছাড়াও, উহার সহিত অন্যান্য স্বন শ্রবণগোচর হয়। এই অতিরিক্ত স্বনগুলিকে বলা হয় যুক্তস্বন (combination tone)। **যুক্তস্বন** আবার বিভিন্ন শ্রেণীর হইতে পারে—ইহাদের মধ্যে **পার্থক্য-স্বন** (difference tone) উল্লেখযোগ্য। দুইটি স্বন-এর মূল-স্বন-এর পার্থক্যকে পার্থক্য-স্বন বলে। যেমন ধরা যাউক যে উচ্চ এবং নিম্ন স্বন দুইটির মূল-স্বন-এর কম্পন প্রতি সেকেণ্ডে যথাক্রমে ৩০০ এবং ২০০। এই স্থলে উহাদের পার্থক্য-স্বন ৩০০—২০০=১০০ হইবে। আবার পার্থক্য-স্বন-এর অতিরিক্ত আর এক প্রকার যুক্ত-স্বনও পাওয়া যাইতে পারে। ইহার নাম **যোজিত স্বন** (Summation tone)। যোজিত স্বন হইবে মূল-স্বনদ্বয়ের কম্পনের যোগফল। সুতরাং এইক্ষেত্রে ৩০০ + ২০০ = ৫০০ কম্পন-বিশিষ্ট স্বনই যোজিত স্বন।

সাধারণতঃ স্বন-শূলের (tuning fork) সাহায্যেই শব্দ পরীক্ষা বা প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। ধরা যাউক যে দুইটি স্বন-শূলের স্বনকে সেকেণ্ডে ২৫৬ কম্পনবিশিষ্ট করা হইল। ঐ স্বন-শূল দুইটিকে একটি অনুনাদক বোতলের (resonating bottle) উপর ধরিলে, উহাদের স্বন মিশ্রিত বা একীকৃত হইবে। এইবার একটি স্বন-শূলের কাঁটার (prong) সহিত ভার যুক্ত করিয়া উহার স্বননকে প্রতি সেকেণ্ডে ২৫৫ কম্পনবিশিষ্ট করা হইল। এখন এই ২৫৫ এবং ২৫৬ কম্পনবিশিষ্ট দুইটি স্বন-শূলকে একত্র বাজানো হইলে, প্রতি সেকেণ্ড অন্তর এই দুই তরঙ্গ পরস্পর পরস্পরকে বর্ধিত (reinforce) করিবে, যখন উহাদের চূড়া* (crest) মিলিত হইবে (বা coincide করিবে), আবার বিরোধিতা করিবে, যখন একটির চূড়া আর একটির খাঁজের (trough) সহিত মিলিত হইবে। উল্লিখিত **মিলন ও বিরোধের ফলে স্বন-এর গভীরতা বা তীব্রতার নিয়মিত উত্থান-পতনকে বলা হয় অধিকম্প** (Beats)।

---

* বায়ুতরঙ্গেরও সাধারণ জল-তরঙ্গের মত ওঠা-নামা অথবা উচ্চতা-নীচতা থাকে। একটি তরঙ্গের উচ্চ অংশকে উহার চূড়া (crest) এবং নিম্ন অংশকে উহার খাঁজ (trough) বলে।

১৭। শ্রবণ সম্বন্ধে হেল্‌ম্‌হোল্‌জ্‌-এর অনুরণনবাদ
(Resonance Theory)

বিখ্যাত জার্মান মনীষী হেল্‌ম্‌হোল্‌জ্‌ উপরোক্ত শব্দবৈশিষ্ট্যগুলি ব্যাখ্যা করিতে গিয়া একটি প্রসিদ্ধ মতবাদ উপস্থাপিত করিয়াছেন। এই শ্রবণ মতবাদকে **প্রতিধ্বনিবাদ, অনুরণনবাদ, প্রতিনাদবাদ, বেহালা অথবা পিয়ানোবাদ** (Sympathetic, Resonance, Violin or Piano Theory) প্রভৃতি নানা নামে অভিহিত করা হয়। যে ধ্বনি কোনো স্থানে বাধাপ্রাপ্ত বা আহত হইয়া সেই স্থান হইতে প্রায় অবিকলভাবে ফিরিয়া আসে, তাহাকে প্রতিধ্বনি বলে। **হেল্‌ম্‌হোল্‌জ্‌ মনে করেন যে বাহিরের শব্দ-তরঙ্গও কর্ণের কোনো যন্ত্রাংশে অনুরূপভাবে প্রতিধ্বনিত বা অনুরণিত হয় অথবা উহাতে সহানুভূতিসূচক কম্পন সৃষ্টি করে।**

হেলম্‌হোল্‌জ্‌-এর মতে বেহালাদণ্ডের উপর যেমন তার বা তন্ত্রী থাকে এবং ঐ তারে বা তন্ত্রীতে যেমন আঘাত করা যায় সেইরূপ সুর বাজিয়া ওঠে, তেমন আভ্যন্তরীণ কর্ণের (basilar membrane) উপর অসংখ্য কম্পনশীল তন্তু বা ফাইবার আছে, যাহা বায়ুতরঙ্গের দ্বারা আহত হইয়া উহার সহিত সহানুভূতিশীল ভাবে কম্পিত হইতে থাকে এবং সেইজন্যই ঐ শব্দ শোনা সম্ভব হয়। বেসিলার্‌ মেম্‌ব্রেন্‌-এর প্রত্যেকটি তন্তু বা ফাইবার্‌-এর **নিজস্ব কম্পনতাল** (vibration-rate) আছে। উহা শুধু ঐ কম্পনতালবিশিষ্ট বায়ুতরঙ্গের দ্বারা উদ্দীপিত হয় এবং অন্যান্য কম্পনতালবিশিষ্ট বায়ুতরঙ্গে সাড়াই দেয় না।

যেমন ধরিয়া লওয়া যাউক যে, ২০০, ৩০০ এবং ৪০০ কম্পনবিশিষ্ট তিনটি শব্দ-তরঙ্গের সমষ্টি একটি শব্দ একই সময়ে কর্ণে প্রবেশ করিল। এই তিনটি শব্দতরঙ্গ কর্ণের একই যন্ত্রাংশ দ্বারা গৃহীত হইবে না। যে তিনটি তন্তুর কম্পনতাল যথাক্রমে ২০০, ৩০০ এবং ৪০০, উহারা এই তিনটি তন্তুর দ্বারা **পৃথক পৃথক ভাবে গৃহীত** হইবে। তাহা ছাড়া, কোনো প্রধান স্বন-এর উচ্চ স্বন, যুক্ত-স্বন, পার্থক্য-স্বন, যোজিত-স্বনও পৃথকভাবে গৃহীত হইবে সেই সকল তন্তু দ্বারা, যাহাদের কম্পনতাল উহাদের কম্পনতালের অনুরূপ।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, বেসিলার মেম্‌ব্রেন্‌-এর তন্তুগুলির দ্বারা একটি সমগ্র বা জটিল স্বন **সমগ্রভাবে গৃহীত হয় না**, কিন্তু হয় পৃথক বা বিশিষ্ট ভাবে। শব্দ

সংবেদনের ব্যাপারে কর্ণের একটি প্রধান কাজ হইল সমগ্র শব্দটিকে **বিশ্লেষণ** করিয়া প্রত্যেক শব্দাংশকে উহার সমধর্মী তন্তু দ্বারা গ্রহণ করা।

হেল্‌ম্‌হোল্‌জ্‌-এর মতবাদ **কয়েকটি প্রমাণ** দ্বারা সমর্থিত হয়। **স্বন-বধিরতা** (tone deafness) ইহার অন্যতম প্রমাণ। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে কুকুরের ককলিয়া-এর নিম্নাংশ নষ্ট করা হইলে, উহা উচ্চ-স্বন শুনিতে পায় না আবার উহার ককলিয়া-এর সর্বোচ্চ অংশ নষ্ট করা হইলে উহা নিম্ন-স্বন শুনিতে পায় না। এইরূপ ঘটনা শুধু হেল্‌ম্‌হোল্‌জ্‌-এর মত দিয়াই ব্যাখ্যা করা যায়। মানুষের ক্ষেত্রেও স্বন-বধিরতা এবং **"স্বন-দ্বীপ"** (Island of hearing) অথবা **"স্বন-শূন্যতা"** (tonal gap) এই মতবাদের দ্বারা ব্যাখ্যাত হয়। কোনো কোনো ব্যক্তি কতকগুলি শব্দ বা স্বন শুনিতে পায় না, অথচ উহার উচ্চ বা নীচ গ্রামের শব্দ বা স্বন শুনিতে পায়। এই ব্যাপারটির নাম "স্বন-শূন্যতা"। আবার, উচ্চ বা নীচ গ্রামের শব্দ শুনিতে না পারিলেও, উহাদের মধ্যবর্তী গ্রামের শব্দ শুনিতে পারার নাম "স্বনদ্বীপ"।

সমালোচনা

কিন্তু হেল্‌ম্‌হোল্‌জ্‌-এর মতটির বিরুদ্ধে কয়েকটি প্রবল আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে। (১) প্রথমতঃ, বেসিলার মেম্‌ব্রেন্‌-এর তন্তুগুলির দৈর্ঘ্য ·০৪ হইতে ·৪৯ মিলিমিটার হওয়ায় উহাদের **পরিধি অত্যন্ত স্বল্প-পরিসর**। পক্ষান্তরে যে সকল বায়ুতরঙ্গ শ্রবণযোগ্য শব্দ উৎপন্ন করে, তাহাদের ব্যবধান বা পরিধি অন্ততঃ ১৬ হইতে ২২০০ কম্পন। এইরূপ বিশাল পরিধিবিশিষ্ট বায়ুতরঙ্গ কিরূপে পূর্বোক্ত স্বল্প-পরিসর তন্তুর দ্বারা গৃহীত হইতে পারে তাহা বুঝিতে পারা কঠিন। **অনেকগুলি বিভিন্ন দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট কম্পনের ভার যদি এক একটি তন্তুর উপর চাপানো হয়,** শুধু তাহা হইলেই ইহা সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু এইরূপ হইলে হেল্‌ম্‌হোল্‌জ্‌-এর মতবাদ অচল হইয়া পড়ে, কারণ এই মত অনুসারে প্রত্যেকটি দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট বায়ুতরঙ্গ গ্রহণ করিবার উপযোগী একটি করিয়া তন্তু বেসিলার মেম্‌ব্রেনে রহিয়াছে, যাহা অবাস্তব।

(২) দ্বিতীয়তঃ বেসিলার্‌ মেম্‌ব্রেন্‌-এর উপরে যেমন তন্তুগুলি রহিয়াছে, তেমনই কেশ-কোষ, যাহাকে রড্‌স্‌ অফ্‌ কর্টি অথবা অর্গ্যান্‌ অফ্‌ কর্টি বলা হয়, তাহাও উহাতে রহিয়াছে। সুতরাং তন্তুগুলির পক্ষে এই কেশ-কোষগুলি **বোঝাস্বরূপ** হইয়া পড়িতে পারে। ফলে উহাদের **কম্পন-ক্ষমতা অনেকাংশে কমিয়া যাইবার সম্ভাবনা** একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না।

উপরোক্ত আপত্তি দুইটির কথা বাদ না দিলেও ইহা স্বীকার করিতে হয় যে হেল্ম্‌হোল্‌জ্‌-এর শ্রবণ-মতবাদ **স্বন সম্বন্ধীয় অধিকাংশ ঘটনার ব্যাখ্যা করিতে পারে।**

১৮। অন্যান্য শ্রবণ-মতবাদ

(ক) ইওয়াল্‌ড্‌-এর (Ewald) মতবাদ

ইওয়াল্‌ড্‌-এর শ্রবণ-মতবাদকে বলা হয় **শব্দ-চিত্র মতবাদ** (Sound Picture Theory)। তিনি বলেন যে কৃত্রিম বেসিলার্ মেম্‌ব্রেন্‌-এর উপর একটি স্বন-শূল কম্পিত করিলে প্রত্যেকটি স্বন উহার উপর শব্দ-চিত্রাবলী গঠন করে। স্বন বেসিলার্ মেম্‌ব্রেন্‌-এর উপর ইহার সমগ্র শব্দ-চিত্র উৎপন্ন করিয়া কেশ-কোষগুলিকে উদ্দীপিত করে, যাহার ফলে স্বনশ্রবণ উৎপন্ন হয়।

(খ) ম্যাক্‌স্ মেয়ার্‌-এর (Max Meyer) মতবাদ

ম্যাক্‌স্ মেয়ার্ বলিয়াছেন যে স্বন-এর উচ্চতা নির্ভর করে বেসিলার্ মেম্‌ব্রেনের স্টেপিস্‌-এর আঘাতের উপর। এই আঘাতের ফলে **বেসিলার্ মেম্‌ব্রেন্ অবনমিত হয়** বা নোয়াইয়া পড়ে। উল্লিখিত অবনমনই স্বন-এর উচ্চতা বা নিম্নতার সংবেদন উৎপন্ন করে। তাঁহার মতে স্বন-এর পীচ্ নির্ভর করে উক্ত অবনমনের পৌনঃপুনিকতার (frequency) উপর।

(গ) ওয়াট্‌-এর (Watt) মতবাদ

ওয়াট্ সম্পূর্ণ মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে তাঁহার শ্রবণ মতবাদ উপস্থাপিত করিয়াছেন। তিনি হেল্ম্‌হোল্‌জ্‌-এর শ্রবণ মতবাদ একেবারেই গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার মতে শব্দের একটি বিশেষ গুণ হইল উহার বিস্তার (volume)। তিনি আরও বলেন যে স্বনতীক্ষ্ণতা বা পীচ্ স্বন-এর নিজস্ব গুণ নয়, কিন্তু **একাধিক স্বন-এর স্থানীয় পার্থক্য** মাত্র।

ওয়াট্‌-এর মতে শব্দ-সংবেদন যেরূপে উৎপন্ন হয়, তাহা এই। শব্দ-তরঙ্গ ককলিয়া-এর মধ্য দিয়া অগ্রসর হইবার পথে মেম্‌ব্রেন-এর উপর **চাপ** সৃষ্টি করে। ঐ চাপ বেসিলার্ মেম্‌ব্রেন্‌কে অবনমিত করে বা নোয়াইয়া দেয়। অবনমন বা নোয়াইবার মাত্রা নির্ভর করে শব্দ-তরঙ্গের দৈর্ঘ্যের উপর। এই অবনমনের ফলে শব্দ-সংবেদনের ব্যাপ্তি, বিস্তার বা পরিমাণ গুণটি উৎপন্ন হয়।

(ঘ) রাদারফোর্ড-এর (Rutherford) মতবাদ

রাদারফোর্ড-এর মত অনুসারে কর্ণের বহিঃপ্রান্তীয় যন্ত্রগুলি টেলিফোন প্লেট-এর

মত কাজ করে। উহারা কম্পনের নানা নক্সা বা প্যাটার্ণ গ্রহণ করে এবং উহাদিগকে শ্রবণ-নার্ভ দিয়া মস্তিষ্কে প্রেরণ করে। মস্তিষ্কে এই প্যাটার্ণগুলির বিশ্লেষণ ঘটে।

এই মতকে শব্দ শ্রবণের **টেলিফোন মতবাদ** বলে।

১৯। কর্ণের চেষ্টা-সংবেদন
(Kinaesthetic Sensation)

কর্ণের সব কয়টি যন্ত্রই যে শ্রবণ-সংবেদন উৎপাদনে অংশ গ্রহণ করে, তাহা নয়। অন্তঃকর্ণের ককলিয়াই শ্রবণ-সংবেদনে প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু ইহার অন্তর্ভুক্ত ভেস্টিবিউল্ (vestibule) এবং অর্ধবৃত্তাকার-নালীর (semi-circular canal) কার্য অন্যরূপ। ভেস্টিবিউল্ এবং সেমি-সার্কুলার কেন্যাল্ শ্রবণ-সংবেদনে অংশ গ্রহণ করে না, কিন্তু করে প্রধানতঃ **শারীরিক অবস্থান** (body position) অথবা **দেহ-সাম্য** (equilibrium) সংবেদনে। এই কারণে ইহাদিগকে **ইকুলিব্রিয়াম সেন্স্** এবং **স্ট্যাটিক্ সেন্স্** বলা হইয়া থাকে।

অ্যামপুলার্ সেন্সেশন্

পায়ের গোড়ালীর উপর ভর দিয়া উপর্যুপরি কয়েকবার ঘুরপাক খাইয়া চোখ বন্ধ করিয়া স্থির হইলে, মস্তিষ্কে একটি সঞ্চারণ সংবেদন (swimming sensation) অনুভূত হয়. ইহাকে মাথা-ঘোরা বোধও (sense of giddiness) বলা হইয়া থাকে। এই সংবেদন উৎপন্ন হয় অর্ধবৃত্তাকার নালীতে সংগ্রাহক কোষ (receptor cells) অ্যাম্পুলা-এর অংশ ক্রিস্টি-এর উদ্দীপনা হইতে। নানা জন্তুর উপর পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে যে অর্ধবৃত্তাকার নালীগুলির এইরূপ উদ্দীপনাই মস্তিষ্কের অবস্থান ও গতি সংবেদনের (head position and movement) কারণ। এই সংবেদনকে **ল্যাবিরিন্থাইন্ সেন্সেশন্**ও বলা হইয়া থাকে।

ম্যাক্ব্রয়ের-ব্র'উন্ (MacBreuer-Brown) মতবাদ অনুসারে মস্তিষ্কের যে কোনো গতি অর্ধবৃত্তাকার নালীগুলিকে প্রভাবিত করে, কারণ ইহারা উভয় কর্ণেই সমানভাবে দেশের (space) তিনটি মাত্রায় (dimension) স্থাপিত রহিয়াছে। তিন প্রকারে দেহ-সাম্য বোধ নষ্ট হইতে পারে, যথা উপরের সহিত নীচের, সম্মুখের সহিত পশ্চাতের এবং ডান দিক হইতে বাম দিকের সম্বন্ধ ভুল করিয়া। উপরে-নীচে, ডান-বামে এবং সম্মুখে-পশ্চাতে জোরে মাথা নাড়িলে সাময়িক মাথাঘোরা (giddiness) সংবেদন উপস্থিত হয়।

ঘুরপাক খাইলে, অর্ধবৃত্তাকার নালীর তরল পদার্থ (fluid substance) পিছনে

পড়িয়া থাকে। এই তরল পদার্থের পশ্চাৎ অভিঘাতে ক্রিস্টা-এর (cristae) কুপুলা (cupula) নোয়াইয়া পড়ে। ফলে ক্রিস্টা-এর উপরে অবস্থিত সংগ্রাহক নার্ভ উদ্দীপিত হয় এবং মাথায় সুড়সুড়ির মত সঞ্চারণ সংবেদন অনুভূত হয়। ঘুরপাক খাওয়া বন্ধ করিয়া থাকিলে, ঐ পিছনে অপসৃত তরল পদার্থ সামনের দিকে অগ্রসর হয় এবং কুপুলাকে বিপরীত দিকে নোয়াইয়া দেয়। ইহার ফলে সুড়সুড়ি বা সঞ্চারণ সংবেদনের গতি উল্টাইয়া যায়।

ভেস্‌টিবুলার্ (Vestibular) সেন্‌সেশন্

ভেস্‌টিবুলার্ সেন্‌সেশন্ সমস্ত শরীরের অবস্থান সম্বন্ধে অনুভূতি উৎপন্ন করে। ইহা শরীরের ভার-সাম্যবোধ জাগায় এবং ইহার সাম্যাবস্থা রক্ষা করিতে সাহায্য করে। চক্রাকারে দোল খাইয়াও যে দেহের সাম্যবোধ বজায় থাকে, তাহার কারণ কর্ণের ভেস্‌টিবিউল্ অংশ। জলে সাঁতার কাটিবার সময় এই অংশই গতির দিক (direction) সম্বন্ধে চেতনা অক্ষুণ্ণ রাখে। যাহারা মূক-বধির (deaf mutes), তাহাদের ভেস্‌টিবিউল্ কার্যক্ষম থাকে না। ফলে তাহারা উক্ত সংবেদন হইতে বঞ্চিত।

কর্ণের চেষ্টা-সংবেদন নামক **উপরোক্ত সংবেদনগুলি শ্রবণ-সংবেদন** নয়। **কিন্তু** যেহেতু ইহারা কর্ণেরই কয়েকটি অংশের উদ্দীপনা হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, সেই কারণে শ্রবণ-সংবেদন অনুচ্ছেদেই উহাদের আলোচনা করা হইল। উপরোক্ত চেষ্টা সংবেদনের সহিত শ্রবণ সংবেদনের সম্বন্ধ নাই।

২০। কর্ণের গঠন (Structure of the Ear)

প্রথমতঃ, কর্ণের **তিনটি প্রধান অংশ**—যথা বহিরংশ বা বহিঃকর্ণ, মধ্যবর্তী অংশ বা মধ্যকর্ণ এবং অন্তর্বর্তী অংশ বা অন্তঃকর্ণ।

বহিঃকর্ণের অংশ

বহিঃকর্ণের (External Ear) ভাগগুলি এবং উহাদের গঠন নিম্নরূপ। বহিঃকর্ণের দুইটি অংশ, যথা **কানের পাতা** (Pinna, auricle) এবং বহিঃছিদ্র, **বহিঃকর্ণপথ** বা কর্ণছিদ্র (Auditory Meatus or Earhole)। এই ছিদ্র বা পথ মধ্যকর্ণের কর্ণপটহ পর্যন্ত গিয়াছে। কর্ণপটহ বা কানের পর্দা বহিঃকর্ণ পথকে মধ্যকর্ণ গহ্বর হইতে পৃথক করিয়া দিয়াছে।

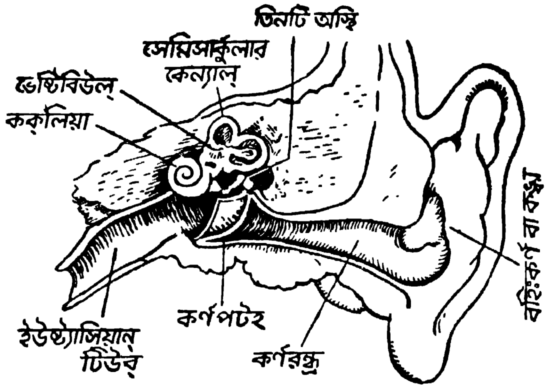
মধ্যকর্ণের অংশ

মধ্যকর্ণের (Middle-Ear) অংশগুলি এবং উহাদের গঠন এইরূপ। এই কর্ণের প্রথম ভাগটি হইল **কর্ণপটহ** বা কানের পর্দা (Tympanic Membrane,

Ear-drum)। ইহা স্নায়ুতন্তু (fibrous tissue) দিয়া তৈয়ারী এবং অল্প বাঁকাভাবে বসানো। কর্ণপটহের পিছনে আছে তিনটি অতি ক্ষুদ্র **কর্ণাস্থি** (Ear-bones, ossicles)। একটিকে বলা হয় **হাতুড়ি অস্থি** (Hammer-bone, Malleus) যেহেতু ইহা দেখিতে অনেকটা হাতুড়ির মত এবং ইহার কাজও বায়ুতরঙ্গকে হাতুড়ির মত আঘাত করা। দ্বিতীয় অস্থিটির নাম **নেহাই অস্থি** (Anvil-bone, Incus), এবং তৃতীয়টির নাম হইল **রেকাব অস্থি** (Stirrup-bone, Stapes), কারণ উহাকে দেখিতে অনেকটা ঘোড়ার জিনের পার বা রেকাবের মত। মধ্যকর্ণের ভিতরের অস্থিতে দুইটি ছিদ্র থাকে, একটি ডিম্বাকৃতি (oval) এবং অপরটি গোল (round)। মধ্যকর্ণের সহিত গলার সংযোগপথকে বলা হয় **ইউস্ট্যাশিয়ান টিউব্** (Eustachian Tube)।

অন্তঃকর্ণের গঠন

অন্তঃকর্ণের (Internal Ear) গঠন বিশেষ জটিল। ইহা হাড় দিয়া তৈয়ারী একটি গোলক ধাঁধা (osseous or bony labyrinth) বিশেষ। এই হাড় বা অস্থির



২৩নং চিত্র—কর্ণের বিভিন্ন অংশ

ব্যূহে তিনটি ভাগ আছে। মধ্যভাগের অস্থিকে বলা হয় **ভেস্টিবিউল্**)Vestibule)। ভেস্টিবিউল্-এর এক প্রান্তে রহিয়াছে **তিন বার ঘুরানো অর্ধগোল খাল** (Semi-circular canal) এবং অন্য প্রান্তে রহিয়াছে **শম্বুকাকৃতি অংশ** (Cochlea)। সেমি-সারকুলার্ কেনাল্ অর্ধবৃত্তাকার। কক্লিয়া আড়াই পাকের একটি চক্রাকৃতি (spiral) কামরা।

দুইটি পাতলা হাড় কক্লিয়াকে **তিনটি কামরায়** বিভক্ত করিয়াছে—যথা স্কেলা

ভেষ্টিবিউল্ (Scala Vestibule), স্কেলা মেডিয়া (Scala Media) এবং স্কেলা টিম্প্যানি (Scala Tympani)। ককলিয়ায় দুইটি ছিদ্র আছে—একটি ডিম্বাকৃতি (oval window) যাহার নাম ফেনেস্ট্রা ওভালিস্ (Fenestra Ovalis) এবং অপরটি গোল (round window) যাহার নাম ফেনেস্ট্রা রোটাণ্ডা (Fenestra Rotunda)। স্কেলা মিডিয়া এবং স্কেলা টিম্প্যানির মাঝখানে রহিয়াছে একটি **সূক্ষ্ম কোমল পর্দা**, যাহার নাম **বেসিলার মেমব্রেন্** (Basilar-membrane)। বেসিলার্ মেম্‌ব্রেন্ বিভিন্ন আকারের অসংখ্য তন্তু দ্বারা গঠিত। ইহা একটি পাত্‌লা ঝিল্লী এবং শ্রুতিশম্বুকনালীর (cochlea) নিম্ন হইতে শীর্ষদেশ পর্যন্ত প্রসারিত। বেসিলার মেম্‌ব্রেন্-এর উপর কোমল ও স্পর্শকাতর চুলের শ্রেণী (hair-cells) খাড়াভাবে সজ্জিত আছে। এই চুলগুলিকে বলে **অর্গ্যান অফ্ কর্টি** (Organ of Corti)। অর্গ্যান্ অফ কর্টি বা স্পর্শকাতর চুলের কোষাণুতে আছে **শ্রুতি-সংবেদীয় নার্ভের** (Acoustic, auditory nerve) ডেনড্রন্ সকল। এই নার্ভই শব্দনার্ভ-প্রবাহকে (auditory nerve-impulse) মস্তিষ্কে বহন করে।

হাড়ের (bony labyrinth) চক্রব্যূহে ঝিল্লী দিয়া তৈয়ারী যে নল (tube) আছে উহাকে মেম্‌ব্রেনাস্ ল্যাবিরিন্থ্ (membranous labyrinth) বলে। ইহার দুইটি মুখই বন্ধ থাকে। ঝিল্লী ঢাকা এই নলে পরিষ্কার তরল রস (endolymph) আছে। আবার নলের ও হাড়ের খোলে লসিকা রস (Perilymph) আছে। এই রস ক্ষরিত হয় ককলিয়ার মধ্যবর্তী বহু সূক্ষ্ম ধমনী, শিরা এবং লসিকাবাহী নালী-সমূহ হইতে।

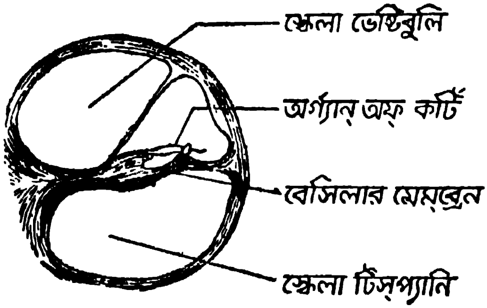
মেম্‌ব্রেনাস্ ল্যাবিরিন্থ্-এর সুড়ঙ্গ মধ্যে দুইটি থলি আছে—উহাদের নাম উট্রিক্‌ল্ (Utricle) এবং স্যাকিউল্ (Saccule)। উট্রিক্‌ল-এর পিছনে আছে এণ্ডোলিম্‌ফ্যাটিক্ ডাক্‌ট্ নামক একটি নালী। এই নালী মস্তিষ্ক কঙ্কালে প্রবেশ করিয়াছে। স্যাকিউল্-এর সহিত ককলিয়ার যোগসূত্রকে বলা হয় কেনালিস্ রি-ইউনিয়ন্ (Canalis Re-union) অথবা হেন্সেন্-এর ডাক্‌ট্ (Honsen's Duct)।

২১। সাম্য এবং মাথার অবস্থান সংবেদন

(Equilibrium and Head-Position Sense)

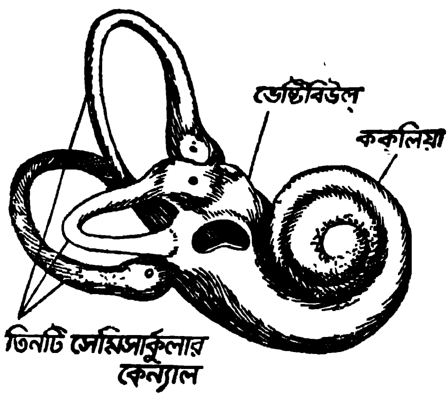
কর্ণ শ্রবণেন্দ্রিয় সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার সবগুলি অংশই শ্রবণ সংবেদনে অংশ গ্রহণ করে না। যেমন, সেমি-সার্কুলার্ কেনাল্ শ্রবণ ব্যাপারে কোনো অংশ গ্রহণ করে না, কিন্তু গতিসাম্য নিয়ন্ত্রণ করে। চলার গতি এবং নড়ন-চড়নের সমতা-বিধান

করার প্রেরণা বা নার্ভপ্রবাহ এই তিন বৃত্তাকার যন্ত্র হইতে উঠিয়া মেডুলা অবলংগেটা ও সেরিবেলামে যায় ও সেখানে গতিসাম্য স্থির হয়। পশুপক্ষীদের এই তিন কেনাল নষ্ট হইলে, তাহাদের ঘাড় ঝুলিয়া পড়ে, তাহারা ঘুরিয়া ঘুরিয়া পড়িয়া যায় এবং গতিসাম্য রক্ষা করিতে পারে না। টলিয়া-পড়া রোগ (vertigo) এই কেনাল-এর বিকার হইতে উৎপন্ন হয়।



২৪ নং চিত্র—কক্লিয়া-এর একটি ছেদ

মা থা - ঘু রা নো - ও-ফিরানোর ক্রিয়াও সেমি-সার্কুলার কেনাল-এর সহিত জড়িত। তিন বৃত্তাকার কেনালটি পাঁচটি নল ও ছিদ্র দ্বারা উট্রিকল্-এর সহিত যুক্ত আছে। আবার, ঐ উট্রিকল্-এর সহিত স্যাকিউল্ও একটি নল দ্বারা সংযুক্ত। যখন মাথা একদিকে হেলানো হয়, তখন সেই দিকের কানের স্যাকিউল্-এর মধ্যস্থ মিউকাস্ ও অটোলিথ্ ঝিল্লী পর্দাতে টান পড়ে, অথচ অপর দিকের কানের স্যাকিউল্ নিষ্ক্রিয় থাকে। আবার, মাথা সামনে অথবা পিছনে হেলাইলেও উট্রিকল্-এর ভিতরে ঐরূপ টান পড়ে। ফলে, আমরা বুঝিতে পারি কোন্ দিকে মাথা হেলানো হইয়াছে, অথবা মাথা কিভাবে অবস্থিত রহিয়াছে।



২৫ নং চিত্র—অন্তঃকর্ণের গহ্বর

দেখা যাইতেছে, কানের সেমি-সার্কিউলার কেনাল্ অংশটি **শ্রবণ ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করে না,** কিন্তু দেহের সাম্যবোধ এবং মস্তকের অবস্থিতিবোধ নিয়ন্ত্রিত করে।

অনুশীলনী (Exercise)

1. How does visual sensation take place ? What are the different kinds of visual sensation. (Ans. : pp. 258-260)
কিরূপে দর্শন সংবেদন ঘটে ? দর্শন সংবেদন কয় প্রকার এবং কি কি ?

2. Distinguish between primary and secondary colours. What are the main characteristics of colour ? (Ans. : pp. 260-261)
মুখ্য এবং গৌণ বর্ণের পার্থক্য দেখাও। বর্ণের প্রধান বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।

3. Define after-sensation. Distinguish between positive and negative after sensation. (Ans. : pp. 261-264)
অনুসংবেদন কাহাকে বলে ? সবর্ণ এবং অসবর্ণ অনুসংবেদনের পার্থক্য আলোচনা কর।

4. Define colour-contrast. Distinguish between simultaneous and successive colour-contrast. What is meant by complementary colours ? (Ans. : pp. 264-266)
বর্ণ বৈসাদৃশ্য কাহাকে বলে ? সমকালীন ও অনুবর্তী বৈসাদৃশ্যের পার্থক্য প্রদর্শন কর। পরিপূরক বর্ণ বলিতে কি বুঝায় ?

5. Explain colour-blindness. Distinguish between its different types. (Ans. : pp. 266-268)
বর্ণান্ধতা কাহাকে বলে ? ইহা কয় প্রকার ? ইহাদের পার্থক্য দেখাও।

6. Write notes on : (a) blind spot ; (b) colour-mixing ; (c) the different methods of producing colourless sensation ; (d) accommodation , adaptation ; Purkinje Phenomenon ; (f) twilight vision. (Ans. : pp. 268-271)
সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর :—(ক) অন্ধবিন্দু . (খ) বর্ণসংমিশ্রণ ; (গ) অবর্ণ সংবেদন উৎপাদনের বিভিন্ন উপায় ; (ঘ) সংযোজন ; (ঙ) প্রতিযোজন ; (চ) পার্কিন্জে ব্যাপার ; (ছ) গোধূলি দর্শন।

7. Explain the Ycung-Helmholtz theory of colour vision. (Ans. : pp. 271-273)
ইয়ং-হেল্মহোজ্ দর্শনমতবাদটি আলোচনা কর।

8. What are the retinal zones ? To which sensation are they sensitive ? (Ans. : p. 266)
অক্ষিপটীয় অঞ্চল কি কি ? তাহারা কোন্ কোন্ সংবেদনে সংবেদনশীল ?

9. **Explain with a diagram the structure of the eye.**
(Ans. : pp. 276-278)
চিত্রসহ চক্ষুর গঠন ব্যাখ্যা কর।

10. **Show with diagrams the different parts of the eye.**
(Ans. : pp. 276-278)
চিত্র সাহায্যে চক্ষুর অংশগুলি দেখাও।

11. **Point out the structure of the retina.** (Ans. : pp. 278-280)
অক্ষিপটের গঠন বর্ণনা কর।

12. Explain how auditory sensation originates. What are the main properties of sound ? (Ans. : pp. 280-282)
শ্রবণ সংবেদনের উৎপত্তি আলোচনা কর। শব্দের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি ?

13. Give a critical exposition of Helmholtz's Resonance theory of Hearing. (Ans. : pp. 283-285)
হেল্মহোলজ্-প্রতিধ্বনি-শ্রবণ-মতবাদের সমালোচনামূলক ব্যাখ্যা কর।

14. Explain with a diagram the structure of the ear.
চিত্রসহ কর্ণের গঠন আলোচনা কর (Ans. : pp. 289-290)

15. Sketch out the different parts of the ear and explain their function. (Ans. : pp. 289-290)
কর্ণের অংশগুলি আঁকিয়া দেখাও এবং উহাদের ক্রিয়া বর্ণনা কর।

16. What do you mean by (a) Kinaesthetic sensation ; (b) Labyrinthine sensation and (c) Vestibular sensation ?
(Ans. : pp. 286-287)
(ক) চেষ্টা সংবেদন ; (খ) ল্যাবিরিন্থাইন সংবেদন এবং (গ) ভেস্টিবুলার সংবেদন কাহাকে বলে ?

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

স্বাদ, ঘ্রাণ, স্পর্শ, যান্ত্রিক এবং পেশীয় সংবেদন

(Gustatory, Olfactory, Cutaneous, Organic and Muscular Sensations)

১। স্বাদ সংবেদন (Gustatory or Taste Sensation)

ইন্দ্রিয় এবং উদ্দীপক

জিহ্বাস্থ বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গুলির উদ্দীপনা হইতে যে সংবেদন উৎপন্ন হয় তাহাকে স্বাদ সংবেদন বলে।

স্বাদ সংবেদনের **ইন্দ্রিয়** জিহ্বার উপরিস্থিত স্বাদ কোরক (taste-buds or papillae)-গুলি। এই কোরকগুলি আঁচিলের মত জিহ্বার উপরিভাগে গুচ্ছে গুচ্ছে অবস্থান করে। জিহ্বার পশ্চাতে অবস্থিত প্যাপিলিগুলিকে সার্কাম্ভ্যালেট্ (circumvallate) এবং উহার আশেপাশে অবস্থিত প্যাপিলিগুলিকে ফাঞ্জিফর্ম্ (fungiform) প্যাপিলি বলা হয়। এই কোরকগুলির ভিতরে স্বাদ-কোষ (taste-cells) অবস্থিত। ইহাদের সন্নিহিত স্বাদ-নার্ভ উত্তেজিত হইলে এবং ঐ উত্তেজনা মস্তিষ্কে পৌছিলেই স্বাদ-সংবেদন ঘটে। স্বাদ-সংবেদনের **উদ্দীপক** কোনো দ্রবণীয় পদার্থ (soluble substance)। এই পদার্থ লালার সহিত দ্রবীভূত হইয়া স্বাদ-ইন্দ্রিয়কে উদ্দীপিত করে।

সাধারণভাবে জিহ্বা স্বাদেন্দ্রিয় হইলেও, উহার সকল অংশই যে সকল প্রকার স্বাদ উদ্দীপকের প্রতি সংবেদনশীল, তাহা নয়। বিভিন্ন রকম স্বাদ-সংবেদনে জিহ্বার বিভিন্ন অংশ ক্রিয়াশীল হয়। স্বাদ-সংবেদন প্রধানতঃ **চারি প্রকার,** যথা **মধুর** (sweet), **অম্ল** (sour), **তিক্ত** (bitter) এবং **লবণ** (salt)—যেমন চিনি, লেবুর রস, কুইনাইন এবং লবণের স্বাদ।

জিহ্বার বিশেষ বিশেষ অংশ এই স্বাদগুলির প্রতি বিশেষ বিশেষ ভাবে সংবেদনশীল। যেমন জিহ্বার **অগ্রভাগ** প্রধানতঃ মধুর ও লবণ স্বাদগ্রহণে সংবেদনশীল, উহার **পশ্চাদ্ভাগ বা গোড়া** তিক্তরস গ্রহণে এবং উহার **দুই পার্শ্ব**, অথবা কাহারও কাহারও মতে **মধ্যভাগ,** অম্লরস গ্রহণে সংবেদনশীল। কিন্তু প্রয়োগ-মনোবিদ্যার মতে জিহ্বার মধ্যভাগের কোনো স্বাদ-সংবেদনশীলতা নাই। উপরোক্ত চারিটি

স্বাদগ্রহণে সক্ষম চারিটি স্বাদ-কোরক বা স্বাদ-মুকুল রহিয়াছে এবং প্রত্যেক মুকুল-গুচ্ছে উহাদের একাধিক মুকুল থাকিতে পারে।

উপরে বলা হইয়াছে যে স্বাদ **চারি প্রকার**—যথা মধুর, অম্ল. তিক্ত এবং লবণ। এই চারিটিই মৌলিক স্বাদ (simple taste) এবং অন্যান্য স্বাদগুলি যৌগিক (compound), অর্থাৎ ইহাদেরই বিভিন্ন মাত্রায় সংমিশ্রণের ফল। যেমন ধাতুজ (metallic) স্বাদ মধুর ও লবণ রসের সংযোগ ফল। আবার তৈলাক্ত (oily) স্বাদ, পান্‌সে (pungent), মসৃণ (smooth), উগ্র (astringent) প্রভৃতি স্বাদগুলিকেও ঐরূপে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে।

লিনিয়াস্ (Linnaeus) উপরোক্ত স্বাদগুলির সহিত ধাতুজ, তৈলাক্ত, পান্‌সে, মসৃণ, উগ্র প্রভৃতি আরও ছয়টি যুক্ত করিয়া মৌলিক স্বাদের সংখ্যা বাড়াইয়া দশটি করিয়াছেন। আবার কেহ কেহ চারিটি প্রধান স্বাদকে মধুর ও তিক্ত, এই **দুইটি** মূল স্বাদ সংবেদনে পরিণত করিয়াছেন। কাহারও কাহারও, যেমন **জোহানেস্ মুয়েলার্**-এর মতে বিবমিষা (nausea) স্বাদেরই একটি গুণ। কোনো কোনো আধুনিক মনোবিৎ ক্ষারজ (alkaline) এবং ধাতুজ (metallic) স্বাদকেও মূল স্বাদ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

অধিকাংশ মনোবিদের মতে মধুর, অম্ল, তিক্ত এবং লবণ এই চারিটিই মূল স্বাদ এবং অন্যান্য স্বাদ এই চারিটির রূপান্তর, অথবা স্বাদ যান্ত্রিক, স্পর্শ এবং ঘ্রাণ সংবেদনের যৌগিক ফল। যেমন উগ্র স্বাদের মৌলিকতা নাই, ইহা অম্লের রূপান্তর, কারণ অম্ল প্রথমে উগ্র বা সঙ্কোচক, পরে জ্বালাময় এবং সর্ব শেষে বেদনাদায়ক। লবণের সহিত প্রথমে জ্বলন থাকে, পরে উহা বেদনাদায়ক হয়। মধুরের সহিত মসৃণতা ও কোমলতা, থাকে, কিন্তু প্রবল হইলে উহা বিদ্ধ করে অথবা তীক্ষ্ণ ব্যথার মত অনুভূত হয়। তিক্ত স্বাদ চর্বিময় বা তৈলাক্ত কিছু বুঝায় এবং প্রবল হইলে জ্বালাময় হইয়া দাঁড়ায়।

স্বাদ-সংবেদনের কয়েকটি ধর্ম

স্বাদ সংমিশ্রণে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উল্লেখযোগ্য। কতগুলি স্বাদ অল্প-বিস্তর পরস্পর-বিরোধী। কফির তিক্ত স্বাদ চিনির স্বাদে উপশমিত হয়। আবার অম্ল এবং লবণ, একটি অপরটির বিরুদ্ধতা নষ্ট (neutralise) করে। কতগুলি স্বাদ **পাশাপাশি থাকিতে পারে,** যেমন তিক্ত এবং লবণ।

উদ্দীপকের তীব্রতা বেশী হইলে, দুইটি স্বাদ **দোলায়মান** (oscillating) **ভাবে**

চলিতে থাকে। কিন্তু ইহার তীব্রতা কম হইলে, একটি আর একটির আংশিক **ক্ষতিপূরণ** (compensate) **করে**।

স্বাদ-সংবেদনের **প্রতিযোজন** (adaptation) উল্লেখযোগ্য নয়, কারণ স্বাদযন্ত্রগুলি উদ্দীপকের সহিত নিজেদের মানাইয়া লইতে পারে না। বেশী মিষ্টি খাইলে মিষ্টির তীব্রতা না কমিয়া বাড়িয়াই যায়, যাহার ফলে আরও বেশী মিষ্টি খাওয়া যায় না। কোনো কোনো স্বাদ-সংবেদনের **বৈসাদৃশ্য ফল** (contrast effect) উল্লেখযোগ্য, যেমন হরীতকী, আমলকী প্রভৃতির তিক্ত-অম্ল স্বাদ উহাদের বিপরীত মধুর স্বাদে রূপান্তরিত হইতে পারে।

স্বাদ-সংবেদনের সহিত **যান্ত্রিক সংবেদনের** (organic sensation) সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। স্বাদ শারীরিক **স্বাস্থ্যের সূচক**। ইহার বিশৃঙ্খলা যান্ত্রিক সংবেদনের বিশৃঙ্খলার সহিত জড়িত। যেমন অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, পেটব্যথা, বিবমিষা প্রভৃতি যান্ত্রিক-সংবেদনের তারতম্যে স্বাদ-সংবেদনের তারতম্য ঘটিয়া থাকে। তাহা ছাড়া, স্বাদ-সংবেদনের সহিত **ঘ্রাণ-সংবেদনেরও** ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। নাকে সর্দি থাকিলে খাদ্যের স্বাদ পাওয়া যায় না। নাক বন্ধ থাকিলে আলুর, আপেলের এবং পেঁয়াজের স্বাদে পার্থক্যবোধ নষ্ট হয়।

তৃতীয়তঃ, স্বাদ-সংবেদনের সহিত **স্পর্শ-সংবেদনের** সম্বন্ধও খুব ঘনিষ্ঠ। মধুর স্বাদের সহিত সাধারণতঃ মসৃণতা বা কোমলতার স্পর্শবোধ যুক্ত থাকে। তীক্ষ্ণ বা রুক্ষ স্বাদের, যেমন ঝাল স্বাদের সহিত জ্বালাবোধ (burning sensation) যুক্ত থাকে।

২। ঘ্রাণ-সংবেদন (Olfactory or Smell Sensation)

ঘ্রাণ-সংবেদনের **ইন্দ্রিয়** স্থূলভাষায় নাসিকা, কিন্তু আসলে নাসিকাগহ্বরের ঝিল্লীর (nasal membrane) উপরিভাগে অবস্থিত ঘ্রাণকোষ, যাহা দ্বারা উহা নির্মিত। ঘ্রাণ-নার্ভ দুই প্রকার। একটির কাজ হইল গন্ধ বহন করা এবং অপরটির কাজ হইল **সুড়সুড়ি-সংবেদন** (tickling sensation) সৃষ্টি করা। দ্বিতীয়টির সহিত ঘ্রাণ-সংবেদনের কোনো সংস্রব নাই। **ঘ্রাণ-নার্ভ** উদ্দীপিত হইয়া ঘ্রাণ-নার্ভ-প্রবাহের আকারে মস্তিষ্কে বাহিত হয় এবং ঘ্রাণ-সংবেদন উৎপন্ন করে।

ঘ্রাণ-সংবেদনের **উদ্দীপক** গ্যাসীয় রেণু (gaseous particles), যাহা আঘ্রাত বস্তু হইতে বায়ুদ্বারা বাহিত হইয়া নাসিকাস্থ ঘ্রাণকোষগুলিতে পৌঁছায়, উহাদের সন্নিহিত

ঘ্রাণ-নার্ভকে উদ্দীপিত করে এবং এই নার্ভ-প্রবাহ মস্তিষ্কের ঘ্রাণকেন্দ্রে আসিয়া উপস্থিত হয়।

স্বাদ-সংবেদনের তুলনায় ঘ্রাণ-সংবেদন অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম এবং জটিল। ঘ্রাণ-নার্ভের সংবেদনশীলতা স্বাদ-নার্ভের সংবেদনশীলতা অপেক্ষা ২৪০০০ গুণ বেশী। স্বাদ-সংবেদনকে মোটের উপর **চারিটি শ্রেণীতে** পরিণত করা হইয়াছে। কিন্তু ঘ্রাণ-সংবেদনের সংখ্যা এই তুলনায় অনেক বেশী। **লিনিয়াস** ঘ্রাণ-সংবেদনকে **সাত শ্রেণীতে** এবং বিখ্যাত ডাচ্ শারীরবৃত্তবিৎ **জোয়ারদেমেকার** (Zwaardemaker) ঘ্রাণ-সংবেদনকে **নয়টি শ্রেণীতে** বিভক্ত করিয়াছেন। এই নয়টি শ্রেণী নিম্নপ্রকার।

(১) ইথেরিয়েল (Ethereal, fruity) গন্ধ—যাবতীয় ফল, মদ্য, ইথর, মৌচাক প্রভৃতির গন্ধ;

(২) অ্যারোমেটিক (Aromatic) গন্ধ বা সৌরভ—কর্পূর, মসলা, গোলাপ প্রভৃতির গন্ধ;

(৩) ফ্র্যাগ্র্যান্ট বা বাল্সামিক্ (Fragrant, balsamic) সুগন্ধ—কমলালেবু ফুল, চা প্রভৃতির গন্ধ;

(৪) অ্যাম্ব্রসিয়াক্ বা অমৃত (Ambrosiac, musky) গন্ধ—মৃগনাভি, তৈলস্ফটিক, অম্বর, চন্দন প্রভৃতির গন্ধ;

(৫) অ্যালিয়েসিয়স্ বা রশুন (Alliaceous, leeky) জাতীয় গন্ধ—হিঙ্গ, মৎস্য, আয়োডিন্ প্রভৃতির গন্ধ;

(৬) বার্নিং বা দাহজনক (Empyreumatic, burnt) গন্ধ—টোস্ট, বেঞ্জল্, তামাকের ধোঁয়া প্রভৃতির গন্ধ,

(৭) হিরসাইন্ (Hircine, rank) গন্ধ—পনীর, ঘাম প্রভৃতির গন্ধ,

(৮) ভিরুলেন্ট, ফাউল্, তীব্র বা বদ (Virulent, foul) গন্ধ—আফিং, ছারপোকা প্রভৃতির গন্ধ;

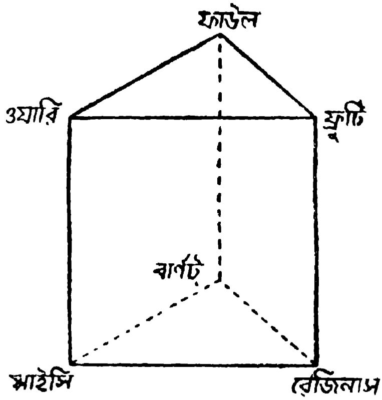
(৯) নসিয়েটিং বা বমনজনক (Nauseating) গন্ধ—গলিত বা পচা প্রাণিদেহ প্রভৃতির গন্ধ;

জোয়ার্দেমেকার-এর উপরোক্ত শ্রেণীভেদ মূল্যবান। কিন্তু ইহার অন্তর্ভুক্ত কোনো কোনো গন্ধ মৌলিক নয়, ইহারা যৌগিক। **হেনিং** (Henning) ইহার বিশ্লেষণ করিয়া যাবতীয় গন্ধকে **ছয়টি** মৌলিক গন্ধে পরিণত করিয়াছেন। তাঁহার নির্দেশিত ছয়টি মৌলিক গন্ধ এই :—

(১) ফ্লাওয়ারি (Flowery) স্মেল্ বা পুষ্পগন্ধ
(২) স্পাইসি (Spicy) স্মেল্ বা মশলা গন্ধ
(৩) রেজিনাস্ (Resinous) স্মেল্ বা ধুনা-গন্ধ
(৪) ফ্রুটি (Fruity) স্মেল্ বা ফল-গন্ধ
(৫) পিউট্রিড বা ফাউল (Putrid, foul) স্মেল্ বা গলিত বা পচা গন্ধ।
(৬) বার্নট্ বা স্কর্চ্ড্ (Burnt, Scorched) স্মেল্ বা পোড়া গন্ধ

হেনিং উপরোক্ত ছয়টি মৌলিক গন্ধকে একটি ত্রিভুজ প্রিজ্‌মে সাজাইয়াছেন। ইহার নাম **"হেনিংস্-স্মেল প্রিজ্‌ম্"** (Henning's Smell Prism)। ইহার একদিকের তিন কোণে তিনটি গন্ধ, যথা—ফ্লাওয়ারি, ফ্রুটি এবং ফাউল এবং বিপরীত দিকের তিন কোণে বাকী তিনটি গন্ধ, যথা স্পাইসি, রেজিনাস্ এবং বার্নট্ রহিয়াছে।

ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের একটি **বৈশিষ্ট্য** এই যে ইহা সহজেই ক্লান্ত (fatigued) হইয়া পড়ে। একটি ফুলের সুগন্ধ এক মিনিট ধরিয়া আঘ্রাণ করিলে, ঐ সুগন্ধ কমিতে কমিতে লুপ্ত হইয়া যায়। স্বাদ-সংবেদনের তুলনায় ঘ্রাণ-সংবেদনের **প্রতিযোজন** বেশী। যেমন, তীব্র গন্ধের প্রতিও ঘ্রাণেন্দ্রিয় সহনশীল হইয়া যাইতে পারে।



২৬নং চিত্র—হেনিংস্ স্মেল্ প্রিজম্

আবার, দুইটি গন্ধ একই সময়ে উপস্থিত থাকিলে, একটি অপরটির **ক্ষতিপূরণ** (compensation) করিতে পারে।

৩। রাসায়নিক ইন্দ্রিয় (Chemical Sense)

রাসায়নিক ইন্দ্রিয় বলিতে বুঝায় এমন ইন্দ্রিয়, যাহা উহার সংগ্রাহক যন্ত্রের উপর কোনো উদ্দীপক পদার্থের প্রতিক্রিয়া দ্বারা প্রভাবিত হইয়া থাকে। নিম্নতর প্রাণীর ক্ষেত্রে স্বাদ ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের পৃথক বিকাশ ঘটেনা, কিন্তু ইহারা অবিভক্ত বা মিলিত অবস্থায় থাকে। **স্বাদ ও ঘ্রাণের** এইরূপ অবিভক্ত **মিলিত ইন্দ্রিয়কে রাসায়নিক ইন্দ্রিয়** বলে। সংগ্রাহক যন্ত্রের রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে যে প্রতিবর্ত ঘটে তাহাকে রাসায়নিক প্রতিবর্তও বলা হয়।[1]

১ জেম্‌স্ ড্রিভার্—এ ডিক্‌শ্‌নারি অফ্ সাইকলজি—পৃঃ ৩৬

স্বাদ ও ঘ্রাণকে রাসায়নিক ইন্দ্রিয় বলা হইয়া থাকে, কারণ স্বাদের উদ্দীপক দ্রবণশীল পদার্থ এবং ঘ্রাণের উদ্দীপক গ্যাসীয় পদার্থ। এই উদ্দীপক দুইটির রাসায়নিক উপাদান কতগুলি অণু (molecule) দিয়া গঠিত। অণুগুলির আকার প্রকার অনুসারে ইহারা ঘ্রাণেন্দ্রিয় এবং স্বাদেন্দ্রিয়ের উপর ক্রিয়া করে। জলাভূমির গ্যাস গন্ধ উৎপন্ন করে না, কারণ ইহার অণুগুলির আকার অত্যন্ত ক্ষুদ্র। তাহা ছাড়া, উদ্দীপকের রাসায়নিক উপাদানগুলির গন্ধ নাই।

এই পদার্থগুলির রাসায়নিক স্বভাব বা গঠন আসলে মনোবিদ্যার বিষয় নয়। ইহারা যে ইন্দ্রিয়কে রাসায়নিক ভাবে উদ্দীপিত করে তাহাতে সন্দেহ নাই এবং ইন্দ্রিয়ের উপর উদ্দীপকগুলির রাসায়নিক প্রক্রিয়াই মনোবিদ্যার বিষয়।

দ্রবণশীল পদার্থ লালার সহিত মিশিয়া স্বাদ-নার্ভকে উদ্দীপিত করে। আবার গ্যাসীয় পদার্থ গন্ধহীন হইয়াও নাসিকা-গহ্বরের হাইড্রোজেন-এর সহিত রাসায়নিক ভাবে মিশিয়া ঘ্রাণ-নার্ভকে উদ্দীপিত করে। এই রাসায়নিক ক্রিয়ার স্বভাব কি তাহা সঠিকভাবে নিরূপিত হয় নাই। কিন্তু ইহা ঠিক যে ঘ্রাণ-সংবেদনের তারতম্য হয় উহার উদ্দীপক পদার্থের রাসায়নিক উপাদানের গঠন অনুসারে।

৪। **স্পর্শ-সংবেদন** (Cutaneous Sensation)

স্পর্শ-সংবেদনের **ইন্দ্রিয়** চর্মের নিম্নে অবস্থিত বিভিন্ন প্রকারের অন্তর্মুখ বা সংবেদীয় নার্ভ এবং ইহার **উদ্দীপক** তাপ, শৈত্য, চর্মের আকর্ষণ-বিকর্ষণ এবং চর্মের আঘাত বা আঘাতের ভয়।

চর্মের সকল অংশই সমানভাবে স্পর্শসংবেদনশীল নয়। পক্ষান্তরে চর্মকে **বিভিন্ন এলাকা বা অঞ্চলে** (zones) ভাগ করা হইয়াছে বিভিন্ন প্রকারের সংবেদনশীলতা অনুসারে। তীক্ষ্ণাগ্র উদ্দীপক (punctate stimuli) সাহায্যে পরীক্ষা ও প্রয়োগের ফলে দেখা গিয়াছে যে চর্মে **চার শ্রেণীর বিন্দু** (spots) পাওয়া যায়—যথা **তাপ, শৈত্য, চাপ ও ব্যথা-বিন্দু**। তাপ, শৈত্য, চাপ ও ব্যথা-বিন্দুগুলির উদ্দীপনায় চার প্রকার স্পর্শ-সংবেদন উৎপন্ন হয়, যথা তাপ (heat), শৈত্য (cold), চাপ (pressure) এবং ব্যথা (pain) সংবেদন।

তাপ ও শৈত্য-সংবেদন (Heat and Cold Sensation)

তাপ ও শৈত্য-সংবেদনকে মিলিতভাবে তাপ (Heat Temperature) সংবেদন বলা হয়, কারণ ইহারা তাপ বা টেমপারেচার্-এর অধিক বা অল্প পরিমাণের উপর নির্ভর করে। তাপ উদ্দীপক একতরফা অথবা নিরপেক্ষভাবে তাপ-সংবেদন উৎপন্ন

করে না। কি পরিমাণের তাপ তাপ-সংবেদন উৎপন্ন করিবে, তাহা আংশিকভাবে নির্ভর করে **চর্মের তাপের উপর** (body temperature), অথবা কোন্ মাত্রার তাপের সহিত চর্ম প্রতিযোজিত হইয়া আছে, তাহার উপর।

সাধারণতঃ ১২° হইতে ১৫° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড্ তাপ শৈত্য-সংবেদনের এবং ৩৭° হইতে ৪০° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড্ তাপ-সংবেদনের নিম্নসীমা। সুস্থ চর্মের তাপ সাধারণতঃ ৩৫° সেন্টিগ্রেড্ হইয়া থাকে এবং জ্বরাক্রান্ত ব্যক্তির দেহে তাপ-সংবেদন উৎপন্ন করিতে হইলে, তাপ-উদ্দীপকের মাত্রা বেশী হওয়া চাই। আবার শীতল দেহতাপবিশিষ্ট ব্যক্তির দেহে তাপ-সংবেদন উৎপন্ন করিতে হইলে, তাপ-উদ্দীপকের মাত্রা অপেক্ষাকৃত কম হইলেও চলে।

তাপ ও শৈত্য-সংবেদনের প্রত্যেকটি আবার **দুই প্রকারের** হইতে পারে—যথা প্রথমটি তাপ (Heat) ও উষ্ণতা (Warmth) এবং দ্বিতীয়টি শৈত্য (Cold) ও শীতলতা (Coolness)।

শৈত্য-বিন্দু (cold spots) দেহের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন রকমে ছড়াইয়া থাকে। ইহারা অনিয়মিত ভাবে শ্রেণীবদ্ধ হয় এবং কখনও গুচ্ছাকারে, আবার কখনও বা বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করে। পেরেকের অথবা পেনসিলের অগ্রভাগ দিয়া চর্মে অনুসন্ধান করিলে, উহাতে শৈত্য-বিন্দুগুলি বাহির করা যায়। ইহারা প্রধানতঃ **কপালেই অধিক সংখ্যায়** বিরাজ করে। শৈত্য-সংবেদনের **ইন্দ্রিয়** হইল ভন্ ক্রজ্ আবিষ্কৃত প্রান্তীয় বাল্বগুলি।

শৈত্য-বিন্দুর তুলনায় **তাপ-বিন্দুর** (heat spot) **সংখ্যা কম**। চর্মের প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে তাপ-বিন্দু থাকে গড়ে দুইটি করিয়া, কিন্তু শৈত্য-বিন্দু থাকে গড়ে তেরোটি করিয়া। শৈত্য-বিন্দুর মত তাপ-বিন্দুও দেহের সকল অংশে পরিব্যাপ্ত। কিন্তু **গণ্ডদেশেই তাপ-বিন্দু থাকে বেশী সংখ্যায়।** শৈত্য-বিন্দুর তুলনায় তাপ-বিন্দু নিরূপণ করা অপেক্ষাকৃত কঠিন। কারণ, ইহাতে তাপ-উদ্দীপক, যেমন ৩৭° সেন্টিগ্রেড্ অথবা এতদপেক্ষা অধিক তপ্ত মেটাল সিলিণ্ডার, প্রয়োগ করিবার অব্যবহিত পরেই উহা ঠাণ্ডা হইয়া যায়। তাহা ছাড়া, শৈত্য-সংবেদন অপেক্ষা তাপ-সংবেদন নিস্তেজ এবং কম প্রবল।

তাপ-সংবেদনের **ইন্দ্রিয়** রাফিনি আবিষ্কৃত প্রান্তীয় যন্ত্র অথবা কর্পাস্‌ল্‌স্ বা রক্তকণিকাগুলি। ইহারা শৈত্য-সংবেদনের ইন্দ্রিয় ক্রজ্-এর প্রান্তীয় বাল্বগুলির

তুলনায় চর্মের গভীরতর তলদেশে অবস্থিত। এই কারণে ইহাদের প্রতিক্রিয়াকাল শৈত্য-সংবেদন অপেক্ষা অধিক।

তাপ-সংবেদনের পর্যাপ্ত (adequate) উদ্দীপক কম পক্ষে ৩৭° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড্ তাপ। আবার শৈত্য-সংবেদনের পর্যাপ্ত উদ্দীপক কম পক্ষে ১২° সেন্টিগ্রেড্ তাপ। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অ-পর্যাপ্ত (inadequate) উদ্দীপক দ্বারাও শৈত্য-বিন্দু উদ্দীপিত হইতে পারে। যেমন চর্মের তাপ ও শৈত্য-বিন্দু অনুসন্ধান করিতে গিয়া দেখা যায় যে কোনো কোনো শৈত্য-বিন্দু ৪৩° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড্ হইতে ৫০° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড্ উদ্দীপকের সংস্পর্শে তাপ-সংবেদন উৎপন্ন না করিয়া শৈত্য-সংবেদন উৎপন্ন করে। এই তাপ উদ্দীপক তাপ-সংবেদনের পর্যাপ্ত, কিন্তু শৈত্য-সংবেদনের অ-পর্যাপ্ত উদ্দীপক। এইরূপ অ-পর্যাপ্ত উদ্দীপক-প্রসূত শৈত্য-সংবেদনকে, অর্থাৎ কোনো শৈত্য-বিন্দুকে ৪৩° সেন্টিগ্রেড্ তাপ-উদ্দীপকের সাহায্যে উদ্দীপিত করিবার ফলে তাপ-সংবেদনের পরিবর্তে উৎপন্ন শৈত্য-সংবেদনকে, উড্ওয়ার্থ বলিয়াছেন **আপাত-বিরুদ্ধ শৈত্য-সংবেদন** (Paradoxical cold sensation)।

আপাত-বিরুদ্ধ শৈত্য-সংবেদনের মত **আপাত-বিরুদ্ধ তাপ-সংবেদনও** (paradoxical warmth sensation) কদাচিৎ ঘটিয়া থাকে। দেহতাপ অপেক্ষা কম তাপ-উদ্দীপকের সংস্পর্শে স্বভাবতঃ শৈত্য-সংবেদন ঘটা উচিত। কিন্তু এই উদ্দীপক যদি তাপবিন্দুকে স্পর্শ করে, তাহা হইলে কখনও কখনও উষ্ণতা সংবেদন উৎপন্ন হয়। এইরূপ আপাত-বিরুদ্ধ উষ্ণতা সংবেদনকে বলা যাইতে পারে প্যারা-ডক্সিক্যাল ওয়ার্ম্থ্ সেনসেশন্।

চাপ-সংবেদন (Pressure Sensation)

চাপ-সংবেদনের **ইন্দ্রিয়** হইল মিস্নার এবং প্যাসিনি-এর কর্পাস্‌ল্স্ বা রক্ত-কণিকা এবং চর্মরোমের মূলে অবস্থিত নার্ভ-প্রান্ত অথবা উহাতে অবস্থিত সংগ্রাহক কোষ। চাপ-সংবেদনের **পর্যাপ্ত উদ্দীপক** হইল চর্মের উপরিভাগকে ঠেলা বা ধাক্কা দেওয়া অথবা টানা বা আকর্ষণ এবং বিকর্ষণ করা। কোনো বস্তু যান্ত্রিকভাবে (mechanically) চর্মকে উদ্দীপিত করিলে অথবা চর্মরোম স্পর্শ করিলে, চাপ-সংবেদন উৎপন্ন হয়। দেহের সর্বত্র, বিশেষ করিয়া **অঙ্গুলির অগ্রভাগে,** চাপ-বিন্দু অধিক সংখ্যায় অবস্থান করে। জে.বি. ওয়াট্সন্ বলেন যে চর্মের প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে

নীচের দিকে ৭টি এবং উপরের দিকে ৩০০টি পর্যন্ত এবং গড়ে ২৫টি করিয়া চাপ-বিন্দু থাকে।

চাপ-সংবেদনের **অনুসন্ধানে** উষ্ট্রের অথবা ঘোড়ার রোম দ্বারা নির্মিত ব্রাস ব্যবহৃত হয়। চর্মের প্রত্যেক রোমমূলে, রোমহীন হাতের বা পায়ের পাতায়, বিশেষ করিয়া হাতের আঙুলের ডগায়, চাপ-বিন্দু পাওয়া যায়। অচ্ছোদপটলে (cornea) চাপ-বিন্দুর অভাব পরিলক্ষিত হয়। চাপ-সংবেদনে **প্রতিযোজন** উল্লেখযোগ্যভাবে দেখা যায়। যেমন, পরিধানের কাপড়-চোপড় বা পোশাক-পরিচ্ছদের চাপ অনুভূত হয় না, কারণ প্রতিযোজনের ফলে পরিহিত পোশাক-পরিচ্ছদের ওজন গা-সহা হইয়া যায় চশমা চোখে দিয়া চশমা খুঁজিয়া বেড়ানো অথবা জুতা পায়ে দিয়া জুতা খুঁজিয়া বেড়ানো চাপ প্রতিযোজনের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। চাপ-সংবেদনের **অনু-সংবেদনও** ঘটিয়া থাকে। সবর্ণ (পজিটিভ) অনুসংবেদনের উদাহরণ—যথা, ব্যবহৃত আংটি খুলিয়া ফেলিলেও বোধ হইতে থাকে যেন আংটিটি হাতেই রহিয়াছে। আবার **স্থান-নির্দেশ** (localisation) চাপ-সংবেদনের একটি বিশেষ লক্ষণ। ইহাকে দেশ-সংবেদন (Space Sense) বলা হইয়া থাকে। অধিকাংশ চাপবিন্দুরই এই নির্দেশ ক্ষমতা নির্ভুল হইয়া থাকে।

ব্যথা-সংবেদন (Pain Sensation)

ব্যথা-সংবেদনের সংগ্রাহক **ইন্দ্রিয়** চর্মের নানাস্থানে ছড়াইয়া রহিয়াছে। কতকগুলি মুক্ত নার্ভ-প্রান্তই ব্যথা-সংবেদনের সংগ্রাহক। আঙুলে খোঁচা বা ফোঁড় লাগিলে, আগুনে ছ্যাঁকা লাগিলে, অথবা পায়ের আঙুলে ঘষা লাগিলে, যে ব্যথা অনুভূত হয়, তাহার কারণ ঐ সংগ্রাহকগুলির উদ্দীপনা। চর্মের নীচে গভীর নার্ভ-সূত্রগুলিও ব্যথা-সংবেদনের আংশিক কারণ হইতে পারে। ব্যথা-সংবেদনের **উদ্দীপক** আঘাত বা আঘাতের আশঙ্কা (damage or threatened damage to skin) অথবা চর্মকে বিদ্ধ করা বা কাটা। অত্যধিক তাপ, শৈত্য বা চাপেও ব্যথা-সংবেদন উৎপন্ন হইতে পারে।

ব্যথা-বিন্দু (Pain Spots) চর্মের সর্বত্র অল্পাধিক সংখ্যায় পরিব্যাপ্ত। চর্মের প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে গড়ে ১০০ হইতে ২০০টি ব্যথা-বিন্দু আছে। সুতরাং অন্যান্য স্পর্শ-বিন্দুর—যেমন তাপ, শৈত্য এবং চাপ-বিন্দুর তুলনায় ব্যথা-বিন্দুর সংখ্যা সর্বাপেক্ষা বেশী। মুখ-গহ্বরে ব্যথা-বিন্দু নাই বলিলেই চলে। কিন্তু **ওষ্ঠে, দাঁতে এবং জিহ্বাগ্রে** ব্যথা-বিন্দু আছে। সর্বাপেক্ষা ব্যথা-সংবেদনশীল **অচ্ছোদপটল**। ইহাতে

ব্যথা-বিন্দুর অস্তিত্ব সর্বাধিক। ব্যথা-বিন্দুগুলির **অনুসন্ধানে** চর্ম কামাইয়া লইতে হয়, এবং সাবানজল দিয়া চর্মকে নরম করিয়া লইতে হয়। তারপর ঘোড়ার রোম (**horse-hair**) সূক্ষ্মাগ্র করিয়া চর্মের বিভিন্ন অংশে লাগাইলেই ব্যথা-বিন্দু বাহির করা যায়।

ব্যথা-সংবেদনের **প্রতিযোজন** ঘটে বলিয়া মনে হয় না। ব্যথা-বিন্দুকে পুনঃপুনঃ উদ্দীপিত করিলে, ব্যথা 'গ-সহা' হয় না, কিন্তু পুনঃপুনঃ ব্যথা-সংবেদনই উৎপন্ন হইতে থাকে এবং ঐ ব্যথা-বিন্দুর চারিপাশ আহত ও উত্তেজিত অনুভূত হয়। ব্যথার **অনু-সংবেদন** দীর্ঘস্থায়ী এবং সকল ব্যথা-সংবেদনই দুঃখকর।

আবার ব্যথা-সংবেদনের **অন্তর্দর্শনে** উহার তিনটি অবস্থা বা স্তর পাওয়া যায়। প্রথমে ব্যথা-সংবেদন অনুভূত হয় স্পষ্ট (bright) এবং চুলকানো (itching) সংবেদনের আকারে। মধ্যবর্তী অবস্থায় ব্যথা-সংবেদন দেখা দেয় কণ্টকিত শিহরণের (prickly thrill) আকারে এবং শেষ অবস্থায় ইহা অনুভূত হয় বিদ্ধ হইবার ব্যথার (punctiform pain) আকারে।

রোম-বিহীন ত্বকের উপরিভাগকে মৃদু ঘর্ষণ (brushing) করিলে **সুড়সুড়ি** সংবেদন (tickling) উৎপন্ন হয়। উপত্বক (epidermis) এবং নার্ভপ্রান্ত উদ্দীপিত হইলেই এই সংবেদন ঘটে। সুড়সুড়ি-সংবেদন মৌলিক সংবেদন নয়, কিন্তু কয়েকটি সংবেদনের সমষ্টি। ইহার মধ্যে হাল্কা চাপ (light pressure) সংবেদন, তাপ-সংবেদন, যেমন উষ্ণতার শিহরণ বা শৈত্যের মৃদু কম্পন, রক্তসঞ্চালনের পরিবর্তন-জনিত সংবেদন, পেশীয় চাপ-সংবেদন উল্লেখযোগ্য।

৫। পেশী-সংবেদন (Muscular Sensation)

পেশী-সংবেদন কোন্ শ্রেণীর সংবেদন ?

পেশী-সংবেদনকে **কেহ কেহ যান্ত্রিক-সংবেদনের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন,** কারণ ইহাদের সাদৃশ্য এই যে দুইটি সংবেদনেই উদ্দীপক আভ্যন্তরীণ দেহের কোনো অংশকে উদ্দীপিত করে এবং কোনটিতেই সংবেদন কোনো নির্দিষ্ট ইন্দ্রিয়ের উদ্দীপনার ফলে উৎপন্ন হয় না। কিন্তু পেশী-সংবেদনকে যান্ত্রিক-সংবেদনের অন্তর্ভুক্ত করা সমীচীন নয়, কারণ এই সাধারণ সাদৃশ্য সত্ত্বেও উহাদের **পার্থক্যই অধিক গুরুত্বপূর্ণ।** পেশী-সংবেদন বাহ্য জগতের জ্ঞানলাভে বিশেষ সহায়তা করে, কিন্তু যান্ত্রিক-সংবেদন ঐরূপ করে না।

উপরোক্ত কারণে **স্টাউট** প্রভৃতি মনোবিদ্ পেশী-সংবেদনকে একটি বিশেষ সংবেদনের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া মনে করেন। এইরূপ অভিমত গ্রহণ করিলেও, পেশী-সংবেদন কোন্ সংবেদনের শ্রেণীভুক্ত, স্টাউট্ তাহার উল্লেখ করেন নাই। **টিশ্নার** প্রভৃতি মনোবিদ্গণ পেশী-সংবেদনকে চেষ্টা-সংবেদন (kinaesthetic sensation) শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। ইহা সন্ধি-সংবেদন এবং বন্ধনী-সংবেদনের (articular sensation) সমগোত্রীয়, অর্থাৎ এই দুইটির মত চেষ্টা-বেদন শ্রেণীর সংবেদনের অন্তর্ভুক্ত।

পেশী-সংবেদন **নিম্নপ্রকারে পাওয়া যাইতে পারে**। বাহুর এবং তন্তুর (tissue) উপরকার চর্ম কোকেইন ইন্জেক্শন্ অথবা ইথর সাহায্যে অসাড় করিয়া দেওয়া হয়, যাহাতে চর্মের কণ্ডরার এবং সন্ধির সংবেদন অপসারিত হয়। এইবার অসাড় বাহুটিকে একটি বিশ্রাম স্থানের (Support) উপর রাখিয়া উহার পেশীর উপর চাপ দেওয়া হয়। চাপের মাত্রা বাড়াইবার ফলে পেশী সংবেদনের পরিবর্তন অনুভূত হয়।

উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় প্রথমে একটি নিস্তেজ (dull) এবং বিস্তৃত (diffuse) সংবেদন ঘটে। উদ্দীপকের, অর্থাৎ চাপের, মাত্রাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহা একটি টান-সংবেদনের (Sensation of strain) মত অনুভূত হয়। কখনও কখনও মনে হয়, যেন পেশীতে একটি শক্ত এবং নিশ্চল পিণ্ড রহিয়াছে, আবার কখনও বা মনে হয়, যেন পেশীতন্তুগুলির একটি আর একটির সহিত ঘর্ষণ করা অথবা জড়াইয়া ফেলা হইতেছে। উদ্দীপিত অঙ্গটিকে ক্লান্ত বলিয়া মনে হয় এবং শেষ পর্যন্ত টান-সংবেদনটি আঘাত বা ব্যথা-সংবেদনে পরিণত হইয়া নিস্তেজ ও বিস্তৃত বেদনার আকার ধারণ করে।

পেশী-সংবেদনের **ইন্দ্রিয়** হইল ফেসিয়্যাল রক্তকণিকা (facial corpuscles) এবং পেশীদণ্ড (spindles) এবং **উদ্দীপক** চাপ। উদ্দীপনার ফলে রক্তকণিকাগুলি সম্ভবতঃ একপ্রকার চাপ-সংবেদন উৎপন্ন করে। উপরোক্ত নিস্তেজ ও বিস্তৃত সংবেদনটিকে উহাদেরই কাজ বলা যাইতে পারে। টান, ব্যথা ও ক্লান্তি, যাহা বেদনার আকার ধারণ করে, হয়ত পেশীদণ্ডগুলিরই কাজ।

নার্ভ-সংস্থান বোধ (Innervation Sense)

পেশী-সংবেদনের সহিত সন্ধি এবং বন্ধনী সংবেদন প্রায়ই মিশ্রিত থাকে। যাহাকে

নার্ভ-সংস্থান বোধ বলা হয়, তাহা আসলে পেশীর কার্য নয়, কিন্তু উপরোক্ত দুইটি সহকারী সংবেদনের কার্য।

কোনো গুরুভার তুলিবার সময় যেন একটি **শক্তি প্রয়োগ করিবার** (putting forth of energy) অনুভূতি জন্মে। ইহাকেই নার্ভ-সংস্থান বোধ বা ইনার্ভেশন্ সেন্স্ বলা হইয়াছে। এই ইনার্ভেসন্ সেন্স্ সম্বন্ধে অনেক মনোবিদ্ বিভিন্ন মত পোষণ করিয়াছেন। **হবুণ্ড্** প্রভৃতি মনোবিদ্ এই শক্তি প্রয়োগের বোধটির কারণ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে শক্তি প্রয়োগ করিবার ফলে মস্তিষ্কের চেষ্টীয় কেন্দ্র (motor area) হইতে নার্ভ-প্রবাহ উপচাইয়া পড়িয়া, উহার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত পেশীতে প্রবাহিত হওয়ার ফলেই, এই শক্তি বা চেষ্টা প্রয়োগের বোধ জন্মে।

কিন্তু **ডঃ কুশিং** (Dr. Cushing) পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে মস্তিষ্কের চেষ্টীয় কেন্দ্রকে মৃদু তড়িৎপ্রবাহ (mild electric current) দিয়া উদ্দীপিত করিলেই অঙ্গ-সঞ্চালন ঘটে, কিন্তু এই সঞ্চালনে কোনো শক্তি বা চেষ্টা-প্রয়োগ বোধের উৎপত্তি হয় না। **জেম্‌স্** প্রভৃতি মনোবিদ্‌গণের মতে এই বোধটিকে চেষ্টীয় সংবেদন এবং কল্পনার দ্বারাই ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে এবং ইহাকে স্বতন্ত্র সংবেদন বলিয়া স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই। **স্টাউট্ এবং ম্যাক্‌ডুগ্যাল** প্রভৃতির মতে শক্তি বা চেষ্টা-প্রয়োগের বোধটি কোনো সংবেদন নয়। আসলে ইহা পেশী-সংবেদনের সহিত সংশ্লিষ্ট **ইচ্ছামূলক** শক্তি।

উপসংহারে বলা যায় যে পেশী সংবেদন সক্রিয় নয়, কিন্তু নিষ্ক্রিয়। সক্রিয়তা বোধ এই সংবেদনের নিজস্ব ধর্ম নয়, কিন্তু ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংবেদনের, যেমন সন্ধি ও বন্ধনী সংবেদনের ধর্ম। সুতরাং নার্ভ-সংস্থান বোধ কোন ইচ্ছামূলক শক্তি নয়। আধুনিক প্রয়োগ-মনোবিদ্যার সিদ্ধান্তও এইরূপ।

৭। সন্ধি-সংবেদন (Tendinous Sensation)

একটি পেশীর সহিত আর একটি পেশীর অথবা অস্থির সংযোজক সূত্রকে (connective tissue) টেন্‌ডন্ বা সন্ধি বলে। সন্ধিতে অবস্থিত সংগ্রাহক যন্ত্রের উদ্দীপনার ফলে যে সংবেদন হয়, তাহাকে বলে **সন্ধি-সংবেদন** (টেন্‌ডিনাস্ সেন্‌সেশন্)। এক পায়ে ভর করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিলে, অথবা হাত প্রসারিত করিয়া সেই হাতে একটি ভার ধারণ করিলে, যথাক্রমে পায়ের এবং হাতের পেশীদ্বয়ে অথবা পেশীর সহিত অস্থির সংযোজক সন্ধিতে ক্লান্তি উৎপন্ন হইয়া একপ্রকার চাপ-কষ্ট (strain) সংবেদন সৃষ্টি করে। এই সংবেদনের নাম সন্ধি-সংবেদন।

৮। বন্ধনী-সংবেদন (Articular Sensation)

কুস্তি করা, ঠেলা দেওয়া, টানাটানি করা, ভার উত্তোলন করা প্রভৃতি সক্রিয় চেষ্টায় যে সন্ধি-সংবেদন হয়, তাহাকে বলা যায় চেষ্টা বা পরিশ্রম। **গলগি** (Golgi) **আবিষ্কৃত পেশী-দণ্ডগুলিই** (spindles) **সম্ভবতঃ সন্ধি-সংবেদনের ইন্দ্রিয়।** উদ্দীপক প্রবল হইলে, পেশীর টানিয়া-ধরা সংবেদনের মত এই সংবেদনও একঘেয়ে (dull) ব্যথায় পরিণত হইতে পারে।

হাতের আঙ্গুল ছড়াইয়া অথবা চক্ষু বন্ধ করিয়া হাতের কব্জি (wrist) আস্তে আস্তে সামনের ও পিছনের দিকে নাড়াইলে যে সংবেদন হয়, তাহাকে **বন্ধনী-সংবেদন** বলে। নানাপ্রকার চর্ম-সংবেদন যেমন হাতের পাতায় শির্ শির্ বা ঠাণ্ডা বোধ, কখনও অঙ্গুলি-সন্ধির অস্থিতে কখনও বা তর্জনীর সম্মুখ-ভাগে অথবা অঙ্গুলির পার্শ্বে বিস্তৃত চাপ-বোধ, এই সংবেদনের লক্ষণ।

৯। স্পর্শেন্দ্রিয়ের গঠন (Structure of the tactual organ)

চর্মকেই স্পর্শেন্দ্রিয় বলা হয়। চর্মের **দুইটি স্তর**। প্রথমটি **উপত্বক্** (Epidermis) এবং দ্বিতীয়টি **অধস্ত্বক** (Dermis, cutis, true skin)। উপত্বকের আবার দুইটি স্তর। উপরের স্তরটি কঠিন আবরণযুক্ত। নীচের স্তরে কোষাণু অবস্থিত।

ত্বক ঘন (connective) ও নমনীয় (elastic) তন্তুতে (tissue) তৈয়ারী। ইহাতে রহিয়াছে অসংখ্য সূক্ষ্ম ধমনী ও শিরার জাল। তাহা ছাড়া, বহু চুলের গোড়া (hair-roots) ত্বকে অবস্থিত।

১০। চার শ্রেণীর ত্বক সংবেদন—চার প্রকার সংগ্রাহক যন্ত্র

ত্বকের উদ্দীপনা হইতে চার শ্রেণীর সংবেদন উৎপন্ন হয়। যথা **চাপ** (Pressure, Touch), **ব্যথা** (Pain), **শৈত্য** (Cold) এবং **তাপ** (Heat, Warmth)। আবার প্রত্যেকটি শ্রেণীর সংবেদন উৎপন্ন হয় ত্বকে অবস্থিত বিভিন্ন সংগ্রাহক যন্ত্রের উদ্দীপনার ফলে।

ত্বকের উদ্দীপনার ফলে উৎপন্ন এই চার শ্রেণীর সংবেদনকে একত্রভাবে **স্পর্শ সংবেদনও** বলা হয়। সাধারণভাবে বলা যায় যে স্পর্শ সংবেদনের ইন্দ্রিয় যন্ত্রগুলি ত্বকের নিম্নে অবস্থিত। যথার্থভাবে বলিতে গেলে, শুধু চাপ-সংবেদনই স্পর্শ-সংবেদন।

চাপ-সংবেদনের **ইন্দ্রিয়যন্ত্রগুলি** হইল মিস্‌নার এবং প্যাসিনি আবিষ্কৃত নার্ভ-প্রান্ত। ইহাদিগকে **মিস্‌নার এবং প্যাসিনি-এর কর্পাস্‌লস** (Meissner and

Pacini Corpuscles) বলা হয়। এই কর্পাস্‌ল্‌স্‌ বা রক্তকণিকাগুলি এবং চর্মরোমের মূলে (hair-roots) অবস্থিত নার্ভপ্রান্তসকল (nerve-endings) অথবা উহাতে অবস্থিত সংগ্রাহক কোষগুলিই চাপ-সংবেদনের ইন্দ্রিয়যন্ত্র।

দেহের সর্বত্র, বিশেষ করিয়া অঙ্গুলির অগ্রভাগে চাপবিন্দু (Pressure spots) অধিক সংখ্যায় অবস্থান করে। জে. বি. ওয়াট্‌শন্‌ বলেন যে চর্মের প্রতি বর্গ সেন্টি-মিটারে নীচের দিকে সাতটি এবং উপর দিকে তিনশতটি পর্যন্ত, গড়ে পঁচিশটি করিয়া চাপবিন্দু থাকে।

প্যাসিনিয়ান্‌ কর্পাস্‌ল্‌গুলি চর্ম, টেণ্ডন্‌, ফ্যাসিয়া, ফুস্‌ফুস্‌ ও ধমনীর গাত্রে ছড়াইয়া আছে। ইহারা ডিম্বাকৃতি গ্র্যানুলার বাল্‌ব্‌। ইহাদের মধ্যস্থলে থাকে একটি নার্ভসূত্র এবং উহাকে ঘিরিয়া থাকে ক্যাপ্‌সুল। যদিও অঙ্গুলির অগ্রভাগেই ইহারা অধিক সংখ্যায় বর্তমান, কিন্তু ইণ্টার-ওসিয়াস্‌ পর্দায়, পেশীতে, মেসেণ্টারি, মিসো, কোলন্‌ প্রভৃতি স্থানেও ইহারা থাকে। তাহা ছাড়া, চর্মের প্যাপিলিতে এবং জিহ্বার অগ্রভাগেও এই কোষাণু আছে। এই কোষাণু পৃষ্ঠে খুব কম থাকে।

ব্যথা সংবেদনের ইন্দ্রিয়যন্ত্র

ব্যথা সংবেদনের সংগ্রাহক ইন্দ্রিয় চর্মের নানা অংশে ছড়াইয়া আছে। কতকগুলি **মুক্ত প্রান্তীয়-যন্ত্র** (free nerve-endings) এই সংবেদনের সংগ্রাহক। তাহা ছাড়া, ত্বকের নীচে অবস্থিত গভীর স্নায়ুসূত্রগুলিও হয়ত ব্যথা সংবেদনের আংশিক ইন্দ্রিয়যন্ত্র। ব্যথা সংবেদনের মুক্ত নার্ভপ্রান্তগুলি চর্মের বহিঃস্তর বা এপিডার্মিসে চালিত হইয়া বহু শাখায় বিভক্ত হইয়া পড়ে। এই শাখাগুলি এপিডার্মিস্‌-এর কোষে (cells) আসিয়া শেষ হয়, আবার কখনও বা উহাদের ভিতরে প্রবিষ্ট হয়।

ব্যথাবিন্দু (Pain spots) চর্মের সর্বত্র অল্পাধিক সংখ্যায় রহিয়াছে। চর্মের প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে গড়ে একশত হইতে দুইশতটি ব্যথাবিন্দু বর্তমান। অন্যান্য স্পর্শ-বিন্দুর—যেমন চাপ, শৈত্য, তাপ—তুলনায় ব্যথাবিন্দুর সংখ্যা সর্বাপেক্ষা বেশী। মুখগহ্বরে ব্যথাবিন্দু নাই বলিলেই চলে, অবশ্য ওষ্ঠে, দাঁতে এবং জিহ্বাগ্রে আছে। সর্বাপেক্ষা ব্যথাকাতর অচ্ছোদপটল (cornea)।

শৈত্য সংবেদনের ইন্দ্রিয়যন্ত্র

শৈত্য সংবেদনের সংগ্রাহক ইন্দ্রিয়যন্ত্র হইল **ভন্‌ ক্রজ** (Von Krause) আবিষ্কৃত **প্রান্তীয় বাল্ব্‌** (end-bulbs)। **শৈত্যবিন্দু** (cold-spots) দেহের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন রকমে ছড়াইয়া থাকে। ইহারা অনিয়মিতভাবে শ্রেণীবদ্ধ, কখনও

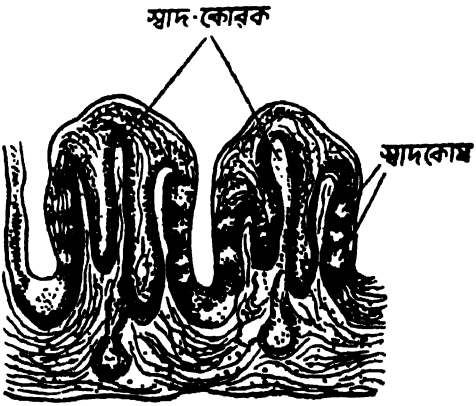
গুচ্ছ আকারে, কখনও বা বিচ্ছিন্নভাবে দেহের সর্বত্র থাকিলেও, কপালেই ইহারা অধিক সংখ্যায় থাকে। দেহের প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে শৈত্যবিন্দু থাকে গড়ে তেরোটি করিয়া।

তাপ সংবেদনের ইন্দ্রিয়যন্ত্র

তাপ সংবেদনের ইন্দ্রিয়যন্ত্র **রাফিনি** (Ruffini) আবিষ্কৃত **প্রান্তীয়-যন্ত্র** (end-organ) অথবা **রক্তকণিকা** (corpuscles)। ইহারা শৈত্য সংবেদনের ইন্দ্রিয় ক্রজ্-এর প্রান্তীয় বাল্ব্‌গুলির তুলনায় চর্মের গভীরতর তলদেশে অবস্থিত। এই কারণে ইহাদের প্রতিক্রিয়াকাল শৈত্য সংবেদন অপেক্ষা অধিক। **তাপবিন্দু** (heat spots) শৈত্যবিন্দুর তুলনায় কমসংখ্যক। চর্মের প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে তাপবিন্দু থাকে দুইটি করিয়া। শৈত্যবিন্দুর মত তাপবিন্দুও দেহের সকল অংশে ছড়াইয়া থাকে।

১১। স্বাদেন্দ্রিয়যন্ত্র (Gustatory or Taste Sense-organ)

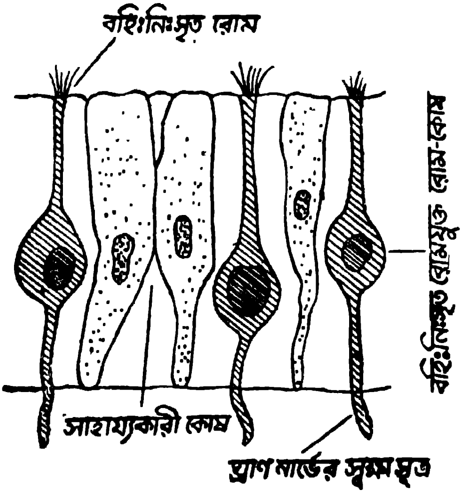
স্বাদ-সংবেদনের ইন্দ্রিয় জিহ্বার উপরিস্থিত স্বাদ-কোরক (taste-buds)। জিহ্বার উপর আঁচিলের মত এই কোরকগুলি (Papillae) গুচ্ছে গুচ্ছে অবস্থান



২৭নং চিত্র—স্বাদ-কোরক ও কোষ

করে। জিহ্বার পশ্চাতে অবস্থিত স্বাদ-কোরক প্যাপিলিগুলিকে বলে সার্কামভ্যালেট্ প্যাপিলি (Circumvallate Papillae) এবং উহার আশেপাশে অবস্থিত প্যাপিলি

বা স্বাদ-কোরকগুলিকে ফাঙ্গিফর্ম প্যাপিলি (Fungiform Papillae) বলে। এই কোরকগুলির ভিতরে স্বাদকোষ অবস্থিত। ইহাদের সন্নিহিত স্বাদ-নার্ভ (Gustatory



২৮নং চিত্র—ঘ্রাণ-কোষ

nerve) উত্তেজিত হইলে এবং ঐ উত্তেজনা মস্তিষ্কে পৌঁছিলেই, স্বাদ সংবেদন উৎপন্ন হয়। স্বাদেন্দ্রিয়ের কোরক এবং কোষ ২৭নং চিত্রে দ্রষ্টব্য।

১২। ঘ্রাণেন্দ্রিয়যন্ত্র (Olfactory or Smell Sense-organ)

ঘ্রাণ-সংবেদনের ইন্দ্রিয় স্থূলভাষায় নাসিকায় এবং আসলে নাসিকা-গহ্বরের পর্দা বা ঝিল্লীর (Nasal Membrane) উপরিভাগে অবস্থিত ঘ্রাণকোষগুলি। অল্‌ফ্যাক্টরি বাল্‌ব্‌ যে পর্দা বা ঝিল্লীর উপর অবস্থিত সেইটি মোটা এবং অনেকটা হলুদ। অল্‌ফ্যাক্টরি বাল্‌ব্‌ অথবা গন্ধকোষ প্রকৃত স্নায়ুকোষে তৈয়ারী। মস্তিষ্কের এক নম্বর নার্ভের নাম অল্‌ফ্যাক্টরি নার্ভ। অল্‌ফ্যাক্টরি নার্ভের একটি শাখার কাজ মস্তিষ্কে গন্ধ বহন করা এবং আর একটি শাখার কাজ সুড়সুড়ি সংবেদন (tickling sensation) সৃষ্টি করা।

২৮নং চিত্রে ঘ্রাণকোষ দেখানো হইয়াছে।

স্পর্শেন্দ্রিয়ের উপরোক্ত যন্ত্রগুলি ২৯নং চিত্রে দেখানো হইল।



২৯নং চিত্র—স্পর্শেন্দ্রিয়ের বিভিন্ন যন্ত্র অথবা চর্মস্থ সংবেদীয় নার্ভপ্রান্ত

১৩। পেশী-সংবেদনের ইন্দ্রিয়যন্ত্র (Muscular Sense-organ)

পেশী সংবেদনের ইন্দ্রিয় পেশীতে অবস্থিত ফেসিয়্যাল্ রক্তকণিকা (Facial corpuscles) এবং পেশী দণ্ড (Spindles)। রক্তকণিকাগুলি সম্ভবতঃ একপ্রকার চাপ-সংবেদন উৎপন্ন করে।

পেশীর তিনটি শ্রেণীভেদ পূর্বেই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। রেখাঙ্কিত, রেখাবিহীন এবং মিশ্রিত পেশী যথাক্রমে কি কি কাজ করে তাহাও পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। এই খণ্ডের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের ৭ম অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

পেশী সংবেদনের সহিত টৈন্‌ডিনাস্ (Tendinous) এবং আর্টিকুলার (Articular) সংবেদন প্রায়ই মিশ্রিত থাকে। একটি পেশীর সহিত আর একটি পেশীর অথবা অস্থির সংযোজক সূত্রকে (connective tissue) টেন্‌ডন্ (tendon) বলে।

আবার, সন্ধিবন্ধনীতে (Articular Ligaments) অবস্থিত প্রান্তাঙ্গ (end-organ) হইতে উৎপন্ন সংবেদনকে বলে আর্টিকুলার বা বন্ধনী সংবেদন।

ইহাতে চর্মতল-সংবেদন (subcutaneous sensation) অত্যন্ত ক্ষীণভাবে থাকে এবং চাপ-কষ্ট এবং-সংবেদন একেবারেই থাকে না। শুধু কব্জির সন্ধি-বন্ধনীতে একটি বিস্তৃত এবং জটিল সংবেদন হয়, যাহার গুণ চর্মের চাপসংবেদন হইতে পৃথক বলিয়া বোধ হয় না। এই সংবেদন প্রধানতঃ সন্ধিবন্ধনীতে (articular ligaments) অবস্থিত প্রান্তাঙ্গের উদ্দীপনা হইতে উৎপন্ন হয়।

১৪। দেহ-বেদিতা (Somaesthesis)

দেহ-বেদিতা বলিতে দেহের, বিশেষতঃ চর্মের, সংবেদনশীলতা বুঝায়। চর্মে, গভীরতর তন্তুতে এবং আভ্যন্তরীণ দেহ-যন্ত্রে (viscera) চাপ, ব্যথা, তাপ এবং শৈত্য সংবেদনগুলির মিলিত নাম **সোমেস্‌থেসিস্ বা দেহবেদিতা**।

দেহ-বেদিতা ইন্দ্রিয়গুলি (somaesthetic sense) তিন প্রকার কার্য করে। প্রথমতঃ, উহারা বাহ্যজগতের জ্ঞান আহরণে সাহায্য করে। দ্বিতীয়তঃ, দেহে ও দেহাভ্যন্তরে যে সকল অবস্থা ঘটে সেই সম্বন্ধে অনেক প্রয়োজনীয় জ্ঞান সংগ্রহ করিয়া নিজ (self) এবং দেহ প্রতিরূপ (body-image) সম্বন্ধে জ্ঞান লাভে সহায়তা করে। তৃতীয়তঃ, ইহারা অনেক নোদনা এবং উদ্দেশ্যের যোগসূত্ররূপে কাজ করে।

দেহ-বেদিতা অঞ্চল (somaesthetic area) মস্তিষ্কের মধ্য-চির (central fissure)-এর পশ্চাতে শিরকুন্তলাঞ্চলে (parietal lobe) অবস্থিত।

দেহ-বেদিতা বলিতে বুঝায় চর্মে, গভীরতর তন্তুতে এবং দেহাভ্যন্তরীণ-যন্ত্রে চাপ, ব্যথা, তাপ এবং শৈত্য সংবেদনগুলি। চর্মসংবেদন পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে।[১] দেহের আভ্যন্তরীণ সংবেদন ব্যাখ্যা করিলেই দেহ-বেদিতার ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ হইবে।

১৫। দেহাভ্যন্তরীণ অঙ্গ-সংবেদন
(Visceral Sensation)

দেহাভ্যন্তরীণ যন্ত্রের সংবেদনকে ভিসারাল সেন্‌সেশন্ বলে। দেহাভ্যন্তরীণ সংবেদনকে মোটের উপর তিনটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে যথা—(১) অস্থি, পেশী, ও কণ্ডরা বা সন্ধি সংবেদন; (২) পৌষ্টিক নালী বা মহাস্রোত-দেশীয় (alimentary canal) সংবেদন; এবং (৩) ফুসফুস, রক্তবাহ (blood vessel) এবং বস্তি-(bladder) দেশীয় সংবেদন।

---

১ বর্তমান পরিচ্ছেদের দশম অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

(১) অস্থি, পেশী ও সন্ধি-সংবেদন পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। অস্থিগুলি পেশীর সাহায্যে সঞ্চালিত এবং পেশীগুলি উহাদের সহিত স্নায়ু এবং কণ্ডরা (tendon) দ্বারা যুক্ত থাকে। সুতরাং অস্থির কোনো পৃথক সংবেদন ঘটে কিনা, তাহাতে সন্দেহ আছে।

(২) দেহ নিরেট নয়। পৌষ্টিক নালী ইহাকে বিদীর্ণ করিয়াছে। এই নালীর কাজ হইল খাদ্য গ্রহণ করা এবং খাদ্যের অপ্রয়োজনীয় অংশগুলি নিঃসারিত করা। এই নালীর উপরের অংশ হইতে তিন প্রকারের সংবেদন হয়—যথা, মুখগহ্বরের শেষ পশ্চাদংশ এবং কণ্ঠের উপরাংশ **তৃষ্ণা-সংবেদন**, মুখগহ্বর হইতে পাকস্থলী পর্যন্ত চালিত অংশ **বিবমিষা** (nausea) **অথবা অসুস্থতা** (sickness) সংবেদন এবং পাকস্থলী স্বয়ং **ক্ষুধা** সংবেদন উৎপন্ন করে। অন্ত্র (intestine) হইতে কোন নূতন সংবেদন উৎপন্ন হয় না।

(৩) ফুসফুস, রক্তবাহ এবং বস্তি প্রদেশ হইতে সম্ভবতঃ নূতন সংবেদন পাওয়া যায়। ফুসফুস হইতে **সতেজ** (bracing) **এবং রুদ্ধশ্বাস** (stuffy) সংবেদন জন্মে। আবার রক্তবাহ হইতে **সুড়সুড়ি** (tingling) **বা চুলকনা** (itching) এবং **বেধন** (pins and needles) সংবেদন উৎপন্ন হয়। তৃতীয়তঃ, ভয়ে প্রক্ষুব্ধ হইলে, সম্ভবতঃ বস্তিদেশ হইতে আভ্যন্তরীণ যন্ত্রগুলির **উত্তেজিত হওয়ার** (stirred up) **সংবেদন ঘটে**।

চেষ্টা বেদন (Kinaesthesis)

কাইনেস্‌থেসিস্ বলিতে পেশী, কণ্ডরা বা সন্ধি-সংবেদনগুলির সমষ্টি বুঝায়। এই সংবেদনগুলি গতি (movement) এবং অবস্থানের (position) দূরত্ব (distance) এবং দেহের সাম্যবোধ (sense of body equilibrium) প্রভৃতি সম্বন্ধে ঘটে।

১৬। বাহ্যেন্দ্রিয় (Exteroceptors), মধ্যেন্দ্রিয় (Interoceptors) এবং আভ্যন্তরীণ ইন্দ্রিয় (Proprioceptors)

শেরিংটন (Sherrington) উদ্দীপক সংগ্রাহক যন্ত্রগুলিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন।

(১) প্রথমটি দেহের উপরিভাগে অথবা উহার নিকটে অবস্থিত। এই সংগ্রাহক ইন্দ্রিয়গুলি বাহ্য পরিবেশের উদ্দীপক দ্বারা উদ্দীপিত হয়, যেমন চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, চর্ম প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সংগ্রাহক যন্ত্রগুলি।

(২) দ্বিতীয়টি দেহের অভ্যন্তরের উপরিভাগে অবস্থিত, যেমন মুখগহ্বর, পৌষ্টিক নালী এবং উহার সহিত সংস্পৃষ্ট উদ্দীপকের দ্বারা উদ্দীপিত হয়।

(৩) তৃতীয়টি দেহের কলায় (tissue) অবস্থিত এবং ইহার পরিবর্তিত অবস্থার দ্বারা উদ্দীপিত হইয়া থাকে।

উল্লিখিত তিন শ্রেণীর সংগ্রাহক ইন্দ্রিয়ের প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয়টিকে শেরিংটন বলিয়াছেন যথাক্রমে বাহ্যেন্দ্রিয়, মধ্যেন্দ্রিয় এবং আভ্যন্তরীণ ইন্দ্রিয়।

প্রপ্রায়োসেপ্টর্‌গুলির মধ্যে যেগুলি গতি-সংবেদন উৎপন্ন করে, প্রধানতঃ সেইগুলিই প্রায়োগিক মনোবিদ্‌কে আকৃষ্ট করে। এই গতি-সংবেদনগুলি সাধারণতঃ পেশীয়, চেষ্টীয় অথবা চেষ্টা-বেদনীয় সংবেদনে বিভক্ত। ব্যক্তির জ্ঞান ও নৈপুণ্য বিকাশে ইহারা বিশেষ সহায়ক। গতি-সংবেদনগুলির নানা শ্রেণীবিভাগ পূর্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তাহা ছাড়া, এক্স্‌টারোসেপ্টর্‌ অর্থাৎ বিশেষ সংবেদনের এবং ইণ্টারোসেপ্টর্‌ অর্থাৎ যান্ত্রিক সংবেদনের সংগ্রাহক ইন্দ্রিয় যথাস্থানে আলোচিত হইয়াছে।

১৭। যান্ত্রিক সংবেদন (Organic Sensation)

যে সকল সংবেদনের সংগ্রাহক যন্ত্র (receptor organs) দেহের অভ্যন্তরে অবস্থিত, উহাদিগের সমষ্টিকে যান্ত্রিক-সংবেদন বলে। যান্ত্রিক-সংবেদন ব্যাপক ও সঙ্কীর্ণ, এই দুই অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ব্যাপক অর্থে আভ্যন্তরীণ যন্ত্রের সকল সংবেদনই এমন কি চেষ্টা-বেদন (kinaesthetic) সংবেদন এবং পেশী-সংবেদনও যান্ত্রিক-সংবেদনের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু সঙ্কীর্ণ অর্থে **যে সকল আভ্যন্তরীণ যন্ত্রের সংবেদন দেহের পুষ্টি (nutrition) বা স্বাস্থ্যের নিয়ামক—যেমন পৌষ্টিক নালীর সংবেদন, তৃষ্ণা, ক্ষুধা, নিদ্রা, মাথাধরা, ক্লান্তি, বিবমিষা প্রভৃতি—উহাদের সমষ্টিই যান্ত্রিক সংবেদন**। সাধারণতঃ এই দ্বিতীয় অর্থেই যান্ত্রিক সংবেদন কথাটি গৃহীত হইয়া থাকে। কিন্তু গতিসংবেদন অথবা বিশেষ চেষ্টাবেদনগুলিকে যান্ত্রিক সংবেদন হইতে বাদ দিলেও, ইহারা উহার উপর প্রভাব বিস্তার করে।

যান্ত্রিক ও বিশেষ সংবেদনের সম্বন্ধ

(১) যান্ত্রিক সংবেদন বিশেষ **জটিল**, কারণ ইহার সহিত পেশীর, স্নায়ুর এবং সন্ধির সংবেদন ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকে। তাহা ছাড়া, যান্ত্রিক সংবেদনের সহিত

প্রায় সবগুলি বিশেষ সংবেদনই (special sensation) সংশ্লিষ্ট থাকে। যেমন, **ঘ্রাণ বা স্বাদ** বিবমিষা (nausea) সংবেদনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। আবার বিবমিষা খাদ্যের স্বাদ ও ঘ্রাণকে পরিবর্তিত করে, অথবা সমগ্র দেহে শিহরণ এবং তাপ, শৈত্য প্রভৃতি বিশেষ স্পর্শ সংবেদনের সৃষ্টি করিতে পারে। **শব্দ বা কণ্ঠস্বর** বিতৃষ্ণা বা দৈহিক অস্বস্তি জন্মাইতে পারে। শ্লেটের উপর পেন্সিল ঘষিলে যে তীক্ষ্ণ ও কর্কশ শব্দ হয় তাহা শুনিয়া দাঁতে দাঁত লাগিতে পারে। কোনো **দৃশ্য,** যেমন ময়লা আবর্জনা, বমি, আরশুলা, কেঁচো, প্রাণীর গলিত দেহ, বিবমিষা বা অন্য দৈহিক অস্বস্তি জন্মাইতে পারে। **স্পর্শ সংবেদন** যেমন চাপ, উত্তাপ, শৈত্য, ব্যথা প্রভৃতির সহিতও যান্ত্রিক সংবেদন ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। কর্কশ ভূমিতে বা ঘরের মেঝেতে হাত বুলাইলে সমস্ত শরীরে কণ্টকিত বোধ বা শিহরণ জাগিতে পারে।

যান্ত্রিক সংবেদনও বিশেষ সংবেদনগুলির উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। **ক্ষুধা বা রুচি** থাকিলে খাদ্যের স্বাদ ও গন্ধ অপেক্ষাকৃত ভাল লাগে, এমন কি শাকান্নও অমৃত বলিয়া মনে হয়। আবার **অক্ষুধায় বা অরুচিতে** উপাদেয় খাদ্যও বিস্বাদ লাগে।

(২) যান্ত্রিক সংবেদন **আভ্যন্তরীণ উদ্দীপক-প্রসূত** এবং বিশেষ সংবেদন **বাহ্য উদ্দীপক-প্রসূত,** দুই সংবেদনের এই উল্লিখিত ভেদটি গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ বাহ্য উদ্দীপকও যান্ত্রিক সংবেদন ঘটাইতে পারে। যেমন, কোন আঘাত বা ক্ষত হইতে উৎপন্ন ব্যথা সংবেদন বাহ্য উদ্দীপক দ্বারা উৎপন্ন হইলেও, যান্ত্রিক সংবেদন। সুতরাং যান্ত্রিক সংবেদনকে শুধু আভ্যন্তরীণ উদ্দীপক-প্রসূত (internally initiated sensation) সংবেদন রূপে ব্যাখ্যা করিলে চলিবে না।

(৩) বিশেষ সংবেদন হইতে যান্ত্রিক সংবেদনের পার্থক্য গভীর। যান্ত্রিক সংবেদন সেই সকল দৈহিক ক্রিয়া হইতে উদ্ভূত হয়, যেগুলি প্রাণীর পুষ্টি (nutrition) এবং বৃদ্ধিকে (growth) প্রভাবিত করে। উহার উদ্দীপক পাওয়া যায় রক্তসঞ্চালনের বা রক্তসরবরাহের বিভিন্ন অবস্থায়, খাদ্যের পরিপাকক্রিয়ায়, গ্রন্থির রসক্ষরণে, অক্সিজেন সরবরাহে অথবা শ্বাসকার্যে—এক কথায় সেই সকল দৈহিক ক্রিয়ায় যাহারা দেহতন্তুগুলিকে (nervous tissue) তাহাদের প্রধান ক্রিয়া-সম্পাদনে সহায়তা করে। অপর পক্ষে, বিশেষ সংবেদন উৎপন্ন হয় বাহ্য উদ্দীপকের সংস্পর্শে। ইহা মুখ্যভাবে প্রাণীর পুষ্টি বা বৃদ্ধির সহায়তা করে না।

(৪) যান্ত্রিক সংবেদনকে **দৈহিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যের পরিমাপক** যন্ত্র

(barometer) বলা যায়। এই সংবেদনগুলি স্বাভাবিক হইলে বুঝিতে হইবে যে প্রাণীর স্বাস্থ্যও স্বাভাবিক এবং উহাদের গোলযোগ বা বিশৃঙ্খলা হইলে বুঝিতে হইবে যে অসুস্থতা ঘটিয়াছে। তৃষ্ণা, ক্ষুধা, ক্লান্তি, নিদ্রা প্রভৃতি যান্ত্রিক সংবেদনের আধিক্য বা অল্পতা অসুস্থতার এবং উহাদের যথাযথ ক্রিয়া সুস্থতার সূচক। যান্ত্রিক সংবেদনগুলির স্বাভাবিক ক্রিয়াশীলতার ফলে সমগ্র দেহে যে **একতানতা বা সাম্যবোধ** হয় অধ্যাপক স্টাউট্ তাহার নাম দিয়াছেন **সমগ্র সংবেদন** (coenaesthesis), অথবা **সাধারণ সংবেদনশীলতা** (common sensibility)। ইহাকে **জীবনীশক্তিবোধও** (vital feeling) বলা যায়। একটি যান্ত্রিক সংবেদন বিশৃঙ্খল হইলেই এই সাধারণ বা সমগ্র সংবেদন ব্যাহত হয়। এই সমগ্র সংবেদনের মূলে রহিয়াছে যাবতীয় আভ্যন্তরীণ যন্ত্রগুলির সুশৃঙ্খল ক্রিয়া, যাহা প্রাণীর যান্ত্রিক সুস্থতার (organic welfare) নির্ণায়ক। এই সতেজ অথবা সুস্থসবল বোধ নষ্ট হইয়া যায়, যদি সামান্য একটি আভ্যন্তরীণ যন্ত্রও বিকল হইয়া পড়ে, যেমন, যদি হঠাৎ মাথা ধরে বা ঘুম পায়, বা পেট ব্যথা করে। জলাশয়ের নিস্তরঙ্গ জলরাশির উপর একটি ঢিল ছুঁড়িলেই যেমন উহা তরঙ্গায়িত এবং চঞ্চল হইয়া ওঠে, তেমন একটি যান্ত্রিক সংবেদন বিশৃঙ্খল হইলেই সাধারণ বোধ বা সমগ্র সংবেদন বিশৃঙ্খল হয়।

(৫) যান্ত্রিক সংবেদন, বিশেষ সংবেদনের তুলনায় **অস্পষ্ট**। কতকগুলি যান্ত্রিক সংবেদন এতই অস্পষ্ট যে উহাদের **স্থান নির্দেশ** (localisation) একেবারেই **অসম্ভব**। যেমন বিবমিষা বা বমি-বমি ভাব সমগ্র দেহে বিস্তৃত হয় এবং ঠিক করিয়া বলা যায় না এই সংবেদনটি দেহের কোন্ বিশেষ অংশে অনুভূত হয়। আবার কতকগুলি যান্ত্রিক সংবেদনের **অস্পষ্ট স্থান-নির্দেশ** সম্ভব। যেমন, পাকস্থলী, ফুস্ফুস্, যকৃৎ প্রভৃতির যান্ত্রিক সংবেদনের মোটামুটিভাবে স্থান নির্দেশ করা যায়। আরও কতকগুলি যান্ত্রিক সংবেদনের **স্পষ্ট স্থান-নির্দেশ** করা যায়। যেমন আঘাত বা ক্ষত হইতে যে যান্ত্রিক সংবেদন ঘটে, উহা আঘাত বা ক্ষতস্থানকে স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে।

(৬) যান্ত্রিক সংবেদনের আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য এই যে ইহা সর্বাপেক্ষা **আদিম সংবেদন** (primitive sensation)। ক্ষুদ্র কীট এবং পতঙ্গেরও এই সংবেদন আছে। (৭) আবার বাহ্য জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণের ক্ষমতা যান্ত্রিক সংবেদনের নাই বলিলেই চলে। ইহারা দেহের আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভে সহায়তা করে মাত্র। (৮) তাহা ছাড়া, যান্ত্রিক সংবেদন সহজ প্রবৃত্তি, ইচ্ছা, অনুভূতি

প্রভৃতি মানসক্রিয়ার ভিত্তি। সহজ প্রবৃত্তি এবং ইচ্ছার মূলে যে অস্বস্তি বোধ থাকে তাহা একপ্রকার যান্ত্রিক সংবেদন। (৯) আবার অনুভূতিতে যান্ত্রিক সংবেদনের স্থানও অনস্বীকার্য।

১৮। কয়েকটি যান্ত্রিক সংবেদন

ক্লান্তি, নিদ্রা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, বিবমিষা প্রভৃতি, যান্ত্রিক সংবেদনের উল্লেখযোগ্য প্রকারভেদ। এই সংবেদনগুলি এই খণ্ডের "প্রেষণা" শীর্ষক দশম পরিচ্ছেদে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

ক্লান্তি উৎপন্ন হয় পেশীর অবিশ্রাম ক্রিয়ার ফলে। ইহার সহিত জড়িত থাকে নানাবিধ যান্ত্রিক সংবেদন, যেমন সাধারণ অবসন্নতা বোধ, স্থানীয় চাপবেদন (strain, pain) প্রভৃতি।

নিদ্রায় বাহ্য জগতের সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন হয়। জীবদেহের বিপাকের (metabolism) দুইটি দিক, যথা উপচিতি (anabolism) এবং অপচিতি (katabolism)। উপচিতি এবং অপচিতির মধ্যে তাল (rhythm) রক্ষাই নিদ্রা এবং জাগরণের লক্ষ্য। জাগরণের কর্মব্যস্ততায় জীবদেহের যে ভাঙ্গন বা অপচিতি ঘটে, তাহার ক্ষতিপূরণ হয় নিদ্রায় বিশ্রাম হইতে উৎপন্ন গড়ন বা উপচিতির মধ্য দিয়া। এই কারণে জীবদেহের স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং বৃদ্ধির পক্ষে নিদ্রা একটি অপরিহার্য প্রয়োজন।

পুষ্টিনালীর সহিত সংশ্লিষ্ট সংবেদনগুলির মধ্যে **ক্ষুধা, তৃষ্ণা, বিবমিষা** এবং **অজীর্ণের ব্যথা** প্রধান। অবশ্য ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা আংশিকভাবে পাকস্থলী এবং গলবিল-এর (pharynx) অবস্থা হইতে উদ্ভূত। এই দুইটি যান্ত্রিক সংবেদনেই একপ্রকার দংশন বা কামড়ানো (gnawing) সংবেদন অনুভূত হয় এবং আহার্য ও পানীয় পাইলেই এই কষ্টকর অনুভূতি দূর হয়। গলদেশের শুষ্কতা **তৃষ্ণার** একটি প্রধান লক্ষণ।

ক্ষুধা দেহের কোন অভাব হইতেই উদ্ভূত, যদিও ক্ষুধাবোধ পাকস্থলীতে নির্দিষ্ট। প্রাথমিক অবস্থায় ক্ষুধায় ব্যথা অনুভূত হয় না, এবং ইহা শুধু খাদ্য অনুসন্ধানের আবেগরূপেই প্রকাশিত হয়। কিন্তু ক্ষুধা পরিতৃপ্ত না হইলে, পাকস্থলীতে বিশেষ কষ্ট এবং দেহযন্ত্রের অভাব-জনিত দুর্বলতা ও আচ্ছন্নতা অনুভূত হয়।

ক্ষুধার প্রধান ভিত্তি শুধু পাকস্থলীর অবস্থাই নয়, কারণ পাকস্থলী অপসারিত হইলেও কুকুরের ক্ষুধা বোধ থাকে। রাত্রিতে সুনিদ্রা হইলে দশ ঘণ্টা উপবাসে যে ক্ষুধা হয়, তাহা কর্মকোলাহলে থাকিয়া চার ঘণ্টা উপবাসজনিত ক্ষুধা অপেক্ষা কম

অনুভূত হয়। দেহকলা তন্তুর ক্ষয় ও পূরণের উপর এই পার্থক্য নির্ভর করে। ইন্‌জেক্‌শন করিয়া শিরায় পুষ্টিকর পদার্থ প্রবিষ্ট করিলে, পাকস্থলীতে খাদ্য না দিয়াই ক্ষুধার উপশম হয়। খাদ্য রক্তের সহিত মিশিবার পূর্বেই ক্ষুধা দূর হয় এবং তৃপ্তিবোধ জন্মে।

ক্ষুধার অনুরূপ তৃষ্ণাও দেহযন্ত্রের জলাভাব বোধ হইতে উদ্ভূত হয়। প্রথমে জিহ্বার ও গলদেশের শুষ্কতারূপে ইহার অনুভূতি ঘটে।

বিবমিষা অজীর্ণতার একটি প্রধান লক্ষণ। কখনও কখনও ইহা স্নায়বিক কারণেও উৎপন্ন হয়, যেমন সমুদ্রপীড়ার (sea sickness) ক্ষেত্রে। কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্রের জৈব ক্রিয়ার উপর প্রত্যক্ষ ক্রিয়ার ফলে বিবমিষা জন্মে।

অনুশীলনী (Exercise)

1. **Explain the psychology of taste and smell. Explain also the importance and number of taste and smell sensations.**
(Ans.—pp. 293-297)
স্বাদ এবং ঘ্রাণ সংবেদনের মনোবিদ্যাসম্মত ব্যাখ্যা কর। ইহাদের গুরুত্ব এবং সংখ্যা ও আলোচনা কর।

2. **What do you mean by "Chemical sense"? Why are taste and smell called so?** (Ans.—pp. 297-298)
রাসায়নিক সংবেদন কাহাকে বলে? স্বাদ এবং ঘ্রাণ সংবেদনকে রাসায়নিক বলা হয় কেন?

3. **Explain the different classes of cutaneous sensation with their sense-organs.** (Ans.—pp. 298-302)
বিভিন্ন স্পর্শ সংবেদনের প্রকার এবং ইন্দ্রিয় আলোচনা কর।

4. **Write short notes on (a) Paradoxical cold sensation, (b) the sensation of tickling, (c) touch spots.**
(Ans.—pp. 300 ; 302 ; 298-302)
সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর:—(ক) আপাতবিরুদ্ধ শৈত্য সংবেদন, (খ) সুড়সুড়ি সংবেদন, (গ) স্পর্শ-বিন্দু।

5. **Give an analysis of muscular sensation. Is there an "innervation sense"? Discuss.** (Ans.—pp. 302-304)
পেশী সংবেদনের বিশ্লেষণ কর। নার্ভ সংস্থান বোধ আছে কিনা আলোচনা কর।

6. **Write short notes on (a) Innervation sense, (b) Tendinous sensation, (c) Articular sensation, (d) Kinaesthesis (e) Somaesthesis, (f) Exteroceptors, Interoceptors and Proprioceptors.** **(Ans.—pp. 303-305 ; 310-312)**
   সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর :—(ক) নার্ভ-সংস্থান বোধ, (খ) সন্ধি সংবেদন, (গ) বন্ধনী সংবেদন, (ঘ) বাহ্যেন্দ্রিয়, মধ্যেন্দ্রিয় এবং আভ্যন্তরীণ ইন্দ্রিয়।
7. **Define organic sensation. Explain the character of organic sensation as distinguished from special sensation.**
   (Ans.—pp. 312-315)
   যান্ত্রিক সংবেদন কাহাকে বলে? ইহার প্রকৃতি ব্যাখ্যা কর। যান্ত্রিক সংবেদনের সহিত বিশেষ সংবেদনের পার্থক্য দেখাও।
8. **Explain the organic sensations of hunger, thirst, sleep and fatigue.** **(Ans.—pp. 315-317)**
   ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা এবং ক্লান্তি—এই যান্ত্রিক সংবেদনগুলি বুঝাইয়া দাও।

মনোবিদ্যা

(দ্বিতীয় খণ্ড)

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রত্যক্ষ

(Perception)

১। প্রত্যক্ষ কাহাকে বলে

সংবেদন বস্তুর চেতনা-মাত্র (bare awareness)। এই চেতনা-মাত্র হইতে যে বিশেষ প্রকারের চেতনা জন্মে, যেমন সংবেদিত বস্তুটি এই প্রকার বা ঐ প্রকার। এইরূপ **বিশেষ প্রকারের চেতনা বা জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ বলে।**

একটি নীল ফুল দেখিতেছি। এই চেতনা চেতনা-মাত্র বা শুধু সংবেদন নয়। নীল বর্ণটি যে নীল ফুলটিরই একটি গুণ এইরূপ বিশিষ্ট চেতনা সংবেদনে নাই।

নীল ফুলের জ্ঞান শুধু সংবেদন নয়, কিন্তু প্রত্যক্ষ। কারণ ইহা একটি বিশেষ প্রকারের জ্ঞান। এই জ্ঞানে অন্যান্য নীল বস্তুর সহিত নীল ফুলটির **সাদৃশ্য**, নীল-অতিরিক্ত অন্য বস্তু হইতে ইহার **পার্থক্য**, যে নীল ফুল পূর্বে প্রত্যক্ষ হইয়াছে ইহা তজ্জাতীয়, এইরূপ জ্ঞান, যে নীল ফুলটি প্রত্যক্ষ হইতেছে, তাহা বস্তুতঃ নীল, এইরূপ **বিশ্বাস**, নীল ফুলটি **বাহ্য জগতের একটি অংশ**, এবং ইহা কোনো **নির্দিষ্ট স্থানে বা দেশে এবং বর্তমান কালে জ্ঞাত** হইতেছে, এইরূপ চেতনা রহিয়াছে।

প্রত্যক্ষে **সদৃশীকরণ** (assimilation), **পৃথকীকরণ** (differentiation), পূর্ব অভিজ্ঞতার **পুনরুদ্দীপন** (reproduction), **বিশ্বাস** (belief), **বহিঃক্ষেপণ** (objectfication) এবং **স্থান ও কালনির্দেশ** (localisation) ঘটে। **যে মানসবৃত্তিতে বস্তুর অতীত অভিজ্ঞতার পুনরুৎপাদন, উহার সহিত বর্তমান অভিজ্ঞতার সাদৃশ্য ও পার্থক্য জ্ঞান, বহিক্ষেপণ এবং স্থানকাল নির্দেশ সাহায্যে উপস্থাপিত সংবেদনের বিশ্বাসযুক্ত অর্থব্যাখ্যা** (interpretation) **ঘটে, তাহাকে প্রত্যক্ষ বলে।** সংক্ষেপে প্রত্যক্ষকে সংবেদনের ব্যাখ্যা, অথবা সংবেদন + ব্যাখ্যা (sensation + its interpretation), অথবা সংবেদন + অর্থ (Sensation + meaning) বলা হইয়া থাকে।

ফুলটি যে নীল, উহা যে নীলত্বগুণ-বিশিষ্ট ফুলের সমশ্রেণীভুক্ত এবং নীলত্বভিন্নগুণবিশিষ্ট বস্তুর পৃথক্ শ্রেণীভুক্ত, এই জ্ঞান নীল ফুলের প্রত্যক্ষে ঘটিয়া

থাকে। অর্থাৎ নীল ফুলের প্রত্যক্ষ ঐ বস্তুর অর্থব্যাখ্যা বিশেষ। সুতরাং **প্রত্যক্ষকে বলা যায় সংবেদনের ব্যাখ্যা বা অর্থগ্রহণ** (perception is the interpretation of sensation)।

নীল ফুলটি প্রত্যক্ষে **উপস্থাপিত** (presented) হইয়াছে। কিন্তু উহা যে শুধু উপস্থাপিত হইয়াছে, তাহা নয়। পুনরুপস্থাপিতও হইয়াছে। উপস্থাপিত নীল ফুলটির প্রত্যক্ষে **অস্পষ্ট স্মৃতির আকারে** অতীতে জ্ঞাত উহার সমজাতীয় বা বিজাতীয় বস্তুর **পুনরুপস্থাপনও** (representation) ঘটিয়াছে। অতীত প্রত্যক্ষে উপস্থাপিত এবং বর্তমানে অনুপস্থিত নীল ফুলগুলির প্রতিরূপের পুনরুৎপাদন সাহায্যে অস্পষ্ট স্মরণ ঘটে এবং এইরূপেই উহার প্রত্যক্ষ সম্ভব হয়।

অর্থাৎ প্রত্যক্ষে যে শুধু উহার বস্তুটি প্রদত্ত বা উপস্থাপিত (presented) হয়, তাহাই নয়। এই উপস্থিত বা প্রদত্ত বস্তু ব্যাখ্যাত হয় উহার অতীত প্রত্যক্ষফলের, অর্থাৎ প্রতিরূপের পুনরুপস্থাপনের মধ্য দিয়া। উপস্থিত নীল ফুলটি এবং উহার অতীত প্রত্যক্ষফলের বা প্রতিরূপের পুনরুপস্থিতি মিলিত হইবার ফলেই নীল ফুলের প্রত্যক্ষ সম্ভব হয়। এই কারণে প্রত্যক্ষকে **উপস্থাপিত-পুনরুপস্থাপিত বস্তুকূট** (presentative-representative complex) বলা হইয়া থাকে।

প্রত্যক্ষ একাধারে বিশ্লেষণাত্মক এবং সংশ্লেষণাত্মক ক্রিয়া (analytic-synthetic process)। প্রত্যক্ষ উহার বিষয়কে বিজাতীয় বস্তু হইতে পৃথক্ করিয়া জানে। এই দিক্ দিয়া প্রত্যক্ষ বিশ্লেষণাত্মক (analytic), কারণ পৃথকীকরণ (differentiation) ইহার একটি বিশেষ ধর্ম। আবার প্রত্যক্ষ সংশ্লেষণাত্মকও (synthetic) বটে, কারণ ইহা বস্তুকে সমজাতীয় বস্তুর সহিত সদৃশীকরণের (assimilation) সাহায্যে জানে।

কিন্তু প্রত্যক্ষের সংশ্লেষণাত্মক লক্ষণটিই প্রধান বা মুখ্য। প্রথমতঃ প্রত্যক্ষে পৃথক পৃথক সংবেদন গ্রথিত বা সংশ্লেষিত হয়। প্রত্যক্ষ টেবিল একটি রূপ-স্পর্শ সমন্বিত গোটা বস্তু। আমরা টেবিল প্রত্যক্ষে উহার বাদামী রং এবং কঠিন, শীতল, মসৃণ স্পর্শ পৃথক রূপে জানি না, কিন্তু জানি **একটি বাদামী-কঠিন-শীতল-মসৃণ টেবিল**। সুতরাং প্রত্যক্ষ বস্তু কতগুলি পৃথক সংবেদনের সমষ্টিমাত্র নয়, কিন্তু ইহা একটি **গোটা বা সম্পূর্ণ বস্তুর জ্ঞান**। অতীত অভিজ্ঞতার সহিত বর্তমান জ্ঞানের মিলন বা সংশ্লেষণ প্রত্যক্ষের প্রধান ধর্ম।

প্রত্যক্ষে পূর্বজ্ঞাত বস্তু পুনরুপস্থাপিত বা পুনরুদ্দীপিত হয়। স্মরণক্রিয়ায়ও অতীত

অভিজ্ঞতার পুনরুদ্দীপন বা পুনরুপস্থাপন ঘটিয়া থাকে। তাহা হইলে প্রশ্ন এই যে, **প্রত্যক্ষের সহিত স্মরণের পার্থক্য কি।** উত্তর এই যে, এই দুইটি ক্রিয়ায় পুনরুদ্দীপন বা পুনরুৎপাদন থাকিলেও. উহা প্রত্যক্ষে অপেক্ষাকৃত **অস্পষ্ট** এবং অনৈচ্ছিকভাবে, কিন্তু স্মরণে অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট এবং ঐচ্ছিকভাবে থাকে।

তাহা ছাড়া, নীল ফুলের প্রত্যক্ষে শুধু উপস্থিত ফুলটিই উহার জ্ঞাত অর্থের সবটুকু নয়। অধিকন্তু বস্তুটি উহার পুনঃপরিচিতি বা **প্রত্যভিজ্ঞার** স্বাক্ষর বহন করে।

প্রত্যভিজ্ঞা (recognition) প্রত্যক্ষের একটি বিশেষ লক্ষণ। প্রত্যভিজ্ঞা ঘটিতে হইলে, প্রত্যভিজ্ঞাত বস্তুর **অতীত জ্ঞানের স্মরণ** আবশ্যক। এই স্মরণ অস্পষ্ট বা অব্যক্ত হইলেও, ইহাতে পূর্ব প্রত্যক্ষের ফল হিসাবে বস্তুর প্রতিরূপ পুনরুপস্থাপিত হইয়া থাকে।

প্রত্যক্ষের সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ

সুতরাং প্রত্যক্ষের **সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ** এই :—

(১) প্রত্যক্ষে উপস্থাপিত এবং পুনরুপস্থাপিত, এই দুই প্রকার উপাদান মিলিত হয়।

(২) প্রত্যক্ষে উপস্থাপিত বা প্রদত্ত বস্তুর, উহার সমশ্রেণীভুক্ত বস্তুর সহিত **সদৃশীকরণ** এবং ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত বস্তু হইতে **পৃথকীকরণ** ঘটে।

(৩) ইহাতে যে বস্তুটি জ্ঞাত হয় তাহার **স্থানীয়** (spatial) এবং কালিক (temporal) **নির্দেশ** থাকে। বস্তুটি কোথায় এবং কখন প্রত্যক্ষ হইতেছে সেই জ্ঞান প্রত্যক্ষের বিশেষ লক্ষণ।

(৪) আবার বস্তুটি যে বাস্তব এবং উহা যে মানস নয়, এইরূপ **বিক্ষেপণও** প্রত্যক্ষের বিশেষ ধর্ম।

(৫) তাহা ছাড়া **অস্পষ্ট স্মরণ** এবং **প্রত্যভিজ্ঞাও** প্রত্যক্ষের পরিচায়ক। যে বস্তুটি প্রত্যক্ষ হইতেছে উহাকে চিনিতে পারা এবং উহাকে চিনিতে গিয়া উহার পূর্ব অভিজ্ঞতা অস্পষ্টভাবে স্মরণ করা প্রত্যক্ষের বিশেষ ধর্ম।

২। প্রত্যক্ষের সহিত সংশ্লিষ্ট কয়েকটি ক্রিয়া

প্রত্যক্ষে পুনরুপস্থাপন ও প্রত্যভিজ্ঞার কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু প্রত্যক্ষে এই ক্রিয়াগুলি সহজ, অস্পষ্ট ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে (automatic) নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে **স্মৃতিতে** এই ক্রিয়া দুইটি সচেষ্ট এবং স্বেচ্ছাকৃতভাবে সম্পন্ন হয়।

এই পার্থক্যের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষকে স্পষ্ট এবং সচেষ্ট (voluntary) স্মৃতি না বলিয়া **অস্পষ্ট স্মৃতি** (implicit memory) এবং স্বতঃস্ফূর্ত (free) স্মৃতি বলিতে হয়। তাহা ছাড়া, প্রত্যক্ষে যে সদৃশীকরণ এবং পৃথকীকরণ ঘটে তাহাও স্বতঃস্ফূর্ত এবং সহজভাবে সম্পন্ন হয়। এই কারণে কেহ কেহ প্রত্যক্ষকে **সহজ সদৃশীকরণ** (automatic assimilation) বলিয়াছেন। আবার প্রত্যক্ষে বহু সংবেদন মিশ্রিত হওয়ার ফলে একটি সম্পূর্ণ বা গোটা বস্তু জ্ঞাত হইয়া থাকে। এই জন্য কেহ কেহ প্রত্যক্ষের সংশ্লেষণকে **মিশ্রণ** (fusion) বলিয়া থাকেন।

প্রত্যক্ষকে একপ্রকার **অভ্যাস** (habit) বলা চলে। একটি ক্রিয়া পুনঃপুনঃ অনুশীলনের ফলে ক্রিয়াটি অভ্যাসে পরিণত এবং সহজসাধ্য হয়। তেমনই পূর্ব অভিজ্ঞতার ফলে কোনো বস্তু সংবেদিত হইবামাত্র প্রত্যক্ষ হয়। পরিচিত বস্তু বা ব্যক্তির প্রত্যক্ষ হয় উহার পূর্ব অভিজ্ঞতার ফলে উহাতে অভ্যস্ত হইবার জন্য। এই নিয়মেই নিত্য ব্যবহৃত বস্তু বা পরিচিত ব্যক্তির সহজ প্রত্যক্ষ ঘটে। সুতরাং প্রত্যক্ষ এক প্রকার অভ্যাস গঠনেরই নামান্তর। অবশ্য অভ্যাস-গঠন প্রধানতঃ চেষ্টাত্মক ক্রিয়া, কিন্তু প্রত্যক্ষ প্রধানতঃ অবগতিমূলক ক্রিয়া। এই পার্থক্যটি মনে রাখা দরকার।

প্রত্যক্ষ ও জটিলীকরণ (Complication)

প্রত্যক্ষের বিষয় একটি গোটা বা সমগ্র বস্তু। এই বস্তুর অংশগুলি সংশ্লেষিত হইয়া এমন ঘনিষ্ঠসূত্রে আবদ্ধ হয় যে, পরবর্তী অভিজ্ঞতায় ঐ বস্তুর এক বা একাধিক অংশ প্রত্যক্ষ করিলেই, অন্য অংশও প্রত্যক্ষ হইতেছে বলিয়া মনে হয়। এইরূপ প্রত্যক্ষকূটকে বলে **জটিলীকরণ**। এই প্রত্যক্ষকূটে বস্তুর বর্তমানে প্রত্যক্ষ কোনো দিকের সহিত সংশ্লিষ্ট উহার অতীত-প্রত্যক্ষ অপর কোনো দিক্ সম্বন্ধে স্মরণ বা উহার প্রতিরূপ সাহায্যে পুনরুৎপাদন হইয়া থাকে। যেমন "সুগন্ধ চন্দন দেখিতেছি" "শীতল বরফ দেখিতেছি" অথবা "শুভ্র বরফ স্পর্শ করিতেছি," এই জাতীয় প্রত্যক্ষে চন্দনের সুগন্ধ, বরফের শীতলতা দর্শন প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে পারে না অথবা বরফের শুভ্রতারও স্পর্শন প্রত্যক্ষ ঘটিতে পারে না, কিন্তু যথাক্রমে ঘ্রাণ, স্পর্শ এবং দর্শন প্রত্যক্ষেরই বিষয় হইতে পারে। অথচ অতীতে যখন চন্দন বা বরফ দেখিয়াছি, তখন চন্দনের সুগন্ধ ঘ্রাণ করিয়াছি এবং বরফের শীতলতা স্পর্শ করিয়াছি। সুতরাং চন্দনের দর্শন ও ঘ্রাণ সংবেদন, বরফের দর্শন ও স্পর্শ সংবেদন অনুষক্ত (associated) হইয়া এক একটি প্রত্যক্ষকূট বা জটিল প্রত্যক্ষ (complication) গঠন করিয়াছে, যাহার ফলে ঐ বস্তুর কোনো দিক সংবেদিত হইলেই অপর দিকের স্মরণ হইয়া থাকে।

কিন্তু এই স্মরণ স্বতঃস্ফূর্ত এবং স্পষ্টভাবে ঘটে বলিয়া, মনে হয় যেন স্মৃত বিষয়টি প্রত্যক্ষ হইতেছে। চন্দন বা বরফের দর্শন প্রত্যক্ষ উহার সুগন্ধের বা শীতলতার **পূর্বানুভব** (fore-feeling) উৎপন্ন করে। এই কারণে ওয়ার্ড, স্টাউট্ প্রভৃতি মনোবিদ্ এই জটিল প্রত্যক্ষের নাম দিয়াছেন **পূর্বপ্রত্যক্ষ** (pre-perception)।

এই প্রকার জটিলীকরণকে **নৈয়ায়িক যথার্থ** প্রত্যক্ষ বলিয়া মনে করেন। নৈয়ায়িক এই প্রত্যক্ষের নামকরণ করিয়াছেন **জ্ঞান-লক্ষণা**। নৈয়ায়িক ইহাকে অলৌকিক প্রত্যক্ষের শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন।

সহ সংবেদন (Synaesthesia)

প্রত্যক্ষকূট বা জটিলীকরণের অনুরূপ আর এক প্রকার প্রত্যক্ষকে সহ-সংবেদন বলা হইয়াছে। **টিশ্‌নার** প্রভৃতি প্রায়োগিক মনোবিদ্‌গণ সহ-সংবেদন সম্বন্ধে প্রয়োগ ও পরীক্ষা করিয়াছেন।

সাধারণতঃ প্রত্যেক ইন্দ্রিয় উহার নির্দিষ্ট স্বভাব অনুসারে নির্দিষ্ট সংবেদন উৎপন্ন করিয়া থাকে। যেমন, চক্ষু উদ্দীপিত হইলে দর্শন সংবেদন এবং কর্ণ উদ্দীপিত হইলে শ্রবণ সংবেদন ঘটে। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, একটি ইন্দ্রিয় শুধু উহার স্বাভাবিক এবং নির্দিষ্ট সংবেদনই উৎপন্ন করে না, কিন্তু অন্য ইন্দ্রিয়ের নির্দিষ্ট সংবেদনও উৎপন্ন করিতে পারে। কর্ণের নির্দিষ্ট সংবেদন হইল শ্রবণ, অথচ এই ইন্দ্রিয়টি কখনও কখনও রঙীন বা বর্ণযুক্ত শব্দ শুনিতে পায়। একই শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শ্রবণের সহিত বর্ণের এই সহ-সংবেদনকে **বর্ণযুক্ত শ্রবণ** (coloured hearing or psychochromaesthesia) বলে। ইহা আবার দুই শ্রেণীর। উদ্দীপিত ইন্দ্রিয়ের সংবেদনের সহিত অন্য ইন্দ্রিয়ের সংবেদনের সাহচর্য বা অনুষঙ্গ প্রথম ক্ষেত্রে সোজাসুজি (direct) এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে পরোক্ষ (indirect)। প্রথমটির বেলায় শব্দ সোজাসুজি দর্শন সংবেদন ঘটায় এবং দ্বিতীয়টির বেলায় পরোক্ষভাবে অথবা কোনো যান্ত্রিক সংবেদনের মধ্যস্থতায় এইরূপ করে। যেমন, কেহ হয়ত ইংরাজী ব্যঞ্জনবর্ণগুলি পৃথকভাবে গভীর বেগুনীরূপে, স্বরবর্ণগুলি হলুদবর্ণবিশিষ্টরূপে, কিন্তু শব্দের অংশ হিসাবে ব্যঞ্জনবর্ণগুলি হলুদবর্ণবিশিষ্টরূপে শোনে।

রঙীন শ্রবণের মত **শ্রুত দর্শনও** (tonal vision) ঘটিতে পারে। যেমন, কোনো কোনো ব্যক্তি সকল প্রকারের নীল রং, গভীর এবং নিস্তেজ আবার সকল প্রকারের

হলুদ রং উচ্চ এবং ঝঙ্কৃত শব্দরূপে শুনিয়া থাকে। **স্বাদ-শ্রবণের** (gustatory audition) ক্ষেত্রও পাওয়া গিয়াছে, যেমন 'ইন্‌টেলিজেন্স' কথাটি শ্রবণ করিয়া কোনো ব্যক্তি হয়ত কাঁচা টম্যাটো-এর স্বাদ-সংবেদন অনুভব করে। গ্রন্থকার কর্তৃক স্বাদ-শ্রবণের একটি ক্ষেত্র পরীক্ষিত হইয়াছিল। এই ব্যক্তি শান্তিপুরের কথ্য ভাষা শুনিয়া আপেলের স্বাদ অনুভব করিতেন। নানা অঞ্চলের নানা কথাভাষাই ভিন্ন রকমের স্বাদবিশিষ্ট হইয়া তাঁহার দ্বারা শ্রুত হইত। আবার **দৃষ্ট-স্বাদও** (visual taste) ঘটিতে দেখা গিয়াছে। যেমন লবণের ফিকে লাল, তিক্ত স্বাদের বাদামী, অম্লের সবুজ বা সবুজাভ নীল এবং মিষ্ট স্বাদের উজ্জ্বল নীল বর্ণ-সংবেদন ঘটিতে পারে।

সহ-সংবেদনের সহিত প্রত্যক্ষকূটের পার্থক্য এই যে, প্রথমটি সংবেদন এবং দ্বিতীয়টি প্রত্যক্ষ। ইহাদের আর একটি পার্থক্য এই যে প্রত্যক্ষকূট যথার্থ প্রত্যক্ষ, কিন্তু সহ-সংবেদন ভ্রান্ত প্রত্যক্ষকূট ছাড়া কিছু নয়। তৃতীয়তঃ, প্রত্যক্ষকূট একটি সর্বসাধারণ জ্ঞান—ইহা একটি স্বাভাবিক মানস অবস্থা। পক্ষান্তরে সং-সংবেদন সর্ব-সাধারণ এবং স্বাভাবিক মানসজ্ঞান নয়। কিন্তু ইহা স্বাভাবিক সংবেদনের ব্যতিক্রম।

৩। **শুদ্ধ সংবেদন** (Pure Sensation)

চেতনা-মাত্র বা নির্বিশেষ চেতনাকে সংবেদন বলে। কিন্তু প্রশ্ন এই যে এইরূপ বিশুদ্ধ সংবেদন সম্ভব কিনা, যাহা নির্বিশেষ চেতনা-মাত্র। পরিণত (adult) এবং বাস্তব অভিজ্ঞতায় শুদ্ধ সংবেদন পাওয়া যায় না। পরিণত মনের সকল জ্ঞানই পূর্ব অভিজ্ঞতার আলোকে লব্ধ। শুধু 'নীল' সংবেদন, যাহাতে নীলটি নীল এইরূপ জ্ঞানও ঘটে না, অথবা যে নীল-জ্ঞানে পূর্ব অভিজ্ঞতার প্রভাব বা ক্রিয়া নাই, এইরূপ সংবেদন সাবালক বা পরিণত মনে ঘটিতে পারে না। শিশুর মনেও এইরূপ নির্বিশেষ চেতনা ঘটে কিনা সন্দেহ। শিশুও তাহার নিকট উপস্থাপিত বস্তুকে পুনরুপস্থাপন বা অতীত অভিজ্ঞতার পুনরুদ্দীপন সাহায্যে জানিয়া থাকে। অবশ্য পরিণত বা সাবালক ব্যক্তির জ্ঞান হইতে শিশুর জ্ঞানের পার্থক্য এই যে, প্রথমটির ক্ষেত্রে অতীত অভিজ্ঞতার পরিধি দ্বিতীয়ের তুলনায় অধিক। শিশুর জীবনের **প্রথম সজ্ঞান মুহূর্তের 'চেতনা'** হয়ত বিশুদ্ধ সংবেদনের মত হইয়া থাকিতে পারে। এই চেতনা অবশ্যই নিষ্প্রকারক চেতনা-মাত্র হইয়া থাকিবে, কারণ এই অবস্থায় শিশুর এমন কোনো অভিজ্ঞতাভাণ্ডার সঞ্চিত

হয় নাই, যাহা হইতে আহৃত উপাদান তাহার চেতনা বা জ্ঞানকে কোনো বিশেষ আকারে আকারিত করিতে পারে। এই কল্পিত প্রথম সজ্ঞান মুহূর্তে শিশুর সম্মুখে নীল ফুলটি ধরিলে, হয়ত সে উহাকে নিষ্প্রকারভাবে জানিতে পারে, অথবা তাহার বিশুদ্ধ সংবেদন হয়ত কোনো প্রত্যক্ষের আলোকে আলোকিত নাও হইতে পারে। কিন্তু শিশু-চেতনার এই প্রথম মুহূর্তটিকে মনোবৈজ্ঞানিক জ্ঞানের স্তর বলা যায় না, কারণ বাস্তব অভিজ্ঞতা বা চেতনাই মনোবিদ্যার বিষয় এবং শিশুর এইরূপ কোনো বাস্তব অভিজ্ঞতা আছে কি না তাহা সে বলিতে পারে না।

স্টাউট্ বলিয়াছেন যে, শুদ্ধ সংবেদনের অনুরূপ স্বাভাবিক বা বাস্তব চেতনা অসম্ভব হইলেও, অবচেতন (subconscious) স্তরে ইহা সম্ভব হইতে পারে। অন্যমনস্ক বা চিন্তামগ্ন ভাবে রাস্তায় চলিতেছি। এমন সময় হয়ত কোনো পরিচিত ব্যক্তির সম্ভাষণের উত্তরে প্রতি-সম্ভাষণ করিলাম, নিতান্ত সংস্কারের বা অভ্যাসের বশবর্তী হইয়া। ঐ পরিচিত ব্যক্তিকে স্পষ্টভাবে পরিচিত বলিয়া না বুঝিয়াই যে প্রতিসম্ভাষণ করা হইল, সেই অস্পষ্ট জ্ঞানকে বিশুদ্ধ সংবেদনের অনুরূপ বলা যাইতে পারে।

বিশুদ্ধ সংবেদনের অনুরূপ চেতনার **আরও উদাহরণ** দেওয়া যাইতে পারে। জাগ্রৎ অবস্থা হইতে ধীরে ধীরে নিদ্রামগ্ন হইবার ঠিক পূর্বের অবস্থাটি, যাহাকে নিদ্রাও বলা যায় না, আবার জাগরণও বলা যায় না, তাহা হয়ত শুদ্ধ সংবেদনের অনুরূপ। আবার নিদ্রিত অবস্থা হইতে জাগিয়া উঠিবার মধ্যবর্তী অবস্থাটিকেও ইহার দৃষ্টান্তস্থল বলা যাইতে পারে। তাহা ছাড়া, অস্মার রোগে (amnesia) পূর্বস্মৃতি লুপ্ত হইলে, সকল উপস্থাপিত বস্তুই অর্থহীন হইয়া দাঁড়ায়। অস্মার রোগীর উপস্থাপিত বস্তুর যে জ্ঞান হয় তাহাকে হয়ত বিশুদ্ধ সংবেদনের অনুরূপ বলা যাইতে পারে।

উপসংহারে বলা যায় যে, মনোবিদ্যার অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বিশুদ্ধ সংবেদনের অস্তিত্ব আছে কি না সন্দেহ। তথাপি প্রত্যক্ষ ঘটিবার পূর্বে অবশ্যই বিশুদ্ধ সংবেদন ঘটিয়া থাকিবে, অথবা কোনো বস্তুর সপ্রকারক বা বিশিষ্টাকারীয় জ্ঞান ঘটিবার পূর্বে অবশ্যই উহার কোনো নির্বিশেষ বা নিষ্প্রকারক জ্ঞান হইয়া থাকিবে। নীল ফুলটি এই প্রকার বা ঐ প্রকার এইরূপ জ্ঞান লাভ করিবার পূর্বে উহার বস্তুমাত্ররূপে জ্ঞান অবশ্যই ঘটিয়া থাকিবে। এই জাতীয় যুক্তির সাহায্যে বলা যাইতে পারে যে, বিশুদ্ধ সংবেদন অবশ্যই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের পূর্ববর্তী একটি প্রকৃত অবস্থা। যুক্তিবিদ্যার দিক হইতে এইরূপ অনুমানের যাথার্থ্য অস্বীকার

করিবার উপায় নাই।[১] কিন্তু মনোবিদ্যার দিক হইতে প্রত্যক্ষের পূর্বে সংঘটিত এইরূপ বিশুদ্ধ চেতনা-মাত্র বাস্তব অভিজ্ঞতার বাহিরে, সুতরাং অবাস্তব।

৪। প্রত্যক্ষ ও সংবেদন

প্রত্যক্ষ ও সংবেদনের পার্থক্য[২]

(১) প্রত্যক্ষ একটি উপস্থাপন-পুনরুপস্থাপন কূট। প্রত্যক্ষে বস্তুর উপস্থাপন এবং পুনরুপস্থাপন ঘটে। সংবেদনে শুধু বস্তুর উপস্থাপনই ঘটে, পুনরুপস্থাপন ঘটে না।

(২) সংবেদন চেতনামাত্র, অথবা নির্বিশেষ চেতনা। সংবেদনে বস্তুর অর্থ (meaning) জ্ঞাত হয় না। কিন্তু প্রত্যক্ষে সংবেদিত বস্তু অর্থপূর্ণ হইয়া প্রকাশিত হয়। অর্থপূর্ণ (meaningful) সংবেদনই প্রত্যক্ষ।

(৩) প্রত্যক্ষকে জ্ঞান বলা যায়, কিন্তু সংবেদনকে জ্ঞান (knowledge) বলা চলে না। জ্ঞানে বস্তুর অর্থপ্রতীতি থাকে, যেমন নীল ফুলের জ্ঞানে ফুলটিকে নীল বলিয়া জানা যায়। সংবেদনে বস্তুর এইরূপ অর্থপ্রতীতি থাকে না, সুতরাং ইহাকে জ্ঞান বলা যায় না। অথবা, অধ্যাপক উইলিয়ম জেম্‌স্‌-এর ভাষায়, সংবেদন বস্তুর পরিচিতি মাত্র (acquaintance)। কিন্তু প্রত্যক্ষ পরিচিত বস্তুর জ্ঞান।

(৪) সংবেদনে বস্তুর গুণ জানিতে পারা যায়, কিন্তু গুণবিশিষ্ট বস্তুকে জানা যায় না। যেমন, সংবেদনে নীল ফুলটির জ্ঞান হয় না, কিন্তু হয় ফুলের নীলত্ব গুণটির, সুগন্ধ ফুলের জ্ঞান হয় না, কিন্তু হয় ফুলের সৌগন্ধ্য গুণটির। পক্ষান্তরে, প্রত্যক্ষ সাহায্যে গুণবিশিষ্ট বস্তুর জ্ঞান হয়, অর্থাৎ শুধু ফুলের নীলত্ব বা সৌগন্ধ্য গুণেরই জ্ঞান হয় না, কিন্তু হয় নীল অথবা সুগন্ধ ফুলের।

(৫) সংবেদন একটি বিষয়গত (objective) চেতনা। সংবেদন শুধু মনের কল্পিত নয়, কিন্তু মন-নিরপেক্ষ কোনো বস্তুর দ্বারা সংঘটিত মানসবৃত্তি। কিন্তু

---

১ নৈয়ায়িক সবিকল্পক অথবা সপ্রকারক প্রত্যক্ষের ভিত্তিস্বরূপ নির্বিকল্পক অথবা নিষ্প্রকারক প্রত্যক্ষ স্বীকার করিয়াছেন। ইহা আপাতদৃষ্টিতে পাশ্চাত্ত্য মনোবিদ্যাসম্মত সংবেদন বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু নৈয়ায়িক মতটির ভিত্তি যৌক্তিক (logical), পক্ষান্তরে পাশ্চাত্ত্য মতটির ভিত্তি প্রধানতঃ মনোবৈজ্ঞানিক (psychological) বলিয়া মনে হয়।

২ প্রচলিত (traditional) মনোবিদ্যার মতের, অর্থাৎ প্রত্যক্ষের পূর্বে সংবেদন ঘটিয়া থাকে, এই মতের ভিত্তিতে বর্তমান অনুচ্ছেদের আলোচনা করা হইয়াছে।

সংবেদনের এই বিষয়গত চেতনা সত্ত্বেও ইহাতে বিষয়ের বাস্তব সত্তায় স্পষ্ট বিশ্বাস ফুটিয়া ওঠে না।

(৬) সংবেদন অপেক্ষাকৃত নিষ্ক্রিয় (passive) এবং প্রত্যক্ষ অপেক্ষাকৃত **সক্রিয়** (active) মানসবৃত্তি। সংবেদিত বস্তু এমন একটি উদ্দীপক-শক্তি, যাহা সবলে চেতনাকে অধিকার করে। এই চেতনায় মন বস্তুর প্রতি নিষ্ক্রিয় অথবা গ্রহণশীল থাকে। পক্ষান্তরে, প্রত্যক্ষে সদৃশীকরণ, পৃথকীকরণ, স্মরণ, প্রত্যভিজ্ঞা, বিশ্বাস প্রভৃতি ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। সংবেদন নিষ্ক্রিয় চেতনামাত্র, কিন্তু প্রত্যক্ষ সংবেদনের **সক্রিয় অর্থাবধারণ** (interpretation)।

(৭) আবার প্রত্যক্ষের বিষয় একটি **সম্পূর্ণ বা গোটা বস্তু** যাহার জ্ঞান অনেক প্রকার সম্বন্ধ-জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। নীল ফুলের প্রত্যক্ষে, ফুল এবং উহার নীল ও অন্যান্য গুণ পৃথক বা বিচ্ছিন্নভাবে জ্ঞাত হয় না, কিন্তু হয় একটি সম্পূর্ণ বা গোটা বস্তুরূপে। সংবেদনের বিষয় সম্পূর্ণ বা গোটা বস্তু নয়, কিন্তু ঐ বস্তুর গুণ বা অংশ। অর্থাৎ, প্রত্যক্ষ সম্পূর্ণ বস্তুর জ্ঞান, কিন্তু সংবেদন আংশিক বস্তুর জ্ঞান।

(৮) সুতরাং সংবেদন কোনো বস্তুর বাস্তব বা মূর্ত (concrete) মানসবৃত্তি নয়, কিন্তু প্রত্যক্ষ ইহার **বাস্তব বা মূর্ত মানসবৃত্তি**। সংবেদনের বিষয় সম্পূর্ণ বস্তু নয়, কিন্তু উহার বিচ্ছিন্ন অংশ। সমগ্র বস্তু হইতে উহার অংশকে বিচ্ছিন্ন করিলে উহা কাল্পনিক বা অবাস্তব হইয়া দাঁড়ায়। সংবেদন এইরূপ কাল্পনিক বা অবাস্তব বিষয়কে অবলম্বন করিয়া ঘটিয়া থাকে।

(৯) জ্ঞানব্যাপারে উহাদের কার্য বা স্থানের দিক দিয়াও প্রত্যক্ষ এবং সংবেদন ভিন্ন। সংবেদন জ্ঞানের বিভিন্ন উপাদানগুলি সংগ্রহ করে, কিন্তু প্রত্যক্ষ এইগুলিকে **সম্বদ্ধ** করে।

[উল্লিখিত পার্থক্য আলোচনায় ধরিয়া লওয়া হইয়াছে, সম্পূর্ণ বস্তুর প্রত্যক্ষের পূর্বে উহার বিভিন্ন গুণগুলির সংবেদন আবশ্যক এবং সংবেদিত উপাদানগুলির সম্বন্ধস্থাপন ও অর্থবোধের ফলে প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হয়। চিরাচরিত মনোবিদ্যার এই মামুলী ধারণা প্রয়োগিক মনোবিদ্যার মতে অগ্রাহ্য। অনুষঙ্গবাদী (associationist) বা পারমাণবিক মনোবিদ্‌গণের (psychological atomists)[১] মতে পৃথক পৃথক

১। অনুষঙ্গবাদীদের মতে মন কতকগুলি মৌলিক উপাদান দিয়া গঠিত। ইহারা পরস্পর-বিচ্ছিন্ন, কিন্তু অনুষঙ্গ নিয়মে সম্বদ্ধ হইয়া যৌগিক মানসবৃত্তি গঠিত করে। পারমাণবিক মনোবিদ্যার মতে জড়বস্তু যেমন পরমাণু দিয়া গঠিত, মনও তেমনই মৌলিক মানস উপাদান দিয়া গঠিত।

সংবেদন সম্বদ্ধ হইয়া প্রত্যক্ষের আকার ধারণ করে, অথবা প্রত্যক্ষের উপাদান পরস্পর বিচ্ছিন্ন মৌলিক সংবেদন। মিল্, বেইন্ (Bain) প্রভৃতি এইরূপ মতবাদের সমর্থক। কিন্তু অধ্যাপক জেম্স্ এইরূপ মতবাদকে ইট-চুন মনোবিদ্যা (brick-and-mortar psychology) বলিয়া উপহাস করিয়াছেন। গেস্টাল্ট্ মনোবিদ্গণও প্রত্যক্ষের এই মত গ্রহণ করেন নাই। তাঁহাদের মতে প্রত্যক্ষই সম্পূর্ণ এবং মৌলিক মানসবৃত্তি, ইহা সংবেদনের যৌগিক ফল মাত্র নয়।]

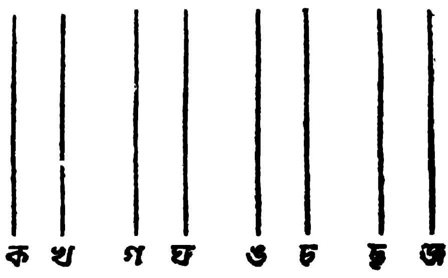
৫। গেস্টাল্ট্ প্রত্যক্ষবাদ (The Gestalt Theory of Perception)

গেস্টাল্ট্ মনোবিদ্গণ মনে করেন যে, প্রত্যক্ষই সকল জ্ঞানের মূল ভিত্তি। প্রত্যক্ষই বাস্তব এবং মূর্ত জ্ঞান। ইহা তথাকথিত মৌলিক সংবেদনের সংযোজন নয়, কিন্তু সকল জ্ঞানের মূল একক (unit)। সংবেদন এই মৌলিক জ্ঞানের বিশ্লেষিত দিগ্‌দর্শন মাত্র। হিউম্ হইতে মিল্ পর্যন্ত যে সকল মনোবিদ্ সংবেদনকে মানসজীবনের মূল উপাদান মনে করিয়া এই সংবেদনগুলির সংমিশ্রণ বা মানস রসায়নের (mental chemistry)১ উপর নির্ভর করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা ভ্রান্ত।

পশ্চাদ্‌ভূমি (Ground) **এবং আকার** (Figure)

গেস্টাল্ট্ মনোবিদ্গণের মতে মানস-রসায়নের ধারণা অমূলক। তাঁহারা প্রয়োগ ও পরীক্ষণের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, প্রত্যক্ষই সকল উচ্চতর মানসবৃত্তির মৌলিক অথবা একক ভিত্তি। তাহা ছাড়া, প্রত্যক্ষ একটি এবং সমগ্র বস্তুর জ্ঞান।

বেড়া ব্যাপার (fence phenomenon) সাহায্যে প্রত্যক্ষের এই একক ও সমগ্র রূপ বুঝা যায়। নীচের ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ- এই আটটি সরলরেখা এইরূপভাবে আঁকা হইয়াছে যে ক হইতে খ, গ হইতে ঘ,

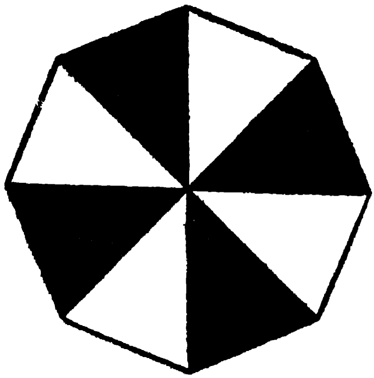


১নং চিত্র—বেড়া অথবা ফেন্স্ ফেনমেনন

১। রসায়ন মতে যেমন মৌলিক উপাদানের সংমিশ্রণে নূতন নূতন যৌগিক উৎপন্ন হয়, মানস রসায়ন মতেও তেমনই কতকগুলি মৌলিক মানস উপাদানের সংমিশ্রণে নূতন নূতন যৌগিক মানস-বৃত্তির উদ্ভব ঘটে।

ঙ হইতে চ এবং ছ হইতে জ-এর দূরত্ব ক হইতে গ, খ হইতে ঘ, গ হইতে ঙ ইত্যাদি সরলরেখাগুলির দূরত্ব অপেক্ষা কম।

সংবেদনের দিক দিয়া বিচার করিলে, এই বেড়া ব্যাপারটিতে আমাদের জোড়াবদ্ধ আটটি সরলরেখা এবং উহাদের ব্যবধানগুলি পুস্তকের সাদা পৃষ্ঠার অংশ হিসাবে এবং মাত্র চওড়ায় বা প্রশস্ততায় ভিন্ন বলিয়া জ্ঞান হওয়া উচিত। কিন্তু বস্তুতঃ আমাদের প্রত্যক্ষ হইতেছে সাদা পৃষ্ঠার পশ্চাদ্‌ভূমিতে (ground) প্রতি জোড়ার ব্যবধান সহ চার জোড়া সরলরেখার একটি আকার (figure, Gestalt)। কখ, গঘ, ঙচ এবং ছজ এই চার জোড়া লাইন-এর ব্যবধানগুলি ফিগার বা আকারের অংশ। পক্ষান্তরে খগ, ঘঙ, চছ ব্যবধানগুলি পশ্চাদ্‌ভূমি বা গ্রাউণ্ড-এর অংশ। আকারের অন্তর্গত সাদা ব্যবধানগুলি সংবেদনরূপে অন্য ব্যবধানগুলি হইতে ভিন্ন নয়, অথচ প্রত্যক্ষজ্ঞানে নিশ্চিতরূপে ভিন্ন বলিয়া জ্ঞাত হয়।



২নং চিত্র—পশ্চাদ্‌ভূমি এবং আকার

২ নং চিত্রের কালো অংশে মনোযোগ করিলে উহা সাদা অংশের পশ্চাদ্‌ ভূমিতে আকাররূপে ফুটিয়া ওঠে, আবার সাদা অংশে মনোযোগ করিলে উহা কালো অংশের পশ্চাদ্‌ভূমিতে আকাররূপে ফুটিয়া ওঠে।[১]

এইরূপে গেস্টাল্ট্‌ মনোবিদ্‌গণ বুঝাইতে চাহেন যে প্রত্যেক প্রত্যক্ষেই আকার এবং পশ্চাদ্‌ভূমির পার্থক্য আছে। আকারের তুলনায় পশ্চাদ্‌ভূমি অস্পষ্ট। অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট পশ্চাদ্‌ভূমির পৃষ্ঠে (background) আকার স্পষ্টভাবে ফুটিয়া ওঠে।

প্রত্যক্ষের বিষয় একটি সমগ্র বস্তু

প্রত্যক্ষের বস্তু একটি একক বা সমগ্র এবং ইহার অংশগুলির মধ্যে সংগঠন (integration) থাকে, যাহার ফলে ইহা অবিভাজ্য। অবশ্য পরবর্তী বিশ্লেষণে অংশগুলি পৃথকভাবে নির্দেশিত হইতে পারে। প্রতি মুহূর্তের অভিজ্ঞতাই একটি

১। এম্‌, কলিন্‌স্‌ অ্যাণ্ড্‌ জে, ড্রিভার—এক্সপেরিমেন্টাল্‌ সাইকলজি—পৃঃ ১০৮-১১০

সমগ্র বা গোটা বস্তু। এই সমগ্রের কতক অংশ স্পষ্ট আকাররূপে (figure) ফুটিয়া ওঠে এবং বাকী অংশে ইহার পশ্চাদ্‌ভূমি (ground) রূপে ইহার স্পষ্টতায় সহায়তা করে। প্রত্যেক পরবর্তী অভিজ্ঞতাই উহার পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতা হইতে আবির্ভূত হয়, অর্থাৎ প্রথমটি দ্বিতীয়টির পরিবর্তিত রূপ বা আকার।

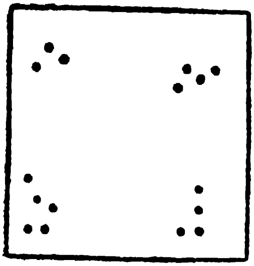
সুতরাং প্রত্যক্ষের বিষয় একটি বিচ্ছিন্ন বস্তু নয়। ইহা একটি সমগ্র পরিস্থিতি (situation), যাহা বর্তমান এবং পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতার সহিত সম্বন্ধ। মনোযোগের ফলে এই সমগ্র পরিস্থিতি বা অবস্থা হইতে এক বা একাধিক অংশ পৃথকভাবে নির্বাচিত হইতে পারে। আবার এই নির্বাচিত অংশটিও একটি সমগ্র পরস্থিতি, যাহা উহার পশ্চাদ্‌ভূমিতে আকার বা গেস্টাল্ট্‌রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। মোটের উপর বলা যায় যে, **আকার এবং পশ্চাদ্‌ভূমির সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ বিষয়ের অপরিহার্য লক্ষণ।**

হ্বার্‌দাইমার্‌-এর (Wertheimer) পরীক্ষিত **ফাই-ব্যাপার** (Phi-Phenomenon) গেস্টাল্ট্‌ মনোবিদ্যার একটি উল্লেখযোগ্য প্রমাণ। যদি দুইটি বিন্দুকে প্রায় ০·৬ সেকেণ্ড ব্যবধানে পূর্বাপরভাবে আলোকিত করা হয় তাহা হইলে বিভিন্নস্থানে দুইটি আলোকবিন্দু দেখা যায় না, কিন্তু দেখা যায় এক স্থান হইতে আর এক স্থানে চলনশীল একটি আলোকবিন্দু। এইরূপ দর্শন শুধু গেস্টাল্ট্‌ মনোবিদ্যার ভিত্তিতেই ব্যাখ্যাত হইতে পারে। পূর্ববর্তী আলোকের সবর্ণ অনুসংবেদন শেষ না হইতেই পরবর্তী আলোক দর্শন হয়ত ইহার কারণ।

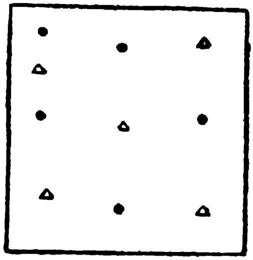
সমগ্র-বস্তু-গঠনের আকার-বিষয়ক নিয়ম

সমগ্র-বস্তু-গঠনের (organisation) আকার যে নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহা বুঝাইতে গিয়া হ্বারদাইমার্‌ বিন্দু এবং রেখার সাহায্য লইয়াছেন। কতকগুলি **বিন্দু কাছাকাছি** থাকিলে অথবা **একই প্রকারের** হইলে, উহাদিগকে একটি সংগঠন বা শ্রেণীবদ্ধরূপে দেখায়। পক্ষান্তরে, প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে দুই বা ততোধিক আকারের বা বর্ণের বিন্দু থাকিলে, একজাতীয় বিন্দুগুলিকে এক একটি পৃথক সংগঠন বা শ্রেণীবদ্ধ দেখায়। আবার বিন্দুগুলিকে একই সংগঠন বা শ্রেণীবদ্ধরূপে প্রত্যক্ষ করিবার আর একটি অনুকূল অবস্থা হইল উহারা বদ্ধ (closed) অথবা মুক্ত (open) কিনা, তাহা। এই **বন্ধন সূত্র** (principle of closure) গেস্টাল্ট্‌ মতবাদের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। শূন্যস্থান (gap)-বিশিষ্ট আকারের শূন্যস্থানগুলি স্বভাবতঃই উপেক্ষিত এবং পূর্ণ বা আবদ্ধ হইয়া থাকে।

অর্থাৎ, সমগ্র-বস্তু-গঠনের আকার নিয়ন্ত্রিত হয় তিনটি নিয়মের দ্বারা, যথা **নৈকট্য** (contiguity), **সাদৃশ্য** (Similarity) এবং **বন্ধন** (closure)। নিম্নপ্রদর্শিত তিনটি চিত্রে এই নিয়ম দেখানো হইল।

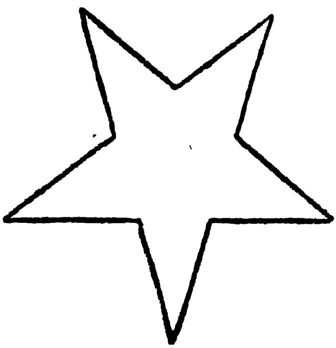


৩ নং চিত্র—নৈকট্য



৪ নং চিত্র—সাদৃশ্য

৩নং চিত্রের নিকট বিন্দুগুলিকেই এক একটি বিন্দুশ্রেণী অথবা সংগঠনরূপে দেখা যাইতেছে, কিন্তু দূরের বিন্দুগুলিকে এইরূপ শ্রেণীবদ্ধ সংগঠনরূপে দেখা যাইতেছে না। ৪নং চিত্রটিকে একই প্রকারের বা সদৃশ আকার, আকৃতি বা বর্ণের বিন্দুগুলিকে এক শ্রেণী বা সংগঠনভুক্ত এবং বিভিন্ন বা বিসদৃশ বিন্দুগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণী বা সংগঠনভুক্ত বলিয়া দেখা যাইতেছে। ৫নং চিত্রটিতে বক্ররেখার অংশগুলি মুক্ত বা বিচ্ছিন্ন থাকিলেও, গঠনের অন্তর্নিহিত বন্ধন-প্রবণতা অনুসারে উহাদের ফাঁক বা শূন্যতা যেন দেখিয়াও দেখা যাইতেছে না, কিন্তু এই বিচ্ছিন্ন অংশগুলি যেন একটি ছেদহীন আকাররূপে দৃষ্ট হইতেছে।



৫ নং চিত্র—বন্ধন

সংগঠনের স্থায়ী, সহজ এবং নিয়মিত রূপ লাভ করিবার প্রবণতাকে **সংগঠনপ্রবণতা** বা "প্রাগ্‌ন্যানজ্ (pragnanz)" বলা হয়। এই প্রবণতার ফলেই বন্ধন, বা "শূন্যস্থানের পূরণ (closure)" ঘটিয়া থাকে। বদ্ধ স্থানের সংগঠন স্থায়ী এবং প্রতিকূল শক্তিগুলিকে বাধা দিতে সক্ষম।

৬। **ভ্রমপ্রত্যক্ষ** (Illusory Perception)

যে প্রত্যক্ষে বস্তুর যথার্থ জ্ঞান না হইয়া অযথার্থ জ্ঞান হয় তাহাকে ভ্রমপ্রত্যক্ষ বলে। যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম স্থলে যথার্থ বস্তুটি রজ্জু, কিন্তু উহার অযথার্থ অথবা ভাসমান রূপটি, অথবা যে রূপে রজ্জু প্রত্যক্ষ হইতেছে, তাহা সর্প। আবার, শুক্তিতে বা বালুকায় রজতভ্রম স্থলে যথার্থ বস্তু শুক্তি বা বালুকা, কিন্তু উহার অযথার্থ অথবা ভাসমান রূপটি, অথবা যে রূপে উহা প্রত্যক্ষ হইতেছে, তাহা রজত বা রৌপ্য। আবার, জলমগ্ন একটি সোজা লাঠিকে বাঁকা দেখা যায়। এই স্থলে প্রত্যক্ষ বিষয়ের যথার্থ রূপটি সোজা লাঠি এবং উহার ভাসমান রূপ বাঁকা লাঠি।

ভ্রমপ্রত্যক্ষের কোনো **বাস্তব ভিত্তি থাকা চাই**—অর্থাৎ, প্রত্যক্ষ বস্তুটি শুধু মানসসৃষ্টি নয়। শূন্যে দুর্গ নির্মাণকে ভ্রমপ্রত্যক্ষ বলে না। রজ্জু, শুক্তি অথবা সোজা লাঠি প্রভৃতি বস্তু না থাকিলে ভ্রমপ্রত্যক্ষ ঘটে না। **যথার্থ বস্তুকে উহা যাহা নয় তাহা বলিয়া প্রত্যক্ষ করাকে ভ্রমপ্রত্যক্ষ বলে।** অথবা প্রত্যক্ষে যে উদ্দীপকগুলি ইন্দ্রিয়কে উদ্দীপিত করে তাহাদের **অপব্যাখ্যা বা ভুল অর্থগ্রহণ** (false interpretation of sense-stimuli) করার নাম ভ্রমপ্রত্যক্ষ। ভ্রমপ্রত্যক্ষে বাস্তব সংবেদন-ভূমি বা ভিত্তি (sensory basis) থাকে। কিন্তু উহা যথার্থরূপে প্রত্যক্ষ না হইয়া একটি মন-গড়া বস্তুরূপে প্রত্যক্ষ হয়। উহার সহিত আসল বস্তুর মিল থাকে না। সুতরাং ভ্রমপ্রত্যক্ষের একটি **সংবেদনলব্ধ বস্তুগত দিক** এবং আর একটি অপব্যাখ্যা বা **ভুল অর্থগ্রহণরূপ মানস দিক** আছে।

ভ্রমপ্রত্যক্ষ **প্রথমতঃ দুই শ্রেণীর** হইতে পারে—যথা, ব্যক্তিগত (individual) এবং সার্বজনীন (universal)। ভীতু লোক অন্ধকারে স্তম্ভকে চোর বলিয়া এবং দেওয়ালে ঝুলানো স্যুট্ বা জামাকে ভূত বলিয়া ভ্রম করে। প্রুফ্ রিডার-এর ভ্রমও একপ্রকার ব্যক্তিগত ভ্রম। প্রুফ্-রিডার প্রুফ্ সংশোধনে প্রায়ই ভুল ছাপা শব্দটির স্থানে তাঁহার পরিচিত বা প্রত্যাশিত শব্দটি পড়িয়া যান, সুতরাং ছাপার ভুল আর সংশোধন হয় না। আবার সংবাদপত্রের পাঠক উহার শিরোনামাগুলিকে প্রায়ই ভুল পড়িয়া যান, এবং হয়ত কোনো বিশেষ সংবাদের জন্য পূর্ব হইতেই প্রস্তুত বা আশান্বিত থাকাই এই ভ্রমের কারণ।

সার্বজনীন ভ্রমপ্রত্যক্ষের মূলে কোনো **নির্দিষ্ট ব্যাখ্যা বা অভ্যাসের প্রভাব** (fixity of interpretation) থাকিতে পারে। যেমন মধ্যমা এবং তর্জনীর মধ্যস্থলে একটি পেন্সিল অগ্রপশ্চাৎভাবে চালাইলে ঐ একটি পেন্সিলকে দুইটি বলিয়া ভ্রম হয়।

আবার একটি মটর দানা অনুরূপভাবে তুইটি আঙুলের মধ্য দিয়া চালনা করিলেও উহা দুইটি বলিয়া প্রত্যক্ষ হয়। একটি আঙুলের উপর আর একটি আঙুলের নীচ অংশ সাধারণতঃ দুইটি বস্তুই স্পর্শ করিতে পারে, এইরূপ ব্যাখ্যায়ই আমরা অভ্যস্ত বলিয়া উপরোক্ত ভ্রমপ্রত্যক্ষ ঘটিয়া থাকে। আবার আকার-ওজনের ভ্রম-ও (size-weight illusion) এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। পূর্বাভ্যাসের ফলে একই ওজনের অথচ বিভিন্ন আকারের বাক্সকে বিভিন্ন ওজনের, অর্থাৎ ছোটটিকে বেশী এবং বড়টিকে কম ওজনের, বলিয়া ভ্রম ঘটে। এই ভ্রম এমনই অসংশোধনীয় যে দুইটি বাক্সের ওজন সমান দেখিয়া বা জানিয়াও এই ভ্রম হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায় না।[১]

দৃষ্টিবিভ্রম সকলেরই ঘটিয়া থাকে। একটি ধাবমান ট্রেন দেখিবার পর অন্যদিকে তাকাইলে দেখা যায় যে নিশ্চল ঘর, বাড়ি, গাছপালা প্রভৃতি বিপরীত দিকে ছুটিতেছে। ইহার কারণ এই যে গাড়িটিকে ছুটিতে দেখিবার সময় চোখ যেদিকে ঘুরিতেছিল, গাড়িটি চলিয়া যাইবার পরই চোখের সেই গতি থামিয়া যায় না এবং নিশ্চল বস্তুগুলিকে দেখিবার জন্য চোখের গতিকে বিপরীত দিকে ফিরাইতে হয়। আংশিকভাবে একই কারণে পায়ের গোড়ালির উপর ভর করিয়া ঘুরিবার পর থামিলে, আশেপাশের সকল বস্তুগুলিই ঘুরিতেছে দেখা যায়। ইহার কারণ প্রথম খণ্ডের চতুর্দশ পরিচ্ছেদে আলোচিত হইয়াছে।[২]

জ্যামিতিক দর্শন-ভ্রম (Geometrical Optical illusions)

সংবেদনলব্ধ বস্তুর মানস বিকৃতিকে ভ্রমপ্রত্যক্ষ বলা যায়। জ্যামিতিক দর্শনভ্রমে কোনো জ্যামিতিক রেখাচিত্র (figure) বৈজ্ঞানিক বা গাণিতিক মান অনুসারে যেরূপ প্রত্যক্ষ হওয়া উচিত সেইরূপ হয় না। যেমন একটি যথার্থ সমচতুষ্কোণের (square) উচ্চতা এবং প্রস্থ সমান হইলেও, উহার উচ্চতা প্রস্থ অপেক্ষা দীর্ঘ বলিয়া প্রত্যক্ষ হয়।

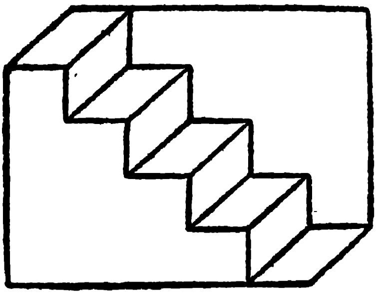
জ্যামিতিক দর্শন-ভ্রমকে প্রধানতঃ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। (১) দ্ব্যর্থবোধক বা প্রত্যাবর্তনীয় দৃষ্টিকোণ-মূলক ভ্রম (ambigucus reversible perspoc-tive); (২) পরিমাণ অথবা দূরত্ব (extent, distanee) সম্বন্ধে ভ্রম ; (৩) দিক (direction) সম্বন্ধে ভ্রম বা দিগ্‌ভ্রম।

---

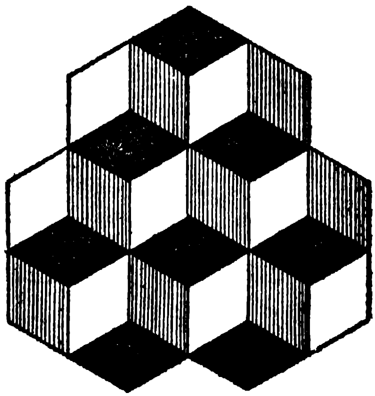
১ এম্, কলিন্‌স্ অ্যাণ্ড জে, ড্রেভার্—এক্স্‌পেরিমেণ্টাল্ সাইকলজি, পৃঃ ১০২

২। ১ম খণ্ড, পরিচ্ছেদ চতুর্দশ—১৯ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য

(১) **দ্ব্যর্থবোধক বা প্রত্যাবর্তনীয় দৃষ্টিকোণের ভ্রম** উৎপাদন করিতে হইলে, জ্যামিতিক রেখাচিত্র সাদা বা কালো পশ্চাদ্‌ভূমিতে আঁকিতে হয়। এই রেখাচিত্রের কোন নির্দিষ্ট দৃষ্টিকোণ নাই, ইহাকে দুই দিক হইতেই দেখা যাইতে পারে। দুই দিক হইতেই রেখাচিত্রটি দেখিলে একবার উহার একটি এবং আর একবার উহার অপরটি দিক দ্রষ্টার নিকটবর্তী বলিয়া প্রত্যক্ষ হয়। এই ভ্রম-প্রত্যক্ষের প্রকৃষ্ট উদাহরণ হইলে শ্রোয়েডার্-এর সিঁড়ি রেখাচিত্র (Schroeder's Steps) এবং



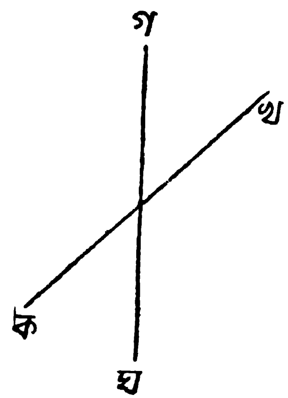
৬ নং চিত্র—শ্রোয়েডারের সিঁড়ি রেখাচিত্র



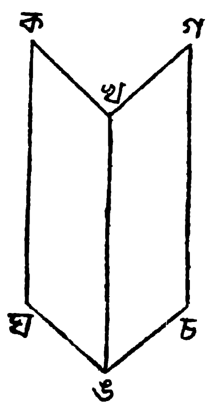
৭নং চিত্র—স্ক্রিপ্‌চার-এর প্রত্যাবর্তনীয় খণ্ডপুঞ্জ

স্ক্রিপ্‌চার-এর খণ্ডপুঞ্জ (Scripture's Blocks)। এই দুইটিকে যথাক্রমে ৭নং এবং ৮নং রেখাচিত্রে দেখানো হইল।

স্ক্রিপ্‌চার্-এর খণ্ডপুঞ্জে কতকগুলি ঘনক (cube) এমনভাবে সাজানো থাকে যে উহাদিগকে গুণিতে আরম্ভ করিলেই উহারা ফিরিয়া আসে। ইহাতে প্রত্যক্ষ ঘনকের সংখ্যা নির্ভর করে উহাদিগকে কোন্



৮ নং চিত্র—ক্রশ, বা ছেদ চিত্র



৯নং চিত্র—ম্যাক্‌-এর পুস্তক

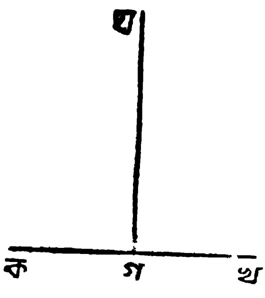
দিক হইতে দেখা হইতেছে, তাহার উপর। আবার এই রেখাচিত্রকে কতকগুলি পুঞ্জীকৃত খণ্ডরূপে দেখা যায়, যাহাদের খোলা মুখ-গুলিও অনুরূপ ভ্রম উৎপাদন করে।

শ্রোয়েডার্-এর সিঁড়ি রেখাচিত্রটিও একই প্রকার ভ্রমপ্রত্যক্ষের অবস্থা ঘটায়।

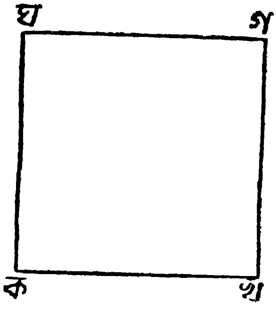
আবার ম্যাক্-এর পুস্তক (Mach's Book—১৯নং চিত্র) এই জাতীয় ভ্রম-প্রত্যক্ষের একটি রেখাচিত্র। এই চিত্রটিতে একখানি বই দেখানো হইয়াছে। মধ্য অর্থাৎ খ ঙ রেখাটিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলে, অথবা উহার শেষ প্রান্ত হইতে দৃষ্টি বাহিরের দিকে চালিত করিলে, বইখানির পশ্চাদ্ভাগ দেখা যায়। আবার বাহিরের কোনো রেখায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলে, অথবা উহার শেষ প্রান্ত হইতে দৃষ্টি ভিতরের দিকে চালাইলে, বইখানির সম্মুখভাগ দেখা যায়। আসলে কিন্তু এই চিত্রটি দুইটি সামান্তরিকের (parallelogram) সমষ্টি মাত্র।

প্রত্যাবর্তনীয় দৃষ্টিকোণের ভ্রম ১৮ নং রেখাচিত্রটিতেও ঘটে। ক্রশ্ বা কাটা চিহ্নটির ক'তে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলে, ঐ বিন্দু গ ঘ হইতে সম্মুখে চলিয়া আসে এবং কখ রেখাটি দূরের দিকে চালিত হয়। আবার খ'তে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলে খ সম্মুখে চলিয়া আসে এবং খ ক সরল রেখাটি দূরের দিকে চালিত হয়।

(২) দূরত্ব, পরিমাণ অথবা দৈর্ঘ্যের হ্রাসবৃদ্ধির প্রত্যক্ষ ভ্রম নানাপ্রকারে উৎপন্ন হয়। যেমন একটি বর্গক্ষেত্রের (square) উচ্চতা প্রস্থ অপেক্ষা বেশী দেখা যায়। ইহাকে অনুভূমিক খাড়া ভ্রম (horizontal-vertical illusion) বলে।



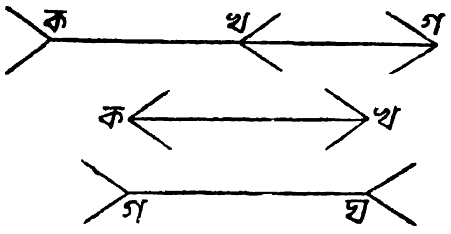
১০ নং চিত্র



১১ নং চিত্র

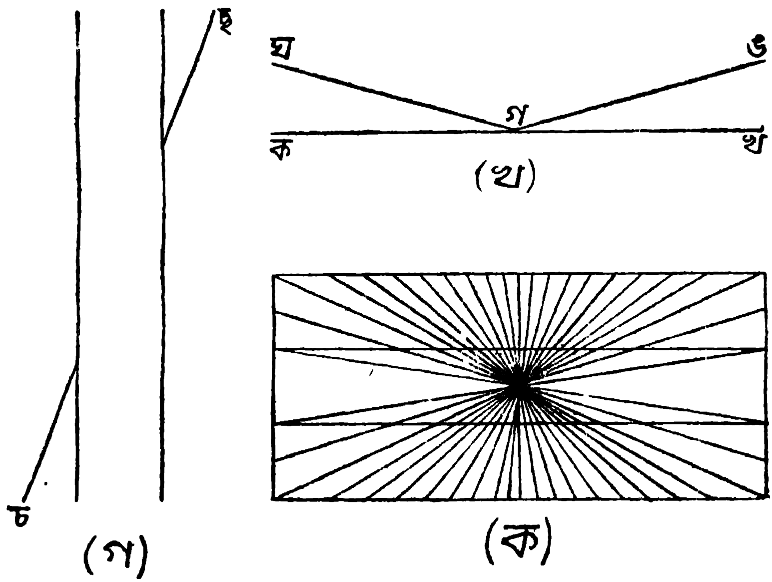
ইহাতে একটি খাড়া সরলরেখাকে (vertical line) উহার সমান অনুভূমিক সরলরেখা (horizontal line) হইতে বড় দেখায়। ১০ নং এবং ১১ নং চিত্র দ্রষ্টব্য।

দৈর্ঘ্য ভ্রমের একটি প্রসিদ্ধ উদাহরণ হইল মুয়েলার্-লায়ার ভ্রম (Muller-Lyer Illusion)। ১২ নং চিত্র দ্রষ্টব্য। এই চিত্রে পরিমাপ বা দৈর্ঘ্য অনুসারে ক খ=খ গ, এবং নীচের দুইটি চিত্রে কখ=গ ঘ। অথচ কার্যতঃ ক খ রেখাকে খ গ এবং গ ঘ রেখাকে ক খ অপেক্ষা বড় দেখায়। উভয়ক্ষেত্রেই মুক্ত (open) বা পালক-প্রান্ত (feather-end) রেখাটিকে বড় এবং আবদ্ধ (closed) বা তীর-প্রান্ত (arrow-end) রেখাটিকে ছোট বলিয়া ভ্রম হয়। এই ভ্রমের কারণ পরবর্তী অনুচ্ছেদে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।



১২ নং চিত্র -মুয়েলার-লায়ার ভ্রম রেখাচিত্র

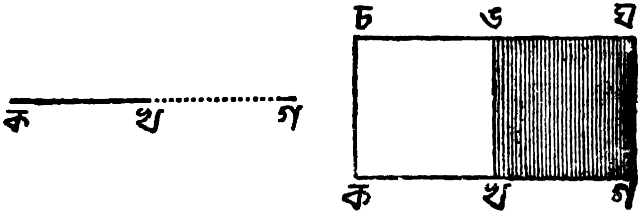
(৩) ১৩ নং (ক), (খ) এবং (গ) চিত্রে তিনটি দিগ্‌ভ্রমের দৃষ্টান্ত দেখানো হইয়াছে। কোনো কোনো অবস্থায় সরলরেখা বক্র, নোয়ানো বা ছিন্ন দেখা যায়।



১৩ নং চিত্র--(ক), (খ), (গ)—দিগ্‌ভ্রম

(ক) চিত্রে লম্বালম্বি সরলরেখা দুইটি সমান্তরাল, কিন্তু উহাদের বাঁকা

দেখাইতেছে। আবার (খ) চিত্রে ক গ খ সরলরেখাকে গ বিন্দুতে নোয়ানো দেখায়।



১৪ নং চিত্র—শূন্যস্থানের তুলনায় পূর্ণ বা খণ্ডিত সমানস্থান বড় দেখায়

(গ) চিত্রে চ ছ সরলরেখাকে দুইটি ভিন্ন সরলরেখার অংশ বলিয়া দেখায়, অথবা দেখায় যেন ছ সরলরেখা চ সরলরেখার সহিত অবিচ্ছিন্ন নয়।

আবার, শূন্যস্থানের তুলনায় পূর্ণ বা খণ্ডিত সমান স্থান বড দেখায়। ১৪নং চিত্রে দ্রষ্টব্য।

৭। ভ্রমপ্রত্যক্ষের ব্যাখ্যা

ভ্রমপ্রত্যক্ষের ব্যাখ্যায় উহার দুই জাতীয় কারণ নির্দেশ করা হইয়া থাকে। প্রথম কারণটি সংবেদনমূলক এবং দ্বিতীয় কারণটি অনুমানমূলক। **সংবেদনমূলক ব্যাখ্যায়** বলা হয় যে অক্ষিপটীয় প্রতিরূপ (retinal image) অথবা চক্ষু-সঞ্চালনের অভিজ্ঞতাই অধিকাংশ ভ্রমপ্রত্যক্ষের কারণ। যেমন খাড়া রেখাটিকে উহার সমান অনুভূমিক রেখা হইতে বড় দেখায়, কারণ প্রথমটিকে দেখিতে গিয়া দ্বিতীয়টির তুলনায় চক্ষুসঞ্চালনের শ্রম বেশী হয়। এইরূপ ব্যাখ্যার সমালোচনায় বলা যায় যে, যদি চক্ষুসঞ্চালনের কোনো সুযোগ না দিয়াই রেখা দুইটি অতি অল্প কালে দেখানো হয়, তখনও এই দৃষ্টিভ্রম ঘটিয়া থাকে।

আবার শূন্যস্থানের তুলনায় পূর্ণস্থানের পরিমাণ বা দৈর্ঘ্যের আধিক্য—ভ্রম ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলা হয় যে, যেহেতু পূর্ণস্থানের বিন্দু বা সরলরেখা দেখিতে চক্ষুর কাজ বাধা পায়, এবং শূন্যস্থান দেখিতে উহার কাজ অবাধে চলিতে পারে, সেই কারণে প্রথমটি বেশী এবং দ্বিতীয়টি কম দীর্ঘ দেখা যায়।

এই মতে **মুয়েলার্-লায়ার্ ভ্রমের ব্যাখ্যা** এইরূপ। এই ভ্রম অক্ষিপটের উপর ব্যাপ্ত কতকগুলি বৃত্ত প্রতিফলিত হইবার জন্যই ঘটিয়া থাকে। এই বৃত্তগুলি স্পষ্টতম দর্শনের স্থান অর্থাৎ পীতবিন্দু (yellow spot) হইতে বাহিরে পড়ে। ফলে তীরপ্রান্ত (arrow-end) এবং পালক-প্রান্তের (feather-end) প্রতিরূপ আবছা বা অস্পষ্ট হয়।

ফলে এই দুই প্রান্তবিশিষ্ট সরল রেখাটি ছোট দেখায়। মুয়েলার্-লায়ার্ ভ্রমপ্রত্যক্ষের উপরোক্ত ব্যাখ্যা **গ্রহণীয় নয়**, কারণ চিত্রটি চক্ষু হইতে যত দূরে স্থাপিত হয়, অর্থাৎ উহার প্রতিরূপ যে পরিমাণে স্পষ্ট দর্শনস্থানে পড়ে, এই ভ্রম সেই পরিমাণে বাড়িয়া যায়। আবার **প্রত্যাবর্তনীয় দৃষ্টিকোণ** হইতে যে সকল ভ্রমপ্রত্যক্ষ ঘটে সেইগুলিও অনেক সময় চক্ষুসঞ্চালনের অভাবে ঘটিয়া থাকে এবং উহা বর্তমান থাকিলে ঘটে না।

সংবেদনমূলক ব্যাখ্যার তুলনায় **সম্বন্ধ বা অনুমানমূলক ব্যাখ্যাই** বেশী সন্তোষজনক বলিয়া মনে হয়। গেস্টাল্ট্ মতবাদ স্বীকার না করিলেও, ইহা স্বীকার্য যে ভ্রমপ্রত্যক্ষই একটি নির্দিষ্ট সংগঠন (pattern) এবং উহার নিজস্ব স্বভাব ও সক্রিয়তা থাকে। তাহা ছাড়া, কোনো কোনো ভ্রমপ্রত্যক্ষ যে অনুশীলন এবং দীর্ঘকালীন দৃষ্টিনিবেশের ফলে দূর হইতে থাকে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। শুধু সংবেদনই ভ্রমের কারণ হইলে, ভ্রমপ্রত্যক্ষ এইরূপে কমিতে পারে না। সুতরাং সম্বন্ধ অথবা অনুমানমূলক দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটিই ভ্রম-প্রত্যক্ষের অধিকতর সঙ্গত ব্যাখ্যা বলিয়া মনে হয়।

৮। অমূল ভ্রমপ্রত্যক্ষ (Hallucination)

অমূল ভ্রমপ্রত্যক্ষ এই খণ্ডের 'কল্পনা' শীর্ষক পঞ্চম পরিচ্ছেদে আরও বিশদভাবে আলোচিত হইবে। ঐ পরিচ্ছেদের পঞ্চম অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। কিন্তু অমূল ভ্রমপ্রত্যক্ষের সহিত সমূল ভ্রমপ্রত্যক্ষের পার্থক্য বুঝা দরকার। সুতরাং, পুনরাবৃত্তি ঘটিলেও সমূল ভ্রমপ্রত্যক্ষের পরই অমূল ভ্রমপ্রত্যক্ষের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইল। উপরোক্ত স্থানেও এই পার্থক্য আলোচিত হইবে।

যে ভ্রমপ্রত্যক্ষ বাস্তব ভিত্তিমূলক না হইয়া সম্পূর্ণ মানস বা যান্ত্রিক কারণে ঘটে তাহাকে অমূল ভ্রমপ্রত্যক্ষ বলে। যেমন অন্ধকারে কোথায়ও কিছু নাই, অথচ অশরীরী ছায়ামূর্তির দর্শন হইল। অথবা যেমন মত্ত অবস্থায় চারিদিকে ইঁদুর ছুটাছুটি করিতেছে এইরূপ দেখা গেল। অথবা যেমন ঘুমের ঘোরে লেডি ম্যাক্‌বেথ্ রক্তাক্ত কৃপাণ দেখিলেন। অবশ্য ঘুমের ঘোরে রক্তাক্ত কৃপাণ দেখাকে অমূল ভ্রমপ্রত্যক্ষ না বলিয়া স্বপ্ন বলাই ভাল।[১]

অমূল এবং সমূল ভ্রমপ্রত্যক্ষের **সাদৃশ্য** এই যে উহারা উভয়ই ভ্রমপ্রত্যক্ষের প্রকারভেদ। কিন্তু ইহাদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ **পার্থক্য** রহিয়াছে। সমূল ভ্রম-প্রত্যক্ষের মূলে যেমন কোনো বাস্তব ঘটনা বা পদার্থ থাকে, অমূল ভ্রমপ্রত্যক্ষে সেইরূপ থাকে না।

১ স্বপ্ন ও অমূল ভ্রমপ্রত্যক্ষের পার্থক্য "কল্পনা" শীর্ষক পঞ্চম পরিচ্ছেদে আলোচিত হইবে।

অর্থাৎ, বাস্তব জগতের অথবা সংবেদনের দিক হইতে দেখিলে অমূল ভ্রমপ্রত্যক্ষ নিতান্ত অমূলক। পক্ষান্তরে সমূল ভ্রমপ্রত্যক্ষ সমূল, অর্থাৎ ইহার মূল বা বাস্তব ভিত্তি রহিয়াছে। ভ্রমপ্রত্যক্ষ বাস্তব সংবেদনের মানস বিকৃতি বা অপব্যাখ্যা (wrong interpretation of sensation)। কিন্তু অমূল ভ্রমপ্রত্যক্ষ বাহ্য সংস্পর্শহীন মানসপ্রত্যক্ষ। ইহা কোন বাহ্যবস্তুর দ্বারা উৎপন্ন নয়, কিন্তু মনের ক্রিয়া হইতে উদ্ভূত।

অমূল ভ্রমপ্রত্যক্ষের কারণ প্রসঙ্গে বলা যায়, যে-কোনো ইন্দ্রিয়েই ইহা আরোপিত হইতে পারে, যদিও ইহা প্রধানতঃ দর্শন এবং শ্রবণেই আরোপিত হয় বেশী। ভ্রান্তদর্শন ভ্রান্তশ্রবণ প্রভৃতি অমূল প্রত্যক্ষ স্বভাবী এবং অস্বভাবী সকল ব্যক্তির ক্ষেত্রেই ঘটিয়া থাকে। দূরদর্শন (clairvoyance) এবং দূরশ্রবণ (clairaudience) প্রভৃতি অধিকাংশ স্থলেই অমূল ভ্রমপ্রত্যক্ষ। অমূল ভ্রম-প্রত্যক্ষ প্রধানতঃ **মানসিক এবং যান্ত্রিক কারণে** ঘটিয়া থাকে। সংবেশন (hypnosis) দ্বারা এই ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ উৎপন্ন করা যায়। এইরূপ অমূল ভ্রম-প্রত্যক্ষ সদর্থক (positive) এবং নঞর্থক (negative) হইতে পারে। সদর্থক অমূল ভ্রমপ্রত্যক্ষে বাস্তব-ভিত্তিহীন সংবেদন জন্মে, যেমন সংবেশিত ব্যক্তি তাহার সম্মুখে অনুপস্থিত ব্যক্তিকে দেখিতে পায় এবং তাহার সহিত কথাবার্তা বলে। নঞর্থক অমূল প্রত্যক্ষে যে সকল সংবেদন বাস্তবিকই ঘটিতেছে তাহা অনুভূত হয় না। যেমন, সংবেশিত ব্যক্তি তাহার নিজ নাম, ধাম, পরিচয় প্রভৃতি ভুলিয়া যাইতে পারে।

৯। দেশ ও কাল প্রত্যক্ষ

(Perception of Space and Time)

(ক) সাধারণভাবে দেশপ্রত্যক্ষ

দেশ বা স্থানের আসল স্বরূপ কি তাহা মনোবিদ্যার আলোচ্য নয়। দেশ বা স্থান যাহাই হউক না কেন, ইহার জ্ঞান কিরূপে সম্ভব হয়, অথবা অভিজ্ঞতার দিক হইতে দেশ বা স্থান কি, তাহাই মনোবিদ্যার আলোচ্য।

দেশ শূন্য এবং পূর্ণ ভেদে দুই প্রকার। শূন্য স্থান বা দেশ (empty space,

vacuum) বুঝায় অব্যাহত বা বাধাহীন অঙ্গসঞ্চালন (unresisted movement)। ঘরের শূন্যস্থান দেখিতে বা উহাতে চলিতে গিয়া, কোথাও চক্ষুর বা হস্তপদের সঞ্চালন বাধা পায় না। এইরূপ অবাধ অঙ্গচালনার বাহন (medium) শূন্যস্থান। আবার পূর্ণস্থান (filled-up space, plenum) বলিতে বুঝায় ব্যাহত বা বাধাপ্রাপ্ত অঙ্গসঞ্চালন (resisted movement)। ঘরে চক্ষু বা হস্তপদ সঞ্চালন করিতে গিয়া ঘরের আসবাবপত্রে অথবা দেওয়ালে এই গতি ব্যাহত বা বাধাপ্রাপ্ত হইলে বুঝায় এই গতির বাধাদানকারী স্থানগুলি পূর্ণ। **ব্যাহত গতি সংবেদন হইতে পূর্ণস্থানের এবং অব্যাহত গতি সংবেদন হইতে শূন্যস্থানের প্রত্যক্ষ ঘটে।**

বস্তুর বিভিন্ন দৈশিক ধর্মগুলিও মনোবিছায় অভিজ্ঞতার মানদণ্ডে নির্ণীত হয়। বস্তুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং ঘনত্ব, পরিমাণ, ওজন, আকার, আকৃতি, মসৃণতা, কর্কশতা, দূরত্ব, নিকটত্ব প্রভৃতি সকল দৈশিক ধর্মগুলিই বুঝিতে হয় প্রত্যক্ষের মানদণ্ডে।

মনোবিছার দিক হইতে দেশ বা স্থান কতকগুলি **বিন্দুর সমষ্টি**। একটি বড় জিনিসের সহিত একটি ছোট জিনিসের পার্থক্য নির্ভর করে, উহারা যে দৈশিক বিন্দুগুলি লইয়া গঠিত, তাহাদের সংখ্যার উপর। এই বিন্দুগুলি উপরে-নীচে, ডাইনে-বাঁয়ে, সম্মুখে-পশ্চাতে, দূরে-নিকটে প্রভৃতি নানা অবস্থানে, দিকে ও দূরত্বে পরস্পর-সম্বদ্ধ। দেশ বা স্থান বলিতে বুঝায় অনেকগুলি বিন্দুর সহাবস্থান (co-existence of points)।

বাহ্য জগৎ বা জড় পদার্থই দেশ জুড়িয়া থাকে। সুতরাং দেশপ্রত্যক্ষ বলিতে জড়পদার্থের বা বহির্জগতের প্রত্যক্ষ বুঝায়। জড়পদার্থের (matter) দেশ জুড়িয়া থাকা (extension) ছাড়া, ওজন, পরিমাণ, ঘনত্ব, সংখ্যা, গতি প্রভৃতি গুণগুলিকে বলা হয় **মুখ্য গুণ** (primary qualities)। দেকার্তে, লক্ প্রভৃতি মনোবিদ্‌গণের মতে এই মুখ্যগুণগুলি জড়পদার্থের নিজস্ব গুণ। ইহারা প্রত্যক্ষ হউক বা না হউক, ইহারা বাস্তব সত্য। আবার এই মুখ্য বা প্রাথমিক গুণগুলি ছাড়াও, জড়পদার্থের আরও কতগুলি গুণ আছে যাহাদের বলা হয় **গৌণ গুণ** (secondary qualities), যেমন রং, শব্দ কাঠিন্য, গন্ধ, স্বাদ প্রভৃতি। ইহারা জড়বস্তুর নিজস্ব বা আসল গুণ নয়, কিন্তু চক্ষু, নাসিকা, জিহ্বা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সহিত বস্তুর সংযোগ-হেতু উৎপন্ন গুণ।

দেশপ্রত্যক্ষ বলিতে শূন্য ও পূর্ণভেদে **দুই প্রকার দেশের প্রত্যক্ষ** বুঝায়। পূর্ণ দেশপ্রত্যক্ষ বলিতে আবার বহির্বিশ্বের বিভিন্ন জড়পদার্থের প্রত্যক্ষ বুঝায়। আবার জড়পদার্থের প্রত্যক্ষ বলিতে বুঝায় উহা যে সকল দৈশিক বিন্দু লইয়া গঠিত

উহাদের নানা অবস্থান, দিক, দূরত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধগুলির প্রত্যক্ষ। অধিকন্তু, জড়পদার্থের প্রত্যক্ষ হইল উহার মুখ্য ও গৌণ গুণগুলির প্রত্যক্ষ। তাহা ছাড়া, ইহাও মনে রাখা দরকার যে প্রত্যক্ষ একটি কালিক ঘটনা। ইহা কোনো কালে সংঘটিত হয়। সুতরাং বাহ্য জড়পদার্থের দৈশিক প্রত্যক্ষের সহিত উহার কালিক প্রত্যক্ষও বুঝিতে হইবে।

(খ) দেশের স্পর্শপ্রত্যক্ষ

(Tactual Perception of Space)

স্বাদ ও ঘ্রাণ সংবেদনের বাহ্য জগৎ বিষয়ে জ্ঞান উৎপন্ন করিবার ক্ষমতা কম। শ্রবণ সংবেদন সাহায্যে বাহ্য জগতের যে জ্ঞান হয়, তাহাও সামান্য। এই জ্ঞান উৎপন্ন করিবার সর্বাপেক্ষা বেশী ক্ষমতা স্পর্শ ও দর্শন সংবেদনের। **স্পর্শ ও দর্শন প্রত্যক্ষই বহির্বিশ্বকে জানিবার দুইটি দ্বার।** অবশ্য মানুষের বহির্বিশ্ব প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে এই কথা খাটিলেও, মনুষ্যেতর প্রাণীর বহির্বিশ্ব প্রত্যক্ষে উহা খাটে না। কারণ নিম্নতর প্রাণীর ইন্দ্রিয়গুলির মধ্যে দর্শন ও স্পর্শের তত প্রাধান্য নাই, যত আছে শ্রবণ, স্বাদ ও ঘ্রাণ সংবেদনের। যেমন মৎস্য, পিপীলিকা প্রভৃতির বহির্বিশ্বের প্রত্যক্ষে ঘ্রাণ সংবেদনের স্থান সর্বাধিক।

কাহারও কাহারও মতে দর্শন অপেক্ষা স্পর্শই জড়জগৎকে প্রত্যক্ষ করিবার প্রকৃষ্টতর উপায়। যাহারা জন্মান্ধ, তাহাদের পক্ষে স্পর্শই এই জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায়। **জন্মান্ধের বহির্জগৎপ্রত্যক্ষ স্পর্শপ্রত্যক্ষ।** পক্ষান্তরে যাহারা চক্ষুষ্মান বা দর্শনক্ষম, তাহারা স্পর্শের সহিত দর্শন এবং দর্শনের সহিত স্পর্শ মিলিত করিয়া এই জ্ঞানলাভের সুবিধা পায়।

জন্মান্ধ ব্যক্তির দেশপ্রত্যক্ষ

(Spatial Perception of the Congenitally blind)

জন্মান্ধ ব্যক্তির, দেশপ্রত্যক্ষ কিরূপে সংঘটিত হয়? হাতের কাছে টেবিলটিকে জন্মান্ধ ব্যক্তি কিরূপে প্রত্যক্ষ করে তাহা দেখা যাউক। এই ব্যক্তি তাহার ডান হাতটি টেবিলের উপর রাখিল। এই একটি স্পর্শনক্রিয়ায় টেবিলের যতটুকু অংশ তাহার ডান হাতের সংস্পর্শে আসিল, টেবিলটি যে অন্ততঃ ততটুকু, তাহা সে প্রত্যক্ষ করিল। টেবিলটি যদি তাহার করতলের মত ছোট হইত, তাহা হইলে এই একটি স্পর্শনেই মোটের উপর গোটা টেবিলটিকে সে প্রত্যক্ষ করিতে পারিত। এইরূপ

স্পর্শপ্রত্যক্ষে হাত চালাইবার বা সঞ্চালন করিবার, অর্থাৎ সক্রিয় স্পর্শের, দরকার নাই, কারণ ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে টেবিলটির আকার এই জন্মান্ধ ব্যক্তির দক্ষিণ করতলের সমান। এইরূপ গতিবিহীন স্পর্শের নাম **নিষ্ক্রিয় স্পর্শ** (passive touch) ।

টেবিলটি করতলাকার বলিতে মনোবিদ্যার দিক হইতে বুঝায় যে, করতলের যে স্পর্শবিন্দুগুলি (touch spots) টেবিলের সংস্পর্শে আসিয়া উদ্দীপিত হইয়াছে, উহার আকার ঐগুলির সমান। প্রত্যেকটি স্পর্শবিন্দুরই একটি **স্থানীয় সঙ্কেত** (local sign) আছে, যাহার ফলে উহা উদ্দীপিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই অন্যান্য স্পর্শবিন্দুর সহিত তুলনায় উহা কোথায় অবস্থিত তাহা প্রত্যক্ষ হয়। ধরিয়া লওয়া গেল যে টেবিলের সংস্পর্শে আসিয়া করতলের যে স্পর্শবিন্দুগুলি উদ্দীপিত হইয়াছে উহারা ক´, খ´, গ´, ঘ´, এবং ঙ´, এবং টেবিলের উদ্দীপক দেশ-বিন্দুগুলি যথাক্রমে ক, খ, গ, ঘ, এবং ঙ। ক´ বিন্দু উদ্দীপিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যক্ষ হয় যে ইহা অন্যান্য বিন্দুগুলির বাম দিকে। আবার খ´ বিন্দু উদ্দীপিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যক্ষ হয় উহা ক´ বিন্দুর ডান দিকে এবং অন্যান্য বিন্দুগুলির বামদিকে। অনুরূপভাবে প্রত্যেকটি বিন্দুরই নিজস্ব স্থানীয় সঙ্কেত রহিয়াছে। তাহা হইলে টেবিলটির ক, খ, গ, ঘ এবং ঙ এই উদ্দীপক দেশ-বিন্দুগুলি যথাক্রমে করতলের ক´, খ´, গ´, ঘ´, এবং ঙ´ বিন্দুগুলি উদ্দীপিত করিয়াছে এবং করতলের উদ্দীপিত বিন্দুগুলির পারস্পরিক সম্বন্ধ যেরূপ, টেবিলের উদ্দীপক বিন্দুগুলির সম্বন্ধও সেইরূপ এই প্রকার প্রত্যক্ষ ঘটিল।

টেবিলের আকৃতি করতলের সমান ধরিয়া লইলেও, হয়ত উহার প্রকৃত আকৃতি করতল অপেক্ষা বড়। সুতরাং গোটা টেবিলের দৈশিক পরিমাণ বা আকার করতলের একটি মাত্র নিষ্ক্রিয় স্পর্শ দ্বারা প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হয় না। এই উদ্দেশ্যে কয়েকটি নিষ্ক্রিয় স্পর্শ অথবা স্পর্শের সহিত করতলসঞ্চালন দরকার হইবে। এইরূপ অঙ্গসঞ্চালনের সঙ্গে সঙ্গে স্পর্শনকে **সক্রিয় স্পর্শ** (active touch) বলে। সক্রিয় স্পর্শের সাহায্যে টেবিলের বিভিন্ন অংশগুলিকে পূর্বাপরভাবে স্পর্শ করিয়াই এই বস্তুটির পূর্ণাঙ্গ প্রত্যক্ষ সম্ভব। এইরূপ পুনঃ পুনঃ এবং পর পর টেবিলের অংশগুলি গতি বা হস্ত সঞ্চালনের সাহায্যে স্পর্শ করিয়া, অর্থাৎ স্পর্শ সংবেদনের সহিত পেশী সংবেদন (muscular sensation) যুক্ত করিয়া, টেবিলের আকার এবং আয়তন প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হয়। বস্তুর বিভিন্ন অংশগুলি মধ্যে, কোন্‌টি কোন অংশের সম্বন্ধে কোথায়, কোন্ দিকে এবং কতদূরে বা নিকটে অবস্থিত, প্রত্যক্ষের এই সকল জ্ঞাতব্য

বিষয় সক্রিয় স্পর্শের সাহায্যে জানা যায়। কিন্তু নিষ্ক্রিয় স্পর্শের সাহায্যে কোনো ক্ষুদ্র বস্তুকে **কতকগুলি বিন্দুর সহাবস্থান** (co-existence of points) রূপেই জানা যায় মাত্র। ঐ বিন্দুগুলির পারস্পরিক সম্বন্ধ, যেমন অবস্থিতি, দিক এবং দূরত্ব বা নিকটত্ব প্রভৃতি, প্রত্যক্ষ করিলে হইলে শুধু নিষ্ক্রিয় স্পর্শই যথেষ্ট নয়, কিন্তু উহার সহিত সক্রিয় স্পর্শের অর্থাৎ গতি-স্পর্শ সংবেদনের (tactuo-muscular sensation) প্রয়োজন হয়।

কিন্তু **সক্রিয় স্পর্শের** ভেদ রহিয়াছে, যেমন **পরিমাণগত** (quantitative) এবং **প্রকারগত** (qualitative) ভেদ)। টেবিলটির দৈর্ঘ্য কোন্‌টি এবং প্রস্থ কোন্‌টি তাহা প্রত্যক্ষ করিতে হইলে, জন্মান্ধ ব্যক্তি টেবিলের উপর হস্ত সঞ্চালন করিয়া দেখিবে যে উহার কোন্ প্রান্ত হইতে কোন্ প্রান্ত পর্যন্ত হস্ত সঞ্চালন করিয়া উহাকে স্পর্শ করিতে সক্রিয় স্পর্শ, অর্থাৎ পেশী ও স্পর্শ সংবেদনের পরিমাণ বেশী হয়। বলা বাহুল্য, যে প্রান্ত হইতে যে প্রান্ত পর্যন্ত প্রত্যক্ষ করিতে স্পর্শ ও পেশী সংবেদনের পরিমাণ বেশী হয়, তাহাই টেবিলটির **দৈর্ঘ্য** এবং যে প্রান্ত হইতে যে প্রান্ত পর্যন্ত প্রত্যক্ষ করিতে স্পর্শ ও পেশী সংবেদনের মাত্রা কম তাহাই টেবিলের **প্রস্থ**। এইরূপে টেবিলটি কত বড় তাহার প্রত্যক্ষ নির্ভর করে উহাতে হস্তসঞ্চালন করিতে কি পরিমাণ পেশীয় স্পর্শ বা সক্রিয় স্পর্শ সংবেদন লাগে, তাহার উপর।

সুতরাং জন্মান্ধ ব্যক্তির ক্ষেত্রে টেবিলের অথবা অন্য যে কোনো বাহ্য প্রত্যক্ষ বস্তুর পরিমাণ বুঝিতে হইলে, উহাকে সক্রিয় স্পর্শের **মাত্রা বা পরিমাণ** (quan tity) দিয়া বুঝিতে হইবে। কিন্তু সহাবস্থিত বিন্দুগুলির পারস্পরিক অবস্থিতি এবং দিক প্রত্যক্ষ করিতে হইবে সক্রিয় স্পর্শ সংবেদনের **গুণ** (quality) দ্বারা। টেবিলের ক, খ, গ, ঘ এবং ঙ বিন্দুগুলির একটি অপরটির সহিত কিরূপে সম্বন্ধ (relation), একটি অপরটির কোন্ দিকে অবস্থিত (direction, position), ইহা প্রত্যক্ষ করিতে হইলে সক্রিয় স্পর্শ সংবেদনের প্রকার বা গুণের উপর নির্ভর করিতে হয়। ডান দিক হইতে বাম দিকে হস্তসঞ্চালন করিতে হইলে যে জাতীয় সক্রিয় স্পর্শ করিতে হয়, বাম দিক হইতে ডান দিকে, উপর হইতে নীচে, নীচ হইতে উপরে, সম্মুখ হইতে পশ্চাতে এবং পশ্চাৎ হইতে সম্মুখে হস্তসঞ্চালনের সক্রিয় স্পর্শ উহার তুলনায় ভিন্নজাতীয়, এমন কি বিপরীতও, হইতে পারে। এই সকল ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি সক্রিয় স্পর্শ সংবেদনে **বিভিন্ন প্রকারের পেশী সংবেদন** জন্মে এবং এই ভিন্ন সক্রিয় স্পর্শই সহাবস্থিত বিন্দুগুলির দিক এবং পারস্পরিক অবস্থান প্রত্যক্ষ করিতে সাহায্য

করে। পাখাটি যে মাথার উপরে এবং টেবিলটি পাখার নীচে, ইহা বুঝিতে পারা যায়, উহাদিগকে স্পর্শ করিতে হইলে যে বিপরীত সক্রিয় স্পর্শ প্রয়োজন, তাহার সংবেদন দ্বারা। হাত তুলিবার সক্রিয় স্পর্শ যে হাত নামাইবার সক্রিয় স্পর্শের বিপরীত, তাহা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় ধরা পড়ে।

সুতরাং, জন্মান্ধ ব্যক্তি **পেশীয় এবং স্পর্শ সংবেদনের পরিমাণ বা মাত্রাভেদ অনুসারে বস্তুর পরিমাণ, যেমন দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বেধ, দূরত্ব, নিকটত্ব প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করে. এবং এই সংবেদনের প্রকার বা গুণভেদ অনুসারে বস্তুর অবস্থিতি, দিক, পারস্পরিক সম্বন্ধ প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করে।**

(গ) দেশের দর্শন-প্রত্যক্ষ
(Visual Perception of Space)

জন্মান্ধ ব্যক্তি পেশী ও স্পর্শ সংবেদন সাহায্যে দেশ প্রত্যক্ষ করে। কিন্তু **চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তির দেশপ্রত্যক্ষে** দর্শন সংবেদনও প্রধান অংশ গ্রহণ করে। স্বাভাবিক দেশপ্রত্যক্ষে স্পর্শের তুলনায় দর্শনের গুরুত্ব কম নয়।

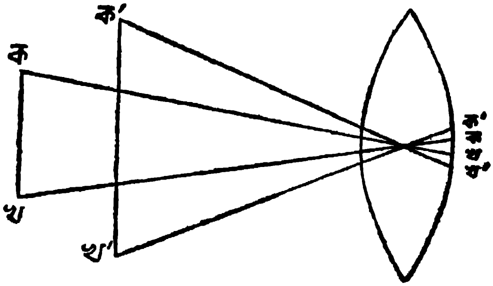
স্পর্শ সংবেদনের মত, দর্শন সংবেদনও পেশী সংবেদনের সাহায্যে অথবা উহার সাহায্য না লইয়া, অর্থাৎ সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় ভাবে, ঘটিতে পারে। নিষ্ক্রিয় দর্শন সংবেদনে চক্ষুসঞ্চালন থাকে না কিন্তু সক্রিয় দর্শন সংবেদনে চক্ষুপেশীর ক্রিয়ার ফলে চক্ষু সঞ্চালিত হয়। যেমন এক দৃষ্টিতে, অথবা একটি চোখের পলকে টেবিলটি দেখিয়া লইলাম। টেবিলটি ছোট হইলে অবশ্যই উহাকে এক পলকে অথবা চক্ষুসঞ্চালন না করিয়াই দেখা যায়। এই একটি দৃষ্টিতে দেখার নাম **নিষ্ক্রিয় দর্শন** (passive sight)। আবার টেবিলটি যদি প্রকাণ্ড হয়, তাহা হইলে উহাকে এক পলকে দেখিয়া লওয়া যায় না, কিন্তু চক্ষু ঘুরাইয়া ফিরাইয়া, অর্থাৎ **সক্রিয় দৃষ্টির** (active sight) সাহায্যে দেখিতে হয়।

স্পর্শ সংবেদনের মত দর্শন সংবেদনেরও **পরিমাণ** অনুসারে দৈশিক পরিমাণ, দূরত্ব প্রভৃতি গুণ প্রত্যক্ষ হয়, এবং ইহার প্রকার বা **গুণভেদ** অনুসারে দৈশিক অবস্থিতি অথবা অন্য বস্তুর সহিত সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ হয়। চর্মে স্পর্শবিন্দুর মত অক্ষিপটেও দর্শনবিন্দু আছে। আবার স্পর্শ সংবেদনের মত দর্শন সংবেদনের ক্ষেত্রেও প্রত্যক্ষ বস্তুর অবস্থিতি, সম্বন্ধ প্রভৃতি ধর্মগুলি অক্ষিপটের কোন্ বিন্দুতে বস্তুটি প্রতিফলিত হয়, তাহার উপর নির্ভর করে। অক্ষিপটের দর্শনবিন্দুগুলি, অর্থাৎ যে বিন্দুতে প্রত্যক্ষ

বস্তু প্রতিফলিত হয়, যেমন ডান-বাম, উপর-নীচ, সম্মুখ-পশ্চাৎ প্রভৃতি, যে ক্রমে সম্বদ্ধ, উহাদের উপর প্রতিফলিত বস্তুর বিন্দুগুলিও সেই ক্রমানুসারে সম্বদ্ধ।

বস্তুর পরিমাণ, অর্থাৎ বস্তুটি ছোট কি বড় তাহাও, নির্ভর করে দৃষ্টিবিন্দু বা **দৃষ্টিকোণের** (angle of vision) উপর। দৃষ্টবস্তু হইতে প্রসূত আলোকরশ্মি অক্ষিমুকুর প্রভৃতি চক্ষুগোলকের স্তর অতিক্রম করিবার কালে প্রতিসৃত (refracted) হইয়া অক্ষিপটে বিপরীতভাবে প্রতিফলিত হয়। ফলে অক্ষিপটের সহিত দৃষ্টবস্তুর একটি কোণ গঠিত হয়। এই কোণের পরিমাণ অনুসারে দৃষ্টবস্তুর আকার বা পরিমাণ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে।

একই আকারের দুইটি বস্তু যথা ক খ এবং ক′ খ′ চক্ষুর দূরে ও নিকটে অবস্থিত হইলে উহারা অক্ষিপটে যথাক্রমে ছোট এবং বড় দৃষ্টিকোণ গঠন করে এবং ঐ কারণে দূরের বস্তুটি ছোট ও নিকটের বস্তুটি বড দেখায়। উপরের ১৫ নং প্রতিসরণ (refraction) চিত্রে ইহা দেখানো হইয়াছে।



১৫ নং চিত্র—প্রতিসরণ (Refraction)

অবশ্য দর্শন-প্রত্যক্ষের এই ব্যাখ্যা যতটা শারীরবৃত্তীয় ততটা মনোবৈজ্ঞানিক নয়। সংবেদন ও প্রত্যক্ষের মনোবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা যে অনেকাংশে শারীরবৃত্তীয় হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই, কারণ এই দুইটি মানসবৃত্তিতেই ইন্দ্রিয়-যন্ত্র এবং কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্রের ক্রিয়া স্থূলভাবে প্রকট। মনোবিদ্যার দিক হইতে বলা যায় যে, সক্রিয় দর্শনপ্রত্যক্ষের সংশ্লিষ্ট চক্ষুর পেশী-সংবেদন দৃষ্টবস্তুর প্রত্যক্ষে প্রভাব বিস্তার করে। একটি বস্তুকে দেখিতে হইলে উহাকে স্পষ্ট দর্শন-রেখায় (clear line of vision) আনিতে হয় এবং এই ক্রিয়ায় চক্ষুকে ডানে-বামে, উপরে-নীচে, সম্মুখে-পশ্চাতে সঞ্চালিত করিতে হয়। চক্ষুসঞ্চালনের এই বিভিন্ন-প্রকার ক্রিয়াগুলি দৃষ্টবস্তুর অবস্থিতি, সম্বন্ধ, দিক্ প্রভৃতির নির্ণয়ে সহায়তা করে।

মোটের উপর, স্পর্শপ্রত্যক্ষের মূলনীতি দর্শন-প্রত্যক্ষেও প্রযোজ্য। এই **দুই প্রত্যক্ষের পার্থক্য** এই যে, চক্ষু উহার বিবর হইতে দৃশ্যবস্তুর নিকট ছুটিয়া যায় না,

কিন্তু ত্বগিন্দ্রিয় পেশীর সাহায্যে প্রত্যক্ষ বস্তুর নিকট যাইয়া উহার স্পর্শজ্ঞান লাভ করে। চক্ষু উহার বিবরে অবস্থিত হইয়াই দৃশ্যবস্তুর বিভিন্ন ধর্মগুলি প্রত্যক্ষ করে। অবশ্য ন্যায় প্রভৃতি ভারতীয় দর্শনমতে চক্ষুও স্পর্শেন্দ্রিয়ের ন্যায় দৃশ্যবস্তুর নিকট আলোকরশ্মির মধ্য দিয়া গমন করে এবং ঐ আলোকরশ্মি বস্তুর আকারে আকারিত হওয়ার ফলে প্রত্যক্ষ সম্ভব হয়।

(ঘ) এক-চাক্ষুষ (Monocular) এবং দ্বি-চাক্ষুষ (Binocular) প্রত্যক্ষ

দুইটি চক্ষুর সাহায্যে দর্শনপ্রত্যক্ষকে দ্বিচাক্ষুষ এবং একটি চক্ষুর সাহায্যে দর্শন-প্রত্যক্ষকে এক-চাক্ষুষ দর্শনপ্রত্যক্ষ বলে।

সাধারণতঃ দুই চক্ষুর সাহায্যেই দর্শনপ্রত্যক্ষ ঘটে, অর্থাৎ সাধারণ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষকে দ্বি-চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ বলা যায়। এক-চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ সাধারণ নয়। কিন্তু যাহাদের এক চক্ষু নিষ্ক্রিয়, অথবা যাহারা প্রয়োগশালায় এক চক্ষু বন্ধ করিয়া দর্শনপ্রত্যক্ষের অনুশীলন করে, তাহাদের দর্শনপ্রত্যক্ষ এক-চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ। অবশ্য এই ক্ষেত্রেও এক-চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ প্রায়ই অতীত দ্বি চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ দ্বারা প্রভাবিত হয়।

এক চক্ষু দিয়া দূরত্ব দর্শন অস্পষ্ট বা আবছা ভাবে হয়। যাহারা একটি চক্ষুর সাহায্য হইতে বঞ্চিত, তাহাদের দূরত্বজ্ঞান যে অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট তাহাতে সন্দেহ নাই। এক-চাক্ষুষ দূরত্ব প্রত্যক্ষ কতকগুলি **দর্শনের সূচক বা চিহ্নের** (visual signs) সাহায্যে সাধিত হইয়া থাকে। যেমন, (১) কোনো বস্তুর আকারকে উহার পরিচিত আকার অপেক্ষা **ছোট দেখাইলে** বুঝা যায় যে উহা দূরে অবস্থিত। (২) আবার দুইটি সমান্তরাল রেখা একস্থানাভিমুখী হইতেছে (convergence) দেখিলেও, ঐ রেখা দুইটির দূরত্ব বুঝা যায়। (৩) বস্তুর **অস্পষ্টতা** এবং উহাতে অবস্থিত গাছপালা প্রভৃতির **রং-এর পরিবর্তন** প্রভৃতি দেখিয়াও বুঝা যায় যে উহা দূরে অবস্থিত। (৪) **'আলো-ছায়ার খেলা'** (play of light and shade) দেখিয়াও ছায়াময় অংশ দূরে এবং আলোকময় অংশ নিকটে বলিয়া দেখা যায়। (৫) গতিশীল দ্রষ্টার **দৃষ্টিবিন্দুর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আপাতদৃষ্ট স্থান পরিবর্তন দেখিয়াও** (parallax) দূরত্ব বা নিকটত্বের দর্শন-প্রত্যক্ষ হয়। ধাবমান রেলগাড়িতে বসিয়া নিকটবর্তী বস্তুগুলি বিপরীত দিকে এবং দূরবর্তী বস্তুগুলি সঙ্গে সঙ্গে দৌড়াইতেছে দেখা যায়। (৬) অধিকন্তু, এক-চাক্ষুষ প্রত্যক্ষেও নিকট এবং দূরবর্তী বস্তুর সহিত

চক্ষুকে উপযোজিত (accommodated) করিতে হয় এবং এই উপযোজনে বস্তুর নিকটত্ব বা দূরত্ব অনুসারে অক্ষিমুকুরকে বেশী বা কম ন্যুব্জ (convex) করিতে হয়। এই ক্রিয়ায় চক্ষুপেশীর যে শ্রম বা টান (strain) অনুভূত হয়, তাহাই বস্তুর নিকটত্ব বা দূরত্বের পরিমাপ করে।

উপরোক্ত লক্ষণগুলির সাহায্যে **এক-চাক্ষুষ দর্শনে** দৃষ্টবস্তুর দূরত্ব বা নিকটত্ব সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে।

দ্বি-চাক্ষুষ দর্শনে উপরের লক্ষণগুলি ছাড়া আরও কতকগুলি দর্শনের সূচক-চিহ্ন বর্তমান থাকে। যেমন, দুই চক্ষু দিয়া একই বস্তুকে দেখিলে, দুই চক্ষু একটি দর্শন-যন্ত্ররূপে কাজ করে এবং উহাদের দুইটি অক্ষকেই (axis), অর্থাৎ পীতবিন্দু হইতে অক্ষিমুকুরের মধ্য দিয়া দৃষ্টবস্তু পর্যন্ত কল্পিত রেখাকে, কমবেশী একস্থানাভিমুখী (Converge) করিতে হয়। দুইটি অক্ষিমুকুরের অক্ষদ্বয়কে এইরূপ করিতে হইলে চক্ষুপেশীগুলির যে শ্রম হয়, তাহার পরিমাণ অনুসারে দৃষ্ট-বস্তুর দূরত্ব বুঝা যাইতে পারে। বস্তুটি অত্যন্ত নিকটবর্তী হইলে, এই পেশীর শ্রম অত্যধিক হয়। আবার উহা যত দূরে হয়, চক্ষুর পেশীর শ্রম তত কম হইয়া থাকে।

দ্বি-চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে একটি বস্তুদর্শন

দুইটি চক্ষু দিয়া একই বস্তুকে দেখিলে, দুই অক্ষিপটের দুইটি পীতবিন্দুতে বস্তুর দুইটি প্রতিরূপ (image) প্রতিফলিত হয়। এই অবস্থায় বস্তুটিকে দুইটি বস্তুরূপে দেখা উচিত। কিন্তু বস্তুতঃ এই অবস্থায়ও একটি বস্তু দুইটি রূপে দৃষ্ট না হইয়া একটি রূপেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহার কারণ এই যে **চক্ষু দুইটি হইলেও, উহারা একটি দর্শনেন্দ্রিয়রূপে কাজ করে।** প্রশ্ন এই যে **কিরূপে দুইটি চক্ষু** একটি বস্তুদর্শনে একটি ইন্দ্রিয়রূপে কাজ করিয়া **একটি বস্তুর প্রত্যক্ষ জন্মায়।**

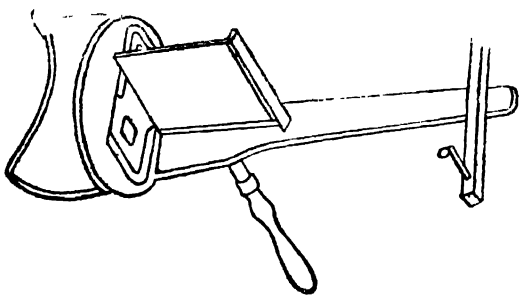
মনে করা যাউক, দুইটি অক্ষিপটের একটিকে অপরটির উপর এইরূপভাবে স্থাপন করা হইল যে উহারা সর্বসম হয়। এইবার একটি পিন দিয়া উহাদের যে স্থানেই বিদ্ধ করা হউক না কেন, উহারা **সদৃশ বিন্দুতে** (similar or corresponding points) বিদ্ধ হইবে। এই সদৃশ বিন্দুগুলি ছাড়া অন্য বিন্দুগুলি **বিসদৃশ** (Dissimilar or non-corresponding points) বিন্দু। দুইটি চক্ষু দ্বারা দৃষ্ট একটি বস্তু তখনই একটি বস্তুরূপে দৃষ্ট হয়, যখন উহা দুই পীতবিন্দুর সদৃশ বিন্দুতে প্রতিফলিত হয়। কিন্তু ঐ বস্তু কোনো কারণে দুই পীতবিন্দুর বিসদৃশ বিন্দুতে প্রতিফলিত হইলে, উহা একটি বস্তুরূপে প্রত্যক্ষ না হইয়া দুইটি বস্তুরূপে প্রত্যক্ষ হয়।

একটি সাধারণ **পরীক্ষা দ্বারা বস্তুর একত্ব বা দ্বিত্বদর্শন** সহজবোধ্য হইতে পারে। তর্জনী আঙ্গুলটি সম্মুখে ধরিয়া উহাতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যাউক। এইবার তর্জনী ও চক্ষুর মধ্যবর্তী স্থানে অপর কোনো বস্তু, যেমন একটী পেন্সিল, ধরা হইল। এইরূপ অবস্থায় পেন্সিলটি দুইটি দেখা যায়। এই স্থলে একটি তর্জনী একটিই এবং একটি পেন্সিল দুইটি দৃষ্ট হয় কেন? উত্তর এই যে, দুই চক্ষুই দূরবর্তী তর্জনীতে নিবদ্ধ থাকায়, উহার প্রতিরূপ দুই অক্ষিপটের সদৃশ বিন্দুতে প্রতিফলিত হয় বলিয়া তর্জনীটি **একটি রূপে দৃষ্ট হয়।** কিন্তু চক্ষু দুইটি দূরবর্তী তর্জনীতে নিবদ্ধ থাকায়, চক্ষু এবং তর্জনীর মধ্যবর্তী পেন্সিলের প্রতিরূপ দুই অক্ষিপটের বিসদৃশ বিন্দুতে প্রতিফলিত হয় এবং একটি পেন্সিল **দুইটি রূপে দৃষ্ট হয়।**

(ঘ) ঘনত্ব বা স্থূলত্ব প্রত্যক্ষ (Perception of Solidity)

ঘনত্ব বলিতে আমরা বস্তুর সেই দৈশিক গুণ বুঝি, যাহার ফলে বস্তুর একটি প্রান্ত চক্ষুর নিকটে আর একটি প্রান্ত দূরে দেখায়। ইহা বস্তুর দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ হইতে পৃথক একটি তৃতীয় গুণ।

আমরা দেখিয়াছি যে একটি বস্তু দুই অক্ষিপটের সদৃশ বিন্দুতে প্রতিফলিত হইলে একটি এবং বিসদৃশ বিন্দুতে প্রতিফলিত হইলে দুইটি দেখায়। এইরূপও হইতে পারে যে, বস্তুটি দুই অক্ষিপটের ঠিক সদৃশ বা ঠিক বিসদৃশ বিন্দুতে প্রতিফলিত না হইয়া উহাদের নিকটবর্তী বিন্দুতে প্রতিফলিত হইল। এইরূপ ক্ষেত্রে বস্তুটি যে একটি রূপে প্রত্যক্ষ হইবে তাহা নয়, আবার ইহা যে দুইটিরূপে প্রত্যক্ষ হইবে তাহাও নয়, কিন্তু বস্তুটির প্রত্যক্ষ এই দুই প্রকার প্রত্যক্ষের মাঝামাঝি হইবে, অর্থাৎ বস্তুটি ঘনত্ব-বিশিষ্ট বলিয়া প্রত্যক্ষ হইবে। তাহা হইলে বস্তুর একত্ব এবং দ্বিত্ব দর্শনের মাঝামাঝি বা উহাদের আপোষমূলক দর্শনই বস্তুর ঘনত্ব দর্শন।[১]

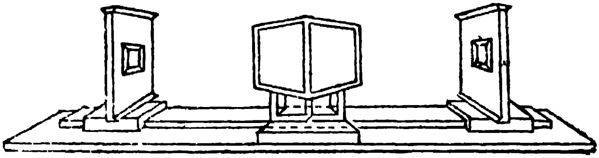


১৬ নং চিত্র—ব্রুস্টার-এর প্রতিসারক (Refraction) স্টিরিয়স্কোপ

[১] ই, বি, টিশ্‌নার—এ টেক্স্‌ট্‌ বুক্‌ অফ্‌ সাইকলজি—পৃঃ ৩১০

ঘনদৃগ্‌দর্শন (Steresoscopic Vision)

ঘনদৃক্ (stereoscope) সাহায্যে উপরোক্ত ঘনত্ব দর্শনের পরীক্ষা করা যাইতে পারে। ঘনদৃক্ যন্ত্রে একই বস্তুর দুইটি ছবি মিলিত হইয়া ঘনত্বের প্রত্যক্ষ উৎপন্ন করে। বস্তুর এই ছবি দুইটি যথাক্রমে ডান এবং বাম চক্ষু দিয়া বস্তুটিকে যেরূপ দেখা



১৭ নং চিত্র—ঘনদৃক্‌যন্ত্র হোয়েটস্টোন-এর প্রতিভাসক (reflecting) স্টিরিয়স্কোপ

যায়, তাহার ছবি। পৃথকভাবে কোনো ছবিতেই বস্তুর ঘনত্ব দেখা যায় না. ইহাতে শুধু বস্তুর দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ দেখা যায়। কিন্তু ডান চক্ষু দিয়া বস্তুর ডান দিক প্রত্যক্ষ হয় এবং বাম চক্ষু দিয়া উহার বাম দিক প্রত্যক্ষ হয। দুইটি চক্ষুর দ্বারা দৃষ্ট এই সামান্য পৃথক ছবি দুইটি দৃক্‌যন্ত্রে মিলিত হইয়া যে বস্তুর প্রত্যক্ষ ঘটায়, তাহা দুইটি নয় বা একটিও নয়, কিন্তু এই দুই প্রকার প্রত্যক্ষের মাঝামাঝি একপ্রকারের প্রত্যক্ষ, অর্থাৎ বস্তুর ঘনত্ব প্রত্যক্ষ।

যেমন দৃক্‌যন্ত্রের সাহায্যে একটি দেওয়ালের ঘনত্ব প্রত্যক্ষ এইরূপে বুঝানো যাইতে পারে। বাম চক্ষু দিয়া দেওয়ালটি যেরূপ দেখা যায় তাহার একটি ছবি, এবং ডান চক্ষু দিয়া উহা যেরূপ দেখা যায় তাহার আর একটি ছবি, এই দুইটি ছবির একত্র মিলন ঘটানো হয় দৃক্‌যন্ত্রে। এই মিলনের ফলে, যে ঘনত্ব দেওয়ালের ডান চক্ষু এবং বাম চক্ষু দ্বারা পৃথকভাবে দৃষ্ট দুইটি ছবিতে নাই, তাহার প্রত্যক্ষ হয়। এইরূপ ঘনত্ব প্রত্যক্ষের নাম ঘনদৃগ্‌দর্শন।

(চ) দূরত্বের মূল এবং অর্জিত প্রত্যক্ষ (Direct or Original and Indirect or Acquired Perception of Distance)

কোনো কোনো মনোবিদ মনে করেন যে স্পর্শ সংবেদন সাহায্যে দূরত্বের যে প্রত্যক্ষ হয়, তাহাই উহার মূল বা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ। অর্থাৎ স্পর্শ সংবেদনজ দূরত্ব-প্রত্যক্ষ অন্য কোনো প্রত্যক্ষের উপর নির্ভর না করিয়া সোজাসুজি বা মুখ্যভাবে দূরত্বের জ্ঞান উৎপন্ন করে। পক্ষান্তরে, এই সকল মনোবিদের মতে, সোজাসুজি বা

সাক্ষাৎভাবে দূরত্বের দর্শন-প্রত্যক্ষ হয় না, কিন্তু হয় স্পর্শ সংবেদনের মধ্যস্থতায়। সুতরাং দূরত্বের দর্শন-প্রত্যক্ষ আসলে এক প্রকারের পরোক্ষ জ্ঞান। উহা স্পর্শ সংবেদনের সাহায্যে শিক্ষা বা অভিজ্ঞতার ফলে অর্জিত (acquired) হইয়া থাকে।

বার্ক্‌লে (Berkeley) বলিয়াছেন যে সক্রিয় স্পর্শ, অর্থাৎ পেশীয় স্পর্শ-সংবেদনের সাহায্যে যে দূরত্ব-প্রত্যক্ষ হয়, তাহাই উহার মুখ্য বা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ। তাঁহার মতে, দূরত্বের দর্শন-প্রত্যক্ষ আসলে প্রত্যক্ষ নয়, কিন্তু পরোক্ষ বা অর্জিত জ্ঞান। দর্শন-সংবেদনজ দূরত্ব-প্রত্যক্ষ শিক্ষালব্ধ, অর্জিত বা গৌণ প্রত্যক্ষ। উহা অর্জিত হয় উহার সহিত অনুষক্ত দূরত্বের সক্রিয় স্পর্শপ্রত্যক্ষ সাহায্যে। **সক্রিয় স্পর্শ ই সাক্ষাৎভাবে দূরত্ব-প্রত্যক্ষের একমাত্র উপায়।** সক্রিয় স্পর্শ ই এক দেশ হইতে অন্য দেশে যাইয়া সাক্ষাৎ দূরত্বজ্ঞান বা উহার প্রত্যক্ষ উৎপন্ন করে। কিন্তু দেশ হইতে দেশান্তরে পৌঁছিবার সাক্ষাৎ সক্রিয় স্পর্শজ প্রত্যক্ষের সহিত দর্শন-সংবেদনও জড়িত থাকে। দর্শন-সংবেদন সক্রিয় স্পর্শের সহকারীরূপে ক্রিয়াশীল হয়। সক্রিয় স্পর্শ-প্রত্যক্ষ করিয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইবার সময় আমরা গন্তব্য পথ দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইয়া থাকি। যেমন, যে বস্তুটিকে এই স্থান হইতে ছোট দেখাইতেছে, উহাই বড় দেখায়, যখন পেশীয় স্পর্শ সাহায্যে ঐ স্থানে পৌঁছানো যায়। যে সমান্তরাল রেল লাইন দুইটি এক স্থানে দাঁড়াইলে মিলিত দেখাইতেছে, তাহা নিশ্চয়ই এই স্থান হইতে অনেক দূরে অবস্থিত, কারণ ঐ স্থানে পৌঁছাইতে হইলে, এই স্থান হইতে অনেকটা পথ হাঁটিয়া যাইতে হয়। আবার যে পাহাড়টি এক স্থান হইতে ছোট, আবছা এবং অস্পষ্ট দেখায়, তাহা অবশ্যই অনেক দূরে অবস্থিত, কারণ ঐ পাহাড় পর্যন্ত হাঁটিয়া অথবা পেশীয়-প্রত্যক্ষ সাহায্যে জানা গিয়াছে, যে পাহাড়টি আসলে বড় এবং স্পষ্ট।

এইরূপে **দূরত্বের স্পর্শ-প্রত্যক্ষ হইতে উহার পরোক্ষ দর্শন-জ্ঞান অর্জিত হয়।** পর্বতে ধূম দেখিয়া পূর্ব-প্রত্যক্ষ ধূম-বহ্নির সহচার দর্শনের সাহায্যে পর্বতে বহ্নির অনুমান হইয়া থাকে। তেমন দূরত্বের অতীত স্পর্শ-প্রত্যক্ষের সহকারী দর্শনের ভিত্তিতে পরবর্তী দর্শনকালে স্পর্শজ লক্ষণগুলির স্মরণ হয় এবং শুধু দর্শনই যেন স্পর্শনিরপেক্ষভাবে দূরত্বের প্রত্যক্ষ ঘটাইতেছে বলিয়া মনে হইয়া থাকে। **ইহাই জর্জ বার্ক্‌লে প্রবর্তিত দূরত্বের অর্জিত বা পরোক্ষদর্শন প্রত্যক্ষবাদ বলিয়া পরিচিত।**

দূরত্বের অর্জিত দর্শন-প্রত্যক্ষবাদের সমর্থনে **বার্ক্‌লে কতকগুলি যুক্তি দেখাইয়াছেন।** (১) দূরত্বের সাক্ষাৎ দর্শনপ্রত্যক্ষ ঘটিতে পারে না, কারণ চক্ষু

উহার বিবরে বা কোটরে থাকিয়াই দূরত্ব দেখিয়া থাকে। সক্রিয় স্পর্শে পা যেমন এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সঞ্চরণ করিতে পারে, চক্ষু তেমন উহার কোটর হইতে ছিট্‌কাইয়া বা ঠিক্‌রাইয়া পড়িয়া দৃষ্ট দূরবর্তী স্থানে চলিয়া যায় না, অথবা সশরীরে উপস্থিত হয় না। (২) বলা যাইতে পারে যে, যাহারা জন্মান্ধ তাহারা দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাইলে নিকট ও দূরবর্তী বস্তুর পার্থক্য প্রত্যক্ষ করে না। যাহাদের দর্শন স্পর্শ-সংবেদনের সহিত মিলিত হইবার সুযোগ পায় নাই, অথবা যাহাদের শুধু দর্শনশক্তি আছে কিন্তু সক্রিয় স্পর্শনশক্তি নাই, তাহাদের দূরত্বের প্রত্যক্ষশক্তিও নাই। যেমন, শিশু বহু দূরে অবস্থিত চাঁদের দিকে হাত বাড়াইয়া উহাকে ধরিতে চায়। আবার নবজাত গোবৎস বা বাছুর ভূমিষ্ঠ হইয়াই সমতল মাটির উপরও লাফাইতে থাকে। এইরূপ আচরণের কারণ এই যে নবজাত গোবৎস সক্রিয় স্পর্শ সাহায্যে উঁচু-নীচু, দূর-নিকট প্রভৃতি দৈশিক ভেদ প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ পায় নাই। আবার বিড়ালশিশু যে অনেক উঁচু হইতে নীচে লাফাইয়া পড়িয়া মারা পড়ে, এইরূপ ঘটনার ব্যাখ্যাও এই যে তাহার দর্শন-সংবেদনের সহিত সক্রিয় স্পর্শ-সংবেদন যুক্ত হইতে পারে নাই—কাজেই সে দূর ও নিকটের পার্থক্য জানে না।

(৩) বস্তুর ছবি দেখিয়া উহাতে আমরা দূরত্ব নিকতত্ব অথবা ঘনত্ব প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। অথচ ছবিতে আঁকা বস্তুগুলির আসলে কোন ঘনত্ব নাই, কারণ উহারা সমতল কাগজে বা স্থানে অঙ্কিত। ছবিতে ঘনত্ব দর্শন সম্ভব হয় কতকগুলি দর্শন-প্রতীক বা চিহ্নের (visual signs) সাহায্যে, যাহাদের জ্ঞান বা শিক্ষা অর্জিত হইয়াছে সক্রিয় স্পর্শ-সংবেদনের মধ্যস্থতায়।

অর্জিত দর্শন-প্রত্যক্ষবাদের পক্ষে বার্কলে-প্রদর্শিত উপরোক্ত যুক্তিগুলি অনেক মনোবিদই গ্রহণ করেন নাই। (১) দেশের দর্শন প্রত্যক্ষ আলোচনায় আমরা দেখিয়াছি যে ইহাও মৌলিক, প্রাথমিক বা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ। অনেকেই, যেমন স্টাউট্, মনে করেন যে ঘনত্ব বা দূরত্ব প্রত্যক্ষে স্পর্শের তুলনায় দর্শনের গুরুত্ব বেশী, কারণ দর্শন-প্রত্যক্ষ স্পর্শ-প্রত্যক্ষের তুলনায় সূক্ষ্মতর। বহুদূরবর্তী বস্তু, যেমন চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ নক্ষত্রাদি সক্রিয় স্পর্শ-প্রত্যক্ষের বাহিরে, অথচ দর্শন সাহায্যে এই সকল বস্তুর প্রত্যক্ষ হয়। (২) আরও বলা যাইতে পারে যে দূরত্বের দর্শন-প্রত্যক্ষে চক্ষু যেমন উহার বিবর হইতে বাহির হইয়া যায় না, উহার স্পর্শ-প্রত্যক্ষেও হাত পা শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দূর বস্তুতে চলিয়া যায় না। (৩) তাহা ছাড়া, ইহাও ভুলিলে চলিবে না যে চক্ষু বলিতে শুধু চক্ষু-গোলককেই বুঝায় না, ঐ গোলকের শক্তিকেও

বুঝায়। এইটুকু মনে রাখিলে, ন্যায়, সাংখ্য প্রভৃতি দর্শনমতে চক্ষুর দূর বস্তুতে গমন এবং বিষয়াকারে আকারিত হওয়া অযৌক্তিক নয়। (৪) দেশ তিনটি মাত্রাবিশিষ্ট। দেশের প্রত্যক্ষ হয় বলিলে বুঝায় যে উহার তিনটি মাত্রারই—যথা দৈর্ঘ্য প্রস্থ এবং ঘনত্বের—প্রত্যক্ষ হয়। দর্শন সাহায্যে মাত্র উহার দুইটি মাত্রার—অর্থাৎ দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের প্রত্যক্ষ ঘটে বলা, উহার একেবারেই প্রত্যক্ষ হয় না বলারই সামিল।

(ছ) বস্তুর বিপরীত দর্শন হয় না কেন?

কোন বস্তু অক্ষিপটে প্রতিফলিত হইবার পূর্বে, ঐ বস্তু হইতে প্রসৃত আলোকরশ্মি অক্ষিমুকুর, ভিট্রিয়াস হিউমর্ প্রভৃতি স্তর অতিক্রম করিতে গিয়া প্রতিসৃত (refracted) হয়। ফলে ঐ বস্তুটির প্রতিরূপ অক্ষিপটে প্রতিফলিত হয় উল্টা বা **বিপরীতভাবে**। ক্যামেরার নেগেটিভে ছায়ামূর্তিগুলি দেখিলেই ব্যাপারটি বুঝা যাইবে। এই ছায়ামূর্তিগুলি আসল ব্যক্তি বা বস্তুব বিপরীত ক্রমে দেখা যায়, যেমন ডান হাতটি বাঁ দিকে এবং বাঁ হাতটি ডান দিকে। অথচ অক্ষিপটে এই বিপরীত প্রতিফলন সত্ত্বেও আমরা দৃষ্ট বস্তুগুলিকে যথার্থ ক্রমেই দেখিয়া থাকি। বলা যাইতে পারে যে, নেগেটিভের বিপরীত ক্রম সত্ত্বেও যেমন ফটোতে যথার্থক্রমে বস্তু দেখা যায় ফটো তুলিবার রসায়নিক ক্রিয়ানুসারে, তেমন চক্ষুতে বিপরীতভাবে প্রতিফলিত বস্তু বা ব্যক্তিকে যথার্থক্রমে দেখা যায় **দর্শনের রাসায়নিক ক্রিয়া** অথবা উহার নিজস্ব ভাব অনুসারে। আবার অক্ষিপটে প্রতিফলন একটি শারীর ক্রিয়া, পক্ষান্তরে দর্শন একটি **মানস ক্রিয়া**। এই পার্থক্যের ফলেই বস্তুর বিপরীত প্রতিফলন সত্ত্বেও উহার যথার্থক্রমে দর্শন ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে।

উপরোক্ত ব্যাখ্যা অনুসারে দর্শন সাহায্যে দেশের প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ অথবা মৌলিক। কিন্তু **বার্ক্‌লে**-প্রদর্শিত অর্জিত দর্শন প্রত্যক্ষবাদ অনুসারে, অক্ষি-পটে বস্তুর বিপরীত প্রতিফলন সত্ত্বেও যে ইহা স্বাভাবিকরূপে প্রত্যক্ষ হয় তাহার কারণ এই যে, দেশ প্রত্যক্ষে দর্শন-সংবেদন স্পর্শ-সংবেদনের উপর নির্ভর করে। বার্ক্‌লে বলেন যে, দৃষ্ট বস্তুর অক্ষিপটে প্রতিফলন-ক্রম বিপরীত হওয়া সত্ত্বেও যে বস্তু যথার্থক্রমে দৃষ্ট হয়, তাহার মুখ্য কারণ দর্শন-প্রত্যক্ষ নয়, কিন্তু সক্রিয় স্পর্শ-প্রত্যক্ষ। স্পর্শ-বিবর্জিত দর্শনই যদি দেশ-প্রত্যক্ষের একমাত্র কারণ হইত, তাহা হইলে প্রত্যক্ষ বস্তুর ক্রম আসল বস্তুর বিপরীতই থাকিয়া যাইত। কিন্তু দেশের দর্শন-প্রত্যক্ষ অর্জিত বা পরোক্ষ জ্ঞান এবং ইহার স্পর্শ-প্রত্যক্ষই মুখ্য বা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ জ্ঞান। দর্শনে বস্তুর

বিপরীত ক্রম সক্রিয় স্পর্শ সাহায্যে সংশোধিত হয়, এবং এই সংশোধনের ফলে দর্শনেও বস্তুর যথার্থ ক্রম প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে।

বার্ক্‌লে-সমর্থিত মতটি জি. **এম. স্ট্র্যাটন্‌-এর পরীক্ষা** দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। তিনি এক জোড়া চশমা এমনভাবে তৈয়ারী করেন, যাহা ধারণ করিবার ফলে প্রথমে সকল দৃষ্টবস্তুই বিপরীত বা উল্টাভাবে প্রত্যক্ষ হইতে লাগিল। ফলে দক্ষিণ-বাম, উঁচু-নীচু বস্তুগুলি যথাক্রমে বামে-দক্ষিণে, নীচুতে-উঁচুতে দেখা যাইতে লাগিল। কিন্তু তিনি দেখিলেন যে, যে বস্তুটিকে দক্ষিণে বা বামে এবং উঁচুতে বা নীচুতে দেখা যাইতেছে, উহার নাগাল পাইতে হইলে যথাক্রমে বামে বা দক্ষিণে এবং নীচুতে বা উঁচুতে অবস্থিত বস্তুর নাগাল পাইবার উপযোগী সক্রিয় স্পর্শ প্রত্যক্ষ ঘটে। এইরূপে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, যে বস্তুটিকে ডানদিকে দেখা গিয়াছিল, তাহা আসলে বামদিকে এবং যে বস্তুটিকে উঁচুতে দেখা গিয়াছিল, তাহা আসলে নীচে। এইরূপে স্ট্র্যাটন্‌-এর দৈশিক দর্শন-প্রত্যক্ষের ভ্রম সক্রিয় স্পর্শ-প্রত্যক্ষ দ্বারা সংশোধিত হইল। তাঁহার দর্শনলব্ধ দেশ-প্রত্যক্ষের বিপরীত ক্রম সক্রিয় স্পর্শ-সংবেদনের সাহায্যে যথার্থ ক্রমে পরিণত হইল।

এই পরীক্ষার দ্বারা স্ট্র্যাটন্‌ দেখাইলেন যে, দেশ প্রত্যক্ষ মুখ্য বা সাক্ষাৎভাবে সক্রিয় স্পর্শপ্রত্যক্ষ এবং মাত্র পরোক্ষ বা অর্জিতভাবে দর্শনপ্রত্যক্ষ। স্ট্যাটন-এর পরীক্ষায় বার্ক্‌লে-প্রবর্তিত দেশের মুখ্য স্পর্শপ্রত্যক্ষবাদ এবং গৌণ বা অর্জিত দর্শনপ্রত্যক্ষবাদ সমর্থিত হইল।

উপসংহার

উপসংহারে বলিতে হয় যে সক্রিয় স্পর্শপ্রত্যক্ষ দেশের সাক্ষাৎ বা মুখ্য জ্ঞান অবশ্যই উৎপন্ন করে। যাহারা জন্মান্ধ তাহাদের পক্ষে দেশপ্রত্যক্ষের একমাত্র উপায় সক্রিয় স্পর্শসংবেদন। কিন্তু, বার্ক্‌লে-এর মতানুযায়ী এইরূপ মনে করিবার কারণ নাই যে, দর্শন সাহায্যে দেশের সাক্ষাৎ বা মৌলিকপ্রত্যক্ষ হইতে পারে না। যাহারা জন্মান্ধ, স্পর্শসংবেদন সত্ত্বেও, তাহাদের পক্ষে অতিদূরবর্তী সৌরপিণ্ডগুলি প্রত্যক্ষ করিবার কোনো উপায় নেই, কারণ তাহারা দর্শনসংবেদন হইতে বঞ্চিত। কিন্তু চক্ষুষ্মান্‌ ব্যক্তির ক্ষেত্রে ঐগুলির দর্শন-প্রত্যক্ষ ঘটিয়া থাকে। মোটের উপর বলা যায় যে, স্বাভাবিক প্রত্যক্ষে সক্রিয় স্পর্শ এবং দর্শন ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকে। ইহার কোনটিই অপরটি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বাভাবিক দেশপ্রত্যক্ষ ঘটায় না। প্রত্যক্ষ সমগ্র দ্রষ্টার ক্রিয়া এবং ইহাতে দ্রষ্টার সকল প্রত্যক্ষই অংশগ্রহণ করে, যদিও শ্রবণ, স্বাদ ও ঘ্রাণ

সংবেদনের তুলনায় স্পর্শ এবং দর্শন সংবেদনই এই ব্যাপারে প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে।

গৌণ দেশ প্রত্যক্ষ
(Secondary Space Perception)

স্বাদ, গন্ধ এবং শ্রবণ সংবেদনের বিস্তার (extensity) নাই, যদিও জেম্‌স্‌ প্রভৃতি মনোবিদ্‌গণ শ্রবণ সংবেদনের বিস্তারে সন্দেহ পোষণ করেন না। গন্ধ সংবেদনের বিস্তার না থাকিলেও, স্থানীয় নির্দেশ সম্ভব। ইহার উৎপত্তি হয় কোন বাহ্য দেশে বা স্থানে। স্পর্শ অথবা দর্শন প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে বা স্থানে উহার স্থাননির্দেশ করা যায়। গন্ধ যে দিক হইতে আসিতেছে সেইদিকে মাথা ফিরাইয়া অথবা গন্ধের তীব্রতা অনুভবের ফলে, আমরা উহার কিঞ্চিৎ স্থাননির্দেশ করিতে পারি, যদিও এইরূপ স্থাননির্দেশ প্রায়ই ভ্রান্ত হইতে পারে। আবার স্বাদের স্থাননির্দেশ ক্ষমতা গন্ধ অপেক্ষাও কম। স্বাদের উৎপত্তিস্থল বাহ্যদেশীয় নয়, কিন্তু জিহ্বার মধ্যবর্তী স্বাদমুকুল। সুতরাং বহির্বিশ্বের কোন্‌ স্থান হইতে স্বাদ আসিতেছে সেই প্রশ্ন ওঠে না। স্বাদের স্থান-নির্দেশ মুখগহ্বরের অভ্যন্তরেই থাকে।

গন্ধ এবং স্বাদ এই দুইটি ইন্দ্রিয়ের তুলনায় শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের স্থাননির্দেশ এবং দেশপ্রত্যক্ষের ক্ষমতা অধিক। সাধারণতঃ, শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে শব্দের স্থাননির্দেশ যথেষ্ট নিখুঁতভাবে ঘটিয়া থাকে। শ্রবণের স্থাননির্দেশ তিনটি অবস্থার সহযোগিতায় সাধিত হয়। প্রথমতঃ, দুইটি কর্ণের দ্বারা শ্রুত শব্দের আপেক্ষিক (relative) তীব্রতা বা গভীরতা। এবং দ্বিতীয়তঃ, ঐ শব্দের নিজস্ব বা নিরপেক্ষ (absolute) তীব্রতা বা গভীরতা। বিভিন্ন দিক হইতে আগত শব্দের তীব্রতায় স্বাভাবিক পার্থক্য থাকে। তৃতীয়তঃ, শব্দের জটিলতাও (complexity) উহার স্থাননির্দেশে সহায়তা করে। যেমন, তানে (musical tone), মানুষের কণ্ঠস্বরে এবং কোলাহলে, শুদ্ধ শব্দ (pure tone) অপেক্ষা নিখুঁতভাবে স্থান নির্দেশিত হয়।

জন্মান্ধ ব্যক্তির ত্রৈমাত্রিক (tridimensional) দেশপ্রত্যক্ষ সক্রিয় স্পষ্ট-প্রত্যক্ষ। কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, এই ব্যক্তি শ্রবণপ্রত্যক্ষজাত গৌণ দেশেই বাস করে। টিশ্‌নার একজন অন্ধ গ্রন্থকারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, যাঁহার দেশজ্ঞান স্পর্শসংবেদন অপেক্ষা শ্রবণসংবেদনের উপরই অধিক নির্ভরশীল। এই গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে, দৈশিক নমনীয়তা এবং কাঠিন্যের স্পর্শজ্ঞান অন্ধদেশ-প্রত্যক্ষের একটি আনুষঙ্গিক অংশ মাত্র।

'সাবধানী-সংবেদন' (Warning sense)

আবার জন্মান্ধ ব্যক্তিদের একপ্রকার সংবেদন হয় যাহার নাম "সাবধানী-সংবেদন'। সাবধানী-সংবেদনের সাহায্যে জন্মান্ধ ব্যক্তি তাহার নিকটবর্তী কোনো কঠিন বা ঘন বস্তুর উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করিয়া সাবধান হয়। এইরূপ প্রত্যক্ষও মুখ্য বা গৌণভাবে শ্রবণপ্রত্যক্ষ। কিন্তু এই শ্রবণপ্রত্যক্ষ কিরূপে ঘটিতে পারে ? হয়ত ঐ বস্তুর উপরিভাগ হইতে শব্দতরঙ্গ আসিয়া সোজাসুজি-ভাবে জন্মান্ধ ব্যক্তির কর্ণে আঘাত করে। হয়ত আভ্যন্তরিক কর্ণের চেষ্টা-বেদন যন্ত্রে ঐ শ্রবণ উদ্দীপকগুলি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, যে কারণে এই সাবধানী সংবেদনকে **ভেস্টিবুলার সংবেদন** বলা যাইতে পারে। এই সংবেদন এমন সূক্ষ্ম যে চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিরা ইহা ধরিতে পারে না।

'সাবধানী-সংবেদন' বধির এবং অন্ধ শ্রবণক্ষম ব্যক্তির কর্ণ বন্ধ করিলেও ঘটিয়া থাকে। এই ক্ষেত্রে ইহার কারণ হয়ত তাপের অথবা বায়ুচাপের পরিবর্তন। অন্ধ ব্যক্তিরা ইহার উৎপত্তিস্থলস্বরূপে মুখমণ্ডল নির্দেশ করে। 'সাবধানী-সংবেদন' যে একটি ইন্দ্রিয়যন্ত্রেই সীমাবদ্ধ, এইরূপ মনে করিবার হেতু নাই। অন্ধের দেশপ্রত্যক্ষ হয়ত প্রয়োজন অনুসারে কক্লিয়া, ভেস্টিবিউল্, চাপবিন্দু এবং তাপবিন্দু প্রভৃতি সকল ইন্দ্রিয়গুলির দ্বারাই সাধিত হয়।

অক্ষিপটীয় দ্বন্দ্ব বা বৈরূপ্য এবং ঐক্য (Retinal Rivalry and Unity)

দুইটি ভিন্ন বর্ণ বা আকার একই সময়ে দুই চক্ষুকে উদ্দীপিত করিলে, ইহারা পরস্পরের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে থাকে, অর্থাৎ কখনও উহাদের একটি, কখনও উহাদের অপরটি পর্যায়ক্রমে দৃষ্টিক্ষেত্রকে অধিকার করে। এই ঘটনাকে বলে অক্ষিপটীয় দ্বন্দ্ব।

কিন্তু দুইটি একই জাতীয় বর্ণ বা আকার একই সময়ে দুই চক্ষুকে উদ্দীপিত



১৮ নং চিত্র অক্ষিপটীয় দ্বন্দ্ব এবং ঐক্য

করিলে, উহারা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে না, কিন্তু মিলিত-হওয়া একটি বর্ণ বা আকাররূপে দৃষ্ট হয়। এটি ঘটনাকে বলে অক্ষিপটীয় ঐক্য।

প্রথম ঘটনাটি ঘটিবার কারণ এই যে ভিন্ন বর্ণ বা আকারদ্বয় অক্ষিপটের বিসদৃশ বিন্দুতে প্রতিফলিত হয় বলিয়া, একটি বর্ণ বা আকাররূপ ধারণ করিতে পারে না। আবার দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটিবার কারণ এই যে সমজাতীয় বর্ণ বা আকারদ্বয় অক্ষিপটের সদৃশ বিন্দুতে প্রতিফলিত হয় বলিয়া, একটি বর্ণ বা আকারের মিলিতরূপ ধারণ করে। ১৮ নং রেখাচিত্রের সাহায্যে এই ঘটনা দুইটি বুঝা যাইতে পারে।

(ঞ) দেহাবস্থান (Body Position) প্রত্যক্ষ

আমাদের দেহ কোথায় এবং কিভাবে অবস্থিত রহিয়াছে, তাহা সাধারণতঃ **দর্শনের** দ্বারাই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। যেমন আমরা দেখিতে পাই কোথায়, কিভাবে আমরা বসিয়া, শুইয়া বা দাঁড়াইয়া রহিয়াছি। এমন কি অন্ধকারে থাকিয়া আমরা কল্পনানেত্রে আমাদের দেহাবস্থান বুঝিয়া থাকি এবং এবং এই কল্পনা দর্শন-প্রতিরূপ (Visual image) সাহায্যেই ঘটিয়া থাকে।

দ্বিতীয়তঃ, **স্পর্শ** এবং **সন্ধি** সংবেদনেও আমরা আমাদের দেহাবস্থান প্রত্যক্ষ করি। পায়ের তলদেশ অসাড় হইয়া গেলে ঠিক ভাবে হাঁটা অসম্ভব হয়। আবার দেহের ভার সম্বন্ধে কোমর অসাড হইয়া পড়িলেও দেহাবস্থান সম্পর্কে ভুল হইয়া থাকে।

তৃতীয়তঃ, দেহাবস্থানপ্রত্যক্ষে **কর্ণও** সাহায্য করে। কর্ণের **ভেস্টিবুল** অথবা শেইক্ অর্গ্যান্ সাহায্যে দেহাবস্থানের প্রত্যক্ষ ঘটে। দেহের ভারসাম্য কোনোপ্রকারে নষ্ট হইলেই এই অংশটি সেই সম্বন্ধে আমাদিগকে সচেতন করে। সংবেদন পরিচ্ছেদে ভারসাম্যবোধ (Equilibrium sense) দ্রষ্টব্য।

(ট) গতি-প্রত্যক্ষ (Perception of Movement)

গতি-প্রত্যক্ষ দুই প্রকারে ঘটিতে পারে, যথা—স্পর্শ-সংবেদন এবং দর্শন-সংবেদন সাহায্যে।

স্পর্শ-সংবেদন সাহায্যে গতি-প্রত্যক্ষ

কোনো স্থানে একটি বা সমান বেগে এবং বিনা বাধায় বাহিত হইয়া গেলে গতি-প্রত্যক্ষ হয় না। যেমন, কামরার সকল আলোকপথ বা জানলা বন্ধ করিয়া চলন্ত রেলগাড়িতে বাহিত হইলে, **যতক্ষণ গাড়ির গতি পরিবর্তিত না হয়**, অথবা বাহিরের কোনো বস্তু দৃষ্টিগোচর না হয়, ততক্ষণ আমরাও যে গাড়ির সহিত ছুটিয়া

চলিয়াছি, তাহা প্রত্যক্ষ হয় না। আবার একই কারণে সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর নিরন্তর গতি বা আবর্তনও আমরা প্রত্যক্ষ করি না, কারণ এই গতি একই প্রকার বা অব্যাহত। কিন্তু ভূমিকম্প হইলেই পৃথিবীর গতিপ্রত্যক্ষ উৎপন্ন হয়।

মোটর গাড়ি একই গতিতে চলিতে থাকিলে এবং যাত্রীর দৃষ্টি বন্ধ থাকিলে, তাহার এই গতিপ্রত্যক্ষ হয় না। কিন্তু হঠাৎ গাড়িটির ব্রেক কষিয়া দিলে, যাত্রী তৎক্ষণাৎ সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়ে। আবার উহার গতি হঠাৎ বাড়াইয়া দিলে, যাত্রী তৎক্ষণাৎ পশ্চাতে কুশন-এর গায়ে হেলিয়া পড়ে। এইরূপ সম্মুখে বা পশ্চাতে পড়িয়া যাইবার কারণ দেহভারের স্থানপরিবর্তন, চর্মে তাপ-সংবেদন, কতগুলি পেশীর এবং কণ্ডরার প্রসারণ অথবা সংকোচন, কোন সন্ধির আবদ্ধ এবং অপরটির উন্মুক্ত হইয়া যাওয়া প্রভৃতি। এই সকল ত্বক, সন্ধি, পেশী, কণ্ডরা প্রভৃতির সংবেদনগুলির মিলিত ক্রিয়ায় গতিপ্রত্যক্ষ উৎপন্ন হয়।

একটি অঙ্গ বা প্রত্যঙ্গ, যেমন বাহু, পা প্রভৃতির গতিপ্রত্যক্ষ শুধু সন্ধি-সংবেদন দ্বারা সংঘটিত হইতে পারে। হয়ত বাহুটি নাড়ানো হইল। এই গতির সঙ্গে সঙ্গে বাহুর সন্ধি (joint) উহার বিবর (socket) হইতে বিচলিত হইয়া বাহুর গতি-প্রত্যক্ষ ঘটায়। অন্ধ এবং স্পর্শ-পেশী-কণ্ডরা-সংবেদনবিহীন ব্যক্তিও এইরূপে তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গতি প্রত্যক্ষ করে।

উপরোক্ত কারণে স্পর্শ, সন্ধি, কণ্ডরা এবং পেশীর সংবেদনগুলিকে মোটর সেন্‌সেশন্‌ বা চেষ্টীয় সংবেদন বলা হইয়া থাকে। কিন্তু এইরূপ বলা ঠিক নয়, কারণ গতির সংবেদন হয় না এবং গতিসংবেদনের কোনো নির্দিষ্ট ইন্দ্রিয়ও নাই। গতির প্রত্যক্ষ হয়, কিন্তু সংবেদন হয় না।

দর্শন-সংবেদন সাহায্যে গতি-প্রত্যক্ষ

একটি বস্তুকে এককালে দুই স্থানে দেখিয়া গতির প্রাথমিক দর্শন-প্রত্যক্ষ ঘটে। আকাশ হইতে তীব্রবেগে একটি তারকার পতন হইল। স্পষ্ট দেখা গেল, জ্যোতির রেখা পশ্চাতে রাখিয়া তারকাটি এক স্থানে যাত্রা আরম্ভ করিল এবং আর একপ্রান্তে অদৃশ্য হইল। এইরূপে তারকাটির গতির দর্শন-প্রত্যক্ষ ঘটিল। গতিপ্রত্যক্ষ স্মরণ সাহায্যে ঘটিয়া থাকে। তারকাটি বিভিন্ন স্থান অতিক্রম করিয়া উহার যাত্রাশেষ করিল। এই গতিপথের প্রত্যেকটি পূর্ববর্তী প্রত্যক্ষ স্মরণ না থাকিলে, উহার গতি যে এক স্থান হইতে আরম্ভ হইয়া আর এক স্থানে শেষ হইল, এই প্রত্যক্ষ সম্ভব হয়

না। রেলগাড়িটি ছুটিয়া চলিয়াছে, ইহা আমরা দেখিতে পাই, কারণ আমাদের স্মরণ আছে যে এক মুহূর্ত পূর্বে উহা এই বৃক্ষটির নিকট ছিল এবং আর একটি মুহূর্ত পূর্বে ইহা ছিল অপর একটি বৃক্ষের নিকট। **প্রত্যক্ষ চলনশীল বস্তুর তুলনায় দ্রষ্টা কম চলনশীল বা নিশ্চল না থাকিলে গতিপ্রত্যক্ষ ঘটে না।** যদি গাড়িটির গতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দাঁড়াইবার স্থান এবং সমগ্র দৃশ্যজগৎসহ আমরা বাস্তবিকই গতিশীল হইতাম, তাহা হইলে গতির দর্শনপ্রত্যক্ষ সম্ভব হইত না।

সৌরজগৎ অনন্ত শূন্যে সবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। আমাদের এই গতিপ্রত্যক্ষ হয় না, কারণ এই গতি একরূপ এবং অপরিবর্তিত এবং এই গতির সঙ্গে সঙ্গে সব কিছুই সমভাবে গতিশীল। গতির স্পর্শ-প্রত্যক্ষের বেলায় যেমন উহার গতি-পরিবর্তন আবশ্যক, তেমন গতির দর্শন-প্রত্যক্ষের বেলায়ও অন্যান্য স্থির বস্তুর পশ্চাদভূমিতে কোনো বস্তুর স্থান পরিবর্তন আবশ্যক।

(ঠ) ভার ও বাধা প্রত্যক্ষ

(Perception of Weight and Resistance)

একটি ভার বা ওজন তুলিবার কালে ভার-প্রত্যক্ষ হয়। ভার-প্রত্যক্ষ বলিতে বুঝায় কোনো বিপরীত শক্তি, যথা, মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে পরাজয় করিবার ক্লেশ বা টান-প্রত্যক্ষ। ভারটি বেশী হইলেই ইহা স্পষ্ট হয়; অনুভূত হয় যেন হাতটি নামিয়া আসিতেছে এবং বহু ক্লেশে হাতটিকে উপরে উঠাইয়া ভার উত্তোলন করা হইতেছে। বাধা প্রত্যক্ষও ভারপ্রত্যক্ষের সহিত একজাতীয় বলিয়া মনে হয়। বাধা অতিক্রম করিবার প্রত্যক্ষেও একটি বিপরীত বা প্রতিকূল শক্তিকে পরাজিত করিবার অনুভূতি হইয়া থাকে। এই দুইটি প্রত্যক্ষের ইন্দ্রিয় প্রথমতঃ সন্ধির সংবেদনশীল উপরিভাগ। টানপ্রত্যক্ষ (strain), কণ্ডরার (tendon) দণ্ডের (spindle) উদ্দীপনায় ঘটিয়া থাকে।

ভারপ্রত্যক্ষ নিষ্ক্রিয় এবং সক্রিয় ভেদে দুই প্রকার। টেবিলের উপর হাতটি রাখা হইল। এইবার এই নিশ্চল হাতের উপর একটি ভারি বস্তু রাখিলে নিষ্ক্রিয় ভারপ্রত্যক্ষ হয়। নিষ্ক্রিয় ভারপ্রত্যক্ষের ইন্দ্রিয় হইল চর্মের চাপবিন্দু এবং চর্মতলস্থ সংযোজক সূত্রের প্যাসিনীয় রক্তকণিকা। জিহ্বা এবং ওষ্ঠ দ্বারা গতিপ্রত্যক্ষের মত, এইরূপ প্রত্যক্ষেও ঠিকমত ভার-বিনিশ্চয় (weight discrimination) হয় না। ভারবিনিশ্চয় হয় সক্রিয় ভারপ্রত্যক্ষে অথবা তার উত্তোলনের অনুভূতিতে।

(ভ) বস্তুর পরিমাণ ও আকার প্রত্যক্ষ
(Perception of Magnitude and Form)

বস্তুর পরিমাণ বলিতে উহা কত **বড় বা ছোট** বুঝায়। বস্তুর আকার বলিতে বুঝায় উহা **গোল, লম্বা, ত্রিকোণ বা চতুষ্কোণ** প্রভৃতি কিনা।

বস্তুর পরিমাণ এবং আকার স্পর্শ এবং দর্শন, এই দুই প্রকারেই প্রত্যক্ষ হইতে পারে। একটি বস্তুর প্রথম হইতে শেষ প্রান্ত পর্যন্ত দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং ঘনত্ব স্পর্শ করিতে বা দেখিতে কি পরিমাণ স্পর্শ এবং দর্শন সংবেদনের প্রয়োজন হয় তাহার উপর নির্ভর করে উহার পরিমাণ কি, তাহার প্রত্যক্ষ। এই বিষয়টি পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে।[১]

কোনো বস্তুর আকার কিরূপ, ইহা গোল, লম্বা, ত্রিকোণ অথবা চতুষ্কোণ কিনা, তাহার স্পর্শ এবং দর্শন-প্রত্যক্ষ নির্ভর করে এই সংবেদনের পরিমাণ এবং গুণের উপর। বস্তুটি যে গোল তাহা বুঝা যাইবে, যখন, দেখা যাইবে যে যে স্থান হইতে উহার উপর দিয়া হস্ত বা চক্ষু-সঞ্চালন আরম্ভ হইয়াছিল, অনবরত এই গতির দিক পরিবর্তন করিয়া পুনরায় সেই হস্ত বা চক্ষু সেই স্থানে ফিরিয়া আসে। আবার বস্তুটি যে লম্বা তাহা বুঝা যাইবে, যখন হস্ত বা চক্ষু সঞ্চালনের দিক পরিবর্তিত হইতেছে না। ত্রিকোণ আকার প্রত্যক্ষ হইবে, যখন প্রথম দিক হইতে আরম্ভ করিয়া আরও দুইটি দিক পরিবর্তনের পর হস্ত এবং চক্ষু প্রথম স্থানে ফিরিয়া আসে।

১০। কালপ্রত্যক্ষ (Perception of Time)

সংবেদনের স্থায়িত্ব (duration) গুণটি কালপ্রত্যক্ষের ভিত্তি। সকল সংবেদন হইতেই উহাদের স্থায়িত্ব বা কালপ্রত্যক্ষ উৎপন্ন হইতে পারে। দেশ ত্রিমাত্রিক, কিন্তু কাল একমাত্রিক। দেশের মাত্রা তিনটি, যথা—দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং বেধ বা ঘনত্ব। কিন্তু কালের মাত্রা একটি, যথা—পৌর্বাপর্ব (succession)। কাল একটি—রৈখিক পরিমাণ-বিশিষ্ট (uni-linear)। কালিক ঘটনাগুলি ক্রমিক ধারায় পূর্বাপরভাবে ঘটিয়া যায়।

কালের ধারাবাহিকতা বা কালপ্রবাহের মধ্যে ছেদ টানিয়া আমরা বর্তমান, অতীত এবং ভবিষ্যৎ এই তিনটি কালিক অংশ কল্পনা করি। এই তিনটি কালাংশের মধ্যে **বর্তমান** প্রত্যক্ষ হয় সংবেদনে। সংবেদন ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে বর্তমানে প্রদত্ত বা

---

১ এই অনুচ্ছেদের ক, খ, গ দ্রষ্টব্য।

উপস্থাপিত একটি বস্তুর চেতনা। আবার **স্মৃতিতে প্রত্যক্ষ হয় অতীত।** যে বস্তুটিকে স্মরণ করা হইতেছে তাহা অতীত বস্তু, যাহা বর্তমানে উপস্থিত নাই কিন্তু পুনরুৎপন্ন (reproduced) হইতেছে। **ভবিষ্যৎ প্রত্যক্ষ হয় প্রতীক্ষা** (expectation) বা অগ্রস্থচনার (anticipation) সাহায্যে।

কালের ক্ষণিকতা আমরা প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করি। মনোযোগ এবং সংবেদনের হ্রাসবৃদ্ধি, ইচ্ছার সাফল্য এবং ব্যর্থতা, সুখ-দুঃখ, আলোক-অন্ধকার প্রভৃতি বিচিত্র অনুভবের মধ্য দিয়া কালের ক্ষণিকতার সহিত আমাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটিয়া থাকে।

তথাকথিত বর্তমান (Specious Present)

প্রত্যক্ষ ক্ষণিকতাবোধই কাল-প্রত্যক্ষের মূল ভিত্তি। যাহাকে বর্তমান কাল বলা হইয়া থাকে, তাহা প্রত্যক্ষ ক্ষণিকতাবোধ হইতেই সঞ্জাত। বর্তমান বলিতে বাস্তবিকভাবে উপলব্ধ সংবেদন, সুখ-দুঃখ, ইচ্ছা-প্রক্ষোভ, কল্পিত প্রতিরূপ প্রভৃতির প্রত্যক্ষ-জ্ঞান বুঝায়। যাহা বাস্তব অভিজ্ঞতায় নাই তাহাই অতীত বা ভবিষ্যৎ। কিন্তু বর্তমান কাল শুধু কালের অনন্ত প্রবাহকে ছিন্ন করিয়া ফেলে এমন কোনো ছুরির শাণিত প্রান্ত ('knife-edge') নয়। ইহা শুধু একটি অবিভাজ্য বিন্দুমাত্র নয়, কিন্তু একটি প্রসার। যে বর্তমানকে আমরা 'এখন', 'এইমাত্র' (now) প্রভৃতি রূপে বর্ণনা করি, তাহার আবির্ভাব হয় 'এখনও নয়' ('not yet') সূচক ভবিষ্যতের গর্ভ হইতে এবং তাহার লয় ঘটে 'আর নাই' ('no more') এইরূপ চেতনাত্মক অতীতের অন্ধকারে। বর্তমান বলিতে আমরা প্রত্যক্ষ করি একটি 'তথাকথিত বর্তমান' ('specious present') যাহার এক প্রান্ত রহিয়াছে ভবিষ্যতে এবং অপর প্রান্ত অতীতে।

কালপ্রত্যক্ষ **মনোযোগের** সহিত সংযুক্ত। বর্তমান বলিতে বুঝায় সেই বাস্তব সংবেদন যাহা মনোনিবেশকে নিয়ন্ত্রিত করে। অতীত বলিতে বুঝায় মনোনিবেশের সঞ্চিত ফল যাহা বর্তমান মনোনিবেশকে প্রভাবিত করে। আবার ভবিষ্যৎ বলিতে বুঝায় মনোনিবেশের প্রতীক্ষামূলক দৃষ্টিভঙ্গীকে।

কালাতিক্রম (Lapse of time) প্রত্যক্ষের পরীক্ষা বা পরিমাপচেষ্টা হইয়াছে। এই প্রয়োগে প্রধানতঃ দুইটি প্রণালী ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রথমটিতে প্রয়োগকর্তা পাত্রের নিকট একটি কাল-ব্যবধান (time interval) উপস্থাপিত করিয়া তাহাকে যথার্থভাবে

ঐ ব্যবধানের স্মরণ করিতে বলেন। দ্বিতীয়টিতে প্রয়োগকর্তা পাত্রের নিকট দুইটি কাল-ব্যবধান উপস্থাপিত করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, এই দুইটি ব্যবধান সমান, বেশী, না কম। এই প্রয়োগের ভিত্তিতে মায়ার্স বলিয়াছেন যে পাত্র অল্প ব্যবধানকে বাড়াইয়া এবং বেশী ব্যবধানকে কমাইয়া বলিয়া থাকে। এই দুইটির মধ্যবর্তী একটি "উদাসান্তর" (Indifference interval) আছে, যাহা ঠিকভাবে স্মরণ করা যায়। উদাসান্তর ব্যবধানটি এক সেকেণ্ডের ৭০০ এবং ৮০০ সহস্রাংশের মধ্যবর্তী। উদাসন্তর অপেক্ষা কম এবং বেশী কাল-ব্যবধানকে পাত্র যথাক্রমে বাড়াইয়া এবং কমাইয়া বলে। মায়ার্স আর একটি তথ্য আবিষ্কার করেন যে, "পূর্ণ" ব্যবধান অর্থাৎ যে কালব্যবধানে কোনো মানসঘটনা ঘটে, "শূন্য" ব্যবধান, অর্থাৎ যে কাল ব্যবধানে কোনো মানসবৃত্তি ঘটে না, তাহা অপেক্ষা বিলম্বিত বা দীর্ঘ বলিয়া মনে হয়।

কালের বিভিন্ন স্থায়িত্ববোধ নিয়ন্ত্রিত হয় মনোনিবেশের দ্বারা। মনোনিবেশ অবিরামভাবে চলিতে থাকিলে, ক্রমিক অভিজ্ঞতাগুলি ধৃতির (retentiveness) সঞ্চিত ফলের দ্বারা প্রভাবিত হয়। যতক্ষণ ধরিয়া মনোনিবেশ চলিতেছে, কালের স্থায়িত্ব ততক্ষণ। মনোনিবেশ ক্রিয়া একঘেয়ে বা ব্যাহত হইলে, কালের স্থায়িত্ব বেশী বলিয়া প্রত্যক্ষ হয়। আবার উহা সহজ এবং অব্যাহত হইলে কালের স্থায়িত্ব কম বলিয়া অনুভূত হয়।

১১। ছন্দ (Rhythm) প্রত্যক্ষ

শব্দ অথবা গতি দ্বারা চিহ্নিত নির্দিষ্ট সময়ান্তরের নিয়মিত পৌর্বাপর্যকে ছন্দ বলে। ছন্দ প্রত্যক্ষের জন্য দুই শ্রেণীর সংবেদন বিশেষ প্রয়োজনীয়। প্রথমটি হইল চর্ম, পেশী, কণ্ডরা, সন্ধি প্রভৃতি সংবেদন লইয়া গঠিত স্পর্শ সংবেদন, এবং দ্বিতীয়টি হইল স্পর্শ-শ্রবণ সংবেদন, যাহা উপরোক্ত সংবেদনগুলির সহিত শ্রবণ-সংবেদন লইয়া গঠিত।

(১) দেহরূপ কাণ্ডের সহিত দুই হাত-পা যেন চারিটি দোলকের মত সংযুক্ত হইয়া থাকে। দৌড়াইবার বা হাঁটিবার সঙ্গে সঙ্গে দুই পা এবং প্রত্যেক পায়ের সহিত উহার বিপরীত বাহু দোল খায়। এই দোলন-প্রত্যক্ষই ছন্দ-প্রত্যক্ষের মূল ভিত্তি।

(২) উপরোক্ত গতিচ্ছন্দ, ছন্দ প্রত্যক্ষে প্রধান অংশ গ্রহণ করে। কিন্তু গতি ও শ্রবণের যুগ্ম ছন্দ শুধু গতিচ্ছন্দ অপেক্ষা অধিক উন্নত, কারণ উপরোক্ত চারিটি অঙ্গ

দেহের সহিত আবদ্ধ এবং শুধু সম্মুখে-পশ্চাতে বা উপরে-নীচে দোলায়মান হইতে পারে। পক্ষান্তরে শব্দ এইরূপ দেহবন্ধন হইতে মুক্ত।

১২। প্রত্যক্ষ এবং সংপ্রত্যক্ষ
(Perception and Apperception)

লাইবনিজ (Leibnitz), কাণ্ট (Kant), হার্বার্ট (Herbart), হ্বুণ্ড্ (Wundt) প্রভৃতি দার্শনিক এবং মনোবিৎ প্রত্যক্ষ এবং সংপ্রত্যক্ষের পার্থক্য আলোচনা করিয়াছেন। সংবেদনের স্পষ্ট চেতনাকে যেমন প্রত্যক্ষ বলা যায়, তেমন প্রত্যক্ষের স্পষ্ট চেতনাকে বলা যায় সংপ্রত্যক্ষ (apperception)। কিন্তু সংপ্রত্যক্ষ শুধু স্পষ্ট প্রত্যক্ষই নয়। ইহার অর্থ স্পষ্ট প্রত্যক্ষ অপেক্ষা ব্যাপক। **নূতন জ্ঞানকে পূর্বলব্ধ অথবা পুরাতনসঞ্চিত জ্ঞানের সাহায্যে স্পষ্টভাবে জানিবার নাম সংপ্রত্যক্ষ।** অথবা পৃথক পৃথক সংবেদনকে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করার নাম সংপ্রত্যক্ষ। কাণ্ট্ ইহাতে একটি একীকরণশক্তির সন্ধান দিয়াছেন। কিন্তু হার্বার্ট তাহা দেন নাই। তাঁহার মতে পুরাতন জ্ঞানভাণ্ডার উহার নিজ শক্তিতেই নূতন জ্ঞানকে একাকার করিয়া লয়। হ্বুণ্ড্-এর মতে একীকরণ ক্রিয়াটি পুরাতনের সহিত নূতনের সৃজনশীল সংশ্লেষণ (creative synthesis) বিশেষ।

প্রত্যক্ষের সহিত সংপ্রত্যক্ষের পার্থক্য এইরূপ। প্রত্যক্ষে যেমন উপস্থাপিত (presentative) এবং পুনরুপস্থাপিত (representative) অংশ থাকে, সংপ্রত্যক্ষেও সেইরূপ থাকিতে পারে। কিন্তু সংপ্রত্যক্ষে পুনরুপস্থাপিত ভাবকেও আমরা পুনরুপস্থাপিত ভাবের সাহায্যে স্পষ্টভবে জানিতে পারি। তাহা ছাড়া, প্রত্যক্ষের পুনরুপস্থাপিত অংশ স্বতঃস্ফূর্তভাবে উপস্থাপিত অংশের সহিত যুক্ত হয়। কিন্তু সংপ্রত্যক্ষের পুনরুপস্থাপিত অংশ উহার সহিত ঐচ্ছিকভাবে সংযুক্ত হয়। আবার, প্রত্যক্ষের সদৃশীকরণ, পৃথকীকরণ, স্থাননির্দেশ, বিক্ষেপণ প্রভৃতি ক্রিয়াগুলি ঘটে অনৈচ্ছিক বা স্বতঃস্ফূর্তভাবে। পক্ষান্তরে সংপ্রত্যক্ষে এই ক্রিয়াগুলি ঘটে ঐচ্ছিকভাবে। অধিকন্তু প্রত্যক্ষ শুধু সংবেদনকেই স্পষ্টতরভাবে জানিয়া থাকে, কিন্তু সংপ্রত্যক্ষ শুধু প্রত্যক্ষকেই নয়, ভাব বা যুক্তিকেও স্পষ্টভাবে জানিতে পারে।

সংপ্রত্যক্ষে যে অতীত জ্ঞানভাণ্ডার নূতন জ্ঞানকে চেতনায় স্পষ্ট করিয়া তোলে তাহাকে হার্বার্ট-এর ভাষায় বলা হয় **সংপ্রত্যক্ষক পিণ্ড** (apperceptive mass), অতীত এবং নূতন জ্ঞানের মিলিত ফলকে বলে **সংপ্রত্যক্ষ পিণ্ড** (apperception

mass) এবং যে নূতন জ্ঞানটি সংপ্রত্যক্ষের ফলে স্পষ্ট চেতনায় ফুটিয়া ওঠে তাহাকে বলে **সংপ্রত্যক্ষকৃত পিণ্ড** (apperceived mass)।

১৩। প্রত্যক্ষের প্রণালী বা দ্বাররূপে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গুলির তুলনা (Comparison of the Senses as Channels of Perception)

সব কয়টি বিশেষ ইন্দ্রিয়ই বস্তুপ্রত্যক্ষের দ্বার। চক্ষু সাহায্যে আলোক-অন্ধকার, কর্ণ সাহায্যে শব্দ, ত্বক সাহায্যে তাপ, শৈত্য, চাপ এবং ব্যথা, নাসিকা সাহায্যে গন্ধ এবং রসনা সাহায্যে স্বাদ প্রত্যক্ষ হয়। জগৎ বলিতে প্রধানতঃ এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জ্ঞাত বস্তু বা বস্তুনিচয় বুঝায়।

এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে চক্ষু, কর্ণ এবং ত্বক অবশ্যই নাসিকা এবং জিহ্বার তুলনায় উন্নত। বিশেষ করিয়া চক্ষু ও ত্বক বহির্জগতের জ্ঞান উৎপাদনে অন্যান্য ইন্দ্রিয়যন্ত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই দুইটি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই বহির্জগতের বিভিন্ন গুণাবলী প্রত্যক্ষ হয়। বাহ্য বা জড় পদার্থের মুখ্য এবং গৌণগুলি, যেমন—অবস্থান, ঘনত্ব, পরিমাণ, আকার, ওজন, সংখ্যা, গতি প্রভৃতি মুখ্য গুণ এবং বর্ণ, শব্দ, স্পর্শ প্রভৃতি গৌণ গুণ– দর্শন এবং কর্মেন্দ্রিয়ের সাহায্যেই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। বিশেষ করিয়া জড়পদার্থের ব্যাপ্তি বা অবস্থান প্রভৃতি মুখ্য গুণগুলি জানিবার একমাত্র উপায় এই ইন্দ্রিয় দুইটি। দূরত্ব সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞানও এই দুইটি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই ঘটিয়া থাকে।

শ্রবণ-ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে শব্দ প্রত্যক্ষ হয়। তাহা ছাড়া, ইহার সাহায্যে বাহ্য-বস্তুর অবস্থান, পরিমাণ, দিক, দূরত্ব প্রভৃতির যতটুকু জ্ঞান লাভ করা যায়, তাহা নিতান্তই নগণ্য। অবশ্য শ্রবণেন্দ্রিয়ের একটি অংশ, অর্থাৎ ভেস্টিবিউল্ দেহসাম্য এবং দেহাবস্থান সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জন্মায়। কাজে কাজেই, শ্রবণও দর্শন এবং স্পর্শের মত উচ্চতর ইন্দ্রিয়গুলির অন্তর্ভুক্ত। আবার, বস্তুর রূপ-প্রত্যক্ষে দর্শনেন্দ্রিয় অপরিহার্য। তাহা ছাড়া, বস্তুর অন্যান্য গুণগুলির, বিশেষতঃ বহুদূরবর্তী গ্রহনক্ষত্রাদির অবস্থান ও দূরত্ব প্রত্যক্ষেও ইহা অপরিহার্য।

স্বাদ-ইন্দ্রিয়, অর্থাৎ জিহ্বা, বাহ্য জগৎ সম্বন্ধে বিশেষ প্রত্যক্ষ জন্মায় না। জিহ্বার সংস্পর্শে আনীত দ্রবণীয় বস্তুর স্বাদপ্রত্যক্ষ উৎপন্ন করাই ইহার কাজ। ইহার অতিরিক্ত কোন বাহ্যজাগতিক জ্ঞান স্বাদেন্দ্রিয় উৎপন্ন করে না। আবার গন্ধ-ইন্দ্রিয়ের প্রধান

কাজ হইল গন্ধ বা ঘ্রাণ প্রত্যক্ষ উৎপন্ন করা। ইহার স্থাননির্দেশ ক্ষমতা থাকিলেও, তাহা নির্ভরযোগ্য নয়। গন্ধটি কোথা হইতে আসিতেছে ইহার সন্ধান করিতে ঘ্রাণেন্দ্রিয় অপারগ।

সুতরাং, যদিও সকল ইন্দ্রিয়েরই বাহ্যজগতেই জ্ঞান উৎপন্ন করিবার ক্ষমতা আছে, এই ক্ষমতা দর্শন ও স্পর্শেন্দ্রিয়ের সর্বাপেক্ষা বেশী, শ্রবণেন্দ্রিয়ের অপেক্ষাকৃত কম, ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের আরও কম, এবং স্বাদেন্দ্রিয়ের সর্বাপেক্ষা কম।

১৪। দেশাভিজ্ঞান (Local Sign) এবং দেশনির্দেশ (Localisation)।

স্পর্শ ও দর্শন প্রত্যক্ষ আলোচনা প্রসঙ্গে দেখা গিয়াছে যে ত্বক ও অক্ষিপটের দেশাভিজ্ঞান[২] আছে। দেশাভিজ্ঞান বলিতে বুঝায় ত্বকের বা অক্ষিপটের সেই গুণ, যাহা থাকিবার জন্য উহার যে কোন বিন্দু উদ্দীপিত হইলে, প্রত্যক্ষ জন্মে যে ঐ বিন্দুই উদ্দীপিত হইয়াছে। অথবা দেশাভিজ্ঞান ত্বাচ্ বা অক্ষিপটীয় বিন্দুর সেই পরিচিতি জ্ঞান, যাহার ফলে উহার উদ্দীপনা উহাকে অন্যান্য বিন্দু হইতে পৃথক রূপে চিহ্নিত করে। সংক্ষেপে বলা যায় যে, দেশাভিজ্ঞান চর্মের বা অক্ষিপটের কোন্ বিন্দু উদ্দীপিত হইয়াছে, তাহার দৈশিক জ্ঞান। এই জ্ঞানটি ঐ উদ্দীপিত বিন্দুর পরিচায়ক চিহ্ন, সঙ্কেত বা নির্দেশ। ইহার ফলে আমরা বুঝিতে পারি, একটি বিশেষ বিন্দুই উদ্দীপিত হইয়াছে, অন্য কোনো বিন্দু উদ্দীপিত হয় নাই।

দেশ-নির্দেশ বলিতে বুঝায় সেই মানসক্রিয়া, যাহা দ্বারা সংবেদন কোথায় অথবা কখন ঘটিতেছে তাহা প্রত্যক্ষ হয়। নির্দেশ দুই প্রকার, যথা—স্থান-নির্দেশ এবং কাল-নির্দেশ। স্থানীয় নির্দেশ বলিতে বুঝায়, কোন্ দেহস্থ সংবেদন কোন্ উদ্দীপিত বিন্দুতে ঘটিয়াছে, তাহা প্রত্যক্ষ করা। এইরূপ স্থান-নির্দেশকে আভ্যন্তরীণ স্থান-নির্দেশ (Intra-organic localisat'on) বলে। দেহস্থ স্থান-নির্দেশ সম্ভব হয় দেশাভিজ্ঞান বা দেহস্থ বিন্দুগুলির নিজস্ব স্থানীয় বোধের দ্বারা। দেহাভ্যন্তরীণস্থান-নির্দেশের সাহায্যেই দেশজ্ঞান ঘটে। একটি বস্তু স্পর্শ বা দর্শন করিতে ত্বকের বা অক্ষিপটের যে যে বিন্দু উদ্দীপিত হয়, উহার প্রত্যেকটির দেশাভিজ্ঞান ফলে বুঝা যায় যে উহারা উদ্দীপিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া, এই বিন্দুগুলি যে-ক্রমে দেহে অবস্থিত,

১ বর্তমান পরিচ্ছেদের ৪ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

২ বর্তমান পরিচ্ছেদের ২-৪ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

প্রত্যক্ষ বস্তুটির স্পৃষ্ট বা দৃষ্ট বিন্দুগুলিও সেই ক্রমে অবস্থিত। যেমন, টেবিলটি স্পর্শ করিতে গিয়া যে চাপবিন্দু উদ্দীপিত হয়, তাহা দ্বারা বুঝা যায় যে টেবিলের যে স্থানটি ঐ চাপবিন্দুকে উদ্দীপিত করিয়াছে, উহা মসৃণ নয়, কিন্তু কর্কশ বা উঁচু-নীচু।

এইরূপে দেহাভ্যন্তরীণ স্থান-নির্দেশের সাহায্যে বাহ্য স্থান-নির্দেশ বা বিক্ষেপণ (projection) সম্ভব হয়। টেবিলের ক বিন্দু খ বিন্দুর দক্ষিণে বা বামে অবস্থিত, কারণ উহার স্পর্শ বা দর্শন করিতে ত্বকের বা অক্ষিপটের যে ক´ খ´ বিন্দু উদ্দীপিত হইয়াছে, উহারা একটি অপরটির দক্ষিণে বা বামে অবস্থিত।

কাল-নির্দেশও (localisation in time) প্রত্যক্ষের একটি অবিচ্ছেদ্য ধর্ম। কোনো বস্তু প্রত্যক্ষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ইহাও প্রত্যক্ষ হয়, যে বস্তুটির প্রত্যক্ষ বর্তমানে ঘটিতেছে, তাহা এক মুহূর্ত পূর্বেও ভবিষ্যৎ ছিল এবং মুহূর্ত পরে অতীত হইয়া যাইবে।

অনুশীলনী (Exercise)

1. Define Perception. Explain and illustrate it. (Ans. pp. 1—3)

   প্রত্যক্ষের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। উদাহরণ সাহায্যে ইহা বুঝাইয়া দাও।

2. Give an analysis of the process of perception. (Ans. pp. 3—6)

   প্রত্যক্ষ বিশ্লেষণ কর।

3. "Perception is implicit memory and habit." Explain. (Ans. p. 4)

   "প্রত্যক্ষ অস্পষ্ট স্মৃতি এবং অভ্যাস।" কথাটি ব্যাখ্যা কর।

4. Is pure sensation possible ? Discuss. (Ans. pp. 6—8)

   শুদ্ধ সংবেদন সম্ভব কিনা আলোচনা কর।

5. Distiuguish between sensation and perception. Which is more fundamental of the two ? (Ans. pp. 8—10)

   সংবেদন এবং প্রত্যক্ষের পার্থক্য দেখাও। ইহাদের মধ্যে কোন্‌টি মৌলিক ?

6. Expound the Gestalt theory of Perception. (Ans. pp. 10—13)

   গেস্টাল্ট্‌ প্রত্যক্ষবাদ ব্যাখ্যা কর।

7. What is illusory perception ? Explain and illustrate different types of illusory perception. (Ans. pp. 14—19)

ভ্রমপ্রত্যক্ষ কাহাকে বলে ? দৃষ্টান্ত সাহায্যে বিভিন্ন প্রকার ভ্রমপ্রত্যক্ষ ব্যাখ্যা কর।

8. Write notes on : (a) Figure and Ground ; (b) Configuration ; (c) Complication ; (d) Synaesthesia.

(Ans. pp. 10—13 ; 4—6)

সংক্ষেপে আলোচনা কর : (ক) 'আকার' এবং 'পশ্চাদ্‌ভূমি ; (খ) 'সংগঠন' ; (গ) জটিলীকরণ ; (গ) সহ-সংবেদন।

9. Write notes on : (a) Geometrical optical illusion ; (b) Muller-lyer illusion. (Ans. pp. 15 ; 17—18)

সংক্ষেপে আলোচনা কর : (ক) জ্যামিতিক দর্শন ভ্রম ; (খ) মুয়েলার-লায়ার ভ্রম।

10. Distinguish between illusion and hallucination,

(Ans. pp. 14—15)

সমূল এবং অমূল ভ্রম প্রত্যক্ষের পার্থক্য আলোচনা কর।

11. Explain the process of space perception in general. What is the psychological problem of the perception of space ?

(Ans. pp. 20—22)

সাধারণভাবে দেশপ্রত্যক্ষ আলোচনা কর। দেশপ্রত্যক্ষ ব্যাপারে মনোবিদ্যার সমস্যা কি ?

12. How would the congenitally blind perceive space ? Discuss.

(Ans. pp. 23—26)

জন্মান্ধ ব্যক্তির দেশপ্রত্যক্ষ আলোচনা কর।

13. Explain the tactual perception of space. How is filled space, as distinguished from empty space, perceived ?

(Ans. pp. 23—26)

দেশের স্পর্শ-প্রত্যক্ষ বুঝাইয়া দাও। পূর্ণ এবং শূন্যস্থানের প্রত্যক্ষের পার্থক্য কি ?

14. Distinguish between visual and tactual perception of space.

(Ans. pp. 26—28)

দেশের দর্শন এবং স্পর্শ-প্রত্যক্ষ পার্থক্য দেখাও।

15. Distinguish between monocular and binocular perception of space. How is an object perceived as single with two eyes ?

(Ans. pp. 28—30)

এক-চাক্ষুষ এবং দ্বি-চাক্ষুষ দেশ প্রত্যক্ষের পার্থক্য কি ? কিরূপে দুই চক্ষু দিয়া একটি বস্তুকে একটি দেখা যায় ?

16. How is solidity perceived ? Explain the stereoscopic vision of solidity. (Ans. pp. 29—30)

কিভাবে ঘনত্ব প্রত্যক্ষ ঘটে ? ঘনত্বের ঘনদৃগ্দর্শন বুঝাইয়া দাও।

17. Distinguish between the original and acquired perception of distance. Why are not objects seen inverted in space ? (Ans. pp. 31—34)

দূরত্বের অর্জিত এবং মূল প্রত্যক্ষবাদের তুলনা কর।

18. Write notes on (a) Secondary perception of space, (b) Warning sense, (c) Retinal unity and rivalry. (Ans. pp. 36-37, 37-38)
সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর :—(ক) গৌণ দেশপ্রত্যক্ষ, (খ) সাবধানী সংবেদন, (গ) অক্ষিপটীয় ঐক্য এবং দ্বন্দ্ব।

19. How are (a) body-position, (b) movement, (c) resistance and weight, (d) magnitude and form of objects perceived ? (Ans. pp. 38, 38-40, 41)

(ক) দেহাবস্থান, (খ) গতি, (গ) বাধা এবং ওজন, (ঘ) বস্তুর পরিমাণ এবং আকার কিরূপে প্রত্যক্ষ হয় ?

20. Analyse temporal perception. What is the 'specious present' ? (Ans. pp. 41-43)

কালপ্রত্যক্ষ বিশ্লেষণ কর। 'তথাকথিত বর্তমান' কাহাকে বলে ?

21. Distinguish between perception and apperception. (Ans. pp. 44-45)

প্রত্যক্ষ এবং সংপ্রত্যক্ষের পার্থক্য আলোচনা কর।

Compare the different senses as means of space-perception. (Ans. pp. 45-46)

দেশপ্রত্যক্ষ ব্যাপারে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের তুলনা কর।

22. Write notes on :—(a) Indifference Interval, (b) Perception of rhythm, (c) Local sign and Localisation, (d) Projection. (Ans. pp. 43, 43-44, 44-45, 46-47, 47)

সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর :—
(ক) উদাসান্তর, (খ) ছন্দ প্রত্যক্ষ, (গ) দেশাভিজ্ঞান এবং দেশনির্দেশ (ঘ) বিক্ষেপণ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রতিরূপ (Image)

১। প্রত্যক্ষ-ফল (Percept) এবং প্রতিরূপ

প্রত্যক্ষের ফলকে বলে প্রত্যক্ষ-ফল। **প্রত্যক্ষ শেষ হইয়া গেলে উহার যে ফল উৎপন্ন হয় তাহাই প্রত্যক্ষ-ফল।** যেমন, নীল ফুলের প্রত্যক্ষে, প্রত্যক্ষ নীল ফুলটিই ইহার প্রত্যক্ষ-ফল। অতীত-প্রত্যক্ষ বস্তুকে আবার প্রত্যক্ষ করিলে, বস্তুটি পরিচিত বলিয়া জ্ঞাত হয়। কারণ ইহাতে যে অতীত প্রত্যক্ষ-ফল প্রতিরূপের আকারে মনে রহিয়াছে, তাহার অস্পষ্ট স্মরণ (implicit memory) ঘটে।

প্রত্যক্ষ-ফলের রেখা (trace), **ছায়াপাত** (impression) **বা নকলকে** (copy) **প্রতিরূপ** (Image) **বলে।** প্রত্যক্ষ শেষ হইয়া গেলেও, প্রত্যক্ষ বিষয় উহার প্রতিরূপ মনে রাখিয়া যায়। প্রতিরূপ প্রত্যক্ষ-ফলের আসল রূপ নয়, কিন্তু উহার ভাসমান রূপ।

প্রত্যক্ষ ফলের প্রতিরূপে পরিণতি

(Transition from percept to Image)

প্রত্যক্ষফল ও উহার প্রতিরূপের মধ্যবর্তী কতকগুলি স্তরকে প্রত্যক্ষ-ফল বা প্রকৃত প্রতিরূপ, কোনটিই বলা যায় না। প্রত্যক্ষের ফল প্রতিরূপের আকারে মনে সংরক্ষিত হইবার পূর্বে নিম্নলিখিত স্তরসকল অতিক্রম করে।

(১) সংবেদন বা প্রত্যক্ষের উদ্দীপক বিষয় অপসৃত হইবার পরও, উহার প্রতিক্রিয়া কিছুক্ষণ চলিতে থাকে। যেমন একটি রবং দেখা বা শব্দ শোনা শেষ হইলেও, চক্ষু বা কর্ণের উপর তাহার প্রতিক্রিয়া চলিতে থাকে। এই প্রতিক্রিয়ার নাম **অনু-সংবেদন** (after-sensation) বা **অনু-প্রতিরূপ** (after-image)।[১]

অনু-সংবেদন উদ্দীপকের অনুপস্থিতিতে ঘটে। সুতরাং ইহা সংবেদন নয়। আবার ইহা প্রতিরূপও নয়, কারণ ইহা সংবেদনের শক্তির ফলেই স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে ঘটিয়া থাকে। সুতরাং ইহা প্রত্যক্ষ এবং প্রতিরূপের মধ্যবর্তী একটি স্তর।

১। ১ম খণ্ড চতুর্দশ পরিচ্ছেদ, ২-৪ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

(২) **পৌনঃপুনিক প্রতিরূপ** প্রত্যক্ষ এবং প্রতিরূপের মধ্যবর্তী **দ্বিতীয় স্তর।** একটি সুর থামিয়া যাইবার পরও যেন থাকিয়া থাকিয়া কানে বাজিয়া ওঠে। একখানি সুন্দর মুখ দেখিবার পরও যেন উহা থাকিয়া থাকিয়া চোখে ভাসিয়া ওঠে বা মনে পড়ে। প্রত্যক্ষ বস্তু তিরোহিত হইবার পর, এইরূপ বার বার উহা যে আকারে মনে পড়ে তাহার নাম **পৌনঃপুনিক প্রতিরূপ।**

অনুসংবেদনের সহিত পৌনঃপুনিক প্রতিরূপের পার্থক্য এই যে প্রথমটি অবিরাম বা অবিচ্ছিন্নভাবে চলিতেছে বলিয়া মনে হয়, কিন্তু দ্বিতীয়টি মনে হয় থাকিয়া থাকিয়া, সবিরাম বা বিচ্ছিন্নভাবে। অনুসংবেদনের আবির্ভাব ও তিরোভাব স্পষ্টভাবে বুঝা যায় না, কিন্তু পৌনঃপুনিক প্রতিরূপের আবির্ভাব ও তিরোভাব স্পষ্টভাবে জ্ঞাত হয়, কারণ প্রথমটির তুলনায় দ্বিতীয়টিতে আবির্ভাব ও তিরোভাবের সময়-ব্যবধান বেশী। দ্বিতীয়তঃ, অনুসংবেদনের তুলনায় পৌনঃপুনিক প্রতিরূপ আসল প্রতিরূপের দিকে আর একটি ধাপ অগ্রসর হয়। তৃতীয়তঃ, অনুসংবেদন পশ্চাদ্‌ভূমির উপর ফুটিয়া ওঠে না। অনুসংবেদন পৌনঃপুনিক প্রতিরূপের তুলনায় অধিক উদ্দীপক-সাপেক্ষ এবং মন-নিরপেক্ষ।

উড্‌ওয়ার্থ পূর্বে মনে করিতেন[১] যে পৌনঃপুনিক প্রতিরূপের মূলে রহিয়াছে উহার ভাসিয়া ওঠার (buoyancy) প্রবণতা বা অধ্যবসায় শক্তি (perseverance)। অবশ্য উড্‌ওয়ার্থ্ এই প্রবণতাকে পৌনঃপুনিক প্রতিরূপ বলিয়া অভিহিত করেন নাই। তাঁহার “Psychology” গ্রন্থের বর্তমান সংস্করণে এই মতবাদের উল্লেখ নাই।

(৩) প্রত্যক্ষ এবং আসল প্রতিরূপের মধ্যবর্তী শেষ স্তরটিকে বলা হয় **প্রাথমিক স্মৃতি-প্রতিরূপ** (Primary memory-image)। ইহা আসল প্রতিরূপ নয়। শেষ হইয়া যাইবার পরও, প্রত্যক্ষের যে রেখা ও ছায়াপাত মনে সংরক্ষিত হয়, অথচ যাহা আপনা-আপনি স্মরণপথে আসে এবং যাহা স্মরণ করিতে ঐচ্ছিক চেষ্টার দরকার হয় না, এইরূপ প্রতিরূপকে বলে প্রাথমিক স্মৃতি-প্রতিরূপ। একটি ভার তুলিবার ঠিক পরক্ষণে আর একটি ভার তুলিয়াই বুঝা গেল যে দ্বিতীয়টি প্রথমটির তুলনায় বেশী হাল্‌কা বা ভারী। দ্বিতীয় ভারটির বেশী হাল্‌কা বা ভারী বলিয়া প্রত্যক্ষে, প্রথম ভারটির ওজন প্রত্যক্ষের প্রতিরূপ অবশ্যই সাহায্য করে। অথচ এই প্রতিরূপ কোনো ঐচ্ছিক চেষ্টার উপর নির্ভর না করিয়া, স্বয়ং মনে আসে।

প্রাথমিক স্মৃতি-প্রতিরূপ **অনুসংবেদন** নয়, কারণ ইহা অবিরামভাবে অথবা

১। আর-এস-উডওয়ার্থ—সাইকোলজি (ত্রয়োদশ সংস্করণ)—পৃঃ ৩৪২

অল্প বিরামের ব্যবধানে পুনঃপুনঃ প্রত্যক্ষের স্পষ্টতা এবং সজীবতা লইয়া ঘটে না। আবার ইহা পৌনঃপুনিক প্রতিরূপও নয়, কারণ উদ্বোধক বা স্মরণসূত্রের সাহায্য না লইয়া বা অধ্যবসায়ের বেগ লইয়া ইহা পুনঃপুনঃ মনে উদিত হয় না। প্রাথমিক স্মৃতি-প্রতিরূপ একটি মানস-ব্যাপার এবং ইহা ঘটে প্রত্যক্ষের ঠিক পরেই। ইহা মনে স্থায়ীভাবে সংরক্ষিত হয় না। অনুসংবেদন এবং পৌনঃপুনিক প্রতিরূপেব মত ইহাও একটি ক্ষণিক বা অস্থায়ী অবস্থা। প্রাথমিক স্মৃতি-প্রতিরূপে এই দিকটি মনে রাখিলে, ইহার সহিত আসল বা প্রকৃত স্মৃতি-প্রতিরূপের ভ্রান্তি ঘটিবার সম্ভাবনা কমিয়া যায়।

(৪) **আসল স্মৃতি-প্রতিরূপ** (memory-image proper) এই ক্রমিক স্তরের শেষ পরিণতি। অনুসংবেদন, পৌনঃপুনিক প্রতিরূপ এবং প্রাথমিক স্মৃতি-প্রতিরূপ, এই তিনটি স্তর, প্রত্যক্ষ হইতে প্রকৃত স্মৃতি-প্রতিরূপ পর্যন্ত ধারাবাহিক পরিণতির বিভিন্ন পর্যায় বা অবস্থা। এই ক্রমিক পরিণতিতে প্রত্যক্ষের বস্তুগত ভিত্তি ক্রমশঃ কমিতে কমিতে একেবারে নিঃশেষ হয় স্মৃতি-প্রতিরূপে। পূর্ব পূর্ব স্তরগুলিতে উদ্দীপক ও প্রতিরূপের ন্যূনাধিক্য বর্তমান। অনুসংবেদনে উদ্দীপকের প্রভাব প্রতিরূপ অপেক্ষা বেশী। আবার প্রাথমিক স্মৃতিপ্রতিরূপে প্রত্যক্ষের উদ্দীপক নাই বলিলেই চলে, আছে শুধু প্রতিরূপ এবং প্রতিরূপকে উদ্বুদ্ধ করিবার মত স্মরণসূত্র (cue) অথবা অভিভাবীয় শক্তি (suggestive force)।

যে পাঠটি অতীতে তৈয়ারী করা হইয়াছিল, আজ তাহা স্মরণ করা হইতেছে। পাঠটি স্থূলভাবে, অথবা সশরীরে মনে থাকিতে পারে না। নিশ্চয়ই উহা মনে সংরক্ষিত ছিল পঠিত বিষয়ের প্রতিরূপ রূপে। শিক্ষক মহাশয় পাঠটি আবৃত্তি করিতে বলিলেন। এই আদেশ বা জিজ্ঞাসাই অভিভাবীয় উদ্দীপক যাহা স্মরণ-ক্রিয়াকে উদ্বুদ্ধ বা জাগ্রত করিয়া দিল এবং পাঠের কোনো অংশ হয়ত বিনা চেষ্টায়, আবার কোনো অংশ বিশেষ চেষ্টায় মনে পড়িল। তাহা হইলে প্রতিরূপ প্রত্যক্ষের সেই রূপ, যাহা উহার **নকলের মত মনে সংরক্ষিত হইয়া পরবর্তী চেষ্টার ফলে পুনরুজ্জীবিত** (revived) হয়।

৩। আইডেটিক্ প্রতিরূপ (Eidetic image)

জার্মানীর মারবুর্গ ইনষ্টিটিউট অফ্ সাইকলজির বিখ্যাত মনোবিদ ই. আর. যেনেশ্ (E. R. Jaensch) এবং তাঁহার সম্প্রদায় এক প্রকার নূতন প্রতিরূপ

আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহারা এই প্রতিরূপের নামকরণ করিয়াছেন আইডেটিক্ প্রতিরূপ। ইহা প্রধানতঃ দর্শন প্রতিরূপের আকারেই ঘটিয়া থাকে। সাধারণতঃ বারো হইতে চৌদ্দবর্ষীয় বালক-বালিকারা আইডেটিক্ প্রতিরূপ-প্রবণ। আইডেটিক্-প্রতিরূপ-প্রবণতা কৈশোরের সঙ্গে সঙ্গে কমিতে থাকে।

কোন বস্তু বা ছবিতে আধ মিনিট চক্ষু নিবদ্ধ করিয়া, চক্ষু বুজিলে, অথবা কোনো ধূসর পশ্চাদ্‌ভূমিতে তাকাইলে, আইডেটিক্ প্রতিরূপ-প্রবণ বালক-বালিকারা ঐ বস্তু বা ছবিটিকে অবিকলভাবে দেখিতে পায়। প্রত্যেকটি খুঁটিনাটির দিক দিয়া এই প্রতিরূপকে দৃষ্ট বস্তু বা ছবির হুবহু নকল বলিয়া মনে হয়। ইহার স্পষ্টতা ও সজীবতা মূল প্রত্যক্ষেরই মত।

বস্তু নাই, অথচ বস্তুটি দেখা যাইতেছে, এমন অভিজ্ঞতাকে অমূল প্রত্যক্ষ (hallucination) বলে। কিন্তু আইডেটিক্ প্রতিরূপ **অমূল প্রত্যক্ষ নয়**, কারণ ইহাতে প্রতিরূপের অবাস্তবতা বা অলীকতা সম্বন্ধে জ্ঞান থাকে, যাহা অমূল প্রত্যক্ষে থাকে না। আইডেটিক্ প্রতিরূপে বস্তুর নকলের অবিকলতা (Photographic fidelity) থাকিলেও, বাস্তবতাবোধ নাই। যেনেশ্ ইহাকে বলিয়াছেন তথাকথিত অমূল প্রত্যক্ষ (pseudo-hallucination)।

আইডেটিক্-প্রতিরূপ-প্রবণ ব্যক্তিকে যেনেশ্ বলেন আইডেটিক্ ব্যক্তি (Eidetic individual)। তিনি আইডেটিক্ প্রবণতাকে ব্যক্তিত্বের মানদণ্ড রূপে গ্রহণ করিয়া ব্যক্তিত্বের অনেকগুলি জাতির (types) নির্ণয় করিয়াছেন। যেমন টি-টাইপ অথবা টিটানয়েড (Titanoid) এবং বি-টাইপ অথবা বেজ্‌ডউঅয়েড্ (Bezdowoid) ব্যক্তিত্বের দুইটি প্রধান জাতিরূপ। এই বিশুদ্ধ দুইটি জাতিরূপ ছাড়া তিনি আর কয়েকটি জাতিরূপও নির্ণয় করিয়াছেন।

আইডেটিক্ প্রতিরূপের সহিত প্রত্যক্ষ ও প্রতিরূপের মধ্যবর্তী স্তরগুলির পার্থক্য রহিয়াছে। আইডেটিক্ প্রতিরূপকে অনুসংবেদন বলা যায় না। অনুসংবেদন একটি সার্বভৌম এবং ব্যাপক ঘটনা—আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই অনুসংবেদন ঘটে। কিন্তু আইডেটিক্ প্রতিরূপ প্রধানতঃ চৌদ্দ বৎসরের কম বয়স্ক বালক-বালিকাদেরই ঘটে। আবার, সবর্ণ অনুসংবেদন উহার বিপরীত অসবর্ণ অনুসংবেদনে রূপান্তরিত হয়, কিন্তু আইডেটিক্ প্রতিরূপে এইরূপ ঘটে না।

আইডেটিক্ প্রতিরূপের সহিত পৌনঃপুনিক প্রতিরূপের পার্থক্যও স্পষ্ট। দ্বিতীয়টির তুলনায় প্রথমটি অবিরাম বা ছেদহীন। তাহা ছাড়া, অনুসংবেদন এবং

পৌনঃপুনিক প্রতিরূপের সহিত আইডেটিক্ প্রতিরূপের আর একটি পার্থক্য এই যে, প্রথম দুইটি তৃতীয়টির তুলনায় ব্যাপক, কারণ তৃতীয়টি শুধু চাক্ষুষ প্রতিরূপেই সীমাবদ্ধ, কিন্তু প্রথম দুইটি যে কোনো সংবেদনে ঘটে।

আইডেটিক্ প্রতিরূপ অনেকটা প্রাথমিক স্মৃতি-প্রতিরূপের অনুরূপ। কিন্তু এই দুইটির পার্থক্যও উপেক্ষণীয় নয়। প্রথমটি চাক্ষুষ প্রতিরূপে সীমাবদ্ধ, কিন্তু দ্বিতীয়টি যে কোনো প্রতিরূপ সম্পর্কেই ঘটিতে পারে। তাহা ছাড়া দ্বিতীয়টি নকলের বিশ্বস্ততা লইয়া প্রত্যক্ষ হয় না এবং উহার মধ্যে প্রত্যক্ষের স্পষ্টতা ও সজীবতা নাই।

আবার আইডেটিক্ প্রতিরূপকে স্মৃতি-প্রতিরূপও বলা যায় না, যদিও স্মৃতি-প্রতিরূপ আইডেটিক্ প্রতিরূপের মত স্পষ্ট ও সজীব বা অবিকল। উহাদের পার্থক্য এই যে, দ্বিতীয়টি আপনা-আপনি ঘটে, কিন্তু প্রথমটিকে ঐচ্ছিক চেষ্টায় পুনরুজ্জীবিত করিতে হয়।

উপসংহারে বলা যায় যে আইডেটিক্ প্রতিরূপ একটি সাময়িক এবং বয়ঃসন্ধিক্ষণের (adolescent phenomenon) ঘটনা। ইহাতে উপরোক্ত প্রত্যক্ষ এবং প্রতিরূপের মধ্যবর্তী স্তরগুলির মত ব্যাপকতা বা সার্বভৌমতা নাই। তাহা ছাড়া, ইহা চাক্ষুষ প্রতিরূপকে আশ্রয় করিয়া ঘটে। কিন্তু উপরোক্ত স্তরগুলি যে কোন ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্পর্কিত হইতে পারে। তাহা ছাড়া, আইডেটিক্ প্রতিরূপকে অন্য জাতীয় প্রতিরূপে পরিণত করা যায় না।

৪। প্রত্যক্ষফল ও প্রতিরূপ (Percept and Image)

প্রত্যক্ষফল ও প্রতিরূপের সম্বন্ধ অতি নিকট। প্রতিরূপ প্রত্যক্ষফলেরই রেখা বা ছায়াপথ। যে বস্তুর প্রত্যক্ষ হয় নাই তাহার প্রতিরূপও নাই। সুতরাং প্রতিরূপ প্রত্যক্ষের উপর নির্ভর করে। আবার প্রত্যক্ষও প্রতিরূপের অপেক্ষা রাখে। প্রত্যক্ষের অঙ্গীভূত সদৃশীকরণ, পৃথকীকরণ প্রভৃতি ক্রিয়া প্রতিরূপের সাহায্যে ঘটে। কিন্তু প্রত্যক্ষফল ও প্রতিরূপের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হইলেও ইহাদের **পার্থক্য** বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

তীব্রতা (intensity), **স্পষ্টতা** (vividness) এবং **সজীবতার** (liveliness) দিক হইতে প্রতিরূপ প্রত্যক্ষের তুলনায় নিকৃষ্ট। **হিউম-এর** মতে প্রতিরূপ এবং প্রত্যক্ষফলের পার্থক্য শুধু তীব্রতার **পরিমাণগত পার্থক্য**। তিনি বলেন যে প্রতিরূপ প্রত্যক্ষফলের ক্ষীণ প্রতিচ্ছায়া মাত্র। উহারা আসলে একজাতীয় মানস-

বৃত্তিরই যথাক্রমে স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট রূপ। যাহা তীব্র এবং সজীব প্রত্যক্ষরূপে মনকে **আঘাত** (strikes the mind) করে, তাহাই কম তীব্র বা সজীবভাবে প্রতিরূপের আকারে মনে জাগে।

স্টাউট, হিউম্-এর মত গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার মতে প্রত্যক্ষফল ও প্রতিরূপের পার্থক্য শুধু পরিমাণগত নয়, কিন্তু **প্রকারগত**। অর্থাৎ, প্রতিরূপ শুধু প্রত্যক্ষফলের একটি সংস্করণ নয়, কিন্তু ইহা একটি স্বতন্ত্র মানসবৃত্তি। স্টাউট্ দেখাইয়াছেন যে হিউম্ প্রকারান্তরে এই পার্থক্যের ইঙ্গিত করিয়াও ইহা স্পষ্টভাবে স্বীকার করেন নাই। হিউম্ বলিয়াছেন যে, **প্রত্যক্ষ অপেক্ষাকৃত বেশী সজীব ভাবে মনকে নাড়া দেয়**, কিন্তু প্রতিরূপ মনকে নাড়া দিতে পারে না। প্রদীপের মন্দ আলোক, ফিস্ ফিস্ কথা বা মৃদু শব্দ, ক্ষীণ প্রত্যক্ষের দৃষ্টান্ত। আবার বিদ্যুতের তীব্র আলোক অথবা বজ্রাঘাতের উচ্চ শব্দ স্পষ্ট প্রত্যক্ষের দৃষ্টান্ত। তীব্র বিদ্যুতের প্রতিরূপ হয়ত ক্ষীণ আলোকের প্রত্যক্ষের তুলনায় তীব্র। কিন্তু ক্ষীণ আলোকের প্রত্যক্ষ মনকে যেরূপ নাড়া দিতে পারে, তীব্র আলোকের প্রতিরূপ সেইরূপ পারে না। সুতরাং, প্রত্যক্ষ এবং প্রতিরূপের পার্থক্যকে **শুধু পরিমাণগত পার্থক্য বলা চলে না**। প্রতিরূপ প্রত্যক্ষফলের ক্ষীণ সংস্করণ মাত্র নয়।

(২) দ্বিতীয়তঃ, প্রতিরূপ অপেক্ষা প্রত্যক্ষফল **স্পষ্টতর**। প্রত্যক্ষফল সবলে মনকে অধিকার করে। স্টাউট্-এর ভাষায়, প্রত্যক্ষের মনকে 'আক্রমণ' অথবা সবলে অধিকার করিবার (aggressive character) গুণ আছে। প্রতিরূপের স্বভাবে মনকে অধিকার করিবার অথবা মনোযোগ কাড়িয়া লইবার ক্ষমতা নাই।

(৩) তৃতীয়তঃ, প্রত্যক্ষ বস্তু একটি সমগ্র বা গোটা বস্তু। টেবিলের প্রত্যক্ষে মোটামুটিভাবে সমগ্র টেবিলটি অথবা টেবিলের কোনো সম্পূর্ণ অংশ জ্ঞাত হয়। পক্ষান্তরে, টেবিলটির প্রতিরূপে উহার সমগ্রতা ক্ষুণ্ণ হয়। টেবিলটিকে স্মরণ করিতে গেলে, হয়ত উহার একটি পায়া মনে আসে, অন্য পায়াগুলি মনে আসে না। উহার দৈর্ঘ্য বা প্রস্থ একটানাভাবে অথবা একটি সম্পূর্ণ ফালি হিসাবে স্মরণ হয় না, কিন্তু স্মরণ হয় কাটা কাটা বা খণ্ডবিখণ্ড টুকরারূপে। দেখা যাইতেছে যে, **প্রত্যক্ষের তুলনায় প্রতিরূপ আংশিক** (fragmentary)।

(৪) প্রত্যক্ষফলে **ধারাবাহিকতা** (continuity) আছে, প্রতিরূপে নাই। প্রত্যক্ষফল অপেক্ষাকৃত স্থির এবং অচঞ্চল, কিন্তু প্রতিরূপ প্রত্যক্ষফলের তুলনায় চঞ্চল। প্রতিরূপ নিয়ত দোলায়মান (fluctuating) এবং হ্রাসবৃদ্ধিসম্পন্ন। অনেক

মনোবিদ, যেমন স্টাউট্, টিশনার্ প্রভৃতি, প্রতিরূপের পরিবর্তনশীলতা এবং চঞ্চলতার (flowing and flickering character) উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন।১

(৫) প্রত্যক্ষফল স্বভাবতঃ **মনোযোগ আকর্ষণ করে।** ইহাকে স্থিরভাবে ধরিয়া রাখিবার জন্য ঐচ্ছিক মনোযোগের দরকার হয় না। কিন্তু প্রতিরূপ নিয়ত পরিবর্তনশীল। কাজেই, ইহাকে স্থিরভাবে ধরিয়া রাখিবার জন্য ঐচ্ছিক মনোযোগের দরকার হয়।

(৬) আর এক দিক হইতে প্রত্যক্ষফলই ক্ষণিক বা চঞ্চল এবং প্রতিরূপ অপেক্ষাকৃত কম ক্ষণিক অথবা চঞ্চল। প্রত্যক্ষফল বাস্তব জগতের একটি অংশ। ঐ বস্তুটি যে স্থানে প্রত্যক্ষ হইয়াছে, তাহা ত্যাগ করিলেই, মনের সহিত বস্তুর যোগসূত্র ছিন্ন হইয়া পড়ে। কিন্তু স্থান ত্যাগ করিলেই প্রত্যক্ষফলের প্রতিরূপ নষ্ট হয় না, বরং মোটের উপর স্থির বা অপরিবর্তিতভাবে মনে সংরক্ষিত থাকে। অর্থাৎ গতি বা স্থান পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যক্ষ অন্তর্হিত হয় কিন্তু **প্রতিরূপ স্থির ও অপরিবর্তিত** থাকে।

৫। প্রতিরূপের নমুনাভেদ (Types of Imagery)

প্রতিরূপ গঠনের প্রবণতা সকল ব্যক্তির ক্ষেত্রে সমান হয় না। এই বিষয়ে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে উল্লেখযোগ্য ভেদ দেখা যায়। ইংরেজ মনোবিদ **ফ্রান্সিস্ গ্যাল্‌টন্** প্রতিরূপ-গঠনে ব্যক্তিভেদ সম্বন্ধে মূল্যবান গবেষণা করিয়াছেন। তিনি একশত ব্যক্তির উপর প্রশ্নাবলী পদ্ধতি (questionnaire) প্রয়োগ করিয়া দেখিয়াছেন যে, প্রাতঃকালীন আহারের টেবিল স্মরণ করিতে গিয়া সকল ব্যক্তি একই জাতীয় প্রতিরূপের সাহায্য লয় না। কোন ব্যক্তি হয়ত প্রাতরাশ টেবিলের দৃশ্যগুলি, যেমন টেবিলের বা চা-কাপের রং অথবা বিভিন্ন ব্যক্তির চেহারা মনশ্চক্ষে দেখিতে পায়। এই ব্যক্তি **চাক্ষুষ-প্রতিরূপ-প্রবণ** (visile) অর্থাৎ উহার স্মরণ ক্রিয়ায় চাক্ষুষ প্রতিরূপ প্রাধান্য লাভ করে। আবার কোন ব্যক্তি হয়ত চা-কাপের টুং-টাং শব্দ বা কেট্‌লি হইতে কাপে চা ঢালিবার শব্দ, অথবা প্রাতরাশ গ্রহণকারী ব্যক্তিদের কণ্ঠস্বর শুনিতে পায়। এই ব্যক্তি প্রধানতঃ **শ্রবণ-প্রতিরূপ-প্রবণ**

১। (৬)-এর আলোচনায় দেখা যাইবে যে, প্রতিরূপকেই প্রত্যক্ষের তুলনায় স্থায়ী বলা যাইতে পারে।

(audile)। আবার কোনো ব্যক্তি হয়ত প্রাতরাশ টেবিল স্মরণ করিতে গিয়া বয়-এর অথবা অন্যান্য লোকদের ছুটাছুটি, কেট্‌লি হইতে কাপে ঢালিবার কালে চা-এর ধারা প্রভৃতির প্রতিরূপ স্মরণ করে। এই ব্যক্তি **চেষ্টীয় প্রতিরূপ-প্রবণ** (kinaesthetic)।

ব্যক্তির প্রতিরূপ-প্রবণতা প্রধানতঃ তিন শ্রেণীর, যথা—চাক্ষুষ, শ্রাবণ এবং চেষ্টীয়। কিন্তু একটি চতুর্থ প্রকারের প্রতিরূপ-প্রবণতা আছে, এবং অধিকাংশ ব্যক্তিই এই শ্রেণীভুক্ত। এই চতুর্থ প্রকারের প্রতিরূপ-প্রবণতাকে বলা যায় **মিশ্রিত প্রকার** (mixed type)। এই ব্যক্তি স্মরণের বিষয়কে দুইটি বা তিনটি প্রতিরূপের সাহায্যে গ্রহণ করে। যেমন, প্রাতরাশের টেবিল কল্পনা করিতে গিয়া এই ব্যক্তি চাক্ষুষ, শ্রাবণ এবং চেষ্টীয়, এই সকল রকমের প্রতিরূপই স্মরণ করে। অবশ্য মিশ্রিত প্রতিরূপ-প্রবণতার মধ্যেও কোনো একটি বিশেষ প্রকারের প্রতিরূপের দিকে অধিক ঝোঁক দেখা যায়।

উপরোক্ত **চারিটির অতিরিক্ত প্রতিরূপ-প্রবণতা**, যেমন স্পার্শন (tactile), ঘ্রাণীয় (olfactory) এবং স্বাদীয় (gustatory) ভেদও আছে কিনা, সেই সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ রহিয়াছে। মোটের উপর, ব্যক্তির প্রতিরূপ-প্রবণতার প্রকারভেদ প্রধানতঃ উপরোক্ত চারিটিই।

প্রতিরূপ-প্রবণতার **গুরুত্ব** এই যে, ইহার ভেদ ব্যক্তির মনোবিকাশের উপর বিশেষ আলোকপাত করে। ব্যক্তির ভবিষ্যৎ পেশা, তাহার শিক্ষাপ্রণালী প্রভৃতি প্রতিরূপ-প্রবণতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। চাক্ষুষ প্রতিরূপ-প্রবণ ব্যক্তির শিক্ষায় চাক্ষুষ সংবেদনের এবং শ্রাবণ প্রতিরূপ-প্রবণ ব্যক্তির শিক্ষায় শ্রবণ সংবেদনের প্রাধান্য থাকা বাঞ্ছনীয়। প্রথমোক্ত ব্যক্তির শিক্ষা হইবে দেখিয়া, আবার দ্বিতীয় ব্যক্তির শিক্ষা হইবে প্রধানতঃ শুনিয়া।

৬। প্রতিরূপের আরও কয়েকটি প্রকারভেদ

প্রতিরূপের আরও কয়েকটি প্রকারভেদও উল্লেখযোগ্য।

(১) **সামান্য প্রতিরূপ** (generic image) একই বা সদৃশ বস্তুর সাদৃশ্যগুলির সমবেত প্রতিরূপ। এই প্রক্রিয়াটি অনেকটা সম্মিলিত চিত্রের (composite photography) মত। হাসপাতালের রোগীরা কিরূপ তাহা সাধারণভাবে বুঝিতে হইলে,

সকল যোগীর আকৃতির পার্থক্যগুলি বাদ দিয়া এবং সাদৃশ্যগুলি লইয়া যে সাধারণ বা সম্মিলিত চিত্র গঠিত হয়, তাহা সামান্য প্রতিরূপের অনুরূপ।১

(২) **যুগ্ম প্রতিরূপ** (composite image) গঠিত হয় একই বা এক শ্রেণীর ব্যক্তি বা বস্তুর বিভিন্ন প্রতিরূপগুলি মিলিত হইবার ফলে।

(৩) সংবেশিত (hypnotised) ব্যক্তির অর্ধনিদ্রিত অবস্থায় যে প্রতিরূপগুলি অমূল প্রত্যক্ষের মত বস্তুর আকারে ভাসিয়া উঠে, উহাদিগকে বলে **সংবেশিত অবস্থাকালীন প্রতিরূপ** (hypnagogic image)।

(৪) অমূল প্রত্যক্ষের প্রতিরূপ (hallucinatory image) বলে সেই প্রতিরূপকে যাহা অমূল প্রত্যক্ষে ভাসিয়া উঠে এবং সত্য বলিয়া মনে হয়।

৭। স্মৃতি-প্রতিরূপ এবং কল্পনা-প্রতিরূপ
Memory Image and the Image of Imagination

স্মৃতি-প্রতিরূপ এবং কল্পনা-প্রতিরূপ—যে প্রতিরূপ অতীত অভিজ্ঞতাকে পরিবর্তিত না করিয়া পুনরুপস্থিত করে তাহাকে স্মৃতি-প্রতিরূপ (memory image) বলে। আবার যে প্রতিরূপ অতীত অভিজ্ঞতাকে পরিবর্তিত করিয়া অথবা উহার অংশগুলি পুনর্বিন্যাস করিয়া পুনরুপস্থিত করে তাহাকে বলে কল্পনা-প্রতিরূপ।

স্মৃতি-প্রতিরূপ এবং কল্পনা-প্রতিরূপের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।

স্মৃতি-প্রতিরূপ এবং কল্পনা-প্রতিরূপের সাদৃশ্য এই যে, ইহারা উভয়ই অতীত প্রত্যক্ষের ফল। যে শিল্পী তাজমহলের ছবি আঁকিতেছেন, তিনি এই হর্ম্যটিকে যেরূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, অবিকল তাহারই পুনরুৎপাদন করিতেছেন। আবার রবীন্দ্রনাথ তাজমহল সম্বন্ধে তাঁহার কাব্যসৃষ্টিতে উহার এবং উহার সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতিরূপগুলিকে নূতনভাবে সাজাইয়াছেন। তাহা হইলে, কি স্মৃতি-প্রতিরূপ, কি কল্পনা-প্রতিরূপ, ইহারা উভয়ই অতীত অভিজ্ঞতার ফল।

স্মৃতি-প্রতিরূপ এবং কল্পনা-প্রতিরূপের পার্থক্যও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

(১) সাধারণতঃ মনে করা হয় যে, স্মৃতি-প্রতিরূপ অপেক্ষাকৃত স্থায়ী এবং কল্পনা-প্রতিরূপ অপেক্ষাকৃত ক্ষণিক। এই মতে স্মৃতিপ্রতিরূপ প্রত্যক্ষের হুবহু পুনরুৎপাদন, সুতরাং প্রত্যক্ষের মতই স্থির, এবং কল্পনা-প্রতিরূপ স্বাধীন, সুতরাং উহা অস্থির বা ক্ষণিক।

কিন্তু টিশ্‌নার্‌ প্রভৃতি মনোবিদ্‌ মনে করেন যে, এই দুই প্রতিরূপের বাস্তব সম্বন্ধ

১। গঠনমূলক কল্পনা পরিচ্ছেদের তৃতীয় অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

বিপরীত। ইহাদের মতে স্মৃতি-প্রতিরূপই অস্থির, কিন্তু কল্পনা-প্রতিরূপ স্থির। একটি স্মৃতি-প্রতিরূপ হয়তো এই মাত্র মনে হইল, আবার পরক্ষণেই বিস্মৃত হইল। কিন্তু কল্পনা-প্রতিরূপকে স্থির রাখিয়া শিল্পী ছবি আঁকেন, অথবা কবি কাব্য রচনা করেন। সুতরাং কল্পনা-প্রতিরূপই স্থির এবং স্মৃতি-প্রতিরূপ অস্থির।

(২) আবার স্মৃতি-প্রতিরূপ ব্যক্তিকেন্দ্রিক, কিন্তু কল্পনা-প্রতিরূপ অপেক্ষাকৃত নৈর্ব্যক্তিক। যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি বা জানিয়াছি, তাহা স্মরণ করিতেছি, এইরূপ ব্যক্তিবোধ (personal consciousness) স্মৃতি-প্রতিরূপের কেন্দ্র। কিন্তু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে প্রতিরূপ গ্রহণ করিয়া উহাকে যে নূতনভাবে সাজাইতেছি, তাহা ব্যক্তির কল্পনা হইলেও, তাহাতে ব্যক্তিবোধ নাই বলিলেই চলে।

(৩) স্মৃতি-প্রতিরূপের সহিত পরিচিতি-বোধ (feeling of familiarity) সংযুক্ত থাকে। যে ঘটনাটির স্মরণ হইতেছে, তাহা ব্যক্তির পরিচিত ঘটনা। কিন্তু কল্পনা-প্রতিরূপে এইরূপ পরিচিতিবোধ থাকে না।

(৪) স্মৃতি-প্রতিরূপের অতীত নির্দেশ (reference to the past) এবং স্থান-নির্দেশ (localisation) থাকে। এমন কোনো ঘটনার স্মরণ হয় না, যাহা নির্দিষ্ট কালে বা স্থানে সংঘটিত হয় নাই। কবে, কোথায়, ঘটনাটি ঘটিয়াছিল, এই অতীত কাল এবং স্থানের প্রতিরূপ জাগরূক না হইলে, এই ঘটনার স্মরণ সম্পূর্ণ হয় না। একটি লোককে দেখিয়াই মনে হইল, যেন তাহাকে চিনি। কিন্তু এই লোকটিকে চেনা তখনই সম্পূর্ণ হয়, যখন মনে পড়ে কোথায়, কবে এবং কি উপলক্ষে তাহাকে দেখিয়াছিলাম।

কিন্তু কল্পনা-প্রতিরূপে এইরূপ কোনো কাল বা স্থানের নির্দেশ নাই। ফুল আকাশে ফোটে না, কিন্তু ফুলের প্রতিরূপকে আকাশের প্রতিরূপের সহিত জুড়িয়া আকাশ-কুসুম কল্পনা সম্ভব। এমনও কল্পনা করা যায়, যখন এই জগতে থাকিব না, ফেলিয়া-যাওয়া বস্তুগুলি হয়ত এই ভাবে বা অন্যভাবে থাকিবে। বর্তমান, অতীত, ভবিষ্যৎ—এই তিন কালের প্রতিরূপ চয়ন করিয়া কল্পনার জাল বোনা যাইতে পারে। ছাত্র ভবিষ্যৎ পরীক্ষার ফল, অথবা অতীতে আরও ভাল পরীক্ষার ফল এবং পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হইলে, বর্তমানে তাহার কিরূপ প্রস্তুত হওয়া উচিত, তাহা কল্পনা করিতে পারে।

স্মৃতি-প্রতিরূপ এবং কল্পনা-প্রতিরূপের পার্থক্য চূড়ান্ত নয়, উহারা পরস্পর-সাপেক্ষ। সাধারণ অভিজ্ঞতায় উহারা প্রায়ই সংমিশ্রিত থাকে। যাহাকে

স্মৃতিপ্রতিরূপ অথবা অতীত প্রত্যক্ষের নকল মনে করা হয়, তাহা প্রায়ই পুনরুৎপাদন ক্রিয়ায় কল্পনার প্রভাবে ইতরবিশেষ হইয়া দাঁড়ায়। তোতাপাখীর মত অবিকল আবৃত্তি (rote learning) ছাড়া উন্নত স্তরের স্মরণক্রিয়ায় প্রায়ই নূতন সংগঠন থাকে। ফলে এই সকল স্মৃতি-প্রতিস্তুপের সহিত কল্পনা-প্রতিরূপ মিশ্রিত হয়।

আবার কল্পনা-প্রতিরূপেও স্মৃতি-প্রতিরূপের সাহায্য আবশ্যক। উহা অতীত প্রত্যক্ষ হইতে সংগৃহীত হয়। ইহার বিশেষত্ব এই যে, ইহা যে স্থানে বা কালে বা অবস্থায় প্রত্যক্ষ হইয়াছিল, তাহা হইতে পৃথক স্থানে, কালে বা অবস্থায় কল্পিত হয়। যেমন, মৎস্যদেহের নিম্নাংশ এবং কন্যাদেহের উপরাংশ প্রত্যক্ষ হইয়াছিল যথাক্রমে মৎস্যে এবং কন্যায়। কিন্তু মৎস্যকন্যার (mermaid) কল্পনায় এই অংশ বা অবয়বগুলি উহাদের অবয়ব হইতে বিশ্লিষ্ট এবং একটি অপরটিতে সংযোজিত হওয়ায়, এমন একটি কল্পিত প্রাণী সৃষ্ট হয়, যাহার দেহের নিম্নাংশ মৎস্যের এবং উপরাংশ কন্যার।

৮। স্মৃতি ও কল্পনা (Memory and Imagination)

কল্পনা (imagination) কথাটি দুই অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। **ব্যাপক অর্থে** প্রত্যক্ষলব্ধ প্রতিরূপকে নানাপ্রকারে সম্বদ্ধ করিবার মানসক্রিয়া অথবা অতীত অভিজ্ঞতার পুনরুজ্জীবনকেই (revival) কল্পনা বলে। প্রতিরূপের পুনরুজ্জীবন দুই প্রকারের হইতে পারে, যথা—প্রত্যক্ষের ক্রম ও বিন্যাসের অনুরূপ এবং ভিন্নরূপ ক্রম এবং বিন্যাসে। পূর্ব-পঠিত পাঠের পুনরাবৃত্তিতে প্রতিরূপগুলি পর পর মনে জাগিতে পারে। এই স্মরণক্রিয়ায় বস্তু ঠিক যে ক্রমে অথবা পূর্বাপর সম্বন্ধে, যেমন পঠিত হইয়াছিল, ঠিক সেই ক্রমে অথবা পূর্বাপর সম্বন্ধে তেমনভাবে পুনরুজ্জীবিত বা পুনরুৎপন্ন হইতেছে। **অনুভূত বিষয়ের হ্রাসবৃদ্ধি অথবা অদলবদল না করিয়া, যথাক্রমে উহার প্রতিরূপগুলিকে পুনরুৎপন্ন বা পুনরুজ্জীবিত করাকে স্মরণক্রিয়া বলে।** ব্যাপক অর্থে স্মরণও কল্পনা।

সঙ্কীর্ণ অর্থে কল্পনা বলিতে বুঝায় সেই মানসক্রিয়া, যাহাতে পূর্ব-প্রত্যক্ষ বস্তুর প্রতিরূপগুলি পুনরুৎপন্ন বা পুনরুজ্জীবিত হইলেও, পূর্ব ক্রমবিন্যাস অথবা অবস্থায় হয় না, কিন্তু নূতন ক্রম, বিন্যাস অথবা অবস্থায় হইয়া থাকে। যেমন পূর্ব-পঠিত পাঠটি শুধু যে ভাবে শেখা হইয়াছিল, ঠিক সেইভাবেই উহার প্রতিরূপগুলিকে পুনরুৎপন্ন না করিয়া, নূতন ক্রম, বিন্যাস বা অবস্থায় পুনরুৎপন্ন করিয়া নূতন বস্তু গঠন করার নাম কল্পনা। তাজমহল ঠিক যেমনটি প্রত্যক্ষ হইয়াছে, ঠিক তেমনটি উহার প্রত্যক্ষলব্ধ প্রতিরূপগুলিকে পুনরুজ্জীবিত না করিয়া, অন্যভাবে অথবা উহাদের সম্বন্ধের

অদলবদল করিয়া কিছু নূতন সৃষ্টির আকারে পুনরুজ্জীবিত করা যায়। যেমন, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার শা-জাহান কবিতায় তাজমহল সম্বন্ধে নূতন সৃষ্টি করিয়াছেন, তাজমহল, শা-জাহান এবং মমতাজের প্রতিরূপগুলিকে নানাভাবে সংযোজিত করিয়া।

তাহা হইলে, উপরোক্ত দুইটি প্রকারভেদ অনুসারে কল্পনা দুই প্রকার, যথা—পুনরুৎপাদনমূলক (reproductive) এবং গঠনমূলক কল্পনা (constructive)। কল্পনার এই ব্যাপকতাকে সঙ্কুচিত করিয়া প্রথমটিকে বলা হয় স্মৃতি (memory) এবং দ্বিতীয়টিকে বলা হয় কল্পনা (imagination)।

অনুশীলনী

Exercise

1. Explain the stages in the transition from percept to image. (Ans. pp. 50—52)

প্রত্যক্ষএল এবং প্রতিরূপের মধ্যবর্তী স্তরগুলির আলোচনা কর।

2. What is Eidetic Image? How does it differ from other images? Why is it called pseudo-hallucination? (Ans. pp. 52—54)

আইডেটিক প্রতিরূপ কাহাকে বলে? ইহার সহিত অন্যান্য প্রকার প্রতিরূপের পার্থক্য কি? ইহাকে তথাকথিত অমূল প্রত্যক্ষ বলা হয় কেন?

3. Distinguish between percept and image. Do they differ in degree or in kind? (Ans. pp. 54—56)

প্রত্যক্ষফল এবং প্রতিরূপের পার্থক্য আলোচনা কর। উহাদের পার্থক্য পরিমাণগত অথবা গুণগত?

4. What are the main image-types? How do individuals differ in the power of forming images? (Ans. pp. 56—57)

প্রতিরূপের প্রধান নমুনাগুলি কি কি? ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রতিরূপ-গঠনশক্তির ভেদ আলোচনা কর।

5. Distinguish between memory and imagination. In what sense is memory also called imagination? (Ans. pp. 60—61)

স্মৃতি এবং কল্পনার ভেদ আলোচনা কর। কোন্ অর্থে স্মৃতিকে কল্পনা বলা যায়?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

স্মৃতি (Memory)

১। স্মৃতি কাহাকে বলে

স্মৃতি ও স্মরণ

অতীত প্রত্যক্ষ বা অভিজ্ঞতার প্রতিরূপগুলি অবিকলভাবে পুনরুৎপাদন করিবার ক্ষমতাকে স্মৃতি বলে। যেমন "পাখী সব করে রব রাত্তি পোহাইল" লাইনটি যেমন শেখা হইয়াছিল, ঠিক তেমনভাবেই উহা মনে করিবার নাম উহার স্মৃতি। যোগসূত্রকারের ভাষায় স্মৃতি বলিতে বুঝায় অনুভূত বিষয়ের 'অসম্প্রমোষ' অথবা অনপহরণ, অথবা উহা অক্ষুণ্ণভাবে সংরক্ষিত থাকা। অর্থাৎ, যোগসূত্রকার ধৃতি বা সংরক্ষণকে (retention) স্মৃতি বলিয়াছেন।

অতীতে প্রত্যক্ষ বা অনুভূত বস্তুর যথাসম্ভব অবিকল পুনরুৎপাদনের **ক্ষমতাকে** স্মৃতি (memory) এবং এই **ক্রিয়াকে** স্মরণ (remembering, recalling) বলা হয়। স্মৃতি এবং স্মরণ আবার নির্ভর করে শিক্ষা, শিক্ষালব্ধ বিষয়ের সংরক্ষণ বা ধৃতি, পুনরুৎপাদন প্রভৃতি ক্রিয়ার উপর।

২। স্মৃতির অঙ্গ (Factors of Memory)

স্মৃতি কতকগুলি অঙ্গ বা অংশ লইয়া গঠিত। স্মৃতির অঙ্গ প্রধানতঃ চারিটি, যথা—**ধৃতি** বা ধারণ (retention), **পুনরুৎপাদন**, পুনরুজ্জীবন বা পুনরুদ্বোধন (reproduction, recall, revival), পুনর্জ্ঞান বা **প্রত্যভিজ্ঞা** (recognition) এবং **স্থান-কাল-নির্দেশ** (localisation)।

(১) ধৃতি বা ধারণ (Retention)

সংবেদন, শিক্ষণ, প্রত্যক্ষ প্রভৃতি মনের সংগ্রাহক (acquisitive) বৃত্তি। ইহাদের সাহায্যে মন নূতন নূতন জ্ঞান আহরণ করে। এই আহৃত জ্ঞান লব্ধ হইবার সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট হইয়া গেলে, জ্ঞানের বৃদ্ধি বা বিকাশ সম্ভব হয় না। ইহা মনে ধৃত বা সংরক্ষিত (retained, preserved) থাকিলেই, উহার ভিত্তিতে উচ্চতর জ্ঞানলাভ সম্ভব হয়। **ধৃতি মনের এই সংরক্ষণমূলক শক্তি।**

যাহাই চেতনাকে স্পর্শ করে, তাহাই মনের উপর রেখাপাত করে। এই রেখাপাত (impression) প্রতিরূপের আকারে মনে ধৃত বা সংরক্ষিত থাকে। কোনো উদ্দীপক-অবস্থা ঘটিলেই, এই সংরক্ষিত প্রতিরূপ পুনরুৎপন্ন হয়, যাহার ফলে স্মৃতি ঘটিয়া থাকে।

(২) **পুনরুৎপাদন বা পুনরুদ্দীপন** Reproduction, Recall)

কিন্তু প্রতিরূপ মনে সংরক্ষিত থাকিলেই উহার স্মরণ হয় না। নানা অভিজ্ঞতার ফলে নানা প্রতিরূপই তো মনে রহিয়াছে। যে বিষয়টিকে স্মরণ করিতে হইবে, তাহার প্রতিরূপগুলিকে উহাদের সংরক্ষিত বা অব্যক্ত অবস্থা হইতে ব্যক্ত বা প্রকাশিত করা দরকার। **মনে সংরক্ষিত অব্যক্ত প্রতিরূপ ব্যক্ত করাকে বলে পুনরুৎপাদন**, পুনরুদ্দীপন বা পুনরুজ্জীবন।

পুনরুৎপাদন সম্ভব হয় কোনো উদ্দীপক সূত্র (cue) বা অভিভাবের (suggestion) সাহায্যে। উদ্দীপক প্রতিরূপগুলিকে অতীত অভিজ্ঞতার ক্রম, সম্বন্ধ, বিন্যাস প্রভৃতি অনুযায়ী পুনরূপস্থাপিত করে। প্রতিরূপগুলির মধ্যে যে সম্বন্ধের ফলে উদ্দীপক উহাদের পুনরূপস্থাপিত করিতে পারে তাহাকে বলা হয় **অনুষঙ্গ**।

(৩) **পুনর্জ্ঞান প্রত্যভিজ্ঞা** (Recognition)

আবার, পূর্ব-অভিজ্ঞতালব্ধ প্রতিরূপের ধারণ এবং পুনরুৎপাদন স্মরণের পক্ষে যথেষ্ট নয়। যে বিষয়টি পূর্ব অভিজ্ঞতায় জ্ঞাত হইয়াছিল, পুনরুৎপন্ন প্রতিরূপ যে উহারই প্রতিরূপ, এই পুনর্জ্ঞানও স্মৃতির অপরিহার্য অঙ্গ। স্মরণে উহার প্রতিরূপকে কোনো পূর্বজ্ঞাত বিষয়ের প্রতিরূপ বলিয়া চিহ্নিত করা অথবা পুনরায় জানা চাই। **যে বিষয়টিকে পূর্বে জানা হইয়াছিল, তাহাই পুনর্বার জ্ঞাত হইতেছে**, এইরূপ জ্ঞানকে প্রত্যভিজ্ঞা বলে।

পুনর্জ্ঞান বা প্রত্যভিজ্ঞা ছাড়া স্মরণক্রিয়া অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। হয়ত পূর্বজ্ঞাত বিষয়টি ঠিকমতই পুনরুৎপন্ন হইল, অথচ উহাকে পূর্বজ্ঞাত বলিয়া চিনিতে পারা গেল না। অথবা যে বস্তুটিকে পূর্বে জানিয়াছিলাম, সেই বস্তুটিকেই পুনরায় জানিতেছি বা স্মরণ করিতেছি, এই আকারের পুনর্জ্ঞান বা প্রত্যভিজ্ঞা ঘটিল না। এইরূপ ক্ষেত্রে পূর্বজ্ঞাত বিষয়ের পুনরুদ্দীপন হওয়া না-হওয়া সমান। সুতরাং পুনর্জ্ঞান বা প্রত্যভিজ্ঞা স্মরণের অপরিহার্য অঙ্গ।

(৪) **স্থান-কাল-নির্দেশ** (Localisation)

কোনো বস্তুর প্রত্যভিজ্ঞায় উহার প্রতিরূপটি যে উহারই প্রতিরূপ, এই প্রকার বোধ অনিবার্য। প্রতিরূপের স্থান-কাল-নির্দেশ না হইলে, এই আকারের প্রত্যভিজ্ঞা সম্ভব হয় না। শুধু সংরক্ষিত বস্তুর প্রতিরূপ পুনরুৎপন্ন হইলেই হইল না। বস্তুটি **কোথায়, কবে** অথবা **কখন** জ্ঞাত হইয়াছিল, সেই স্থান-কাল জ্ঞানেরও পুনরুৎপাদন হওয়া চাই। স্থান-কাল-নির্দেশসহ বস্তুর পুনরুজ্জীবন না ঘটিলে উহার পরিচিতি-বোধ (feeling of familiarity), যাহাকে টিশ্‌নার্ প্রত্যভিজ্ঞার প্রাণ বলিয়াছেন, তাহা ঘটে না। দূর হইতে একটি লোককে দেখিয়া তাহাকে যেন চিনি বা জানি বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এই সংশয়মিশ্রিত জ্ঞান প্রত্যভিজ্ঞা নয়। প্রত্যভিজ্ঞা হয় তখনই, যখন ঐ লোকটিকে কোন্ স্থানে কবে বা কোন্ সময় দেখিয়াছিলাম, এই স্থান-কাল-নির্দেশ ঘটে।

সুতরাং স্মৃতি বলিতে বুঝায় সেই স্মরণ করিবার ক্ষমতা, যাহা পূর্ব-অভিজ্ঞতালব্ধ প্রতিরূপের সংরক্ষণ, পুনরুৎপাদন, প্রত্যভিজ্ঞা এবং স্থান-কাল-নির্দেশের ফলে ঘটে।

৩। সংরক্ষণ বা ধৃতির বিশ্লেষণ

আপাতদৃষ্টিতে সংরক্ষণ, ধৃতি বা মনে-রাখা ব্যাপারটিকে সহজ বলিয়া মনে হয়। ইহাকে সহজ বলিয়া মনে হওয়ার কারণ জড়জগতের জ্ঞানলব্ধ **দৈশিক সংস্কার**। জড়জগতের সকল বস্তুই থাকে দেশে বা স্থানে। যেমন, টেবিলটি আছে বলিতে আমরা বুঝি যে ইহা ঘরে, বারান্দায় বা অন্য কোনো স্থানে আছে। তেমনই আমরা মনে করি যেন মনও ঘর বা বারান্দার মত একটি স্বল্প বা দীর্ঘ-পরিসর স্থান, যেখানে পূর্বলব্ধ অভিজ্ঞতার প্রতিরূপ থাকে।

কিন্তু জড়বস্তুর মত উহার **প্রতিরূপের দৈশিক পরিমাণ** নাই! একটি আঠার ফুট লম্বা ঘরের প্রতিরূপ আঠার ফুট লম্বা নয়। আবার হিম-শীতল জলের প্রতিরূপ হিম-শীতল নয়। বাহ্যবস্তু স্বশরীরে মনের মধ্যে প্রবিষ্ট হয় না। অথচ পূর্বলব্ধ অভিজ্ঞতা একেবারে মুছিয়া যায় না, বরং মনে উহার ছাপ রাখিয়া যায়। সংরক্ষণ কিরূপে ঘটিতে পারে, তাহা সহজবোধ্য নয়। তথাপি ইহা বাস্তবিকই ঘটিয়া থাকে।

সংরক্ষণ বা ধৃতি সম্বন্ধে **জটিল প্রশ্ন** এই যে, পূর্বলব্ধ অভিজ্ঞতার প্রতিরূপ কি আকারে এবং কোথায় সংরক্ষিত হয়। উহারা কি মানস অথবা শারীর ব্যাপার? উহারা কি মনেরই একপ্রকার বিকার বা পরিবর্তন, অথবা নার্ভতন্ত্রের এবং বিশেষ করিয়া গুরুমস্তিষ্কেরই বিকার বা পরিবর্তন?

(১) **শারীরবৃত্তীয় মতবাদ** (Physiological Theory)

শারীরবৃত্তীয় মতে সংরক্ষণ নার্ভতন্ত্রের এবং গুরুমস্তিষ্কের বিকার বা পরিবর্তন-বিশেষ। এই মতটি মুয়েনস্টারবার্গ, জ্যাস্ট্রো, কার্পেণ্টার্‌, মিল্‌, লুইস, জেম্‌স্‌, ওয়াট্‌সন প্রভৃতি মনোবিদ্‌গণ সমর্থন করিয়াছেন। শারীরবৃত্তীয় মত প্রধানতঃ তিন শ্রেণীর, যথা, মিল্‌ কার্পেণ্টার প্রভৃতির, জেম্‌স্‌ প্রভৃতির এবং ওয়াট্‌সন প্রভৃতির।

(ক) মিল্‌, কার্পেণ্টার্‌ প্রভৃতির মতে সংরক্ষণ একপ্রকার অচেতন গুরু-মস্তিষ্কীয় (cerebral) প্রক্রিয়া বা কম্পন (Vibration) বিশেষ। ইঁহারা মনে করেন যে শিক্ষণ, প্রত্যক্ষ প্রভৃতি মানসবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি মস্তিষ্ক-ক্রিয়ার বা কম্পনের সূত্রপাত হয় এবং ঐ সকল মানসবৃত্তির অবসানের পরও ঐ মস্তিষ্কক্রিয়া বা কম্পন অস্পষ্ট ও অচেতনভাবে চলিতে থাকে। এই অচেতন মস্তিষ্ক ক্রিয়া বা কম্পনকেই বলা যায় সংরক্ষণ। পুনরুৎপাদন এই অস্পষ্ট মস্তিষ্কক্রিয়াকে স্পষ্ট বা তীব্র করার নামান্তর। সংরক্ষণ বা ধৃতি বলিতে বুঝায়, স্থায়ী মস্তিষ্ক-ক্রিয়া (permanent vibration in the brain) অথবা অচেতন মস্তিষ্ক-স্পন্দন (unconscious cerebral vibration)। ধৃতির এই শারীরবৃত্তীয় মতকে বলা হয় **স্থায়ী-অচেতন-ক্রিয়াবাদ** (Theory of Permanent Unconscious Cerebration)।

অধ্যাপক উইলিয়াম্‌ জেম্‌স্‌ মনে করেন যে, সংরক্ষণ **মস্তিষ্ক-গঠনের** স্থায়ী বিকার বা পরিবর্তন (permanent cerebral modification)। শিক্ষণ বা প্রত্যক্ষ যে যে মস্তিষ্ক-অংশগুলির সহিত সংশ্লিষ্ট, ঐ ক্রিয়ার ফলে সেই সেই মস্তিষ্কাংশের গঠনে স্থায়ী পরিবর্তন বা সংস্কার সাধিত হয়। মানসবৃত্তির পুনঃপুনঃ অনুশীলনের ফলে মস্তিষ্কের পথ সংক্ষিপ্ত হইয়া যায়। এই কারণে, পূর্বে যে কাজটি সম্পাদন করিতে বেশী সময় লাগিত, পরে তাহা সম্পাদন করিতে অপেক্ষাকৃত কম সময় লাগে। জেম্‌স্‌-এর মতে, এইরূপ **স্থায়ী সংক্ষিপ্ত মস্তিষ্কপথ স্থাপিত হইবার নামই সংরক্ষণ বা ধৃতি।** পূর্বজ্ঞাত কোনো বস্তু মনে আছে বা সংরক্ষিত আছে বলিতে বুঝায় যে, অভিজ্ঞতার ফলে সংক্ষিপ্ত মস্তিষ্কপথ (short brain-path) তৈয়ারী হইয়াছে। জেম্‌স্‌-এর মতে, ধৃতি মস্তিষ্কীয় সংগঠনের (morphological) ব্যাপার। তাঁহার মতের নাম **স্থায়ী-মস্তিষ্ক-গঠন-বিকারবাদ** (Theory of Permanent Cerebral Modification)।

(গ) আবার **ওয়াট্‌সন** প্রভৃতি চেষ্টিতবাদী মনোবিদ্‌ মনে করেন যে, সংরক্ষণ **একশ্রেণীর নির্জ্ঞান বা অচেতন শারীর বিকার** (unconscious bodily modifica-

tion)। এই মত শারীর কারণকে শুধু মস্তিষ্কে বা নার্ভে সীমাবদ্ধ রাখে না, কিন্তু সকল আভ্যন্তরীণ যন্ত্রের, গ্রন্থির এবং মাংসপেশীর ক্রিয়াকে উহার অন্তর্ভুক্ত করে।

(২) **মনোবৈজ্ঞানিক মতবাদ** (Psychological Theory)

ধৃতি বা মনে থাকার কারণ সম্বন্ধে দ্বিতীয় মতটি হইল মনোবৈজ্ঞানিক। এই মতানুসারে মনের চেতন ক্ষেত্রের নীচে একটি অবচেতন স্তর রহিয়াছে। প্রত্যক্ষ, শিক্ষণ প্রভৃতি অভিজ্ঞতায় মনের চেতন স্তর ক্রিয়াশীল হয়। কিন্তু এই সকল অভিজ্ঞতার বিষয়গুলি অন্তর্হিত হইলেও, মনের অবচেতন স্তরে উহারা উহাদের প্রতিরূপ রাখিয়া যায়। এই প্রতিরূপ বলিতে বুঝায় অবচেতন মনের স্থায়ী পরিবর্তন (subconscious mental modification)। বস্তুগুলি মনের চেতন স্তরে ক্রিয়া করিবার ফলে, উহারা মানস পরিবর্তনের আকারে মনের গভীরতর অবচেতন স্তরে তলাইয়া যায়। স্টাউট্-এর ভাষায়, ঐ বস্তুগুলি উহাদিগকে পুনরায় জানিবার একটি প্রবণতা (pre-disposition) মনে রাখিয়া যায়।

তাহা হইলে, অতীত-অভিজ্ঞতা-লব্ধ বিষয় প্রতিরূপের আকারে মনে থাকিয়া যায় বলিতে আমরা বুঝিব মনের এমন কোনো পরিবর্তন, যাহার ফলে ঐ বস্তুকে পুনরায় জানিবার প্রতি একটি প্রবণতা জন্মে এবং ভবিষ্যতে কোনো উদ্দীপক উপস্থিত হইলেই, এই প্রবণতা সক্রিয় পুনরুৎপাদনে পরিণত হয়। এই মতবাদকে **অবচেতন মনের স্থায়ী পরিবর্তনবাদ** (Theory of Subconscious Mental Modification) বলে।

এই মতগুলির সমালোচনা

শারীরবৃত্তীয় মতগুলি ধৃতিকে শারীর ক্রিয়ায় বা সংগঠনে পরিণত করে। এই মতগুলি হইতে শিক্ষণীয় এই যে ধৃতির সহিত নার্ভতন্ত্র, বিশেষতঃ মস্তিষ্কের, ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। কিন্তু এই মত ধৃতির মানসরূপকে উপেক্ষা করে। আবার কোন্ ধৃতির সহিত কোন্ শারীরক্রিয়া ঘটে, তাহা সঠিকভাবে নিরূপণ করিতেও এই মত অসমর্থ। তৃতীয়তঃ, এই মত মানস প্রতিরূপের প্রকারগত ভেদকে মস্তিষ্কপথের অথবা মস্তিষ্কক্রিয়ার পরিমাণগত ভেদ অনুসারে ব্যাখ্যা করে। কিন্তু একটি শব্দপ্রতিরূপ এবং বর্ণপ্রতিরূপের প্রকারগত পার্থক্য উহাদের মস্তিষ্ককেন্দ্রীয় স্নায়ুপথের সরলতা বা জটিলতা দিয়া ব্যাখ্যা করা যায় না। চতুর্থতঃ, মিল্ এবং কার্পেণ্টার ধৃতি বা সংরক্ষণকে নির্জ্ঞান মস্তিষ্কক্রিয়া বলিয়াছেন। ইহা দ্বারা তাঁহারা যেন বলিতে চাহেন যে, সংজ্ঞান মস্তিষ্ক-ক্রিয়াও আছে। কিন্তু কোনো মস্তিষ্কক্রিয়াই সংজ্ঞান হইতে পারে না। সর্বোপরি,

এই মতে মস্তিষ্কের অনুষঙ্গ এলাকাতেই মস্তিষ্কক্রিয়া চলে। অথচ অসংখ্য সংরক্ষিত বস্তুর তুলনায় এই এলাকা ক্ষুদ্র-পরিসর।

সুতরাং সংরক্ষণ বা ধৃতি অবচেতন মনের প্রবণতা বা পরিবর্তন-বিশেষ, এই মতই গ্রহণীয়। অবশ্য এই মনোবৈজ্ঞানিক মত স্বীকার করিবার অর্থ এই নয় যে, সংরক্ষণের সহিত শারীর ব্যাপারের সংস্রব নাই। উপরন্তু সংরক্ষণ মানস ব্যাপার হইলেও, ইহার এমন কতকগুলি সহকারী শারীর-ব্যাপার আছে, যেগুলি স্বীকার করিলে, ইহা আরও সহজবোধ্য হয়। শারীরবৃত্তীয় মত ধৃতির এই দৈহিক দিকটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে।

৪। পুনরুৎপাদন

যে ক্রিয়ায় পূর্বজ্ঞাত বস্তু উহার প্রতিরূপ সাহায্যে পুনরুপস্থাপিত হয় তাহাকে **পুনরুৎপাদন, পুনরুদ্দীপন** অথবা **পুনরুদ্রেক** বলে।

স্মৃতি শুধু আয়ত্ত বিষয়ের সংরক্ষণই নয়, কিন্তু কার্যকালে সংরক্ষিত বিষয়ের ব্যবহারও বটে। মনের কথা মনেই থাকিয়া গেলে, উহাকে পুনরুৎপন্ন বা পুনরুদ্দীপিত করিয়া মনে না করিলে, স্মৃতি কার্যকরী হয় না। কিন্তু অসংখ্য পূর্বজ্ঞাত বস্তুর ছাপ বা প্রতিরূপই তো মনে রহিয়াছে। এই অসংখ্য সংরক্ষিত প্রতিরূপই তো একই সময়ে মনে করিবার দরকার হয় না।

বিশাল সংরক্ষণ ভাণ্ডার হইতে যখন যতটুকু "মনে করা" বা পুনরুৎপাদন করা দরকার, ঠিক ততটুকুর পুনরুদ্ধারই স্মৃতির পক্ষে প্রয়োজন।

পুনরুৎপাদন বা "মনে করা" কতকগুলি নিয়মসূত্রে নিয়ন্ত্রিত বা আবদ্ধ। অভিজ্ঞতার বিষয়গুলি যে সম্বন্ধে সম্বদ্ধ, এই নিয়মগুলি তদনুযায়ী হইয়া থাকে। যেমন, অভিজ্ঞতায় বা পাঠশিক্ষণকালে "পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল" লাইনটির শব্দগুলিকে একটি নির্দিষ্ট শৃঙ্খলায় অভ্যাস করা হইয়াছে। ইহার প্রত্যেকটি শব্দের সহিত অপর শব্দের পূর্বাপর সম্বন্ধ রহিয়াছে। সংরক্ষিত অবস্থায়ও ইহাদের প্রতিরূপগুলি ইহাদের বাস্তব সম্বন্ধ অনুযায়ী শৃঙ্খলায় আবদ্ধ থাকে। ফলে একটি শব্দের প্রতিরূপ মনে আসিলেই পরবর্তী শব্দগুলির প্রতিরূপ মনে উদিত হয় এবং এইরূপে পূর্বাপরক্রমে পুনরুৎপাদন চলিতে থাকে। অর্থাৎ, একটি উদ্দীপক প্রতিরূপ অপর একটিকে অভিভাবিত (Suggest) করে, অথবা একটি অপরটির অভিভাবীয় শক্তি (Suggestive force) হইয়া দাঁড়ায়।

পূর্বজ্ঞাত বিষয়গুলির প্রতিরূপ যে নিয়মে পরস্পর সম্বদ্ধ, এবং পূর্বাপর ক্রমে

পুনরুৎপন্ন হয়, সেই নিয়মকে **অনুষঙ্গ নিয়ম** বা **অনুষঙ্গ-সূত্র** (Laws of association) বলা হয়। যেমন "পাখী সব করে রব..." লাইনটির একটি শব্দ উহার পরবর্তী বা পূর্ববর্তী শব্দের সহিত স্থানীয় বা দৈশিক সান্নিধ্যসূত্রে গ্রথিত বলিয়া, একটি অপরটিকে স্মরণ করাইয়া দেয় বা পুনরুৎপন্ন করে।

৫। **অনুষঙ্গ ও অভিভাব** (Association and Suggestion)

পূর্বজ্ঞাত বিষয়গুলির একটি বা একাধিক প্রতিরূপ অভিভাব শক্তির দ্বারা উদ্দীপিত হইয়া যে নিয়ম অনুসারে অন্য একটি বা একাধিক প্রতিরূপ পুনরুৎপন্ন করে, সেই নিয়ম বা সূত্রকে বলে **অনুষঙ্গসূত্র বা নিয়ম**। এই পুনরুৎপন্ন প্রতিরূপগুলির প্রত্যেকটি অপরটির সহিত অনুষক্ত অর্থাৎ উহাদের একটি অপটির সহিত এইরূপে সম্বন্ধ যে, একটি মনে পড়িলেই অপরটি মনে পড়িয়া যায়। এইরূপে একটি প্রতিরূপের অপর একটিকে পুনরুৎপন্ন করিবার শক্তিকে বলে **অভিভাব শক্তি** (Suggestive force)।

একটি প্রতিরূপের পক্ষে আর একটি প্রতিরূপকে পুনরুৎপন্ন করা তখনই সম্ভব, যখন ইহাদের মধ্যে অনুষঙ্গ থাকে। দুইটি প্রতিরূপ অনুষক্ত থাকিলেই উহাদের একটির পক্ষে অপরটিকে অভিভাবিত বা উদ্দীপিত করা সম্ভব। যেমন "পাখী সব" এই অধীত অংশটির প্রতিরূপ মনে জাগিয়া উঠিবামাত্র উহার পরবর্তী অংশ "করে রব" মনে হইয়া যায়, কারণ প্রথম অংশটির পরেই দ্বিতীয় অংশটি পঠিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে অনুষঙ্গসূত্র স্থাপিত হইয়াছে। ফলে, প্রথমটি দ্বিতীয়টির উদ্দীপক বা অভিভাব শক্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

সুতরাং অভিভাব এবং অনুষঙ্গ **একই পুনরুৎপাদন ক্রিয়ার দুইটি দিক।** প্রতিরূপগুলি অনুষঙ্গ নিয়মে আবদ্ধ বলিয়াই উহাদের একটি অপরটিকে অভিভাবিত করিতে পারে। সুতরাং অভিভাব অনুষঙ্গের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু আর এক দিক দিয়া বিচার করিলে, অনুষঙ্গও অভিভাবের উপর নির্ভরশীল। বুদ্ধিপূর্বক শিক্ষণের (intelligent learning) ফলে যে অনুষঙ্গ উৎপন্ন হয়, তাহার মূলে অভিভাব কাজ করে। যেমন "পাখী সব করে রব" অংশের সহিত "রাতি পোহাইল" অংশের এবং "রাতি পোহাইল" অংশের সহিত "কাননে কুসুমকলি সকলই ফুটিল" অংশের স্বাভাবিক সম্বন্ধটি বুঝিয়া কবিতাটি পাঠ করিলে, প্রত্যেক পূর্ববর্তী অংশ উহার পরবর্তী অংশকে অভিভাবিত করে এবং এই অভিভাবের ফলে উহার মধ্যে সহজে

এবং স্থায়ীভাবে অনুষঙ্গ সূত্র স্থাপিত হয়। অতএব অভিভাব এবং অনুষঙ্গ **পরস্পরসাপেক্ষ।**

৬। অনুষঙ্গ-নিয়ম (Laws of Association)

যে নিয়ম অনুসারে পূর্ব-অভিজ্ঞতালব্ধ প্রতিরূপের সম্বন্ধ-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাকে অনুষঙ্গ-নিয়ম বলে। আধুনিক মনোবিদ্যায় প্রধানতঃ **তিন প্রকার** অনুষঙ্গ-সূত্র বা নিয়ম স্বীকৃত হইয়াছে, যথা সান্নিধ্যসূত্র, সাদৃশ্যসূত্র এবং বৈপরীত্যসূত্র।

(১) সান্নিধ্য-অনুষঙ্গ-সূত্র (Law of Contiguity)

পূর্ব অভিজ্ঞতায় যে সকল বস্তু **দেশ এবং কাল সম্বন্ধে পরস্পরের কাছাকাছি বা নিকটবর্তীরূপে জ্ঞাত** হইয়াছিল, উহাদের প্রতিরূপগুলি সান্নিধ্য-অনুষঙ্গ-সূত্রে সম্বদ্ধ হয়। যেমন অতীত শিক্ষণে "পাখী সব করে রব" অংশের কাছাকাছি বা নিকটবর্তীরূপে "রাতি পোহাইল" অংশটি পঠিত হইয়াছিল। এই শব্দগুলি দেশ এবং কাল সম্বন্ধে যেমন পরস্পর কাছাকাছি বা নিকটবর্তী, উহাদের প্রতিরূপগুলিও তেমন সান্নিধ্যসূত্রে অনুষক্ত হয়। সান্নিধ্য-অনুষঙ্গ-সূত্র বলিতে বুঝায় পরস্পর নিকটবর্তী প্রতিরূপের সেই সম্বন্ধ, যাহার ফলে উহাদের একটি মনে পড়িলে, আর একটিও মনে পড়িয়া যায়।

মনোবিদ্যায় **অনুষঙ্গ বলিতে বস্তুর সহিত বস্তুর সম্বন্ধ বুঝায় না।** প্রত্যক্ষ বা জ্ঞাত বস্তুর সম্বন্ধ অনুযায়ী উহাদের প্রতিরূপের মধ্যে যে সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, তাহাকেই মনোবৈজ্ঞানিক অনুষঙ্গ বলে। অনুষঙ্গ সূত্রে সম্বদ্ধ প্রতিরূপগুলির একটি মনে জাগিলে অন্যগুলির পর পর পুনরুপস্থাপিত হওয়াই মনোবৈজ্ঞানিক অনুষঙ্গের তাৎপর্য। পূর্বপ্রত্যক্ষগুলির একটি পুনরায় প্রত্যক্ষ হইলে, বাকি বস্তুগুলির প্রতিরূপ আপনা-আপনি, অথবা পুনরুৎপাদন চেষ্টার ফলে মনে ভাসিয়া উঠে। আবার এই অনুষক্ত প্রতিরূপগুলির একটি মনে জাগিয়া উঠিলেও, অন্যান্যগুলি মনে ভাসিয়া উঠিতে পারে।

দেশ এবং কাল সম্বন্ধে সান্নিধ্য দুই প্রকার। যেমন "পাখী সব করে রব" অংশটির কাছাকাছি বা নিকটবর্তী স্থানেই "রাতি পোহাইল" অংশটি পঠিত হইয়াছে। এই দুইটি অংশ **দৈশিক সান্নিধ্যসূত্রে** আবদ্ধ। সুতরাং ইহাদের প্রতিরূপগুলিও দৈশিক সান্নিধ্যসূত্রে অনুষক্ত। আবার প্রথম অংশটি পঠিত হইবার পর পঠিত হয় দ্বিতীয় অংশটি, অর্থাৎ এই দুইটি অংশ কালিক পৌর্বাপর্যে পঠিত হয়। সুতরাং ইহাদে

প্রতিরূপগুলিও **কালিক সান্নিধ্যসূত্রে অনুষক্ত**। আকাশের উপর মেঘ ভাসিয়া বেড়ায়, সুতরাং আকাশ ও মেঘ এবং উহাদের প্রতিরূপগুলিও দৈশিক সান্নিধ্যসূত্রে অনুষক্ত। কিন্তু বিদ্যুৎ চমকাইবার পর মেঘগর্জন শোনা যায়, সুতরাং বিদ্যুৎ ও মেঘগর্জনের অনুষঙ্গ কালিক এবং ইহাদের প্রতিরূপও কালিক সান্নিধ্যসূত্রে অনুষক্ত।

(২) **সাদৃশ্য অনুষঙ্গ** (Association by Similarity)

দুই বা ততোধিক বস্তুর একটি অপরটির সদৃশ বলিয়া জ্ঞাত হইলে, উহাদের **প্রতিরূপগুলিও পরস্পর সদৃশ** বলিয়া যে সম্বন্ধে অনুষঙ্গ হয়, তাহাকে সাদৃশ্য অনুষঙ্গ বলে। যেমন রামু এবং শ্যামু দুইটি যমজ ভাই পূর্ব অভিজ্ঞতায় সদৃশ বলিয়া জ্ঞাত হওয়ায়, পরবর্তীকালে একজনকে দেখিলে বা স্মরণ করিলেই, আর একজনের কথা মনে পড়ে। অথবা রামুকে পূর্বে দেখা হইয়াছিল, পরে শ্যামুকে দেখিয়া রামুকে মনে পড়িল, কারণ উহাদের মধ্যে সাদৃশ্য রহিয়াছে। অথবা রবীন্দ্রনাথের ফটো দেখিয়া তাঁহার চেহারাটি মনে জাগিল, কারণ ফটো বা প্রতিকৃতির সহিত চেহারাটি সাদৃশ্যসূত্রে আবদ্ধ। কাব্যের উপমা সাদৃশ্য অনুষঙ্গের উপর প্রতিষ্ঠিত। তিলফুলের সহিত সুগঠিত নাসিকার, পদ্মের সহিত নয়নের, চন্দ্রের সহিত বদনের, পুরুষের সহিত বৃক্ষের এবং ললনার সহিত লতার উপমাস্থলে তুলনীয় বস্তুদ্বয়ের সাদৃশ্য রহিয়াছে। ফলে একটিকে দেখিলে বা মনে পড়িলেই অপরটি মনে পড়ে। **সদৃশ বস্তু সদৃশ বস্তুর কথা মনে করাইয়া দেয়**। অথবা, সদৃশ বস্তুর প্রতিরূপ সাদৃশ্য-অনুষঙ্গ-সূত্রে সম্বদ্ধ হয় বলিয়া, উহাদের একটি মনে হইলেই, অপরটি মনে পড়ে।

বৈপরীত্য অনুষঙ্গ (**Association by Contrast**)

বস্তু বা উহার প্রতিরূপ **বিপরীত বস্তু বা উহার প্রতিরূপকে** যে নিয়ম অনুসারে মনে করাইয়া দেয়, সেই নিয়মসূত্রকে বৈপরীত্য অনুষঙ্গ-সূত্র বলে। যে সকল বস্তু একটি আর একটির বিপরীত, উহাদের একটিকে দেখিলে বা মনে করিলে অপরটি মনে পড়ে বা স্মৃত হয়। যেমন দুঃখের দিনে সুখের দিনগুলি মনে পড়ে। অমা রজনী দেখিয়া পূর্ণিমা রাত্রির কথা মনে উদিত হয়। বামন বা খর্বকায় লোক দেখিয়া বিরাটবপু লোকের কথা মনে পড়ে। দুর্নাম শুনিয়া সুখ্যাতির কথা এবং অসমতল পার্বত্যপথে চলিতে চলিতে বাংলার সমতলভূমির কথা মনে উদিত হয়, কারণ ইহাদের একটি অপরটির বিপরীত। যে ব্যক্তিটি আজ ফুলের মালা পরাইল, সে-ই হয়ত একদিন জুতার মালা পরাইয়াছিল, অথবা যে আজ উপকারের আশায় আসিয়াছে সে-ই হয়ত

অতীতে ক্ষতি করিয়াছিল। এই সকল পরস্পরবিরোধী আচরণ, একটি অপরটির স্মারক হইয়া দাঁড়ায়। বৈপরীত্য অনুষঙ্গ-সূত্র অনুসারে বিপরীত সম্বন্ধে সম্বন্ধ বস্তুর একটি প্রত্যক্ষ করিলে বা মনে পড়িলে, অপরটিও মনে পড়ে।

৭। অনুষঙ্গ নিয়মের পারস্পরিক মৌলিকতা

উপরোক্ত তিনটি অনুষঙ্গ-সূত্র সমানভাবে মৌলিক কি না, সেই সম্বন্ধে গুরুতর মতভেদ রহিয়াছে।

অধিকাংশ মনোবিদ্ **সান্নিধ্য এবং সাদৃশ্য** অনুষঙ্গ-সূত্র দুইটিকে সমভাবে মৌলিক বা মুখ্য বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে **বৈপরীত্য সূত্র সাদৃশ্যেরই বিকার বা রূপান্তর**। অন্ধকার আলোককে স্মরণ করাইয়া দেয়, কারণ উহারা উভয়েই মূলতঃ আলোকসংবেদন, এই বিষয়ে সদৃশ। আবার বামন দেখিয়া বিরাটবপু ব্যক্তির কথা মনে হয়, কারণ উহারা উভয়েই আকারের উচ্চতা-জ্ঞাপক বলিয়া সদৃশ। দুঃখের দিনে সুখময় দিনগুলির কথা মনে পড়ে, কারণ সুখ ও দুঃখ অনুভূতির প্রকারভেদ বলিয়া সদৃশ। অর্থাৎ সাদৃশ্যসূত্রের উপর নির্ভর করিয়া বৈপরীত্য সূত্র কাজ করে। এক বৃন্তে দুইটি ফুলের মত বিপরীত বস্তু সান্নিধ্যসূত্রে গ্রথিত। সুতরাং বৈপরীত্য মৌলিক বা মুখ্য অনুষঙ্গসূত্র নয়।

টিশ্‌নার্ বৈপরীত্য অনুষঙ্গ-সূত্রকে সাদৃশ্য অনুষঙ্গ-সূত্রে পরিণত করিবার বিরুদ্ধে দুইটি আপত্তি তুলিয়াছেন।[১]

প্রথমতঃ বৈপরীত্য অনুষঙ্গ-সূত্রকে সাদৃশ্য অনুষঙ্গ সূত্রে পরিণত করিবার যুক্তিটি **মনোবৈজ্ঞানিক নয়, কিন্তু যুক্তিবৈজ্ঞানিক**। ইহা মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে উত্থাপিত হয় নাই, কিন্তু হইয়াছে যুক্তিবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গী হইতে। এই যুক্তি অনুসারে খর্বকায় ব্যক্তি বিরাটকায় ব্যক্তিকে মনে করাইয়া দেয় উহাদের অন্তর্নিহিত দৈর্ঘ্যরূপ সাদৃশ্যের ভিত্তিতে, অথবা দৈর্ঘ্য বিষয়ক সামান্য ধারণার সাহায্যে। কিন্তু এই তথাকথিত সামান্য ধারণা মনোবিদ্যার অন্তর্দর্শনে ধরা পড়ে না। ইহা তর্কের খাতিরে অথবা যুক্তিবিদ্যার প্রয়োজনে স্বীকার করিয়া লওয়া হয়। পক্ষান্তরে, অন্তর্দর্শনে বৈপরীত্য অনুষঙ্গ মৌলিক বলিয়াই ধরা পড়ে।

দ্বিতীয়তঃ, বৈপরীত্য এবং সাদৃশ্য অনুষঙ্গ **সমপর্যায়ভুক্ত** নয়। সাদৃশ্য অনুষঙ্গ চিন্তা বা ধারণামূলক, কিন্তু বৈপরীত্য অনুষঙ্গ বেদনামূলক বিরুদ্ধতাবোধের নামান্তর।

১। ই. বি. টিশ্‌নার্—এ টেক্সট্‌বুক্ অফ্ সাইকলজি—১০৫ অনুচ্ছেদ—পৃঃ ৩৭৫-৩৭৬

বামনের পার্শ্বে সাধারণ ব্যক্তিকে বড, আবার বিরাটকায় ব্যক্তির পার্শ্বে ঐ ব্যক্তিকে ছোট দেখায়, কারণ প্রথম ক্ষেত্রে বামন অনুকম্পার এবং সাধারণ ব্যক্তি প্রশংসার পাত্র, আবার দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সাধারণ ব্যক্তি অনুকম্পার এবং বিরাটকায় ব্যক্তি প্রশংসার পাত্র। এই বিরুদ্ধ বেদনামূলক অনুভূতিই বৈপরীত্য অনুষঙ্গের ভিত্তি। সুতরাং **বৈপরীত্য অনুষঙ্গকে সাদৃশ্য অনুষঙ্গে পরিণত করা যায় না।**

টিশ্‌নার্‌-এর মতে আমাদের অভিজ্ঞতায় বিপরীত বস্তুগুলি প্রায়ই পাশাপাশি বা সান্নিধ্য সম্বন্ধে থাকে, যেমন সাদা কাগজের উপর কালো অক্ষর, উজ্জ্বল আলোকের গভীর ছায়া। সুতরাং **বৈপরীত্য অনুষঙ্গ সান্নিধ্য অনুষঙ্গের প্রকারবিশেষ।**

সান্নিধ্য এবং সাদৃশ্যের পারস্পরিক মৌলিকতায় মতভেদ রহিয়াছে। অধ্যাপক **জেম্‌স্‌** মনে করেন যে **সান্নিধ্যই প্রধান বা মৌলিক** এবং সাদৃশ্য অপ্রধান বা গৌণ। রামুকে দেখিয়া শ্যামুর কথা মনে হইল। রামু এবং শ্যামু এক বা অভিন্ন নয়, কিন্তু সদৃশ বা সমধর্মী। তাহারা কোনো কোনো বিষয়ে সদৃশ, আবার অন্যান্য বিষয়ে বিসদৃশ। অথবা রামুকে দেখিয়া শ্যামুকে মনে পড়িবার মূলে রহিয়াছে উহাদের সাদৃশ্য। কিন্তু উহাদের সাদৃশ্য জ্ঞানের মূলে রহিয়াছে পার্থক্য জ্ঞান। রামুর সহিত শ্যামুর সাদৃশ্যজ্ঞানের সহিত উহাদের পার্থক্যজ্ঞান সান্নিধ্য অনুষঙ্গে অনুষক্ত। ফলে উহাদের সাদৃশ্যজ্ঞান সান্নিধ্য অনুষঙ্গ সাহায্যে উহাদের পার্থক্য মনে করাইয়া শ্যামুকে স্মৃতিপথে লইয়া আসে।

স্পেন্সর্‌ প্রভৃতি মনোবিদ্‌গণের মতে **সাদৃশ্য অনুষঙ্গই মৌলিক** এবং সান্নিধ্য অনুষঙ্গ গৌণ। "পাখী সব করে রব" অংশটি "রাতি পোহাইল" অংশটিকে মনে করাইয়া দেয়, প্রথমতঃ, সাদৃশ্য সূত্রের সাহায্যে উহার নিজ প্রতিরূপকে জাগরূক করিয়া এবং দ্বিতীয়তঃ, এই পুনরুৎপন্ন প্রতিরূপের সহিত পরবর্তী প্রতিরূপটির সান্নিধ্য অনুষঙ্গের সাহায্যে। সুতরাং সান্নিধ্য অনুষঙ্গ সাদৃশ্য অনুষঙ্গের উপর নির্ভর করে। আবার অন্য দিক দিয়া বিচার করিলেও দেখা যায় যে, সান্নিধ্য অনুষঙ্গে সম্বদ্ধ প্রতিরূপের স্থানগত অথবা কালগত সাদৃশ্য আছে। যেমন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মূর্তি উহা যে বেদীতে স্থাপিত তাহা এবং উহার লৌহবেষ্টনী স্মরণ করাইয়া দেয়, কারণ উহারা একই স্থানে, অর্থাৎ গোলদীঘিতে অবস্থিত। আবার বিদ্যুৎ মেঘগর্জনকে স্মরণ করাইয়া দেয়, কারণ এই দুইটিই কালিক ঘটনা, সুতরাং সদৃশ্য।

তিনটি অনুষঙ্গ নিয়মকে উপরোক্তভাবে একটি বা দুইটিতে পরিণত করিবার পশ্চাতে হেতু রহিয়াছে। অনুষঙ্গ আসলে একটি নিয়ম এবং ইহার তিনটি দিক, যথা

সান্নিধ্য, সাদৃশ্য এবং বৈপরীত্য। **হ্যামিল্টন্** (Hamilton) অনুষঙ্গের এই অন্তর্নিহিত ঐক্য লক্ষ্য করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, অনুষঙ্গ আসলে **পুনরৈকীকরণ নিয়মের** (Law of Red-integration) দিগ্‌দর্শন মাত্র। তিনি পুনরৈকীকরণ নিয়মকে একমাত্র অনুষঙ্গ-সূত্র বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন। প্রত্যক্ষ বা অভিজ্ঞতা একটি সমগ্র পরিস্থিতির জ্ঞান। এই সমগ্র পরিস্থিতির যে কোনো অংশ পুনরুৎপন্ন হইলে, ইহার সমগ্র পরিস্থিতিটিকে পুনরুপস্থান করিবার প্রবণতা ঘটে। "পাখী সব করে রব" অংশ একটি সমগ্র কবিতার অংশ। সুতরাং এই অংশটি মনে পড়িলে, উহা যে সমগ্র কবিতাটির অংশ, সেই সমগ্র কবিতাটি পুনরুৎস্থাপিত করে। আবার বিদ্যুৎ এবং মেঘগর্জন মিলিয়া সমগ্র এককটিই প্রত্যক্ষ বা অভিজ্ঞতার বিষয়। ফলে বিদ্যুতের ঝলক দেখিলেই, এই অংশটি সমগ্র পরিস্থিতির বাকী অংশকে পুনরুৎপন্ন করে।

পুনরৈকীকরণ বা পুনঃসমাকলন, **শারীরবৃত্তের ভাষায়** এক প্রকার নার্ভ অভ্যাস (nervous habit)। সমগ্র বস্তুর প্রত্যক্ষে যে নার্ভপথ (nervous path) ক্রিয়া করে, উহার প্রত্যেক অংশের সহিত প্রত্যেক অংশের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। ফলে, এই নার্ভ-পথের একটি অংশ সক্রিয় হইলে, অন্য অংশগুলিও সক্রিয় হয়, এবং একটি অংশের স্মরণ হইলে, অন্য অংশগুলির স্মরণ ঘটে।

৮। অনুষঙ্গের সর্ত (Condition of Association)

তিন প্রকার অনুষঙ্গ এবং উহাদের সর্ত আলোচিত হইয়াছে। সান্নিধ্য অনুষঙ্গের **বিশেষ সর্ত** দুই বা ততোধিক জ্ঞাত বস্তুর দৈশিক বা কালিক নৈকট্য, সাদৃশ্য এবং বৈপরীত্য অনুষঙ্গের বিশেষ কারণ উহাদের বৈপরীত্য।

তিন প্রকার অনুষঙ্গের একটি **সাধারণ সর্ত মনোযোগ**। সকল নিকটবর্তী, সদৃশ বা বিপরীত ঘটনার প্রতিরূপই অনুষক্ত হয় না। যে ঘটনাগুলি মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারে, শুধু উহাদের প্রতিরূপের মধ্যেই অনুষঙ্গ গড়িয়া ওঠে।

প্রাথমিকতা, সাম্প্রতিকতা, পৌনঃপুন্য বা নৈরন্তর্য এবং স্পষ্টতা অনুষঙ্গের আরও কয়েকটি সাধারণ সর্ত। অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকিলে, এই চারিটি সর্ত মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া অনুষঙ্গকে নিয়ন্ত্রিত করে। এই চারিটি সর্তকে অনুষঙ্গের গৌণ সূত্র বা নিয়মও (secondary laws of association) বলা যাইতে পারে।

অনুষঙ্গের একটি সর্ত **প্রাথমিকতা** (Primacy)। প্রথম প্রতিরূপের অনুষঙ্গ দীর্ঘস্থায়ী, সুতরাং ইহা সহজে পুনরুদ্দীপিত হইতে পারে। অনুষঙ্গের আর একটি

সর্ত প্রতিরূপ এবং উহাদের **অনুষঙ্গের সাম্প্রতিকতা** (Recency)। সাম্প্রতিক প্রতিরূপ এবং উহাদের অনুষঙ্গ সহজে পুনরুদ্দীপিত হইবার জন্য প্রস্তুত থাকে। তৃতীয়তঃ, **যত অধিকবার** (Froquency) প্রতিরূপ এবং উহাদের অনুষঙ্গের আবৃত্তি ঘটে, উহারা তত স্থায়ীভাবে সংরক্ষিত এবং তত সহজে পুনরুদ্দীপিত হয়। চতুর্থতঃ, প্রতিরূপের অনুষঙ্গ **যত স্পষ্টভাবে** (Vividness) ঘটে, উহাদের প্রভাব তত স্থায়ী এবং পুনরুদ্দীপন তত সহজ হয়।

৯। আরও কয়েকটি শ্রেণীর অনুষঙ্গ

(১) **ফ্রয়েড** যে মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছেন, উহার নাম **অবাধ ভাবানুষঙ্গ** (Free association)। ইহাতে ইজি চেয়ারে আরামে অর্ধশায়িত ব্যক্তিকে মন শিথিল করিতে অথবা ছাড়িয়া দিতে বলা হয়। মনের শিথিল বা বাধামুক্ত অবস্থায় তাহার মনের সকল ভাবনা, চিন্তা বা চেতনবৃত্তি, কোনো কাটছাঁট না করিয়া. অবিকৃত এবং বাধাহীনভাবে তাহাকে বলিয়া যাইতে হয়। রোগী যে সকল চিন্তা প্রকাশ করিতে সঙ্কোচ বোধ করে অথবা চাপিয়া যায়, আবার সেই সকল অংশের অবাধ ভাবানুষঙ্গ করা হয়। কারণ এই সকল দ্বিধাপূর্ণ ভাবনা, আবেগ বা ইচ্ছাই মানস রোগের মূল কারণ। উহারা অবদমিত হইয়াই রোগসৃষ্টি করে। যে বিবেক বা অধিশাস্তা (Superego) উহাদিগকে অশ্লীল বা অবৈধ বলিয়া অবদমিত করিয়াছে, তাহাই উহাদের আত্মপ্রকাশে বাধা দেয়। একটির পর একটি করিয়া নির্জ্ঞান মনের সকল অবদমিত বাসনাগুলি অবাধ ভাবানুষঙ্গের ধারায় বাহির হইয়া আসে। এইরূপে রোগীর শৈশবকালীন (infantile) ইডিপাস গূঢ়ৈষা (oedipus complex) প্রকাশিত হইয়া পড়ে। শৈশবে পিতামাতার প্রতি যে ভালবাসা ও ঘৃণা অবদমিত হইয়াছিল. তাহা অবাধ ভাবনাস্রোতে ভাসিয়া ওঠে। কিন্তু ভালবাসা এবং ঘৃণার যথাযোগ্য পাত্র, পিতামাতা উপস্থিত নাই। সুতরাং ইহা সংক্রামিত হয় মনঃসমীক্ষকের উপর। এই সংক্রমণই (transference) অবাধ ভাবানুষঙ্গের চূড়ান্ত পর্যায়। এই পর্যায়ে রোগী সম্পূর্ণভাবে মনঃসমীক্ষকের আয়ত্তে আসিয়া পড়ে। বিচক্ষণ মনঃসমীক্ষক, এই অবস্থায় রোগীকে তাহার গূঢ়ৈষাগুলি হইতে মুক্ত করেন এবং বাস্তবের সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিতে পুনরায় শিক্ষা (re-education to reality দেন। ফলে, রোগী রোগ এবং গূঢ়ৈষামুক্ত হইয়া স্বাভাবিক মানস জীবন ফিরিয়া পায়।

কিন্তু অবাধ ভাবানুষঙ্গ **মৌলিক অনুষঙ্গসূত্র নয়**। ইহা পূর্ব-অনুষক্ত ভাবকে

পুনরুদ্দীপিত করিবার একটি পদ্ধতি বিশেষ। সুতরাং ইহা উল্লিখিত তিনটি অনুষঙ্গসূত্রের স্থান গ্রহণ করিতে পারে না।

সি. জি. য়ুঙ্গ্‌ নির্জ্ঞানে অবস্থিত গূঢ়ৈষাগুলিকে সংজ্ঞানে রূপান্তরিত করিবার উদ্দেশ্যে **শব্দ-অনুষঙ্গ** (Word Association) পদ্ধতি উদ্ভাবন করিয়াছেন। এই পদ্ধতিতে পরীক্ষণীয় ব্যক্তির গূঢ়ৈষার ইঙ্গিতকারী (complex indicator) অর্থপূর্ণ শব্দ-তালিকা প্রস্তুত করা হয়। প্রত্যেকটি শব্দ শুনিয়া বা দেখিয়া যে শব্দটি তাহার মনে আসে, পরীক্ষণীয় ব্যক্তি সেই শব্দটি বলিয়া প্রতিক্রিয়া করে। বিরাম-ঘড়ি (stop-watch) সাহায্যে প্রয়োগকর্তা প্রত্যেকটি প্রতিক্রিয়ায় ব্যয়িত সময় লিপিবদ্ধ করেন। যেমন 'টাকা' শব্দটি উপস্থাপিত করিলে, পাত্র হয়ত 'রোজগার' কথাটি বলিযা আবার 'বাঘ' কথাটি শুনিয়া বা দেখিয়া সে হয়ত 'ভয়' কথাটি বলিয়া প্রতিক্রিয়া করে।

এই পরীক্ষায় দেখা যায়, যে অর্থপূর্ণ শব্দ কোনো গূঢ়ৈষার মূলে আঘাত করে, তাহার **প্রতিক্রিয়ায় বিলম্ব** ঘটে। এই শব্দগুলি পাত্রের মনে নানা আবেগ সঙ্কোচ বা দ্বিধা সৃষ্টি করায়, প্রতিক্রিয়া বিলম্বিত হয়। শব্দ-অনুষঙ্গ পদ্ধতি **অপরাধ এবং মানসরোগের কারণ** নির্ণয়ে সাহায্য করে। তাহা ছাড়া, স্বভাবী ব্যক্তিদের **বিভিন্ন প্রকৃতির** উপরও ইহা যথেষ্ট আলোকপাত করে। এই পরীক্ষার ফলে দেখা যায়, কোনো কোনো ব্যক্তি অন্তর্বৃত্ত (introvert), কেহ বা বহির্বৃত্ত (extrovert), আবার কেহ বা উভয়বৃত্ত (ambivert)। শব্দ অনুষঙ্গ একপ্রকার প্রায়োগিক পদ্ধতি। ইহা পুনরুৎপাদনের সাধারণ সূত্র নয়। ইহা সাধারণ অনুষঙ্গ-সূত্রগুলির উপর নির্ভর করে।

১০। (ক) ভাল স্মৃতিশক্তির লক্ষণ

(Marks of good memory)

ভাল স্মৃতি বলিতে স্মৃতির সকল অঙ্গগুলিরই উৎকর্ষ বুঝায়। স্মৃতির মূলে রহিয়াছে শিক্ষণ এবং স্মৃতির অঙ্গ সংরক্ষণ, পুনরুৎপাদন, প্রত্যভিজ্ঞা এবং স্থানকাল-নির্দেশ।

স্মরণীয় বিষয়কে যত তাড়াতাড়ি শিখিয়া যত দীর্ঘকাল মনে ধারণ বা সংরক্ষণ করা যায় এবং প্রয়োজনমত যত অনায়াসে, নিখুঁত এবং প্রাসঙ্গিকভাবে, অর্থাৎ নিষ্প্রয়োজনীয় অংশ বাদ দিয়া প্রয়োজনীয় অংশ পুনরুৎপাদন করিয়া, উহার স্থান কাল নির্দেশ সাহায্যে চেনা যায়, স্মৃতিশক্তি সেই পরিমাণে ভাল।

কোনো কোনো ব্যক্তি শীঘ্র অথবা বিলম্বে শিখিয়া অধীত বিষয়কে দীর্ঘকাল অথবা অল্পকাল ধারণ করিতে পারে, আবার অনায়াসে অথবা কষ্টে এবং প্রাসঙ্গিক বা অপ্রাসঙ্গিকভাবে উহার পুনরুৎপাদন করিতে পারে। যে ব্যক্তি-স্মরণীয় বিষয়কে তাড়াতাড়ি শিখিয়া দীর্ঘকাল মনে সংরক্ষণ এবং অনায়াসে ও প্রাসঙ্গিকভাবে পুনরুৎপাদন করিতে পারে, তাহার স্মৃতিশক্তিই **উৎকৃষ্ট। অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট** স্মৃতিশক্তিবিশিষ্ট ব্যক্তি বিলম্বে শিখিয়া স্মরণীয় বিষয়কে দীর্ঘকাল সংরক্ষণ এবং অনায়াসে ও প্রাসঙ্গিকভাবে পুনরুৎপাদন করিতে পারে। **তৃতীয় স্তরের** স্মৃতিশক্তিবিশিষ্ট ব্যক্তি তাড়াতাড়ি শিখিয়া তাড়াতাড়ি ভুলিয়া যায়। আবার **সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট** স্মৃতিশক্তিবিশিষ্ট ব্যক্তি বিলম্বে শিখিয়া তাড়াতাড়ি ভুলিয়া যায়। চলিত কথায়, এই চার স্তরের স্মৃতিশক্তিকে যথাক্রমে **বেগচিরা, চিরচিরা, বেগবেগা** এবং **চিরবেগা** বলা হয়।

(খ) মুখস্থ বিদ্যার (cramming) দোষগুণ

মুখস্থ বিদ্যার **গুণ** এই যে পরিণামে নিষ্প্রয়োজনীয় অথচ বর্তমানে প্রয়োজনীয় বিষয় শিখিবার পক্ষে ইহা কার্যকরী। অনেক বিষয় সাময়িক প্রয়োজনে আয়ত্ত করিতে হয়। আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য উকিলকে দীর্ঘ বিবরণ মুখস্থ করিতে হয়। আবার পরীক্ষার্থীরও অনেক বিষয় মুখস্থ করা দরকার। অথচ উকিলের বা পরীক্ষার্থীর পরবর্তী জীবনে এই বিষয়গুলি হয়তো কোনো কাজে লাগে না। সুতরাং এই জাতীয় বিষয় মুখস্থ করিয়া ফেলাই আশু প্রয়োজন মিটাইবার পক্ষে যথেষ্ট।

কিন্তু তোতাপাখীর মত মুখস্থ করা (parrot learning, cramming) অথবা আবৃত্তিজ স্মৃতির (learning by rote) **দোষ** এই যে ইহা আশু প্রয়োজনের সহায়ক হইলেও, পরিণামে নির্ভরযোগ্য নয়। আবৃত্তিজ স্মৃতি অল্পস্থায়ী এবং দ্রুত বিস্মৃতিই উহার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। না বুঝিয়া মুখস্থ করিবার প্রধান দোষ এই যে ইহার অংশগুলির মধ্যে স্থায়ী অনুষঙ্গ-সূত্র গড়িয়া ওঠে না, যাহার ফলে, একটি অংশ আর একটির উদ্দীপক হইতে পারে না।

(গ) বুদ্ধিপূর্বক স্মৃতির (Logical memory) গুণ

বুদ্ধিপূর্বক স্মৃতির গুণ এই যে অধীত বা জ্ঞাত বিষয়ের অংশগুলির পারস্পারিক সম্বন্ধ-জ্ঞান ইহার মূল অবলম্বন। 'পাখী সব' মনে হইলেই "করে রব" এবং "করে রব" মনে হইলেই "রাত্রি পোহাইল" অংশ মনে পড়ে, কারণ এইস্থলে প্রত্যেকটি

পরবর্তী অংশের অর্থ উহার পূর্ববর্তী অংশের অর্থকে অনুসরণ করে। ফলে, এই অংশগুলির মধ্যে একটি অর্থপূর্ণ সঙ্গতি স্থাপিত হয় এবং একটি অংশ অপরটির সূচক বা জ্ঞাপক হইয়া দাঁড়ায়। ১৩৫৭৯ ১১ ১৩ ১৫, এই সমষ্টি সংখ্যাটিকে যান্ত্রিক ভাবে (mechanically) অর্থাৎ না বুঝিয়া শিখিতে গেলে, যতবার আবৃত্তির প্রয়োজন হয়, উহায় প্রত্যেকটি পরবর্তী সংখ্যা উহার পূর্ববর্তী সংখ্যা হইতে দুই বেশী, এইরূপ বুঝিয়া শিখিতে গেলে ততবার আবৃত্তির এমন কি একটি আবৃত্তির বেশী, প্রয়োজন হয় না। আবার, প্রথম পদ্ধতির তুলনায় দ্বিতীয় পদ্ধতির ফলও হয় অপেক্ষাকৃত দীর্ঘস্থায়ী।

(ঘ) স্মৃতি বা স্মরণের সর্ত (Conditions of Memory)

স্মৃতি বা স্মরণের **মানস সর্ত** বলিতে বুঝায় সংরক্ষণ, পুনরুৎপাদন, প্রত্যভিজ্ঞা এবং স্থানকালনির্দেশের কারণ। সংরক্ষণের কারণে সাম্প্রতিকতা, প্রাথমিকতা, পৌনঃপুন্য এবং স্পষ্টতা প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত।

এই সর্তগুলির অতিরিক্ত সংরক্ষণের অপর সর্তগুলি হইল বর্তমান প্রত্যক্ষ বিষয়ের অতীত অভিজ্ঞতা অথবা উহাকে সংপ্রত্যক্ষে (apperception) সংশ্লেষণ করিবার মত ক্রিয়াশীল মনোযোগ এবং ইহার সর্তরূপে মনোযোগের বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ (interest)। কোনো বস্তুকে অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে বুঝিতে হইলে, অথবা সংপ্রত্যক্ষ করিতে হইলে, অতীত সংপ্রত্যক্ষ ভাণ্ডার এবং বর্তমান প্রত্যক্ষকে একটি অখণ্ড মনোযোগের বিষয় বলিয়া বুঝিতে হয় এবং এইরূপ অখণ্ড মনোযোগের বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ বা আগ্রহ থাকা চাই।

পুনরুৎপাদনের সর্ত প্রথমতঃ, অভিভাবক শক্তি, যাহা পুনরুৎপাদন ক্রিয়াকে উদ্দীপিত করে এবং দ্বিতীয়তঃ, অনুষঙ্গসূত্র, যাহা পুনরুৎপন্ন প্রতিরূপকে সংবদ্ধ করে, যাহার ফলে, একটি অংশ মনে পড়িলেই, অন্যান্য অংশগুলি মনে পড়িয়া যায়।

উপরোক্ত মানস সর্তগুলি ছাড়াও স্মৃতির **দৈহিক সর্ত** রহিয়াছে। সংরক্ষণের মূলে থাকে নার্ভ-পথের গঠন এবং মস্তিষ্ক-পদার্থ ও নার্ভের ক্রিয়া বা পরিবর্তন। শিক্ষণের ফলে সংশ্লিষ্ট নার্ভ-পথ ও মস্তিষ্ক-পদার্থের অংশগুলি পুনর্গঠিত বা পরিবর্তিত হয়। ফলে, উহার একটি অংশ সক্রিয় হইলে, উহার পরবর্তী অংশটি সক্রিয় হয় এবং অনুভূত বিষয়ের পুনরাবির্ভাব ঘটে। শারীরবৃত্তের দিক হইতে স্মৃতিকে যান্ত্রিক স্মৃতি (organic memory) বলা যাইতে পারে।

(ঙ) **স্মৃতির উন্নতি (Improvement of Memory)**

অধ্যাপক উইলিয়ম জেম্‌স্-এর মতে স্মৃতি যান্ত্রিক স্মৃতিরই নামান্তর। ইহা মস্তিষ্ক ও নার্ভপথের স্থায়ী পুনর্গঠনের ফলে উৎপন্ন হয়। তিনি বলেন যে **স্মৃতিশক্তি অপরিবর্তনীয়**, অর্থাৎ ইহার কোনো প্রকার উন্নতিই সম্ভব নয়, যদিও শারীরিক সুস্থতা ও অসুস্থতা অনুসারে স্মৃতিশক্তির হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিতে পারে। স্মৃতিশক্তি ব্যক্তির দৈহিক গঠনের দ্বারা নির্দিষ্ট। সুতরাং অনুশীলনের ফলে উহার উন্নতি অসম্ভব।

জেম্‌স্-এর মতটিকে অধ্যাপক স্টাউট্ সর্বাংশে সমর্থন করেন নাই। স্টাউট্ জেম্‌স্-এর সহিত এই বিষয়ে একমত যে, অনুশীলনের ফলে সাধারণ স্মৃতিশক্তির উন্নতি ঘটে না। কিন্তু তিনি মনে করেন যে, অনুশীলনের ফলে সাধারণ স্মৃতিশক্তির উন্নতি সম্ভব না হইলেও, কোনো বিশেষ বিষয়ের স্মৃতিশক্তিকে উন্নত করা সম্ভব। যেমন কোনো অভিনেতা হয়ত অনুশীলনের ফলে তাহার অভিনয়াংশ মুখস্থ করিতে পারে, অথবা কোনো ছাত্র ইতিহাসের নাম, তারিখ ও ঘটনাগুলি মনে রাখিতে পারে। জেম্‌স্ হয়ত আপত্তি করিবেন যে, উল্লিখিত উন্নতি আসলে স্মৃতিশক্তির উন্নতি নয়, কিন্তু শিক্ষাপদ্ধতির, যেমন মনোযোগ আকর্ষণ প্রভৃতি আনুষঙ্গিক কারণগুলির উন্নতি। স্টাউট্ হয়ত ইহার উত্তরে বলিবেন যে, যেহেতু এই এই আনুষঙ্গিক কারণগুলির উন্নতির ফলে কোনো বিশেষ বিষয়ের সংরক্ষণ দৃঢ়তর এবং পুনরুৎপাদন ক্ষিপ্রতর হয়, সুতরাং অনুশীলনের ফলে **বিশেষ বিষয়ে স্মৃতির উন্নতি** সাধিত হয়। পক্ষান্তরে জেম্‌স্ মনে করেন যে, শিক্ষণপদ্ধতির উন্নতি সম্ভব হইলেও, স্মৃতিশক্তির অথবা স্মৃতির উন্নতি হইতে পারে না।

অনুশীলনী (Exercise)

1. Define memory. Give an analysis of the factors involved in memory. (Ans. pp. **62—64**)
   স্মৃতি কাহাকে বলে? ইহার অঙ্গগুলি বিশ্লেষণ কর।

2. What is retention? How is retention possible? Explain the theories of retention. (Ans. pp. **64—67**)
   ধৃতি কি এবং কিরূপে সম্ভব? ধৃতির মতবাদগুলি আলোচনা কর।

3. Explain the process of recall and the laws operating in the process. Distinguish betweeu suggestion and association.
(Ans. pp. 67—69)
পুনরুদ্রেক ক্রিয়া এবং ইহাতে ক্রিয়াশীল নিয়মগুলি আলোচনা কর। অনুষঙ্গ ও অভিভাবের পার্থক্য কি ?

4. What are the laws of association ? What part do they play in the process of recall ? Are all the laws of association equally fundamental ? Explain the conditions of association.
(Ans. pp. 69—74)
অনুষঙ্গ নিয়মগুলি কি কি ? পুনরুদ্রেক ক্রিয়ায় উহারা কি অংশ গ্রহণ করে ? অনুষঙ্গের কারণ কি ? সবগুলি অনুষঙ্গ নিয়মই মৌলিক কিনা আলোচনা কর।

5. Write notes on "Free Association" and "Word Associction." Can they replace the laws of Association ? (Ans. pp. 74—75)
অবাধ ভাবানুষঙ্গ এবং শব্দ-অনুষঙ্গের সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর। উহারা অনুষঙ্গ নিয়মের স্থান পূরণ করিতে পারে কি ?

6. What are the marks of good memory ? What are the effects of cramming ? Distinguish between unintelligent and intelligent (logical) memory. Can memory be improved by practice ? Discuss. (Ans. pp. 75—78)
ভাল স্মৃতিশক্তির লক্ষণ কি ? মুখস্থ বিদ্যার দোষগুণ কি ? বুদ্ধিপূর্বক এবং বুদ্ধিহীন স্মৃতির পার্থক্য দেখাও। অনুশীলন দ্বারা স্মৃতির উন্নতি সাধন সম্ভব কিনা আলোচনা কর।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

স্মৃতি এবং বিস্মৃতির প্রয়োগমূলক গবেষণা

(Experiments on Memory and Forgetfulness)

১। সুষ্ঠু শিক্ষা বা শিক্ষায় সময় এবং শ্রম সংক্ষেপ

(Methods of Economising Learning or Memorisation)

(ক) শিক্ষণীয় বিষয়ের সমগ্র এবং আংশিক পদ্ধতি

কোনো নির্দিষ্ট বিষয়কে কত কম সময়ে ও পরিশ্রমে আয়ত্ত করা যায়, এই প্রশ্নের প্রয়োগমূলক গবেষণা করিয়াছেন **এবিংহাউস** এবং অন্যান্য মনোবিদ্। তাঁহারা দেখিয়াছেন যে শিক্ষণীয় বিষয়টি খুব বৃহৎ না হইলে, উহা অখণ্ড বা সম্পূর্ণভাবে শিক্ষা করিতে যত সময় এবং শ্রম লাগে, উহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া অথবা আংশিকভাবে শিক্ষা করিতে তদপেক্ষা বেশী সময় এবং শ্রমের দরকার হয়। অর্থহীন শব্দাংশ, সংখ্যা, কবিতা, গদ্য, শিক্ষণীয় বিষয় যাহাই হউক না কেন উহার সম্পূর্ণ শিক্ষণ (whole learning) আংশিক শিক্ষণ (part learning) অপেক্ষা বেশী ফলপ্রসূ (efficient) এবং সংক্ষিপ্ত (economic) হয়। যেমন, শিক্ষণের দুই বৎসর পরেও খণ্ডিত বা আংশিক পদ্ধতির তুলনায়, সম্পূর্ণ বা অখণ্ড পদ্ধতিতে শেখা কবিতা, অনেক অধিক সুষ্ঠুভাবে পুনরুৎপাদন করা যায় বলিয়া দেখা গিয়াছে।

সমগ্র পদ্ধতির শ্রেষ্ঠতার কারণ এই যে, ইহাতে প্রত্যেকটি অংশকে অপরাপর অংশের সহিত সংযুক্ত বা অনুষক্ত করিয়া শিক্ষা করা হয়। ফলে, স্মরণক্রিয়ার অভিভাবক (Suggestive) সূত্রগুলির সংখ্যা এবং সবলতা অধিক হয়। পক্ষান্তরে, খণ্ডিত বা আংশিক পদ্ধতিতে শিক্ষায় অংশগুলি পরস্পর-বিচ্ছিন্ন হইবার ফলে, একটি অংশ অপরটির স্মারক বা উদ্বোধক হইতে পারে না।

(খ) শিক্ষণ-সময়ের সমগ্র এবং আংশিক পদ্ধতি

দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষণের মোট সময়কে একবারে না লাগাইয়া, উহাকে বিভক্ত করিয়া ব্যবহার করিলে শিক্ষণ, সংরক্ষণ এবং পুনরুৎপাদন, অর্থাৎ স্মরণ, অপেক্ষাকৃত সহজ এবং উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে। ধরা যাউক যে, শিক্ষণীয় বিষয়টি আটবার আবৃত্তি করিয়া শিখিতে হইবে। একদিনেই আটবার আবৃত্তি না করিয়া যদি প্রত্যহ দুইবার হিসেবে চার দিনে আটবার আবৃত্তি করা হয়, তাহা হইলে শিক্ষা, সংরক্ষণ এবং পুনরুৎপাদন বেশী সহজ এবং ফলপ্রসূ হয়।

এই বিষয়ে এবিংহাউস্ ছাড়া আরও অনেক মনোবিদ্, যেমন মায়ার্স, স্টার্চ্ প্রভৃতি প্রয়োগমূলক গবেষণা করিয়া মোটের উপর একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। স্টার্চ্ (Starch) দুই ঘণ্টা শিক্ষণকালকে চার শ্রেণীতে বিভক্ত পাত্রের উপর চার প্রকারে প্রয়োগ করিয়াছেন। প্রথম শ্রেণী প্রত্যেক বারে দশ মিনিট করিয়া, প্রত্যহ দুইবার আবৃত্তির সাহায্যে ছয় দিনে, দ্বিতীয় দলটি প্রত্যেক বারে কুড়ি মিনিট করিয়া, প্রত্যহ একবার আবৃত্তির সাহায্যে ছয় দিনে, তৃতীয় দলটি প্রত্যেক বারে চল্লিশ মিনিট করিয়া, এক দিন অন্তর এক দিন আবৃত্তির সাহায্যে ছয় দিনে এবং চতুর্থ দলটি দুই ঘণ্টা আবৃত্তি করিয়া, একদিনে শিক্ষণকার্য শেষ করিল। স্টার্চ্ দেখিলেন যে প্রথম দলটির শিক্ষণফলই সর্বাপেক্ষা সন্তোষজনক। সুতরাং স্টার্চ্ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিলেন যে, শিক্ষণ সময়কে সংক্ষিপ্ত এবং বেশী সংখ্যক ভাগে বণ্টন করিলেই শিক্ষণফল মোটের উপর ভাল হয়। অবশ্য এই সংক্ষিপ্ত বিভাগেরও একটি সীমা আছে, যাহা প্রয়োগ-সাহায্যে স্থির হয়।

শিক্ষণ সময়ের বিভাগ শিক্ষণফলকে উন্নত করে, কারণ ইহার ফলে একটানাভাবে শিক্ষণের ক্লান্তি বা শ্রম ঘটে না এবং শিক্ষণ বিষয়ের অংশগুলির মধ্যে অনুষঙ্গসূত্র সহজে গড়িয়া ওঠে।

(গ) আবৃত্তি পদ্ধতি (Recitation)

তৃতীয়তঃ, শিক্ষণীয় পাঠ শুধু পড়িয়া গেলে যে সুফল পাওয়া যায়, পড়িবার পর উহা আবৃত্তি করিলে তদপেক্ষা বেশী সুফল পাওয়া যায়। পড়িবার পর পাঠের আবৃত্তিতে অনধিগত অংশ ধরা পড়ে এবং যেখানে যেখানে ঠেকিয়া যাইতে হয়, সেই অংশগুলি যে আরও অভ্যাস করা দরকার, তাহা বুঝা যায়। এই শিক্ষণ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী নিজেই নিজের পরীক্ষক হইয়া দাঁড়ায়।

দেখা গিয়াছে যে, শিক্ষার সবটুকু সময় পাঠে নিয়োজিত করিলে যে স্থলে পাঠের শতকরা ৩৫ ভাগ স্মরণ করা যায়, ঐ সময়ের এক, দুই, তিন এবং চার-পঞ্চমাংশ আবৃত্তিতে লাগাইলে যথাক্রমে ৫০, ৫৪, ৫৭ এবং ৭৪ শতাংশ স্মরণ করা যায়।

(ঘ) অতি-শিক্ষণ (Over-learning) এবং পর্যালোচনা (Review)

চতুর্থতঃ অতিরিক্ত শিক্ষণ এবং পর্যালোচনা সাহায্যে শিক্ষণ এবং স্মরণক্রিয়া সংক্ষিপ্ত এবং কার্যকরী হইয়া থাকে। পঠিত বিষয়কে ঠিক স্মরণ করা যায়, এমন অবস্থার পরও শিক্ষণ চালাইলে, সংরক্ষণ দৃঢ়তর হয়। একটি চল্লিশ মিনিটের

বক্তৃতার পরেই পাঁচ মিনিট উহার পর্যালোচনা করিলে, দুই মাস পরে উহার স্মরণ-ক্রিয়া পঞ্চাশ শতাংশ উন্নততর হয়।

(ঙ) **শ্রেণীগঠন পদ্ধতি**

তাহার ছাড়া, শিক্ষণীয় বিষয়কে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া শিখিলে, স্মৃতির উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। যেমন ২৫, ৩৫, ৪৫ সংখ্যা তিনটিকে মনে রাখা ২৭, ৩৬, ৪৮ এই তিনটি সংখ্যা অপেক্ষা সহজ। প্রথম সংখ্যা তিনটির প্রত্যেকটি পূর্ববর্তী সংখ্যা অপেক্ষা দশ বেশী বলিয়া শ্রেণীবদ্ধ হয়, কিন্তু দ্বিতীয় সংখ্যা তিনটি এইরূপ নিয়মে শ্রেণীবদ্ধ হয় না। আবার কবিতা বা গান শিক্ষা করা সহজতর হয়, কারণ উহাতে শব্দের শ্রেণীগঠন ছাড়া ছন্দ এবং তাল সংযুক্ত হয়।

(চ) **অর্থপূর্ণ শিক্ষণ পদ্ধতি** (Logical Memory)

আবার অর্থপূর্ণ শিক্ষণে, অথবা শিক্ষণীয় বিষয়ের অর্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া উহা শিক্ষা করিলে, স্মৃতি ফলপ্রসূ হয়। যেমন, শিক্ষার্থী যে সকল ঘটনা বা বিষয়ের সহিত তাহা জীবনের সম্বন্ধ লক্ষ্য করিয়া উহা শিক্ষা করে, সেইগুলি তাহার মনে থাকে বেশী। প্রতিবেশীর যে সন্তানটি নিজ সন্তানের সমবয়সী, তাহার বয়স মনে রাখা সহজ হয়। এক কথায়, শিক্ষণীয় বিষয়ের অর্থবোধ স্মৃতির বিশেষ সহায়ক। এই কারণে অর্থপূর্ণ স্মৃতি যান্ত্রিক স্মৃতি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

(ছ) **স্মৃতির সহায়ক বা সঙ্কেত**

স্মৃতির সহায়ক বা সঙ্কেত অবলম্বন করিলে, এই ক্রিয়া সংক্ষেপিত এবং কার্যকরী হয়। যেমন, বার্বারা, সিলারেন্ট, ডেরিয়াই, ফেরিও প্রভৃতি নাম মনে রাখা সহজতর হয়, "বর্বর ছেলেরা দৌড়ে ফেরে একে একে"—এইরূপ সঙ্কেতের সাহায্যে। আবার রামধনুর সাতটি রং-এর নাম মনে রাখা সহজতর হয়, 'ভিব্‌জিঅর' বা 'বেনীআসহকলা', এই সাঙ্কেতিক বর্ণগুলির সহায়তায়।

২। স্মৃতির প্রয়োগমূলক গবেষণা
(Experiments on Memory)

এবিংহাউস্-এর পরীক্ষণীয় বিষয়

হার্ম্যান্ এবিংহাউস্ (Ebbinghaus) স্মৃতির প্রযোগমূলক গবেষণার পথিকৃৎ। অর্থহীন শব্দাংশের (Non-sense Syallables) সম্পূর্ণ শিক্ষণ বা মুখস্থ করিবার পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া শিক্ষণের পরবর্তী বিভিন্ন কালে বিস্মৃতির হার বা পরিমাণ সম্বন্ধে

তিনি গবেষণা করিয়াছেন। সংরক্ষণের উপর প্রতীপ বাধের (Retroactive inhibition) প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া, সংরক্ষণের পরিমাণ নির্ণয়, শিক্ষণের (Memorisation) সময় ও শ্রমসংক্ষেপ (Economy) সমাধানে এবিংহাউস্-এর প্রয়োগমূলক গবেষণা প্রসিদ্ধ।

এবিংহাউস্-এর প্রয়োগগুলির মূল অবলম্বন **অর্থহীন শব্দাংশ** এবং **সংখ্যা** (digits), যেমন, ব্যাপ্, টল্প্, মক্, রিফ, জেব, কব্, টাফ্, রেব্, যুজ্, এক্, ২৫১৬৩৭৯ ইত্যাদি। পূর্বগঠিত অনুষঙ্গ হইতে প্রয়োগবিষয়কে মুক্ত রাখিয়া স্মৃতির গবেষণা করিবার জন্যই তিনি অর্থহীন শব্দাংশ বা সংখ্যা অবলম্বনের পক্ষপাতী।

এবিংহাউস্ অর্থহীন শব্দাংশ পদ্ধতির প্রয়োগ করিয়া দেখিলেন যে পুনরাবৃত্তিই শিক্ষণ বা মুখস্থ করিবার প্রধান উপায়। শিক্ষণীয় শব্দাংশগুলির সংখ্যা বেশী হইলে, অধিক-সংখ্যক এবং উহাদের সংখ্যা কম হইলে, অল্পসংখ্যক পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন হয়। তিনি আরও দেখিলেন, কোনো শব্দাংশতালিকা সম্পূর্ণভাবে শিখিবার পরও অধিকবার শিখিলে, উহা অধিকতর স্থায়ীভাবে সংরক্ষিত হয়। সম্পূর্ণ শিক্ষার পরও কয়েকবার শিক্ষা করিবার নাম **অতিরিক্ত শিক্ষণ** (over-learning)।

এবিংহাউস্ স্থায়ীভাবে শিখিবার বা মনে রাখিবার যে প্রয়োগগুলি নির্দেশ করিয়াছেন উহাদের নাম—(১, ২) শিক্ষণ এবং পুনরাবৃত্তি বা সঞ্চয় পদ্ধতি, (৩) স্মরণ পদ্ধতি এবং (৪) যুগ্মস্মৃতি পদ্ধতি। এই পদ্ধতিগুলি যেমন শিক্ষণ তেমন সংরক্ষণেরও পরিমাপ করে।

(১,২) শিক্ষণ এবং পুনরাবৃত্তি বা সঞ্চয় পদ্ধতি (Learning and Saving Methods)

শিক্ষণ এবং পুনরাবৃত্তি পদ্ধতিতে কতকগুলি অর্থহীন শব্দাংশ বা সংখ্যা স্মৃতিযন্ত্রের (memory apparants) ছিদ্রে একটি করিয়া নিয়মিত কাল ব্যবধানে উপস্থাপিত করা হয় এবং পাত্র সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকটি শব্দাংশ বা সংখ্যা বলিয়া যায়। তারপর পাত্রকে ঐ শব্দাংশ বা সংখ্যা মনে করিতে বলা হয়। পাত্র উহা মনে করিতে না পারিলে উহা পুনঃপুনঃ উপস্থাপিত করা হইতে থাকে; যতক্ষণ পর্যন্ত না পাত্র নির্ভুল এবং নিয়মিতভাবে উহা মনে করিতে পারে। **শিক্ষণ পদ্ধতি** (learning method) এইখানেই শেষ হয়।

পুনরাবৃত্তি পদ্ধতি

শিক্ষণের এক বা একাধিক দিন, এমন কি এক সপ্তাহ, পরে পাত্রকে ঐ শব্দাংশ বা সংখ্যাতালিকা পুনরুদ্রেক করিতে বলা হয়। পুনরুদ্রেকে ভুল হইলে, ঐগুলির পুনঃশিক্ষণ বা পুনরাবৃত্তি দরকার। পদ্ধতির এই অংশকে বলে পুনরাবৃত্তি পদ্ধতি। প্রথম শিক্ষণে যতবার আবৃত্তি বা পুনরুপস্থাপন দরকার হইয়াছিল, পুনঃশিক্ষণে তদপেক্ষা কম বার আবৃত্তি এবং পুনরুপস্থাপনের প্রয়োজন। পুনরাবৃত্তিতে যে সময় বা পুনরুপস্থাপন কম লাগে, তাহা অবশ্যই প্রথম শিক্ষণ ফলের সংরক্ষণের জন্য। পুনঃশিক্ষণে আবৃত্তি বা উপস্থাপনের বার এবং সময় বাঁচিবার কারণ অতীত শিক্ষণফলের সংরক্ষণ। পুনরাবৃত্তি পদ্ধতিকে **সঞ্চয় পদ্ধতিও** (Saving method) বলা হয়, কারণ সংরক্ষণে সঞ্চিত শিক্ষণ ফলই পুনঃশিক্ষণের সময় ও পরিশ্রমের লাঘব করে।

(৩) **স্মারণ পদ্ধতি** (Prompting Method)

স্মারণ পদ্ধতিতে সংরক্ষণ এবং পুনরুৎপাদনের পরিমাণ নির্ণীত হয়, অসম্পূর্ণ শিক্ষণের পর বিষয়ের পুনরুৎপাদন কালে পাত্রকে **কতবার** উহা স্মরণ করাইয়া দেওয়া দরকার হয়, সেই অনুসারে। পাত্র অসম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত বিষয় মনে করিতে গিয়া যত অধিকবার ঠেকিয়া যায় এবং যত অধিকবার তাহাকে বলিয়া বা স্মরণ করাইয়া দিতে হয়, তাহার সংরক্ষণ এবং পুনরুৎপাদন তত অসম্পূর্ণ।

(৪) **যুগ্মস্মৃতি পদ্ধতি** (Scoring Method)

যুগ্মস্মৃতি পদ্ধতিতে কতগুলি অর্থহীন শব্দাংশ বা সংখ্যা এইরূপ নির্দিষ্টসংখ্যক বার পাত্রের নিকট উপস্থাপিত করা হয়, যাহাতে সে ঐগুলি সম্পূর্ণ ভাবে শিক্ষা করিতে না পারে। উপস্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে পাত্র শব্দগুলিকে ট্রোকে (trochaic) তালে জোড়ায় জোড়ায় বলিয়া যায়। কিছুক্ষণ পর পাত্রকে অনিয়মিতভাবে শব্দাংশ-জোড়াগুলির প্রথমটি দেখাইয়া অপর শব্দাংশটি স্মরণ করিতে বলা হয়। দ্বিতীয় শব্দাংশটি শুদ্ধভাবে মনে করিতে যতটা সময় লাগে, সেই সময়কে বলে সাফল্যাঙ্ক কাল (Scoring time)।

(৫) **অন্যান্য পদ্ধতি**

এবিংহাউস্‌-প্রদর্শিত উপরোক্ত চারিটি পদ্ধতি ছাড়াও অন্যান্য পদ্ধতির সাহায্যে

স্মৃতির প্রায়োগিক গবেষণা করা হইয়াছে, যেমন **সংরক্ষিত বিষয় পদ্ধতি** (Method of Retained Members) এবং **পুনর্গঠন পদ্ধতি** (Reconstruction Method)। প্রথম পদ্ধতিতে দেখা হয়, উপস্থাপিত শব্দাংশ বা সংখ্যাতালিকা হইতে পাত্র কয়টি বলিতে পারে। দ্বিতীয়টিতে প্রত্যেক উপস্থাপনের পর উপস্থাপিত বিষয়গুলিকে অন্যভাবে সাজাইয়া আবার দেখানো হয় এবং বিষয়গুলিকে প্রথমে যে ভাবে সাজানো হইয়াছিল, পাত্রকে বলা হয়, উহাদিগকে আবার ঠিক সেইভাবে সাজাইতে।

প্রত্যভিজ্ঞার প্রায়োগিক গবেষণা

প্রত্যভিজ্ঞার প্রায়োগিক গবেষণায় দুইটি পদ্ধতি ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রথমটি **নির্বাচন পদ্ধতি** (Method of Selection)। ইহাতে শিক্ষণের পর জ্ঞাত বস্তুগুলিকে অন্যান্য অজ্ঞাত বস্তুর সহিত মিশাইয়া দেখানো হয় এবং পাত্র ঐ মিশ্রণ হইতে জ্ঞাত বস্তু বাছিয়া লয়। প্রত্যভিজ্ঞা নির্ণয়ের দ্বিতীয় পদ্ধতিটি হইল "**অভিন্ন তালিকা' পদ্ধতি** (Identical Series Method)। ইহাতে যে তালিকাটি অসম্পূর্ণভাবে শিক্ষা করা হইয়াছে, সেই সম্পূর্ণ তালিকাটিই পাত্রের নিকট পুনরুপস্থাপিত করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তালিকায় কোনো অদল বদল হইয়াছে কি না।

৩। বিস্মৃতি (Forgetfulness)

বিস্মৃতির উপকারিতা এবং অপকারিতা

সাধারণতঃ স্মৃতিশক্তিকে সম্পদ এবং বিস্মৃতিকে আপদ বলিয়া মনে করা হয়। কিন্তু এইরূপ ধারণা ভুল। স্মৃতির মত বিস্মৃতিও মানসজীবনে প্রয়োজনীয়। প্রথমতঃ, নিখুঁত অথবা প্রাসঙ্গিক স্মৃতি সম্ভব হয়, বহু অনাবশ্যক এবং অপ্রাসঙ্গিক বিষয় ভুলিয়া গিয়া। যখন যেটুকু দরকার, ঠিক ততটুকু মনে করিতে হইলে, জ্ঞাত বিষয়ের নিষ্প্রয়োজনীয় অংশ ভুলিয়া যাইতে হয়। তাহা ছাড়া, বিস্মৃতি মানসজীবনকে সুস্থ এবং স্বাভাবিক রাখিতে সাহায্য করে। সন্তানবিয়োগের মর্মান্তিক শোক এবং অপমান অথবা ক্ষতির অসহনীয় বেদনাও কালক্রমে সহনীয় হয় বিস্মৃতির কোমল স্পর্শে। দৈনন্দিন জীবনে নিত্রা ক্ষতস্থানে বিস্মৃতির প্রলেপ বুলাইয়া দেয়। তৃতীয়তঃ, বিস্মৃতি নূতন স্মৃতিকে সাহায্য করে, মনের সঞ্চিত আবর্জনা বা জঞ্জাল-স্তূপ সরাইয়া

দিয়া। "পাখী সব" অংশটিই যদি সর্বদা মনে পড়ে, তাহা হইলে "করে রব" প্রভৃতি পরবর্তী অংশগুলির স্মরণ অসম্ভব হইয়া পড়ে।

কিন্তু বিস্মৃতির উপরোক্ত তিন প্রকার গুণ সত্ত্বেও, ইহা যে অনেক সময় মানসজীবনের অন্তরায়, তাহাতে সন্দেহ নাই। নিষ্প্রয়োজনীয় বিষয় ভুলিয়া যাওয়া দরকার। কিন্তু প্রয়োজনীয় বিষয় ভুলিয়া যাওয়া ক্ষতিকর।

বিস্মৃতির কারণ (Causes of forgetting)

বিস্মৃতির কারণ কি? শিক্ষণ ও স্মরণের **কাল ব্যবধানই** ইহার মুখ্য বা একমাত্র কারণ হইতে পারে না। এই কালব্যবধানে অথবা শিক্ষণের পর যে সকল বিষয় জ্ঞাত হইয়াছে উহারাই পূর্বজ্ঞাত বিষয়ের স্মৃতিপথে **বাধা** (interference) সৃষ্টি করে, ফলে পূর্বজ্ঞাত বিষয়গুলি বিস্মৃত হয়। তাহা ছাড়া, দৈনন্দিন জীবনের নানাপ্রকার সদৃশ এবং বিসদৃশ ঘটনা পরস্পরকে ব্যাহত করিয়া পরস্পরের স্মৃতি ক্ষুণ্ণ করে। পরবর্তীকালে জ্ঞাত বিষয়ের পূর্বজ্ঞাত বিষয়ের বিরুদ্ধে বাধাকে বলা হয় **প্রতীপ বাধা** (retroactive inhibition)। পূর্বজ্ঞাত বিষয়ের শিক্ষণের পর মনের বিশ্রাম দরকার। বিশ্রামের ফলে উহা মনে স্থায়ী অথবা **বদ্ধমূল** (consolidated) হইয়া থাকে। অন্যভাবে বলিতে গেলে, শিক্ষণের পর বিশ্রামের ফলে অবচেতন মনে শিক্ষালব্ধ বিষয়ের পরিপাক ক্রিয়া চলিতে থাকে। এই বিশ্রামকালকে **তাপকাল** (incubation period) বলা হয়। বিশ্রাম অথবা তাপকালে পূর্বজ্ঞাত বিষয়ের স্মৃতিরেখাগুলি স্থায়ীভাবে মনে বসিয়া যাইবার সময় পায়। পক্ষান্তরে, একটি বিষয়শিক্ষা করিবার ঠিক পরেই আর একটি বিষয় শিক্ষা করিতে সচেষ্ট হইলে, বিপরীত ফল হইয়া থাকে।

কালের প্রভাব অথবা বাধা যেমন বিস্মৃতি ঘটাইতে পারে, তেমন **মস্তিষ্কের দুর্বলতা** বা পীড়াও বিস্মৃতির কারণ হইতে পারে। মস্তিষ্কের আঘাতের ফলে অনেক সময় বিস্মৃতি ঘটিতে দেখা যায়। মস্তিষ্কের অনুষঙ্গ প্রদেশের ক্ষতিতে এবং বার্ধক্যজনিত মস্তিষ্ক দুর্বলতায় স্মৃতিশক্তি ব্যাহত হয়।

বিস্মৃতির কারণ সম্বন্ধে আর একটি মতের নাম **অব্যবহারজনিত ক্ষীণতা** (atrophy through disuse)। পেশী পরিচালিত না হইলে, উহা দুর্বল হইয়া পড়ে, কারণ উহার কিঞ্চিৎ সারাংশ রক্ত শুষিয়া লয়। আবার সক্রিয় পেশী রক্ত হইতে উহার পুষ্টি টানিয়া লইয়া সবল হয়। সেইরূপ যে সকল স্মৃতিরেখার দীর্ঘকাল ধরিয়া অনুশীলন হয় না, উহারা আস্তে আস্তে ক্ষীণ হইয়া মুছিয়া যায়।

ফ্রয়েড্ এবং ওয়াট্সন-এর মত

বিস্মৃতির কারণ সম্বন্ধে ফ্রয়েডীয় মত উল্লেখযোগ্য। এই মতানুসারে **অবদমনই** (repression) বিস্মৃতির মূল কারণ। অবদমন একটি জৈব ক্রিয়া। ইহা আত্মরক্ষার উপায়, যেহেতু ইহা মনকে পীড়াদায়ক অথবা অস্বস্তিকর অভিজ্ঞতা হইতে রক্ষা করে। বেদনাদায়ক স্মৃতির বিনিময়ে, অথবা বিস্মৃতির আশ্রয় লইয়া, মন নিজ শান্তি ক্রয় করে। আমরা আমাদের প্রাপ্য চেক্-এর কথা মনে রাখি, কিন্তু দেয় বিল্-এর কথা ভুলিয়া যাই। ফ্রয়েডীয় মতানুসারে বিস্মৃতির কারণ স্মরণ করিবার অনিচ্ছা, অর্থাৎ **বিস্মৃতি ইচ্ছামূলক**।

চেষ্টিতবাদী ওয়াট্সন্ মনে করেন যে বিস্মৃতির কারণ হইল **ভাষার অভাব** অথচ বাচিক অনুষঙ্গের (vebral association) অভাব। শৈশবের প্রথম তিন অথবা চার বৎসরকালীন অভিজ্ঞতার বিস্মরণের মূলে রহিয়াছে এই অবস্থায় ভাষা অথবা বাচিক অনুষঙ্গের অভাব। ভাষার অভ্যাস কার্যকরী হইলেই অভিজ্ঞতার স্মরণ হয়, অর্থাৎ ঐ সম্বন্ধে লোককে বলা যায়।

৪। বিস্মৃতির প্রতিকার

বিস্মৃতির প্রতিকারের জন্য নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বনীয়। (১) একটি জ্ঞাত বিষয়ের সহিত যাহাতে অপর জ্ঞাত বিষয়ের সংঘাত না হয়, অর্থাৎ যাহাতে একটি অপরটিকে ব্যাহত না করে, সেই বিষয়ে সতর্ক হওয়া আবশ্যক। (২) স্মৃতির পারস্পরিক ব্যাঘাতের মূলে রহিয়াছে একটি স্মৃতিরেখা মনে বদ্ধমূল না হইতেই, অন্য স্মৃতিরেখার দ্বারা মনকে প্রভাবিত করা। সুতরাং একটি স্মৃতিরেখাকে বদ্ধমূলভাবে মনে বসিয়া যাইবার সুযোগ দিতে হইলে, উহার পরক্ষণেই মনকে বিশ্রাম দেওয়া উচিত। (৩) অনভ্যাসজনিত স্মৃতিক্ষীণতার বিষয়ে সতর্ক হইলে, অর্জিত বা জ্ঞাত বিষয়ের পুনরনুশীলন দরকার। এই বিষয়ে মনের সক্রিয়তার ফলে স্মৃতিরেখা মুছিয়া যায় না, বরং স্পষ্ট থাকে। (৪) বেদনা-দায়ক অভিজ্ঞতার বিস্মৃতি হইতে রক্ষা পাইতে হইলে, উহা কেন বেদনাদায়ক তাহা বুঝিবার অভ্যাস করিতে হয়। এই কারণ বুঝিতে পারিলে, ইহা অবদমিত বা বিস্মৃত হইবে না। (৫) জ্ঞাত বিষয়টি ভাষা অথবা বাচিক অনুষঙ্গের সাহায্যে জ্ঞাত হইলে, উহা বিস্মৃত হইবে না। (৬) সর্বোপরি, জ্ঞাত বা অর্জিত বিষয়কে নিশ্চিতভাবে মনে রাখিতে হইলে, উহার **অতিরিক্ত শিক্ষণ** (over-learning) দরকার।

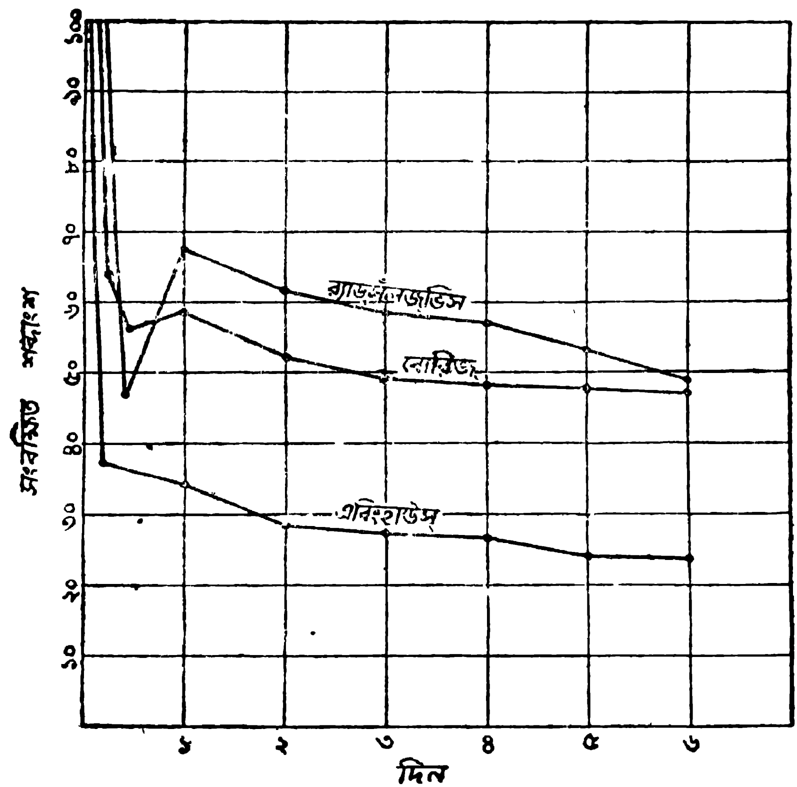
৫। বিস্মৃতির প্রায়োগিক গবেষণা

(Experimental Studies on Forgetfulness)

বিস্মৃতির হার (Rate of Forgetting)

বিস্মৃতির হার সম্বন্ধে এবিংহাউস্-এর প্রয়োগমূলক গবেষণা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। যে কোনো শিক্ষণীয় বিষয় সম্বন্ধে বলা যায়, শিক্ষণের অব্যবহিত পরেই বিস্মৃতি বেশী মাত্রায় বা হারে এবং খুব শীঘ্র ঘটে, কালক্রমে ইহা অল্পাহারে বা মাত্রায় এবং মন্দগতিতে ঘটিয়া, পরিণামে ইহা আর ঘটে না, অথবা নগণ্য হারে এবং গতিতে ঘটে।

নীচে ১৯ নং চিত্রে এবিংহাউস্ বোরিজ্ এবং র‍্যাড্সল্জ্ভিস্-এর তুলনামূলক বিস্মৃতিরেখা দেখানো হইয়াছে।



১৯ নং চিত্র

অর্থহীন শব্দাংশ সাহায্যে পরীক্ষিত বিস্মৃতি

এবিংহাউস্-এর মতে শিক্ষণের প্রথম আধ ঘণ্টায়, আট ঘণ্টায় এবং এক মাসে

শিক্ষালব্ধ বিষয়ের যথাক্রমে অর্ধেক, দুই-তৃতীয়াংশ এবং চার-পঞ্চমাংশের বিস্মৃতি ঘটে। বিস্মৃতির এইরূপ হার হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, শিক্ষণের অল্পকাল পরেই শিক্ষালব্ধ বিষয়ের পুনরুদ্রেক বিশেষ কার্যকরী হয়, কারণ এই সময়েই দ্রুতহারে বিস্মৃতি ঘটিয়া থাকে। মূয়েলার (Muller), স্যুম্যান্ (Schumann), র‍্যাডসলজ্ভিস্ (Raddssowljewitsch), বোরিজ্ (Boreas) প্রভৃতি মনোবিদ্গণ অল্পবিস্তর একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। ইহারা সকলেই প্রধানতঃ অর্থহীন শব্দাংশতালিকা লইয়া প্রায়োগিক গবেষণা করিয়াছেন।

৬। স্মৃতি-প্রসর (Memory Span)

পাত্রের নিকট কতকগুলি অর্থহীন শব্দাংশ, বর্ণ বা সংখ্যা একবার মাত্র উপস্থাপিত করা হইল। ইহার ঠিক পরেই, সে এই উপস্থাপিত শব্দাংশের যতটুকু পর্যন্ত নির্ভুল পুনরুৎপাদন করিতে পারে এবং যতটুকুর বেশী পারে না, ঐটুকুকে পাত্রের স্মৃতি-প্রসর বলে।

মনোবিদ্যার প্রয়োগশালার একটি সহজ প্রয়োগ হইল পাত্রের নিকট কমবেশী দীর্ঘ অর্থহীন শব্দাংশ, সংখ্যা বা বর্ণতালিকা নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থাপিত করা। পাত্র উহা একবার মাত্র প্রত্যক্ষ করিয়া, উপস্থাপনের ঠিক পরেই, উহার যতটুকু শুদ্ধ-ভাবে মনে করিতে পারে, তাহাই **অব্যবহিত স্মৃতি-প্রসর** (immediate memory span)। দর্শন প্রত্যক্ষে সাধারণতঃ ক্ষণদৃক্ যন্ত্রের (tachistoscope) সাহায্যে এই বস্তুগুলি এত অল্প সময়ের জন্য উপস্থাপিত হয় যে, পাত্র একবারের বেশী উহাদের উপর দৃষ্টিপাত করিতে পারে না। অন্যভাবেও অব্যবহিত স্মৃতিপ্রসর পরীক্ষা করা যায়। যেমন, পাত্রকে প্রতি সেকেণ্ডে একটি করিয়া শব্দ বলিয়া যাওয়া হয় এবং পাত্র ঊর্ধ্ব সীমায় যতগুলি শ্রুত শব্দ মনে করিয়া বলিতে পারে, তাহাই তাহার অব্যবহিত স্মৃতি-প্রসর।

এই প্রয়োগের ফলে দেখা গিয়াছে যে, চার হইতে ছয় বর্ষীয় শিশুগণের স্মৃতি-প্রসর সাধারণতঃ চারটি সংখ্যা। পরিণতবয়স্ক ব্যক্তি অক্লেশে পাঁচটি, ছয়টি এবং চেষ্টা না করিয়াই সাতটি বা আটটি পর্যন্ত সংখ্যা, একবার মাত্র অল্পক্ষণ প্রত্যক্ষ করিয়া মনে করিতে পারে। নারীপুরুষ, প্রত্যক্ষবস্তু, মনের নানা অবস্থা, মনোযোগ ও অনুশীলন প্রভৃতি ভেদে স্মৃতি-প্রসরের তারতম্য হইতে পারে। যেমন, উপস্থাপিত তালিকাটি দীর্ঘ হইলে, পাত্রের মন অতি-ভারাক্রান্ত (over--loaded) হইয়া পড়ে এবং স্মৃতি-প্রসর কমিয়া যায়। অব্যবহিত স্মৃতি-প্রসর সাধারণতঃ বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে এবং একটি

বয়ঃসীমা পর্যন্ত বাড়িতে থাকে। মিউম্যান্ বলিয়াছেন যে, তের বৎসর বয়ঃক্রম পর্যন্ত অত্যন্ত ধীরগতিতে, তের হইতে ষোল বৎসর পর্যন্ত দ্রুতগতিতে, ইহার বৃদ্ধি চলিতে থাকে। মিউম্যান্ আরও দেখিয়াছেন যে, কুড়ি হইতে বাইশ বৎসর বয়ঃক্রমে ইহা সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছে এবং তাহার পর ইহার সামান্য হ্রাস ঘটে।

উপস্থাপনের ঠিক পরেই, অর্থাৎ প্রত্যক্ষবস্তু চেতন-স্তর ত্যাগ করিবার পূর্বেই, উহা স্মরণ বা মনে করাকে বলে **অব্যবহিত বা ক্ষণস্থায়ী স্মৃতি** (immediate memory)। শিক্ষণ বা প্রত্যক্ষ এবং স্মরণের ব্যবধান থাকিলে যে স্মৃতি অবশিষ্ট রহিয়া যায়, তাহাকে বলে **স্থায়ী স্মৃতি** (permanent memory)।

শিক্ষার দিক হইতে স্মৃতি-প্রসরের গবেষণা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। যেমন, যেহেতু শব্দ বানান করিতে গিয়া সপ্তমবর্ষীয় শিশু সাধারণতঃ মাত্র ছয়টি বর্ণ পর্যন্ত মনে করিতে পারে, সুতরাং তাহাকে ছয় সংখ্যার বেশী বর্ণবিশিষ্ট শব্দের বানান শিখাইতে হইলে, ঐ শব্দকে শব্দাংশের এককে ভাগ করিয়া শিখাইতে হইবে।

৬। স্মৃতির বিকৃতি বা রোগ (Disorders of Memory)

সাধারণতঃ স্মৃতির বিকার (disorder) বলিতে স্মৃতির চারটি অঙ্গের, যথা সংরক্ষণ, পুনরুৎপাদন, প্রত্যভিজ্ঞা এবং স্থান-কাল নির্দেশের বিকার বুঝায়। **সংরক্ষণের বিকার** ঘটে মস্তিষ্কের আঘাতে, যেমন মস্তিষ্কে গুলিবিদ্ধ হইয়া। এইরূপ আঘাতের ফলে মস্তিষ্ক-পদার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায়, পূর্বজ্ঞাত বিষয়ের সংরক্ষণ নষ্ট হয় এবং স্মরণক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটে। **পুনরুৎপাদনের বিকার** উপস্থিত হয় হিস্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে, মানসিক আঘাতের ফলে। হিস্টিরিয়া রোগী হয়ত কোনো বেদনাজনক ঘটনা মনে করিতে চাহে না বলিয়াই উহা মনে করিতে পারে না। **প্রত্যভিজ্ঞার বিকার** বাতুল বা উন্মাদগণের মধ্যে সচারচর দৃষ্ট হয়। বাতুল তাহার বিশেষ পরিচিত ব্যক্তি বা পরিবেশকেও চিনিতে পারে না। তাহা ছাড়া, দৈনন্দিন জীবনেও ইহা প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। হয়ত রাস্তায় কোনো পরিচিত বন্ধু সম্ভাষিত না হইয়াই চলিয়া গেল, অথবা কোনো পূর্বপরিচিত ব্যক্তি প্রথম সাক্ষাতে অপরিচিত বলিয়া মনে হইল। আবার **স্থান-কাল-নির্দেশ** ক্ষমতাও বহু স্মৃতির বিকারেই পরিলক্ষিত হয়। এইরূপ বিকারে দূরবর্তী বস্তু নিকট এবং নিকটবর্তী বস্তু দূর বলিয়া স্মৃত হয়, আবার অল্প সময় দীর্ঘ এবং দীর্ঘ সময় অল্প বলিয়া মনে হয়।

অন্য দিক দিয়া স্মৃতির বিকারগুলিকে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—

যথা (১) **বিস্মরণ** বা **অস্মার** (Amnesia), **অতিস্মরণ** (Hypermnesia) এবং **উপস্মরণ** (Paramnesia) ।

(১) বিস্মরণ বা অস্মার (Amnesia)

সাধারণভাবে বিস্মরণ বা অস্মার বলিতে বুঝায় স্মরণ করিবার অক্ষমতা বা ভুলিয়া যাওয়া। রিবো (Ribot) অস্মার-এর নিম্নোক্ত বিভাগ করিয়াছেন। সাধারণ (general) এবং আংশিক (partial) ভেদে অস্মার দুই প্রকার। (ক) **সাধারণ অস্মার** আবার সাময়িক (temporay), পর্যাবৃত্ত (periodical), বর্ধনশীল (progressive) এবং জন্মগত (congenital) হইতে পারে। **সাময়িক অস্মার** কোনো আকস্মিক ঘটনার বা অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে হঠাৎ আরম্ভ হইয়া আবার হঠাৎ শেষ হয়, যেমন ভ্রামর অথবা মৃগী (epilepsy) রোগে। প্রতীপক্রিয় অস্মার (retroa-ctive amnesia) এবং আভিঘাতিক অস্মার (Shock amnesia) এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। **পর্যাবৃত্ত অস্মার** দুই বা বহু ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়। ডঃ জেকিল এবং মিস্টার হাইড্-এর মত দুইটি স্বতন্ত্র, বিচ্ছিন্ন এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যক্তিত্ব একই ব্যক্তির মধ্যে পর্যায়ক্রমে আবির্ভূত হইত। ডঃ জেকিল-এর ব্যক্তিত্ব সক্রিয় হইলে, মিঃ হাইড্-এর এবং মিঃ হাইড্-এর ব্যক্তিত্ব সক্রিয় হইলে, ডঃ জেকিল-এর ব্যক্তিত্ব নিষ্ক্রিয় হইত। **বর্ধনশীল অস্মার** বার্ধক্যের চিত্তভ্রংশের (senile dementia) সহিত আবির্ভূত হয়। ইহা ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে। সাম্প্রতিক ঘটনার প্রথম বিস্মৃতি এবং পূর্ববর্তী ঘটনার পরবর্তী বিস্মৃতি বার্ধক্যজনিত অস্মার-এর বৈশিষ্ট্য। **জন্মগত অস্মার** জড়ধী এবং দুর্বলধী ব্যক্তির মধ্যে দেখা যায়। সহজাত মস্তিষ্কের দোষ হইতেই এই স্মৃতিবিকার ঘটে।

(খ) **আংশিক অস্মার** ঘটে বিশেষ ঘটনা, ব্যক্তি বা বস্তুর সম্বন্ধে। কাহারও হয়ত দৃষ্ট অথবা শ্রুত বিষয়ের স্মরণ নষ্ট হইতে পারে। পরীক্ষাকালে পরীক্ষার্থীর পরীক্ষণীয় বিষয়ের বিস্মৃতি এবং পরীক্ষান্তে উহার স্মরণ এই জাতীয় অস্মার। একটি নাম হয়ত কিছুতেই মনে করা যায় না। কাহারও নিকট লিখিত প্রত্যেক চিঠিই হয়ত ডাকে দিতে ভুল হয়। এই সকল ঘটনা আংশিক অস্মার-এর পরিচিত দৃষ্টান্ত।

(২) অতিস্মরণ এবং উপস্মরণ

অতিস্মরণ (hypermnesia) নামক স্মৃতিবিকারে অতীত অভিজ্ঞতার অত্যধিক

পুনরুদ্রেক ঘটে। এই বিকারে দীর্ঘকাল-বিস্মৃত ঘটনাগুলি নিখুঁতভাবে মনে জাগিয়া প্রবল বন্যার মত মনকে অভিভূত করিয়া ফেলে। অতীতের ঘটনাগুলির যে সকল খুঁটিনাটি মনে রাখা স্বাভাবিক নয়, সেইগুলি সবেগে মনকে আক্রমণ করে। ইহার ফলে মনের ভারসাম্য নষ্ট হইয়া যায়। বিস্মরণ, অতিস্মরণ অপেক্ষা কম উদ্বেগজনক স্মৃতিবিকার নয়। সুস্থ ও স্বভাবী মনের পক্ষে অতীত ঘটনার অনেক খুঁটিনাটি ভুলিয়া যাওয়াই বাঞ্ছনীয়। অতীতের অনেক কিছু না ভুলিলে নূতন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য মনকে প্রস্তুত করা যায় না।

উপস্মরণ (paramnesia) একটি প্রত্যভিজ্ঞার ভ্রম। অপরিচিতকে পরিচিত বলিয়া বোধ করাকে বলে উপস্মরণ। ফরাসীরা ইহাকে বলে দি জা ভু (Deja Vu) অথবা দি জা ভিকু। বর্তমানের অভিজ্ঞতাটি যেন পূর্বেও হইয়াছে এইরূপ বোধ হয়, যদিও এইরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। রাস্তা পার হইবার পূর্বেই মনে হইতে পারে, যেন পার হইয়াছি। একটি নূতন স্থানকে বহু পরিচিত বলিয়া অনুভব হইতে পারে, যদিও এই পরিচিতির কোনো সম্ভাবনা ঘটে নাই। প্রধানতঃ নবযৌবনে এই প্রত্যভিজ্ঞার ভ্রমটি ঘটিয়া থাকে। উপস্মরণের নানা কারণ প্রদর্শিত হইয়াছে, কেহ কেহ ইহাকে ভবিষ্যৎ-সূচক স্বপ্ন (prophetic dream) বলিয়াছেন। আবার প্লেটো পূর্বজন্মলব্ধ অভিজ্ঞতাকে ইহার কারণ বলিয়াছেন। মনোবিদ্গণ উহার নিম্ন প্রকার কারণ দেখাইয়াছেন। (ক) প্রত্যক্ষের বিলম্ব ঘটিবার জন্য প্রথম সংবেদনটি বিচ্ছিন্ন হইয়া যেন পূর্বপ্রত্যক্ষ বলিয়া অনুভূত হয়। (খ) মনোযোগের অথবা মানস-শক্তির হ্রাসফলে প্রত্যক্ষটিকে স্বপ্ন বলিয়া মনে হয়। (গ) পরিচিতি বোধটি প্রত্যক্ষের যে অংশের সহিত সংলগ্ন, তাহা হইতে ছড়াইয়া পড়ে সেই সকল অংশে, যাহাতে উহা সংলগ্ন হয়, কারণ প্রথম অংশের সহিত দ্বিতীয় অংশগুলির সাদৃশ্য রহিয়াছে। (ঘ) ডঃ মড্স্লে প্রভৃতি মনে করেন যে, মস্তিষ্কের দুই অর্ধাংশের কার্যে সামঞ্জস্য বা মিল না থাকাই উপস্মরণের কারণ।

অনুশীলনী (Exercise)

1. What are the methods of economising memory ? Is the whole or part method of learning more economical ? (Ans : PP 79—82)

শিক্ষণে সময় এবং শ্রমসংক্ষেপের পদ্ধতি কি ? শিক্ষণে সমগ্র এবং আংশিক পদ্ধতির মধ্যে কোন্টি লাভজনক ?

2. Write notes on (a) Recitation, (b) Overlearning, (c) Grouping as methods of learning. (Ans. PP 81—82)

(ক) আবৃত্তি, (খ) অতিশিক্ষণ, (গ) শ্রেণীগঠন পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।

3. What are the effects of cramming ? (Ans. PP 76)

মুখস্থবিদ্যার ফল আলোচনা কর ?

4. How do logical memory and symbolism help learning ? (Ans. PP 82)

অর্থপূর্ণ স্মৃতি এবং সঙ্কেত কিরূপে শিক্ষণকে সাহায্য করে ?

5. Explain some main experiments on memory laying stress on those made by Ebbinghaus. (Ans: PP 82—85)

এবিংহাউসের উপর গুরুত্ব দিয়া স্মৃতির প্রধান পরীক্ষাগুলি আলোচনা কর।

6. Write notes on : Method of Retained Members, (b) Reconstruction Method, (c) Method of Selection and (d) Identical Series Method, (Ans :PP 82—85)

(ক) সংরক্ষিত বিষয় পদ্ধতি, (খ) পুনর্গঠন পদ্ধতি, (গ) নির্বাচন পদ্ধতি এবং (ঘ) অভিন্ন তালিকা পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।

7. What are the causes and remedies of forgetting ?

বিস্মৃতির কারণ এবং প্রতিকার কি ? (Ans : PF 85—88)

8. Explain some main experimrents on fergetfulness.

বিস্মৃতির কয়েকটি প্রধান পরীক্ষা আলোচনা কর। (Ans :PP 88—89)

9. What is meant by memary span ? What is the method of determining it ? (Aas : PP 89—90)

স্মৃতি প্রসর কাহাকে বলে ? উহা নির্ণয়ের পদ্ধতি কি ?

10. What are the main diseases of memory ? Explain,

স্মৃতির প্রধান বিকারগুলি কি তাহা বুঝাইয়া দাও। (Ans. PP 90—92)

11. Write notes on (a) Amnesia, (b) Hypermnesia and (c) Paramnesia (Ans : PB 90—92)

সংক্ষেপে আলোচনা কর : (ক) অস্মার, (খ) অতিস্মরণ এবং (গ) উপস্মরণ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

গঠনমূলক কল্পনা

(Constructive Imagination)

১। কল্পনা ও স্মৃতি

উনবিংশ পরিচ্ছেদে **পুনরুৎপন্ন** কল্পনা (reproductive imagination) বা **স্মৃতি** এবং **গঠনমূলক কল্পনার** পার্থক্য বুঝানো হইয়াছে। অনুভূত বিষয়ের হুবহু বা অবিকল পুনরুদ্রেককে বলে পুনরুৎপন্ন কল্পনা বা স্মৃতি। উহা হইতে ভিন্ন ক্রম, বিন্যাস বা অবস্থায় অতীত অভিজ্ঞতার পুনরুদ্রেককে গঠনমূলক কল্পনা বা কল্পনা বলা হয়। অবশ্য, পুনরুৎপাদন প্রায়ই একেবারে হুবহু বা অবিকলভাবে ঘটে না। পূর্ব প্রত্যক্ষ বিষয়ের স্মরণে পরিবর্তন ঘটে, স্মৃতির সহিত মিশ্রিত কল্পনার জন্য। দৈনন্দিন জীবনে স্মৃতি কল্পনার বর্ণে রঞ্জিত হয়। উদ্যানের ফুলটি স্মরণ করিতে গিয়া নানা গঠনমূলক কল্পনা ঘটিতে পারে, যেমন ফুলটি যদি অন্য বাগানে থাকিত, অথবা ফুলটি যদি আরও বড় হইত, ইত্যাদি। **পূর্বঅভিজ্ঞতার বিষয়টি ঠিক যেমন জ্ঞাত হইয়াছিল, তেমনটি করিয়া উহার পুনরুদ্রেককে স্মরণ বলে। কিন্তু যে মানসক্রিয়ায় অতীত অভিজ্ঞতার বিষয় ভিন্ন ক্রম, বিন্যাস বা অবস্থায় পুনরুদ্রিক্ত হয় তাহাকে কল্পনা বলে।**

২। কল্পনা গঠনের নিয়ম

প্রত্যক্ষ বিষয়ের সংযোজন (conjunction), বিযোজন (disjunction), বৃদ্ধি (augmentation), হ্রাস (diminution), নাড়াচাড়া (maninulation) প্রভৃতি উপায়ে কল্পনা সম্ভব হয়। তাহা ছাড়া, অভিভাব (suggestion) এবং উদ্দেশ্য নিয়ন্ত্রণও (motivation) কল্পনা গঠনে সহায়তা করে।

মৎস্যের নিম্নাংশের সহিত নারীমূর্তির উপরাংশ **সংযোজিত** করিয়া আমরা মৎস্য-কন্যার (mermaid) কল্পনা করিতে পারি। এই স্থলে মৎস্যের অঙ্গ হইতে উহার নিম্নাংশে নারীদেহ হইতে উহার উপরাংশ **বিয়োজিত করিয়া** উহাদের সংযোজিত করা হইয়াছে। আবার আকাশ কুসুমের কল্পনায় কুসুম উহার নৈসর্গিক পরিবেশ

হইতে বিয়োজিত হইয়া আকাশের সহিত সংযোজিত হইয়াছে। প্রত্যক্ষ বিষয়ের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটাইয়াও কল্পনা-গঠন সম্ভব। যেমন, কল্পনা করা হয় যে যম সত্যবানের দেহ হইতে অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ সূক্ষ্ম শরীরকে আকর্ষণ, অথবা অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন করিয়াছিলেন।

বিষয়ের প্রতিরূপগুলিকে নানাপ্রকারে **নাড়াচাড়া** করিয়াও কল্পনা সম্ভব। আল্‌নাস্কার দিবাস্বপ্নে কল্পনা করিতেছে, সে তাহার মৃৎপাত্রগুলি বেচিয়া এত বড়-লোক হইবে যে দেশের রাজকুমারী তাহার পাণিপ্রার্থিনী হইবেন এবং সে তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিবে। এই কল্পনাটিকে **উদ্দেশ্য-নিয়ন্ত্রিত** বলাও যায়, কারণ ইহাতে অল্‌নাস্কার-এর ব্যর্থতা বোধ (frustration) আত্মম্ভরিতার মধ্যে পরিপূর্তি (compensation) খুঁজিয়াছে। আবার **অভিভাবের** ফলেও কল্পনা ঘটিতে পারে, যেমন কল্পনা করা হইল, যেন রাজকুমার তাহার পক্ষিরাজ ঘোড়ায় চড়িয়া আকাশে উড়িতেছেন।

৩। কল্পনার সীমা

কল্পনা অতীত অভিজ্ঞতাকে নূতন আকারে, পরিবেশে, বিন্যাসে বা অবস্থায় পুনরুদ্রিক্ত করে। কল্পনাকে একেবারে অঘটন-ঘটনপটীয়সী বলা ভুল হইবে। অভিজ্ঞতা হয় নাই, এমন আজগুবি বস্তুর কল্পনা অসম্ভব। আকাশ-কুসুমের এবং মৎস্যকন্যার দুইটি অংশের পৃথক প্রত্যক্ষ হইয়াছিল বলিয়াই, উহাদের সংযোজিত বা বিযোজিত কল্পনা সম্ভব। কল্পনার প্রতিরূপ সম্পূর্ণ নূতন হইতে পারে না। উহা অভিজ্ঞতালব্ধ বিষয়েরই প্রতিরূপ। নূতনত্ব শুধু প্রতিরূপের সংগঠনে অথবা সম্বন্ধে।

স্মুতরাং **কল্পনা কোনো অসীম শক্তি বা ক্রিয়া নয়**। কল্পনা উহার পক্ষ বিস্তার করিয়া অসীম শূন্যে অনন্তকাল ধরিয়া ছুটিতে পারে না। উহার শ্রান্ত পক্ষ বাস্তব প্রত্যক্ষের আশ্রয় চায়। যে বস্তুর অভিজ্ঞতা নাই, তাহার প্রতিরূপ নাই, সুতরাং কল্পনাও হয় না। কল্পনার সংযোজন-বিযোজন ক্ষমতা **বাস্তব অভিজ্ঞতায় সীমাবদ্ধ**। স্বর্ণলঙ্কা কল্পনা করা সম্ভব, কিন্তু একই স্থানে স্বর্ণময় এবং স্বর্ণময় নয়, এইরূপ পরস্পর বিরোধী লঙ্কার কল্পনা অসম্ভব। কল্পনা **চিন্তার মূলসূত্রগুলিকে অতিক্রম করিতে পারে না**।

স্মৃতি কল্পনাকে সীমাবদ্ধ করে। স্মৃতিশক্তি দুর্বল হইলে, কল্পনাশক্তিও দুর্বল হয়। অতীত অভিজ্ঞতার স্মৃত প্রতিরূপকে নানাপ্রকারে মিশ্রিত করিবার নামই কল্পনা। আবার অতীত অভিজ্ঞতালব্ধ বস্তুর সংমিশ্রণও সীমাবদ্ধ। অতীতে অচ্ছেদ্যভাবে প্রত্যক্ষ বস্তুকে কল্পনা ছিন্ন করিতে পারে না। যেমন আগুনকে উত্তপ্ত এবং বরফকে ঠাণ্ডা বলিয়া জানা আছে। বরফের বা আগুনের স্পর্শ-প্রতিরূপও যথাক্রমে উত্তপ্ত এবং শীতল বস্তুর প্রতিরূপ।

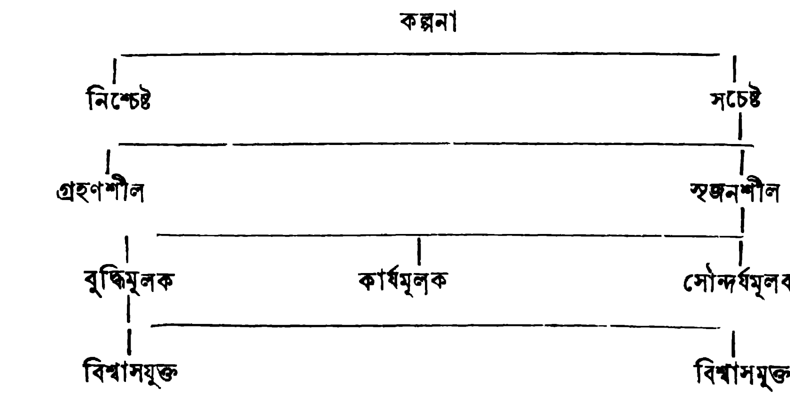
৪। কল্পনার প্রকারভেদ

কল্পনা অনেক প্রকারের হইতে পারে। প্রথমতঃ, অনৈচ্ছিক এবং ঐচ্ছিক কল্পনাকে যথাক্রমে নিশ্চেষ্ট (passive) এবং সচেষ্ট (active) কল্পনা বলে। দ্বিতীয়তঃ, ঐচ্ছিক বা সচেষ্ট কল্পনাকে আবার গ্রহণশীল (receptive) এবং সৃজনশীল (creative), এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। তৃতীয়তঃ, সৃজনশীল কল্পনা আবার বুদ্ধিমূলক (intellectual), কার্যকরী (practical) এবং সৌন্দর্যমূলক (aesthetic) ভেদে তিন প্রকার। চতুর্থতঃ, বুদ্ধিমূলক কল্পনা আবার বিশ্বাসযুক্ত (with belief) এবং বিশ্বাসমুক্ত (without belief) হইতে পারে।

নিশ্চেষ্ট ও সচেষ্ট কল্পনা

ইচ্ছাকৃত কল্পনাকে ঐচ্ছিক বা সচেষ্ট এবং অনিচ্ছাকৃত কল্পনাকে অনৈচ্ছিক বা নিশ্চেষ্ট কল্পনা বলে। নিশ্চেষ্ট কল্পনা ইচ্ছাকৃত অথবা সংজ্ঞান উদ্দেশ্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। ইহাতে প্রতিরূপের বা ভাবনার স্রোত মনে প্রবাহিত হয়। মন তৃণের মত এই প্রবাহে ভাসিয়া চলে। অবাধ ভাবনা বা প্রতিরূপ শৃঙ্খলে (free train of ideas) মন শৃঙ্খলিত হয়, উহার কোনো স্বাধীনতা থাকে না। এই কল্পনাপ্রবাহে মন নিষ্ক্রিয় দ্রষ্টার স্থান গ্রহণ করে। নিশ্চেষ্ট কল্পনা নিজ ছন্দে বা খেয়ালে চলিতে থাকে। ইহাতে মন ইচ্ছানুশাসিত নয়, কিন্তু কল্পনানুশাসিত।

মেলোন্ এবং ড্রামণ্ডকে অনুসরণ করিয়া[১] কল্পনার উপরোক্ত শ্রেণীভেদকে নিম্নপ্রদর্শিত বিন্যাসে দেখানো যাইতে পারে :



১। মেলোন্ অ্যাণ্ড্ ড্রামণ্ড—এলিমেণ্টস্ অফ্ সাইকলজি—পৃঃ ৪৩৯

দিবাস্বপ্ন (day--dream, reverie, brown study) নিশ্চেষ্ট কল্পনার প্রকৃত উদাহরণ। ইহাতে ইচ্ছা বা উদ্দেশ্যের বাধাবন্ধন থাকে না। ইহা স্বচ্ছন্দে ও অবাধে চলে। এই কল্পনা পৌরাণিক কাহিনী, রূপকথা এবং উপাখ্যানের অবলম্বন।

পক্ষান্তরে সচেষ্ট বা ঐচ্ছিক কল্পনা ইচ্ছানুশাসিত এবং উদ্দেশ্য-নিয়ন্ত্রিত। ইহা কল্পয়িতার ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য অনুসারে চলে। দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, শিল্পী, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার প্রভৃতি সৃজনশীল কল্পয়িতারা প্রধানতঃ এই কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই কল্পনায় কল্পয়িতা কল্পনায় বাহিত হইয়া চলেন না, কিন্তু কল্পনা বাহিত হয় কল্পয়িতার ইচ্ছায় এবং অনুশাসনে।

সচেষ্ট কল্পনা—
- —গ্রহণশীল (Receptive)
- —সৃজনশীল (Creative)

সচেষ্ট কল্পনা, আবার গ্রহণশীল এবং সৃজনশীল ভেদে দুই প্রকার। প্লেটো-কল্পিত অতীন্দ্রিয় আদর্শ সত্তাগুলি সৃজনশীল কল্পনার দৃষ্টান্ত; তিনি তাঁহার অবাধ কল্পনা-প্রবাহকে সংযত করিয়াছেন পরম সত্য ও শিবের উপলব্ধিতে। কালিদাস তাঁহার নিরঙ্কুশ কল্পনাকে সৌন্দর্যসৃষ্টির উদ্দেশ্যে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন। তাঁহার কল্পনাও সৃজনশীল। আবার নিউটন্ সমগ্র বিশ্ব কি নিয়মশৃঙ্খলে বিধৃত, তাহা জানিবার উদ্দেশ্যে সৃজনশীল কল্পনার সাহায্যে মাধ্যাকর্ষণ সূত্র আবিষ্কার করিয়াছেন।

কিন্তু প্লেটো, কালিদাস, নিউটন্ প্রভৃতি মনীষিগণের পাঠক উঁহাদের সৃজনশীল আবিষ্কার বুঝিতে গিয়া উঁহাদের কল্পনার ধারা অনুসরণ করিতে সচেষ্ট। এই কারণে পাঠকের কল্পনা নিশ্চেষ্ট বা অনৈচ্ছিক নয়, কিন্তু সচেষ্ট বা ঐচ্ছিক। আবার, পাঠকের কল্পনা গ্রহণশীল, কারণ তিনি কল্পনার সাহায্যে কোনো নূতন সৃষ্টি করিতেছেন না, কিন্তু অন্যের উদ্ভাবিত কল্পনার অনুসরণ করিতেছেন।

সৃজনশীল কল্পনা, আবার, উচ্চপ্রতিভাসম্পন্ন দ্রষ্টাদিগের ক্ষেত্রে নিশ্চেষ্টও হইতে পারে। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, তাঁহার কাব্যসৃষ্টি কাব্যলক্ষ্মীর কৃপায় উৎসারিত। যন্ত্রচালিতের মত উচ্চাঙ্গ সৃজনশীল কল্পনার বাহন হইয়া অনেক স্রষ্টাই জগতে কীর্তিমান হইয়াছেন।

সৃজনশীল কল্পনা—
- —বুদ্ধিমূলক (Intellectual)
- —সৌন্দর্যমূলক (Aesthetic)
- —কার্যকরী (Practical)

সৃজনশীল কল্পন আবার, বুদ্ধিমূলক, সৌন্দর্যমূলক এবং কার্যকরী ভেদে তিন প্রকারের হইতে পারে। জ্ঞানলাভের বা তত্ত্ব নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে যে কল্পনা করা হয়, তাহা বুদ্ধিমূলক কল্পনা। গণিতজ্ঞ অসীমের কল্পনা করেন, সসীম সংখ্যা বুঝিবার জন্য। আবার দার্শনিক ঈশ্বরের কল্পনা করেন জগৎ ব্যাপার বুঝিবার জন্য। ইঁহাদের কল্পনা সৃজনশীল বুদ্ধিমূলক কল্পনা।

সৌন্দর্যসৃষ্টির উদ্দেশ্যে সাহিত্য, কাব্য, সঙ্গীত, ভাস্কর্য প্রভৃতি সুকুমার বা ললিতকলা সৃষ্টির মানসে যে কল্পনা নিয়োজিত হয়, তাহাকে বলে সৌন্দর্যমূলক কল্পনা। কবি কালিদাস শকুন্তলার যে কমনীয় রূপ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার মূলে রহিয়াছে সৃজনশীল সৌন্দর্যমূলক কল্পনা।

কর্মসম্পাদনের উদ্দেশ্যে যে কল্পনার প্রয়োজন হয়, তাহাকে বলে কার্যকরী কল্পনা। কাজ করিবার পূর্বেই কল্পনা করিয়া লইতে হয়, কি প্রকারে কাজটি করা হইবে। যুদ্ধ পরিচালনার পূর্বে যুদ্ধপ্রণালী সম্বন্ধে সেনাধ্যক্ষের কল্পনা সৃজনশীল কার্যকরী কল্পনা।

বুদ্ধিমূলক কল্পনা—
- —বিশ্বাসযুক্ত (with belief)
- —বিশ্বাসমুক্ত (without belief)

- —ঐতিহাসিক (historical)
- —আশামূলক (expectant)
- —বৈজ্ঞানিক (scientific)

বিশ্বাসযুক্ত কল্পনা

বুদ্ধিমূলক কল্পনা, বিশ্বাসযুক্ত এবং বিশ্বাসমুক্ত ভেদে দুই প্রকার। যে বুদ্ধিমূলক কল্পনায় কল্পিত বস্তুর সত্যতা সম্বন্ধে নিশ্চিত বিশ্বাস থাকে তাহাকে বিশ্বাসযুক্ত কল্পনা বলে। মহেঞ্জোদারো সভ্যতায় মানুষ বিজ্ঞানসম্মত ঘরবাড়ি তৈয়ারী করিতে পারিত, নালন্দা একটি বিশাল আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় ছিল, অথবা বুদ্ধদেব অতুল রাজৈশ্বর্য তুচ্ছ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন, এই জাতীয় ঐতিহাসিক কল্পনার সত্যতায় আমরা বিশ্বাসী। সুতরাং **ঐতিহাসিক কল্পনা**, বিশ্বাসযুক্ত কল্পনা। আবার, জুন মাসে ত্রৈবার্ষিক ডিগ্রী কোর্স-এর প্রাথমিক পরীক্ষা হইবে, অথবা জ্যৈষ্ঠ মাসে আরও গরম

পড়িবে, অথবা মাঘ মাসে আরও শীত পড়িবে, এই জাতীয় আশাও বিশ্বাসযুক্ত কল্পনার উদাহরণ। **আশামূলক কল্পনায়** বর্তমান অপূর্ণ অবস্থা এবং তৎসংশ্লিষ্ট অনুভূতির সহিত ভবিষ্যতের সম্ভাব্য পূর্ণতা এবং তৎসংশ্লিষ্ট অনুভূতির তুলনামূলক বোধ থাকে। কল্পিত ঘটনা বা বস্তুটি বর্তমান নয় কিন্তু ভবিষ্যৎ, এই বোধ আশামূলক কল্পনার বিশেষ ধর্ম। তাহা ছাড়া, কল্পিত ঘটনাটি যে ঘটিবে, এইরূপ বিশ্বাস ইহার প্রধান লক্ষণ: উপরন্তু, কল্পিত ঘটনাটি বাস্তব হইলে, উহার সম্মুখীন হইবার প্রস্তুতিও আশামূলক কল্পনার বৈশিষ্ট্য। আসন্ন ঝড়ের আশঙ্কায় ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করা, প্রিয়জনের বা মাননীয় অতিথির আসন্ন আগমনের প্রত্যাশায় তাহার আদর-আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা, আলোচ্য কল্পনার উদাহরণ। তৃতীয়তঃ, **বৈজ্ঞানিক কল্পনাও** বিশ্বাসযুক্ত কল্পনা। যেমন সূর্যের সহিত পৃথিবীর সম্বন্ধ বা সূর্যকে কেন্দ্র করিয়া তাহার চারিদিকে পৃথিবীর আপন কক্ষে আবর্তনের ফলেই দিনরাত্রি, মাস-বর্ষ, ষড়ঋতু প্রভৃতি ঘটিয়া থাকে, এই সকল কল্পিত বিষয়ের সত্যতায় আমরা বিশ্বাস করি।

বিশ্বাসমুক্ত কল্পনা

পক্ষান্তরে বিশ্বাসমুক্ত কল্পনায় কল্পিত ঘটনা বা বস্তুর সত্যতায় বিশ্বাস থাকে না। এই কল্পনা বাস্তব জগতের নিয়ন্ত্রণহীন। ইহা অবাধ ও স্বচ্ছন্দ। ইহা আপন সত্যতার সাক্ষ্য বহন করে না। পৌরাণিক কাহিনী অথবা উদ্দাম কল্পনামূলক রূপকথা বিশ্বাসমুক্ত কল্পনার উদাহরণ। বিশ্বাসমুক্ত কল্পনা সচেষ্ট (গ্রহণশীল এবং সৃজনশীল উভয়তঃ) এবং নিশ্চেষ্ট, দুই প্রকারেরই হইতে পারে। শিশুকে তেপান্তরের মাঠের বা স্বপনপুরীর রাজকন্যার গল্প বলা হইতেছে। যিনি গল্প বলিতেছেন বা লিখিতেছেন তাঁহার বিশ্বাসমুক্ত কল্পনা সচেষ্ট এবং সৃজনশীল। আবার শ্রোতা শিশুর বিশ্বাসমুক্ত কল্পনা সচেষ্ট হইলেও, গ্রহণশীল। দিবাস্বপ্ন প্রভৃতি বিশ্বাসমুক্ত কল্পনাগুলি নিশ্চেষ্ট।

৫। অমূল প্রত্যক্ষ বা মায়া (Hallucination)

অমূল প্রত্যক্ষ

যে কল্পনা প্রত্যক্ষের স্পষ্টতা লইয়া জাত হয়, অথচ যাহার বস্তুগত ভিত্তি নাই, তাহাকে অমূল প্রত্যক্ষ বলে। ইহা বিষয়গত প্রত্যক্ষ (objective perception) নয়, কিন্তু মানস বা পাত্রগত প্রত্যক্ষ (subjective perception)। এই কল্পনা প্রবল ও স্পষ্ট হইয়া উঠে যে কল্পিত বিষয়টি প্রত্যক্ষ বলিয়া ভ্রম হয়। মনের অবস্থা বহির্বিক্ষিপ্ত (projected) হইয়া এই ভ্রান্তি ঘটায়।

মেলোন অ্যাণ্ড ড্রামণ্ড১ উল্লিখিত বিয়াঁচি-এর দৃষ্টান্ত সাহায্যে ভ্রান্তকল্পনার প্রাত্যক্ষিক স্পষ্টতা ও প্রবলতা বুঝা যাইবে। "কোনো ভদ্রমহিলা এক মুচিকে মাতাল বলায়, মুচিটি চটিয়া গিয়া ভদ্রমহিলাকে গালাগালি করিল। মহিলাটি তাহাকে শাসাইয়া গেলেন যে, তিনি ঐ অঞ্চলের চারজন কৃষককে ঘটনাটি জানাইয়া অপমানের প্রতিশোধ লইবেন। মুচি কৃষকদের ভয়ে লুকাইয়া রহিল। ইহার পর এক রাত্রিতে স্বপ্নে শয়তান আসিয়া মুচিকে বলিল, 'যে কোনোটি বাছিয়া লও, হয় তোমার ডান হাতটি কাটিয়া ফেল, নতুবা ঐ চারটি কৃষকের হাতে খুন হও।' স্বপ্নেই মুচি ভাবিল, বরং সে একটি হাত বাদ দিয়াই প্রাণে বাঁচিয়া থাকিবে। জাগিয়াও সে দেখিল যে শয়তান তাহাব পাশেই বসিয়া আছে এবং তাহাকে হাত কাটিয়া ফেলিবার নির্দেশ দিতেছে। এই দৃশ্যে ভীত হইয়া, ভয়েই হউক, অথবা ব্যথা পাইবার আশঙ্কায়ই হউক, সে আদেশ পালন করিতে ইতস্ততঃ করিতেছিল। সেই ভৌতিক মূর্তির নিকট আপত্তি তুলিয়া সে আরও নির্দেশ পাইল যে, তাহার কোনো ব্যথা অনুভব হইবে না। মুচিটি তখনই একটি পুরানো করাতের দিকে তাকাইল এবং 'শয়তানের ও নিজ সহায়তায়' কোনো ব্যথা অনুভব না করিয়াই হাতটি কাটিয়া ফেলিল। তাহার মনে হইল তাহার হাতটি যেন কাঠ দিয়া তৈয়ারী। হাতটি কাটা শেষ হওয়া মাত্র সে ব্যথা অনুভব করিল এবং রক্তস্রোতের পরিমাণ দেখিয়া ভয়ার্ত চিৎকারে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করিল।"

উপরের উদাহরণটিতে জাগ্রত অবস্থায় ভৌতিক মূর্তি দর্শন, আদেশ শ্রবণ, কোনো ব্যথা অনুভূত হইবে না এইরূপ আশ্বাসলাভ প্রভৃতি কল্পনাগুলি অমূল প্রত্যক্ষ, কারণ এইগুলি মুচিটির নিছক কল্পনা মাত্র। এই কল্পনাগুলির বহিঃ-প্রত্যক্ষরূপে বিক্ষেপণের মূল কারণ হয়ত মুচিটির অন্যায় কার্যের জন্য অপরাধবোধ এবং মোড়লস্থানীয় চারিটি কৃষকের ভয়। প্রত্যক্ষ পরিচ্ছেদে অমূল ভ্রম প্রত্যক্ষের এবং উহার সহিত সমূল প্রত্যক্ষের সাদৃশ্য ও পার্থক্য আলোচনা দ্রষ্টব্য।

নিম্নে কয়েকটি নিশ্চেষ্ট বা অনৈচ্ছিক কল্পনা উল্লিখিত হইল।

৬। নিশ্চেষ্ট কল্পনা

(ক) অবাধ কল্পনা (Phantasy) বা মনঃসৃষ্টি

অবাধ কল্পনা ইচ্ছার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয় এবং বিশৃঙ্খল। ইহা একপ্রকার মুক্ত

১। মেলোন অ্যাণ্ড ড্রামণ্ড—এলিমেণ্ট্‌স্ অফ্ সাইকলজি—পৃঃ ৪৪৫

চিন্তাপ্রবাহ, যাহা লাগামবিহীন ঘোড়ার মত যথেচ্ছভাবে বিহার করে। অবাধ কল্পনা সৃজনশীল এবং উচ্চস্তরের শিল্পসৃষ্টির ভিত্তি।

(খ) স্বয়ংসম্পূর্ণ চিন্তন (Autistic thinking)

স্বয়ংসম্পূর্ণ বা আত্মসর্বস্ব চিন্তন একপ্রকার নিশ্চেষ্ট বা অনৈচ্ছিক কল্পনা। এই কল্পনা কল্পয়িতার নিজ ব্যক্তিত্বে সীমাবদ্ধ। অভাববোধ, ইচ্ছা, আশা, আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি ব্যক্তিগত প্রয়োজনই ইহার উৎস। এই মানসবৃত্তি বাস্তব জগতের সহিত সংস্রবহীন। ইহাতে ব্যক্তি স্বয়ং তাহার কল্পনার কেন্দ্র। ইহাকে চিন্তন বলা হইলেও, আসলে ইহা কল্পনাবিশেষ, কারণ চিন্তন বিষয়মুখী কিন্তু স্বয়ংসম্পূর্ণ চিন্তন আপনাতে আপনি মগ্ন বা আত্মলীন। বাস্তব জীবন-সংগ্রামে পরাজিতবোধ এবং বাস্তববিমুখতাই স্বয়ংসম্পূর্ণ চিন্তনের মূল কারণ।

(গ) দিবা স্বপ্ন বা জাগর-স্বপ্ন (Day-Dream)

সাধারণতঃ স্বপ্ন ঘটে নিদ্রিত অবস্থায় এবং রাত্রিতে। কিন্তু জাগরণে এবং দিবাভাগে একরূপ অর্ধনিদ্রিত অবস্থা ঘটে, যাহাতে বাস্তব জগতের উদ্দীপক প্রায় নিষ্ক্রিয় থাকে। জাগরণের অর্ধনিদ্রিত বা তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় স্বপ্নের মত যে নিশ্চেষ্ট, অনৈচ্ছিক বা স্বতঃক্রিয় কল্পনা ঘটে, তাহাই জাগর-স্বপ্ন বা দিবা-স্বপ্ন। ইহা স্বয়ংসম্পূর্ণ কল্পনা, কল্পনাজাল (Reverie) এবং অবাধ কল্পনার অনুরূপ।[১]

উপরোক্ত কল্পনাগুলির পার্থক্য

উপরোক্ত কল্পনাগুলির পার্থক্য নির্ভর করে উহাদের উৎসের গভীরতার উপর। অবদমিত বাসনাই এই জাতীয় কল্পনার মূল কারণ। অবদমিত বাসনার প্রভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ কল্পনায় ব্যক্তি নিজের মধ্যে নিজেকে গুটাইয়া ফেলে। স্বয়ংসম্পূর্ণ কল্পনার তুলনায় দিবাস্বপ্নে অবদমনের গভীরতা অপেক্ষাকৃত কম। তাহা ছাড়া, দিবাস্বপ্ন স্বয়ংসম্পূর্ণ কল্পনার তুলনায় সাময়িক। কল্পনাজাল, উদ্দাম কল্পনা প্রভৃতি অবস্থাগুলি আরও হাল্কা এবং উহাদের অবদমনমূলক উৎসের গভীরতা আরও কম। উহারা বাস্তব-বিমুখ, কিন্তু প্রথমটি সর্বাপেক্ষা বেশী, দ্বিতীয়টি তদপেক্ষা কম এবং তৃতীয়গুলি আরও কম।

১। অবাধ কল্পনা, স্বয়ংসম্পূর্ণ চিন্তন, জাগর স্বপ্ন প্রভৃতি কল্পনাগুলির মধ্যে অনেকেই ভেদ স্বীকার করেন না। যেমন, উড্‌ওয়ার্থ, মর্গ্যান্, বোরিং প্রভৃতি ইহাদিগকে সমার্থক মনে করেন।

৭। স্বপ্ন (Dream)

সুষুপ্তি বা গভীর নিদ্রা এবং জাগরণের মধ্যবর্তী অবস্থায় প্রত্যক্ষের স্পষ্টতা ও বাস্তবতা লইয়া যে কল্পনারাশি ঘটে তাহাকে স্বপ্ন বলে। সুষুপ্তি বা গভীর নিদ্রায় দ্রষ্টা ও দৃশ্যের ভেদ থাকে না। ইহা একটি স্বপ্নাতীত অবস্থা। সুষুপ্তি ও জাগরণের মধ্যবর্তী অর্ধনিদ্রিত বা তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায়ই স্বপ্ন ঘটিয়া থাকে। অবশ্য এই তন্দ্রাচ্ছন্ন বা অর্ধনিদ্রিত অবস্থাটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কল্পনা, দিবা-স্বপ্ন প্রভৃতির অনুকূল অর্ধজাগ্রত অবস্থা হইতে আরও গভীর।

স্বপ্ন ঘটে কল্পনাকে আশ্রয় করিয়া। স্বপ্নে বহির্জগতের সহিত কোনো প্রত্যক্ষ সংস্রব থাকে না, কিন্তু প্রত্যক্ষের লুপ্তাবশেষ, স্মৃতিরেখা বা প্রতিরূপ মাত্র থাকে। এই প্রতিরূপগুলি বিচিত্রভাবে সংযোজিত বা বিযোজিত, বর্ধিত বা হ্রস্বায়িত, অভিভাবিত, প্রেষিত বা উদ্দেশ্যনিয়ন্ত্রিত হইয়া স্বপ্নের সৃষ্টি করে এবং যাহা কখনও প্রত্যক্ষ হয় নাই, এমন অভিনব আকারে আত্মপ্রকাশ করে। স্বপ্ন **গঠনমূলক** কল্পনা, কারণ ইহাতে প্রতিরূপগুলি নূতনভাবে সম্বদ্ধ হইয়া নূতন অভিজ্ঞতার সৃষ্টি করে। একই কারণে স্বপ্ন **সৃজনশীল** কল্পনা। কিন্তু স্বাপ্নিক প্রতিরূপের সংমিশ্রণ সাধারণ অর্থে নিশ্চেষ্টভাবে ঘটে বলিয়া, স্বপ্ন একপ্রকার **নিশ্চেষ্ট** অনৈচ্ছিক কল্পনা।

স্বপ্ন ও অমূল প্রত্যক্ষ (Dream and Hallucination)

স্বপ্ন শুধু কল্পনাই নয়। স্বপ্নের প্রতিরূপ বাস্তব জগতের সংস্রববর্জিত মনের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া বাস্তবরূপে ভাসমান হয়। সুতরাং স্বপ্ন **অমূল প্রত্যক্ষবিশেষ**। যেমন অমূল প্রত্যক্ষে, তেমন স্বপ্নে, সাধারণতঃ ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংযোগ অথবা বাস্তব প্রত্যক্ষ থাকে না। আবার যেমন অমূল প্রত্যক্ষে, তেমন স্বপ্নে, অবস্তু প্রতিরূপগুলিই বস্তু বলিয়া মনে হয়। তৃতীয়তঃ, যেমন অমূল প্রত্যক্ষের, তেমন স্বপ্নের মূলে থাকে মানসিক বা দৈহিক বিকার। ভীতু ব্যক্তি অথবা অজীর্ণরোগী প্রায়ই স্বপ্নে অমূলক ভয়, যেমন চোরের ভয়, ভূতের ভয়, দেখিয়া আতঙ্কগ্রস্ত হয়।

কিন্তু স্বপ্নের সহিত অমূল প্রত্যক্ষের **পার্থক্যও** লক্ষ্য করিবার মত। প্রথমতঃ, স্বপ্ন ঘটে অর্ধনিদ্রিত অবস্থায়, কিন্তু অমূল প্রত্যক্ষ ঘটে জাগ্রদবস্থায়।

দ্বিতীয়তঃ, স্বপ্নের তুলনায় অমূল প্রত্যক্ষ অধিকতর স্পষ্ট, সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং স্বাভাবিক। অমূল প্রত্যক্ষে বুদ্ধির সংযম এবং বিবেক বা অধিশাস্তার শাসন থাকে

বলিয়া, প্রতিরূপের মিশ্রণ বাস্তবের দ্বারা আংশিকভাবে নিয়মিত হয়। ফলে, অমূল প্রত্যক্ষের বিষয় একেবারেই অদ্ভুত বা কিম্ভূতকিমাকার হইতে পারে না। পক্ষান্তরে স্বপ্নে বুদ্ধির সমালোচনা এবং বিবেক বা অধিশাস্তার শাসন অভিভূত হইয়া পড়ে। ফলে, স্বাপ্নিক বিষয় প্রায়ই অদ্ভুত বা কিম্ভূতকিমাকার হয়। **তৃতীয়তঃ**, অমূল প্রত্যক্ষের তুলনায় স্বপ্ন অধিকতর জটিল। প্রথমটির তুলনায় দ্বিতীয়টির উৎস মনের গভীরতর স্তরে নিহিত। **চতুর্থতঃ**, অমূল প্রত্যক্ষের কারণ-বিশ্লেষণ সাধারণ মনোবিদ্যার নিয়মেই করা যায়। কিন্তু স্বপ্নের কারণবিশ্লেষণ মনঃসমীক্ষণের অবাধ ভাবানুষঙ্গ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উপর নির্ভর করে।

স্বপ্ন ও ভ্রমপ্রত্যক্ষ (Dream and Illusion)

স্বপ্নের উদ্দীপক-বাদ (Stimulus Theory)

ফ্রয়েড-এর পূর্ববর্তী অনেক মনোবিদ্ এবং শারীরবৃত্তবিদ স্বপ্নকে প্রধানতঃ ভ্রমপ্রত্যক্ষ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে স্বপ্ন বহির্জগতের উদ্দীপক দ্বারা উৎপন্ন। অর্ধনিদ্রিত অবস্থায়ও বাহিরের উদ্দীপক (যেমন শয্যার স্পর্শ, পোশাক, তোষক, লেপ প্রভৃতির চাপ), আভ্যন্তরীণ শারীর যন্ত্রগুলির অবস্থাজনিত উদ্দীপক (যেমন নিশ্বাস-প্রশ্বাসে বাধা, রক্তচলাচল এবং নাড়ীর গতিপরিবর্তন, হজমের গোলমাল), শয়ন করিবার ভঙ্গী (যেমন চিৎ হইয়া বা উপুড় হইয়া শয়ন করা), মনের উপর ক্রিয়াশীল থাকে। জাগরণে মন বাহ্যজগতের সংস্পর্শে আসিয়া এই সকল উদ্দীপকের প্রতি স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া করে। কিন্তু অর্ধনিদ্রিত অবস্থায় মন বাহ্যজগতের সংস্পর্শ-বিহীন হয়। ফলে, এইসকল উদ্দীপকের দ্বারা উত্তেজিত হইয়া মন প্রতিরূপের সংমিশ্রণে অবাস্তব জগৎ সৃষ্টি করে।

সুতরাং স্বপ্ন শুধু অমূল প্রত্যক্ষ নয়, কিন্তু সমূল অর্থাৎ বস্তুভিত্তিক ভ্রমপ্রত্যক্ষ। যেহেতু বস্তুজগতের কোনো না কোনো উদ্দীপক ক্রিয়ার অপব্যাখ্যাই স্বপ্নের কারণ, সুতরাং স্বপ্নেরও বাস্তব ভিত্তি রহিয়াছে। যেমন, হয়ত কোনো অর্ধনিদ্রিত ব্যক্তির নাকে সুড়সুড়ি দেওয়ার ফলে সে স্বপ্ন দেখিল, যেন তাহার মুখমণ্ডল হইতে একটি আলকাতরার মুখোশ খুলিয়া ফেলা হইতেছে। হয়ত কোনো ব্যক্তি স্বপ্ন দেখিল যে, একটি শোভাযাত্রা যাইতেছে, কারণ ঢাক বাজাইয়া তাহার নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মানো হইয়াছে। উড়িবার স্বপ্ন অথবা নগ্নতার স্বপ্ন যথাক্রমে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নড়াচড়া এবং দেহতাপহ্রাসের দ্বারা উৎপন্ন হইতে পারে। অর্ধনিদ্রাবস্থায় আবরণশূন্য পায়ে ঠাণ্ডা

হাওয়া লাগিবার ফলে, কেহ হয়ত স্বপ্ন দেখিল যে সে জলের মধ্য দিয়া যাইতেছে। আবার মশারির খুঁটি ঘাড়ে পড়িয়া যাওয়ায়, কেহ বা স্বপ্ন দেখিল যে, সে ফরাসী বিপ্লবের মধ্যে বাস করিতেছে এবং শীঘ্রই তাহার ফাঁসি হইবে।

ক্লাইন্ (Klein) তাঁহার পাত্রদিগের উপর নানা প্রযোগ করিয়া দেখিয়াছেন যে উদ্দীপক, শয়নভঙ্গী প্রভৃতি কারণগুলি স্বপ্ন উৎপন্ন করে। চিৎ হইয়া অথবা হাত বুকের উপর রাখিয়া নিদ্রিত হইলে বোবায় পায়। বিভিন্ন অবস্থান কিরূপে স্বপ্নকে প্রভাবিত করে, জে. মোর্লি ভোল্ও (Veldt) তাহার বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা করিয়াছেন।

বলা যাইতে পারে যে, স্বপ্ন শুধু সমূল ভ্রমপ্রত্যক্ষ নয়, কিন্তু **সমূল এবং অমূল ভ্রমপ্রত্যক্ষের সংমিশ্রণ**। ইহাকে সম্পূর্ণ অমূল প্রত্যক্ষ বলা চলে না, কারণ স্বপ্নের উপর অভ্যন্তরীণ বা বাহ্য উদ্দীপকের প্রভাব রহিয়াছে। আবার স্বপ্নকে সম্পূর্ণভাবে সমূল ভ্রমপ্রত্যক্ষও বলা যায় না, কারণ স্বপ্নাবস্থার বাস্তব অবলম্বন বা ভিত্তি নাই। আবার বলা যাইতে পারে যে, স্বপ্ন অমূল বা সমূল ভ্রমপ্রত্যক্ষের **কোনোটিই নয়**, কিন্তু সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কাল্পনিক প্রত্যক্ষ। ইহা জাগরণ এবং সুষুপ্তির মধ্যবর্তী অর্ধনিদ্রাবস্থার একপ্রকার কল্পনা। বাহ্য বা আভ্যন্তরীণ উদ্দীপক থাকিলেও, উহাদিগের উত্তেজনায় ইন্দ্রিয়গুলি স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া করে না। সুতরাং স্বপ্নকে অমূল প্রত্যক্ষ বা সমূল ভ্রমপ্রত্যক্ষের কোনোটিই বলা চলে না। আবার, জাগরণ-অবস্থায় সংঘটিত হয় না বলিয়াও, স্বপ্নকে উহার কোনোটি বলা যায় না, কারণ এই দুইটি প্রত্যক্ষই জাগরণে ঘটিয়া থাকে। সুতরাং বলিতে হয় যে, স্বপ্ন অমূল এবং সমূল ভ্রমপ্রত্যক্ষের সহিত আংশিক সাদৃশ্য এবং পার্থক্যযুক্ত **স্বতন্ত্র কল্পনা**।

৮। জেম্‌স্-এর শারীরবৃত্তীয় স্বপ্নমত

উপরোক্ত উদ্দীপকবাদের মত অধ্যাপক উইলিয়াম্ জেম্‌সও স্বপ্নের শারীরবৃত্তীয় ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে স্বপ্নে মস্তিষ্ক আংশিকভাবে নিদ্রিত বা নিষ্ক্রিয় থাকে। এই অবস্থায় কতকগুলি মস্তিষ্ক-পথ (brain-paths) বন্ধ হয়, আবার কতকগুলি উন্মুক্ত থাকে, ফলে স্বাভাবিক অনুষঙ্গের ব্যাঘাত ঘটে। তাঁহার মতকে Brain-path-resistance theory অথবা **মস্তিষ্ক-পথ অবরোধবাদ** বলা হইয়া থাকে।

ধরা যাউক যে, নিদ্রিত অবস্থায় মুখে হাওয়া লাগিলে, স্বাভাবিক অনুষঙ্গসূত্র অনুসারে ঠাণ্ডা, শীত, তুষার, পতন, বিন্দু, ভাঙ্গিয়া যাওয়া, গাড়ি, যান, বাষ্প প্রভৃতির কথা মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু ঠাণ্ডা বা শীতলতার কথা ভাবিলে যে

মস্তিষ্কপথগুলি সক্রিয় হইয়া শীত, তুষার, পতন, প্রভৃতির কথা মনে করাইয়া দেয়, সেই মস্তিষ্কপথগুলি বন্ধ হইয়া গেলে, ঠাণ্ডা বা শীতলতা স্মরণের সহিত অনুষক্ত প্রতিরূপগুলি মনে ভাসিয়া উঠিতে পারে না। কিন্তু এই মস্তিষ্কপথগুলি অবরুদ্ধ (blocked) থাকিলেও, হয়ত পূর্ববর্তী কোনো অভিজ্ঞতার (যেমন পুতুলনাচ দেখার) সহিত সংশ্লিষ্ট কোনো মস্তিষ্কপথ উন্মুক্ত এবং ক্রিয়াশীল থাকে। ফলে, নিদ্রিত অবস্থায় মুখে হাওয়া লাগিবার জন্য কাগজের তুষার ঝঞ্ঝায় পুতুলনাচের স্বপ্ন উৎপন্ন হইল। অধিকাংশ মস্তিষ্কপথ অবরুদ্ধ থাকায়, স্বপ্নে অনুষঙ্গসূত্রগুলির অবস্থা দাঁড়ায়, বন্যায় মোটর গাড়ির সোজা পথ ছাড়িয়া, নানা বাঁকা পথ অতিক্রম করিয়া, সোজা পথে আসিবার মত।

৯। ফ্রয়েড্-এর স্বপ্নমত

(১) অন্যান্য মত খণ্ডন

ফ্রয়েড্ স্বপ্নের **অন্যান্য মতবাদ খণ্ডনপূর্বক** স্বমত ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

(ক) স্বপ্নের **শারীরবৃত্তীয় মতবাদগুলির প্রধান দোষ** এই যে উহারা স্বপ্ন, কেন এবং কি প্রকারে নির্দিষ্ট আকারে প্রকাশিত হয়, তাহা ব্যাখ্যা করিতে পারে না। **উদ্দীপকবাদ** স্বপ্নকে সমূল ভ্রমপ্রত্যক্ষের আলোকে ব্যাখ্যা করে। ফ্রয়েড্-এর আপত্তি অনুসারে, বাহিরের বা ভিতরের উদ্দীপক স্বপ্নের আংশিক কারণ হইলেও, উহার সম্পূর্ণ কারণ হইতে পারে না। **উদ্দীপকের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া না ঘটিয়া, কেন উহার স্বাপ্নিক প্রতিক্রিয়া অস্বাভাবিক এবং ব্যক্তিভেদে বিচিত্র হয়, তাহাই জিজ্ঞাসা।** অর্ধনিদ্রিত ব্যক্তির শয্যা নাড়িলে, কেন কেহ ভূমিকম্পের, কেহ বা পড়িয়া যাইবার, আবার কেহ বা পাতালে প্রবেশ করিবার স্বপ্ন দেখে? এই প্রশ্নের সদুত্তর দিতে গিয়া, উদ্দীপকবাদ অচল হইয়া পড়ে। **জেম্‌স্-এর মস্তিষ্ক-পথ-অবরোধ-বাদও** এই সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান করিতে পারে না। প্রশ্ন এই যে কি কারণে, কোনো ব্যক্তির একটি মস্তিষ্কপথ, আবার অপর ব্যক্তির আর একটি মস্তিষ্কপথ, অবরুদ্ধ থাকে।

(খ) হব্‌ণ্ড, জড্‌ল্ (Jodl) প্রভৃতি স্বপ্নে অনুষঙ্গসূত্রের অভাব, বিচারবুদ্ধির স্তিমিত ক্রিয়া, জ্ঞানের অভাব এবং অন্যান্য মানসক্রিয়ার মন্দীভূত অবস্থা প্রভৃতি নঞর্থক কারণগুলির উল্লেখ করিয়াই, স্বপ্নব্যাখ্যায় ক্ষান্ত হইয়াছেন, স্বরূপ ব্যাখ্যা করেন নাই। (গ) ভবিষ্যদর্থক প্রাচীন স্বপ্নব্যাখ্যাও অচল। প্রত্যেক স্বপ্নই ভাবী

অর্থ সূচনা (prophetic significance) করে। এই মত অযৌক্তিক, কারণ মনোবিদ্যা জ্যোতিষশাস্ত্র নয়। যান্ত্রিক কারণবাদ (causal determinism), অথবা পূর্ববর্তী ঘটনাই পরবর্তী ঘটনার কারণ, এই সূত্রই স্বপ্নব্যাখ্যার মূল ভিত্তি।

(২) ফ্রয়েডীয় মতে স্বপ্নের ব্যাখ্যা (Dream-interpretation)

ফ্রয়েড মনে করেন যে স্বপ্নের কারণ ব্যক্তিমনের নির্জ্ঞান **অবদমিত বাসনার চরিতার্থতা-প্রবণতা** (tendency towards wish-fulfilment)। তাঁহার মতে স্বপ্ন অবদমিত কামনার চরিতার্থতা ছাড়া কিছু নয়। এই কারণে ফ্রয়েডীয় স্বপ্নবাদকে **কামনাপরিপূরণ বাদ** (wish-fulfilment theory) বলা হয়। স্বপ্নের প্রেরক কামনাগুলি (motivating desire) প্রধানতঃ, যৌন (sexual) বা কামজ। শাস্তি বা শাসনের ভয়ে এই কামনাগুলি **অবদমিত** হয় এবং সংজ্ঞান মন ত্যাগ করিয়া আসংজ্ঞান এবং **নির্জ্ঞান মনে আশ্রয়** গ্রহণ করে।

কিন্তু অবদমিত কামনা নির্জ্ঞান অজ্ঞাতবাসে নির্বাসিত হইয়াও **নিষ্ক্রিয় থাকে না**। ইহারা সর্বদা সংজ্ঞান মনে আত্মপ্রকাশ করিয়া চরিতার্থতার উপায় অনুসন্ধান করে। জাগরণে উহাদের এই উদ্দেশ্য সফল হয় না। বিবেক বা অধিশাস্তা (super-ego), জাগরণে এই অশ্লীল কামনাগুলির পরিপূর্তি ব্যাহত করে।

অর্ধনিদ্রিত স্বপ্নাবস্থায় অধিশাস্তা, আচ্ছন্ন এবং শক্তিহীন হইয়া পড়ে। সতর্ক প্রহরী অধিশাস্তার অনবধানতার সুযোগ লইয়া, অর্ধনিদ্রার সুড়ঙ্গপথে অবদমিত কামনাগুলি সংজ্ঞানে আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করে। কিন্তু, পাছে বিবেক সজাগ হইয়া এই নিষিদ্ধ কামনাগুলিকে আবার নিরুদ্ধ করিয়া নির্জ্ঞান মনে নির্বাসিত করে, এই আশঙ্কায়, ইহারা **আত্মগোপনের নানা কৌশল** অবলম্বন করে এবং ভদ্রতা ও শালীনতার মুখোশ পরিয়া ছদ্ম বা বিকৃত বেশে সংজ্ঞানে প্রকাশিত হয়।

(ক) স্বপ্নের অস্ফুট ও ব্যক্ত রূপ

স্বপ্নের নির্জ্ঞানরূপকে বলে ইহার অস্ফুট বা অব্যক্ত উপাদান (latent content) এবং ইহার সংজ্ঞান মনে ব্যক্ত রূপকে বলে ব্যক্ত উপাদান (manifest content)। স্বপ্নের অস্ফুট বা নির্জ্ঞান রূপটি সংজ্ঞানে ব্যক্তরূপে প্রকাশিত হয় ছদ্ম বা বিকৃত বেশে। সুতরাং **স্বপ্ন অবদমিত নির্জ্ঞান ইচ্ছার, অথবা উহার অস্ফুট রূপের সংজ্ঞান, ছদ্ম বা বিকৃত** (disguised) **ব্যক্তরূপ**।

অস্ফুট রূপটি অবিকৃতভাবে ব্যক্ত হইতে পারে না, পাছে স্বপ্নপ্রহরী (dream-censor) অথবা অধিশাস্তা ইহাদিগকে চিনিয়া ফেলে এবং উহাদিগকে আবার অবদমিত করিয়া নির্জ্ঞান মনে নির্বাসিত করে। সুতরাং আসলে স্বপ্ন একটি **আপোষ বা সন্ধিমূলক সংগঠন** (compromise formation)। ইহা অবদমিত ইচ্ছা এবং অধিশাস্তা এই দুইটি পরস্পরবিরোধী শক্তির মধ্যে একটি আপোষবিশেষ।

(খ) স্বপ্ন-কৃতি (Dream-work)

অবদমিত নির্জ্ঞান ইচ্ছা বা স্বপ্নের অস্ফুটরূপ কয়েকটি কৌশল অবলম্বন করিয়া ছদ্মবেশে ব্যক্ত স্বপ্নরূপে প্রকাশিত হয়। স্বপ্নকৃতির কৌশল (mechanism) প্রধানতঃ চার প্রকার :—

(অ) সংক্ষেপণ (Condensation)

স্বপ্নকৃতির প্রথম কৌশল সংক্ষেপণ। সাধারণতঃ সংক্ষেপণ বলিতে অস্ফুট স্বপ্ন উপাদানের সংক্ষিপ্ত রূপান্তর বুঝায়। নির্জ্ঞান মন স্বপ্নকৃতির এই কৌশলটি অবলম্বন করে দুই বা ততোধিক অস্ফুট স্বপ্ন-উপাদানকে আংশিকভাবে সংমিশ্রিত করিয়া। বিভিন্ন স্বপ্ন-উপাদানের সংমিশ্রণ-ফলে ব্যক্ত স্বপ্ন-উপাদান বিকৃত হয়। যেমন 'ক্রিস্ট্‌মাস্ হোলিডেজ্' এবং 'অ্যাল্‌কোহল' শব্দগুলির আংশিক সংমিশ্রণের ফলে উৎপন্ন হয় অদ্ভুত 'অ্যালকোহোলিডেজ্' শব্দটি। স্বপ্নে দেখা গেল, একটি দাঁড়িওয়ালা বেঁটে, বৃদ্ধ, খোঁড়া লোক। কিন্তু আসলে এই একটি লোক হয়ত চারিটি লোকের বিশিষ্ট লক্ষণগুলির সংক্ষেপিত রূপ। পরিচিত বিভিন্ন সদৃশ অংশগুলিকে একত্র করিয়া একটি যৌগিক আকৃতির (composite figure) স্বপ্ন দৈনন্দিন জীবনে প্রায়ই ঘটিতে দেখা যায়। এই যৌগিক আকৃতির ব্যক্তিটি হয়ত রামের পোশাক, যদুর চেহারা, মধুর পেশা, অর্থাৎ তিন ব্যক্তির তিনটি অস্ফুট স্বপ্ন-উপাদান, সংক্ষেপিত করিয়া হরির ব্যক্ত স্বপ্ন উপাদানরূপে প্রকাশিত হইল।

(আ) অভিক্রান্তি (Displacement)

স্বপ্নকৃতির দ্বিতীয় কৌশল অভিক্রান্তি। অভিক্রান্তি বলিতে ব্যক্তস্বপ্নরূপে অব্যক্ত স্বপ্ন-উপাদানের স্থানচ্যুতি বা স্থান পরিবর্তন বুঝায়। যাহাতে ব্যক্তস্বপ্নরূপে অব্যক্ত স্বপ্ন-ইচ্ছাগুলি ধরা না যায়, সেই উদ্দেশ্যে প্রসঙ্গনির্দেশের (allusion) মত, ঐ ইচ্ছার সহিত অসম্পর্কিত, কোনো দূরবর্তী অংশ উহার স্থান গ্রহণ করিতে পারে।

আবার অব্যক্ত স্বপ্ন-উপাদানে যাহা মুখ্য তাহাকে গৌণ এবং যাহা গৌণ তাহাকে মুখ্য করিয়া অর্থাৎ বিভিন্ন অংশের উপর ভুল বা মিথ্যা জোর (accent) দিয়াও ব্যক্ত স্বপ্নরূপ প্রকাশিত হইতে পারে। যেমন স্বপ্নে হিংস্র ব্যাঘ্রের মত কোনো ভীতিজনক পশু দেখিয়া ভয় হইল না, কিন্তু ভয় হইল একটি নিরীহ মেষ-শাবক দেখিয়া। ব্যাঘ্রভীতিই স্বাভাবিক, কিন্তু অভিক্রান্তির ফলে ইহা মেষের উপর আরোপিত হইয়াছে।

স্বপ্ন-ব্যাখ্যার (Dream-interpretation) পর অভিক্রান্তি ব্যর্থ পরিহাস বা কষ্ট-কল্পনা বলিয়া মনে হয়। ফ্রয়েড্ একটি উদাহরণ দিয়া এই ব্যাপারটি বুঝাইয়াছেন। কোনো গ্রাম্য কর্মকার একটি খুন করিয়াছিল। আদালত কর্মকারকে দোষী সাব্যস্ত করিল। ঐ গ্রামে সে-ই একমাত্র কর্মকার, সুতরাং সে অপরিহার্য। কিন্তু যেহেতু ঐ গ্রামে তিনজন দর্জি বাস করিতেছিল, দোষী কর্মকারের স্থানে একটি নিরীহ দর্জিরই ফাঁসি হইল।

(ই) রূপান্তর (Transformation)

স্বপ্নপ্রকৃতির তৃতীয় কৌশল রূপান্তর। ফ্রয়েড্ এই রূপান্তরের আর একটি নাম দিয়াছেন **নাটন** (Dramatisation)। একটি উপন্যাসবর্ণিত ঘটনাকে দৃশ্যরূপে দেখাইতে হইলে, নাটকাকারে রূপান্তরিত করিতে হয়। অব্যক্ত অংশের ব্যক্ত দৃশ্যে রূপান্তরিত হইবার প্রক্রিয়াই নাটন। যেমন, 'কলেজের ছুটি হইলে কার্সিয়ং যাইব—ভাবী ঘটনার এই ইচ্ছাটি স্বপ্নে—কলেজের ছুটি হইল, দার্জিলিং মেলে উঠিলাম, ট্রেন ছাড়িয়া দিল, এইরূপ চিত্রাবলীর ভিতর দিয়া প্রকাশ পায়।"[১]

(ঈ) প্রতীকতা (Symbolism)

স্বপ্নকৃতির চতুর্থ কৌশল প্রতীকতা। অব্যক্ত অংশের উপাদানগুলি আত্মগোপনের ছলে প্রতীক সাহায্যে ব্যক্ত অংশে প্রকাশিত হয়। "সর্বদেশেই সর্বসময়েই একটি প্রতীক একই বস্তুর নির্দেশ করিয়া থাকে। কাজেই প্রতীককে সর্বজনীন বলিয়া ধরিয়া লইলে ভুল করা হয় না। যেমন সাপ পুংলিঙ্গের, বাক্স জননেন্দ্রিয়ের, রাজা পিতার, রাণী মাতার, গৃহ দেহের প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হয়।"[২]

---

১ ডঃ সুহৃৎচন্দ্র মিত্র—মনঃসমীক্ষণ—পৃঃ ৬৭
২ ঐ —পৃঃ ৭৩

ফ্রয়েড্ বলিয়াছেন, প্রতীকতাই সম্ভবতঃ স্বপ্নবাদের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অংশ। তাঁহার মতে স্বপ্নে প্রতীকরূপে প্রকাশিত বস্তুগুলি অসংখ্য নয়—ইহারা প্রধানতঃ মানুষের দেহ, পিতামাতা, ভাইবোন, মৃত্যু এবং নগ্নতা। সার্নার-এর (Scherner) মতে গৃহ মনুষ্যদেহের সাধারণ প্রতীক। শিশু ও ভাই-বোনের প্রতীক ক্ষুদ্র জানোয়ার, জন্মের প্রতীক জল, মৃত্যুর ভ্রমণ, নগ্নতার পোশাক-পরিচ্ছদ।

অনুযোজনা (Secondary Elaboration)

স্বপ্নকৃতির আরও একটি বিকৃতি-কৌশল অনুযোজনা। এই কৌশলটি আসলে স্বপ্নকৃতির কৌশল নয়। জাগরণের পর স্বপ্ন বর্ণনা করিতে গিয়া, স্বপ্নের সহিত কিছু কিছু মনগড়া উপাদান যুক্ত করিয়া উহাকে সুসংবদ্ধ রূপ দান করিবার, একটি কৌশল অবলম্বিত হয়। এই কৌশলই অনুযোজনা। "অন্যের নিকট বলিবার সময় স্বপ্নবৃত্তান্তের অনেক পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। কোনো দৃষ্ট অংশ বাদ পড়িয়া কোনো নূতন অদৃষ্ট অংশ হয়ত স্বপ্নবর্ণনায় জুড়িয়া যায়। জ্ঞাতসারেই হউক, অজ্ঞাতসারেই হউক, বর্ণনা করিবার সময় স্বপ্নের এই যে পরিবর্তন হয়, মনঃসমীক্ষকেরা ইহার নাম দিয়াছেন অনুযোজনা।"[১]

১০। ফ্রয়েডীয় স্বপ্নমতের সমালোচনা

ফ্রয়েড্-এর স্বপ্নমতবাদকে সাধারণত **ইচ্ছা-পূরণ মতবাদ** (Wish fulfilment theory) বলা হইয়া থাকে। জাগ্রৎ-জীবনের অশ্লীল কামনাগুলি অবদমিত হইয়া নির্জ্ঞান মনে নির্বাসিত হয়। নিষিদ্ধ বাসনাগুলি অর্ধনিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্নের আকারে সংজ্ঞান মনে আত্মপ্রকাশ করে।

(২) এই বাসনাগুলি কামজ বা যৌন। সুতরাং স্বপ্ন কামজ বাসনার চরিতার্থতা। কিন্তু স্বপ্ন ইচ্ছা-পূরণ হইলেও, **সকল স্বপ্নই যে যৌন বা কামজ ইচ্ছার পূরণ, এমন নয়।** ফ্রয়েড্ বলিয়াছেন, "সকল স্বপ্নব্যাখ্যাই যৌন এই উক্তিটির বিরুদ্ধে স্বপ্ন-বিষয়ক গ্রন্থে বহু বাক্‌বিতণ্ডা চলিয়াছে। কিন্তু আমার স্বপ্নব্যাখ্যা গ্রন্থের সহিত ইহার কোনো সম্পর্ক নাই ইহা এই গ্রন্থের আটটি সংস্করণের কোথায়ও পাওয়া যাইবে না, বরং ইহার বক্তব্যের সমহিত এই উক্তির বিরোধই

১ ডঃ সুহৃৎচন্দ্র মিত্র—মঃসমীক্ষণ—পৃঃ ৬৭

রহিয়াছে।"১ ফ্রয়েডীয় মতে সঙ্কীর্ণার্থক কামজ কামনা ছাড়া অন্যান্য কামনাও স্বপ্নে চরিতার্থ হইতে পারে, যেমন ক্ষুধা তৃষ্ণা, স্বাচ্ছন্দ্য প্রভৃতি।

(৩) স্বপ্ন অনৈচ্ছিক বা নিশ্চেষ্ট কল্পনা বলিয়া মনে হইলেও, ইহা ঐচ্ছিকও বটে। স্বপ্ন **অনৈচ্ছিক** এই অর্থে, ইহাকে কোনো সংজ্ঞান ইচ্ছা নিয়ন্ত্রণ করে না। কিন্তু ইহা ঐচ্ছিক বা সচেষ্ট এই অর্থে যে, কতগুলি নির্জ্ঞান ইচ্ছাই স্বপ্নের ভিতর দিয়া পূর্ণ হইতে চায়।

(৪) **স্বপ্ন অকারণ বা কার্যকারণ** সূত্রের ব্যতিক্রম নয়। স্বপ্নের কারণ রহিয়াছে। ইহার কারণ অবদমিত নির্জ্ঞান ইচ্ছা। স্বপ্নে কোনো উদ্দেশ্য আরোপ করা অসঙ্গত। ইহা কোনো ভবিষ্যৎ লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য ঘটে না, কিন্তু ঘটে অতীতে অবদমিত নির্জ্ঞান ইচ্ছার দ্বারা।

(৫) স্বপ্নের প্রতিরূপ অসংলগ্ন এবং খাপছাড়া বলিয়া মনে লইতে পারে। আসলে উহারা সুশৃঙ্খল এবং অনুষঙ্গ-সূত্রে আবদ্ধ। অনুষঙ্গ-সূত্রগুলি বাহির করিতে হইলে, **অবাধ ভাবানুষঙ্গ** পদ্ধতির সাহায্যে **স্বপ্ন-বিশ্লেষণ** করিতে হয়। **স্বপ্ন-বিশ্লেষণ** (Dream analysis) বা স্বপ্নব্যাখ্যা (Dream interpretation) বলিতে বুঝায় স্বপ্নের ব্যক্ত উপাদানকে অব্যক্ত উপাদানে অনূদিত অথবা পরিণত করা। কি কি কৌশলে অব্যক্ত উপাদান ব্যক্ত উপাদানে পরিণত হইয়াছে, তাহার আবিষ্কারই স্বপ্ন-বিশ্লেষণের লক্ষ্য। স্বপ্ন-বিশ্লেষণে ইহার ব্যক্তরূপের ছদ্ম আবরণ খসিয়া পড়ে এবং আসল অব্যক্ত রূপটি প্রকাশিত হয়।

(৬) স্বাভাবিক জীবনের নিয়মিত ছন্দে স্বপ্ন একপ্রকার যতিভঙ্গ বা ছন্দপতন বলিয়া মনে হয়। সুতরাং জীবনের স্বাভাবিকতা সংরক্ষণে যে স্বপ্নের কোনো মূল্য আছে, তাহা মনে হয় না।

(ক) কিন্তু **স্বপ্ন শুধু স্বাভাবিক জীবনের নিয়মভঙ্গ নয়। জীবনের স্বাভাবিকতা সংরক্ষণে স্বপ্নের মূল্য অপরিসীম।** এই কারণে মনোরোগ চিকিৎসায় ফ্রয়েড স্বপ্নবিশ্লেষণকে শীর্ষস্থান দিয়াছেন। মনোরোগের মূল কারণ নিহিত থাকে নির্জ্ঞান মনের অবদমিত ইচ্ছায়। অবদমিত ইচ্ছাগুলি বিকৃত বা ছদ্মভাবে স্বপ্নে আত্মপ্রকাশ করে। সুতরাং স্বপ্ন-বিশ্লেষণ করিলেই মনোরোগের কারণ নির্ণয় (Diagnosis) সহজ হইয়া পড়ে। এই অবদমিত নির্জ্ঞান ইচ্ছাগুলিকে সংজ্ঞান মনে টানিয়া আনিয়া, উহাদিগকে বাস্তব জীবনের সহিত উপযোজিত করাই রোগনিবারণের উপায়।

১ ফ্রয়েড্—ইন্টারপ্রিটেশন্ অফ ড্রিম্স্—পৃঃ ৩৭৩

(খ) স্বভাবী ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বুঝিবার পক্ষেও স্বপ্ন পথপ্রদর্শক। ব্যক্তি কিরূপ বুঝা যায়, সে কি বা কেমন স্বপ্ন দেখে, তাহা বুঝিলে। (গ) বিরেচন বা নিঃসারণ (Purgation, Catharsis) হিসাবেও স্বপ্ন মূল্যবান অংশ গ্রহণ করে। স্বপ্ন মনের সঞ্চিত আবর্জনাস্তূপ সংজ্ঞানে ঠেলিয়া দিয়া উহার ভার লাঘব এবং নিদ্রার সহায়তা করে। স্বপ্ন নিদ্রার প্রতিবন্ধক, এই সাধারণ ধারণা ভ্রান্ত। ফ্রয়েড্ স্বপ্নকে "নিদ্রার অভিভাবক" (guardian of sleep) বলিয়াছেন। মনের যে সকল সঞ্চিত ইচ্ছা নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটাইতে পারে, সেইগুলি স্বপ্নে মনের অন্তস্তল হইতে উহার উপরিতলে ভাসিয়া ওঠে, এবং মনের ভার লাঘব করিয়া নিদ্রায় সহায়তা করে।

(৭) অবদমিত নির্জ্ঞান ইচ্ছার বিকৃত পূরণই স্বপ্ন। কিন্তু এই স্বপ্নলক্ষণ পরিণত বয়স্কদের স্বপ্নেই প্রযোজ্য। পরিণতবয়স্কদের অবদমিত ইচ্ছা তাহাদের অজ্ঞাতসারে নির্জ্ঞান মনে থাকে এবং ছদ্মবেশে বিকৃতভাবে সংজ্ঞান মনে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু **শিশুর স্বপ্ন** এই লক্ষণটির ব্যতিক্রম। শিশুর স্বপ্নও পরিণত ব্যক্তির স্বপ্নেরই মত ইচ্ছার পরিপূরক, সন্দেহ নাই। কিন্তু শিশুর অধিশাস্তা বা বিবেক এখনও বিকাশ লাভ করে নাই। সুতরাং তাহার ন্যায়অন্যায় বোধ এখনও জন্মায় নাই। কাজেই, অন্ধ ইচ্ছা এবং সেই ইচ্ছাকে নিরুদ্ধ বা অবদমিত করিবার পরস্পরবিরুদ্ধ শক্তি দুইটি তাহার মনে এখনও প্রবল শক্তিতে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে না।

শিশুর জাগরণে অপূর্ণ বাসনা অবদমিত হইয়া নির্জ্ঞানে আশ্রয় লয় না। ইহা সংজ্ঞান মন ত্যাগ করিয়া উহার ঠিক নিম্নতলে, অর্থাৎ আসংজ্ঞান (preconscious) মনের প্রতীক্ষাগারে (ante-chambr) অবসর লয়। এই অপূর্ণ বাসনা অবিকৃতভাবে স্বপ্নে পরিপূর্তি বা চরিতার্থতা লাভ করে। শিশু হয়ত চকোলেটের জন্য কাঁদিতে কাঁদিতে ঘুমাইয়া পড়িল এবং স্বপ্নে চকোলেট চুষিবার মুখভঙ্গী করিতে লাগিল। এই ক্ষেত্রে জাগরণে শিশুর চকোলেট খাইবার ইচ্ছা অবদমিত হয় নাই, অথবা নির্জ্ঞান মনে নির্বাসিত হয় নাই। এস্থলে শিশুর অনবদমিত এবং ব্যক্ত বাসনাই স্বপ্নে পূর্ণ হইয়াছে। আবার শিশুর কোনো কোনো বাসনা হয়ত শাসনের বা শাস্তির ভয়ে নিরুদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু নির্জ্ঞানের গভীর স্তরে নির্বাসিত হইয়া অব্যক্ত হয় নাই। এই নিরুদ্ধ, অথচ ব্যক্ত বাসনাটিও শিশুর স্বপ্নে পূর্ণতা বা চরিতার্থতা লাভ করিতে পারে।

১১। স্বপ্ন-প্রতিরূপ (Dream-image)

স্বপ্ন-প্রতিরূপের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখযোগ্য। (১) ইহার **স্পষ্টতা ও বিশদতার** প্রধান কারণ মনোযোগ। স্বপ্নে বাস্তব জগতের সংস্রব না থাকায়, এই প্রতিরূপগুলির উপর মনোযোগ নিঃশেষে কেন্দ্রীভূত হয়। ফলে, স্বপ্নের প্রতিরূপ জাগরণের মত বাস্তব বলিয়া মনে হয়। (২) স্বপ্নপ্রতিরূপ **জাগরণে অস্পষ্ট এবং অসংবদ্ধ** বলিয়া মনে হয়। স্বপ্নকৃতি অথবা অব্যক্ত উপাদানের ব্যক্তরূপে পরিণতির কৌশলই ইহার কারণ। (৩) জাগরণে প্রায়ই স্বপ্ন-প্রতিরূপের **বিস্মৃতি** ঘটে। এই প্রসঙ্গেও উপরোক্ত কারণটি উল্লিখিত হইতে পারে। (৪) স্বপ্ন-প্রতিরূপ **প্রত্যক্ষ ও স্বতঃসিদ্ধ** বলিয়া মনে হয়। কারণ পরে বর্ণিত হইতেছে। (৫) স্বপ্ন-প্রতিরূপ **দার্শন-প্রতিরূপের আকারে দৃষ্ট হয়।** কারণ পরে আলোচ্য। (৬) স্বপ্ন-প্রতিরূপ **বর্তমান** বলিয়া জ্ঞাত হয়। অতীত বা ভবিষ্যৎ ঘটনার স্বপ্ন প্রতিরূপও বর্তমান বলিয়া বোধ হয়। (৭) ইহা যেন **বহির্জগতে বিক্ষিপ্ত** বলিয়া ভাসমান হয়। (৮) ইহা সাধারণ অর্থে **অনৈচ্ছিক**। (৯) স্বপ্ন প্রতিরূপ নানা **উদ্ভট** এবং আজগুবি আকারে সংমিশ্রিত হয়। (১০) **বিচার এবং সমালোচনা শক্তি স্তিমিত** হওয়ায়, স্বপ্নের অদ্ভুতত্বকেও স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়।

স্বাপ্নিক দার্শন প্রতিরূপ

দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, চাপ প্রভৃতি সকল সংবেদনের প্রতিরূপই স্বপ্নের বিষয় হইতে পারে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে, দার্শন-প্রতিরূপ অবলম্বন করিয়াই স্বপ্ন ঘটিয়া থাকে। চলিত কথায়ও আমরা "স্বপ্ন দেখি" কিন্তু শুনি না, স্পর্শ করি না, আঘ্রাণ বা আস্বাদন করি না। স্বাপ্নিক বস্তুগুলি দৃশ্য চিত্রাবলীর মত একটির পর একটি ভাসিয়া ওঠে। স্বপ্নের দৈহিক অবস্থায় যদি তাপ উদ্দীপক ক্রিয়া করে, তবে আমরা হয়ত এট্না বা ভিসুভিয়স্ পর্বতে উঠিবার অথবা তুষারক্ষেত্রের উপর দিয়া চলিবার স্বপ্ন দেখি। যদি পেশীগুলি আড়ষ্ট হয়, তবে হয়ত দেখি যে, একদল কাঁকড়া আমাদিগকে চিম্‌টি কাটিতে আসিতেছে এবং উদ্দীপকটি যদি স্বাদ হয়, তবে হয়ত আমরা স্বপ্ন দেখি যে কোন সুখাদ্য বা অখাদ্য ভোজন করিতেছি। কিন্তু এই সব স্বপ্নে দার্শন-প্রতিরূপ প্রাধান্য লাভ করে।

স্বপ্ন-প্রতিরূপের দার্শন হইবার কারণ

স্বাপ্নিক প্রতিরূপ প্রধানতঃ **দার্শন** (visual) হইবার তিনটি কারণ দেখানো

যাইতে পারে। চক্ষু আলোকের, চোখের পাতার চাপের এবং রক্ত সঞ্চালনের সামান্য পরিবর্তনের প্রতি সংবেদনশীল। এই সংবেদনগুলি আবার মস্তিষ্কের ধূসর সংবেদনের দ্বারা বর্ধিত হয়। চক্ষুরিন্দ্রিয় এবং মস্তিষ্ক এই উভয়ের উত্তেজনীয়তাই দার্শন স্বপ্নের অনুকূল। (২) যে কারণে কল্পনা প্রধানতঃ দার্শন প্রতিরূপের আকারে ঘটে, সেই একই কারণে স্বপ্নও দার্শন প্রতিরূপের আকারে সংঘটিত হয়। (৩) সকল ইন্দ্রিয়ের মধ্যে চক্ষুই প্রধান, বেশী ব্যবহৃত এবং বাহ্য জগতের জ্ঞান আহরণে নির্ভরযোগ্য। এই কারণে মস্তিষ্কের দর্শনকেন্দ্র অন্যান্য কেন্দ্রগুলির সহিত সর্বাধিক সংযোগসূত্রে সম্বন্ধ এবং যে কোনো কেন্দ্র উত্তেজিত হইলেই দর্শনকেন্দ্র উত্তেজিত হয়।

স্বপ্নের সহিত উহার সত্যতা বা **স্বতঃসিদ্ধতাবোধ** অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত। স্বপ্নে দৃষ্ট বস্তুগুলি স্বতঃসিদ্ধভাবে প্রত্যক্ষ হইতেছে বলিয়া মনে হয়। স্বপ্নের স্বতঃসিদ্ধতা-বোধের দুইটি কারণ। (১) স্বপ্নদৃষ্ট ঘটনাগুলিকে পরীক্ষা বা সংশোধন করিবার কোন উপায় নাই। স্বপ্নে সত্যাসত্যের এমন কোনো বাস্তব মানদণ্ড নাই, যাহার সহিত না মিলিলে স্বপ্নকে মিথ্যা বলা যায়। (২) স্বাপ্নিক প্রতিরূপ অত্যন্ত স্পষ্ট এবং তীক্ষ্ণ। এই অবস্থায়, স্বপ্ন-প্রতিরূপ ছাড়া অপর বস্তুতে মনোযোগ থাকে না। মনোযোগ উহার বিষয়কে স্পষ্ট এবং বিশদ করিয়া তোলে। স্বাপ্নিক প্রতিরূপে মনোযোগ নিঃশেষে কেন্দ্রীভূত হওয়ায়, উহা বাস্তবতার স্বতঃসিদ্ধতা লইয়া ভাসমান হয়।

অনুশীলনী (Exercise)

1. Distinguish between memory and inagination. (Ans : p 94)

স্মৃতি এবং কল্পনার পার্থক্য নির্দেশ কর।

2. How is imagination constructed ? Point out the limits of imagination. (Ans : pp 94-95)

কিরূপে কল্পনা গঠিত হয় ? কল্পনার সীমা নির্দেশ কর।

3. Explain and illustrate the different kinds of imagination. (Ans : pp 96-97)

উদাহরণ সাহায্যে কল্পনার প্রকারভেদ ব্যাখ্যা কর।

4. What is hallucinatiou ? Distinguish between hallucination and dream. (Ans : pp 99-103)

অমূল ভ্রমপ্রত্যক্ষ কি? অমূল ভ্রমপ্রত্যক্ষ এবং স্বপ্নের পার্থক্য প্রদর্শন কর।

5. Write notes on (a) Phantasy, (b) Autistic' thinking and (c) Day-dream, (Ans : pp 100-101)

সংক্ষেপে আলোচনা কর : (ক) অবাধ কল্পনা, (খ) স্বয়ংসম্পূর্ণ চিন্তন, (গ) দিবা-স্বপ্ন।

6. Expound Freud's theory of Dream and criticise it.

(Ans : pp 105-111)

ফ্রয়েডীয় স্বপ্নমত ব্যাখ্যা কর এবং উহার সমালোচনা কর।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

চিন্তন (Thinking)

১। চিন্তন কাহাকে বলে

স্মৃতি, কল্পনা প্রভৃতি নানা মানস ক্রিয়ার অর্থে চিন্তন কথাটি ব্যবহৃত হয়। কাহারও নাম স্মরণ করিতে গিয়া, আমরা নামটি 'চিন্তা করিয়া দেখি'। আবার, কোনো নূতন পরিস্থিতিতে কি ভাবে চলিব, তাহাও আমরা 'চিন্তা করি'। এখানে প্রথমোক্ত চিন্তন ক্রিয়া স্মরণের এবং দ্বিতীয়টি কল্পনার নামান্তর। কিন্তু চিন্তণ কথাটি এইরূপ **সাধারণ অর্থে** প্রয়োগ করিলে, চিন্তন ক্রিয়ার মনোবৈজ্ঞানিক বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ণ হয়। চিন্তনের এমন বৈশিষ্ট্য আছে, যাহা স্মরণের বা কল্পনায় নাই। এই বৈশিষ্ট্যই চিন্তনের বিশেষ বা সঙ্কীর্ণ অর্থ।

এই **বিশেষ বা সঙ্কীর্ণ অর্থে** চিন্তন বলিতে কোনো সমস্যা সমাধানের চেষ্টায় ভাব বা ধারণাপ্রবাহ (train of ideas) বুঝায়। কোনো সমস্যার সম্মুখীন না হইলে, চিন্তনের প্রয়োজন হয় না। একটি বিষয় বুঝিবার বা কাজ করিবার কালে, বাধা উপস্থিত হইলেই, চিন্তনের উদ্ভব হয়। শরীর সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে চলিতেছে অথবা অঙ্কগুলি বেশ সহজে হইয়া যাইতেছে, এইরূপ গতানুগতিক অবস্থায়, কোনো সমস্যার সৃষ্টি না হওয়ায়, চিন্তন নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু হঠাৎ শরীর খারাপ হইলে চিন্তা হয়, কেন সাবধানে থাকা সত্ত্বেও শরীর খারাপ হইল। একটি অঙ্ক হঠাৎ আটকাইয়া গেলে চিন্তা হয়, কেন অঙ্কটি হইতেছে না, তবে কি এইটির জন্য অন্য নিয়ম জানা দরকার।

চিন্তন বলিতে আমরা বুঝিব জ্ঞাত সত্যের সাহায্যে কোনো নূতন সমস্যাকে বুঝিবার অথবা জানিবার জন্য ভাব বা ধারণাপ্রবাহ। অথবা যাহা জ্ঞাত রহিয়াছে তাহার সাহায্যে অজ্ঞাতকে জানিবার ক্রিয়াকে চিন্তন বলে। কিন্তু জ্ঞাত সত্যগুলি হইয়াছে অতীত সংবেদন, প্রত্যক্ষ, স্মরণ, কল্পনা প্রভৃতি ক্রিয়ার সাহায্যে। কাজেই, চিন্তন এই অপেক্ষাকৃত সরল অবগতিমূলক ক্রিয়াগুলির উপর নির্ভর করে। সংবেদন এবং প্রত্যক্ষ সাহায্যে চিন্তনের উপাদান (materials) অর্জিত হয়। সুতরাং ইহারা চিন্তনের অর্জনমূলক (acquisitive) দিক। আবার অর্জিত বা সংগৃহীত উপাদানগুলি স্মৃতিতে এবং কল্পনাতে সংরক্ষিত হয়। সুতরাং ইহারা

চিন্তনের সংরক্ষণমূলক (preservative) দিক। তৃতীয়তঃ, প্রত্যয় (concept) বা সামান্য ধারণা, অবধারণা (judgment) এবং যুক্তি (reasoning) প্রভৃতি উচ্চতর চিন্তনস্তরগুলি উহার সংগঠনমূলক (constructive) দিক।

বৃষ্টি দেখিয়া অনুমান করা হইল, নিশ্চয় মেঘ করিয়াছে। অতীত প্রত্যক্ষে বৃষ্টির সহিত মেঘের নিয়মিত সম্বন্ধ জানা আছে। এই জ্ঞাত সত্যের ভিত্তিতে অজ্ঞাত সত্যে উপনীত হওয়া গেল যে মেঘ করিয়াছে।

চিন্তন একটি জটিল প্রক্রিয়া এবং উহাকে বিশ্লেষণ করিলে সংবেদন, প্রত্যক্ষ, স্মরণ, কল্পনা প্রভৃতি সহজতর ক্রিয়াগুলির ফলও ইহার মধ্যে পাওয়া যায়। ব্যাপক অর্থে চিন্তন বলিতে বুঝায় মনের অবগতিমূলক বৃত্তিগুলি, যথা সংবেদন, প্রত্যক্ষ, স্মরণ, কল্পনা, প্রত্যয়, অবধারণা এবং যুক্তি। কিন্তু এই ব্যাপক অর্থে চিন্তনের বৈশিষ্ট্য থাকে না। চিন্তনের বৈশিষ্ট্য বুঝিতে হইলে বলিতে হয় যে ইহা প্রত্যয়, অবধারণ এবং যুক্তি, এই তিনটি অঙ্গ লইয়া গঠিত।

অথবা চিন্তনের অর্থ কোনো সমাধানে ভাব বা ধারণাপ্রবাহ, অথবা জ্ঞাত বিষয়ের আলোকে অজ্ঞাত বিষয়কে জানা। এই অর্থে চিন্তনের তিনটি অঙ্গ, যথা প্রত্যয়, অবধারণা এবং যুক্তি।

২। চিন্তনের বাহন (Tools of Thinking)

প্রত্যক্ষ ফল (percept)

অনুভূতি এবং ইচ্ছা প্রভৃতি মানসবৃত্তির মত চিন্তনও একটি সহজ এবং স্বাভাবিক ক্রিয়া। কিন্তু চিন্তন সম্ভব হয় কতগুলি বাহন বা উপায়ের সাহায্যে। চিন্তনের পশ্চাতে রহিয়াছে প্রত্যক্ষ-ফল। "পর্বতটিতে আগুন আছে, কারণ পর্বতটি হইতে ধূম বাহির হইতেছে এবং যেখানে ধূম আছে, সেখানেই আগুন আছে।" এই অনুমান বা চিন্তনটির মূলে ধূম এবং আগুনের প্রত্যক্ষ-ফল রহিয়াছে, কারণ যাহার ধূম এবং আগুন প্রত্যক্ষ হয় নাই, তাহার পক্ষে এইরূপ চিন্তন অসম্ভব। পর্বতে প্রত্যক্ষ ধূমের অবশ্যই আগুনের সহিত সম্বন্ধ আছে, কারণ ইহাদের নিয়ত সম্বন্ধের পূর্ব-প্রত্যক্ষ হইয়াছে।

প্রত্যয় (Concept)

প্রত্যক্ষফল চিন্তনের একটি বাহন বা উপায়। কিন্তু উপরের দৃষ্টান্তে পর্বতে প্রত্যক্ষ ধূম অতীতে প্রত্যক্ষ সকল ধূমের সমজাতীয়, এইরূপ জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

এইরূপ **একই জাতীয় সকল বিশেষ বস্তুর সাধারণ গুণগুলির ধারণাকে বলা হয় প্রত্যয়।** প্রত্যয়ের সাহায্য ছাড়া চিন্তন অসম্ভব। চিন্তন দুই বা ততোধিক প্রত্যয়ের সম্বন্ধ। উপরোক্ত উদাহরণের চিন্তনটি পর্বত, ধূম এবং আগুন এই তিনটি সামান্য ধারণা বা প্রত্যয়ের সম্বন্ধে গঠিত।

অবধারণা (Judgment)

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, প্রত্যক্ষ-ফলের মত প্রত্যয়ও চিন্তনের বাহন বা উপায়। আবার **প্রত্যয়ের সহিত প্রত্যয়ের সম্বন্ধকে বলে অবধারণা।** চিন্তন এক বা একাধিক অবধারণার সম্বন্ধে গঠিত হয়। যেমন উপরের উদাহরণের তিনটি অংশই অবধারণা। 'পর্বতে আগুন আছে,' কারণ 'পর্বতে ধূম আছে' এবং 'যেখানে ধূম আছে, সেখানে আগুন আছে'—এই তিনটি অবধাবণা লইয়া চিন্তনটি গঠিত।

প্রতীক (Symbol)

চিন্তনের মূল অবলম্বন হইল প্রতীক। **জ্ঞাত বস্তুর সাহায্যে অজ্ঞাত বস্তুকে অভিব্যঞ্জিত বা ইঙ্গিত করাই প্রতীকের কাজ।** যেমন ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকাটি ভারতীয় জাতীয়তার প্রতীক, অথবা সিংহ ইংরাজ-জাতির জাতীয় প্রতীক। তেমনই প্রত্যক্ষ ধূম অপ্রত্যক্ষ আগুনের প্রতীক। প্রত্যক্ষ ধূম একটি উপস্থিত বস্তু। ইহা অপ্রত্যক্ষ আগুনকে ইঙ্গিত করে।

ভাষা (Language)

আবার ভাষাও চিন্তনের একটি মস্ত বড় বাহন। ভাষার সাহায্য না লইয়া চিন্তন সম্ভব কিনা, তাহা একটি বিশেষ সমস্যা। চিন্তনের একটি অপরিহার্য উপায় এবং প্রকাশ হইল ভাষা। যে সকল চিন্তন ভাষায় প্রকাশ না করিয়া আমরা মনে মনে করি, তাহার সঙ্গে সঙ্গেও ভাষা-প্রতিরূপ (Verbal image) বা ভাষা-অভ্যাস (Language habit) কাজ করে।

ভাষা ও প্রতীক

ভাষা চিন্তনের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় প্রতীক অথবা চিহ্নের (sign) কাজ করে।

কোনো ব্যক্তিকে 'রাম' বলিয়া অভিহিত করিবার অর্থ ঐ নাম সাহায্যে উহাকে অপরাপর ব্যক্তি ও বস্তু হইতে পৃথকভাবে চিহ্নিত করা। ঐ ব্যক্তিকে 'রাম' বলিয়া ডাকিবার অর্থ, ঐ ব্যক্তি সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ চিন্তা বা ভাবকে ঐ ব্যক্তির এবং অপরাপর ব্যক্তির নিকট প্রকাশ করা, অথবা আমাদের ব্যক্তিগত চিন্তার আদান-প্রদান করা।

৩। প্রত্যক্ষ-ফল প্রতিরূপ এবং প্রত্যয়

প্রত্যক্ষ-ফল ও প্রত্যয়ের পার্থক্য

(১) প্রত্যক্ষ-ফল একটি বিশেষ বস্তু বা ব্যক্তিতে সীমাবদ্ধ, কিন্তু প্রত্যয় বা সামান্য ধারণা শুধু বিশেষ বস্তু বা ব্যক্তিতেই সীমাবদ্ধ নয়, বস্তুতঃ ইহা প্রত্যেক সমজাতীয় বস্তু বা ব্যক্তিতে একই অর্থে প্রযোজ্য। পর্বতে যে ধূম দেখিতেছি সেই প্রত্যক্ষের ফল ঐ ধূমেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু ধূম সম্বন্ধে প্রত্যয় বা সামান্যধারণা শুধু ঐ ধূমেই সীমাবদ্ধ নয়, পক্ষান্তরে ধূমজাতীয় সকল বস্তুতেই প্রযোজ্য। (২) উপরের তুলনা হইতে বুঝা যাইতেছে যে প্রত্যক্ষ-ফল শুধু বর্তমানে সীমাবদ্ধ, কিন্তু প্রত্যয় বা সামান্য-ধারণা ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান, সকল কালেই প্রসারিত। ধূম-প্রত্যক্ষ শুধু বর্তমান ধূমেরই প্রত্যক্ষ। কিন্তু ধূমের সামান্য ধারণা বা প্রত্যয় যে ধূম বর্তমানে প্রত্যক্ষ হইতেছে, অতীতে হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে হইবে, অর্থাৎ সকল ধূমের বা ধূম-সামান্যের প্রত্যয়। (৩) আবার প্রত্যক্ষফল স্থূল বা মূর্ত (concrete)। পক্ষান্তরে প্রত্যয় অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম এবং অমূর্ত (abstract)। প্রত্যক্ষ ধূমের রূপগুণ আছে। ইহা যেমন বস্তু বুঝায়, তেমন ঐ বস্তুর গুণও বুঝায়। পক্ষান্তরে, ধূম প্রত্যয় কতগুলি সাধারণ গুণের ধারণা, ইহার মূর্তি নাই। (৪) প্রত্যক্ষ-ফল একটি সমগ্র বস্তুকে বুঝায়, কিন্তু প্রত্যয় বস্তু হইতে বিচ্ছিন্ন সাধারণ গুণাবলীকে বুঝায়। ধূমপ্রত্যক্ষে অল্পবিস্তরভাবে ধূমের সকল গুণগুলি-সহ ধূম জ্ঞাত হয়। কিন্তু ধূম প্রত্যয়ে শুধু ইহার যে সকল গুণ ধূমে আছে, তাহারই জ্ঞান হইয়া থাকে।

প্রত্যক্ষ, প্রতিরূপ এবং প্রত্যয়

প্রত্যক্ষ যেমন ব্যক্তিতে সীমাবদ্ধ, প্রতিরূপও তেমন **ব্যক্তিতে সীমাবদ্ধ**। ধূমের প্রতিরূপ, প্রত্যক্ষ ধূমেরই প্রতিরূপ, অন্য ধূমের নয়। কিন্তু প্রত্যক্ষ শুধু **উপস্থিত** বস্তুর জ্ঞান। পক্ষান্তরে, প্রতিরূপ **অনুপস্থিত** অথবা পুনরুপস্থিত বস্তুর জ্ঞান। আবার, প্রত্যক্ষ বর্তমান বস্তুর জ্ঞান, কিন্তু প্রতিরূপ অতীত-প্রত্যক্ষ বস্তুর জ্ঞান।

প্রত্যক্ষ উহার বস্তুর বর্তমানতা বুঝায়, কিন্তু প্রতিরূপ বুঝায় যে উহার বস্তু অতীত বা অবর্তমান।

কিন্তু প্রত্যক্ষ এবং প্রতিরূপ যেমন ব্যক্তিতে সীমাবদ্ধ, প্রত্যয় তেমন নয়। ধূমের প্রত্যক্ষ বর্তমানে এবং প্রতিরূপ অতীতে জ্ঞাত ধূমে সীমাবদ্ধ। পক্ষান্তরে ধূমের প্রত্যয় **বর্তমান, অতীত এবং ভবিষ্যত,** সকল ধূমেই প্রযোজ্য। আবার প্রত্যক্ষ বস্তুর উপস্থিতি (presentation) এবং প্রতিরূপ উহার **পুনরুপস্থিতি** (representation) বুঝায়, কিন্তু প্রত্যয় উহার **পুনঃপুনরুপস্থিতি** (re-representation) বুঝায়। প্রত্যক্ষ ধূম বর্তমানে উপস্থিত, প্রতিরূপের ধূম অতীতে উপস্থিত এবং বর্তমানে পুনরুপস্থিত ধূম প্রতিরূপের মধ্য দিয়া পুনঃপুনরুপস্থিত।

অন্য দিক দিয়া দেখিলে, প্রতিরূপ প্রত্যক্ষ এবং প্রত্যয়ের **মধ্যবর্তী** একটি মানসবৃত্তি। **স্থূলতা** এবং **সূক্ষ্মতার** দিক দিয়াও এই সম্বন্ধ সত্য। প্রত্যক্ষ স্থূল অথবা মূর্ত। প্রতিরূপ অপেক্ষাকৃত কম স্থূল বা মূর্ত এবং প্রত্যয় সর্বাপেক্ষা কম স্থূল বা মূর্ত।

সামান্য এবং যৌগিক প্রতিরূপ (Generic and Composite Image)[১]

প্রতিরূপ বিশেষ ব্যক্তি বা বস্তুতে সীমাবদ্ধ এবং প্রত্যয় সমজাতীয় সকল ব্যক্তি বা বস্তুতে সাধারণভাবে প্রযোজ্য। অর্থাৎ প্রতিরূপের সাধারণতা নাই, যেমন প্রত্যয়ের আছে। কিন্তু কোনো কোনো মনোবিদ দেখাইয়াছেন যে বিশেষ বস্তু বা ব্যক্তিসূচক প্রতিরূপ এবং সমজাতীয় সকল বস্তু বা ব্যক্তিসূচক প্রত্যয়ের মধ্যবর্তী একপ্রকার প্রতিরূপ আছে যাহা একাধিক বস্তু বা ব্যক্তির ধর্ম সূচিত করে। এই প্রতিরূপকে বলা হইয়াছে **সামান্য প্রতিরূপ**।

সামান্য প্রতিরূপের সদৃশ আর এক প্রকার প্রতিরূপকে বলা হয় **যৌগিক প্রতিরূপ**। যৌগিক প্রতিরূপ গঠিত হয় কতগুলি সমজাতীয় বা সদৃশ বস্তুর প্রত্যক্ষের ভিত্তিতে। ইহাতে প্রত্যক্ষ বস্তুগুলির পার্থক্য বাদ পড়িয়া যায় এবং উহাদের সাদৃশ্য সংরক্ষিত হয় প্রতিরূপের আকারে। কোনো হাসপাতালের রোগীদের সমষ্টিগত চেহারা কিরূপ তাহা যৌগিক চিত্রে ধরা পড়ে, রোগীদের চেহারার পার্থক্য বাদ দিয়া এবং সাদৃশ্য সংরক্ষণ করিয়া। অনুরূপভাবে সামান্য প্রতিরূপে একই জাতীয় বিভিন্ন বস্তুর পার্থক্য বাদ পড়িয়া উহাদের সাদৃশ্য থাকিয়া যায়। সামান্য প্রতিরূপ অনেকটা নক্সার মত, কারণ ইহা এক জাতীয় যে কোন বস্তুকে বুঝাইতে পারে। একজাতীয়

১। এই খণ্ডের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

একাধিক বস্তুর পুনঃপুনঃ প্রত্যক্ষের ফলে বস্তুগুলির সাদৃশ্য মনের উপর দাগ কাটিতে থাকে, যাহার ফলে উহাদের পার্থক্যগুলি বাদ পড়িয়া সাদৃশ্যের সামান্য প্রতিরূপ সৃষ্ট হয়।

কিন্তু সামান্য প্রতিরূপ প্রত্যয়ের মত সামান্য বা সাধারণ মনে হইলেও, তাহা নয়। প্রত্যয় জ্ঞাত বা অজ্ঞাত সকল সমজাতীয় বস্তুরই সাধারণ ধারণা। কিন্তু সামান্য প্রতিরূপ শুধু জ্ঞাত সমজাতীয় বস্তুর সাধারণ ধারণা। অর্থাৎ, সামান্য প্রতিরূপে জ্ঞাত হইতে অজ্ঞাত বস্তুতে জ্ঞানের প্রসারণ নাই, কিন্তু প্রত্যয়-জ্ঞানে এইরূপ প্রসারণ রহিয়াছে।

৪। প্রত্যয় গঠন
(Formation of the Concept)

প্রত্যয় বা সামান্য ধারণা সাধারণতঃ স্বাভাবিক নিয়মেই ঘটিয়া থাকে। ইহা আমাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর না করিয়াই গঠিত হয়।

প্রত্যয়ের গঠন-প্রণালী বিশ্লেষণ করিলেই, উহার কয়েকটি স্তর বা অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। (১) **পর্যবেক্ষণ** (observation)—যেমন, "মানুষ" এই সামান্য ধারণাটির মূলে রহিয়াছে রাম, শ্যাম, যদু প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির পর্যবেক্ষণ। (২) **বিশ্লেষণ** (analysis)—আমরা পর্যবেক্ষিত ব্যক্তি বা বস্তুর গুণাবলী বিশ্লেষণ করিয়া উহাদের বুঝিয়া থাকি। যেমন, রামের ক, খ, জ, ব, শ, শ্যামের গ, জ, ত, প, ব এবং যদুর ঘ, চ, জ, ড, ব গুণগুলি আছে। (৩) **তুলনা** (comparison)—আমরা রাম, শ্যাম এবং যদুর পর্যবেক্ষিত গুণগুলিকে তুলনা করিয়া দেখি কোন্‌গুলি উহাদের সাধারণ গুণ। এই স্থলে দেখা যায় যে 'জ' জীববৃত্তি 'ব' বা বুদ্ধিবৃত্তি পর্যবেক্ষিত ব্যক্তিগণের সাধারণ গুণ। (৪) **বিমূর্তকরণ** (abstraction)—আমরা জীববৃত্তি এবং বুদ্ধিবৃত্তি, এই সাধারণ গুণ দুইটিকে অন্যান্য পরিবর্তনশীল গুণগুলি হইতে বিচ্ছিন্ন বা পৃথক করিয়া একদিকে রাখি বা একত্র করি। (৫) **সামান্যীকরণ** (generalisation)—এই সাধারণ গুণগুলিকে শুধু পর্যবেক্ষিত রাম, শ্যাম এবং যদুতে সীমাবদ্ধ না রাখিয়া উহাদের সমজাতীয় সকল মানুষে প্রয়োগ করি। অর্থাৎ আমরা এই সামান্য বচনে উপস্থিত হই যে জীববৃত্তি এবং বুদ্ধিবৃত্তি শুধু এই তিন জনেরই সাধারণ গুণ নয়, কিন্তু উহাদের সমজাতীয় সকল মানুষেরই সাধারণ গুণ। (৬) **নামকরণ** (naming)—জীববৃত্তি এবং বুদ্ধিবৃত্তির সামান্য ধারণা বা প্রত্যয়টির "মানুষ" বা "মনুষ্যত্ব" এই নামকরণ করি।

উপরোক্ত উপায়ে, "মানুষ" বা "মনুষ্যত্ব" এই প্রত্যয় বা সামান্য ধারণাটি গঠিত হইয়া থাকে। অনিচ্ছাকৃত অথবা স্বতঃক্রিয় চিন্তনেও এই স্তরগুলি স্বাভাবিক নিয়মে অতিক্রম করিতে হয়। কিন্তু এইরূপ চিন্তনে, যেমন শিশুর চিন্তনে, ইহাদের সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকে না। কিন্তু অপেক্ষাকৃত উচ্চস্তরের চিন্তনে—যেমন ন্যায়, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতিতে—এই স্তরগুলি ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পন্ন এবং স্পষ্টভাবে জ্ঞাত হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া, প্রথমোক্ত মনোবৈজ্ঞানিক প্রত্যয় জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়। কিন্তু ন্যায়, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতির প্রত্যয় সাধারণতঃ সুনির্দিষ্ট এবং অপরিবর্তিত থাকে।

৫। ভাষা, সঙ্কেত, প্রতীক ও নক্‌সা

ভাষা

ভাষা চিন্তনের বাহন, অর্থাৎ ভাষার সাহায্যেই চিন্তন প্রকাশিত হয়। ভাষা যে চিন্তন-প্রকাশের একটি মস্ত বড় বাহন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভাষাই এক ব্যক্তিমনের সহিত অপর ব্যক্তিমনের সম্বন্ধসূত্র। রামের মনোভাব জানিতে হইলে, তাহাকে উহা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে হয়। তাহা হইলে, মনোভাব বা চিন্তন জানিবার বাহন হইল ভাষা। শুধু **কথিত** ভাষায়ই (articulate speech) যে চিন্তন প্রকাশিত হয়, তাহা নয়। **অকথিত ভাষা** (inarticulate speech) বা নানা আকার-প্রকার এবং ইঙ্গিত প্রভৃতির সাহায্যেও চিন্তন প্রকাশিত হইয়া থাকে। মূক-বধির (deaf-mute) ব্যক্তিগণ আকার-প্রকার বা ইঙ্গিতের সাহায্যেই তাহাদের মনোভাব ব্যক্ত করে।

ভাষা ব্যতীত চিন্তন সম্ভব কিনা, এই বিষয়ে মতভেদ রহিয়াছে। চেষ্টিতবাদীরা বলিয়া থাকেন যে চিন্তন অকথিত বা কথিত ভাষারই নামান্তর। কিন্তু অন্যান্য অনেক মনোবিদ, যেমন কুল্পে, স্টাউট্, বিনে প্রভৃতি মনে করেন যে ভাষা-প্রতিরূপ-বিহীন চিন্তন (imageless thought) সম্ভব। এই প্রশ্নটির বিচার পরবর্তী অনুচ্ছেদে করা যাইতেছে। আপাততঃ সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে চিন্তন এবং ভাষার আপেক্ষিক গুরুত্ব যাহাই হউক না কেন, ইহাদের সম্বন্ধ অতিশয় ঘনিষ্ঠ।

সঙ্কেত (sign) ও প্রতীক (symbol)

চিন্তনে সঙ্কেতের বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে। ভাষা চিন্তন বা ভাবেরই সঙ্কেত বিশেষ। ভাষা কোনো অর্থের meaning প্রকাশ করিয়া উহাকে চিহ্নিত করে, বা উহার সঙ্কেতরূপে কাজ করে। চিন্তনের উচ্চতর স্তরে ভাষা ক্রমশঃ সংক্ষিপ্ত বা

ঘনীভূত আকার গ্রহণ করে, অর্থাৎ সাঙ্কেতিক হইয়া দাঁড়ায়। যেমন বীজগণিতে শুধু কয়েকটি বর্ণের সাহায্যে চিন্তন প্রকাশিত হয়। দর্শনের অনেকগুলি চিন্তন এক বা একাধিক প্রত্যয়ের সাহায্যে ব্যক্ত হইয়া থাকে। একটিমাত্র সূত্র বা প্রত্যয়ের সাহায্যে বিজ্ঞান এবং দর্শন বহু চিন্তন প্রকাশ করিয়া থাকে।

উপরের আলোচনা হইতে এমন মনে হয় না যে **সঙ্কেত এবং প্রতীকের** মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে। উহারা উভয়েই চিন্তনকে ব্যক্ত করে। কিন্তু উহাদের সাদৃশ্যই স্পষ্ট। উহাদের পার্থক্য এই যে **সকল প্রতীকই সঙ্কেত, কিন্তু সকল সঙ্কেতই প্রতীক নয়।** প্রতীকের তুলনায় সঙ্কেত অধিকতর ব্যাপক। অঙ্গভঙ্গী, যেমন হাত বা মাথা নাড়িয়া হাঁ বা না করা, সদর্থক (positive) এবং নঞর্থক (negative) চিন্তন প্রকাশ করে। আবার হাসি-কান্না, ঘুষি বাগানো, দন্তঘর্ষণ, ভ্রূকুঞ্চন, প্রভৃতি ভঙ্গীগুলি কোনো না কোনো মনোভাবের সঙ্কেত করে। দৌড়ানো, বসিয়া পড়া বা শুইয়া পড়া বিভিন্ন মানসিক অবস্থার সূচক। কিন্তু এই সঙ্কেতগুলিকে প্রতীক বলা যায় না। প্রতীক সাধারণতঃ অতি সংক্ষিপ্ত। ইহা সঙ্কেতের তুলনায় অধিকতর সংক্ষিপ্তভাবে অধিকতর সূক্ষ্ম চিন্তন প্রকাশ করে। যেমন বেদান্তে ওম্ এই প্রণব মন্ত্রটি সৃষ্টিস্থিতিসংহারমূলক পরমকারণ ব্রহ্মের প্রতীক অথবা বাচকরূপে ব্যবহৃত হয়। খ্রীষ্টানগণ ক্রশ্ চিহ্নকে তাঁহাদের ধর্মীয় প্রতীক বলিয়া গ্রহণ করেন। আবার জাতীয় পতাকা জাতির ঐক্যবোধের প্রতীক।

সুতরাং দেখা গেল যে চিন্তনের সূক্ষ্ম সঙ্কেতগুলিই প্রতীক, কিন্তু অঙ্গ-ভঙ্গী বা সাধারণ নাম প্রভৃতির বাচকভাষাগুলি চিন্তনের সঙ্কেত হইলেও, প্রতীক নয়। অথবা সঙ্কেত দুই প্রকারের হইতে পারে যথা স্থূল এবং সূক্ষ্ম। সূক্ষ্ম সঙ্কেতই প্রতীক, কিন্তু স্থূল সঙ্কেত প্রতীক নয়।

নক্সা (Diagram)

আবার, **নক্সাও** চিন্তনের একপ্রকার সঙ্কেত বা উহা প্রকাশ করিবার একপ্রকার বাহন। জ্যামিতির রেখাঙ্কন (figure), যুক্তিশাস্ত্রীয় ন্যায়ের আকার (figure), অয়লার্-এর বৃত্তসাহায্যে (Euler's circle) পদের ব্যাপ্যার্থের বণ্টন প্রণালীর (distribution of terms) ব্যাখ্যা, প্রভৃতি নক্সার দৃষ্টান্ত। চিন্তনের সূক্ষ্ম বিষয়কে ইন্দ্রিয় সাহায্যে জানিবার উপায় নাই। নক্সা উহাদিগকে ইন্দ্রিয় সাহায্যে বুঝিবার বা বুঝাইবার উপায়।

যেমন ত্রিভুজ একটি নক্সা। ত্রিভুজ বলিতে আমরা বুঝি তিনটি সরল রেখার দ্বারা সীমাবদ্ধ রেখাঙ্কনকে। কিন্তু সরলরেখার সংজ্ঞা (যাহার শুধু দৈর্ঘ্য আছে কিন্তু প্রস্থ নাই এবং যাহা দিক্ পরিবর্তন না করিয়া একই দিকে অগ্রসর হয় এমন রেখা) অনুসারে ইহাকে অঙ্কন করা যায় না। অথচ জ্যামিতির জটিল ও সূক্ষ্ম চিন্তন বুঝিবার সহায়ক হয় ত্রিভুজ প্রভৃতি রেখাঙ্কন। দৈনন্দিন জীবনেও রাস্তার, প্রস্তাবিত গৃহের বা অন্যান্য পরিকল্পনার নক্সা ঐ ঐ বিষয়ে চিন্তনকে সাহায্য করিয়া থাকে।

৬। অবধারণ (Judgement) এবং যুক্তি (Reasoning)

দুইটি প্রত্যয়ের সম্বন্ধকে সত্য বলিয়া মনে করিবার ক্রিয়াকে অবধারণ বলে। অবধারণকে চিন্তনের একক বলা হইয়া থাকে, কারণ বাস্তব চিন্তনে অবধারণ অপেক্ষা মৌলিক স্তর নাই। অবধারণই চিন্তনের মৌলিকতম অংশ, কারণ ইহার সাহায্যেই চিন্তন ঘটিয়া থাকে। যাঁহারা প্রত্যয়কে অবধারণের সংগঠক এবং চিন্তনের মৌলিকতম অংশ বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের মত যুক্তিবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গীতে যাহাই হউক না কেন, মনোবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গী হইতে গ্রহণীয় নয়।

অবধারণে বিশ্লেষণ এবং সংশ্লেষণ প্রভৃতি ক্রিয়া অংশ গ্রহণ করে। "গোলাপ সুগন্ধ ফুল," এই অবধারণে গোলাপের নানা গুণের মধ্যে উহার সৌগন্ধ্য গুণটি বাছিয়া লওয়া হইয়াছে, সুতরাং ইহা বিশ্লেষণমূলক। আবার ইহাতে এই বিশ্লিষ্ট গুণটিকে গোলাপের সহিত যুক্ত করা হইয়াছে, সুতরাং এই অবধারণটি সংশ্লেষণ-মূলকও বটে।

অবধারণ বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে। "গোলাপ সুগন্ধ ফুল"—এইটি সদর্থক (affirmative) অবধারণ। আবার "গোলাপ ফল নয়", এই অবধারণটি নঞ্‌বাচক (negative) অবধারণ। আবার "একটি গোলাপ বড়" এবং "সকল গোলাপই সুগন্ধ" যথাক্রমে বিশেষ (particular) এবং সামান্য (universal) অবধারণের দৃষ্টান্ত। অবধারণ আরও অনেক প্রকারের হইতে পারে।

অবধারণ সাহায্যেই চিন্তনের ক্রমবিকাশ ঘটিয়া থাকে। চিন্তন বুঝিতে হইলে অবধারণের সাহায্য লইতে হয়। যেমন "সূর্য উদিত হইয়াছেন" এই অবধারণটি "রাত্রি শেষ হইয়াছে", "এখন হাত মুখ ধুইবার সময়" প্রভৃতি অন্যান্য অবধারণের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকায়, অবধারণ চিন্তনের ক্রমবিকাশের ধারায় অনুমান অথবা যুক্তির আকার গ্রহণ করে।

এক বা একাধিক অবধারণকে আশ্রয় করিয়া কোনো নূতন অবধারণে উপনীত হইবার প্রণালীকে বলা হয় যুক্তি।

অবধারণ বুঝিতে হইলে, উহাকে যুক্তির আকারে প্রসারিত করিয়া বুঝিতে হয়। যেমন, "সূর্য উদিত হইয়াছেন" অবধারণটি বুঝিতে হইলে বুঝিতে হয় "আমি সূর্যোদয় দেখিতেছি," "সূর্য উদিত না হইলে আমি সূর্যোদয় দেখিতাম না," "চারিদিক আলোকিত হইয়াছে," "রাত্রির অন্ধকার দূর হইয়াছে," প্রভৃতি অবধারণগুলি।

যুক্তি প্রধানতঃ দুই প্রকারের হইতে পারে। যে অবধারণকে আশ্রয় করিয়া কোনো অজ্ঞাতপূর্ব অবধারণে উপনীত হওয়া যায় তাহা বিশেষ এবং নূতন অবধারণটি সামান্য হইতে পারে। এইরূপ বিশেষ অবধারণ হইতে সামান্য অবধারণে উপনীত হওয়ার যুক্তিপদ্ধতিকে বলে **আরোহ অনুমান** (Inductive reasoning)। যেমন রাম, শ্যাম, যদু প্রভৃতি বিশেষ ব্যক্তির মৃত্যু দেখিয়া অনুমান করা হইল যে "সকল মানুষই মরণশীল।" আবার সামান্য অবধারণকে আশ্রয় করিয়া কোনো অপেক্ষাকৃত বিশেষ অবধারণে পৌঁছিবার যুক্তিপদ্ধতির নাম **অবরোহ অনুমান** (Deductive reasoning)। যেমন, "সকল মানুষই মরণশীল," এই সামান্য অবধারণটিকে আশ্রয় করিয়া, "রাম মানুষ" অবধারণের সাহায্যে, অনুমান করা যাইতে পারে যে "রাম মরণশীল"।

৭। চিন্তন সম্পর্কে মনোবিদ্যা এবং যুক্তিবিদ্যার পৃথক দৃষ্টিভঙ্গী

উপরের আলোচনা হইতে এইরূপ মনে হইতে পারে যে চিন্তন বিষয়ে মনোবিদ্যার এবং যুক্তিবিদ্যার কোনো পার্থক্য নাই, কারণ যুক্তিবিদ্যার মত মনোবিদ্যাও প্রত্যয়, অবধারণ এবং যুক্তির আলোচনা করে। এই সংশয় অমূলক নয়, কারণ এই তিনটি চিন্তন স্তরই মনোবিদ্যা এবং যুক্তিবিদ্যার পক্ষে সমান আলোচ্য বিষয়।

কিন্তু এই সংশয় ভ্রান্ত। প্রত্যয়, অবধারণ এবং যুক্তি মনোবিদ্যা এবং যুক্তিবিদ্যার সমান আলোচ্য বিষয় হইলেও, উহাদের আলোচনার দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ বিভিন্ন। প্রথমতঃ মনোবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গী পাত্রগত বা মানসিক, কিন্তু যুক্তিবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গী বিষয়গত। মনোবিদ্যা চিন্তনের আলোচনা করে চিন্তনকারী মনের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে।

অথবা ঐ মনের ক্রিয়া বা বৃত্তিরূপে চিন্তনের অভিজ্ঞতা কিরূপ, চিন্তন কিরূপে সহজ হইতে ক্রমশঃ জটিল স্তরে পরিণত হয়, এই জাতীয় প্রশ্নই মনোবিদ্যার জ্ঞাতব্য বিষয়। পক্ষান্তরে, যুক্তিবিদ্যার জ্ঞাতব্য বিষয় হইল চিন্তনক্রিয়ার ফল কি, চিন্তন সামঞ্জস্যপূর্ণ বা সত্য কিনা, প্রভৃতি প্রশ্ন। দ্বিতীয়তঃ মনোবিদ্যার আলোচনা ঘটনানিষ্ঠ, কিন্তু যুক্তিবিদ্যার আলোচনা আদর্শনিষ্ঠ অর্থাৎ মনোবিদ্যা চিন্তনকে ঘটনারূপে গ্রহণ করে, উহার সত্যতা বা অসত্যতা সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলে না। কিন্তু যুক্তিবিদ্যা চিন্তনের সত্যতা বা অসত্যতা লইয়াই আলোচনা করে, উহার ঘটনানিষ্ঠ বা বাস্তব রূপ যুক্তিবিদ্যার পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক। তৃতীয়তঃ, মনোবিদ্যার পক্ষে সত্য মিথ্যা নির্বিশেষে সকল চিন্তনই ঘটনা বা ক্রিয়া হিসাবে সমান গুরুত্বপূর্ণ। পক্ষান্তরে, যুক্তিবিদ্যায় সত্য চিন্তনই গ্রহণীয় এবং মিথ্যা চিন্তন বর্জনীয়।

শুদ্ধ ও অশুদ্ধ চিন্তন

মনোবিদ্যা প্রধানতঃ চিন্তনের ঘটনানিষ্ঠ রূপটির আলোচনা করে। কিন্তু যুক্তিবিদ্যা প্রধানতঃ আলোচনা করে চিন্তনের শুদ্ধতা বা অশুদ্ধতা, অথবা উহার আদর্শনিষ্ঠ রূপটির। ঘটনা হিসাবে যথার্থ এবং অযথার্থ চিন্তন মনোবিদ্যার পক্ষে সমান বাস্তব। কি কি কারণে চিন্তন যথার্থ এবং অযথার্থ হয়, এই দুইটি প্রশ্নই মনোবিদ্যার পক্ষে সমান মূল্যবান। **কুসংস্কার, ব্যক্তিগত ধারণা, আকর্ষণ বা ভাল লাগা এবং মন্দ লাগা, সুখ-দুঃখ** প্রভৃতি অনুভূতি, **ইচ্ছা-অনিচ্ছা মনোযোগ-অমনোযোগ, উদ্দেশ্য-উদ্দেশ্যহীনতা, বিশ্বাস-অবিশ্বাস** প্রভৃতি নানা মানসিক অবস্থার উপর চিন্তনের যাথার্থ্য এবং অযাথার্থ্য নির্ভর করে। ভ্রান্ত সংস্কারের বশবর্তী হইয়া আমরা ভুল চিন্তা করিয়া থাকি। ভুল গাড়িতে চড়িয়া হয়ত গন্তব্যস্থলে পৌঁছিতে পারি না। আবার, হয়ত ভুল আকর্ষণ, মনোযোগ, উদ্দেশ্য প্রভৃতি নানা মানসিক কারণে, ঠিক গাড়িতে চাপিয়াও গন্তব্যস্থান অতিক্রম করিয়া চলিয়া যাই। এই সকল ক্ষেত্রে অযথার্থ চিন্তাই অনর্থের মূল। যাহাকে বিশ্বাস করা উচিত তাহাকে অবিশ্বাস অথবা যাহাকে অবিশ্বাস করা উচিত তাহাকেই হয়ত বিশ্বাস করা হয়। হয়ত পূর্বকল্পিত কোনো ব্যক্তিগত ধারণাই এই সকল ভ্রান্তির মূল।

কল্পনাপ্রবণতার ফলে, বাস্তবের সহিত কল্পনার সামঞ্জস্য না করিয়া কল্পনার সহিত বাস্তবের সামঞ্জস্য ঘটাইতে গিয়াও অনেক ভ্রান্তি হয়। আবার তীব্র প্রক্ষোভ বা আবেগে অন্ধ হইয়াও মানুষ ভুল চিন্তা করিতে পারে। ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া অথবা

পক্ষপাতিত্ব বশে ভুল করিবার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। অদূরদর্শিতা বা সঙ্কীর্ণদৃষ্টি চিন্তনে ভুল ঘটাইতে পারে। তাহা ছাড়া, মনঃসমীক্ষণমতে অবদমিত নির্জ্ঞান কামনাও দৈনন্দিন জীবনে ভুলভ্রান্তি ঘটায়।

৮। অপ্রতিরূপ চিন্তন (Imageless Thought)

সংবেদন, প্রত্যক্ষ, প্রতিরূপ কল্পনা প্রভৃতি সহজতর মানসবৃত্তি চিন্তনে পরিণতি লাভ করে। চিন্তন সাধারণতঃ **প্রতিরূপসাহায্যে** ঘটিয়া থাকে। যেমন "অশ্ব চতুষ্পদ জন্তু" এই সামান্য সদর্থক অবধারণটি করিতে গিয়া, কোনো না কোনো অশ্বের প্রতিরূপ মানসচক্ষে ভাসিয়া ওঠে। আবার "সকল মানুষ মরণশীল" এই অবধারণেও কোনো না কোনো মানুষের প্রতিরূপ মনে ভাসিয়া ওঠে। প্রতিরূপ ছাড়া চিন্তন সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। চিন্তন সপ্রতিরূপ অথবা প্রতিরূপসাপেক্ষ। দ্বিতীয়তঃ, চিন্তন **স্থূল প্রতিরূপের সাহায্য না লইয়া** শুধু শাব্দপ্রতিরূপের (verbal image) সাহায্যে ঘটিতে পারে। যেমন, প্রতীকমূলক চিন্তনে (symbolic thought) স্থূল প্রতিরূপ থাকে না, কিন্তু থাকে শাব্দপ্রতিরূপ। যেমন বীজগণিতে এ, বি, সি, প্রভৃতি বর্ণগুলি সংখ্যার বিকল্প হিসাবে ব্যবহৃত হয়। তৃতীয়তঃ, চিন্তন কোন প্রকার **প্রতিরূপের সাহায্য না লইয়াই** ঘটিতে পারে, যেমন উচ্চ দার্শনিক বিচারে।

চিন্তন নিয়তই সপ্রতিরূপ কিনা, অথবা ইহা কখনও কখনও অপ্রতিরূপও হইতে পারে, সাম্প্রতিক মনোবিদ্‌গণ এই প্রশ্নটি লইয়া বিস্তৃত গবেষণা করিয়াছেন। **কুল্পে, স্টাউট্** প্রভৃতি মনোবিদ্‌গণ অপ্রতিরূপ বা প্রতিরূপহীন চিন্তন স্বীকার করিয়াছেন। **বিনে, উড্‌ওয়ার্থ** প্রভৃতি মনোবিদ্‌গণও তাঁহাদের প্রয়োগমূলক গবেষণার ভিত্তিতে অপ্রতিরূপ চিন্তন সমর্থন করিয়াছেন। অধ্যাপক **উইলিয়ম জেমস্‌ও** তাঁহার চেতনা-প্রবাহ (stream of consciousness) আলোচনা প্রসঙ্গে সক্রিয় (transitive) ও নিষ্ক্রিয় (substantive) বৃত্তির পার্থক্য দেখাইয়া প্রথমটিকে অপ্রতিরূপ চিন্তনের অনুরূপ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি যাহাকে চেতনা-প্রান্ত (fringe of consciousness) বলিয়াছেন, তাহা অপ্রতিরূপ চিন্তনেরই সামিল। উপরোক্ত মনোবিদেরা মনে করেন যে সপ্রতিরূপ চিন্তার মধ্যেও অপ্রতিরূপ চিন্তন কাজ করিয়া থাকে।

অ্যালফ্রেড্ বিনে তাঁহার তেরো এবং চৌদ্দ বৎসরের দুই কন্যাকে কতগুলি সমস্যা সমাধান করিতে দিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, সমস্যা সমাধানে সর্বদাই তাহাদের মনে প্রতিরূপ ভাসিয়া উঠিয়াছে কিনা। তাহারা বলিল যে তাহাদের চিন্তন মাঝে মাঝে

অপ্রতিরূপভাবে অথবা প্রতিরূপের সাহায্য না লইয়াই ঘটিয়াছে। এই প্রয়োগের ভিত্তিতে বিনে সিদ্ধান্ত করিলেন, প্রতিরূপ যে সর্বদাই চিন্তনের বাহন, তাহা নয়। তাঁহার মতে চিন্তন চিন্তাউপাদানের (thought element) ক্রিয়া।

কুল্পে এবং তাঁহার অনুগামী মার্বে (Marbo) প্রভৃতি মনোবিদ এই সমস্যাটির গবেষণা করিয়া একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন। চিন্তন শুধু প্রতিরূপের ব্যবহার (manipulation of images) নয়, কিন্তু 'চিন্তা' নামক অবগতিমূলক মানস-উপাদানের ক্রিয়াবিশেষ। অ্যাক্ (Ach) এবং ওয়াট্ (Watt) প্রভৃতি কুল্পে-পন্থী মনোবিদেরাও এই মতের প্রায়োগিক সমর্থন করিলেন। স্টাউট্ ও স্বাধীনভাবে একই সিদ্ধান্ত করিলেন যে চিন্তন অপ্রতিরূপভাবেও ঘটিয়া থাকে।

কিন্তু **টিশ্‌নার** প্রভৃতি হ্বুণ্ড্‌পন্থী মনোবিদ্‌গণ অপ্রতিরূপ চিন্তন স্বীকার করেন নাই। যাহাকে উপরোক্ত মতাবলম্বী মনোবিদেরা মৌলিক বা অবিশ্লেষণীয় চিন্তা-উপাদান বলিয়া থাকেন, তাহা আসলে মৌলিক মানস উপাদান নয়, কিন্তু সংবেদন, অনুভূতি এবং প্রতিরূপেরই সংগঠন। টিশনারএর মতে সংবেদন, অনুভূতি এবং প্রতিরূপই মৌলিক মানস উপাদান এবং ইহাদের অতিরিক্ত কোনো 'চিন্তা' উপাদান স্বীকার করা নিষ্প্রয়োজন।

গেস্টাল্ট মনোবিদ্‌গণ মনে করেন যে কি সংবেদন, কি চিন্তা, মনকে যে কোনো উপাদানে বিশ্লেষণ করিবার প্রয়াসে মনোবিদ্যা বিকৃত হয়। মন একটি সমগ্র বা গোটা বস্তু—ইহাকে বিভাজন বা বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিবার চেষ্টা ভ্রান্তিমূলক। উড্-ওয়ার্থ-এর মতে অপ্রতিরূপ চিন্তনের অবিসম্বাদী প্রমাণ রহিয়াছে। চিন্তন ক্রিয়ার অপ্রতিরূপ চিন্তন গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। অবশ্য উড্‌ওয়ার্থ, গেস্টাল্ট্ মনোবিদ্‌গণের সহিত এই বিষয়ে একমত যে মনোবিদ্যায় "চিন্ত-উপাদানের" উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

ওয়াটসন্-এর মত—চিন্তন অনুচ্চারিত ভাষা

চেষ্টিতবাদী ওয়াট্‌সন-এর মতে চিন্তনও একপ্রকার চেষ্টিত অথবা উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়া এককের সমষ্টি। চিন্তন অস্পষ্ট বা অনুচ্চারিত ভাষার প্রতিক্রিয়া। ইহা একপ্রকার সংবেদন-গতিমূলক (Sensori-motor) অস্পষ্ট ক্রিয়া। এই ক্রিয়া প্রায়ই দৃশ্য বিচলন (movement) বা শ্রবণযোগ্য ভাষায় প্রকাশিত হয় না। স্পষ্ট চেষ্টিতের পরিবর্তে যে অস্পষ্ট বা অব্যক্ত চেষ্টিত ঘটে, তাহাই চিন্তন। বস্তু এবং কাজের সহিত

ভাষার সম্বন্ধ গড়িয়া ওঠে, কারণ কাজ করিবার সময় শিশু প্রায়ই প্রকাশ্যে বা স্বগতভাবে বলিতে থাকে সে কি করিতেছে। প্রথমে প্রকাশ্য ভাবেই শিশু বলে সে কি করিতেছে। দুই ধাপ পরেই দেখা যায় যে সে স্বগতভাবে কথা বলিতেছে এবং তাহার কথা অপরে শুনিতে পায় না। এই অবস্থায় শিশু বাস্তবে কাজ না করিয়াও, ঐ সম্বন্ধে মনে মনে কথা বলে অথবা চিন্তা করে। বাস্তবে কাজ না করিয়াও, সমস্যার সমাধানে চিন্তন করিয়া শিশুব সময় এবং পরিশ্রমের লাঘব হয়। সে হয়ত তাহার একটি খেল্‌না না সরাইয়া ভাবে, "আচ্ছা খেল্‌নাটা যদি ওখানে সরিয়ে রাখি...কিন্তু ওখানে রাখলে ওটা বেমানান।" ওয়াট্‌সন-এর মতে, বাস্তবিক কাজের পরিবর্তে এই অব্যক্ত চেষ্টিত বা চিন্তন প্রধানতঃ বাচিক বিচলনেরই (Speech movement) সমষ্টি।

ওয়াটসনীয় মতের সমালোচনা

(১) চিন্তনের বাচিক বিচলন, ওয়াট্‌সন্ যন্ত্র সাহায্যে নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে বিচলন প্রধানতঃ বাক্ যন্ত্রেব, যেমন জিহ্বার এবং স্বরযন্ত্রের পেশী সঞ্চালন এবং ফুসফুসের ক্রিয়া প্রভৃতি লইয়া গঠিত। চিন্তনকালে যে বাক্‌যন্ত্রের সূক্ষ্ম সঞ্চালন এবং ফুসফুস্ প্রভৃতির ক্রিয়া ঘটিয়া থাকে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এইগুলি চিন্তনের পর্যাপ্ত কাবণ না হইয়া আংশিক কারণও হইতে পাবে। কিন্তু ওয়াট্‌সন চিন্তনকে এই বিচলন বা ক্রিয়ার সহিত অভিন্ন বলিয়া মনে করেন। (২) উচ্চতর চিন্তনের ক্ষেত্রে বাক্‌যন্ত্রপেশীর ক্রিয়া যন্ত্রসাহায্যে প্রায়ই ধরা পড়ে না। (৩) চিন্তন ভাষারই নামান্তর হইলে, সর্বদা ভাব-প্রকাশের ভাষা খুঁজিয়া পাওয়া যাইত। অথচ, কথা বলিতে বলিতে একটি পরিচিত শব্দে আটকাইয়া যাওয়া সাধারণ অভিজ্ঞতা। (৪) চিন্তন=ভাষা, এই সমীকরণটি সত্য হইলে, ভাষা= চিন্তন, এই সমীকরণও সত্য হইবে। অথচ, দ্বিতীয় সমীকরণটি গ্রহণীয় নয়, কারণ একেবারেই চিন্তা না করিয়া বিদেশী ভাষায় লিখিত পাঠ মুখস্থ বলিয়া যাওয়া সম্ভব। (৫) চিন্তনে একটি বস্তুর সহিত আর একটি বস্তুর সম্বন্ধ বুঝিতে পারা যায়। ইহাতে নূতন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। চিন্তনের এই নূতনত্ব ওয়াট্‌সন্-স্বীকৃত পুরাতন বাচিক অভ্যাস (language-habit) দিয়া ব্যাখ্যা করা যায় না।

সুতরাং চিন্তনকে শুধু বাক্‌যন্ত্রের পেশীসঞ্চালন অথবা অব্যক্ত ভাষা বলা যায় না। চিন্তন ভাষা নয়, যদিও ইহার সহিত ভাষার সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ।

অনুশীলনী

Exercise

1. Define and analyse thinking. What are the tools of thinking? Explain and illustrate them. (Ans : pp .115-116)

চিন্তন কাহাকে বলে? উহার বিশ্লেষণ কর। উদাহরণ সাহায্যে চিন্তনের বিভিন্ন বাহন ব্যাখ্যা কর।

2. Compare percept, image and concept to one another. How is concept formed? (Ans : pp. 118-119)

প্রত্যক্ষ-ফল, প্রতিরূপ এবং প্রত্যয়ের তুলনা কর। প্রত্যয় কিরূপে গঠিত হয়?

3. Explain judgement and reasoning as processes of thought. (Ans. pp. 123-124)

চিন্তন ক্রিয়ারূপে অবধারণ এবং যুক্তির আলোচনা কর।

4. Is imageless thought possible? Discuss citing experimental evidences. (Ans : pp. 126-128)

প্রায়োগিক প্রমাণ সাহায্যে অপ্রতিরূপ চিন্তন সম্ভব কিনা আলোচনা কর।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বিশ্বাস (Belief)

১। বিশ্বাসের সংজ্ঞা ও বিশ্লেষণ

নিশ্চয়তা অথবা সত্যতাবোধকে বিশ্বাস বলে। ধারণা অথবা প্রত্যয়ের সহিত উহার বিষয় বা বস্তুর সামঞ্জস্য সম্বন্ধে **নিশ্চয় প্রতীতিই বিশ্বাস**।

বিশ্বাস জ্ঞানের অপরিহার্য অঙ্গ। কারণ প্রত্যয় বা ধারণার সহিত সামঞ্জস্যে বিশ্বাসই জ্ঞান। মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে বিশ্বাস সহজ বা সরল মানসবৃত্তি নয়। ইহা একাধিক মানসবৃত্তির মিশ্রণফল। বিশ্বাসে অবগতি, চেষ্টা এবং অনুভূতিমূলক মানসবৃত্তি মিশ্রিত থাকে।

(১) বিশ্বাস **অবগতিমূলক** (cognitive)। কারণ, যে বিষয়ে বিশ্বাস ঘটে, উহার **জ্ঞান** বিশ্বাসের অত্যাবশ্যক অঙ্গ। একেবারে না জানিয়া কোনো বস্তুতে বিশ্বাস উৎপন্ন হয় না। পৃথিবী সূর্যকে কেন্দ্র করিয়া আপনকক্ষে নিয়ত ঘুরিতেছে। এই বিশ্বাসের মূলে রহিয়াছে সূর্য এবং পৃথিবী সম্বন্ধে অল্পবিস্তর জ্ঞান। অমুক লোকটি প্রতারক। এই বিশ্বাসের মূলে রহিয়াছে ঐ ব্যক্তি এবং প্রতারক সম্বন্ধে ন্যূনাধিক জ্ঞান।

বিশ্বাসের অবগতিমূলক ধর্ম নিরূপিত হয় উহার **বিষয়মুখীনতা** (objectivity) দিয়া; বিশ্বাসের বিষয়টি বিশ্বাসীর সৃষ্টি বা কল্পনা নয়, কিন্তু স্বতন্ত্র বস্তু। অর্থাৎ বিশ্বাস বা অবিশ্বাস নিতান্ত **খেয়ালখুশীর ব্যাপার নয়**। বিশ্বাস **বাধ্যতামূলক**। বিশ্বাস করা বা না করা নিছক ব্যক্তিগত (subjective) বা মানসিক ব্যাপার মাত্র নয়। বিশ্বাসের বাধ্যবাধকতাবোধ থাকে।

কোনো কোনো মনোবিদের মতে বিশ্বাস **সম্পূর্ণ অবগতিমূলক**। কিন্তু এইরূপ চরম অবগতিমূলক মতবাদ **একদেশদর্শী**। অবগতি একটি শুদ্ধ তাত্ত্বিক (purely theoretical) মনোভাব। কিন্তু বিশ্বাস তাহা নয়। কারণ বিশ্বাস ব্যবহারিক বা কার্যকরীও (practical) বটে। তাহা ছাড়া, বিশ্বাসে অনুভূতিমূলক (affective) উপাদানও থাকে। তাই বিশ্বাসকে শুধু অবগতিমূলক মানসবৃত্তি বলা অনুচিত।

(২) বিশ্বাস **অনুভূতিমূলক**। কারণ বিশ্বাস উৎপন্ন হইলে সুখ বা স্বস্তিবোধ হয়। **সংশয়** (doubt) একটি উদ্বেগজনক মানসিক অবস্থা। কারণ ইহাতে অনিশ্চয়তাজনিত অশান্তি বা দুঃখ থাকে। বিশ্বাসে উদ্বেগের উপশম হয়, নিশ্চয়তাবোধের শান্তি বা আনন্দ অনুভূত হয়। সন্দেহাকুল চিত্তে নির্দিষ্ট কর্মপন্থা অনুসরণ করা যায় না। ফলে মানসিক অসহায়তাবোধ জন্মে। সন্দেহ নিরসনের সঙ্গে সঙ্গে

স্থির হইয়া যায় কোন্ কর্মপন্থা অনুসরণ করিয়া সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইবে। ফলে বিশ্বাস জন্মিবার সঙ্গে সঙ্গে মানসিক ক্লেশ, অশান্তি এবং অসহায়তাবোধ দূর হইয়া আসে নিশ্চিন্ততার আশ্বাস।

উপরোক্ত কারণে কোনো কোনো মনোবিদ বিশ্বাসকে **সম্পূর্ণ অনুভূতিমূলক** বলিয়া মনে করেন। কিন্তু এইরূপ মত **গ্রহণযোগ্য নয়**। বিশ্বাস শুধু অনুভূতিমূলক হইলে, ইহা **ব্যক্তিমনে সীমাবদ্ধ** এবং নিষ্ক্রিয় হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু বিশ্বাস শুধু ব্যক্তিমনে সীমাবদ্ধ মানস (subjective) অবস্থা নয়। ইহাতে ব্যক্তিমন-নিরপেক্ষ (objective) বহিঃসত্তার ইঙ্গিত রহিয়াছে। ইহাতে আরও রহিয়াছে বাস্তব অবস্থার সম্মুখীন হইবার **কর্মপ্রবণতা**। সুতরাং **বিশ্বাস একাধারে অনুভূতি, জ্ঞান এবং ইচ্ছামূলক**।

(৩) বিশ্বাস চেষ্টা বা **ইচ্ছামূলকও** (conative) বটে। সংশয়ে কর্মব্যাঘাত ঘটে। ইহাতে উভয় সংকটে পড়িয়া কোনো নির্দিষ্ট কর্মপন্থা অনুসরণ করা যায় না। সংশয়ে পরস্পরবিরুদ্ধ দুইটি অবস্থার দ্বন্দ্ব থাকে। ফলে কর্মে প্রবৃত্তি হয় না। পক্ষান্তরে বিশ্বাস কর্মবিরোধের অবসান ঘটায়, নির্দিষ্ট কর্মপন্থায় প্রবৃত্তি জন্মায়। বিশ্বাসে স্থির হইয়া যায় কিরূপে সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইবে। সুতরাং বিশ্বাসে **কর্মপ্রস্তুতি** ঘটে।

বেইন (Bain) প্রভৃতি মনোবিদ বিশ্বাসকে চেষ্টা বা ইচ্ছামূলক বলিয়া মনে করেন। কিন্তু এই মতও **একদেশদর্শী**। ইহা বিশ্বাসের অবগতি এবং অনুভূতি-মূলক দিক দুইটি বাদ দিয়া ইহাকে শুধু ক্রিয়ায় সীমাবদ্ধ করে।

২। বিশ্বাসের ভিত্তি ও কারণ (Grounds any Conditions of Belief)

উপরোক্ত আলোচনায় বিশ্বাসের ভিত্তি এবং কারণের আভাস পাওয়া গিয়াছে মাত্র। বিষয়টির বিশদ আলোচনা বাঞ্ছনীয়।

বিশ্বাসের ভিত্তি কি? যুক্তিবাদী মনোবিদ (Rational psychologist) বলেন যে বিশ্বাসের ভিত্তি অবগতি বা জ্ঞান। ইঁহারা মনে করেন যে ভাবের বা ধারণার সহিত বস্তুর সামঞ্জস্যে নিশ্চয়তাবোধই বিশ্বাস।

(ক) বিশ্বাসের অবগতিমূলক ভিত্তি বা কারণ

অবগতির বিভিন্ন স্তরের সহিত বিশ্বাস যুক্ত। (১) **প্রত্যক্ষই** বিশ্বাসের প্রাথমিক ভিত্তি, কারণ প্রত্যক্ষে বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎ সংযোগ ঘটে এবং বিষয় সত্য-রূপে

প্রতিভাত হয়। যে রংটি দেখিতেছি বা যে শব্দটি শুনিতেছি তাহার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। বিশ্বাস প্রত্যক্ষের অপরিহার্য অঙ্গ। প্রত্যক্ষকে উহার বিষয়ই নিয়ন্ত্রণ করে। এই নিয়ন্ত্রণ সরাসরিভাবে অনুভূত হইয়া প্রত্যক্ষ বিষয়ের সত্যতায় বিশ্বাস উৎপাদন করে। সুখ, দুঃখ, ভয় ক্রোধ প্রভৃতি মানস অবস্থাগুলি অনুভূত হইবার সঙ্গে সঙ্গে সত্য বলিয়া স্থির বিশ্বাস জন্মায়। অন্তর্দর্শনও মানস অবস্থার সত্যতায় বিশ্বাস উৎপন্ন করিতে পারে।

(১) **স্মৃতিও** বিশ্বাসের ভিত্তি। স্মরণক্রিয়া প্রতিরূপের সাহায্যে প্রত্যক্ষ বিষয়কে উহার দেশ, কাল, অনুষঙ্গ প্রভৃতি অনুসারে পুনরুৎপাদন করে এবং উহার সত্যতায় বিশ্বাস জন্মায়। আমরা যাহা স্মরণ করি, তাহা শুধু ব্যক্তিগত ইচ্ছা অনিচ্ছার উপরই নির্ভর করে না, কিন্তু স্মৃত বস্তুর নিজস্ব নিয়মের উপরও নির্ভর করে। স্মরণে এই বিশ্বাস উৎপন্ন হয় যে উহার প্রতিরূপগুলি অতীত অভিজ্ঞতালব্ধ বিষয়ের যথার্থ প্রতিরূপ।

আবার **কল্পনাও** কল্পিত বস্তুর সত্যতায় বিশ্বাস জন্মাইতে পারে। এই কারণে ভ্রান্ত কল্পনাও সত্য বলিয়া মনে হয়। বৃক্ষ হইতে পতিত আপেল দেখিয়া নিউটন মাধ্যাকর্ষণ সূত্রের কল্পনা করিলেন। অথবা রাষ্ট্রনায়ক কল্পনা করেন তাঁহার রাষ্ট্রের উন্নত অবস্থা। উভয়ক্ষেত্রেই কল্পনার সত্যতায় বিশ্বাস রহিয়াছে। এমন কি, আল্‌নাস্কার্‌- এর জাগরস্বপ্ন অথবা শক্‌কলসের কাহিনীর জাগরস্বপ্ন উহাদের সত্যতায় বিশ্বাস বহন করে, যদিও উভয়ক্ষেত্রেই কল্পনা ও উহার বিষয়ের সামঞ্জস্য না থাকায়, বিশ্বাস অমূলক ও মিথ্যা হইয়া দাঁড়ায়।

(৩) **অনুমান** বা যুক্তিও বিশ্বাসের ভিত্তি হইতে পারে। কোনো জ্ঞাত সত্যের ভিত্তিতে অজ্ঞাত সত্যকে জানিবার ফলে, উহাতে বিশ্বাস উৎপন্ন হয়। রান্নাঘর হইতে ধোঁয়া বাহির হইতেছে দেখিয়া, আমরা অনুমান করি যে উনানে আগুন দেওয়া হইয়াছে। এই সিদ্ধান্ত আমাদের নিকট অভ্রান্ত সত্য বলিয়া মনে হয়, কারণ পূর্ব প্রত্যক্ষে আমরা দেখিয়াছি যে যখনই রান্নাঘর হইতে ধোঁয়া বাহির হইয়াছে সেই সেই ক্ষেত্রে উনানে আগুন দেওয়া হইয়াছে।

(৪) আবার **অবিচ্ছেদ্য ভাবানুষঙ্গ** (inseparable association of ideas) হইতেও বিশ্বাস উৎপন্ন হয়। আগুনে হাত দিলে হাতে গরম লাগে, জল পান করিলে তৃষ্ণা নিবারণ হয়। আগুনে হাত দেওয়ার সহিত হাতে গরম লাগার, জলপানের সহিত তৃষ্ণা নিবারিত হইবার অভিজ্ঞতা দুইটির প্রতিরূপ বা ধারণা অবিচ্ছেদ্যভাবে অনুষক্ত হইয়া উহাদের সম্বন্ধ বিষয়ে বিশ্বাস জন্মায়। কেহ যদি বলে যে আগুনে হাত দিলে হাত ঠাণ্ডা লাগে, অথবা জলপান করিলে তৃষ্ণা বাড়িয়া যায়, আমরা এইরূপ উক্তি হাসিয়া উড়াইয়া দিই, কারণ এইরূপ অনুষঙ্গ অবিচ্ছেদ্য এবং বিশ্বাস্য নয়।

(৫) **বাচিক অভিভাবনও** (verbal suggestion) বিশ্বাস উৎপন্ন করিয়া থাকে। গুজব যে নানাপ্রকার উদ্ভট বিশ্বাস সৃষ্টি করে, ইহা সুবিদিত। যুদ্ধের উন্মাদনায় মানুষ নানা গুজব বা ঘটনায় বিশ্বাস করে। যেমন গত মহাযুদ্ধে, জাপান কলিকাতা ধ্বংস করিয়া দিবে, এইরূপ গুজবের প্রভাবে কলিকাতাবাসীরা দলে দলে কলিকাতা ত্যাগ করিবার ফলে, এই ঘনবসতিপূর্ণ শহরটি প্রায় জনশূন্য হইয়া পড়ে।

(৬) বাচিক অভিভাবন যে বিশ্বাসের একটি প্রবল কারণ তাহা প্রমাণিত হয় আর একটি যুক্তিতে। ভারতীয় দর্শনে **শব্দ** বা শ্রুতিকে (authority) প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা অন্য কোনো সূত্র হইতে আমরা যে জ্ঞান লাভ করি তাহা বিশ্বাসের একটি প্রধান উৎস।

(খ) বিশ্বাসের বেদনামূলক ভিত্তি বা কারণ

অনেকের মতে বিশ্বাস একটি বেদনামূলক মানসবৃত্তি।

(১) বেদনা, প্রক্ষোভ বা **আবেগ** বিশ্বাসের ভিত্তি বা কারণরূপে উপেক্ষণীয় নয়। ক্রোধ, ভয় ঘৃণা প্রভৃতি **অভিরাগ** (passion) উপযুক্ত পাত্রে অবিশ্বাস এবং অপাত্রে বিশ্বাস উৎপন্ন করে। 'ব্রাহ্মণ-নকুল' কথার কাহিনী সুবিদিত। এই কাহিনীর ক্রোধান্ধ ব্রাহ্মণ পুত্রের রক্ষক নকুলকেই ভক্ষক মনে করিয়া হত্যা করিয়াছিল। শরৎচন্দ্রের শ্রীনাথ বহুরূপীর কাহিনীতে দেখানো হইয়াছে ভয় কিরূপে মিথ্যা বিশ্বাস সৃষ্টি করিয়াছিল। আবার ঘৃণাও মিথ্যা বিশ্বাস উৎপন্ন করে।

(২) তাহা ছাড়া, শ্রদ্ধা, সম্মান প্রভৃতি **উচ্চতর রসও** (sentiment) বিশ্বাসের উর্বর ক্ষেত্র। পরশুরাম পিতৃভক্তিতে প্রভাবিত হইয়া বিশ্বাস করিয়া ছিলেন যে মাতৃহত্যায় দোষ নাই। উপমন্যু, আরুণি প্রভৃতির গুরুভক্তি কঠোর পরীক্ষায়ও বিচলিত হয় নাই। হিন্দু পতিব্রতা নারী বিশ্বাস করেন, পতি পরম গুরু।

(৩) ব্যক্তির **আম্বানও** (temperament) বিশ্বাসের হেতু হইতে পারে। আশাবাদী উজ্জ্বল ভবিষ্যতে বিশ্বাস পোষণ করে। সদা-প্রফুল্ল ব্যক্তি বিপদে পড়িলেও বিপদ কাটিয়া যাইবে বলিয়া বিশ্বাস করে। আবার সংশয়বাদী এবং নৈরাশ্যবাদী সম্পদের মধ্যেও বিপদের আশঙ্কায় সন্ত্রস্ত থাকে।

(গ) বিশ্বাসের ইচ্ছামূলক ভিত্তি বা কারণ

অনেকে মনে করেন যে বিশ্বাস একটি ইচ্ছা বা ক্রিয়ামূলক বৃত্তি।

(১) দে-কার্তে প্রভৃতি দার্শনিকগণ বলেন যে কতগুলি বিশ্বাস **সহজাত প্রবৃত্তি** (instinctive)—যেমন ঈশ্বর, কার্যকারণসূত্র, পুনর্জন্ম প্রভৃতি।

(২) জেম্‌স্‌ এর মতে ইচ্ছাই বিশ্বাসের কারণ। তিনি বলেন যে **ইচ্ছা বিশ্বাসের জনক**, অর্থাৎ ইচ্ছা করিলেই কোনো বস্তুতে বিশ্বাস বা অবিশ্বাস করা যাইতে পারে। এই মতটিকে চরমপন্থী বলিয়া মনে হয়। বিশ্বাস শুধু ইচ্ছা অনিচ্ছার সৃষ্টি হইতে পারে না, যেহেতু বিশ্বাসে একটি বিষয়গত বাধ্যতাবোধ (objective compulsion) বর্তমান থাকে।

(৩) কিন্তু **প্রবল ইচ্ছা বা সক্রিয় আবেগ** (impulse) যে বিশ্বাসপ্রবণতা জন্মাইতে পারে, তাহাতে সন্দেহ নাই। মুমূর্ষু পুত্রের আরোগ্যলাভ কামনার প্রভাবে, মৃত্যুর মুখে তিলে তিলে অগ্রসর পুত্রকেও মাতা ক্রমশঃ সুস্থ বলিয়া বিশ্বাস করেন। আবার আত্মশক্তিতে অতিবিশ্বাসী পরীক্ষার্থী হয়ত বিশ্বাস করে যে সে সগৌরবে উত্তীর্ণ হইবে, যদিও ইহার কোনো সম্ভাবনা নাই।

(৪) **ক্রিয়া ও বিশ্বাস** পরস্পর পরস্পরের ভিত্তি। বিশ্বাস ক্রিয়ায় বা কর্মে প্রবৃত্ত করে সন্দেহ নাই। আবার ক্রিয়াও বিশ্বাস উৎপাদন করিতে পারে। কোনো উদ্দেশ্যলাভের জন্য ক্রিয়া-সম্পাদনে, ঐ ক্রিয়ায় অবলম্বিত উপায়গুলি যে উদ্দেশ্য সাধনের অনুকূল, এইরূপ বিশ্বাস না থাকিলে ক্রিয়া অসম্ভব হইয়া পড়ে। সুতরাং বিশ্বাস ক্রিয়ার ভিত্তি হইয়া দাঁড়ায়। আবার, কোনো বিশ্বাস যদি ক্রিয়ায় পরিণত না হইতে পারে, তাহা হইলেও উহা বিশ্বাসপদবাচ্য হইতে পারে না। সুতরাং ক্রিয়াকেও বিশ্বাসের ভিত্তি বলিতে হয়।

(৫) **কার্যকালীন প্রয়োজনও** (practical necessity) বিশ্বাসের জনক হইতে পারে। যেমন নিমজ্জমান ব্যক্তি ভাসমান তৃণকেও তাহার জীবনরক্ষার উপায় বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারে।

(ঘ) বিশ্বাসের সামাজিক ভিত্তি ও কারণ

উপরোক্ত কারণগুলির অধিকাংশ বিশ্বাসের ব্যক্তিগত কারণ বা ভিত্তি। কিন্তু ব্যক্তিগত কারণ ছাড়াও বিশ্বাসের সামাজিক কারণ রহিয়াছে।

শিশু যে পরিবারে জন্ম ও শিক্ষা লাভ করে, যে বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করে, যে পল্লীতে বা পরিবেশে বর্ধিত হয় এবং যে রাষ্ট্রের নাগরিক, তাহার প্রভাব অতিক্রম করিতে পারে না। পিতা-মাতা, ভ্রাতা-ভগ্নী শিক্ষক-শিক্ষিকা, বন্ধু-বান্ধব প্রভৃতি তাহার মনের উপর অসীম প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকেন। ফলে শিশুর মনে কতগুলি সংস্কার, ধারণা বা আদর্শে বিশ্বাস দৃঢ়মূল হয়। যেমন সাধারণ শিশু হয়ত বিশ্বাস করে যে পিতাই পরম ধর্ম, স্বর্গ এবং দেবতা, আবার মাতা স্বর্গাদপি গরীয়সী। এইরূপে ধর্মানুষ্ঠান, উপাসনা, প্রার্থনা প্রভৃতি পারিবারিক এবং সামাজিক কর্মপ্রণালী সাধারণতঃ শিশুর মনে বিশ্বাস জন্মায় যে ঈশ্বর আছেন, আত্মা আছে এবং আত্মার জন্মমৃত্যু নাই প্রভৃতি।

সামাজিক রীতি-নীতি আচার-বিচার, সংস্কার-ধারণা, আদর্শ- আকাঙ্ক্ষা ব্যক্তিমনে সংক্রামিত হয় এবং ঐগুলির প্রতি বিশ্বাস উৎপাদন করে। সামাজিক উত্তরাধিকারের (social heritage) প্রভাবে ব্যক্তিমন সমাজের সংস্কৃতি ও কৃষ্টিতে শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস করে। এই বিশ্বাস প্রায়ই যুক্তিতর্কের প্রভাবে বিকৃত হয় না এবং ব্যক্তিবিকাশের উপর প্রভাব বিস্তার করে।

৩। বিশ্বাস অবিশ্বাস ও সংশয়

বিশ্বাস (belief), অবিশ্বাস (disbelief) এবং সংশয়ের (doubt) মধ্যে পার্থক্য রহয়াছে। এই পার্থক্য জানা আবশ্যক।

ভাব অথবা ধারণার সহিত বস্তুর সামঞ্জস্যে নিশ্চিত বোধকে বিশ্বাস বলে। বিশ্বাস ইতিবাচক (positive) মনোভাব। অবিশ্বাস কিন্তু বিশ্বাসের অভাব মাত্র নয়। ইহাও একপ্রকার বিশ্বাস। অবিশ্বাস বলিতে বুঝায় নেতিবাচক (negative) বিশ্বাস—অর্থাৎ ভাব অথবা ধারণার সহিত বিষয়ের সামঞ্জস্য নাই এইরূপ নিশ্চয়তাবোধ। ঈশ্বর সম্বন্ধে সকলের মনেই ধারণা রহিয়াছে। এই ধারণানুযায়ী ঈশ্বর আছেন, এই নিশ্চয়তাবোধের নাম ঈশ্বরে বিশ্বাস এবং ইহার অনুযায়ী ঈশ্বর নাই, এই নিশ্চিতি-বোধের নাম অবিশ্বাস।

পক্ষান্তরে সংশয় বিশ্বাস এবং অবিশ্বাস হইতে ভিন্ন। মনোগত ধারণার সহিত

বিষয়ের সামঞ্জস্য থাকিতেও পারে বা নাও থাকিতে পারে, এইরূপ অনিশ্চিত মানস অবস্থাকে বলে সংশয় বা সন্দেহ। ঈশ্বরের মনোগত ধারণার সহিত তাঁহার বিষয়গত সত্যতার মিল আছে কিনা, অর্থাৎ ঈশ্বর কি আছেন, অথবা নাই, এই পরস্পরবিরুদ্ধ অথবা উভয়সংকটমূলক অবস্থাকে বলে সংশয়। বিশ্বাস ইতিবাচক এবং অবিশ্বাস নেতিবাচক জ্ঞান। কিন্তু সংশয় জ্ঞান-পদবাচ্য নয়। ইহা বিশ্বাস এবং অবিশ্বাস এই উভয়ের, সুতরাং জ্ঞানের, অভাব-বাচক মনোভাব।

বিশ্বাস, প্রতীতি (Trust) এবং আস্থা (Faith)

বিশ্বাস সমগ্র মনের অবস্থা, অর্থাৎ ইহা অবগতি, অনুভূতি এবং চেষ্টা বা ক্রিয়ামূলক মানসবৃত্তি। বিভিন্ন মনোবিদ্ বিশ্বাসের এই তিনটি উপাদানের উপর সমান গুরুত্ব আরোপ করেন নাই। কাহারও মতে বিশ্বাস অবগতিমূলক মনোবৃত্তি, কেহ বা মনে করেন যে ইহা অনুভূতিমূলক, কাহারও বা দাবী এই যে ইহা চেষ্টা বা ক্রিয়া-মূলক। এই তিনটি মতবাদই চরম এবং একদেশদর্শী। ইহাদের দোষগুণ পূর্বে আলোচিত হইয়াছে।

কিন্তু বিশ্বাস উপরোক্ত তিনটি উপাদানের সংমিশ্রণে গঠিত হইলেও, উহাদের **মাত্রা বা পরিমাণভেদ অনুসারে বিশ্বাসের প্রকারভেদ** হইতে পারে। অবগতি, অনুভূতি এবং চেষ্টা বা ক্রিয়ামূলক উপাদানের প্রাধান্য বা বা গৌণতা অনুসারে তিনটি স্তর রহিয়াছে। যথা, বিশ্বাস প্রধানতঃ অবগতি, জ্ঞান বা বুদ্ধিমূলক অবস্থা। বিষয় সম্বন্ধে নিশ্চয়তাব জ্ঞানই বিশ্বাসের প্রধান লক্ষণ। দ্বিতীয়তঃ, প্রতীতি বলিতে বুঝায় সেই প্রকারের বিশ্বাস, যাহাতে জ্ঞানমূলক ভঙ্গীটির তুলনায় চেষ্টা বা ক্রিয়ামূলক ভঙ্গীটি প্রধান। তৃতীয়তঃ, আস্থা বা শ্রদ্ধা এমন বিশ্বাস, যাহাতে জ্ঞানমূলক এবং চেষ্টামূলক ভঙ্গী দুইটির তুলনায় অনুভূতিমূলক ভঙ্গীটি প্রধান।

৪। বিশ্বাস ও জ্ঞান (Belief and Knowledge)

জ্ঞানের সহিত বিশ্বাস অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। বিশ্বাসহীন জ্ঞানকে জ্ঞান বলা যায় না। ব্যাপক অর্থে জ্ঞান একটি মৌলিক অবস্থা। জীবনের প্রথম চেতন মুহূর্ত হইতে ইহার সূত্রপাত। এই অর্থে জ্ঞান সহজ এবং অনায়াসলভ্য। যেমন, সদ্যোজাত শিশুও মাতৃগর্ভ হইতে বিচ্যুত হইয়া পৃথিবীর স্পর্শ সম্বন্ধে চেতন হয়।

কিন্তু জ্ঞান কথাটির উপরোক্ত অর্থ ব্যাপক। মনোবিকাশের উচ্চতর স্তরে ইহা একটি জটিল, আয়াসলভ্য এবং সঙ্কীর্ণ মানস অবস্থার অর্থে ব্যবহৃত হয়। এই অর্থে,

জ্ঞানের নিম্নোক্ত কারণগুলি পাওয়া যায়। (১) জ্ঞান নির্ভর করে বিষয় সম্বন্ধে কতগুলি মনোগত ধারণার উপর। (২) ইহাতে এই ধারণাগুলির মধ্যে স্ব-সামঞ্জস্য বা স্ব-বিরোধের অভাব থাকা আবশ্যক। (৩) আবার এই ধারণাগুলির সহিত উহাদের বিষয়ের সামঞ্জস্য থাকা চাই। (৪) চতুর্থতঃ, ধারণার সহিত বস্তুর সামঞ্জস্যে বিশ্বাস থাকা চাই।

শুধু ধারণার স্ব-সামঞ্জস্য জ্ঞানপদবাচ্য হইতে পারে না। আবার, স্ব-সুসমঞ্জস ধারণাসমষ্টির সহিত বিষয়ের সামঞ্জস্য থাকিলেই জ্ঞান হয় না, কিন্তু উহাদের সামঞ্জস্য সম্বন্ধে নিশ্চয়তা বোধ অথবা বিশ্বাস থাকিলেই জ্ঞান হয়।

যেমন জ্যোতির্বিদ টলেমির মতে পৃথিবী সৌরজগতের কেন্দ্র, যাহাকে কেন্দ্র করিয়া সূর্য পরিভ্রমণ করে। এই ধারণা স্ব-সুমঞ্জস বা স্ব-বিরোধমুক্ত ছিল। তাহা ছাড়া, এই ধারণা যে পৃথিবী ও সূর্যের বাস্তব সম্বন্ধের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ, টলেমি এইরূপ বিশ্বাসও পোষণ করিয়াছেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও, এই বিশ্বাসকে জ্ঞান বলা যায় না, কারণ সূর্য পৃথিবীর চারিদিকে আবর্তন করে, এই ধারণা স্ব-সামঞ্জস্যপূর্ণ হইলেও এবং এই সামঞ্জস্যে বিশ্বাস থাকিলেও, ইহাতে বাস্তব সামঞ্জস্যের অভাব রহিয়াছে। আসলে সূর্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরে না, কিন্তু পৃথিবীই সূর্যের চারিদিকে ঘুরিয়া থাকে। সুতরাং টলেমীয় মতবাদে জ্ঞানের উপরোক্ত প্রথম, দ্বিতীয় এবং চতুর্থ কারণ কয়টি থাকিলেও, উহার তৃতীয় কারণটি—যথা স্ব-সামঞ্জস্যপূর্ণ ধারণার সহিত বাস্তব অবস্থার সামঞ্জস্য—নাই বলিয়া উহাকে জ্ঞান বলা অসঙ্গত

আবার, স্ব-সামঞ্জস্যপূর্ণ ধারণারাশির সহিত বাস্তব অবস্থার সামঞ্জস্য থাকিযাও উহাতে বিশ্বাস না থাকিলে, প্রকৃত জ্ঞান হয় না। যেমন একটি শব্দের বানান শুদ্ধ লিখিয়া কাটিয়া দেওয়ার দৃষ্টান্ত বিরল নয়। বানানটি যে ঠিক—এই বিশ্বাসের অভাবই উহা জ্ঞান না হইবার এবং কাটিয়া দিবার কারণ।

দেখা যাইতেছে যে সকল যথার্থ জ্ঞানই বিশ্বাসমূলক, যদিও সকল বিশ্বাসই যথার্থ জ্ঞানমূলক নয়। অর্থাৎ বিশ্বাস না থাকিলে যথার্থ জ্ঞান হয় না, কিন্তু যথার্থ জ্ঞান না থাকিলেও বিশ্বাস থাকিতে পারে। তাহা ছাড়া, বিশ্বাস যেমন জ্ঞানমূলক তেমনই অনুভূতি ও চেষ্টামূলক। উপরন্তু, জ্ঞান শুদ্ধ অথবা তাত্ত্বিক (pure, theoretical), কিন্তু বিশ্বাস কার্যকরী বা ব্যবহারিকও বটে।

৫। বিশ্বাস ও কল্পনা (Belief and Imagination)

ঐচ্ছিক কল্পনা ও বিশ্বাস

কল্পনা ও বিশ্বাসের সম্বন্ধ অতিশয় ঘনিষ্ঠ। বিশেষ করিয়া, ঐচ্ছিক কল্পনা যে বিশ্বাসের ভিত্তি বা কারণ হইতে পারে আমরা তাহা দেখিয়াছি। এইরূপ কল্পনায় যাহা খুশি তাহাই কল্পনা করিয়া যাইবার স্বাধীনতা নাই। ইহা কোনো উদ্দেশ্য সাধনের প্রয়োজন দ্বারা পরিচালিত বা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং উদ্দেশ্য অনুযায়ী উপায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়। যেমন তাজমহলের উপর একটি কবিতা রচনা করিতে হইলে, অথবা উহার ছবি আঁকিতে হইলে, ঐ বস্তুটির দ্বারা কল্পনাকে সংযমিত এবং নিয়ন্ত্রিত করা আবশ্যক হয়।

ঐচ্ছিক কল্পনায়, স্টাউট্-এর ভাষায়, **ব্যক্তির ক্রিয়ার উপর বস্তুর নিয়ন্ত্রণ** (objective control of subjective activity) রহিয়াছে। স্টাউট্এর মতে এই বস্তুগত নিয়ন্ত্রণ অথবা সংশোধনই (objective coercion) বিশ্বাসের সারভূত ধর্ম। ঐচ্ছিক কল্পনায় বিশ্বাস বর্তমান। সুতরাং এই কল্পনায় ব্যক্তির ক্রিয়ার উপর বস্তুগত নিয়ন্ত্রণ বা সংশোধন থাকে।

অনৈচ্ছিক কল্পনা ও বিশ্বাস

অনৈচ্ছিক কল্পনার সহিত বিশ্বাসের সম্বন্ধ ভিন্ন প্রকারের। অনৈচ্ছিক বা স্বতঃক্রিয় কল্পনা অল্পাধিক পরিমাণে বিশ্বাসমুক্ত। যেমন আকাশ-কুসুম কল্পনা একপ্রকার অনৈচ্ছিক কল্পনা। এই কল্পনায় বস্তুগত নিয়ন্ত্রণ নাই, সুতরাং বিশ্বাসও নাই। তেমনই শশবিষাণের (খরগোশের শিং) বা মৎসকন্যার কল্পনাও বিশ্বাসমুক্ত। কিন্তু এই শ্রেণীর স্বতঃক্রিয় কল্পনায় এবং জাগরস্বপ্নে (day-dream) বাস্তব নিয়ন্ত্রণ না থাকিলেও, চিন্তার আকারগত নিয়মগুলির, যেমন বিরোধ-সূত্র (Law of Contradiction) অথবা তাদাত্ম্য সূত্রের (Law of Identity) নিয়ন্ত্রণ থাকে। আকাশ-কুসুম, শশবিষাণ, কচ্ছপ-কেশ বা মৎস্যকন্যার কল্পনায় আত্মবিরোধ নাই। আকাশে ফুল ফুটিয়াছে, শশক বা খরগোশের শিং গজাইয়াছে, কচ্ছপের কেশোদ্গম হইয়াছে, অথবা কোনো কন্যার নিম্নাংশ মৎস্যাকৃতি হইয়াছে—এই জাতীয় কল্পনায় কোনো স্ব-বিরোধ নাই, যদিও বাস্তব বিরোধ রহিয়াছে। অর্থাৎ এই সকল কল্পনায় বাস্তব নিয়ন্ত্রণ বা সংশোধন না থাকিলেও, আকারগত নিয়ন্ত্রণ রহিয়াছে।

বিশ্বাসের পরিমাণ অনুসারে তিন প্রকারের কল্পনা

বিশ্বাসের অল্পাধিক্য অনুসারে কল্পনাকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। (১) প্রথমতঃ, যে কল্পনা সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাসাশ্রয়ী অথবা যাহাতে ব্যক্তিগত কল্পনার বিষয়গত নিয়ন্ত্রণ থাকে—যেমন বাড়ি তৈয়ারী করিবার পূর্বে বাড়ির নক্সা কল্পনা—তাহা ঐচ্ছিক কল্পনা। (২) দ্বিতীয়তঃ, যে কল্পনা সম্পূর্ণ বিশ্বাসমুক্ত, যেমন জাগরস্বপ্ন অথবা স্বতঃক্রিয় কল্পনা, তাহা অনৈচ্ছিক। ইহাতে কল্পনার আকারগত সত্যতায় (formal truth) বিশ্বাস থাকিলেও উহার বাস্তব সত্যতায় (material truth) বিশ্বাস নাই। এই জাতীয় কল্পনার উদাহরণ পূর্বে দেওয়া হইয়াছে। (৩) তৃতীয়তঃ, উপরোক্ত দুই প্রকারের চরম কল্পনার মধ্যবর্তী আর এক প্রকারের কল্পনা সম্ভব। এই কল্পনায় আংশিকভাবে বিশ্বাস রহিয়াছে, আবার আংশিকভাবে বিশ্বাস নাইও। যেমন তাজমহলের উপর কবিতা লিখিতে গিয়া অনেক কল্পনা করিতে হয় যাহার সত্যতায় বিশ্বাস আছে, আবার আরও অনেক কল্পনা আসিয়া পড়ে যাহাতে বিশ্বাসের অভাব আছে। একটি উপন্যাস লিখিতে অনেক কাল্পনিক ঘটনা বানাইয়া লিখিতে হয়, যাহার সহিত বাস্তবের সামঞ্জস্য নাই অথবা যাহাতে বিশ্বাস নাই, আবার এমন অনেক ঘটনাও কল্পনা করিতে হয় যেগুলির সত্যতায় বিশ্বাস আছে।

অনুশীলনী (Exercise)

1. Define belief. Analyse the factors involved in belief.
(Ans.—pp. 130-131)

   বিশ্বাসের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। উহা বিশ্লেষণ কর।

2. What are the grounds and conditions of belief ?
(Ans.—pp.131-135)

   বিশ্বাসের ভিত্তি ও কারণ কি কি ?

3. Distinguish between imagination with belief and imagination without belief. (Ans.—pp. 138-139)

   বিশ্বাসযুক্ত এবং বিশ্বাসমুক্ত কল্পনার প্রভেদ আলোচনা কর।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

শিক্ষণ (Learning)

১। শিক্ষণের সংজ্ঞা

অভিজ্ঞতা বা অনুশীলনের ফলে প্রতিক্রিয়ার সংস্কারসাধনকে (modification) শিক্ষণ বলে। প্রত্যেক উদ্দীপনার ফলে প্রতিক্রিয়ার সংস্কার বা পরিবর্তন ঘটে। যেমন প্রথম পাঠে একটি কবিতা বুদ্ধিতে এবং মস্তিষ্কে অনুকূল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিতে পারে না। কারণ এই ক্ষেত্রে কবিতা পাঠরূপ উদ্দীপকের কোন পূর্ববর্তী সংস্কার নাই। কিন্তু পুনরাবৃত্তির ফলে উহার প্রতিকূলতা কমিতে থাকে এবং মস্তিষ্কে ও বুদ্ধিতে অনুকূল প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন হয়। কারণ এই ক্ষেত্রে কবিতা পাঠের পূর্ববর্তী সংস্কার গঠিত হইয়াছে। যে পাঠ্য বিষয়টি প্রথম পঠনে অত্যন্ত দুরূহ এবং নীরস বলিয়া মনে হয়, তাহাই প্রতিক্রিয়ার সংস্কার সাধন অথবা শিক্ষণের ফলে হইয়া দাঁড়ায় সহজ এবং সরস।

প্রায় সকল মানস এবং দৈহিক ক্রিয়াই শিক্ষণের ফলে ঘটিয়া থাকে। প্রত্যেকটি ক্রিয়াই প্রথমে পদে পদে বাধা সৃষ্টি করে। কিন্তু অভিজ্ঞতা ও অনুশীলনের ফলে সহজ হইয়া দাঁড়ায়। **যে ক্রিয়ার ফলে প্রতিকূল এবং দুরূহ কাজ অনুকূল এবং সহজ হইয়া দাঁড়ায়, তাহাকে শিক্ষণ বলে। অথবা, যে ক্রিয়া প্রত্যেক পরবর্তী অভিজ্ঞতা ও অনুশীলনকে পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতা ও অনুশীলনের তুলনায় উন্নততর করে, তাহাই শিক্ষণ।**

শারীরবৃত্তীয় দিক হইতে, যে ক্রিয়া প্রতিকূল দৈহিক বা নার্ভক্রিয়াকে অনুকূল করে, অথবা সংশ্লিষ্ট দৈহিক ক্রিয়াগুলিকে উহাদের উদ্দীপকে সাড়া দিতে সাহায্য করে, তাহাকে শিক্ষণ বলে। "হাঁটিতে শিখে না কেহ না খেয়ে আছাড়।" হাঁটিতে হইলে যে নার্ভ, পেশী এবং স্নায়ু প্রভৃতির সংযোজন দরকার, তাহা শিক্ষণ-সাপেক্ষ। দৈহিক ক্রিয়ার সংস্কার-সাধন এবং স্থায়ী সংগঠনও শিক্ষণের ফল।

শিক্ষা **অভ্যাস** বিশেষ। অনুশীলনের ফলে অভ্যাসগঠনের প্রাথমিক ক্লেশ স্বাচ্ছন্দ্যে পরিণত হয়, এবং অভ্যাস গৌণ স্বভাব (Second nature, Secondarily automatic) হইয়া দাঁড়ায়। শিক্ষার ফলেও অনুশীলনের প্রাথমিক ক্লেশ ক্রমে ক্রমে স্বভাবসুলভ হইয়া পড়ে। যে আজ অনায়াসে চোখ বুজিয়া সেলাই বা টাইপ করিয়া যাইতে পারে, তাহার পক্ষে এই ক্রিয়া শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে খুবই আয়াসসাধ্য

ব্যাপার ছিল। যে ছাত্র আজ অবলীলাক্রমে বই পড়িয়া যায়, তাহাকেই একদিন বহু ক্লেশে বর্ণমালার মরুভূমি পার হইতে হইয়াছিল। সুতরাং **অনভ্যস্ত বা নূতন বিষয়ে অভ্যস্ত হওয়াকেও শিক্ষা বলা যাইতে পারে।**

২। শিক্ষণ-গবেষণায় পশুব্যবহার

শিক্ষা-গবেষণায় মনোবিদ্‌গণ তাঁহাদের পাত্র হিসাবে উচ্চতর প্রাণী বা পশুর ব্যবহার করিয়াছেন। মানুষের শিক্ষণপ্রণালী কল্পনা চিন্তন প্রভৃতি উচ্চতর মানস-বৃত্তির প্রভাবমুক্ত নয়, সুতরাং অল্পবিস্তর বিকৃত বা অশুদ্ধ। কিন্তু ইঁদুর, বিড়াল, কুকুর, বানর, শিম্পাঞ্জী প্রভৃতি উচ্চতর পশুর শিক্ষণপ্রণালী অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ, কারণ উহা কল্পনা, চিন্তন প্রভৃতি উচ্চতর মানসবৃত্তির প্রভাবমুক্ত। তাহা ছাড়া, উচ্চতর পশুকে যেমন প্রাকৃতিক পরিবেশে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব, মানুষকে তেমন করা সম্ভব হয় না। অধিকন্তু, উচ্চতর পশুকে যেমন প্রয়োগশালার নিয়ন্ত্রণাধীন অবস্থায় পরীক্ষা করা যায়, মানুষকে তেমন করা যায় না। এই সকল নানা কারণে শিক্ষণ-গবেষণায় মানুষের তুলনায় উচ্চতর পশুর ব্যবহার অপেক্ষাকৃত বেশী।

লয়েড্ মর্গ্যান-এর সূত্র (Lloyd Morgan's Canon)

উচ্চতর পশুর শিক্ষণপ্রণালীকে মানুষের শিক্ষণপ্রণালীর মানদণ্ডে বিচার করা অনুচিত। বিখ্যাত প্রাণিমনোবিদ লয়েড্ মর্গ্যান্ তাঁহার সূত্রে এই নির্দেশ দিয়াছেন: **"কোনো ক্রিয়াকে নিম্নতর মানসবৃত্তির ফলরূপে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হইলে, কোনোমতেই উচ্চতর মানসবৃত্তির ফলরূপে ব্যাখ্যা করা উচিত নয়।"** যেমন' একটি কুকুরকে বেড়া দিয়া ঘেরা উঠানে রাখা হইলে, সে যদি মুখ দিয়া উহার দরজার খিল খুলিয়া ফেলে, এইরূপ মনে করা উচিত নয় যে কুকুরটি যুক্তির সাহায্যে এই সমস্যার সমাধান করিয়াছে। পক্ষান্তরে আবদ্ধ অবস্থা হইতে মুক্ত হইবার লক্ষ্য, এই লক্ষ্যে পৌঁছিবার নির্দিষ্ট উপায়ের অভাব, নানা পথে ঘুরিয়া ফিরিয়া ও অবস্থাটি পর্যবেক্ষণ করিয়া শেষ পর্যন্ত ঠিক পথ পাইয়া লক্ষ্যে পৌঁছানো, প্রভৃতি ক্রিয়াগুলিই কুকুরের উক্ত আচরণ বুঝিবার পক্ষে যথেষ্ট। প্রথমে কুকুরটি শিখিল, কোথায় এবং কোন স্থানে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে এবং তারপর সে শিখিল, কোন্ জিনিসটি বা যন্ত্রটির সাহায্যে তাহার লক্ষ্যে পৌঁছিতে হইবে। প্রথমটি হইল **স্থান-শিক্ষণ** (place-learning) এবং দ্বিতীয়টি হইল **যন্ত্র-শিক্ষণ** (tool-learning)।

৩। **শিক্ষণ-মতবাদ** (Theoies of Learning)

কি প্রণালীতে শিক্ষণ ঘটে, এই বিষয়ে মনোবিদ্‌গণ একমত নহেন। কেহ কেহ, যেমন **থর্নডাইক** মনে করেন যে **শিক্ষণ** একটি যান্ত্রিক ও অন্ধ ক্রিয়া (mechanical and blind process) এবং ইহাতে বুদ্ধির বা চেতনার নিয়ন্ত্রণ নাই। অন্ধ আবেগের বশবর্তী হইয়াই পশু লক্ষ্যে পৌঁছাইতে শিক্ষা করে। শিক্ষণের মূলে থাকে **পুনঃ পুনঃ** চেষ্টা বা পরীক্ষা। প্রাথমিক চেষ্টায় ভুলের সংখ্যা থাকে বেশী। চেষ্টার পুনরাবৃত্তির ফলে, ভুলের সংখ্যা কমিতে থাকে এবং সর্বশেষে নির্ভুল সাফল্য লাভ হয়। থর্নডাইক্-প্রবর্তিত শিক্ষা মতকে **চেষ্টা ও ভ্রম সংশোধন** (Trial and Error Theory) মতবাদ বলা হইয়া থাকে।

আবার কেহ কেহ, যেমন **প্যাভ্‌লো, বিচ্‌টিরিও, ওয়াট্‌সন্** প্রভৃতি মনে করেন যে শিক্ষণ সাপেক্ষ-প্রতিবর্ত (Conditioned Reflex) বিশেষ। স্বাভাবিক বা নিরপেক্ষ প্রতিবর্ত উহার স্বাভাবিক উদ্দীপকের প্রতিক্রিয়ারূপেই উৎপন্ন হয়। কিন্তু ঐ স্বাভাবিক উদ্দীপকের সহিত অস্বাভাবিক উদ্দীপক উপস্থাপিত করা হইলে দ্বিতীয়টি প্রথমটির প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন করে। **অস্বাভাবিক উদ্দীপক দ্বারা উৎপন্ন প্রতিক্রিয়াকে সাপেক্ষ প্রতিবর্ত** বলে। শিক্ষণই জ্ঞাত বস্তুর সাহায্যে অজ্ঞাতকে জানা, অর্থাৎ স্বাভাবিক উদ্দীপকের প্রতিক্রিয়াটিকে কোনো অস্বাভাবিক উদ্দীপকের দ্বারা উৎপন্ন করিতে শেখা বুঝায়।

শিক্ষণ সম্বন্ধে তৃতীয় মতবাদটি **গেস্টাল্ট্‌** মনোবিদ্‌গণের **পরিজ্ঞান** মতবাদ (Insight Theory of Learning)। নানা প্রচেষ্টা বা পরীক্ষায় ভুলভ্রান্তি সংশোধনের ফলে শিক্ষণ ঘটে না। শিক্ষণ ঘটে শিক্ষণীয় বিষয়ের সমগ্র রূপটির আকস্মিক পরিজ্ঞান ফলে।

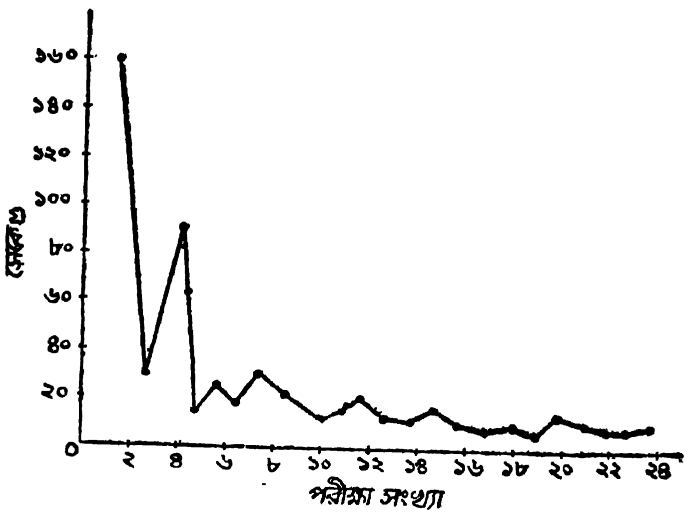
৪। চেষ্টা ও ভ্রম সংশোধন মতবাদ
(Trial and Error Theory of Learning)

থর্নডাইক্-এর (Thorndike) চেষ্টা ও ভ্রম সংশোধন মতবাদ তাঁহার দ্বারা পরিচালিত মাছ, মুরগীশাবক, বিড়াল, কুকুর এবং বানরের উপর দীর্ঘ গবেষণার ফল। থর্ণডাইক বলেন যে "**শিক্ষণ বলিতে বুঝায় উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সম্বন্ধ-স্থাপন। ইহা একটি অন্ধ যান্ত্রিক ক্রিয়া, যাহাতে একবার ভুল করিয়া, আবার ভুল সংশোধন করিয়া অগ্রসর হইতে হয়।**" শিক্ষণ বুদ্ধি বা বিচারগত নয়,

কিন্তু যান্ত্রিক এবং অন্ধ। থর্নডাইক্-এর মতবাদকে 'যোগসূত্র স্থাপনের মতবাদও (Connectionism, The Bond Theory of Learning) বলা হয়।

থর্নডাইক্-এর অসংখ্য পশু-শিক্ষা-গবেষণার মধ্যে **বিড়ালের উপর পরীক্ষা-মূলক গবেষণাই** সমধিক প্রসিদ্ধ। বিড়ালের শিক্ষণপ্রণালী নির্ণয়ের জন্য তিনি একটি ক্ষুধার্ত বিড়ালকে ধাঁধা পিঞ্জরের (puzzle box) ভিতর আটকাইয়া রাখিলেন। ঐ ধাঁধা পিঞ্জরের একটু দূরে উহার প্রিয় খাদ্য মাছ থাকিল। ক্ষুধার্ত বিড়ালটি এই অবস্থায় নানাপ্রকার প্রতিক্রিয়া আরম্ভ করিল। প্রথমেই সে পিঞ্জরের ভিতর মাথা ঢুকাইতে, মাছ টানিয়া লইবার জন্য থাবা বাড়াইতে এবং পিঞ্জরের গবাদে আঁচড়াইতে ও কামড়াইতে থাকিল। কিন্তু তাহার সকল প্রচেষ্টাই বিফল হইল। এইরূপ চেষ্টা করিতে করিতে **হঠাৎ** তাহার থাবার আঘাতে, যে দড়িতে পিঞ্জরের দরজাটি বাঁধা ছিল, সেই দড়িটি খুলিয়া গেল। বিড়াল পিঞ্জরমুক্ত হইয়া বাহিরে আসিয়া মাছ খাইল এবং সন্তুষ্ট হইল।

বিড়াল এখনও কিন্তু পিঞ্জর খুলিতে শিখে নাই। তাহার থাবায় লাগিয়া পিঞ্জরের ছিট্‌কানিটি ঘটনাচক্রে খুলিয়া গিয়াছে মাত্র। বার বার ক্ষুধার্ত বিড়ালটিকে ধাঁধা পিঞ্জরে আটকাইয়া রাখিয়া থর্নডাইক্ উহার পিঞ্জর খুলিয়া মাছ খাইতে শেখার



২০ নং চিত্র—বিড়ালের শিক্ষা চিত্র

প্রণালী লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। প্রত্যেক পরবর্তী পরীক্ষায় বিড়ালের ভুল

প্রতিক্রিয়ার সংখ্যা এবং দড়ি টানিয়া খাঁচার বাহিরে আসিয়া মাছ খাইবার সময়ও, ক্রমশঃ কমিয়া আসিল। সর্বশেষ পরীক্ষায় সে ভুল চালচলনে বিন্দুমাত্র সময়ক্ষেপ না করিয়াই লক্ষ্যে পৌঁছাইতে শিখিল। বলা যাইতে পারে, বিড়াল এইবার খাঁচার দরজা খুলিয়া লক্ষ্যে পৌঁছাইতে শিখিয়াছে।

খাঁচার দরজা খুলিয়া খাদ্যে পৌঁছাইতে **চব্বিশটি** ক্রমিক পরীক্ষায় বারো নম্বর বিড়ালটির যথাক্রমে ১৬০, ৩০, ৯০, ৬০, ১৫, ২৮, ২০, ৩০, ২২, ১১, ১৫, ২০, ১২, ১০, ১৪, ১০, ৮, ৮, ৫, ১০, ৮, ৬, ৬, ৭ সেকেণ্ড সময় লাগিয়াছে। ২০নং লেখ বা চিত্রে এই পরীক্ষাফল দেখানো হইল।

উপরের লেখ বা চিত্র হইতে বুঝা যায় যে বিড়ালের লক্ষ্যে পৌঁছিবার সময় অনিয়মিতভাবে হইলেও, ক্রমশঃ কমিতে থাকে। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে বিড়ালের ভুল বিচলনগুলি ক্রমশঃ মুছিয়া গিয়া (Stamped out) শুদ্ধ বিচলনগুলি থাকিয়া যায় (stamped in)।

৫। থর্নডাইক-উদ্ভাবিত শিক্ষাসূত্র
(Laws of Learning)

বিভিন্ন পশুর উপর পরীক্ষা ফলে থর্নডাইক্ কয়েকটি শিক্ষাসূত্র বা নিয়ম আবিষ্কার করিয়াছেন।

(১) **ফল-সূত্র** (Law of Effect): কোন উদ্দীপকের সহিত প্রতিক্রিয়ার পরিবর্তনীয় সম্বন্ধের ফলে, সন্তোষজনক অবস্থায় উহাদের সম্বন্ধ দৃঢ়তর হয় এবং বিরক্তিজনক অবস্থায় দুর্বলতর হয়। পরিবর্তনীয় সম্বন্ধ বলিতে বুঝায় শিক্ষার দ্বারা পরিবর্তনীয় সম্বন্ধ। কতগুলি উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধ অপরিবর্তনীয়, যেমন শ্বাস-প্রশ্বাস, হজমক্রিয়া, মণিপ্রতিবর্ত (pupilary reflex), নাকডাকা প্রভৃতি।

উপরোক্ত দৃষ্টান্তে বিড়ালের খাদ্যরূপ লক্ষ্যে পৌঁছানো নানা পরিবর্তিত বিচলনের উপর নির্ভর করে। যে বিচলনগুলি লক্ষ্যে পৌঁছিবার সহায়ক, সেইগুলি উহার ক্ষুধা-নিবারণরূপ সন্তোষজনক অবস্থার উদ্ভব করে, সুতরাং সেইগুলির সম্বন্ধ দৃঢ়তর হয় এবং উহারা টিকিয়া থাকে। কিন্তু যে বিচলনগুলি লক্ষ্যে পৌঁছিবার প্রতিকূল, সেইগুলি উহার ক্ষুধা না মিটাইয়া বিরক্তিকর অবস্থার সৃষ্টি করে, সুতরাং উহাদের সম্বন্ধ দুর্বলতর হয় এবং উহারা মুছিয়া যায়।

ফলসংক্রান্ত নিয়মকে **পুরস্কার ও দণ্ডসংক্রান্ত নিয়মও** (Law of Reward and Punishment) বলা যায়। বিড়ালের যে বিচলন বা চেষ্টা খাদ্যলাভে সহায়তা করে,

সেইগুলির ফলে সে সন্তুষ্ট বা পুরস্কৃত হয়। আবার যেগুলি খাদ্যলাভে সহায়তা করে না, উহাদের ফলে সে অসন্তুষ্ট বা দণ্ডিত হয়। উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ায় যে পরিবর্তনীয় সম্বন্ধ পুরস্কার এবং দণ্ড আনে, তাহা যথাক্রমে দৃঢ়তর এবং দুর্বলতর হয়।

(২) **অনুশীলন বা পৌনঃপুনিকতা সূত্র** (Law of Exercise or Frequency): অনুশীলন বা পৌনঃপুনিকতা নিয়মের দুইটি দিক, যথা অনুশীলন এবং অনুশীলনের অভাব। কোনো উদ্দীপকের সহিত প্রতিক্রিয়ার পরিবর্তনীয় সম্বন্ধ স্থাপিত হইলে, অনুশীলনের সম্বন্ধটিকে দৃঢ়তর করে, আবার উহা স্থাপিত না হইলে, অনুশীলনের অভাব সম্বন্ধটিকে দুর্বল করে। অবশ্য উভয় ক্ষেত্রেই প্রথম নিয়মটি অক্ষুণ্ণ থাকা চাই, অর্থাৎ অনুশীলনের এবং অনুশীলনের ক্ষেত্রে সম্বন্ধটি যথাক্রমে সন্তোষজনক এবং অসন্তোষজনক হওয়া চাই। অনুশীলন নিয়মের সহিত সম্বন্ধের **তীব্রতা** (intensity) এবং **সাম্প্রতিকতা** (recency) বিশেষভাবে জড়িত। উজ্জ্বল আলোক, উচ্চ শব্দ প্রভৃতি তীব্র উদ্দীপকের সহিত পুনঃপুনঃ অনুশীলিত প্রতিক্রিয়ার পরিবর্তনীয় সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। আবার যে সম্বন্ধটি সম্প্রতি স্থাপিত হইয়াছে, তাহা অতীতে স্থাপিত সম্বন্ধ অপেক্ষা দৃঢ়তর হয়। অনুশীলন এবং ফলসংক্রান্ত নিয়ম দুইটি একযোগে কাজ করে। সাধারণতঃ যে ক্রিয়া সন্তুষ্ট অথবা পুরস্কৃত করে, তাহারই অনুশীলন হয় এবং যাহা বিরক্ত বা দণ্ডিত করে, তাহার অনুশীলন হয় না। ফলে, প্রথমোক্ত ক্রিয়াটি থাকিয়া যায়, কিন্তু দ্বিতীয়োক্তটি থাকে না।

(৩) **প্রস্তুতি সংক্রান্ত নিয়ম** (Law of Readiness): থর্নডাইক্ এই নিয়মকে প্রধানতঃ নার্ভক্রিয়ার প্রস্তুতি অর্থে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। নার্ভতন্ত্রের উপর উদ্দীপকের ক্রিয়ায় যে নিউরোন্‌গুলি সক্রিয় হইয়া নার্ভপ্রবাহের আকারে ঐ উত্তেজনাকে নার্ভকেন্দ্রে লইয়া যায়, ঐ নিউরোনগুলিকে পরিবহন একক (conduction unit) বলা যাইতে পারে। সকল পরিবহন-এককই উত্তেজনা গ্রহণ করিয়া, উহাকে নার্ভকেন্দ্রে পরিচালিত করিতে সর্বদা প্রস্তুত থাকে না। উত্তেজনাকে পরিচালিত করিতে প্রস্তুত পরিবহন-এককের পক্ষে উহা পরিচালনা করা সুখকর, কিন্তু ইহাতে প্রস্তুত নয় এমন পরিবহন-এককের পক্ষে উহা পরিচালনা করা কষ্টকর।

কয়েকটি গৌণ নিয়ম

(১) **একই উদ্দীপকের বহু প্রতিক্রিয়া-সূত্র** (Law of Multiple Response to the Same External Situation): উপরোক্ত তিনটি প্রধান নিয়ম ছাড়াও থর্নডাইক্ আরও পাঁচটি গৌণ নিয়ম উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথমটি হইল একই বাহ্য

উদ্দীপকের বহু প্রতিক্রিয়া সংক্রান্ত নিয়ম। যেমন পিঞ্জরাবদ্ধ বিড়াল খাদ্য-দর্শনরূপ উদ্দীপকের প্রতিক্রিয়ায় নানা রূপে অঙ্গচালনা করে অথবা নানারূপে ক্রিয়াশীল হয়।

(২) **প্রতিন্যাস, প্রস্তুতি অথবা স্বভাবের নিয়ম** (Law of Attitude, Set or Disposition): দ্বিতীয় গৌণ নিয়মটি হইল প্রতিন্যাস, প্রস্তুতি অথবা স্বভাবের নিয়ম। ক্ষুধার্ত বিড়ালের প্রতিন্যাস, প্রস্তুতি এবং স্বভাব খাদ্যান্বেষণে সক্রিয় হয়। সে পিঞ্জরের দরজা খুলিবার জন্য অস্থির হয়, কিন্তু ক্ষুধা মিটিয়া গেলে, হয়ত পিঞ্জরেই শান্তভাবে ঘুমাইয়া পড়ে।

(৩) **আংশিক প্রতিক্রিয়া নিয়ম** (Law of Partial Activity): তৃতীয়টি হইল আংশিক সক্রিয়তার নিয়ম। যে বিড়াল অনেকগুলি পিঞ্জরের বাহিরে আসিতে শিখিয়াছে, সে অনভিজ্ঞ বিড়ালের তুলনায় নূতন পিঞ্জরের পার্শ্বে অবস্থিত ক্ষুদ্র বস্তুগুলির প্রতি বেশী মনোযোগী হয়। এই দিক দিয়া শিক্ষা বলিতে বুঝায় কোনো সমগ্র পরিস্থিতির অর্থপূর্ণ অংশ সম্বন্ধে প্রতিক্রিয়াশীল হওয়া। আংশিক প্রতিক্রিয়া সূত্রটি এই, "কোনো অবস্থার একটি অংশ বা উপাদানই কোনো কোনো ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ প্রতিক্রিয়াটি সৃষ্টি করিতে পারে, যদিও সমগ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিবার সম্পূর্ণ অবস্থাটি উপস্থিত নাও থাকিতে পারে।"

(৪) **সাদৃশ্য বা উপমান সূত্র** (Law of Assimilation or Analogy): চতুর্থ নিয়মটি হইল সাদৃশ্য অথবা উপমান নিয়ম। "এক অবস্থায় যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়, তাহা অনুরূপ অবস্থা দ্বারাও সৃষ্টি হইতে পারে, যদিও পূর্বে সেই অবস্থা স্বভাবতঃ সেই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিত না।" অতীতে যে সকল পরিস্থিতির কোনো প্রতিক্রিয়া ঘটে নাই, সেইগুলি উহাদের সদৃশ পরিস্থিতির প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন করে। যেমন নূতন পিঞ্জরে আবদ্ধ বিড়াল নূতন অবস্থার সম্মুখীন হইয়া, পুরাতন পিঞ্জরে আবদ্ধ থাকাকালে সে যে সকল অঙ্গচালনা করিয়াছিল, তাহার অনুরূপ অঙ্গচালনা করে।

(৫) পঞ্চম গৌণ নিয়মটি হইল **আনুষঙ্গিক পরিবর্তন নিয়ম** (Law of Associated Shifting): এই নিয়মটি সাপেক্ষ প্রতিবর্ত নিয়মের অনুরূপ। একটি প্রতিক্রিয়া উহার স্বাভাবিক উদ্দীপকের সহিত একসঙ্গে উপস্থাপিত উদ্দীপকের দ্বারাও উৎপন্ন হইতে পারে। যেমন পিঞ্জরাবদ্ধ ক্ষুধার্ত বিড়াল মাছের পাত্র দেখিয়া উহা পাইবার জন্য সচেষ্ট হয়।

৬। চেষ্টা ও ভ্রমসংশোধনবাদের সমালোচনা

গুণ

থর্নডাইক্-এর শিক্ষণ-মতবাদ মনোবিদ্যায় আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছে। বহু

পরীক্ষা ও প্রয়োগের ভিত্তিতে তাঁহার মতবাদ প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং প্রায়োগিক মনোবিদ্যায় ইহার **মূল্য বা গুণ** অপরিসীম।

শিক্ষণে যে চেষ্টা করিতে হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। আবার প্রথম চেষ্টায়ই যে শিক্ষণ ঘটে এমন নিশ্চয়তা নাই। পুনঃপুনঃ চেষ্টার ফলেই সাধারণতঃ শিক্ষণ ঘটিয়া থাকে। পুনঃপুনঃ চেষ্টার সার্থকতা পরবর্তী চেষ্টায় পূর্ববর্তী চেষ্টায় সংঘটিত ভুল শোধরানো। ফলে সব ভুলগুলি সংশোধিত হইয়া শিক্ষণ ঘটে। থর্নডাইক্ শিক্ষণের এই স্বীকৃত পথটিকে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা সাহায্যে স্থাপন করিয়াছেন। ইহাই মনোবিদ্যায় **তাঁহার মস্ত অবদান।** এই অতি সাধারণ কথা—"একবারে না পারিলে দেখ আর বার"—মানুষের বেলায় যেমন সত্য, পশুদের ক্ষেত্রেও তেমন সত্য। পশুর শিক্ষণপদ্ধতিকে থর্নডাইক্ বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া মনোবিদ্যায় যুগান্তর সৃষ্টি করিয়াছেন।

দোষ

(১) এই মতবাদের প্রধান দোষ এই যে ইহা **যান্ত্রিক** (mechanical)। ইহাতে শিক্ষায় উদ্দেশ্যমূলকতার স্থান নাই। অথচ অনেক মনোবিদের মতে, বিড়াল প্রভৃতি উচ্চতর পশুরা তো বটেই, এমন কি প্যারামিসিয়া, অ্যামিবা প্রভৃতি নিম্নস্তরের প্রাণীরাও অজ্ঞাত উদ্দেশ্যসাধনের জন্য নূতন পরিস্থিতির সম্মুখীন হইতে শিখে। অসংখ্য পুনরাবৃত্তি অথবা অনুশীলনও নিরর্থক হয়, যদি শিখিবার ইচ্ছা না থাকে। আবার শিখিবার ইচ্ছা থাকিলে, একবার অনুশীলনেও আশাতীত সুফল পাওয়া যায়।

ম্যাক্‌ডুগ্যাল্, উড্‌ওয়ার্থ প্রভৃতি মনোবিদ শিক্ষায় কোনো লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য প্রস্তুতি এবং লয়েড্ মর্গ্যান্ ইহাতে প্রচেষ্টার মধ্যে একাগ্রতা বা দৃঢ়তার স্থান স্বীকার করিয়াছেন। পিঞ্জরাবদ্ধ বিড়াল পিঞ্জরের বাহিরে আসিয়া খাদ্য না পাওয়া পর্যন্ত একনিষ্ঠভাবে চেষ্টা করিয়া যায়। সুতরাং উহার প্রচেষ্টা অন্ধ বা যান্ত্রিক নয়। চেতনা ও প্রত্যক্ষমূলক মনোযোগ, সুখ দুঃখ বেদনা প্রভৃতি মানসবৃত্তির সহিত ইহা সংশ্লিষ্ট। অথচ থর্নডাইক্ যেন বলিতে চান যে শিক্ষায় এই সকল উচ্চতর মানসবৃত্তির কোনো স্থান নাই।

(২) চেষ্টা ও ভুল করিতে করিতে ক্রমশঃ ভুল কমিয়া যায়। কিন্তু নিছক যান্ত্রিকভাবে অথবা আপনা-আপনি ভুলগুলি শোধরায় না। চেষ্টা ও ভুলের ফলাফল অনেকটা নির্ভর করে প্রাণীর **দৈহিক-মানসিক অবস্থার** উপর। কোনো পরিস্থিতিতে হয়ত ভুলগুলি প্রাণীকে এমন বিভ্রান্ত করিয়া ফেলে, যে উহা অন্ধভাবে একই

ভুলের পুনরাবৃত্তি করিয়া যাইতে থাকে। মানুষের ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে শাস্তি ভুল সংশোধনের পরিবর্তে আরও বদ্ধমূল করিয়া দেয়।

(৩) থর্নডাইক্ ধরিয়া লইয়াছেন যে শিক্ষা কতকগুলি পরস্পর-বিচ্ছিন্ন ঘটনার সংযোগ মাত্র। কিন্তু শিক্ষা একটি **সমগ্র** ব্যাপার। ইহাতে শিক্ষণীয় বিষয়ের সমগ্র রূপটির জ্ঞান বা চেতনা আবশ্যক। পিঞ্জরাবদ্ধ ক্ষুধার্ত বিড়াল খাঁচাটি এবং উহার বাহিরে স্থাপিত খাদ্য পরস্পর-বিচ্ছিন্নভাবে দেখে না, কিন্তু সে দেখে ক্ষুধা-খাদ্য-খাঁচা প্রভৃতির সমন্বয়ে একটি সমগ্র পরিস্থিতি।

(৪) থর্নডাইক্-উদ্ভাবিত নিয়মগুলিও অনেকাংশে অসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। যেমন **ফলসংক্রান্ত নিয়মের সহিত যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর সামঞ্জস্য নাই।** সাফল্য-জনিত সন্তোষ বা পুরস্কার এবং অসাফল্যজনিত বিরক্তি বা শাস্তি বিড়াল, ইঁদুর প্রভৃতি প্রাণীতে উচ্চতর মানসবৃত্তির আরোপ করে।

৭। ওয়াট্সন্-এর শিক্ষণ-মতবাদ

ওয়াট্সন্ বলিয়াছেন যে শুধু অনুশীলন বা পৌনঃপুনিকতা এবং সাম্প্রতিকতা, এই দুইটি নিয়ম দিয়াই শিক্ষা ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। তাঁহার মতে শিক্ষার ব্যাখ্যায় চেতনা বা মন-প্রভাবিত মানসবৃত্তি স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই। **পৌনঃপুনিকতা সূত্রের প্রয়োজন** এই যে ভ্রান্ত প্রতিক্রিয়ার তুলনায় সফল প্রতিক্রিয়ার সংখ্যা বেশী, কারণ প্রত্যেক প্রচেষ্টার পরিসমাপ্তি হয় সাফল্যলাভে, অথচ এই ভ্রান্ত প্রতিক্রিয়া প্রতি চেষ্টায় না ঘটিতে পারে। এই কারণেই বার বার চেষ্টার ফলে সাফল্য লাভ হয়। আবার যে চেষ্টায় সাফল্য লাভ ঘটে, তাহা **সাম্প্রতিকও** বটে, কারণ সকল প্রতিক্রিয়াই সর্বশেষ চেষ্টা। সেই কারণেও সফল প্রতিক্রিয়া স্থায়িত্বলাভ করে এবং বিফল প্রতিক্রিয়ার বিলোপ ঘটে।

ওয়াট্সনীয় মতের সমালোচনা

পক্ষান্তরে টম্সন্ অনুশীলন এবং সাম্প্রতিকতা নিয়ম অপেক্ষা ফল-সংক্রান্ত নিয়মকে প্রধান বলিয়া মনে করেন। থর্নডাইক্ স্বয়ং এই নিয়ম দুইটিকে ফল-সংক্রান্ত নিয়মের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট বলিয়া মনে করেন।

টম্সন্, ওয়াট্সনীয় মতবাদের সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে ফল-সংক্রান্ত নিয়মকে বাদ দিয়া শুধু অনুশীলন এবং সাম্প্রতিকতা নিয়মের সাহায্যে

শিক্ষার ব্যাখ্যা হইতে পারে না। সফল ক্রিয়াগুলি যে সর্বাধিক পুনঃপুনঃ ঘটিবে এমন কোনো নিশ্চয়তা নাই। হয়ত একই ভুল প্রতিক্রিয়ার বহুবার পুনরাবৃত্তি ঘটিতে পারে এবং এই ভুলটি বার বার অনুষ্ঠিত হইবার ফলে বদ্ধমূল হইয়া যাইতে পারে। আবার সাম্প্রতিকতাই যদি শিক্ষণের মূল-কারণ হয়, তাহা হইলে প্রত্যেকটি পূর্ববর্তী ভুল ক্রিয়া সাম্প্রতিক হওয়ায় পুনঃপুনঃ অনুষ্ঠিত হইবে। উপরন্তু শেষ সফল বা শুদ্ধ ক্রিয়া সর্বাপেক্ষা সাম্প্রতিক হওয়ায় পরবর্তী পরীক্ষায় প্রথমেই উহা অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত এবং অসাম্প্রতিক ভুল ক্রিয়ায় সময়ক্ষেপ হওয়া উচিত নয়। সুতরাং শুধু অনুশীলন বা সাম্প্রতিকতা শিক্ষণের মূল কারণ হইতে পারে না। ফল-সংক্রান্ত নিয়মের সহিত উহাদের যুক্ত করা দরকার। ম্যাক্‌ডুগ্যাল, কফ্‌কা প্রভৃতি মনোবিদেরা থর্নডাইক্ এবং ওয়াট্‌সন্-এর মতবাদকে যান্ত্রিক এবং বিকৃত বলিয়া সমালোচনা করিয়াছেন।

৮। সাপেক্ষ প্রতিবর্তবাদ
(Conditioned Reflex Theory)

প্যাভ্‌লো (Pavlov), **বিচ্‌টিরিও** (Bechterev) প্রভৃতি রুশ বিজ্ঞানীরা এবং **ল্যাশ্‌লি ও ওয়াট্‌সন্** প্রভৃতি চেষ্টিতবাদীরা শিক্ষণকে সাপেক্ষ প্রতিবর্তরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উদ্দীপক স্বভাবতঃ যে প্রতিবর্ত উৎপন্ন করে তাহাকে বলে **সরল** বা **নিরপেক্ষ প্রতিবর্ত** (Simple, Unconditioned Reflex) যেমন মাংসের সহিত জিহ্বার সংস্পর্শে কুকুরের লালা-নিঃসরণ প্রতিবর্ত ঘটে, অথবা জোর আওয়াজ শুনিবামাত্র শিশু ভয়ে চমকাইয়া ওঠে। কুকুরের জিহ্বার সহিত মাংস-সংস্পর্শের ঠিক পূর্বে বা সঙ্গে সঙ্গে যদি কয়েকবার একটি ঘণ্টা বাজানো হয়, তবে ঘণ্টার শব্দ শুনিবামাত্র কুকুরের লালা নিঃসরণ হইতে থাকে। অথবা জোর আওয়াজটি হইবার সঙ্গে সঙ্গে যদি কয়েকবার শিশুকে একটি সুন্দর খেলনা দেওয়া হয়, তবে সুন্দর খেলনাটি দেখিবামাত্র শিশু ভয়ে চমকাইয়া ওঠে। এই দুইটি স্থলে **ঘণ্টার শব্দ শুনিয়া** যে **লালা নিঃসরণ** এবং **সুন্দর খেলনা দেখিয়া** যে **ভয়** উৎপন্ন হয়, তাহা সাপেক্ষ প্রতিবর্ত।

এই মতে **শিক্ষা একপ্রকার সাপেক্ষ প্রতিবর্ত**। শুধু যে মনুষ্যেতর প্রাণীদের শিক্ষাই এইরূপ, তাহা নয়। মানুষের শিক্ষা, এমন কি সকল উচ্চতর মানস ক্রিয়াই, সাপেক্ষ প্রতিবর্তরূপে ব্যাখ্যাত হইতে পারে। প্যাভ্‌লো, বিচ্‌টিরিও প্রভৃতি রুশ

বিজ্ঞানীদের গবেষণা উচ্চতর প্রাণীদের ক্ষেত্রেই বিশেষভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু ক্রাস্‌নোগরস্কি, মিস মাতির, ওয়াটসন্, ল্যাশলে প্রভৃতি বিজ্ঞানীগণ শিশুর শিক্ষণ বিষয়ে পরীক্ষা ও প্রয়োগ করিয়া, মানুষের শিক্ষাও যে মূলতঃ সাপেক্ষ প্রতিবর্তই, এই মত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছেন।*

শিশুর স্বাভাবিক কৌতুহল অথবা জানিবার ঔৎসুক্যকে নূতন বা অজ্ঞাত বস্তুতে জাগাইয়া তোলা যায়। যে বস্তুতে শিশুর স্বাভাবিক ঔৎসুক্য আছে, উহার সহিত, যাহাতে শিশুর স্বাভাবিক ঔৎসুক্য নাই, সেই বস্তুর, অনুষঙ্গ-স্থাপনই এই মতে শিক্ষণের স্বরূপ। যেমন শিশু পাখী কি তাহা জানে, কিন্তু 'পাখী' নামটি জানে না। তাহাকে একটি পাখী দেখাইয়া, যদি কয়েকবার বলা হয় এইটি 'পাখী,' তবে তাহার পক্ষে পাখী কথাটি শিক্ষা করা সহজ হয়। এই ক্ষেত্রে শিশুর 'পাখী' কথাটির শিক্ষা পাখী বস্তুটির পূর্বজ্ঞানের অপেক্ষা রাখে।

সাপেক্ষ প্রতিবর্ত মতে সকল শিক্ষাই সাপেক্ষ প্রতিবর্ত। উচ্চতর শিক্ষার সহিত সহজ বা সরল শিক্ষার পার্থক্য শুধু জটিলতর এবং সহজতর সাপেক্ষ প্রতিবর্তের পার্থক্য। যে নিয়মে শিশু 'পাখী' কথাটিকে পাখীর জ্ঞানের সাপেক্ষ করিয়া শিক্ষা করে, সেই নিয়মেই নিউটন্ তাঁহার মাধ্যাকর্ষণ সূত্র অথবা শঙ্কর তাঁহার অদ্বৈতবাদ শিক্ষা করিয়াছেন।

সাপেক্ষ প্রতিবর্তবাদের সমালোচনা

সাপেক্ষ প্রতিবর্তবাদের গুণ এই যে ইহা থর্নডাইক্-এর ফল-সংক্রান্ত নিয়মের সাহায্য লয় না, সুতরাং উচ্চতর মানসবৃত্তির উপর নির্ভর না করিয়াই শিক্ষার ব্যাখ্যা করিতে পারে। কিন্তু থর্নডাইক্-প্রবর্তিত অনুশীলন এবং উহার সহকারী সাম্প্রতিকতা নিয়মটিকে এই মত স্বীকার করে। সাপেক্ষ উদ্দীপক যদি নিরপেক্ষ উদ্দীপকের সহিত পুনঃপুনঃ উপস্থাপিত হয়, তবেই সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ঘটিতে পারে।

প্রায়োগিক মনোবিদ্যায় সাপেক্ষ প্রতিবর্তবাদ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। এই গবেষণা শিশু-শিক্ষা ক্ষেত্রে যুগান্তর ঘটাইয়াছে। পূর্বে শিক্ষা ব্যাপারটি অস্পষ্ট ছিল। কিন্তু বর্তমানে ইহা যে স্পষ্টতর হইয়াছে, তাহার মূলে রহিয়াছে সাপেক্ষ প্রতিবর্তবাদের অনস্বীকার্য প্রভাব। শিক্ষায় অনুষঙ্গ ক্রিয়া করে, সন্দেহ নাই। শিশুর শিক্ষা যে মূলতঃ কতকগুলি সাপেক্ষ প্রতিবর্তের প্রতিষ্ঠা এবং অভ্যাসরূপ স্থায়ী সাপেক্ষ প্রতিবর্ত গঠন, তাহা সাম্প্রতিক মনোবিদ্যার একটি স্বীকৃত সত্য। মেধাবী

শিক্ষার্থী সহজেই সাপেক্ষ প্রতিবর্ত করিতে পারে, কিন্তু মন্দধী শিক্ষার্থী পারে না। তাহা ছাড়া, শিক্ষা যে শিক্ষকের আয়ত্তাধীন, সাপেক্ষ প্রতিবর্তবাদ সেইদিকে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। এই মতবাদ দেখাইয়াছে, ইচ্ছানুরূপ শিক্ষাপরিস্থিতি সৃষ্টি করিয়া আশানুরূপ শিক্ষাফল লাভ করা যায়।

কিন্তু সাপেক্ষ প্রতিবর্তবাদের এই যে দোষ ইহা যান্ত্রিকতাবাদ। ইহা শিক্ষার্থীর ইচ্ছা, আকর্ষণ, মনোযোগ প্রভৃতি উচ্চতর মানসবৃত্তিগুলিকে যথাযোগ্য স্থান দেয় না। শিক্ষার্থী যদি না শিখিতে চায়, অথবা শিক্ষণীয় বিষয়ে মনোযোগ না দেয়, তাহা হইলে শিক্ষা কোনো প্রকারেই সম্ভব নয়। তাহা ছাড়া, সকল উদ্দীপকই যে সাপেক্ষ হইতে পারে, এমন নয়। এমন কতকগুলি উদ্দীপক আছে, যাহা অন্য উদ্দীপকের পরিবর্তে কাজ করিতে পারে না। যেমন, মায়ের উপর শিশুর স্বাভাবিক টান বা আকর্ষণ থাকে, কিন্তু মায়ের সহিত যাহাকে দেখে, শিশু তাহাকেই মায়ের মত ভালবাসিতে শিখে না।

৯। পরিজ্ঞানবাদ (Insight Theory)

গেস্টাল্ট্ মনোবিদ্যার মতে শিক্ষা শুধু অন্ধ বা আকস্মিক চেষ্টা ও ভুলের যান্ত্রিক ফল নয়, অথবা সাপেক্ষ প্রতিবর্তও নয়, কিন্তু একটি সমগ্র শিক্ষণীয় পরিস্থিতির পরিজ্ঞান (insight)। অথবা শিক্ষা শুধু চেষ্টা ও ভুল-সংশোধনের ক্রমিক ফল নয়, কিন্তু সমগ্র পরিস্থিতির দ্রুত ও এককালীন পরিজ্ঞান-ফল।

কোয়েলার্-এর গবেষণা

ক্যানারি দ্বীপে অবস্থিত গবেষণাগারে কোয়েলার্ (Kohler) পরীক্ষা করিয়াছেন, কি প্রকারে শিম্পাঞ্জীরা বস্তু প্রত্যক্ষ করে বা শিখে। তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন যে সমস্যার সমাধান করিতে গিয়া, উহাদের বিশৃঙ্খল চেষ্টার আকস্মিক অবসান হয় সমস্যার পরিজ্ঞান অথবা অন্তর্দৃষ্টির ফলে, কিন্তু চেষ্টা ও ভ্রম সংশোধনের ফলে ক্রমশঃ হয় না।

কোয়েলার্-এর পরীক্ষাধীন একটি শিম্পাঞ্জী খাবার নাগাল পাইতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বৃথা চেষ্টায় হয়রান হইতেছিল। সে হয়ত হঠাৎ দেখিল, খাবারের নাগাল পাইবার উপযোগী একটি লাঠি মাটিতেই পড়িয়া আছে। আবার কোনো শিম্পাঞ্জী হয়ত হঠাৎ দেখিল, যে কম্বলটি খাঁচায় পড়িয়া আছে, তাহাই খাদ্যের নাগাল পাইবার

উপায়। কোয়েলার্-এর তৃতীয় গবেষণা আরও চমকপ্রদ। শিম্পাঞ্জীটির নাগালের বাহিরে, অনেক উঁচুতে, কলা ঝুলিতেছিল। সে দুইটি পৃথক লাঠি দিয়া ঐ কলা টানিয়া লইবার বৃথাই চেষ্টা করিল, কারণ পৃথকভাবে লাঠি দুইটি কলা নাগাল পাইবার পক্ষে ছোট। খাদ্যলাভে বিফল হইয়া সে লাঠি দুইটি লইয়া অনেকক্ষণ উদ্দেশ্যহীনভাবে খেলা করিতে লাগিল। এইরূপ করিতে করিতে, সে হঠাৎ একটি লাঠি অপরটির প্রান্তে জুড়িয়া দিয়া কলা টানিয়া লইল। অর্থাৎ সে এতক্ষণ লাঠি দুইটিকে সমগ্র পরিস্থিতির অংশরূপে দেখে নাই, দেখিয়াছে পৃথক পৃথক ভাবে। এই বার দুইটি যুক্ত লাঠি কিরূপে কলার দূরত্ব অতিক্রম সম্ভব করে তাহাই আবিষ্কার করিল।

পরিজ্ঞান বা ইন্‌সাইট্ **দ্রুত এবং এককালীন শিক্ষা**। ইহা ধীরে ধীরে বা ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হয় না। পরিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র প্রত্যক্ষ ক্ষেত্রের বস্তুগুলির বিন্যাসে পরিবর্তন ঘটে। ফলে, যে বস্তুটি প্রত্যক্ষের পশ্চাদ্‌ভূমিতে (ground) ছিল, তাহাই উহার কেন্দ্রে মূর্ত (figure) হইয়া ওঠে। যেমন তৃতীয় গবেষণায় খাদ্যের নাগাল পাইবার অনুপযোগী পৃথক লাঠি দুইটি প্রত্যক্ষের কেন্দ্রে থাকিলে, উহাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ-জ্ঞান, অর্থাৎ লাঠি দুইটি যে আলাদাভাবে ছোট এবং যুক্তভাবে বড় এই জ্ঞান, প্রত্যক্ষের পশ্চাদ্‌ভূমিতে থাকে। কিন্তু পরিজ্ঞানের ফলে ইহাই প্রত্যক্ষের কেন্দ্র অধিকার করে। ইহা বিদ্যুতের মত হঠাৎ উদ্ভাসিত হয় এবং সমগ্র সমস্যাটির উপর আলোকপাত করে। পরিজ্ঞান নূতন আবিষ্কারের অনুরূপ। ইহা **নব উন্মেষশালিনী চেতনা**। উদ্ভাবনশালী পরিজ্ঞানের আসল রূপ হইল ইহার তড়িৎ গতিতে প্রকাশ (illumination)।

পরিজ্ঞানবাদের সমালোচনা

পরিজ্ঞানবাদ উপরোক্ত দুইটি মতবাদ অর্থাৎ চেষ্টা ও ভ্রম সংশোধন এবং সাপেক্ষ প্রতিবর্তবাদ হইতে মূলতঃ ভিন্ন। ঐ মত দুইটি অনুষঙ্গবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। চেষ্টা ও ভ্রম সংশোধনবাদ এবং সাপেক্ষ প্রতিবর্তবাদ শিক্ষা পরিস্থিতিকে সমগ্ররূপে গ্রহণ না করিয়া, উহার অংশগুলি পৃথক্ করিয়া লয়। পিঞ্জরাবদ্ধ ক্ষুধার্ত বিড়াল জানে না যে তাহাকে পিঞ্জরের বাহিরে আসিয়া খাদ্য সংগ্রহ করিয়া ক্ষুধা মিটাইতে হইবে। সে শুধু ক্ষুধার অন্ধ আবেগে, একটির পর আর একটি অঙ্গচালনা করে এবং যে অঙ্গচালনা আন্দাজে ঢিল মারিবার মত লক্ষ্যে লাগিয়া যায়, তাহাই যান্ত্রিক নিয়মে টিকিয়া থাকে।

এই কারণে বলা যায়, **চেষ্টা ও ভুল সংশোধনবাদ শিক্ষাকে একটি পারমাণবিক ব্যাপারে পর্যবসিত করে।** কতকগুলি পরস্পরবিচ্ছিন্ন পৃথক পরমাণুর সংযোজন ও বিয়োজনে জড়বস্তু উৎপন্ন হয়, তেমনই কতকগুলি পরস্পরবিচ্ছিন্ন পৃথক চেষ্টার সংযোজন ও বিয়োজনে শিক্ষা ঘটে। পরিজ্ঞানবাদ এই মনোবৈজ্ঞানিক পরমাণুবাদের বিরোধী। এই মতে শিক্ষা-পরিস্থিতি একটি সমগ্র বা গোটা বস্তু। সমগ্রের যে কোনো অংশ পরিবর্তিত হইলে অন্যান্য অংশগুলির পরিবর্তন হয়। পরিজ্ঞান-বাদ উপরোক্ত দুইটি মতের মত যান্ত্রিক নয়। ইহাতে উচ্চতর মানসবৃত্তির স্থান আছে। কিন্তু পরিজ্ঞানবাদও প্রয়োগিক। ইহা হ্বার্দাইমার্, কোয়েলার্, কফ্কা প্রভৃতি গেস্টাল্ট্ মনোবিদ্গণের গবেষণায় সমৃদ্ধ।

কিন্তু উপরোক্ত শিক্ষা-মতবাদ দুইটি যে একেবারে মিথ্যা, তাহা প্রমাণিত হয় না। পরিজ্ঞান তড়িৎগতিতে হয় স্বীকার করিলেও, ইহার প্রস্তুতি হিসাবে পরীক্ষা ও ভ্রম প্রয়োজনীয়। যে শিম্পাঞ্জীটি দুইটি লাঠি জোড়া দিয়া কদলী সংগ্রহ করিতে শিখিল, সে উহা হঠাৎ শিখে নাই। পূর্বে সে পৃথক লাঠি দুইটি দিয়া চেষ্টা করিয়াছে। সুতরাং চেষ্টা ও ভ্রমের মধ্য দিয়াই ঐ শিম্পাঞ্জীকে শিক্ষা কার্যে অগ্রসর হইতে হইয়াছে। বিশেষ এই, চেষ্টা ও ভ্রম অন্ধ আবেগের দ্বারা পরিচালিত হয় নাই, কিন্তু প্রথম হইতেই একটি সমগ্র পরিস্থিতির প্রত্যক্ষ দ্বারা পরিচালিত হইয়াছে।

পরিজ্ঞান শুধু যে অন্তর্দৃষ্টি (insight) তাহা নয়, কিন্তু পশ্চাৎদৃষ্টি (hindsight) এবং সম্মুখদৃষ্টিও (foresight) বটে। ইহাতে সমগ্র পরিস্থিতির অগ্র ও পশ্চাৎদৃষ্টি রহিয়াছে।

উপসংহার

শুধু চেষ্টা ও ভ্রমসংশোধন এবং সাপেক্ষ প্রতিবর্তে সময় ও শক্তির অপচয় হয়। শিক্ষা পরিস্থিতি না বুঝিয়া শুধু বোকার মত এলোমেলো চেষ্টা করিয়া যাওয়া ক্ষতিকর। অবশ্য দৈনন্দিন জীবনে অনেক কিছুই যন্ত্রের মত করিতে হয়। গতানুগতিক ক্রিয়াগুলির শিক্ষায় হয়ত প্রথম মতবাদ দুইটির সমর্থিত শিক্ষাপ্রণালী যথেষ্ট সহায়তা করে। কিন্তু যে সকল শিক্ষায় মনোযোগ, ইচ্ছা, আকর্ষণ, বুদ্ধি প্রভৃতি উচ্চতর মানসবৃত্তিগুলির প্রয়োজন, তাহাতে প্রথম মতবাদ দুইটির যাথার্থ্য বিষয়ে সন্দেহ আছে।

স্কট্-এর গবেষণাফল উদ্ধৃত করিয়া **ইউয়ার্** (Ewer) পরীক্ষা ও ভ্রমবাদ, অনুকরণবাদ এবং চিন্তনবাদ, এই তিনটি শিক্ষাপদ্ধতির তুলনা করিয়াছেন। কোনো বিশেষজ্ঞের হাতেকলমে কাজ দেখিয়া, উহা করিবার চেষ্টাকে **অনুকরণ পদ্ধতি** বলে। এই পদ্ধতিতে অযথা সময় ও শক্তির অপচয় নিবারিত হয়। কিন্তু ইহার দোষ এই যে ইহা শিক্ষার্থীর স্বাধীন চেষ্টাকে ব্যাহত করে। **চিন্তন পদ্ধতি** শিক্ষণীয় পরিস্থিতির প্রত্যেকটি অংশের সহিত অপরাপর অংশের সম্বন্ধ বুঝিয়া শিক্ষার পদ্ধতি। এই পদ্ধতি মূলতঃ পরিজ্ঞান পদ্ধতির অনুরূপ।

ইউয়ার্ দেখাইয়াছেন যে কোনো যান্ত্রিক ধাঁধার সমাধানে পরীক্ষা ও ভ্রম পদ্ধতিতে যদি আট ঘণ্টা লাগে, তাহা হইলে দ্বিতীয় পদ্ধতিতে লাগে দুই ঘণ্টা এবং তৃতীয় পদ্ধতিতে মাত্র আধ ঘণ্টা। উপসংহারে আরও বলা যায় যে, শিক্ষা পদ্ধতি শুধু সংযোগ অনুষঙ্গের (law of contiguity) উপর নির্ভর না করিয়া সাদৃশ্য অনুষঙ্গের (law of similarity) উপরও নির্ভর করে। যাহাতে শুধু যান্ত্রিক নিয়মই কাজ করে না, বুদ্ধিপূর্বক শিখিবার নিয়মও কাজ করে, সেই শিক্ষা-পদ্ধতিই ফলপ্রসূ। এই দিক দিয়া বিচার করিলে, পরীক্ষা ও ভ্রমসংশোধনবাদ এবং সাপেক্ষ প্রতিবর্তবাদ গ্রহণীয় নয়, কারণ এই দুইটিতে সংযোগ অনুষঙ্গই প্রাধান্য লাভ করে। পরিজ্ঞানবাদ এই দোষ হইতে মুক্ত।

১০। শিক্ষার গতি

শিক্ষা নিয়মিত হারে অগ্রসর হয় না। প্রথমে দ্রুত পরে শিথিল, আবার দ্রুত,



২১ নং চিত্র—তারবার্তায় বর্ণ গ্রহণ ও প্রেরণ শিক্ষার গতি

আবার শিথিল, এইরূপ বিভিন্ন হারে শিক্ষণের গতি চলিতে থাকে। আবার

মাঝে মাঝে ইহার গতি থামিয়া গিয়া, এইভাবে চলিতে থাকে। তৃতীয়তঃ, একই বস্তুর শিক্ষণে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে ভেদ পরিলক্ষিত হয়। উৎসাহ এবং মনোযোগের পার্থক্যই ব্যক্তিগত ভেদের কারণ।

থর্নডাইক্-এর চব্বিশটি পরীক্ষায় পিঞ্জরাবদ্ধ বিড়ালের লক্ষ্যে পৌঁছাইতে যে সময় লাগিয়াছিল, মধ্যে মধ্যে সময় কমিয়া যাইবার পরিবর্তে যে সময় বাড়িয়া গিয়াছিল এবং কোনো কোনো উপর্যুপরি পরীক্ষায় যে সময়ের কোনো নড়চড় হয় নাই—এই ঘটনাগুলিতে শিক্ষাগতির প্রথম দুইটি লক্ষণ দেখা যাইবে।

ব্রায়ান্ ও হার্টার্ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, শিক্ষণের ফলে তারবার্তায় বা টেলিগ্রাফে প্রতি মিনিটে কতগুলি বর্ণ গ্রহণ বা প্রেরণ করা যায়। তাঁহাদিগকে অনুসরণ করিয়া **কলিন্‌স্ ও ড্রিভার্** শিক্ষণগতি ২১নং রেখাচিত্রে উপস্থাপিত করিয়াছেন।[১]

শিক্ষার 'মালভূমি'

শিক্ষার রেখাচিত্রে আরম্ভকালে দ্রুত উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। এই উন্নতির গতি ক্রমশঃ শিথিল হইতে থাকে। উন্নতির একটি সীমায় পৌঁছিবার পর অধিকতর উন্নতি অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। এই স্তরটিকে বলা হয় **শিক্ষার মালভূমি** (Plateau of Learning) অথবা কিট্‌সন্-এর ভাষায় নৈরাশ্যের মালভূমি। উৎসাহের অভাব, দৈহিক অবসাদ, চেষ্টার অভাব, অমনোযোগ প্রভৃতি কারণে এই অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়। ইহা কাটাইয়া উঠিতে হইলে, উপযুক্ত সময়ে বিশেষ চেষ্টার প্রয়োজন হয়। এই সঙ্কটকাল উত্তীর্ণ হইবার জন্য বিশেষজ্ঞের সাহায্য আবশ্যক। শিক্ষার 'মালভূমি' আর একটি কারণেও ঘটিতে পারে, যেমন ইহাই হয়ত অনুসৃত প্রণালীতে, শিক্ষার্থীর বয়স ও মস্তিষ্কের শক্তি অনুসারে, শিক্ষা-সীমা (physiological limit)।

১১। সুষ্ঠু শিক্ষা বা শিক্ষায় সময় ও শ্রম সংক্ষেপ[২]

১২। পশুর এবং মানুষের শিক্ষণ

থর্নডাইক, হব্‌হাউস্, কোয়েলার্, প্যাভ্‌লো প্রভৃতি মনোবিদ্ প্রধানতঃ মনুষ্যেতর পশুতে বা প্রাণীতে তাঁহাদের শিক্ষা-গবেষণা সীমাবদ্ধ রাখিয়াছেন। অন্যদিকে

১ এম্, কলিন্‌স্ অ্যাণ্ড্ জে, ড্রিভার্—এক্সপেরিমেণ্টাল সাইকলজি—পৃঃ ২২৭

২ এই খণ্ডের চতুর্থ পরিচ্ছেদ, প্রথম অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

ওয়াট্‌সন, ল্যাশ্‌লে প্রভৃতি শিক্ষামতবিশারদগণ শিশু এবং সাবালক মানুষের উপরও তাঁহাদের পরীক্ষা প্রয়োগ করিয়াছেন।

মনুষ্যেতর প্রাণী এবং মানুষের শিক্ষা-পদ্ধতিতে প্রকারগত ভেদ নাই বলিয়াই বিশিষ্ট মনোবিদ্‌গণের অভিমত। উহাদের শিক্ষা-পদ্ধতির পার্থক্য পরিমাণগত। মনুষ্যেতর প্রাণীর শিক্ষা-পদ্ধতি অপেক্ষাকৃত সহজ, সরল এবং অনুন্নত। কিন্তু মানুষের শিক্ষা-পদ্ধতি অধিকতর জটিল এবং উন্নত। পশু বা প্রাণীর তুলনায় মানুষের শিক্ষা-পদ্ধতির উৎকর্ষের কারণ মানুষের মানসিক, দৈহিক প্রভৃতি সর্বাঙ্গীণ উৎকর্ষ।

(১) পশুর তুলনায় মানুষের নার্ভতন্ত্র উন্নত। তাহার মস্তিষ্ক অধিক পরিণত এবং বিকশিত। কাজেই মানুষের ক্ষেত্রে, শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে যে উচ্চতর ও সূক্ষ্মতর অনুষঙ্গ স্থাপিত হয়, পশুদের ক্ষেত্রে তাহা হয় না।

(২) মস্তিষ্ক-বিকাশের সহিত মানুষের বুদ্ধি অধিকতর বিকশিত। সুতরাং তাহার পর্যবেক্ষণশক্তিও উন্নততর। মানুষ প্রত্যক্ষ বস্তুর যত দিক পর্যবেক্ষণ করিতে পারে, পশুরা বা প্রাণীরা তত দিক পর্যবেক্ষণ করিতে পারে না।

(৩) সমস্যার সমাধানে মানুষ অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিতে পারে এবং সমস্যার বিভিন্ন অংশ নিজ আয়ত্তে আনিয়া উহার সম্মুখীন হইতে পারে, কিন্তু পশুরা পারে না।

(৪) সকল প্রাণীর মধ্যে মানুষই ভাষা ব্যবহারে সক্ষম। নাম, সংখ্যা, প্রভৃতি প্রতীকের সাহায্যে মানুষ শিক্ষাকার্য অধিকতর সংক্ষেপে ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করিতে পারে।

(৫) মানুষের কল্পনা, চিন্তন প্রভৃতি উচ্চতর মানসবৃত্তি উন্নত হওয়ায়, মানুষ অতীত ও ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত বস্তু সম্বন্ধেও শিক্ষালাভ করিতে পারে। কিন্তু মনুষ্যেতর প্রাণীরা শুধু উপস্থিত বিষয়ে শিক্ষালাভেই সমর্থ।

১৩। শিক্ষণের প্রধান অঙ্গ

(১) শিক্ষণের প্রধান অঙ্গ হইল জিজ্ঞাসা বা জানিবার ইচ্ছা। এই জিজ্ঞাসা, কৌতূহল বা ঔৎসুক্য দেখা দেয় প্রথমতঃ অভাব বা প্রয়োজন বোধে। ইহা সকল প্রাণীরই একটি অদম্য স্বভাব বা প্রকৃতি। অবশ্য উড্‌ওয়ার্থ্‌ প্রভৃতি মনোবিদ্‌ মনোবিদ্যাকে ক্রিয়াত্মক (dynamic) বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের মনে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা বা জানিবার ইচ্ছা নয়, কিন্তু কোনো কার্যকরী ফল লাভ করা।

(২) শুধু জানিবার ঔৎসুক্যই যথেষ্ট নয়। ঔৎসুক্য মিটাইবার উপযোগী **ইচ্ছা**, **সঙ্কল্প** বা **প্রস্তুতিও** আবশ্যক। ইচ্ছা বা সঙ্কল্পের অভাবে শিক্ষার বাসনা মনে উঠিয়া মনেই লীন হইয়া যায়।

(৩) জানিবার প্রয়োজন বোধ হইতে আসে **পর্যবেক্ষণ** বা অনুসন্ধান। শিক্ষণীয় পরিস্থিতি সাধারণতঃ জটিল অবস্থায় থাকে। এই পরিস্থিতির বিভিন্ন অংশ-গুলিকে উহাদের পারস্পরিক সম্বন্ধে পর্যবেক্ষণ না করিলে, উহার সম্মুখীন হওয়া সম্ভব হয় না।

(৪) সার্থক পর্যবেক্ষণের সহিত মনোযোগও অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত। পরিস্থিতিকে **মনোযোগ** দিয়া পর্যবেক্ষণ না করিলে উহার প্রধান এবং গৌণ অংশগুলির পার্থক্য স্পষ্টভবে বুঝা সম্ভব নয়।

(৫) শিক্ষণীয় পরিস্থিতি জটিল হইলে, পর্যবেক্ষণ ও মনোযোগের সহিত শিক্ষণ চেষ্টার পুনরাবৃত্তি বা **অনুশীলনও** দরকার।

(৬) সুফললাভ, আকর্ষণ প্রভৃতি অঙ্গগুলি অনুশীলনে প্রাণ ও শক্তিসঞ্চার করে। চেষ্টায় সুফললাভ হইলে, চেষ্টা আরও বলবতী হইয়া শিক্ষা-কার্যকে অগ্রসর করে। কিন্তু প্রত্যেক চেষ্টাই বৃথা হইলে, উহাতে শক্তি থাকে না।

(৭) অনুশীলনের বলাধানকারী অঙ্গ **পুরস্কার** এবং শাস্তি। চেষ্টা বৃথা হইলে, অসন্তোষ বা শাস্তি এবং উহার সাফল্যে, সন্তোষ বা পুরস্কার আসে।

Exercise

1. Define learning. Why are animals used in experiments on learning? (Ans.—pp. 140-141)

শিক্ষা কাহাকে বলে? শিক্ষা-প্রয়োগে পশু ব্যবহৃত হয় কেন?

2. Critically expound Thorndike's Trial and Error method of learning. (Ans.—pp. 142-148)

থর্নডাইক্-এর শিক্ষা সম্বন্ধে চেষ্টা ও ভ্রম-সংশোধন মতবাদ আলোচনা কর।

3. Explain and criticise the Conditioned Reflex theory of learning. (Ans.—pp. 149-151)

শিক্ষা সম্বন্ধে সাপেক্ষ প্রতিবর্তবাদের আলোচনা কর।

4. What is learning by insight ? Is learning by insight ? Discuss.
(Ans.—pp. 151-154)

পরিজ্ঞানমূলক শিক্ষা কাহাকে বলে ? পরিজ্ঞানের ফলে শিক্ষা ঘটে কিনা আলোচনা কর।

5. Compare the different theories of learning. Which of these appears to you to be the most satisfactory ? Discuss.
(Ans. pp. 140-154)

বিভিন্ন শিক্ষা-মতবাদগুলির তুলনামূলক বিচার কর। ইহাদের মধ্যে কোন্‌টি সর্বাপেক্ষা সন্তোষজনক ?

নবম পরিচ্ছেদ

ব্যক্তিত্ব ; ব্যক্তিত্বের প্রলক্ষণ ও পরিমাপ

Personality

ব্যক্তিত্বের কারণ এবং জাতিরূপ
(Factors and Types of Personality)

১। ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞা

পার্সন্যালিটি কথাটির উৎস ল্যাটিন 'পার্সনা' (persona), অর্থাৎ অভিনয়ে ব্যবহৃত মুখোস (Mask)। এই অর্থে ব্যক্তিত্ব বলিতে আসল ব্যক্তিকে বুঝায় না, বুঝায় ব্যক্তির নকল বা মিথ্যা রূপ : পরবর্তীকালে 'পার্সনা'র অর্থ হইয়া দাঁড়ায় **নাটকের অভিনেতা** বা কুশীলবগণ (Dramatis Personae)। এই অর্থেও ব্যক্তিত্ব ব্যক্তির আসল রূপকে না বুঝাইয়া নাটকে অভিনীত রূপ বুঝায়।

ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞার অন্ত নাই। **অ্যালপোর্ট** (Allport) ব্যক্তিত্বের প্রায় পঞ্চাশটি সংজ্ঞা উল্লেখ করিয়াছেন। ব্যক্তিত্ব ব্যক্তির একটি সর্বান্তর্ভাবী স্বভাব। ব্যক্তির এমন কোনো প্রকাশ বা ধর্ম নাই যাহা তাহার ব্যক্তিত্বের মধ্যে পড়ে না। তাই ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞা-নিরূপণ করা দুরূহ ব্যাপার।

মনোবিদ্যার মতে ব্যক্তিত্ব একটি নিষ্ক্রিয় সত্তা মাত্র নয়। ব্যক্তিত্ব সর্বদা আচরণ বা ক্রিয়ার মধ্যে প্রকাশিত হয়। ব্যক্তি কি করে অথবা কিরূপে সক্রিয় হয় তাহাই ব্যক্তিত্বের জ্ঞাপক। **ব্যক্তিত্ব যে সকল ক্রিয়ায় বা গুণে প্রকাশিত হয় উহাদের সমষ্টিই ব্যক্তিত্ব।**

ব্যক্তিত্বের শেষোক্ত অর্থ বুঝাইতে গিয়া উড্ওয়ার্থ বলিয়াছেন, "**ব্যক্তির আচরণের সমগ্র রূপটিই তাহার ব্যক্তিত্ব** (Total quality of an individual's behaviour)"।[১] কিন্তু আচরণের বা গুণাবলীর সমষ্টি বলিতে পরস্পর-বিচ্ছিন্ন কতকগুলি গুণ বা ধর্মের যোগফল বুঝায় না, বুঝায় উহাদের ঐক্য বা সমগ্রতা। ব্যক্তিত্ব এমনই একটি বস্তু যাহা ব্যক্তির বহুমুখী প্রকাশগুলিকে একই ব্যক্তিত্বের প্রকাশরূপে গ্রথিত করে।

১। উড্ওয়ার্থ অ্যাণ্ড মার্কুইস—সাইকলজি, পৃঃ ৮৭

ওয়াট্‌সন প্রভৃতি **চেষ্টিত মনোবিদ্‌গণ** (behaviourists) উডওয়ার্থ প্রভৃতির মত ব্যক্তিত্বের সক্রিয়তা স্বীকার করেন। শুধু এইটুকু স্বীকার করিয়াই তাঁহারা সন্তুষ্ট হন না, কিন্তু ব্যক্তিত্বকে উহার সক্রিয়তা বা চেষ্টিতের সহিত অভিন্ন এবং সমার্থক বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের মতে উদ্দীপকের সংস্পর্শে অঙ্গীর (organism) প্রতিক্রিয়া-সমষ্টিই ব্যক্তিত্ব। এই প্রতিক্রিয়ার কাজ হইল অঙ্গীর সহিত পরিবেশের উপযোজন (adaptation), আবার উপযোজনের মধ্যস্থ (medium) হইল নার্ভতন্ত্র। ওয়াট্‌সন-এর মতে ব্যক্তিত্ব বলিতে কোনো প্রকার মানস ঐক্য বুঝায় না, কিন্তু বুঝায় উদ্দীপক প্রতিক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন নার্ভীয় গঠন (narra-pattern)।

ব্যক্তিত্বের ক্রিয়াত্মক সংজ্ঞা শুধু উড্‌ওয়ার্থ, ওয়াট্‌সন প্রভৃতি মনোবিদেই সীমাবদ্ধ নয়। **ম্যাক্‌ডুগ্যাল, মর্টন্‌ প্রিন্স** (Morton Prince), **অ্যাল্‌পোর্ট** প্রভৃতি মনোবিদও ব্যক্তিত্বকে উহার ক্রিয়াত্মক রূপে সীমাবদ্ধ করিয়াছেন। যেমন ম্যাক্‌ডুগ্যাল্‌-এর মতে ব্যক্তিত্ব কতগুলি **সহজাত প্রবৃত্তির ক্রিয়া** ছাড়া কিছু নয়। তিনি মনে করেন যে মতে আত্মপ্রাধান্য (Self-assertion or mastery impulse) এবং আত্ম-অবনমন মূলক (Self-abasement or submissive impulse) পরস্পর-বিরোধী প্রবৃত্তির সামঞ্জস্যই ব্যক্তিত্ব। এই দুইটি প্রধান প্রবৃত্তির বিরোধে মানস বিকলতা ঘটে। মর্টন প্রিন্স-এর মতে সহজাত প্রবৃত্তি এবং প্রবণতার সমষ্টিই ব্যক্তিত্ব। আবার অ্যাল্‌পোর্ট মনে করেন যে ব্যক্তির যে গুণগুলি তাহাকে অন্য ব্যক্তির উপর প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ করে, তাহাদের সমষ্টিই ব্যক্তিত্ব।

সমালোচনা

উপরের সংজ্ঞাগুলি ব্যক্তিত্বের ব্যাপক রূপ ফুটাইয়া তুলিতে পারে না। **উডওয়ার্থ**-এর সংজ্ঞা ব্যক্তিত্বের ব্যাপক রূপ প্রকাশ করিলেও, কিরূপে ব্যক্তির বিভিন্ন আচরণগুলি সংহত হয়, তাহায় ব্যাখ্যা করে না। উদ্দেশ্যমুখিতা বা উদ্দেশ্যমূলক নিয়ন্ত্রণই এই ঐক্যের কারণ। উডওয়ার্থ এই দিকে মনোযোগী হন নাই। আবার **ওয়াট্‌সন** প্রদর্শিত সংজ্ঞা ব্যক্তিত্বের চেতন বা মানস রূপ অস্বীকার করিয়া ইহার উদ্দেশ্যমূলক নিয়ন্ত্রণ উপেক্ষা করিয়াছে। **মর্টন প্রিন্স** সহজাত প্রবৃত্তি ও প্রবণতার সমষ্টিকে ব্যক্তিত্ব বলিয়াছেন। ব্যক্তিত্ব শুধু সহজাত প্রবৃত্তি ও প্রবণতার সমষ্টি নয়, কিন্তু উহাদের সংহতি বা ঐক্য। ইহাতে বুদ্ধি, যুক্তি প্রভৃতি অবগতিমূলক বৃত্তিগুলির প্রভাবও অনস্বীকার্য।

অ্যালপোর্ট-এর সংজ্ঞাও দূষণীয়। ব্যক্তিত্ব শুধু অন্য ব্যক্তির উপর প্রভাব বিস্তারের সামর্থ্য হইতে পারে না। ইহা গুরুস্থানীয় ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানগুলির নিকট নতি-স্বীকার করিবার সামর্থ্যও বটে।

ম্যাক্‌ডুগ্যাল-এর সংজ্ঞাটি অপেক্ষাকৃত কম দূষণীয় বলিয়া মনে হয়। ম্যাক্‌ডুগাল্ ব্যক্তিত্বের সক্রিয়তা স্বীকার করিয়াছেন এবং উহার উদ্দেশ্যমূলক নিয়ন্ত্রণের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। তাঁহার প্রদত্ত সংজ্ঞায় ব্যক্তিত্বের ব্যক্তিগত এবং সামাজিক, এই দুই দিকই ধরা পড়িয়াছে। কিন্তু বুদ্ধি, বিচার প্রভৃতি অবগতিমূলক দিকগুলিকে তিনি যথোপযুক্ত স্থান দেন নাই।

উপসংহার

উপসংহারে বলা যাইতে পারে যে মনোবিদ্যার দিক হইতে শরীরী মনই (Embodied mind) ব্যক্তিত্ব। মন শরীরের মধ্য দিয়া নানাভাবে ক্রিয়া করে—যেমন পরিবেশের সহিত নিজেকে মানাইয়া চলে এবং এইরূপ করিতে গিয়া, নানা শারীর এবং মানস বৃত্তিতে আত্মপ্রকাশ করে। সংবেদন হইতে আরম্ভ করিয়া চিন্তা পর্যন্ত অবগতিমূলক মানস-ক্রিয়া, বেদনা, অনুভূতি, রস প্রভৃতি অনুভূতিমূলক মানস-ক্রিয়া এবং ঐচ্ছিক ও অনৈচ্ছিক ক্রিয়া—সকল মানসবৃত্তিগুলিই ব্যক্তিত্বের অঙ্গীভূত। তাহা ছাড়া নার্ভতন্ত্রের যেরূপ সংগঠন হইলে এবং গ্রন্থিগুলি যেরূপ রসক্ষরণ করিলে পরিবেশের সহিত প্রতিযোজন বা মানাইয়া চলা সম্ভব, তাহাও ব্যক্তিত্বের নিয়ামক।

ব্যক্তিত্ব শুধু সত্তামাত্র নয়, আবার শুধু কতকগুলি ক্রিয়া বা গুণের সমষ্টিও নয়, কিন্তু সকল ক্রিয়া ও গুণের মধ্যে প্রকাশিত একটি সত্তা, যাহা উহাদের ঐক্য বা সংহতি সাধন করে। **ব্যক্তিত্ব বলিতে বুঝায় ব্যক্তির শারীর, গ্রন্থীর, মানসিক সংগঠন, যাহার ফলে নানা প্রকাশ-বৈচিত্র্য সত্ত্বেও ব্যক্তিত্ব অনৈক্যের মধ্যে এক-এর মত কাজ করে।** ব্যক্তিত্ব ব্যক্তির শরীর, মন, আভ্যন্তরীণ রাসায়নিক ক্রিয়া, এক কথায় সমগ্র ব্যক্তির সাধারণ ধর্ম।

২। ব্যক্তিত্বের আংশিক কারণ
(Factors of Personality)

ব্যক্তিত্বের সংগঠনে অনেকগুলি শক্তি প্রভাব বিস্তার করে। ব্যক্তির দেহ, প্রাণ ও মন নানাপ্রকার সামাজিক, বংশানুগতিক এবং শারীরিক প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া ব্যক্তিত্বের আকার গ্রহণ করে। ব্যক্তিত্বের সংগঠনে এই জাতীয় যে সকল শক্তি

প্রভাব বিস্তার করে তাহাদিগকে ব্যক্তিত্বের আংশিক কারণ (Factors of Personality) বলে।

(ক) দৈহিক কারণ

ব্যক্তিত্বের একটি দৈহিক কারণ ব্যক্তির **চেহারা** (Physique)। চেহারার তারতম্যে ব্যক্তিত্বের তারতম্য ঘটিতে পারে। দীর্ঘকায় এবং সুন্দর ব্যক্তি তাহার ক্ষুদ্রকায় এবং কুৎসিত সঙ্গীর তুলনায় বেশী সুবিধা ভোগ করিতে পারে। কোনো অঙ্গবৈকল্য থাকিলেও ব্যক্তিত্ব বদলাইয়া যায়। যেমন অন্ধ লোক অন্যের উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হয়। তোত্‌লা লোকের কথা বলিবার ভঙ্গী তাহার ত্রুটির দ্বারা প্রভাবিত হয়। গোল-গোল লোক প্রায়ই আমুদে, আরামপ্রিয় ও মিশুক এবং শীর্ণকায় লোক উহার বিপরীত হইয়া থাকে।

আবার **বিভিন্ন দৈহিক অবস্থার** উপর ব্যক্তিত্ব অনেকাংশে নির্ভর করে। ক্লান্ত বা ক্ষুধার্ত ব্যক্তি সহজেই চটিয়া যায়। যাহাদের রক্ত সঞ্চালন অস্বাভাবিক তাহাদের অক্সিজেন কমিয়া যায়, ফলে তাহারা কোনো কাজেই উৎসাহ বা প্রেরণা পায় না। অ্যাল্‌কোহল এবং অন্যান্য ঔষধের প্রয়োগে যে সকল দৈহিক পরিবর্তন ঘটে তাহার ফলে ব্যক্তিত্ব বদলাইয়া যায়। রক্তে শর্করার অংশ কমিলে বা বাড়িলে ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন ঘটে। পথ্যাদির পরিবর্তন, উপবাস, ব্যাধি প্রভৃতি কারণেও ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। আবার মস্তিষ্ক-রোগের ফলে ব্যক্তিত্বের পরিবর্তনও উল্লেখযোগ্য।

(খ) রাসায়নিক কারণ

ব্যক্তির দেহ যে সকল রস লইয়া গঠিত উহাদের রাসায়নিক মিশ্রণের উপর ব্যক্তিত্ব নির্ভর করে। হিপোক্র্যাটিস্ (Hippocrates), গ্যালেন (Galen) প্রভৃতি গ্রীক বিজ্ঞানী চারিটি প্রধান দেহরস (Humor)-এর অল্পাধিক প্রাধান্য অনুসারে ব্যক্তিত্বের নিরূপণ করিয়াছেন। যাহাদের দেহে রক্তের প্রাধান্য তাহারা **আশাপ্রবণ** (Sanguine); যাহারা পীত পিত্ত (Yellow bile) প্রধান তাহারা **ক্রোধপ্রবণ** (Choleric), যাহারা কৃষ্ণ পিত্ত প্রধান (Black bile) তাহারা **বিষাদপ্রবণ** (Melancholic) এবং যাহারা শ্লেষ্মা-প্রধান (Phlegm) তাহারা **শ্লেষ্মাপ্রবণ** (Phlegmatic)।

এই রাসায়নিক মত বর্তমানে অচল। কিন্তু ব্যক্তিত্বের সংগঠনে রাসায়নিক ক্রিয়া যে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে, এই প্রাচীন মতটি সেই দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে।

গ্রন্থির রসক্ষরণ ও ব্যক্তিত্ব

আবার গ্ল্যাণ্ড্ বা গ্রন্থির রসক্ষরণ ব্যক্তিত্বকে নিয়ন্ত্রিত করে। গ্ল্যাণ্ড্ বা গ্রন্থি দুই প্রকার—যথা ডাক্ট্ গ্ল্যাণ্ড্ বা বহিঃক্ষরা গ্রন্থি এবং ডাক্ট্‌লেস গ্ল্যাণ্ড্ বা অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি। বহিঃক্ষরা গ্রন্থি যে রসক্ষরণ করে তাহা শরীরের কোনো দ্বার বা প্রণালী দিয়া বাহির হইয়া শরীরের উপরে বা বাহিরে উপচাইয়া পড়ে—যেমন লালাগ্রন্থি, স্বেদগ্রন্থি, অশ্রুগ্রন্থি, মূত্রগ্রন্থি এবং যৌনগ্রন্থির একটি প্রধান অংশ প্রভৃতি। ব্যক্তিত্বের উপরও ইহারা ক্রিয়া করে। যদি অধিক বা অল্প পরিমাণে লালা নিঃসৃত হয়, অথবা নাসিকার শ্লেষ্মাগ্রন্থি হইতে অধিক পরিমাণে শ্লেষ্মা ঝরিতে থাকে, অথবা হজমী রসের গোলযোগ হয়, অথবা ক্ষরণের অভাবে গলা উত্তেজনাশীল বা সংবেদনশীল হয়, অথবা মূত্রগ্রন্থির অত্যধিক ক্ষরণে মূত্রাশয় পূর্ণ হইয়া থাকে, অথবা যৌনগ্রন্থি অধিক রসক্ষরণ করে, তাহা হইলে ব্যক্তির আচরণ বিশেষভাবে পরিবর্তিত হয়। এইরূপ অবস্থায় ব্যক্তির সামাজিক আচরণও বদলাইয়া যাইতে পারে। যেমন, হয়ত সে তাহার বন্ধুকে আঘাত বা অপমান করিয়া বসে। হয়ত বা কর্তৃপক্ষের সহিত রুক্ষ ব্যবহার করিয়া চাকুরী খোয়ায়।

অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির রসক্ষরণ ও ব্যক্তিত্ব

কিন্তু বহিঃক্ষরা গ্রন্থিগুলির তুলনায় অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলির রসক্ষরণ ব্যক্তিত্বের উপর অধিকতর প্রভাব বিস্তার করে। এই গ্রন্থিগুলির ক্ষরিত রস দেহের বাহিরে নির্গত হইবার পথ পায় না। কাজেই ইহাদের ক্ষরিত রস রক্তের সহিত মিশিয়া শরীরের বিভিন্ন অংশে ছড়াইয়া পড়ে।

মানুষের আচরণ বা ব্যক্তিত্বের উপর সকল অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির রসক্ষরণই প্রভাব বিস্তার করিলেও থাইরয়েড্, এড্রিনেল এবং পিটুইটারি গ্রন্থির রসক্ষরণই অধিক প্রভাবশালী।[১]

১। গ্রন্থিগুলির গঠন ও ক্রিয়া ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে।

ব্যক্তিত্বের উপর থাইরয়েড্ গ্রন্থির প্রভাব

থাইরয়েড্ গ্রন্থির ক্ষরিত রসকে বলে থাইরক্সিন্ (Thyroxin)। এই রস কম বা বেশী পরিমাণে ক্ষরিত হইলে ব্যক্তিত্বের নানারূপ বিকৃতি ঘটে। থাইরক্সিন কম ক্ষরিত হইলে ব্যক্তি **বামন** (Cretin) হয় এবং বেশী ক্ষরিত হইলে তাহার মাইক্সিডেমা (Myxoedema) নামক রোগ জন্মায়। প্যারাথাইরয়েড্ গ্রন্থির কম বা অধিক রস-ক্ষরণের ফলও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এড্রিনেল বা সুপ্রারেনাল গ্রন্থি যে রসক্ষরণ করে তাহার নাম এড্রিনিন্ বা এপিনেফ্রিন্ (adrenin, epinephrin)। ইহাও থাইরক্সিন্-এর মত একটি শক্তিশালী পদার্থ। ব্যক্তিত্বের উপর ইহার প্রভাব যথেষ্ট।

পিটুইটারি গ্রন্থির ক্ষরিত রসের নাম পিটুইটিন্ (pituitin)। ব্যক্তিত্বের উপর ইহার প্রভাব অসীম—সেই কারণে ইহাকে প্রধান গ্রন্থি (master gland) বলা হয়। প্যান্ক্রিয়াজ্, যৌনগ্রন্থি, থাইমাস্ গ্রন্থি এবং পিনিয়াল্ গ্রন্থি উহাদের রসক্ষরণের দ্বারা ব্যক্তিত্বকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। পরবর্তী অনুচ্ছেদে আলোচিত 'ব্যক্তিত্বের জাতিরূপ' ও দ্রষ্টব্য।

(গ) সামাজিক কারণ

ব্যক্তিত্ব একটি নিষ্ক্রিয় সত্তা নয়, কিন্তু কতগুলি ক্রিয়ার সংগঠন। ব্যক্তি পরিবেশেই জন্মলাভ করে, উহাতেই বর্ধিত হয় এবং তাহার ক্রিয়া উৎপন্ন হয় পারিবেশিক উদ্দীপকের প্রতিক্রিয়া হিসাবে।

সামাজিক পরিবেশের (Social environment) দুইটি প্রধান শক্তি—যথা সামাজিক বিধি (Social code) এবং সামাজিক স্থান (Social role)। ব্যক্তি সমাজের বিধি-নিষেধগুলি মানিয়া চলে এবং সমাজে একটি নিজস্ব স্থান বা অংশ গ্রহণ করে।

সামাজিক বিধি-নিষেধ ব্যক্তির আচার-ব্যবহার ও নীতিবোধকে নিয়ন্ত্রিত করে। সমাজের আচার-ব্যবহার, ন্যায়নীতি প্রভৃতি আদর্শ বা নিয়ম লঙ্ঘন করিলে শিশুকে সমালোচনা, উপহাস, শাস্তি, এমন কি বহিষ্কারের সম্মুখীন হইতে হয়। কাজেই ঐগুলি মানিয়া চলাই সে বুদ্ধিমানের কাজ বলিয়া বুঝিতে পারে।

কিন্তু সমাজ বা গোষ্ঠির বাঁধা ছাঁচে চলিতে হইলেও, প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজ বৈশিষ্ট্য অনুসারে বিকাশ লাভ করে। ব্যক্তিত্ব শুধু সমাজের সৃষ্টি নয়, ইহাতে

ব্যক্তির নিজস্ব স্বভাবও ক্রিয়াশীল। আবার সমাজও ব্যক্তির সৃষ্টি নয়। সমাজদ্রোহী ব্যক্তি সমাজের দ্বারা তিরস্কৃত, শাসিত বা বহিষ্কৃত হয়।

সামাজিক বিধি-নিষেধগুলি শৈশবেই অর্জিত হয়। যেমন কোনো খেলায় অংশ-গ্রহণ করিতে হইলে শিশুকে ঐ খেলার নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়। আবার মিথ্যা কথা বলিলে শাস্তি পাইতে হয় অথবা লোকে অবিশ্বাস করে। এইরূপ যুক্তিতে শিশু বুঝিতে পারে যে মিথ্যা কথা বলা ভাল নয়।

প্রত্যেক ব্যক্তিকেই সামাজিক জীবনে যথাযোগ্য স্থান গ্রহণ করিতে এবং ঐ স্থান অনুযায়ী কাজ করিতে হয়। সামাজিক জীবনে কেহ নেতা বা সমাজসংস্কারক, কেহ বা তাহার অনুগামী, আবার কেহ বা নেতার নির্দেশে পরিচালিত সাধারণ লোক। পারিবারিক জীবনে কেহ পিতা, কেহ মাতা, কেহ বা সন্তান। শিক্ষালয়ে কেহ শিক্ষক, কেহ বা শিক্ষার্থী। আবার একই ব্যক্তির হয়ত বিভিন্ন ব্যক্তির সম্পর্কে বিভিন্ন স্থান গ্রহণ এবং তদনুযায়ী কাজ করিতে হয়। যেমন পারিবারিক জীবনে একই ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির সম্পর্কে পিতা বা মাতা, পুত্র বা কন্যা, ভ্রাতা বা ভগ্নী।

সুতরাং সামাজিক জীবন বলিতে ব্যক্তির সহিত ব্যক্তির সম্বন্ধ বা আন্তর্ব্যক্তিক সম্বন্ধ (Interpersonal relationship) বুঝায়।

পরিবারে শিশুর স্থান ও কাজ তাহার ব্যক্তিত্বকে গভীরভাবে নিয়ন্ত্রিত করে। শিশুর পারিবারিক স্থান ও কাজ অনেকাংশে নির্ভর করে তাহার পিতামাতার উপর, যদিও তাহার নিজস্ব স্বভাব উপেক্ষণীয় নয়। পরিবারে শিশুর প্রধান কাজ হইল বড় হইয়া ওঠা। অনেক পিতামাতা শিশুকে বড় হইয়া উঠিবার সুযোগ দেন না। কোনো পিতামাতা হয়ত অত্যধিক তত্ত্বাবধান, যত্ন ও সতর্কতার ফলে শিশুকে স্বাবলম্বী এবং দায়িত্বশীল হইতে বাধা দেন। 'আদুরে ছেলে' (Spoilt child), 'প্রিয় সন্তান' অথবা 'অবাঞ্ছিত সন্তান' পরিবারে যে স্থান লাভ করে, তাহা উহাদের ব্যক্তিত্বের উপর স্থায়ী ছাপ রাখিয়া যায়।

পরিবারস্থ প্রত্যেকটি শিশুর স্থান বিভিন্ন, কারণ পিতামাতার সমান ব্যবহার সত্ত্বেও তাহার সঙ্গী অন্য কোনো শিশু। যেমন দুটি ভাই-এর বড়টির সাথী ছোট ভাই আবার ছোট ভাইটির সাথী বড় ভাই। অ্যালফ্রেড **অ্যাডলার** (Alfred Adler), শিশুর পারিবারিক স্থান অথবা **জন্মগত ক্রম** (Birth-order)-এর উপর অত্যধিক গুরুত্বআরোপ করিয়াছেন। **'একমাত্র সন্তান'** (Only child) কোনো বাধা না পাইয়া অথবা কাহারও অংশীদার না হইয়া পরমুখাপেক্ষী বা অত্যাচারী হইয়া দাঁড়াইতে

পারে। **জ্যেষ্ঠ সন্তান** কিছুকাল একমাত্র সন্তানের স্থান গ্রহণ করিয়া পরে স্থানচ্যুত হয়—ফলে তাহার হিংসুক-প্রকৃতি, রক্ষণশীল, কর্তৃত্বে বা ক্ষমতায় বিশ্বাসী হওয়া সম্ভব। দ্বিতীয় **সন্তান** প্রথমটিকে 'ধরিয়া ফেলিবার' অথবা তাহার সমকক্ষ হইবার জন্য ব্যগ্র হয় এবং তাহার পক্ষে প্রচলিত রীতির বিরোধী হওয়া স্বাভাবিক। **কনিষ্ঠ সন্তান** চিরদিনই কনিষ্ঠ। সে প্রত্যেকের আদর-কাঙ্গাল এবং পরমুখাপেক্ষী। পরিবারটি বড না হইলে, প্রত্যেক শিশুর অদৃষ্টই যেন কোনো না কোনো দুর্দশা-জনক স্থানের সহিত জড়িত।

সমালোচনায় বলিতে হয় যে অ্যাড্‌লার-এর এই মতবাদ যথার্থ নয়। পরিবারে কোনো স্থান বা জন্মক্রমই শিশুর পক্ষে খাবাপ নয়। তাহা ছাড়া, বিভিন্ন ক্রমে ভূমিষ্ঠ শিশুর ব্যক্তিত্বে সাদৃশ্য দেখা যায়। জন্মক্রমের সহিত কতগুলি সুবিধা বা অসুবিধা জড়িত থাকিতে পারে। কিন্তু এইগুলি শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের চূড়ান্ত নিযামক নয়। শিশুর গৃহ-পরিবেশ এবং সহজাত স্বভাবও তাহার ব্যক্তিত্বকে নিয়ন্ত্রণ করে।

অ্যাড্‌লার জন্মক্রমকেই ব্যক্তিত্ব বিকাশের একমাত্র হেতু বলিয়া অভিমত পোষণ করেন নাই। তিনি ব্যক্তিত্ব বিকাশের অন্যান্য হেতুগুলিকেও স্বীকার করিয়াছেন। মা সন্তানকে কিরূপে সামাজিক জীবনে অভ্যস্ত করেন, তাহার উপর অনেকটা নির্ভর করে তাহার ব্যক্তিত্বের বিকাশ। আদুরে ছেলে সকলেরই আকর্ষণ-কেন্দ্র হইতে চায়, আবার উপেক্ষিত শিশু দূরে দূরে সরিয়া বেড়ায়। এইরূপে অতি শৈশব হইতেই ব্যক্তির এমন একটি 'জীবনপদ্ধতি' (Style of life) গড়িয়া ওঠে, যাহা আজীবন অপরিবর্তিত থাকে।

মনঃসমীক্ষক **ফ্রয়েডও** ব্যক্তিত্ব গঠনে পারিবারিক এবং সামাজিক প্রভাব স্বীকার করিয়াছেন। পিতামাতার ভালবাসা এবং শাসন ফলে, তাঁহাদের প্রতি শিশুর একটি **উভয়বল ভঙ্গী** (Ambivalent attitude) গড়িয়া ওঠে—অর্থাৎ সে পিতা-মাতাকে যেমন ভালবাসিতে তেমন ঘৃণা করিতে শিখে। একটু বড হইলেই শিশু পিতামাতার সহিত নিজকে অভিন্ন বলিয়া মনে করে এবং পিতামাতার কর্তৃক বা শাসনের ভূমিকা আত্মসাৎ করে। এইরূপ শিশুর মনে অধিশাস্তা (Super-ego) গড়িয়া ওঠে এবং সে অন্যায় করিলে পিতামাতা তাহাকে যেমন শাসন করেন, সে নিজেকে নিজেই তেমন শাসন করিতে শিখে। পিতামাতার এই আনুগত্য (Loyalty) আস্তে আস্তে বৃহত্তর সমাজের ক্ষেত্রে বিস্তৃত হয়, যাহার ফলে শিশু পিতৃস্থানীয় শিক্ষক বা নেতাকে মানিয়া লইতে পারে।

ফ্রয়েড্-এর মতে উপরোক্ত ক্রিয়াগুলি সাধারণতঃ নির্জ্ঞান মনে সম্পন্ন হইয়া থাকে। উহাদের সম্বন্ধে প্রায়ই শিশুর কোনো চেতনা থাকে না! শিশু পিতা-মাতার সহিত তাহার সম্বন্ধকে কিরূপে আত্মসাৎ করিয়া লয়, তাহারই উপর নির্ভর করে তাহার ভবিষ্যৎ ব্যক্তিত্বের বিকাশ। যে শিশুর মধ্যে উভয়বল অথবা পরস্পর-বিরোধী ভালবাসা ও ঘৃণার মধ্যে ঘৃণা প্রক্ষোভটি প্রকাশ পায়, সে হইয়া ওঠে সমাজবিরোধী। আবার যে শিশুর মধ্যে ভালবাসা প্রক্ষোভটি সংজ্ঞান মনে প্রকাশিত থাকে, সে হয় স্বাভাবিক।

সমালোচনা করা যাইতে পারে যে আাড্লার এবং ফ্রয়েড উভয়েই শিশুর সামাজিক জীবনকে পরিবারে সীমাবদ্ধ রাখিয়াছেন। গৃহ বা পরিবারের বাহিরে বৃহত্তর সমাজের প্রভাব কিরূপে শিশুর ব্যক্তিত্বকে গঠন করে, তাঁহারা সেইদিকে লক্ষ্য রাখেন নাই। অবশ্য শিশুর ব্যক্তিত্বের উপর বৃহত্তর সমাজের প্রভাব পিতামাতা এবং পরিবারস্থ আর পাঁচজনের মধ্য দিয়াই ঘটিয়া থাকে। পিতামাতার সহিত সম্বন্ধই যে শিশুর সামাজিক জীবনের প্রথম সূত্রপাত তাহাতে সন্দেহ নাই।

নবযৌবন (Adolescence) শিশুর জীবনে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বয়ঃসন্ধিকাল। এই কালটিকে **স্যার স্ট্যানলি হল** 'ঝড় ও চাপের সময়' (Storm and stress period) বলিয়াছেন। এই সময়ে ব্যক্তি কোনো নায়ক (Hero) খুঁজিয়া বেড়ায়। উপযুক্ত নায়ক বা হিরো পাইলে, এই সময়ের অশান্তভাব প্রায়ই গঠনমূলক প্রকাশের পথে পরিচালিত হয়।

যৌবন আসিবার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর ভবিষ্যৎ ব্যক্তিত্ব একটি নির্দিষ্ট ধারায় আত্ম-প্রকাশ করে। সে সমাজে কি স্থান গ্রহণ করিবে অথবা কি কাজ করিবে, তখন তাহা অনেকটা স্পষ্ট রূপ ধারণ করে।

ঘ) জৈব কারণ—বংশ প্রভাব (Biological factors—Heredity)

ব্যক্তি বংশপরম্পরায় উত্তরাধিকার সূত্রে যাহা পায় তাহার গুরুত্ব অত্যধিক। **বংশগতি বা হেরিডিটি** বলিতে বুঝায় ব্যক্তিত্ব বিকাশের সেই কারণগুলি যাহা শিশু জন্মের সঙ্গে সঙ্গে পাইয়াছে, অথবা যাহা জন্মগত। আরও স্পষ্টভাবে বলিতে গেলে, জন্মের কিঞ্চিদধিক নয় মাস পূর্বে ভ্রূণাবস্থার প্রথম সূত্রপাত হইতে আরম্ভ করিয়া জন্মকাল পর্যন্ত শিশুর মধ্যে যে সকল কারণ নিহিত থাকে, সেইগুলি তাহার ব্যক্তিত্ব বিকাশের বংশগত কারণ। অপর পক্ষে, ভূমিষ্ঠ হইবার পরবর্তী মুহূর্ত হইতে শিশুর

ব্যক্তিত্ব বিকাশে যে সকল কারণ ক্রিয়া করে সেইগুলিই তাহার পারিবেশিক কারণ।

বংশগতি ব্যক্তিত্বকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করে। কোনো ব্যক্তি হয়ত আজন্ম চালাক বা বুদ্ধিমান, আবার কেহ হয়ত জন্ম হইতেই বোকা বা নির্বোধ। কেহ হয়ত স্বভাবতঃ সঙ্গীতপ্রিয়, আবার কেহ হয়ত প্রথম হইতেই সঙ্গীতের প্রতি উদাসীন। কেহ হয়ত সহজেই বাক্‌পটু, আবার কেহ আড়ষ্ট। সূর্যের আলোর সঙ্গে সঙ্গে কেহ জাগিয়া ওঠে, আবার কেহ কেহ ঘুমাইয়া পড়ে।

মানুষের জীবন আরম্ভ হয় একটি জীবকোষ রূপে, অর্থাৎ পিতৃবীজ ও মাতৃকোষের মিলিত জিগট (Zygoto) রূপে। এই জিগটেই ব্যক্তির মানসিক, নৈতিক এবং দৈহিক সম্ভাবনার বীজ অব্যক্তভাবে নিহিত থাকে। ব্যক্তিব বংশগতি নির্দিষ্ট বা অপরিবর্তনীয়। ইহাকে কোনো প্রকারেই বাড়ানো বা কমানো যায় না। সুতরাং বংশগতি বলিতে বুঝায় যাহা জিগটে, অথবা পিতৃবীজ দ্বারা উর্বরীকৃত মাতৃ-কোষে অব্যক্তভাবে থাকে তাহার সমষ্টি।

বংশগতি ও পরিবেশ (Heredity and Environment)

বংশগতি ও পরিবেশ পরস্পর-সম্বদ্ধ। পরিবেশ বংশগত ধর্মগুলির বিকাশ নিয়ন্ত্রিত করে। ব্যক্তিত্ব বিকাশের ক্ষেত্রে **বংশগতি নির্দিষ্ট** এবং **পরিবেশ অনির্দিষ্ট** স্থান গ্রহণ করে। উন্নত পরিবেশে উৎকৃষ্ট বংশগত সম্ভাবনাগুলি বিকাশ লাভ করে। বংশগতি সূত্রে পাওয়া নয়, এমন কোনো শক্তি বা সামর্থ্য পরিবেশ উৎপন্ন করিতে পারে না। কিন্তু, অনুকূল পরিবেশ সুপ্ত বংশগত সম্ভাবনার বাস্তব প্রকাশে সহায়তা করে। আবার, পরিবেশের প্রভাবে ব্যক্তির উন্নতি সম্ভব, কিন্তু জাতির উন্নতি সম্ভব নয়, কারণ **পারিবেশিক উন্নতি ব্যক্তিতেই সীমাবদ্ধ**।

বংশগতি ব্যক্তিত্ব বিকাশের সকল সম্ভাবনার মূল কারণ। পরিবেশ শুধু এই সম্ভাবনাগুলির বাস্তব রূপায়ণে সহায়তা করে। তানসেন যদি আফ্রিকার জঙ্গলে অথবা আরবের মরুভূমিতে জন্মগ্রহণ করিতেন, অনুকূল পরিবেশের অভাবে হয়ত তিনি উচ্চ সঙ্গীতজ্ঞ হইতে পারিতেন না। হয়ত বা তিনি তাঁহার দল বা গোষ্ঠীর বাদ্যযন্ত্রবিশারদ হইতেন। কিন্তু কোনো মূকবধির ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত শিক্ষার সুযোগ পাইলেও, সঙ্গীতজ্ঞ হইতে পারে না। কোনো ক্ষীণবুদ্ধি শিশুকে হাজার শিক্ষা দিয়াও স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্ন করা যায় না, যদিও তাহার সামর্থ্য অনুসারে তাহাকে অর্থকরী

বিদ্যা শিখানো যাইতে পারে। কাজেই শুধু পরিবেশ ও শিক্ষার প্রভাবে কোনো ব্যক্তি বা জাতিকে প্রতিভাসম্পন্ন করিয়া তোলা যায় না।

সামাজিক বংশগতি (Social Heritage) বা উত্তরাধিকার

সমাজগত বংশগতিও ব্যক্তিত্বের বিকাশে সাহায্য করে। শিশু যেমন পিতামাতার বংশগত সম্ভাবনা লইয়া জন্মগ্রহণ করে, তেমনই একটি সামাজিক উত্তরাধিকার লইয়াও জন্মগ্রহণ করে। পিতামাতা তাঁহাদের জ্ঞান ও শিক্ষা সন্তানের মধ্যে জন্মগতভাবে সংক্রামিত করিতে পারেন না। কিন্তু মনুষ্যজাতির জ্ঞান, রীতিনীতি, আচার-বিচার এবং ঐতিহ্য পুরুষ-পরম্পরাক্রমে শিশুতে সঞ্চারিত হয়। অগণিত পুরুষ-পরম্পরায় মনুষ্যজাতি পুস্তক, চিত্র, শিল্পকলা, আইনকানুন ও ঐতিহ্য তাহার জ্ঞান-ভাণ্ডারে সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে। পূর্বপুরুষের এই সঞ্চিত জ্ঞান-ভাণ্ডার পরবর্তী পুরুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশে পারিবেশিক উদ্দীপকের মত কাজ করে। ইহা গ্রহণ করিবার ক্ষমতা অনুসারে এই সামাজিক উত্তরাধিকার শিশুর ব্যক্তিত্বকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। পিতামাতা হইতে প্রাপ্ত বংশগত উত্তরাধিকার জন্মগত। কিন্তু পূর্ব-পুরুষের শিক্ষা-দীক্ষার সঞ্চিত ভাণ্ডার হইতে প্রাপ্ত সামাজিক উত্তরাধিকার প্রত্যেকটি পরবর্তী পুরুষকে নূতন করিয়া অর্জন করিতে হয়।

৩। ব্যক্তিত্বের জাতিরূপ (Types of Personality)

(ক) হিপোক্র্যাটিস্ ও গ্যালেন্ প্রবর্তিত জাতিরূপ

ব্যক্তিত্ব অনেক প্রকারের বা নমুনার হইতে পারে। প্রাচীন গ্রীক্ বিজ্ঞানীরা মেজাজ (Temperament) অনুসারে ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন নমুনাভেদ করিয়াছেন। যেমন, **হিপোক্র্যাটিস্** (Hippocrates), **গ্যালেন** (Galen) প্রভৃতির মতে দেহ প্রধানতঃ **চারিটি রস** (Humor) দিয়া তৈয়ারী—যথা, রক্ত, হলুদে বা পীত পিত্ত, কালো পিত্ত এবং শ্লেষ্মা।

এই রসগুলির সুষম মিশ্রণই স্বাস্থ্য এবং উহাদের বিষম মিশ্রণই রোগ। এই চারিটি রসের প্রাধান্য অনুসারে গ্যালেন ব্যক্তিত্বকে চার প্রকারে বিভক্ত করিয়াছেন। রক্তপ্রধান ব্যক্তিত্ব **আশাপ্রবণ** (Sanguine)। এবং চঞ্চল ও তেজস্বী আবার শ্লেষ্মাপ্রধান ব্যক্তিত্ব শ্লেষ্মাপ্রবণ (Phlegmatic) এবং নিস্তেজ ও হিসাবী। আবার কালো পিত্তপ্রধান ব্যক্তিত্ব **বিষাদপ্রবণ** (Melancholic) এবং বলবান ও বিষণ্ণ

প্রকৃতির। চতুর্থতঃ পীত পিত্ত-প্রধান ব্যক্তিত্ব **ক্রোধপ্রবণ** (Choleric) এবং বদ্‌রাগী ও কর্মঠ।

(খ) য়্যুঙ্গ-প্রবর্তিত ব্যক্তিত্বের জাতিরূপ—অন্তর্বৃত্ত ও বহির্বৃত্ত

সি. জি. য়্যুঙ্গ (C G. Jung) তাঁহার প্রবর্তিত শব্দ-অনুষঙ্গ পদ্ধতির ভিত্তিতে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর ব্যক্তিত্ব নির্দেশ করিয়াছেন—যথা অন্তর্বৃত্ত (Introvert) এবং বহির্বৃত্ত (Extrovert)।

অন্তর্বৃত্ত ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গী অন্তর্দর্শনমূলক এবং আত্মকেন্দ্রিক। সে ভাবুক এবং আত্মলীন। এই ব্যক্তি নিজ চিন্তা বা কল্পনারাজ্যে অথবা আপনার মধ্যে আপনি আশ্রয় লইয়া থাকে। সে কর্মকোলাহলময় বহির্বিশ্বে অথবা জীবনসংগ্রামে অংশ গ্রহণ করিতে চায় না। বাস্তবের বা পরিবেশের উত্তেজনা হইতে আত্মরক্ষার জন্য সে মনে মনে কতগুলি কল্পনাকে রক্ষাকবচ রূপে সৃষ্টি করিয়া লয়।

কিন্তু **বহির্বৃত্ত** ব্যক্তি আপনাকে লইয়া আপনি বিব্রত থাকিতে চায় না বা পারে না। আপনার মধ্যে আপনি মগ্ন না থাকিয়া, বহির্বিশ্বের কর্মকোলাহলে অংশ গ্রহণ করা বা ব্যস্ত থাকাই তাহার পক্ষে সহজ। এই ব্যক্তি আরও পাঁচজনের ভালোমন্দ অথবা সুখদুঃখের সহিত নিজেকে মিশাইয়া দেয় এবং আত্মস্বাতন্ত্র্য বলিয়া কিছু রাখে না। ব্যক্তিত্বের এই উভয়-প্রান্তিক শ্রেণীভেদ **'কাজের লোক'** এবং **'কল্পনাবিলাসী লোক'**—এই প্রচলিত শ্রেণীভেদের অনুরূপ।

অন্তর্বৃত্ত ব্যক্তিত্ব আত্মকেন্দ্রিক, কিন্তু বহির্বৃত্ত ব্যক্তিত্ব বহিঃকেন্দ্রিক বা সামাজিক। প্রথমটিতে জাগতিক বিজ্ঞতা এবং বিচক্ষণতার অভাব। যেরূপ জীবন যাপন করিলে যশ, মান, খ্যাতি, ধন অথবা সামাজিক স্বীকৃতি লাভ করা যায়, সেইরূপ দৃষ্টিভঙ্গী অন্তর্বৃত্ত ব্যক্তির থাকে না, কিন্তু বহির্বৃত্ত ব্যক্তির থাকে। য়্যুঙ্গ্-এর মতে প্রথমোক্ত ব্যক্তির কামশক্তি (Libido) ব্যক্তিগত শক্তি বা শ্রেষ্ঠতা লাভের চেষ্টায় নিয়োজিত হয়। কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তির কামশক্তি নিয়োজিত হয় যৌন সামর্থ্যের প্রকাশে এবং আত্মশক্তি বা শ্রেষ্ঠতা লাভ ইহার নিকট গৌণ হইয়া দাঁড়ায়।

কিন্তু য়্যুঙ্গ্ দেখিয়াছেন যে জনসংখ্যার বেশীর ভাগ লোকই এই দুইটি চরম প্রান্তের কোনটিতেই পড়ে না। তাহারা পড়ে উহাদের মধ্যবর্তী শ্রেণীতে, য়্যুঙ্গ্ যাহার নাম দিয়াছেন **উভয়বৃত্ত** (Ambivert)। এই শ্রেণীভুক্ত অধিকাংশ জনসাধারণ শুধু আত্মকেন্দ্রিক বা সমাজকেন্দ্রিক নয়, কিন্তু এই দুইটির সংমিশ্রণ।

য়্যুঙ্গ-এর পরবর্তী মত

ব্যক্তিত্বের অন্তর্বৃত্ত এবং বহির্বৃত্ত শ্রেণীভেদ প্রতিন্যাসমূলক (attitudinal types) বিভাগ। জীবনের প্রতিন্যাস বা ভঙ্গী উহাদের মূল ভিত্তি। অন্তর্বৃত্ত (introvert) জীবনবিমুখ এবং বহির্বৃত্ত (extrovert) জীবনমুখী। মানসক্রিয়ার (mental functions) দিক দিয়া বলিতে গেলে, প্রথমটি প্রধানতঃ চিন্তনমূলক এবং দ্বিতীয়টি প্রধানতঃ বেদনা বা প্রক্ষোভমূলক। দার্শনিকপ্রবর ডেভিড্ হিউম (David Hume) প্রথম শ্রেণীর এবং অধ্যাপক উইলিয়াম্ জেমস্ (William James) দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যক্তিত্বের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

তাঁহার গবেষণার পরবর্তী ধাপে য়্যুঙ্গ্ প্রতিন্যাস বা জীবনভঙ্গীর পরিবর্তে ব্যক্তিত্বের **চারিটি মানসক্রিয়ার গঠনের** বা গঠনের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। এই মত অনুসারে পরিবেশের সহিত নিজকে খাপ খাওয়াইবার জন্য ব্যক্তিত্বের চারিটি মানস-ক্রিয়া প্রয়োজন—যথা, চিন্তন (Thinking), বেদনা (Feeling), অন্তর্জ্ঞান (Intuition) এবং সংবেদন (Sensation)। প্রত্যেক ব্যক্তিতেই এই চারটি মানসক্রিয়ার মধ্যে একটির প্রাধান্য থাকে। তথাপি প্রত্যেক ব্যক্তিত্বেই এই চারিটি মানসক্রিয়া অল্পাধিক বর্তমান। প্রথম দুইটি, অর্থাৎ চিন্তন এবং বেদনা পরস্পরবিরোধী। আবার শেষোক্ত দুইটি, অর্থাৎ অন্তর্জ্ঞান এবং সংবেদনও পরস্পরবিরোধী।

এই চারিপ্রকার মানস গঠনের পারস্পরিক প্রাধান্য অনুসারে ব্যক্তিত্বও চার শ্রেণীর, যথা চিন্তন বা মননশীল (Thinking), বেদনা বা প্রক্ষোভপ্রবণ (Feeling), অনুভূতি বা অন্তর্জ্ঞানশীল (Intuitive) এবং সংবেদনশীল (Sensational)। চিন্তন এবং বেদনা উচ্চতর মানসক্রিয়া। বিচারমূলক আচরণ ('rational' conduct) নির্ভর করে এই দুইটিরই উপর। এইরূপ আচরণে বস্তুর মূল্যায়ণ করিতে হয় এবং মূল্যায়ণ বিচারমূলক অথবা বেদনামূলক এই উভয়ই হইতে পারে। এই কারণে ব্যক্তিত্বের বিচারমূলক শ্রেণী উপরোক্ত দুইটি।

অন্তর্জ্ঞান এবং সংবেদন নিম্নতর মানসক্রিয়া, কারণ উহাদের মধ্যে চেতনা অপেক্ষাকৃতভাবে অস্পষ্ট। অন্তর্জ্ঞান একপ্রকার আন্দাজমূলক (guess work) চিন্তন। ইহা চিন্তনের তুলনায় পরিবেশের সহিত কম প্রতিযোজিত (less adapted)। আবার সংবেদন একপ্রকার আদিম বেদনা (primitive feeling) এবং ইহাতে বিচারমূলক বা চিন্তনমূলক ক্রিয়ার সহিত সংশ্লিষ্ট উচ্চতর ও জটিল প্রক্ষোভগুলির

অভাব থাকে। কাজে কাজেই অন্তর্জ্ঞান এবং বেদনা নির্বিচার বা অভিজ্ঞতামূলক মানসক্রিয়া।

সুতরাং যাহারা প্রধানতঃ চিন্তন বা বেদনার সাহায্যে পরিবেশের সহিত নিজকে উপযোজিত করে, তাহারা বিচারশীল শ্রেণীর (Rational or Judging Types)। ইহারা পরিস্থিতির মূল্য বা গুরুত্ব বিচার করিয়া চলে। দ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব দুইটি পরিস্থিতির ভালোমন্দ বিচার করে না, কিন্তু আবেগের বশবর্তী হইয়া চলে। এই দুইটি ব্যক্তিত্বকে নির্বিচার বা অভিজ্ঞতা-নির্ভর (Irrational or Empirical Types) বলা হয়।

অন্তর্বৃত্ত এবং বহির্বৃত্ত এই দুইটিই আবার চিন্তন, বেদনা, অন্তর্জ্ঞান এবং সংবেদন এই চারিটির প্রাধান্য অনুসারে চার রকমের হইতে পারে। যেমন বিচারশীল, সংবেদনশীল, অন্তর্জ্ঞানবান এবং সংবেদনশীল, এই চারিটির প্রত্যেকটি অন্তর্বৃত্ত ও বহির্বৃত্ত ভেদে দুই প্রকার হইতে পারে। সুতরাং চারটি অন্তর্বৃত্ত এবং চারটি বহির্বৃত্ত শ্রেণী লইয়া **ব্যক্তিত্ব আট রকমের হইয়া দাঁড়ায়।** আবার ইহাদের প্রত্যেকটি দুই রকমের হইতে পারে। যেমন বিচারশীল অন্তর্বৃত্ত এবং বহির্বৃত্ত ব্যক্তির বেদনা অবদমিত হইয়া শুধু চিন্তন প্রকাশিত হইতে পারে, আবার উহার চিন্তন অবদমিত হইয়া শুধু বেদনা প্রকাশিত হইতে পারে। আবার নির্বিচার অন্তর্বৃত্ত এবং বহির্বৃত্ত ব্যক্তির অন্তর্জ্ঞান প্রকাশিত এবং সংবেদন অবদমিত অথবা সংবেদন প্রকাশিত এবং অন্তর্জ্ঞান অবদমিত হইতে পারে।

এইরূপে য়ুঙ্গ-এর মতানুযায়ী ব্যক্তিত্বের **ষোলটি** নমুনাভেদ হইতে পারে।

(গ) বারম্যান্-প্রবর্তিত ব্যক্তিত্বের গ্রন্থীয় জাতিরূপ (Glandular Types)

হিউমর ভেদ অনুসারে চারটি প্রাচীন ব্যক্তিত্ব-ভেদকে **বারম্যান** (Berman) একটি নূতন রূপ দিয়াছেন। তিনি তাঁহার মতের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করেন নাই। তথাপি বলা যায় যে অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলির প্রাধান্য অনুসারে তিনি ব্যক্তিত্বের কতগুলি **গ্রন্থীয় জাতিরূপের** ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

এড্রিনেল ব্যক্তিত্বের এড্রিনিন বা এপিনেফ্রিন **অধিক ক্ষরিত হয়**—ফলে তাহার ত্বক পুরু, চুল রুক্ষ ও শুষ্ক এবং দাঁত বড় হইয়া থাকে। এই ব্যক্তি তাড়াতাড়ি বিপদের সম্মুখীন হইতে পারে। আবার এড্রিনেল-এর রসক্ষরণের সহিত পিটুইটিন-এর বেশী ক্ষরণ হইলে এড্রিনেল ব্যক্তিত্বশালী লোক অসীম শক্তি, উৎসাহ এবং

দৃঢ়তাসম্পন্ন হইয়া থাকে। এড্রিনেল ব্যক্তিত্ব আত্মনির্ভর এবং স্থিরসঙ্কল্প হয়। এড্রিনেল ব্যক্তিত্বশালিনী নারী সাধারণ নারী অপেক্ষা অধিক পুরুষভাবাপন্ন হয়। আবার এড্রিনেল কম **ক্ষরিত হইলে**, স্নায়বিক দৌর্বল্যের লক্ষণ প্রকাশ পায়, শরীরের তাপ এবং রক্তের চাপ কমিয়া যায়, উত্তেজনা এবং রোগাতঙ্ক লক্ষণের সহিত অবসাদ দেখা দেয়।

পিটুইটারি ব্যক্তিত্ব সম্মুখের (Anterior) এবং পশ্চাতের (Posterior) পিটুইটারি গ্রন্থির রসক্ষরণের প্রাধান্য অনুসারে ভিন্ন হয়। **সম্মুখের পিটুইটারি প্রাধান্য লাভ করিলে**, পৌরুষ, শারীরিক বিকাশ এবং মস্তিষ্কশক্তি বাড়ে। এই গ্রন্থি বুদ্ধি, দূরদৃষ্টি, বিচারশীলতা এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বাড়ায়। কিন্তু **পশ্চাতের পিটুইটারি গ্রন্থির প্রাধান্য ঘটিলে**, মেয়েলি ভাব এবং ভাবোচ্ছ্বাস বৃদ্ধি পায়। এই দ্বিতীয় অংশটি মাতৃত্বসুলভ, সামাজিক, সৃজনমূলক এবং যৌন প্রকৃতিকে প্রভাবিত করে। **সমগ্র পিটুইটারি গ্রন্থির রসক্ষরণ কম হইলে**, জননেন্দ্রিয়ের ক্ষুদ্রতা, চেহারায় খর্বতা, অবসন্নতা, নির্বুদ্ধিতা, উৎসাহাভাব এবং সর্বাঙ্গীণ অবনতি ঘটে।

যেমন, ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল্-এর ব্যক্তিত্ব ছিল পিটুইটারি। তাঁহার সম্মুখের পিটুইটারি অত্যধিক ক্রিয়াশীল ছিল বলিয়াই তিনি অসাধারণ সহনশীল, সংগঠনক্ষম, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এবং স্থিরসঙ্কল্প ছিলেন। বারম্যান্-এর মতে নেপোলিয়ন্ নীৎসে, ডারুইন্, জুলিয়াস্ সীজার প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ পিটুইটারি ব্যক্তিত্বশালী ছিলেন।

থাইরয়েড ব্যক্তিত্বে থাইরয়েড্ গ্রন্থির রসক্ষরণের প্রাধান্য থাকে। এই ব্যক্তিত্বশালী লোক প্রাণশক্তির প্রাচুর্যে পূর্ণ, কামপ্রবণ, শীর্ণ, কর্মঠ, ঘনচুল-বিশিষ্ট হয়। সে চট্ করিয়া পরিস্থিতি বুঝিতে পারে। তাহার ইচ্ছাশক্তি এবং আবেগ প্রবল হয়। কিন্তু যদি থাইরক্সিন্-এর প্রাচুর্যের সহিত থাইমাস ক্ষরণ বেশী হয়, তবে আবেগের সাম্য থাকে না।

থাইরক্সিন্ কম ক্ষরিত হইলে, গৌণ যৌন লক্ষণগুলির উপযুক্ত বিকাশ হয় না। এইরূপ অবস্থায় পুরুষ নারীর এবং নারী পুরুষের বেশভূষা, হাবভাব প্রভৃতি অনুকরণ করে, তাহার আকৃতি ক্ষুদ্র হয়, মধ্য বয়সে স্থূলতা আসে, গায়ের রং ফ্যাকাশে, চুল শুষ্ক, দাঁত খারাপ এবং রক্ত চলাচল অনিয়মিত হয়। এই ব্যক্তির মনে মন্দতা, নির্বুদ্ধিতা, উদাসীনতা, জড়তা এবং অসামঞ্জস্য আসে।

উপরোক্ত প্রধান গ্রন্থীয় ব্যক্তিত্বগুলি ছাড়া থাইমাস্ ও যৌনগ্রন্থি প্রভৃতির

অত্যধিক বা অত্যল্প ক্রিয়া অনুসারেও বিভিন্ন প্রকার ব্যক্তিত্বের উদ্ভব হইয়া থাকে।

(ঘ) ক্রেশ্‌মার (Kretschmer)-প্রবর্তিত ব্যক্তিত্বের জাতিরূপ

ক্রেশ্‌মার শরীরের গঠন অনুসারে ব্যক্তিত্বের কয়েকটি জাতিরূপ নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে দেহের ও মনের গঠন ভেদে ব্যক্তিত্বভেদ ঘটে।

ক্রেশ্‌মার্‌-এর **দৈহিক ব্যক্তিত্ব** চার শ্রেণীর: অ্যাথ্‌লেটিক্‌, অ্যাস্‌থেনিক্‌, পিক্‌নিক্‌ এবং ডিস্‌প্ল্যাস্‌টিক্‌।

অ্যাথ্‌লেটিক (Athletic) ব্যক্তিত্ব-বিশিষ্ট ব্যক্তির দেহের গঠন মজবুত, পেশী দৃঢ়, বুক চওড়া, ঘাড় প্রশস্ত এবং হাত পা বড়। **অ্যাস্‌থেনিক্‌** (Asthenic) ব্যক্তি সাধারণতঃ রোগা, লম্বা এবং তাহার বুক চাপা। **পিক্‌নিক্‌** (Pyknic) ব্যক্তির মাথা, বুক, তলপেট, প্রভৃতি গহ্বরগুলি বড়। তাহার মেদবাহুল্য থাকে। এই ব্যক্তি দেখিতে গোলগাল। তাহার মুখমণ্ডল কোমল ও প্রশস্ত এবং হাত পা ছোট, কিন্তু চওড়া। **ডিস্‌প্ল্যাস্‌টিক্‌** (Dysplastic) ব্যক্তির গৌণ যৌন লক্ষণগুলি অবিকশিত। এই ব্যক্তির দেহ অপরিণত এবং সামঞ্জস্যহীন।

ক্রেশ্‌মার **অস্বভাবী মানস** ব্যক্তিত্বের দুইটি প্রকারভেদ দেখাইয়াছেন। প্রথমটি হইল **সাইক্লোথিমিক্‌** (Cyclothymic, Manic-depressive) অথবা **খেদোন্মত্ত বাতুল** ব্যক্তিত্ব। এই প্রকার অস্বভাবী ব্যক্তিত্ব আবেগ অথবা প্রক্ষোভের ক্ষেত্রে প্রকাশ পায়। ইহাতে চরম আবেগগুলির পুনঃপুনঃ এবং দ্রুত পরিবর্তন ঘটে। হঠাৎ উত্তেজনা, আবার পরক্ষণেই অবসাদ অথবা হঠাৎ আনন্দ, আবার পরক্ষণেই নিরানন্দ প্রভৃতি চরম আবেগ এই ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু সাইক্লোথিমিক ব্যক্তিত্বের ঘন ঘন ভাব-বিপর্যয় সত্ত্বেও বাস্তব জগতের সহিত সম্পর্ক স্বাভাবিকই থাকে।

দ্বিতীয় অস্বভাবী ব্যক্তিত্বটি হইল **সিজোফ্রেনিক** (Schizophrenic) বা **চিত্তভ্রংশী বাতুলতা শ্রেণীর**। ইহাতে মানসিক ঐক্যসূত্র ছিন্ন হয়, ফলে একই ব্যক্তিত্ব যেন একাধিক হইয়া পড়ে। ইহাতে ব্যক্তি তাহার নিজ সত্তায় আবদ্ধ থাকে এবং বাস্তব জগতের সহিত সম্পর্ক হারাইয়া ফেলে।

উল্লিখিত দুইটি অস্বভাবী মানস ব্যক্তিত্ব ছাড়াও ক্রেশ্‌মার আরও দুই প্রকার **স্বভাবী মানস ব্যক্তিত্বের** উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথমটি হইল **সাইক্লয়েড্‌** (Cycloid)

এবং দ্বিতীয়টি **সিজয়েড্** (Schizoid) শ্রেণীর। ইহারা যথাক্রমে সাইক্লোথিমিক্ এবং সিজোফ্রেনিক্ এই দুইটি অস্বভাবী ব্যক্তিত্বের স্বাভাবিক অবস্থা। য়ুঙ্গ-প্রদর্শিত ইন্‌ট্রোভার্ট এবং এক্স্‌ট্রোভার্ট ব্যক্তিত্বই যথাক্রমে ক্রেশ্‌মার-প্রদর্শিত সিজয়েড্ এবং সাইক্লয়েড ব্যক্তিত্ব।

সিজয়েড ব্যক্তি আত্মকেন্দ্রিক, কল্পনাপ্রবণ, অসামাজিক, রুক্ষস্বভাব, সহানুভূতিহীন, মাথাপাগলা এবং প্রায়ই বুদ্ধিমান হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে, সাইক্লয়েড্ ব্যক্তি সামাজিক, সৎপ্রকৃতি, কর্মঠ, ভাবপ্রবণ, উত্তেজনাপ্রবণ, এবং চঞ্চল হয়। স্বাভাবিক লোকের মধ্যে এই দুইটি শ্রেণী পরিলক্ষিত হয়।

সাইক্লয়েড্ ব্যক্তিত্ব অস্বাভাবিক হইলে, উহা সাইক্লোথিমিক্ ব্যক্তিত্বের আকার গ্রহণ করে। আবার সিজয়েড্ ব্যক্তিত্ব অস্বাভাবিক হইলে, উহা সিজোফ্রেনিক ব্যক্তিত্বের রূপ নেয়।

(ঙ) শেলডন্ (Sheldon)-প্রবর্তিত ব্যক্তিত্বের জাতিরূপ

ডব্‌লু. এইচ. শেলডন্ এবং এস্. এস্, ষ্টিভেন্‌স্ (Stevens) দেখাইয়াছেন যে বিভিন্ন শ্রেণীর দৈহিক গঠন অনুসারে মেজাজ বা মানসিক গঠনেরও শ্রেণীভেদ ঘটে।

(১) দৈহিক কোমলতা এবং স্থূঠামতার প্রাধান্যকে তাঁহারা বলিয়াছেন **এণ্ডোমর্ফি** (Endomorphy)। এণ্ডোমর্ফিক ব্যক্তির তলপেট মেদবহুল বা থলথলে এবং হাড় ও পেশী অপরিণত। মেজাজ ও মানসিক গঠন অনুসারে এণ্ডোমর্ফিক ব্যক্তি আবার ভিসেরোটনিক্ (Viscerotonic)। ভিসেরোটনিক ব্যক্তি বিশ্রাম এবং আরামপ্রিয়। সে ভালবাসা, সমর্থন, খাওয়া-দাওয়া, বিপদে সাহায্য প্রভৃতি পাইতে চায়। এই ব্যক্তি অত্যন্ত মিশুক, সহিষ্ণু এবং প্রেমিক প্রকৃতির হইয়া থাকে। মনের আবেগ প্রকাশ করিতে ইহার দ্বিধা নাই।

(২) যে দেহ হাড় এবং পেশী-বহুল, শেল্‌ডন্ তাহার নামকরণ করিয়াছেন **মেসোমর্ফিক** (Mesomorphic)। মেসোমর্ফিক দেহ মোটাও নয় আবার পাতলাও নয়, কিন্তু দোহারা। ইহারা পেশী ও হাড়-বহুল। মেজাজ ও মানসিক গঠনের দিক দিয়া মেসোমর্ফিক ব্যক্তি সোমাটোটনিক (Somatotonic)। এই ব্যক্তি কর্মঠ, বেপরোয়া, প্রতিযোগিতা ও আক্রমণ-প্রিয়। সে শক্তি জাহির করিতে ভালবাসে।

(৩) চর্ম ও স্নায়ুর প্রাধান্য অনুসারে ইহারা দেহের ভেদকে বলিয়াছেন **একটোমর্ফি** (Ectomorphy)। একটোমর্ফিক্ দেহ দুর্বল এবং ক্ষীণ। মেজাজ বা

মানসিক গঠনের দিক দিয়া একটোমর্ফিক ব্যক্তিগণ সেরিব্রোটনিক্ (Cerebrotonic)। সেরিব্রোটনিক ব্যক্তিগণের ভঙ্গী এবং চলাফেরা সংহত ও আড়ষ্ট। ইহারা আবেগ চাপিয়া রাখে, লোকের সহিত মিশিতে ভয় পায়, কখন কি করিয়া বসিবে জানে না এবং দুঃখে পড়িলে নির্জনতা খোঁজে।

ক্রেশমার-এব পিক্‌নিক্, অ্যাথলেটিক্ এবং অ্যাসথেনিক্ দেহভেদের সহিত শেলডন-এর এণ্ডোমর্ফিক্, মেসোমর্ফিক্ এবং একটোমর্ফিক্ ভেদের ক্রমিক সঙ্গতি আছে।

(চ) ব্যক্তিত্বের দার্শনিক জাতিরূপ

জীবনের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে **ই স্প্র্যাঙ্গার** (Spranger) ব্যক্তিত্বের নিম্নোক্ত শ্রেণীভেদ করিয়াছেন :

(১) **তাত্ত্বিক** (Theoretical) ব্যক্তিত্ব মননশীল গবেষণায় এবং সত্যানুসন্ধানে উৎসুক। এই ব্যক্তিত্ব দর্শন ও বিজ্ঞানে নিযোজিত হয়।

(২) **আর্থনীতিক** (Economic) ব্যক্তিত্ব বস্তুতান্ত্রিক হইয়া থাকে।

(৩) **সৌন্দর্যপ্রিয়** (Aesthetic) ব্যক্তিত্ব জীবনকে আনন্দময় ও সুন্দর করিয়া গড়িতে চায়।

(৪) **সামাজিক** (Social) ব্যক্তিত্ব মানব-প্রেমিক হয়।

(৫) **রাষ্ট্রনীতিক** (Political) ব্যক্তিত্ব ক্ষমতাপ্রিয় হইয়া থাকে।

(৬) **ধার্মিক** (Religious) ব্যক্তিত্ব পরম শক্তির সাহায্যে জীবনের চরম সার্থকতা লাভ করিতে চায়।

(ছ) ই. আর. যোনেশ-এর জাতিরূপ

উপরোক্ত জাতিরূপগুলি ছাড়াও ব্যক্তিত্বের আরও অনেক প্রকার জাতিরূপ আছে। আইডেটিক্ প্রতিরূপের তারতম্য অনুসারে ই. আর. যোনেশ্ (Jaensch) ব্যক্তিত্বকে বিভক্ত করিয়াছেন **টি-টাইপ** বা **টিটানয়েড** (Titanoid) এবং বি-টাইপ বা বেজ্‌ডউয়েড্ (Bezdowoid) এই দুই শ্রেণীতে। প্রথম জাতিরূপটিতে অনুসংবেদনের (alter-sensation) সহিত আসল দর্শন-প্রতিরূপের সাদৃশ্য থাকে। দ্বিতীয়টিতে

১। এই খণ্ডের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের তৃতীয় অনুচ্ছেদে আইডেটিক্ প্রতিরূপের আলোচনা দ্রষ্টব্য।

অনুসংবেদন স্মৃতি প্রতিরূপের (memory-image) প্রায় অনুরূপ হয়। দ্বিতীয়টির সহিত শিল্পীয় মনোভাব, থাইরয়েড্ গ্রন্থির বৃদ্ধি, মানসিক উদ্দীপকের ফলে তীব্র প্রতিক্রিয়া —বিশেষতঃ সমবেদী স্নায়ুতন্ত্রে—পরিলক্ষিত হয়। প্রথমটিতে মানসিক উদ্দীপক অপেক্ষা সাধারণ পারিবেশিক উদ্দীপকই সমধিক প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন করে।

উপরোক্ত দুইটি বিশুদ্ধ জাতিরূপের অতিরিক্ত কয়েকটি মিশ্রিত জাতিরূপও যেনেশ্ স্বীকার করিয়াছেন—বিটি, টিবি, টিই, বি-এইচ প্রভৃতি। ব্যক্তিত্বের এই জাতিরূপ বিভাগটি জটিল। সুতরাং ইহা উল্লিখিত হইল মাত্র।

(জ) **ফ্রয়েড্-প্রবর্তিত জাতিরূপ**

শিশুর মানস-যৌন বিকাশের স্তরভেদগুলি ফ্রয়েড্-এর মতে এই :—

সর্বপ্রথম শিশু সুখ অনুভব করে স্তন্যপানে—মুখের উদ্দীপনা হইতে। এইটি শিশুর মানস-যৌন বিকাশের **মুখ-কাম** (Oral-erotic) স্তর; এই মুখ-কাম অবস্থাটি প্রথমে থাকে **নিষ্ক্রিয়** (passive), কারণ ইহাতে শিশু ভোগ্যবস্তুকে তাহার মুখে রাখিয়া দিতে চায়। এই অবস্থায় শিশুর জীবন অনেকটা পরগাছার মত—সে নিষ্ক্রিয়, নির্ভরশীল এবং আশাদীপ্ত থাকে।

মানস-যৌন বিকাশের পরবর্তী অবস্থায় শিশুর নিষ্ক্রিয় মুখ-কামিতা **সক্রিয়** (active) হইয়া ওঠে। এই সক্রিয় মুখ-কাম অবস্থাকে ফ্রয়েড বলিয়াছেন **ধর্ষকাম** (Sadistic) মুখ-কাম স্তর। এই অবস্থায় শিশুর আক্রমণাত্মক ভাব প্রকাশ পায়—যেমন, স্তনবৃন্ত শুধু মুখে পুরিয়া না রাখিয়া সে হয়ত উহা কামড়াইয়া দেয় এবং মাতার প্রতি হিংসা বা বিদ্রূপাত্মক মনোভাব ও নৈরাশ্য পোষণ করে।

শিশুর মানস-যৌন বিকাশের পরবর্তী স্তর হইল **পায়ু-কাম** (Anal-erotic) স্তর। এই স্তরে সুখের কেন্দ্র মুখ হইতে পায়ুতে বা গুহ্যে সরিয়া যায়। এই স্তরেরও দুইটি অবস্থা আছে। কিন্তু এইস্থলে প্রথমটি সক্রিয় বা **ধর্ষকাম** এবং পরবর্তীটি নিষ্ক্রিয় বা **মর্ষকাম** (Masochistic)। প্রথমটিতে মলত্যাগ, গুহ্যের সঙ্কোচন, প্রসারণ প্রভৃতি ক্রিয়া হইতে শিশুর সুখ জন্মে এবং দ্বিতীয়টিতে গুহ্য এবং মলই তাহার পক্ষে সুখজনক হইয়া দাঁড়ায়। মনের দিক দিয়া শিশু এই সময়ে বেয়াড়া, একগুঁয়ে, অভিমানী এবং সুবিধাবাদী হয়।

শিশুর মানস-যৌন বিকাশের তৃতীয় স্তর হইল **উপস্থ-কাম** (Genital-erotic)। ইহার প্রথম এবং দ্বিতীয় অবস্থার নাম যথাক্রমে **ফ্যালিক** (Phallic) এবং **জেনিট্যাল্**

(Genital)। প্রথমটি অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট এবং অগঠিত। ইহাতে শিশু ধারণা করে যে তাহার মত সকলেরই যৌন লিঙ্গ আছে। দ্বিতীয়টি মানস-যৌন বিকাশের স্বাভাবিক অবস্থা। ইহাতে লিঙ্গই যৌন-সুখের কেন্দ্র হইয়া দাঁড়ায়। এই স্তরে শিশু সৃজনশীল, প্রতিযোজনশীল, নির্ভরযোগ্য এবং সহযোগিতাভাব-সম্পন্ন হইয়া উঠে।

উপরোক্ত স্তরগুলি শিশুর মানস-যৌন বিকাশের অবস্থা হইলেও, উহাদের সহিত শিশুর বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব প্রকাশিত হয়। এই দিক হইতে বিচার করিলে, ব্যাপক অর্থে ইহাদিগকে ব্যক্তিত্বের জাতিরূপও বলা যাইতে পারে।

(ঝ) এরিক্ ফ্রোম (Eric Fromm) প্রবর্তিত ব্যক্তিত্বের জাতিরূপ

এরিক্ ফ্রোম্ ব্যক্তিত্বের পাঁচটি শ্রেণীভেদ করিয়াছেন—যথা **গ্রহণক্ষম** (Receptive), **আদায়ক্ষম** (Exploitative), **সঞ্চয়ক্ষম** (Hoarding), **বিনিময়ক্ষম** (Marketing) এবং **সৃজনক্ষম** (Creative)। এই শ্রেণীগুলির সহিত যথাক্রমে ফ্রয়েড্-এর নিষ্ক্রিয় মুখকাম, ধর্ষ-মুখকাম, নিষ্ক্রিয় পায়ুকাম, ধর্ষ পায়ুকাম এবং উপস্থকাম স্তরগুলির সঙ্গতি রহিয়াছে।

ব্যক্তিত্বের অন্যান্য জাতিরূপ

ব্যক্তিত্বের আরও নানারকম জাতিরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। যেমন ফ্রয়েড্-এর একটি শ্রেণীভেদ প্রসিদ্ধ—যথা **কামীয়** (Erotic), **আবেশজ** (Obsessional) এবং **স্বতঃকাম** (Narcissistic)। বলডুইন (Baldwin) ব্যক্তিত্বের ভেদ করিয়াছেন **সংবেদনজ** (Sensory) এবং **গতিজ** বা চেষ্টীয় (Motor) শ্রেণীদ্বয়ে। র‍্যাঙ্ক (Rank) **সাধারণ** (Average), **অপরাধী** (Criminal), **শিল্পীয়** (Artistic) এবং **স্নায়বিক** (Neurotic) এই চার শ্রেণীতে ব্যক্তিত্বকে বিভক্ত করিয়াছেন। রোসানফ (Rosanoff) ব্যক্তিত্বের ভেদ করিয়াছেন **অসামাজিক** (Antisocial), **সাইক্লোথিমিক** (Cyclothymic), **শিল্পীয়** (Artistic) এবং **মৃগীয়** (Epileptic)—এই চার শ্রেণীতে।

বাহুল্য বোধে এইগুলির ব্যাখ্যা করা হইল না।

৪। ব্যক্তিত্বের প্রলক্ষণ (Traits of Personality)

ব্যক্তিত্বের প্রলক্ষণ (Trait) বলিতে বুঝায় এমন কতগুলি চিন্তা, অনুভূতি এবং ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য, যাহার সাহায্যে একটি ব্যক্তিত্বকে অন্য ব্যক্তিত্ব হইতে পৃথক্ করিয়া

দেখানো যায়। চলিত ভাষায় এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে বিশেষণ রূপে প্রকাশ করা হয়, যেমন আশাবাদী, নৈরাশ্যবাদী, আয়াসী, পরিশ্রমী, বিষন্ন, প্রফুল্ল, উদার, সঙ্কীর্ণ প্রভৃতি। চলিত ভাষায় এই বিশেষণের সংখ্যা প্রায় দুই হাজার বা তাহারও অধিক। সহজ ভাষায়, ব্যক্তিত্বের প্রলক্ষণ এমন বিশেষ গুণ বা ধর্ম যাহা এক ব্যক্তিত্বকে অন্য ব্যক্তিত্ব হইতে পৃথক্ বলিয়া জানায়।

অ্যাল্‌পোর্ট্, ক্যাটেল্ (Cattell), আইসেঙ্ক (Eysenck) প্রভৃতি ব্যক্তিত্ব-মনোবিদেরা ব্যক্তিত্বের প্রলক্ষণগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করিতে চাহিয়াছেন। এই অসংখ্য প্রলক্ষণগুলি স্বতন্ত্র বা পরস্পর-নিরপেক্ষ নয়, কিন্তু ইহাদের কয়েকটি এক একটি শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত।

যেমন আশাবাদী—নৈরাশ্যবাদী, আয়াসী—পরিশ্রমী, সহিষ্ণু—অসহিষ্ণু প্রভৃতি লক্ষণগুলি জোড়বদ্ধ। অধিকন্তু, ব্যক্তিত্বের প্রলক্ষণগুলি গড় সম্ভাবনা রেখাচিত্র অনুসারে জনসংখ্যায় বণ্টিত হয়। কোনো জনসংখ্যায় বেশীর ভাগ লোকই জোড়বদ্ধ গুণদ্বয়ের দুই চরম প্রান্তে না পড়িয়া, পড়ে দুই প্রান্তের কোনো এক মধ্যবর্তী বা কেন্দ্রীয় স্থানে। যেমন বেশীর ভাগ লোকই চূড়ান্তভাবে আশাবাদী বা নৈরাশ্যবাদী হয় না, কিন্তু অবস্থাবিশেষে যেমন আশাবাদী তেমন নৈরাশ্যবাদী হয়। আবার বেশীর ভাগ লোকই চূড়ান্তভাবে বিষণ্ণ বা প্রফুল্ল হয় না, কিন্তু এই দুই চরম প্রান্তের মধ্যবর্তী, অর্থাৎ অবস্থাবিশেষে বিষণ্ণ এবং প্রফুল্ল হইয়া থাকে।

ক্যাটেল্-প্রদর্শিত ব্যক্তিত্ব-প্রলক্ষণ

ব্যক্তিত্ব-প্রলক্ষণের সামঞ্জস্য দেখাইতে গিয়া ক্যাটেল্ বাহ্য (Surface) এবং মূল প্রলক্ষণের পার্থক্য প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রথমোক্ত প্রলক্ষণগুলি ব্যক্তির ব্যবহার বা আচরণে সোজাসুজিভাবে দেখা যায়। কিন্তু দ্বিতীয় প্রলক্ষণগুলি ব্যক্তির অন্তস্তলে থাকে। ইহারা সোজাসুজিভাবে আচরণে প্রকাশিত হয় না, কিন্তু ভিতরে থাকিয়া ব্যক্তিত্বের প্রকাশকে নিয়ন্ত্রিত করে। প্রথম লক্ষণগুলির মধ্যে প্রায়ই সামঞ্জস্য বা স্থায়িত্ব থাকে না, অর্থাৎ উহারা প্রায়ই অসংবদ্ধভাবে প্রকাশিত হয় এবং কখনও প্রকাশিত হয়, কখনও বা হয় না। যেমন, আত্মবিশ্বাস ব্যক্তির একটি গভীর বা কেন্দ্রীয় গুণ, যাহা চট্ করিয়া তাহার চালচলনে দেখা যায় না, অথচ যাহার উপর তাহার হাবভাব এবং চালচলন নির্ভর করে। এই ব্যক্তির ভিতর যে আত্মবিশ্বাস আছে, তাহা তাহার কাজে একনিষ্ঠতা, অধ্যবসায়, দৃঢ়তা প্রভৃতি বাহিরের গুণাবলীতে প্রকাশিত হয়।

ক্যাটেল্ ব্যক্তিত্ব-প্রলক্ষণের যে তালিকা দিয়াছেন তাহা এইরূপ। প্রধান বাহ্যগুণ (Surface Traits) তাঁহার মতে কুড়ি শ্রেণীর এবং প্রধান বা মুখ্য মূল লক্ষণগুলি (Source Traits) বারো শ্রেণীর।

প্রধান বাহ্যগুণ	বিপরীত
১। চরিত্রের চমৎকারিতা	নৈতিক ত্রুটি লাগিয়া না থাকা
(ক) সততা, পরার্থতা	অসাধুতা, অনির্ভরযোগ্যতা
(খ) একনিষ্ঠ চেষ্টা	কর্মত্যাগ, অসঙ্গতি
২। বাস্তববাদ, আবেগের গঠন	স্নায়বিক দৌর্বল্য, এড়াইয়া যাওয়া, ছেলেমানুষী
(ক) বাস্তববাদ, স্থায়িতা	,, ,, পরিবর্তনশীলতা
(খ) ব্যবহারিকতা, সঙ্কল্প	জাগর স্বপ্ন, এড়াইয়া যাইবার ভাব
(গ) স্নায়বিক দৌর্বল্য, আত্মপ্রবঞ্চনা, অসংযত আবেগ	ইহাদের বিপরীত
(ঘ) ছেলেমানুষী, আদায়কারিতা, আত্মকেন্দ্রিকতা	পরিণত আবেগ, ব্যর্থতাসহন
৩। সাম্যভাব, সরলতা, আশাবাদ	বিষাদ, অস্থিরতা
(ক) শান্তভাব, সামাজিক আকর্ষণ	অস্থিরতা, বিষণ্ণতা, একগুঁয়েমি
(খ) সাম্যভাব, সরলতা, খেলোয়াড়ীভাব	নৈরাশ্যবাদ, গোপনীয়তা, বাড়াবাড়ি
৪। বুদ্ধি, শিক্ষিত মন, স্বাতন্ত্র্য	বোকামি, নির্ভরযোগ্যতা, চিন্তা না করা
(ক) আবেগের পরিণতি, পরিষ্কার মন	ছেলেমানুষী, নির্ভরশীলতা
(খ) ভদ্রতা, শিষ্টতা, চিন্তাশীলতা	বহির্মুখতা, বোকামি, সঙ্কল্পের অভাব
(গ) সৃজনশীলতা, স্থিরসঙ্কল্প, বুদ্ধি	সঙ্কীর্ণ আকর্ষণ, অস্পষ্টতা
(ঘ) বুদ্ধি, প্রবেশ, সাধারণ, ক্ষমতা	সাধারণ ক্ষমতার অভাব
৫। অহঙ্কার, আত্মপ্রচার, গোঁড়ামি	নম্রতা, আত্মবিলোপ, উপযোজন ক্ষমতা
৬। সাহস, স্বাতন্ত্র্য, কঠোরতা	ভীরুতা, বাধ, বেদনশীলতা

প্রধান বাহ্যগুণ	বিপরীত
৭। সামাজিকতা	ভীরুতা, বিরোধিতা, বিষণ্ণতা
৮। সাধারণ আবেগশীলতা, চড়া মেজাজ, অসমতা	সাম্যভাব, বিবেচকতা, গোপনীয়তা।

মুখ্য মূল লক্ষণ	বিপরীত
১। সহজগতি, প্রফুল্ল, সহৃদয়, সদয়	অনমনীয়, উদাসীন, ভীরু, বিরোধী, লাজুক
২। বুদ্ধিমান, স্বতন্ত্র, স্থির	বোকা, চিন্তাশীল নয়, চপল
৩। স্থির আবেগ, বাস্তববাদী, দৃঢ়	স্নায়বিক দুর্বলতা, এড়াইয়া যাওয়া, চঞ্চল আবেগ
৪। প্রাধান্যপ্রিয়, উন্নতিশীল, আত্মপ্রচারক	অনুগত, আত্মবিলোপশীল
৫। সাম্যভাববিশিষ্ট, প্রফুল্ল, সামাজিক, বাচাল	বিষণ্ণ, অবসন্ন, নির্জনতাপ্রিয়, অস্থির

মুখ্য মূল লক্ষণ	বিপরীত
৬। বেদনশীল, কোমল, সহানুভূতিশীল	কঠিন, স্থির, সরল, আবেগহীন
৭। শিক্ষিত ও শিষ্টমন, সৌন্দর্যপ্রিয়	অভদ্র, অশিষ্ট
৮। বিবেকী, দায়িত্বশীল, কষ্টসহিষ্ণু	আবেগপূর্ণ, নির্ভরশীল, উত্তেজিত, দায়িত্বহীন
৯। সাহসী, নিরুদ্বেগ, সদয়	ব্যাহত, গোপনশীল, সাবধান আত্মমগ্ন
১০। তেজোদৃপ্ত, উৎসাহী, স্থির, দ্রুত	অলস, শিথিল, জাগর স্বপ্নচারী
১১। অত্যন্ত আবেগশীল, চড়া-মেজাজ, উত্তেজনাপ্রবণ	শ্লেষ্মাপ্রবণ, সহিষ্ণু
১২। সহৃদয়, বিশ্বাসকারী	সন্দেহপূর্ণ, বিরোধী।

উপরে বলা হইয়াছে যে পরস্পরবিরোধী গুণ সাহায্যে ব্যক্তিত্বের বর্ণনা নির্ভরযোগ্য হয় না, কারণ জনসংখ্যার অধিকাংশ লোকই উহাদের মধ্যবর্তী গুণবিশিষ্ট হয়।

কোনো ব্যক্তিতে একটি গুণ সম্পূর্ণই থাকিবে অথবা একেবারেই থাকিবে না—যেমন কোনো ব্যক্তি সর্বদা প্রফুল্ল অথবা সর্বদা বিষণ্ণ থাকিবে—এমন নয়। সুখী এবং দুঃখিত এই দুই বিপরীত মনোভাবের মধ্যবর্তী অসংখ্য কম বেশী সুখী বা দুঃখিত মনোভাব থাকিতে পারে। ধরা যাউক, যে সুখী ও দুঃখিত এই দুইটি গুণকে একই সরল রেখার বাম ও দক্ষিণ, এই দুই বিপরীত প্রান্তে বসানো হইল। এইবার বামপ্রান্তের সুখী অবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণপ্রান্তীয় দুঃখী অবস্থায় ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে থাকিলে, সুখ কমিতে থাকে এবং সুখ-দুঃখ-নিরপেক্ষ মধ্য বা কেন্দ্রীয় বিন্দু অতিক্রম করিবাব পর দুঃখের পরিমাণ ক্রমশঃ বাড়িয়া চরমে পৌঁছায়। আবার, দক্ষিণ প্রান্তের দুঃখী অবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া বামপ্রান্তীয় সুখী অবস্থায় ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে থাকিলে, দুঃখ কমিতে থাকে এবং সুখ-দুঃখ-নিরপেক্ষ মধ্য বা কেন্দ্রীয় বিন্দু অতিক্রম করিবার পব সুখের পরিমাণ ক্রমশঃ বাড়িয়া চবমে পৌঁছায়।

সুখী মধ্যবিন্দু দুঃখী

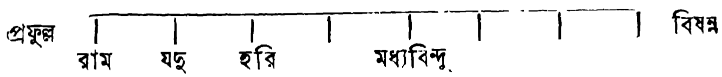
এইবার দুই বা ততোধিক ব্যক্তি সুখী বা দুঃখী, ইহা নির্ণয় করিতে হইলে আমরা উহাদিগকে সুখী এবং দুঃখী, এই চরম সীমায় না বসাইয়া, তাহাদের মধ্যে এই দুইটি গুণের অল্পাধিক্য অনুসারে তাহাদিগকে এই সরল রেখার যে কোনো স্থানে বসাইতে পারি। যে ব্যক্তিটি বেশী সুখী তাহাকে বামে এবং যে কম সুখী তাহাকে দক্ষিণে বসাইয়া একই গুণের দিক দিয়া উহাদের বর্ণনা করিতে পারি।

৫। ব্যক্তিত্বের মাত্রা
(Dimensions of Personality)

উপরোক্ত ভাবে বিরোধী দুইটি গুণকে ব্যক্তিত্বের ডাইমেনসন্‌স অথবা মাত্রা বলে। ব্যক্তিত্ব কিরূপ তাহা বুঝাইতে হইলে উহা বিশেষণ দিয়া বুঝাইতে হয়—যেমন উদার, সঙ্কীর্ণ, প্রফুল্ল বিষণ্ণ প্রভৃতি। ব্যক্তিত্ব বর্ণনায় দুইটি বিপরীত গুণাত্মক মাত্রার পরিমাণ অনুসারে উহাকে উপরোক্ত প্রকারের একটি কল্পিত সরলরেখার কোনো চিহ্নিত স্থানে বসাইতে হয়। এই সরলরেখাটিকে ব্যক্তিত্ব পরিমাপের **অংশিত মানক** (Graduated Scale) বলা হয়। ইহাতে একটি মাত্রা বা ডাইমেন্‌সন্‌-এর একটি প্রলক্ষণ উচ্চতম পরিমাণ হইতে আরম্ভ হয়, ক্রমশঃ কমিতে থাকে। এইরূপে প্রলক্ষণটি ঐ অংশিত মানকের মধ্যবিন্দু অতিক্রম করিয়া বিপরীত প্রলক্ষণে রূপান্তরিত হয়। আবার বিপরীত প্রলক্ষণটি ক্রমশঃ বাড়িতে বাড়িতে শেষ প্রান্তে চরম সীমায় পৌঁছায়।

ধরা যাউক যে অভীক্ষিত জনসংখ্যার মধ্যে রামই সর্বাপেক্ষা প্রফুল্ল প্রকৃতির, যদু রাম অপেক্ষা কম, হরি যদু অপেক্ষাও কম প্রফুল্ল। রাম, যদু এবং হরির উপরোক্ত ক্রমিক প্রলক্ষণ-ভেদ বুঝাইতে হইলে রামকে বসাইতে হইবে প্রফুল্ল-বিষণ্ণ মাত্রার এই অংশিত মানকের বাম প্রান্তে, যদুকে ঠিক রামের পরেই এবং হরিকে ঠিক যদুর পরেই —এইরূপ ক্রমে।

তাহা হইলে, ব্যক্তিত্বের প্রলক্ষণ বা মাত্রা বর্ণনায় ব্যক্তিকে ঐ মাত্রার অংশিত মানকে ফেলিয়া বর্ণনা করিতে হয়। সাধারণ স্কেল্ বা মানাক যেমন সেন্টিমিটার বা ইঞ্চির পরিমাণ চিহ্নিত থাকে, প্রলক্ষণ বা মাত্রা পরিমাপের মানককেও ঐ গুণের পরিমাণ অনুসারে চিহ্নিত করা যায়।



প্রলক্ষণ ও মাত্রা

উপরের আলোচনায় মনে হইতে পারে যে প্রলক্ষণ এবং মাত্রার মধ্যে কোনো ভেদ বা পার্থক্য নাই। প্রলক্ষণ বলিতে ব্যক্তিত্বের গুণ বুঝায়। প্রত্যেকটি গুণ উহার বিপরীত গুণের সহিত জড়িত থাকে এবং উহারা দুইটি মিলিত হইয়া এক একটি একক গঠন করে। দুইটি বিপরীত গুণের একককেই সাধারণতঃ মাত্রা বলা হইয়া থাকে। আবার কোনো গুণই উহার বিপরীত গুণটিকে বাদ দিয়া সার্থক হইতে পারে না। এই দিক দিয়া দেখিলে দুইটি বিপরীত গুণের একককে প্রলক্ষণ বা ট্রেইট বলা হয়।

অধিকাংশ মনোবিদ্ মাত্রা এবং প্রলক্ষণের মধ্যে ভেদ করেন নাই। কিন্তু কেহ কেহ, যেমন আইসেঙ্ক্ উহাদের ভেদ প্রদর্শন করিয়াছেন।

আইসেঙ্ক্-এর (Eyesenck) ব্যক্তিত্ব-মাত্রা

আইসেঙ্ক্-এর মতে ব্যক্তিত্বের মাত্রা হইল উহার গঠনে প্রলক্ষণগুলির উন্নত শৃঙ্খলা বা সংগঠন। তিনি মনে করেন যে ব্যক্তিত্বের জাতিরূপের সহিত উহার মাত্রার কোনো বিরোধ নাই।

আইসেঙ্ক্-এর মতে ব্যক্তিত্ব তিনটি মৌলিক মাত্রা লইয়া গঠিত। যথা (১) **অন্তর্বৃত্ত-বহির্বৃত্ত** (Introversicn-Extroversion), (২) **স্নায়বিকতা** (Neuroticism) এবং (৩) **বাতুলতা** (Psychoticism)। সকল ব্যক্তিত্বেই এই

তিনটি মাত্রা কম বেশী পরিমাণে বর্তমান থাকে। কাজেই স্বভাবী এবং অস্বভাবী ব্যক্তিত্বের মধ্যে কোনো প্রকারগত বা জাতিগত পার্থক্য নাই। উহাদের পার্থক্য পরিমাণগত।

এই সাধারণ মাত্রা তিনটি ছাড়াও ব্যক্তিত্বের বিশেষ বিশেষ মাত্রা থাকিতে পারে, যেমন সরলতা—কুটিলতা, কঠোরচিত্ততা—কোমলচিত্ততা এবং রক্ষণশীলতা—প্রগতিশীলতা প্রভৃতি।

৬। ব্যক্তিত্বের পরিমাপ
(Measurement of Personality)

(১) **মূল্য-মানক অভীক্ষা** (Rating Scale Test)

ব্যক্তিত্ব পরিমাপের অনেকগুলি পদ্ধতি আছে। মাত্রা ও প্রলক্ষণের অংশিত মানক সাহায্যে ব্যক্তিত্ব পরিমাপের কথা পূর্বের দুইটি অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে। এই অংশিত মানককে ব্যক্তিত্বের মূল্যমানক (Rating Scale) বলা হইয়া থাকে। যেমন কতকগুলি ব্যক্তিত্বকে আয়াসী-পরিশ্রমী মাত্রা অনুসারে এই মাত্রামানকে চিহ্নিত বিভিন্ন পরিমাণে পরিমাপ করা যাইতে পারে।

	চরম আয়াসী	বেশ আয়াসী	মোটের উপর আয়াসী	মাঝামাঝি অর্থাৎ আয়াসীও নয় পরিশ্রমীও নয়	মোটের উপর পরিশ্রমী	বেশ পরিশ্রমী	চরম পরিশ্রমী
রাম	------	------	------	×	------	------	------
শ্যাম	------	×	------	------	------	------	------
যদু	×	------	------	------	------	------	------
মধু	------	------	------	×	------	------	------
হরি	------	------	------	------	------	------	×
রবি	------	------	×	------	------	------	------
শশী	------	------	------	------	×	------	------
তারা	------	------	------	------	------	×	------

উপরের মূল্যমানকে সাতটি বিন্দু বা চিহ্ন আছে। কিন্তু গুণের পরিমাপ পার্থক্য

অনুসারে মানকে তিনটি, পাঁচটি, এমন কি সাতটি অপেক্ষা বেশী চিহ্ন বা বিন্দুও থাকিতে পারে। রাম, শ্যাম প্রভৃতি আটজন ব্যক্তির অভীক্ষায় দেখা যাইতেছে যে উহাদের মধ্যে দুইজন আয়াসী-পরিশ্রমী মাত্রার মধ্য-বিন্দুতে এবং এক একজন করিয়া প্রত্যেকটি বিন্দুতে স্থান পাইয়াছে।

(২) কারণ বিশ্লেষণ পদ্ধতি (Factor Analysis)

ব্যক্তিত্ব পরিমাপের আর একটি পদ্ধতি হইল ব্যক্তিত্বের **কারণ বিশ্লেষণ**। ব্যক্তিত্বের অভীক্ষায় যে ফলগুলি পাওয়া যায় পরিসংখ্যান সাহায্যে তাহার বিশ্লেষণ করাই এই পদ্ধতির কাজ। ব্যক্তিত্বের একটি কারণ বা গুণের সহিত অপরটির পারম্পর্য (Correlation) করিয়া উহাদের সদর্থক (Positive) অথবা নঞর্থক (Negative) সম্বন্ধ নির্ণীত হয়। যেমন, যে ব্যক্তি উদার সে স্বভাবতঃ সহিষ্ণু হইবে, অর্থাৎ উদারতা এবং সহিষ্ণুতার সহিত সদর্থক পারম্পর্য (Positive Correlation) আছে। আবার যে ব্যক্তি উদার সে সাধারণতঃ অসহিষ্ণু হয় না, অর্থাৎ উদারতা এবং অসহিষ্ণুতার সহিত নঞর্থক পারম্পর্য (Negative Correlation) আছে। প্রথম প্রকারের পারম্পর্যকে যোগচিহ্ন (+) এবং দ্বিতীয় প্রকারের পারম্পর্যকে বিয়োগ চিহ্ন (−) দ্বারা প্রকাশ করা হইয়া থাকে।

(৩) পেনসিল-কাগজ সাহায্যে ব্যক্তিত্বের পরিমাপ (Pencil and Paper Test)

একটি পেন্সিল ও কাগজের সাহায্যে ব্যক্তিত্বের সহজ পরিমাপ করা যাইতে পারে।

(ক) **প্রশ্নাবলী** (Questionnaire) **পদ্ধতি**—একই সঙ্গে অনেক ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব পরীক্ষার জন্য উহাদিগকে কাগজে ছাপানো প্রশ্নাবলী দেওয়া হয়। প্রত্যেক প্রশ্নের পাশে 'হাঁ' বা 'না' লেখা থাকে। পাত্র পেন্সিল দিয়া এই দুইটি উত্তরের একটি কাটিয়া অপরটি রাখে। প্রশ্নগুলি এমন ভাবে নির্বাচিত হয় যে উহাদের উত্তর হইতে ব্যক্তিত্বের নির্দেশ বা সূচনা পাওয়া যাইতে পারে।

আপনার কি সব কাজই তাড়াতাড়ি করিবার অভ্যাস ?	হাঁ—না
আপনি কি যথাসময়ে কর্মস্থলে পৌঁছান ?	হাঁ—না
আপনার কি মনে হয় যে সময় কোথা দিয়া চলিয়া যাইতেছে ?	হাঁ—না
আপনার কি সুনিদ্রা হয় ?	হাঁ—না
আপনার কি সর্বদা ক্লান্তি বোধ হয় ?	হাঁ—না

আপনি কি গোলমাল সহ্য করিতে পারেন ? হাঁ—না

আপনার কি একা থাকিতে ভাল লাগে ? হাঁ—না

আপনি কি সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দেন ? হাঁ—না

এই প্রশ্নাবলীর উত্তরে ব্যক্তিত্বের জাতিরূপ সম্বন্ধে ধারণা হইতে পারে। যেমন, স্নায়বিক বা নিউরটিক ব্যক্তি প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, পঞ্চম এবং সপ্তম প্রশ্নের উত্তরে 'হাঁ' এবং চতুর্থ, ষষ্ঠ ও অষ্টম প্রশ্নের উত্তরে 'না' লিখিবে। পক্ষান্তরে সুস্থ স্নায়ু-বিশিষ্ট ব্যক্তি এই প্রশ্নগুলির উত্তরে বিপরীত ভাবে 'না' এবং 'হাঁ' লিখিবে। কিন্তু প্রশ্নাবলী পদ্ধতির দোষ এই যে ইহাতে 'হাঁ' এবং 'না'-এর মধ্যবর্তী উত্তর দেওয়া যায় না, অথচ অধিকাংশ ব্যক্তির পক্ষেই মধ্যবর্তী উত্তর দেওয়া স্বাভাবিক।

প্রশ্নাবলী নানাভাবে নির্বাচিত হইয়াছে। ফলে প্রশ্নাবলী পদ্ধতির প্রকারভেদের অন্ত নাই। যেমন, মিনেসোটা মালটিফেজিক পার্সন্যালিটি ইনভেণ্টরি (Minnesotta Multiphasic Personality Inventory) ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন গুণ নির্ণয়ের জন্য নির্মিত হইয়াছে। এই প্রশ্নাবলীর সাহায্যে স্বভাবী এবং অস্বভাবী এই উভয় ব্যক্তিত্বের পরীক্ষা করা হয়। আবার আলপোর্ট-ভের্‌নন্‌ মানক (Allport-Vernon Scale) সাহায্যে ব্যক্তিত্বের অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয়, সৌন্দর্য-সম্বন্ধীয় মূল্যবোধ (value) পরিমাপের চেষ্টা হইয়াছে। অধিকন্তু ক্যাটেল-লুবরস্কি পরীক্ষায় (Cattell-Luborsky Test) প্রশ্নাবলী সাহায্যে ব্যক্তির রসবোধ যাচাই করিয়া তাহার ব্যক্তিত্ব পরিমাপের চেষ্টা করা হয়।

(খ) **পরিস্থিতিমূলক পরীক্ষা (Situational Test)**

প্রশ্নাবলীর 'হাঁ' বা 'না' উত্তরের সাহায্যে পরিমাপে ব্যক্তির পুরাপুরি পরীক্ষা হয় না। ব্যক্তি কিরূপে বাস্তব জীবনের বিভিন্ন অবস্থা বা পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় অথবা কিরূপ আচরণ করে, তাহা দেখিয়া তাহার ব্যক্তিত্ব নির্ণয় করা অধিক সমীচীন বলিয়া মনে হয়। এই উদ্দেশ্যে অনেকগুলি পরিস্থিতি-মূলক পরীক্ষা উদ্ভাবিত হইয়াছে।

যেমন, শিশুদের সততা পরীক্ষা করিবার জন্য উহাদিগকে এমন অবস্থায় ফেলা হয়, যাহাতে উহারা অভীক্ষকের চোখে ধূলা দিয়া তাহাকে প্রতারিত করিতে পারে। একটি অভীক্ষায় হয়ত সাজাইয়া বাক্সে তুলিয়া রাখিবার জন্য শিশুকে অনেকগুলি মুদ্রা দেওয়া হইল। তারপর অভীক্ষক দেখিলেন শিশু কোন মুদ্রাগুলি রাখিয়া গিয়াছে এবং কোনগুলি চুরি করিয়াছে। এই জাতীয় অভীক্ষার ফলে জানা গিয়াছে যে সততা একটি গুণ নয়, কারণ যে শিশু একটি পরিস্থিতিতে সততা দেখায় সেই হয়ত অন্য পরিস্থিতিতে সততা না দেখাইতে পারে।

(৪) **প্রায়োগিক পরিমাপ** (**Experimental**)

ব্যক্তিত্বের মাপনায় মনোবিদরা প্রায়ই প্রয়োগপদ্ধতির সাহায্য লইয়া থাকেন। যেমন একটি প্রয়োগে পরীক্ষা করা হইল, কলেজের ছাত্রদের প্রত্যক্ষ (Perception) কিরূপে তাহাদের আকর্ষণের (Interest) দ্বারা প্রভাবিত হয়। প্রথমে এই ছাত্রদের সাফল্যাঙ্ক নির্ণয় এবং এই আকর্ষণগুলির সহিত সংশ্লিষ্ট কয়েকটি শব্দ নির্বাচন করা হইল। আর্থনীতিক আকর্ষণ পরিমাপের জন্য "মূল্য", "ডলার" প্রভৃতি শব্দ এবং ধর্মীয় আকর্ষণ পরিমাপের জন্য "প্রার্থনা", "ঈশ্বর" প্রভৃতি শব্দ উহাদিগকে দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করা হইল এই শব্দগুলি কি। দেখা গেল যে অকের্ষণ বা উহার অভাব অনুসারে শব্দগুলি চিনিতে উহাদের কম বা বেশী সময় লাগে। এইরূপে প্রমাণিত হয় যে কোনো বিষয়ে আকর্ষণ থাকিলে, ঐ বিষয়ের শব্দ প্রত্যভিজ্ঞান (Sound recognition) হইয়া থাকে।

(৫) **ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার** (**Personal Interview**)

উল্লিখিত সকল ব্যক্তিত্ব পরিমাপগুলিই বাহ্যিক বা বিষয়গত (Objective)। কিন্তু বাহ্যিক পরীক্ষায় ব্যক্তিত্বের সকল গুণ ধরা পড়ে না। ব্যক্তিত্বের একান্ত নিজস্বতা বা স্বাতন্ত্র্যকে প্রায়ই বাহির হইতে বুঝিতে পারা অসম্ভব। বাহ্যিক পদ্ধতির এই ত্রুটি সংশোধনের জন্য সাক্ষাৎকার (Interview) পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। ব্যক্তির অনুভূতি বা মনোভাব তাহার সহিত সাক্ষাৎকার কালে বুঝিবার সুযোগ পাওয়া যায়। ব্যক্তি কোন বিষয়ে কিভাবে কথা বলে, কোন বিষয়ে কথা বলিতে গিয়া কিভাবে তাহার কণ্ঠস্বর নরম অথবা কঠিন হইয়া পড়ে, অথবা সে উচ্ছ্বসিত হয় বা দমিয়া যায়—ব্যক্তিত্বের এই জাতীয় গুণগুলি সাক্ষাৎকারে ধরিবার সুবিধা হয়।

কিন্তু এই পদ্ধতির অসুবিধা এই যে সকল ব্যক্তিই সাক্ষাৎকারকালে আপনার যথার্থ পরিচয় দিতে পারে না। অনেকেই এই সময়ে আড়ষ্ট বোধ করে, আবার অনেকেই হয়ত এই সময়ে আপনাকে জাহির করিবার সুযোগ সন্ধান করে। এই জাতীয় অসুবিধা দূর করিতে হইলে, সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী পরীক্ষকের বিশেষ সাবধান হওয়া দরকার, যাহাতে পাত্রের আড়ষ্টতা দূর করিয়া তাহার মনে আত্মীয়ভাব জাগানো যাইতে পারে এবং যাহারা আত্মজাহির করে তাহারা অধিক সুবিধা না পায়।

(৬) **বিক্ষেপণ বা প্রতিফলন অভীক্ষা** (**Projective Test**)

বিক্ষেপণ বা প্রতিফলন (Projective) পদ্ধতির উদ্দেশ্য হইল পাত্রকে না বুঝিতে দিয়া তাহার ব্যক্তিত্বের গুণ বা প্রকাশ পরীক্ষা করা। পাত্রকে একটি অস্পষ্ট কাজ

সম্বন্ধে কিছু করিতে বলা হয় এবং কি করিতে হইবে বুঝিতে না পারিয়া হয়ত ঐ কাজে সে নিজ ব্যক্তিত্ব বিক্ষেপণ বা প্রকাশ করিয়া বসে।

বিক্ষেপণ পদ্ধতিগুলির মধ্যে ররসাক্ অভীক্ষা (Rorschach Test) এবং কাহিনী সংপ্রত্যক্ষ অভীক্ষাই প্রধান।

(ক) **ররসাক্ অভীক্ষাকে** "কালির ছাপ অভীক্ষা" (Ink-Blot Test) বলা হয়। বিভিন্ন রকমের দশটি কালির ছাপ সাহায্যে ররসাক্ ব্যক্তিত্ব পরীক্ষা করিয়াছেন। এই ছাপগুলির মধ্যে পাঁচটির রং কালো এবং ধূসর, দুইটির কালো এবং লাল এবং বাকী তিনটি সম্পূর্ণ রঙীন। পাত্রকে এক একটি করিয়া কালির ছাপ দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করা হয়, এইটি কি হইতে পারে, অথবা ইহা দেখিয়া পাত্রের কি মনে হয়।

এই পরীক্ষায় (১) কালির ছাপের সমগ্র বা কোনো অংশ পাত্রের প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন করিয়াছে কিনা, (২) ছাপের কালো ছায়া, রং, আকার অথবা "গতি" তাহার প্রতিক্রিয়াকে প্রভাবিত করিয়াছে কিনা, (৩) প্রতিক্রিয়াকালে পাত্র কালির ছাপে মানুষ, জন্তু-জানোয়ার, উহাদের অবয়ব অথবা অন্য কোনো বস্তু দেখিয়াছে কিনা, তাহা নির্ণয় করা যায়। সমগ্র ছাপের উপর প্রতিক্রিয়া সূক্ষ্ম চিন্তা বা তত্ত্বজ্ঞান (abstract or metaphysical thinking) প্রবণতার পরিচায়ক। আবার অংশের উপর প্রতিক্রিয়া অনুকর্ষী বায়ুর (Compulsion neurosis) প্রকাশ করে। দ্বিতীয়তঃ, গতি দর্শন অন্তর্বৃত্তি (introversion) এবং পশুর আকৃতি দর্শন চিন্তার সঙ্কীর্ণতা সূচিত করে। তৃতীয়তঃ, রং-এর উপর অধিক প্রতিক্রিয়া পাত্রের আবেগশীলতা প্রকাশ করে। রং ও আকার এই উভয়ের উপর প্রতিক্রিয়া হইলে বুঝিতে হয় পাত্রের স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল আবেগ প্রকাশ।

(খ) **কাহিনী সংপ্রত্যক্ষ অভীক্ষা** (Thematic Apperception Test—Tat)

মারে (Murray) এবং মর্গ্যান্ (Morgan) উদ্ভাবিত কাহিনী সংপ্রত্যক্ষ অভীক্ষা অথবা সংক্ষেপে টাট পদ্ধতি বলিতে কতকগুলি ছবির ব্যাখ্যা বুঝায়। ঐ ছবিগুলি যে সব কাহিনী তুলিয়া ধরে সেইগুলি অস্পষ্ট। সুতরাং ইহাদের নানাপ্রকার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া পাত্র তাহার মনোভাব প্রকাশ করিয়া ফেলে।

পাত্রকে একটি ছবি দেখাইয়া, ছবিটিতে যে ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা সম্বন্ধে একটি কাহিনী রচনা করিতে বলা হয়। কি করিয়া ঘটনাটি ঘটিল অথবা ঘটনাটির ফল কি দাঁড়াইবে, কাহিনী রচনায় পাত্রকে এই সকল সমস্যার সমাধান করিতেও

অনুরোধ করা হয়। দেখা যায় যে ছবিতে বর্ণিত কোনো না কোনো চরিত্রের সহিত পাত্র নিজেকে একাত্ম করিয়া ফেলে এবং তাহার কাহিনী প্রায়ই আত্মজীবনী হইয়া দাঁড়ায়। এইরূপে পাত্রের এমন অনেক অনুভূতি, আবেগ, প্রেরণা প্রভৃতি প্রকাশ পায়, যাহা তাহার পক্ষে স্বেচ্ছায় প্রকাশ করা অসম্ভব।

(গ) **শব্দানুষঙ্গ অভীক্ষা** (Word-association Test)

পাত্রকে পর পর কতকগুলি ব্যক্তিত্বসূচক শব্দ বলা বা দেখানো হয়। শব্দ শুনিয়া বা দেখিয়া তাহার যে শব্দটি মনে হয়, পাত্র সেই শব্দটি বলে বা লেখে। কোনো কোনো শব্দের প্রতিক্রিয়া-শব্দ হয়ত অনতিবিলম্বে এবং কতকগুলি বিলম্বে ঘটে। প্রতিক্রিয়া-শব্দের প্রকৃতি এবং সময় অনুসারে পাত্রের নির্জ্ঞান মনে গূঢ়ৈষা (Complex) এবং অবদমিত ইচ্ছার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। শব্দানুষঙ্গ অভীক্ষার ভিত্তিতে য়্যুঙ্গ অন্তর্বৃত, বহির্বৃত এবং উভয়বৃত প্রভৃতি ব্যক্তিত্বের জাতিরূপ নির্ণয় করিয়াছেন।

৭। একান্তর ব্যক্তিত্ব (Alternate Personality)

স্বাভাবিক জীবনে নানা মানসক্রিয়াব মধ্যেও ব্যক্তিত্ব একটি অখণ্ড চেতনারূপে কাজ করে। ব্যক্তিত্বের বিচিত্র এবং বিভিন্ন প্রকাশগুলি একই ব্যক্তির বলিয়া অনুভূত না হইলে, স্বাভাবিক জীবন ক্ষুণ্ণ হয়। নানা প্রকাশের মধ্যেও ব্যক্তিত্ব এক এবং অখণ্ড বোধরূপে ক্রিয়াশীল থাকে, কিন্তু নানা খণ্ডে বা টুকরায় পরস্পরবিচ্ছিন্ন সত্তার আকার ধারণ করে না। যে ব্যক্তি ছাত্রের শিক্ষক আবার সেই ব্যক্তিই শিক্ষকের ছাত্র। বহুরূপে কাজ করিয়াও স্বাভাবিক জীবনে ব্যক্তিত্ব এক এবং অখণ্ড থাকে।

স্বভাবী জীবনে ব্যক্তিত্বের একান্তরতা

কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে ব্যক্তিত্ব অখণ্ড এবং এক বলিয়া মনে হইলেও, একটু তলাইয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে, স্বাভাবিক জীবনেও ব্যক্তিত্বের এমন অংশ থাকিতে পারে, যাহা বাকী ব্যক্তিত্ব হইতে বিচ্ছিন্ন। যে ব্যক্তি স্বভাবতঃ অত্যন্ত মৃদু, ধীর, স্থির এবং সহিষ্ণু, সে ব্যক্তিই হয়ত ক্রোধান্ধ অবস্থায় দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য এবং বেসামাল হইয়া পড়ে। হয়ত সেই ব্যক্তিই এইরূপ অবস্থায় ঘরের আসবাবপত্র ভাঙ্গিয়া, নিজকে অথবা অপরকে কামড়াইয়া, আঁচড়াইয়া, চুল ছিঁড়িয়া লণ্ডভণ্ড কাণ্ড ঘটায়। ক্রোধের এই অগ্নিশর্মা মূর্তি ঐ ব্যক্তিরই আর একটি ব্যক্তিত্ব, যাহা তাহার পূর্ণ ব্যক্তিত্ব-চেতনা

হইতে বিচ্ছিন্ন এবং যাহার উপর তাহার কোনো ক্ষমতাই খাটে না। একদিকে স্বাভাবিক, সৌম্য, শান্ত এবং সংযত মূর্তি, অপরদিকে অস্বাভাবিক অস্থির, উচ্ছৃঙ্খল এবং উগ্র মূর্তি—একই ব্যক্তির দুইটি মূর্তি। এই দুইটি মূর্তি একান্তর ভাবে—অর্থাৎ একটির পর অপরটি—আত্মপ্রকাশ করে। যখন একটি ব্যক্তিত্ব ক্রিয়াশীল হয়, তখন অপরটি নিষ্ক্রিয় থাকে।

অস্বভাবী মানসজীবনই একান্তর ব্যক্তিত্ব-প্রকাশের বিশেষ ক্ষেত্র। যেমন স্বপ্নচারিতায় (Somnambulism) একান্তর ব্যক্তিত্ব ক্রিয়াশীল হয়। এইস্থলে **লেডি ম্যাকবেথ্**-এর নিদ্রিত অবস্থা হইতে উঠিয়া স্বপ্নচালিতের মত ডানকান-এর রক্তে লিপ্ত (কল্পিত ভাবে) রুমাল হইতে অশুভ রক্তচিহ্ন ধুইয়া মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টা প্রসিদ্ধ। আবার পি. **জ্যানে** (P. Janet) বর্ণিত **আইরিন্**-এর (Irene) দৃষ্টান্তও উদ্ধৃত করা যায়। আইরিন্ তাহার রুগ্ন মায়ের প্রাণপণ সেবা করিয়াছিল। তাহার প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও মায়ের মৃত্যুতে সে মর্মান্তিক আঘাত পাইয়াছিল। ফলে মায়ের মৃত্যুদৃশ্যকে কেন্দ্র করিয়া তাহার মধ্যে একটি স্বপ্নচারী ব্যক্তিত্ব গড়িয়া উঠিল। আইরিন্ হয়ত সেলাইয়ে বা কথাবার্তায় মগ্ন আছে, এমন সময় হঠাৎ সে তাহার কাজ বন্ধ করিয়া স্বপ্নাবিষ্টের মত মায়ের মৃত্যুদৃশ্যের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি অভিনয় করিতে লাগিল। এই আচরণ যেমন হঠাৎ দেখা দিত, তেমনই হঠাৎ বন্ধ হইয়া যাইত এবং আইরিন্ও তাহার সেলাই বা কথাবার্তায় এমনভাবে ফিরিয়া আসিত, যেন কিছুই ঘটে নাই। স্বপ্নাবিষ্ট ভাবে সে যাহা করিত, তাহার কিছু কিছু মনে থাকিলেও, মায়ের মৃত্যুদৃশ্যকে কেন্দ্র করিয়া সে যাহা করিত, জাগ্রত বা স্বাভাবিক অবস্থায় সে তাহার কিছুই মনে করিতে পারিত না। সুতরাং আইরিন্-এর এই দুই প্রকার পরস্পরবিচ্ছিন্ন ব্যক্তিত্ব একান্তর—**অর্থাৎ উহারা একই সঙ্গে আবির্ভূত না হইয়া একটির পর অপরটি প্রকাশ পাইত।**

ডঃ অ্যাজাম্-এর **ফেলিডা** একান্তর ব্যক্তিত্বের একটি প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত। চৌদ্দ বছর বয়সে ফেলিডা একটি নূতন জীবন অধ্যায় আরম্ভ করিল। ফলে তাহার পুরাতন ও নূতন ব্যক্তিত্বের একান্তরতা দেখা গেল। নূতন ব্যক্তিত্বের ক্রিয়াকালে তাহার পুরাতন ব্যক্তিত্বের কথা ফেলিডা মনে করিতে পারিত, কিন্তু পুরাতন ব্যক্তিত্বের ক্রিয়াকালে সে তাহার নূতন ব্যক্তিত্বের সকল ঘটনা ভুলিয়া যাইত। পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত তাহার নূতন ও পুরাতন ব্যক্তিত্বের এই একান্তরতা চলিল। কিন্তু তাহার পর ফেলিডার নূতন ব্যক্তিত্বই পুরাতন ব্যক্তিত্বের উপর প্রাধান্য লাভ করিল। অবশ্য এই

সময়েও হয়ত ফেলিডা হঠাৎ তাহার পুরাতন ব্যক্তিত্বে ফিরিয়া যাইত এবং নূতন ব্যক্তিত্বের সকল ঘটনা বিস্মৃত হইত।

আবার মর্টন প্রিন্স্ বর্ণিত **স্যালি ব্যুক্যাম্প্** কাহিনীও একান্তর ব্যক্তিত্বের একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। ব্যুক্যাম্প্ একটি স্বভাবতঃ ধর্মভীরু ও নিঃস্বার্থ যুবতী। কিন্তু মাঝে মাঝে অল্পক্ষণের জন্য সে দুষ্টপ্রকৃতি হইয়া উঠিত। দ্বিতীয় ব্যক্তিত্বটি প্রথমটি হইতে বিচ্ছিন্নভাবে প্রকাশ পাইত। আবার চিকিৎসাকালে তাহার মধ্যে একটি তৃতীয় ব্যক্তিত্ব দেখা দিল। এই ব্যক্তিত্বটি কিন্তু স্বার্থপর এবং উৎপীড়নকারী। এইরূপে ব্যুক্যাম্প-এর মধ্যে বহু ব্যক্তিত্ব ক্রিয়াশীল হইল।

ডব্‌লু. এফ্. প্রিন্স উদ্ধৃত **ডোরিস্**-এর দৃষ্টান্তেও একান্তর ব্যক্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। শিশু ডোরিস্‌কে তাহার মাতাল পিতা মাটিতে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছিলেন। সেই মুহূর্ত হইতে ডোরিস্ নিতান্ত শান্তপ্রকৃতি হইয়া গেল। তাহার মধ্যে দুইটি একান্তর ব্যক্তিত্ব দেখা দিল। একটির নাম মার্গারেট্ এবং অপরটির নাম ঘুমন্ত মার্গারেট্ (Sleeping Margaret)। প্রথমটি দুষ্ট, বেয়াড়া এবং দ্বিতীয়টি শান্ত, ধীর এবং পরিপক্ক। সতেরো বৎসর বয়সে তাহার মায়ের মৃত্যুর পর ডোরিস্-এর মধ্যে একটি তৃতীয় ব্যক্তিত্বের প্রকাশ হইল—ইহার নাম রুগ্ন ডোরিস্। ডোরিস্-এর যথার্থ ব্যক্তিত্ব ইহার সহিত একান্তরভাবে প্রকাশ পাইতে লাগিল। এইরূপে ডোরিস্-এর ব্যক্তিত্ব রুগ্ন ডোরিস্, যথার্থ ডোরিস্, মার্গারেট্ এবং ঘুমন্ত মার্গারেট্ এই চারটি ব্যক্তিত্বের লীলাভূমি হইয়া দাঁড়াইল।

জ্যানে বর্ণিত **লিওনি** একান্তর ব্যক্তিত্বের আর একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। লিওনি স্বভাবতঃ একটি বোকা, বিষণ্ণ এবং ভীরু শিশু ছিল। মাঝে মাঝে তাহার মূর্ছাবেশ হইত। পরে বার বার সংবিষ্ট (Hypnotised) হওয়ার ফলে, তাহার মধ্যে লিওন্‌টাইন্ নামে একটি দ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব দেখা দিল। প্রথম লিওনি শান্ত, বিষণ্ণ, ধীর, নম্র এবং ভীরু ছিল, আবার দ্বিতীয় লিওনি, অর্থাৎ লিওন্‌টাইন্ ছিল তেমনই অশান্ত, হাসিখুশী, বাচাল, পরিহাসপ্রিয় এবং সাহসী। দ্বিতীয় ব্যক্তিত্বের ক্রিয়াকালে সে প্রথম লিওনিকে তাহার নিজ ব্যক্তিত্ব বলিয়া অস্বীকার করিত। কিছুকাল পরে গভীরতর সংবেশনের (deeper hypnotism) ফলে তাহার মধ্যে লিওনোর নামে গম্ভীর, মৃদুভাষী এবং মন্দগতিবিশিষ্ট একটি তৃতীয় ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব হইল। তৃতীয় লিওনি প্রথম এবং দ্বিতীয় লিওনিকে চিনিত এবং উহাদিগকে ছোট এবং হীন বলিয়া মনে করিত।

বহু-ব্যক্তিত্ব (Multiple Personality)

উপরে প্রদর্শিত একান্তর ব্যক্তিত্বগুলি বহু-ব্যক্তিত্বও বটে। লেডি ম্যাক্‌বেথ, আইরিন্‌, ফেলিডা, স্যালি ব্যুক্যাম্প্‌, ডোরিস্‌, লিওনি—সকলের মধ্যেই একাধিক ব্যক্তিত্ব ক্রিয়াশীল।

তবে বহু-ব্যক্তিত্ব এবং একান্তর-ব্যাক্তিত্বের মধ্যে একটি পার্থক্য আছে। বহু-ব্যক্তিত্ব একান্তর নাও হইতে পারে। অনেকগুলি ব্যক্তিত্ব একান্তরভাবে অথবা একটির পর আর একটি আবির্ভূত না হইয়া একই সঙ্গে আবির্ভূত এবং সক্রিয় হইতে পারে। সহজ্ঞ-ব্যক্তিত্ব এইরূপ বহু-ব্যক্তিত্বের দৃস্টান্ত। সহজ্ঞ-ব্যক্তিত্ব বহু-ব্যক্তিত্ব হইলেও একান্তর ব্যক্তিত্ব নয়।

সহজ্ঞ-ব্যক্তিত্ব (Co-conscious Personality)

মর্টন্‌ প্রিন্স্‌ সহজ্ঞ-ব্যক্তিত্বের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। **একই ব্যক্তিত্বের মধ্যে দুই বা ততোধিক ব্যক্তিত্ব পরপর বা একটির পর আর একটি ক্রিয়া করিলে, অথবা একটি অপরটি হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে, যে বহু-ব্যক্তিত্ব দেখা দেয়, তাহাকে একান্তর-ব্যক্তিত্ব বলে। কিন্তু এই ব্যক্তিত্বগুলি যদি পাশাপাশি অথবা একসঙ্গে এবং চেতনভাবে কাজ করে, তাহা হইলে এই ব্যক্তিত্বগুলিকে সহজ্ঞ বা সচেতন ব্যক্তিত্ব বলে।** স্বাভাবিক জীবনে এইরূপ সহজ্ঞ-ব্যক্তিত্বের ক্রিয়া দেখা যায়। যেমন, কাহারও সহিত কথা বলিতে বলিতে হয়ত একটি তালা খুলিবার চেষ্টাও চলিতেছে। এই ক্ষেত্রে তালা খুলিতে যে চেতনা কাজ করিতেছে তাহা কথা বলিবার সঙ্গে সঙ্গে সক্রিয় চেতনা হইতে পৃথক। অথচ উভয় ব্যক্তিত্বই চেতনভাবে কাজ করিতেছে, যদিও একটির চেতনা অপরটির তুলনায় স্পষ্ট বা অস্পষ্ট হইতে পারে।

অস্বভাবী জীবনে সক্রিয় সহজ্ঞ-ব্যক্তিত্বের প্রসঙ্গ বাহুল্যবোধে বর্জিত হইল।

অনুশীলনী (Exercise)

1. Define personality. How do Woodworth and the behaviourists define it ? What seems to you to be the best definition of personality and why ? (Ans : pp. 158-161)

ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞা নির্ধারণ কর। উড্‌ওয়ার্থ এবং চেষ্টিতবাদীদের মতে এই সংজ্ঞা কি ? কারণ উল্লেখ করিয়া ব্যক্তিত্বের সন্তোষজনক সংজ্ঞা নির্দেশ কর।

2. What are the factors of personality ? Fxplain the chemistry of personality, or what role do the glands play in the genesis of personality ? (Ans : pp.)

ব্যক্তিত্বের আংশিক কারণ কি কি ? ব্যক্তিত্বের রসায়ন কাহাকে বলে অথবা ব্যক্তিত্বের বিকাশে গ্রন্থিগুলির ভূমিকা আলোচনা কর।

3. What role does society play in the development of personality ? How does birth-order of the child determine his personality, according to Adler ? Discuss. (Ans : pp.)

ব্যক্তিত্ব-বিকাশে সমাজের স্থান আলোচনা কর। অ্যাড্‌লার-এর মতে শিশুর জন্মক্রম কিভাবে উহার ব্যক্তিত্বকে প্রভাবিত করে ?

4. Explain Freud's view of the child's personality as it develops in relation to the parents. (Ans : pp.)

ফ্রয়েড্‌ এর মতে পিতামাতার সম্বন্ধে শিশুর ব্যক্তিত্ব-বিকাশ আলোচনা কর।

5. Explain the interaction of heredity with environment in the genesis of personality. (Ans : pp)

ব্যক্তিত্ব-বিকাশে বংশগতি এবং পরিবেশের পারস্পরিক ক্রিয়া বুঝাইয়া দাও।

6. Classify the main types oi personality. Explain the endocrine types of the same. (Ans : pp)

ব্যক্তিত্বের শ্রেণীভেদ দেখাও। উহার গ্রন্থীয় শ্রেণীভেদ বুঝাইয়া দাও।

7. Classify the main types of perfonality accowiny to C. G. Jumg (Ans : pp)

য়্যুঙ্গ-এর মতানুযায়ী ব্যক্তিত্বের শ্রেণী ভেদ কর।

8. Write notes on the following personality types :- (a) Cyclothymic & Schizophrenic (b) Cycloid and Schizoid (c) Introvert anw Extrovert. (Ans : pp)

নিম্নলিখিত ব্যক্তিত্ব শ্রেণীর সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর :— (ক) (খ) (গ) ঐ (ঘ) অন্তর্বৃত্ত এবং বহির্বৃত্ত।

9. What is meant by 'traits of personality ? How are they miasured ? (Ans : pp)

ব্যক্তিত্বের প্রলক্ষণ বলিতে কি বুঝায় ? কিরূপে উহাদের পরিমাপ করা হয় ?

10. Explain the principal methods of measuring personality.

(Ans : pp)

ব্যক্তিত্ব পরিমাপের প্রধান পদ্ধতিগুলি আলোচনা কর।

11. Define multiple personality, Cite some instances thereof.

(Ans : pp)

বহু-ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। উহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ কর।

12. Distinguish between alternate and co-conscious personality.

(Ans: pp)

একান্তর এবং সহজ্ঞ ব্যক্তিত্বের পার্থক্য বুঝাইয়া দাও।

13. Wirte notes on : (a) Rating Scale ; (b) Factor Analysis ; (c) Questionnaire ; (d) Situational Test ; (e) Prajection Test ; (f) Rorschach Test ; (g) Thematic Apperception Jist or TAT.

(Ans : pp)

সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর :—(ক) মূল্য মানক ; (খ) কারণ বিশ্লেষণী ; (গ) প্রশ্নাবলী ; (ঘ) পরিস্থিতিমূলক পরীক্ষা ; (ঙ) বিক্ষেপণ অভীক্ষা ; (চ) ররসাক অভীক্ষা ; (ছ) কাহিনী সংপ্রত্যক্ষ অভীক্ষা অথবা ট্যাট্।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

বুদ্ধি; বুদ্ধি-অভীক্ষা

(Intelligence)

১। বুদ্ধির সাধারণ অর্থ

'বুদ্ধি' কথাটির সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা কঠিন, কারণ বুদ্ধি ব্যক্তির সমগ্র সত্তার সহিত জড়িত। কিন্তু তবুও দৈনন্দিন জীবনে আমরা এক ব্যক্তিকে অপর ব্যক্তির তুলনায় বেশী বা কম বুদ্ধিমান মনে করিয়া থাকি। সাধারণত: সতর্কতাকে (alertness) আমরা বুদ্ধির পরিচায়ক বলিয়া মনে করি। যে ব্যক্তি কোনো বাস্তব পরিস্থিতি সম্বন্ধে সজাগ বা সতর্ক তাহাকে বুদ্ধিমান এবং যে সেইরূপ নয় তাহাকে বুদ্ধিহীন বলা হইয়া থাকে। অথবা বুদ্ধি বলিতে বুঝায় পর্যবেক্ষণ, ধারণা, চিন্তন, স্মরণ, কল্পনা প্রভৃতি মানসবৃত্তিগুলি, যাহা জ্ঞানলাভে সহায়তা করে। এই অর্থে **জ্ঞান উৎপাদনকারী মানস শক্তিই** বুদ্ধি। **উড্‌ওয়ার্থ** বলিয়াছেন যে বুদ্ধি কথাটি আকারের দিক হইতে বিশেষ্য হইলেও, অর্থের দিক দিয়া ইহা **ক্রিয়া বা ক্রিয়া-বিশেষণাত্মক**। বুদ্ধি কোনো বস্তু নয়, কিন্তু যে ভাবে বা যে প্রকারে কাজ করা হয় তাহাই বুদ্ধি। কোনো ব্যক্তি যে প্রকারে একটি পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় সেই ক্রিয়া এবং ক্রিয়ার প্রকার বুদ্ধির বা নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক।

(১) কেহ কেহ বুদ্ধির **বিশুদ্ধ রূপ এবং সংগঠনী শক্তির** উপর জোর দিয়াছেন। **এবিংহাউস** (Ebbinghaus)-এর মতে কোনো পরিস্থিতির অংশগুলিকে "মিলিত এবং সংগঠিত করিবার (To combine and integrate)" সামর্থ্যই বুদ্ধি। এই সংজ্ঞায় বুদ্ধির সংশ্লেষণমূলক (Synthetic) বৈশিষ্ট্যটি উল্লিখিত। কিন্তু ইহাতে বুদ্ধির বিশ্লেষণমূলক (Analytic) এবং কার্যকরী দিক উপেক্ষিত।

আলফ্রেড্ বিনে (Algred Binet) মনে করেন, "সুষ্ঠু অবধারণা, উপযুক্ত বোধ এবং উত্তম বিচারশক্তি বুদ্ধির আসল উৎস (To judge well, to understand properly, to reason well, these are the essential springs of intelligence)।" ইহাতে বুদ্ধির কার্যকরী বৈশিষ্ট্য উপেক্ষিত।

(২) আবার কোনো কোনো মনোবিদ্ বুদ্ধির **কার্যকরী দিকটির** উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন বেশী। যেমন **উইলিয়ম স্টার্ন**-এর মতে বুদ্ধি "জীবনের নূতন নূতন সমস্যার এবং অবস্থার সহিত উপযোজন করিবার সাধারণ মানসিক

শক্তি (The general mental adaptability to new problems and connitions of life)।"

সিরিল বার্ট (Cyril Burt) বলিয়াছেন যে বুদ্ধি "অপেক্ষাকৃত **নূতন পরিস্থিতির সহিত নূতনভাবে প্রতিযোজন করিবার সামর্থ্য** (The power of re-adjustment to relatively new situation)।"

ই. এল্. থর্নডাইক (E. L. Thorndike) বলেন, "সুষ্ঠুভাবে **প্রতিক্রিয়া করিবার ক্ষমতাই** বুদ্ধি (the power of good responses)।"

ফ্রীম্যান্ (Freeman) মনে করেন যে "বুদ্ধি **মানসশক্তির কার্যকরী ব্যবহার** (Productive use of mental powers)।"

থার্স্টোর্ন (Thurstone)-এর মতে "বুদ্ধি হইল সহজ প্রবৃত্তিগুলিকে **সমাজের উপকারে লাগাইবার ক্ষমতা** (the capacity for making instincts socially advantageous)।"

(৩) কল্ভিন্ (Colvin) বলেন যে, বুদ্ধি "**শিক্ষণ করিবার ক্ষমতা** (Capacity to learn)।"

আবার হলিংওয়ার্থ (Hollingworth) মনে করেন "কিরূপে অভিপ্রেত বস্তুকে করা এবং পাওয়া যায় তাহার শিক্ষণই বুদ্ধি (Intelligence learns how to do and how to get what is wanted)।"

(৪) কিন্তু সি. ই. স্পিয়ারম্যান (C. E. Spearman)-এর সংজ্ঞায় বুদ্ধির বিশুদ্ধ, কার্যকরী এবং শিক্ষণমূলক দিকগুলি মিলিত হইয়াছে। বুদ্ধির বিশ্লেষণে এই লক্ষণগুলি পাওয়া যায়। বুদ্ধি থাকিলে, আমরা (ক) অভিজ্ঞতার কয়েকটি ধর্ম সম্বন্ধে এবং আমরাই যে অভিজ্ঞাতা সেই সম্বন্ধে সচেতন হই ; (খ) অভিজ্ঞতার বিভিন্ন অঙ্গগুলির সম্বন্ধ লক্ষ্য করি ; (গ) ইন্দ্রিয় সাহায্যে কখনও জানি নাই এমন চিন্তনেয় বস্তু সৃষ্টি করি ; (ঘ) যাহা অতীতে জানিতাম তাহা ভুলিয়া যাই ; (ঙ) যাহা ভুলিয়া গিয়াছিলাম তাহা স্মরণ করি এবং (চ) যে সকল বস্তু সম্বন্ধে আমরা চেতন সেইগুলির বিশদতা এবং স্পষ্টতার পরিবর্তন লক্ষ্য করি।

৩। সামান্য ও বিশেষ বুদ্ধি বা সামর্থ্য
(General and Special Intelligence or Ability)

স্পিয়ারম্যান্-এর আবিষ্কার—সি. স্পিয়ারম্যান-এর মতে প্রত্যেক বুদ্ধি প্রসূত কাজেই একটি সাধারণ বা সামান্য সামর্থ্য (General Ability) এবং বিভিন্ন বিশেষ

সামর্থ্য (Special Ability) কাজ করে। সামান্য সামর্থ্য এবং বিশেষ সামর্থ্যের যোগফলই বুদ্ধি। বুদ্ধির উপাদান বিশ্লেষণ করিয়া স্পিয়ারম্যান উপরোক্ত দুইটি সামর্থ্য পাইয়াছেন। তিনি সাধারণ সামর্থ্যটিকে "g" এবং বিশেষ "সামর্থ্যকে" "s" এই দুইটি প্রতীক সাহায্যে নির্দেশ করিয়াছেন। "জি" প্রত্যেক বুদ্ধিমূলক ক্রিয়ার সাধারণ অঙ্গ বা উপাদান। কিন্তু "এস্" বিভিন্ন প্রকারে বুদ্ধিমূলক ক্রিয়া অনুসারে বিভিন্ন। যেমন একই ব্যক্তি ইংরাজী, বাংলা, দর্শন, গণিত প্রভৃতি যে কোনো বিষয় বুঝিতে গিয়া "জি" উপাদানটি ব্যবহার করিয়া থাকে। "জি" উপাদানটি ব্যবহার করিয়া থাকে। "জি" হইল ব্যক্তির সাধারণ বুদ্ধি অথবা যাহাকে বলা যাইতে পারে কমন্ সেন্স্। কিন্তু এই ব্যক্তিরই হয়ত অঙ্কে বিশেষ মাথা আছে, কাজেই সে অন্যান্য বিষয়ের তুলনায় অঙ্কে সাফল্য লাভ করে বেশী। আবার অন্যান্য বিষয়ে মোটের উপর সাফল্য লাভ করিয়া সাহিত্যেই হয়ত তাহার সাফল্য অসাধারণ। অর্থাৎ, অঙ্কে এবং সাহিত্যে 'জি'-এর অতিরিক্ত তাহার 'এস' অথবা 'বিশেষ বুদ্ধি' রহিয়াছে।

তাহা হইলে সাধারণ সামর্থ্য বা "জি" ব্যক্তির বুদ্ধিমূলক কাজের সাধারণ ভিত্তি, কিন্তু বিশেষ সামর্থ্য বা "এস্" তাহার কোনো বিশেষ বুদ্ধিমূলক ক্রিয়ায় ভিত্তি। সাধারণ সামর্থ্য বা "জি" একটি, কিন্তু বিশেষ সামর্থ্য বা "এস" বুদ্ধিমূলক ক্রিয়ার বিভিন্নতা অনুসারে বিভিন্ন। ফলে সকল বুদ্ধিমূলক ক্রিয়ায় একটি "জি" ক্রিয়াশীল হয়, কিন্তু প্রত্যেকটি বিশেষ বুদ্ধিমূলক ক্রিয়ার এক একটি পৃথক "এস" কাজ করে, অথবা কোন দুইটি ক্রিয়ায়ই একই "এস" কাজ করে না।

যে পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া স্পিয়ারম্যান্ বুদ্ধির **দ্বি-উপাদান মতবাদ** (Two-Factory theory of Intelligence) আবিষ্কার করেন তাহা এই। বুদ্ধির অভীক্ষা (Intelligence) বা পরীক্ষার ভিত্তিতে তিনি দেখিলেন যে বিভিন্ন কৃতির (Performance) সাফল্যাঙ্কের (Score) সহিত **পারম্পর্য** (Correlation) আছে। কোনো ব্যক্তি একটি বিশেষ বুদ্ধিক্রিয়ায় যেমন সাফল্য লাভ করে, আরও কতকগুলি বিশেষ বুদ্ধিক্রিয়ায়ও হয়ত তেমনই সাফল্য লাভ করে। যাহার গণিতে পারদর্শিতা আছে, তাহার হয়ত আবার পদার্থ বিদ্যায়ও সমান পারদর্শিতা থাকে। অথচ গণিত এবং পদার্থবিদ্যা দুইটি বিশেষ সামর্থ্যের উপর নির্ভরশীল দুইটি পৃথক বিষয়। তাহা হইলে বলিতে হয় যে এই দুইটি বিষয়ের বুদ্ধিগ্রাহ্যতা যেমন দুইটি পৃথক বুদ্ধিসামর্থ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, তেমন উহাদের উভয়ের কোনো সাধারণ বা সামান্য বুদ্ধিসামর্থ্যের উপরও

প্রতিষ্ঠিত।

সুতরাং স্পিয়ারম্যান-এর মতানুসারে কোনো ব্যক্তির বুদ্ধির পরিমাপ করিতে হইলে "জি"+"এস" (G+S) এই সমীকরণের সাহায্যে করিতে হয়। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তির বুদ্ধি হইল তাহার **সাধারণ এবং বিশেষ বুদ্ধি সামর্থ্যের যোগফল।**

স্পিয়ারম্যান্-এর উল্লিখিত মতবাদকে যেমন দ্বি-উপাদান মতবাদ বলা হয়, তেমন এককেন্দ্রিক (Unifocal) মতবাদও বলা যাইতে পারে, কারণ তাঁহার মতে সকল বিশেষ সামর্থ্যের অন্তর্নিহিত একটি সাধারণ বা সামান্য সামর্থ্যও বিদ্যমান।

"জি" অথবা সাধারণ বুদ্ধ্যঙ্কটিকে মনোবিদ্যার দিক দিয়া বলা যায় বুদ্ধি বা মানসশক্তি। আবার শারীরবৃত্তের দিক দিয়া ইহাকে বলা যায় এমন একটি শক্তি যাহা নাভতন্ত্রের নমনীয়তা, রক্তচলাচলের অবস্থা, গ্রন্থির সামঞ্জস্য, অম্লজান (oxygen) গ্রহণ করিবার ক্ষমতা এবং অন্যান্য ক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল। স্পিয়ারম্যান্-এর মতে "জি" হইল এমন একটি শক্তি, যাহা একটি মানসক্রিয়া হইতে অপর মানসক্রিয়াতে সংক্রামিত অথবা স্থানান্তরিত হইতে পারে।

৪। বুদ্ধির সংগঠন সম্বন্ধে অন্যান্য মতবাদ

(ক) থর্নডাইক-এর বহু-উপাদান মতবাদ

স্পিয়ারম্যান্-এর দ্বি-উপাদান মতবাদের বিরুদ্ধে থর্নডাইক্ তাঁহার বহু-উপাদান (Multimodal, Multifocal or Multifactor) মতবাদ উপস্থাপিত করিয়াছেন। থর্নডাইক্-এর মতে কোনো ব্যক্তির সমগ্র বুদ্ধি অসংখ্য বিশেষ সামর্থ্যের দ্বারা গঠিত এবং এই সামর্থ্যগুলি কোনো সাধারণ সামর্থ্য দিয়া নিয়ন্ত্রিত নয়।

(খ) থার্স্টোন্-এর মৌলিক সামর্থ্যবাদ (Primary Ability theory)

থার্স্টোনও (Thurstone) বুদ্ধির এককেন্দ্রিক বাদ স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে বুদ্ধি বলিয়া একক কোনো সামর্থ্য নাই, কিন্তু বুদ্ধি বলিতে বুঝায় সাতটি মৌলিক শক্তি। যথা (১) "ভি (Verbal comprehension) বা কথা বুঝিবার শক্তি; (২) "এন্" (Number facility) বা সংখ্যা ব্যবহারের সহজ শক্তি; (৩) "এম্" (Memory) বা স্মৃতিশক্তি; (৪) "আর্" (Inductive reasoning) বা আরোহমূলক বিচারশক্তি; (৫) "পি" (Perceptual Ability) অথবা প্রত্যক্ষ করিবার শক্তি; (৬) "এস্" (Space comprehension) বা বস্তুর দৈহিক জ্ঞান এবং (৭) "ডব্লু" (Word fluency) বা কথা বলিবার এবং লিখিবার শক্তি

উপরোক্ত সবগুলি বুদ্ধিসামর্থ্যই যে প্রত্যেক কাজে লাগে তাহা নয়। কোনো কাজে হয়ত এই সাতটির চারটি, আবার অন্য কোনো কাজে হয়ত অন্য কয়েকটি শক্তির প্রয়োজন হয়। মোটের উপর, থার্স্টোন্-এর বক্তব্য এই যে বুদ্ধি একাধিক মৌলিক সামর্থ্যের সমবায়ে গঠিত।

গ) টম্‌সন্-এর নমুনাগঠন তত্ত্ব (Sampling Theory)

টমসনও (Thomson) বুদ্ধির বহুকেন্দ্রিকবাদী। তাঁহার মতে বুদ্ধি অসংখ্য শক্তিকণার সমষ্টি। প্রত্যেকটি শক্তিকণাই বুদ্ধির একক বা ইউনিট। প্রত্যেক কাজে কতকগুলি নির্দিষ্ট শক্তিকণা সক্রিয় হয় এবং ঐ কাজে প্রয়োজনীয় বুদ্ধি বলিতে এই শক্তিকণাগুলির সমষ্টি, জোট বা দল বলা যায়।

এইরূপে প্রত্যেকটি কাজের উপযোগী বুদ্ধি শক্তিকণা নমুনাবদ্ধ হয়। সুতরাং টম্‌সন-এর মতটিকে বুদ্ধির "নমুনাগঠন তত্ত্ব" (Sampling Theory) বলা হইয়া থাকে।

ঘ) বুদ্ধি সম্পর্কে আরও কয়েকটি মতবাদ

এম. গার্নেট (Garnett) স্পিয়ারম্যান-এর একটি কেন্দ্রীয় উপাদানের অতিরিক্ত আর একটি কেন্দ্রীয় উপাদান স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে চতুরতা (cleverness) দ্ধির দ্বিতীয় কেন্দ্রীয় উপাদান। গার্নেট "সি" (c) প্রতীক চিহ্নের সাহায্যে এই দ্বিতীয় কেন্দ্রীয় উপাদানটির নির্দেশ করিয়াছেন। চতুরতা বা "সি" বলিতে বুঝায় বস্তুর সাদৃশ্য অনুসারে উহাকে অনুষক্ত করিবার প্রবণতা বা ইচ্ছা।

আবার বিনে (Binet) মনে করেন যে বুদ্ধিতে তিনটি উপাদান বা স্তর বর্তমান —যথা (১) চিন্তনের কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য গ্রহণ করা এবং বজায় রাখিবার ক্ষমতা ; (২) ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌছিবার উদ্দেশ্যে প্রতিযোজন করিবার ক্ষমতা (৩) লব্ধ ফলের বিচার বা সমালোচনা করিবার ক্ষমতা।

ক্ল্যাপারেডও (Claparede) বুদ্ধিক্রিয়ায় তিনটি বিভিন্ন ধারা স্বীকার করেন,— যথা বুদ্ধির প্রথম আরম্ভ বা সূত্রপাত হইল কোনো প্রশ্ন উত্থাপন এবং উহার চেষ্টায় সমাধান, দ্বিতীয়টি হইল অনুসন্ধান, প্রকল্পের আবিষ্কার প্রভৃতি এবং তৃতীয়টি হইল ঐ প্রকল্পের নিয়ন্ত্রণ অর্থাৎ কল্পিত প্রকল্পের পরীক্ষণ।

ঙ) উপসংহার—ব্যালার্ড-এর মত

বুদ্ধির উপাদান অথবা অঙ্গের বিভিন্ন মতবাদ সম্বন্ধে ব্যালার্ড (Ballard) বলিয়াছেন যে,সম্ভবতঃ সকল ক্ষমতবাদীই কয়েকটি বিষয়ে একমত হইবেন। বিভিন্ন-

ভাবে ক্রিয়াশীল বুদ্ধি একটি সহজাত মানসিক সামর্থ্য। ইহা নিম্নতর অপেক্ষা উচ্চতর মানসবৃত্তিগুলিতে অধিকতর প্রকাশিত হয়। যে সকল পরিস্থিতি কতকাংশে নূতন অথবা সমাধানের জন্য সমস্যা উপস্থিত করে, তাহাতেই উহা বিশেষভাবে সক্রিয়। ইহা সংবেদনগুলিকে শুধু গ্রহণ না করিয়া প্রধানতঃ অভিজ্ঞতালব্ধ উপাদানগুলির বিশ্লেষণ, গঠন এবং পুনর্বিন্যাস করে।"

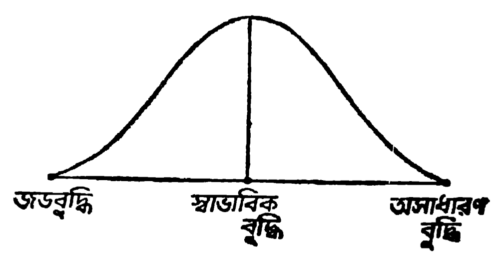
উপরোক্ত বিভিন্ন মতবাদ সম্বন্ধে মোটের উপর বলা যায় যে অভীক্ষা মনোবিদ্যায় (Test Psychology) উহাদের চূড়ান্ত বিচার হইয়া থাকে। অভীক্ষা বা পরীক্ষা সাহায্যে প্রাপ্ত বুদ্ধির কার্য বা ফল দিয়াই এই চূড়ান্ত বিচার হয়, শুধু তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ দিয়া হয় না।

৫। বুদ্ধির পরিমাপ (Mesurement of Intelligence)

সাম্প্রতিক মনোবিদ্যায় অভীক্ষাব ভিত্তিতে বুদ্ধির পরিমাপ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছে। ইহার ফলে মনোবিদ্যায় অভীক্ষা মনোবিদ্যা (Test Psychology) নামক একটি পৃথক শাখা প্রসার লাভ কয়িয়াছে।

স্যার্ ফ্রানসিজ গ্যালটন

ইংরাজ বিজ্ঞানী স্যর ফ্রান্সিজ গ্যালটন্ই (Galton) তাঁহার প্রসিদ্ধ "হেরিডিটারি জিনিয়াস" গ্রন্থে বুদ্ধি পরিমাপের বৈজ্ঞানিক গবেষণার দিকে প্রথম অঙ্গুলি সঙ্কেত করেন। তিনিই সর্বপ্রথম অসাধারণ বা প্রতিভাসম্পন্ন বুদ্ধি হইতে আরম্ভ করিয়া জড়বুদ্ধি পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরগুলি একটি স্বাভাবিক বণ্টন রেখা চিত্রে (Nomal Distribution Curve) প্রদর্শন করেন। এই রেখার দুই প্রান্তসীমায় রহিয়াছে জড়বুদ্ধি (Idiot) এবং অসাধারণ-বুদ্ধি (Genius)। তিনি দেখাইয়াছেন যে এই প্রান্তীয় বুদ্ধিসম্পন্ন, অর্থাৎ জড়-বুদ্ধি এবং অসাধারণ-বুদ্ধির, ব্যক্তির, সংখ্যাই অল্প। এই রেখার কেন্দ্রস্থলে রহিয়াছে স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরা, যাহাদের সংখ্যা বেশী। গ্যালটন এর আবিষ্কৃত বুদ্ধির স্বাভাবিক বণ্টন রেখাচিত্র পার্শ্বে প্রদর্শিত হইল।



৫০ নং চিত্র—স্বাভাবিক বণ্টন রেখাচিত্র
নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন্ কার্ভ

জার্মান মনোবিদ্ এবিংহাউসও তাঁহার সমাপ্তি অভীক্ষায় (Completion test) বুদ্ধি পরিমাপের ভূমি প্রস্তুত করিয়াছেন।

অ্যালফ্রেড বিনে (Binet)

কিন্তু বুদ্ধিপরিমাপক্ষেত্রে যুগান্তর ঘটাইয়াছেন ফরাসী মনোবিদ্ অ্যালফ্রেড্ বিনে। প্যারীর শিক্ষা কর্তৃপক্ষ স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল বিদ্যালয়স্থ কতকগুলি ছাত্রের শিক্ষণে পশ্চাদ্‌বর্তিতায় (Backwardness) চিন্তিত হইলেন। তাঁহার এই পশ্চাদ্‌বর্তিতার কারণ অনুসন্ধানের ভার দিলেন অ্যালফ্রেড বিনেকে। দীর্ঘকাল বিশেষ বুদ্ধি বা কৃতিসামর্থ্যের নির্ণয় উদ্দেশ্যে তিনি অভীক্ষা (test) উদ্ভাবনে আত্মনিয়োগ করিলেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষা ছাড়াই কোনো নির্দিষ্ট বয়সের স্বাভাবী (normal) শিশুদের বুদ্ধি-বিকাশ হওয়া উচিত। ইহা ধরিয়া লইয়া তিনি প্রত্যেক বয়ঃস্তরের পরিমাপ করিবার জন্য কতকগুলি সরল পরীক্ষা বা অভীক্ষা প্রস্তুত করিলেন এবং অভীক্ষার্থী শিশুদের উপর তাহা প্রয়োগ করিলেন। এইরূপে তিনি তাঁহার পরীক্ষা বা অভীক্ষাগুলির মান নির্ধারণ করিতে সমর্থ হইলেন।

অভীক্ষার মান-নির্ধারণ (Standardis.ion of test)

পরীক্ষা বা অভীক্ষার মান নির্ধারণ করিবার অর্থ হইল স্থির করা যে **এই এই পরীক্ষা বা অভীক্ষা এই এই বয়সের উপযোগী**। কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট বয়ঃস্তরের প্রত্যেক শিশুই যে ঐ বয়সের জন্য প্রমাণিত বা নির্ধারিত অভীক্ষায় উত্তীর্ণ অথবা উচ্চতর বয়সের জন্য নির্দিষ্ট অভীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হইল তাহা নয়। যেমন হয়তো কোনো পাঁচ বৎসরের শিশু ঐ বয়ঃস্তরের নির্ধারিত অভীক্ষায় সাফল্য লাভ করিল না; আবার হয়ত অন্য একটি পাঁচ বৎসরের শিশু ঐ বয়ঃস্তরের নির্ধারিত পরীক্ষায় তো সাফল্য লাভ করিলই, তদুপরি ছয়, এমন কি সাত বা আট বৎসরের নির্ধারিত অভীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হইল।

অর্থাৎ, বিনে দেখিলেন যে তাঁহার অভীক্ষার্থী শিশুদের মধ্যে তিনটি শ্রেণী রহিয়াছে। এক শ্রেণী শুধু তাহাদের জন্য নির্ধারিত অভীক্ষায়ই—নিম্নতর বয়ঃসীমার অভীক্ষায় তো বটেই—উত্তীর্ণ হইতে পারে। দ্বিতীয় শ্রেণী তাহাদের বয়ঃসীমা নির্ধারিত অভীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে না—উর্ধ্বতর বয়ঃসীমার অভীক্ষায় তো পারেই না—কিন্তু তাহাদের নিম্নতর বয়ঃসীমার অভীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে। তৃতীয় শ্রেণীর শিশুরা তাহাদের বয়ঃসীমা অথবা নিম্নতর বয়ঃসীমার নির্ধারিত অভীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে তো পারেই, এমন কি তাহাদের উর্ধ্বতর বয়ঃসীমার নির্ধারিত অভীক্ষায়ও সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়।

দুই প্রকার বয়স—কালিক এবং মানস

Chronological and Mental Age

সুতরাং মনের বিকাশ সর্বদা সমান তালে অগ্রসর হয় না। এই আবিষ্কারের ফলে বিনে **অভীক্ষার্থীর বয়স** প্রধানতঃ **দুই প্রকারে ভাগ করিয়াছেন**। প্রথমটি হইল জন্মগত বা **ক্রমিক বয়স** (Chronological age) যাহাকে শারীর বয়সও (Physical age) বলা যাইতে পারে। দ্বিতীয় প্রকারের বয়স হইল মানস বয়স (Mental age)। কাহারও হয়ত ক্রমিক বা শারীর বয়স সাত, কিন্তু মানস বয়স পাঁচ বৎসর বা তাহারও কম। এই শিশু সাত বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করিয়াও, যাহারা মোটে পাঁচ বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছে মাত্র তাহাদের, অথবা তাহাদের নিম্নতর বয়ঃসীমার জন্য নির্ধারিত অভীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে। অর্থাৎ এই শিশুর জন্মগত বা ক্রমিক বয়স সাত বৎসর হইলেও, উহার মানস বয়স পাঁচ বৎসরের বেশী নয়। আবার কাহারও হয়ত জন্মগত বা কালিক বয়স সাত এবং মানস বয়সও সাত, কারণ সে তাহার এবং তাহার নিম্ন বয়সের অভীক্ষায় উত্তীর্ণ, যদিও ঊর্ধ্বতর বয়সের অভীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হয়। তৃতীয়তঃ কোনো শিশুর মানস বযস তাহার জন্মগত বা ক্রমিক বয়স অপেক্ষা বেশী হইতে পারে, কারণ সে তাহার এবং তাহার নিম্ন বয়ঃসীমা নির্দিষ্ট অভীক্ষায় তো বটেই, এমন কি তাহার ঊর্ধ্বতর বয়ঃসীমা, যেমন আট বৎসরের জন্য নির্দিষ্ট অভীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হইতে পারে।

তাহা হইলে **জন্ম হইতে হিসাব করিয়া ব্যক্তির যে বয়স পাওয়া যায় তাহাই তাহার জন্মগত, শারীর বা কালিক বয়স**। আবার **অভীক্ষার মান অনুসারে ব্যক্তির যে বয়স পাওয়া যায় তাহাই তাহার মানস বয়স**।

বিনে'র আবিষ্কার

মানস অভীক্ষার গবেষণায় বিনে যে সকল গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে চারটি প্রধান। যেমন (১) বুদ্ধির সর্বাঙ্গীণ পরিমাপের জন্য বিভিন্ন অভীক্ষা বা পরীক্ষার উদ্ভাবন; (২) মানস অভীক্ষার প্রমাণ বা মান নির্ধারণ; (৩) ক্রমিক এবং মানস বয়সের ভেদ-নির্দেশ এবং (৪) ক্রমিক ও মানস বয়সের আনুপাতিক হিসাবের ভিত্তিতে বুদ্ধ্যঙ্কের (Intelligence Quotient) উদ্ভাবনা।

বুদ্ধ্যঙ্ক Intelligence Quotient or I. Q.)

বিনে উদ্ভাবিত আবিষ্কারের প্রথম তিনটির আলোচনা উপরে করা হইয়াছে। চতুর্থটির, অর্থাৎ বুদ্ধ্যঙ্কের ব্যাখ্যা প্রয়োজন। চতুর্থ আবিষ্কারটির, অর্থাৎ ক্রমিক ও

মানস বয়সের আনুপাতিক হিসাবে **বুদ্ধ্যঙ্কের আবিষ্কারের** গৌরব শুধু একা বিনে'র নয়, বা তাঁহার সহকর্মী সাইমন্ (Simon)-এর ও নয়, কিন্তু স্টার্ন এবং প্রধানতঃ টার্ম্যান্ Terman)-এরও। স্টার্ন (Stern) বুদ্ধ্যঙ্কের ইঙ্গিত করিয়াছিলেন মাত্র। বিনে-সাইমন মানকের (Binet-Simon Scale) পরিবর্তিত সংস্করণে **টার্ম্যান্ ও মেরিল্ হাতেকলমে বুদ্ধ্যঙ্ক নির্ণয় করিয়াছেন।**

এইবার বুদ্ধ্যঙ্ক নির্ণয় প্রণালী কি দেখা যাউক। উপরে দেখানো হইয়াছে কি প্রকারে কোনো শিশুর ক্রমিক বয়স সাত হইলেও, তাহার মানস বয়স সাতের কম বা বেশী হইতে পারে। **বুদ্ধ্যঙ্ক হইল কালিক এবং মানস বয়সের আনুপাতিক পার্থক্য।** যাহার কালিক বয়স সাত, কিন্তু মানস বয়স ছয় বৎসর বা আরও কম, তাহার বুদ্ধির বিকাশ বা বুদ্ধ্যঙ্ক বয়সের অনুপাতে কম, অর্থাৎ এই বয়সে তাহার যেরূপ মানস বিকাশ হওয়া উচিত ছিল তাহা হয় নাই। যাহার কালিক বয়স সাত এবং মানস বয়সও সাত তাহার বুদ্ধির বিকাশ বা বুদ্ধ্যঙ্ক বয়সের অনুপাতে সমান, অর্থাৎ বয়স অনুপাতে তাহার আশানুরূপ বুদ্ধির বিকাশ ঘটিয়াছে। আবার যাহার কালিক বয়স সাত এবং এবং মানস বয়স আট বৎসব বা আরও বেশী, তাহার বিকাশ বা বুদ্ধ্যঙ্ক বয়সের তুলনায় বেশী, অর্থাৎ সাত বৎসর বয়সে যেরূপ বুদ্ধির বিকাশ আশা করা যাইতে পারে তাহার বুদ্ধি তদপেক্ষা বেশী উন্নত।

উপরোক্ত তিনটি শিশুর মধ্যে প্রথমটির বুদ্ধি **স্বাভাবিক অপেক্ষা কম**, দ্বিয়টির বুদ্ধি **স্বাভাবিক** এবং তৃতীয়টির বুদ্ধি **স্বাভাবিক অপেক্ষা বেশী**। স্বাভাবিক বণ্টন রেখায় প্রথমটির স্থান কেন্দ্রবিন্দুর বাম দিকে, দ্বিতীয়টির স্থান কেন্দ্রবিন্দুতে এবং তৃতীয়টির স্থান হইবে কেন্দ্রবিন্দুব ডান দিকে।

বুদ্ধ্যঙ্ক নির্ণয়ের গাণিতিক হিসাব

কিন্তু এইরূপ মোটামুটি ব্যাখ্যায় বুদ্ধ্যঙ্ক অস্পষ্ট থাকিয়া যায়। বুদ্ধ্যঙ্ককে স্পষ্ট বা নির্দিষ্টভাবে বুঝাইবার জন্য গণিত এবং পরিসংখ্যানের (Statistics) সাহায্য অনিবার্য। বুদ্ধ্যঙ্ক নির্ণয়ের গাণিতিক হিসাবটি এই :—

মানস বয়সকে কালিক বয়স দিয়া ভাগ করিয়া ঐ ভাগফলকে ১০০ দিয়া গুণ করিলে যে সংখ্যা পাওয়া যায় তাহাকে বুদ্ধ্যঙ্ক বলে। যেমন প্রথম ব্যক্তির—অর্থাৎ যাহার কালিক বয়স সাত এবং মানস বয়স ছয় বৎসর তাহার—

$$\text{বুদ্ধ্যঙ্ক হইবে } \frac{\text{মানস বয়স}}{\text{কালিক বয়স}} \times ১০০ = \frac{৬}{৭} \times ১০০ = ৮৫{\cdot}৭ = ৮৬$$

দ্বিতীয় ব্যক্তির—অর্থাৎ যাহার কালিক এবং মানস বয়স সাত বৎসর তাহার—

বুদ্ধাঙ্ক হইবে $\frac{\text{মানস বয়স}}{\text{কালিক বয়স}} \times ১০০ = \frac{৭}{৭} \times ১০০ = ১০০$

তৃতীয় ব্যক্তির—অর্থাৎ যাহাব কালিক এবং মানস বয়স যথাক্রমে সাত এবং আট বৎসর—তাহার বুদ্ধাঙ্ক হইবে।

$\frac{\text{মানস বয়স}}{\text{কালিক বয়স}} \times ১০০ = \frac{৮}{৭} \times ১০০ = ১১৪.২ = ১১৪$

বুদ্ধ্যঙ্ক অনুসারে বুদ্ধির বিভিন্ন স্তর

বুদ্ধাঙ্ক বুদ্ধির নির্দেশক এবং বুদ্ধাঙ্ক অনুসারে বুদ্ধি বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত হইয়াছে। যেমন সর্বাপেক্ষা নিম্নবুদ্ধ্যঙ্ক-বিশিষ্ট ব্যক্তিকে **জড়ধী** (Idiot) বলা হয়। জডধীর বুদ্ধাঙ্ক ২০ হইতে ২৫ এবং মানস বয়স তিন হইতে পাঁচ বৎসরের বেশী নয়। জডধী অপেক্ষা অধিক বুদ্ধাঙ্কবিশিষ্ট ব্যক্তিকে বলে **মন্দধী বা নির্বোধ** (Imbecile)। ইহার বুদ্ধ্যঙ্ক সাধারণত: ২৫ হইতে ৫০ এবং মানস বয়স পাঁচ হইতে আট বৎসরের বেশী নয়। মন্দধী অপেক্ষা **ক্ষীণধী** (Moron) ব্যক্তির বুদ্ধাঙ্ক এবং মানস বয়স আরও বেশী—ইহার বুদ্ধাঙ্ক সাধারণতঃ ৫০ হইতে ৭০ এবং মানস বয়স আট হইতে এগারো অপেক্ষা অধিক হয় না। **অল্পধী** (Dull) ব্যক্তির বুদ্ধাঙ্ক ও মানস বয়স আরও বেশী—ইহার বুদ্ধাঙ্ক ৭০ হইতে ৯০ এবং মানস বয়স এগারা হইতে চৌদ্দ। আবার **স্বাভাবিক-বুদ্ধি** (Normal) ব্যক্তির বুদ্ধাঙ্ক এবং মানস বয়স স্বাভাবিক—ইহার বুদ্ধ্যঙ্ক ৯০ হইতে ১১০ এবং মানস বয়স চৌদ্দি হইতে ষোল।

উপরের দিকে, **উজ্জলধী** (Rright ব্যক্তির বুদ্ধাঙ্ক এবং মানস বয়স স্বাভাবিক অপেক্ষা বেশী। ইহাব বুদ্ধাঙ্ক ১১০ হইতে ১২০ এবং মানস বয়স ষোল হইতে কুড়ি। **বিশেষ উজ্জলধী** (Very dright) ব্যক্তির বুদ্ধাঙ্ক ১২০ হইতে ১৪০ এবং মানস বয়স কুড়ি হইতে বাইশ। **প্রতিভাবান** (Genius) ব্যক্তির বুদ্ধাঙ্ক ১৪০ হইতে ১৬০ এবং মানস বয়স বাইশ হইতে চল্লিশ। **অসাধারণ প্রতিভাবান** (Extraordinary) ব্যক্তির বুদ্ধাঙ্ক হইল ১৬০-এর উর্ধ্বে এবং তাহার মানস বয়স চল্লিশ-এর উপরে।

বুদ্ধাঙ্ক এবং মানস বয়সের স্তরভেদগুলি নিম্ন তালিকায় দেখানো হইল।

		মানস বয়স	বুদ্ধ্যঙ্ক
(১)	অসাধারণ প্রতিভাবান ব্যক্তি	২৪ এর উর্ধ্বে	১৬০ এর উর্ধ্বে
(২)	প্রতিভাবান ব্যক্তি	২২-২৪	১৪০-১৬০
(৩)	বিশেষ-উজ্জ্বলধী ,,	২০-২২	১২০-১৪০
(৪)	উজ্জ্বলধী ,,	১৬-২০	১১০-১২০
(৫)	স্বাভাবিক-বুদ্ধি ,,	১৪-১৬	৯০-১১০
(৬)	অল্পধী ,,	১১-১৪	৭০-৯০
(৭)	ক্ষীণধী ,,	৮-১১	৫০-৭০
(৮)	মন্দধী ,,	৫-৮	২৫-৫০
(৯)	জড়ধী ,,	৫ এর নীচে	২৫ এর নীচে

জড়ধী ব্যক্তির বুদ্ধি গর্দভের মত। সে আত্মরক্ষামূলক কাজগুলিও করিতে পারে না। স্নান, আহার পরিধান প্রভৃতি জীবনধারণের জন্য আবশ্যক ব্যাপারগুলিতেও সে পরমুখাপেক্ষী। **মন্দধী** ব্যক্তিকে শিখাইয়া দিলে সে এই জাতীয় কাজগুলি করিতে পারে, কিন্তু লেখাপড়া প্রভৃতি মাথার কাজগুলি শিখাইলেও করিতে পারে না। **ক্ষীণধী** ব্যক্তিকে শিক্ষা দিলে সে মোটামুটি লেখাপড়ার কাজ হয়ত চালাইতে পারে। **অল্পধী** ব্যক্তিকে ঘষিয়া মাজিয়া হয়ত গ্র্যাজুয়েট পর্যন্ত করিয়া তোলা যায়। **স্বভাবিক** বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি সকল প্রকার বুদ্ধিক্রিয়াই সাধারণভাবে সম্পন্ন করিতে পারে। **উজ্জ্বলধী, বিশেষ উজ্জ্বলধী** ব্যক্তিরা আরও সহজে এবং স্বচ্ছন্দে বুদ্ধিক্রিয়াগুলি সম্পন্ন করে। **প্রতিভাবান** এবং **অসাধারণ প্রতিভাবান** ব্যক্তিরা সকল বুদ্ধিক্রিয়ায় নিজস্ব মৌলিকতা দেখায়।

উপরে নির্দেশিত বুদ্ধ্যঙ্কগুলিকে ঐ ঐ বুদ্ধিস্তরের আদর্শ মান ধরা হইলেও, কার্যতঃ উহাদের অল্পাধিক তারতম্য ঘটে। যেমন জড়ধীর বুদ্ধাঙ্ক ২০ ধরা হইলেও, উহা ২০ হইতে প্রায় ২৫-এর কাছাকাছি দাঁড়ায়। আবার মন্দধীর বুদ্ধ্যঙ্ক ২৫ হইতে ৫০, ক্ষীণধীর ৫০ হইতে ৭০, অল্পধীর ৭০ হইতে ৯০, স্বাভাবিক বুদ্ধির ৯০ হইতে ১১০, উজ্জ্বলধীর ১১০ হইতে ১২০ দেখা যায়। অর্থাৎ বুদ্ধাঙ্কগুলি বিন্দু নয়, কিন্তু একটি বিন্দু হইতে আর একটি বিন্দু পর্যন্ত একটি সীমা বা রেঞ্জ্।

৬। বুদ্ধ্যঙ্কের বণ্টন

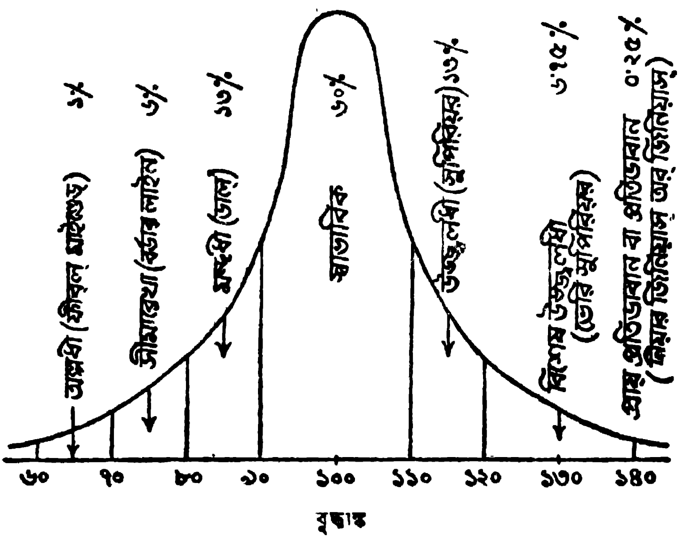
বুদ্ধির বণ্টনহার সম্বন্ধে অভীক্ষা-মনোবিদ্‌গণের মধ্যে কম বেশী মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। যেমন টার্ম্যান্ ১০০০ অনির্বাচিত অ্যামেরিকান শিশুর বুদ্ধ্যঙ্ক বণ্টনের যে

শতকরা হার পাইয়াছেন তাহা এইরূপ :—

বুদ্ধ্যঙ্ক	শতকরা শিশুর সংখ্যা
৫৬-৬৫	০·৩৩
৬৬-৭৫	২·৩
৭৬-৮৫	৮·৬
৮৬-৯৫	২০·১
৯৬-১০৫	৩৩·৯
১০৬-১১৫	২৩·১
১১৬-১২৫	৯·০
১২৬-১৩৫	২·৩
১৩৬-১৪৫	০·৫৫

টার্ম্যান্ ও মেরিল[১] -এর আর একটি গবেষণার ভিত্তিতে স্যাণ্ডিফোর্ড[২] কোনো দেশের জনসাধারণের মধ্যে শতকরা হিসাবে বুদ্ধ্যঙ্ক কিরূপ হারে বণ্টিত হয় তাহা ২৯ নং রেখাচিত্রের সাহায্যে দেখাইয়াছেন।

বণ্টনহার সম্বন্ধে অল্পাধিক তারতম্যে বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। বণ্টনহার দেখাইবার উদ্দেশ্য ব্যক্তিতে বিভিন্ন বুদ্ধিস্তরের অল্পতা বা আধিক্য বুঝানো। এই দিক দিয়া সকল অভীক্ষা-মনোবিদ্ই একমত। যেমন সকলেই বলিবেন যে স্বাভাবিক বুদ্ধি শতকরা সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক লোকের মধ্যে দেখা যায়। টার্ম্যান্-এর মতে প্রথমোক্ত ব্যক্তির সংখ্যা ৩৩·৯% এবং স্যাণ্ডিফোর্ড-এর মতে ইহা ৬০%। কিন্তু উভয় মতেই অন্যান্য বুদ্ধিস্তরের তুলনায় ইহাই অধিকসংখ্যক লোকের মধ্যে বর্তমান।



৫১—নং চিত্র জনসাধারণের মধ্যে বুদ্ধ্যঙ্কের শতকরা বণ্টনহার

৭। বুদ্ধ্যঙ্কের অপরিবর্তনীয়তা
(Constancy of the I. Q.)

বুদ্ধি একটি সহজাত শক্তি। কেহ কেহ আজন্ম জড়ভরত থাকিয়া যায়, আবার কেহ বা জন্ম হইতেই তীক্ষ্নবুদ্ধিসম্পন্ন হয়। মানুষ শিম্পাঞ্জীর তুলনায়, শিম্পাঞ্জী বানরের তুলনায়, বানর কুকুরের তুলনায়, কুকুর বিলাতী ইঁদুরের তুলনায়, বিলাতী ইঁদুর ব্যাঙ-এর তুলনায় এবং ব্যাঙ মাছের তুলনায় বেশী বুদ্ধিমান। জড়বুদ্ধি ব্যক্তিকে হাজার শিক্ষা দিলেও তাহার বুদ্ধির উন্নতি হয় না, আবার সামান্য সুযোগ পাইলেই প্রতিভাবান ব্যক্তির বুদ্ধির চরম বিকাশ ঘটে।

কিন্তু বুদ্ধি শুধু একটু সূক্ষ্ম শক্তি নয়। আচরণের মধ্য দিয়াই বুদ্ধির প্রকাশ। বুদ্ধি জন্মগত হইলেও, উহার বিকাশ বা উন্নতি নির্ভর করে পরিবেশের উপর। কিন্তু শিক্ষা, অভিজ্ঞতা প্রভৃতি পরিবেশগত কারণ বুদ্ধির নিজস্ব রূপকে পরিবর্তিত করে না, পরিবর্তিত করে শুধু বুদ্ধির পরিসর বা ক্ষেত্রকে।

বুদ্ধির যেমন কোনো আসল পরিবর্তন হয় না, বুদ্ধ্যঙ্কেরও তেমন কোনো বিশেষ পরিবর্তন হয় না। যাহারা জন্ম হইতেই জড়বুদ্ধি, মন্দবুদ্ধি, ক্ষীণবুদ্ধি, অল্পবুদ্ধি, উজ্জ্বলবুদ্ধি বা অত্যুজ্জ্বলবুদ্ধি, শিক্ষা দীক্ষা, অভিজ্ঞতা বা বয়োবৃদ্ধির ফলেও তাহাদের বুদ্ধি প্রায় ঐরূপই থাকিয়া যায়। তাহারা হয়ত অল্প বয়সে যাহা জানিত বয়োবৃদ্ধির সহিত তাহা অপেক্ষা আরও বেশী জিনিস জানিতে পারে। কিন্তু তাহাদের জানিবার বা বুঝিবার আকার প্রকার অপরিবর্তিত থাকে। **শিক্ষা, দীক্ষা বা বয়োবৃদ্ধির ফলে বুদ্ধির যে উন্নতি ঘটিতে পারে তাহা বুদ্ধির বিষয় বা বস্তু সম্বন্ধীয়, কিন্তু বুদ্ধির আকার বা প্রকার সম্বন্ধীয় নয়।**

বুদ্ধ্যঙ্কের অপরিবর্তনীয়তা দুই অর্থে বুঝা যাইতে পারে। **প্রথম অর্থে** ইহা বুঝায় যে মনের উন্নতি সত্ত্বেও বুদ্ধ্যঙ্ক অপরিবর্তনীয়। **বুদ্ধ্যঙ্ক যে বয়সের পরিমাপক, সর্বদা সেই বয়সেরই পরিমাপক হইবে।** যদি কাহারও প্রকৃত বয়স ৮ এবং মানস বয়স ১০ এবং বুদ্ধ্যঙ্ক ১২৫ হয়, তাহা হইলে এই বুদ্ধ্যঙ্কটি এইরূপ বয়সেই পরিমাপক হইবে। এই অর্থে ইহা বুঝায় না যে কোনো ব্যক্তির বুদ্ধ্যঙ্ক অপরিবর্তনীয়, কিন্তু বুঝায় যে, যে বয়সে উহা প্রযুক্ত হয় সেই বয়সে ইহার অর্থ বা তাৎপর্য অপরিবর্তনীয় থাকে।

---

১ চতুর্দশ পরিচ্ছেদ—১ম অনুচ্ছেদ

২ পিটার স্যাণ্ডিফোর্ড—এডুকেশন সাইকলজি—পৃঃ ১৬২

দ্বিতীয় অর্থে বুদ্ধ্যাঙ্কের অপরিবর্তনীয়তা বলিতে বুঝায় কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির বুদ্ধ্যাঙ্কের অপরিবর্তনীয়তা। এই অর্থ অনুসারে একই ব্যক্তির বুদ্ধ্যাঙ্ক আজীবন একই থাকে, শিক্ষা দীক্ষা, অভিজ্ঞতা, বয়স এবং অন্যান্য পরিবেশগত কারণে পরিবর্তিত হয় না।

তত্ত্বের দিক দিয়া বুদ্ধ্যাঙ্ক অপরিবর্তনীয় হইলেও হইতে পারে। কিন্তু বাস্তবের দিক দিয়া বুদ্ধি অপরিবর্তনীয় হইলেও, বুদ্ধ্যাঙ্ক অপরিবর্তনীয় নয়। প্রথমতঃ, বুদ্ধ্যাঙ্ক নির্ণয়ের অভীক্ষাগুলিকে একেবারে নির্দোষ বলা যায় না, কারণ ইহাদের মধ্যে ভুলভ্রান্তি থাকিতে পারে। সুতরাং ইহাদের অপরিবর্তনীয়তা যেমন বাঞ্ছনীয় নয় তেমন যথার্থও নয়। তাহা ছাড়া ব্যক্তির বুদ্ধ্যাঙ্কের হ্রাস-বৃদ্ধিপ অস্বীকার করা যায় না। ফ্রীম্যান্ (Freeman) বলেন যে প্রতিভাবান শিশুদের বুদ্ধ্যাঙ্ক স্বাভাবিক বুদ্ধি-সম্পন্ন শিশু অপেক্ষা দীর্ঘতর কাল ধরিয়া এবং বিস্তৃততর ভাবে বদলায়। ওয়েল্‌ম্যান্ (Welman) দেখাইয়াছেন যে বিদ লয়ে যাওয়ার বয়স হয় নাই, এমন শিশুকের বুদ্ধ্যাঙ্ক যথেষ্ট বাড়ে। পালিত এবং যমজ শিশুদের বুদ্ধ্যাঙ্ক পরীক্ষার ভিত্তিতে ফ্রীম্যান্ মনে করেন যে প্রতিবেশের প্রভাবে অল্পবয়স্ক শিশুদের বুদ্ধ্যাঙ্ক যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িতে পারে।

বুদ্ধ্যাঙ্ক বৃদ্ধির বা পরিবর্তনের কারণ অনেক হইতে পারে। হয়ত ইহা অভীক্ষার ত্রুটি হইতেই ঘটে। অথবা, যেমন টার্ম্যান্ মনে করেন, হয়ত এই পরিবর্তন বিভিন্ন শিশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার হইতে ঘটে। আবার হয়তো অনুকূল বা প্রতিকূল পরিবেশের প্রভাবই বুদ্ধ্যাঙ্কের পরিবর্তন ঘটায়।

৮। বুদ্ধির ক্রমবিকাশ

বুদ্ধি অচল বা স্থির নয়, বিকাশ বা পরিমাণশীল। বুদ্ধির অভীক্ষা-গুলির সাহায্যে প্রমাণিত হয় যে ব্যক্তির জন্ম হইতে পরিণতি পর্যন্ত তাহার বুদ্ধি বিকাশশীল।

বুদ্ধির অভীক্ষাগুলি মোটামুটি ভাবে দেখায় যে শৈশবে বুদ্ধির বিকাশ ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে এবং ষোল বৎসর বয়ঃসীমার কাছাকাছি আসিয়া বুদ্ধির বিকাশ বন্ধ হইয়া যায়। তাহা ছাড়া, বুদ্ধিমান শিশুদের বুদ্ধির বিকাশ হয় তাড়াতাড়ি এবং ইহা স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্ন শিশুদের তুলনায় হয় বেশী দীর্ঘকালস্থায়ী। সম্ভবতঃ পরিণত বয়সে বুদ্ধির বিকাশ থামিয়া যায় এবং বার্ধক্যের সঙ্গে সঙ্গে ইহা কমিতে থাকে।

কোন্ নির্দিষ্ট বয়ঃসীমায় বুদ্ধি পরিণতি লাভ করে সেই বিষয়ে মতভেদ আছে। বিনে (Binet) মনে করেন যে এই পরিণতির বয়স ১৫, টার্ম্যান্ এবং ব্যালার্ড-এর

মতে ইহা ১৬ এবং ওটিজ (Otis) ও মনরো (Monroe)-এর মতে ইহা ১৮। থর্নডাইক্ মনে করেন যে উচ্চ বিদ্যালয়ে পাঠান্ত হইবার বয়সই বুদ্ধির পরিণতি বয়স। আবার ডল্-এর মতে এই বয়স ১৩।

উপসংহারে বলা যায় যে বর্তমান পরিমাপ পদ্ধতি অনুসারে বুদ্ধির পরিণতি বয়স ১৪ হইতে ১৬-এর মধ্যে। আরও সূক্ষ্ম পরিমাপ পদ্ধতি উদ্ভাবিত হইলে হয়ত দেখা যাইবে যে ২৩ হইতে ২৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত বুদ্ধির বিকাশ চলিতে থাকে।

৯। বুদ্ধির উচ্চতা এবং বিস্তার বা আনুভূমিকতা
(Vertical and Horizontal Growth of Intelligence)

যদি ১৪ হইতে ১৬ বৎসর বয়ঃসীমায় বুদ্ধির বিকাশ বন্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে চল্লিশ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তির পরিণত বুদ্ধি তাহার কিশোর অবস্থায় অপরিণত বুদ্ধির সহিত সমান হইয়া দাঁড়ায়। অথচ চল্লিশ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তি যে তাহার কিশোর অবস্থার তুলনায় অধিক বুদ্ধিমান, তাহা আপাতদৃষ্টিতে অস্বীকার করা যায় না।

উত্তর এই যে বুদ্ধি-অভীক্ষার ভিত্তিতে উহাদের বুদ্ধির **উচ্চতা বা গভীরতা** সমানই বটে, যদিও চল্লিশ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তির **বুদ্ধির বিস্তার বা ক্ষেত্র** অপেক্ষাকৃত বেশী। ষোল বৎসর বয়স্ক কিশোরের বুদ্ধি অপেক্ষাকৃত অল্প বিষয় সম্বন্ধে সজাগ, আবার ঐ ব্যক্তিই চল্লিশ বৎসর বয়স্ক পরিণত অবস্থায় অপেক্ষাকৃত অধিক বিষয় সম্বন্ধে সজাগ হয়। কিন্তু আসল বুদ্ধিতে অর্থাৎ বুদ্ধির উচ্চতায় বা গভীরতায় উভয়ের কোনো পার্থক্য নাই।

উপসংহারে স্মরণ করা দরকার যে বুদ্ধির উচ্চতায় উল্লিখিত অপরিবর্তনীয়তা তাত্ত্বিক দিক দিয়া গ্রহণীয় হইলেও, বাস্তবে গ্রহণীয় নয়। বাস্তব অভীক্ষার ভিত্তিতে শুধু এইটুকু বলা যায় যে যদিও বুদ্ধি উচ্চতা এবং প্রসার এই উভয়েই পরিবর্তনশীল, প্রথমটির তুলনায় দ্বিতীয়টি বেশী পরিবর্তনশীল। এই প্রসঙ্গে পূর্ব অনুচ্ছেদটি মনোযোগের সহিত দ্রষ্টব্য।

১০। বুদ্ধির অভীক্ষা (Intelligence Tests)

বিনে-সাইমন স্কেল (Binet-Simon Scale)

আলফ্রেড্ বিনেই সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন বুদ্ধির পরিমাপক বিজ্ঞানসম্মত এবং নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি। তাঁহার পূর্বে চেহারা, মস্তিষ্কের গঠন, হাতের লেখা প্রভৃতি দেখিয়া বুদ্ধি-বিচারের যে সকল পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, সেইগুলি অবৈজ্ঞানিক এবং

ভ্রান্ত। বিনে এবং তাঁহার সহকর্মী সাইমন প্যারি শহরের মিউনিসিপ্যাল বিদ্যালয়-গুলির শিশুদের বুদ্ধির মান অথবা স্তরের ভিত্তিতে উহাদের শ্রেণী-বিভাগ করিতে প্রয়াসী হইলেন।

বিনে তাঁহার অভীক্ষা প্রথম তৈয়ারী করেন ১৯০০ সালে। ১৯০৫, ১৯০৮ এবং ১৯১১ সালে বিনে সাইমন-এর সহযোগিতায় তাঁহার অভীক্ষার প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সংস্কার সাধন করেন। ১৯১১ সালের সংস্কারে প্রত্যেক বয়ঃসীমার জন্য (শুধু চার বৎসরের জন্য ৪টি ছাড়া) পাঁচটি করিয়া অভীক্ষা নির্দিষ্ট হয়।

বিনে-সাইমন-উদ্ভাবিত অভীক্ষা কতগুলি প্রশ্ন বা সমস্যা লইয়া গঠিত। প্রশ্ন বা সমস্যাগুলি বিবিধ এবং বিচিত্র, যাহাতে ইহার সাহায্যে বুদ্ধির নানা দিক পরীক্ষিত হইতে পারে। এই স্কেল বা মানক ৫৪টি অভীক্ষা লইয়া গঠিত। ইহাদের ভিত্তিতে বিনে বুদ্ধির বহুমুখী প্রকাশগুলি পরিমাপ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

অভীক্ষাগুলিকে মান, মানক বা স্কেল্ বলা হয়। সাধারণ স্কেল্-এর সাহায্যে যেমন ইঞ্চি, সেন্টিমিটার প্রভৃতি ভেদে সরলরেখা প্রভৃতির পরিমাপ করা যায়, বিনে-সাইমন স্কেলের সাহায্যেও তেমনি তিন বৎসর হইতে আরম্ভ করিয়া পনেরো বৎসর পর্যন্ত মানস বয়স নির্ধারণ করা যায়। এই স্কেলে তিন বৎসর হইতে পনেরো বৎসর পর্যন্ত মানগুলি ক্রমিকভাবে সাজানো থাকে। আবার ইহাতে প্রত্যেকটি বর্ষ-এককের মধ্যবর্তী মাস-বিভাগও থাকে। প্রত্যেক বয়ঃসীমার এককগুলি পরীক্ষণীয় প্রশ্ন বা অভীক্ষার ক্রমিক কাঠিন্য বা দুরূহতা অনুসারে সাজানো হয়। যেমন তিন বৎসর মানস বয়সের মান-নির্ণায়ক প্রশ্ন বা সমস্যাগুলি চার বৎসরের অপেক্ষা সহজ, আবার দ্বিতীয়টি প্রথমটির তুলনায় কঠিন।

এই স্কেল্ বা মানকের ভিত্তিতে বিনে মানস বয়স (mental age) বাহির করিয়াছেন। যে শিশু শুধু তিন বৎসর মানের প্রশ্ন বা সমস্যাগুলি শতকরা পঞ্চাশটির অধিক সমাধান করিতে পারে তাহার মানস বয়স তিন, যদিও তাহার প্রকৃত বা ক্রমিক বয়স দুই, চার, পাঁচ বা আরও কম-বেশী হইতে পারে।

বুদ্ধি অভীক্ষার ক্ষেত্র

বিনে-সাইমন স্কেলে বুদ্ধির সর্বাঙ্গীন পরীক্ষা করিবার চেষ্টা করা হয়। যেমন শিশুকে কোনো বস্তু দেখাইয়া তাহার নাম বলিতে, কোনো ঘটনা উল্লেখ করিয়া তাহা স্মরণ করিতে, সংখ্যা বা বস্তু গণনা করিতে, দুইটি বস্তুর তুলনা করিতে, বোধশক্তির এবং জ্ঞান ভাণ্ডারের ব্যবহার করিতে, বিচার, সমস্যার সমাধান প্রভৃতি

নানারূপ ক্রিয়ায় বুদ্ধির প্রয়োগ করিতে বলা হয়। এইরূপ সর্বাঙ্গীণ পরীক্ষায় বুদ্ধির নানা দিক প্রকাশিত হয়।

কিন্তু বুদ্ধির বিভিন্ন প্রকাশই বিনে-এর নির্ণেয় হইলেও, কার্যতঃ তিনি তাঁহার অভীক্ষাগুলির বিষয় (Item) নির্বাচনে একাগ্রতা বা মনোযোগ, কল্পনাশক্তি, অবধারণ-শক্তি ও বিচার-শক্তিকে প্রাধান্য দিয়াছেন।

বিনে-সাইমন স্কেল শুধু ব্যক্তিগত পরীক্ষা বা অভীক্ষাতে সীমাবদ্ধ থাকে নাই। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন গবেষকরা বিনে-সাইমন উদ্ভাবিত অভীক্ষাগুলির পরীক্ষা করেন। ফলে উহাদের আংশিক পরিবর্তন ঘটে।

টার্ম্যান্ ও মেরিল্ সংস্করণ

গডার্ড (Goddard), কুল্‌ম্যান্ (Kuhlman), মিউম্যান্ (Meumann), টার্ম্যান্-মেরিল্, বার্ট (Burt) প্রভৃতি গবেষকগণের এবং বিশেষ করিয়া টার্ম্যান্ এবং মেরিল্ কৃত বিনে-সাইমন অভীক্ষার "স্ট্যান্‌ফোর্ড সংস্করণ"[১] প্রধান। টার্ম্যান্ ও মেরিল্ দেখিলেন যে বিনে-স্কেল-এর কতগুলি দোষ আছে। এই স্কেলে নিম্ন বয়ঃসীমার পরীক্ষাগুলি অত্যধিক সহজ এবং উচ্চ বয়ঃসীমার পরীক্ষাগুলি অত্যধিক কঠিন। ফলে এই স্কেল্-এর অভীক্ষাগুলি সামঞ্জস্যহীন। টার্ম্যান্ ও মেরিল্ এই দোষ সংশোধনের চেষ্টা করিলেন এবং স্টার্ন-এর ইঙ্গিত অনুসারে বুদ্ধ্যাঙ্ক হিসাব করিবার উপায় উদ্ভাবন এবং বুদ্ধ্যাঙ্ক নির্ণয়ের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত বুদ্ধিস্তরগুলি নির্দেশ করিলেন।

বুদ্ধ্যাঙ্ক	জনসংখ্যার শতকরা হিসাব	মানসস্তর
১৪০এর উপরে	১	প্রতিভা
১২০—১৪০	৫	অত্যুজ্জ্বল বুদ্ধি
১১০—১২০	১৪	উজ্জ্বল বুদ্ধি
৯০—১১০	৬০	স্বাভাবিক বা গড় বুদ্ধি
৮০—৯০	১৪	অল্পধী
৭০—৮০	৫	সীমারেখা—ক্ষীণবুদ্ধি
৭০এর নীচে	১	অল্পধী

১ এই পরিচ্ছেদের পরবর্তী অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

বার্ট-এর লণ্ডন সংস্করণ

বিনে-অভীক্ষার শ্রেষ্ঠ ও সাম্প্রতিক পুনর্মার্জন বা সংস্কার সাধন করিয়াছেন সিরিল্ বার্ট (Cyril Burt) তাঁহার লণ্ডন সংস্করণে। সাইমন্-এর সহযোগিতায় বার্ট বিনে-সাইমন্ অভীক্ষাগুলিকে লণ্ডন শিশুদের উপযোগী করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি টার্ম্যান্-মেরিল্-এর মত বিনে টেস্ট্ গুলিকে প্রায় অপরিবর্তিত রাখিয়া ছাড়িয়া দেন নাই। মেধাবী বা উজ্জ্বলধী শিক্ষার্থীদের অভীক্ষায় তিনি ঐ টেস্ট্ গুলিব আমূল পরিবর্তন করিয়া উহাদের পরিবর্তে নূতন টেস্ট্ উদ্ভাবন করিয়াছেন।

বিনে-সাইমন্ স্কেল-এর অন্যান্য সংশোধন

বিনে-সাইমন স্কেলের পুনর্মার্জনে কুলম্যান তিন বৎসরের ছোট শিশুদের বুদ্ধি-অভীক্ষা উদ্ভাবন করেন।

আবার **যারকিজ** (Yerkes), **ব্রিজেস** (Bridges), **হার্ডউইক** (Hardwick) প্রভৃতি অভীক্ষা-মনোবিদ্গণ বিনে-সাইমন্ স্কেল্-এর কয়েকটি দোষ সংশোধন করিয়া মূল্যবান গবেষণা করেন। বিনে-পদ্ধতির একটি দোষ হইল এই যে উহাতে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলে কোনো পরীক্ষার্থী পূর্ণ সাফল্যলাভ করে, আবার না পারিলে একেবারে শূন্য পায়। ইহাতে পরীক্ষার্থীর বিষয়ের বা পরীক্ষার্থীব, কাহারও প্রতি সুবিচার করা হয় না। কারণ এই পরীক্ষায় এমন অংশ দেওয়া হইতে পারে, যাহাতে পরীক্ষার্থীর দখল আছে অথবা নাই। একই বিষয়ের বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন সাফল্যাঙ্ক থাকিলেই, এই একদেশদর্শিতা দূর করা যাইতে পারে।

বিন্দুমান (Point-Scale)

উপরোক্ত দোষ পরিহারের জন্য যারকিজ্, ব্রিজেস্, হার্ডউইক্ প্রভৃতি অভীক্ষা-মনোবিদ্গণ বিন্দুমান উদ্ভাবন করেন। ইহাতে বিনে-সাইমন্ স্কেল-এর অধিকাংশ অভীক্ষাগুলিই স্থান পাইয়াছে। কিন্তু বিনে-সাইমন্ স্কেল অনুসারে পূর্ণ বা শূন্য সাফল্যাঙ্ক দেওয়ার পরিবর্তে পয়েণ্ট বা বিন্দুমান দেওয়া হয়। ফলে অভীক্ষার্থী আংশিক সাফল্যাঙ্ক লাভ করিতে পারে।

উপরোক্ত পরিমার্জন বা সংস্করণ ছাড়াও বিনে-সাইমন্ স্কেল-এর আরও পরিবর্তন হইয়াছে—যেমন হেরিং (Herring) সংস্করণে।

১১। বিনে-সাইমন স্কেল—টার্মান্-মেরিল্ সংস্করণ অথবা স্ট্যানফোর্ড সংস্করণ

টার্ম্যান্ মেরিল্-সংস্করণে দুই বৎসর হইতে পাঁচ বৎসর বয়স পর্যন্ত প্রতি বৎসরের

জন্য বারোটি করিয়া অভীক্ষা দেওয়া থাকে, যাহার ফলে প্রতিটি অভীক্ষার জন্য এক মাস করিয়া বয়স হিসাব করা হয়। আবার ছয় বৎসর হইতে চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত প্রতি বৎসরের হিসাব নির্ণয়ে ছয়টি করিয়া অভীক্ষা থাকে, যাহার ফলে প্রত্যেকটি অভীক্ষার জন্য দুই মাস করিয়া বয়স ধরা হয়।

বিনে-স্কেল-এর সহিত টার্ম্যান্-মেরিল্ স্কেল-এর পার্থক্য

টার্ম্যান্ বিনে-স্কেল-এর প্রথম সংস্কার করেন ১৯১৬ সালে এবং মেরিল্-এর সহযোগিতায় বিনে-স্কেল্-এর পরিবর্ধিত সংস্করণ বাহির হয় ১৯৩৭ সালে। টার্ম্যান্-এর প্রথম সংস্করণে ৯০টি এবং সর্বশেষ সংস্করণে প্রশ্নসংখ্যা দাঁড়ায় ১২৯-টিতে। বিনে'র স্কেল আরম্ভ হইয়াছিল তিন বৎসর বয়স হইতে, আর টার্ম্যান্-মেরিল্-এর নূতন সংস্করণ আরম্ভ হইয়াছে দুই বৎসব বয়স হইতে। বিনে'র মূল স্কেল-এ প্রশ্নসংখ্যা ছিল ৫৪টি, আর টার্ম্যান্-মেরিল্-এর নবতম সংস্করণে প্রশ্নসংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ১২৯-টিতে।

বিনে-অভীক্ষার ১৯১১ সালের সংশোধিত রূপ :

৩ বৎসর বয়স—

(১) নাক, মুখ, চোখ প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নাম বলা
(২) দুইটি সংখ্যা শুনিয়া আবার বলা
(৩) একটি ছবিতে কি কি জিনিস আছে তাহা বলা
(৪) পদবী বলা
(৫) ছয়টি পদবিশিষ্ট একটি বাক্য শুনিয়া আবার বলা

৪ বৎসর বয়স—

(১) নিজে ছেলে কি মেয়ে তাহা বলা
(২) চাবি, ছুরি, পয়সা প্রভৃতি দেখিয়া বলা
(৩) তিনটি সংখ্যা শুনিয়া আবার বলা
(৪) দুইটি সরল রেখার দৈর্ঘ্যের তুলনা করা

৫ বৎসর বয়স—

(১) দুইটি ওজন তুলনা করা
(২) একটি চৌকোণা ক্ষেত্র দেখিয়া ঐরূপ চিত্র অঙ্কন করা
(৩) দশটি পদবিশিষ্ট একটি বাক্য শুনিয়া তাহা বলা
(৪) চারিটি পয়সা গণনা করা
(৫) একটি দ্বিখণ্ডিত চতুষ্কোণকে জুড়িয়া দেওয়া

৬ বৎসর বয়স—

(১) সকাল সন্ধ্যার মধ্যে পার্থক্য বলা
(২) কয়েকটি প্রচলিত জানা শব্দের অর্থ বলা
(৩) একটি রুহিতনের আকার দেখিয়া তাহা অঙ্কন করা
(৪) তেরোটি পয়সা গণনা করা
(৫) কয়েকটি ছবির মধ্যে কোন্‌টি সুন্দর কোন্‌টি কুৎসিত তাহা বলা

৭ বৎসর বয়স—

(১) ডান হাত ও বাঁ কান দেখানো
(২) একটি ছবির বিবরণ দেওয়া
(৩) একই সঙ্গে প্রদত্ত তিনটি আদেশ প্রতিপালন করা
(৪) ছয়টি মুদ্রার মধ্যে তিনটি ডবল মুদ্রা দিয়া মোট মূল্য গণনা করা
(৫) চারটি প্রধান রং-এর নাম বলা

৮ বৎসর বয়স—

(১) স্মৃতি হইতে দুইটি বস্তুর তুলনা করা
(২) ২০ হইতে ০ পর্যন্ত গণনা করা
(৩) ছবির মধ্যে বাদ-পড়া অংশগুলি লক্ষ্য করা
(৪) বার ও তারিখ বলা
(৫) পাঁচটি সংখ্যার পুনরুক্তি করা

৯ বৎসর বয়স—

(১) মুদ্রার খুচ্‌রা হিসাব করা
(২) শব্দের অর্থ বলা
(৩) প্রচলিত মুদ্রার সব কয়টিকে চেনা
(৪) পর্যায়ক্রমে মাসের নাম বলা
(৫) সহজ প্রশ্নের ভাবার্থ বুঝিয়া উত্তর দেওয়া

১০ বৎসর বয়স—

(১) ওজন অনুসারে পাঁচটি ব্লক্ বা কাঠের টুকরা সাজানো
(২) দুইটি ছবি দেখিয়া স্মৃতি হইতে অঙ্কন করা
(৩) অসম্ভব কথাগুলির অবাস্তবতা দেখানো
(৪) কঠিন প্রশ্নের ভাবার্থ বুঝিয়া উত্তর দেওয়া

(৫) তিনটি দেওয়া শব্দের প্রয়োগ দেখাইয়া বাক্য রচনা করা

১১ বৎসর বয়স—

(১) কতগুলি উক্তির অসম্ভাব্যতা বাহির করা
(২) তিনটি প্রদত্ত শব্দের সাহায্যে একটি বাক্য রচনা করা
(৩) তিন মিনিটে ষাট্‌টি শব্দ বলা
(৪) তিনটি সূক্ষ্ম বা বিমূর্ত শব্দের ভাবার্থ বলা
(৫) কয়েকটি এলোমেলোভাবে সাজানো পদের সাহায্যে একটি অর্থপূর্ণ বাক্য তৈয়ারী করা

১৫ বৎসর বয়স—

(১) সাতটি সংখ্যার পুনরুক্তি করা
(২) একটি শব্দের সহিত মিল রাখিয়া এক মিনিটে তিনটি শব্দ বলা
(৩) ছাব্বিশটি অংশযুক্ত একটি বাক্যের পুনরুক্তি করা
(৪) ছবি দেখিয়া তাহার অর্থ বলা
(৫) ভাবার্থ বলা

বয়স্কদের জন্য—

(১) কাগজ কাটার কয়েকটি সমস্যা সমাধান করা
(২) একটি ত্রিভুজকে কল্পনায় পুনর্গঠন করা
(৩) কতগুলি বিমূর্ত বা সূক্ষ্ম শব্দের পার্থক্য নিরূপণ করা
(৪) প্রেসিডেণ্ট ও রাজার মধ্যে তিনভাবে পার্থক্য নিরূপণ করা
(৫) একটি পড়িয়া-শোনানো গদ্যাংশের সংক্ষিপ্তসার বলা

১৯১১ সালের বিনে-স্কেল সংস্করণের ত্রুটি

উপরে বিনে-সাইমন্‌-স্কেল-এর সংস্করণটি আসলে ১৯১১ সাল-এর নয় কিন্তু ইহা ১৯০৮ এবং ১৯১১ সাল সংস্করণের মিশ্রণ। এই স্কেল-এর একটি সমস্যা এই যে ইহাতে বারো বৎসর হইতে চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত তিনটি বয়ঃসীমার অভীক্ষা নাই। এই অস্পষ্টতার ব্যাখ্যা এইরূপ। ১৯০৮ সংস্করণের এগার বৎসর বয়স নির্ধারিত অভীক্ষাটি ১৯১১ সালের সংস্করণে বারো বৎসরে এবং বারো বৎসরেরটি পনেরো বৎসরে স্থানান্তরিত হইয়াছে। আবার ১৯০৮ সালের সংস্করণে যে অভীক্ষাটি তেরো বৎসরের মানক হিসাবে নির্ধারিত ছিল, সেইটিই ১৯১১ সালের সংস্করণে বয়স্কদের (Adult) জন্য অভীক্ষায় স্থানান্তরিত হইয়াছে। অথচ এই স্থানান্তর করিয়া যে বৎসরগুলির অভীক্ষা

থাকিল না সেই শূন্যস্থানগুলি আর পূরণ করা হয় নাই। ফলে, ১৯১১ সালের বিনে-সাইমন্-স্কেল-এর চূড়ান্ত সংস্করণে বারো, তেরো এবং চৌদ্দ বৎসরের মানক কোন অভীক্ষা নাই।[১]

সুতরাং ১৯১১ সালের চূড়ান্ত সংস্করণকে ১৯০৮ সালের দ্বিতীয় সংস্করণ অপেক্ষা উন্নত বলা যায় কিনা সন্দেহ।

১২। কৃতি অভীক্ষা (Performance Test)

উল্লিখিত বুদ্ধি-অভীক্ষাগুলি ভাষা-ব্যবহারের উপর নির্ভর করে। সুতরাং নিরক্ষর, মূকবধির বা বিদেশীয় ভাষায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তির বুদ্ধি নির্ণয়ে এই অভীক্ষাগুলি অকেজো হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু এই শ্রেণীর ব্যক্তিরা ভাষার সাহায্য না লইয়া স্থূল বস্তুর নাড়াচাড়ার (Manipulation) সাহায্যে নিজ নিজ বুদ্ধির পরিচয় দিতে পারে। এইরূপে কৃতি-অভীক্ষা প্রয়োজনীয় হইয়া দাঁড়ায়।

স্থূল বস্তু নাড়াচাড়ার সাহায্যে বুদ্ধির অভীক্ষাকে কৃতি-অভীক্ষা বলে। আকৃতি-পট্ট (Form-board), ছবি-সম্পূরণ (Picture-completion), ধাঁধা পথ অনুসন্ধান (Maze-exploration) প্রভৃতি অভীক্ষা এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

যেমন আকৃতি-পট্ট অভীক্ষায় পরীক্ষার্থীকে ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ, গোল প্রভৃতি নানা আকৃতির কাষ্ঠখণ্ড (Block) দেওয়া হয়। এই সকল আকৃতি-পট্টের নানা আকৃতিতে কাটা স্থানগুলি শূন্য থাকে। নানা আকারের কাষ্ঠখণ্ড ছড়াইয়া রাখা হয়। কৃতি-অভীক্ষার্থীকে আকৃতি-পট্টের ঐ ঐ আকারীয় শূন্যস্থানগুলি যথাযোগ্য কাষ্ঠখণ্ড দিয়া নির্দিষ্ট সময়ে পূরণ করিতে বলা হয়। আবার ছবি-সম্পূরণ অভীক্ষায় কোনো বস্তুর ছবিতে—যেমন একটি চেয়ারের ছবিতে, কতগুলি অংশ অসম্পূর্ণ রাখিয়া সেইগুলি নির্দিষ্ট সময়ে সম্পূর্ণ করিয়া দিতে বলা হয়।

শ্রেণী পরীক্ষা (Group Test)

আবার উপরোক্ত অভীক্ষাগুলির দোষ এই যে উহারা অভীক্ষিত ব্যক্তিতে সীমাবদ্ধ, অর্থাৎ এককালে একাধিক ব্যক্তিতে প্রযোজ্য নয়। কিন্তু যে ক্ষেত্রে অভীক্ষণীয় ব্যক্তির সংখ্যা অনেক অথবা অভীক্ষার সময় অল্প, সেইক্ষেত্রে এককালে অনেক ব্যক্তির অভীক্ষা আবশ্যক হয়; এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শ্রেণীগত অভীক্ষা উদ্ভাবিত হইয়াছে। যেমন, আমেরিকান্ সেনা-মনোবিদ্‌গণের আর্মি অ্যালফা (Army Alpha) টেস্ট এবং আর্মি বিটা (Army Beta) টেস্টগুলি।

১ এফ, এন, ফ্রীমান্—মেণ্টাল টেস্টস্—পৃঃ ৯০-৯২

কিন্তু শ্রেণী-অভীক্ষা স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। অল্প সময়ে শ্রেণীগত অভীক্ষা গ্রহণ করিয়া ব্যক্তির বুদ্ধি যথাযোগ্যভাবে পরীক্ষিত হইতে পারে না। এইগুলিকে সম্পূর্ণ করিতে হইলে ব্যক্তি-অভীক্ষার প্রয়োগ করিতে হয়।

মেজাজ ও চরিত্র অভীক্ষা (Temperament and Character Test)

আমার মেজাজ ও চরিত্র অভীক্ষাগুলিও বুদ্ধি-অভীক্ষার পরিপূরক। ইহাদের সাহায্যে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব (Personality), মেজাজ, চরিত্র, শারীরিক গুণ—যেমন চেহারা, পরিচ্ছন্নতা, কণ্ঠস্বর, বেশভূষা, আচরণ, নেতৃত্বপ্রবণতা প্রভৃতি—নিরূপণ করা হয়।

বৃত্তি পরিচালনা এবং নির্বাচন (Vocational Guidance and Vocational Selection)

চতুর্থতঃ, বৃত্তি বা পেশামূলক পরিচালনা এবং বৃত্তি বা পেশা নির্বাচন সম্বন্ধে অভীক্ষা উদ্ভাবিত হইয়াছে। প্রথমটিতে অনুসন্ধান, পর্যবেক্ষণ বা প্রয়োগ প্রণালী অনুসৃত হইয়া থাকে। প্রশ্নাবলী-পদ্ধতির (Questionnaire) সাহায্যে অনুসন্ধান করা হয় কোন্ ব্যক্তি কোন্ বৃত্তি বা পেশার উপযুক্ত এবং বৃত্তিপ্রার্থীর কি কি অসুবিধা হইতে পারে। বৃত্তি-নির্বাচনকালে ব্যক্তিকে হাতে-কলমে পরীক্ষা করিতে হয়।

ক্ল্যাপারিড্ দুই প্রকার বৃত্তি বা পেশা নির্বাচন অভীক্ষার কথা বলিয়াছেন—যথা মানস অভীক্ষা, যাহাতে বুদ্ধি, মেজাজ, ব্যক্তিত্ব প্রভৃতির অভীক্ষাগুলি অন্তর্ভুক্ত—এবং কাজ সংক্রান্ত অভীক্ষা। দ্বিতীয়টি চার প্রকার, যেমন নমুনামূলক, সাদৃশ্যমূলক বিশ্লেষণমূলক এবং অভিজ্ঞতামূলক। নমুনামূলক অভীক্ষায় বৃত্তিপ্রার্থীকে তাহার করণীয় কাজের নমুনা দিয়া তাহা করিতে বলা হয়। সাদৃশ্যমূলক অভীক্ষায় তাহাকে করণীয় কাজের অনুরূপ কোনো কাজ করিতে দেওয়া হয়। আবার বিশ্লেষণমূলক অভীক্ষায় কাজের অংশগুলিকে বিশ্লেষণ করিতে দেওয়া হয় এবং কর্মপ্রার্থীকে প্রত্যেক অংশের উপর অভীক্ষা দিতে হয়। অভিজ্ঞতামূলক অভীক্ষায় এলোমেলোভাবে কতগুলি অভীক্ষা দেওয়া হয়। এবং সেইগুলিই গ্রহণ করা হয়, যেগুলির সহিত কাজের সম্বন্ধ থাকে।

১৩। বুদ্ধি ও আচরণ (Intelligence and Conduct)

বুদ্ধির সঙ্গে আচরণের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। প্রত্যেক আচরণেই বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। আবার, বুদ্ধি আচরণের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করে।

বুদ্ধি ও আচরণের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ বলিয়াই বুদ্ধির অভীক্ষা ব্যক্তিত্ব, মেজাজ এবং

চরিত্রের অভীপ্সার সম্পূরক, আবার দ্বিতীয়টি প্রথমটির সম্পূরক। ইহার একটি অপরটি ছাড়া অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়।

জড়ধী, মন্দধী এবং ক্ষীণধী

ব্যক্তির আচরণ কিরূপ, তাহা তাহার বুদ্ধির উপর নির্ভর করে। জড়ধী ব্যক্তির বুদ্ধ্যঙ্ক যেমন অত্যন্ত অল্প, তাহার আচরণও তেমন অত্যন্ত নিম্ন স্তরের। জীবন ধারণের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় কাজগুলিও এই ব্যক্তি করিতে পারে না। তাহার আহার, স্নান, বেশভূষা, চলাফেরা প্রভৃতি প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি কাজে অপরের তত্ত্বাবধান প্রয়োজন। তাহার আচরণ গাধার তুল্য। সেই কারণেই নির্বোধ লোককে গাধা বলিয়া তিরস্কার করা হয়। মন্দধী বা নির্বোধ এবং ক্ষীণধী ব্যক্তির আচরণ জড়ধী ব্যক্তির আচরণ অপেক্ষা উচ্চ পর্যায়ের, কারণ উহাদের বুদ্ধ্যঙ্কও অপেক্ষাকৃত উচ্চ। ইহারা জীবনের গতানুগতিক কাজগুলি মোটামুটিভাবে করিয়া যাইতে পারে, কিন্তু কোনো জটিল বা নূতন পরিস্থিতির সম্মুখীন হইতে পারে না।

অল্পধী এবং স্বাভাবিক ধী

বুদ্ধ্যঙ্কের স্তরে আর একধাপ উঠিলে, অর্থাৎ অল্পধী ব্যক্তিদের আচরণ পর্যালোচনা করিলেও বুদ্ধ্যঙ্ক বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আচরণের উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। আবার সাধারণ অথবা স্বাভাবিক-বুদ্ধি ব্যক্তির বুদ্ধ্যঙ্ক যেমন আরও উচ্চ স্তরের, তাহাদের আচরণও তেমনই আরও উচ্চ স্তরের। এই সকল ব্যক্তির মধ্যে পারিবারিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় চেতনা আরও স্পষ্ট আকার লাভ করে; সুতরাং ইহাদের আচরণে এই সকল ন্যায়-নীতি এবং আদর্শনিষ্ঠা বেশী প্রতিফলিত হয়। ইহারা শিক্ষার ফলে অর্জিত মার্জিত ও শিষ্ট রুচি লাভ করে এবং প্রচলিত নৈতিক আচরণের ধারক ও বাহক হইয়া দাঁড়ায়। ইহারা স্বাধীনভাবে কোনো জীবনাদর্শকে আচরণে ফুটাইয়া তুলিতে পারে।

উজ্জ্বলধী, প্রতিভাবান এবং উচ্চবুদ্ধি ব্যক্তি

তীক্ষ্ণ অথবা উজ্জ্বলবুদ্ধি ব্যক্তিরা যেমন বুদ্ধ্যঙ্কে উন্নত, তেমনই তাহাদের আচরণও অপেক্ষাকৃত উন্নত। ইহারা নূতন পরিস্থিতির সহিত উন্নততর সামঞ্জস্য করিতে পারে। ইহাদের আচরণ অপেক্ষাকৃত পরিচ্ছন্ন এবং সজাগ। আবার প্রতিভাবান বা অত্যুজ্জ্বলধী ব্যক্তিরা বুদ্ধ্যঙ্কের এবং আচরণের দিক দিয়া উজ্জ্বলধী ব্যক্তির তুলনায় উন্নত। ইহাদের মধ্যে সামাজিক গুণগুলির বিকাশও বেশী। চরিত্রের দিক দিয়াও ইহাদের শ্রেষ্ঠতা অনস্বীকার্য। ইহাদের মধ্যে সততা, বিশ্বস্ততা এবং নৈতিক দৃঢ়তা অধিকতর পরিস্ফুট। তীক্ষ্ণধী এবং প্রতিভাবান ব্যক্তিদের সঙ্কল্প বা স্বাধীন ইচ্ছাও দৃঢ়তর।

ন্যায়ান্যায় বোধ, আদর্শনিষ্ঠা এবং চরিত্রবলও ইহাদের বেশী। কিন্তু সামাজিক বা চিরাচরিত ন্যায়নীতির সহিত এই শ্রেণীর ব্যক্তিদের প্রায়ই বিরোধ ঘটে। ইহারা প্রায়ই সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া চলে, কাজেই গতানুগতিক ন্যায়নীতি মানিয়া চলিতে পারে না।

উচ্চবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের আচরণ ভ্রান্তপথে পরিচালিত হইলে, প্রায়ই নীতি-বিরোধী হইয়া ওঠে। এই কারণে ইহারা অনেক সময় সমাজের পক্ষে বিপৎসঙ্কুল হইয়া দাঁড়ায়। ইহাদের দ্বারা সমাজের প্রভূত উপকার হইতে পারে, কারণ ইহাদের বুদ্ধি সৃজনমূলক। আবার ভ্রান্তপথে চালিত হইলে, ইহাদের দ্বারা সমাজের ঘোরতর অনিষ্ট সাধিত হইতে পারে।

১৪। দুষ্ক্রিয়তা (Delinquency)

দুষ্ক্রিয়তা সম্বন্ধে সিরিল বার্ট (Cyril Burt), হিলি (Healy), ব্রোনার (Bronner), শ্লসন (Slawson) প্রভৃতি মনোবিদ্‌গণের গবেষণা বিশেষ মূল্যবান।

দুষ্ক্রিয়তা বা delinquency কথাটি সাধারণতঃ শিশু ও কিশোরদের উচ্ছৃঙ্খল আচরণপ্রবণতা বুঝায়, যেমন ঘরপালানো, মিথ্যা কথা বলা, চুরি করা প্রভৃতি। ঘরপালানো শিশুর মন ঘরে টিকে না। সুযোগ পাইলেই সে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যায় কোনো কোনো শিশু বা কিশোর কোনো প্রকারেই সত্য কথা বলে না। মিথ্যা কথা বলা তাহাদের অভ্যাসে পরিণত হয়। আবার কোনো কোনো শিশুর চুরি করিবার জন্য হাত নিস্‌পিস্ করে। এই জাতীয় স্বভাবের জন্য ইহারা পরিবার ও সমাজের আপদস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়।

অপরাধ (Crime) এবং দুষ্ক্রিয়তা

দুষ্ক্রিয়তা সমাজজীবনের একটি উদ্বেগজনক ঘটনা। প্রত্যেক সমাজেই এক শ্রেণীর লোক থাকে যাহারা উন্মার্গগামী। তাহারা সমাজজীবনের স্বাস্থ্য ও শৃঙ্খলা নষ্ট করে এবং সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন-যাত্রার পথে বাধা বা কণ্টক-স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। তাহারা আইনভঙ্গকারী, সুতরাং আইনতঃ দণ্ডনীয়। অথচ তাহাদের দুষ্ক্রিয়তা আইনভঙ্গের এমন স্তরে পৌঁছায় না যাহাকে আইনের চোখে অপরাধ বা ক্রাইম বলা চলে। সুতরাং এই দুষ্ট শ্রেণীর ব্যক্তিদিগকে পুলিসের হাতে দিয়া নিশ্চিন্ত হইবার উপায় নাই।

বুদ্ধি ও দুষ্ক্রিয়তা

বুদ্ধি-অভীক্ষায় দেখা যায় যে দুষ্ক্রিয় শিশু বা কিশোররা প্রায়ই ক্ষীণবুদ্ধি-সম্পন্ন

(Feeble-minded) হইয়া থাকে। তাহাদের উচ্ছৃঙ্খল আচরণের মূল কারণ তাহাদের বুদ্ধির অভাব। স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের তুলনায় ক্ষীণবুদ্ধিদের মধ্যে দুষ্ক্রিয়তা বেশী দেখা যায়। যে স্থলে স্বাভাবিক মানুষের মধ্যে শতকরা মাত্র একজন দুষ্কৃতকারী সেই স্থলে ক্ষীণবুদ্ধির মধ্যে শতকরা ১৫ হইতে ৩০ জনই দুষ্কৃতকারী। ইহারা দুষ্ক্রিয়তার ফলাফল বুঝিতে পারে না এবং অন্যায় করিতে প্রলুব্ধ হয়। ক্ষীণ মানসিকতা এবং মানস অস্বাভাবিকতা (Mental Abnormality) দুষ্কৃতকারীদের মধ্যেই বেশী দেখা যায়। হিলি এবং ব্রোনার মনে করেন যে ইহাদের শতকরা ১৩·৫ অংশ ক্ষীণবুদ্ধিসম্পন্ন। বার্ট-এর মতে এই সংখ্যা মাত্র শতকরা ৮ জন। ম্যাথুজ (Mathews) এবং বার্ট মনে করেন যে দুষ্কৃতকারীদের এক-তৃতীয়াংশের মধ্যে চিত্তচাঞ্চল্য দেখা যায়। মাতীর (Mateer) মনে করেন যে ইহাদের অধিকাংশই মানসরোগগ্রস্ত।

দুষ্ক্রিয়তা সম্বন্ধে বার্ট, হিলি, ব্রোনার, শ্লসন প্রভৃতির প্রধান বক্তব্য মূলতঃ এক। ইহাদের সকলের মতেই বালিকার তুলনায় অধিকসংখ্যক বালক নানা রকমের চুরি করিয়া থাকে। আবার ঘরপালানো, ভবঘুরেমী, সম্পত্তির ক্ষতিসাধনপ্রবণতা প্রভৃতি দুষ্ক্রিয়তাও বালিকাদের তুলনায় বালকদিগের মধ্যে বেশী। অপর পক্ষে, যৌন অপরাধ বালকদের ক্ষেত্রেই বেশী। আবার মিথ্যা কথা বলা এবং চরিত্রের অসংশোধনীয়তাও বালকদের তুলনায় বালিকাদের মধ্যেই অধিক। অর্থাৎ বালক এবং বালিকাভেদে দুষ্ক্রিয়তার প্রকারভেদ হয় মাত্র। এইরূপ বলা চলে না যে বালিকাদের তুলনায় বালকেরাই বেশী অথবা বালকদের তুলনায় বালিকারাই বেশী দুষ্কৃতকারী।

দুষ্ক্রিয়তার কারণ

অধিকাংশ দুষ্কৃতকারীর ঘরের অবস্থা খারাপ। হয়ত তাহাদের সংসার ভাঙা বা পারিবারিক বন্ধনশূন্য, বাপ অথবা মা অথবা উভয়েই জীবিত নাই, হয়ত বা বাপ-মা বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করেন অথবা মা সারাদিন বাহিরে কাজ করিয়া বেড়ান। উহাদিগের গৃহশিক্ষা নাই বলিলেই চলে। বেশীর ভাগ দুষ্কৃতকারীই দরিদ্র বা অসৎ-সঙ্গে লিপ্ত। আবার যে সকল দুষ্কৃতকারী ক্ষীণবুদ্ধিসম্পন্ন তাহাদের তিরস্কার, শাসন বা দণ্ডিত করিয়াও বিশেষ ফল হয় না। তাহারা সংযম শিক্ষা করিতে বা দুষ্কার্যের ফল বুঝিতে পারে না। ফলে উহাদের মধ্যে নৈতিক বা ন্যায়-অন্যায় বোধ বিকাশ লাভ করে না। হিলি, ব্রোনার প্রভৃতি বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে অধিকাংশ দুষ্কৃতকারী অস্বভাবী (Abnormal) বা মানসরোগগ্রস্ত (Pathological) নয়। নবযৌবনের চিত্তচাঞ্চল্য, মানসিক দ্বন্দ্ব, স্কুল এবং পেশার অসন্তোষজনক অবস্থা দুষ্ক্রিয়তার আংশিক

কারণ। কুমারী মাতীর অবশ্য মনে করেন যে দুষ্ক্রিয়তার প্রধান কারণ মানসিক অবস্থা বা রোগ।[১]

দুষ্ক্রিয়তার প্রতি মনোবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গী

মনোবিদ্যায় দুষ্কৃতকারীকে অপরাধী (Criminal) মনে না করিয়া মানসিকভাবে অসুস্থ বা রোগী বলিয়া মনে করা হয়। মনোবিদ্যার মতে দুষ্কৃতকারী ব্যক্তি যে পরিমাণে শাস্তির যোগ্য, তদপেক্ষা বেশী পরিমাণে চিকিৎসার যোগ্য। অপরাধ প্রবণতার কারণ কি তাহা অনুসন্ধান করিয়া উহার দূরীকরণই মনোবিদ্যার কাম্য।

দুষ্ক্রিয়তার প্রতিকার

দুষ্ক্রিয়তার প্রকারভেদ এবং উহার কারণ দেখানোই যথেষ্ট নয়। ইহার প্রতিকার কি এই প্রশ্নের উপর আলোকপাত করাই মনোবিদ্যার একটি প্রধান সমস্যা। প্রবৃত্তি বিপথগামী হইলেই উচ্ছৃঙ্খল আচরণ অথবা দুষ্ক্রিয়তা আসে। কিন্তু উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তির সুশৃঙ্খল চরিতার্থতাই মনোবিদ্যার কাম্য, উহাদের অবদমন নয়। দুষ্কৃতকারীরা সাধারণতঃ গৃহে, সমাজে এবং রাষ্ট্রে উপেক্ষিত এবং নির্যাতিতই হইয়া থাকে। উহাদিগকে বুঝিবার মত ধৈর্য এবং সহানুভূতির অভাব রহিয়াছে। মনোবিদ্যা উহাদের প্রতি ধৈর্যশীল এবং সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর পক্ষপাতী।

দুষ্কৃতকারিতার প্রতিকারে উহাকে নির্মমভাবে দমন না করিয়া ভুল পথ হইতে ঠিক পথে পরিচালিত করাই মনোবিদ্যার উদ্দেশ্য। এই কার্যে পিতা মাতা বা অভিভাবকের মনোযোগ একান্ত আবশ্যক।

সকল দুষ্কৃতকারীর জন্য একই শিক্ষা বা সংস্কার প্রণালীর ব্যবস্থা করা যায় না। ইহাদের অবস্থা অনুসারে পরিবর্তনীয় শিক্ষাব্যবস্থা প্রয়োজন। দুষ্কৃতকারিতার কারণ এত জটিল এবং ব্যক্তিভেদে উহার প্রকাশ এত বিচিত্র যে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রের কারণ এবং প্রতিকার এক প্রকার হইতে পারে না। দুষ্কৃতকারীকে নূতনভাবে এবং ঠিকপথে পরিচালিত করিবার ব্যাপারে বিদ্যালয় গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিতে পারে।

দশ বৎসর বয়সের পূর্বেই দুষ্কৃতকারিতার প্রতিকার এবং নূতনভাবে পরিচালনার উপযুক্ত সময়।

---

১ F. Mateer—The Unstable Child

১৫। বুদ্ধি এবং বৃত্তি বা পেশা

(Intelligence and Occupation)

ব্যক্তির বুদ্ধির সহিত তাহার বৃত্তি বা পেশার সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। বুদ্ধির তারতম্য অনুসারে পেশার যোগ্যতার তারতম্য ঘটে। **জড়ধী** কোনো পেশারই উপযুক্ত নয়। **ক্ষীণবুদ্ধি** ব্যক্তিরা শুধু যান্ত্রিক (mechanical) বা গতানুগতিক পেশার উপযুক্ত। এইসকল পেশায় শুধু নিয়মমাফিক কাজ করিয়া যাইতে হয়। আবার যাহাদের বুদ্ধি **স্বাভাবিক**, যাহাতে সাধারণ বুদ্ধি প্রয়োজন এমন পেশাই তাহাদের উপযোগী। যেমন, কেরানী অথবা সাধারণ শিক্ষক বা ব্যবসায়ীর কাজই উহাদের উপযুক্ত পেশা। ইহারা নূতন উদ্ভাবন করিতে পারে না, কিন্তু সাধারণভাবে দৈনন্দিন কাজ চালাইয়া যায় মাত্র।

উজ্জ্বলধী এবং **প্রতিভাবান** ব্যক্তিগণ নূতন উদ্ভাবন বা সৃষ্টিতে সক্ষম। তাহারা সেই সকল পেশার উপযুক্ত যাহাতে উদ্ভাবন বা সৃজনমূলক বুদ্ধির প্রয়োজন। যে সকল পেশায় বুদ্ধি কম লাগে, ইহারা তাহাতে উৎসাহ পায় না, অথবা অতি সহজে এবং তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করিয়া বাকী সময় নষ্ট করে। ফলে, তাহাদের বুদ্ধির যথাযোগ্য ব্যবহার সম্ভব হয় না।

সাফল্যাঙ্কের সহিত পেশার সম্বন্ধ

আমেরিকান আর্মি অ্যালফা অভীক্ষায় বিভিন্ন পেশা বা বৃত্তির সহিত পরবর্তী পৃষ্ঠায় প্রদত্ত সাফল্যাঙ্কের তারতম্য পাওয়া গিয়াছে।[১]

নিম্নলিখিত তালিকা হইতে মনে হয় যে হিসাবরক্ষক বা অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট্, সিভিল ইঞ্জিনীয়ার, স্টেনোগ্রাফার প্রভৃতি পেশাজীবী ব্যক্তিরাই বেশী বুদ্ধিমান, আবার কৃষক, সাধারণ কারিগর, কেরানী প্রভৃতি পেশাজীবীরা কম বুদ্ধিমান।

১ এফ, এন্, ফ্রীম্যান্—মেণ্টাল টেস্ট্স্, পৃঃ ৪০৫

বিভিন্ন পেশাজীবী পিতামাতার সন্তানদের বুদ্ধি

বিভিন্ন বৃত্তি বা পেশাজীবী পিতামাতার ৫৪৮টি শিশুর অভীক্ষা করিয়া প্রেসে (Pressey) এবং র‍্যালস্টন্ (Ralston) নিম্নরূপ সাফল্যাঙ্ক[১] পাইয়াছেন।

বৃত্তি	অভীক্ষিত লোকের সংখ্যা	সাফল্যাঙ্ক
কৃষক	৬৮৮৬	৪৮·৩
সাধারণ কারিগর	১২৫১	৬২·৮
রেলরাস্তার কেরানী	৩০৮	৯১·৪
পুস্তক-রক্ষক বা বুক-কীপার	৪৫৮	১০০·৯
হিসাব রক্ষক বা অ্যাকাউন্ট্যান্ট	২০২	১১৭·৯
স্টেনোগ্রাফার বা টাইপিস্ট	৪০২	১১৫·০
যান্ত্রিক ইঞ্জিনীয়ার	৪৫	১০৯·৭
সিভিল ইঞ্জিনীয়ার	৫৩	১·৬·৮

এই হিসাব অনুসারে ব্যবসায়ীদের সন্তানেরা বেশী বুদ্ধিমান এবং শ্রমিকের সন্তানগণ কম বুদ্ধিমান।

প্রতিভাবান শিশুদের পিতা কিরূপ হারে প্রতিভাবান এবং পিতার পেশা কি তাহা অনুসন্ধান করিয়া টার্ম্যান্ মূল্যবান তথ্য পাইয়াছেন। তিনি লস্ অ্যাঞ্জেল্স ও সান্‌ফ্রান্‌সিস্‌কো নিবাসী ১৪০ বা তদূর্ধ্ব বুদ্ধ্যঙ্ক-সম্পন্ন শিশুদের ৫৬০ জন পিতার পেশা এবং প্রতিভা নিম্নলিখিত হারে[২] শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছেন।

বাইর্ন্‌স্ (Byrns) এবং হেন্‌মন্ (Henmon) বিভিন্ন বৃত্তিজীবীদের সন্তান-দিগের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করিয়াছেন। তাঁহারা উইস্‌কন্‌সিন রাষ্ট্রের উচ্চ বিদ্যালয়গুলির এক লক্ষেরও অধিক উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রদের সাফল্যাঙ্ক লিপিবদ্ধ করিয়া বিভিন্ন পেশাজীবী পিতার সন্তানদের মধ্যে যথেষ্ট বিভিন্নতা পাইয়াছেন।

১ এফ্. এন্. ফ্রীম্যান—মেণ্টাল টেস্ট্‌স্, পৃঃ ৪০৫

২ এফ্., এন্. ফ্রীম্যান—মেণ্টাল টেস্ট্‌স্, পৃঃ ৪০৬

পিতার পেশা	শিশুর সাফল্যাঙ্ক
ব্যবসায়	৮৫
শাসনকার্য পরিচালনা	৬৮
কারিগর	৪১
শ্রমিক	৩৯

মোটের উপর বলা যায় যে কোনো কোনো পেশাজীবীর বুদ্ধ্যাঙ্ক অন্যান্য পেশাজীবীর তুলনায় উচ্চ এবং বিভিন্ন পেশাজীবীর সন্তানগণ বুদ্ধিবৃত্তিতে তাহাদের

পেশার শ্রেণীভেদ	প্রতিভাবান শিশুর পিতার শতকরা কতজন ঐ পেশাজীবী	জনসংখ্যার শতকরা কতজন ঐ পেশাজীবী	প্রতিভাবান পিতাদের প্রতিভাবান সন্তানের শতকরা হার
ব্যবসায়ী শ্রেণী	২৯.১	২.৯	১০০.৩
চাকুরীজীবী শ্রেণী	৪.৫	৩.৩	১৩৭
বাণিজ্যিক শ্রেণী	৪৬.২	৩৬.১	১২৮
শিল্পী শ্রেণী	২০.২	৫৭.৭	৩৫

পিতাদের মত বিভিন্ন। ইহার একটি কারণ হইতে পারে এই যে উচ্চতর কাজে সাধারণতঃ উচ্চবুদ্ধি-সম্পন্ন এবং নিম্নতর কাজে নিম্নবুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তিরা নিযুক্ত হইয়া থাকে। অর্থাৎ পেশানির্বাচন বুদ্ধির কারণ না হইয়া বুদ্ধিই পেশানির্বাচনের কারণ হইতে পারে।

টার্ম্যান্ ও মেরিল্ আমেরিকান জনসাধারণের বুদ্ধি অভীক্ষা করিয়া পিতার জীবিকা অনুযায়ী শিশুদের গড় বুদ্ধির হার নির্ধারণ করিয়াছেন।

বুদ্ধি ও পেশার সম্বন্ধ

নিম্নের গবেষণা ফলগুলি হইতে বুদ্ধি ও পেশার সম্বন্ধ বিশেষ ঘনিষ্ঠ বলিয়া

প্রতিপন্ন হয়। স্বাধীন ব্যবসায়ী পিতাদের সন্তানগণ সাধারণতঃ সর্বোচ্চ বুদ্ধ্যঙ্কের অধিকারী হয় এবং সর্বনিম্ন বুদ্ধ্যঙ্ক হয় কৃষক, শ্রমিক, মজুর প্রভৃতির সন্তানদের। স্বাধীন ব্যবসায়ীর মত প্রকৃত শিক্ষক, ইঞ্জিনীয়ার, ডাক্তার, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতির সন্তানদের বুদ্ধ্যঙ্কও উচ্চ পর্যায়ের হইয়া থাকে।

পিতার জীবিকা	শিশুর গড় বুদ্ধির হার
স্বাধীন ব্যবসায়ী	১১৬
অর্ধস্বাধীন ব্যবসায়ী ও পরিচালক	১১১
কেরানী, নিপুণ কারিগর, খুচরা ব্যবসায়ী	১০৭
গ্রাম্য সম্পন্ন গৃহস্থ, কৃষক ইত্যাদি	৯৫
অর্ধশিক্ষিত কারিগর, ছোট অফিসের কেরানী, ছোট দোকানদার ইত্যাদি	১০৪
সামান্য শিক্ষিত শ্রমিক	৯৯
শহর ও গ্রামের দিন মজুর	৯৬

ফলে জীবিকা বা পেশা নির্বাচনে বুদ্ধি-অভীক্ষার প্রয়োজন স্বীকার করিতে হয়। যাহার বুদ্ধি যে পেশার উপযোগী, তাহাকে সেই পেশার জন্য নির্বাচন করা উচিত। নতুবা বুদ্ধি-সামর্থ্যের অযথা অপব্যয় অনিবার্য। প্রখর বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে দিনমজুরের কাজ অথবা সাধারণ-বুদ্ধি দিনমজুরকে কোনো কারখানায় পরিচালনার কাজ দেওয়া উচিত নয়।

পেশাপ্রার্থীর বুদ্ধি অভীক্ষা সাহায্যে নির্ণয় করিয়া দেখা উচিত। তাহা হইলেই সে কোন্ পেশার উপযুক্ত তাহা স্থির করা সহজ হয়।

১৬। প্রাপ্তবয়স্কদের বুদ্ধি-অভীক্ষা

১৬ বৎসরই সর্বোচ্চ মানস বয়স

প্রাপ্তবয়স্কদের বুদ্ধি কিরূপে নির্ণয় করা যাইতে পারে, ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। প্রাপ্তবয়স্কদের বুদ্ধ্যঙ্ক নির্ণয়ে মনে রাখিতে হইবে যে বুদ্ধি-অভীক্ষকগণ ১৬ বৎসরের পর প্রকৃত বুদ্ধির উন্নতিতে সাধারণতঃ বিশ্বাস করেন না। অর্থাৎ ব্যক্তির প্রকৃত বয়স

১৭ বৎসর হইতে আরম্ভ করিয়া যত বেশীই হউক না কেন, ঐ ক্রমিক বয়সকে ১৬ বৎসর বলিয়াই ধরিতে হইবে। ব্যক্তির মানস বয়সও অনির্দিষ্টভাবে বাড়ে না বা কমে না। বুদ্ধি-অভীক্ষকেরা মনে করেন যে স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্ন বয়স্ক ব্যক্তিদের মানস বয়স ১৬, অস্বভাবীদের ৩ হইতে আরম্ভ করিয়া ১১ এবং প্রতিভাবানদিগের ২০ হইতে ৩২ পর্যন্ত হইতে পারে।

কোনো স্বাভাবিকবুদ্ধি ব্যক্তির কালিক বা প্রকৃত বয়স ৩৬ হইলে, ধরিয়া লইতে হইবে যে তাহার প্রকৃত এবং মানস এই উভয় বয়সই ১৬, সুতরাং তাহার বুদ্ধ্যঙ্ক হইবে $\frac{১৬}{১৬} \times ১০০ = ১০০$।

কোনো জড়বুদ্ধি ব্যক্তির প্রকৃত বয়স ৩৫ হইলে, ধরিয়া লইতে হইবে যে উহা ১৬ এবং তাহার মানস বয়স হয়ত ৩, সুতরাং তাহার বুদ্ধ্যঙ্ক $\frac{৩}{১৬} \times ১০০ = ২০$।

আবার কোনো অতি প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির প্রকৃত বয়স ৩৬ হইলে, ধরিয়া লইতে হইবে যে উহা ১৬ এবং তাহার মানস বয়স হয়ত ২৪, সুতরাং তাহার বুদ্ধ্যঙ্ক হইবে $\frac{২৪}{১৬} \times ১০০ = ১৫০$।

উপসংহার

প্রশ্ন হইতে পারে যে ১৬ বৎসর বয়স্ক কিশোরের এবং পরিণত বয়স্ক ব্যক্তির মানস বয়স কিরূপে একই থাকিয়া যায়। ইহাদের উভয়েরই মানস বয়স ১৬ বলিয়া ধরিলে, ১৬ বৎসর বয়স্ক কিশোরের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করা হয় না কি? প্রকৃতই কি ১৬ বৎসরের পর মানস বিকাশ বন্ধ হইয়া যায়?

এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, পরিণত বয়স্ক ব্যক্তির মানস বয়স ১৬ বৎসর বয়স্ক কিশোরের তুলনায় এক থাকিলেও, বুদ্ধির বিকাশ বন্ধ হইয়া যায়, এইরূপ কোনো ইঙ্গিত করা হইতেছে না। বুদ্ধিবিকাশ দুই দিকে হইতে পারে। প্রথমটি হইল বুদ্ধির উচ্চতা বা গভীরতার বিকাশ এবং দ্বিতীয়টি উহার বিস্তার বা প্রসারের বিকাশ। অর্থাৎ প্রথমটি হইল আসল বুদ্ধিক্রিয়ার, যেমন বিচারশক্তি, ধারণা, মেধা প্রভৃতির বিকাশ এবং দ্বিতীয়টি হইল বুদ্ধি যে সকল বিষয়ে খাটানো হয়, তাহার সংখ্যা বা পরিমাণের বৃদ্ধি। প্রথমটি সাধারণতঃ ১৬ বৎসর বয়সেই পূর্ণ পরিণতি লাভ করে এবং পরবর্তী জীবনে বিশেষ পরিবর্তিত হয় না। দ্বিতীয়টি বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত বাড়িতে থাকে। বিষয়টি এই পরিচ্ছেদের নবম অনুচ্ছেদেও আলোচিত হইয়াছে।

অনুশীলনী (Exercise)

1. Distinguish between intelligence and intellect.

(Ans : pp. 195)

বুদ্ধি এবং ধী'র পার্থক্য প্রদর্শন কর।

2. How does general intelligence differ from special intelligence ?

(Ans : pp. 196-198)

সাধারণ বুদ্ধি এবং বিশেষ বুদ্ধির পার্থক্য কি ?

3. Define intelligence. Is intelligence one or many ?

(Ans : pp. 195-196 ; 198-199)

বুদ্ধির সংজ্ঞা নির্দেশ কর। বুদ্ধি কি এক, অথবা অনেক ?

4. Give a short history of the measurement of intelligence.

(Ans : pp. 200-205)

বুদ্ধি পরিমাপের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লেখ।

5. Distinguish between chronological and mental age. What is the I. Q. How is it calculated ? (Ans : pp. 202-204)

কালিক এবং মানস বয়সের পার্থক্য প্রদর্শন কর। বুদ্ধাঙ্ক কাহাকে বলে ? কিরূপে ইহার হিসাব করিতে হয় ?

6. What are the different grades of intelligence according to I.Q. ? How is intelligence normally distributed ?

(Ans : pp. 205-206)

বুদ্ধাঙ্ক অনুসারে বুদ্ধির বিভিন্ন স্তরগুলি কি কি ? বুদ্ধাঙ্কের স্বাভাবিক বণ্টন কিরূপ ?

7. Is the I. Q. constant ? If so, in what sense ?

(Ans : pp. 207-208)

বুদ্ধাঙ্ক অপরিবর্তনীয় কি ? যদি তাহা হয়, তবে কোন্ অর্থে ?

8. What is the course of development of intelligence ?

(Ans : pp. 208-209)

বুদ্ধির ক্রমবিকাশধারা কি ?

9. What is meant by horizontal and vertical intelligence ?

(Ans : pp 209-)

বুদ্ধির উচ্চতা এবং বিস্তার বলিতে কি বুঝায় ?

10. Give a short history of intelligence tests.

(Ans : pp. 209-212)

বুদ্ধি-অভীক্ষার ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা কর।

11. What do you mean by intelligence tests ? What do they measure ? (Ans : pp. 209-211)

বুদ্ধি-অভীক্ষা কাহাকে বলে ? উহা কি পরিমাপ করে ?

12. What is the Binet-Simon Scale ? What improvements have been sought to be made on it ? (Ans : pp. 212-216)

বিনে-সাইমন মানক কাহাকে বলে ? উহার উন্নতির চেষ্টাগুলি আলোচনা কর।

13. What are performance tests ? How do they differ from intelligence tests ? (Ans : pp. 216-217)

কৃতি-অভীক্ষা কাহাকে বলে ? বুদ্ধি-অভীক্ষার সহিত উহার পার্থক্য কি ?

14. Show how intelligence and conduct interact with each other.

(Ans : pp. 217-219)

বুদ্ধি এবং আচরণের সম্বন্ধ নির্ণয় কর।

15. Define delinquency. How does it differ from criminality ?

(Ans : pp. 219-220)

দুষ্ক্রিয়তা কাহাকে বলে ? ইহার সহিত অপরাধপ্রবণতার পার্থক্য কি ?

16. How is intelligence related to delinquency ?

(Ans : pp. 220-221)

বুদ্ধির সহিত দুষ্ক্রিয়তার সম্বন্ধ কি ?

17. How is delinquency caused ? What are its remedies ?

(Ans : pp. 220-221)

দুষ্ক্রিয়তার কারণ এবং প্রতিকার কি ?

18. Show how intelligence and occupation are related to each other. (Ans : pp. 222-225)

বুদ্ধির সহিত পেশার সম্বন্ধ নির্ণয় কর।

19. How would you measure the intelligence of the adult ?

(Ans : pp. 225-226)

কিরূপে বয়স্ক ব্যক্তির বুদ্ধি পরিমাপ করিতে হয় ?

একাদশ পরিচ্ছেদ

বেদনা (Feeling)

১। বেদনার সংজ্ঞা

ইন্দ্রিয়ের উদ্দীপনা হইতে উৎপন্ন সংবেদনের সুখ-দুঃখ অনুভূতিকে বেদনা (Sense-feeling) **বলে**। কিন্তু বেদনার এই সংজ্ঞায়, উহার সহিত যান্ত্রিক সুখ-দুঃখ সংবেদনের (organic sensations of pleasure and pain) পার্থক্য থাকে না। অথচ যান্ত্রিক সুখ-দুঃখ সংবেদন এবং সুখ-দুঃখ বেদনা পৃথক। মাথাব্যথার, পেটব্যথার, ফোড়ার বা ক্ষতের কষ্ট বা দুঃখ এবং সাধারণ সুস্থতা-সংবেদনের (common sensibility) সতেজ, সরল সুখ-বোধ আসলে বেদনা নয়, কিন্তু সংবেদন। পক্ষান্তরে মিষ্টান্ন বা কুইনাইনের স্বাদ সংবেদন হইতে উৎপন্ন সুখ বা দুঃখ অনুভূতি বেদনা, কিন্তু সংবেদন নয়।

বেদনা ও যান্ত্রিক সংবেদন

উপরোক্ত দুই শ্রেণীর সুখ-দুঃখ বোধের **সাদৃশ্য** এই যে উহারা উভয়েই সংবেদন হইতে উৎপন্ন। কিন্তু ইহাদের **পার্থক্য** এই যে (১) প্রথমটি **বিষয়গত** (objective) এবং দ্বিতীয়টি **মানসিক বা ব্যক্তিগত** (Subjective), (২) প্রথমটি শরীরের কোনো অংশে, যেমন মাথায়, পেটে, **স্থান নির্দেশ** করে, কিন্তু দ্বিতীয়টি করে না। (৩) তাহা ছাড়া, যান্ত্রিক সুখ-দুঃখের **আক্রমণাত্মক** লক্ষণ (aggressiveness) আছে, যাহার ফলে উহারা সবলে মনোযোগ অধিকার করে। কিন্তু সুখ-দুঃখ-বেদনার এই লক্ষণ নাই ; (৪) সুখ-দুঃখ সংবেদনের তুলনায় সুখ-দুঃখ বেদনা **অস্পষ্ট এবং ম্লান**। যান্ত্রিক দুঃখের **কামড়ানো, দপ্‌দপ্‌-করা** জাতীয় লক্ষণ আছে, যাহার ফলে উহা স্পষ্টভাবে অনুভূত হয়। কিন্তু সুখ-দুঃখ বেদনার এইরূপ স্পষ্টতা নাই ; (৫) সুখ-দুঃখ সংবেদন অপেক্ষাকৃত **সক্রিয়**, কিন্তু সুখ-দুঃখ বেদনা **নিষ্ক্রিয়**।

২। বেদনা এবং সংবেদন (Feeling and Sensation)

ইহাদের কোন্‌টি মৌলিক ?

হার্বার্ট স্পেন্সর, জন্ স্টুয়ার্ট মিল্, ডঃ এস. সি. মিত্র প্রভৃতি মনোবিদ্ বেদনাকেই সংবেদনের তুলনায় অধিকতর মৌলিক আখ্যা দিয়াছেন। ইহাদের মতে বেদনাই আদিম (primitive) বা মৌলিক (elementary) মানসপ্রবৃত্তি এবং অন্যান্য মানসবৃত্তি

বেদনারই বিকার। আবার কোনো কোনো মনোবিদ্ সংবেদনকেই বেদনার তুলনায় অধিকতর মৌলিক বা আদিম বলিয়া মনে করেন, যেমন হ্ব্ণ্ড্-এর প্রথম মত। তাঁহাদের মতে বেদনা স্বতন্ত্র মানসবৃত্তি নয়, কিন্তু সংবেদনেরই গুণ বিশেষ। তাঁহারা বেদনাকে সংবেদনের বেদনা-রাগে (feeling tone, hedonic tone) পরিণত করিয়াছেন।

হ্ব্ণ্ড্ (পরবর্তী মতে), কুল্পে, টিশ্‌নার প্রভৃতির মতে বেদনা এবং সংবেদন, এই দুইটিই সমানভাবে মৌলিক বা আদিম মানসবৃত্তি। সংবেদনের লক্ষণ বেদনার লক্ষণ হইতে স্বতন্ত্র। প্রথমটি বিষয়গত (objective), কিন্তু দ্বিতীয়টি পাত্রগত (subjective)। তাহা ছাড়া, সংবেদনের যেমন প্রকার, পরিমাণ, তীব্রতা, স্থায়িত্ব, বিশদতা প্রভৃতি নিজস্ব গুণ আছে, বেদনারও তেমন নিজস্ব গুণ রহিয়াছে, যথা, প্রকার, পরিমাণ, তীব্রতা এবং স্থায়িত্ব।

সুতরাং বেদনা এবং সংবেদন **সমান মৌলিক**। ইহাদের একটিকে অপরটির বিকার বা গুণ বলিয়া মনে করা অসঙ্গত।

বেদনা এবং সংবেদনের পার্থক্য

সংবেদন এবং বেদনা ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ। সংবেদনহীন বেদনা অথবা বেদনাহীন সংবেদন নাই। কিন্তু উহাদের পার্থক্যও উল্লেখযোগ্য।

(১) সংবেদন চেতনার **বিষয়গত** এবং বেদনা **ব্যক্তিগত** বা মানসিক দিক। অর্থাৎ, সংবেদন উহার বিষয়ের জ্ঞান বহন করিয়া আনে, কিন্তু বেদনা ব্যক্তির নিজস্ব অবস্থার জ্ঞান বহন করে। (২) সংবেদনের দেশাভিজ্ঞান বা **স্থানীয় নির্দেশ** থাকে, কিন্তু বেদনার থাকে না। (৩) বিভিন্ন সংবেদন **একইকালে** অনুভূত হইতে পারে—যেমন মিষ্টান্নের সুমিষ্ট স্বাদ, সুগন্ধ, কোমল স্পর্শ এবং দর্শন, এই বিভিন্ন সংবেদনগুলি একসঙ্গে ঘটিতে পারে। কিন্তু সুখ-দুঃখ একই সময়ে ঘটিতে পারে কিনা সন্দেহ। (৪) সংবেদনের মধ্য বেদনার **দ্বিপ্রান্তিকতা** (bipolarity) নাই। সুখ-দুঃখ, একটি অপরটির বিপরীত, যাহার ফলে একটিকে অপরটিতে পরিণত করা যায় না। কিন্তু সাদা এবং কালো সংবেদনের মধ্যে বৈপরীত্য থাকিলেও, একটিকে অপরটিতে পরিণত করা যায়। (৫) একই উদ্দীপকের **পুনরাবৃত্তি** করিলে, সংবেদন চেতনার একটি অংশ হইয়া দাঁড়ায়, কিন্তু বেদনা ক্রমে ক্রমে দুর্বল হইয়া বিলুপ্ত হয়। (৬) সংবেদনের **প্রতিরূপ** সাহায্যে স্মরণ হয়। কিন্তু বেদনার প্রতিরূপ নাই, সুতরাং ইহার স্মরণ হইতে পারে না। (৭) হেফ্‌ডিং বলিয়াছেন

যে যদিও সংবেদন এবং বেদনা এই উভয়েরই **আপেক্ষিকতা** (Relativity) আছে, **অনুষঙ্গ** নিয়ম শুধু সংবেদনেই প্রযোজ্য। একটি সংবেদন অপর একটি সংবেদনের সহিত **অনুষক্ত** হইতে পারে, যাহার ফলে, একটি অপরটিকে স্মরণ করাইয়া দেয়। কিন্তু একটি বেদনার সহিত আর একটির এমন **অনুষঙ্গ** স্থাপিত হয় না, যাহার ফলে একটি অপরটিকে **স্মরণ** করাইয়া দিতে পারে। বেদনা বেদনাকে স্মরণ করাইয়া দিতে পারে শুধু ভাব বা ধারণার মধ্যস্থতায়। (৮) সংবেদনের মত বেদনারও **জাতি, পরিমাণ, তীব্রতা এবং স্থায়িত্ব** আছে। কিন্তু সংবেদনের বিশদতা গুণটি বেদনায় নাই। (৯) **অভিনিবেশ** চেতনায় (attentive consciousness) সংবেদন এবং বেদনা বিভিন্ন স্থান অধিকার করে। সংবেদনে **অভিনিবেশ** সম্ভব, কিন্তু বেদনায় উহা সম্ভব নয়। ফলে, সংবেদন স্পষ্ট ও বিশদ, কিন্তু বেদনা অস্পষ্ট এবং অবিশদ চেতনা।

৩। বেদনার প্রকার ও মাত্রাভেদ

(১) প্রচলিত একমাত্রাত্মক (Uni-Dimensional) মতবাদ

বেদনার প্রকারভেদ লইয়া মতভেদের অন্ত নাই। প্রচলিত মনোবিদ্যার মতানুসারে বেদনা দুই প্রকার—যথা সুখ এবং দুঃখ। সুখ এবং দুঃখই বেদনার দুইটি জাতি বা প্রকার। এমন কোনো বেদনা নাই যাহা এই দুইটির একটিতে অন্তর্ভুক্ত নয়। ইহারা যেমন জাতিতে বা প্রকারে পৃথক, তেমন পরিমাণ, তীব্রতা, **স্থায়িত্বেও** ভিন্ন হইতে পারে। যেমন একটি রসগোল্লা খাইবার সুখের তুলনায় দুইটি রসগোল্লা খাইবার সুখের পরিমাণ বেশী। আবার মৃদু মিষ্টান্নভোজনসুখের তুলনায় তীব্র মিষ্টান্নভোজনসুখ অধিক তীব্র। অল্পকাল স্থায়ী সঙ্গীতশ্রবণের সুখ হইতে দীর্ঘকালস্থায়ী সঙ্গীতশ্রবণের সুখ অধিক স্থায়ী। কিন্তু সুখ-দুঃখের **বিশদতা** বা স্পষ্টতা নাই। ইহারা অবিশদ অথবা অস্পষ্ট।

বেদনার উপরোক্ত মতকে একমাত্রাত্মক মতবাদ বলা যাইতে পারে, কারণ এই মতানুসারে বেদনা একই সরল রেখার এক প্রান্তে স্থিত সুখ হইতে এবং অপর প্রান্তে স্থিত দুঃখ পর্যন্ত, অথবা বিপরীত ক্রমে, একই দিকে পরিবর্তিত হয়।

(২) দ্বিমাত্রাত্মক (Bi-Dimensional) মতবাদ

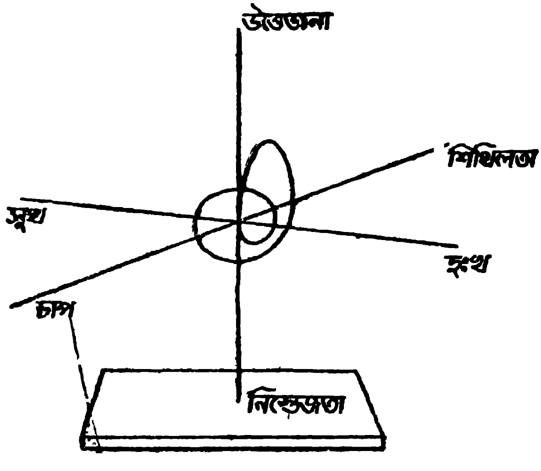
কিন্তু প্রচলিত একমাত্রাত্মক মতবাদের বিরুদ্ধে রয়েস্ (Royce) বেদনার **দ্বিমাত্রাত্মক** মত সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহার মতে বেদনার পরিবর্তন দুই দিকে পরিচালিত হয়—প্রথমটি **সুখ-দুঃখ** মাত্রায় এবং অপরটি **স্থিরতা-অস্থিরতা** মাত্রায়।

(৩) ত্রিমাত্রাত্মক (Tri-Dimensional) মতবাদ

হ্বুণ্ড্ বেদনার ত্রিমাত্রাত্মক মত (Tri-Dimensional Theory) উপস্থাপিত করিয়াছেন। তাঁহার মতে **সুখ দুঃখ** একমাত্র মৌলিক বেদনা নয়, কিন্তু জোড়াবদ্ধ এই দুইটি বেদনা ছাড়াও, দুই জোড়ায় আরও চারটি মৌলিক বেদনা রহিয়াছে, যথা **উত্তেজনা-নিস্তেজতা** (excitement-depression) এবং **চাপ-উপশম** (strain-relief)। হ্বুণ্ড্ বলেন যে বেদনার পরিবর্তন তিন দিকে সাধিত হয়। প্রথম মাত্রাটির এক প্রান্তে সুখ এবং অপর প্রান্তে দুঃখ, দ্বিতীয় মাত্রাটির এক প্রান্তে উত্তেজনা এবং অপর প্রান্তে নিস্তেজতা এবং তৃতীয় মাত্রাটির এক প্রান্তে চাপ এবং অপর প্রান্তে উপশম বা শিথিলতা বোধ রহিয়াছে।

নীচের রেখাচিত্রটিতে হ্বুণ্ড্ প্রদর্শিত বেদনার গতি দেখানো হইয়াছে। বেদনা আরম্ভ হয় উত্তেজনা এবং দুঃখের সংমিশ্রণে এবং উহার সহিত চাপ বেদনা শীঘ্রই সংযোজিত হয়। এই উত্তেজনা-দুঃখ-চাপ বেদনা সুখ এবং নিস্তেজতা বেদনায় পরিচালিত হয় এবং উহাতে শিথিলতা বেদনারাগ দেখা দেয়। এইরূপে বেদনার গতি শেষ হয় নিরপেক্ষ-বিন্দুতে (indifference point), যে স্থান হইতে উহার সূত্রপাত হইয়াছিল।

হ্বুণ্ড্ বলেন যে পাত্রগণের নাড়ী ও নিশ্বাস-প্রশ্বাসের গতি নিশ্চিতভাবে এই ত্রিমাত্রাত্মক বেদনার সমর্থন করে। চাপ নাড়ীর গতিশক্তি ও গতিহার এবং নিশ্বাসপ্রশ্বাসের গভীরতা ও হার কমাইয়া দেয়, কিন্তু **উপশম বা শিথিলতা** এই চারটিরই বৃদ্ধি ঘটায়। **উত্তেজনায়** নাড়ীর গতিশক্তি বাড়ে, উহার



২৬—নং চিত্র হ্বুণ্ড্-এর ত্রিমাত্রাত্মক বেদনার গতিচিত্র

গতিহার অপরিবর্তিত থাকে, শ্বাসপ্রশ্বাসের গভীরতা এবং হার বাড়িয়া যায়, কিন্তু **নিস্তেজতায়** নাড়ীর গতিশক্তি কমিয়া যায়, যদিও উহার গতিহার অপরিবর্তিত থাকে এবং শ্বাসপ্রশ্বাসের গভীরতা এবং হার কমিয়া যায়। আবার **সুখে** নাড়ীর গতিশক্তি বাড়ে, যদিও উহার হার কমে, শ্বাসপ্রশ্বাসের গভীরতা কমে এবং হার বাড়ে; কিন্তু **দুঃখে** নাড়ীর শক্তি কমিয়া এবং উহার হার বাড়িয়া যায়, আবার শ্বাস-প্রশ্বাসের গভীরতা বাড়িয়া উহার হার কমিয়া যায়।

হ্বুণ্ড্-এর ত্রিমাত্রাত্মক বেদনা মতবাদের সমালোচনা

কিন্তু হ্বুণ্ড্-এর মত এবং তাঁহার প্রয়োগলব্ধ ফল অনেক মনোবিদ্ গ্রহণ করেন নাই। যেমন, **টিশ্নার** দেখাইয়াছেন যে চাপ-শিথিলতা এবং উত্তেজনা-নিস্তেজতা এই চারটি বেদনা আসলে যৌগিক, মৌলিক নয়। তাঁহার মতে ইহারা 'সাধারণ সংবেদন' (Coenaesthesis), চেষ্টা-বেদন (Kinaesthesis) এবং সুখ-দুঃখ বেদনা দ্বারাই ব্যাখ্যাত হইতে পারে। সুতরাং তিনি বলেন যে সুখ-দুঃখ, এই দুইটিই মাত্র মৌলিক বেদনা।

হ্বুণ্ড্-বর্ণিত শ্বাসপ্রশ্বাস এবং নাড়ীর শক্তি ও গতিহার এবং শ্বাসপ্রশ্বাসের গভীরতা ও হারের প্রভাব নিম্নপ্রদর্শিত তালিকা হইতে বুঝা যাইবে :—

	নাড়ীর শক্তি	নাড়ীর গতির হার	শ্বাসপ্রশ্বাসের গভীরতা	শ্বাসপ্রশ্বাসের হার
হ্রাসপ্রাপ্ত হয়	চাপ, নিস্তেজতা দুঃখ	চাপ, সুখ	চাপ, নিস্তেজতা সুখ	চাপ, নিস্তেজতা, দুঃখ
অপরিবর্তিত থাকে		উত্তেজনা নিস্তেজতা		
বর্ধিত হয়	শিথিলতা উত্তেজনা, দুঃখ	শিথিলতা দুঃখ	শিথিলতা, উত্তেজনা, দুঃখ	শিথিলতা, উত্তেজনা সুখ

মনোবৈজ্ঞানিক কারণে হ্বুণ্ড্-এর মত যে **সঙ্গত নয়** তাহা দেখানো হইল। কিন্তু এই মতটি যে **যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়** টিশ্নার তাহাও দেখাইয়াছেন। (১) প্রথমত, এই মতে উদ্দীপকের তীব্রতা, জাতি এবং স্থায়িতা অনুসারে যথাক্রমে সুখ-দুঃখ, উত্তেজনা-নিস্তেজতা এবং চাপ শিথিলতা, এই তিনটি বেদনার মাত্রা রহিয়াছে। কিন্তু উদ্দীপকের পরিমাণ বা দৈশিক গুণ অনুসারে বেদনার একটি চতুর্থ মাত্রা না থাকায়, হ্বুণ্ড্-এর বেদনা-বিভাগ যুক্তির দিক দিয়া **অসম্পূর্ণ**

রহিয়া গিয়াছে। (২) দ্বিতীয়তঃ, উত্তেজনা-নিস্তেজতা এবং চাপ-শিথিলতা মাত্রা দুইটি সুখ-দুঃখ মাত্রার সহিত **একই নিয়মে কল্পিত হয় নাই**। শিথিলতা চাপের নিম্নতম স্তর। উহাদের বৈপরীত্য নাই। আবার, নিস্তেজতাও উত্তেজনার ঠিক বিপরীত নয়। অপর পক্ষে, সুখ ও দুঃখ একটি অপরটির সম্পূর্ণ বিপরীত। (৩) তৃতীয়তঃ, **উড্‌ওয়ার্থ** বলিয়াছেন, বেদনার মাত্রা যে ঠিক তিনটিই হইবে, এমন কারণ নাই। তিনটি মাত্রার অতিরিক্ত বেদনার একটি চতুর্থ মাত্রাও থাকিতে পারে, যেমন পরিচিত-অপরিচিত বোধ।

৪। বেদনার স্বরূপ (Nature of Feeling)

সংবেদনজ অনুভূতি বা বেদনার প্রধান ধর্মগুলি নিম্নে উল্লিখিত হইল।

(১) সাধারণতঃ সংবেদন হইতেই বেদনা উদ্ভূত হয়। কিন্তু বেদনার ভিত্তিস্থানীয় সংবেদন স্পষ্ট বা বিশিষ্ট নয়—ইহা **সংবেদনপিণ্ড** বিশেষ। (২) বেদনা সংবেদনের গুণ বা বিকার নয়। ইহা সংবেদনের মতই একপ্রকার **মৌলিক** চেতনা। (৩) বেদনা ব্যক্তিগত বা **মানসিক** (Subjective); সংবেদনে যেমন বিষয়নির্দেশ (objective refererence) থাকে বেদনায় তেমন থাকে না। লাল রং দেখিয়া শিশুর সুখ হইল। এই স্থলে 'দেখা' রূপ সংবেদনটি লাল রং রূপ বিষয়কে নির্দেশ করে। কিন্তু সুখবেদনা নির্দেশ করে শিশুর মানস অবস্থাকে। অবশ্য বেদনার এই ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য বা মানসিকতা বুঝায় না যে ইহার বিষয় নাই, কিন্তু বুঝায় যে বিষয়ের প্রতি বেদনার ততটা নির্দেশ নাই, যতটা আছে মানসিক অবস্থার প্রতি। (৪) একই বস্তুর সংবেদন স্বভাবতঃ একই প্রকারের হইয়া থাকে—যেমন শব্দের বা আলোকের সংবেদন। কিন্তু **একই বস্তু বা বিষয় বিপরীত বেদনা ঘটাইতে পারে**। যেমন একই সঙ্গীত কাহারও মনে সুখ, আবার কাহারও মনে দুঃখ জন্মাইতে পারে। (৫) সংবেদনের বিষয় সর্বজনগ্রাহ্য। যেমন একটি আলোক একসঙ্গে একাধিক ব্যক্তি দেখিতে পারে। কিন্তু বেদনার **সর্বজন-গ্রাহ্যতা নাই**। একই আলোক দেখিয়া বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন প্রকারের বেদনা ঘটিতে পারে। (৬) বেদনা অল্পাধিক **নিষ্ক্রিয়** (passive); সংবেদনে যেমন ইন্দ্রিয়কে বিষয়ের সহিত সংযুক্ত করিবার জন্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অভিযোজন (adaptation) আবশ্যক হয়, বেদনায় তেমন হয় না। বেদনা পরিহারের বা লাভের চেষ্টায় ক্রিয়া বা ইচ্ছা উৎপন্ন হইতে পারে। কিন্তু নিজস্বভাবে বেদনায় সক্রিয়তা নাই। অবগতিমূলক এবং ইচ্ছামূলক মানসবৃত্তির তুলনায় বেদনা নিষ্ক্রিয়।

কিন্তু ম্যাকুডগাল, উড্‌ওয়ার্থ্‌ প্রভৃতি মনোবিদ্‌গণ বেদনাকে সক্রিয় মানসবৃত্তি বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের মতে বেদনায় সুখকর বস্তু লাভ করিবার এবং দুঃখকর বস্তু পরিহার করিবার প্রতিন্যাস (attitude) এবং প্রবণতা (tendency) থাকে। কিন্তু প্রতিন্যাস বা প্রবণতা বাস্তবভাবে সক্রিয় মানসবৃত্তি নয়, ক্রিয়ার প্রস্তুতি বিশেষ। প্রতিন্যাস বা প্রবণতাকে বাস্তব কার্যে পরিণত করিতে বেদনা অক্ষম। সুতরাং বেদনাকে সক্রিয় মানসবৃত্তি বলা চলে না

(৭) বেদনায় অল্পাধিক শারীরিক ও মানসিক উত্তেজনা ঘটে। বেইন্‌-এর (Bain) মতে চাঞ্চল্য বা উত্তেজনাই বেদনার বিশেষ লক্ষণ। বেদনায় আভ্যন্তরীণ শারীরযন্ত্রগুলির সর্বাঙ্গীন পরিবর্তন ঘটে।

(৮) হেফ্‌ডিং (Hoffding) দেখাইয়াছেন যে অন্যান্য মানসবৃত্তির মত বেদনায়ও আপেক্ষিক সূত্র (Law of Relativity) কাজ করে। বেদনা শারীরিক এবং মানসিক অবস্থার তুলনায় অনুভূত হইয়া থাকে। যেমন একই সঙ্গীত কাহারও মনে সুখ, আবার কাহারও মনে দুঃখ জন্মাইতে পারে। আশা, নৈরাশ্য, উদ্বেগ প্রভৃতি অবস্থাগুলি বেদনাকে প্রভাবিত করে। বস্তুর নূতনত্ব অথবা পরিবর্তনও বেদনার উপর প্রভাব বিস্তার করে।

৫। বেদনা ও প্রক্ষোভ (Feeling and Emotion)

অনুভূতি দুই প্রকার—সংবেদনজ বা বেদনা অনুভূতি (sense-feeling) এবং ভাবজ বা প্রক্ষোভ অনুভূতি (ideal feeling, emotion)।

বেদনা ও প্রক্ষোভের সাদৃশ্য এই যে (১) উহারা উভয়েই সুখ-দুঃখাত্মক; (২) উহারা উভয়েই সংবেদন এবং প্রত্যক্ষের ফল; (৩) উহারা উভয়েই অল্পাধিক ব্যক্তিগত বা মানসিক এবং নিষ্ক্রিয় মানসবৃত্তি; (৪) আবার দুইটিতেই শারীরিক এবং মানসিক উত্তেজনা থাকে।

কিন্তু উহাদের পার্থক্য গুরুত্বপূর্ণ। (১) বেদনা এবং প্রক্ষোভ সংবেদন বা প্রত্যক্ষ হইতে উদ্ভূত হইলেও দ্বিতীয়টি প্রথমটির তুলনায় জটিল। বেদনার কারণভূত সংবেদন বাস্তব জগতের একটি বস্তুর সহিত সম্বদ্ধ, কিন্তু প্রক্ষোভের কারণভূত সংবেদন বাস্তব জগতের কোনো সমগ্র পরিস্থিতির (whole situation) সহিত সম্পর্কিত। যেমন ক্লান্তি, তৃষ্ণা এবং উত্তাপবোধের দুঃখবেদনা ইঙ্গিত করে বিশ্রাম, জল এবং বাতাস। কিন্তু ভয় প্রক্ষোভ বুঝায় সম্মুখস্থ ভয়ের বস্তুকে, নিজ অসহায়তাকে, পলায়নের অসম্ভাব্যতাকে, আসন্ন দুঃখ প্রভৃতিকে, অর্থাৎ একটি সমগ্র পরিস্থিতিকে।

(২) বেদনা প্রক্ষোভের তুলনায় **স্থূল** এবং প্রক্ষোভ বেদনার তুলনায় **সূক্ষ্ম** মনোবৃত্তি। বেদনার মূলে রহিয়াছে সংবেদন বা প্রত্যক্ষ। কিন্তু প্রক্ষোভের মূলীভূত কারণ ধারণা বা ভাবও (idea) হইতে পারে। একা, অন্ধকারে বনের ভিতর দিয়া যাইতে দস্যু, ব্যাঘ্র বা সর্প প্রভৃতির ভয় হয়। এই ক্ষেত্রে ভয়ের কারণ প্রত্যক্ষ ব্যাঘ্রাদি নয়, কিন্তু উহাদের প্রতিরূপ বা ধারণা। অপর পক্ষে স্থূল সুখ বা দুঃখ-বেদনার কারণ বাস্তব সংবেদন বা প্রত্যক্ষ, কিন্তু প্রতিরূপ বা ধারণা নয়।

(৩) যেহেতু প্রক্ষোভ বেদনার তুলনায় জটিল, দ্বিতীয়টির তুলনায় প্রথমটির **দৈহিক প্রকাশ** স্পষ্ট। প্রক্ষোভে নাড়ীর, শ্বাসপ্রশ্বাসের, দেহ-বিস্তারের এবং পেশীর শক্তি, বেদনার তুলনায় অধিক। তাহা ছাড়া, প্রক্ষোভে দেহের আভ্যন্তরীণ অঙ্গসকল বেদনার তুলনায় বেশী সক্রিয় হয়।

৬। বেদনার সর্ত বা নিয়ম
(Conditions of Pleasure and Pain)

বেদনা নিম্নলিখিত সর্ত বা নিয়মগুলির অধীন :—

(১) **উদ্দীপনা-সংক্রান্ত নিয়ম** (**Law of Stimulation**)

বেদনা ইন্দ্রিয়ের উদ্দীপনাজনিত সংবেদন বা প্রত্যক্ষ হইতে উৎপন্ন হয়। বেদনার মূলে উদ্দীপকের সক্রিয়তা আবশ্যক। কোনো উদ্দীপক হয়ত চেতনার নিম্নসীমা (threshold) অতিক্রম করিলেই সুখজনক হয়। এই উদ্দীপকটি বাড়াইতে থাকিলে সুখবেদনাও বাড়িতে থাকে। উহাকে আরও বাড়াইলে একটি নিরপেক্ষ (neutral) অনুভূতি এবং আরও বাড়াইলে হয়ত দুঃখবেদনা উপস্থিত হয়।

উদ্দীপনা-সংক্রান্ত নিয়মটি এই :—**সুখকর উদ্দীপক মধ্যমপরিমাণের তীব্রতা-বিশিষ্ট** (stimulus of moderate intensity) **হইলে সুখ উৎপন্ন করে, কিন্তু অত্যন্ত কম বা বেশী তীব্রতাবিশিষ্ট হইলে, দুঃখ উৎপন্ন করে।** যেমন অত্যন্ত অস্পষ্ট বা অতি তীব্র আলোক দর্শন কষ্টকর এবং মাঝারি তীব্র আলোক দর্শন সুখকর হইয়া থাকে। আবার, উচ্চ বা অস্পষ্ট স্বর, তীব্র বা মৃদু স্বাদ ও গন্ধ, এবং কর্কশ বা পিচ্ছিল স্পর্শ দুঃখকর হয়। কিন্তু এইগুলি মধ্যম পরিমাণের হইলে সুখকর হইয়া থাকে। হ্বুণ্ড্-প্রদর্শিত এই নিয়মটিকে সর্বাংশে সত্য বলা যায় না। ইহার ব্যতিক্রম হইতে পারে। যদিও এই নিয়মটি সুখদায়ক উদ্দীপকের বেলায় খাটে, ইহা দুঃখদায়ক উদ্দীপকের বেলায় খাটে কিনা সন্দেহ। দুঃখদায়ক উদ্দীপকের তীব্রতা যে পরিমাণেরই

হউক না কেন, উহা দুঃখ উৎপন্ন করে। যেমন, মৃদু, মধ্যম বা তীব্র, প্রত্যেক পরিমাণে কুইনাইন সেবনই দুঃখজনক হয়। সুতরাং সুখ-দুঃখ-বেদনা শুধু উদ্দীপকের উপর নির্ভর করে না, কিন্তু উহার **জাতির** উপরও নির্ভর করে।

(২) পরিবর্তন সংক্রান্ত নিয়ম (Law of Change)

বেদনা আপেক্ষিক। উহা মানস এবং শারীর অবস্থার পরিবর্তনের উপর নির্ভর করে। পরিবর্তন বা নূতনত্ব যেমন মনোযোগ আকর্ষণ করে, তেমন সুখ-বেদনারও কারণ হয়। একই গানের রেকর্ড অনবরত বাজাইতে থাকিলে, উহাতে সুখ বা দুঃখ বিলুপ্ত হইয়া ঔদাসীন্য আসে। প্রত্যহ আহার করিলে, একই সুস্বাদু খাদ্য সুস্বাদু লাগে না। আবার ঐ গানের বা খাদ্যের ফাঁকে ফাঁকে অন্য গান বা খাদ্য অনুপ্রবিষ্ট হইলে, উহার সুখদায়কতা বজায় থাকে। পরিবর্তনই চেতনার সঞ্জীবনী শক্তি। একঘেয়েমি (monotony) ইহাকে নির্জীব বা প্রাণহীন করিয়া তোলে। একই উদ্দীপকের ক্রিয়া নার্ভতন্ত্রের জড়তা (inertia) ঘটায় এবং পরিবর্তনের ফলে উহার সক্রিয়তা ফিরিয়া আসে। তাহা হইলে, বেদনার পরিবর্তন সংক্রান্ত নিয়মটি এই :—**উদ্দীপনার পরিবর্তন বা বৈচিত্র্য সুখদায়ক, পক্ষান্তরে উহার একঘেয়েমি বা নিরন্তরতা দুঃখদায়ক।**

কিন্তু এই নিয়মটির **ব্যতিক্রম** আছে। পরিবর্তন বা বৈচিত্র্য যে সুখকর তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সকল পরিবর্তনই সুখকর নয়। আকস্মিক পরিবর্তন সুখের পরিবর্তে দুঃখ ঘটায়, কারণ এইরূপ পরিবর্তনের সহিত অভিযোজন অসম্ভব হয়। যেমন, একটি সুন্দর দৃশ্য দেখিতে না দেখিতেই যদি আর একটি উহার স্থান গ্রহণ করে, তাহা হইলে চক্ষু কোনো দৃশ্যেই অভিযোজিত হইতে না পারিয়া দুঃখ বা পীড়া বোধ করে। দ্বিতীয়তঃ, সুখকর অবস্থা দুঃখকর অবস্থায় পরিবর্তিত হইলেও, দুঃখকর অবস্থাটি আরও বেশী দুঃখকর অনুভূত হয়। সুতরাং উদ্দীপকের পরিবর্তন হইলেই হইল না। সুখবেদনা তখনই ঘটে যখন পরিবর্তনটি একটি সুখকর অবস্থা হইতে আর একটি সুখকর অবস্থায়, অথবা একটি দুঃখকর অবস্থা হইতে সুখকর বা কম দুঃখকর অবস্থায় পরিবর্তন ঘটে। তৃতীয়তঃ, নিশ্চলতা বা অপরিবর্তনীয়তা যে শুধু দুঃখই উৎপন্ন করে, তাহা নয়। দুঃখকর অবস্থার পুনরাবৃত্তির ফলে উহাই সুখকর হইয়া দাঁড়াইতে পারে। যেমন প্রত্যহ অন্নভোজনে বাঙালীর অরুচি নাই।

(৩) সামঞ্জস্য ও সংঘাত সংক্রান্ত নিয়ম

(Law of Harmony and Discord)

দৈনন্দিন জীবনে অসংখ্য উদ্দীপক এলোমেলোভাবে শরীর ও মনের উপর ক্রিয়া করে। গোলমাল বা কর্কশ আওয়াজ, নানা রঙের হিজিবিজি, অসমতল বা এবড়ো-খেবড়ো ভূমি, বিশৃঙ্খল ও অসংযত কাজ বা আচরণ, সুখকর হয় না। কোকিলের কুহুতান, তাল-মান-লয়যুক্ত সঙ্গীত, সুখকর হইয়া থাকে। প্রথম শ্রেণীর উদ্দীপকগুলি সংঘাতশীল। উহারা একটি অপরটিকে বাধা দিয়া পীড়াদায়ক হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর উদ্দীপকগুলি সুসমঞ্জস। উহারা একটি অপরটিকে সাহায্য করিয়া শরীর ও মনের একতানতা উৎপন্ন করে এবং সুখদায়ক হয়। তাহা হইলে সামঞ্জস্য ও সংঘাত সংক্রান্ত নিয়মটি এই :—

সামঞ্জস্যপূর্ণ বা মিলিত উদ্দীপক এবং ক্রিয়া সুখ উৎপন্ন করে, কিন্তু পরস্পরবিরোধী উদ্দীপক এবং ক্রিয়া, একটি আর একটির বাধা সৃষ্টি করিয়া দুঃখ উৎপন্ন করে।

৭। বেদনা সম্বন্ধে মতবাদ

(Theory of Pleasure and Pain)

উপরোক্ত নিয়মগুলি সুখ-দুঃখ-বেদনার অভিজ্ঞতা-প্রসূত সাধারণ বর্ণনা মাত্র। উহারা সুখ-দুঃখের মূল কারণ অথবা স্বরূপ ব্যাখ্যা করে না। অর্থাৎ, উহারা বেদনার তথ্যসম্বন্ধীয় নিয়ম, কিন্তু উহার তত্ত্বসম্বন্ধীয় নিয়ম নয়। সুখ-দুঃখ-বেদনার মূল কারণ বা তত্ত্ব সম্বন্ধে মতবাদগুলি প্রধানতঃ এই :—

(১) **মনোবৈজ্ঞানিক** (Psychological) **মতবাদ**

এই মতবাদটি সুখ-দুঃখ-বেদনাকে মানস কারণের কার্য হিসাব এবং ইহাকে মানসবৃত্তিরূপে ব্যাখ্যা করে। মনোবৈজ্ঞানিক মতবাদের কয়েকটি প্রকারভেদ উল্লেখযোগ্য—

(ক) **বুদ্ধিপ্রকারক** (Intellectual) **মতবাদ**

লাইব্‌নিজ বেদনাকে অস্পষ্ট ভাব বা ধারণা (confused ideas) বলিয়া মনে করেন। আবার হেগেল্‌-এর মতানুসারেও বেদনা একপ্রকার অস্পষ্ট জ্ঞান (implicit knowledge)। **অর্জ** যান্ত্রিক বেদনাকে সুস্থতাবোধ অথবা অসুস্থতা-বোধের আকারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আবার **ওয়েৎজ্**-এর মতে যান্ত্রিক বেদনা একপ্রকার দুর্বল সংবেদন যাহা চেতনায় স্পষ্টরূপে ভাসিয়া উঠিতে চেষ্টা করে। প্রথমোক্ত মত দুইটি মনো-

বৈজ্ঞানিক নয়, কিন্তু দার্শনিক। শেষোক্ত মত দুইটি মনোবৈজ্ঞানিক। কিন্তু উহারা বেদনাকে যান্ত্রিক সংবেদনে পরিণত করে। তাহা ছাড়া, উপরোক্ত সব মতবাদগুলিরই দোষ এই যে, উহারা বেদনাকে বুদ্ধি-ক্রিয়ার ফলরূপে গ্রহণ এবং উহার মৌলিকতা অস্বীকার করে।

মানস-যান্ত্রিক মতবাদ (Psycho-mechanical Theory)

বেদনার মানস-যান্ত্রিক মতবাদের ব্যাখ্যাতা **হার্বার্ট**। তাঁহার মতে বেদনা পরস্পর-বিরোধী ভাব বা ধারণার কার্য। ভাবনা একপ্রকার চাপ (strain) বা টান এবং বাধ (inhibition) সৃষ্টি করে। এই চাপ বা বাধ অতিক্রম করিয়া ভাবনাকে আত্মরক্ষা করিতে হয়। এই মতে পরস্পর-বিরোধী ভাবের সামঞ্জস্য হইলে সুখ এবং বিরোধ ঘটিলে দুঃখ জন্মে। কিন্তু এই মতও বেদনার মৌলিকতা অস্বীকার করে। কিন্তু বেদনা শুধু ভাবাত্মক বুদ্ধিক্রিয়া নয়। ইহাও একটি মৌলিক মানসবৃত্তি।

(খ) **ইচ্ছামূলক মতবাদ** (Conative Theory)

ওয়ার্ড মনে করেন যে বেদনা মনোযোগের ফল বা ক্রিয়া। বিষয়ে মনোযোগের সফল অভিযোজনে সুখ এবং বিফল অভিযোজনে দুঃখ উৎপন্ন হয়।

স্টাউট্ও বলেন যে বেদনা ইচ্ছার (conation) কার্য বা ফল। ইচ্ছা উদ্দেশ্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। "যে সকল অবস্থা উদ্দেশ্যসাধনে ইচ্ছার সহায়তা বা আনুকূল্য করে, তাহাই সুখদায়ক। আবার যে সকল অবস্থা ইচ্ছাকে উহার উদ্দেশ্যসাধনে বাধা দেয়, তাহাই দুঃখদায়ক হয়।" যেমন, গোলমাল একটি দুঃখ বা কষ্টসাধ্য অবস্থা, কারণ উহা ইচ্ছাশক্তিকে অথবা মনোযোগকে বিষয়ে নিবদ্ধ হইতে বাধা দেয়। কিন্তু নীরবতা সুখজনক, কারণ উহা ইচ্ছাশক্তি বা মনোযোগকে উহার বিষয়ে নিবদ্ধ হইতে সাহায্য করে। **সমালোচনায়** বলা যায় যে ওয়ার্ড এবং স্টাউট্ বেদনাকে ইচ্ছার কার্যরূপে ব্যাখ্যা করিতে গিয়া, ইহাকে গৌণ এবং ইচ্ছাকে মুখ্য বা প্রধান মানসবৃত্তিরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু বেদনা ইচ্ছার মতই একটি মৌলিক মানসবৃত্তি।

(গ) **বেদনা-বাদ** (Affective Theory)

উপরোক্ত মতবাদগুলি বেদনাকে জ্ঞান বা ইচ্ছার ফলরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছে। কিন্তু **মিল্, স্পেন্সর, ডঃ এস. সি. মিত্র** প্রভৃতি মনোবিদ্গণের মতে বেদনাই একমাত্র মৌলিক মানসবৃত্তি এবং বেদনা হইতেই সংবেদন, ভাব, ইচ্ছা প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়াছে। ডঃ মিত্র বলিয়াছেন, "বেদনা অথবা অনুভূতিই সেই আদিম মানসলক্ষণ যাহা হইতে, অথচ যাহাকে বাদ দিয়া, আর সব মানসবৃত্তি বিকাশলাভ করিয়াছে।"

টিশ্‌নার্‌ মনে করেন যে বেদনা এবং সংবেদন মূলতঃ একই প্রকার মানস উপাদান হইতে উদ্ভূত, কিন্তু ক্রমবিকাশের ধারায় উহারা পৃথক হইয়া যায়। ঐ একাকার মানস উপাদানের একটি অংশ বেদনা এবং আর একটি অংশ সংবেদন। বেদনা অংশটি যদি আরও অধিক বিকাশলাভ করিতে পারিত, তাহা হইলে উহা সংবেদনই হইয়া যাইত। কিন্তু বিকাশের অনুকূল অবস্থা লাভ করিতে না পারিয়া, উহা সংবেদন হইতে পৃথক বেদনারূপেই রহিয়া গিয়াছে।

সাধারণভাবে মনোবৈজ্ঞানিক মতবাদগুলির **সমালোচনায়** বলা যাইতে পারে যে উহারা বেদনাকে সম্পূর্ণভাবে মানসিক কারণ দিয়া ব্যাখ্যা করিতে চায়, কিন্তু উহার শারীর কারণকে উপেক্ষা করে। কিন্তু এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গী সঙ্কীর্ণ।

(২) **শারীরবৃত্তীয় মতবাদ** (Physiological Theory)

(ক) **অ্যারিস্টটল্‌** বলিয়াছেন যে প্রত্যেক অবয়বীর (organism) ভাণ্ডারে নির্দিষ্ট পরিমাণ শক্তি রহিয়াছে। এই শক্তির হ্রাসবৃদ্ধি নাই। ইহার **পরিমিত ব্যবহার** সুখজনক এবং অপরিমিত ব্যবহার দুঃখদায়ক। এই মতবাদের **সমালোচনায়** বলা যায় যে ইহা অস্পষ্ট। দ্বিতীয়তঃ, ইহাতে উল্লিখিত হয় নাই কি উদ্দেশ্যে শক্তির ব্যবহার হইলে সুখ বা দুঃখ হয়। কোনো অসদুদ্দেশ্যে শক্তির পরিমিত ব্যবহার হইলেও দুঃখ ঘটিতে পারে। আবার সদুদ্দেশ্যে শক্তির অপরিমিত ব্যবহারেও সুখ হইতে পারে।

(খ) **স্টাউট্‌** তাঁহার ইচ্ছামূলক মানসবাদের ভিত্তিতে বেদনার একটি শারীরবৃত্তীয় মতবাদও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে ইচ্ছামূলক ক্রিয়ায় নার্ভ-এর সাম্যাবস্থা (equilibrium) নষ্ট হইয়া যায়। যে ইচ্ছামূলক ক্রিয়ায় এই নার্ভীয় বৈষম্য দূর হয় অথবা উহার সাম্যাবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাই সুখকর এবং যাহাতে এইরূপ না হয়, তাহাই দুঃখদায়ক। স্টাউট্‌-এর এই মতবাদ তাঁহার মানস মতবাদের শারীর পরিপূরক হিসাবে প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু ইচ্ছামূলক ক্রিয়ার কাজই যদি হয় নার্ভীয় সাম্যাবস্থা নষ্ট করা, তবে অন্য ইচ্ছামূলক ক্রিয়া কিরূপে নষ্ট সাম্যাবস্থার পরিপূরণ করিবে তাহা ভাবিবার বিষয়।

উপরোক্ত দুইটি মতবাদকে বিশুদ্ধ শারীর মতবাদ বলা যায় না। প্রথমটি যেমন শারীর তেমন জৈবও বটে, কারণ অবয়বী শরীর ও প্রাণবিশিষ্ট জীব। আবার দ্বিতীয়টি মানস মতবাদের পরিপূরক।

(গ) বহিঃপ্রান্তিক শারীরবৃত্তীয় মতবাদ (Peripheral Physiological Theory)

এই মতে বহিঃপ্রান্তিক নার্ভগুলিতে একটি বিশেষ বেদনামূলক ক্রিয়া ঘটিয়া থাকে। এই নার্ভের পুষ্টির বা উহার অভাবের উপর যথাক্রমে সুখ এবং দুঃখ নির্ভর করে। প্রত্যেক উদ্দীপনায়ই নার্ভশক্তি ব্যয়িত হয়। উদ্দীপনায় নার্ভশক্তির ব্যয় কিভাবে বন্টিত হয় এবং কিভাবে এই ব্যয়িত শক্তির পরিপূরণ হয় তাহার উপর নির্ভর করে সুখ এবং দুঃখ বেদনা।

(ঘ) আন্তঃপ্রান্তিক বা কেন্দ্রীয় শারীরবৃত্তীয় মতবাদ (Central Physiological Theory)

এই মতে মস্তিষ্কের নার্ভক্রিয়া বেদনার মূল কারণ। মেনার্ট বলেন যে মস্তিষ্কের পুষ্টির বিভিন্ন অবস্থার উপর সুখদুঃখ বেদনা নির্ভর করে। যে নার্ভক্রিয়ায় মস্তিষ্কের পুষ্টি ব্যাহত হয়, তাহা দুঃখ এবং যাহাতে উহার পরিপূরণ হয় অথবা উহা অক্ষুন্ন থাকে, তাহা সুখ সৃষ্টি করে। হুন্ড্ বলিয়াছেন, সংবেদনের উপর সংপ্রত্যক্ষের (apperception) ক্রিয়াই সুখ দুঃখের নিয়ামক।

(ঙ) **ফেক্‌নার** বলেন যে সুখ এবং দুঃখ যথাক্রমে সুসমঞ্জস এবং সংঘাতপূর্ণ স্নায়ু-স্পন্দন হইতে উদ্ভূত হয়।

সমালোচনা প্রসঙ্গে বলা যায় যে (গ) এবং (ঘ) চিহ্নিত মতবাদ দুইটি বিশুদ্ধ শারীরবৃত্তীয় মতবাদ। কিন্তু শুধু নার্ভ বা মস্তিষ্কের পুষ্টি অনুসারে বেদনার ব্যাখ্যা আংশিক। বেদনার মানসরূপ এই ব্যাখ্যায় উপেক্ষিত। এই মতবাদ দুইটিকে বেদনার শারীর ব্যাখ্যারূপে গ্রহণ করা গেলেও, উহার মানস ব্যাখ্যারূপে গ্রহণ করা যায় না। শেষোক্ত (ঙ) মতবাদটিও সুখদুঃখের মানসরূপ ব্যাখ্যা করে না।

(চ) মানস-দৈহিক মতবাদ (Psycho-physical Theory)

বেদনার মানস অভিজ্ঞতার সহিত বিভিন্ন শারীর প্রকাশ-লক্ষণ দেখা যায়। বেদনার মানস অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে উদ্দীপক প্রতিবর্তভাবে কতকগুলি শারীর প্রকাশও ঘটাইয়া থাকে। যেমন, সুখদুঃখ বেদনার সঙ্গে সঙ্গে শ্বাস-প্রশ্বাস, নাড়ী-প্রবাহের গতি ও শক্তি পরিবর্তিত হয়। এই দিক দিয়া আভ্যন্তরীণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উদ্দীপনাজনিত সংবেদনগুলিই বেদনা।

এই মতবাদটি উইলিয়াম্ জেম্‌স্ এবং ল্যাঙ্গ প্রভৃতির গবেষণার সহিত জড়িত। ইহা

সন্তোষজনক নয়, কারণ ইহাতে বেদনার নিজস্ব মৌলিকতা নাই, কিন্তু ইহা যান্ত্রিক সংবেদনেরই নামান্তর।

(৪) **জৈব মতবাদ** (Biological Theory)

স্পিনোজা, কাণ্ট্, হার্বার্ট স্পেন্সর, বেইন প্রভৃতি সুখদুঃখ-বেদনাকে জৈব বা প্রাণশক্তির (vital energy) সহিত যুক্ত করিয়াছেন। সুখ প্রাণশক্তির বৃদ্ধি এবং দুঃখ উহার ক্ষয় বা হ্রাস সূচনা করে, অর্থাৎ সুখ জীবনীশক্তি বাড়াইয়া তোলে এবং দুঃখ উহাকে কমাইয়া দেয়। যেমন **কাণ্ট্** বলিয়াছেন, "সুখ জীবনীশক্তি বৃদ্ধির এবং দুঃখ জীবনীশক্তি ব্যাঘাতের অনুভূতি।" **স্পিনোজা** বলিয়াছেন, শক্তিপ্রসারণের বোধই সুখ এবং শক্তিসঙ্কোচের বোধই দুঃখ।

হার্বার্ট স্পেন্সর্ জৈব বিবর্তনের (biological evolution) তথ্য সাহায্যে তাঁহার মতবাদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যে সকল প্রাণী প্রাণশক্তির অনুকূল বস্তুতে সুখ পায় এবং উহার ক্ষতিকর বস্তুতে দুঃখ পায়, তাহারাই জীবন সংগ্রামে টিকিয়া থাকে এবং যাহারা ঐরূপ পায় না, তাহারা জীবনসংগ্রামে নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। **হিউম্** বলিয়াছেন, উদরী রোগীর তৃষ্ণা বাড়িলে রক্ষা নাই, কারণ জলপান তাহার প্রাণশক্তির পক্ষে ক্ষতিকর। **বেইন্** সুখের জীবনীশক্তিবৃদ্ধির এবং দুঃখের জীবনীশক্তিহ্রাসের সম্বন্ধকে তাঁহার আত্মসংরক্ষণ সূত্র সাহায্যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

জৈব মতবাদটির **সমালোচনায়** ইহার বাস্তব মূল্য অস্বীকার করা যায় না। সুখ যে সঞ্জীবনীশক্তি এবং উহা যে হৃদ্‌যন্ত্র, ফুসফুস, যকৃৎ প্রভৃতি আভ্যন্তরীণ যন্ত্রগুলির ক্রিয়াকে সবল ও সুস্থ করে, তাহা স্বীকৃত সত্য। আবার দুঃখ যে ইহার বিপরীত ফল উৎপন্ন করে, তাহাতেও সন্দেহ নাই। কিন্তু এই মতানুসারে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সত্য ব্যাখ্যা করা যায় না। মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়াও পতঙ্গ আগুনে ঝাঁপাইয়া পড়িতে সুখ পায়। মৃত্যু ত্বরান্বিত হইবে জানিয়াও উদরী রোগী পুনঃপুনঃ জলপান করিতে ইচ্ছা করে। নিশ্চিত মৃত্যুর পথে তিলে তিলে অগ্রসর হইয়াও ক্ষয়রোগী অসুখী বোধ করে না। তাহা ছাড়া, অনেক মারাত্মক বিষ পান করিতে সুস্বাদু এবং অনেক উপকারী ঔষধ সেবন কষ্টকর।

স্পেন্সর হয়ত বলিবেন যে প্রত্যেক নিয়মেরই ব্যতিক্রম থাকে এবং উপরোক্ত উদাহরণগুলি সাধারণ জৈববেদনাবাদের ব্যতিক্রম মাত্র। **স্টাউট্** দ্বিতীয় দৃষ্টান্তগুলিকে স্পেন্সর্ এর সমর্থনে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে বিস্বাদ বা মন্দস্বাদ

ভেষজগুলি সেবনকালে সাময়িকভাবে জীবনীশক্তির হ্রাস করে বলিয়া দুঃখকর এবং পরক্ষণেই উহারা প্রাণশক্তির সহিত মিশিয়া উহার বৃদ্ধি বা উন্নতি সাধন করে বলিয়া সুখকর হয়। মারাত্মক অথচ সুস্বাদু বিষও পানকালে জীবনীশক্তির বৃদ্ধি সাধন করে এবং পরক্ষণে উহাদের বিষক্রিয়া কালে দুঃখবেদনা উৎপন্ন করে।

৮। বেদনা সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন

(ক) সুখদুঃখের একটি সদর্থক এবং অপরটি নঞর্থক কিনা

কোনো কোনো দুঃখবাদী (pessimist) দার্শনিক সুখকে নঞর্থক এবং দুঃখকে সদর্থক বেদনা বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের মতে সুখ বলিয়া কোনো পৃথক বেদনা নাই। ইহা দুঃখের অভাব মাত্র। পাশ্চাত্ত্য দর্শনে **সোপেনহাওয়ার** (Schopenhauer) এবং ভারতীয় দর্শনে **সাংখ্য** এবং **বৌদ্ধ** দার্শনিকেরা এইরূপ মতের প্রবক্তা। আবার **বেদান্ত** আনন্দকেই আসল অনুভূতি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। এই মতে দুঃখ সুখের অভাব মাত্র।

সমালোচনায় বলা যাইতে পারে, উপরোক্ত মতটি দার্শনিক। সকল বেদনাই দুঃখময়, এইরূপ অনুভূতি স্বাভাবিক নয়। তাহা ছাড়া, সুখের অনুভূতি না থাকিলে, দুঃখের অনুভূতি ঘটিতে পারে না। তৃতীয়তঃ, অন্তর্দর্শনেও সুখদুঃখ সমভাবে মৌলিক বলিয়া ধরা পড়ে। চতুর্থতঃ, প্রয়োগিক পদ্ধতিতে দেখা যায়, সুখ এবং দুঃখের শারীর প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন। সুতরাং সুখ এবং দুঃখ, একটি অপরটির অভাবাত্মক নয়। দুইটিই সদর্থক বেদনা।

(খ) নিরপেক্ষ বেদনা (Neutral feeling) সম্ভব কিনা

সুখ ও দুঃখ বেদনা একই সুখদুঃখ মাত্রার দুই প্রান্তে অবস্থিত পরস্পর-বিরুদ্ধ বেদনা। সুতরাং উহাদের মধ্যবর্তী কোনো বেদনা—যাহা সুখও নয় দুঃখও নয়—নাই বলিয়াই মনে হইতে পারে।

কিন্তু **হব্‌ও** প্রভৃতি মনোবিদ মনে করেন যে **সুখদুঃখ-নিরপেক্ষ মধ্যবর্তী বেদনা** থাকা সম্ভব। একই মাত্রার বিপরীত প্রান্তে অবস্থিত সুখ ও দুঃখ একটি কাল্পনিক রেখা দ্বারা যুক্ত হইয়াছে মনে করা যাইতে পারে।

সর্বোচ্চ সুখবেদনা— ————o————— সর্বোচ্চ দুঃখবেদনা

নিরপেক্ষ বেদনা

উপরের কাল্পনিক রেখার বাম প্রান্তে রহিয়াছে সর্বোচ্চ-পরিমাণ সুখবেদনা,

আবার উহার দক্ষিণ প্রান্তে রহিয়াছে সর্বোচ্চ-পরিমাণ দুঃখবেদনা। বাম প্রান্ত হইতে দক্ষিণে অগ্রসর হইলে, সুখবেদনার পরিমাণ ক্রমশঃ কমিতে কমিতে, মধ্যবিন্দুতে শূন্য হইয়া যায়। আবার, এই নিরপেক্ষ শূন্য বিন্দু হইতে আরও দক্ষিণে অগ্রসর হইতে থাকিলে, প্রথমে নিম্নতম দুঃখবেদনা উপস্থিত হয় এবং উহা ক্রমশঃ বাড়িতে বাড়িতে উচ্চতর দুঃখসীমায় পৌঁছায়। আবার দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত সর্বোচ্চ দুঃখবেদনা হইতে বামে অগ্রসর হইলে, দুঃখ কমিতে কমিতে মধ্যবিন্দুতে শূন্য হইয়া দাঁড়ায় এবং ঐ মধ্য-বিন্দু হইতে আরও বামে অগ্রসর হইলে, প্রথমে নিম্নতম সুখবেদনা উপস্থিত হয় এবং উহা ক্রমশঃ বাড়িতে বাড়িতে সর্বোচ্চপরিমাণ সুখবেদনাসীমায় পৌঁছায়।

সুতরাং হ্বুণ্ড্-এর মতে সুখদুঃখের মধ্যবর্তী নিরপেক্ষ বেদনা আছে, যাহা উহাদের অতিক্রম-বিন্দু (transition point)।

কিন্তু হ্বুণ্ড্-এর **এই মতবাদ যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না**। (১) ইহা বেদনার আপেক্ষিকতা সূত্রকে (Law of Relativity of Feeling) লঙ্ঘন করে: নিরপেক্ষ বেদনার তথাকথিত শূন্য বিন্দুটি আসলে শূন্য নয়। কল্পিত সরলরেখাটির সুখ-প্রান্ত হইতে অগ্রসর হইলে, এই বিন্দুটি দুঃখময় এবং দুঃখ-প্রান্ত হইতে অগ্রসর হইলে, এই বিন্দুটি সুখময় বলিয়া অনুভূত হওয়া উচিত। (২) কোনো বস্তুর মৃদু উত্তপ্ত উপরিভাগে হাতের পাতা রাখিলে, প্রথমে সুখবেদনা অনুভূত হয়। এইবার উহার উত্তাপ ক্রমশঃ বাড়াইতে থাকিলে, সুখবেদনা দুঃখবেদনায় পরিবর্তিত হয়। কিন্তু এই পরিবর্তনের পূর্বে সুখ-বেদনার সহিত মৃদু অথবা ক্ষীণ দুঃখবেদনা উপস্থিত হয়। (৩) তাহা ছাড়া, যে সাধারণ সুস্থতাবোধের (common sensibility) পটভূমিতে বেদনা ফুটিয়া ওঠে, তাহা সুখদায়ক। সুতরাং যাহাকে নিরপেক্ষ মধ্যবিন্দু বলা হয়, তাহা ঐ সুখবেদনার তুলনায় দুঃখকর। (৪) তথাকথিত নিরপেক্ষ বেদনার অন্তর্দর্শনে উহাতে সুখদুঃখের সূক্ষ্ম ক্রমিক পরিবর্তন অথবা দোলন (oscillation) অনুভূত হয়। (৫) তথাকথিত নিরপেক্ষ বেদনা আসলে অবগতিমূলক। ইহা একটি বুদ্ধি-নির্মাণ বা কল্পনা, কিন্তু অনুভূতি বা বেদনা নয়।

(গ) মিশ্র বেদনা (Mixed Feeling) সম্ভব কিনা

সুখও বটে, দুঃখও বটে, এমন মিশ্রিত বেদনা আছে কি? সুখ এবং দুঃখ যদি পরস্পর-বিরোধী বেদনা হয়, তাহা হইলে যুক্তির দিক দিয়া এইরূপ সুখদুঃখমিশ্রিত বেদনা থাকিতে পারে না। কিন্তু ম্যাকডুগ্যাল, স্টাউট প্রভৃতি মনোবিদ্‌গণ মিশ্রিত বেদনা স্বীকার করেন। তাঁহাদের মতে সুখ এবং দুঃখ পরস্পর-বিরুদ্ধ বেদনা নয়, সুতরাং ইহারা মিশ্রিত হইতে পারে। দৈনন্দিন জীবনের এবং কবির বর্ণিত বেদনায়

সুখ-দুঃখের মিশ্রণ দেখা যায়। মহর্ষি কণ্ব শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রাকালে হয়ত এই-রূপ মিশ্র বেদনা অনুভব করিয়াছিলেন। রোমিও জুলিয়েৎ-এর নিকট "বিদায় মধুর বিষণ্ণতা (parting is sweet sorrow)"। স্টাউট মধুর বিষাদের (pleasing melancholy) উল্লেখ করিয়াছেন। শোকের মধ্যেও সুখ অনুভূত হইতে পারে। প্রিয়-জনের বিচ্ছেদ ব্যথার সঙ্গে সঙ্গে অতীতের মধুর স্মৃতিগুলি জাগিয়া উঠিলে, দুঃখ সুখরাগে রঞ্জিত হয়।

সমালোচনায় বলিতে হয় যে মনোবিদ্যা বিজ্ঞান। দৈনন্দিন জীবনের অথবা কবিকল্পনার নজীর যাহাই হউক না কেন, অন্তর্দর্শনে অথবা প্রায়োগিক গবেষণায় মিশ্রবেদনার সন্ধান পাওয়া যায় না। সুখ এবং দুঃখ যুগপৎ ঘটিতেছে বলিয়া মনে হইলেও, বাস্তবিকই যুগপৎ ঘটে না। সুখ ও দুঃখ দোলকের মত এমন দ্রুতভাবে দোলায়মান হয় যে উহাদের যুগপৎ অনুভূতি ঘটে অথবা মনে হয় যে উহারা একই সময়ে ঘটিতেছে।

(ঘ) বেদনা ও মনোযোগ (Feeling and Attention)

সংবেদনের সহিত বেদনার একটি প্রধান পার্থক্য এই যে সংবেদন মনোযোগের বিষয় হইতে পারে, কিন্তু বেদনা পারে না। মনোযোগের ফলে সংবেদন স্পষ্টতর হয়, কিন্তু বেদনা প্রায় বিলুপ্ত হইয়া যায়। ক্রোধ দমন করিবার উপায় হিসাবে ক্রুদ্ধ ব্যক্তির মুখাবয়ব আয়নায় দেখাইবার উপদেশ দেওয়া হয়। সুখ বা দুঃখের উপর মনোযোগ নিবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিলেই, ঐ বেদনা নিম্নলিখিত কারণে মিলাইয়া যায়। (১) বেদনায় মনোযোগের সঙ্গে উহার ভিত্তিস্থানীয় সংবেদন হইতে মনোযোগ সরিয়া যায়, সুতরাং বেদনা অস্পষ্ট হইয়া পড়ে। (২) বেদনা স্বয়ং মনোযোগ এবং সংবেদনের যুক্ত ফল। সুতরাং বেদনায় মনোযোগের সঙ্গে সঙ্গে এই যুক্তফলটি বিচ্ছিন্ন এবং অস্পষ্ট হয়। (৩) মনোযোগের ফলে মন শান্ত এবং স্থির হয়। বেদনা এক প্রকার উত্তেজনার অনুভূতি। সুতরাং ইহা মনোযোগের ফলে ব্যাহত হয়।

সুতরাং **ওয়ার্ড** প্রভৃতি মনোবিদ্‌গণের মতে, বেদনা মনোযোগের বিষয় হইতে পারে না। বেদনার সহিত সংশ্লিষ্ট সংবেদন এবং দৈহিক প্রকাশ মনোযোগের বিষয় হইতে পারে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে ইহারা বেদনা নয়। সুতরাং ইহাদের প্রতি মনোযোগ সম্ভব হইলেও, বেদনায় মনোযোগ সম্ভব নয়।

(ঙ) বিষয়গত এবং ব্যক্তিগত বেদনা Objective and Subjective feeling)

কোনো কোনো মনোবিদ্ ব্যক্তিগত বেদনার সহিত বিষয়গত বেদনাও স্বীকার

করিয়াছেন। যেমন পীতবর্ণের উজ্জ্বলতা দর্শনের সুখবেদনা ঐ উজ্জ্বলতাকেই নির্দেশ করে, সুতরাং ইহা বিষয়গত। পক্ষান্তরে উজ্জ্বলতাদর্শন দ্রষ্টার মনে সুখবেদনারূপ যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, উহা মানসিক বা ব্যক্তিগত। মনোযোগের ফলে বিষয়গত বেদনা বিলুপ্ত হয় না, কিন্তু ব্যক্তিগত বেদনা বিলুপ্ত হয়।

(চ) বেদনার শারীর লক্ষণ (Bodily Expressions of Feeling)

প্রত্যেক মানসবৃত্তিই শরীরের বিবিধ লক্ষণে আত্মপ্রকাশ করে। শারীর প্রকাশগুলি দেখিয়া আমরা বুঝিতে পারি, কোন্ ব্যক্তি সুখী এবং কোন্ ব্যক্তি দুঃখিত। বেদনা মুখমণ্ডলের পেশীয় বিচলনে প্রকাশিত হয়। এই জন্যই কাহারও মুখভঙ্গী দেখিয়াই আমরা বুঝিতে পারি, তাহার কি বেদনা হইয়াছে। আমরা বলিয়া থাকি অমুককে সুখী বা দুঃখিত, ভীত বা ক্রুদ্ধ দেখাইতেছে।

বেদনায় সমগ্র শরীর আন্দোলিত হয়। শুধু মুখাবয়বে নয়, সমগ্র শরীরেই বেদনার লক্ষণ প্রকাশিত হয়। অন্ততঃ চারিটি শারীর প্রকাশ দেখিয়া আমরা ব্যক্তির সুখ বা দুঃখ বেদনা বুঝিতে পারি, যথা—(১) নাড়ীর অবস্থা, (২) শ্বাস-প্রশ্বাসের অবস্থা, (৩) শরীরের বিস্তার (volume) এবং (৪) পেশীর শক্তি।

(১) সুখ বেদনায় নাড়ী সবল এবং দুঃখ বেদনায় উহা দুর্বল হয়। (২) আবার সুখে শ্বাস-প্রশ্বাস গভীরতর এবং দুঃখে অগভীর হয়। (৩) সুখে স্বচ্ছন্দ রক্তচলাচল ঘটে এবং দুঃখে ব্যাহত হয়। সেই কারণে সুখে আমরা যেন ফুলিয়া উঠি, কিন্তু দুঃখে সঙ্কুচিত বা ক্ষুদ্র হইয়া পড়ি। (৪) সুখে পেশীজ শক্তি বাড়িয়া যায়, কিন্তু দুঃখে ইহা কমিয়া থাকে।[১]

অনুশীলনী (Exercise)

1. What does feeling mean? Define sense-feeling. Distinguish between feeling and organic sensation. (Ans : pp 229-231)

বেদনা এবং সংবেদনজ বেদনা কাহাকে বলে? বেদনা এবং যান্ত্রিক সংবেদনের পার্থক্য দেখাও।

১ এই প্রসঙ্গে বর্তমান পরিচ্ছেদের ৩য় অনুচ্ছেদে প্রদত্ত তালিকাটি দ্রষ্টব্য।

2. How many feelings are there ? Explain the Tridimensional Theory of Feeling. (Ans : pp. 231-234)
বেদনা কয় প্রকার ? ত্রিমাত্রাত্মক বেদনাবাদ আলোচনা কর।

3. Give an analysis of the nature of feeling. (Ans : pp. 234-235)
বেদনার স্বরূপ বিশ্লেষণ কর।

4. Distinguish between feeling and emotion. (Ans : pp. 235-236)
বেদনা এবং প্রক্ষোভের পার্থক্য প্রদর্শন কর।

5. What are the conditions of pleasure and pain ? (Ans : pp. 236-238)
সুখ এবং দুঃখের সর্তগুলি কি ?

6. Explain the different laws of feeling. (Ans : pp. 236-238)
বেদনার নিয়মগুলি ব্যাখ্যা কর।

7. What are the different theories of feeling ? Which of them is the most satisfactory, and why ? (Ans : pp. 238-243)
বেদনার বিভিন্ন মতবাদ আলোচনা কর। কোন্ মতবাদটি সর্বাপেক্ষা সন্তোষজনক এবং কেন সন্তোষজনক ?

8. (a) Is pleasure more fundamental than pain ?
   (b) Is there a neutral feeling ?
   (c) Is there any mixed feeling ?

Discuss. (Ans : pp. 243-246)

আলোচনা কর : (ক) সুখ ও দুঃখের মধ্যে কোন্‌টি মৌলিক ? (খ) নিরপেক্ষ বেদনা আছে কি ? (গ) মিশ্র বেদনা আছে কি ?

9. Explain the bodily expressions of feeling. (Ans : p. 246)
বেদনার দৈহিক প্রকাশ আলোচনা কর।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

প্রক্ষোভ (Emotion)

১। প্রক্ষোভের সংজ্ঞা (Definition)

প্রক্ষোভ বেদনার (Feeling) **সেই ভাবগত** (Ideal) **রূপ, যাহা বেদনার তুলনায় জটিল, যাহা শরীরের সর্বাঙ্গীণ পরিবর্তন ঘটায়, যাহা মানসিক দিক হইতে একটি তীব্রবেদনাযুক্ত ও উত্তেজনাময় অবস্থা, যাহার কোনো নির্দিষ্ট ক্রিয়া বা চেষ্টিত উৎপন্ন করিবার প্রবণতা থাকে এবং যাহা কোনো সমগ্র পরিস্থিতির প্রত্যক্ষ ফল।**

কুল্পে বলিয়াছেন যে প্রক্ষোভ যান্ত্রিক সংবেদন এবং বেদনার এক প্রকার মিশ্রণ। **হেফ্‌ডিং**-এর মতে প্রক্ষোভ একপ্রকার সুখদুঃখবেদনা, যাহাতে উহাদের কারণ সম্বন্ধে চেতনা থাকে। **সালি** (Sully) মনে করেন যে প্রক্ষোভ এক প্রকার সংবেদনজ এবং পুনরুদ্রিক্ত উপাদান, যাহা বেদনার রাগে রঞ্জিত। আবার **ওয়ার্ড** বলেন যে প্রক্ষোভ একটি সমগ্র মানসবৃত্তি, যাহাতে অবগতি, সুখদুঃখবেদনা এবং ইচ্ছা বর্তমান। এই সংজ্ঞাগুলি হইতে বুঝা যায় যে প্রক্ষোভ **মৌলিক মানসবৃত্তি নয়,** কিন্তু যৌগিক বা জটিল মানসবৃত্তি।

প্রক্ষোভের **বিশ্লেষণ** হইতে নিম্নোক্ত লক্ষণগুলি পাওয়া যায় :—

(১) প্রক্ষোভে একটি **সুখদুঃখ বেদনার অনুভূতি** থাকে। প্রক্ষোভ **বেদনা** রাগে (Hedonic tone) রঞ্জিত। (২) ইহাতে বিস্তৃত বা সর্বাঙ্গীণ যান্ত্রিক ক্রিয়া ঘটিয়া থাকে—যেমন নাড়ীর শক্তি ও গতি, শ্বাসপ্রশ্বাসের গভীরতা-অগভীরতা, গ্রন্থির রসক্ষরণ প্রভৃতি। এই সর্বাঙ্গীণ যান্ত্রিক ক্রিয়াকে বলা হয় **যান্ত্রিক ঝঙ্কার** (Somatic resonance)। (৩) প্রক্ষোভের একটি কালিক ধর্ম বা **স্থায়িত্ব** (Duration) আছে। ইহা হঠাৎ আরম্ভ হয়, ক্রমশঃ বাড়িতে বাড়িতে চরম সীমায় পৌঁছায় এবং ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হইয়া যায়। (৪) প্রক্ষোভ বেদনার মত কোনো নির্দিষ্ট বা বিচ্ছিন্ন উদ্দীপক দ্বারা উৎপন্ন হয় না। পক্ষান্তরে ইহার উদ্দীপক একটি **সমগ্র পরিস্থিতি** (Situation)। (৫) স্টাউট্‌ বলিয়াছেন যে **প্রক্ষোভের স্বভাব পরগাছার মত** (Emotions are parasitical in nature), কারণ **ইহা সহজ প্রবৃত্তি অথবা ইচ্ছাকে অবলম্বন করিয়া ঘটে।** যেমন, বাছুর ধরিতে গেলে, গরু ক্রুদ্ধ

হইয়া গুঁতাইতে আসে। এই ক্ষেত্রে ক্রোধ প্রক্ষোভটি 'মাতৃত্ব' সহজ প্রবৃত্তিকে আশ্রয় করিয়া ঘটে। (৬) প্রক্ষোভের কারণ শুধু সংবেদন বা উপস্থিত কোনো বস্তুর প্রত্যক্ষ নয়, কিন্তু উহার সহিত সংশ্লিষ্ট প্রতিরূপ বা ভাবও বটে। অর্থাৎ প্রক্ষোভ **উপস্থিত ও পুনরুপস্থিত, এই উভয় প্রকার কারণে ঘটিয়া থাকে।** (৭) প্রক্ষোভে **বিচার শক্তি ব্যাহত হয়।** প্রক্ষুব্ধ অবস্থায় আমরা সম্পূর্ণভাবে আবেগের দাস হইয়া পড়ি এবং এমন কথা বলি অথবা কাজ করি, যাহা শান্ত অবস্থায় মূর্খতা বা বোকামি বলিয়া মনে হয়। (৮) প্রক্ষোভ সহজেই **সাপেক্ষ** (Conditioned) **হইয়া পড়ে।** চেষ্টিতবাদীরা প্রক্ষোভের সাপেক্ষকরণ সম্বন্ধে বিস্তৃত গবেষণা করিয়াছেন। যে বস্তুতে শিশুর সহজাত প্রক্ষোভ ঘটে, তাহার সহিত অন্য কোনো বস্তু উপস্থাপিত করিলে, দ্বিতীয় বস্তুটিতে সাপেক্ষ প্রক্ষোভ জন্মে। এই বিষয়টি যথাস্থানে সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে।[১] (৯) প্রক্ষোভ প্রধানতঃ অনুভূতিমূলক (affective) মানসবৃত্তি হইলেও, ইহাতে অবগতিমূলক (cognitive) এবং ইচ্ছামূলক (conative) উপাদানও থাকে।

২। প্রক্ষোভ, মেজাজ (Mood), অতিরাগ (Passion), স্বভাব (Disposition) এবং আয়ান (Temperament)

মেজাজ (Mood)

প্রক্ষোভ কোনো প্রত্যক্ষ বস্তু, প্রতিরূপ বা অবলম্বন করিয়া ঘটিয়া থাকে। ইহা একটি বাস্তব অনুভূতি। যেমন, কাহারও দ্বারা অপমানিত হইয়া তাহার বিরুদ্ধে ক্রোধ নামক প্রক্ষোভ ঘটে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি, উহার প্রতিরূপ বা ভাব হইতে বাস্তব ক্রোধ না ঘটিলেও, ক্রুদ্ধ মেজাজ থাকিতে পারে। কোন ব্যক্তি হয়ত খোশ্‌মেজাজী, কোনো ব্যক্তি হয়ত বদ্‌মেজাজী। এই স্থলে উক্ত ব্যক্তিটি যে নির্দিষ্ট ভাবে কাহারও উপর খুশি হইয়া বা চটিয়া আছেন, তাহা নয়। কিন্তু তাহার মধ্যে বাস্তব খুশিভাবের বা ক্রোধের প্রবণতা রহিয়াছে। এই খুশিভাব বা ক্রোধপ্রবণতা কোন অছিলা বা ছুতা পাইলেই বাস্তব প্রক্ষোভের আকারে প্রকাশিত হইতে পারে।

তাহা হইলে মেজাজ বলিতে বুঝায় **এমন প্রক্ষোভ-প্রবণতা, যাহা বাস্তব প্রক্ষোভে প্রকাশিত হয় না, অথচ যাহার বাস্তব প্রক্ষোভে প্রকাশিত হইবার প্রবণতা আছে।**

১। সপ্তম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য

প্রক্ষোভ ও মেজাজের সম্বন্ধ (১) প্রক্ষোভের যেমন **নির্দিষ্ট বিষয় বা বস্তু** থাকে, মেজাজের তেমন **থাকে না**। মেজাজ যে কোনো বস্তুকে আশ্রয় করিয়া বাস্তব প্রক্ষোভরূপে প্রকাশিত হইতে পারে। (২) প্রক্ষোভ যেমন একটি **বাস্তব অনুভূতি**, মেজাজ সেইরূপ **নয়**। মেজাজ একপ্রকার প্রক্ষোভ-প্রবণতা, যাহা উপযুক্ত সময়ে নির্দিষ্ট বস্তু বা ব্যক্তির সম্পর্কে বাস্তব প্রক্ষোভরূপে দেখা দিতে পারে। (৩) প্রক্ষোভের তুলনায় মেজাজ বা প্রক্ষোভপ্রবণতার **সুখদুঃখ অনুভূতি কম**। (৪) মেজাজ প্রক্ষোভের ন্যায় হঠাৎ উপস্থিত হইয়া, ক্রমশঃ বাড়িতে বাড়িতে, একটি চরম অবস্থায় পৌঁছিয়া, ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয় না। মেজাজ প্রক্ষোভের তুলনায় **অধিক স্থায়ী**।

প্রক্ষোভ ও মেজাজ **পরস্পর-সাপেক্ষ**। একটি প্রক্ষোভ পুনঃ পুনঃ ঘটিলে, উহার প্রবণতা বা মেজাজ জন্মিতে পারে। ক্রোধ প্রশ্রয় পাইলে, অপেক্ষাকৃত স্থায়ী ক্রোধপ্রবণতা বা মেজাজ গঠিত হয়। আবার, প্রক্ষোভ মেজাজের ফলস্বরূপ দেখা দিতে পারে। রাগী লোক সহজেই চটিয়া যায়। সাহেবের দ্বারা অপমানিত বড়বাবু গৃহে ফিরিয়া নিরীহ পত্নীর উপর তাঁহার অপমানজনিত ক্রোধমেজাজ জাহির করিতে পারেন।

মেজাজের কারণ :—মেজাজের একটি কারণ, অতীত প্রক্ষোভফল। প্রক্ষোভকে প্রশ্রয় দেওয়ার ফলে, উহা শরীর ও মনের উপর যে প্রভাব রাখিয়া যায়, তাহাই মেজাজের আকার গ্রহণ করে। যান্ত্রিক কারণেও মেজাজ গঠিত হইতে পারে। যেমন অজীর্ণ এবং অনিদ্রা, বদ মেজাজ এবং সুস্থ হজমক্রিয়া ও সুনিদ্রা মধুর মেজাজ উৎপন্ন করে। তাহা ছাড়া, আভ্যন্তরীণ যন্ত্রগুলির ক্রিয়া মেজাজের উপর প্রভাব বিস্তার করে। যেমন গ্রন্থিগুলির রসক্ষরণ, রক্তচলাচল এবং শ্বাসক্রিয়ার বিশৃঙ্খলা মেজাজকে বিশেষভাবে-নিয়ন্ত্রণ করে।

স্বভাব (Disposition) ও মেজাজ :—(১) মেজাজ যেমন প্রক্ষোভের তুলনায় বেশী স্থায়ী প্রবণতাবিশেষ, তেমন স্বভাবও মেজাজের তুলনায় **অধিক স্থায়ী** প্রবণতা। মেজাজ বড় জোর একদিন বা আরও কিছু বেশী কাল স্থায়ী হইতে পারে। কিন্তু স্বভাব ব্যক্তির আজীবন সঙ্গী। (২) স্বভাব মেজাজের তুলনায় **গভীরতর মানসস্তরে** নিহিত। (৩) স্বভাব মেজাজের মত যে কোনো অছিলার সুযোগ লইয়া আত্মপ্রকাশ করে না, কিন্তু **উপযুক্ত বিষয়** অবলম্বন করিয়া প্রকাশিত হয়। (৪) মেজাজ অর্জিত বা বাস্তব প্রক্ষোভলব্ধ প্রবণতা। কিন্তু প্রক্ষোভ-স্বভাব **অর্জিত এবং জন্মগত উভয়ই**

হইতে পারে। ইহা কোনো ব্যক্তি বা বিষয়ের প্রতি প্রক্ষুব্ধ হইবার **স্থায়ী প্রবণতা**। যেমন, মাতৃত্ব নারীর পক্ষে একটি জন্মগত প্রক্ষোভ-স্বভাব। (৫) আবার প্রক্ষোভের তুলনায় যেমন মেজাজ, মেজাজের তুলনায় তেমন স্বভাব, কম সুখদুঃখ-বেদনাশীল। **প্রক্ষোভের বেদনা স্পষ্ট, মেজাজের অস্পষ্ট, স্বভাবের আরও অস্পষ্ট।**

আয়ান বা ধাত্ (Temperament), মেজাজ ও স্বভাব :—আয়ান বা ধাত্ শুধু প্রক্ষোভ, প্রক্ষোভ-প্রবণতা বা স্বভাবই বুঝায় না। ইহার অর্থ অধিকতর ব্যাপক। ইহাতে অবগতি এবং ইচ্ছাও থাকে, যদিও ইহাতে প্রক্ষোভেরই প্রাধান্য। পক্ষান্তরে, প্রক্ষোভে এবং প্রক্ষোভ-প্রবণতায়, জ্ঞান ও ইচ্ছামূলক বৃত্তির স্থান নগণ্য।

আয়ান **জন্মগত** এবং ব্যক্তির মানসিক গঠনের সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। পক্ষান্তরে প্রক্ষোভের সহিত ব্যক্তির **মানসগঠনের সম্বন্ধ** নাই বলিলেই চলে, কারণ **মূল প্রক্ষোভগুলি সকল ব্যক্তিতেই সমান**। মেজাজের সহিতও মানসিক গঠনের সম্বন্ধ অল্প। মেজাজ আত্মপ্রকাশ করিয়াই শরতের মেঘের মত মিলাইয়া যায়। আবার, স্বভাবের সহিত মানসগঠনের সম্বন্ধ আয়ানের মত গভীর এবং ব্যাপক নয়। প্রক্ষোভ-স্বভাব ব্যক্তির সর্বাংশকে স্পর্শ করে না, কিন্তু করে তাহার অনুভূতিকে।

আয়ানের গভীরতা, ব্যাপকতা এবং স্থায়িত্ব নির্ভর করে উহার সহিত ব্যক্তির মানসিক এবং দৈহিক গঠনের অঙ্গাঙ্গিভাবের উপর। গ্যালেন প্রভৃতি প্রাচীন মনীষিগণ দেহের চারটি ধাতুর সহিত জড়িত **চার শ্রেণীর আয়ানের** উল্লেখ করিয়াছেন—যথা কোলেরিক্, স্যাঙ্গুইন্, ফ্লেম্যাটিক্ এবং মেলাঙ্কোলিক।[১]

যে ব্যক্তির চিন্তা দ্রুত এবং সুখদুঃখ অনুভূতি প্রবল, সে **কোলেরিক্**; যে ব্যক্তির চিন্তা দ্রুত কিন্তু সুখদুঃখ অনুভূতি দুর্বল, সে **স্যাঙ্গুইন**, যাহার চিন্তা ধীর এবং অনুভূতি দুর্বল, সে **ফ্লেম্যাটিক** এবং যাহার চিন্তা ধীর হইলেও অনুভূতি গভীর, সে **মেলাঙ্কোলিক্**। আবার রক্ত, পিত্ত, শ্লেষ্মা এবং প্লীহার আধিক্য এই সকল আয়ানের লক্ষণ। প্রাচীন বিজ্ঞানীরা বলিয়াছেন যে স্যাঙ্গুইন ব্যক্তির রক্তাধিক্য, কোলেরিক্-এর পিত্তাধিক্য ফ্লেম্যাটিক-এর শ্লেষ্মাধিক্য এবং মেলাঙ্কোলিক্-এর প্লীহাধিক্য থাকে। এই চারিটি ছাড়াও, একটি পঞ্চম প্রকারের আয়ান উল্লেখযোগ্য, যথা **স্নায়বিক (নার্ভাস)**। এই আয়ান-বিশিষ্ট ব্যক্তিতে স্নায়ুরসের আধিক্য থাকে। **আয়ুর্বেদ** মতে ব্যক্তির তিনটি মৌলিক ধাতুর, যথা বায়ু, পিত্ত এবং শ্লেষ্মার প্রাধান্য অনুসারে তাহার আয়ানও তিন শ্রেণীর—যথা **বায়ু-প্রধান, পিত্ত-প্রধান** এবং

১ নবম পরিচ্ছেদ—২য় এবং ৩য় অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

শ্লেষ্মা-প্রধান।

অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলির রসক্ষরণের প্রাধান্য অনুসারে বিভিন্ন প্রকারের আয়ান উৎপন্ন হয়। এই গ্রন্থিগুলি হইতে নিঃসৃত শক্তিশালী রাসায়নিক পদার্থ রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া ব্যক্তির মন ও শরীরকে প্রভাবিত করে। যেমন, থাইরয়েড গ্রন্থির অধিক রসক্ষরণ ব্যক্তিকে চঞ্চল এবং অতিসক্রিয়, আবার উহার অল্প রসক্ষরণ, ব্যক্তিকে নিষ্ক্রিয় এবং মন্দ-বুদ্ধি করিয়া তোলে। [১]

অতিরাগ (Passion)

অতিরাগ কথাটি দ্ব্যর্থবোধক। ইহার সাধারণ অর্থ **নিষ্ক্রিয় বেদনা**। ইহা (১) যে কোনো প্রক্ষোভ, (২) প্রবল প্রক্ষোভ, যেমন তীব্র ক্রোধ বা দ্বেষ, (৩) প্রবল এবং বদ্ধমূল প্রক্ষোভ-স্বভাব, যেমন তীব্র প্রতিহিংসা এবং (৪) কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতি অন্ধ আসক্তি, যেমন স্ত্রৈণ ব্যক্তির স্ত্রীর প্রতি, বিজ্ঞানীর অঙ্কের প্রতি অথবা খেলোয়াড়ের খেলার প্রতি আসক্তি, প্রভৃতি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়।

এই সকল অর্থভেদ সত্ত্বেও, **অতিরাগ বুঝায় এইরূপ মেজাজ অপেক্ষা প্রবলতর প্রক্ষোভ-প্রবণতা, যাহা ব্যক্তিকে অল্পকালেই অবসন্ন করিয়া ফেলে।** হেফ্‌ডিং-এর মতে অতিরাগ এবং প্রক্ষোভস্বভাব প্রায় সমার্থক। ইহারা উভয়েই বুঝায় অনুভূতি-প্রবণতা। কিন্তু উহারা পৃথক, কারণ অতিরাগে ক্রিয়ামূলক আবেগ প্রক্ষোভ-স্বভাব অপেক্ষা বেশী। ইহাতে **অনুভূতির সহিত ক্রিয়া-প্রবণতা অথবা সক্রিয়তা বর্তমান থাকে।**

৩। প্রক্ষোভের শ্রেণীভেদ

অনুভূতিকে প্রথমতঃ **সংবেদনজ** বেদনা এবং **ভাবজ** বেদনা বা প্রক্ষোভ, এই দুই শ্রেণীতে এবং সংবেদনজ বেদনাকে, আবার, **যান্ত্রিক** সংবেদনজ এবং **সুখদুঃখবেদনা**, এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। সকল যান্ত্রিক এবং বিশেষ সংবেদনই সুখ-দুঃখাত্মক রাগে (hedonic tone) রঞ্জিত হয়।

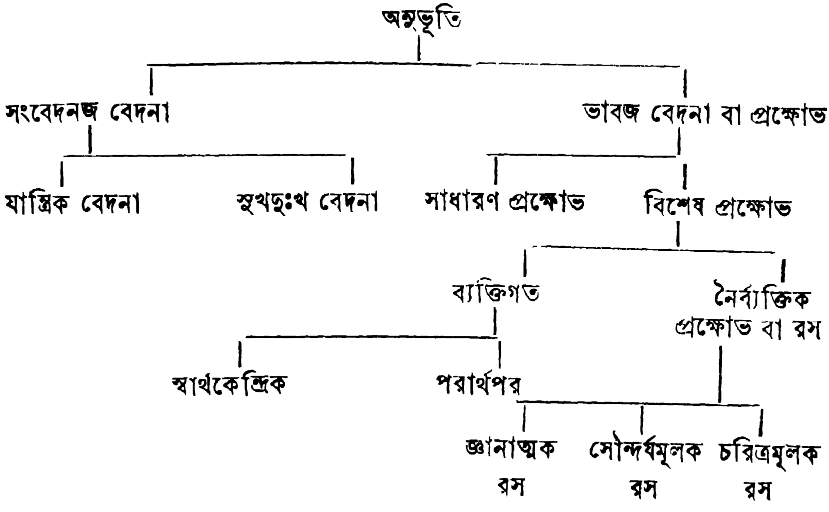
ভাবজ বেদনা অথবা প্রক্ষোভকে আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—যথা **সাধারণ** প্রক্ষোভ এবং **বিশেষ** প্রক্ষোভ। সাধারণ প্রক্ষোভ, যেমন হর্ষ এবং বিষাদ সকল ব্যক্তিই অনুভব করে। বিশেষ প্রক্ষোভগুলি বিশেষ ক্ষেত্রে ঘটিয়া থাকে। বিশেষ প্রক্ষোভ আবার **ব্যক্তিগত** বা মূর্ত এবং **নৈর্ব্যক্তিক**

---

১ চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ—২য় অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

বা অমূর্ত ভেদে দুই প্রকার। ব্যক্তিগত বা মূর্ত প্রক্ষোভ স্বার্থকেন্দ্রিক (egoistic) এবং পরার্থপর (altruistic) ভেদে দুই শ্রেণীর হইতে পারে। প্রথমটি কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমূহকে কেন্দ্র করিয়া ঘটে। ভয়, ক্রোধ, ঘৃণা, হিংসা, অহঙ্কার প্রভৃতি ব্যক্তিগত বা স্বার্থকেন্দ্রিক প্রক্ষোভ। অপরপক্ষে সহানুভূতি, ভালবাসা, দয়া, পিতৃস্নেহ,মাতৃস্নেহ, দেশপ্রেম, বন্ধুবাৎসল্য প্রভৃতি ব্যক্তিগত অথচ পরার্থপর বা সামাজিক প্রক্ষোভ। অন্যদিকে নৈর্ব্যক্তিক প্রক্ষোভে ব্যক্তির স্থান নাই। নৈর্ব্যক্তিক প্রক্ষোভকে **রস** (Sentiment) বলে। ইহারা আবার তিন শ্রেণীর—যথা, জ্ঞানাত্মক রস অথবা সত্যপ্রেম, অনুভূতিমূলক বা সৌন্দর্যমূলক রস বা সৌন্দর্য-প্রেম এবং ইচ্ছা বা চরিত্রমূলক রস অথবা ন্যায়প্রেম।

প্রক্ষোভের উপরোক্ত শ্রেণীভেদে ডঃ হেনরী ষ্টিফেন-এর (Stephon) মত অনুসরণ করা হইয়াছে। এই শ্রেণীভেদটি রেখাচিত্রের সাহায্যে দেখানো যাইতেছে।



৪। কয়েকটি প্রক্ষোভের বিশ্লেষণ

প্রক্ষোভের স্বরূপ বুঝিতে হইলে কয়েকটি প্রধান প্রক্ষোভের মানস এবং শারীর লক্ষণগুলি বিশ্লেষণ আবশ্যক।

(ক) ভয় (Fear) **:—চার্লস ডারুইন** (Darwin) তাঁহার On the Expression of Emotion in Man and Animals গ্রন্থে **ভয়ের** যে **বিশ্লেষণ** করিয়াছেন তাহা এই :—

"চোখ মুখ বিস্তৃত হয় এবং ভ্রূযুগল উপরে ওঠে। ভীত ব্যক্তি প্রথমে প্রাণহীন মূর্তির মত নিশ্চল এবং নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া থাকে, অথবা হামাগুড়ি দিয়া দৃষ্টির অন্তরালে সরিয়া পড়ে। তাহার বুক সজোরে টিপ্ টিপ্ করিতে থাকে এবং পাঁজরার গায়ে স্পন্দিত হয় বা ধাক্কা দেয়; কিন্তু এই অবস্থায় ইহা দেহের সর্বাংশে বেশী রক্ত প্রেরণ করিয়া অস্বাভাবিকরূপে কার্যকর হয় কি না তাহা অনিশ্চিত, কারণ মূর্ছার প্রথম অবস্থার মত, ভয়ের সঙ্গে সঙ্গে চর্ম ফ্যাকাসে হইয়া যায়।

"উপরকার এই বিবর্ণতা হয়ত, রক্তবাহ কেন্দ্র (Vaso-motor-centre) প্রভাবিত হইয়া চর্মের ক্ষুদ্র ধমনীগুলিকে সঙ্কুচিত করিবার ফলে ঘটে। নিদারুণ ভয়ে যে চর্ম বিশেষরূপে প্রভাবিত হয় তাহা বুঝা যায়, যখন চর্ম হইতে অদ্ভুত এবং অবোধ্য রকমের ঘাম বাহির হইতে থাকে। ঘাম বাহির হওয়া আরও আশ্চর্যজনক এই জন্য যে চর্ম শীতল থাকে এবং ঘামও ঠাণ্ডা, অথচ স্বেদগ্রন্থিগুলির ক্রিয়ার উদ্দীপনা নির্ভর করে চর্মের উত্তাপের উপর।

"চর্মরোমগুলি দাঁড়াইয়া ওঠে। হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া ব্যাহত হয় এবং শ্বাসপ্রশ্বাস দ্রুত হয়। লালাগ্রন্থিগুলি ঠিক মত কাজ করে না এবং মুখ শুকাইয়া যায়।...দেহের সকল পেশীই কম্পিত হয়। প্রথমেই ওষ্ঠ কাঁপিতে থাকে।...কণ্ঠস্বর বাধিয়া যায় বা অস্পষ্ট হয় বা একেবারেই কণ্ঠরোধ ঘটে। ভয় তীব্রতর হইয়া আতঙ্কে পরিণত হইলে... হৃদয় উদ্দামভাবে স্পন্দিত হইতে থাকে অথবা নিষ্ক্রিয় হইয়া যায় এবং মূর্ছা ঘটে; মৃতের বিবর্ণতা দেখা দেয়, শ্বাসকৃচ্ছ্র অনুভূত হয় এবং নাসারন্ধ্রের পক্ষদ্বয় অত্যন্ত বিস্তৃত হয়।...মুক্ত এবং যেন ঠিক্‌রাইয়া পড়া চক্ষুগোলক ভয়ের বস্তুতে নিবদ্ধ হয়, অথবা অস্থিরভাবে এক দিক হইতে আর এক দিকে ঘুরিতে থাকে। তারারন্ধ্র অত্যন্ত বিস্তৃত হয়। দেহের পেশীগুলি শক্ত হয় অথবা, যেমন তড়কায় ঘটে, তেমন খিঁচাইতে থাকে।

"হাত দুইটি একবার মুষ্টিবদ্ধ হয় আর একবার খুলিয়া যায়। হাত দুইটি যেন কোনো ভয়ঙ্কর বিপদ এড়াইবার জন্য প্রসারিত হয়, অথবা উদ্দামভাবে মাথার উপর আঘাত করে। অন্যান্য ক্ষেত্রে সোজা পালাইয়া যাইবার আকস্মিক এবং দুর্দমনীয় প্রবণতা দেখা দেয়।"

আসন্ন বিপদরূপে প্রত্যক্ষ বা কল্পিত কোনো পরিস্থিতিই ভয়ের বস্তু। মনের দিক হইতে প্রথমেই ঘটে একটি কেন্দ্রীয় বা মস্তিষ্কগত ক্রিয়া, যাহা ভীতিজনক পরিস্থিতির প্রত্যক্ষ বা ধারণার সহিত সংশ্লিষ্ট। ভীত ব্যক্তির ঐচ্ছিক শক্তি কেন্দ্রীভূত

হয় পেশীজ ক্রিয়ায় এবং তাহার চিন্তনের বিষয় হইয়া দাঁড়ায় ভীতিজনক পরিস্থিতিটি। অস্বাভাবিক উত্তেজনা এবং আভ্যন্তরীণ উত্তেজনার ফলে সর্বাঙ্গীণ অস্বস্তি অনুভূত হয়। স্টাউট্ বলিয়াছেন, ভয় শুধু যে আসন্ন বিপদ হইতে ঘটে তাহাই নয়, কিন্তু "কোনো অদ্ভুত, আকস্মিক প্রবলভাবে আক্রমণকারী ঘটনার চমকপ্রদ অথবা উদ্বেগজনক ফলহিসাবেও ঘটিয়া থাকে।" দৃষ্টান্ত হিসাবে ভূতের ভয় উল্লিখিত হইতে পারে। জ্ঞানের নিম্নতর অবস্থায় ভয়ের যান্ত্রিক প্রকাশ প্রবল আকারে দেখা যায়, কিন্তু উচ্চতর অবস্থায় উহার প্রবলতা কমিয়া যায়।

(খ) **ক্রোধ** (Anger) :—**ডারুইন্**-প্রদত্ত ক্রোধের দৈহিক ও মানসিক লক্ষণের বর্ণনা সংক্ষেপে উল্লিখিত হইতেছে।

ক্রোধে হৃদযন্ত্র এবং রক্তচলাচল পরিবর্তিত হয়—মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ, কপাল এবং গলার শিরা স্ফীত এবং রক্ত মাথায় চালিত হয়। শ্বাসপ্রশ্বাসের গতিও পরিবর্তিত হয়, বুক দুলিতে এবং স্ফীত নাসারন্ধ্র কাঁপিতে থাকে। দেহ সক্রিয় হইবার প্রস্তুতি হিসাবে সোজা হয় এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শক্ত হইয়া অপমানকারীর উপর ঝুঁকিয়া পড়ে। দৃঢ় ও স্থির সঙ্কল্প প্রকাশ করিয়া মুখ বন্ধ থাকে এবং দন্ত আবদ্ধ হয় অথবা দন্তে দন্তে ঘর্ষণ চলিতে থাকে। অপমানকারীকে আঘাত করিবার জন্য মুষ্টিবদ্ধ হাত তোলা, তাহাকে চলিয়া যাইতে বলা, ধাক্কা দেওয়া, আঘাত করা, এমন কি প্রাণহীন বস্তুকেও আঘাত বা আছাড় দেওয়া ক্রোধের সাধারণ লক্ষণ। ক্রুদ্ধ শিশুরা উপুড় বা চিৎ হইয়া মাটিতে গড়াগড়ি দিয়া চিৎকার করিতে থাকে এবং নাগালের মধ্যে যে বস্তু পায় তাহা আঁচড়াইতে, লাথি মারিতে অথবা কামড়াইতে থাকে।

কিন্তু ক্রোধে পেশীতন্ত্র অন্যভাবে সক্রিয় হয়। প্রবল ক্রোধে পেশীর কম্পন ঘটিয়া থাকে। ওষ্ঠ অসাড়, কণ্ঠ রুদ্ধ অথবা উচ্চ এবং কর্কশ হইয়া পড়ে। ক্রুদ্ধ অবস্থায় বেশি কথা বলিলে, মুখ দিয়া ফেনা বাহির হইতে থাকে। ক্রোধে চুল কণ্টকিত এবং কপাল মাঝে মাঝে কুঞ্চিত হয়। চোখ দিয়া যেন আগুন ঠিক্‌রাইয়া পড়ে এবং কোটর হইতে যেন চোখ বাহির হইয়া আসিতে চায়।

মনের দিক হইতে ক্রোধ বিরুদ্ধতা বা প্রতিকূলতা চূর্ণ করিতে চায়। এই প্রক্ষোভটির লক্ষণ হইল সক্রিয় বিরোধিতা এবং আক্রমণ, যেমন ভয়ের লক্ষণ হইল অসহায়বোধ এবং পলায়ন। জ্ঞানের নিম্নতর অবস্থায় ক্রোধ নিকটবর্তী সকল বস্তুকেই ভাঙ্গিতে, ছিঁড়িতে এবং ধ্বংস করিতে চায়। যেমন একই দলভুক্ত একটি কুকুরের

ডাকে অন্যান্য কুকুর ক্রুদ্ধ হয় এবং আক্রমণ করিবার মত কিছু না দেখিয়া পরস্পরকে আক্রমণ করিয়া বসে। কিন্তু জ্ঞানের উচ্চতর স্তরে ক্রোধ অধিকতর জটিল আকার ধারণ করে এবং চিন্তন বিকাশের ফলে বাস্তব কারণে সীমাবদ্ধ হয়।

স্টাউট্‌ মনোবিকাশের বিভিন্ন স্তরগুলির সহিত সম্বন্ধ ক্রোধের বিভিন্ন আকার-গুলির বর্ণনা করিয়াছেন। **প্রাথমিক স্তরে** যোগ্যাযোগ্য বিচার না করিয়া ক্রোধ যে কোনো বস্তুর দিকেই ধাবিত হয়। **জ্ঞানমূলক চেতনা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে** ক্রোধের প্রকাশ স্পষ্টতর হইয়া ওঠে। এই অবস্থায় ক্রোধ সম্মুখস্থ যে কোনো বস্তুর দিকে আর চালিত হয় না, কিন্তু যে ব্যক্তি ক্রোধের কারণ তাহার দিকে চালিত হয়। শারীরিক বলপ্রয়োগই ক্রোধপ্রকাশের সাধারণ উপায়। কিন্তু **উচ্চতর মানস-বিকাশের স্তরে** শারীরিক বলপ্রয়োগের পরিবর্তে বিরুদ্ধ শক্তিগুলি যে আমাদের শক্তির নিকট পরাভূত হইয়াছে এই কল্পনা বা জ্ঞানই হয়ত যথেষ্ট। চিন্তনের বিকাশই এইরূপ কল্পনা বা জ্ঞানের কারণ।

ক্রোধ এবং ভয় এই দুইটি প্রক্ষোভকে ক্যানন্‌ জরুরী প্রক্ষোভ (Emergency emotion) **বলিয়াছেন**। ক্রোধ জরুরী অবস্থার সম্মুখীন হইয়া উহাকে পরাভূত করিবার চেষ্টা করে এবং ভয় উহার সহিত আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া পলায়ন প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন করে। ভয়ের তুলনায় ক্রোধ অধিকতর বলশালী। আবার প্রথমটির তুলনায় দ্বিতীয়টি অধিকতর বহির্ক্রিয় এবং কম দুঃখদায়ক প্রক্ষোভ।

(গ) **হর্ষ ও বিষাদ** সুখ দুঃখ বেদনার তুলনায় হর্ষ ও বিষাদ উন্নততর অনুভূতি, কারণ ইহারা উৎপন্ন হয় কোনো সমগ্র পরিস্থিতির প্রত্যক্ষ, কল্পনা বা চিন্তন হইতে। কোনো ইচ্ছার বা ইচ্ছামূলক প্রবণতার পরিপূর্তি হইলে, হর্ষ এবং উহার ব্যর্থতা ঘটিলে, বিষাদ উপস্থিত হয়।

হর্ষ ও বিষাদ সকল প্রক্ষোভের মূলগত অনুভূতি, কারণ সকল প্রক্ষোভই হর্ষ অথবা বিষাদের দ্বারা অনুরঞ্জিত হয়। কিন্তু **ম্যাক্‌ডুগ্যাল্‌**-এর মতে হর্ষ ও বিষাদ মৌলিক (simple), প্রক্ষোভ নয়, কিন্তু উৎপন্ন (derived) প্রক্ষোভ, কারণ হর্ষ ও বিষাদ ইচ্ছার পূরণ অথবা অপূরণ হইতে উদ্ভূত হয়। বিষাদ সাধারণতঃ পশ্চাদ্দর্শী (Retrospective) প্রক্ষোভ, কারণ ইহা পশ্চাতে তাকায়। অতীত ব্যর্থতা হইতেই দুঃখের বা বিষাদের উৎপত্তি। আবার হর্ষ প্রধানতঃ সম্মুখদর্শী (Prospective)। ইহা সম্মুখে তাকায়, কারণ ইচ্ছার পরিপূর্ণতা হইতেই হর্ষের উৎপত্তি।

শরীরের উপর হর্ষ ও বিষাদের ক্রিয়া বিপরীত। এই ক্রিয়া সুখদুঃখবেদনার অনুরূপ, যদিও অধিকতর জটিল এবং সর্বাঙ্গীণ। নাড়ী, শ্বাস-প্রশ্বাস, রক্তচলাচল, হজমক্রিয়া প্রভৃতির উপর হর্ষ সুস্থ প্রভাব এবং বিষাদ অসুস্থ প্রভাব বিস্তার করে।

ইহাদের **প্রকাশও** বিপরীত। হর্ষান্বিত ব্যক্তি সোজা হইয়া দাঁড়ায়। তাহার বক্ষ প্রসারিত হয়, চোখ উজ্জ্বল এবং মুখমণ্ডল হাস্যময় হয়। সে হয়ত আনন্দে লাফাইয়া ওঠে, অন্য ব্যক্তির সহিত বেশী মেলামেশা করে। আবার বিষাদগ্রস্ত ব্যক্তির চক্ষু দিয়া জল বাহির হয়, সে দুঃখভারে নোয়াইয়া পড়ে, তাহার বক্ষ সঙ্কুচিত হয় এবং দেহ শিথিল হইয়া বা এলাইয়া পড়ে।

(ঘ) **ভালবাসা** (Love) :—ভালবাসা প্রক্ষোভটি নানা অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। **সঙ্কীর্ণ অর্থে** ইহা যৌন বা কামজ লিপ্সার নামান্তর। এই ভালবাসা সাধারণতঃ স্বার্থপর, কারণ ব্যক্তির নিজ কামনা পরিতৃপ্ত হইলেই ইহার চরিতার্থতা ঘটে।

ব্যাপক অর্থে ভালবাসা একটি পরার্থপর বা সামাজিক প্রক্ষোভ। অনুরাগ এবং সহানুভূতি ইহার প্রধান লক্ষণ। ভালবাসায় এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির সুখদুঃখের সহিত আপন সুখদুঃখ অভিন্ন অনুভব করে, উহাকে আদর করে এবং সপ্রশংস দৃষ্টিতে দেখে। মাতৃস্নেহ ভালবাসার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। উচ্চতর স্তরে কোনো আদর্শ ভালবাসার বস্তু হইতে পারে—যেমন ভক্তের ভালবাসা ভগবানের প্রতি অথবা শিল্পীর ভালবাসা সৌন্দর্যের প্রতি। এই উচ্চতর অনুভূতিগুলি প্রক্ষোভের তুলনায় উন্নততর রস (Sentiment)।

(ঙ) **ঘৃণা** (Hate) :—ভালবাসার বিপরীত প্রক্ষোভ হইল ঘৃণা। ঘৃণ্য বস্তু বা ব্যক্তি আকর্ষণ না করিয়া আমাদিগকে দূরে সরাইয়া রাখে।

ম্যাক্‌ডুগ্যাল্‌-এর মতে ঘৃণা মৌলিক নয়, কিন্তু যৌগিক প্রক্ষোভ। ইহাতে মিশ্রিত থাকে ক্রোধ ভয় এবং বিতৃষ্ণা। ভালবাসা সুস্থ, কিন্তু ঘৃণা অসুস্থ প্রক্ষোভ। প্রথমটিতে আমাদের সত্তা প্রসারিত এবং দ্বিতীয়টিতে সঙ্কুচিত হয়। আবার প্রথমটি পরার্থপর বা সামাজিক এবং গঠনমূলক, কিন্তু দ্বিতীয়টি স্বার্থপর, অসামাজিক এবং ধ্বংসমূলক প্রক্ষোভ।

(চ) **সহানুভূতি** (Sympathy) :—অপরের অনুভূতির সহিত নিজ অনুভূতির নাম সহানুভূতি। অপরের সুখে সুখী এবং দুঃখে দুঃখী হওয়াই সহানুভূতির লক্ষণ।

সহানুভূতি একটি পরার্থকেন্দ্রিক প্রক্ষোভ। ইহা সহজাত, অনৈচ্ছিক এবং সকলের, এমন কি শিশুর মধ্যেও, দেখা যায়। শিশু তাহার মাতাকে হাসিতে দেখিলে হাসে এবং কাঁদিতে দেখিলে কাঁদে। অনুকরণ প্রবৃত্তিই সহানুভূতির মূল কারণ। একটি কুকুর ঘেউ ঘেউ করিলেই, দলের অন্যান্য কুকুর সহজাত অনুকরণ প্রবৃত্তির বশবর্তী হইয়া ঘেউ ঘেউ করে।

উচ্চতর সহানুভূতিতে যেমন পরের সুখদুঃখের অনুভূতি ঘটে, তেমন অবগতিমূলক এবং ইচ্ছামূলক মানসবৃত্তি ঘটিয়া থাকে। সুখদুঃখ প্রভৃতির বহিঃপ্রকাশের প্রত্যক্ষ, অর্থবোধ, নিজেকে অপরের অবস্থায় কল্পনা করা এবং চিন্তন সাহায্যে অপরের অনুভূতি বুঝিতে পারা, এই সবগুলিই অনুভূতি কারণ।

সহানুভূতি সম্ভব হয় সম-অবস্থাযুক্ত ব্যক্তির মধ্যে। ক্রোড়পতি দরিদ্রকে করুণা করিতে পারে, কিন্তু দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতিশীল হইতে পারে না। সম-অবস্থার ব্যক্তিই নিজকে অপরের অবস্থায় কল্পনা করে।

সমানুভূতি (Empathy)[১] :—সহানুভূতি এবং সমানুভূতির পার্থক্য উল্লেখযোগ্য। সহানুভূতিতে দুই ব্যক্তির মধ্যে 'সাহিত্য' বা সাদৃশ্য অনুভূতি হয়। ইহাতে এক ব্যক্তি নিজেকে অপর ব্যক্তির সহিত অভিন্ন অথবা এক বলিয়া বোধ করে না। কিন্তু সমানুভূতিতে এক ব্যক্তি যেন অপরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার সহিত একাত্মতা বা অভিন্নতা বোধ করে। শিশুরা ঘুড়ি উড়াইয়া আনন্দ পায়, কারণ তাহারা উহার সহিত এমন অভিন্নতা বোধ করে যে তাহাদের মনে হয় যেন তাহারাই আকাশে ঘুড়ি হইয়া উড়িতেছে। কল্পনায় মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাব অতিক্রম করিয়া তাহারা আনন্দ অনুভব করে।

৫। প্রক্ষোভের প্রচলিত কেন্দ্রীয় মতবাদ

(Traditional, or Central Theory of Emotion)

প্রক্ষোভের বিশ্লেষণ করিলে নিম্নলিখিত উপাদানগুলি পাওয়া যায় :—

(১) প্রত্যক্ষ, প্রতিরূপ বা ধারণা, যাহা প্রক্ষোভ উৎপন্ন করে, (২) এই মানস ক্রিয়াগুলির সহিত সংশ্লিষ্ট কতগুলি কেন্দ্রীয় বা মস্তিষ্কগত ক্রিয়া, (৩) প্রক্ষোভের সুখ-দুঃখাত্মক অনুভূতি, (৪) এই অনুভূতির সহকারী কতগুলি শারীর প্রকাশ, যেমন নাড়ী, শ্বাস-প্রশ্বাস, হৃদ্‌যন্ত্র, রক্তসঞ্চালন, অন্তঃরক্ষা এবং বহিঃরক্ষা গ্রন্থির রসক্ষরণ, পেশীজ ক্রিয়ার পরিবর্তন এবং (৫) প্রক্ষোভ অনুভূতির ফলস্বরূপ

১ উডওয়ার্থ অ্যাণ্ড মার্কুইস—সাইকলজি (প্রথম এশীয় সংস্করণ) পৃঃ ৩৩৯—৩৪০

প্রতিক্রিয়া।

উদাহরণ: কেহ হয়ত বাঘ দেখিয়া ভয় পাইল। ব্যাঘ্রপ্রত্যক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া ভীতিজনক পরিস্থিতির উপলব্ধি পর্যন্ত মানস ক্রিয়াগুলি দুঃখবেদনাময় এবং ইহারা সাধিত হয় কতগুলি মস্তিষ্কীয় বা কেন্দ্রীয় ক্রিয়ার সহযোগিতায়। ব্যাঘ্র দর্শনের ফলে শারীরযন্ত্রের নানা পরিবর্তন হইল, যেমন ভীত ব্যক্তির মুখ বিবর্ণ হইয়া শুকাইয়া গেল, বুকটা ঢিপ্ ঢিপ্ করিতে লাগিল, সর্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল, হাত-পা অসাড় বোধ হইল এবং সে পলায়ন করিল, বা মূর্ছিত হইল। প্রক্ষোভের উল্লিখিত ব্যাখ্যা প্রচলিত মতবাদের উপর নির্ভরশীল। কেন্দ্রীয় প্রচলিত মতবাদ অনুসারে প্রক্ষোভের প্রথম প্রধান কারণ হইল কোনো বস্তু, ব্যক্তি বা পরিস্থিতির প্রত্যক্ষ, প্রতিরূপ বা ধারণা। এই কারণটি মুখ্যতঃ কেন্দ্রীয় বা মস্তিষ্কগত, যেহেতু প্রত্যক্ষ, প্রতিরূপ বা ধারণা দৈহিক দিক হইতে নার্ভকেন্দ্রের বা মস্তিষ্কের ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ। প্রক্ষোভ উৎপন্ন হইলেই উহার ফলস্বরূপ নানা যান্ত্রিক, গ্রন্থীয় এবং পেশীয় সংবেদন বা প্রকাশ ঘটে এবং ইহাদের ফলে প্রক্ষোভের প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন হয়। তাহা হইলে **প্রচলিত মত অনুসারে প্রথমে প্রত্যক্ষ, প্রতিরূপ বা ধারণা, এই কেন্দ্রীয় ক্রিয়াগুলি ঘটে, উহাদের ফলে প্রক্ষোভ উৎপন্ন হয়, আবার প্রক্ষোভের ফলে দেহযন্ত্রীয় নানা প্রকাশ দেখা দেয় এবং উহাদের ফলে প্রতিক্রিয়া ঘটে।**

কিন্তু জেম্‌স্-ল্যাঙ্গ্ প্রক্ষোভের প্রচলিত মত স্বীকার করেন নাই।

৬। প্রক্ষোভের জেম্‌স্-ল্যাঙ্গ্ মতবাদ
(James-Lange Theory of Emotion)

অ্যামেরিকান মনোবিদ্ উইলিয়াম্ জেম্‌স্ এবং ড্যানিশ্ শারীরবৃত্তবিদ্ সি. জি. ল্যাঙ্গ্ প্রক্ষোভের যে মতবাদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা প্রচলিত বা কেন্দ্রীয় মতবাদের বিপরীত। জেম্‌স্ এবং ল্যাঙ্গ্ স্বাধীনভাবে, যথাক্রমে ১৮৮৪ এবং ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে, প্রক্ষোভের যে দুইটি মতবাদের অবতারণা করিয়াছেন উহারা আসলে অভিন্ন, সুতরাং যুক্তভাবে জেম্‌স্-ল্যাঙ্গ্ মতবাদরূপে পরিচিত।

জেম্‌স্-ল্যাঙ্গ্ মনে করেন যে প্রক্ষোভের উদ্দীপক কারণ প্রথমেই প্রক্ষোভ উৎপন্ন করে না, অথবা প্রত্যক্ষ, প্রতিরূপ বা ধারণা জাতীয় কেন্দ্রীয় ক্রিয়ার ফলে প্রক্ষোভ ঘটে না। **এই মতানুসারে প্রক্ষোভের উদ্দীপক কারণ প্রথমেই আভ্যন্তরীণ দেহযন্ত্রের নার্ভকেন্দ্রকে উদ্দীপিত করিয়া নানা প্রকার যান্ত্রিক সংবেদন ঘটায় এবং এই যান্ত্রিক সংবেদনগুলির ফলে যে মানসবৃত্তি উৎপন্ন**

হয় তাহাই প্রক্ষোভ। প্রচলিত মতানুসারে প্রকাশের কারণ প্রক্ষোভ, কিন্তু জেমস্-ল্যাঙ্গ্ মতানুসারে প্রক্ষোভের কারণ প্রকাশ।

জেমস্-এর প্রসিদ্ধ মনোবিদ্যাগ্রন্থ "প্রিনসিপ্‌ল্‌স্ অফ্ সাইকলজি" হইতে তাঁহার মতব্যাখ্যার একটি প্রসিদ্ধ অংশ উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

"এই স্থূল প্রক্ষোভগুলি সম্বন্ধে আমাদের সাধারণ চিন্তাধারা এই যে কোনো ঘটনার মানসিক প্রত্যক্ষ প্রক্ষোভ নামক মানস অনুভূতি উৎপন্ন করে এবং শেষোক্ত মানসবৃত্তি দৈহিক প্রকাশ ঘটায়। পক্ষান্তরে আমার মতবাদ এই যে উদ্দীপক ঘটনা প্রত্যক্ষ হইবার ঠিক পরেই দৈহিক পরিবর্তনগুলি ঘটিয়া থাকে এবং এই পরিবর্তনগুলি ঘটিবার ফলে উহাদের যে অনুভূতি হয় তাহাই প্রক্ষোভ। সাধারণ জ্ঞানবশে আমরা বলিয়া থাকি যে আমরা আমাদের দুর্ভাগ্যের জন্য দুঃখিত হইয়া কাঁদি, ভালুক দেখিয়া ভীত হইয়া পলায়ন করি, প্রতিদ্বন্দ্বীর নিকট অপমানিত হইয়া ক্রোধবশে তাহাকে আঘাত করিয়া বসি। কিন্তু যে মতটি বর্তমানে সমর্থিত হইতেছে তদনুসারে এই ঘটনাক্রম ভ্রান্ত। একটি মানসবৃত্তি আর একটি মানসবৃত্তির দ্বারা প্রবর্তিত হয় না। দৈহিক প্রকাশগুলি উহাদের মধ্যবর্তী থাকে। এইরূপ বলাই অধিক যুক্তিযুক্ত যে আমরা কাঁদি বলিয়াই দুঃখিত হই, আঘাত করি বলিয়াই ক্রুদ্ধ হই, কাঁপি বলিয়াই ভীত হই, কিন্তু দুঃখিত, ক্রুদ্ধ এবং ভীত হই বলিয়া যথাক্রমে কাঁদি না, আঘাত করি না এবং কাঁপি না।"

জেমস্ আরও বলিতেছেন, "দৈহিক পরিবর্তনগুলি যাহাই হউক না কেন, উহার প্রত্যেকটি ঘটিবামাত্র তীক্ষ্ণ বা অস্পষ্টভাবে অনুভূত হয়।" আবার "আমরা যদি কোনো প্রবল প্রক্ষোভের কল্পনা করি এবং উহার চেতনা হইতে সকল দৈহিক লক্ষণগুলি বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা করি, আমরা দেখি যে উহার কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকে না। কোনো মানস 'উপাদানই' থাকে না যাহা দ্বারা প্রক্ষোভটি গঠিত হইতে পারে এবং যাহাও বা অবশিষ্ট থাকে, তাহা শুধু একটি শুষ্ক এবং নিরপেক্ষ বুদ্ধিমূলক প্রত্যক্ষ ক্রিয়া"। জেমস্ আরও বলিতেছেন, "আমার শরীর যদি অসাড় হইত তাহা হইলে কি কোমল কি কঠোর, সকল অনুভূতি হইতেই আমি বঞ্চিত হইতাম এবং শুধু অবগতি বা বুদ্ধিমূলক সত্তা বহন করিতাম।"

জেমস্-এর মতে "প্রক্ষোভ উৎপাদক বস্তু দৈহিক পরিবর্তন ঘটায় একটি পূর্বগঠিত দেহযন্ত্রের দ্বারা। এই পরিবর্তন এমন সূক্ষ্ম এবং অসংখ্য যে সমগ্র

দেহযন্ত্রকে বলা চলে একটি শব্দায়মান ফলক যাহাতে প্রত্যেকটি চেতনা-পরিবর্তন ঝঙ্কৃত হয়।" অধিকন্তু "প্রত্যেকটি দৈহিক পরিবর্তন কতগুলি উপাদানের সমষ্টি। উপাদানগুলি হইল দেহযন্ত্রের পরিবর্তন এবং প্রত্যেকটি পরিবর্তনই উদ্দীপক বস্তুর প্রতিবর্তী ফল।"

তাহা হইলে, জেম্‌স্-এর মতানুসারে **প্রত্যক্ষকে কেন্দ্র করিয়া যে যান্ত্রিক সংবেদনগুচ্ছ প্রতিবর্তরূপে উদ্দীপিত হয়, তাহাই প্রক্ষোভ।** মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে সমগ্র প্রক্ষোভচেতনাকে প্রতিবর্তরূপে উৎপন্ন যান্ত্রিক সংবেদনে পরিণত করা যায়।

সি. জি ল্যাঙ্গ্-এর মত : জেম্‌স্-এর সহিত কোনোরূপে সম্পর্কিত না হইয়াই সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে সি. জি. ল্যাঙ্গ্ মূলতঃ একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। জেম্‌স্ এবং ল্যাঙ্গ্ উভয়ের মতেই প্রক্ষোভ কতগুলি শারীর প্রকাশ, পরিবর্তন বা সংবেদন মাত্র। জেম্‌স্ যান্ত্রিক সংবেদনের উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। কিন্তু ল্যাঙ্গ্ বাহ্যনিয়ামক ([illegible]) পরিবর্তনের উপর বেশী জোর দিয়াছেন। তিনি বলেন যে "প্রক্ষোভের উদ্দীপক যদি বাহ্যনিয়ামক যন্ত্রকে সক্রিয় না করিত তাহা হইলে আমরা উদাসীন বা নিস্পৃহ জীবন যাপন করিতাম।" এইরূপ অবস্থায় বাহ্যজগতের সংবেদন আমাদের অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করিত এবং জ্ঞান বাড়াইত, কিন্তু না করিত সুখ উৎপাদন, না প্রবৃত্ত করিত ক্রোধে, না অবনমিত করিত উদ্বেগে, না অভিভূত করিত ভয়ে। প্রক্ষোভের জন্য বাহ্যনিয়ামক যন্ত্রকেই ধন্যবাদ দিতে হয়।

সুতরাং ল্যাঙ্গ্-এর মতানুসারে প্রক্ষোভের দুইটি অংশ। প্রথমটি হইল উহার সংবেদনরূপ কারণ যাহা স্মরণের অথবা অনুষক্ত ধারণার সাহায্যে কাজ করে। আবার দ্বিতীয়টি হইল উহার কার্য, অর্থাৎ প্রতিবর্তরূপ উৎপন্ন বাহ্যনিয়ামক পরিবর্তনগুলি, যেমন বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে রক্তসঞ্চালন এবং উহাদের উপর নির্ভরশীল মানসিক ও দৈহিক পরিবর্তনগুলি। তাঁহার মতেও এই দুইয়ের মধ্যবর্তী কোনো বেদনা নাই। **প্রক্ষোভ শেষোক্ত পরিবর্তনগুলিরই নামান্তর।**

জেম্‌স্ ল্যাঙ্গ্ মতবাদের সপক্ষে যুক্তি : জেম্‌স-ল্যাঙ্গ্ মতবাদের স্বপক্ষে যুক্তিগুলি সংক্ষিপ্তভাবে এইপ্রকার :—

(১) প্রক্ষোভ হইতে উহার শারীরিক প্রকাশগুলির বেদনা বিচ্ছিন্ন করিলে প্রক্ষোভ থাকে না, থাকে একটি শুষ্ক এবং সুখদুঃখনিরপেক্ষ

বুদ্ধিমূলক প্রত্যক্ষ।

(২) **বস্তুশূন্য বা অমূলক প্রক্ষোভও** (objectless emotion) **প্রচলিত মতে ব্যাখ্যাত হয় না।** মানসরোগী বিনা কারণেই ভীত, ক্রুদ্ধ বা অন্য প্রকারে প্রক্ষুব্ধ হইতে পারে। তাহার প্রক্ষোভের মূলে প্রায়ই বাস্তব প্রত্যক্ষ থাকে না, কিন্তু থাকে শুধু যান্ত্রিক সংবেদন বা প্রকাশ। সুতরাং এই প্রকার 'ভাসমান' বা শূন্য প্রক্ষোভ আসলে যান্ত্রিক সংবেদন বা প্রকাশেরই নামান্তর।

(৩) **প্রক্ষোভের যান্ত্রিক প্রকাশের কৃত্রিম উৎপাদনে উহা উৎপন্ন হয়।** যেমন অভিনেতারা ক্রোধ, ভয়, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি প্রক্ষোভগুলির বহিঃপ্রকাশ অনুকরণ করিয়া উহাদের অনুভব করিয়া থাকেন।

(৪) **প্রক্ষোভ এবং উহার যান্ত্রিক প্রকাশ অভিন্ন, কারণ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রক্ষোভ বাড়িয়া যায়।** পলায়ন করিতে বা কাঁদিতে আরম্ভ করিলেই ভয় বা দুঃখ আরও পাইয়া বসে।

(৫) **প্রক্ষোভের প্রকাশ দমন করিলেই প্রক্ষোভ অন্তর্হিত হয়।** যেমন পলায়ন না করিলে অথবা না কাঁদিলে ভয় এবং দুঃখ তিরোহিত হয়।

এইরূপে প্রতিপন্ন হয় যে যান্ত্রিক প্রকাশ বা সংবেদন ঘটিলেই প্রক্ষোভ ঘটে এবং উহারা না ঘটিলে প্রক্ষোভ ঘটে না। সুতরাং প্রক্ষোভ প্রকাশ বা সংবেদনেরই নামান্তর।

৭। জেম্‌স-ল্যাঙ্গ্‌ মতবাদের সমালোচনা

জেম্‌স্‌-ল্যাঙ্গ্‌ মতবাদ অভিন্ন। সুতরাং জেম্‌স্‌-এর মতের বিরুদ্ধে উত্থাপিত আপত্তিগুলি ল্যাঙ্গ্‌-এর মতের বিরুদ্ধেও প্রযোজ্য।

(১) জেম্‌স্‌-ল্যাঙ্গ মতবাদ **নূতন নয়।** অ্যারিস্টট্‌ল্‌, মেলব্রান্স, দেকার্তে, স্পিনোজা প্রভৃতি দার্শনিক যান্ত্রিক এবং বাহনিয়ামক সংবেদনই প্রক্ষোভ, এইরূপ মত ল্যাঙ্গ ও জেম্‌স-এর বহুপূর্বে উপস্থাপিত করিয়াছেন।

(২) জেম্‌স্‌-এর প্রথম যুক্তিতে বলা হইয়াছে যে কোনো প্রক্ষোভ হইতে উহার শারীর প্রকাশ বিচ্ছিন্ন করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা প্রক্ষোভ নয়, কিন্তু শুষ্ক বুদ্ধিক্রিয়া। এই যুক্তিতে অবশ্যই প্রমাণিত হয় যে **প্রক্ষোভ উহার যান্ত্রিক প্রকাশ হইতে অবিচ্ছেদ্য।**

জেম্‌স্‌ এইটুকু বলিয়াই ক্ষান্ত নহেন। তিনি ইহার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে প্রক্ষোভ এবং উহার যান্ত্রিক প্রকাশ অভিন্ন অথবা আসলে একই বস্তু। কিন্তু

জেম্‌স-এর এই সিদ্ধান্ত তাঁহার যুক্তিকে অনুসরণ করে না। **দুইটি বস্তু সংযুক্ত হইলেই, উহারা অভিন্ন, এইরূপ প্রতিপন্ন হয় না।** এই সমালোচনা প্রসঙ্গে স্টাউট-এর বক্তব্য এইরূপ। —একটি জলাশয়ের তরঙ্গ সৃষ্টি না করিয়া উহাতে ঢিল পড়িতে পারে না। কিন্তু ঢিল নিক্ষেপ এবং তরঙ্গ এক বা অভিন্ন নয়। অনুরূপ যুক্তিতে বলা যায় যে ভয়, ক্রোধ, হর্ষ, শোক প্রভৃতি প্রক্ষোভ উহাদের যান্ত্রিক সংবেদন বা প্রকাশ না ঘটিলে ঘটিতে পারে না। কিন্তু তাই বলিয়া উহারা এক বা অভিন্ন এইরূপ সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক। **এইরূপ যুক্তিতে সহভাবের সহিত কার্য-কারণ ভাবের ভ্রম** (mistaking co-existense for causation) **ঘটে।**

(৩) জেম্‌স্ বলিয়াছেন যে বস্তুশূন্য বা অমূলক প্রক্ষোভের মূলে কেন্দ্রীয় ক্রিয়া নাই (অর্থাৎ ইহা প্রত্যক্ষ, প্রতিরূপ বা ধারণা হইতে উৎপন্ন হয় না), কিন্তু আছে শুধু বহিঃপ্রান্তীয় যান্ত্রিক প্রকাশ বা সংবেদন। সুতরাং এইরূপ প্রক্ষোভ অবশ্যই উহার যান্ত্রিক প্রকাশ বা সংবেদনের সহিত অভিন্ন।

বস্তুশূন্য বা অমূলক প্রক্ষোভ স্বভাবী জীবনে খুব কমই ঘটিয়া থাকে। কিন্তু অস্বভাবী জীবনে উহার অস্তিত্ব অনস্বীকার্য। মত্ততার কোনো অবস্থায় হয়ত মাতাল তাহার চারিদিকেই ইঁদুর ছুটিয়া বেড়াইতেছে দেখিতে পায়। ভ্রম-বাতুল রোগী নানাপ্রকার অমূলক উদ্বেগ, ভয়, ক্রোধ প্রভৃতি প্রক্ষোভ অনুভব করে, অথচ আপাত-দৃষ্টিতে এইরূপ অনুভূতির বাস্তব হেতু নাই।

কিন্তু অমূলক বা বস্তুশূন্য প্রক্ষোভের সত্যতা স্বীকার করিলেও, উহা যে শুধু যান্ত্রিক প্রকাশ বা সংবেদনেরই নামান্তর, এইরূপ সিদ্ধান্ত অমূলক। আসলে মানস-রোগীর এইরূপ **বস্তুশূন্য প্রক্ষোভের কারণ তাহার প্রক্ষোভ-স্বভাব যাহা অতীত প্রত্যক্ষ, কল্পনা অথবা ধারণা হইতে গঠিত হইয়াছে।**

অধিকন্তু **মনোবিদ্যার দিক হইতে** তথাকথিত বস্তুশূন্য প্রক্ষোভ আসলে বস্তুশূন্য বা নির্বিষয় নয়। মাতাল ইঁদুর দেখিতেছে, অথচ ইঁদুর নাই। এই ক্ষেত্রে কল্পিত ইঁদুরই প্রক্ষোভের বিষয়। সুতরাং **প্রক্ষোভ বস্তুশূন্য নয়।**

(৪) জেম্‌স্ বলেন যে যান্ত্রিক প্রকাশের কৃত্রিম উৎপাদনে প্রক্ষোভের সৃষ্টি হয়। ইহা স্বীকার করিলেও, এইরূপ সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক যে প্রক্ষোভ কৃত্রিম যান্ত্রিক প্রকাশের সহিত অভিন্ন। প্রথমতঃ, বুঝিতে হইবে কি উপায়ে কৃত্রিম যান্ত্রিক প্রকাশ-গুলি উৎপন্ন হয়। ইহারা উৎপন্ন হয় প্রক্ষোভের বিষয়ের কল্পনা, ধারণা বা চিন্তন হইতে। **যে অভিনেতা অভিনীত চরিত্রের সহিত কাল্পনিক একাত্মতা বোধ**

করিতে পারেন, তাঁহার পক্ষেই ঐ চরিত্রের অনুভূতি, আবেগ বা প্রক্ষোভের অভিনয় সম্ভব। এই প্রক্ষোভ প্রথমে অস্পষ্ট। উহার প্রকাশের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া উহা স্পষ্টতর বা তীব্রতর হইতে থাকে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে এই ক্ষেত্রে প্রক্ষোভ হইতেই যান্ত্রিক প্রকাশ উৎপন্ন হয়। এই যান্ত্রিক প্রকাশ কৃত্রিম, যেহেতু প্রক্ষোভের কারণও কল্পিত বা কৃত্রিম।

(৫) জেম্‌স্ বলেন, প্রক্ষোভের যান্ত্রিক প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রক্ষোভ বাড়িতে থাকে, সুতরাং যান্ত্রিক প্রকাশই প্রক্ষোভের কারণ। কিন্তু কথাটি আপাতদৃষ্টিতে সত্য হইলেও, আসলে মিথ্যা। অবদমিত প্রক্ষোভের প্রকাশ আরম্ভ কালে প্রক্ষোভ বাড়ায়। যাহারা নিদারুণ শোকেও দুঃখ প্রকাশ করে না, অবদমিত দুঃখ তাহাদের মনে এক প্রকার দুঃখ-স্বভাব সৃষ্টি করে। একবার কাঁদিতে আরম্ভ করিলে, নিরুদ্ধ শোক যেন আরও উথলিয়া ওঠে। কিন্তু প্রক্ষোভের প্রকাশ উহার প্রাথমিক বৃদ্ধি ঘটাইলেও, পরে আর উহার বৃদ্ধি ঘটায় না। প্রকাশের ফলে প্রক্ষোভের প্রাথমিক বৃদ্ধি ধীরে ধীরে কমিয়া আসে। পর্যাপ্ত প্রকাশের ফলে দুঃখ প্রভৃতি প্রক্ষোভের তীব্রতা হ্রাস পায়।

সুতরাং প্রকাশের সহিত প্রক্ষোভ বাড়িয়া যায়, অতএব প্রক্ষোভ প্রকাশের সহিত অভিন্ন, জেম্‌স্-এর এইরূপ যুক্তি গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে হয় না।

(৬) জেম্‌স্ বলিয়াছেন যে যেহেতু যান্ত্রিক প্রকাশ দমন করিলে প্রক্ষোভও দমিত হয়, সুতরাং ইহারা অভিন্ন। কিন্তু এই যুক্তিও স্বীকার্য নয়। প্রক্ষোভের প্রকাশ দমন করিবার চেষ্টা করিলে, প্রক্ষোভ না কমিয়া বাড়িয়াই যায়। অবদমিত প্রক্ষোভের ফলে প্রক্ষোভ-স্বভাবের সৃষ্টি হয় এবং উহা বিকৃতভাবে আত্মপ্রকাশ করে, তাহা ছাড়া, অবদমনের চেষ্টায় শারীরিক ও মানসিক বৈকল্যও ঘটিতে পারে, যথা স্নায়ুদৌর্বল্য প্রভৃতি।

(৭) জেম্‌স্ ওয়ার্ড তাঁহার "সাইকলজিক্যাল প্রিন্‌সিপল্‌স (Psychological Principles)" গ্রন্থে প্রচলিত মতের সমর্থনে বলিয়াছেন যে প্রত্যক্ষ, প্রতিরূপ বা ধারণা হইতে যান্ত্রিক প্রকাশগুলি সোজাসুজিভাবে উৎপন্ন হয় না, কিন্তু হয় উহাদের মধ্যবর্তী বুদ্ধিক্রিয়া অথবা কেন্দ্রীয় ক্রিয়ার মধ্য দিয়া। একটি পরিস্থিতির জ্ঞান হইতে প্রক্ষোভ এবং প্রক্ষোভ হইতে উহার যান্ত্রিক প্রকাশ উৎপন্ন হয়। ওয়ার্ড পরিহাসচ্ছলে বলিয়াছেন, "জেম্‌স্‌কে প্রথমে একটি পিঞ্জরাবদ্ধ এবং পরে একটি মুক্ত ভালুকের সম্মুখীন করা হউক। প্রথমটিকে তিনি উপহার দিবেন পিষ্টক,

কিন্তু দ্বিতীয়টিকে তাঁহার পায়ের পরিষ্কার গোড়ালি দুইটি।” পিঞ্জরাবদ্ধ ভালুককে জেম্‌স্‌ যে পরিস্থিতিতে দেখিবেন, মুক্ত ভালুককে তাহা হইতে ভিন্ন পরিস্থিতিতে দেখিবেন। প্রথমটি তাঁহার মনে জাগাইবে কৌতুক অনুভূতি বা আমোদ, আর দ্বিতীয়টি ভয়। প্রথম পরিস্থিতির লঘুতা এবং দ্বিতীয় পরিস্থিতির গুরুত্ব-জ্ঞানই যথাক্রমে পিষ্টক উপহার এবং পলায়ন এই দুইটি বিপরীত যান্ত্রিক প্রকাশের কারণ।

সুতরাং প্রক্ষোভ উহার বহিঃপ্রকাশের দ্বারা উৎপন্ন হয় না, কিন্তু উৎপন্ন হয় উহার কেন্দ্রীয় বা মস্তিষ্কগত ক্রিয়ার দ্বারা।

(৮) ম্যাকৃডুগ্যাল, স্টাউট প্রভৃতি মনোবিদ্‌গণ জেম্‌সীয় মতবাদের একটি গুরুতর ত্রুটির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন যে ইচ্ছামূলক ক্রিয়ার সহিত প্রক্ষোভের সম্বন্ধ অতিশয় ঘনিষ্ঠ। ইচ্ছামূলক ক্রিয়ার পূরণ বা ব্যাঘাত হইতেই প্রক্ষোভ উৎপন্ন হয়। এই কারণে স্টাউট্‌ প্রক্ষোভের ‘পরগাছা-সুলভ প্রকৃতির (Parasitical nature)’ কথা উল্লেখ করিয়াছেন। প্রক্ষোভ শক্তি আহরণ করে ইচ্ছামূলক ক্রিয়া হইতে। মাতা নিজেকে সন্তানের দুঃখে দুঃখী এবং সুখে সুখী অনুভব করেন, কারণ প্রথমটিতে তাঁহার মাতৃত্ব রূপ সহজ প্রবৃত্তি ব্যাহত এবং দ্বিতীয়টিতে পূর্ণ হয়। অধ্যাপক উইলিয়াম জেম্‌স্‌ প্রক্ষোভের ইচ্ছামূলক ভিত্তি উপেক্ষা করিয়াছেন।

আবার স্যাইন্ডার্, ম্যাকডুগাল্ প্রভৃতির মতে প্রক্ষোভ সহজ প্রবৃত্তির সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ম্যাক্‌ডুগাল বলেন যে প্রক্ষোভ সহজ প্রবৃত্তির মর্মস্থল (core), যেমন পলায়ন নামক সহজ প্রবৃত্তির মর্মস্থল ভয়, যোধন নামক সহজ প্রবৃত্তির মর্মস্থল ক্রোধ। জেম্‌স্‌-এর মতবাদে প্রক্ষোভের সহিত সহজ প্রবৃত্তির যোগসূত্র উপেক্ষিত হইয়াছে।

(৯) উপরন্তু, জেম্‌স্‌-এর নিজ স্বীকৃতি অনুসারে তাঁহার মতবাদ অপেক্ষাকৃত স্থূল প্রক্ষোভগুলিতে সীমাবদ্ধ, সূক্ষ্ম বা সুকুমার প্রক্ষোভগুলিতে প্রযোজ্য নয়। ক্রোধ, ভয়, হিংসা প্রভৃতি স্থূল প্রক্ষোভে উচ্চতর মানসবৃত্তির ক্রিয়া থাকে না। কিন্তু সুকুমার বা সূক্ষ্ম প্রক্ষোভ অর্থাৎ যে সকল প্রক্ষোভ সৌন্দর্য, সত্য এবং ন্যায়ান্যায়-বোধের সহিত জড়িত, সেইগুলি কেন্দ্রীয় মতবাদ অনুসারেই ব্যাখ্যাত হইতে পারে।

(১০) যান্ত্রিক সংবেদন বা প্রকাশ যদি প্রক্ষোভের কারণ হইয়া থাকে, একই প্রকারের যান্ত্রিক সংবেদন বা প্রকাশ একই প্রকারের প্রক্ষোভের সহিত সংশ্লিষ্ট হইত। কিন্তু বাস্তব ঘটনা বিপরীত। কেহ যেমন ভয় পাইয়া দৌড়াইতে

পারে তেমনই আনন্দেও দৌড়াইতে পারে। আনন্দে প্রিয়জনকে দূর হইতে দেখিয়া, ক্রোধে পলায়মান শত্রুর পশ্চাদ্ধাবনে, উদ্বেগে ট্রেন ধরিতে গিয়া, এইরূপ বিভিন্ন প্রক্ষোভের ফলে একই জাতীয় দৌড়ানো-রূপ বহিঃপ্রকাশ এবং বক্ষস্পন্দন, নাড়ীর গতি, রক্তসঞ্চালন, গ্রন্থির রসক্ষরণ প্রভৃতি আভ্যন্তরীণ প্রকাশ ঘটিতে পারে।

টিশ্‌নার বলিয়াছেন, "আনন্দে, অভিমানে এবং দুঃখে আমরা অশ্রুমোচন করিতে পারি; ভয়ে, নৃশংসতায় এবং ক্রোধে আমরা আঘাত করিতে পারি; কোনো বন্ধুকে ধরিয়া ফেলিবার জন্য আমরা দৌড়াইতে পারি, তেমনই পশ্চাতে ধাবিত ভালুক দেখিয়াও আমরা দৌড়াইতে পারি; আগ্রহাতিশয্যে যেমন আমরা কাঁপিতে পারি, তেমন ভাবপ্রবণতায় অথবা ভীত হইয়াও কাঁপিতে পারি।"

উপসংহার

সুতরাং যান্ত্রিক প্রকাশ বা সংবেদন প্রক্ষোভের কারণ নয়। পূর্বোক্ত বিরুদ্ধ যুক্তি সাহায্যে ইহাই প্রমাণিত হইল যে জেম্‌স্‌-ল্যাঙ্গ মতবাদ গ্রহণীয় নয়।

(১১) **জেম্‌স্‌ কর্তৃক নিজ মতের সংস্কার সাধন**

জেম্‌স্‌ স্বয়ং তাঁহার মতের অযৌক্তিকতা উপলব্ধি করিয়া উহার সংস্কার সাধন করিয়াছেন। তাঁহার মতের পরবর্তী সংস্করণে দুইটি স্বীকৃতি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ইহার ফলে তাঁহার পূর্বমতবাদ এবং প্রচলিত মতবাদের বিরোধিতা হ্রাস পাইয়াছে।

জেম্‌স্‌ কর্তৃক তাঁহার নিজ মতের **প্রথম সংস্কারটি এই**:—

প্রক্ষোভ যে প্রত্যক্ষ কারণ দ্বারা উৎপন্ন হয়, তাহাতে বেদনা বর্তমান। পূর্বমত অনুসারে প্রত্যক্ষ প্রতিবর্তভাবে (reflexly) যান্ত্রিক সংবেদন বা প্রকাশ ঘটায় এবং প্রতিবর্তরূপেই উহাদের প্রক্ষোভ উৎপন্ন হয়। পূর্বমতে প্রক্ষোভের উদ্দীপক প্রত্যক্ষে সুখদুঃখবেদনা নাই, কিন্তু পরবর্তী মতে, প্রত্যক্ষের সংবেদনাত্মক গুণগুলিতে সুখদুঃখবেদনা বর্তমান।

জেম্‌স্‌ **দ্বিতীয় সংস্কার** করিয়াছেন প্রত্যক্ষ বিষয়ের ব্যাখ্যায়। এতদনুসারে **প্রক্ষোভের উদ্দীপক কারণ একটি সমগ্র পরিস্থিতির প্রত্যক্ষ।** এই স্বীকৃতি ওয়ার্ড প্রদর্শিত প্রত্যক্ষ বিষয়ের সমগ্র রূপের স্বীকৃতি। ইহার ফলে জেম্‌স্‌-এর বহিঃপ্রান্তিক (peripheral) প্রক্ষোভ-মতবাদ প্রচলিত কেন্দ্রীয় (central) মতবাদের নিকটবর্তী হইয়াছে এবং উহাদের বিরুদ্ধতা অনেকাংশে হ্রাস পাইয়াছে।

৮। **জেম্‌স্‌-ল্যাঙ্গ্‌ মতবাদের বিরুদ্ধে প্রায়োগিক প্রমাণ** (Experimental

Evidences Against James-Lange Theory) **বিরুদ্ধে প্রায়োগিক প্রমাণ** :—

জেম্‌স্-ল্যাঙ্গ্ মতবাদ প্রয়োগ পদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সাম্প্রতিককালে সি. এস. শেরিংটন্, ডব্‌ল্যু. বি. ক্যানন, পি. বার্ড প্রভৃতি বিজ্ঞানিগণ তাঁহাদের প্রয়োগলব্ধ ফলের সাহায্যে জেম্‌স্-ল্যাঙ্গ্ মতবাদের অসারতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

(১) **শেরিংটন্**-এর প্রয়োগ প্রযুক্ত হইয়াছে কুকুরের উপর। তিনি অস্ত্রোপচার করিয়া এই প্রাণীর **সকল দেহাভ্যন্তরীণ যন্ত্র, চর্ম এবং পেশীর সহিত মস্তিষ্কের স্নায়ুপথ ছিন্ন করিয়া দিলেন। ফলে ঐ সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সংবেদন অথবা প্রকাশ নিরুদ্ধ হইয়া গেল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও, কুকুরের ক্রোধ, বিরক্তি, ভয়, আনন্দ দুঃখ প্রক্ষোভের কোনো দৃশ্যমান পরিবর্তন ঘটিল না।** জেমস্-ল্যাঙ্গ্ মতবাদ যদি যথার্থ হইত, সংবেদন এবং প্রকাশ বন্ধ হইলে প্রক্ষোভও বন্ধ হওয়া উচিত। শেরিংটন্ প্রতিপন্ন করিলেন যে প্রক্ষোভ যান্ত্রিক সংবেদন বা প্রকাশের ফলে ঘটে না। যান্ত্রিক সংবেদন বা প্রকাশ প্রক্ষোভের তীব্রতা বাড়াইতে পারে মাত্র।

(২) **ক্যানন**-এর (Cannon) প্রয়োগপদ্ধতি জেম্‌স্-ল্যাঙ্গ্ মতবাদের খণ্ডনে আর একটি ধাপ অগ্রবর্তী। **ক্যানন্ তাঁহার পরীক্ষণ-পাত্র বিড়ালের স্বতঃক্রিয় নার্ভ-মণ্ডলী কর্তিত করিয়া দিলেন, যাহার ফলে উহাদের ক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল ক্রোধের যান্ত্রিক সংবেদন বা প্রকাশ রহিত হইল।** জেমস্-ল্যাঙ্গ্ মতানুসারে এই অবস্থায় বিড়ালের ক্রোধ, ভয় প্রভৃতি প্রক্ষোভ হওয়া উচিত নয়। **অথচ** উদ্দীপক কারণ উপস্থিত হইলে, **ঐ বিড়াল** গোঁ গোঁ করা, ফোঁস ফোঁস করা, দাঁত বাহির করা, কান খাড়া করা এবং আঘাত করিবার জন্য সামনের পা তোলা, প্রভৃতি **ক্রোধের সকল বহির্লক্ষণগুলিই প্রকাশ করিতে পারিল।**

ক্যানন্-পরীক্ষিত বিড়ালের আচরণ হইতে মনে হয় যে উহার আভ্যন্তরীণ বা যান্ত্রিক সংবেদন প্রক্ষোভের পক্ষে অপরিহার্য নয়।

(৩) ক্যানন্-বার্ড মতবাদ—প্রক্ষোভের কেন্দ্রীয় মতবাদ।

ক্যানন্ ও তাঁহার সহকর্মী পি. বার্ড (Bard) তাঁহাদের প্রয়োগ সাহায্যে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে যান্ত্রিক সংবেদন বা প্রকাশ প্রক্ষোভের কারণ নয়, **কিন্তু মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাস্ কেন্দ্রই প্রক্ষোভ এবং উহার যান্ত্রিক সংবেদন বা প্রকাশের সাধারণ কারণ।** প্রক্ষোভের কারণ এই যে উহার **উদ্দীপক-ক্রিয়া**

অন্তর্বাহী নার্ভপ্রবাহের হাইপোথ্যালামাস্-এ বাহিত হয় এবং ঐ উত্তেজনা মস্তিষ্কে পৌঁছিয়া বহির্বাহী নার্ভপ্রবাহের আকারে আন্তর যন্ত্রগুলিতে, অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিতে, চর্মে, পেশীতে এবং অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গে চালিত হয়, যাহার ফলে সর্বাঙ্গীণ যান্ত্রিক প্রকাশ ঘটিয়া থাকে

ক্যানন্ ও বার্ড তাঁহাদের এই মতবাদের নামকরণ করিয়াছেন **কেন্দ্রীয় অথবা আন্তঃপ্রান্তীয় মতবাদ** (Central Theory of Emotion)। পক্ষান্তরে, জেম্‌স্ ল্যাঙ্গ মতবাদ **বহিঃপ্রান্তীয় মতবাদ** (Peripheral Theory) বলিয়া প্রসিদ্ধ। ক্যানন্-এর প্রয়োগফলে প্রমাণিত হইয়াছে, প্রক্ষোভের কেন্দ্রীয় মতবাদ অর্থাৎ **মস্তিষ্ককেন্দ্রের ভিতরে** চালিত অন্তর্বাহী নার্ভপ্রবাহের ফলেই প্রক্ষোভ ঘটে, এই মতবাদই যথার্থ। পক্ষান্তরে প্রক্ষোভের বহিঃপ্রান্তীয় জেম্‌স্-ল্যাঙ্গ্ সমর্থিত মতবাদ, অর্থাৎ মস্তিষ্ককেন্দ্রের বাহিরে অবস্থিত দেহযন্ত্রের সংবেদন বা প্রকাশ হইতেই প্রক্ষোভ উৎপন্ন হয়, এই মতবাদ ভ্রান্ত।

মানুষের প্রক্ষোভ: (৪) বলা যাইতে পারে যে উপরোক্ত প্রায়োগিক মতবাদ নিম্নস্তর প্রাণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ, সুতরাং মানুষের প্রক্ষোভে উহার প্রযোজ্যতা সন্দিগ্ধ। **ক্যানট্রিল, হাণ্ট** প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা মানুষের ক্ষেত্রে দেখিয়াছেন যে অ্যাড্রিনিন ইন্‌জেক্‌শন-এর ফলে উহাদের আভ্যন্তরীণ যন্ত্রে ক্রোধের সকল প্রকাশ উৎপন্ন হইলেও, প্রকৃত ক্রোধ উৎপন্ন হয় না। কিন্তু আন্তরযন্ত্র সংবেদন বা প্রকাশই ক্রোধ হইলে, এই অবস্থায় উৎপন্ন হইত।

(৫) **সি. এল. ড্যানা** একটি চল্লিশবর্ষীয়া বুদ্ধিমতী নারীর দৃষ্টান্ত দিয়া জেম্‌স্ ল্যাঙ্গ্ মতবাদের খণ্ডন করিয়াছেন। এই মহিলাটির গ্রীবাদেশের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। ফলে, তাঁহার **মস্তিষ্কের সহিত দেহকাণ্ডের এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নার্ভসূত্র ছিন্ন হইয়া আন্তরযন্ত্র সংবেদন এবং প্রকাশ ব্যাহত করিয়াছিল।** জেম্‌স্-ল্যাঙ্গ্ মতবাদ অনুসারে ইহার সকল প্রকার প্রক্ষোভই নষ্ট হইয়া যাইবার কথা। অথচ **বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা গেল যে তাঁহার হর্ষ, শোক, ভালবাসা প্রভৃতি প্রক্ষোভগুলি অল্পাধিক অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।** উপরোক্ত দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা গেল যে **দেহের সংবেদন ও প্রকাশ ছাড়াই মস্তিষ্কে প্রক্ষোভের অনুভূতি ঘটিতে পারে।**

উপসংহার

সুতরাং **যুক্তির এবং প্রায়োগিক প্রমাণের ভিত্তিতে প্রমাণিত হইল যে জেম্‌স্-ল্যাঙ্গ্ প্রদর্শিত বহিঃপ্রান্তীয় প্রক্ষোভ মতবাদ গ্রহণ করা যাইতে পারে**

না। পক্ষান্তরে প্রচলিত প্রক্ষোভ মতবাদ, যাহা প্রায়োগিক গবেষণার ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় বা অন্তঃপ্রান্তীয় মতবাদের আকার গ্রহণ করিয়াছে, তাহাই যথার্থ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।

৯। প্রক্ষোভ-প্রকাশের কারণ

ডারুইন্-এর মতে প্রক্ষোভের সকল প্রকাশ এবং অঙ্গভঙ্গীর মূল কারণ তিনটি। (১) প্রথমটি হইল **কার্যকরী অনুষক্ত অভ্যাস সূত্র** (Principle of Serviceable Associated Habits)। এই সূত্র অনুসারে কোনো কোনো প্রক্ষোভ-প্রকাশ এমন কতগুলি অভ্যাসের লুপ্তাবশেষ, যেগুলি অতীতে প্রাণীর জীবনসংগ্রামে প্রয়োজনীয় ছিল। যেমন ক্রোধে মুষ্টি বদ্ধ করা, অথবা দন্ত বিকশিত করা—এই অঙ্গভঙ্গীগুলি প্রাণীর অতীত জীবনসংগ্রামে কার্যকরী ছিল বলিয়া, উহার সহিত অনুষক্ত হইয়া অভ্যাসে পরিণত হইয়াছে এবং পরবর্তী পুরুষে বংশগতি অনুসারে সংক্রামিত হইয়াছে।

(২) দ্বিতীয় ডারুইনীয় সূত্রটি হইল **বিরোধ সূত্র** (Principle of Antithesis)। এই সূত্র অনুসারে অনেক প্রক্ষোভ-প্রকাশই প্রাণীর স্বাভাবিক প্রক্ষোভ-প্রকাশের বিপরীত। যেমন কুকুর বন্ধুত্ব প্রকাশ করে, উহার পক্ষে অধিক স্বাভাবিক বৈরিতার বিপরীত প্রকাশগুলির সাহায্যে।

(৩) ডারুইন্-নির্দেশিত তৃতীয় সূত্রটি হইল নার্ভতন্ত্রের প্রত্যক্ষ ক্রিয়া সূত্র (Principle of the Direct Action of the Nervous System)। নার্ভ-তন্ত্রের গঠন অনুসারে এবং প্রথম হইতেই ইচ্ছা এবং কতক অংশে অভ্যাসের উপর নির্ভর না করিয়া প্রক্ষোভের প্রকাশ ঘটে। যেমন, কষ্টে ঘর্মাক্ত বা ভয়ে কম্পিত হওয়া, আনন্দে লম্ফ ঝম্প করা, এই সূত্রের ক্রিয়া অনুসারে সংঘটিত হয়।

প্রথম সূত্রটিই প্রক্ষোভ প্রকাশের কারণের উপর বিশেষ আলোকপাত করে।

অনুশীলনী (Exercise)

1. Define and analyse emotion.

(Ans pp. 248-249)

প্রক্ষোভের সংজ্ঞা দাও এবং উহা বিশ্লেষণ কর।

2. Distinguish between emotion, emotional mood and emotional disposition. (Ans pp. 249-252)

প্রক্ষোভ, মেজাজ এবং স্বভাবের পার্থক্য প্রদর্শন কর।

3. Classify feeling. **Explain the different kinds of feeling.**

(Ans pp. 252-253)

বেদনার শ্রেণীভেদ কর। বেদনার প্রকারভেদ ব্যাখ্যা কর।

3. Bring out the psychology of fear, anger, joy and sorrow, love hatred and sympathy. (Ans pp. 253-258)

মনোবিস্তার দিক হইতে ভয়, ক্রোধ, সুখদুঃখ, ভালবাসা, ঘৃণা এবং সহানুভূতি আলোচনা কর। প্রচলিত প্রক্ষোভমত ব্যাখ্যা কর।

4. Explain the Traditional Theory of Emotion. Analyse the Lange-James Theory of Emotion and adduce the arguments in its favour

(Ans pp. 258-262)

প্রচলিত প্রক্ষোভমত ব্যাখ্যা কর। ল্যাঙ্-জেমস্ প্রক্ষোভ মতবাদ বিশ্লেষণ কর এবং ইহার স্বপক্ষে যুক্তি দেখাও।

5. Critically expound the Lange-James Theory of Emotion. What are the experimental evidences against it? (Ans pp. 262-269)

জেমস্-ল্যাঙ্ প্রক্ষোভ মতবাদের বিচারমূলক আলোচনা কর। ইহার বিপক্ষে প্রায়োগিক প্রমাণগুলি কি?

6. Explain the causes of emotional expression. (Ans p. 269)

প্রক্ষোভ প্রকাশের কারণ আলোচনা কর।

7. "Emotion is parasitical in nature" Explain. (Ans p. 265)

"প্রক্ষোভের প্রবৃত্তি পরগাছার মত"—কথাটি ব্যাখ্যা কর।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

রস (Sentiment)

১। রস কাহাকে বলে

রস, প্রক্ষোভ এবং বেদনা ঃ অনুভূতিমূলক মানসবৃত্তির অপরিণত এবং অধিক পরিণত অবস্থা যেমন যথাক্রমে বেদনা (Feeling) এবং প্রক্ষোভ (Emotion), ইহার পূর্ণ-পরিণত বা পরিপক্ক অবস্থা তেমন রস (Sentiment)। অবগতির পরিণত বা পূর্ণবিকশিত অবস্থা চিন্তন। আবার ক্রিয়ার পরিণত বা পূর্ণ-বিকশিত অবস্থা ঐচ্ছিক ক্রিয়া। **সেইরূপ অনুভূতির পরিণত বা পূর্ণ-বিকশিত অবস্থা রস।** সুতরাং সুখদুঃখবেদনা, প্রক্ষোভ এবং রসের পার্থক্য প্রকারগত নয়, কিন্তু, পরিমাণগত। প্রক্ষোভ বেদনার তুলনায় সূক্ষ্মতর এবং জটিলতর অনুভূতি, আবার রসও প্রক্ষোভের তুলনায় সূক্ষ্মতর এবং জটিলতার অনুভূতি। **উড্ওয়ার্থ** মনে করেন যে বেদনা ও রসের পার্থক্য তীব্রতার পার্থক্য।

রস কথাটির বিভিন্ন অর্থ ঃ রস কথাটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। (১) **প্রবণতা** (Sentimentality) অর্থেই রস কথাটি প্রচলিত। অমুক লোকটি খুব ভাবালু (Sentimental) বলিতে বুঝায় যে সে সহজেই ভাবাবেগে বিচলিত হয়, অর্থাৎ সামান্য কারণেই সুখী. দুঃখী, ভীত বা ক্রুদ্ধ হইয়া পড়ে। অথবা এই অর্থে রস প্রক্ষোভ-প্রবণতা বুঝায়, যাহার ফলে ব্যক্তি সামান্য কারণেই প্রক্ষুব্ধ হইয়া ওঠে। (২) রস কথাটিকে চিন্তনের স্তরেও তোলা হইয়া থাকে। **ড্রিভার** (Drover) প্রভৃতি মনোবিদ্ রস বলিতে **সুখদুঃখবেদনার সহিত যুক্ত ধারণা বা ভাব-সমষ্টি** (Complex) বুঝিয়া থাকেন। রস একপ্রকার বেদনামিশ্রিত চিন্তন। (৩) আবার কাহারও কাহারও মতে রস শুধু বেদনাযুক্ত ধারণা বা ভাবসমষ্টি নয়, কিন্তু **ক্রিয়াত্মকও বটে।** ইঁহারা রসকে **একাধারে অনুভূতিমূলক, অবগতিমূলক** এবং **ক্রিয়ামূলক** বলিয়া মনে করেন। রস বলিতে বুঝায় কতগুলি ধারণা বা ভাব, ঐ ভাব বা ধারণাকে আশ্রয় করিয়া সুখদুঃখবেদনা বা প্রক্ষোভ এবং এই ভাব এবং অনুভূতি অনুসারে কর্মপ্রবণতা। **কতগুলি ধারণা বা ভাবকে আশ্রয় করিয়া সুখদুঃখ প্রভৃতি প্রক্ষোভ অনুভব করিবার এবং তদনুযায়ী কর্ম করিবার প্রবণতাই রস।**

রস কথাটির শেষোক্ত অর্থ অথবা উহার সামান্য ইতরবিশেষ অনেক মনোবিদের দ্বারা গৃহীত হইয়াছে। যেমন **ম্যাক্‌ডুগ্যাল্ এবং শ্যাণ্ড্** (Shand) রস বলিতে বুঝিয়া থাকেন **প্রক্ষোভ-প্রবণতা**, যাহা কোনো বস্তুকে কেন্দ্র করিয়া সুগঠিত হয়। আবার, **স্টাউট্, মেলোন, ড্রামণ্ড** প্রভৃতির মতে রস যে কোনো **প্রক্ষোভ-স্বভাব** (Emotional Disposition), যাহা উপযুক্ত উদ্দীপকের সংস্পর্শে বাস্তব প্রক্ষোভে আত্মপ্রকাশ করে। এইরূপ প্রক্ষোভ-প্রবণতা বা প্রক্ষোভ-স্বভাব প্রায়ই গঠিত হয় **অভ্যাস এবং অভিজ্ঞতার** ফলে। যেমন, পিতামাতার সহিত অভ্যস্ত শৈশব আচরণই ভবিষ্যতে 'পিতৃভক্তি" অথবা "মাতৃভক্তি"র (Father-Sentiment or Mother-Sentiment) কেন্দ্ররূপে গঠিত হয়।

প্রক্ষোভের সংগঠন : (Organisation of Emotions) : প্রক্ষোভ-স্বভাব এক প্রকারের প্রক্ষোভ-সংগঠন। কিন্তু এই প্রকার সংগঠনের মূলে কোন উচ্চতর আদর্শ থাকে না। ইহার মূলে থাকে অভ্যাস এবং অভিজ্ঞতা। কিন্তু কোনো উচ্চতর আদর্শে কেন্দ্রীভূত প্রক্ষোভ-সংগঠনই (emotional organization) রসানুভূতির ভিত্তি। রসাশ্রিত প্রক্ষোভগুলি **সৌন্দর্য** (Beauty), **সত্য** (Truth), **মঙ্গল বা ন্যায়ান্যায়** (Goodness), **এবং ঈশ্বর** (God) **প্রভৃতি উচ্চতর ভাব বা আদর্শকে কেন্দ্র করিয়া সংগঠিত হয়।** এই প্রক্ষোভ-সংগঠন উচ্চতর আদর্শের সংস্পর্শে আসিয়া বাস্তব প্রক্ষোভের আকারে আত্মপ্রকাশ করে, সুখদুঃখ-বেদনা-মিশ্রিত থাকে এবং এইরূপ জ্ঞান ও অনুভূতি অনুসারে কর্মে প্রবৃত্ত করে। অর্থাৎ রস অনুভূতি, অবগতি এবং ক্রিয়ামূলক মানসবৃত্তির অপূর্ব সমন্বয় বিশেষ।

তাহা হইলে, **রস ও প্রক্ষোভের প্রধান পার্থক্য** এই যে প্রথমটি সংগঠনাত্মক অনুভূতি-প্রবণতা, কিন্তু দ্বিতীয়টি বাস্তব অনুভূতি। রস প্রক্ষোভের মত বাস্তব অনুভূতি বা অভিজ্ঞতা নয়, কিন্তু কোনো আদর্শ বা ভাবকে কেন্দ্র করিয়া প্রক্ষোভের সংগঠন বিশেষ। যেমন, সৌন্দর্যরসে রসিক শিল্পী, সর্বদা এই রসের অধিকারী হইলেও, তিনি যে সর্বদা এই রসের বাস্তব অনুভূতি লাভ করিয়া থাকেন, তাহা নয়। তাঁহার বৈশিষ্ট্য এই যে তাঁহার সৌন্দর্যানুভূতি বা স্বভাব রহিয়াছে এবং উপযুক্ত উদ্বোধক বা উদ্দীপকের সংস্রবে আসিলেই, তাঁহার সৌন্দর্যানুভূতি ঘটে।

রস ও গূঢ়ৈষা (Complex) **:** রস কতগুলি প্রক্ষোভের সংগঠিত সমষ্টি। তাই বলিয়া **রস শুধু গূঢ়ৈষা বা কম্‌প্লেক্স নয়।** কিন্তু ড্রিভার প্রভৃতি মনোবিদ্ প্রক্ষোভ বা রসকে গূঢ়ৈষা এবং উহার সহিত যুক্ত সুখদুঃখবেদনাকে আধান (Affect)[১]

বলিয়াছেন। গূঢ়ৈষা প্রধানতঃ ইচ্ছামূলক। ইহা অবদমিত ইচ্ছার সমষ্টি, যদিও ইহার সহিতই গৌণভাবে আধান (Affect)[১] বা সুখদুঃখবেদনা অনুষক্ত থাকে। কিন্তু (১) রসকে প্রধানতঃ ইচ্ছামূলক বলা যায় না। অনুভূতিমূলক দিকটি রসের প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাহা ছাড়া, (২) গূঢ়ৈষা মানসরোগীর ধর্ম (Pathological)। পক্ষান্তরে রস স্বভাবী ব্যক্তির স্বভাব। (৩) তৃতীয়তঃ. গূঢ়ৈষার মত রস শুধু অবদমিত বাসনার সমষ্টি নয়।

২। রসের বিভিন্ন প্রকার

যে ভাব বা আদর্শকে কেন্দ্র করিয়া প্রক্ষোভ রসের আকারে সংগঠিত হয়, তাহা প্রধানতঃ চারটি—যথা অবগতিমূলক বা বুদ্ধিমূলক, অনুভূতিমূলক, ইচ্ছামূলক এবং এমন একটি আদর্শ যাহাতে সমগ্র সত্তার উপলব্ধি হয়। প্রথমটি যুক্তিবিদ্যার আদর্শ সত্য, দ্বিতীয়টি নন্দনবিদ্যার আদর্শ সৌন্দর্য, তৃতীয়টি নীতিবিদ্যার আদর্শ মঙ্গল বা কল্যাণ এবং চতুর্থটি ধর্মজীবনের আদর্শ ঈশ্বর, সত্যম্, শিবম্, সুন্দরম্, এবং ঈশ্বর, যাহাতে এই আদর্শত্রয় কেন্দ্রীভূত এবং পরিণত হয়। এই চারিটি আদর্শকে আশ্রয় করিয়া এবং অবগতি ইচ্ছা, অনুভূতি এবং সমগ্র সত্তাকে অবলম্বন করিয়া যে চারিটি রস সংগঠিত হইয়া থাকে তাহাই যথাক্রমে বুদ্ধিমূলক বা সত্যাশ্রিত (Logical), ইচ্ছামূলক বা নৈতিক (Moral), এবং অনুভূতিমূলক বা সৌন্দর্যমূলক (Aesthetic)। তাহা হইলে, সত্য (Truth), সুন্দর (Beauty) কল্যাণ বা শিব (Goodness) এবং ঈশ্বর (God) এই চারিটি আদর্শের আশ্রয়ে যে চারিটি রসের সংগঠন ঘটে, তাহাই মনোবিদ্যার আলোচ্য।

৩। বুদ্ধিমূলক (Logical or Intellectual Sentiment) অথবা সত্যাশ্রিত রস

সত্য, জ্ঞান, অনন্ত—এই আর্দশের প্রতি প্রেম বা শ্রদ্ধাকে অবলম্বন করিয়া যে প্রক্ষোভ স্বভাব গঠিত হয় তাহাকে বুদ্ধিমূলক বা যুক্তিমূলক রস বলে। দার্শনিক, বিজ্ঞানী প্রভৃতি যাঁহারা বুদ্ধির সাহায্যে সত্যাসত্য নির্ণয় করিবার প্রয়াসী, তাঁহারা প্রধানতঃ এই রসে রসিক। যেমন প্লেটো, শঙ্করাচার্য, কাণ্ট্, নিউটন, কেপ্‌লার্ প্রভৃতি দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক সত্যাশ্রিত রসের পূজারী।

১। সাম্প্রতিক মনোবিদ্যায় ধারণা বা ধারণা সমষ্টির (ideas or idea-complexes) সহিত যুক্ত বেদনা-প্রক্ষোভকে আধান (affect) বলা হইয়া থাকে।

কোনো সমস্যার সম্মুখীন হইলেই উহার সমাধান করা দরকার হয় এবং এই সমাধানচেষ্টার প্রথম ধাপ সমস্যাটিতে মনোযোগ বা অবধান। অবধারণা (Judgment) এবং যুক্তির (Reasoning) সাহায্য না লইয়া কোনো সমস্যার সমাধান সম্ভব হয় না। সমস্যার এইরূপ সমাধান চেষ্টা জাগে একটি অস্বস্তিকর অনুভূতি হইতে। আবার এই অস্বস্তিকর অনুভূতি দূর করিবার জন্য যে চেষ্টা হয় তাহার সাফল্যে জন্মে সুখ অনুভূতি। অবধান বা সমাধান চেষ্টা ইচ্ছাশক্তির ক্রিয়া; অবধারণা এবং যুক্তি বুদ্ধির ক্রিয়া; আবার সমস্যার সমাধান হইতে যে সুখ জন্মে তাহা অনুভূতি ক্রিয়া। সুতরাং **সত্যাশ্রিত রসে অবগতি, ইচ্ছা এবং অনুভূতি—এই তিন প্রকারের মানস-ক্রিয়াই অংশ গ্রহণ করে।**

কিন্তু সত্যাশ্রিত রসটিতে তিন প্রকারের মানসক্রিয়াই অংশগ্রহণ করিলেও, উহাতে নানাপ্রকার প্রক্ষোভ বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। যেমন, **কৌতূহল** (curiosity) প্রক্ষোভটি সত্য রসের সংগঠনে একটি প্রধান উপাদান। সত্য নির্ণয়ের, নূতনকে জানিবার, নিঃসংশয় হইবার একটি স্বাভাবিক কৌতূহল-বোধ বুদ্ধির বিশেষ ধর্ম। আবার বিস্ময়বোধ ও (emotion of wonder) সত্যাশ্রিত রসের মুখ্য উপাদান। বিরাট বিশ্বের নিয়মশৃঙ্খলা, কারুকার্য দেখিয়া যে বিস্ময় জাগে তাহার সত্যান্বেষণে বুদ্ধি ব্যাপৃত হয়। অনেকের মতে বিস্ময়বোধ হইতেই দর্শনের উৎপত্তি।

৪। কান্ত-রস বা সৌন্দর্য-রস
(Aesthetic Sentiment)

সৌন্দর্য উপলব্ধিকে কেন্দ্র করিয়া যে প্রক্ষোভ-স্বভাব গঠিত হয় তাহাকে কান্ত-রস বা সৌন্দর্য-রস বলে। রূপমাধুর্যের, বর্ণবিন্যাসের, শব্দসামঞ্জস্যের বা সঙ্গীতের, গতিচ্ছন্দের অথবা নৃত্যের সৌন্দর্য এবং উহাদের বিপরীত গুণগুলির কদর্যতা উপলব্ধিতে যে সুখময় এবং দুঃখময় প্রক্ষোভ-প্রবণতা উৎপন্ন হয়, তাহাই কান্ত-রস। "যখনই আমি আকাশে রামধনু দেখি, আমার হৃদয় নাচিয়া উঠে, (My heart leaps in joy when I behold a rainbow in the sky") এবং "হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে ময়ূরের মত নাচেরে," ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ্ এবং রবীন্দ্রনাথের এই জাতীয় উক্তি কান্ত-রসের অভিব্যক্তি।

কান্ত-রসের গঠনে শ্রবণ এবং দর্শন প্রত্যক্ষ, প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। অন্য জাতীয় প্রত্যক্ষগুলি, স্পর্শ, ঘ্রাণ এবং আস্বাদন উপরোক্ত দুইটির তুলনায় স্থূল

এবং সুকুমার বা ললিত কান্তরসের অনুপযোগী। বিশেষ করিয়া শ্রবণ এবং দর্শন প্রত্যক্ষেই সুন্দর ও কদর্য, এই দ্বিবিধ অবধারণা ঘটে। যে শ্রবণ বা দর্শন প্রত্যক্ষে শৃঙ্খলা, সামঞ্জস্য, সৌষ্ঠব উপলব্ধ হয়, তাহাই সুন্দর এবং যাহাতে ঐরূপ হয় না, তাহাই অসুন্দর, বিশ্রী বা কদর্য।

কান্ত-রসের বিশ্লেষণ

কান্তরসের বিশেষ লক্ষণগুলি উল্লিখিত হইতেছে :—

(১) কান্তরসের বৈশিষ্ট্য এই যে ইহা **স্বার্থসম্পর্কশূন্য** (Dis-interested) এবং **নিস্পৃহ** (detached)। ইহা আনন্দ দেয়, কান্তরসের পক্ষে এইটুকুই যথেষ্ট। **কান্তরসের উদ্দেশ্য থাকে না**। কোনো বস্তু যে উদ্দেশ্য সাধন করে বলিয়া সুন্দর, এবং এইরূপ করে না বলিয়া অসুন্দর, তাহা নয়।

(২) কান্তরস **শুদ্ধ** এবং **অভেজাল**। সৌন্দর্য অবিমিশ্র প্রীতি, সুখ অথবা বিশুদ্ধ আনন্দ উৎপন্ন করে। আবার কদর্যতা উৎপন্ন করে বিরক্তি বা দুঃখ। কীটস্ বলিয়াছেন, "যাহা সুন্দর তাহা চিরআনন্দময় (A thing of beauty is a joy forever)"। বিশুদ্ধ আনন্দই কান্তরসের উপজীব্য। ইহাতে অন্য কোন বিজাতীয় ভাব বা প্রক্ষোভের সংমিশ্রণ নাই।

(৩) কান্তরস **অংশগ্রহণযোগ্য**। অর্থাৎ একই কালে একাধিক ব্যক্তি একই বস্তুতে সৌন্দর্যবোধের প্রীতি এবং কদর্যতাবোধের বিরক্তি অনুভব করিতে পারে। এই রস **সার্বজনিক**। ইহা উপভোগে কমিয়া যায় না। কীটস্ বলিয়াছেন যে কান্তরসের আনন্দ বাড়িয়াই যায়।

কান্তরসের উপাদান

কান্তরস **বিশ্লেষণ** করিলে নিম্নলিখিত উপাদানগুলি পাওয়া যায় :—

(১) **দর্শন এবং শ্রবণই কান্তরসের বিশেষ উপাদান**, কারণ ইহারাই ইন্দ্রিয়-গুলির মধ্যে কম স্বার্থবিজড়িত।

(২) কান্তরসের সংগঠনে বহু অনুভূতি এবং প্রক্ষোভ অংশগ্রহণ করিলেও উহাদের মধ্যে **সামঞ্জস্য, শৃঙ্খলা বা সঙ্গতি** থাকে। উহাদের মিলনে একটি সম্পূর্ণ সুন্দরের সৃষ্টি হয়। যেমন নানা বর্ণের সমন্বয়ে সুন্দর দৃশ্য এবং নানা শব্দের সমন্বয়ে সুন্দর সঙ্গীত উৎপন্ন হয়।

(৩) কান্তরস নানা ভাবের **অভিব্যঞ্জক** (Suggestive)। ইহা অতীত জীবনের বহু স্মৃতিকে জাগাইয়া তোলে। কোকিলের স্বর মধুর এবং গ্রামধনুর দৃশ্য সুন্দর

লাগে, কারণ ইহারা অতীতের বহু সুখময় স্মৃতি জাগায়।

৫। কয়েকটি প্রধান কান্তরস

কান্তরসগুলির মধ্যে বিরাট রস, করুণ রস, অদ্ভুত রস এবং হাস্য রস প্রধান।

বিরাট রস (Sentiment of the Sublime) :—অসীম আকাশ, অন্তহীন সমুদ্র **গগনচুম্বী পর্বত প্রভৃতি বিরাট অথবা মহৎ বস্তুর সংস্পর্শে আসিলে যে রসের উপলব্ধি হয় তাহাকে বিরাট রস বলে।** আবার কোনো বিরাট ব্যক্তিত্বের বিরাটত্ব উপলব্ধির ফলেও এই রসের অভ্যুদয় হইতে পারে।

বিরাট রস একটি বিশুদ্ধ অথবা অবিমিশ্র রস নয়। বিরাটের উপলব্ধিতে **দুইটি বিপরীত ভাব** ক্রিয়া করে। প্রথম ভাবটি হইল বিরাটের প্রতি আকর্ষণ। আকর্ষণ-বোধ, সুখ এবং বিস্ময় অনুভূতি জাগায়। দ্বিতীয় ভাবটি হইল **ভয় এবং ভক্তি বা শ্রদ্ধা**। বিরাট মহনীয় এবং বরণীয়। ইহা আমাদের অন্তরে মহান্ এবং বিরাট হইবার আকাঙ্ক্ষা জাগায়, সুতরাং আমরা ইহার প্রতি আকৃষ্ট হই। আবার ইহা বিরাট, আমরা ক্ষুদ্র। বিরাটের সংস্পর্শে অন্তরে ভয় জাগে, পাছে আমরা ইহাতে হারাইয়া যাই। আবার এই ভয়ের সঙ্গে সঙ্গে শ্রদ্ধা বা ভক্তিরও আবির্ভাব হয়, কারণ, আমাদেব ঈপ্সিত বিরাটত্ব উহার মধ্যে বাস্তব রূপে থাকে। **বিরাটের সৌন্দর্য আমাদের আকর্ষণ করিয়া বা কাছে টানিয়াও দূরে সরাইয়া রাখে।** উহার সান্নিধ্যে আসিয়া আমাদের ক্ষুদ্রতা প্রকট হইয়া পড়ে। তাই বিবাটকে দূর হইতেই বলিতে হয়, "লহ শুধু ক্ষুদ্রের প্রণাম"। শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি বিরাট ব্যক্তিদের সংস্পর্শে আসিলেও, এইরূপ অনুভূতি জাগিতে পারে।

বিরাট বস প্রধানতঃ **অনুভূতিমূলক**। কিন্তু ইহাতে অবগতি এবং ইচ্ছামূলক উপাদানও বর্তমান থাকে। আবার প্রত্যেকটি অনুভূতি, অবগতি এবং ইচ্ছামুলক উপাদানেই বিপরীত দুইটি দিকও থাকে—যেমন আনন্দ এবং কষ্ট, অবধান এবং অনবধান, আকর্ষণ এবং বিকর্ষণ।

করুণ বা বিয়োগান্ত রস (Sentiment of Tragedy) :—করুণ বা বিয়োগান্ত রসেও বিপরীত ভাবের সংমিশ্রণ থাকে। **যে রস বস্তুর সৌন্দর্য এবং অসঙ্গতি, এই দুইটি বিপরীত অথচ যুগপৎ উপলব্ধি হইতে উৎপন্ন হয় তাহাই করুণ বা বিয়োগান্ত রস।**

করুণ রসের উৎপাদক বস্তুটি সুন্দর বটে, কিন্তু অন্যায়ও বটে। যেমন সেক্সপীয়র বর্ণিত ডেসডেমোনার পরিণাম পাঠকের মনে যুগপৎ কান্তরস এবং অন্যায় উপ-

লব্ধিরূপ শীলরস উৎপন্ন করে। আবার কালিদাস বর্ণিত **শকুন্তলার পতিগৃহে প্রত্যাখ্যান** পাঠকের মনে যুগপৎ এই বিপরীত ভাবদ্বয়ের সৃষ্টি করে। ডেস্‌ডেমোনা এবং শকুন্তলার এই দুরবস্থা পাঠ করিয়া পাঠকের মনে স্বতই এই অবিচারের প্রতি একটি ধিক্কার জাগিয়া ওঠে, অথচ 'ওথেলো' (Othello) এবং "শকুন্তলা" নাটকের কাব্য-সৌন্দর্য উপলব্ধি করিয়া কান্তরসও জাগিয়া ওঠে।

করুণ রস যেমন একটি কান্তরস, তেমন শীলরস বা নৈতিক রসও বটে। এই রস শুধু ব্যক্তিগত উপলব্ধিতেই পর্যবসিত নয়, কিন্তু সামাজিক সঙ্গতি বা অসঙ্গতি, ন্যায় বা অন্যায় উপলব্ধিও উহাতে অংশগ্রহণ করে।

অদ্ভুত রস (Sentiment of the Ludicrous) :—অদ্ভুত রসেও দুইটি পরস্পর-বিরোধ-ভাবের দোলায়মানতা থাকে। কিন্তু এই রসের বস্তু সুন্দর অথচ সামঞ্জস্য-বিহীন বা খাপছাড়া। অদ্ভুত রস **বিরাট রসের বিপরীত**। বিরাট রসে রসিক ব্যক্তি বিরাট বস্তুর তুলনায় নিজেকে **অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং অপকৃষ্ট** (Inferior) বলিয়া অনুভব করে। তাহা ছাড়া, বিরাট বস্তুর প্রতি ভয়ের সহিত ভক্তি বা শ্রদ্ধা এবং আকর্ষণের সহিত বিকর্ষণও মিশ্রিত থাকে। কিন্তু অদ্ভুত রসের মনোভাব ইহার বিপরীত। **অদ্ভুত রসে রসিক ব্যক্তি রস-উদ্দীপক বস্তুর তুলনায় নিজকে বিরাট, মহৎ বা উৎকৃষ্ট** (Superior) **বলিয়া অনুভব করে।**

অদ্ভুত রসে বস্তুর অপকর্ষ এবং অসঙ্গতি উপলব্ধি থাকে। আবার নিজ প্রাধান্য জাহির করিবার ইচ্ছা এবং সুখদুঃখবেদনাও এই রসের উপাদান। অর্থাৎ ইহা অবগতি, অনুভূতি এবং ইচ্ছামূলক উপাদানে গঠিত।

৬। হাস্যরস (Comic Sentiment)

অদ্ভুত রস হাসির খোরাক জোগায়। ইহা হাস্যরসেরই একটি প্রকারভেদ। হাসি নানা কারণে ঘটিতে পারে। কাতুকুতু বা সুড়সুড়ি প্রভৃতি দৈহিক কারণে, অপরের হাসি দেখিয়া এবং নিছক অনুকরণ প্রবৃত্তির বশেও হাসি আসিতে পারে। হাসির সংক্রামকতা আছে, যাহার ফলে ইহা ছড়াইয়া পড়ে। কিন্তু এই জাতীয় হাসির সহিত অদ্ভুত রসের উপলব্ধি ঘটে না। ইহারা হাস্য-রস কিন্তু অদ্ভুত রস নয়। আবার, আনন্দে এবং অদ্ভুত দৃশ্য দর্শনে বা অদ্ভুত শব্দ শ্রবণেও হাস্যরসের উদয় হইতে পারে। কিন্তু এইরূপ হাস্যরস অদ্ভুত রসও বটে। সুতরাং **হাস্যরস অদ্ভুত রসের তুলনায় ব্যাপক**। সকল অদ্ভুত রসই হাস্যরস, কিন্তু সকল হাস্যরসই অদ্ভুত রস নয়।

সাধারণতঃ হাস্য সুখবেদনার প্রকাশ। প্রশ্ন এই, কি কি কারণে হাস্যরস সুখ

বেদনার উৎস হইয়া দাঁড়ায়, অথবা সুখবেদনার উৎস কি। **হব্‌স্-এর** (Hobbes) **মতে, অপরের দুর্গতি দেখিয়া আকস্মিক নিজ মহিমাবোধই হাসির কারণ।** যেমন, পণ্ডিত মহাশয় ক্লাসে পড়াইতে পড়াইতে হঠাৎ নাক ডাকিয়া ঘুমাইতে লাগিলেন। এই ব্যাপারটি হাস্যকর। আমরা বয়সে ছোট হইয়াও, না ঘুমাইয়া আমাদের অধ্যয়নব্রত পালন করিতেছি, কিন্তু অন্যদিকে বয়োবৃদ্ধ পণ্ডিত আদর্শ শিক্ষকের মর্যাদাভ্রষ্ট হইয়া দিনের বেলায় পড়াইতে পড়াইতে ঘুমাইতেছেন। এই হাসির মধ্যে পণ্ডিত মহাশয়ের আদর্শচ্যুতি দেখিয়া আমাদের হাম-বড় ভাব বা উৎকর্ষবোধ জাগিয়া উঠিয়াছে। আকস্মিক মহিমাবোধ এবং উহার সহিত অসামঞ্জস্য বা অসঙ্গতি-বোধই এইরূপ হাস্যরসের মূল কারণ। শিক্ষক মহাশয়ের এইরূপ আচরণ তাঁহার মর্যাদার সহিত সামঞ্জস্য-বিহীন।

কিন্তু উপরোক্ত অপকর্ষ এবং অসঙ্গতিই হাস্যরসের পর্যাপ্ত কারণ হইতে পারে না। অসঙ্গতি এবং অপকর্ষ যদি এইরূপ আকারের হয় যে উহার ফলে অন্য কোনো তীব্র-তর প্রক্ষোভ জন্মিতে পারে, তাহা হইলে হাস্যরসের উৎপত্তি না হইয়া অন্য কোনো রসের, এমন কি বিপরীত রসেরও উৎপত্তি হইতে পারে। যেমন একজন বয়স্ক লোককে স্বাভাবিক অবস্থায় পড়িয়া যাইতে দেখিলে আমরা হয়ত হাসিয়া উঠি, কারণ এই হাস্যরস কোনো তীব্রতর প্রক্ষোভের দ্বারা প্রভাবিত হয় না। কিন্তু এই পতন যদি এমন সাংঘাতিক হয় যে পতিত ব্যক্তির হাত পা ভাঙ্গিয়া গেল, অথবা ঐ ব্যক্তি মরিয়াই গেল, তাহা হইলে হাস্যরসের পরিবর্তে করুণ রসের আবির্ভাব ঘটে। আবার, যাহার পতনের ফলে অসঙ্গতিবোধ এবং আমাদের আত্মমহিমা-বোধেব প্রভাবে আমরা হাসিয়া উঠি, তাহাদের সহিত আমাদের **সাদৃশ্য থাকা আবশ্যক।** যেমন গাছ হইতে একটি পাখি, অথবা শিশু বা বৃদ্ধলোক পড়িয়া গেলে ঐ পতন দেখিয়া আমরা হাসিয়া উঠিয়া উঠি না, কিন্তু দুঃখিতই হই।

হার্বার্ট স্পেন্‌সর্-এর মত :—হাসির কারণ সম্বন্ধে হার্বার্ট স্পেন্‌সর্ (Herbert Spencer) হব্‌স-এর তুলনায় সম্পূর্ণ ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁহার মতে **নার্ভ-শক্তির প্রাচুর্য বা অতিরিক্ততা** (Surplus nervous energy) **হাসির যথার্থ কারণ।** নার্ভশক্তি প্রয়োজনাতিরিক্ত হইলে, উহা হাসিতে উপচাইয়া পড়ে। এই মতে পরিবেশের সহিত উপযোজনে নার্ভতন্ত্রের সকল শক্তি ব্যয়িত না হইয়া, উহার কিছু অবশেষ থাকে। এই অবশিষ্ট নার্ভশক্তি ব্যয়িত হয় হাসির মধ্য দিয়া। কিন্তু হার্বার্ট স্পেন্‌সর-এর এই মত গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে হয় না। মুমূর্ষু ব্যক্তির মুখে হয়ত

শেষ নিশ্বাস ফেলিবার কালেও হাসির রেখা লাগিয়া থাকে। এই ব্যক্তির হাসি নার্ভশক্তির প্রাচুর্যের ফলে ঘটিয়াছে, এইরূপ বলা যায় না। তাহা ছাড়া, হাসি শুধু জৈব কারণেই ঘটিয়া থাকে, এইরূপ মতও অসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। হাসির মানসিক কারণ উপেক্ষণীয় নয়।

বের্গসেঁা-এর মত :—বের্গসেঁা (Bergson) মনে করেন যে হাসি শুধু ব্যক্তিগত কারণে ঘটে না, কিন্তু ঘটে সামাজিক কারণে। **হাসি সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ**। আড়ষ্ট, এলোমেলো এবং যান্ত্রিক ব্যবহার হাস্যোদ্রেক করিয়া থাকে, কারণ ইহা সামাজিক শৃঙ্খলার প্রতিকূল। এই সকল আচরণ হাসির উদ্রেক করে বলিয়া আচরণকারী তাহার আচরণের অসঙ্গতি বুঝিতে এবং উহা সংযত করিতে শিখে, ফলে তাহার সামঞ্জস্যসাধনের অক্ষমতা সংশোধিত হয় এবং সামাজিক জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য ফিরিয়া আসে।

কিন্তু বের্গসেঁা-এর মতও সর্বাংশে সত্য নয়। হাসি যে ব্যক্তির আচরণের আড়ষ্টতা এবং অনমনীয়তা অথবা অসামঞ্জস্য সংযত করে, তাহা অবশ্যই স্বীকার্য। যে ব্যক্তি জুতা পায়ে পরিয়া, অথবা চশমা চোখে আঁটিয়া, উহা খুঁজিয়া বেড়ায়, সে অপরের হাস্যোদ্রেক করে এবং সকলকে হাসিতে দেখিয়া নিজেকে শোধরাইয়া লইবার সুযোগ পায়। কিন্তু হাস্যরস যে সর্বদাই সামাজিক শিক্ষার উদ্দেশ্য সাধন করে এমন নয়। বিশুদ্ধ হাস্যরস স্বতঃসঞ্জাত। ইহা অন্য কোনো উদ্দেশ্য সাধনের ধার ধারে না।

ম্যাক্‌ডুগ্যাল্-এর মত :—হাসির কারণ সম্পর্কে ম্যাক্‌ডুগ্যাল-এর মতে হাসির সামাজিক মূল্য অন্যরূপ। তাঁহার অভিমত এই যে **হাস্যরস সহানুভূতির** (Sympathy) **প্রতিকার** (antidote) **বিশেষ**।

সহানুভূতি সমাজজীবনের পক্ষে প্রয়োজনীয়। ইহা জীবনের দুঃখযন্ত্রণার লাঘব করে। ইহা পরম দুঃখে এবং ব্যথায় সান্ত্বনার প্রলেপ বুলাইয়া দেয়। কিন্তু সহানুভূতি যেরূপ সমাজজীবনের পক্ষে হিতকর, তেমন ক্ষতিকরও বটে। সহানুভূতি মানুষকে সর্বদা তাহার দুঃখের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। সহানুভূতির ফলে মানুষ দুঃখ ভুলিতে চাহিলেও, উহা ভুলিতে পারে না।

হাসি জীবনের দুঃখময় দিক হইতে মনোযোগ সরাইয়া দুঃখ হালকা **করিয়া দেখিবার সুযোগ দেয়। দুঃখময় জীবনও হাসির মাধুর্যে সতেজ হইয়া ওঠে। হাসি শরীর ও মনকে সুস্থ-সবল করে এবং জীবন-সংগ্রাম সহনীয় করিয়া তোলে।**

উপসংহার :—হাস্যরস মানুষের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। মনুষ্যেতর প্রাণীরা এই রস হইতে বঞ্চিত। অ্যারিস্টট্‌ল মানুষকে "হসনশীল প্রাণী (Laughing animal)" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। হাসির কারণ আংশিকভাবে ব্যক্তিগত, সামাজিক, জৈব এবং মানসিক। এই বিষয়ে যত মতভেদই থাকুক না কেন, **হাসি যে সুখময় অনুভূতির জ্ঞাপক তাহাতে সন্দেহ নাই।**

৭। শীল-রস (Moral Sentiment)

যে রস নৈতিক আদর্শকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয় তাহাকে শীল রস বলে। এই রসের অবলম্বন চরিত্র, সত্যতা, ন্যায়, নির্ভীকতা, বীরত্ব, পবিত্রতা, কর্তব্য প্রভৃতি নৈতিক আদর্শ। শীল-রস উদ্দীপিত হয় শীল অথবা নৈতিক আচরণ দ্বারা এবং শীল বা নৈতিক আচরণ (moral conduct) নিয়ন্ত্রিত হয় শীল-রসের দ্বারা।

শীল রসে **অনুভূতি, অবগতি এবং ইচ্ছা, এই তিন প্রকারের উপাদানই বর্তমান।** ইহাতে ইচ্ছামূলক উপাদানই স্পষ্ট এবং প্রধান। ন্যায় আচরণ করা উচিত এবং অন্যায় আচরণ করা অনুচিত, এইরূপ কর্তব্য (duty) এবং বাধ্যবাধকতা বোধ (sense of moral obligation) **ইচ্ছামূলক উপাদান।** এইরূপ উপলব্ধির সহিত ন্যায় শীল আচরণ করিবার এবং অন্যায় শীল বর্জন করিবার একটি ক্রিয়া-প্রবণতা (tendency to action) জড়িত থাকে।

আবার শীল-রসের অন্তর্নিহিত অবগতিমূলক উপাদানও লক্ষণীয়। ক্রিয়া-প্রবণতার কারণ কর্তব্য ও বাধ্যবাধকতা বোধ, আবার দ্বিতীয়টির কারণ ন্যায় এবং অন্যায় শীলের অবধারণা (moral judgment)। এই অবধারণা সম্ভব হয় অবধান বা মনোযোগ সাহায্যে। শীলের ন্যায়-অন্যায়বিবেক বা পার্থক্যজ্ঞানই শীল-রসের **প্রধান অবগতিমূলক উপাদান।**

শীল-রসের অনুভূতিমূলক উপাদানে অনেক প্রকারের প্রক্ষোভ থাকে। ন্যায়া-ন্যায়বোধের সহিত জড়িত থাকে ন্যায়ের প্রতি শ্রদ্ধা বা আকর্ষণ এবং অন্যায়ের প্রতি অশ্রদ্ধা বা বিরক্তি। ন্যায় শীল বা আচরণ করিতে না পারিলে জাগে অনুতাপ বা অনুশোচনা (repentance) এবং উহা আচরণ করিতে পারিলে জাগিয়া ওঠে আত্ম-প্রসাদ বা আত্মসন্তুষ্টি। শীল-প্রধান **অনুভূতিমূলক উপাদান** হইল আত্মপ্রসাদ, শ্রদ্ধা, অনুরাগ, আকর্ষণ প্রভৃতি।

৮। ধর্মীয় রস (Religious Sentiment) বা ভাগবত রস (Divine Sentiment)

যে রস ধর্মীয় আদর্শকে কেন্দ্র করিয়া, অর্থাৎ ঈশ্বর বা কোন অতি-প্রাকৃত সত্তার সহিত মানুষের সম্বন্ধকে কেন্দ্র করিয়া গঠিত হয় তাহাকে ধর্মীয় রস বলে। ধর্মীয় রস সকল রসের চরম পরিণতি বা পরিপাক। সত্যাশ্রিত রস, কান্ত রস এবং শীল রস ধর্মীয় রসে চরম উৎকর্ষ লাভ করে।

ধর্মীয় বা ভাগবত রসের বস্তু হইল একটি সর্বান্তর্ভাবী সত্তা। এইরূপ কোন সত্তা যথার্থ, কি অযথার্থ তাহা মনোবিদ্যার জিজ্ঞাস্য নয়। সর্বান্তর্ভাবী সত্তার প্রতি মানুষের সমগ্র সত্তা অভিমুখী হয় এই বাস্তব ঘটনাই মনোবিদ্যার আলোচ্য। ধর্মীয় বা ভাগবত রসে মানুষের সমগ্র সত্তা অংশ গ্রহণ করে। ইহার তুলনায় অন্যান্য সকল রসগুলি আংশিক—কারণ উহাদের কোনোটিতেই একটি সর্বান্তর্ভাবী সত্তার সহিত মানুষের সমগ্র সত্তার উপযোজন ঘটে না। তাহা ছাড়া অন্যান্য রসগুলির বিষয় হইল সীমাবদ্ধ, আর ধর্মীয় রসের বিষয় অসীম।

ধর্মীয় রসে **অবগতিমূলক উপাদান** অংশ গ্রহণ করে। ইহাতে অন্ততঃ এইটুকু জ্ঞান থাকে যে ইহা অন্যান্য রস হইতে ভিন্ন। এই পার্থক্য জ্ঞানের মূলে থাকে অন্যান্য রসবস্তুর সহিত ধর্মীয় রসবস্তুর সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য জ্ঞান। ধর্মীয় রস শুধু ব্যক্তিগত রুচিবৈচিত্র্য নয়, কিন্তু উহা বিষয়গতও বটে। উহার বিষয় এমন সত্তা, যাহার সংস্পর্শেই এই রসের আবির্ভাব ঘটিতে পারে।

আবার ধর্মীয় রস **ইচ্ছামূলকও** বটে। ধর্মীয় রস নানা প্রকার ক্রিয়ায়, নিয়ম-নিষ্ঠায় এবং আচরণে আত্মপ্রকাশ করে। যেমন পূজা, প্রার্থনা, ব্রত, নিয়ম, উপবাস প্রভৃতি ধর্মাঙ্গগুলি ধর্মীয় রসের বিভিন্ন ক্রিয়াত্মক প্রকাশ। তাহা ছাড়া, মন্দির, মসজিদ্, গীর্জা, উপাসনা-মন্দির প্রভৃতি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির মূলও ধর্মীয় রস।

ধর্মীয় রসের **প্রধান উপকরণ অনুভূতি ও প্রক্ষোভ**। ভয়, বিস্ময়, ভালবাসা, প্রেম, ভক্তি, কৃতজ্ঞতা, আত্মসমর্পণ প্রভৃতি অনুভূতি ধর্মীয় রসের সংগঠক। ধর্মীয় রস **বিস্ময়**-মিশ্রিত, কারণ ইহার বিষয় বিরাট। বিরাট মানুষের সীমাবদ্ধ জ্ঞানের পক্ষে দুরবগাহ, সুতরাং বিস্ময়কর। ইহার এই বিরাটত্ব জীবকে যেমন আকর্ষণ করে. তেমনিই যেন দূরে সরাইয়া রাখে। ইহা **ভয়, প্রেম এবং শ্রদ্ধারও বস্তু।** মানুষ ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিতে চায় আপন হইতেও আপনার রূপে, তাই তাঁহাকে ভালবাসে। আপনার হইয়াও ঈশ্বর বিরাট। তাই তাঁহার প্রতি জাগে ভক্তি বা শ্রদ্ধা। তিনি উপলব্ধ হন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা এবং পালয়িতা রূপে, তাই জাগে তাঁহার

প্রতি **কৃতজ্ঞতা।** আবার তাঁহাকে মানুষ উপলব্ধি করে তাহার একান্ত প্রভুরূপে, তাই জাগে তাঁহার প্রতি **আত্মসমর্পণ** কামনা।

উপসংহার :—ধর্মীয় রসে সত্যাশ্রয়ী রসের বিস্ময়, কৌতূহল, অবধান, শীলরসের শ্রদ্ধা, এবং কান্তরসের বিরাট অনুভূতি, ভয়, আকর্ষণ প্রভৃতি মিলিত হয়। **এই সর্বান্তর্ভাবী রসে সত্য-শিব-সুন্দরাশ্রিত সকল রসের চরম পরিণতি ঘটে। ধর্মীয় রসই সার্বভৌম রস।**

অনুশীলনী (Exercise)

1. Define sentiment. Distinguish between emotion and sentiment. (Ans—pp. 271-273)

   প্রক্ষোভ এবং রসের পার্থক্য প্রদর্শন কর।

2. What are the main kinds of sentiments ? Give an analysis of the intellectual sentiment. (Ans—pp. 273-274)

   রস প্রধানতঃ কয় প্রকার ? বুদ্ধিমূলক রস বিশ্লেষণ কর।

3 Explain the sentiment of the sublime as distinguished from that of the ludicrous What is the sentiment of tragedy ? (Ans—pp. 276-277)

   বিরাট রস এবং অদ্ভূত রসের পার্থক্য আলোচনা কর। বিয়োগান্ত রস কাহাকে বলে ?

4 Give a psychological analysis of the comic sentiment. What are the causes of laughter ? (Ans—pp. 277-280)

   হাস্যরসের মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ কর। হাসির কারণ কি ?

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

চেতনা, অবচেতন এবং নির্জ্ঞান

(Consciousness, the Subconscious and the Unconscious)

১। চেতনা কাহাকে বলে—মন ও চেতনা

চেতনা (Consciousness) মনের স্বভাব বা ধর্ম। দেকার্তে, লক্ প্রভৃতি দার্শনিক-মনোবিদ্ চেতনাকে মনের সহিত অভিন্ন বা সমব্যাপ্ত বলিয়াছেন। কিন্তু লাইবনিজ্ হইতে আরম্ভ করিয়া সাম্প্রতিক মনোবিদ্‌গণের অধিকাংশই মনকে চেতনা হইতে ব্যাপকতর বলিয়া মনে করেন। কাহারও কাহারও মতে চেতনা বা সংজ্ঞান মনের নিম্নে ইহার অন্ততঃ দুইটি স্তর রহিয়াছে, যথা অবচেতন (Sub-conscious) এবং নির্জ্ঞান (Un-conscious)।

চেতনা কাহাকে বলে? চেতনার কোনো সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন। চেতনা মৌলিক। চেতনার সাহায্যেই চেতনার সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব। কিন্তু তৎসত্ত্বেও চেতনার সংজ্ঞা নির্ণয় চেষ্টায় ত্রুটি ঘটে নাই। চেতনা কথাটি প্রধানতঃ দুইটি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রথম অর্থে নিজ বৃত্তিগুলি সম্বন্ধে মনের বোধই চেতনা (the mind's awareness of its own processes)। এই অর্থ অনুসারে চেতনা শুধু মন নয়, কিন্তু মনে যা ঘটে তাহার সাক্ষাৎ প্রতীতি। অর্থাৎ সংবেদন, চিন্তন প্রভৃতি মানসবৃত্তি সম্বন্ধে মনের প্রত্যক্ষ জ্ঞানই চেতনা। দ্বিতীয় অর্থে মনই চেতনা। কোন মানসবৃত্তি, যেমন সুখ অর্থই ঐ সম্বন্ধে চেতনা। চেতনার এই জাতীয় সংজ্ঞায় মনের সহিত উহা সমব্যাপক। সুতরাং ইহা গ্রহণীয় হইতে পারে না। আবার প্রথম সংজ্ঞাটি চেতনার সহিত আত্ম-চেতনার পার্থক্য স্বীকার করে না। এই সংজ্ঞা চেতনা দিয়াই চেতনার ব্যাখ্যা করে।

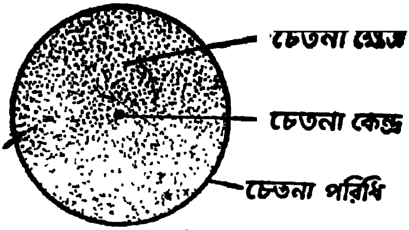
অনেক মনোবিদের মতে চেতনার সংজ্ঞা সম্ভব না হইলেও, উহার বর্ণনা সম্ভব। যেমন জি, টি, ল্যাড্ বলিয়াছেন, চেতনা সেই বস্তু যাহা নিদ্রিত হইয়া পড়িবার পূর্বে ক্রমশঃ কমিতে কমিতে অন্তর্হিত হয়, আবার জাগরণের পর মুহূর্ত হইতে ক্রমশঃ বাড়িতে বাড়িতে স্পষ্টতম আকার ধারণ করে। অবশ্য এইরূপ বর্ণনার যৌক্তিকতা বিবেচ্য। কারণ নিদ্রিতাবস্থায় চেতনা একেবারে অন্তর্হিত হয় কিনা তাহাতে সন্দেহ আছে।

২। চেতনার ক্ষেত্র (Field of Consciousness)

চেতনার স্বভাব জ্ঞান বা প্রকাশ। চেতনার স্পর্শে সকল বস্তু আমাদের জ্ঞান-গোচর হয়, যেমন আলোকের স্পর্শে সকল দৃশ্যবস্তু স্পষ্ট হয়। কিন্তু চেতনার প্রকাশ সর্বদাই যে সমান স্পষ্ট হয় তাহা নয়। চেতনার মাত্রাভেদ (Degree of consciousness) আছে। চেতনা একটি বিন্দু নয়, কিন্তু একটি বৃত্ত। এই বৃত্তটি স্পষ্টতম চেতনা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ অস্পষ্ট হইতে অস্পষ্টতর হইয়া অস্পষ্টতমতায় বিলীন হয়। স্পষ্টতম চেতনাকে চেতনাবৃত্তের (circle or field of cosciousness) বা চেতনা-ক্ষেত্রের কেন্দ্র (centre) বলা যায়। স্পষ্টতম চেতনাকেন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া অস্পষ্টতম চেতনাপরিধি পর্যন্ত ক্ষেত্রকে বলা যায় চেতনা-বৃত্ত বা চেতনা-ক্ষেত্র। কেন্দ্র হইতে পরিধি পর্যন্ত অগ্রসর হইলে চেতনার বস্তুগুলি স্পষ্টতম হইতে অস্পষ্টতম হইয়া দাঁড়ায়। চেতনা-ক্ষেত্রের বস্তু চেতনা-কেন্দ্রের যত নিকটবর্তী হয়, উহার চেতনাও সেই পরিমাণে স্পষ্ট এবং কেন্দ্র হইতে যত দূরবর্তী হয় বা সরিয়া যায়, উহার চেতনাও সেই পরিমাণে অস্পষ্ট হয়।

যেমন পাঠক পুস্তক পাঠ করিতেছেন। এই স্থলে যে সকল বস্তু বা বিষয় তাঁহার চেতনা অধিকার করিয়া আছে, সেইগুলি মিলিত হইয়া পাঠকের চেতনা-ক্ষেত্র গঠিত করে। আবার পাঠক পুস্তকের যে অংশটি যখন পাঠ করিতেছেন, তাহাই তখন তাঁহার চেতনা-ক্ষেত্রের কেন্দ্রে অথবা স্পষ্টতম চেতনায় আসে। তিনি যে আলোকে পড়িতেছেন তাহা, অথবা যে অংশ পড়িতেছেন তাহার আগের এবং পরের অংশটি, তাঁহার স্পষ্টতম চেতনায় বা চেতনা-ক্ষেত্রের কেন্দ্রে নাই, কিন্তু আছে অস্পষ্ট চেতনায় বা চেতনা ক্ষেত্রের পরিধিতে।

চেতনা-ক্ষেত্রের বিষয়গুলির মধ্যে সর্বদা অদলবদল বা স্থান-পরিবর্তন চলিতে থাকে। চেতনা স্থাণু বা নিশ্চল নয়, কিন্তু নিত্য চঞ্চল। নিয়ত পরিবর্তনশীল হওয়ায়, পূর্ব মুহূর্তে যে বিষয়টি উহার কেন্দ্রে অবস্থিত ছিল, সেইটি হয়ত পরমুহূর্তে উহার পরিধিতে সরিয়া যায়, আবার যেটি পরিধিতে ছিল সেইটিই হয়ত উহার কেন্দ্রে স্থান অধিকার করিয়া বসে। যেমন, পুস্তকটি পড়িবার কালে উহার কোনো অংশ চেতনা-কেন্দ্র অধিকার করিয়া থাকে এবং আলোক, টেবিল, চেয়ার এবং সামনের দেওয়ালে টাঙানো ছবিগুলি চেতনার পরিধিতে অবস্থিত থাকে। কিন্তু এই পারিপার্শ্বিক অবস্থাগুলির কোনো পরিবর্তন বা মনোযোগের ব্যাঘাত ঘটিলেই, চেতনা পুস্তকাংশ হইতে সরিয়া ঐ বিষয়গুলিতে চলিয়া যায়।



২৪নং চিত্র-চেতনাবৃত্ত

এইরূপে দেখানো যাইতে পারে যে চেতনা-ক্ষেত্রে বস্তুগুলি নিষ্ক্রিয় নয়, কিন্তু নিত্য পরিবর্তনশীল, কারণ চেতনা নিত্য প্রবহমান। জেম্‌স চেতনাকে একটি প্রবাহ (stream of consciousness) বলিয়াছেন। বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ দার্শনিকও চেতনাকে "বিজ্ঞানসন্তান" বা চেতনা-প্রবাহরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। চেতনা-ক্ষেত্রের পরিবর্তনের একটি মূল কারণ হইল মনোযোগের পরিবর্তন।

৩। চেতনার স্তর—অবচেতন ও আসংজ্ঞান

সালি (Sully), স্টাউট্, এঞ্জেল (Angel) প্রভৃতি মনোবিদগণের মতে চেতনা-কেন্দ্রের পর হইতে আরম্ভ করিয়া চেতনা-পরিধি পর্যন্ত ক্ষেত্রকে (Subconscious) বলে। তাঁহারা বলেন যে অবচেতন চেতনাবিহীন নয়, স্পষ্টতম চেতনাও নয়, কিন্তু এই দুইয়ের মধ্যবর্তী। ইহা অল্পাধিক চেতনা, যে চেতনা সম্বন্ধে ব্যক্তি সচেতন নয়, কিন্তু যাহা সম্বন্ধে সে সচেতন হইতে পারে। যেমন, পাঠক যে আলোকে পুস্তক পাঠ করিতেছেন সে সম্বন্ধে তাঁহার স্পষ্ট চেতনা নাই। কিন্তু যদি কেহ তাঁহার অজ্ঞাতে আলোক কমাইয়া দেয়, তিনি আলোকের হ্রাস বুঝিতে পারেন। আলোক সম্বন্ধে তাঁহার অবশ্যই অস্পষ্ট চেতনা ছিল, নতুবা আলোকের হ্রাস সম্বন্ধে তিনি সচেতন হইতেন না। তাহা হইলে, অবচেতনের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে অনুকূল অবস্থা ঘটিলেই, উহা সংজ্ঞানে অথবা স্পষ্ট চেতনায় আসিতে পারে অথবা চেষ্টা করিলেই উহাকে চেতনার কেন্দ্রে আনিতে পারা যায়।

এখানে প্রশ্ন এই, যে বিস্মৃত বস্তুটিকে আমরা স্মরণ করিতে পারি অথবা যে পূর্ব পরিচিত ব্যক্তিকে আমরা চিনিতে পারি, স্মরণের বা চিনিবার (প্রত্যভিজ্ঞা) পূর্বে ঐ বস্তু বা ব্যক্তি সম্বন্ধে কি আমাদের অস্পষ্ট চেতনা ছিল, অথবা ইহাদের সম্বন্ধে আমাদের কোনো চেতনাই ছিল না? একথা অনস্বীকার্য যে পূর্ব পরিচয় অথবা অভিজ্ঞতা এবং উহার প্রত্যভিজ্ঞান অথবা স্মরণের মধ্যবর্তী কালে উহাদের সম্বন্ধে অস্পষ্ট বা কোন চেতনাই না থাকিতে পারে। যে অভিজ্ঞতা বা পরিচয় বহু পূর্বে ঘটিয়াছিল তাহার চেতনা-ক্ষেত্রে না থাকাই স্বাভাবিক। উহারা অবশ্যই সংজ্ঞানে ছিল না।

উহাদের অস্পষ্ট চেতনা না থাকায়, উহারা অবচেতনেও ছিল না। যেহেতু উহারা সংজ্ঞানে বা অবচেতনে না থাকিয়াও মনে রহিয়াছে, সুতরাং উহারা নিশ্চয়ই নির্জ্ঞানে ছিল। কিন্তু উহারা নির্জ্ঞান মনেও থাকিতে পারে না, কারণ নির্জ্ঞানে সংরক্ষিত বস্তু অবিকৃত ভাবে প্রকাশিত হয় না। পূর্ব অভিজ্ঞতার স্মৃতি বা পূর্ব পরিচিতের প্রত্যভিজ্ঞানে বস্তুর কোনো প্রধান বিকৃতি ঘটে না।

সুতরাং স্বীকার করিতে হয় যে অবচেতন বলিতে স্টাউট প্রভৃতি যাহা বুঝেন তাহার সাহায্যে সকল স্মরণ এবং প্রত্যভিজ্ঞান ব্যাখ্যাত হয় না। আবার স্টাউট যাহাকে মানস সংস্কার বা প্রবণতা (mental disposition) বলিয়া নির্জ্ঞান মনের প্রমাণ করিয়াছেন, সেই নির্জ্ঞান মনও ইহা ব্যাখ্যা করিতে পারে না। কাজেই অবচেতন ও নির্জ্ঞানের মধ্যবর্তী আর একটি মানসস্তর আছে, ফ্রয়েড্ যাহাকে বলিয়াছেন আসংজ্ঞান (Pre-conscious)। আসংজ্ঞান চেতনা-ক্ষেত্রের একটি অস্পষ্ট স্তরই শুধু নয়, কিন্তু এইটি উহার বহিঃস্থ একটি অবচেতন স্তর।

হেফ্ডিং (Heffding) প্রভৃতি মনোবিদ্ অবচেতন বলিতে মনের এইরূপ একটি অচেতন স্তরই বুঝিয়াছেন। আবার মনঃসমীক্ষণ প্রণেতা ফ্রয়েডও বলিয়াছেন যে নির্জ্ঞান ও সংজ্ঞান মনের মধ্যবর্তী স্তরটি অস্পষ্টচেতন নয় কিন্তু অচেতন। তিনি এই স্তরটির নাম দিয়াছেন আসংজ্ঞান। সংজ্ঞানে প্রকাশিত হইতে হইলে, নির্জ্ঞান মানসবৃত্তির আসংজ্ঞান স্তরটি অতিক্রম করিতে হয়। মোট কথা, যে সকল মানসবৃত্তি বর্তমানে সংজ্ঞান মনে নাই, অথচ একটু চেষ্টা করিলেই উহাদের সংজ্ঞানে প্রকাশ করা যায়, আসংজ্ঞান মন সেইগুলির আশ্রয়স্থল।

নির্জ্ঞান স্তর ঃ—আবার চেতনা ক্ষেত্রের বাহিরে, অথচ মনেরই ক্ষেত্রে একটি গভীরতম স্তর আছে। উহার নাম নির্জ্ঞান (unconscious) মন। এই স্তর চেতনা-ক্ষেত্রের মধ্যে পড়ে না, কারণ ইহা চেতনাবিহীন। কিন্তু চেতনার ক্ষেত্রে না পড়িলেও, ইহা মনের ক্ষেত্রে অবশ্যই পড়ে। স্টাউট প্রভৃতির মতে সংজ্ঞান (Coscious) এবং অবচেতন (Subconscious) মনের পার্থক্য শুধু চেতনার পরিমাণ বা মাত্রা অনুসারে। উভয় স্তরেই চেতনা থাকে—সংজ্ঞানে স্পষ্টতম ভাবে এবং অবচেতনে অস্পষ্ট হইতে আরম্ভ করিয়া অস্পষ্টতম ভাবে। হেফ্ডিং-এর মতে অবচেতন একটি চেতনাবিহীন স্তর। উহা নির্জ্ঞান বা অচেতন, কিন্তু অবচেতন বা অস্পষ্টচেতন মাত্র নয়। ফ্রয়েডও এইরূপ মত পোষণ করেন। তিনি অবচেতন মন স্বীকার করেন না, কিন্তু আসংজ্ঞান মন স্বীকার করেন। এমন কতগুলি মানসবৃত্তি আছে, যাহা সংজ্ঞান মন হইতে

অপসৃত হইয়া মনে অবস্থান করে এবং যাহা সংজ্ঞান, অবচেতন বা নির্জ্ঞান নয়। ইহারা অচেতন হইলেও, নির্জ্ঞান এবং সংজ্ঞানের মধ্যবর্তী আসংজ্ঞান মনে অবস্থান করে। অবচেতন, আসংজ্ঞান এবং নির্জ্ঞান মনের পার্থক্য পরে আলোচিত হইতেছে।

মনঃসমীক্ষণ (Psychoanalysis) :—নির্জ্ঞান মানসবৃত্তির প্রায়ই বাল্যজীবনের। মাতা, পিতা, শিক্ষক, ধাত্রী, পরিবার, সমাজ প্রভৃতি শাসকদের মানদণ্ডে যে সকল ইচ্ছাপূরণ অন্যায় বা অনুচিত, সেইগুলি পূর্ণ করিলে শিশুকে কঠোর শাস্তি বা দণ্ড পাইতে হয়। শাস্তি ও দণ্ডের ভয়ে শিশুর অবৈধ বা অন্যায় কামনাগুলি অবদমিত হইয়া নির্জ্ঞান মনে আশ্রয় লাভ করে। কিন্তু কামনার স্বভাবই হইল সক্রিয়তা। ইহারা নির্জ্ঞান মনে নির্বাসিত হইয়াও অধিশাস্তার (Super-ego) ভয়ে সর্বদা আত্ম-প্রকাশের চেষ্টায় সক্রিয় থাকে। উহারা জাগরণে পুরাপুরি আত্মপ্রকাশ করিতে পারে না। তাই উহারা জাগরণের ভুল-ভ্রান্তির, নিদ্রায় স্বপ্নের, এবং মানসিক রোগে রোগলক্ষণের আকারে দেখা দেয়। এই প্রকাশগুলি বিকৃত এবং উহাদের ছদ্মবেশ হইতে নির্জ্ঞান ইচ্ছাগুলির আসল রূপ বুঝা যায় না। মনঃসমীক্ষণ এই ব্যক্তরূপের মূলীভূত অব্যক্ত কামনা বিশ্লেষণ করে।

কোনো নিপুণ মনঃসমীক্ষকই তাঁহার বৈজ্ঞানিক অবাধ ভাবানুষঙ্গ (Free Association) পদ্ধতির সাহায্যে নির্জ্ঞান মন বিশ্লেষণ করিয়া উহাদের প্রকৃত রূপ উদ্ঘাটন করিতে পারেন। এই বিষয়টি স্বপ্ন শীর্ষক অনুচ্ছেদে[১] আরও সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে।

অবচেতন এবং নির্জ্ঞান স্তরের পার্থক্য :—অবচেতন এবং নির্জ্ঞান মনের পার্থক্য এই :—(১) অবচেতন অস্পষ্ট-চেতন এবং চেতনাবিহীন এই উভয় স্তরেরই হইতে পারে। স্টাউট্ প্রভৃতির মতানুযায়ী অবচেতন মন অস্পষ্টভাবে চেতন। কিন্তু ফ্রয়েড্ প্রভৃতির মতানুযায়ী অবচেতন বা তাঁহার অভিমত আসংজ্ঞান মন, সামগ্রিক ভাবে অচেতন বা চেতনাবিহীন। পক্ষান্তরে নির্জ্ঞান মন সর্বতোভাবে চেতনাবিহীন। (২) অবচেতন মন অবদমন (Repression)-প্রসূত নয়, যদিও ইহা নিরোধ (Suppression)[২] -প্রসূত হইতে পারে। পক্ষান্তরে নির্জ্ঞান মন অবদমিত বাসনার আশ্রয়স্থল। (৩) অবচেতন বৃত্তিগুলির সহিত উহাদের সংজ্ঞান রূপের কোনো প্রকারগত বৈষম্য নাই, উহারা একই জাতীয়। ইহাদের

১। কল্পনা শীর্ষক পরিচ্ছেদ, ৭-১০ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

২ অবদমন এবং নিরোধের পার্থক্য আছে। প্রথমটি নির্জ্ঞান ক্রিয়া, অর্থাৎ ব্যক্তির ইচ্ছা-প্রসূত নয়। কিন্তু দ্বিতীয়টি সংজ্ঞান ক্রিয়া এবং ব্যক্তির ইচ্ছামূলক।

বৈষম্য চেতনার পরিমাণের বা মাত্রার। অবচেতন বৃত্তিগুলি অস্পষ্টভাবে চেতন এবং উহারা যখন সংজ্ঞান মনে প্রকাশিত হয় তখন স্পষ্টভাবে চেতন। অথবা অবচেতন বৃত্তির সংজ্ঞান প্রকাশগুলি বিকৃত নয়, উহাদের দুইটি রূপেরই আকার প্রকার একই রকমের। পক্ষান্তরে নির্জ্ঞান ইচ্ছা এবং উহার সংজ্ঞান প্রকাশের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য থাকিতে পারে। নির্জ্ঞান মনে অবদমিত বাসনাগুলির অব্যক্ত রূপ (Latent content) এবং সংজ্ঞান মনে প্রকাশিত উহাদের ব্যক্তরূপ (Manifest content) ভিন্নজাতীয় বলিয়া প্রতীয়মান হয়। অবচেতন ইচ্ছা সংজ্ঞানে নিজরূপেই প্রকাশিত হয়। নির্জ্ঞান ইচ্ছা সংজ্ঞানে প্রকাশিত হয় ছদ্মবেশে (Disguised)। (৪) আবার অবচেতন আসংজ্ঞান অর্থে অচেতন হইলেও, স্বয়ং অথবা বিনা চেষ্টায় নিজরূপে সংজ্ঞান মনে প্রকাশিত হইতে পারে। ব্যক্তি নিজ চেষ্টায় অবচেতন বৃত্তিকে সংজ্ঞান মনে আনিতে সক্ষম। পক্ষান্তরে নির্জ্ঞান বৃত্তি স্বয়ং বা ব্যক্তির নিজ চেষ্টায় নিজরূপ লইয়া সংজ্ঞানে প্রকাশিত হয় না। ব্যক্তি নির্জ্ঞান বৃত্তিকে তাহার নিজস্ব চেষ্টায় সংজ্ঞান মনে আনিতে পারে না। নিপুণ মনঃসমীক্ষকই শুধু এই রূপান্তর সাধনে সক্ষম। (৫) সর্বশেষে, অবচেতন ইচ্ছা মানস-ব্যাধির লক্ষণরূপে আত্মপ্রকাশ করে না; কারণ ইহাতে সেই পরিমাণের অবদমন থাকে না, যাহার ফলে বিকৃত অথবা ছদ্ম প্রকাশের পথ খুঁজিতে হয়। পক্ষান্তরে নির্জ্ঞান ইচ্ছা প্রায়ই হিস্টিরিয়া, ভ্রমবাতুলতা (Paranoia), বিষাদবায়ু (Melancholia) প্রভৃতি মানসব্যাধির লক্ষণরূপে আত্মপ্রকাশ করে।

৪। আসংজ্ঞান এবং অবচেতনের প্রমাণ

আসংজ্ঞান মন প্রমাণিত সত্য। স্মরণ (Memory), প্রত্যভিজ্ঞা (Recognition) প্রভৃতি মানসবৃত্তি আসংজ্ঞান মনের ভিত্তিতেই বোধগম্য। অতীত অভিজ্ঞতার ফল প্রতিরূপের আকারে আসংজ্ঞান মনে সংরক্ষিত থাকে বলিয়াই ইহার স্মরণ এবং প্রত্যভিজ্ঞা সম্ভব হয়। স্মরণে এবং প্রত্যভিজ্ঞায় অতীত অভিজ্ঞতার ফলে আসংজ্ঞান মনে সংরক্ষিত প্রতিরূপ পুনরুদ্বোধিত (revived) হয়। প্রত্যভিজ্ঞায় প্রমাণিত হয় যে পুনরুদ্বুদ্ধ জ্ঞানটি নূতন বা অপরিচিত নয়, কিন্তু পুরাতন বা পরিচিত। এই পরিচিতি বোধ ব্যাখ্যা করিতে হইলে, প্রতিরূপগুলি যে কোনো না কোনো আকারে আসংজ্ঞান মনে সংরক্ষিত ছিল, তাহা স্বীকার করিতে হয়।

অবচেতন মনও অবশ্য স্বীকার্য। সংবেদন, প্রত্যক্ষ, চিন্তন প্রভৃতি বৃত্তিগুলিকে ব্যাখ্যা করিতে হইলেও অবচেতন মনের অস্তিত্ব স্বীকার করা প্রয়োজন। যেমন, সংবেদনের বেলায় প্রত্যেক উদ্দীপকই (Stimulus) বোধগম্য সংবেদন উৎপন্ন করে না, কিন্তু একটি নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিলেই, বোধগম্য সংবেদন উৎপন্ন করে। একটি সমুদ্রতরঙ্গের শব্দ শোনা যায় না. কিন্তু অনেকগুলি তরঙ্গের সমবেত শব্দ শোনা যায়। প্রত্যেকটি তরঙ্গশব্দের শ্রবণ যদি শূন্য হয়, তবে কতগুলি তরঙ্গ-শব্দের যুক্ত শ্রবণও শূন্য হইবার কথা। আবার কতগুলি তরঙ্গের সমবেত শব্দ যদি পূর্ণ, অর্থাৎ বোধগম্য শ্রবণ সংবেদন উৎপন্ন করে, তবে ধরিয়া লইতে হয় যে প্রত্যেকটি পৃথক তরঙ্গের শ্রবণ-সংবেদন শূন্য নয়, কিন্তু পূর্ণ, অর্থাৎ বোধগম্য। এই বোধগম্যতা অস্পষ্ট, অর্থাৎ উহার সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট চেতনা হয় না। পৃথক তরঙ্গগুলির বোধগম্যতা স্পষ্ট-চেতনার নিম্নে অবচেতন স্তরে রহিয়াছে।

আবার অবচেতন মন অস্বীকার করিলে, প্রত্যক্ষও দুর্বোধ্য হইয়া পড়ে। প্রত্যক্ষ অতীত সংবেদনের উপর নির্ভরশীল। সংবেদনের প্রতিরূপ অবচেতন মনে সংরক্ষিত থাকিয়া পুনরায় উদ্বুদ্ধ না হইলে, প্রত্যক্ষ হয় না। তাহা ছাড়া, প্রত্যক্ষ সদৃশীকরণ (Assimilation), পৃথকীকরণ (Discrimination), প্রত্যভিজ্ঞা (Recognition) প্রভৃতি ক্রিয়ার উপর নির্ভর করে এবং এই ক্রিয়াগুলি অবচেতন মন সাহায্যেই সম্পন্ন হয়।

আরও অন্যান্য বহু মানসক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করিতে হইলে, অবচেতন মন স্বীকার করিতে হয়।

৫। নির্জ্ঞান মনের প্রমাণ

নির্জ্ঞান মনের অস্তিত্বও কতগুলি যুক্তি সাহায্যে প্রমাণ করা যাইতে পারে। দৈনন্দিন জীবনের ভুলভ্রান্তি (Errors of everyday life), স্বপ্ন, মানসব্যাধি, সংবেশন (Hypnotism), অভিভাবন (Suggestion) প্রভৃতি ঘটনাগুলি নির্জ্ঞান মনের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। তাহা ছাড়া, নির্জ্ঞান মনের সাহায্যে যে শুধু মানস রোগীর বা স্বভাবী ব্যক্তির মানসক্রিয়াই বুঝা যায়, তাহা নয়। নির্জ্ঞান মন সাহায্যে আমরা শুধু রোগীর মন নয়, সহজ, সুস্থ মানবের মানসিকতার গতিবৃত্তি, সাহিত্য ও ললিতকলার সৃষ্টিতত্ত্ব, সামাজিক রীতিনীতির অন্তর্নিহিত উৎস, ধর্মজীবনের ভিত্তি,

বিভিন্ন ধর্মাশ্রমের বিভিন্ন নিয়মাবলীর কারণ, পৌরাণিক কাহিনীর সঙ্গত ব্যাখ্যা প্রভৃতি নানা বিষয়ে নূতন জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হই। [১]

(১) ফ্রয়েড্ তাঁহার "সাইকপ্যাথলজি অফ্ এভ্রিডে লাইফ (Psychopathology of Everyday Life) গ্রন্থে **দৈনন্দিন জীবনের ভুলভ্রান্তি** সম্বন্ধে মূল্যবান তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন। নাম ভুলিয়া যাওয়া, সঙ্কল্প ভুলিয়া যাওয়া, নানাপ্রকার ভুল কাজ—যেমন কথায় ভুল, পড়ার ভুল, লেখার ভুল, ছাপার ভুল, দেখার ভুল, শোনার ভুল প্রভৃতি প্রাত্যহিক জীবনের দোষত্রুটিগুলির মূলে কোনো না কোনো নির্জ্ঞান ইচ্ছার প্রভাব বর্তমান থাকে। ডঃ ব্রিল (Dr. Brill) একটি নাম ভুলিয়া যাওয়ার উদাহরণ দিয়াছেন। তাঁহার একজন সহকর্মী ডঃ বি—তাঁহার আত্মীয় ব্রাউন-এর নামটি স্মরণ করিতে পারিতেছিলেন না। অথচ ঐ সহকর্মী তাঁহার আত্মীয়টির নিকট নানাপ্রকারে ঋণী ছিলেন। আত্মীয়টি দেড় মাস পূর্বে তাঁহার নিকট হইতে কর্জ হিসাবে কিছু অর্থ চাহিয়া একখানি পত্র দিয়াছিলেন। ডঃ বি—আত্মীয়টিকে টাকা পাঠানো দূরে থাকুক, তাঁহার পত্রের উত্তর পর্যন্ত দেন নাই, এমন কি সেই পত্রখানি হারাইয়াও ফেলিয়াছিলেন। এই নামটি ভুলিয়া যাইবার মূলে ছিল ডঃ বি-এর মানসিক দ্বন্দ্ব। উপকারের কৃতজ্ঞতা-স্বরূপ তাঁহাকে সাহায্য করা উচিত ছিল, অথচ তিনি তাঁহাকে সেই সাহায্যটুকু করেন নাই। এই দ্বন্দ্বমূলক অপ্রীতিকর অবস্থা হইতে পরিত্রাণের জন্যই উপকারীর নামটি বিস্মৃত হইয়াছেন।

(২) **জাগর স্বপ্ন** (Day Dream) নির্জ্ঞান মনের আর একটি প্রমাণ। স্বপ্ন জাগ্রৎ এবং সুষুপ্তি বা স্বপ্নহীন নিদ্রার মধ্যবর্তী অবস্থা। আবার জাগর স্বপ্ন জাগ্রৎ এবং স্বপ্নের মধ্যবর্তী অবস্থাবিশেষ। জাগর স্বপ্নের দৃষ্টান্তের অভাব নাই—গোয়ালিনী, ডিম-বিক্রেত্রী, ছাতুওয়ালা বা অল্নাস্কার-এর দিবাস্বপ্ন ইহার উদাহরণ। উহারা সকলেই জাগিয়া জাগিয়া স্বপ্ন দেখিতেছিল যে দুধ, ডিম, ছাতু এবং হাঁড়ি-কলসী বিক্রয় করিয়া অর্থ উপার্জন করিয়া বড়লোক হইবে এবং কোনো দেশের রাজপুত্র বা রাজকন্যা উহাদের পাণিপ্রার্থী হইবে তখন উহারা তাহাকে মাথা নাড়িয়া বা লাথি মারিয়া প্রত্যাখ্যান করিবে। স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে তাহারা বাস্তবিকই মাথা নাড়িল বা লাথি মারিল। ফলে দুধ, ডিম, ছাতু মাথা হইতে পড়িয়া ভাঙ্গিল অথবা হাঁড়ি কলসী পদাঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইল। এই প্রকার জাগর স্বপ্নের মূলে রহিয়াছে

১ মনঃসমীক্ষণ—ডঃ সুহৃৎচন্দ্র মিত্র, পৃঃ ৮/

জাগরণে উহাদের আত্মমর্যাদা অথবা আত্মসাম্মুখ্য (Self-assertion) ইচ্ছার অবদমন।

(৩) আবার, **স্বপ্ন** (Dream) নির্জ্ঞান মনের অভ্রান্ত প্রমাণ। স্বপ্নের মূলে রহিয়াছে অবদমিত ইচ্ছার আত্মপ্রকাশ প্রবৃত্তি। যে সকল ইচ্ছা প্রচলিত ন্যায়, সুন্দর, সত্য প্রভৃতি আদর্শের বিরোধী, সেইগুলি জাগরণে পূর্ণ হইতে পারে না। অবদমনের ফলে উহারা নির্জ্ঞান মনে বিতাড়িত হয়। কিন্তু নির্জ্ঞানের অজ্ঞাতবাস হইতে সংজ্ঞানের প্রকাশ্য দিবালোকে আসিবার জন্য উহারা নিরন্তর সচেষ্ট থাকে। যখন নিদ্রার প্রাথমিক অবস্থায় বিবেক বা অধিশাস্তার শাসন শিথিল হইয়া পড়ে, সেই সুযোগে উহারা আত্মগোপন করিয়া ছদ্মবেশে সংজ্ঞান মনে প্রকাশিত হয়। সংজ্ঞান মনে অপূর্ণ ও অবদমিত ইচ্ছার এইরূপ বিকৃত প্রকাশের নামই স্বপ্ন। বিষয়টি স্বপ্ন শীর্ষক অনুচ্ছেদে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে।

(৪) **নির্জ্ঞান ইচ্ছা প্রকাশের উপায় :** স্বপ্ন ছাড়াও ধর্ম, দর্শন, শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতি মানস-জীবনের উচ্চতর আদর্শ বা মূল্যগুলির এবং নানা রোগলক্ষণ বা উপসর্গের (Symptoms) মধ্য দিয়াও নির্জ্ঞান মনের ক্রিয়া প্রকাশিত হয়। স্বভাবী লোকের অবদমিত নির্জ্ঞান ইচ্ছা প্রধানতঃ তিনটি উপায়ে সংজ্ঞান মনে আত্মপ্রকাশ করে।

(ক) প্রথমটি **উদ্গতি** (Sublimation)—ইহাতে নির্জ্ঞান ইচ্ছা উহার স্বাভাবিক নিম্নতর লক্ষ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কোনো কল্যাণময় লক্ষ্যপথে পরিচালিত হয়। অথবা নিরুদ্ধ ও নিষিদ্ধ ইচ্ছা উহার নিষিদ্ধ লক্ষ্য হইতে নিবৃত্ত হইয়া কোনো শ্লাঘনীয় বা বরণীয় লক্ষ্যের দিকে চালিত হয় এবং দেশের ও দশের কল্যাণে নিয়োজিত হয়। উদ্গতির ফলেই দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প, জনসেবা, সমাজ-হিতৈষণা, দেশপ্রেম, সৌন্দর্য-পিপাসা, ঈশ্বরানুভূতি বা ধর্ম প্রভৃতি উচ্চতর আদর্শগুলির বিকাশ ঘটে। উদ্গতি বা উন্নয়ন সংজ্ঞান ইচ্ছা দ্বারা সাধিত হয় না। ইহার সাধারণ দৃষ্টান্ত হিসাবে ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল-এর মত সেবাব্রতা নার্সদিগের কথা উল্লেখ করা যায়। কোনো সেবাব্রতা নার্স হয়ত একজন বালবিধবা অথবা সন্তানহীনা। তাহার অবদমিত মাতৃত্ব কামনাই হয়ত সেবাব্রতে আত্মপ্রকাশ করে।

(খ) নির্জ্ঞান ইচ্ছার দ্বিতীয় প্রকাশ প্রণালী **অভিক্রান্তি** (Displacement)। ইহার ফলে নির্জ্ঞান ইচ্ছা কোনো কল্যাণকর পথে প্রবাহিত হয় না, যেমন উদ্গতির ক্ষেত্রে হয়। কোনো বালিকার মা হইবার বাসনা অবদমিত হইয়া হয়ত পুতুলখেলায় অভিক্রান্ত হয় বা স্থানান্তরিত। কোনো নিঃসন্তানা মহিলার অবদমিত মাতৃত্বকামনা

হয়ত বিড়াল, কুকুর, অথবা পাখি পোষার মধ্য দিয়া প্রকাশিত হয়।

(গ) নির্জ্ঞান ইচ্ছার তৃতীয় প্রকাশপ্রণালী **বিপরীত গঠন** (Reaction formation)। এই ক্ষেত্রে নির্জ্ঞান ইচ্ছা উহার বিপরীত রূপ লইয়া আত্মপ্রকাশ করে। কিশোর জীন্ ভলজিন্ সাধু উদ্দেশ্যে একখণ্ড রুটি চুরি করিয়াছিল। এই লঘু পাপে গুরু দণ্ড লাভ করিয়া সে হঠাৎ দাগী চোর হইয়া দাঁড়াইল। আবার হয়ত কোনো সাধুব্যক্তি আঘাত পাইয়া বিপরীত অসাধু পথ অবলম্বন করিয়া দ্বিতীয় কালাপাহাড় হইয়া উঠিলেন।

সংবেশন (Hypnotism) ও **অভিভাবন** (Suggestion) :—সংবেশন এবং অভিভাবন নির্জ্ঞান মনের অস্তিত্ব প্রমাণিত করে। সংবিষ্ট অবস্থায় কোনো ব্যক্তিকে হয়ত আদেশ করা হইল যে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিবার পর তাহাকে কোনো কাজ করিতে হইবে। দেখা যায় যে স্বাভাবিক অবস্থায় সে ঐ আদিষ্ট কাজটি যথাবিধি সম্পন্ন করে। অথচ সংবেশকের (Hypnotist) আদেশের কথা তাহার আদৌ মনে থাকে না। অবশ্য সংবিষ্ট অবস্থাটি সম্পূর্ণ নির্জ্ঞান অবস্থা কি না, তাহাতে সন্দেহ আছে। ইহা একপ্রকার লঘু অবচেতন বা আসংজ্ঞান অবস্থাও হইতে পারে। কারণ প্রায়ই দেখা যায় যে সংবিষ্ট অবস্থায় প্রদত্ত সংবেশকের অভিভাবন বা আদেশ সংবিষ্ট ব্যক্তির নীতি এবং ধর্মবোধের বিরুদ্ধ হইলে, সে উহা পালন করে না।

(৬) **উপসর্গ বা রোগলক্ষণ** (Symptoms) : আবার অস্বভাবী মনের নির্জ্ঞান ইচ্ছা বহুবিধ মানসব্যাধির উপসর্গ বা লক্ষণের আকার লইয়াও প্রকাশিত হয়। আবেশিক বায়ুর (Obsessional Psychoneurosis) মধ্যে শুচিবায়ুর (Touch mania) দৃষ্টান্ত লওয়া যাউক। **শুচিবায়ু** রোগী সদাই অশুচির ভয়ে ভীত। শরীর পবিত্র রাখিবার অছিলায় সে স্নান করিতেই থাকে, অথবা আহারের পর সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মুখ ধুইয়াও তৃপ্ত হয় না। আবার গণনা বায়ুর (Counting mania) রোগী কোনো জিনিস গুণিতে আরম্ভ করিয়া গণনা-কার্য শেষ করিতেপারে না। সে গুণিয়াই যাইতে থাকে, কারণ তাহার আশঙ্কা এই যে গণনায় হয়ত কোথায়ও ভুল হইয়া গিয়াছে। এই প্রকার রোগলক্ষণের পশ্চাতে সর্বদাই কোনো না কোনো নিষিদ্ধ কামনা থাকে, যাহা অবদমিত হইয়া নির্জ্ঞান মনে অজ্ঞাতবাস করে। আবার ভয়বায়ুগ্রস্ত (Fear mania) রোগী নানা বস্তু হইতে অকারণে ভীতসন্ত্রস্ত হয়। শৈশবে অবদমিত কোনো অন্যায় নির্জ্ঞান কামনাই ভয় ও আশঙ্কারূপে প্রকাশিত হয়। এইরূপে হিস্টিরিয়া, ভ্রম-বাতুলতা, বিষাদ-বায়ু, চিত্তভ্রংশী বাতুলতা (Dementia

Praecox) প্রভৃতি মানসব্যাধির লক্ষণগুলির মূলেও কোনো না কোনো অবদমিত নির্জ্ঞান কামনা থাকে।

৬। উপসংহার

উপরের আলোচনা হইতে দেখা গেল যে মন শুধু চেতন নয়। চেতনা মনের উপরকার স্তর মাত্র। সংজ্ঞান বা চেতন মনের ভিতরে ইহার আরও অন্ততঃ তিনটি স্তর আছে—যথা অবচেতন (Subconscious), আসংজ্ঞান (Preconscious এবং নির্জ্ঞান (Unconscious)। অবচেতন স্তরটি অচেতন বা নির্জ্ঞান নয়। ইহা একটি অস্পষ্ট-চেতন মানস স্তর। চেতনা-ক্ষেত্রের কেন্দ্রবিন্দুটি হইল স্পষ্টতম চেতনার স্থান। ঐ কেন্দ্র হইতে চেতনাক্ষেত্রের পরিধির দিকে যতই অগ্রসর হওয়া যায়, চেতনার স্পষ্টতা ততই কমিতে থাকে। এইরূপ অস্পষ্ট-চেতনাই অবচেতন। কিন্তু অবচেতন মনের সাহায্যে স্মৃতি, প্রত্যভিজ্ঞা প্রভৃতি মানসবৃত্তি ব্যাখ্যা করা যায় না। কারণ স্মৃতির যে বিষয় মনে পড়িয়া যায়, অথবা প্রত্যভিজ্ঞায় যে বস্তু চিনিতে পারা যায়, সেই বিষয় বা বস্তু স্মৃত বা প্রত্যভিজ্ঞাত হইবার পূর্বে অস্পষ্টচেতন ভাবে মনে অবস্থান করিতেছিল, এইরূপ ধারণা অযৌক্তিক।

উপরোক্ত মানসবৃত্তি ব্যাখ্যা করিতে হইলে অবচেতন স্তর হইতেও গভীরতর একটি অচেতন স্তর স্বীকার করিতে হয়, যাহার নাম আসংজ্ঞান। বস্তু স্মৃত বা অভিজ্ঞাত হইবার পূর্বে আসংজ্ঞান স্তরে অচেতন ভাবে অবস্থান করে। চেষ্টা করিলেই এইরূপ বিষয়ের স্মরণ বা প্রত্যভিজ্ঞা সম্ভব। কারণ ইহা পূর্বজ্ঞাত বিষয়কে বিকৃত না করিয়াই সংজ্ঞানে বা চেতনায় আনিতে পারে।

আসংজ্ঞান অপেক্ষা গভীরতর স্তর হইল নির্জ্ঞান মন। এই স্তরটিও আসংজ্ঞানের মত অচেতন। কিন্তু আসংজ্ঞান বস্তু যেমন অবিকৃতভাবে সংজ্ঞানে আত্মপ্রকাশ করে, নির্জ্ঞান বস্তু তেমন করে না। নির্জ্ঞান বস্তু বিকৃত হইয়া সংজ্ঞানে উপস্থিত হয়।

এই পার্থক্যগুলি মনে রাখিলে সংজ্ঞান, আসংজ্ঞান এবং নির্জ্ঞান মানসস্তর সম্বন্ধে ভ্রান্তির সম্ভাবনা থাকে না।

৭। মনের বিভিন্ন ক্রিয়া

মনোবিদ্যা মানসক্রিয়ার বিদ্যা। কোন নিষ্ক্রিয় মানসসত্তা থাকিলেও, তাহা মনোবিদ্যার বিষয় নয়। মনোবিদ্যার বিষয় হইল বিভিন্ন মানসপ্রকাশ বা ক্রিয়াগুলি। সুতরাং মানসক্রিয়া প্রধানতঃ কি কি এবং উহাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ কি, তাহা জানা দরকার। এই বিষয়ে মতভেদের অন্ত নাই।

মানসবৃত্তি প্রধানতঃ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা, (১) জ্ঞানাত্মক, অবগতিমূলক বা চিন্তাত্মক (Cognitive or Thinking), (২) বেদনাত্মক বা অনুভবাত্মক (Affective or Feeling) এবং (৩) ক্রিয়াত্মক বা ইচ্ছাত্মক (Conative or Willing)।

(১) **অবগতিমূলক** (Cognitive) **মানসবৃত্তি** :—সকল জ্ঞানমূলক মানসক্রিয়ার সাধারণ নাম চিন্তন। (ক) **বিষয়মুখিতা** (Objectivity) চিন্তনের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। কোনো চিন্তাই উহার বিষয়কে (Object) ইঙ্গিত না করিয়া ঘটে না। (খ) **চেতনা** (Consciousness) অন্যান্য মানস-ক্রিয়ার মত চিন্তনেরও একটি বিশেষ লক্ষণ। সকল চিন্তনের সহিতই এই ক্রিয়া যে চলিতেছে, এইরূপ বোধ থাকে। (গ) চিন্তন প্রধানতঃ একটি **জ্ঞাননিষ্ঠ** (Theoretical) মানসক্রিয়া। চিন্তনের প্রধান কাজ বিষয়ের জ্ঞান লাভ করা। (ঘ) চিন্তন জ্ঞাননিষ্ঠ হওয়ায়, নিষ্ক্রিয় মানসক্রিয়াও বটে। মানসক্রিয়া অর্থে চিন্তন সক্রিয় হইলেও, ইহা বিষয়ে কোন পরিবর্তন ঘটায় না, যদিও বিষয়ের জ্ঞানে পরিবর্তন ঘটাইয়া থাকে। চিন্তন স্বয়ং নিষ্ক্রিয় হইলেও, ক্রিয়ার সহায়তা করিতে পারে। যেমন কেহ একটি ফুলের কথা চিন্তা করিতেছে এই ফুলের চিন্তাটি ব্যক্তির নিজস্ব মানসক্রিয়া, সন্দেহ নাই। কিন্তু চিন্তার বিষয় একটি ফুল, যাহা ব্যক্তির নিজস্ব নয়। দ্বিতীয়তঃ, এই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে উহার চেতনা রহিয়াছে। তৃতীয়তঃ, ফুলের চিন্তা ফুলের জ্ঞান লাভে সহায়তা করে এবং চতুর্থতঃ, ফুলের চিন্তা নিষ্ক্রিয়, কারণ ফুলের চিন্তা হইলেই যে ফুল লইবার চেষ্টা হইবে, এমন কথা নাই।

চিন্তন প্রধানতঃ নিম্নলিখিত বৃত্তিগুলি লইয়া গঠিত—যথা, সংবেদন, প্রত্যক্ষ, স্মরণ, কল্পনা, বিশ্বাস, প্রত্যয় বা ধারণা, অবধারণা এবং যুক্তি।

চিন্তার স্তরভেদ সংবেদন :—চিন্তনক্রিয়ার সর্বাপেক্ষা সবল ও সহজ বৃত্তি। উদ্দীপক ইন্দ্রিয়গোলককে (Sense-organ) উদ্দীপিত করিলে এবং সেই উদ্দীপনা স্নায়ুপ্রবাহ বা নার্ভপ্রবাহ রূপে অন্তর্বাহী স্নায়ুপথে মস্তিষ্কে বা মেরুমজ্জায় প্রবাহিত হওয়ায় রং, শব্দ, গন্ধ, স্বাদ, স্পর্শ সম্বন্ধে যে চেতনামাত্র (bare consciousness) ঘটে তাহাকে সংবেদন বলে।

সংবেদন বস্তুকে বিশিষ্টভাবে জানে না। সংবেদন বিশিষ্ট আকারে ব্যাখ্যাত হইলে, উহার বস্তুর বা বিষয়ের অর্থবোধও হয়। এইরূপ বিশিষ্ট বা ব্যাখ্যাত সংবেদনকে বলে **প্রত্যক্ষ**। যেমন, ফুলটি মাত্র আছে, এই চেতনাকে বলা যায়

সংবেদন। কিন্তু যে বস্তুটি মাত্র আছে বলিয়া বোধ হইয়াছে সেই বস্তুটি একটি ফুল—এইরূপ বিশেষ প্রকারের জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ বলা যায়।

প্রত্যক্ষ মনে যে বিষয়ের ছাপ, সংস্কার, মূর্তি অথবা রেখা রাখিয়া যায় তাহাকে প্রতিরূপ বলে। এই প্রতিরূপকে মনে মনে জাগরূক করিবার নাম **স্মৃতি**। প্রত্যক্ষ বিষয়ের অবিকল পুনরুদ্বোধনকে **স্মৃতি** বলে।

আবার প্রত্যক্ষ বিষয়ের প্রতিরূপগুলিকে অবিকল ভাবে পুনরুদ্বুদ্ধ না করিয়া যদি অদলবদল করিয়া অথবা উহাদিগকে নূতন ভাবে সাজাইয়া জাগরূক করা হয়, তাহা হইলে এই ক্রিয়াকে **কল্পনা** বলে।

অনেকগুলি প্রতিরূপের সাধারণ লক্ষণকে একটি ধারণায় গ্রথিত করিবার নাম **প্রত্যয়**। একটি প্রত্যয়ের সহিত অপর একটি প্রত্যয়কে সম্বন্ধ করার নাম **অবধারণা** এবং একাধিক অবধারণাকে যুক্ত করিয়া কোনো নূতন জ্ঞান আহরণ করিবার মানসক্রিয়াকে বলা হয় **যুক্তি**।

দৃষ্টান্ত :—

যেমন একটি রূপ বা রং নির্বিশেষভাবে দেখার নাম উহার রূপ-সংবেদন এবং এই সংবেদনের অর্থবোধসহ রূপ দেখার নাম রূপ-প্রত্যক্ষ। রূপ-প্রত্যক্ষের ফলে উহার একটি প্রতিরূপ মনে সংরক্ষিত হয়, যে কারণে ঐ রূপ স্মরণ করা যাইতে পারে অথবা উহাকে রকমফের করিয়া কল্পনা করা যাইতে পারে।

(২) **অনুভূতিমূলক** (Affective) **মানসবৃত্তি** ঃ—চিন্তন যেমন একটি অবগতি-মূলক বৃত্তি, অনুভূতি বা বেদনা সেইরূপ নয়। অবশ্য ব্যাপক অর্থে ইহাও জ্ঞানাত্মক, কারণ সকল বেদনা এবং অনুভূতিতেই চেতনা থাকে, অথবা সুখ দুঃখ প্রভৃতি বেদনা ভালবাসা ঘৃণা প্রভৃতি অনুভূতি অনুভূত বা বোধগম্য হয়। কিন্তু চিন্তন যে অর্থে জ্ঞাননিষ্ঠ মানসবৃত্তি, বেদনা বা অনুভূতিকে সেই অর্থে জ্ঞাননিষ্ঠ মানসবৃত্তি বলা যায় না। চিন্তনের মত বেদনার বিষয়মুখিতা নাই। ইহা শুধু পাত্রের মানসিক অবস্থা ইঙ্গিত করে, কিন্তু উহার বাহিরে বা উহা হইতে স্বতন্ত্র কোন বস্তুর বা বিষয়ের ইঙ্গিত করে না। অর্থাৎ বেদনা বা অনুভূতি পাত্রগত (subjective) বা মনোগত। ইহা পাত্রের বা জ্ঞাতার একান্ত নিজস্ব অভিজ্ঞতা। যাহার সুখ হইয়াছে সে-ই উহার ভোক্তা, উহার প্রকৃত অংশীদার অপর কেহ নাই। তাহা ছাড়া সুখানুভূতির কোনো বিষয়মুখিতা নাই, উহা পাত্রের বা জ্ঞাতার অনুভূতিতেই পর্যবসিত। তৃতীয়তঃ, বেদনা বা অনুভূতি নিষ্ক্রিয়। ইহা স্বভাবতঃ কোন কর্মে

পরিণতি লাভ করে না। চিন্তন নিষ্ক্রিয় হইলেও কর্মে সহায়তা করে। কিন্তু বেদনা বা অনুভূতি কর্মে সহায়তা করে কি না, তাহাতে সন্দেহ আছে। গভীর সুখ বা দুঃখ ব্যক্তিকে ঐ ঐ অনুভূতি বা বেদনায় মগ্ন বা তদ্গত করে, কিন্তু কর্মে প্রবৃত্ত করে না।

অনুভূতির স্তরভেদ

ক্রমবিকাশের ধারা অনুযায়ী অনুভূতির কয়েকটি প্রধান স্তর-বিভাগ আছে, যথা **ইন্দ্রিয়জ অনুভূতি** বা **বেদনা**, ভাবজ অনুভূতি অথবা **প্রক্ষোভ** এবং আদর্শজ অনুভূতি বা **রস**। ইন্দ্রিয়ের উদ্দীপনাজনিত সংবেদনের ফলে সুখদুঃখানুভূতি। ইন্দ্রিয়জ অনুভূতি। আবার ভাব বা ধারণা হইতে যে হর্ষ-বিষাদ, ভয়-ক্রোধ, ভালবাসা-ঘৃণা প্রভৃতি অনুভূতি জন্মে, সেইগুলিকে বলে ভাবজ অনুভূতি। তৃতীয়তঃ, সৌন্দর্য, সত্য, চরিত্র প্রভৃতি আদর্শকে অবলম্বন করিয়া কতগুলি প্রক্ষোভের সংগঠনফলে যে সকল অনুভূতি উৎপন্ন হয়, উহাদিগকে বলে রস।

যেমন সুস্বাদু খাদ্য আহার করিয়া যে সুখ হয় তাহা ইন্দ্রিয়জ অনুভূতি, কোনো সুসংবাদ পাইয়া যে সুখ হয় তাহা ভাবজ অনুভূতি, আবার কোনো সুন্দর দৃশ্য দেখিয়া যে সুখ জন্মায় তাহা আদর্শজ অনুভূতি।

(৩) **ইচ্ছামূলক** (Conative) **মানসবৃত্তি**:—ক্রিয়া বা ইচ্ছা প্রধানতঃ কার্যকরী মানসবৃত্তি। ইচ্ছা সক্রিয় এবং কর্মের প্রেরকশক্তি। ইচ্ছা যেমন মনোগত তেমন বিষয়গতও বটে। ইচ্ছার একটি অনুভববেদ্য দিক্ আছে, যাহা শুধু পাত্র বা জ্ঞাতাই জানে, আবার ইহাতে একটি কর্মে পরিণত হইবার প্রবণতা বা বিষয়-মুখিতাও বর্তমান। বিষয়মুখিতার দিক্ দিয়া ইচ্ছার সহিত চিন্তনের সাদৃশ্য আছে। আবার ইচ্ছা যেমন প্রধানতঃ সক্রিয় এবং কার্যকরী, চিন্তন সেইরূপ নয়। চিন্তন ক্রিয়া বা বুদ্ধিকে স্পষ্ট বা মার্জিত করিয়া ক্রিয়া সম্পাদনে সহায়ক হইলেও, মুখ্যভাবে সক্রিয় এবং কার্যকরী মানসবৃত্তি নয়। আবার অনুভূতির সহিত ইচ্ছার পার্থক্য সকল দিক্ দিয়াই। অনুভূতি পাত্রগত, কিন্তু ইচ্ছা বিষয়গত। আবার অনুভূতি নিষ্ক্রিয় এবং অকার্যকরী, কিন্তু ইচ্ছা সক্রিয় এবং কার্যকরী। এই দিক দিয়া বিচার করিলে মনে হয় যে ইচ্ছা এবং অনুভূতি পরস্পর-বিরোধী মানসবৃত্তি, কিন্তু চিন্তন ইহাদের মধ্যে সেতুস্বরূপ। চিন্তনে অনুভূতি এবং ইচ্ছা এই উভয়ের ধর্মই আংশিকভাবে বর্তমান।

ইচ্ছার স্তরভেদ :—ক্রিয়ামূলক সকল বৃত্তির প্রকারভেদ রহিয়াছে। প্রথমতঃ ক্রিয়াকে অনৈচ্ছিক এবং ঐচ্ছিক এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যে ক্রিয়া ইচ্ছার অভাবে অথবা সহজভাবে ঘটে, তাহাকে অনৈচ্ছিক ক্রিয়া বলে। আবার যে ক্রিয়া ইচ্ছাপূর্বক বা ইচ্ছা করিয়া করা হয়, তাহাকে ঐচ্ছিক ক্রিয়া বলে।

অনৈচ্ছিক ক্রিয়া নানা প্রকারে বিভক্ত হইতে পারে। যথা স্বতঃস্ফূর্ত, প্রতিবর্ত, সহজ এবং ভাবনাজ। অভ্যাস বস্তুতঃ অনৈচ্ছিক ক্রিয়া নয়, যদিও ইহাকে অনৈচ্ছিক ক্রিয়া বলিয়াই মনে হয়। যে ক্রিয়া কোনো বাহ্য উদ্দীপকের সাহায্য ছাড়া স্বতঃ উৎপন্ন হয়, তাহাকে **স্বতঃস্ফূর্ত** ক্রিয়া বলে। শিশুর আপন মনে খেলা করা, হাত পা ছোঁড়া প্রভৃতি ক্রিয়াগুলি অনৈচ্ছিক এবং স্বতঃস্ফূর্ত। এই কার্যগুলি বাহিরের কোনো উদ্দীপকের অপেক্ষা না রাখিয়া আপনা-আপনি ঘটে। যে অনৈচ্ছিক ক্রিয়া উদ্দীপকের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শ মাত্র বুদ্ধি বা চেতনার উপর নির্ভর না করিয়া স্বাভাবিকভাবে সংগঠিত হয়, তাহাকে **প্রতিবর্ত** ক্রিয়া বলে। যেমন আগুনে হাত লাগিবামাত্র হাত সরাইয়া লওয়া হয়, চক্ষুতে ধুলা বা পোকামাকড় ঢুকিবার উপক্রম হওয়া মাত্র চক্ষুব পাতা বুজিয়া যায়। যে ক্রিয়া-প্রবাহ অজ্ঞাতভাবে অথবা শিক্ষার উপর নির্ভর না করিয়া বংশগত ভাবে আত্মরক্ষা বা আত্ম-প্রজননমূলক উদ্দেশ্য সাধন করে, তাহাকে বলে **সহজ প্রবৃত্তি**। বাবুই পাখি ডিম পাড়িবার সময় উপস্থিত হইলে, অতুলনীয় চাতুর্যের সহিত পুরুষ-পরম্পরাক্রমে একই প্রকার বাসা তৈয়ারি করে, অথবা মাকড়সা তাহার জাল বিস্তার করিয়া পুরুষ-পরম্পরাক্রমে একই প্রকারে শিকার ধরে। এই দুইটি সহজ ক্রিয়ার উদাহরণ। চতুর্থতঃ, ভাবনা বা প্রত্যয় হইতেই যে ক্রিয়া ইচ্ছা-নিরপেক্ষভাবে ঘটিয়া থাকে, তাহাকে **ভাবনাজ ক্রিয়া** বলে। যেমন পড়িয়া যাইবাব আশঙ্কা করিতে করিতে বাস্তবিকই পড়িয়া যাওয়া ঘটিতে পারে।

প্রথমে ইচ্ছাপূর্বক কোন ক্রিয়া পুনঃপুনঃ অনুশীলনের ফলে, উহা পরে সহজ বা অনৈচ্ছিক ক্রিয়ায় পরিণত হয়। এইরূপ ক্রিয়াকে **অভ্যাস** বলে। এই ক্রিয়া আংশিকভাবে ঐচ্ছিক এবং আংশিকভাবে অনৈচ্ছিক। ইহাকে মুখ্যতঃ ঐচ্ছিক কিন্তু গৌণতঃ অনৈচ্ছিক ক্রিয়াও বলা হইয়া থাকে। কারণ প্রথমে ইহা ইচ্ছা করিয়াই করা হইয়াছিল, কিন্তু বার বার করিবার ফলে কাজটি আপাতদৃষ্টিতে অনৈচ্ছিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ঐচ্ছিক ক্রিয়ার কতগুলি স্তরভেদ রহিয়াছে—যেমন তাড়না, উদ্দেশ্য বা প্রেরণা,

কামনা, ইচ্ছা, অভিপ্রায় এবং সঙ্কল্প। ক্ষুধার্ত শিশু ক্ষুধার তাড়নায় বা আবেগে হাতের কাছে যাহা পায়, তাহাই মুখে দেয়। আবার সেই শিশুই আরো বড় হইয়া আহারের উদ্দেশ্যে সচেষ্ট হয়, অথবা তাহার কোন আহার্য বস্তু কামনা জাগে, অথবা সে ইচ্ছা করে যে সে আহার করিবে অথবা আহারের অভিপ্রায়ে সে কোনো উপায় উদ্ভাবন করে, অথবা আহার করা উচিত কি অনুচিত এই ইচ্ছাদ্বন্দ্ব দূর করিয়া সে সঙ্কল্প করে যে সে আহার করিবে। এই স্তরগুলির মধ্যে কোনো নির্দিষ্ট ভেদ-রেখা নাই। আগের স্তরটি পরেরটিতে অস্পষ্টভাবে মিলাইয়া যায়।

অনুশীলনী (Exercise)

1. Define the nature of consciousness. Distinguish bewteen its focus and field. (Ans : pp. 283-285)

চেতনার সংজ্ঞা নির্দেশ কর। চেতনাকেন্দ্র হইতে চেতনাক্ষেত্রের পার্থক্য আলোচনা কর।

2. Is mind co-extensive with consci ousness ? Discuss. What is meant by the sub-conscious ? What are the evidences of the sub-conscious ? (Ans : pp. 285-289)

মন চেতনার সমব্যাপক কি ? অবচেতন কাহাকে বলে ? উহার প্রমাণ কি ?

3. On what grounds is the unconscious regarded as a level of mind ? (Ans : pp 28-293)

নির্জ্ঞান মানস স্তর স্বীকার করিবার কারণ কি ?

4. Distinguish between the subconscious, the pre-conscious and the unconscious levels of mind. (Ans : pp. 285-293)

অন্তর্জ্ঞান, আসংজ্ঞান এবং নির্জ্ঞান মানস স্তরের পার্থক্য নির্দেশ কর।

5. Give an analysis of the fundamental mental processes. Distinguish between cognition, affection and conation (Ans : pp. 293-298)

মৌলিক মানসবৃত্তি বিশ্লেষণ কর। অবগতি, বেদনা এবং ইচ্ছার পার্থক্য আলোচনা কর।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

মনোবিত্থার কয়েকটি সম্প্রদায়

(Some Schools of Psychology)

১। মনোবিত্থার বিভিন্ন সম্প্রদায়

মনোবিত্থা অসংখ্য সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে **ক্রিয়াবাদী** (Functionalist), **অবয়ববাদী** (Structuralist), **চেষ্টিতবাদী** (Behaviourist), **সমগ্রবাদী** (Gestalt); **উদ্দেশ্যবাদী** (Hormic) এবং **মনঃসমীক্ষণবাদী** (Psychoanalytical) সম্প্রদায় উল্লেখযোগ্য।

২। মনের ক্রিয়া (Function) এবং অবয়ব বা গঠন (Structure)

অন্যান্য বস্তুর মত মনেরও দুই দিক হইতে আলোচনা করা যায়। একটি মনের গঠন (Structure) বা সত্তার (existence) দিক্ এবং অপরটি উহার ক্রিয়ার বা কাজের (function) দিক। প্রথম দিক্ হইতে মন সম্বন্ধে প্রশ্ন এই : মন কি উপাদানে বা মালমশলা দিয়া তৈয়ারি ? উহাকে বিশ্লেষণ করিলে কি কি অংশ পাওয়া যায় ? কোন্ কোন্ উপাদানের সংযোগফলকে মন বলা যাইতে পারে ? সত্তা হিসাবে মনের স্বরূপ বা প্রকৃতি কি ?

অবয়ববাদ (structuralism) **মনের গঠন বা সত্তামূলক দিক্‌টির আলোচনা করে।** এই মতবাদ ধরিয়া লয় যে মন একটি যৌগিক পদার্থ এবং ইহা কতগুলি মৌলিক অবয়ব বা অঙ্গের সংযোগে গঠিত। অবয়ববাদের মতে মনোবিত্থা মনের গঠন বা সত্তা সম্বন্ধীয় বিত্থা। এই মতবাদকে **সত্তাবাদও** (Existentialism) বলা হয়, কারণ ইহা মনকে নিছক সত্তারূপে দেখে এবং মনের উপর কোনো মূল্যমান আরোপ করে না।

দ্বিতীয় দিক্ হইতে মন সম্বন্ধে প্রশ্ন : মনের কাজ বা ক্রিয়া কি ? কোন্ কোন্ আচরণে বা চেষ্টিতে মন আত্মপ্রকাশ করে ? মনের চেষ্টিতগুলি কি কি নিয়মের অধীন এবং কোন্ কোন্ স্তরে বিকাশ লাভ করে ? নিয়ত ক্রিয়াশীল বা প্রকাশশীল সত্তা হিসাবে মনের স্বভাব কি ? **ক্রিয়াবাদীর** (functionalist) **মতে মনোবিত্থা মনের বিভিন্ন ক্রিয়া বা কার্যপ্রণালীর বিত্থা।**

উহাদের পরস্পর-সাপেক্ষতাঃ—মনের গঠন বা সত্তা এবং কার্য বা প্রকাশ একই মনের দুইটি দিক্। সুতরাং একটি অপরটি হইতে বিচ্ছিন্নভাবে আলোচিত হইতে পারে না। মনের গঠন বা সত্তা নিষ্ক্রিয় গঠন বা সত্তা নয়, আবার উহার ক্রিয়া গঠন বা সত্তাহীন মনের প্রকাশ নয়। কাজেই উহারা **পরস্পরসাপেক্ষ**। কার্যতঃ দেখা যায় অবয়ববাদী বা সত্তাবাদী মনোবিদ্ও মনের ক্রিয়া আলোচনা না করিয়া পারেন না, আবার ক্রিয়াবাদী মনোবিদ্ও মনের সত্তা বা গঠনকে উড়াইয়া দিতে পারেন না। অবশ্য নিজ গবেষণার উৎসাহে, প্রত্যেকেই অপরকে উপেক্ষা করিতেছেন, এইরূপ মনে হইতে পারে।

আসলে ইহাদের একটি অপরটির **পরিপূরক**। মন আছে বলিয়াই ক্রিয়া করিতে পারে এবং মন ক্রিয়া করিতে পারে বলিয়াই আছে। যে মন কাজ করে না, কিন্তু শুধু থাকে, তাহা মনোবিদ্যার আলোচ্য নয়। আবার যে ক্রিয়া কোনো মানস সত্তার ক্রিয়া নয়, সেইরূপ কর্তাহীন ক্রিয়াও অনেক মনোবিদের মতে অর্থহীন। যেমন ওয়ার্ড, স্টাউট প্রভৃতি ক্রিয়াবাদী মনোবিদ্ মানস সত্তা স্বীকার করিয়াছেন। আবার হুব্ণ্ড্, কুল্পে, টিশনার্ প্রভৃতি অবয়ববাদী মনোবিদ্ মানসক্রিয়ার আলোচনা না করিয়া পারেন নাই। ইহা সত্ত্বেও, এই দুইটি দিকের একটি বা অপরটির উপর গুরুত্ব আরোপ করিবার ফলে, মনোবিদ্গণ অবয়ববাদী এবং ক্রিয়াবাদী সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছেন।

৩। অবয়ববাদী (Structuralist) সম্প্রদায়

মনোবিদ্যায় অবয়ববাদের আধুনিক পথিকৃৎ **হুব্ণ্ড্, টিশনার, কুল্পে** এবং বিখ্যাত পিতা-পুত্র **জেমস্ মিল্ ও জন্ স্টুয়ার্ট মিল্**। প্রাচীন গ্রীক্ দার্শনিকগণ মনের **স্বরূপ** এবং **গঠন** লইয়াই মাথা ঘামাইয়াছেন বেশী। মানস সত্তার প্রবক্তা **প্লেটো** অবয়ববাদী এবং মানস ক্রিয়ার ব্যাখ্যাতা **অ্যারিস্টটল্** ক্রিয়াবাদী। আবার আধুনিক মনোবিদ্যায় **জন্ লক্** এবং **ডেভিড্ হিউম্** অবয়ব বা সত্তাবাদী।

টমাস্ ব্রাউন্ এবং জন্ স্টুয়ার্ট মিল রসায়নের আদর্শে মনকে কতগুলি মৌলিক উপাদানে গঠিত যৌগিক পদার্থরূপে ব্যাখ্যা করেন। **মানস রসায়ন** (Mental Chemistry) মতে **অনুষঙ্গ সূত্র** অনুসারে মৌলিক সংবেদনের সংমিশ্রণেই মন তৈয়ারি। ব্রাউন্ এবং মিল্, অবয়ববাদী মনোবিদ্।

এই সম্প্রদায়ের আধুনিক ব্যাখ্যাতা **হ্বিল্‌হেল্‌ম্ হুব্ণ্ড্** (Wilhelm Wundt)। তাঁহার মতে মনোবিদ্যা আন্তর বা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার (Science of internal or

immediate experience) বিদ্যা। মন সংবেদন এবং বেদনা, এই দুইটি মৌলিক উপাদানে গঠিত। সংবেদনের চারিটি লক্ষণ, যথা: তীব্রতা, পরিমাণ গুণ এবং স্থায়িত্ব। আবার বেদনা ছয় প্রকার, যথা: সুখ-দুঃখ, চাপ-শিথিলতা, উল্লাস-বিষণ্ণতা। হ্বুণ্ড মনে করেন যে প্রত্যক্ষ সংবেদন ও স্মৃতির মিশ্রণ, অনুষঙ্গ-সূত্রে সম্বদ্ধ সংবেদনের উদ্বোধনই স্মৃতি, আবার সংবেদনের মিশ্রণই চিন্তন।

সংপ্রত্যক্ষ (Apperception) :—**হ্বুণ্ড্-এর সংপ্রত্যক্ষ** (Apperception) মতবাদ প্রসিদ্ধ। **লাইব্‌নিজ্**-এর মত তিনিও চেতনার স্পষ্টতা লক্ষণ সাহায্যে সংপ্রত্যক্ষের স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন। স্পষ্টতম চেতনাই সংপ্রত্যক্ষ। সংপ্রত্যক্ষ মনোযোগের কারণ। আবার মনোযোগই ক্রিয়া উৎপন্ন করে, সুতরাং সংপ্রত্যক্ষ ক্রিয়ারও কারণ। ফলে, হ্বুণ্ড্-এর মতে, সংপ্রত্যক্ষের সহিত ইচ্ছা বা সঙ্কল্পের পার্থক্য নাই। **হার্বার্ট** (Herbert) সকল মানস উপাদানকেই শেষ পর্যন্ত কতগুলি ধারণার অন্তর্নিহিত শক্তিতে পরিণত করিয়াছেন। হ্বুণ্ড্, হার্বার্ট-এর বুদ্ধিমূলক ব্যাখ্যার সহিত একমত নহেন। তিনি সংপ্রত্যক্ষ বা ইচ্ছাকে একটি মৌলিক মানস শক্তি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাই, তাঁহার মতে, মানস উপাদানগুলির **সৃজনী সংশ্লেষণ** (creative synthesis) ঘটায়।

এড্‌ওয়ার্ড ব্র্যাডফোর্ড টিশনার্‌ই সর্বপ্রথম 'স্ট্রাক্‌চার্যালিজ্‌ম্' এবং 'ফাংশন্যালিজ্‌ম্' কথা দুইটি ব্যবহার করেন। তিনি মনকে **সংবেদন, প্রতিরূপ** এবং **বেদনা**—এই তিনটি মৌলিক মানস উপাদানে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। এই মৌলিক মানস উপাদানগুলি নির্দিষ্ট গুণসম্পন্ন এবং অল্পাধিক স্থায়ী সত্তা। মিল্-এর মত টিশ্‌নার্‌ও মানস উপাদানের রাসায়নিক সংমিশ্রণ স্বীকার করিয়াছেন। মানস উপাদানের বিভিন্ন সংমিশ্রণই সকল মানসবৃত্তির কারণ। টিশ্‌নার্-এর মতে **অন্তর্দর্শন** মনোবিদ্যার প্রধান পদ্ধতি। প্রত্যেক পরীক্ষা বা প্রয়োগে পাত্রের কাজ হইল তাহার মানসবৃত্তির অন্তর্দর্শন এবং প্রয়োগকর্তার কাজ হইল পাত্রের বাহ্যপ্রকাশগুলির পর্যবেক্ষণ। আয়ত্তাধীন অবস্থায় পাত্রের অন্তর্দর্শন এবং প্রয়োগকর্তার পর্যবেক্ষণ —এই দুইয়ের সমন্বয়েই মনোবিদ্যার **প্রয়োগিক পদ্ধতি** গঠিত।

টিশ্‌নার-এর মতে মনোবিদ্যা "চেতনার বিদ্যা (Science of Consciousness)"। চেতনার অবয়ব বা গঠনই মনোবিদ্যার বিষয়। চেতনা যাহা তাহা, অথবা চেতনার সত্তাই উহার গঠন এবং উহার কার্যকলাপই উহার ক্রিয়া। তিনি বলিয়াছেন, **"প্রায়োগিক মনোবিদ্যার প্রধান লক্ষ্য হইল মনের অবয়ব বিশ্লেষণ, চেতনার**

গ্রন্থি হইতে মৌলিক বৃত্তিগুলির উদ্ঘাটন।" সংবেদন, প্রতিরূপ এবং বেদনাই চেতনার তিনটি মৌলিক অবয়ব বা অঙ্গ। সংবেদন প্রত্যক্ষের, প্রতিরূপ স্মৃতি, কল্পনা, ধারণা প্রভৃতির এবং বেদনা অনুভূতি বা ইমোশন এবং রসের মৌলিক অবয়ব। এই অবয়বগুলি কাল্পনিক নয়, কিন্তু বাস্তব সত্তা। এই কারণে টিশ্‌নার্ তাঁহার মতবাদকে **সত্তাবাদ** (Existentialism) বলিয়াছেন।[১]

অপ্রতিরূপ চিন্তন :—"অপ্রতিরূপ চিন্তন" (imageless thought) সম্বন্ধে অবয়ববাদীরা বিস্তৃত গবেষণা করিয়াছেন। অজওয়াল্ড্ কুল্পে, আল্‌ফ্রেড্ বিনে প্রভৃতি হ্বুণ্ড্-এর অনুগামীরা অন্তর্দর্শন সাহায্যে অপ্রতিরূপ চিন্তন বা মৌলিক ও বিশুদ্ধ চিন্তন উপাদানের (Thought elements) অস্তিত্ব প্রমাণ করেন। ক্রিয়াবাদী মনোবিদ্‌গণের মধ্যেও কেহ কেহ, যেমন অধ্যাপক জি. এফ. স্টাউট্, অপ্রতিরূপ চিন্তনের সত্যতা অস্বীকার করেন নাই। কিন্তু টিশ্‌নার্ বিশুদ্ধ বা মৌলিক চিন্তন স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে অপ্রতিরূপ চিন্তনের সত্যতা স্বীকার করিবার মূলে রহিয়াছে মনোবিদ্যার সহিত যুক্তিবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গীর ভ্রম। কুল্পে প্রভৃতি অপ্রতিরূপ চিন্তনের সমর্থকেরা অভিজ্ঞতাব সত্তা বর্ণনা না করিয়া উহার অর্থ নির্ণয় করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। অর্থাৎ তাঁহারা অন্তর্দর্শন পদ্ধতি ঠিক মত প্রয়োগ করিতে পারেন নাই। পূর্বেই অভিজ্ঞতার বিষয়টি জানিয়া কিরূপ অভিজ্ঞতা হওয়া উচিত বা বাঞ্ছনীয় এইরূপ আশা করিয়া অন্তর্দর্শন করিলে **'মনোবিদের ভ্রম'** (Psychologist's fallacy) ঘটে। পূর্বেই অপ্রতিরূপ চিন্তন সম্বন্ধে বিস্তৃততর আলোচনা করা হইয়াছে।[২]

তাহা হইলে **মৌলিক মানস উপাদান, উহাদের গুণাবলী এবং উহাদের মিশ্রণের অনুষঙ্গ সূত্র বাহির করাই অবয়ববাদী মনোবিদের কাজ।** টিশ্‌নার **সংপ্রত্যক্ষ** স্বীকার করেন নাই। সংবেদন ও প্রতিরূপের স্পষ্টতা বাড়ানোর কাজটি মনোযোগের, সংপ্রত্যক্ষের নয়। **অর্থ** বা **মিনিং** বলিতে উহারা বোঝেন মানস-গঠনের পটভূমি (Context)।

সত্তাবাদ (Existentialism) :—টিশ্‌নার প্রভৃতি অবয়ববাদী মৌলিক মানস উপাদানগুলিকে সত্তা বলিয়া মনে করেন। পরবর্তীকালে টিশ্‌নার তাঁহার সম্প্রদায়কে

১ তাঁহার মতে ইচ্ছার মৌলিকতা নাই। ইচ্ছা সংবেদনের, বিশেষ করিয়া চেষ্টাবেদন সংবেদনের (Kinaesthetic Sensation) সমষ্টি।

২ এই খণ্ডের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, অষ্টম অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

অবয়ববাদী না বলিয়া সত্তাবাদী বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। সত্তাবাদী মনোবিদ্ মানসবৃত্তির গঠন, সত্তা, পরিমাণ, গুণ প্রভৃতির আলোচনা করেন এবং উহার কোনো উদ্দেশ্য বা মূল্যায়ন স্বীকার করেন না।

৪। ক্রিয়াবাদী (Functionalist) সম্প্রদায়

ক্রিয়াবাদী মনোবিদ্যা মনের সত্তা বা গঠন আলোচনা না করিয়া উহার ক্রিয়াবলী আলোচনা করে। এই মতে মনোবিদ্যা চেতনার বিদ্যা নয়, কিন্তু **মানসক্রিয়ার বিদ্যা** (Science of mental processes)।

এই মনোবিদ্যার মূল উৎস সম্ভবতঃ **অ্যারিস্টট্ল্**। তিনি মনকে একটি সত্তা মাত্র হিসাবে গ্রহণের বিরোধী। তাঁহার মতে মনোবিদ্যার বিষয় শুধু মনের সত্তা বা বা গঠন নয়, কিন্তু প্রধানতঃ উহার ক্রিয়া বা কার্যকলাপ।

সাম্প্রতিক ক্রিয়াবাদ প্রসার লাভ করিয়াছে বিশেষ করিয়া আমেরিকায়, অধ্যাপক **উইলিয়াম জেম্স্** এবং **জন ডিউই**-এর নেতৃত্বে। জার্মান মনোবিদ্ হ্যারল্ড্ হেফডিংও ক্রিয়াবাদের সমর্থন করিয়াছেন। ক্রিয়াবাদী মনোবিদ্যা জীববিদ্যাকে উহার ভিত্তিরূপে গ্রহণ করে। পরিবেশের সহিত উপযোজন প্রাণীর প্রধান ধর্ম। ক্রিয়াবাদী মনোবিদ্ দেখাইতে চাহেন যে মন বলিতে বুঝায় পরিবেশের সহিত উপযোজন করিবার সামর্থ্য। তাঁহার মতে জীববিদ্যার আদর্শে বা ভিত্তিতে মনোবিদ্যার ব্যাখ্যা করা সঙ্গত। **মনোবিদ্যা মনের উপযোজন ক্রিয়ার বিদ্যা।**

উইলয়াম্ জেম্স্ (**W. James**) :—জেম্স্ নিজেকে কোনো সম্প্রদায়ের সহিত জড়িত না করিয়া উদার দৃষ্টিভঙ্গীতে মনোবিদ্যার গবেষণা করিয়াছেন। তিনি মনকে কতগুলি পৃথক সত্তায় বিভক্ত করেন নাই। তাঁহার মতে মন সংগঠনমূলক সত্তা নয়, কিন্তু ক্রিয়া। চেতনা একটি ধারা বা প্রবাহ। মন চেতনা-প্রবাহ ছাড়া কিছু নয়। অনুষঙ্গবাদীরা কতগুলি কল্পিত পৃথক সত্তাকে অনুষঙ্গ সাহায্যে সংমিশ্রিত করিয়া মানসজীবনের ব্যাখ্যা করেন। জেম্স্-এর মতে এই পৃথক সত্তাগুলি নাই। জেম্স্ নিজেকে ক্রিয়াবাদী বলিয়া অভিহিত না করিলেও, তাঁহার মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ক্রিয়াবাদের অনুকূল।

জন্ ডিউই (**J. Dewey**) :—ক্রিয়াবাদী মনোবিদ্যার নির্দিষ্ট সূত্র নির্দেশ করেন জন্ ডিউই। তিনি স্পষ্টভাবে বলেন প্রতিবেশের সহিত অবয়বীর (organism) উপযোজনই মনোবিদ্যার আলোচ্য। ডিউই ক্রিয়া (Function) বলিতে বুঝেন কোনো উদ্দেশ্য সাধন করা। ডিউই-প্রদর্শিত সূত্র অবলম্বন করিয়া জে. আর্

এঞ্জেল্ (J. R. Angell) ক্রিয়াবাদী মনোবিদ্যার প্রসারিত ভূমি রচনা করেন। তাঁহার মতেও অবয়ব বা অঙ্গবিশেষের ক্রিয়া নয়, কিন্তু সমগ্র অবয়বীর ক্রিয়াই মনোবিদ্যার বিষয়।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে ক্রিয়াবাদী মনোবিদ্যায় **অন্তর্দর্শন** পদ্ধতির কোনো স্থান নাই, কারণ ব্যক্তির ক্রিয়াই উহার আলোচ্য এবং ক্রিয়াকে পর্যবেক্ষণই করিতে হয়। কিন্তু কার্যতঃ ক্রিয়াবাদী মনোবিদ্ অন্তর্দর্শন পদ্ধতিকে ত্যাগ করিতে চাহেন না, কারণ সকল মানসক্রিয়ার সহিত মানস অভিজ্ঞতা অথবা চেতনাও থাকে এবং ইহার জ্ঞানলাভে অন্তর্দর্শন আবশ্যক।

জেম্স্ ওয়ার্ড-এর মনোবিদ্যাও ক্রিয়াবাদের অনুকূল। পৃথক্ মানসসত্তাগুলি অনুষঙ্গ সূত্রের দ্বারা যোজিত হইয়া অভিজ্ঞতা উৎপন্ন করে, অবয়ববাদীর এইরূপ মতবাদ তিনি স্বীকার করেন নাই। তিনি এবং তাঁহার অনুগামী **স্টাউট্** মনকে ক্রিয়াশীল বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু **ডিউই** প্রমুখ ক্রিয়াবাদীর সহিত ইঁহাদের প্রধান পার্থক্য এই যে ইঁহারা জীববিদ্যার আদর্শে মনোবিদ্যা গঠনের বিরোধী। অধিকন্তু, ইঁহাদের মতে মনোবিদ্যায় অন্তর্দর্শনের স্থান অনস্বীকার্য। আবার **ম্যাক্ডুগ্যাল্** উদ্দেশ্যমূলক বা হর্মিক মনোবিদ্যার প্রতিষ্ঠাতা হইলেও, তাঁহাকে ক্রিয়াবাদী মনোবিদ্ বলা যায়, কারণ তাঁহার মতে মনের প্রধান ধর্ম হইল কাজ করা। সাধারণতঃ, ক্রিয়াবাদীরা মনকে স্থায়ী সত্তা হিসাবে স্বীকার করেন না। কিন্তু ওয়ার্ড, স্টাউট্, সালি, হেফ্ডিং প্রভৃতি ক্রিয়াবাদী মনোবিদেরা মানসসত্তা স্বীকারের পক্ষপাতী। তাহা ছাড়া, অন্যান্য অনেক ক্রিয়াবাদীর তুলনায় ইঁহারা অন্তর্দর্শন পদ্ধতির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন।

অবয়ববাদ এবং ক্রিয়াবাদের সম্বন্ধ : অবয়ববাদ ও ক্রিয়াবাদকে আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী বলিয়া মনে হয়। টিশ্নার উত্তরকালে এই দুই মতবাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিষয়ে অবহিত হইয়াছিলেন। আবার কুল্পেও সঙ্কল্পে বা ইচ্ছাশক্তিতে উপযোজনের (adjustment) প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া পরোক্ষ ভাবে ক্রিয়াবাদের সমর্থন করিয়াছিলেন। ক্যাটেল্ প্রভৃতি হুণ্ড-পন্থিগণও চেতনা অপেক্ষা মানস ক্রিয়ার উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। তাহা ছাড়া ওয়াশ্-বার্ণ, হোল্ট্, মন্টেগ্ প্রভৃতি অবয়ববাদিগণও ক্রিয়াবাদের মূল্য স্বীকার করিয়াছেন।

এদিকে ক্রিয়াবাদিগণও মনোবিদ্যায় মানসবৃত্তি এবং অভিজ্ঞতার স্থান স্বীকার করিয় পরোক্ষে অবয়ববাদকে স্থান দিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাঁহারা অন্তর্দর্শনের

মূল্যও অস্বীকার করিতে পারেন নাই। **বর্তমানে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনো বিরোধ আছে বলিয়া মনে হয় না।** অবয়ববাদী ক্রিয়া এবং উপযোজন স্বীকার করিয়াছেন, আবার ক্রিয়াবাদীও চেতনা বা অভিজ্ঞতার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন।

সে যাহা হউক, গঠন বা সত্তা এবং ক্রিয়া বা প্রকাশ মনের দুইটি প্রধান দিক। ইহাদের পারস্পরিক প্রাধান্যই এই দুই সম্প্রদায়ের আলোচ্য।

৫। চেষ্টিতবাদ (Behaviourism)

চেষ্টিতবাদ বা বিহেভিয়রিজম-এর মতে চেষ্টিতের বিদ্যাই মনোবিদ্যা। **জে. বি. ওয়াটসন্** এই মতবাদের প্রতিষ্ঠাতারূপে পরিচিত। কিন্তু ওয়াটসন্-এর পূর্বেই ম্যাক্স মেয়র (Max Meyer) তাঁহার দুইখানি গ্রন্থে (The Fundamental Laws of Human Behaviour এবং Psychology of The Other One) চেষ্টিতবাদের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।

চেষ্টিত মনোবিদ্যার প্রধান বক্তব্য (১) মনোবিদ্যা চেষ্টিতের বিদ্যা। চেষ্টিত বলিতে বুঝায় উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়া-এককের সমষ্টি এবং উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়া বলিতে বুঝায় প্রতিবর্ত (reflex action)। সুতরাং **চেষ্টিত কতগুলি প্রতিবর্তের সমষ্টি।** আবার, উচ্চতর চেষ্টিতগুলি সাপেক্ষ প্রতিবর্তের [১] (conditioned reflex) সমষ্টি বিশেষ।

(২) মনোবিদ্যার **দৃষ্টিভঙ্গী** অতীতে পাত্রগত বা সাব্‌জেক্‌টিভ্ ছিল। পাত্রগত দৃষ্টিভঙ্গী মনোবিদ্যাকে ব্যক্তিগত ব্যাপারে পর্যবসিত করে। কিন্তু ওয়াট্‌সন্-এর মতে মনোবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গী বিষয়গত। ফলে, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীববিদ্যা প্রভৃতি বিজ্ঞানের মত মনোবিদ্যাও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান।

(৩) মনোবিদ্যায় **অন্তর্দর্শনের স্থান নাই।** অন্তর্দর্শন ব্যক্তির মনেই সীমাবদ্ধ। সুতরাং ইহার সাহায্যে সর্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্তলাভের চেষ্টা বৃথা। অন্তর্দর্শন-মনোবিদ্যা একই প্রশ্নের সমাধানে পরস্পরবিরোধী সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে। যেমন, টিশ্‌নার্ প্রভৃতি অপ্রতিরূপ চিন্তন অস্বীকার করিয়াছেন। আবার, কুল্পে, স্টাউট্ প্রভৃতি অপ্রতিরূপ চিন্তন স্বীকার করিয়াছেন, অথচ এই অস্বীকৃতির মূল ভিত্তি একই অন্তর্দর্শন পদ্ধতি।

১ সাপেক্ষ প্রতিবর্ত প্রথম খণ্ডের সপ্তম এবং দ্বিতীয় খণ্ডের অষ্টম পরিচ্ছেদে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

অন্তর্দর্শন পদ্ধতির পরিবর্তে **বাচিক বিবরণ পদ্ধতি** গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাই মনোবিদ্যার বিষয়গত পদ্ধতি। পাত্রের বাচিক বিবরণ শুনিয়া তাহার চেষ্টিত বুঝিতে হইবে। মানুষের প্রধান প্রতিক্রিয়া কথা বলা। উদ্দীপক উপস্থিত হইলেই, উহার প্রতিক্রিয়া সে ভাষায় প্রকাশ করে। এইরূপ পদ্ধতির সাহায্যে মনোবিদ্যায় কতগুলি সর্বজনগ্রাহ্য সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব।

(৪) মনোবিদ্যায় 'মন', 'চেতনা' প্রভৃতি প্রচলিত ধারণাগুলি বর্জন করিতে হইবে। এই ধারণাগুলি বৈজ্ঞানিক নয়, কিন্তু দর্শনের পক্ষপুটে আশ্রিত। চেষ্টিতের অতিরিক্ত কোনো চেতন বা মানস সত্তা নাই। **তথাকথিত মানস সত্তা বা ক্রিয়াগুলি চেষ্টিত ছাড়া কিছু নয়।**

(ক) **সংবেদন এবং প্রত্যক্ষ** গতীয় প্রতিক্রিয়া (motor response) বিশেষ। পাত্র একটি রং দেখিয়া বলিল যে সে রং দেখিতেছে। এই বাচিক বিবরণই তাহার রং দেখারূপ সংবেদন বা প্রত্যক্ষ। আবার (খ) **স্মৃতি** এবং **কল্পনা** বিচলন (movement) বিশেষ। **প্রতিরূপ** সংবেদচেষ্টিয় (Sensori-motor) ক্রিয়ার নামান্তর। **চিন্তন** বলিতে বুঝায় **অস্পষ্ট গতীয় চেষ্টিত** (implicit motor behaviour)। অনেক সময় শিশু সবাকভাবে অথবা শোনা যায় এমন ভাবে কথা বলিতে বলিতে কাজ করিয়া যায়। পরবর্তী ধাপে সে স্বগতভাবে কথা বলে। আরও পরে চিন্তা করিবার সময় তাহার ঠোঁট নড়ে এবং সর্বশেষে সে চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে কথা বলিতে শিখে, যাহা বাহিরের বিচলনে প্রকাশ পায় না, কিন্তু স্বরযন্ত্রের অস্পষ্ট বিচলনে পর্যবসিত হয়। **চিন্তা বাগ্‌যন্ত্রের কতগুলি সূক্ষ্ম বা অস্পষ্ট বিচলন ছাড়া কিছু নয়। চিন্তন একপ্রকার নির্বাক ভাষা** (implicit or inarticulate speech)। **সূক্ষ্ম যন্ত্র সাহায্যে চিন্তনকালীন বাগ্‌যন্ত্র বিচলন ধরা পড়ে।** (ঘ) **বেদনা ও প্রক্ষোভ** বা অনুভূতির কেন্দ্র মস্তিষ্ক নয়। ইহারাও সংবেদচেষ্টীয় বা সেন্সরি-মোটর বিচলন। সংবেদ-প্রবাহ আসে কামজ ইন্দ্রিয়গুলি (erogenic zones) হইতে এবং চেষ্টীয় প্রবাহ যায় পেশী এবং গ্রন্থিগুলিতে, যাহার ফলে সুখ বস্তুর দিকে অগ্রসর করায় এবং দুঃখ বস্তু হইতে সরাইয়া লয়। **প্রক্ষোভ বা অনুভূতি বলিতে বুঝায় সমগ্র দেহযন্ত্রের, বিশেষ করিয়া আন্তরযন্ত্র** (visceral, glandular) পরিবর্তন। প্রত্যেকটি অনুভূতি বা প্রক্ষোভ এক একটি নির্দিষ্ট আকারের দৈহিক পরিবর্তন। যেমন, উদ্দীপকের সম্মুখীন হওয়ামাত্র যে অন্তরযন্ত্রীয় এবং গ্রন্থিজ পরিবর্তন ঘটে, সেইগুলির সমষ্টিই ভয়।

(৫) উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়ার ফলে নার্ভতন্ত্রের সক্রিয় অংশ এইরূপ গঠিত হয়, যে উহার একটি অংশ উদ্দীপিত হইলেই সংশ্লিষ্ট অংশগুলি উদ্দীপিত হয়। ফলে নির্দিষ্ট উদ্দীপকের প্রভাবে নির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়ার **নার্ভীয় অভ্যাস বা গঠনের** (nervous habit or pattern) সৃষ্টি হয়।

(৬) তাঁহার গবেষণার প্রথম ভাগে ওয়াট্‌সন্‌ চেষ্টিতের উপর **বংশানুগতিক প্রভাব** (heredity) আবেগের অতিশয্যে স্বীকার করেন নাই। তিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন যে কোনো সুস্থ শিশুকে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে যে কোনো বিশেষজ্ঞে পরিণত করা যায়।

সমালোচনা ঃ—নানা দোষ সত্ত্বেও চেষ্টিতবাদ কয়েকটি **গুণের অধিকারী**। (১) চেষ্টিতবাদের বৈশিষ্ট্য উহার **প্রগতিশীলতা**। চিরাচরিত মনোবিদ্যার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণায় উহার প্রাণশক্তির প্রাচুর্য পরিলক্ষিত হয়। (২) ইহা মনোবিদ্যাকে **দর্শনের বন্ধনপাশ হইতে মুক্ত** করিয়া স্বতন্ত্র মর্যাদা দিবার চেষ্টা করিয়াছে। এই চেষ্টা প্রশংসনীয়। (৩) চেষ্টিতবাদ সাম্প্রতিক মনোবিদ্যার প্রত্যেক শাখার উপর **অসামান্য প্রভাব** বিস্তার করিয়াছে। (৪) ইহা বিষয়গত দৃষ্টিভঙ্গী এবং বাচিক বিবরণ পদ্ধতির সাহায্যে **মনোবিদ্যাকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে উন্নীত করিতে সচেষ্ট**।

কিন্তু চেষ্টিতবাদ অনেক **দোষে দুষ্ট**।

(১) **চেতনা, মন** প্রভৃতি ধারণাগুলিকে নির্বাসন করা বড় কথা নয়। বড় কথা উহাদের ব্যাখ্যা। চেষ্টিতবাদ ইহাদের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা করিতে পারে নাই। (২) চেষ্টিতবাদ অন্তদর্শন পদ্ধতির বদলে বাচিক বিবরণ পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু **বাচিক বিবরণ অন্তদর্শনের উপর নির্ভরশীল**। লাল রং দেখিবামাত্র পাত্র বলে যে সে লাল রং দেখিতেছে। এই স্থলে লাল রং সংবেদনের চেতনা না থাকিলে তাহার পক্ষে বাচিক বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। এই চেতনা অন্তদর্শন না হইলেও অন্তদর্শনের একটি নিম্নতর স্তর, যাহাকে স্টাউট্‌ অন্তদর্শনের আত্মসচেতনতারূপ (self-consciousness) দ্বিতীয় স্তর বলিয়াছেন। (৩) প্রতিবর্তকে চেষ্টিতের একক ধরিয়া **চেষ্টিতবাদ মনের ঐক্য উপেক্ষা করিয়াছে**। ইট পর পর সাজাইয়া বাড়ি তৈয়ারী হয়, মনও সেইরূপ কতগুলি মৌলিক প্রতিবর্তের সংযোজন, চেষ্টিতবাদীর এই ধারণা ভুল। মন প্রথম হইতেই একটি গোটা বা সমগ্র বস্তু। (৪) চেষ্টিতবাদ **সাপেক্ষ প্রতিবর্ত** সাহায্যে চেষ্টিতের ব্যাখ্যা করিয়াছে।

সাপেক্ষ প্রতিবর্তবাদের উদ্ভাবক প্যাভ্‌লো বা বিছ্‌টিরিও এই মতটিকে মানসস্তরে প্রয়োগ করেন নাই, কিন্তু শারীরবৃত্তেই সীমাবদ্ধ রাখিয়াছেন। (৫) চেষ্টিতবাদ **স্মৃতি, বেদনা, অনুভূতি, চিন্তা** প্রভৃতি উচ্চতর মানস ক্রিয়াগুলিকে সংবেদচেষ্টীয় বিচলনরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছে। (ক) কিন্তু **স্মৃতি** যে মন বা চেতনার বিষয়, চেষ্টিতবাদের সেই দিকে লক্ষ্য নাই। যে ব্যক্তির কোনো অভিজ্ঞতা হইয়াছে, তাহারই পক্ষে সেই অভিজ্ঞতার স্মৃতি সম্ভব। এইরূপে স্মৃতি সম্ভব হয় একক চেতনার ক্রিয়া হিসাবে, অথচ চেষ্টিতবাদী একক চেতনা স্বীকার করেন নাই। (খ) আবার বেদনা ও অনুভূতিকে সংবেদ-চেষ্টীয় বিচলন রূপে ব্যাখ্যা করিতে গিয়া চেষ্টিতবাদী সত্যতার মাত্রা ছাড়াইয়াছেন। এই মানস বৃত্তিগুলির অনুভবগম্য বা ভিতরকার দিকটিকে তিনি উপেক্ষা করিয়াছেন। বিশেষতঃ, **অনুভূতি বা প্রক্ষোভ শুধু যান্ত্রিক চেষ্টিত নয়, কিন্তু ইহাতেও বস্তুর জ্ঞান বা চেতনা থাকা আবশ্যক।** বাঘ দেখিলেই যে ভয় হয় তাহা নয়, বাঘকে ভয়ের বস্তু বলিয়া বুঝা বা জানা চাই। (গ) চেষ্টিতবাদের মতে **চিন্তা নির্বাক ভাষা** ছাড়া অন্য কিছু নয়। কিন্তু এই মত গ্রহণের অযোগ্য। প্রথমতঃ, চেতনা বা অর্থবোধ ছাড়া ভাষার উৎপত্তি হয় কিনা সন্দেহ, কারণ ভাব প্রকাশই ভাষার কাজ। দ্বিতীয়তঃ, নির্বাকভাষা কি কারণে সংঘটিত হয়, তাহাও চেতনা বা অর্থবোধ ছাড়া বোধগম্য হয় কিনা সন্দেহ। তৃতীয়তঃ, চিন্তা ভাষার নামান্তর হইলে, সর্বদা চিন্তাকে ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব হইত, অথচ অনেক ক্ষেত্রেই ভাব আছে ভাষা নাই, এমন অবস্থা ঘটিয়া থাকে। চতুর্থতঃ, নির্বাক ভাষায় বাগ্‌যন্ত্রের স্পন্দন ধরিবার মত সূক্ষ্ম যন্ত্র এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই—এই কথা ওয়াট্‌সন্ স্বয়ং স্বীকার করেন। **চিন্তাকে অস্পষ্ট বা নির্বাক ভাষা বলা গোঁড়ামির পরিচায়ক।**

(৬) ওয়াট্‌সন্ প্রথমে উগ্র পরিবেশবাদী (rank environmentalist) ছিলেন এবং বংশানুগতিক প্রভাব স্বীকার করেন নাই। কিন্তু পরে যখন দেখিলেন যে কোনো সুস্থ শিশুকেই নিউটন্ বা কেপ্‌লার করিয়া তোলা যায় না, তখন **উগ্র পরিবেশবাদ সংযত করিতে বাধ্য হইলেন।**

৬। উদ্দেশ্যবাদী মনোবিদ্যা (Hormic Psychology)

হর্মিক মনোবিদ্যা-মতে উদ্দেশ্যই মনের প্রধান এবং মৌলিক প্রেরক। তাই মানুষ একটি যন্ত্র বিশেষ, এই মতানুবর্তী মনোবিদ্যা ভ্রান্ত এবং বিফল। **উদ্দেশ্য মানসজীবনের একটি বাস্তব ঘটনা।** উদ্দেশ্যমূলক আচরণ বলিতে লক্ষ্যের অনুসন্ধান বুঝায়। **উইলিয়াম্ ম্যাক্‌ডুগ্যাল্** (William McDougall) উদ্দেশ্যবাদী

মনোবিদ্যার প্রতিষ্ঠাতা। আচরণ বা চেষ্টিত বলিতে তিনি বুঝিয়াছেন উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা। এই চেষ্টিত প্রাণী মাত্রেরই লক্ষণ।

বলা যাইতে পারে যে উদ্দেশ্য একটি ব্যক্তিগত ব্যাপার, সুতরাং মনোবিদ্যায় ইহার স্থান নাই। ম্যাকডুগ্যাল্ এইরূপ আপত্তি যুক্তিযুক্ত মনে করেন না। তাঁহার মতে উদ্দেশ্য প্রাণীজগতের সার্বভৌম ধর্ম। **উদ্দেশ্যের** নিম্নলিখিত **বাহ্য লক্ষণ** ব্যাখ্যা করিয়া তিনি ইহার স্বরূপ বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

(১) উদ্দেশ্যমূলক কাজ উদ্দীপকের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়। কিন্তু উদ্দীপক নিষ্ক্রিয় হইবার পরও, কাজটি সফল না হওয়া পর্যন্ত চলিতে থাকে। (২) লক্ষ্যে অগ্রগতি ব্যাহত হইলে, উদ্দেশ্য সাধনে বিভিন্ন উপায় অবলম্বিত হইতে পারে। এইরূপে উদ্দেশ্যমূলক ক্রিয়ার পরিবর্তন ঘটে। (৩) আবার উদ্দেশ্য সাধিত হইলেই উদ্দেশ্য-মূলক চেষ্টার বিরতি হয়। (৪) উপরন্তু পুনরাবৃত্তির ফলে উদ্দেশ্যমূলক ক্রিয়ার উন্নতি ঘটে। নিষ্প্রয়োজন বা ব্যর্থ চেষ্টাগুলি বর্জিত, ক্ষিপ্রতর ও সহজতর হয় এবং প্রাণী আরও কার্যকরীভাবে লক্ষ্যে পৌঁছিতে শিখে।

সহজ প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভ :—প্রাণিচেষ্টিতের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য মনোবিদ্যার প্রধান আলোচ্য। ম্যাকডুগ্যাল্-এর মতে সকল চেষ্টিতে কতগুলি মৌলিক প্রেষণা (motive) কাজ করে। সহজ প্রবৃত্তিই (instinct) প্রাণিচেষ্টিতের মূল প্রেষক। সহজ প্রবৃত্তির মর্মস্থলে (core) প্রক্ষোভ থাকে। যেমন, পলায়ন একটি সহজ প্রবৃত্তি। ইহার উদ্দেশ্য বিপদ হইতে আত্মরক্ষা বা সন্তানরক্ষা এবং ইহার অন্তর্নিহিত প্রক্ষোভ ভয়। অধিকন্তু, উদ্দেশ্যমূলক ক্রিয়াতে অবগতি থাকে। ভয়ের বস্তুটি দেখিয়া বা জানিয়াই পলায়ন-প্রতিক্রিয়া জন্মে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ম্যাকডুগ্যালএর মতে **সহজ প্রবৃত্তির তিনটি দিক** আছে। প্রথমটি গ্রহণশীল (receptive) বা জ্ঞানের দিক্, দ্বিতীয়টি প্রতিক্রিয়াশীল বা কর্মের দিক্ (active) এবং তৃতীয়টি নিষ্ক্রিয় (passive) বা অনুভূতির দিক্।

ম্যাক্‌ডুগ্যাল্ যে প্রধান **বারোটি** সহজ প্রবৃত্তির তালিকা দিয়াছেন, তাহা সহজ প্রবৃত্তি পরিচ্ছেদে উল্লিখিত হইয়াছে।[১] পরে তিনি আরও কয়েকটি ছোটখাটো সহজ প্রবৃত্তি এই বারোটির সহিত সংযুক্ত করিয়া সহজ প্রবৃত্তির সংখ্যা **সতেরোটি** করিয়াছেন—যেমন শ্বাসক্রিয়া, হাঁচি কাশি প্রভৃতি। এই বর্ধিত তালিকায় হাসি,

---

১। প্রথম খণ্ডের অষ্টম পরিচ্ছেদ, দশম অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

কান্না, ঘুম প্রভৃতিও স্থান পাইয়াছে। নিজ প্রাধান্য জাহির, (Self-assertiveness) এবং বশ্যতা স্বীকার করা (Submissiveness), তাঁহার মতে, দুইটি প্রধান সহজ প্রবৃত্তি।

এই সহজ প্রবৃত্তিগুলি **শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতার ফলে জটিল আকার ধারণ করে**। যেমন শিশুর যোধন প্রবৃত্তির সহিত ক্রোধ প্রথমে জাগিয়া ওঠে তাহার স্বাধীন গতিকে গায়ের জোর দিয়া বাধা দিলে, কিন্তু পরে জাগিয়া ওঠে বড়দের হুকুম মত কাজ করিতে বাধ্য হইলে। আবার শিশুর যোধন প্রবৃত্তির সহিত ক্রোধ প্রথমে প্রকাশ পায় চড়, লাথি প্রভৃতিতে এবং পরে প্রকাশ পায় কামড়ানো আঁচড়ানো, চুলটানা, ঘুঁষি মারা প্রভৃতিতে এবং আরও পরে প্রকাশ পায় রাগারাগি এবং নানা পরোক্ষ অঙ্গভঙ্গীর মধ্য দিয়া।

রস—সেন্টিমেণ্ট[১] ঃ—শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার ফলে সহজ প্রবৃত্তির আরও একটি পরিবর্তন ঘটে। **অনেকগুলি সহজ প্রবৃত্তি মিলিত হইয়া রস গড়িয়া তোলে।** দেশপ্রেম (patriotism) একটি রস। ইহার মূলে থাকে দেশ বিপন্ন হইলে ভয়, আক্রান্ত হইলে ক্রোধ, অন্য দেশের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিজ দেশের প্রাধান্য জাহিরের প্রবৃত্তি এবং জন্মভূমির প্রতি আনুগত্য বা বশ্যতা বোধ।

মানুষের চেষ্টিত বা আচরণ প্রেষিত হয় রসের দ্বারা। রসের সহিত উহার মূলীভূত সহজ-প্রবৃত্তির অনুভূতিও মিশ্রিত থাকে। ম্যাক্‌ডুগাল্ বলেন যে চেষ্টিত শুধু জ্ঞানের দ্বারাই পরিচালিত হয় না, কিন্তু হয় প্রধানতঃ ভালবাসা, ঘৃণা, আকর্ষণ, সাহস, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, উৎসাহ প্রভৃতি প্রবৃত্তিগুলি দ্বারা।

কতগুলি সহজ প্রবৃত্তি এবং উহাদের প্রক্ষোভ বা অনুভূতি মিলিত হইয়া যে মানসিক সংগঠন (Pattern) রচনা করে তাহাকেই তিনি রস বলিয়াছেন। রস কোনো আদর্শকে (ideal) কেন্দ্র করিয়া উৎপন্ন হয়। যেমন সত্য, শিব এবং সুন্দর এই তিনটি আদর্শকে কেন্দ্র করিয়া যথাক্রমে সত্যাশ্রয়ী, কল্যাণাশ্রয়ী এবং সৌন্দর্যাশ্রয়ী রস গঠিত হয়। আবার ধর্মাদর্শকে কেন্দ্র করিয়া ধর্মাশ্রয়ী রস সংগঠিত হয়।

ম্যাক্‌ডুগ্যাল তাঁহার উদ্দেশ্যবাদের মূল সূত্র অনুসারে মনোবিদ্যাকে বহু শাখায় প্রসারিত করিয়াছেন। সমাজ মনোবিদ্যা, অস্বভাবী মনোবিদ্যা এবং সাধারণ

১ এই খণ্ডের ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

মনোবিদ্যা তাঁহার উদ্দেশ্যবাদ অনুসারেই রচিত হইয়াছে। যেমন, অস্বভাবী মনোবিদ্যার তিনি বলিয়াছেন যে বশ্যতামূলক (submissive) এবং প্রাধান্যমূলক (astertive) রসের অসামঞ্জস্যই অস্বভাবী আচারণ বা মানসিক রোগের, আবার এই দুইটির সাম্যই (balance) স্বভাবী আচরণের মূল কারণ। আবার সমাজ মনোবিদ্যার তিনি দেখাইয়াছেন যে, মানুষের সহজ প্রবৃত্তিগুলি মিটাইবার উদ্দেশ্যেই সমাজের উৎপত্তি।

৭। গেস্টাল্ট্ মনোবিদ্যা (Gestalt Psychology)

মানসবৃত্তিগুলি পৃথক সত্তা এবং অনুষঙ্গের ফলে উহাদের গঠন বা সংযোজন ঘটে, মনোবিদ্যার কোনো কোনো সম্প্রদায় এইরূপ মত পোষণ করে, যেমন অনুষঙ্গবাদী (Associationists) সম্প্রদায়। ইহাদের বিরুদ্ধ মনোবিদ্যা-সম্প্রদায়গুলির মধ্যে গেস্টাল্ট্ মনোবিদ্যা প্রধান। গেস্টাল্ট মনোবিদ্যার মতে মন পৃথক পৃথক মানস উপাদানের সমষ্টি নয়, কিন্তু প্রথম হইতেই একটি সমগ্র এবং গোটা বস্তু। তথাকথিত পৃথক মানস উপাদানগুলি কাল্পনিক, উহাদের বাস্তব অস্তিত্ব নাই।

গতির দর্শন প্রত্যক্ষ ঃ—গতি-দর্শন-প্রত্যক্ষের গবেষণা-ভিত্তিতে **হ্বার্দাইমার্** (Wertheimer) গেস্টাল্ট্ মনোবিদ্যার সূত্রপাত করেন। হ্বার্দাইমার **কোয়েলার্** (Kohler) এবং **কফ্কা** (Koffka)-এর যুক্ত গবেষণা-ফলই গেস্টাল্ট্ মনোবিদ্যা। হ্বার্দাইমার রেটিনা বা অক্ষিপটের **দর্শনক্ষেত্রের দুইটি পাশাপাশি বিন্দুকে পর পর উদ্দীপিত করিয়া দেখিলেন যে দুইটি পৃথক্ দর্শন প্রত্যক্ষ না ঘটিয়া একটি গতি-প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হয়।** ০'৬ সেকেণ্ড ব্যবধানে দুইটি আলো জ্বালাইলে, দুই বিন্দুতে অবস্থিত দুইটি আলো প্রত্যক্ষ হয় না, কিন্তু এক বিন্দু হইতে অপর বিন্দুতে চলমান একটি আলো প্রত্যক্ষ হয়। সুতরাং, প্রত্যক্ষ ক্ষেত্রের বস্তুগুলির আলাদাভাবে প্রত্যক্ষ না হইয়া **সমগ্র** (whole, configuration, pattern), বা **গেস্টাল্ট্** রূপে প্রত্যক্ষ হইবার প্রবণতা আছে।

প্রত্যক্ষই মৌলিক ঃ—গেস্টাল্ট্ মনোবিদ্গণের মতে তথাকথিত সংবেদনের পরিবর্তে **প্রত্যক্ষই নিম্নতম মানসবৃত্তি।** প্রত্যক্ষ শুধু পৃথকরূপে কল্পিত সংবেদনগুলির যোগফল নয়। **প্রত্যক্ষ একটি সমগ্র বা গোটা,** নূতন এবং মৌলিক মানসবৃত্তি। সমগ্র বা গোটা বস্তুটির বা গেস্টাল্ট-এর এমন অনেক গুণ থাকে, যাহা উহার অংশগুলিতে নাই। এই অংশগুলির প্রত্যক্ষ হয় না, কিন্তু প্রত্যক্ষ হয়

কোনো সমগ্র বা গোটা বস্তুর। গোটা বা সমগ্র বস্তুটিকে বিচার করিয়া বুঝিবার জন্য উহার বিশ্লেষণ প্রয়োজন হয় সন্দেহ নাই। কিন্তু বিশ্লিষ্ট অংশগুলির জ্ঞান এবং সত্তা নির্ভর করে সমগ্র বস্তুটির জ্ঞান এবং সত্তার উপর। অর্থাৎ গেস্টাল্ট্ মনোবিদ্যার মতে সমগ্র বস্তুই উহার অংশের ভিত্তি, অংশগুলি সমগ্রের ভিত্তি নয়। অনুষঙ্গবাদ, পারমাণবিক মনোবিদ্যা অথবা অবয়বী মনোবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গী হইতে গেস্টাল্ট্ মনোবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ পৃথক্। গেস্টাল্ট্ মনোবিদ্যা, অধ্যাপক উইলিয়ম জেম্স্-এর মত, এই মতবাদগুলিকে 'ইট-কাঠ-চুন মনোবিদ্যা (brick-and-mortar psychology)' বলিয়া সমালোচনা করিয়াছে।

ইসোমর্ফিজ্‌ম্ (Isomorphism) ঃ—প্রত্যক্ষ ক্ষেত্রের এককগুলি পৃথক পৃথক সংবেদন নয়। উহাদের **আকার গতি** এবং **ক্রিয়াশীলতা** আছে। উহাদের আকার (pattern), গতি (movement) এবং ক্রিয়াশীলতা (dynamism) প্রত্যক্ষ ক্ষেত্রের বিভিন্ন উদ্দীপকের পারস্পরিক ক্রিয়া হইতে উদ্ভূত। **শুধু যে প্রত্যক্ষই একটি গোটা বা সমগ্র ক্রিয়া তাহা নয়, কিন্তু উহার আনুষঙ্গিক শারীরক্রিয়াগুলিও গোটা বা সমগ্র।** মানসবৃত্তির আনুষঙ্গিক শারীরবৃত্তিগুলিতেও গাঠনিক জটিলতা বা সমগ্রতা বর্তমান থাকে। ইহার গেস্টাল্ট্ মনোবিদ্যাব ইসোমর্ফিক্ মতবাদ বলিয়া পরিচিত।

আবার বস্তুর গোটা বা সমগ্র রূপ যে শুধু মানস এবং দৈহিক ক্রিয়াতেই সীমাবদ্ধ, তাহা নয়। কোয়েলার্ দেখাইয়াছেন যে এই সমগ্রতা বাহ্যবস্তুতেও রহিয়াছে। বাহ্যজগতের বস্তুসকল শুধু উহাদের অংশ বা উপাদানগুলির যোগফল নয়। ইহারা এমন গুণের অধিকারী যাহা সমগ্র বা গোটা বস্তুগুলিতে আছে, কিন্তু উহাদের অংশ বা উপাদানগুলিতেই নাই।

শিক্ষণ ও চিন্তন ঃ—গেস্টাল্ট্ মনোবিদ্যার গবেষণা প্রধানতঃ প্রত্যক্ষে কেন্দ্রীভূত হইলেও, উহাতে সীমাবদ্ধ নয়। শিক্ষা (learning) বিষয়ে উহার গবেষণা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষা শুধু চেষ্টা এবং ভ্রম সংশোধনের (Trial and Error) অথবা সাপেক্ষ প্রতিবর্ত-গঠনের (conditioned reflex) ব্যাপার নয়। **শিক্ষা একপ্রকার পরিজ্ঞান বা ইন্‌সাইট্** (Insight)। অধিকাংশ শিক্ষা মতবাদগুলি শিক্ষাকে শিক্ষণীয় বস্তুর অংশগুলির সংযোজন বা সম্বন্ধ স্থাপন বলিয়া ব্যাখ্যা করে। কিন্তু গেস্টাল্ট্ মনোবিদ্যার মতে শিক্ষা সমগ্র বা গোটা বস্তু হিসাবে শিক্ষণীয় বস্তুর পরিজ্ঞান বা ইনসাইট। **পরিজ্ঞান ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করে না, কিন্তু আকস্মিকভাবে উন্মেষিত**

হয়। **চিন্তনও** অনুরূপভাবে ব্যাখ্যেয়। সৃজনশীল চিন্তনে বিষয়ের সমগ্র রূপটি উহার অংশগুলির উপর প্রাধান্য বিস্তার করে। **সহজ প্রবৃত্তিও** একটি সমগ্র বা গোটা পরিস্থিতি সম্পর্কে ক্রিয়াশীল। যেমন হাতে বা পায়ে ময়লা দেখিলে হয়ত কোনো শিম্পাঞ্জী বিরক্ত হয়, আবার ঐ ময়লা মুখে থাকিলে উহা খাইয়া ফেলে। অনুরূপভাবে প্রক্ষোভ, ইচ্ছা, ব্যক্তিত্ব প্রভৃতি মনোবিদ্যার যাবতীয় সমস্যাগুলি সমগ্ররূপে ব্যাখ্যাত হয়।

সমালোচনা ঃ—মানসবৃত্তিকে সমগ্র হিসাবে ব্যাখ্যা করা গেস্টাল্ট্ মনোবিদ্যার নতুন উদ্ভাবন নয়। ইহার পূর্বেই স্টাউট্ মনোযোগের সংশ্লেষণমূলক ক্রিয়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন।[১] **কিন্তু মানসবৃত্তি যে একটি সমগ্র বস্তু গেস্টাল্ট্ মনোবিদ্যার পূর্বে ইহা প্রয়োগ বা পরীক্ষামূলক ভাবে প্রমাণিত হয় নাই।** আবার গেস্টাল্ট্, মনোবিদ্যা শুধু মানসবৃত্তির নয়, আনুষঙ্গিক শারীরক্রিয়ার সমগ্রতাও প্রমাণ করিয়াছে।

কিন্তু গেস্টাল্ট্ মনোবিদ্যা এখনও পরীক্ষামূলক স্তরেই রহিয়াছে। আবার, কোয়েলার বাহ্যবস্তুর সমগ্রতা দেখাইতে গিয়া মনোবিদ্যার সীমা অতিক্রম করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। তাহা ছাড়া, চিন্তন এবং শিক্ষণ ব্যাপারে পরিজ্ঞান বলিতে ঠিক কি বুঝায় তাহা নির্ণয় করা কঠিন।

গেস্টাল্ট্ মনোবিদ্যার আরও বিবরণ অন্যত্র দেওয়া হইয়াছে। বিশেষ করিয়া উহার প্রত্যক্ষ[২] এবং শিক্ষণ[৩] সম্বন্ধীয় মত যথাস্থানে সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে।

৮। মনঃসমীক্ষণ (Psychoanalysis)

মনঃসমীক্ষণকে অস্বভাবী মনোবিদ্যার (abnormal psychology) একটি সম্প্রদায় বলা হইয়া থাকে। কিন্তু মনঃসমীক্ষণ শুধু মানস রোগের বর্ণনাই নয়, উহার চিকিৎসাও বটে। ইহা শুধু তাত্ত্বিক (theoretical) নয়, কিন্তু ফলিত (applied) মনোবিদ্যাও বটে। আবার, ইহা শুধু অস্বভাবী মনোবিদ্যাই নয়, কিন্তু শিশু মনোবিদ্যা, শিক্ষা মনোবিদ্যা, সমাজ মনোবিদ্যাও বটে। মনঃসমীক্ষণের দৃষ্টিভঙ্গীর ভিত্তিতে বিভিন্ন মনোবিদ্যার শাখা, এমন কি সাধারণ মনোবিদ্যাও (general psychology) গড়িয়া উঠিয়াছে।

১ জি, এফ স্টাউট—এ ম্যানুয়্যাল অফ্ সাইকলজি—প্রথম খণ্ড—তৃতীয় পরিচ্ছেদ—ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ।

২ এই খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদ—৫ম অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৩ এই খণ্ডের অষ্টম পরিচ্ছেদ—৯ম অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

মনঃসমীক্ষণ সিজ্‌মণ্ড্‌ ফ্রয়েড্‌-এর (Sigmund Freud) উদ্ভাবন। ইহাকে মনঃসমীক্ষণ বলা হয়, কারণ ইহা মনের অন্তস্তলে আসংজ্ঞান (Pre-conscious) এবং নির্জ্ঞান (unconscious) স্তর অনুসন্ধান করে। আবার উপরোক্ত কারণেই ইহাকে **গভীরতা মনোবিদ্যাও** (depth psychology) বলা হইয়া থাকে। ইহার মতে দৈনন্দিন জীবনের ভুলভ্রান্তি, স্বপ্ন এবং মনোরোগ মনের গভীরতম নির্জ্ঞান স্তরে নির্বাসিত অবদমিত বাসনার বিকৃত প্রকাশরূপে ঘটে। এই অবদমিত (repressed) বাসনাগুলিই সকল রোগলক্ষণের (symptoms) কারণ।

মনঃসমীক্ষণ মতে **মনের তিনটি স্তর** আছে—যথা সংজ্ঞান (conscious) আসংজ্ঞান (pre-conscious) এবং নির্জ্ঞান (unsonscious)। আবার অন্য দিক্‌ দিয়াও মনের **তিনটি অংশ** রহিয়াছে। শিক্ষা ও কৃষ্টির বিরোধী সংজ্ঞান ইচ্ছা, অবদমনের ফলে, নির্জ্ঞান মনে নির্বাসিত হইয়া অজ্ঞাতবাস করে। এই সকল ইচ্ছা প্রধানতঃ কামজ (Sexual) বা যৌন। ইহাদের সমষ্টিকে ফ্রয়েড্‌ বলেন **অদস্‌** (Id)। অদস্‌ অন্ধভাবে কামজ ইচ্ছাগুলি সংজ্ঞান মনে প্রকাশ করিতে সচেষ্ট থাকে। কিন্তু মনের আর একটি অংশের প্রধান চেষ্টা আত্মরক্ষা। ইহার নাম **অহম্‌** (Ego)। অদস্‌ এবং অহম্‌-এর অতিরিক্ত মনের তৃতীয় অংশটির নাম **অধিশাস্তা বা বিবেক** (Super-Ego, Conscience Ego-Ideal, Censor)। ইহার কাজ অদস্‌-এর অন্ধ ইচ্ছাগুলিকে শাসন করা। অহম্‌-এর অবস্থাটি সঙ্গীন। ইহাকে অদস্‌-এর প্রবল চাপ এবং অধিশাস্তার শাসন সহ্য করিতে হয়। ফ্রয়েড্‌ বলেন যে আত্মরক্ষার জন্য অহম্‌-এর উপরোক্ত দুইটি মনিবকেই সন্তুষ্ট রাখিতে হয়।

অবদমিত ইচ্ছাগুলি নির্জ্ঞানে নির্বাসিত হইয়া নিষ্ক্রিয় থাকে না, কিন্তু সংজ্ঞানে আত্মপ্রকাশ করিতে **সক্রিয়** (dynamic) থাকে। প্রকৃত রূপে আত্মপ্রকাশ করিলে অধিশাস্তার দ্বারা আবার নির্জ্ঞানে বিতাড়িত হইবার আশঙ্কায়, উহারা আত্মগোপন করিয়া অথবা ছদ্মবেশে প্রকাশিত হয়। নির্জ্ঞান অবদমিত ইচ্ছার ছদ্ম বা বিকৃত প্রকাশই দৈনন্দিন জীবনের ভুলভ্রান্তিতে, স্বপ্নে এবং মানসরোগের বিচিত্র লক্ষণে দেখা যায়।

নির্জ্ঞান ইচ্ছার বিকৃত প্রকাশ প্রণালী (mechanism) ফ্রয়েড্‌ তাঁহার স্বপ্ন-বিশ্লেষণ (dream-analysis) প্রসঙ্গে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। উহাদের বিস্তৃত আলোচনা স্বপ্ন শীর্ষক অনুচ্ছেদে [১] দ্রষ্টব্য। ইহারা পাঁচ প্রকার, যথা (১) **প্রতীকতা** (symbolism), যাহার দ্বারা বুঝায় যে স্বপ্নে প্রকাশিত প্রত্যেকটি অংশই

কোন নির্জ্ঞান ইচ্ছা বা চিন্তার প্রতীক ; (২) **নাটন** (dramatisation), যাহার ফলে স্বপ্নের প্রকাশিত রূপগুলি একটি কাহিনী বা গল্পের আকার ধারণ করে ; (৩) **যুক্ত্যাভাস** (rationalisation) যাহার ফলে স্বপ্নের আজগুবি প্রকাশগুলি প্রকাশগুলি সুবিন্যস্ত বা সুসঙ্গত আকারে দেখা দেয় ; (৪) **সংক্ষেপণ** (condensation), যাহার ফলে অনেকগুলি নির্জ্ঞান ইচ্ছা স্বপ্নের এক একটি প্রকাশের মধ্য দিয়া সংক্ষিপ্ত আকারে পরিণত হয় ; (৫) **অভিক্রান্তি** (displacement), যাহায় ফলে স্বপ্নের প্রকাশিত রূপে প্রধান বা মুখ্য নির্জ্ঞান ইচ্ছাগুলি গৌণ এবং গৌণ ইচ্ছাগুলি মুখ্য বা প্রধান স্থান অধিকার করে।

ভুল-ভ্রান্তি, স্বপ্ন এবং মনোরোগের **বিশ্লেষণ বা মনঃসমীক্ষণ বলিতে বুঝায় উহাদের অন্তর্নিহিত নির্জ্ঞান অবদমিত ইচ্ছাগুলির উদঘাটন**। অবাধ ভাবানুষঙ্গই (free association) বিশ্লেষণ পদ্ধতি। **অবাধ ভাবানুষঙ্গের** প্রণালী এইরূপ :— রোগীকে শান্ত ও স্বচ্ছন্দভাবে একটি আরামকেদারায় হেলান দিয়া বসিতে বা শুইতে বলা হয় এবং তাহার মনে যে কোনো চিন্তা, ভাব বা ইচ্ছা আসে, তাহা সংযত বা নিরুদ্ধ না করিয়া অবাধে বলিয়া যাইতে নির্দেশ দেওয়া হয়। বলিতে আরম্ভ করিয়া যেখানে যেখানে রোগী আটকাইয়া যায়, সেই সকল স্থানে তাহার গূঢ়ৈষা (complex) থাকে, ধরিয়া লওয়া হয়। রোগীকে পুনরায় এই সকল নিরুদ্ধ ইচ্ছা বা ভাবগুলির উপর অবাধ ভাবানুষঙ্গ করিতে বলা হয়। এইরূপে যতই রোগীর নির্জ্ঞান অবরুদ্ধ ইচ্ছা বা ভাবগুলি সংজ্ঞানে নিঃসারিত (catharsis) হয়, ততই তাহার রোগলক্ষণের উপশম হইতে থাকে।

অবাধ ভাবানুষঙ্গের প্রবাহে একটি তৃণের মত বাহিত হইতে হইতে রোগীর আপাতবিস্মৃত জীবনস্মৃতিগুলি সংজ্ঞান মনে ভাসিয়া উঠিতে থাকে। ভাবানুষঙ্গ গভীরতর হইতে থাকে এবং সুদূর অতীতে নিরুদ্ধ এবং নির্জ্ঞানে নির্বাসিত অবদমিত বাসনাগুলি উহাদের আনুষঙ্গিক অনুভূতি বা প্রক্ষোভ সঙ্গে লইয়া জাগিয়া ওঠে। শৈশবের সকল ভালবাসা এবং ঘৃণার কেন্দ্র পিতামাতার স্থান গ্রহণ করেন স্বয়ং মনঃসমীক্ষক (Psychoanalyst)। তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া তাহার অনুভূতিগুলি প্রকাশিত হয় এবং **মনঃসমীক্ষকই রোগীর সকল ভালবাসা, ঘৃণা, ভয়, ক্রোধ প্রভৃতি অনু-**

১ এই খণ্ডের পঞ্চম পরিচ্ছেদ ৯ম অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

ভূতির লক্ষ্য হইয়া দাঁড়ান। অবাধ ভাবানুষঙ্গের এই গুরুত্বপূর্ণ অবস্থাটির নাম সংক্রমণ (Transference), যাহাতে পিতামাতার প্রাপ্য সকল প্রকাশগুলি সংক্রমিত হয় মনঃসমীক্ষকে।

এই সন্ধিক্ষণেই মনঃসমীক্ষকের যোগ্যতা পরীক্ষিত হয়। সাধারণ মনঃসমীক্ষক এই কঠিন অবস্থা উত্তীর্ণ হইয়া মনঃসমীক্ষণের চরম বা চূড়ান্ত স্তরে পৌঁছিতে পারেন না। যেমন স্বয়ং ব্রয়ার (Breuer) এই গুরুত্বপূর্ণ স্তরে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করিয়াছিলেন। আবার ফ্রয়েড্ সসম্মানে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। এই অবস্থায় মনঃসমীক্ষক রোগীকে তাহার ভুলভ্রান্তি বুঝাইয়া দেন এবং তাহাকে বাস্তবের সহিত সামঞ্জস্য করিয়া চলিবার **পুনঃশিক্ষা** (re-educatian to reality) দিয়া মনঃসমীক্ষণ সমাপ্ত করেন। এই পুনঃশিক্ষণের ফলে রোগী সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়া আসে।

অনুশীলনী (Exercise)

1. Give a short history of the controversy between the structural and functional schools of Psychology. Why does Titchener call himself an Existentialist ? (Ans : pp. 300-305)

   অবয়ববাদী এবং ক্রিয়াবাদী মতভেদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আলোচনা কর। টিশ্‌নার নিজেকে সত্তাবাদী বলেন কেন ?

2. What are the main theses of Behaviourism ? Give a critical analysis of these theses. Does Behaviourism succeed in banishing all reference to mind from Psychology ? Discuss. (Ans : pp. 305-308)

   চেষ্টিতবাদের মূল কথাগুলির সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ কর। চেষ্টিতবাদ মনোবিদ্যা হইতে মনকে সম্পূর্ণ বর্জন করিতে পারিয়াছে কি ?

3. Give a short history of Hormic Psychology. What are its main contributions to the psychology of instinct and emotion ?

(Ans : pp. 308-311)

হর্মিক মনোবিদ্যার ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা কর। সহজ প্রবৃত্তি এবং প্রক্ষোভ বিষয়ে উহার মূল অবদান আলোচনা কর।

4. Bring out the main contentions of Gestalt Psychology. Explain the main contributions of Gestalt Psychology to the problem of perception and learning. (Ans : pp. 311-313)

গেস্টাল্ট্ মনোবিদ্যার প্রধান আলোচ্য ব্যাখ্যা কর। প্রত্যক্ষ এবং শিক্ষা প্রসঙ্গে উহার মুখ্য অবদান কি ?

5. Point out the main features of psychoanalysis with special reference to its divisions of the psyche and dream-analysis.

(Ans : pp. 313-316)

মনঃসমীক্ষণের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি নির্দেশ কর। এই প্রসঙ্গে এই মতে মনের বিভিন্ন বিভাগ এবং স্বপ্নবিশ্লেষণ বুঝাইয়া দাও।